৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৪৬ Saturday, 11th November, 1939 ৫১শ সং

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীকালী—

ঘোর অন্ধকারেই ভক্ত মায়ের মূর্ত্তি দেখে, নিবিড় আঁধার উজ্জ্বল করিয়া মায়ের খাঁড়া চকমক করিয়া জ্বলে, সে চকমকি সাধকের অন্তরকে উচ্চকিত করিয়া তোলে—কালি, কালি মহাকালি কালিকে কালরাত্রিকে, তাঁহার কণ্ঠে উঠে এই নাদ। শ্মশানচারী শৃগাল দলের চীৎকার, দূরে অন্ধকারের বুকে প্রতিধ্বনিত প্রেতের অট্টহাসি সেই মহানাদের মাঝারে বিলীন হইয়া যায়। মাতৃনামের মধ্যে স্ফুরিত হয় মহানন্দ, আনন্দময়ী মা ভক্তের উৎকীর্ণ অন্তরশতদল আলো করিয়া নাচিতে থাকেন। বাহিরের আঁধার ভিতরের আলোককে উচ্ছ্বসিত করিয়া তোলে। ভিতরে এই আলো যেই জ্বলে, অমনই আরম্ভ হয় দীপান্বিতা; সৃষ্টির অঙ্গনতলে চেতনার দীপশিখা মাকে তখন সেই চৈতন্যরূপিণী দেবীরই দর্শন হয়। অভয়ার কণ্ঠে মাভৈঃ মাভৈঃ এই অভয় বাণী বাজিয়া উঠে তখন আকাশে বাতাসে—জগৎ চরাচরে। ভয় আর থাকে না। পশুত্ব ঘুচিয়া যায়, মনুষ্যত্ব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে হৃদয়ে। মানবতার সেই মহোচ্ছ্বাসের প্লাবনে যদি নূতন জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করিতে সাধ থাকে, নিত্য মৃত্যুর মধ্যে যদি অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার বাসনা সত্যই অন্তরে জাগিয়া থাকে—ধ্যান কর মায়ের ঐ রূপ, বল কালি, কালি মহাকালি কালিকে কালরাত্রিকে। মহাকাল দেবতার অন্তরের অতি কাছাকাছি মায়ের পাদপদ্ম রূপ ঐ যে মহেন্দ্রমন্দির রহিয়াছে, সেই স্থানে তুমি স্থান পাইবে, দৈন্য দূর হইবে, খসিয়া পড়িবে কার্পণ্যের বন্ধন। সেদিন জাগ্রত জীবনলক্ষ্মী তোমার কণ্ঠে জয়মালা আপনি পরাইয়া দিবেন। তোমার দীপান্বিতা সার্থক হইবে সেদিন। দীপ জ্বালো, জ্বালো এই অন্ধকারে। মায়ের চরণে আত্মনিবেদন কর। ইতর রাগের—ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী ভেদ করিয়া—গুটি পোকার গুটি কাটিয়া বাহির হও; ঐ উন্মুক্ত আকাশতলে মায়ের লীলারসপানে প্রদীপিত মত পাখা [illegible] নাচিতে থাক। ভেদ কর এ অহঙ্কৃত আঁধিকারের স্তরকে, অন্ধকার ছেদ করিয়া উদারবীর্য্যে আলোকের রাজত্বে চলিয়া যাও। এ গভীর অন্ধকার এ যে আলোকেরই সঙ্কেত—আলোকের অবিতৃপ্ত পিপাসাই ত ইহার ভাষা। এই অভাবের অনুভূতির ভিতর অনুস্যূত সেই ভাব-ধারাকে ধর, উপলব্ধি কর সেই সঙ্কেতকে। মায়ের কৃপা বুঝিবে। কৃপায় বুঝিবে স্নেহ। মায়ের টান পড়িবে সেদিন। সে টান একবার পড়িলে আর কে স্থির থাকিতে পারে? তখন আরম্ভ হয় ত্যাগ, পড়িয়া যায় বলির পালা। মাতৃ রস হইতে বঞ্চিত আমরা কি বুঝিব সে বলির নেশা? তখন কেবল বলি, স্বার্থ বলি, মান বলি, যশ বলি, বলির পর বলির ঝোঁকে একেবারে অষ্টপাশ বিনির্ম্মুক্ত। [illegible] ছিঁড়িবার উদ্দাম সে আনন্দ রসের তাণ্ডব—ভৈরবের [illegible], তাথৈ নৃত্যতাল। ত্যাগের ভিতর দিয়া তখন ভোগ, বিসর্জ্জনের ভিতর দিয়া তখন প্রতিষ্ঠা। সাধক কেবল চাহে তখন আত্মসমর্পণ। নিজের সব বুঝি তখন বুঝাইয়া দেয় সে মাকে। সব ছাড়িয়া সে সর্ব্বনাশী এলোকেশীর কোলে ছুটিয়া যায়। এত অশেষ রসের সম্ভাবনা রহিয়াছে এই আঁধারের মধ্যে। সঙ্কেতটা ধর—ভাষাটা বুঝ, ভাবে পাগল হইবে—মূঢ় লোকে নাহি বুঝে ভাবের বৈভব। তাহারা তোমাকে ভয়ের কথা শুনাইবে, হিসাবের কথা তুলিবে। আঁধারের সঙ্কেতে যদি আলোর আনন্দ তোমার মধ্যে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে তোমার অবীর্য্য ধ্বংস হইয়া যাইবে। শ্রুতি আর বিপ্রতিপন্ন হইবে না। শোন, শোন, মায়ের কথা শোন—"শ্রুধি শ্রুত"! অভয়ার সন্তান তুমি, আঁধারের অন্তরে নিগূঢ় আলোকের বাণী গ্রহণ কর। অমাবস্যার অন্ধকারে মায়ের পূজায় বসিয়া যাও। দীপ-শিখা জ্বলিবে, সার্থক হইবে দীপান্বিতা।

আমাদের কথা—

দেশের পাঠকপাঠিকাগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিতেছেন—অধিকাংশ সাংবাদপত্রেরই আয়তন পূর্ব্বের তুলনায় যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। দেশও পূর্ব্বাপেক্ষা আয়তনে যে কমিয়াছে, স্বেচ্ছায় আমরা যে এরূপ করি নাই, তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। ইহার কারণ এই যে, পত্রিকার

...বং রাখিতে হইলে যে পরিমাণ কাগজ পাওয়ার ... পাওয়া যাইতেছে না। যে রিল কাগজে দেশ ... মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল তাহা এদেশে ...না। নূতন কাগজ যাহা বিদেশ হইতে আসিতেছে কেবল দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে এমন নয়; উহা যে ...ভাবে পাওয়া যাইবে ইহারও কোনো সম্ভাবনা নাই। ...অবস্থায় পত্রিকার কলেবর বাধ্য হইয়া কমাইতে হইয়াছে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া সম্প্রতি আমরা স্থির করিয়াছি—নূতন বর্ষে আমরা "দেশ" ভারতে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট পুরু কাগজে ছাপিব। উহার মুদ্রণও এখনকার তুলনায় ভালো হইবে এবং সময়োচিত চিত্রে সুশোভিত করা হইবে। বাঙলা ... বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের লেখায় 'দেশ'কে সমৃদ্ধতর ...র আয়োজনও করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ... জন্য ব্যয় অনেক বেশী পড়িয়া যাইবে। নূতন বর্ষের "দেশ" পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য এই কারণে ছয় পয়সার স্থলে দুই আনা ধার্য্য করিতে আমরা বাধ্য হইলাম। আশা করি, দেশের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আমাদের অসুবিধার কথা সম্যক অনুধাবন করিয়া পূর্ব্ববৎ আমাদিগকে স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিবেন।

দিল্লীর আলোচনা ব্যর্থ—

দিল্লীতে একদিকে মহাত্মা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, অন্যদিকে মিঃ মহম্মদ আলি ... সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে যে আলোচনা ...হল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ...টি সুদীর্ঘ বিবৃতিতে এই আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই বিবৃতিতে বলেন,—'আমার প্রস্তাবমত আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু উহার ফল আমার পক্ষে একান্ত নৈরাশ্যজনক। প্রধান প্রধান বিষয়ে, প্রধান দুইটির প্রতিনিধিদের মধ্যে আজও মতদ্বৈধ বর্ত্তমান'। বড়লাট বাহাদুরের এই দুঃখে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তিনি চেষ্টা করিয়াছেন ইহা সত্য; কিন্তু আমরা পূর্ব্বেও যে কথা বলিয়াছি, এখনও সেই কথাই বলিব যে, এই চেষ্টা সমস্যার প্রকৃত সমাধান যেভাবে হয় সেভাবে হয় নাই। ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রশ্নের বিচার করিতে হইলে জাতীয় অনুভূতির উপর ভিত্তি করিয়াই তাহা সাফল্য-লাভ করিতে পারে, সাম্প্রদায়িক বিচার-বিবেচনা ইহার মধ্যে টানিয়া আনিলে এ সমস্যার মীমাংসা কল্পান্তকালের মধ্যেও হওয়া সম্ভব নহে। জনাব জিন্না সাহেব জাতীয়তার ধার দিয়াও যাইবেন না। তিনি সাম্প্রদায়িকতাকেই আগাগোড়া শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। জিন্না সাহেবের শেষ যে বিবৃতি তাহাতেও তিনি বলিতেছেন,—'মিঃ গান্ধীকে আমি একথা জানাইয়া দিতেছি যে, ভারতের মুসলমানেরা নিজেদের জোরের উপর দাঁড়াইয়া কাজ করিবে। আমরা আর কাহারও ধার ধারি না।'

এমন সাম্প্রদায়িক একগুঁয়েমির সঙ্গে বৃহত্তর জাতীয়তার আদর্শের মিল হইতে পারে না। কংগ্রেস যদি বৃহত্তর জাতীয়তার এই আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া জিন্না সাহেবের সাম্প্রদায়িক আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করিত, তবে ইহাতে কংগ্রেসের বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর সকল সাধনা ব্যর্থ হইত। বৃহত্তর জাতীয়তার ভিত্তির উপর ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে বিলুপ্ত হইত। সাম্প্রদায়িকতার কেঁকড়ার উপর কেঁকড়া উঠিয়া ফান্দব...ধ্যে ভারতের পরাধীনতা কায়েম হইত। জিন্না সাহেবের দাবী স্বীকার করা, আর কংগ্রেসের আত্মহত্যা একই কথা। ... ধারা ধরিয়া মিটমাটের আলোচনা চলিতেছিল, তাহার মধ্যে ছিল দোষ; সুতরাং মিটমাট যে হয় নাই, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনই কারণ নাই।

জিন্না সাহেবের যুক্তি—

আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে জিন্না সাহেবের সঙ্গে কংগ্রেসের এই দহরম-মহরম ঐকান্তিকতাকে আমরা একেবারেই উপলব্ধি করিতে পারি না। কংগ্রেসের শক্তি জাতীয়তার শক্তি—আর জিন্না সাহেবের যুক্তি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ; বলিতে গেলে এই দুইয়ে বিপরীত। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নীতির কথা আমরা ছাড়িয়া দিলাম; জিন্না সাহেবকে প্রশ্রয় দেওয়াতে কংগ্রেসের আদর্শের ... ঘটে—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। জিন্না সাহেবের সঙ্গে দহরম-মহরম ঐকান্তিক করিয়া তুলিয়া, পরোক্ষভাবে মুসলিম লীগকে একটা রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং তাহাতে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উদ্দেশ্য, ভেদনীতি অবলম্বনকারীদের অভীষ্টই সিদ্ধ করা হয়। জিন্না সাহেবকে লইয়া এতটা টানাটানি না করিলেই ভাল হইত। সুখের বিষয়, গোলটেবিল বৈঠকের সময় মহাত্মা গান্ধীর এ বিষয়ে ভ্রম ছিল, এখন তাহা ভাঙ্গিয়াছে। তিনি জিন্নার মতলব বুঝিয়া লইয়াছেন। 'হরিজন' পত্রে মহাত্মাজী লিখিয়াছেন—"জনাব জিন্না সাহেব মোসলেম-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ...শ-শক্তির উপর ভরসা করিয়া আছেন। কংগ্রেসের কোন ... অথবা কোন দাবী পূরণেই তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। কারণ বৃটিশজাতি যাহা দিতে এবং যাহা দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, তিনি সর্ব্বদাই তাহার চেয়ে বেশী দাবী করিতে পারেন। সুতরাং মোসলেম-দাবীর কোন সীমা ...তে পারে না।" ইহাই যখন সত্য, তখন জিন্না সাহেবকে টানাটানি করিয়া তাঁহাকে ভ্রান্ত মর্য্যাদায় স্ফীত করিয়া ...কে দাবী বাড়াইবার সুবিধা দেওয়া ভারতের স্বার্থের দিক হইতে ক্ষতি করা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। জিন্না সাহেব কংগ্রেসকে উপেক্ষা করিতে চাহেন কোন্ খুঁটার জোরে এবং স্বাধীনতার বৃহত্তর আদর্শে জাগ্রত ভারতে সে খুঁটার বাস্তবিক কতখানি আছে, জিন্না সাহেব এবং তাঁহার অনুগতবৃন্দকে তাহা উপলব্ধি করিতে দেওয়া উচিত। এ ... কোন মধ্যপন্থা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

পথ কোন্‌টি—

গত ৫ই নবেম্বর সংবাদপত্রে এক বিবৃতি ছাড়াও বড়লাট বাহাদুর বেতারযোগে একটি ... করিয়াছেন। এই

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(২২)

নিখিল বিশ্ব-সম্মিলন অথবা বিশ্ব-রাষ্ট্র

রাষ্ট্রবিকাশের ইতিহাস

তাহা হইলে মূলত এইটিই হইতেছে রাষ্ট্রবিকাশের ইতিহাস। ইহা হইতেছে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিকাশের দ্বারা কড়াকড়ি ঐক্যসাধনের এবং শাসনকার্যনির্বাহে, আইন-প্রণয়নে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ও কৃষ্টিতে এবং কৃষ্টির প্রধান উপায় শিক্ষা ও ভাষার ক্রমবর্দ্ধমান সমরূপতার ইতিহাস। সকল বিষয়েই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বটি উত্তরোত্তর নির্দ্ধারক ও নিয়ন্ত্রণশীল শক্তি হইয়া উঠে। এই প্রক্রিয়ার শেষ পরিণতি হইতেছে ঐ অদ্বিতীয় শাসনকর্তৃত্ব বা সার্বভৌম শক্তিটি রূপান্তরিত হয়, তাহা কেন্দ্রস্থানে কোন কার্য্যাধ্যক্ষ ব্যক্তিবিশেষ কিম্বা কোন সমর্থ শ্রেণীবিশেষ হইতে এমন একটি মণ্ডলীর হস্তে আসিয়া পড়ে যাহার কার্য্য হয় সমগ্র সমাজের চিন্তা ও ইচ্ছার প্রতিনিধি হওয়া। মূলত এই পরিবর্তন হইতেছে সমাজের স্বাভাবিক ও অরগ্যানিক অবস্থা হইতে যুক্তিমূলক ও যন্ত্রবৎ ব্যবস্থিত অবস্থায় বিবর্তন। শিথিল ও স্বাভাবিক ঐক্যে জীবন কতকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আভ্যন্তরীণ প্রেরণা ও বাহিরের প্রয়োজন এবং প্রাথমিক পারি-পার্শ্বিক অবস্থার চাপে নিজ যন্ত্র ও শক্তি-সকল বিকাশ করে; পরে ইহার স্থানে আইসে বুদ্ধিমূলক কেন্দ্রীভূত ঐক্যসাধন, যাহার লক্ষ্য হয় সর্বাঙ্গ-সুগঠিত যুক্তিসিদ্ধ efficiency বা কার্য্যদক্ষতা। স্বাভাবিক জটিলতা ও বৈচিত্র্য সকলে পূর্ণ শিথিল একত্বের স্থানে আইসে যুক্তিসিদ্ধ, সুশৃঙ্খল, কড়াকড়ি সমরূপতা। সমাজের স্বভাব ও ধাত অনুসারে বিকশিত বহুল আচার ও প্রতিষ্ঠানে তাহার যে স্বাভাবিক অর্গানিক ইচ্ছা অভিব্যক্ত হয় তাহার স্থানে আইসে সমগ্র সমাজের বুদ্ধিসম্মত ইচ্ছা, তাহা অভিব্যক্ত হয় যত্ন-পূর্ব্বক চিন্তা-প্রসূত আইনে এবং সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণে। রাষ্ট্রের চরম উৎকর্ষের অবস্থা হয় যখন জীবনের বৃহৎ ধারাগুলির স্বাভাবিক সরলতা এবং তাহার খুঁটিনাটি বিষয়ে অস্পষ্ট, বিশৃঙ্খল, ভূয়িষ্ঠ বৈচিত্র্য লইয়া জীবনের যে সতেজতা ও উর্বরতা তাহার স্থানে আসে এক যত্নপূর্ব্বক পরিকল্পিত উৎপাদনশীল ও নিয়ন্ত্রণ-শীল যন্ত্র এবং শেষ পর্যন্ত তাহা অতিকায় হইয়া উঠে। রাষ্ট্র হইতেছে মানুষের প্রভুত্বশালী কিন্তু ধৈর্য ও অনুসন্ধানশীল সায়েন্স ও বুদ্ধি, তাহা সাফল্যের সহিত প্রকৃতির অন্তর্বোধ ও বিবর্তনমূলক পরীক্ষা-সকলের স্থান গ্রহণ করে; বুদ্ধিমূলক অর্গানিজেশন স্বাভাবিক অর্গানিজেশনের স্থান গ্রহণ করে।

মানবজাতির ঐক্য এবং একটি বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা

রাজনৈতিক ও শাসনমূলক উপায়ে মানবীয় ঐক্যসাধনের অর্থ হইতেছে মানবজাতির নব-সৃষ্ট (এখনও শিথিল) স্বাভাবিক অর্গানিক ঐক্যকে ধরিয়া একটি বিশ্ব-রাষ্ট্রের সংগঠন ও অর্গানিজে-শন। কারণ ঐ স্বাভাবিক অর্গানিক ঐক্য এখনই রহিয়াছে,— জীবনের ঐক্য, অস্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার ঐক্য, মানবমণ্ডলীর অংশ-সকলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অনন্য নির্ভরতা, তাহাতে এক অংশের জীবন ও কর্ম্ম অন্যান্য অংশকে এমনভাবে প্রভাবিত করিতেছে যাহা শত বৎসর পূর্ব্বে অসম্ভব ছিল। মহাদেশের সহিত মহাদেশের ভেদরেখা মুছিয়া গিয়াছে; এখন আর কোন জাতিই নিজেকে ইচ্ছামত বিচ্ছিন্ন রাখিতে অথবা স্বতন্ত্র জীবনযাপন করিতে পারে না। বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং দ্রুত খবরা-খবর ও গমনা-গমনের ব্যবস্থা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে এককালে যে-সকল অসম জাতি নিজদিগকে লইয়া স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপন করিতেছিল তাহারা একটা সূক্ষ্ম ঐক্যসাধন প্রক্রিয়া দ্বারা সম্মিলিত হইয়া একটি মাত্র মণ্ডলীতে পরিণত হইয়াছে, ইতিমধ্যেই তাহারা হইয়াছে এক সাধারণ প্রাণ সত্তা এবং তাহার [illegible]ণ মানস সত্তাও দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছে। যাহাতে [illegible] অর্গানিক ঐক্য ঘনিষ্ঠতর ও সম্বদ্ধ ঐক্যের প্রয়োজন প্র[illegible]রে এবং তাহা সিদ্ধ করিয়া তুলিবার সংকল্প সৃষ্টি করে সেজন্য একটা বড় রকমের ধ্বংসকারী ও রূপান্তকারী আঘাত প্রয়োজন ছিল— বর্তমান যুদ্ধ সেই কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়াছে। একটি বিশ্ব-রাষ্ট্র কিম্বা বিশ্ব-সম্মিলনের আদর্শ কেবল যে কল্পনাপ্রবণ ভবিষ্যগণনা-কারী ভাবুকদের মনের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু এই নূতন সার্ব্বজনীন জীবনের প্রয়োজন হইতেই তাহা মানবজাতির চৈতন্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

দুইটি আদর্শ—বিশ্ব-রাষ্ট্র এবং বিশ্ব-সম্মিলন

এখন হয় পরস্পরের বুঝাপড়ার দ্বারা অথবা ঘটনাচক্রের চাপে এবং ক্রমান্বয়ে কতকগুলি নূতন ও বিভ্রাটজনক আঘাতের দ্বারা বিশ্ব-রাষ্ট্র স্থাপন করিতেই হইবে। কারণ এখনও জগতের যে পুরাতন ব্যবস্থা বর্তমান রহিয়াছে, তাহা যে সব পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এখন আর সে-সবের অস্তিত্ব নাই। নূতন পরিস্থিতির জন্য নূতন ব্যবস্থা প্রয়োজন হইয়াছে, আর যতক্ষণ না ইহা সৃষ্ট হইতেছে ততক্ষণ অবিরাম বিক্ষোভ অথবা পুনঃপুনঃ বিভ্রাট ও অবশ্যম্ভাবী সংকট-সমূহের একটা যুগ-সন্ধি চলিবে, সেই সবের ভিতর দিয়া প্রকৃতি নিজ উপদ্রবাত্মক ধারাতেই নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া তুলিবে। এই প্রক্রিয়ার আধিকারিক ও সামাজিক শক্তি-সকলের সংঘর্ষের ভিতর দিয়া অধিকতর ক্ষতি ও দুঃখভোগ ঘটিতে পারে, আর যদি যুক্তি ও সদিচ্ছা কাজ করিতে পায় তাহা হইলে ক্ষতি ও দুঃখভোগের মাত্রা ন্যূনতম হইতে পারে। সেই যুক্তির সম্মুখে দুইটি বিভিন্ন সম্ভাবনা এবং সেইজন্য দুইটি আদর্শ রহিয়াছে,—কেন্দ্রীকরণ ও সমরূপতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্ব-রাষ্ট্র, তাহা হইবে যন্ত্রবৎ ও বাহ্যিক ঐক্য, অথবা স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্ব-সম্মিলন, তাহা হইবে মুক্ত ও বুদ্ধিসম্মত ঐক্য। এই দুইটি আদর্শ ও সম্ভাবনা আমরা পর্য্যায়ক্রমে আলোচনা করিব।*

---

*The Ideal of Human Unity (Arya—1917) হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্তৃক অনূদিত।

যে নদীর কূল ভেঙেছে

(গল্প)
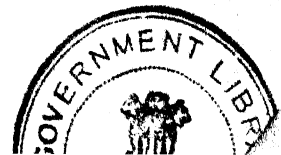
শ্রীধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শ্যামল সেনের স্ত্রী মিনতির হয়েছে বসন্ত।

রোগের যাতে বিস্তৃতি না ঘটে, সেই জন্য শ্যামল সব দিকে তার সতর্ক দৃষ্টির জাগ্রত পাহারা বসিয়েছে। কোথাও একটু শিথিলতা নেই। তার কঠোর অনুশাসন দিয়ে সে যেন এই উপচীয়মান শঙ্কাকে ঠেলে রাখতে চায়। ক্ষুদ্রতম তাচ্ছিল্যের ভিতরেও শ্যামল যেন অনাগত বিপদের শঙ্কিত মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছে।

মিনতির ঘরে রয়েছে নার্স মলিনা। রুগীকে জল দেওয়া, ওষুধ খাওয়ান, মাথায় জল ঢালা—মিনতির সর্ব্ব প্রয়োজনের দাবী মেটাতে একা মলিনা।

...ের শুধু দায়িত্ব। এ দায়িত্ব শুধু তার স্ত্রীর উপর নয়, বিশেষ মলিনার উপর, ছেলে, চাকর, ঝি সবারি উপর।

...র ও ঘরে সে প্রায়ই যায় না। এখানে তার হৃদয়ের দীনতার সঙ্গে রয়েছে নিদারুণ রোগভীতি। একটা অনাগত আশঙ্কায় যেন শ্যামলের মন মূর্চ্ছাহত হয়ে পড়েছে। জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধানের মাঝখানে শ্যামল যেন একটা প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে।

এ রুগীর পরিচর্য্যা করতে এসে মলিনার জীবনে যেন একটা নূতন অধ্যায় নেমে এসেছে। মিনতিকে দেখাই একমাত্র কাজ নয়, মিনতির ছেলেকেও দেখতে হয়। একমাত্র ছেলে রুণু। সুন্দর, সবল স্বাস্থ্যবান শিশু। মলিনা এসেছে মিনতির ভার নিয়ে, কিন্তু রুণুকে সে যেন পেল উপরি।

জীবনের যে পথে সে অন্ন-সংস্থানের জন্য বেরিয়েছে, সেখানে উদার স্নেহ, ভালবাসার মিনতি মমতার বন্ধনকে পিছনে ফেলেই চলতে হবে। কিন্তু হঠাৎ তার জীবনের অনুরুদ্ধ স্রোত যেন উপলখণ্ডে বাধা পেল। স্বল্পকে আশ্রয় করে বৃহতের স্বপ্ন সে কোন দিন দেখেনি, কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তনের দোলায়মান পর্য্যায়ের মাঝে পড়ে আজ সে তার অনাগত স্বপ্নকে যেন ঝাপসা দেখছে। অর্থের বিনিময়ে কর্ম্ম সম্পাদন করতেই শুধু সে এসেছে, কিন্তু জীবন যাকে দেয় সে এমনি করেই পায়।

কিন্তু মিনতির যেন অশান্তির অবধি নেই। বঞ্চনা যাকে ব্যথা দিয়েছে শঙ্কা তার মনে বেশী জাগে। ব্যাধি তার স্নেহের বন্ধনের নৈকট্যকে ব্যবধান করেছে।

দুঃখ মিনতির এইখানেই।

জীবন তার বেশী দিনের নয়, কিন্তু পৃথিবীকে সে এরি মধ্যে চিনেছে; অভিজ্ঞতার বহু সোপান সে অতিক্রম করেছে; মানুষের মনের অনুদ্ঘাটিত ছবিকে সে উদ্ঘাটিত করেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে তাকে দাঁড়িয়ে উঠতে হয়েছে, সংগ্রাম করে তাকে চলতে হয়েছে, তাই সে অনেক শিখেছে, বহু জিনিষ বুঝেছে। ভুল আর তার হবে না।

মলিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার অনেক। কিন্তু বলার ভাষা নেই। মলিনা এসেছে মোটে সাত দিন কিন্তু এরি মধ্যে সে যেন এ বাড়ীর একজন হয়ে গেছে। স্থিতি যার অনিশ্চিত, সম্বন্ধ যদি তার অল্প দিনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সন্দেহ সেখানে সহজেই জাগে।

কিন্তু মিনতি এ সন্দেহের কথা কাকে বলবে—শ্যামলকে সে ভাল করেই চেনে। তার রোগের প্রথম প্রকাশের দিন থেকে সে যে এই ঘরে আসে না, এও সে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু উপায় যার নেই অনুপায়কে ধরেই সে চলতে চায়। শ্যামলকে তার দাবী জানান অনেক দিন থেকেই কঠিন হয়েছে। সে শুধু অনুরোধ করল: রুণুকে অনেক দিন দেখিনি, আমাকে একবার এনে দেখাবে?

শ্যামল একেবারে বিস্মিত হয়ে বলল, তুমি কি পাগল হয়েছ মিনতি?

নার্সের কাছে সব সময় থাকে, মাকে কি একটিবারের জন্যও ওর দেখতে ইচ্ছা করে না!

না, করে না। নার্সের কাছে ও বেশ আছে।

নার্সের কাছে থাকলে ও মারা পড়বে। ওগো, তুমি ওকে নিয়ে এস। দূর থেকে একটিবারের জন্য ওকে দেখি।

শ্যামল রুক্ষ কণ্ঠে বলল, না, না। মিনতি তুমি অবুঝ হয়ো না। এ ছেলেমী নয়। তোমার অসুখ হয়েছে এটা বুঝতে পার না।

স্বামীর এ কণ্ঠ মিনতির অপরিচিত নয়, কিন্তু আজ এ অসুখের মাঝে সে যেন একটু ব্যথা পেল। এখানে উচ্ছ্বাস, আবেগ দেখিয়ে কোন লাভ নেই; মান অভিমানের পালা তার অনেক দিন শেষ হয়েছে। চুপ করে তাকে থাকতেই হবে। মিনতি শুধু গায়ের চাদরটা টেনে পাশ ফিরে শুলো।

তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। প্রথম জীবনের যে আরম্ভ, তা প্রথমেই তাকে ঘা দিয়েছে। বিবাহিত জীবন তাকে দিয়েছে অশান্তি, যৌবন দিয়েছে অসমাপ্ত কামনা আর ব্যাধি নিয়েছে তার অধিকার। বাঁচতে সে অনেকদিন আগে থেকেই চায়নি, আজও তার স্পৃহা নেই। জীবনের উপর তার বৈরাগ্যের ভাব আসেনি, এসেছে অতৃপ্তি, বিতৃষ্ণা। জীবনে তার সহজ সাবলীলতা নেই। গতি যেন কোথায় ব্যাহত হয়ে গেছে।

ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। মলিনা ওষুধ নিয়ে এল।

মিনতি শান্ত কণ্ঠে বলল, ওষুধ আমি খাব না মলিনা, তুমি যাও।

এখন যে ওষুধ খাবার সময় হয়েছে দিদি।

হোক সময়, তুমি যাও।

আপনার মাথা ধুইয়ে দেব?

এখন নয়।

মলিনা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, অনেকক্ষণ তো খাননি, এবার খাবার আনি কেমন?

মিনতি চীৎকার করে বলল, না না, তোমার কিছু করতে হবে না। তুমি যাও মলিনা, আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

মলিনা নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু তার উৎকণ্ঠিত বিস্ময় প্রকাশ করবার পূর্ব্বেই শ্যামল দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, রুণু খুব কাঁদছে, আপনি একবার যান।

মলিনা ওষুধটা টেবিলের উপর রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মিনতির জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কখনও আসেনি। জীবনে প্রথমেই সব নারীই যা পায়, মিনতি তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দুঃখ মিনতির এইখানেই।

মনের সরসতা তার শুষ্ক হয়ে গেছে। করুণা তার ম... সহজে জাগে না। তাই মলিনার প্রতি তার ব্যবহারে স্পষ্ট হ... উঠেছে। এখানে মমতা, দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি দেখালে ভুল ব... হবে। অধিকার যেখানে সে হারাতে বসেছে, কঠোর তাকে সেখ... হতেই হবে। নিজের যেখানে অক্ষমতা, আশা পূরণ করা যেখ... সাধ্যাতীত, দয়া যেখানে নেই, সেখানে সে সাধুতার ভাণ ক... থাকবে না।

শ্যামল যেন মিনতিকে নিয়ে শ্রান্ত হয়ে উঠেছে। মলি... এসেছে কর্ত্তব্য করতে দণ্ড নিতে নয়। এটাই সে বুঝে... মিনতিকে বলল, নার্সের সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করো মিনতি।

মিনতি চুপ করে রইল।

কোন দিনইত তুমি আমার কোন কথা শুনলে না, ... তোমাকে অনুরোধ করছি, যে তোমার সেবা করতে এসেছে, ... সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো না।

মিনতি এবার একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কণ্ঠ যে... ভাষা হারিয়ে নিঃশব্দ হয়ে যায়, অশ্রু সেখানে নীরবে কথা জান...

মিনতি কেঁদে তার প্রথম প্রতিবাদ জানাল।

শ্যামল শান্ত সুরে বলল, চোখের জল তোমার নূতন নয়, কাঁদতে তুমি জান। তোমার অসুখ সারাতে আমি শেষ চেষ্টা করব। কিন্তু তুমি একটু শান্ত হও মিনতি।

মিনতি এবার উত্তেজিত হয়ে বলল, তুমি স্বামী নও, তুমি মানুষ নও, তুমি কসাই। তোমার পায় পড়ি, তুমি যাও। আমাকে তোমার বাঁচাতে হবে না। আমি মরব। আমাকে মরতে দাও।

মিনতি অসংযতভাবে নিষ্ফল উত্তেজনায় কেঁদে উঠল।

জীবনের আরম্ভকাল যার মাঝ পথেই ছিঁড়ে যায়, তার এ পৃথিবীর উপর একটা আকর্ষণ থাকে। কিন্তু মিনতির কাছে ঐ ধূলি-মলিন পৃথিবী যেন কোন মাধুর্যই ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। এ পৃথিবীর জন্য তার কোন মোহ নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, বাসনা নেই। এ পৃথিবীকে ছেড়ে যাওয়া তার অভিশপ্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ।

মলিনা নিজের মাঝে নিজেকে বেঁধে ফেলেছে। মুক্তির নিশ্বাস ফেলবার অবসর তার নেই।

রুণু এর মধ্যে তাকে মা বলতে আরম্ভ করেছে। রাত্রে নিঃশব্দে কোলটি ঘেঁসে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। মলিনা রুণুর সর্ব্ববিধ আবদার দৌরাত্ম্য, নির্ব্বিচারে মেনে লয়।

এতদিন তার জীবন কেটেছে একটা অনির্দ্দিষ্ট পরিধির মাঝে, আজ নির্দ্দিষ্ট সীমানার মাঝে এসে সে যেন জীবনের প্রসার অনুভব করতে লাগল।

মলিনার হাতে রুণুকে সঁপে দিয়ে শ্যামল যেন নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। শ্যামল দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখল, রুণুকে কোলের কাছে শুইয়ে রেখে, মলিনা তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে। এ দৃশ্য শ্যামলের চোখে যেন একটা মোহ এনে দিল। মলিনাকে ও যতই দেখে, ওর চোখ যেন ততই পিপাসিত হয়ে ওঠে। শ্যামল মলিনার চোখের দিকে চেয়ে দেখল, তা দীপ্তিতে উজ্জ্বল, প্রাণের মমতায় ভালবাসায়, সহানুভূতিতে তা পরিপূর্ণ। স্নেহের অতলতায় সে যেন নিজেকে নিঃশেষ করে ডুবিয়ে দিয়েছে।

শ্যামল আস্তে বলল, আপনার হয়ত এখনও খাওয়া হয়নি।

মলিনা ত্রস্তে সংযত হয়ে উঠে বসে বলল, না ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে যাব।

কিন্তু বেলা ত অনেক হয়েছে। আপনি যান। আমি ওকে ঘুম পাড়াচ্ছি।

রুণু শ্যামলের কণ্ঠস্বর শুনে কলহাস্যে উঠে বসল, মলিনা তাকে সস্নেহে জোর করে শুইয়ে রেখে বলল, দেখলেন কি দুষ্টু। ওকে আপনি সামলাতে পারবেন?

ও আপনার উপর ভারী দৌরাত্ম্য করে। ওকে আপনি অত প্রশ্রয় দেবেন না।

মলিনা অবিচলিত কণ্ঠে বলল, মায়ের যখন অসুখ হয়, ছেলেরা তখন কারও উপর নির্ভর করে থাকতে চায়। প্রশ্রয় এটা নয়।

শ্যামল স্মিতহাস্যে বলল, জীবনে আপনার অজানিত পথে চলতে হবে, বন্ধন আপনার ভাল নয়। করুণা আপনার মনে থাকবে কিন্তু তাকে স্নেহের ডোরে বাঁধবেন না ; ভবিষ্যৎ আপনাকে দুঃখ দেবে।

মলিনা শ্যামলের মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে দেখে চোখ নাবিয়ে নিল।

ভবিষ্যৎকে সে কখনও ভেবে দেখেনি। চিন্তা করা তার রীতির বাহিরে। এখানে সে যে চিরদিন থাকতে আসেনি—রুণুকে যে একদিন ছেড়ে যেতে হবে, এ সে কোনদিন ভেবে দেখেনি। শ্যামল যেন তাকে নূতন কথা শোনাল।

শ্যামল ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল, মলিনার ব্যবহারের মাঝ দিয়ে সে যেন একটা নিবিড় প্রাণের সহজ স্পন্দন অনুভব করতে পারে। তার মনের মাঝে একটা প্রশান্তির ভাব ফিরে এল।

শ্যামল মিনতির ঘরে এসে দেখল, মিনতি পাশ ফিরে শুয়ে আছে। শ্যামল কাছে গিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, মিনতি তুমি এবার সেরে উঠলে, তোমাকে খুব ভাল জায়গায় নিয়ে যাব।

স্বামীর এ পরিবর্ত্তিত কণ্ঠস্বর শুনে মিনতি শ্যামলের দিকে পাশ ফিরে শুল।

শ্যামল বলল, তুমি কোন ভয় করো না মিনতি। তাড়াতাড়িই তুমি সেরে উঠবে। তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

মিনতি শান্ত কণ্ঠে বলল, না।

তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, ওষুধ দেব?

দাও।

শ্যামল টেবিলের উপর থেকে ওষুধের শিশিটা নিয়ে এক দাগ ওষুধ অতি যত্নে মিনতির মুখে ঢেলে দিল। অতঃপর বিছানার উপর থেকে হাত পাখাটা উঠিয়ে নিয়ে একটা চেয়ারে বসে, মিনতির মাথায় বাতাস দিতে লাগল। মিনতি চোখ বুজে স্থির নিষ্পন্দভাবে পড়ে থেকে স্বামীর এই সেবা উপভোগ করতে লাগল। তার জীবনে এ শুধু অভাবনীয় নয়, অপ্রত্যাশিত। জানা অজানা স্মৃত, বিস্মৃত সব ঘটনাগুলিকে সে মনের গভীর কোণ হতে একবার সজাগ করে তুলে দেখল যে কোথাও তার বিবাহিত জীবনে এমনিভাবে স্বামীর পরিচর্য্যা এবং সাহচর্য্য সে পায়নি। এতখানি বিস্ময় যে তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল, তা সে কল্পনাও করেনি। মিনতি যেন বেদনামিশ্রিত আনন্দের একটা অতি সূক্ষ্ম প্রবাহ অনুভব করতে লাগল।

শ্যামল বলল, মিনতি এ ডাক্তারকে বদলাব?

তুমি যদি ভাল মনে কর, তবে বদলাতে পার।

শ্যামল একটু হেসে বলল, আমি ত রুগী নই মিনতি। তোমার ভাল লাগা না লাগার উপর সবটাই নির্ভর করছে। তোমার কি ভাল মনে হচ্ছে না?

মিনতি আস্তে বলল, না।

তবে অন্য ডাক্তার ডাকি, কেমন?

আচ্ছা।

মলিনা ঘরে ঢুকে শ্যামলকে বসে থাকতে দেখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

শ্যামল বলল, দাঁড়ালেন যে, কেন এসেছিলেন?

দিদিকে ওষুধ খাওয়াতে।

ওষুধ আমি খাইয়ে দিয়েছি। আপনি খেয়েছেন?

হ্যাঁ, খেয়েছি।

তবে একটু ঘুমিয়ে নিলে পারতেন। কালও সারা রাত জেগেছেন।

মলিনা ছোট একটি আচ্ছা বলে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শ্যামলের অতি নিকট সান্নিধ্যে মিনতির মনে যে সুন্দর ভাব জেগে উঠেছিল, মলিনার আগমনে তা যেন উড়ে গেল।

শ্যামল বলল, পয়সার বিনিময়ে ও খাটতে এসেছে, কিন্তু ওর কাজ দেখলে তা যেন কিছুতেই মনে হয় না। মনে হয় ও যেন আমাদের কত আপনার।

মিনতি চোখ বুজে চুপ করে রইল।

শ্যামল বলে চলল, ও শুধু তোমার সেবাই করে না, সংসারের সব কাজ ওর মুখ চেয়ে আছে। আমাকে কি যত্নই যে করে, শুনলে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। আর আমার সব চেয়ে বিস্ময় লাগে মিনতি, যে রুণুকে ও এত অল্পদিনে এত আপন কি করে করল। রুণু ওকে মা ডাকে, আর—ওকি তুমি মুখ ঢাকলে কেন? ওঃ মাছি বসছে আচ্ছা ঢেকেই রাখ।

শ্যামল হাত পাখাটা বিছানার উপর রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মলিনা হয়ত এখন রুণুকে নিয়ে আদর করছে। কিছুতেই ও ঘুমায় নি। তুমি একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর। আমি আসছি।

শ্যামল চলে গেলে, মিনতি মুখ থেকে কাপড়টা নামিয়ে দাঁত দিয়ে সজোরে কামড়ে ধরল। শ্যামল একজনকে প্রশংসা করে আর একজনের অন্তরে যে প্রদাহ এনে দিল, তারই জ্বালায় মিনতি যেন অসাড় নিস্পন্দ হয়ে এল। অসহ্য বিস্ময় ও বেদনায় মিনতি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

অনুভূতিহীন সহানুভূতির যে সান্ত্বনা, তা কখনও ব্যথার উপশম করে না। মিনতি অন্তরের জ্বালায় অসহায়ভাবে চীৎকার করে উঠল।

বারান্দায় মলিনা রুণুকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল। মিনতির বেদনাময় করুণ আর্ত্তনাদ শুনে মলিনা রুণুকে কোলে নিয়েই মিনতির কাছে ছুটে এল।

মিনতি আরতির প্রদীপের মত তার রক্তদৃষ্টি মেলে মলিনার ভীত দৃষ্টির পানে চেয়ে চীৎকার করে বলল, যাও এখান থেকে। রাক্ষসী আমার ছেলেকে স্বামীকে খেতে এসেছে। যাও—যাও তুমি।

মলিনা নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দরজা থেকে শ্যামল গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আপনি রুণুকে নিয়ে যান।

মলিনা আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শ্যামল শুধু মিনতির মুখের দিকে চেয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

নীচে সুন্দর সাজান বাগান। অজস্র বিকশিত পুষ্পের মধুর সুরভিতে বাতাস ভরা। আর তাদেরই বিচিত্র বর্ণ সুষমায় দিক উজ্জ্বল।

শ্যামল ভাবল, এ মেয়েটির ক্লান্তিহীন সেবার মিনতি যে কোন মূল্যই দেয় না, তার স্নেহকে যে আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দেয়, বিদ্রূপ করে তার মমতাকে কুৎসিত করে তোলে এর জন্য এ মেয়েটির যেন কোন দুঃখ নেই, কোন গ্লানি নেই। মিনতির অকরুণ হৃদয়হীন ব্যবহার মলিনার মনে যেন কোন রেখাপাতই করে না। অভিমান করে সে প্রতিবাদ করে না, রাগ করে সে আঘাত ফিরিয়ে দেয় না।

অবশেষে মিনতির দীপের সলিতার আলো একদিন নিভিল। আকস্মিক এটা নয়। এর জন্য শ্যামল আগে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিল।

সমস্ত বাড়ীটার মাঝে কান্নার লোক শুধু শ্যামল। ঝি, চাকরেরা, কিছুক্ষণ কেঁদে চোখের জল মুছে, সংসারের কাজে লেগে গেছে। মলিনা রুণুকে নিয়ে পাশের ঘরে চুপ করে বসে আছে, চোখ দুটো তার জলে ভরা। যার অন্তরের ফুল আজ ঝরে পড়ল, সেই শুধু চুপ করে আছে। চোখের জলের ভিতর দিয়ে তাকে বিদায় দিল না, বেদনাময় কথার মালা গেঁথে তার শোকের গভীরতা জানাল না। শ্যামল শুধু মিনতির একটা হাত ধরে, সমস্ত চৈতন্য দিয়ে যেন কোন্ দেহাতিরিক্ত সত্তার স্পর্শ অনুভব করতে লাগল। জীবনে যাকে কোনদিন উপলব্ধি করেনি, মৃত্যুর পর তার জন্য শ্যামল যেন একটা গোপন ব্যথা তার সমস্ত প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে লাগল।

এতদিন পর মলিনার কর্ম্মের অবসান ঘটল।

রুণুকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মলিনা তার মুখের দিকে সতৃষ্ণনয়ন মেলে তাকিয়ে আছে। শ্যামল বাইরে থেকে রুণুকে দেখল। সুন্দর শিশু, তারই রূপান্তরিত কামনা। মিনতির শেষ এবং একমাত্র চিহ্ন। কিন্তু ভালবাসার অবদানের পথের সৃষ্টি সে নয়, কামনা পথের অনাহূত অতিথি। শ্যামল যেন রুণুর জন্য আজ অন্তরে একটু ব্যথা পেল।

মিনতির মৃত্যু শ্যামলের চারিদিকে যেন একটা বিশাল অবকাশ রচনা করেছে। কর্ম্মহীন দিনগুলির অবসাদ শ্যামলকে যেন পীড়া দিচ্ছে। জীবনে যেন এরই মাঝে শ্যামল ক্লান্ত হয়ে উঠেছে।

ঘরের মাঝে শ্যামলের অস্থিরতা যেন আরও বেড়ে ওঠে। চারিদিকে বেদনার বাষ্প জমাট বেঁধে আছে, আর সেই আবছায় আলোর পশ্চাতে শ্যামল যেন মিনতির বেদনাক্লিষ্ট মুখ দেখতে পায়। মিনতি জীবনে যা করতে পারে নি, মরার পরে যেন তার প্রতিশোধের গোপন ইঙ্গিত শ্যামলকে জানিয়ে দিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে রাত্রিতে শ্যামল মিনতিকে স্বপ্নে দেখে ঘেমে একেবারে নেয়ে ওঠে। মলিনা শ্যামলের এ বেদনাময় অস্থিরতা টের পেয়েছে, কিন্তু কোনদিন কারণ জানতে চায়নি।

কারণ একদিন শ্যামল নিজেই প্রকাশ করল।

মাঝ রাত্রিতে হঠাৎ একদিন শ্যামল ঘুম থেকে উঠে দৌড়ে গিয়ে মলিনার রুদ্ধ দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়ে মলিনাকে ডাকতে লাগল।

মলিনা তাড়াতাড়ি বাতি জেলে দরজা খুলতেই শ্যামল ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে বল্‌ল, রুণু কৈ মলিনা? আমার রুণু?

মলিনা শ্যামলের ভয়ার্ত্ত, বিবর্ণ মুখের পানে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। শ্যামলের শরীরে দরবিগলিত ধারায় ঘাম পড়ছে। চোখের ভিতরে একটা ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি, চুলগুলি বিপর্য্যস্ত। শ্যামল যেন এইমাত্র মৃত্যুর গহ্বর থেকে পরিত্রাণ পেয়ে এসেছে।

শ্যামল রুণুকে বিছানায় নিদ্রিত দেখে শ্রান্তকণ্ঠে বল্‌ল মলিনা, মিনতি এসেছিল রুণুকে নিতে। রুণু বোধ হয় আর আমার বাঁচবে না।

মলিনা শ্যামলকে বল্‌ল, রুণুর ত কিছু হয়নি তবে আপনি ভাবছেন কেন? আপনি বিছানায় একটু শুয়ে থাকুন, আমি বাতাস করছি।

শ্যামল ক্লান্তভাবে বিছানায় এলিয়ে পড়ে মলিনার একটা হাত ধরে তার করুণ-কাতর দৃষ্টি মেলে বল্‌ল, মলিনা আমার রুণুকে তোমাকেই দিলাম। তারপর কণ্ঠস্বর অতি ছোট করে বল্‌ল দেখবে, মিনতি যেন প্রতিশোধ নিতে না পারে। রুণু যেন তোমাকে পেয়ে ভুলেই যায় যে মিনতি তার একদিন মা ছিল।

স্বপ্নাবিষ্টের মত মলিনা শ্যামলের কথাগুলো শুনে গেল। বাইরে অন্ধকারময়ী রজনী নিঃশব্দে প্রহর অতিক্রম করে চলেছে। মলিনা চুপ করে শ্যামলের কাছে বসে রইল। হৃদয়ে তখন তার এক প্রচণ্ড আলোড়ন এসেছে। দেহকে অতিক্রম করে মন তখন তার নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

কিন্তু মিনতি শেষ পর্য্যন্ত শ্যামলের উপর প্রতিশোধ নিল।

রুণুর জ্বর। শ্যামলের অসাহয্যতার শেষ প্রান্তে ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি শুধু যেন বিপদের ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখছে। শ্যামল একেবারে শঙ্কিত হয়ে উঠল। নিরুপায়ভাবে সে শুধু মলিনার কাছে আত্মসমর্পণ করল ঃ মলিনা, মিনতি শেষে সত্যই প্রতিশোধ নিল। আমি কোন কিছুকেই ভয় করি না মলিনা, যদি তুমি আমার সহায় হও।

মলিনা জীবনে যেন আজ এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হ'ল রুণুকে ও ভালবাসে। এমনিভাবে শিশুকে ভালবাসা জীবনে ওর এই প্রথম। রুণুকে সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে, আদর দিয়ে ভাল ক'রে তুলতে হবে। এ ছেলেটি না বাঁচলে মলিনার জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠবে, প্রতিটি মুহূর্ত্ত করুণ হয়ে উঠবে, চিরদিনের অশান্তিতে বুক ভরে উঠবে।

শ্যামল অসহায়ভাবে বল্‌ল, মলিনা, জীবনে যেন আর আমি চলতে পারছি না। আমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। আমাকে ও রুণুকে তোমার হাতেই সঁপে দিলাম মলিনা। আমাদের তুমি বাঁচাও।

মলিনা স্থির হয়ে বসে রইল। শ্যামলের কথার উত্তর দেবার শক্তি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ রুণু যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল ঃ মা, মাগো।

মলিনা তাড়াতাড়ি রুণুকে বুকের উপর তুলে নিয়ে নিবিড়

(শেষাংশ ৭৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আসামের রূপ

(ভ্রমণ কাহিনী)

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস

আহোম রাজার দেশে

ডিগবয় হইতে প্রায় চারি ঘণ্টা রেলে চড়িয়া লক্ষ্মীপুর জেলার সদর ডিব্রুগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আধুনিক শহর সুশৃঙ্খল রাস্তাঘাট। উপর আসামের প্রত্যেকটি জিলা শহরই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এবং রাস্তাঘাটের শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতায় বাঙলার যে কোন জিলা শহর হইতে সমৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

ডিব্রুগড় শহরটিও ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটি অতি সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী শহর। এ প্রদেশের প্রধান দুই তিনটি শহরের মধ্যে ইহা একটি। চারিপার্শ্বের অসংখ্য চা-বাগান, কয়লা খনি ও তেলখাদ ইত্যাদি ডিব্রুগড় শহরের সম্পদ বহুগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আসামের একমাত্র সরকারী মেডিকেল স্কুলটিও এখানেই অবস্থিত।

কর্ম্মোপলক্ষে বহু বাঙালী ডিব্রুগড়ে বাস করেন, তবে আসামী বাঙালীর অধিকাংশই চাকুরীজীবী আর ব্যবসায়ের ক্ষেত্রগুলি সব মাড়োয়ারীদের দখলে।

যাহা হউক আধুনিক শহরের গতানুগতিক পরিচয়ের বহর বাড়াইয়া আর লাভ নাই। আমি এখানে কোন পরিচিত বাঙালী গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, চারিদিন এখানে বাস করিয়া বৈশাখের তৃতীয় দিবসে (১৩৪৫ বাং) বেলা প্রায় বারটায় আবার পথে বাহির হইলাম। এবার আমার গন্তব্যস্থান আসামের শেষ স্বাধীনরাজ্য অহোম রাজার দেশ 'শিবসাগর'।

মোটর-বাসে চড়িয়া সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া পশ্চিমমুখে চলিতে লাগিলাম। শহর হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার দুই পাশ দিয়া অনবরত চা-বাগান নজরে পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই-একটি বস্তী, বাগানের বাজার, কল-ঘর আর সাহেবদের বাংলো চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে হারাইয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে গাড়ী থামাইয়া যাত্রী উঠা-নামা করিতেছে তবে বোধ হয় অবতরণকারী অপেক্ষা আরোহীর সংখ্যাই বেশী হইতেছিল। কারণ, বার বারই পেছন হইতে কানে আসিতেছে—"আউর মৎ উঠাও, জ্যাম্ হো গিয়া,' কিন্তু বেপরোয়া হিন্দুস্থানী ড্রাইভার অনবরত যাত্রী উঠাইয়া চলিয়াছে আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর বেগ দ্রুত হইতে দ্রুততর করিতেছে। ক্রমে গাড়ী চল্লিশ মাইল বেগে চলিতে লাগিল। একবার পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম মালে মানুষে গাড়ীর মেজে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত সত্যই জ্যাম্ হইয়া রহিয়াছে। যাত্রিগণ পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া চক্ষু বুজিয়া কোনরূপে গাড়ীর বেগ সামলাইতেছে। সৌভাগ্যবশত গাড়ীর সম্মুখভাগের একমাত্র বেঞ্চে একখানা আসন পাইয়াছিলাম নতুবা বোধ হয় আমাকেও ঐ অবস্থায়ই পড়িতে হইত।

কখন চল্লিশ মাইল আবার কখনও নীচে দশ বার মাইল পর্য্যন্ত বেগে গাড়ী চলিয়া এবং বারবার থামিয়া চা-[illegible] একরূপ পাড়ি দিয়া ফেলিল, আর তার স্থানে একটি দুইটি [illegible] আসামী গ্রাম দেখা দিতে লাগিল। সূর্য্যদেবও তখন আকাশের একপার্শ্বে হেলিয়া পড়িয়াছেন। চলন্ত গাড়ী হইতে বৃক্ষলতাবহুল পল্লীগুলিকে এই পড়ন্ত বেলার রঙিন আলোয় বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। রাস্তার পার্শ্বস্থ বাড়ীগুলিতে কোথাও আঙিনায় বসিয়া মেয়েদের কাপড় বুনিতে বা সুতা টানা দিতে দেখা যাইতেছিল, কোথাও পল্লীবালিকারা সাজিয়া-গুজিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দারুণ রৌদ্র ও ধূলির মধ্যে একটানা তিন চারি ঘণ্টা ছুটিবার পর এ সব দৃশ্য যেন মনে একটা স্নিগ্ধ পরশ বুলাইয়া দিতেছিল।

ক্রমে শিবসাগর টাউন দেখা দিল। প্রথমেই তাহার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের কীর্ত্তি আসাম গৌরবের নিদর্শন শিব-দেউলের স্বর্ণচূড়াটি দৃষ্টিগোচর হইল।

গাড়ী শহরের নিকটবর্ত্তী হইলে আইন-কানুনের প্রতি আবার ড্রাইভার সাহেবের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল, টাউনের বাহিরে অতিরিক্ত যাত্রী ও মাল নামাইয়া গাড়ী যথা-নির্দ্দিষ্ট বেগে চলিয়া শহরে প্রবেশ করিল। বেলা প্রায় পাঁচটায় শিবসাগরের একমাত্র বাঙালী হোটেলে গিয়া আমি আশ্রয় লইলাম।

তখনও সামান্য বেলা ছিল, নূতন দেশে আসিয়া এসময়টুকুও ঘরে বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না। মাল-[illegible] গুছাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণ মধ্যেই নিকট[illegible] শিব-দেউলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন দেউল [illegible] নাট-মন্দিরে কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে 'নাম' হইতেছিল।
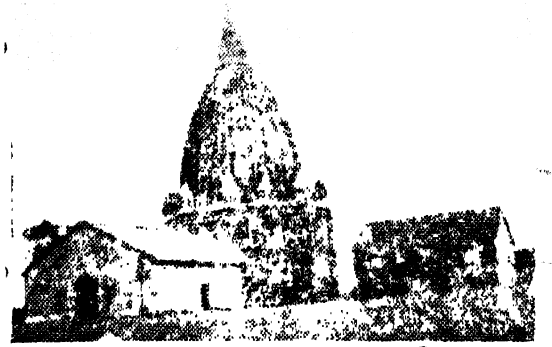
জয়সাগরতীরে নয়দেউল—শিবসাগর

আসামীদের 'নাম' কতকটা আমাদের কীর্ত্তনের অনুরূপ তব নামের সুর ও তাল সর্ব্বসময়ে এবং সর্ব্বপ্রকার বিভিন্ন সংগীতে একইরূপ; আবার একপ্রকার বৃহদাকৃতির করতাল ছাড়া অন্য কোন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ইহাতে নাই। এখানে কিন্তু সেই করতালও দেখিলাম না। প্রশস্ত নাটমন্দিরের মধ্যে মুখোমুখী হইয়া দুই লাইনে প্রায় অর্দ্ধশত লোক বসিয়াছে আর তাহাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া একজন (বোধ হয় বিশেষজ্ঞ) নানাপ্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে এক একটি কলি গাহিতেছেন, তৎপর সকলে মিলিয়া হাততালির সঙ্গে আবার অনুরূপ আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে।

এ সঙ্গীত যে খুব শ্রুতিমধুর হইতেছিল তাহা নহে, তবুও তাহাদের করতালি সহ এই সমবেতকণ্ঠের ভক্তিপ্লুত ধ্বনি প্রস্তর-দেউলের স্তরে স্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন স্থানটিতে এক স্বর্গীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। আমি মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া মুগ্ধ চিত্তে 'নাম' শুনিতে লাগিলাম।

পরদিন ভোরেই বেড়াইতে বাহির হইলাম। 'শিবসাগর' নামক এক বিশাল দীঘির তীরে এই ছোট শহরটি অবস্থিত, ইহা 'শিবসাগর' জিলার একটি মহকুমা শহর মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অহোমীয়া রাজা শিবসিংহের স্থাপিত রাজধানীর ভিত্তির উপরেই বর্ত্তমান শহরটিও গড়িয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান দিয়া আমার প্রয়োজন নাই, অতীতের নিদর্শন দেখিতেই এখানে আসিয়াছি। বস্তুত অতীতের স্মৃতিই এ শহরটিকে এখনও উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। সোয়া দুইশত বৎসর পূর্ব্বে অহোমরাজ শিব সিংহ প্রতিষ্ঠিত (কাহারও কাহারও মতে তদীয় পত্নী ফুলেশ্বরী প্রতিষ্ঠিত) বিরাট দীঘিটি ও তীর-

বর্ত্তী তিনটি মন্দির আজও অক্ষুন্নদেহে বিদ্যমান থাকিয়া শুধু যে অতীতের স্মৃতিই জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহা নহে, বর্ত্তমান শহরটির সৌন্দর্য্যও শতগুণে বাড়াইয়া দিয়াছে। ৩৯০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত সুউচ্চ ও প্রশস্ত তীরবিশিষ্ট এই স্বচ্ছ সলিলা দীঘীর স্থির, ধীর, বিশাল রূপ আজও শত শত নরনারীকে মুগ্ধ করিতেছে, যেমন করিত অতীতের স্বাধীন রাজ্যে।

বিগত দিনের অহোম রাজত্বের নানা চিত্র কল্পনা করিতে করিতে 'শিবসাগরের' চারিটি তীর ঘুরিয়া আসিলাম, এদিকে সূর্য্যদেবও তাহার প্রভাতের পূর্ণ রূপটি পৃথিবীর উপর ধরিয়া দিয়াছেন। আমি শিবদেউলে গিয়া উঠিলাম।

শিবদেউল—শিবসাগর

শিবসাগরের ঠিক তীরেই সাধারণ ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় দশ ফুট উচ্চ একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বিরাট শিবদেউলটি দাঁড়াইয়া আছে, শিবদেউলের দুই পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নীচু এবং ছোট দুইটি প্রাঙ্গণের একটিতে বিষ্ণু এবং অন্যটিতে গৌরী-দেউল অবস্থিত। চূড়ার ত্রিশূল ও চক্র চিহ্নই মন্দির দুইটির পরিচয় জানাইয়া দিতেছে। শিবদেউল অপেক্ষা বিষ্ণু ও গৌরী-দেউল আকারে অনেক ছোট, তবে গঠন প্রায় একই রূপ।

আমি মন্দিরে উঠিয়াই একজন সুদর্শন ব্রাহ্মণ যুবককে পাইলাম। তিনি সাগ্রহে মন্দির সম্মুখস্থ খিলানের নীচে আসন পাতিয়া বসিতে দিলেন, প্রথম ভাবিয়াছিলাম, আমাকে তিনি একজন বিদেশী পুণ্যার্থী ভাবিয়াছেন, এজন্যই এত অভ্যর্থনা, কিন্তু শেষে আমার উদ্দেশ্য জানাইলেও তাঁহার সৌজন্যের কণামাত্র কমতি দেখিলাম না, বরং যেন বাড়িয়াই চলিল। আমি মন্দিরের কারুকার্য্য ও বৈশিষ্ট্য কি আছে, দেখিতে চাহিলে তিনি মন্দিরাভ্যন্তর ও বাহির সব ভালরূপে দেখাইয়া পরিচয় দিয়া যাইতে লাগিলেন। একজন বিদেশীর কাছে তাঁহার দেশের একটি প্রাচীন কীর্ত্তির এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করিতে পারিয়া কত যে আনন্দ এবং গৌরব অনুভব করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার চোখেমুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সুউচ্চ * শিবদেউলটি নানাকৃতির ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রস্তরের গাঁথুনিতে নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের শিরোদেশে স্থাপিত বৃহদাকৃতির পুষ্পকলসদৃশ স্বর্ণাভরণটি এবং অষ্টকোণ মন্দিরের প্রস্তর-দেওয়ালে চারিদিক বেড়িয়া সুদক্ষ শিল্পীহস্তে খোদিত অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি ও নানা সুদৃশ্য লতাপাতা, ফুল মন্দিরের অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। দুই শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রচিত মন্দির গাত্রের এই প্রস্তর খোদিত শিল্পের প্রত্যেকটি অংশ, প্রত্যেকটি রেখা, এমন কি, লতাপাতার প্রত্যেকটি সূক্ষ্মাগ্রভাগ পর্য্যন্ত আজও সুস্পষ্ট থাকিয়া আসামের প্রাচীন ভাস্কর্য্য-চর্চ্চার পরিচয় দিতেছে, অথচ এই দুই শত বৎসরের মধ্যেই একে একে কয়েকটি বিপ্লব, কয়েকটি লুণ্ঠন-অভিযান গিয়াছে এ রাজ্য এবং এ মন্দিরগুলির উপর দিয়া।

মন্দিরের বহির্ভাগ দেখা হইলে আমরা ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলাম। সম্মুখে টিনের চালা দিয়া একটি বৃহৎ মুক্ত নাট-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, চেহারায় মনে হইল, ইহার নির্ম্মাণকাল এক বৎসরও অতীত হয় নাই। নাট-মন্দির অতিক্রম করিয়া আর একটি পাকা খিলান করা ছোট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। এ অঞ্চলের প্রত্যেক পুরাতন মন্দিরেই সম্মুখভাগে এইরূপ খিলান করা একটি বা পর পর দুইটি প্রকোষ্ঠ দেখা যায়।

আমরা একে একে শিবদেউলের দুইটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া নগ্নপদে যেখানে গিয়া দাঁড়াইলাম, সেখানে সম্মুখে একটি মিটমিটে সরিষার তৈলের প্রদীপ ছাড়া চারিদিকে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, সবই অন্ধকার। মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে মন্দিরাভ্যন্তরস্থ মেঝে বহু নিম্নে অবস্থিত, তাই পায়ের তলায় অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে ও পিচ্ছিল অনুভব করিতে লাগিলাম। এই তিমিরাচ্ছন্ন মন্দিরগর্ভে অন্ধ সাজিয়া বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবারও কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হইল না। অতি সন্তর্পণে বাহিরের পথে চলিলাম, ইতিমধ্যেই সঙ্গী আমার হাত-খানা টানিয়া নিয়া ভোলানাথের শীতল-অঙ্গ স্পর্শ করাইতে এবং হাতের মুঠায় একটু নির্ম্মাল্য গুঁজিয়া দিতে ভুলিলেন না।

সারাদিন ঘুরাফিরা করিয়া ছোট শিবসাগর টাউনের যাহা কিছু, মায় আমাদের সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত স্বাধীন আসামের যুদ্ধাস্ত্র ছোট-বড় কয়েক গণ্ডা লৌহ-কামান পর্য্যন্ত দর্শন করিলাম। এই কামানগুলির সব কয়টিই আসামের নিজস্ব সম্পত্তি নহে, বৃহদাকৃতির কয়েকটি কামান বাঙলার মুসলমান রাজ্য হইতে অহোম রাজগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। অবশ্য ইহার পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে, সে আলোচনা হইতে আপাতত ক্ষান্তই রহিলাম।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই আসাম গৌরব সতী জয়মতীর পুণ্য স্মৃতি জয়সাগর দর্শনে রওয়ানা হইব মনস্থ করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু রাত্রি হইতেই এমন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল যে, রাস্তায় বাহির হওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। হোটেলবাসী বন্ধুদের নিকট শুনিলাম, 'এ আসামের বৃষ্টি' এক সপ্তাহের পূর্ব্বে বন্ধ হইবার নয়, কিন্তু আমার আগ্রহাতিশয্যেই কি না জানি না, বেলা প্রায় নয়টায় বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিল, আকাশও বেশ পরিষ্কারই মনে হইল। আমি আগে হইতেই প্রস্তুত ছিলাম, বৃষ্টির বেগ কমিয়া আসিলে বর্ষাতিটি গায়ে জড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

শিবসাগর শহর হইতে দক্ষিণমুখী সোজা রাস্তায় প্রায় তিন মাইল হাঁটিবার পরেই বামে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অহোমরাজ রুদ্র সিংহ প্রতিষ্ঠিত মজা পরিখা ও জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীরবেষ্টিত শূন্য রাজপুরীর মধ্যস্থলে ভগ্নপ্রাপ্ত কেরেং ঘর (রাজপ্রাসাদ) ও দক্ষিণে মাঠের মধ্যে রং ঘর (প্রমোদ গৃহ) দেখা দিল, আর সম্মুখে আরও প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে জয়সাগর তীর-বর্ত্তী জয়দেউলের উচ্চ চূড়াটি বৃক্ষরাজির উপর দিয়া নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া দিতে লাগিল। আমি চূড়া লক্ষ্য করিয়া কর্দ্দমাক্ত পথে চলিয়া জয়সাগর তীরে গিয়া উঠিলাম, তখনও ফুটকি

ফুটকি বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

এখানে জয়সাগর ও জয়দেউলের একটু পরিচয় দেই—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, তখন অহোম রাজসিংহাসনের বড় দুর্দ্দিন। কয়েকজন কূটবুদ্ধি ও স্বার্থপর মন্ত্রীই রাজ্যের পরিচালক। সিংহাসনে নামে মাত্র একজন রাজা বসিয়া আছেন। তাহাও আবার মন্ত্রীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘন ঘন অদল-বদল হইতেছে। এমন কি, এক মাস বা কুড়িদিন অন্তরও এক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে অন্য নূতন রাজা বসান হইতে লাগিল।

অবশেষে 'চুলিকফা' নামে এক রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি সিংহাসনে বসিয়াই নিজের আসন দীর্ঘস্থায়ী করিবার এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করিলেন—অহোম রাজবংশে যত যুবরাজ আছে, তাহাদের সকলকে হঁত্যা। রাজাদেশের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে গুপ্তঘাতক প্রেরিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ছিন্ন মস্তক রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল, রাজরক্তে আসামভূমি প্লাবিত হইল। ক্রমে আসাম যুবরাজ শূন্য করিয়া ঘাতকগণ ফিরিয়া আসিল। রাজা চুলিকফা আনন্দে মশগুল হইয়া নানা উপহার দানে সকলকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিয়া গিয়াছেন, এমন সময় এক মারাত্মক খবর আসিল, গদাপাণি নামক এক পর্ণকুটীরবাসী যুবরাজ এখনও জীবিত আছে, আর সে শুধু যুবরাজ নহে একজন মস্ত বীর। আবার রাজাদেশ দমকা বাঁধিয়া গেল, আবার দলে দলে ঘাতক প্রেরিত হইল। এদিকে খবর পাইয়া গদাপাণিও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সাধ্বী পত্নী 'জয়মতী' এ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে স্বামীকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না। তিনি কিছুদিনের জন্য গদাপাণিকে কোথাও গিয়া গা-ঢাকা দিয়া থাকিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বীর গদাপাণি প্রাণের ভয়ে শৃগাল কুকুরের মত পলাইয়া বেড়াইতে রাজী হইলেন না। জয়মতী জানিতেন, বীর স্বামীকে এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হইতে টলান শক্ত, তিনি দ্বিতীয়বার আর এ অনুরোধ করিতে পারিলেন না। কিন্তু বিরাট রাজশক্তির কাছে তাঁহার পর্ণকুটীরবাসী স্বামীর একলার শক্তি কতটুকু, এই ভাবিয়া জয়মতীর কোমল নারী-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। অবশেষে পত্নীর করুণ অশ্রু গদাপাণির মত পরিবর্ত্তন করিয়া দিল, দুইটি শিশু পুত্র ও প্রিয়তমা পত্নীকে গৃহে রাখিয়া দুর্গম নাগা পাহাড়ে গিয়া তিনি আশ্রয় লইলেন।

এদিকে গদাপাণিকে হারাইয়া রক্তপিপাসু রাজা চুলিকফা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সকল রোষ গিয়া পড়িল জয়মতীর উপর। জয়মতীকে ধরিয়া রাজধানীতে লইয়া গিয়া প্রথমে অনুনয়-বিনয় এবং নানা লোভ দেখান হইল, গদাপাণির সন্ধান বলিবার জন্য, কিন্তু সতী কি কখনও লোভে ভুলে? অবশেষে জয়মতীকে একটি খুঁটায় বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করা হইল, ইহাতেও তাঁহার মুখ খুলিল না। যোলদিন অনাহারে এই দারুণ বেত্রাঘাত সহিয়া জয়মতী হস্ত-পদ-বন্ধ [illegible] প্রাণত্যাগ করিলেন।

ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র। গদাপাণি ফিরিলেন সিংহাসনেও বসিলেন, কিন্তু সতী সাধ্বী জয়মতীর শোক তাঁহাকে বেশীদিন রাজত্ব করিতে দিল না, পুত্র রুদ্র সিংহকে সিংহাসনে বসাইয়া তিনিও পত্নীর অনুগমন করিলেন।

সতী জয়মতীর পুত্র রুদ্রসিংহই মাতার দেহত্যাগ স্থানে জগতের সেরা স্মৃতি এই বিশাল দীঘি ও তাহার তীরে মন্দিরটি স্থাপন করিয়াছেন। মাতার নামানুসারেই দীঘী ও মন্দিরটির নাম যথাক্রমে 'জয়সাগর' ও 'জয়দেউল' রাখা হইয়াছে।

আজ চারিদিকের নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে ৪০০ শত বিঘা স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে এই বৃহৎ দীঘী ও তীরবর্তী দেবতাশূন্য মন্দির।

ক্রমশ

যে নদীর কূল ভেঙ্গেছে

(২৩২ পৃষ্ঠার পর)

তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, এই যে মা! আমি! রূণু লক্ষ্মীটি আমার।

মলিনার চোখ দিয়ে অশ্রুর ঢল নেমে এল। প্রতিটি বুকের স্পন্দনের ভিতর দিয়ে মলিনা আজ অনাগত জীবনের পদধ্বনি শুনতে পেল। তার জীবনের সকল গতি যেন আজ রুদ্ধ হ'ল।

এতদিন পর মলিনার জীবনের শুষ্ক প্রবাহ থেকে একটা নূতন স্রোত নির্গত হয়ে এল। নারী-জীবনের তার মুক্তি ঘটেছে। এ যেন তার নূতন আরম্ভ। আশা, আকাঙ্ক্ষাময় স্বপ্নমাখা জীবন-স্রোতের পথে মলিনা আজ নেমে এসেছে। রূপহীনের ভিতর দিয়ে রূপাতীতকে সে পেয়েছে। জীবনে তার চরম লাভ এইখানেই।

তারপর এক সময় সোহাগিনীটির মত বললে, শ্যামলবাবু, আপনি ভাববেন না। রূণু আমার বাঁচবে। মায়ের ভালবাসা যেন ওর পরমায়ুকে দীর্ঘ করে। আমি যে ওর মা নই—একথা যেন ও জানতে না পারে। চিরদিন যেন ও আমাকে মা বলেই জানে।

শ্যামল মলিনার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মলিনার মুখে যেন নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা ও মমতা ফুটে উঠেছে।

শ্যামল শুধু ভাবল, বেদনার মধ্য দিয়ে যাকে সে পেয়েছে, অনাদর করে তাকে কখনও কষ্ট দিবে না; ব্যথা দিয়ে তার মনকে ভারি করে তুলবে না, ভালবেসে সে তাকে সজীব রাখবে।

ক্রন্দসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

(২০)

শশাঙ্ক লিখিয়াছে দীর্ঘ পত্র। দ্বিপ্রহরের নির্জ্জন অবকাশে দুয়ার রুদ্ধ করিয়া ইভা চিঠিখানা আগাগোড়া আর একবার পড়িতেছিল। শশাঙ্কর ভালবাসায় একটা উদার অবকাশ ছিল। কেবল কামনা এবং আকর্ষণের বেগ হইতে রক্ষা করিয়া সে প্রেমাস্পদকে নিজের জীবনের বহুধাবিস্তৃত আদর্শের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাই ইভা এত অল্পদিনেই নিজের চিরাচরিত সংস্কার ও সকল রকম অভ্যাস হইতে বিমুক্ত হইয়াও খুব গভীর কষ্ট পায় নাই। বরঞ্চ এখন নূতন জীবনের উপরই একটা অত্যন্ত স্নেহের আকর্ষণ গড়িয়া উঠিয়াছে। এমনই হয়। যাহাকে মেয়েমানুষে ভালবাসে তাহার ভালবাসা দিয়া আবৃত করিয়া ধরিলে কোন কাজই যথেষ্ট শক্ত বলিয়া মনে হয় না।

শশাঙ্ক লিখিয়াছে, "ইভা, এখানে এসে একটা জিনিষের বড় অভাব বোধ করছি, সেটা হচ্ছে চিত্তের শুচিতা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই বল বা সামাজিক জীবনেই বল, মনের একটা গূঢ় এবং গভীর আদর্শবাদের প্রয়োজন যেন এরা বোধ করে না। জীবনের উন্নতি, বিজ্ঞানের উন্নতি, সমাজের উন্নতি, রাষ্ট্রের উন্নতি এই নিয়েই অহরহ ব্যস্ত। এখানে থেকে থেকে আমার সমস্ত চিত্ত পীড়িত হয়ে উঠেছে। শ্রান্ত মনের সুমুখে বার বার একটি ছবি ভেসে উঠছে আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত দরিদ্র ভারতবর্ষের ধ্যানরূপ। আমরা কেজো লোকে নই কিন্তু আমাদের দরিদ্র, পর-শাসিত দেশের অন্তর্লীন সাধনার ধারায় একটা বস্তু আছে, সেটা আজকের শক্তি-মদমত্ত ইউরোপের কাছে খুব প্রয়োজনীয়। সে হচ্ছে এই যে, রাত-দিন কাজ এবং অকাজ করে বেড়ানই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। স্বপ্ন দেখার ক্ষমতাও একটা বড় জিনিষ। একটা বড় আদর্শ বড় স্বপ্নের অঞ্জন জীবনকে অনেক ধূলি-ধূসর লাঞ্ছনা থেকে বাঁচায়। অনেক কপটতা ও হীনতার দুর্গতি থেকে মানবাত্মাকে রক্ষা করে, সে কথাটা এরা বুঝেও বুঝতে চায় না। আমাদের দোতলা বাড়ীর শাদাসিধে ছাদে মাদুর পেতে তুমি আর আমি কত নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নাভরা নিশীথে কত বর্ষার তারাহীন কালো আকাশের অন্ধকার ঘেরা রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেছি, যে স্বপ্নের জন্য কোন উপকরণ কোন বহুল সরঞ্জামের দরকার হয় না। আজ সেই সব কথা বারবার মনে পড়ছে। আর সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে এরা উপকরণ জিনিষটাকে এত বাড়িয়ে তুলেছে যে, তার তলায় মানুষের মন জিনিষটা মারা যেতে বসেছে। মন নেই বলেই ওদের বর্ত্তমান দুর্গতি। তাই কোন আদর্শের বালাই, কোন হীনতা, কোন ক্রূর অভিসন্ধিই ওদের কাছে আজ যথোপযুক্ত ছোট কাজ বলে মনে হচ্ছে না। কাজের কথা বলি এইবারে। এখানে এসে আমি একটা কাপড়ের কারখানায় শিক্ষানবিশী করছি। ইচ্ছা আছে ফিরে যেয়ে দেশে আমাদেরই গ্রামের প্রান্তে একটা কাপড়ের কারখানা করব। এ নিয়ে আমার মনে অনেক জল্পনা-কল্পনা আছে। আমাদের জমিদারী বিশাইপুরে অনেক পতিত জমি পড়ে আছে, সেখানেই ছোট আকারে এর গোড়াপত্তন করব। কারখানা আর কুলি-বস্তি বললেই আমাদের মনে যে একটা বিভীষিকা জেগে ওঠে, তা ত অমূলক নয়। সে ভয়ের গোড়াপত্তন একেবারে দূর করে দিয়ে ছোটখাট কুটির স্নিগ্ধ সন্ধ্যা-প্রদীপের আলোকে কতকগুলি গ্রামের লোক নিয়ে ঘরোয়া আবহাওয়ায় একটা ছোটখাট ব্যবসায় চালান যায় কি না পরখ করে দেখতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব স্থির করেছি। সেজন্যে খাটছি ভূতের মত। নিজেকে ছাড়া দিইনে একটুও। এ লাইনে যা-কিছু শিখবার ও দেখে এবং হাতে-কলমে করে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করবার তা জেনে নিতে চেষ্টা করছি। কিন্তু ইতিমধ্যে অবাধ্য মন মাঝে মাঝে উতলা হয়ে উঠছে। মনে পড়ে যাচ্ছে এখন বৈশাখ মাসে গ্রামের নদীটি কেমন স্বচ্ছ জলের নিয়ে আপন মনে বয়ে চলেছে। নিম গাছের আ… শেষ ফাল্গুন থেকে যে কোকিলটা ডাকতে সুরু করে, … সে ডাকাডাকি একেবারে থামায় নাই। ছোট মেয়েগুলি পুণ্যিপুকুর সেঁজুতি হরির চরণ … ফুল ও ফলের সাজি নিয়ে ব্যস্ত। গরমের জন্যে গুরুমশায় স… পাঠশালা বসিয়েছেন। চটের আসন হাতে সকাল হতে না … পোড়োরা একে একে এসে হাজির হচ্ছে। বিকেলবেলায় আমবাগানের সেই ছায়া ঢাকা রাস্তাটা দিয়ে তোমরা সবাই এক… মিলে হাসি-গল্প করতে করতে বারুইপুকুরের তকতকে … জলে গা ধুতে যাচ্ছ। জানি না কেন বাঙলা দেশের এক অ… অজ্ঞাত ছোট গ্রামটিকে এত ভালবাসলাম। কিন্তু একা ভাল… সুখ হয় না, এই ভালবাসার সুর সবারই মনে সংক্রামিত করে … ইচ্ছা করে। তুমি আর আমি যতটা সম্ভব একসঙ্গে চেষ্টা দেখব, যদি তা পারি অন্ততঃ খানিকটাও। তোমার সুবোধ… অবনীর কাজের কথা শুনে সুখী হলাম। কিন্তু ওরা যদি ত… মত করে গাঁয়ের সব জিনিষকে ভাল না বাসতে পারে, ত… ও কাজ দুদিনে অকাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে তাদের পী… করবে। প্রিয়তমে, আমি যেমন তোমাকে দিয়ে আমার জগৎ … আকাশ বাতাস ভরে নিয়েছি, তেমনই ভালবাসার এক সর্ব্ব… বন্ধন আমাকে টেনে রেখেছে চির-রৌদ্রদগ্ধ দরিদ্র ঐ পল্লী প্রা… এ ভালবাসা যেমন করে পেলাম। কি এর সৃষ্টি-রহস্য তা জা… জানতে ইচ্ছে করিনে। কিন্তু একে যখন লাভ করেছি, তখন … সেবা, আমার ত্যাগ দ্বারা তা আরও উজ্জ্বল করে তুলব। … বাঁচতে ইচ্ছে করে, দেশে ফিরে যেয়ে কালো দীর্ঘ ঘন পক্ষ্মের … তোমার স্নিগ্ধ দৃষ্টি দেখব বলে। আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে, … ফিরে যেয়ে আবার সেই দীঘির টলমল কালো জল, সেই … মুকুলের সুগন্ধ, সেই অবারিত মাঠ দেহে-মনে-প্রাণে অনু… করব বলে।"

পড়িতে পড়িতে ইভা যখন তন্ময় হইয়া গিয়াছে তখন দ… ঘা পড়িল। খুলিয়া দিতেই উমা কহিল, 'ওকি বৌদি, ঘুমোয় ফেললে যে! কখনই-বা গা ধুতে যাবে কাপড় ছাড়বে কখনই ঠাকুরের জন্যে মালা গাঁথবে? শীতলের জন্যে ফল নৈবেদ্য সা… এখনও বাকী।'

'চল চল যাই।'—বলিয়া ইভা উঠিয়া পড়িল।

সমস্ত পৃথিবী যেন আনন্দের স্রোতে, প্রেমের স্রোতে ভাসিয়ে এমনই মনে হইল ইভার। জীবনের মর্ম্মস্থলে দাঁড়াইয়া চির-কিশো… চির-চঞ্চল শ্যামসুন্দর ঐ হাসিতেছেন। চারিদিকে আরতির বাদ্য বাজিতেছে। গলায় ইভারই গাঁথা বড় আদরের, বড় যত্নের মালতী মালা দুলিতেছে। শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে খোল বাজিতেছে, কীর্ত্তন যারা গাহিতেছে—

"আরে মোর গৌরকিশোর।
নাহি জানে দিবানিশি কারণ বিহনে হাসি
মনের ভরমে পঁহু ভোর।"

এই বিরাট পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া জীবনের ছোট ছোট মান-অভিমান, হাসি-কান্না, রাগ-বিরাগ কত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। হঠাৎ রেবার কথা মনে পড়িল ইভার। প্রেমের খেলা-ঘরের তুচ্ছ কাড়াকাড়ি, সুবিধা-অসুবিধা, মান-সম্ভ্রম লইয়া সে বেচারা কত ব্যস্ত। অভিনয়ের কৃত্রিম খোলসটা ছাড়িয়া ফেলিয়া এই স্নিগ্ধতা, এই পরিপূর্ণতার স্বাদ সে যদি পাইত! আসিবার সময় সেই সিনেমা হলে রেবার অ্যাডমায়ারার লইয়া ন্যাকামির দৃশ্য মনে পড়িতে একটু অনুকম্পার হাসি পাইল তাহার।

আরতি শেষ হইয়া গেল। ভক্তিনম্র পরিপূর্ণ অন্তর লইয়া সে গৃহে ফিরিল। কিন্তু এখানকার জীবনের স্নিগ্ধতার দিকটা পূর্ণতার দিকটাই সে এতক্ষণ উপভোগ করিতেছিল অথচ এই আলোর পিঠে যে ঘন অন্ধকার রহিয়াছে, সেটাও যে তাহাকে তখনই তীব্রভাবে অনুভব করিতে হইবে, একথা নিমেষের জন্যও ভাবে নাই। বাড়ীতে পা দিতেই উমা চুপি চুপি কানে কানে কহিল, "বৌদি একবার ইন্দুদের বাড়ী চল। সে নাকি আজ সারাদিন খায় নি। একটা ঘরে বন্ধ করে দিয়ে সারাদিন তার শাশুড়ী তার উপর মারধর করেছে।"

ইভা চমকিয়া উঠিল। মারধর ব্যাপারটা এখানকার মেয়েদের মত এখনও তাহার গা-সহা হয় নাই।

দু'একটা ছোটখাট কাজ যাহা বাকী ছিল, উমাকে করিয়া রাখিতে আদেশ দিয়া দাসীর সহিত সে তথায় গেল। ইন্দুর শাশুড়ী তাহাকে বড় প্রসন্ন মনে অভ্যর্থনা করিলেন না। বসিতে অবধি বলিলেন না। ইন্দুর প্রসঙ্গে কহিলেন, "বৌমার আজ শরীরটে ভাল নেই, কেমন অরুচি মত হয়েছে। সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে। তুমি যে এই সাঁঝ উতরিয়ে বেড়াতে আসবে তা কেমন করে জানব বাছা।"

তাঁহার কথায় কান না দিয়া ইভা ইন্দুকে খুঁজিয়া বাহির করিল। উপরের ছাদের এক কোণে অন্ধকারের মধ্যে সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

ইভা আসিয়াই বলিল, "চল ইন্দু, চল চল আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে। এখানে আর এক মুহূর্ত্তও নয়।"

প্রত্যুত্তরে ইন্দু শুধু ম্লান হাসিল।

"যাবে না? এত ভয় কিসের?"

ইন্দু ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "তাহলে আর এ বাড়ীমুখো হবার যো থাকবে না ভাই।

"নাই-বা থাকল!"

কিন্তু এই না থাকার বাইরে যে কি জগৎ আছে, ইন্দিরা ত তাহা জানে না। জ্ঞান হইয়া অবধি এই সংসারে রাঁধিয়াছে বাড়িয়াছে, কখনও আদর, কখনও গালমন্দ খাইয়াছে। যখন স্বামীর অসুখ হইয়াছিল, প্রাণপণ সেবা করিয়াছে, হরিরলুটের, সত্যনারায়ণের মানত করিয়াছে। আর যাই হ'ক যেন হাতের নোয়াটি বজায় থাকে, দেবতার দুয়ারে সকাতরে ভিক্ষা মাগিয়াছে। আবার সেই স্বামী ভাল হইয়া উঠিয়া আবার উচ্ছৃঙ্খলতার বাড়াবাড়ি করিতেছে দেখিয়া ঝগড়া করিতে গিয়া স্বামীর কাছে গালাগালি এবং শাশুড়ীর কাছে মার খাইয়া ছাদের এক পাশে নিজ্জীবের মত বসিয়া আছে। সুখ-দুঃখ, অপমান, কটুকথা সব জড়াইয়া তবু ত এই তাহার চির-পরিচিত আশ্রয় স্থল। এই নিরানন্দ কারাগারটার বাইরে যে অসীম শূন্যে তাহার খবর ইন্দু জানে না। তাহাকে বিশ্বাস করে না। সেই প্রায়ান্ধকারে তাহার উদাস নিষ্প্রাণ মুখের দিকে চাহিয়া ইভা যেন অনেক কথা বুঝিবার কিনারায় আসিল। এত অসহায়! তাই ত ইহাদের সম্ভ্রমটুকু অবধি সংসার রাখিয়া চলে না। সেটুকুও জোর করিয়া দাবী করিবার ইহাদের জোর নাই।

ইভা উত্তেজিত হইয়া কহিল, "বেশ, ফেরার পথ না থাকে নাই থাকবে। এখন চলত। এখানেই বা কি এমন সুখে আছ শুনি?"

কিন্তু ইন্দু কোন উত্তর দিল না। শুধু নীচে হইতে তাহার শাশুড়ীর কর্কশ কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল, অবৌমা নেমে এস না বাছা। ভাজের সঙ্গে মনের কথা বলাবলি করতে হয়ত নীচেয় নেমে করলেই ভাল হয় যেন। এই ভর-সন্ধ্যেয় খোলা ছাদে একা বৌ-মানুষের অত বাড় ত ভাল নয় বাছা! —ক্রমশ

দুঃখের রাতি এল

শ্রীহাসিরাশি দেবী

দুঃখের রাতি এলো বক্ষের আঙিনায়
বন্ধু হে, ঐ পদধ্বনি তার,—
অন্তর মন্দিরে ঐ বুঝি শোনা যায়—
চঞ্চল মঞ্জির ঝঙ্কার;
জীর্ণ দুয়ার ঘর, বন্ধ এ বাতায়ন,
শঙ্কায় কেঁপে ওঠে আজি শুধু ক্ষণে ক্ষণ
রুদ্ধ আঁধার ভরা অতীতের ক্রন্দন
মুক্তি মাগিয়া ফেরে বারবার,
কোন উন্মনা আজ ছেদি বাধা বন্ধন
বাহিরিতে চাহে খুলি এ দুয়ার!

বাহির আকাশ আজ ঘন মেঘ মন্থর
মদির স্বপন নাহি অঙ্কে,—
চকিত চপলা চলে ছুটিয়া নিরন্তর
ভ্রূকুটী কুটিলা নানারঙ্গে!
দীর্ঘ দিবস মাস, দীর্ঘ নিশীথ দিন,
উৎসবানন্দিত ছন্দিত হৃদিবীণ,
আজি অবসাদ ভরা, সুরহারা গীতিহীন,
মিশে যেতে চায় ওরি' সঙ্গে—
চির যবনিকাতলে,—পথে পথে হয় লীন
যেথা শত লীলা নানারঙ্গে।

বন্ধু হে, ঐ মহাযাত্রার সঙ্গীত
ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে বক্ষে,
দিগন্তে জাগে তার অজানিত ইঙ্গিত,
ভেসে ওঠে মোহময় চক্ষে।
রক্তিম শিখা ঐ রচে নব লিপিকা,
জ্বলে ওঠে শক্তির অর্চ্চনা-দীপিকা,
দুঃখের রাত্রির সাথে চিরযাত্রী
মুক্তি আসিবে কারাকক্ষে
আনন্দ হাসি গান, অবসাদে হ'লো ম্লান,
দুঃখ-সুখ বাঁধা প'লো সখ্যে।

সামোয়ানদের উল্কি-পরা

শ্রীমতী অমলা গুপ্ত

সামোয়ান পুরুষের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে অনুষ্ঠান, তাহা হইল উল্কি-পরা। কারণ উল্কি-পরা অনুষ্ঠানটি যথারীতি সম্পন্ন না করা পর্য্যন্ত কোনও সামোয়ান পুরুষই সাবালক বলিয়া গ্রাহ্য নয়। ঐ সময় হইতে সে স্বাধীনভাবে শিকার করিতে পারে—বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারে। মোটের উপর সেই সময় হইতেই তাহাকে সম্প্রদায়ের একজন বলিয়া মর্য্যাদা দান করা হয়। সম্প্রদায়ের সালিশীতে কথা বলিবার অধিকার সেই সময় হইতেই তাহার জন্মে। সুতরাং উল্কি-পরা অনুষ্ঠান সামোয়ান-জীবনের একটা প্রধান পরিবর্ত্তন এবং ভাবী শান্তিময় জীবন যাপনের প্রথম প্রস্তর সোপান।

উল্কি উহারা পরে কোমরের উপরের অংশ হইতে হাঁটুর অব্যবহিত নীচ পর্য্যন্ত। কাজেই উল্কি-পরা নগ্ন অবস্থায় মনে হয়, উহারা যেন অতি মিহি নীল সিল্কের হাফ্ প্যান্ট পরিয়া রহিয়াছে। সোজাসুজি লাইন টানিয়া বা ফুট্কি পাশাপাশি বসাইয়া মাত্র উল্কির নক্সা শেষ করা হয় না। আমাদের দেশের কাপড়ের পাড়ের মত 'বর্ডার' একটির নীচে অন্য একটি গোলাকারে সাজাইয়া দেওয়া হয় কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত।

এই নক্সা ফুটাইয়া তোলা হয় হাড়ের তৈরী সূচের দ্বারা। এই সূচ থাকে দুই প্রকার—এক প্রকারের একটি মাত্র সূক্ষ্মাগ্র থাকে; অন্য প্রকারের থাকে চিরুণীর মত পাশাপাশি কতকগুলি সূক্ষ্মাগ্র। এই সূচ নীল রঙে ডুবাইয়া ছোট হাতুড়ির ঘায়ে গাত্র-ত্বকে বিঁধাইয়া নানাবিধ নক্সা আঁকা হয়। ফলে অনুষ্ঠানটি হয় তীব্র বেদনাদায়ক, কিন্তু সাবালকত্বের দারুণ আকাঙ্ক্ষায় সামোয়ান যুবক সেই অসহ্য যাতনাও অম্লানবদনে সহ্য করে।

যে কোন ব্যক্তিই এই অনুষ্ঠান-পর্ব্ব সমাধা করিতে পারে না—স্বয়ং সাবালকত্বলোভী যুবকের পক্ষে আপন হাতে উহা করা অসম্ভব। এই উল্কির নক্সা ফুটাইয়া তুলিবার নেতা একজন থাকে, আমাদের পুরোহিতের মত। তাহাকে সকল সম্প্রদায়ই শ্রদ্ধার সহিত দেখে এবং নানাপ্রকার উপহার দানে তুষ্ট করিয়া থাকে। আমাদের দেশে যেমন কুম্ভকার, তাঁতি প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে জাতীয় ব্যবসা পরিচালন করে, তেমনি উল্কি আঁকিবার ব্যবসা সামোয়ান পরিবার বিশেষেরই একচেটিয়া। উহারা পুরুষানুক্রমে ঐ সূক্ষ্ম শিল্প শিক্ষা করে এবং মানবদেহে আশ্চর্য্য কৌশলে ফুটাইয়া তোলে।

উল্কি-গ্রহীতাকে মেঝেয় শোয়ান হয়; তারপর হাড়ের কাঁটা নীল রঙেতে ডুবিয়ে হাতুড়ীর আঘাতে নক্সা কাটা হয়

যাহাকে উল্কি দিতে হইবে, তাহাকে ঘরের মেঝেয় শোয়ান হয়, তৎপর কোমর হইতে নিম্নাঙ্গ অনাবৃত করিয়া হাড়ের কাঁটায় হাতুড়ির ঘা দিয়া ফুটান হয় চর্ম্মে। কাঁটাগুলি প্রতিবারে নীল রঙে ডুবাইয়া লওয়া হয়। কাঁটা ফুটানোর সঙ্গে সঙ্গে নীল রং ও রক্ত গড়াইয়া পড়ে, অপর এক ব্যক্তি

তৎক্ষণাৎ তাহা মুছাইয়া দেয়। কিন্তু সমগ্র স্থানে উল্কি এক সময়ে দেওয়া হয় না। কিছুটা উল্কি দেওয়ার পর বিশ্রাম করিতে দেওয়া হয়, যে যতটা সহ্য করিতে পারিবে বলিয়া অনুমান, সেই পরিমাণ সময় উল্কি দিয়া লোকটিকে আরাম করিবার অবকাশ দেওয়া রীতি।

মেয়েদেরও উল্কি দেওয়া হয় এবং শরীরের ঠিক অনুরূপ অংশেই। সেই উল্কি দেয় মেয়েরা, তবে উহার নক্সা থাকে অতি ফাঁক ফাঁক—সামান্য কয়টি ফুট্‌কি ও ড্যাশ লাইনে আঁকা। কিন্তু সকল নারীর উল্কি গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। কেবল সম্প্রদায়ের উচ্চ বংশের নারীরাই এই প্রকারে দেহকে শোভিত সুন্দর করিতে পারে—মর্য্যাদা চিহ্নের জন্য। নারীদের শুধু কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত উল্কির ফুট্‌কি দিলেই চলে না—একটি হাতেও দিতে হয়।

সাবালকত্ব ও মর্য্যাদা ভিন্ন প্রধান যে কারণে উল্কি-পরা উহাদের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইল জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নিজ নিজ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার চরম প্রমাণ প্রদান করা। এই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার নিরিখেই নর-নারীর দেহবল শ্রদ্ধার আকর্ষণ আমন্ত্রিত করে।

উল্কি-পরার জন্য সামোয়ান নরনারীর নির্দ্দিষ্ট কোন বয়স নাই। যুবকেরা সাধারণত উল্কি গ্রহণ করে, কিন্তু অনেকে বিবাহের প্রাক্কালে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সেও উহা গ্রহণ করে।

কিছু সময় উল্কি-পরা, কিছু সময় বিরাম—এইভাবে একদিনে বা দুইদিনে এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত কর হয়। তখন উল্কি-শিল্পী নেতাকে আপ্যায়িত করা হয় পান-ভোজনে। কিন্তু অন্য কোন প্রকার খাদ্য প্রদান করিবার পূর্ব্বে উল্কি-গ্রহীতা একটি নারিকেলের মালায় করিয়া 'কাবা' পানীয় আনিয়া উল্কি-শিল্পীর হাতে প্রদান করিবে শ্রদ্ধার সহিত। ইহাই হইল উল্কি অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি।

উল্কি-পরা সামোয়ানদিগের নিকট দেহকে সুন্দরতর করা। যে জাতির কোনও প্রকার ধাতুজ পদার্থের সহিত পরিচয় নাই, কোনও রকমের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নাই, তাহারা আর কি প্রকারে তাহাদের সৌন্দর্য্যবোধের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিতে পারে? তাহাদের দেহের সকল খুঁত ঢাকিয়া ফেলিয়া অপরূপ দেহ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহারা গাত্র-ত্বকে উল্কি দেয়। তাহারা এই মর্য্যাদার চিহ্ন—এই বীরত্বের নিদর্শন অঙ্গে বহন করিয়া গর্ব্ব বোধ করে—নিজেকে অসামান্য শক্তিধর বলিয়া মনে করে।

বেদনা

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধু আমারে বলো, "কেঁদনা",
বন্ধু, তোমরা বলো হাসিতে,—
—আমার বুকে যে জাগে বেদনা,
—কেমনে ভরিব সুর বাঁশীতে?

তোমরা চলিয়া যাও মোটরে,
নগরীর ধুলি-ম্লান পথেতে,
অন্ধকারের কালো কোঠরে
প'ড়ে থাকি মোরা কোনো মতেতে!

মোদের সমুখে নামে রাত্রি,
তাহার বিরাট ডানা মেলিয়া,—
ওগো নব আলোকের যাত্রী!
মোদের রাখিবে পিছে ফেলিয়া?

পীচ্ ঢালা পথখানি বাহিয়া
মোটরেই চ'লে যাবে খুশীতে?
—পিছনে ধুলার দিকে চাহিয়া,
মোরা রব ললাটেরে দুষিতে?

জানো কি তোমারি গ্রামে, পথেতে,
তোমারি ভায়েরা ঘোরে শীর্ণ—
বেঁচে আছে তারা কোনো মতেতে
—হয় না তোমার হিয়া দীর্ণ?

বন্ধু আজিকে তুমি ভুলিবে
তোমার গ্রামের সুখ-স্মৃতিরে?
বন্ধ দুয়ার নাহি খুলিবে
ভুলিবে সতীর শাড়ী সিঁথিরে?

দীর্ঘ অলকে নাহি কামনা,
"বব্" করা চুলই ভালো বেসেছো,
ভুলেও দেশের কাজে নামো না
তীব্র বিলাস-স্রোতে ভেসেছো?

বন্ধু বলিবে তবু কেঁদনা,
বন্ধু বলিবে তবু হাসিতে,
আমার বুকে যে জাগে বেদনা,
—কেমনে ভরিব সুর বাঁশীতে?

(গল্প)

শ্রীরত্না দেবী

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ত্রিপুরেশ আর অমিয়, দুজনে বাড়ীর সামনের দীঘির বাঁধান ঘাটে, গায়ের জামা খুলে বসে, কলকাতায় আজকালকার ব্যবসার বাজারের গল্প ক'রছিল। গল্প ক'রতে ক'রতে হাতের জামাটাও নাড়ছিল। দীঘির পাড়ের প্রকান্ড বকুল গাছটার একটা পাতাও কি নড়ছে না। এমনি একটা গুমোট গরম প'ড়েছে।

অমিয়র স্ত্রী ফুলু কোথা থেকে এসে, ঝপ্ ক'রে দুখান্ হাত পাখা ফেলে দিয়ে বলল—"ঠাকুরপো। রান্নাবান্না সেরে, একটু পাড়া ঘুরতে চললাম, ততক্ষণ আপনারা গল্প করুন, আমি এসে খেতে দেব।"

ত্রিপুরেশ আজই সকালে এসেছে ওদের বাড়ীতে। গরমের সময়টা তার [illegible]না কোথাও ভাল লাগে না। এই সময় ওর মন প'ড়ে থাকে অমিয়দের বাড়ীর সামনের দীঘির ঘাটটার ওপর।

সন্ধ্যেবেলায় গা ধুতে নেমে, ইচ্ছেমত জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে। ত্রিপুরেশের ফুলবৌঠাকরুণ, বেশ একটু শাসায়—"ও, ঠাকুরপো কলকাতার এক জল থেকে এসে, গাঁয়ের পুকুরের জলে এত মাতামাতি সহ্য হবে না, শীগ্গির উঠে পড়ুন।"

ত্রিপুরেশ, এতবার অমিয়দের বাড়ীতে এসেছে, যে, ফুলু এখন আর ওকে পরের মত দেখে না, নিজের ছোট দেওরটির মতই দেখে। ফুলবৌঠাকরুণের ওপরও ত্রিপুরেশের গভীর শ্রদ্ধা। ফুলু যেমন ওকে শাসন করে প্রয়োজন হ'লে আবার তেমনি আদর যত্নও করে। এখানকার মত আদর, যত্ন, সে কোথাও পায় না, বাড়ীতে ত না-ই। বাড়ীতে ত্রিপুরেশের কেই বা আছে, এক বুড়ো বাপ। মা যে কবে মারা গেছেন, তা ওর মনেই পড়ে না। দিদির ত অনেক দিন বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে। দিদির সঙ্গে বড় একটা দেখাও হয় না। দিদিও যে এতখানি আদর যত্ন ক'রতে পারবে, তাও ত্রিপুরেশের সন্দেহ আছে।

রাত্রে, ত্রিপুরেশ ও অমিয়কে, খেতে বসিয়ে, ফুলু ওদের খাওয়ার তদারক ক'রতে ক'রতে বলল—"দেখুন, ঠাকুরপো, আর কতদিন আইবুড়ো কার্ত্তিক থাকবেন, আমার যেন আপনাকে দেখে কেমন কেমন লাগে। বিয়ে ক'রে ঘরে লক্ষ্মী আনুন। তাহ'লে আপনার স্বভাবটাও কিছু বদলাবে। ভবঘুরের মত আজ এখানে, কাল সেখানে, হৈ হৈ রৈ রৈ ক'রে বেড়াবেন না। তা ছাড়া ঘরে বুড়ো বাপ, তাঁর কি আর মনে মনে সাধ যায় না, শেষ বয়েসে ছেলের বউয়ের মুখ দেখেন।"

ত্রিপুরেশ অমনি ব'লে উঠল—"বৌঠাকরুণের ঐ এক কথা, মুখে লেগে রয়েছে। আমার বিয়ে না দিয়ে আর আমাকে 'সোহাগদহ' গ্রাম পেরোতে দিচ্ছেন না।"

ফুলু বলল—"দেখবেন, এই গাঁ থেকেই, আমি আপনার জন্য ক'নে ঠিক ক'রব।"

ত্রিপুরেশ এখন অবশ্য অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে। তবে এক সময়ে ত্রিপুরেশের বাবা যখন মহকুমার উকীল ছিলেন, তখন পরের বাড়ী থেকে চাল চেয়ে এনে তবে হাঁড়ি চ'ড়েছে, এই রকম শোনা যায়। তারপর ভাগ্য প্রসন্ন হ'ল। ত্রিপুরেশের বাবা একবার লটারীতে বেশ মোটা কিছু টাকা পেয়ে গেলেন। আর ত্রিপুরেশ ঐ একই ছেলে। ত্রিপুরেশ অনেক কষ্টে যখন বি-এ-টা পাশ করল, ওর বাবা ওকে আসামে চায়ের বাগান কিনে দিলেন। ও সেটাকে দুদিন দেখা-শোনা ক'রে ছেড়ে দিল। তারপর বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে, কখনও সাবানের ব্যবসা, কখনও ল্যাকারের ব্যবসা, যখন যেটার ঝোঁক উঠছে, তাতেই টাকা ঢালছে। সম্প্রতি কলকাতায় 'ট্যানারী' খুলেছে।

গরমটা আস্তে আস্তে ক'মে আসছে। ত্রিপুরেশ কলকাতা থেকে চিঠি পেয়েছে যে, সেখানেও প্রায়ই বৃষ্টি হ'চ্ছে। ত্রিপুরেশ বেশ কিছুদিন হ'ল এসেছে, তাই এবার সে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছে।

ত্রিপুরেশের যেদিন যাওয়া স্থির হ'য়েছে, সেদিন শোনা গেল, রাত্রে গ্রামের বারোয়ারী তলায়, মুকুন্দ দাসের যাত্রা হবে। ফুলু তাকে যাত্রা না দেখে কিছুতেই যেতে দিল না। সেদিন অনেক রাত্রে ওরা সকলে যাত্রা দেখে ফিরল। ত্রিপুরেশ লক্ষ্য ক'রল, ফুলু কেবল ওকে দেখে, আর মিচ্‌কি হাসি হাসে। সকালে উঠে, ত্রিপুরেশের বাক্স গোছাতে গোছাতে ফুলু বলল—"দেখুন ঠাকুরপো, এতদিন পর আপনার জন্য ক'নে যোগাড় ক'রেছি, শেষে বারোয়ারী তলায় যাত্রার আসরে। কুন্দরাণীর মাকে অবশ্য আমি চিনি। তবে কুন্দ এতদিন ওর মামা বাড়ীতে ছিল, তাই দেখিনি।"

ত্রিপুরেশকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে, ফুলু ডেকে বলল—"আহা! আমার কথাটার শেষ পর্যন্ত শুনুন না, কুন্দরাণী মেয়েটি কিন্তু দিব্যি। বেশ দুটি টানা টানা ডাগর ডাগর হাসি হাসি চোখ। কি নিটোল গড়ন-পিটন, যেন একটি দুর্গা প্রতিমা। তেমনি মাথায় একরাশ কালো চুল। আপনাদের ঘরেরই যোগ্য বটে, ঠাকুরপো!" ফুলু বাক্স গোছান শেষ ক'রে চোখ তুলে দেখে, ত্রিপুরেশ যে কখন চ'লে গেছে, তা সে জানতেও পারে নি। ফুলু ভাবল—"প্রথম প্রথম বিয়ের কথা শুনে একটু লজ্জা পাবে বৈকি, তারপর আস্তে আস্তে আমি ওকে ঠিক হাত ক'রে নেব। ওর হাতেই কুন্দকে দেব।"

কুন্দর মা'র সঙ্গে যখনই দেখা হয়, তখনই কুন্দর জন্য একটি সম্বন্ধ খুঁজে দিতে বলে। এই ত সেদিনও, নিশানাথ তলায়, শিবরাত্রির উপোস ক'রে পুজো দিতে গিয়ে, কুন্দর মা কতক্ষণ পর্যন্ত পুজোর থালা হাতে নিয়ে, ঐ ভীড়ের মধ্যে বটতলায় দাঁড়িয়ে, ঐ একই কথা বলেছে।

কুন্দর বিয়ের জন্য ঐ নিশানাথ তলায়, ওর মা যে, কত মানতই করে। সেদিন ঐ যাত্রার আসরেই, কুন্দর মাকে ফুলু ব'লে এসেছে—"একটি সুপাত্রের সন্ধান মিলেছে, পাত্র ত ঘরেই অথচ এতদিন মনে হয় নি।" ফুলু আরও বলেছে—একদিন বাড়ী গিয়ে পাত্রের সব খোঁজ-খবর দিয়ে আসবে। এত লোকের মধ্যে আর কি বলবে।

কুন্দর মায়ের সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখটা, ফুলুর কেবল ঘুরে ফিরে মনে পড়ছে, তাই ত্রিপুরেশ যখন ফুলবৌঠানকে প্রণাম ক'রে মোটর লঞ্চে উঠতে যাচ্ছে, সেই সময়ও শুনেছে—"ভুলবেন না কিন্তু এবার গিয়ে বাবাকে রাজী করিয়ে মেয়ে দেখানর বন্দোবস্ত করুন।"

ত্রিপুরেশ বলল—"আরে, ওসব কথা এখন রাখুন বৌঠান।" ত্রিপুরেশ মোটর লঞ্চের ভোঁ শুনে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে, তখনও ফুলু চেঁচিয়ে বলছে—"ও ঠাকুরপো, আমি কিন্তু কুন্দর মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা পাকাপাকি ক'রে রাখব।"

ফুলু আর নানান হাঙ্গামায় কুন্দদের বাড়ী যাওয়ার সময় ক'রে উঠতে পারে নি। ওদের পাড়াটাও ত নেহাৎ কাছে নয়। কিন্তু কুন্দর মা অশোক ষষ্ঠীর দিন ফুলুকে নেমন্তন্ন ক'রে পাঠিয়েছিল। নেমন্তন্ন খাওয়ার পর ফুলুর সঙ্গে কুন্দর মা'র পান গালে দিয়ে, দুপুর বেলায় মাদুরের ওপর পা ছড়িয়ে, দাওয়ায় ব'সে অনেকক্ষণ ত্রিপুরেশের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কুন্দর বিয়ের বয়েস হ'য়েছে। তাছাড়া বুদ্ধিমতী, সবই বোঝে। কোনও জায়গায় বিয়ের কথা শুনলেই, আরক্ত মুখে পাশের ঘরে গিয়ে আত্মগোপন করে। কুন্দর মা সব খবরই নিল—"ছেলের স্বভাব চরিত্র কেমন, কতদূর পড়াশুনা ক'রেছে, বাড়ীর অবস্থা কেমন।" ফুলু সগর্ব্বে বলল—"ছেলের বাপ পয়সাকড়িআলা, তাছাড়া ছেলে নিজে ব্যবসা করে। বি-এ পাশ। আর বাপের ত ঐ একই ছেলে। এরকম ঘর আজকালকার দিনে কটা মেলে দিদি, তুমিই বল।" কুন্দর মাও তার উত্তরে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলল—"তা ত নিশ্চয়ই, তবে এখন অত সুখ আমাদের

কপালে সইলে হয়।" কুন্দর মা কুন্দকে ডাক্‌ল—"আয়রে, আয় চুল বাঁধবি আয়, বেলা যে পড়ে এল।"

ফুলু যাবার সময় কুন্দদের উঠোনের সজনেতলায় দাঁড়িয়ে ফিস ফিস ক'রে ব'লে গেল,—ত্রিপুরেশ এলে যেন, কুন্দকে ওদের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়।

কুন্দ ওর মায়ের সঙ্গে 'ফুলু মাসীমার' কথাবার্ত্তা সবই শুনতে পেয়েছে। তার যৌবনসুলভ হৃদয়টা উতলা হ'য়ে ওঠে। এখন পর্য্যন্ত তার বিয়ে হ'ল না, এই মনে ক'রে কুন্দ মনে মনে সর্ব্বদাই একটা গ্লানি বহন করে। একে ত বাপ-মায়ের অবস্থা স্বচ্ছল নয়। তার ওপর কুন্দর জন্য গাঁয়ের পাঁচজন মুরুব্বিদের কাছে বাপ-মাকে অহোরাত্রই কথা শুনতে হচ্ছে। সেই জন্য কোন জায়গায় তার বিয়ের প্রস্তাব শুনলে সে মনে মনে ভারী খুশী হ'য়ে ওঠে। ভাবে—যাক্‌ বাপ-মায়ের অত বড় একটা ভাবনার লাঘব হবে।

বাগানের তরিতরকারীটা, আচারটা, কাঁচা আমটা আরও এটা-সেটা পাঠাবার উপলক্ষ্য ক'রে, কুন্দকে ওর মা ফুলু বৌয়ের কাছে প্রায়ই পাঠায়।

ফুলু রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকে। কুন্দ 'মাসীমা' ব'লে ডাক দিয়ে এসে, রান্নাঘরের চৌকাঠের ওপর বসে।

কুন্দর স্নানসিক্ত একরাশ চুল পিঠ ব'য়ে চৌকাঠ ছাপিয়ে মাটিতে লুটায়। ফুলু রান্না ক'রতে ক'রতে ত্রিপুরেশের কত গুণ-কীর্ত্তনই যে পাঁচমুখে করে। কুন্দ সলজ্জ মুখটা নীচু ক'রে মাটিতে জলের আঁচড় কাটে। ছোট ছোট কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো মুখে-চোখে এসে পড়ে।

তারপর অনেক দিন, প্রায় এক বছর, ত্রিপুরেশের দেখা নাই। কুন্দর মা ফুলুর সঙ্গে দেখা হ'লেই ত্রিপুরেশ কবে আসবে খোঁজ নেয়। কুন্দরও ত্রিপুরেশের সম্বন্ধে কত প্রশ্নই যে মনে জাগে—'সে ভাল আছে ত, কবে আসবে, শীগ্‌গিরই আসার কথা আছে নাকি', কিন্তু কা'র কাছে জিজ্ঞাসা করবে?

কার্ত্তিক মাস। শীতের সকাল যে কোন দিক দিয়ে ব'য়ে যায়। আজ ফুলুর খাওয়া-দাওয়া সারতে বড় বেলা হ'য়ে গেছে। সে দীঘির ঘাটে কতকগুলো বাসন-পত্তর নিয়ে, একমনে মুখ ধুচ্ছিল, এমন সময় বকুলতলায় শুকনো পাতার মধ্যে কার পায়ের শব্দ শুনে, হঠাৎ চমকে উঠে, মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে পিছন ফিরে দেখে,—ত্রিপুরেশ এক হাতে একটা সুটকেশ নিয়ে, আরেক হাতে কোঁচা ধ'রে হন্‌ হন্‌ ক'রে যাচ্ছে।

ফুলু তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে ব'লে উঠ্‌ল—"আরে, ঠাকুরপো যে, এত বেলায় কোত্থেকে?"

ত্রিপুরেশও সুটকেশটা রেখে পায়ে হাত দিয়ে বলল—"এই যে ফুলবৌঠান্‌, আর আপনাদের গাঁয়ের মোটরলঞ্চের কাণ্ড! মাঝ পথে কলকব্জা গেল বিগড়ে, শেষে এই রোদ মাথায় ক'রে, কিছুটা পথ হেঁটে কিছুটা পথ নৌকায় আসি। তারপর আজ যে এত বেলা হ'ল খেয়ে উঠতে?"

ত্রিপুরেশ অমিয়কে বলল—তার বাবার শরীর কিছুদিন ধ'রে বড় খারাপ চলছে। তাঁকে ছেড়ে সে কোথাও নড়তে পারছে না। পূজাও ত এসে পড়ল। পূজার সময় সে তার বাবাকে নিয়ে দেওঘরে যাবে, হাওয়া পরিবর্ত্তনে। তারপর কবে যে ফিরবে, তার কোনও ঠিক নাই। "তাই ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা-শুনা করে যাই। তবে এবার আর বেশী দিন থাকা হবে না।"

যেদিন ত্রিপুরেশ এসেছে, ঠিক তার পরের দিন, খুব ভোর বেলায়, কুন্দ কাপড় বুজবার জন্য এক কোঁচড় শিউলি ফুল কুড়িয়ে, পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, ফুলুদের বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ফুলু হাতছানি দিয়ে কুন্দকে ডেকে বলল—"এই তোর মাকে বলিস, গতকাল ত্রিপুরেশ এসেছে।"

কুন্দ ত্রিপুরেশকে দেখেছে, ভাল ক'রেই দেখেছে। ত্রিপুরেশ কুন্দকে দেখেছে, ঘুমের জড়তা মাখান চোখে। পিছনে শিউলি ফুল ছড়াতে ছড়াতে কুন্দ ছুটতে ছুটতে চ'লে গেল। বেশ একটু লজ্জা পেয়েছে। এত চোখাচোখি পড়বে সেও কোন দিন ভাবতে পারে নি।

ত্রিপুরেশ চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল—"ও আবার কে, বৌঠাকরুণ?"

ফুলু শুধু একটু হাসল।

ফুলু বলল—"ঠাকুরপো, বাবাকে বলেছিলেন আমার কথাটা?" ত্রিপুরেশ ফুলুর কথার কোন জবাব না দিয়েই বলল—"ফুলবৌঠানের কাণ্ড, এতদিন পর এলাম, তাও আপনি গ্রাম ছাড়া করতে চাচ্ছেন, ওসব আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।" ফুলু তখনও ভাবতে পারে নি যে, ত্রিপুরেশ ওর কথাটাকে মোটে কানেই তোলে নি।

সপ্তমী পূজার দিন রাত্রে ত্রিপুরেশ ফিরে যাবে কলকাতায়। ফুলু এবার তাকে কিছুতেই আটকে রাখতে পারল না। সেদিন বিকালে কুন্দরাণী বালুচরের ধূপছায়া রঙের শাড়ী পরে, খোঁপায় পুঁতি বসান জাল দিয়ে, কপালে কাঁচপোকার টিপ দিয়ে, কানে পাশী মাকড়ী দিয়ে, পায়ে তোড়া দিয়ে "ঝুমুর ঝুমুর" করতে করতে ফুলুদের বাড়ী বেড়াতে এল।

ত্রিপুরেশ শব্দ শুনে, ঔৎসুক্যবশত জানলা দিয়ে এক ঝলক দেখে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চলে গেল। মনে মনে বলল—"ফুলুবৌঠাকরুণের পাগলামি।" সেবারেও ফুলু অনেক চেষ্টা করেও ত্রিপুরেশের কাছ থেকে কোনও মতামতই আদায় করতে পারল না। ত্রিপুরেশ শুধু অত্যন্ত ঔদাসীন্যের সুরে বলে গেল—"আচ্ছা, আচ্ছা, সে-সব দেখা যাবে এখন, দিন ত আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।"

রায়দের বাড়ীতে অষ্টমীর পূজা দেখে ফেরবার পথে কুন্দর মা ফুলুর বাড়ী হ'য়ে গেল। "ছেলের মতিগতি কেমন দেখলে" ফুলু বেশ আশা দিয়ে, হাসি মুখেই বলল—"কুন্দর মত মেয়েকে মনে ধ'রবে না, একি হ'তে পারে, আমি মতামত জিজ্ঞাসা ক'রে ছিলাম, তার উত্তরে বলল কিছুদিন যাক্‌, বাবার শরীরটা ভালর দিকে আসুক, এত তাড়াতাড়ি নয়।"

ফুলুর এখনও দৃঢ় আশা আছে, কুন্দর বিয়ে ত্রিপুরেশের সঙ্গে যে করে হ'ক হবেই। আজ না হ'ক, কাল না হ'ক, দু'বছর পরে হলেও হবে।

ফুলু খুব আশা ক'রে আছে, ত্রিপুরেশ সামনে কিছু না ব'লে গেলেও চিঠিতে কুন্দর কথা, আভাসে-ইঙ্গিতে নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু বিফল মনোরথ হয়েছে। অমিয়কে দিয়ে চিঠিতে, কুন্দর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিয়ে দেখেছে, কিন্তু ত্রিপুরেশ নীরব।

মানুষের কি দুর্ব্বলতা। কুন্দর ঐ আশাভরা বড় বড় চোখ দুটো দেখলে, ফুলু না ব'লে পারে না,—"চিঠিভরা শুধু কুন্দরই কথা।"

তারপর ত্রিপুরেশের কাছ থেকে বহুদিন সাড়াশব্দ নেই। শেষ চিঠিতে শুধু সে অমিয়কে লিখেছিল—তার বাবার অসুখ ভালর দিকে এসেছে। তবে তার এখন শীগ্‌গিরই কলকাতা ফেরার সম্ভাবনা নেই, দেওঘরে আরও কিছুদিন থাকবে, দেওঘরটা বেশ লাগছে।

ইতিমধ্যে কুন্দর নানা জায়গা থেকে ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল। কিন্তু দেনা-পাওনা ও কোষ্ঠীর মতান্তরে একটিও টেঁকে নি। কুন্দ তাতে খুশীই হ'য়েছে। কুন্দর অন্তররাজ্যে এখন ত্রিপুরেশই অধীশ্বর। ত্রিপুরেশকে দেখার পর থেকে কুন্দর যৌবনসুলভ সবুজ মনে একটা গভীর দাগ পড়েছে, সে দাগ মহাকালও মুছতে পারবে না। রাত্রে যখন সে শোয়, তার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম আসে না, শুধু এপাশ-ওপাশ করে। কত কি জল্পনা-কল্পনা করে—সে বড়লোকের ঘরের বউ হবে। বড়লোক কাকে বলে তা ত সে জানে না। তার শ্বশুরবাড়ী হবে কলকাতায়। কলকাতা খুব জমকালো শহর, সেকথা কুন্দ অনেকের মুখে শুনেছে, কিন্তু কোনও দিন ত' দেখে নি। ত্রিপুরেশের তাকে ভাল লেগেছে। সত্যিই কি ভাল

লেগেছে? ত্রিপুরেশ যদি আসে, সে কি আর জানতে পারবে না, নিশ্চয়ই পারবে। ঐ ত কুন্দদের ঘরের জানালার পাশ দিয়ে ছোট্ট মোটর লঞ্চটা ভোঁ দিয়ে, কচুরিপানা ঠেলে চলে যায়। কুন্দ ত রোজই সে সময় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কত লোক দেখতে পায়। ত্রিপুরেশকে তার মধ্যে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে কুন্দর চোখে ঘুম নেমে আসে, সে তা জানতে পারে না। ভোরবেলায় উঠে যখন সে নদীর বাঁধা ঘাটে শিব পূজার ফুল, বেলপাতা ভাসাতে যায়, তার মনটা বেশ সতেজ ও প্রফুল্ল লাগে।

ফুলু আর পারৎপক্ষে, কুন্দদের পাড়া মাড়ায় না। আর কত কথা সাজাবে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর! যতদূর সম্ভব কুন্দর মাকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু বকুলতলার দীঘির ঘাটে কুন্দর সঙ্গে স্নানের সময় দেখা হওয়াটা, ও কিছুতেই এড়াতে পারে না। "কই কোন দিনও ত কুন্দ, বকুলতলার দীঘিতে, ফুলুদের পাড়ায় এর আগে স্নান করতে আসত না, ঐ যে একদিন কথায় কথায় শুনেছে,—দুপুর বেলায়, ফুলু হঠাৎ দেখতে পেল, বকুলতলা দিয়ে ত্রিপুরেশ আসছে বহুদিন পরে।"

কুন্দদের "দুলে পাড়া" থেকে এই বকুলতলার দীঘি ত নেহাৎ কমখানি পথ নয়, তবুও সে এই দীর্ঘ পথ উজিয়ে আসে, শুধু এই আশায়, যদি ফুলুর মুখে ত্রিপুরেশের কোনও খবর শুনতে পায়। কিন্তু ফুলু যত তাড়াতাড়ি পারে, কর্ম্মব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে, স্নান করে ভিজে কাপড় নিংড়াতে নিংড়াতে পিতলের ঘড়া কাঁখে ক'রে বাড়ীর পথে চলে যায়, কুন্দ তখন বকুলতলায় দাঁড়িয়ে এক মনে চুল ঝাড়ে। পথে যেতে যেতে এই শুকনা-ডাঙ্গায় মেশান বকুল ফুলের মিষ্টি গন্ধ, বাতাসে বাতাসে কুন্দ কতদূর পর্য্যন্ত পায়। আপন মনে পথ চলতে চলতে কুন্দর মনে হয়,—মধ্যাহ্নের এই নিঝুম নিস্তব্ধ সমস্ত গ্রামটা বকুলের মাদকতাপূর্ণ সৌরভে পরিপূর্ণ।

বাড়ী ফিরে গেলে, তার মা তাকে কত বকে,—কোথায় সে স্নানে যায়, কার জন্য এত বেলা হয়, নদীর ঘাট ত তাদের বাড়ীর কাছেই। কুন্দ নীরবে মুখ নীচু ক'রে থাকে। নদীর ধারের চোর-কাঁটা আর সোঁদালি ফুলের গন্ধে ভরা মাঠে গরু আনতে গিয়ে তার সমস্ত সন্ধ্যা ব'য়ে যায়, ক্ষেতের ঝিঙে ফুল পর্য্যন্ত ফুটে যায়। তার মা কত রাগ ক'রে,—সময় মত তুলসীতলায় সাঁঝবাতি পড়ে না, চৌকাঠে জলছড়াও দেওয়া হয় না। সেদিন কুন্দর মা কুন্দের বাড়ী আসতে দেরী দেখে, মাঠে গিয়ে দেখেছে, কুন্দ গরুর দড়ি ধ'রে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে নদীর পাড়ের সূর্য্যাস্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, অস্তমিত সূর্য্যের রং এসে পড়েছে বাবলা বনের তালপাতার ফাঁক দিয়ে, ওর কিশোর মুখখানির ওপর। কুন্দ মনে মনে ভাবে—কই, সে ত নিজে ইচ্ছে ক'রে দেরী করে না বা তার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-কর্ম্মে শৈথিল্য দেখায় না, তবে এ আনমনাভাব তার কেন আসে মাঝে মাঝে, সে তা নিজেই বুঝতে পারে না।

সেবার অর্দ্ধোদয় যোগে, গঙ্গাস্নান করতে সোহাগদহ গ্রাম উজাড় ক'রে গেছে। সেদিন অমিয় ও ফুলু দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে স্নান করতে নেমে একটা বজরার ওপর ত্রিপুরেশকে তার বন্ধু বান্ধব নিয়ে হুল্লোড় করতে দেখতে পেল। অমিয় খুব চেঁচি ডাকল—"ত্রিপুরেশ, ও ত্রিপুরেশ।" ত্রিপুরেশ নৌকা থেকে ঝ দিয়ে সাঁতার কেটে চলে এল। ওরা সবাই ভিজে কাপড়ে দক্ষি শ্বরের মন্দিরের সিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়াল। ত্রিপুরেশ এবার ফুলবৌঠাকরুণের সঙ্গে বিশেষ কোনও কথাই বলল না। অগ ফুলু ত্রিপুরেশের গায়ে প'ড়েই বলল—"জানেন, সেই কুন্দরাণ এখনও বিয়ে হয় নি, আমি কিন্তু এবার কলকাতায় আসার অ ব'লে এসেছি, নিশ্চয়ই বিয়ে দিয়ে দেব আপনার সঙ্গে। আমা কথা ঠেলবেন না। গরীব ঘরের মেয়েটিকে নিন, ঠাকুরপো।"

অন্যান্য বারের মত, ত্রিপুরেশ এবার ফুলুর কথার প্রত্যু সলজ্জ হাসিও হাসল না, কিম্বা কথাটাকে চাপা দেওয়ারও ে করল না। ফুলুর কথায় সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়ে অমিয়র অন্য কথার অবতারণা করল।

ত্রিপুরেশের এরকম পরিবর্ত্তন, ফুলু কল্পনাও করতে পারে ফুলু ত আর জানে না যে, সে দেওঘরে গিয়ে সেখানকার বাি হাজারিবাগের অভ্রের খনির এক মালিকের শিক্ষিতা, শহ মেয়েকে বিয়ে ক'রে এনেছে। সেই শহুরে, শিক্ষিতা ধনীর কাছে কুন্দ অশিক্ষিতা, গাঁয়ের গরীব-ঘরের মেয়ে, কি ত্রিপুরেশের নাগাল পাওয়ার দুরাশা করতে পারে! থাকল তার বুকভরা দরদ, আর একান্ত আশা। থাক না সে সহস্র যুগ-যুগান্তর ধৈর্য্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা ক'রে, মেনকা দুহিতা মত। তাতে ত্রিপুরেশের কি আসে যায়?

কত নিদাঘের অলস মধ্যাহ্ন কুন্দর কেটে গেল, বাড়ীর আমবাগানে, কাঁচ আম কুড়াতে গিয়ে। একটা নীচু আমডালে হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। "বউ কথা কও"টা আমবনের অ কোন আবডালে ডেকেই চলে। দূর থেকে মোটর লঞ্চের ভোঁ যায়। কুন্দ রোজই ভাবে—"ত্রিপুরেশ ত গরমকালেই এখানে কে জানে, আজও হয়ত আসতে পারে, তাহ'লে এবার মায়ের বিয়ের আসমানী রংয়ের শাড়ীটা প'রে, খোঁপায় আ বেল কুঁড়ির গড়ে দিয়ে, কপালে খয়েরের টিপ দিয়ে, ফু বাড়ী বেড়াতে যাবে। পাড়ার মেয়েরা বলেছে,—কাঁচপোকার চেয়ে খয়েরের টিপ তাকে আরও বেশী মানায়।"

মোটর লঞ্চটা কখন যে হুস হুস ক'রে জল কেটে চ সে জানতেও পারে না। পশ্চিম আকাশের কাল-বৈশাখীর নদীর ওপারের দূর্ব্বাশ্যামল পাতায় ভরা প্রকাণ্ড তেঁতুল মাথায় জমাট বাঁধে, নৌকাগুলো দিশেহারা হ'য়ে উজান ঠে পল্লী-বধূরা জলভরা কলসী কাঁখে নিয়ে, ত্রস্তপদে আকাশে তাকাতে তাকাতে ঘরে ফিরে যায়। এই রকম ক'রে যখন প্রান্তে আমের বোলের গন্ধভরা চৈতালী দুপুরের অবসান হ সময় কুন্দর খেয়াল হয়—"বেলা যে একেবারে প'ড়ে গেল ফিরে যেতে হবে। এই ক'টা মাত্র কাঁচ আম, সারা দুপুরের মা দেখে হয়ত কত রাগ করবে।"

আলোর কি ওজন আছে?

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ সান্ন্যাল বি-এস-সি

সৃষ্টির কোন্ যুগ-যুগান্তর হইতে যে আলো তার বার্ত্তা বহিয়া আনিতেছে তাহা কে জানে? তবে আমরা দেখিতে পাই যে আলো না হইলে আমাদের আর চলে না। এত উপকারী এই আলোর স্বরূপ জানিবার জন্য শত শত বৎসর ধরিয়া কত বৈজ্ঞানিকের কতই না সাধনা। মনস্বী নিউটন আলোকে পদার্থ কণিকা বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। তারপর হিউগেন বহু প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এই মতবাদকে ভুল প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার "তরঙ্গবাদের" (Wave theory of light) দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন। কালক্রমে ইহাও শিথিল হইয়া পড়িল। বিংশ শতাব্দীর চমকপ্রদ তথা Quantum theory of Energy-র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকগণও আলোকে এক নূতন রূপ দান করিলেন।

এই তথ্য বুঝিতে হইলে আমাদের প্রথমত পদার্থের গঠন সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে হইবে। আমরা জানি প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি অণুর সমষ্টি, এই অণু আবার পরমাণুর সমাবেশে গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে আমাদের সৌরজগতের সূর্য্যেরই মত একটি কেন্দ্রীণ বা নিউক্লিয়াস আছে। তাহার মধ্যে অধিকাংশই "প্রোটন" বা ধন তড়িৎ কণা এবং সামান্য কয়েকটি "ইলেকট্রন" বা ঋণ তড়িৎ কণা। ফলে "নিউক্লিয়াসটি মোটের উপর সর্ব্বদাই ধনাত্মক। যে কোন পদার্থের পরমাণুর মধ্যস্থিত "নিউক্লিয়াসের" প্রোটনের সংখ্যা হইতে ইলেকট্রনের সংখ্যা বাদ দিলে যে কয়টি অতিরিক্ত প্রোটন থাকে তাহার সমান সংখ্যক ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস-এর চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন স্তরে আলোর গতির ১০ ভাগের ১ ভাগ বেগে ঘুরিতে থাকে। এই ঘুরিবার পথ কোথাও বৃত্তাকার এবং কোথাও দীর্ঘ বৃত্তাকার। এই ইলেকট্রনের ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের প্রায় ২০০০ ভাগের ১ ভাগ

এবং ইহার ব্যাস [illegible] × $১০^{-[illegible]}$ সেন্টিমিটার।

এই সূত্র হইতে বৈজ্ঞানিক "প্ল্যাঙ্ক" প্রথম ধারণা করিলেন যে কেবল জড় বস্তুরই নয় শক্তিরও এইরূপ আণবিক গঠন আছে। তিনি বলিলেন যে, যদি একস্তর হইতে কোনও শক্তির (Force) প্রভাবে একটি ইলেকট্রন অন্য স্তরে আসে তবে ইহার গতির জন্য কিছু শক্তির স্ফুরণ হইবে। ইহারই নাম "এক কণা শক্তি" (One Quanta of Energy)। বৈজ্ঞানিক "ভড়" স্থির করিলেন যে শক্তির এই স্ফুরণের দরুন একটি নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং ইহাও নির্ভর করে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্ফুরণের বা কম্পনের উপর। বিভিন্ন দূরত্বের স্তর হইতে "ইলেকট্রন"-এর এই বিচ্যুতি ঘটিবার জন্য শক্তির স্ফুরণেরও তারতম্য হয় এবং তদ্দরুণ তরঙ্গের মাপেরও তারতম্য ঘটে।

$$E_1 - E_2 = hn. \quad E_1 - E_2 =$$

যে শক্তি ইলেকট্রনটি একস্তর হইতে অন্যস্তরে আসিবার সময় বিলাইয়া দিয়াছে। h=একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা। n=প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন সংখ্যা। এই কম্পন সংখ্যা যত বেশী হইবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও তত ছোট হইবে)।

এই কম্পন সংখ্যা যখন সেকেণ্ডে

৪ × ১০[illegible] হইতে ৭·৬ × ১০[illegible] পর্য্যন্ত হয়

অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যখন ·০০০৭৬ মিলি-মিটার হইতে ·০০০৪-এর মধ্যে হয় তখনই আমরা আলো (Visible light) পাইব তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অন্য মাপের হইলে অন্য শক্তি পাইব—যেমন "তাপ"। "প্ল্যাঙ্ক" আরও বলিয়াছেন যে, পদার্থসমূহ হইতে যখন তরঙ্গ বাহির হয় তখন উহারা কতকগুলি শক্তি কণাও ছড়িয়া দেয়—ইহারাই পরে আলোক তরঙ্গের আকার প্রাপ্ত হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। পরে আইনষ্টাইন বলিলেন যে, আলোক তরঙ্গ যে কেবল পদার্থ হইতে বাহির হইবার সময় বা প্রবেশ করিবার সময়েই কণিকার আকার ধারণ করে তাহা নহে—তাহারা পথে চলিবার সময়েও কণিকারূপেই চলিতে থাকে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, মনস্বী নিউটনের আলো সম্বন্ধে ধারণা একেবারে ভুল ছিল না। তফাৎ হইল এই যে উহা "পদার্থের কণা" না হইয়া "শক্তি-কণা"। এই শক্তি-কণা সাহায্যে Photo-electric effect অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। আবার Interference (আলো+আলো=অন্ধকার) ব্যাখ্যা করিতে হইলে "তরঙ্গ-তত্ত্বের" সাহায্য ব্যতীত আর পারা যায় না। সুতরাং আলো শক্তি-কণিকা ও তরঙ্গ এ দুইটিরই সমষ্টি। উভয়ের অস্তিত্বই আরও অনেক প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে।

পদার্থ ও শক্তি ভিন্ন বলিয়াই বৈজ্ঞানিকদের পূর্ব্বে ধারণা ছিল। রসায়নিকেরা মনে করিতেন পদার্থ অবিনশ্বর (Matter is indestructible) এবং পদার্থবিদগণ মনে করিতেন শক্তি অবিনশ্বর (Energy is indestructible)। কিন্তু এ দুইটিই যে এক তাহা ১৯০৫ সালের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সকলেরই ধারণাতীত ছিল। ঐ সালে মনস্বী আইনষ্টাইন তাঁহার বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন যে, শক্তি ও পদার্থ অভিন্ন। শক্তি হইতে পদার্থ, পদার্থ হইতে শক্তি সর্ব্বদাই সৃষ্টি হয়। তাঁহার মতে আলোক-কণার (Quantum) শক্তির সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বও (Mass) আছে। হাইড্রোজেনের গুরুত্ব ১·০০৮ এবং হিলিয়ামের ৪। বৈজ্ঞানিকদের মতে ৪টি হাইড্রোজেন অণু মিলিয়া একটি হিলিয়াম অণু সৃষ্টি করে। অবশিষ্ট ·০৩২ গুরুত্ব বিশিষ্ট পদার্থ শক্তিতে পরিণত হয় এবং তাহাই "কসমিক-রে" হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়।

আইনষ্টাইন দেখাইয়াছেন যে কোনও পদার্থ গতিশূন্য থাকিলে তাহার যে গুরুত্ব থাকে সেই পদার্থই গতিশীল হইলে তাহার গুরুত্ব বাড়িয়া যাইবে। অবশ্য এ বৃদ্ধি এত সামান্য যে তাহা আমাদের কল্পনাতীত।

যদি m_0=কোনও গতিশূন্য পদার্থের গুরুত্ব (mass) হয়,
m=V গতি অবস্থায় সেই পদার্থের ওজন,
E=বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ এবং
V_1=আলোর গতি হয়,

তবে $E = V_1^2(m - m_0)$ সুতরাং $m - m_0 = \frac{E}{V_1^2}$

এইরূপে গতিশীল অবস্থায় শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য পদার্থের ওজন বৃদ্ধি হয়। এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ওজন শক্তিরই ওজন (Energy has mass)। আইনষ্টাইন আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে,

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{V_1^2}}}$$

পদার্থের যে মহাকর্ষণের (gravitation) জন্য নিউটন-এর আইন অনুযায়ী শুধু যে এক পদার্থ অন্য পদার্থকেই আকর্ষণ করে তাহা নহে, শক্তিরও ওজন আছে বলিয়া তাহাকেও আকর্ষণ করিতে পারে। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় দেখা গিয়াছে যে অন্য পদার্থ হইতে আগত আলোকরশ্মিকে সূর্য্য আকর্ষণ করিবার ফলে তাহারা বক্র হয়। কিন্তু আলো শক্তিরই এক রূপ। অতএব উপ-রোক্ত প্রমাণাদি হইতে দেখা যাইতেছে যে—"আলোরও ওজন আছে।"

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে সুধীর ও অক্ষয় যতীনের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিছু পূর্ব্বেই যতীন কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহার মাতা উহাদের সাদরে গ্রহণ করিলেন। সুধীরের দিকে চাহিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন,—এতদিন আসনি কেন বাবা? একটা ভাল কৈফিয়ৎ চাই আমি।

সুধীর বলিল,—এদিকে ছিলাম না, থাকলে নিশ্চয়ই আসতাম।

যতীনের মাতা বলিলেন,—নিজের দেশকে ছেড়ে কি অমন বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। এ হতভাগ্য দেশটাকে তোমরা সবাই মিলে যে আরও হতভাগ্য ক'রে দিচ্ছ, সে কথা ভুললে ত' চ'লবে না। কিন্তু যাক ওসব কথা, হাত মুখ ধুয়ে একটু কিছু মুখে দাও ত' আগে।

দুপুর বেলা মাঠের কাজ শেষ করিয়া যতীন আসিয়া তাহাদের দেখিয়াই আনন্দে প্রায় লাফাইয়া উঠিল। সুধীরের একটা হাত সজোরে নাড়িয়া দিয়া সে বলিল, হঠাৎ আকাশ থেকে নাকি? অক্ষয় যদি সঙ্গে না থাকত ত' আমি এটাকে মিথ্যে স্বপ্ন অথবা ভোজবাজী ব'লেই মনে করতাম।

সুধীর কোন কথা না বলিয়া তাহার দৃঢ় কর্ম্মঠ দেহের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষে একসঙ্গে কৌতূহল এবং বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

হাসিয়া যতীন বলিল, কিহে অবাক হ'য়ে গেলে যে। আমাকে কি আর কোনদিনই দেখনি নাকি!

এতক্ষণে সুধীর বলিল, দেখেছি তোমাকে অনেকবার কিন্তু এমনভাবে ত' আর দেখিনি কখনও। ভাবছি এতখানি বদলালে কেমন ক'রে।

যতীন বলিল, এখন নয়, এসব কথা পরে হবে। ক্ষিদেয় পেটের অবস্থা একটু শোচনীয় হ'য়েই উঠেছে। চল দেখি, আগের দিনের মত পুকুরে বেশ ক'রে সাঁতার দিয়ে আসি।

আহারের পর বাহিরে গাছতলায় মাদুর পাতিয়া বালিশে হেলান দিয়া তিন বন্ধু গল্প করিতে লাগিল। এমনি করিয়া কতদিন তাহারা কেবলমাত্র বসিয়া বসিয়াই কাটাইয়া দিয়াছে। হয়ত মাঝে মাঝে দুই একটা কথা হইয়াছে, কখনও বা কোন কথাই হয় নাই। পরস্পরের সান্নিধ্যেই পরস্পরে খুশী হইয়া উঠিয়াছে। আজ অনেক দিনের পর সে-দিন তাহারা ফিরিয়া পাইয়াছে। যতীন তাহার কাজকে তুচ্ছ করিয়া, সুধীর তাহার অলকাকে মনের এক কোণে ঠেলিয়া রাখিয়া আবার তেমনি করিয়া বসিয়াই হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে লাগিল। তাহারা তিনজন সেই পুরাতন মূর্ত্তিতেই ফিরিয়া আসিল।

সুধীর বলিল, কি ক'রে বদলালে তা ত' কই বললে না।

যতীন বলিল, তার চেয়ে চল আজ একজনের সহিত আলাপ করিয়ে দি তোমাদের।

অক্ষয় বলিল, কিন্তু ওর প্রশ্নের সঙ্গে এই আলাপ করিয়ে দেওয়ার কি সম্পর্ক? ওর কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চাওয়ার মানে কি?

যতীন বলিল, এই আলাপ করিয়ে দেওয়া আর আমার বদলানর সঙ্গে একটা বড় রকম সম্পর্কও ত' থাকতে পারে। তাকে দেখলেই বুঝতে পারবে তোমরা—এখানে সবাই তাঁকে সাধুজী ব'লেই জানে যদিও গেরুয়ার ধার-কাছ দিয়েও তিনি যান না।

সুধীর বলিল, হ্যাঁ শুনেছি বটে তাঁর কথা একজনের কাছে। সে লোকটা নিজে কেমন যেন একটু খেয়ালী ধরণের, ঠাট্টাও বড় করে না, কিন্তু সাধুজীর ওপর খুব বিশ্বাস দেখলাম। হয়ত অনেকেই তাঁকে বিশ্বাস করেন, এও তাদেরই একজন। তবে লোকটা সত্যি একটু অদ্ভুত, বৃষ্টি দেখে যার বাড়ীতে আশ্রয় নিলে, না ব'লেই যে কখন গেল বেরিয়ে। তাকে ত' তুমিও চেন হ কি যেন নাম তার?

সুধীর অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিল।

অক্ষয় বলিল, হ্যাঁ সাধুজীও তাকে চেনেন, নাম তার হেম

যতীনের চক্ষে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, একটু চুপ করিয়া সে বলিল, হ্যাঁ তাঁকে চিনি আমি, কিন্তু তবু ঠিক চি সাধুজীই তাঁর সঙ্গে আমাকে পরিচিত করে দিয়েছেন, আ বুঝেছি তিনি যেই হ'ন, সাধুজী তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করেন তার বেশী আর কিছুই আমি বুঝিনি।

সুধীর বলিল, সাধুজীর কথা ত' খুবই শুনেছি, কিন্ থেকে এসেছেন তিনি আর কিই-বা তাঁর উদ্দেশ্য, কি করছে এখানে এসে?

যতীন বলিল, কোথা থেকে এসেছেন জানি না, জিজ্ঞে বলেনও না শুধু হাসেন। করছেন অনেক কিছুই। ছে ছেলেদের নিয়ে স্কুল, গ্রাম পরিষ্কার করা, রোগীর সেবা কর্ম্মঠ করা সঙ্ঘবদ্ধ করা কিছুই বাদ দেন না তিনি। সব নজর তাঁর চাষীদের ওপর, কি ক'রে ক্ষেতের ফসল বাড়িয়ে হয় তাও যেমন তিনি জানেন তেমনই জানেন সহজভাবে তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা জমিয়ে দিতে হয়। দেবতা ব'লেই জানে তাঁর কথা না শুনে তারা পারে ন দেখলে অবাক হ'তে হয়, তাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি, ভালবাসা বেড়ে উঠেছে। গাঁয়ের মূর্ত্তি গেছে উদ্দেশ্য তাঁর এ'দের সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করে জাতীয় শ করা। আমার বিশ্বাস যে কাজ তিনি হাতে নিয়েছেন হবে।

অক্ষয় বলিল, কিন্তু সারা ভারতবর্ষে গ্রামের ত' অ এই একটা গ্রামের কোণে বসে কত কাজই বা হ'তে পা ধীরে ধীরেই যদি কাজ করতে হয়, তাহলে এ জাতিকে থাকতে হবে না।

যতীন হাসিয়া বলিল, আমারও প্রথমে সে কথাই মনে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁকে। তিনি হেসে বলেছি বড় ভারতবর্ষে আমিই যে একা লেগেছি কে তা বল অনেকেই আছেন এমনিভাবে ব্যস্ত, আর আছেন যে তাঁরা আমার নমস্য, ভারতের গ্রামই শুধু নয়, শহরও যায় নি। আমি তাঁর কথা ঠিক বুঝতে না পারলেও এটু যে, তিনি একা নন। আরও অনেকে ছড়িয়ে আছেন চা হয়ত সবাই একদলের।

সুধীর বলিল, কিন্তু এ ত' তোমার অনুমান।

যতীন বলিল, তা নিশ্চয়ই, কিন্তু এ অনুমান সোজা। যদি বলি না খেয়ে মানুষ বাঁচে না, তবে সেটা না হওয়াই সম্ভব, এও কতকটা তাই। যাঁরা নিজেদের পরের জন্যে কাজ করেন, তাঁরা কি তাঁদের মহৎ উদ্দে ভুলে যান মনে কর? তাঁরা অচেতনকে চেতনা দিতে সঙ্ঘবদ্ধ না হ'য়ে এসব কাজে কখনই তাঁরা নামতে এ ত' হুজুগে মেতে থাকা নয়।

অক্ষয় বলিল, তুমিও তাঁদের দলে ঢুকে পড়েছ নাকি

মাথা নাড়িয়া যতীন বলিল, না অতদূর স্পর্দ্ধা আ আমার মা আছেন, স্ত্রী আছে, তাদের কথা নিয়েই ত' আ সময় কেটে যায়। তারই ফাঁকে তাঁকে এতটুকু সাহায্য কর অবশ্য আমি খুবই খুশী হই।

গাছের ফাঁক দিয়া একটি যুবককে তাহাদের দিকেই আসিতে দেখা যাইতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া অক্ষয় বলিল, কে একজন লোক এদিকেই আসছে না। এ সময় আবার কে বিরক্ত করতে আসছে।

সেই দিকে চাহিয়াই যতীন দাঁড়াইয়া উঠিল, আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিল, এদিকে আসুন সাধুজী, আমরা এখানেই আছি। অনেক দিন বাঁচবেন কিন্তু।

সাধুজী ততক্ষণে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। সুধীর ও অক্ষয় তাহার মুখের দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। যাঁহাকে সাধুজী বলিয়া তাহারা শুনিয়া আসিতেছে, তিনি যে গেরুয়াধারী নহেন, তাহা তাহারা জানিত, কিন্তু তিনি যে তাহাদের অপেক্ষাও ছোট, মাত্র বছর বাইশের সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক, একথা তাহারা ধারণা করিতেও পারে না।

সাধুজী হাসিয়া বলিলেন, খুব তাড়াতাড়ি মরবার ইচ্ছেও আমার নেই। কিন্তু সবাই আমাকে সাধুজী বলে ব'লে, আপনিও কি তাই বলবেন চিরকাল? আমার একটা সহজ নাম আছে, আর সেটা অনেকবার বলেছি আপনাকে, আবার মনে করিয়ে দিতে হবে কি?

যতীন হাসিয়া বলিল, যে নাম ধরে ডাকতে আমার ভাল লাগে, সে নাম ধরেই ত' ডাকব আমি, কিন্তু থাক নামের গোলমাল—এদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি আগে।

হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া মৃদু হাসিয়া সাধুজী বলিলেন, এঁদের চিনি আমি, আপনাকে আলাপ করিয়ে দিতে হবে না। তারপর সুধীরের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার ওখানে যাব ভাবছিলাম সুধীরবাবু। আপনারা ত' বেশ বড় জমিদার তাই নিরাশ হব না নিশ্চয়। কিছু অর্থ সাহায্য চাই আপনার কাছে, আপনাদের নিরুদ্ধেই ত' আমাদের অভিযান—অর্থ না থাকলে কিছুই যে করতে পারব না আমরা, আর সবই অনর্থ হ'য়ে যাবে। কথা শেষ করিয়াই সাধুজী জোরে হাসিয়া উঠিলেন।

অক্ষয় বলিল, এমনি করে কি আর অভিযানে সফল হওয়া যায়? যার বিরুদ্ধে যাবেন আপনারা, সেই কি না করবে আপনাদের সাহায্য! এ আশা কি ক'রে করেন আপনারা?

মৃদু হাসিয়া সাধুজী বলিলেন, আপনি ওঁর বন্ধু হ'য়েও ওঁকে ঠিক চেনেন না। জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন আপনার বন্ধুকেই—তিনি আমাকে সাহায্য করতে রাজী আছেন কি না, তা তাঁর কাছেই জানতে পারবেন। আমরা অনেক মানুষ দেখেছি তাই তাঁদের দেখলেই চিনতে পারি।

সুধীর ঘাড় নাড়িয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল।

সাধুজী হাসিলেন।

অক্ষয় বলিল, এক্ষেত্রে না হয় সাহায্য পেলেন, কিন্তু সব জায়গায়ই ত' তা মেলে না। যেখানে সাহায্য না পান সেখানে অভিযান কি বন্ধ রাখেন নাকি? তাহলে ওই দু'এক জায়গা ছাড়া সব জায়গায়ই আপনাদের চুপ ক'রে থাকতে হবে। নিজের পায়েই নিজে কুড়ুল মারে এমন বোকা আর কটা পাবেন। তাহার কণ্ঠে বিদ্রূপ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

সাধুজীর মুখের হাসি কিন্তু কিছুতেই মুছিয়া গেল না, তিনি বলিলেন, আর যাই বলুন, যুক্তি এবং উদাহরণ দিতে গিয়ে বন্ধুকে বোকা না বলাই ভাল। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার একটা শাস্ত্রসম্মত মত আছে। আমরাও তাই ক'রে থাকি। যে রোগীর কলেরা হয়েছে, তাকে কালাজ্বরের অষুধ আপনি খাওয়াতে চাইলেও আমরা পারিনে। যেখানে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন ব'লে আমরা মনে করি, সেখানে সে ব্যবস্থাই ক'রে থাকি, তার বাইরে যাই না।

অক্ষয় আর কোন কথা বলিতে পারিল না। কেবলমাত্র বিদ্রূপ করিবার জন্যই তর্ক করা যে ইহার সঙ্গে চলিবে না, তাহা সে খুব ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিল।

মাথা নাড়িয়া যতীন বলিল, এ'র সঙ্গে কথা ব'লে পারবে না অক্ষয়, সে চেষ্টাও ভবিষ্যতে আর করবে না বোধ হয়। সমস্ত কিছুই যারা মন দিয়ে বুঝে করে, তাদের সঙ্গে কি না বুঝেই তর্ক করা চলে?

সুধীর আস্তে আস্তে বলিল, আমিও আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই। আমাকে আপনার সহকর্ম্মী করতে কি কোন আপত্তি আছে সাধুজী?

হাসিয়া সাধুজী বলিলেন, কেন সাধু না হ'য়েই আমাদের মত ও নামটার পর খুবই লোভ হয়েছে বুঝি?

অক্ষয় বলিল, আপনাদের ও নামটার ওপর লোভ থাকতে পারে, ওর কিন্তু নেই। নামের মোহ কি সবারই থাকে?

সাধুজী বলিলেন, কিন্তু ও কথা জোর দিয়ে বলা আপনার ঠিক উচিত হয় না। কে যে কিসের ওপর লোভ করে, কজনেই বা বলতে পারে? খবরের কাগজের কোন এক পাশে নিজের নাম ছাপা হবে, একথা মনে ক'রে অনেকে ত' আত্মহত্যাও ক'রে থাকে। কিন্তু কি তার লাভ? সেই ছাপার অক্ষর সে কি কোন দিনও দেখতে পারে? আমার টাকা নেই, তাই না তার প্রতি আমার এত লোভ যে ও'র কাছেও চেয়ে বসলাম—সাধু নাম ও'র নেই, তাই লোভ হওয়া একান্তই কি অস্বাভাবিক?

সুধীর বলিল, না সাধু হবার লোভ আমার নেই। আমি চেলা হ'তে চাই, আপনি নেবেন কি আমায়?

একটু বিস্মিত হইয়া সাধুজী বলিলেন, কিন্তু হঠাৎ কি কারণ হ'ল তা আমি জানতে চাই যে।

সম্মুখের দিকে চাহিয়া সুধীর বলিল, জীবনের আর কোন উদ্দেশ্যই নেই আমার, এখন দিন কটা শুধু কাটিয়ে দিতে চাই। জীবনটা ত' ব্যর্থই হয়েছে, বাকী দিনগুলো একটু কাজের মধ্যে দিয়ে যেতে চাই।

সাধুজীর চক্ষু মুহূর্তের জন্য তীব্র হইয়া উঠিল, মুখের উপর দিয়া মুহূর্তের জন্য একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁহার সেই শান্ত ভাব ফিরিয়া আসিল, সোজা সুধীরের চক্ষের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, পরের কাজ কি এতই সোজা যে, নিজের জীবন ব্যর্থ হ'য়ে গেলেও, তা করা যায়। নিজের জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্যই যাদের শেষ হ'য়ে গেছে, তাদের আর কোন কিছুই বাকী নেই। নিজের জীবনেরই যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে ত' পরের জীবনকে মহান উদ্দেশ্যের মধ্যে বাঁধবেন কেমন ক'রে? এ-সব হয় না সুধীরবাবু, ফাঁকা মন নিয়ে ও-সব কাজ করা চলে না। কিন্তু আজ উঠি, আবার দেখা হবে—আর আমার টাকার কথাও ভুলবেন না।

বাড়ীর ভিতর হইতে একটি তরুণী বাহির হইয়া আসিয়া সাধুজীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মাসীমা আপনাকে ডাকছেন বিনয়-দা। তোমরাও এস দাদা বিকেল যে হ'য়ে গেছে।

সাধুজী হাসিয়া বলিলেন, তাই নাকি সতী দিদি, বিকেল হ'য়ে গেছে? তা হবে। কিন্তু বিকেল হ'য়ে গেলে কি করতে হয় কি?

সতী হাসিয়া বলিল, তা ত' বুঝতেই পাচ্ছেন। কিন্তু দেরী করলে মাসীমা রাগ করবেন। তরুণী ভিতরে চলিয়া গেল।

মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিয়া সাধুজী বলিলেন, এদেশটা বড়ই অদ্ভুত না সুধীরবাবু? কে যে কোথা থেকে এসে টান দেয় তা কে বলতে পারে? ঘর ছেড়ে এসেও সত্যিকার ঘর ছাড়বার একটুও উপায়ও নেই। বিকেলে যে পেটে কিছু দিতে হয়, এ বোধ করি সব দেশেরই নিয়ম অথচ ক্ষিদের আহার জোটে না এমন লোকেরও অভাব নেই, কিন্তু আসুন আমার কিছু কাজও বাকী আছে।

ভিতরে আসিয়াই একটা প্লেট টানিয়া লইয়া সাধুজী বলিলেন জিনিষগুলো ত' বেশ ভালই দেখছি, খেতে যে আরও ভাল হবে তা বেশ বুঝতে পারছি।

যতীনের মা হাসিয়া বলিলেন, তোমার ত' সব কিছুই ভাল লাগে বাবা। কাঁচা চিঁড়ে পেলেও তুমি এমন ভাব দেখাও যে, মনে হয় এমন জিনিষ বুঝি আর কখনই তুমি খাও নি, তুমি যে পাগল সে আমি খুব ভাল রকমই জানি।

সাধুজী হাসিলেন, কোন কথাই না বলিয়া আহারে মন দিলেন।

অক্ষয় বলিল, জিনিষগুলো যে ভাল তা টের পেলেন কি ক'রে? সাধুজীর ধ্যান করার অভ্যেস আছে নাকি?

সাধুজী মুখ তুলিয়া বলিলেন, না ধ্যান নয়, এসব হচ্ছে জিহ্বার ব্যাপার। জিনিষগুলো দেখে আপনার জিহ্বার যে অবস্থা হয়েছিল, মনের মধ্যে যে আগ্রহ ফুটে উঠেছিল, আমারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এ সব হচ্ছে শ্রীখাবারের লীলা—বোঝেনই ত' সব তবে একটু [illegible] করেন আর কি।

সুধীর বলিল, সাধুজীকে রাগাবার আর চেষ্টা ক'র না অক্ষয়।

যতীন বলিল, রাগ উনি করেনও না।

মাথা নাড়িয়া সাধুজী বলিলেন, রাগ ক'রতে জানি যথেষ্ট কিন্তু কি জানেন সমস্ত কিছুই ঘরোয়া ব্যাপার ব'লে মনে হয়, তাই রাগ কিছুতেই আসে না। তারপর গুরুর আদেশ আছে কিনা। তিনি সমস্ত রাগ মনের মধ্যে জমা ক'রে রাখতে বলেন, এতটুকুও যেন বেরিয়ে না যায়। ভগবানের জিনিস একদিন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে তাঁকেই ফেরৎ দিতে হবে কিনা।

অক্ষয় বলিল, কিন্তু এই গুরুজীটি কে এবং থাকেন কোথায়?

সাধুজী হাসিয়া বলিলেন, কে যে তা' বলা বড় শক্ত, তবে আমরা দেখলে তাঁকে চিনতে পারি। চারিদিকেই তাঁর চোখ। কোন কিছুতেই ভয় তিনি পান না, আর আমাদের দেন ভরসা—তাই আমরা তাঁকে বলি অভয়ানন্দ। গেরুয়া তিনি পরেন না বটে; কিন্তু কি যে কখন তিনি পরেন তা আমরাও ঠিক বলতে পারি না। তাঁকে চিনতে গেলে তাঁর আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই।

সুধীর তাঁহার মুখের দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল, যতীনের মা অন্য কাজে উঠিয়া গেলেন, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অক্ষয় বলিল, ব্যাপারটা একটু রহস্যাবৃত হয়ে উঠল। গুরুটি কি দাগী?

সাধুজীর দৃষ্টি সম্মুখের দিকে প্রসারিত হইল, আত্মগত-ভাবে তিনি বলিলেন, দাগ থাকা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু যত দাগই বসান যাক পচে শেষ হয়ে যাবার লোক তিনি নন। তিনি কথা দিয়ে কিছু করেন না—যা কিছু করেন, দুটো হাত দিয়ে শক্ত-ভাবেই করেন।

অক্ষয় বলিল, গুরুজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না?

সাধুজী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, পাপীদের সে ভরসা করাই অন্যায়। তবে একেবারেই নিরাশ করতে চাই না, ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকুন, সেদিন আসবেই। আপনাদের জন্যই আমাদের যত মাথা ব্যথা কি-না।

যতীন বলিল, আজ কি তুমি শুধু তর্কই করবে অক্ষয়?

সাধুজী বলিলেন, যে প্রশ্ন মনের মধ্যে আসে তা প্রকাশ করাই ভাল, নইলে ওরাই বড় হয়ে উঠে একদিন মানুষকে অবিশ্বাসী করে তোলে।

সুধীর বলিল, কিন্তু প্রশ্ন মানে বিদ্রূপ নয়।

সাধুজী বলিলেন, বিদ্রূপ করা মানুষের স্বভাব, আর তা' যদি অক্ষরবাবু করেনই ত' বলবার আমাদের কি-ই বা থাকতে পারে?

ঠিক এমনি সময় পাশের গ্রামের হরিহর সর্দ্দার আসিয়া সাধুজীকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

সাধুজী বলিলেন, তোমার একটু দেরী হয়েছে হরিহর। আমি নিজেই যাচ্ছিলুম তোমার খোঁজে। কিন্তু কোন কাজে দেরী করা ত' আমাদের নিয়ম নয়।

হরিহর বলিল, কি করব ঠাকুর—বাতাসীর ডাকে তাদের বাড়ী গিয়েছিলুম, কিন্তু কোন লাভই হ'ল না। ওর মাকে ধরে রাখতে পারা গেল না।—বুড়িকে কিন্তু এখনও ঘরেই রেখে দেওয়া হয়েছে আপনার জন্যে। সে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বাহিরের দিকে চাহিয়া আবার সাধুজীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

সাধুজী বলিলেন, আমার জন্যে তাকে এখনও ঘরেই রেখেছে কেন? আমাকে খবর দিতে পাঠিয়ে ওদিককার ব্যবস্থা তোমরাও ত' করতে পারতে। আমার জন্যে একাজটাও ফেলে রাখবে? যদি আমি এখানে নাই থাকতুম অথবা মরেই যেতুম ত' করতে কি?

দুই কানে আঙ্গুল চাপিয়া হরিহর বলিল, ওকথা বলবেন না ঠাকুর, আপনি যদি না-ই আসতেন এ গ্রামে ত' হয়ত' দিন আমাদের কেটে যেত এক রকম কিন্তু আপনি এসেই ত' সব গোলমাল ক'রে দিয়েছেন, আর তাই আপনাকেই সমস্ত তাল সামলাতে হবে। বুড়ি মরবার আগে মেয়েকে বলে গেছে যে, ঘর থেকে বার করবার আগে আপনার পায়ের ধুলো যেন তার মাথায় দেওয়া হয়। আর ত' কোন উপায়ই নেই, পায়ে বেশ করে' ধুলো মাখিয়ে এখন চলুন আমার সঙ্গে।

সাধুজী দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, হরিহর তাঁহার অনুসরণ করিল। অনেক দূর আসিয়া একটু থামিয়া হরিহরকে তিনি বলিলেন, না তোমরা যে চিরকাল বোকাই থেকে যাবে তা' বুঝতে পেরেছি—বলে, আশী বছরে গয়লার বুদ্ধি হয়—তা' এবার থেকে তাও হবে না।

হরিহর কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে নিতান্ত অপরাধীর মত চাহিয়া রহিল। শান্ত হইয়া সাধুজী বলিলেন, সবার কাছে কি ওসব কথা বলতে হয় হরিহর! ভদ্র-লোকদের সামনে ওসব পায়ের ধুলোর কথা আর কখনও ব'ল না। কিন্তু আর দেরী করে কাজ নেই, সন্ধ্যে হয়ে যাবে ওখানে পৌঁছবার আগেই।

পরের দিনও যতীনের কাজে যাওয়া হইল না, মজুরদের সেদিনকার কাজ বুঝাইয়া দিয়া বন্ধুদের লইয়া সে নিকটস্থ একটি বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, এটি হচ্ছে আমার গ্রাম সম্পর্কে মাসীমার বাড়ী। একটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই তাঁর। তাকে দেখেছ কাল বিকেলে। খুব ভাল মেয়েটি, সতী নাম দেওয়া যে সার্থক হয়েছে তা' এ গ্রামের সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে।

সুধীর বলিল, হ্যাঁ কাল দেখেছি তাকে, খুব ভাল মেয়ে বলেই মনে হ'ল।

অক্ষয় একবার বক্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দূরে গাছ-গুলির ভিতরে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। যতীনের মাসীমা তাহাদের ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁহার সৌম্য শান্ত চেহারার দিকে চাহিয়া আপনা হইতেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে।

সতী চা লইয়া আসিল।

কি এক সম্পর্ক থাকায় অক্ষয়ের সহিত তাহাদের পরিচয় ছিল, সতীকে চা আনিতে দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল, বা লক্ষ্মী মেয়ের মত একেবারে ঠিক সময়েই যে।

যতীন বলিল, আমার বোনের অপমান করো না তুমি। লক্ষ্মী সে চিরকালই আর যখনকার যা তা' সে সময়েই করে থাকে, এতটুকু এদিক ওদিক হয় না কোনদিন। দেখলেই ওকে ভাল মেয়ে বলে বোঝা যায়—সুধীর ত' অনেক আগেই তা' স্বীকার করেছে।

লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া সতী বাহির হইয়া গেল।

সতীর মা বলিলেন, এটা আমার গর্ব্ব যতীন যে, গ্রামের সবাই ওকে ভাল বলে। কিন্তু সেই ভাল হওয়া ত' ওর কোন কাজেই এল না আজ পর্য্যন্ত। একটা ছেলেও কি পাওয়া যায় না, যার হাতে ওকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি?

যতীন বলিল, ভাল ছেলে অনেক আছে মাসীমা, ছেলে আর মেয়ের অভাব এদেশে কোন দিন হবে না।

মাসীমা হাসিলেন, সুধীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, অনেক আছে সেকথা স্বীকার করি কি করে। নমুনা ত' আজও পাইনি।

তবে মেয়ের যে অভাব নেই তা' আমি জানি। তোমাকে, অক্ষয়কে আরও কত লোককেই ত' বললুম; কিন্তু ছেলের খোঁজ ত' কই আজও মিলল না।

অক্ষয় বলিল, ছেলেরা আজকাল বিয়ে করতেই চায় না।

মাসীমা বলিলেন, অথচ সবাই বিয়ে করে। ওটা হ'চ্ছে আমাদের মারবার যন্ত্র। যারা বিয়ে করবে না বলে তারা চায় মস্ত-বড় একটা সুবিধে অর্থাৎ যারা গরীব তাদের মরণ ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না। এই যে আমার মেয়ে শুধু আমার মেয়েই বা কেন এই এতটুকু গ্রামেও অনেক মেয়ে পাবে যারা কারও চেয়ে ছোট নয়; কিন্তু তাদের শেষ অবস্থা কি হয়। এ হচ্ছে ছেলেদের দোষ, বিয়ে তারা করেই কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছরের আগে নয়। ষোল সতের বছরের মেয়েদের ক'রতে হয় তাদের সংসার কিন্তু তাদেরই যারা উপযুক্ত হ'তে পারত' তারা তখন পঁচিশের ওপর ব'লে সংসারের বাইরের হ'য়ে দাঁড়ায়—এই ত' আজকালের অবস্থা। তোমাকেও বলি বাবা সুধীর, যদি পার এ মেয়েটার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিও।

সুধীর মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল—ইহার বেশী আর কিছু করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। সেই দিনই দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সুধীর ও অক্ষয় স্বগ্রামের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। অনেক দূর নিঃশব্দে চলিয়া আসিয়া সুধীর বলিল, যাবার সময় সেই মেয়েটীর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাওয়া উচিত নয় কি? সেদিন যদি তার সাহায্য না পেতুম তাহলে কি হত বলত'?

অক্ষয় বলিল, দেখা ক'রে যাওয়ার এমন কিছু দরকার আছে ব'লে ত' মনে হয় না। আর সাহায্য? সেত পাবেই। এ দেশের মেয়েদের কাছে বিপদের দিনে সাহায্য না পাওয়ারই যে উপায় নেই। পরের সেবা এবং সাহায্য করাই যেন এদের মজ্জাগত ব্যাপার। এদের বুকনার সৌভাগ্য তোমার হয়নি তাই বলি বন্ধু সময় থাকতে সে কাজ ক'রে ফেল। জীবনে দু'একটা ভুল ত' করেছ আর নাই বা করলে। সতীর মায়ের কথা মনে আছে কি?

অন্যমনস্কের মত সুধীর বলিল, মনে আছে, যদি অসাধ্য না হয় ত' তার ব্যবস্থা আমি করে দেব'। অনেকের সঙ্গেই ত' জানাশোনা আছে, অক্ষম হব না বোধ হয়।

অক্ষয় বলিল, হ্যাঁ, তোমার অসাধ্য হবে না, খুব ভাল একটা সম্বন্ধই ত' হাতের কাছে আছে।

তাহার দিকে ফিরিয়া সুধীর বলিল, ভাল সম্বন্ধ আছে অথচ সে-কথা তাদের বলনি! কে সে? আমাদের দুজনেরই চেষ্টা করা উচিত।

অক্ষয় বলিল, তুমি একলা চেষ্টা ক'রলেও চলবে।

তাহার কথা বুঝিতে না পারিয়া সুধীর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সম্মুখের দিকে চাহিয়া অক্ষয় বলিল, আমি বলি কি বন্ধু তাকে তুমিই নাও। মেয়েটি খুবই ভাল, তাকে নিয়ে এতটুকু অসুবিধেও তোমার কোন দিন হবে না—তোমার সমস্ত অতীত সে ভুলিয়ে দিতে পারবে, ভবিষ্যৎকে মধুময় ক'রে তুলবে এ আমি জোর ক'রেই ব'লতে পারি।

সুধীর চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, আমি? কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব হয় না অক্ষয়। আমার স্ত্রী বর্ত্তমান আর তাকে আজও আমি ভুলতে পারিনি। আমার জীবন অভিশপ্ত ব'লেই স্বীকার ক'রে নিয়েছি, তাকে আর কোন কিছু দিয়েই জোড়া দিতে চাই না। সতী খুবই ভাল, এদেশে ভাল মেয়ের অভাব কোনদিনই হবে না সে আমি জানি, কিন্তু আর কোন ভালকেই গ্রহণ ক'রবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই।

অক্ষয় বলিল, তোমার কাকা কিন্তু আশা করেন যে, তুমি বিয়ে ক'রবে।

সুধীর বলিল, তাঁর সে আশার কারণ?

অক্ষয় বলিল, তিনি ভেবেছেন তাঁর চিঠি পেয়েই তুমি এসেছ।

একটু বিরক্ত হইয়া সুধীর বলিল, সে ধারণা তাঁর ভুল প্রমাণ ক'রে দিলে না কেন? তুমি ত' সমস্তই জান। এখানে আমি একটু বিশ্রাম নিতে এসেছি একথা স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিলে না কেন?

অক্ষয় বলিল, আমার মনেও একটু ভরসা ছিল তাই তাঁর এতবড় আশাটা ভেঙ্গে দিতে পারিনি।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, এখনও সে ভরসা আছে কি?

অক্ষয় বলিল, না।

(ক্রমশ)

গান

শ্রীমমতা ঘোষ

পাব কি এখন প্রবেশের পথ,
খোলা কি দুয়ারখানি?
তোমার জগত পূর্ণ এখন
লইয়া দুইটি প্রাণী।
কত না দিবস ছিল কামনায়,
স্বপনের মাঝে দেখেছ যাহায়,—
তারি সাথে আজ মধুর ভাষায়
চলে কত কানাকানি।

নির্জন ঘরে গুঞ্জন চলে—
প্রণয়-আলাপ-রত
দুইটি চিত্ত আস্বাদ করে
অনুভূতি আজ কত।
প্রতিদিন আনে নবীন হরষ,
পরাণেতে ঢালে নব নব রস;
জীবন-বাসরে মনে মনে হয়
মনোহর জানাজানি।

৯১ বনাম ৭৪

গত মাসে ব্রিষ্টলে কোনও বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার বিবাহ হয়। স্বামী উইলিয়ম সেপার্ড, বয়স ৯১; পত্নী মিসিস্ এলিস ব্রাউন, বয়স ৭৪ বৎসর। এলিসের যখন মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়স, তখন তাহার বন্ধুত্ব হয় উইলিয়মের সঙ্গে। তথাপি উইলিয়মের সঙ্গে এলিসের বিবাহ সেকালে হইতে পারে নাই; তাহার বিবাহ হয় ব্রাউনের সঙ্গে। সেপার্ডও বিবাহ করে। তবু বিবাহ উভয়ের নিবিড় বন্ধুত্বে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ষাট বৎসর ব্যাপিয়া এই বন্ধুত্ব অটুট থাকে।

১৯৩৫ সালে সেপার্ডের স্ত্রী মারা যায়। এলিসের স্বামী ব্রাউন মারা যায় ১৯৩৭ সালে। কিন্তু ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এলিসের জীর্ণ বাড়ীখানি সরকার হইতে নিষিদ্ধ করা হয় বাসের অনুপযুক্ত বলিয়া। চিরজীবন উভয়ে ব্রিষ্টলে বাস করিয়া পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বের টান এমন সজীব রাখিয়াছিল যে, এলিস গৃহহীন হইবে শুনিবামাত্র ৯১ বৎসর বয়স্ক উইলিয়ম এলিসের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে, প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং উইলিয়ম এলিসকে সগৌরবে বিবাহ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসে।

উহারা উইলিয়মের আবাসেই মধুচন্দ্র যাপন করিতেছে — শয্যাটিকে ফুলে ফুলে ছাইয়া ফেলিয়া।

খেলোয়াড়ের অন্ধ সংস্কার

গল্‌ফ চ্যাম্পিয়ান রেগ হুইটকম্ব, সেণ্ট য়্যাণ্ডরুজ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার জন্য বন্ধু সহ ছাতা হস্তে গল্‌ফ মাঠের দিকে যাইতেছিল। বন্ধু এবং তাহার সমর্থকগণ সকলেই নিশ্চিত যে, সে তাহার এতকালের গল্‌ফ খেলার কৃতিত্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইবে। হঠাৎ পথিমধ্যে ছাতাটি হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া যায়। তৎক্ষণাৎ রেগ নত হইয়া ত্বরিতে ছাতাটি তুলিয়া লইতে উদ্যত হয়। সঙ্গের বন্ধুটি যেমন সেয়ানা তেমনই হুঁসিয়ার—রেগকে উবুড় হইয়া রাস্তা হইতে ছাতা কুড়াইতে দেখা মাত্র, বন্ধুটি অকস্মাৎ এক ধাক্কায় রেগকে সরাইয়া দেয় ছাতা হইতে দশ হাত দূরে। তাহার পর বন্ধু স্বয়ং ছাতাটি কুড়াইয়া লইয়া চীৎকার করিয়া বলে,—কর কি, কর কি! আজ না তোমার প্রতিযোগিতার দিন। আজ এমনভাবে ঝুঁকিয়া ছাতা কুড়ান যে অপয়া তা বুঝি মনে নেই। তুমি কি শেষকালে প্রতিযোগিতায় দুর্ভাগ্য বরণ করতে চাও। যাও, ছাতা রইল আমার কাছে। খেলা শেষ হবার আগে আর উহা তুমি ছুঁতেও পাবে না।

সেদিন প্রতিযোগিতায় রেগ আশ্চর্য্য স্কোরে জয়লাভ করে এবং সেণ্ট য়্যাণ্ডরুজ গল্‌ফ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ট্রফি অর্জ্জন করে।

জীবনসঙ্গীর প্রতি দরদ

১৯৩২ সালে ১২০০ পাউণ্ড ব্যয়ে একজোড়া গরি[illegible] লণ্ডন চিড়িয়াখানায় আনা হয় ফরাসী কঙ্গো হইতে। উ[illegible] মোরদটার নাম দেওয়া হয় 'মক' (Mok) এবং গরিলাটির [illegible] করণ হয় 'ময়না' (Moina)। উহারা নিবিড় দাম্পত্য [illegible] রাগে বসবাস করিতে থাকে। একবার একটি শাবকও হ[illegible] ছিল ময়নার, কিন্তু উহা অকালেই কালগ্রাসে পতিত [illegible] ময়না যখন প্রথম [illegible] প্রবেশ করে তখন তাহার বয়স [illegible] কিম্বা পাঁচ বৎসর। [illegible] সুখশান্তিতেই উহাদের দিন [illegible] যাইতেছিল, কিন্তু ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে 'মক' প্রাণ হারায়। [illegible] ময়না পীড়িত অবস্থায়ই [illegible] জীবনসঙ্গীর [illegible] যে [illegible] ময়নাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] মৃত্যুর পর [illegible] শিম্পাঞ্জীকে ময়নার সঙ্গী করিয়া [illegible] হইয়াছিল, কিন্তু ময়নার তাহা পছন্দ হয় নাই। কাজেই শিম্পাঞ্জীকে সরাইয়া [illegible], পাছে ময়না রাগের বশে [illegible] হত্যা করিয়া ফেলে। ময়নার ওজন ক্রমশ কমিতেছে, সে [illegible] বেশী দিন জীবিত থাকিবে না। উহার প্রধান রোগ— [illegible] ঘা।

বিচিত্র ব্যাপার এই যে, সে[illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] বাহিরে [illegible], কিন্তু [illegible] [illegible] করিয়া দিলে সে [illegible] করিতে পারে না। [illegible] তাহার পিছন দিকে মাত্র ময়না একটানে সে [illegible] [illegible] উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

চিড়িয়াখানায় আপন কক্ষের ভিতরে যে শয়নস্থান [illegible] দর্শকের নয়নের অন্তরালে অবস্থিত, সেখানেই ময়না [illegible] হইয়া শুইয়া থাকে দিনরাত। আবার সময়ে ঐ প্রকার শ[illegible] অবস্থায় বাম হাঁটু খাড়া করিয়া তাহার উপর ডান পা-খা[illegible] তুলিয়া দিয়া ঠিক মানুষের মতই আরাম করে।

চিড়িয়াখানার দর্শকেরা যাহাতে শোকসন্তপ্ত ময়না[illegible] বিরক্ত বা উত্ত্যক্ত না করে, সেজন্য উহাদের কামরার সম্মু[illegible] নোটিশ টাঙান আছে—

"ময়না সাময়িক অসুস্থতায় শয্যাগত; শয়নাগা[illegible] নির্জ্জনতা কেহ ভঙ্গ করিবেন না।"

কেহই আর স্ত্রী গরিলাটির দেখা পায় না। কেবল র[illegible] যখন খাবার বা ঔষধ আনে, তখন ময়না উঠিয়া আসে না[illegible] সে শুইয়াই থাকে অহরহ।

আসামে ভাওনা নৃত্য ও গীত

ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ

ভারতের সকল প্রদেশেই প্রাচীনকাল হইতে নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারায় নৃত্য-গীত চলিয়া আসিয়াছে। প্রদেশভেদে কিছুটা উহার প্রকৃতিতে পার্থক্য আজ দেখা গেলেও, মূল সুর কিন্তু সাধারণভাবে ভারতীয় বৈচিত্র্যের গণ্ডী পার হইয়া যায় নাই। তবে একটা কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নৃত্যের বৈশিষ্ট্য সকল প্রদেশে সমান রক্ষিত হয় নাই, অধিকন্তু কোন কোন প্রদেশের সভ্য নরনারী উহাকে কতকটা আধুনিক কালে পরিহার করিয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আবার স্রোত ফিরিয়াছে। প্রাচীন নৃত্যের ধারা পুনঃপ্রবর্ত্তনে সুষ্ঠু প্রয়াসই চলিয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের নৃত্য, নেপালের দেবদাসী নৃত্য, ব্রহ্মের পোয়ে নৃত্য আজ যতটা প্রসার লাভ করিয়াছে আসামের ভাওনা নৃত্য ও গীত অবশ্য সেই হিসাবের বিশেষত্বপূর্ণ নয়। তথাপি ঐ নৃত্য ও গীতের অভিনবত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই আসামে আসিয়া শুনিতেছিলাম। প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ মিলিতেছিল না। আসামবাসীদের মুখের কথায় ভাওনা নৃত্য ও গীতের নূতনত্বের প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণই অনুভব করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে শারদীয়া পূজা আসিয়া পড়িল। শুনিতে পাইলাম ডিব্রুগড় জ্ঞানদায়িনী সভায় যে বৎসরে বৎসরে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেই উপলক্ষে সেখানে এবার নবমী পূজার দিন আমার আকাঙ্ক্ষিত ভাওনা নৃত্য ও গীত হইবে। এ সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করা হইবে না। তাই আশান্বিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

নবমী পূজার দিন কয়েকজন বন্ধু সহ ভাওনা নৃত্য-গীতের আসরে যাইয়া বসিয়া গেলাম। নৃত্য-গীত-অভিনয় প্রভৃতির সূচনায় প্রথম দেখা দিল বন্দনা-গায়ক একটি। সে সংস্কৃত ও আদিম অসমীয়া ভাষায় রচিত বন্দনা-গীতি গান করিতে করিতে আসরে নৃত্য আরম্ভ করিল। গান অসমীয়া ভাষায় রচিত হইলেও আমার বুঝিতে বেগ পাইতে হয় নাই। নৃত্যের ছন্দ ও ভঙ্গী ভালই লাগিল; কিন্তু যে বাদ্য দ্বারা উহার সহিত সংগত করা হইতেছিল, তাহা যেমন কর্কশ তেমনই উচ্চরবে কর্ণপটাহবিদারক। আমরা কলিকাতায় সচরাচর বিহারী বা যুক্ত প্রদেশীয়দের যে সমবেত গানের সঙ্গে তুমুল করতাল-কাঁসর প্রভৃতির কানে-তালা-লাগা ঝঙ্কার শুনিয়া থাকি, এই ভাওনা নৃত্যের সঙ্গীয় বাদ্য কেবল উহার সহিতই তুলনীয়।

সূচনার গায়ক শুধু বন্দনা গাহিয়াই ক্ষান্ত হইল না, সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করিল যে, "গয়াসুরের বিষ্ণুপাদপদ্মলাভ" এই পালাকেই ভাওনা নৃত্য-গীত-অভিনয়ে রূপ দেওয়া হইবে। সেই হিসাবে 'ভাওনা'কে আমাদের 'কৃষ্ণযাত্রা'র সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

বাঙলাদেশের যাত্রার ন্যায়ই পোষাক-পরিচ্ছদগুলি যথাসম্ভব প্রাচীন কালের অনুরূপই করিবার চেষ্টা হইয়াছে; তবে আধুনিক ফ্যাশানও উহার সহিত যে কিছু মিশ্রিত না হইয়াছে এমন নহে।

পালার আরম্ভে দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের পৃষ্ঠারোহণে উপস্থিত। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রত্যেক অভিনেতাকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া সাজ-ঘর হইতে আনিয়া আসরে দাঁড় করান হয়। তখন আবরণের বস্ত্র খুলিয়া তাহার সজ্জিত মূর্ত্তি দর্শকগণের চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করা হয়। তখন সেই সেই অভিনেতা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট নৃত্যে গান অথবা অভিনয় করিতে আরম্ভ করে। গরুড় সেই অবস্থায় কৃষ্ণকে স্কন্ধে লইয়া যথাসাধ্য নৃত্য করিল। শ্রীমতী রাধিকা নাচিতে নাচিতে কৃষ্ণের অনুসরণ করিল। গরুড় অবশ্য বেশী সময় এইভাবে নৃত্য করিতে পারিল না, পরিশ্রান্ত হইয়া কৃষ্ণকে পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া দিল। তখন সে মুক্ত পক্ষ বিস্তার করিয়া নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিল।

সকল নৃত্যের সময়ই ৮।১০টি মৃদঙ্গ এবং তাহার যোগ্য সংখ্যায় কাঁসর ও করতাল বাজিতেছিল। প্রত্যেক অভিনেতাই সূচনায় কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া পরে গান অথবা অভিনয় (অর্থাৎ বক্তৃতা) সুরু করে। তবে সকল নৃত্যের ভিতরই সূক্ষ্ম অঙ্গ সঞ্চালন অপেক্ষা শারীরিক কঠোর কসরতের বাহুল্যই অধিক।

গানের সুরের ভিতর অভিনেতাভেদে বৈচিত্র্য বিশেষ কিছুই শোনা গেল না। প্রায় একই জাতীয় সুরেই যেন সকলগুলি গান গীত হইতেছিল। কিন্তু নৃত্য সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। তবে সকলগুলি নৃত্যই যে নিছক প্রাচীন ধারার প্রতীক, এমন নয়; উহাতেও আধুনিকতার ছাপ পড়িয়াছে কিছুটা। তথাপি নায়িকার ভূমিকায় যে নৃত্য, তাহাতে যে খাঁটি সেকালের ভারতীয় নৃত্যপদ্ধতির মূল ছন্দটি রহিয়াছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

মোটের উপর আর্ট হিসাবে এই নৃত্য উচ্চাঙ্গের না হইলেও উহার মজ্জায় রহিয়াছে ভারতীয় বিশিষ্ট সুর এবং উহা হইতে সেকালের নৃত্যদ্বারা নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিবার রীতিটি ভালরূপেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

সবার উপর একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতে যে সকল লোক-সঙ্গীত প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে নৃত্য ও গীত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাদ্যের সহযোগ ব্যতীত কোনও গান প্রায় গীত হইত না, সুতরাং গানের সুরের ভিতরে নৃত্যের তাল লুক্কায়িত থাকিত। আবার শুধু নৃত্যের প্রচলন হইলেও তাহার সহকারী বাদ্য যেমন থাকিত, তেমনই একটি সুরও থাকিত সমগ্র ব্যাপারটা সুনিয়ন্ত্রণের জন্য। এইভাবে ভারতীয় লোক-সঙ্গীত, পুরাণ-গান প্রভৃতিতে নৃত্য-গীত-বাদ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে বিদ্যমান। উহার সহিত অভিব্যক্তি বা অভিনয় বক্তৃতা যোগ দিলেই আমাদের পুরাণ-গান বা পল্লী-গীতির পালাসমূহের স্বরূপ আমরা পাই—যাহা বর্ত্তমানে যাত্রার আকারে আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। উপরি উক্ত আসামের 'ভাওনা নৃত্য'ও তেমনি নাট্যভাবের যোগাযোগে আধুনিক 'যাত্রা'র স্থানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। সমগ্র ভারতে যে প্রদেশেই যাওয়া যাক, এই সকল পুরাণ গানের মূলসূত্র যে এক তাহা উপলব্ধি করিতে বেগ পাইতে হয় না।

দাম্পত্য

(গল্প)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

কুলকুচো করতে গিয়ে আজ আবার একটা দাঁত পড়ল সৌদামিনীর। বাকি রইল আর তিনটে ডান পাশের মাড়ীর দিকে। অভ্যাস মত দাঁত তিনটির ওপর সস্নেহে আর একবার সৌদামিনী জিভ্ বুলাল, তিনটির গোঁড়াই ঢিলে হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে পড়ে যেতে পারে। যাক্ গেলে আপদ যায় একেবারে। একদিন দুদিন নয়, আজ তিন বছর যাবৎ শশধরকে বলে বলে সৌদামিনী হায়রান্ হয়ে গেছে, দাঁত আজকাল কে না বাঁধায়। অনেকে ত রীতিমত শক্ত দাঁত পর্য্যন্ত তুলে ফেলে দাঁত বাঁধিয়ে আসে সুন্দর দেখাবে বলে। কিন্তু সে ত আর সখের জন্য দাঁত বাঁধাতে চাইছে না, সাধ আহ্লাদের আশা বিয়ের [illegible]র থেকেই সে বিসর্জ্জন দিয়েছে। সখের জন্য নয়, এক ফোঁটা পান পর্য্যন্ত ভাল করে খেতে পারে না সৌদামিনী। আর তা ছাড়া শশধরের যেখানে একটা কি দুটো দাঁত মাত্র পড়েছে সেখানে ঝর ঝর করে সবগুলো দাঁতই তার পড়ে গেল এ কি ভাল দেখায়? যে দেখে সেই হাসে, শশধরের চেয়ে দ্বিগুণ বুড়া দেখায় সৌদামিনীকে। অথচ বয়স তার এখনও চল্লিশ পেরোয়নি, শশধরের যদিও পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

আজও সৌদামিনী একবার দেখে চেষ্টা করে কিন্তু কোন যুক্তিতর্কেই শশধর কান দেয় না। পরের গায়ে ব্যথা তাতে শশধরের কি। হেসে বলে, 'আমার দাঁত পড়ছেনা এই ত তোমার দুঃখের কারণ বড়বউ। তা আর কিছুদিন অপেক্ষা কর ধৈর্য্য ধরে, আমিও তোমার সমান হব।'

রাগ সৌদামিনী প্রকাশ হতে দেয় না। বরং আরও মোলায়েম আরও করুণভাবে মিনতি করে বলে, 'কিন্তু সত্যিই বড় বিশ্রী দেখায় লোকে কি ভাবে বল দেখি?'

এর উত্তরে শশধর বলে, 'লোকের ভাবা-ভাবি দেখা-দেখিতে কি এসে যায় বড়বউ? আমি ত এখনও তোমাকে সুন্দর দেখি, আর লোকে বুড়ি বল্লেই কি তুমি বুড়ি হয়ে গেলে? আমার নিজের ত একটা হিসাব আছে, আমি ত জানি তুমি আমার চেয়ে দশ বার বছরের ছোট। কেবল চব্বিশ ঘণ্টা পান খেয়ে খেয়েই না অকালে তোমার দাঁতগুলি গেল।'

সৌদামিনীর আর সহ্য হয় না। 'পান খেয়ে খেয়ে? তোমার সংসারে একটার বেশী দুটো পান কোনদিন জুটেছে নাকি কপালে? সেই ভাগ্য নিয়েই এসেছি কিনা, বেরিবেরি হওয়ার পর থেকেই ত দাঁতগুলি গেল এভাবে। কিন্তু তোমার এত আপত্তিই বা কিসে শুনি? কোন দিন সোনা গয়না ত তোমার কাছে চাইনি, আর চাইবও না কোন দিন। দাঁত বাঁধাতে তোমার লাখ খানেক টাকা লাগবে না আর।'

শশধরেরও আর সহ্য হয় না, দাঁত খিঁচিয়ে বলে, 'এক পয়সা লাগুক না কেন, তাই বা আসে কোত্থেকে! গরীবের ওসব ঘোড়া রোগ পোষাবে না। বক্-বক্ ক'র না যাও।'

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি সরে আসে শশধরের হাতের কাছ থেকে, বিশ্বাস কি দু' এক ঘা বসিয়ে দিলেই হ'ল। মাত্র এই ক' বছর যাবৎ শশধর গায়ে হাত তোলে না সৌদামিনীর, আগে এমন দিন খুব কমই যেত, যেদিন স্বামীর লাথি চড় পড়ত না তার পিঠে। সৌদামিনী সরে আসে কিন্তু যায় না একেবারে। খিঁচাবার মত দাঁত এখন আর তার নেই, কিন্তু রাগে সেকথা তার মনে থাকে না। অভ্যাস মত ভেংচি কাটতে গিয়ে দন্তহীন কালো আর উঁচু মাড়ীর খানিকটা বেরিয়ে আসে, কুৎসিত ভঙ্গিতে হাত নাচাতে নাচাতে বলে, তা ত জানিই, আমি ত কেবল বক-বকই করি, যার কথা গুড়ের মত মিষ্টি,.....

শশধর বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলে, 'চুপ-চুপ।'

তার যৌবনের এই একটি দিনের অসংযমের কাহিনীই সৌদামিনীর সব চেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। সে জানে এই দিনটির লজ্জাকর স্মৃতি শশধর সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখতে চায়, ভুলে যে চায়। কেন-না কৃপণ বলে একটু দুর্নাম থাকলেও সমাজে [illegible] সচ্চরিত্রতাকে সকলে সম্মান করে। দরিদ্র হয়েও, সকলের [illegible] শ্রদ্ধা আর সম্মানের বলেই মোড়লী পেয়েছে সে গ্রামের পরামাণি[illegible] সমাজে। সামান্য অসংযমের জন্য সমাজের বিভিন্ন বয়সের স্ত্র[illegible] পুরুষকে নির্ম্মমভাবে সে শাস্তি দিয়েছে। আর শাস্তি য[illegible] কঠিন হয়েছে সমাজের শ্রদ্ধাও সে তত বেশী করে পেয়েছে[illegible] সে ঘটনার সাক্ষী কাছে-ধারে কেউ আর নেই শুধু সৌদামিন[illegible] ছাড়া। গোকুল ধোপা এ গ্রাম থেকে কোথায় উঠে গেছে। পাড়া[illegible] আর যারা জানত তাদের অনেকেই আর বেঁচে নেই, যারা আ[illegible] তাদের কারোরই আর এখন সাহস হবে না সে সব কথা তুলতে[illegible] কিন্তু শশধরের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন এখন ঘর সামলান। শশধ[illegible] নরম হয়ে বলে, আহা-হা, চুপ কর্ বড়বউ, চুপ কর্, তোর দাঁ[illegible] গেছে কিন্তু দাঁতের বিষ যায় নি।'

'এ বিষ যাবেও না, যতদিন দাঁত বাঁধিয়ে না দিবি।'

শশধর জানে এই দাঁত বাঁধাবার খেয়াল কোত্থেকে এসে[illegible] সৌদামিনীর। বাঁড়ুয্যে বাড়ীর সেজো গিন্নি নাকি দাঁত বাঁধি[illegible] এসেছে কল্‌কাতায় গিয়ে। চমৎকার দেখতে। মুক্তোর মত সুন্দ[illegible] ছোট ছোট, একরকমের ঠিক বত্রিশটি দাঁত। সৌদামি[illegible] উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে অসংখ্যবার অসংখ্য রকমে বর্ণনা করেছে [illegible] দাঁতের। কিন্তু বড়লোকের যা মানায় গরীবের তাতে লোভ কর[illegible] কি চলে? তা ছাড়া শশধর ভেবে পায় না দাঁত বাঁধিয়ে লাভ[illegible] কি। লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে করে এ সম্বন্ধে সব তথ্যই সংগ্রহ করে নিয়েছে। পঞ্চাশ ষাট টাকা এর পিছনে খরচ করলে দাম এর শেষে কাণা-কড়িও থাকে না। এমন জিনিস নয় একজনের ব্যবহারের পর আর একজন ব্যবহার করতে পারে বিপদে-আপদে বন্ধক বা বিক্রি করা যায়। খরচ যতই হোক কেন এক পয়সা দিয়েও এ জিনিস শেষে রাখে না কেউ, তার চে[illegible] বরং এ টাকা দিয়ে সংসারের দু চারখানা আসবাব পত্র কিনলে কাজে লাগে। এ সব কথা সৌদামিনী বোঝে না কেন? অবু[illegible] মত কি যে তার একগুঁয়েমি। এখন যদি দু' পয়সা সঞ্চয় কর[illegible] পারে তা ত ছেলে বউর জন্যই থাকবে। একটি মাত্র ত ছে[illegible] যে দিনকাল আর যা ছেলের আয় তাতে কিছু রেখে না গেলে চালাবেই বা কি করে। পাঁচুরিয়ার মাইনর স্কুলে মাষ্টারী [illegible] কতই বা সে পায়। পঁচিশ টাকা লেখে পায় ত সতের টা[illegible] জাতব্যবসা করে এর চেয়ে ডবল আয় করে শশধর। আর টাকা-পয়সা ব্যয় করে ম্যাট্রিক পাশ করে সুবল তিন বছর [illegible] সেই সতের টাকাই ঘষছে। শশধরের ইচ্ছা ছিল না মো[illegible] ছেলেকে পড়াবার। বড় স্কুলে পড়ে ছেলের যে এই দশা হবে সে আগেই জানত। পড়াশুনা করে অহঙ্কার ছাড়া আর কি সুবা[illegible] বেড়েছে। অবশ্য এত লেখাপড়া শিখে সে আর জাত-ব্যবসা ক[illegible] পারে না শশধরের মত। কিন্তু তাই বলে বাপের ব্যবসাকে [illegible] ঘৃণার চোখে দেখাই কি তার উচিত! আর আজকাল ছেলেদের চ[illegible] লজ্জা বলে যদি কোন জিনিস থাকে। চাকরি পেয়েই বউ [illegible] চলে গেল পাঁচুরিয়া। রেঁধে খেতে নাকি তার কষ্ট গরীবের এত, বাবু হলে চলে? যাক্ যাতে সে সুখী হয় সে করুক।

এদিকে শশধরের ব্যবহারে আজ আবা[illegible] নতুন করে প[illegible] দাঁতগুলির শোক জেগে উঠ্‌ল সৌদামিনীর মনে। দাঁতের দুঃখই নয়, মনে হল সারা জীবনই তার দুঃখে দ[illegible] কেটেছে শশধরের হাতে পড়ে। যত গরীবই হোক না প্রত্যেকেই ইচ্ছা করলে কিছু না কিছু ভাল কাপড়-চোপড় দু' একখানা গহনাপত্র দিতে পারে স্ত্রীকে। স্ত্রীর এটা আবদার প্রত্যেক স্বামীই রেখে থাকে। কিন্তু গালাগালি

কিল-চড় ছাড়া আর কি দিয়েছে শশধর সৌদামিনীকে? না, দাঁত বাঁধাবার কথা কোনদিন সে আর বলবে না শশধরের কাছে। বলে কোন লাভ নেই। শশধর যে কোন দিনই রাজী হবে না তা সৌদামিনী ভাল করেই জানে। তার চেয়ে সুবল বাড়ী আসছে কাল গরমের ছুটিতে, তার কাছেই একবার বলে দেখবে। টাকা? টাকা সুবলের লাগবে না। দাঁত বাঁধাবার টাকা সৌদামিনী চার আট আনা করে ইতিমধ্যে জমিয়ে ফেলেছে। সুবল শুধু কলকাতায় তাকে নিয়ে যাবে এবং দাঁত বাঁধিয়ে আনবে। কলকাতা! আনন্দে রোমাঞ্চ হল সৌদামিনীর। কি চমৎকার, কি সুন্দর জায়গাই না কলকাতা, বাঁড়ুয্যেদের সেজোগিন্নির কাছে কত গল্পই না শুনেছে সৌদামিনী। কত রকমের আলো, গাড়ী ঘোড়া লোকজন এক আজবপুরী। তারপর যাদুঘর আর চিড়িয়াখানা যাতে দুনিয়ার সব রকমের জন্তু-জানোয়ার পুরে রাখা হয়েছে। এই উপলক্ষে সবই সৌদামিনীর দেখা হয়ে যাবে।

পরদিন দুপুরের কিছু আগে সুবল আর নির্ম্মলা এসে পৌঁছল নৌকা করে। সৌদামিনী ওদের উঠিয়ে আনতে গেল ঘাটে। চমৎকার একখানা শাড়ী পরেছে নির্ম্মলা, রামধনু রঙের; সত্যিই বেশ মানিয়েছে নির্ম্মলাকে। কিন্তু এ শাড়ী ত ওর ছিল না। সুবল বোধ হয় কিছুদিন আগে ওকে কিনে দিয়েছে। ওখানকার বাজারে নাকি নানা রকমের ভাল ভাল শাড়ী পাওয়া যায় আর খুব সস্তাও। বেশ বেশ, ছেলে বউ সুখে থাকলেই ভাল। সৌদামিনীর কি আর রঙীন শাড়ী পরবার বয়স আছে?

নৌকা থেকে নেমে দুজনেই একসঙ্গে প্রণাম করলে সৌদামিনীকে। তাড়াতাড়িতে সুবল আর নির্ম্মলার হাতে হাত লেগে গেল একটু। তা তিনজনের কারোরই লক্ষ্য এড়াল না।

সুবল বললে, 'ভাল আছ ত মা?'

নির্ম্মলা যেন প্রতিধ্বনি করল, 'মা ভাল আছেন ত?'

সৌদামিনী লক্ষ্য না করে পারলে না, কথা ওরা তার সঙ্গেই বলছে কিন্তু চোখ ওদের তার দিকে নয়, পরস্পরের দিকে।

সৌদামিনী বললে, 'তোমাদের একরকম থাকলেই হ'ল। সুবল তুই আগে আগে যা। বউমা এস আমার সঙ্গে। আর একটা কথা মনে রেখ বউমা, টাউন বন্দরে যাই কর না এটা পাড়াগাঁ। সাটপথ বেছে না চললে লোকে নিন্দা করবে।'

নির্ম্মলা একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেল। অবশ্য কারণ সে তৎক্ষণাৎ বুঝে নিল কিন্তু কোন জবাব দিল না।

টুকটাক জিনিষপত্র যা ছিল মাঝি নিয়ে এল মাথায় করে। শশধর হুঁকো টানা রেখে মাঝির মাথা থেকে সব একটা একটা করে নামিয়ে রাখতে লাগল। সুবল ধরতে এসেছিল কিন্তু শশধর বাধা হয়ে বলল, 'না, না, তোর আর আসতে হবে না, তুই বস গিয়ে ওখানে, আমিই নামিয়ে নিচ্ছি। তুই ততক্ষণ জামা খুলে বিশ্রাম কর।' একটা কাপড়ের পুঁটলি, একটা ছোট ট্রাঙ্ক, তারপরে একটা ভারী কাঠের বাক্স নামাতে নামাতে শশধর জিজ্ঞাসা করল, 'এর মধ্যে কিরে সুবল?'

সুবল ঠিক এই আশঙ্কাই করছিল, 'ও কিছু নয়, একটা ভাঙা হারমোনিয়াম!'

'হারমোনিয়াম! পেলি কোথায়?'

'কিনেছি আমাদের সেক্রেটারী বীরেনবাবুর কাছ থেকে। খুব সস্তাতেই পাওয়া গেছে বাবা। দশটাকা। আর তাও ক্রমে ক্রমে দিলেই চলবে।'

'কিন্তু দিতে ত হবেই! এ সব বাজে জিনিস কিনতে কে বলল তোকে? বউমার পরামর্শ বুঝি? হুঁ, মাথায় চুল নেই, ত টেরীর ঘটা! মাইনে ত পাস সতের টাকা কিন্তু বাবুগিরি আছে লাট সাহেবের মত।'

সুবল কি একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর শশধর জিজ্ঞাসা করল সৌদামিনীকে 'সুবল কোথায়?'

সৌদামিনী একটু অর্থপূর্ণভাবে হেসে বলল, 'কোথায় আবার?'

শশধরও হেসে জবাব দিল, 'আজকালকার ছেলে। ভালকথা ছেলে ত বড়লোক হয়ে এসেছে চাকুরি করে। দাঁত বাঁধাবার কথাটা তার কাছেই একবার বলে দেখ না।'

সৌদামিনী একটু চমকে উঠল প্রথমটা। মনের কথা কি করে টের পেল শশধর?

শশধর আবার একটু হাসল। বেশ যেন কৌতুক বোধ করছে সে। বলল, 'বুঝলে আমার সামনেই আজ বল কথাটা সন্ধ্যা-বেলায়। চাকুরে ছেলে, বিদ্বান ছেলে কি বলে একবার দেখি!'

ছেলে কি বলে তা শোনবার লোভ সৌদামিনীরও কম নয়।

সন্ধ্যা বেলায় নানা কথার পর সৌদামিনী তুলল দাঁত বাঁধাবার কথা, 'চাকরি বাকরি ত ক' বছর করলে বাপু, এখন দাঁত কটা আমার বাঁধিয়ে দাও। কিছু খেতে পারি না। আর যা খাই তাও কিছু কি হজম হয় না।

সুবল একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দাঁত ত এখানে বাঁধান যায় না মা।'

'এখানকার কথা ত বলছি না বাবা। কলকাতায় নিয়ে চল, ছুটি ত আছেই একমাস।'

'তা ত আছেই, কিন্তু কলকাতায় যাতায়াত তারপরে দাঁত বাঁধাবার খরচ সে বহু টাকার দরকার মা।'

শশধর একটু দূরে বসে বসে তামাক টানছে, একবার চোখ তুলে সৌদামিনীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। সৌদামিনীও একটু হাসল সেদিক চেয়ে। তারপরে সুবলের দিকে চেয়ে বললে, 'তা ত দরকারই বাবা, কিন্তু এদিকে কিছুই যে খেতে পাচ্ছি না, এভাবে না খেয়ে খেয়ে কদিন আর বাঁচব।'

সুবল একটু ভেবে বলল, 'আচ্ছা, কাল থেকে সেরখানেক করে দুধ রোজ করে দেব মা তোমার জন্য। দুধে সব রকমের ভিটামিনই আছে। শুধু দুধ খেয়েই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। আর তা ছাড়া দাঁত বাঁধায়েও কোন শান্তি নেই মা। খাওয়ার পর প্রত্যেকবার খুলে খুলে ধুতে হবে তিরিশ দিন। সে আবার আর এক উপসর্গ। কারো ফিট করে না, কারো যন্ত্রণা হয়, তার চেয়ে—'

শশধর আর একবার তামাক টানা থামিয়ে সৌদামিনীর চোখের দিকে চেয়ে হাসল।

রাত্রে শোবার সময় শশধর বললে, 'দেখলে ত? ছেলে রীতিমত ঘাবড়ে গেছে।'

সৌদামিনী বলল, 'ওর আর দোষ কি, ও টাকা পাবে কোথায়; পায় ত মোটে সতের টাকা।'

'তবু বাবুগিরি দেখ-না। নতুন শাড়ী, হারমোনিয়ম। আরে ইচ্ছা করলে তিনবার কলকাতায় গিয়ে তোমার দাঁত বাঁধিয়ে আনতে পারি।'

সৌদামিনী বলল, 'তা ত পারই, ও কিন্তু মনে মনে ভাবে তার মত তোমারও ক্ষমতা নেই।'

'না, নেই!' এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার দাঁত বাঁধিয়ে দেব আমি দেখে নিও। এক ছিলিম তামাক সেজে আন ত।'

তামাক টানতে টানতে একটু চুপ করে খানিকক্ষণ কান খাড়া করে থেকে শশধর বলল, 'রাত ত কম হ'লনা, ওরা কি আজ ঘুমাবে না?'

এবার সৌদামিনী অত্যন্ত লজ্জিত হ'ল। 'কি যে বল! যাই শুয়ে থাকি গিয়ে।'

শশধর বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, শোন, বস না এখানে। আচ্ছা দাঁত বাঁধিয়ে দিলে সত্যিই তুমি খুসী হও?'

বহুরূপী বাঙলা ভাষা

শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ

মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা এই তিন লইয়াই পৃথিবী বলিলে অতিরঞ্জিত হয় না। আমাদের দেশের সকল বড় সমস্যাই এই তিনকে কমবেশী জড়াইয়া আছে।

মা, অর্থাৎ মাতৃজাতি ও তাহার প্রগতি, মাতৃভূমি ও তাহার স্বাধীনতার কথা ছাড়িয়া দিলে পড়িয়া থাকে মাতৃভাষা —সেই কথাই এখানে বক্তব্য। জীবনের বাহন মা মাটীর মাতৃভূমিতে আমাদের লইয়া আসার পর হইতে যে ভাষায় আমরা নিজেদের প্রকাশ করিতে শিখি, তাহার প্রকৃত রূপ কি তাহা জানা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

ভারতবর্ষের ১৪৫টি ভাষার মধ্যে বাঙলা ভাষার উচ্চ স্থান আজ স্বীকৃত। অন্যান্য প্রদেশের ভাষাগুলি অপেক্ষা বাঙলা [illegible]ক বেশী সংখ্যক লোকের কথিত ভাষা। পৃথিবীর ভাষাগুলির মধ্যে বাঙলার স্থান সপ্তম। ইংরেজী, উত্তর চীনা, রুশ, জার্ম্মান, স্পেনীয় এবং জাপানী ভাষার পরেই আমাদের বাঙলা ভাষা।

পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত ভাষার মত বাঙলা ভাষারও নানা রূপ আছে। এই নানা রূপ হইবার একটা প্রধান কারণ বৈদেশিক প্রভাব। প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ বহুজাতির মিলনস্থল। আর্য্য, অনার্য্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হূন, মোগল, পাঠান, ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসিয়া বৈদেশিক রাজকীয় প্রভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, মামলা-মোকদ্দমা ও বিলাসিতার বেশবিন্যাসে জড়িত হইয়া ভারতীয় ভাষাগুলি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। এই বৈদেশিক প্রভাব যথোচিতভাবে গ্রহণ করিতে পারাই নাকি জীবন্ত ভাষার লক্ষণ। যে ভাষার এই ক্ষমতা নাই, সে ভাষা পরিবর্ত্তনশীল যুগের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে না। বাঙলা ভাষার এই গুণটি বিশেষভাবেই আছে। পোর্টুগীজ, ফরাসী, আরবী, পারসী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার সংস্রবে আসিয়া বাঙলা ভাষা অনেক বিদেশী শব্দ আপন করিয়া লইয়াছে। জানালা, ফিতা, বালতি, গামলা, চাবি, মাইরি, শানাই, শিশি, কলম, টেবিল, হোটেল, হ্যারিকেন, আলপাকা প্রভৃতি আজ বাঙলা কথা বলিয়াই সকলে জানে।

১৯শ শতকে বাঙলা ভাষা প্রভূত পরিবর্ত্তন লাভ করে। ইহার পূর্ব্বে দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির আড়ম্বর বাঙলা ভাষাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাদের ভীড় ঠেলিয়া বাঙলা ভাষার প্রকৃত রস পান করিতে হইত। ১৯শ শতকে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্সিগণের আমলে বাঙলা গদ্যের বিভিন্ন চারিটি রূপ দেখা যায়।

(১) সাহেবী বাঙলা (সাহেবদের লেখা):—

"প্রথমে ঈশ্বর সৃজন করিলেন, স্বর্গ ও পৃথিবী। পৃথিবী শূন্য এবং অস্থিরাকার হইল এবং গভীর উপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়মান হইল জলের উপরে।"

(২) পণ্ডিতী বাঙলা:—

"ইন্দুতে ইন্দীবর সুন্দর চিহ্ন চারুচ্ছবি বিস্তার করে। কামিনী কাঞ্চী মঞ্জীর মঞ্জুসিঞ্চিত করে।"

(৩) আদালত ও বিষয়কার্য্যে ব্যবহৃত বাঙলা:

"চাকলা একব্বরপুরের হরেকৃষ্ণ চৌধুরী আজ রায় জবরদস্তী করিয়া দখল করিয়া ভোগ করিতেছে। আ[illegible] মালগুজারীর সরবরাহতে মারা পড়িতেছি। উমেদের আমি ও এক চোপদার সরজমিনেতে গিয়া তোরফেনকে তল[illegible] দিয়া আদালত করিয়া এক দেলাইয়া দেন।"

উপরের তিনপ্রকার ভাষা ছাড়াও আর একপ্রকারের ভা[illegible] ছিল। ইহাতে আরবী ও সংস্কৃত শব্দ বেশী থাকিলেও ই[illegible] কথোপকথনের ভাষা ছিল। নিধুবাবুর টপ্পা গান ও দা[illegible] রায়ের পাঁচালী এই ভাষায় রচিত।

বর্ত্তমান বাঙলা ভাষার তিনটি রূপ বিদ্যমান, প্র[illegible] ভাষাকে গজনী বাঙলা বলা যায়। মুসলমান লেখকদের দ্ব[illegible] ইহাতে আরবী ও পারসী শব্দের বহু প্রয়োগ হইয়াছে। যথা

"আমার দাদীর তরে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।"

দ্বিতীয় প্রকার বাঙলাকে ইংরেজী বাঙলা নাম দেওয়া যা[illegible] যথা—

"মটরটা গ্যাসপোষ্টে ধাক্কা খেয়ে ফুটপাথের উপর পড়ে আছে[illegible]

তৃতীয় প্রকার প্রকৃত খাঁটি সরল বাঙলা, যথা—

"আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়
লুকোচুরির খেলা,
নীল আকাশে কে ভাসালে
শাদা মেঘের ভেলা।"

"রক্ষা এই যে, অত ক্ষীণ কণ্ঠ অতদূর কানে গিয়া পৌঁছ[illegible] না—না হইলে তাহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দুই ঘুচিয়া যাইত।"

ইহাই বর্ত্তমানের প্রকৃত বা আদর্শ বাঙলা। 'আলালে[illegible] ঘরে দুলালে' প্যারীচাঁদ যে ভাষা ব্যবহার করিয়া প্রথম বাঙ[illegible] উপন্যাস রচনা করেন, সেই ভাষাই বর্ত্তমানে আরও মার্জ্জি[illegible] ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃ[illegible] প্রতিভার জীয়ন কাঠির ছোঁওয়া লাগিয়া। বাঙলা ভাষ[illegible] অনবদ্য মূর্ত্তিকে আমরা এখন "দম্পতীর বিশ্রাম ক[illegible] বিরহিণীর শূন্য শয্যাপার্শ্বে, ঠাকুরমার মজলিসে এবং পল্লী[illegible] বনবীথিতে গমনাগমন করিবার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছি[illegible]

কিন্তু বিদেশে সাত সাগরের পারে বাঙালী লেখকের [illegible] ছড়াইলেও বাঙলা ভাষাকে এখনও সম্পূর্ণ প্রাণবান বলা [illegible] না। এর কারণ জাতির পরাধীনতা। স্বাধীনতার স্বাদ [illegible] পাইলে নবনব সৃষ্টি হয় না—একথা যেমন সত্য, তার স[illegible] এটাও কম সত্য নহে যে, জাতির দুর্দ্দাম ও সজীব সক্রিয়[illegible] না থাকিলে ভাষা সাহিত্যের জীবন ভরিয়া উঠে না। যু[illegible] ও অভিযান লইয়া, খনি ও সমুদ্র লইয়া, শ্রমিক ও কৃ[illegible] লইয়া, বায়োস্কোপ ও খেলাধুলা লইয়া যে কোন স্বাধ[illegible] দেশের লেখক গাদা-গাদা বই লিখিয়া নাম করিয়াছে। কি[illegible] এইসব লইয়া বাঙলা ভাষায় কয়খানা বই আছে? এত কোটি লো[illegible] লইয়া যাহারা যুদ্ধ কেমন জানে না, যাহাদের দেশে হিমাল[illegible] থাকিতে বিদেশ হইতে আসে অভিযানকারীর দল, যাহ[illegible] নিভৃত গহন-বনের প্রকৃতির সহিত কোনদিন পরিচয় করে [illegible] যাহারা সত্যকারের মরা বাঁচার মধ্যে পড়ে না, তাহাদের ভাষ[illegible] প্রকৃতই মন্দভাগ্য। কেরাণী ও বেকারের বৈচিত্র্যবিহীন আ[illegible] অধম জীবন লইয়া কতক্ষণ সাহিত্য চলে!

জার্ম্মানীর ডুবো জাহাজের উপদ্রব

ইংরেজের রণতরীর চাপে জার্ম্মানীর সম্পর্ক সমুদ্রপথে জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বলা যায়, এই নীতির বিরুদ্ধে জার্ম্মানী ডুবো-জাহাজের দ্বারা ইংরেজকে ঘরবন্দী করিবার চেষ্টায় আছে এবং জার্ম্মান ডুবো-জাহাজের উপদ্রব চলিতেছে। সেদিন জার্ম্মানী কোনরূপ সতর্ক না করিয়া দিয়া 'আথেনিয়া' জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। ছোট-খাটো কতকগুলি সওদাগরী জাহাজ জার্ম্মানীর আক্রমণে নষ্ট হইয়াছে।

সেদিন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, আমরা জার্ম্মানীর ডুবো-জাহাজের উপদ্রব বন্ধ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছি। ডুবো-জাহাজগুলিকে অনবরত আক্রমণ করা হইতেছে এবং বহুক্ষেত্রে সে-আক্রমণে সাফল্যলাভ হইয়াছে। এই সাফল্যের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িবে এবং কিছুদিন পরে ডুবো-জাহাজের উপদ্রবের কথা আর শুনা যাইবে না। জার্ম্মানী বুঝিতে পারিবে যে, ডুবো-জাহাজের সাহায্যে ইংরেজের বাণিজ্যপথ বন্ধ করিবার শক্তি তাহার নাই। কামান এবং উড়ো-জাহাজ যত সত্বর নূতন তৈয়ারী করিয়া লওয়া চলে, ডুবো-জাহাজ তত তাড়াতাড়ি তৈয়ার করা যায় না। গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে উড়ো-জাহাজের নির্ম্মাণ কৌশলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জল-যুদ্ধে ডুবো-জাহাজের বড় শত্রু সৃষ্টি হইয়াছে। উড়ো-জাহাজের আক্রমণ বন্ধ করিবার ক্ষমতা ডুবো-জাহাজের নাই—কেবল জলপথে উপকূলভাগে আত্মরক্ষার কিছু ব্যবস্থা ইহার দ্বারা করা সম্ভব হইতে পারে। উড়ো-জাহাজের আক্রমণ এড়াইতে হইলে ডুবো-জাহাজগুলিকে সেগুলির গাত্রসংলগ্ন ট্যাঙ্কে জল ভর্ত্তি করিয়া জলের নীচে ডুব দিতে হয়; কিন্তু নিরাপদভাবে ডুব দেওয়াই বড় সহজ ব্যাপার নয়; কারণ ঘণ্টায় তিনশত মাইল দ্রুতগতিতে উড়ো-জাহাজগুলি বেগে উড়িয়া আসিয়া ডুবিবার যথেষ্ট সময় পাইবার পূর্ব্বে ডুবো-জাহাজের উপর বোমা ফেলিতে পারে।

ডুবো-জাহাজ যদি সুকৌশলে উড়ো-জাহাজের আক্রমণ এড়াইয়া ডুব দিতে পারেও, তথাপি সে নিরাপদ নয়, কারণ উড়ো-জাহাজ অনেকটা জলের তলদেশে পর্য্যন্ত ডুবো-জাহাজকে লক্ষ্য করিতে পারে এবং লক্ষ্য করিয়া নিকটবর্ত্তী ডেস্ট্রয়ার বা ডুবো-জাহাজ-বিধ্বংসী রণপোতগুলিকে সঙ্কেত করিয়া পরামর্শ দিতে সক্ষম হয়।

কোন ডুবো-জাহাজ আক্রমণকারী রণপোত যদি ডুবো-জাহাজের সন্ধান পায়, তাহা হইলে ঐ ডুবো-জাহাজের অধ্যক্ষকে ভীষণ সঙ্কটে পতিত হইতে হয়; কারণ রণপোত হইতে ডুবো-জাহাজকে ধ্বংস করিবার জন্য 'ডেপ্‌থ্ চার্জ্জ' ছোড়া হইতে থাকে। ডুবো-জাহাজ তখন বাঁচিবার জন্য গভীর হইতে গভীরতম জলের নীচে চলিয়া যাইতে চেষ্টা করে। ডুবো-জাহাজ এই সময় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহার চতুর্দ্দিকে 'ডেপ্‌থ্ চার্জ্জ' ফাটিতে থাকে। প্রবল জলের আলোড়নে ডুবো-জাহাজ অবিরত হেলিতে দুলিতে থাকে; ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়া তাহাকে জলরাশি আন্দোলিত করিতে থাকে। ডুবো-জাহাজের কাছাকাছি বিস্ফোরণ ঘটিলে ডুবো-জাহাজ একেবারে উল্টাইয়া পড়ে, হাল ঠিক রাখা যায় না।

'ডেপ্‌থ্ চার্জ্জের' চেয়েও বেশী ভয়ের কারণ হইল—ডুবো-জাহাজ ধরা জাল; এইগুলির সঙ্গে মাইন লাগান থাকে এবং কাছে কাছে রণপোত থাকে পাহারা। মাকড়সার জালে মাছি পড়িলে তাহার অবস্থা হয় যেমন, কোন ডুবো-জাহাজ যদি অসতর্কভাবে এই জালের ভিতর আটকাইয়া পড়ে তবে তাহার দুর্দ্দশা হয় তেমনই। মাইন কিংবা ডেপ্‌থ্ চার্জ্জের হাত যদিও এক্ষেত্রে ডুবো-জাহাজ এড়ায়, তথাপি তাহার নিষ্কৃতি নাই; কারণ রক্ষিত বায়ু তাহার শূন্য হইয়া যায় জাল কাটিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই; সুতরাং তখন দম আটকাইয়া নিশ্চিত মৃত্যু।

ইহার পর আবার সাগরগর্ভস্থ পাহাড়ের ভয় আছে, ডুবো-জাহাজের মানচিত্রে এগুলি দেওয়া সম্ভব হয় না; উপর হইতে দেখিতে কোন বিপদের কারণ আছে মনে হয় না।

ডুবো-জাহাজের সঙ্গে লড়িবার সবচেয়ে কার্য্যকর উপায় হইল 'কনভয় সিস্টেম'। কতকগুলি রণপোত চক্রাকারে সওদাগরী জাহাজগুলি বেষ্টন করিয়া চলে। ঐ সব রণপোত শুধু যে ডুবো-জাহাজগুলিকে বিতাড়িত করে এমন নয়, নিমজ্জমান জাহাজের লোকজনকে রক্ষাও করিয়া থাকে। বিগত মহাসমরের শেষভাগে এই রীতিতে ডুবো-জাহাজ হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু বর্ত্তমান লড়াইয়ের প্রারম্ভ হইতেই এই ব্যবস্থা পাকাপাকি অবলম্বন করা হইতেছে।

ডুবো-জাহাজ জলের নীচ দিয়া ঘুরিতেছে শত্রুপক্ষের রণতরীর সন্ধানে। 'পেরিস্কোপ' যন্ত্রটি জলের রঙের সঙ্গে নিজের কাচের অঙ্গ মিশাইয়া ঢেউয়ের উপর ভাসিতেছে—ডুবো-জাহাজের ভিতর রহিয়াছে, পেরিস্কোপে প্রতিফলিত বৃহত্তর করিয়া দেখিবার ছাপা প্রতিক্ষেপণ যন্ত্র, এতদুভয়ের মধ্যে তারের দ্বারা যোগ রহিয়াছে। মনে করুন, হঠাৎ পেরিস্কোপের দর্পণে শত্রুপক্ষের জাহাজের চোঙার ছবি আসিয়া পড়িল, তখন তিনি কি করেন? তিনি টর্পেডো মারিবার জন্য তাগ্ করিতে থাকেন, স্ফূর্ত্তি হয় খুব; কিন্তু বিপদও আছে বিস্তর।

তৎক্ষণাৎ ডুবো-জাহাজ আরও জলের নীচে ডুবিয়া শত্রু-পক্ষের রণতরীর খোলের নীচে যায়—রণতরীর বেড়া-ব্যূহ অতিক্রম করিয়া ডুবো-জাহাজের অধ্যক্ষকে সওদাগরী জাহাজের কাছে যাইতে হয় এবং পরে পেরিস্কোপ আবার উপরে তুলিয়া তাগ্ করিতে হয়। ইহা করিতে গণিতবিদ্যার পাকা হিসাব আবশ্যক, দরকার সাহসের এবং হাল ও কলের কৌশলপূর্ণ চালনা দরকার। নহিলে এদিক-ওদিক হইয়া যায়। টর্পেডো ছুঁড়িবার পরও অনেক বিপদ, টর্পেডো ছুঁড়িয়া ডুবো-জাহাজকে অনেক জলের নীচে ডুব দিতে হয় এবং প্রহরী জাহাজগুলির খোলের নীচ দিয়া গলাইয়া হুঁসিয়ারীর সঙ্গে বাহির হইতে হয়। অবশ্য ঐ সময়ের মধ্যে উপরের রণতরী-গুলি হইতে খোঁজ খোঁজ পড়িয়া যায় এবং চারিদিকে 'ডেপ্‌থ্

একটি বৃটিশ সাবমেরিন

জাহাজটি অল্পের জন্য টর্পেডোর মুখ হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে
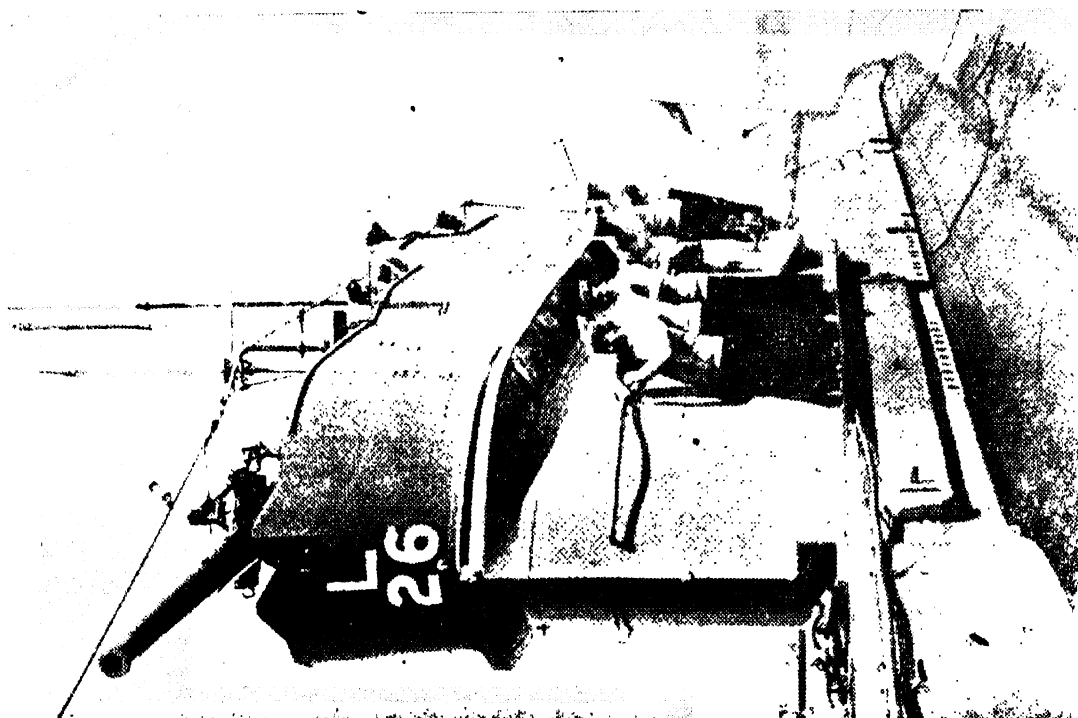
চার্জ্জ' ছোড়া হইতে থাকে। কাপ্তেন আর্নেষ্ট হাসাজেন ইংলণ্ডের ৬২নং ডুবো-জাহাজের অধ্যক্ষ স্বরূপে বিগত মহা-সমরে ব্যাপৃত ছিলেন। ৬০ ফুট জলের নীচে থাকিয়া ডুবো-জাহাজ কিরূপ জীবনযাপন করিতেছে, তাঁহার প্রদত্ত বিবৃতি হইতে তাহা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

রাত্রিকাল, আমরা সকলে ডুবো-জাহাজের মধ্যে নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন। পর্য্যবেক্ষণ কুঠরীর মধ্যে একজন কর্ম্মচারী পাহারা দিতেছেন। এক পার্শ্বে রহিয়াছে জলের গভীরতা মাপার লোক এবং অন্যদিকে রহিয়াছে হালওয়ালা। এঞ্জিনঘরে সব চুপচাপ। আমরা অতি মৃদুগতিতে অগ্রসর হইতেছিলাম। এঞ্জিন-ঘরের বেশীর ভাগ লোকই ঘুমাইতেছিল।

শুইতে যাইবার পূর্ব্বে আমি একখানা বই হাতে লইয়া কেবিনে ঢুকিয়াছিলাম। ক্রমে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম, বইখানা আমার হাত হইতে পড়িয়া গেল, চক্ষু বুজিলাম। কিন্তু ঘুম ষোল আনা হয় না, অভ্যস্ত কর্ণে জল-কলরোল আসিয়া ঢুকিতে লাগিল—বড় মাছের ডানা নাড়ার আওয়াজটা পর্য্যন্ত; হঠাৎ বড় রকমের একটা আওয়াজ কানের মধ্যে গেল—এ কি, নিশ্চয়ই ইহা কামানের আওয়াজ! না, কামানের আওয়াজ নয়—এ যে সমুদ্রের নীচে, তবে এ 'ডেপ্‌থ্ চার্জ্জে'রই বিস্ফোরণ! সমুদ্রের নীচে অনেক দূরের শব্দও নিকটে বলিয়া মনে হয়।

পরে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি তখন প্রভাত হয় নাই, আমার ভৃত্য আমাকে ডাকিয়া তুলিল। আমি চামড়ার জামাটা গায়ে টানিয়া দিলাম লোহার সিঁড়ি বাহিয়া চোঙের দিকে গেলাম এবং জলের উপরে ভাসিতে হুকুম দিলাম। যতদূর দৃষ্টি চলে চোখে কিছুই পড়ে না,—শুধু ঢেউয়ের উপর ঢেউ। আমরা কাফি খাইতে বসিলাম, সিগারেট চলিতে লাগিল। প্রভাত-সূর্য্যের প্রথম আলোকে সুস্পষ্ট দেখিলাম যে, আমরাই সমুদ্রবক্ষে একচ্ছত্র সম্রাট। আকাশ নির্ম্মল—চারিদিক শান্ত।

বেলা ১১॥টার সময় একটা জাহাজ চোখে পড়িল। কিছুক্ষণ পরে জাহাজখানা আর চোখে পড়িল না; বুঝিলাম যে, জাহাজখানার লক্ষ্য আমরাই; কিন্তু সেখানা আঁকিয়া বাঁকিয়া আসিতেছে। যাহাতে আমরা তাগ্ না করিতে পারি। আমাদের ডুবো-জাহাজ ডুব দিল, আমরা আগন্তুককে অভি-নন্দিত করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। জাহাজখানা নিকটে আসিলে দেখিলাম যে, সেখানা একখানা বড় মালটানা জাহাজ—পেরিস্কোপের উপর ছবি পড়িল।

কিছু সময় পর্য্যন্ত আমি জাহাজখানার কাছাকাছি জাহাজ চালাইয়া লইলাম; তাগ্ ঠিক করা কঠিন; আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে। কিন্তু আমাদের জাহাজের ৩৫০ গজের মধ্যে জাহাজখানা আসামাত্র আমি লক্ষ্যের সুবিধা লাভ করিলাম।

হুকুম দিলাম। বৈদ্যুতিক বোতামে টিপ পড়িল। আমাদের ডুবো-জাহাজখানা কাঁপাইয়া টর্পেডো বাহির হইয়া জলের ভিতর দিয়া জাহাজমুখো ছুটিল। দশ সেকেন্ড পরে মালটানা জাহজে বড় একটা ঝাঁকুনি লাগিল, তাহাতেই বুঝিলাম যে, টর্পেডো জাহাজের পেছন দিকে লাগিয়াছে। শ্রবণ-বিদারী একটা শব্দ—জাহাজের বড় বয়েলারটা ফাটিয়া গেল। সব নিস্তব্ধ!

ডুবো-জাহাজ চালাইলাম আরও কয়েক শত গজ দূরে। তারপর আমরা পেরিস্কোপ লক্ষ্য করিলাম। দেখিয়া অবাক্ হইলাম, মালটানা জাহাজ একেবারে যুদ্ধ-জাহাজে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—লড়াইয়ের তোড়জোড় বাঁধা!

ধীরে, অতি ধীরে—বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে আমি ব্যাপারটা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ডুবো-জাহাজখানাকে জাহাজের আরও নিকটে লইয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ আমার চারিদিকে কামানের গোলা আসিয়া পড়িতে লাগিল; কিন্তু আমার টর্পেডো জাহাজখানাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল, ২০ মিনিট পরে দেখিলাম যে, জাহাজের লোকেরা জালি বোটে উঠিতেছে—প্রাণ বাঁচাইবার দায়ে।

জার্ম্মানী সম্প্রতি যে-সব ডুবো-জাহাজ তৈয়ার করিয়াছে, সেগুলি আটলাণ্টিক অথবা ভূমধ্যসাগর যেখানে সেখানেই গতিবিধি করিতে সক্ষম। কিন্তু দূরে যাইতে হইলে তেল লইবার ঘাঁটি থাকা দরকার। একটা উপায় হইল ভাসমান তেলের ঘাঁটির ব্যবস্থা; সমুদ্রের কোন অজ্ঞাত স্থানে এই সব ভাসমান ঘাঁটি থাকে, ডুবো-জাহাজগুলি সেইখানে গিয়া তেল ভর্ত্তি করিয়া আসে। এইগুলিকে ট্যাঙ্কার বলা হয়। জার্ম্মানী সম্প্রতি কতকগুলি পুরানো ট্যাঙ্কার খরিদ করিয়াছিল। সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ডুবো-জাহাজ ১২ হাজার মাইল ব্যাসের মধ্যে পর্য্যন্ত কাজ করিতে পারে।
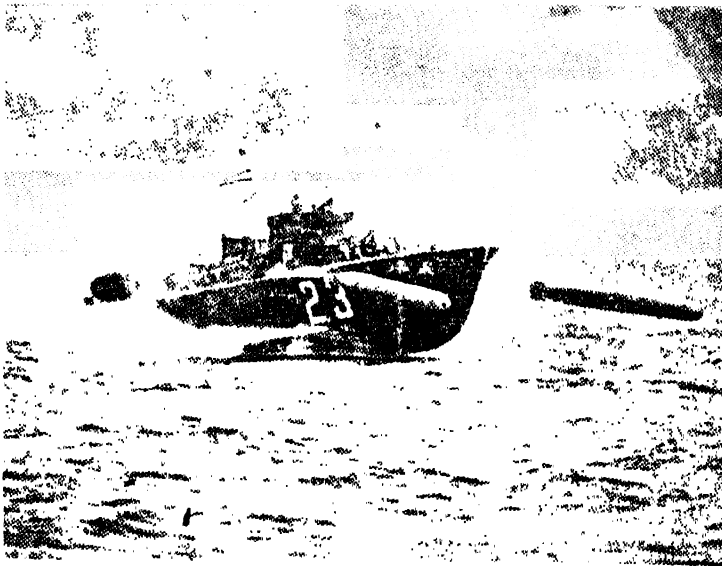
টর্পেডো বোট হইতে দুইটি টর্পেডো ছাড়া হইয়াছে

নিউ সিনেমা ও সিটিতে "কপালকুণ্ডলা"

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের "কপালকুণ্ডলা" গত শুক্রবার একই সময়ে নিউ সিনেমা ও সিটি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

"কপালকুণ্ডলা" হিন্দী ছবি, শ্রীফণী মজুমদারের পরিচালনায় তোলা। ইহার সঙ্গীতশিল্পী—পঙ্কজ মল্লিক, শব্দযন্ত্রী—শ্যামসুন্দর ঘোষ, আলোক চিত্রশিল্পী—দিলীপ দাশগুপ্ত, দৃশ্য সজ্জাশিল্পী—পরিচালক নিজেই, গান ও কথার রচয়িতা—আর্জু ও শোর। ইহাতে কপালকুণ্ডলার ভূমিকায়—লীলা দেশাই, নবকুমারের ভূমিকায়—নাজাম, মতিবিবির ভূমিকায়—কমলেশ

নিউ থিয়েটার্সের "কপালকুণ্ডলা" হিন্দি-চিত্রে মতিবিবির ভূমিকায় শ্রীমতী কমলেশকুমারী। ছবিখানি নিউ সিনেমা এবং সিটি সিনেমায় দেখান হইতেছে।

কুমারী, কাপালিকের ভূমিকায়—জগদীশ শেঠী ও অপরাপর ভূমিকায় পঙ্কজ মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী, রাণী, মনোরমা, পার্ব্বতী, সত্য মুখার্জ্জি প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনীপ্রসূত উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' এই তৃতীয়বার ছবির পর্দ্দায় রূপায়িত হইল। ইহার পূর্ব্বে এই উপন্যাস অবলম্বনেই একখানি নির্ব্বাক ও একখানি সবাক বাঙলা ছবি তোলা হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকন্যা প্রকৃতির সহজাত শিশু ও সীমাহীন তরঙ্গময়ী সমুদ্রের আজীবন ক্রীড়াসঙ্গিনী কপালকুণ্ডলা সংসারের লীলাকুটিল আবহাওয়া ও আবেষ্টনীর মধ্যে টিকিতে পারিল না, প্রকৃতির অহর্নিশ আহ্বানকে উপেক্ষা করিতে পারিল না, নিজেকে সেই বিরাট সত্তার মধ্যে মিলাইয়া দিল,—ইহাই ছবির আখ্যানবস্তুর মূল বিষয়। ফণী মজুমদারের পরিচালনায় ছবির এই নিগূঢ় উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া আমাদের মনে হয়, প্রকৃতির সঙ্গে সংসারী কপালকুণ্ডলার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক কল্পনা বা স্বপ্নের মধ্য দিয়া মূর্ত্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া, পরিচালক যদি তাহা আরও কয়েকটি বাস্তব ঘটনাবহুল দৃশ্যের অবতারণা করিয়া দেখাইতেন, তাহা হইলে আমাদের মনে হয় কপালকুণ্ডলার চরিত্র দর্শকদের মনে অধিকতর রেখাপাত করিত। এই দিকটা বাদ দিলে ছবিখানির পরিচালনা, বিশেষ করিয়া নূতন পরিচালক ফণী মজুমদারের কথা বিবেচনা করিলে, ভালই হইয়াছে।

অভিনয়ের দিক দিয়া ছবিটি মোটামুটি ভাল হইয়াছে বলিতে হইবে। নাম ভূমিকায় লীলা দেশাইর সহজ ও অনাড়ম্বর অভিনয়ে সংসারাসক্তিহীনা, নিষ্পাপ বালিকার চরিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সরল ও চরিত্রবান গ্রাম্য যুবকের ভূমিকায় নাজামের অভিনয় ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন। তন্ত্রসাধক কাপালিকের ভূমিকায় জগদীশের অভিনয় একেবারে অস্বাভাবিক হইয়াছে। কাল্পনিক কোনও কাপালিকের কণ্ঠস্বর ও গতিভঙ্গি অনুকরণ করিতে যাইয়া অভিনেতা স্বীয় স্বর ও অঙ্গভঙ্গি অধিকাংশ স্থানেই বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন, ফলে তাঁহার অভিনয়ে কৃত্রিমতা অতি নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কমলেশ কুমারীর কয়েকখানি নৃত্য খুবই উপভোগ্য হইয়াছে। তাঁহার সাবলীল ও লীলাচপল অঙ্গভঙ্গিমা প্রকৃত নৃত্যশিল্পীমনের দ্যোতক। পঙ্কজ মল্লিকের গানগুলিতে গায়কের দিক হইতে বিবেচনা করিলে, নূতনত্ব কিছুই নাই। অন্যান্যের অভিনয় একপ্রকার ভালই হইয়াছে। নবকুমারের ভগ্নীর ভূমিকায় পান্নার অভিনয় ও গান মন্দ হয় নাই।

ছবিখানির দৃশ্যপরিচালনায় নূতনত্ব এতটুকুও নাই। ইহার শব্দ ও আলোকচিত্র গ্রহণ প্রথম শ্রেণীর।

মিনার্ভা চিত্রগৃহে "পুকার"

ছবিখানি মিনার্ভা প্রডাকশান লিমিটেডের। বর্ত্তমানে নূতন নামধেয় মিনার্ভা চিত্রগৃহে দেখান হইতেছে।

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের ন্যায়পরায়ণতা, সম্রাট ও অলৌকিক রূপলাবণ্যময়ী নূরজাহানের প্রেমকাহিনী, রাজপুতকুল-তিলক সংগ্রাম সিংহের ত্যাগ ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি ছবির আখ্যানবস্তু।

ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন সোরাব মোদী এবং ইহার বিভিন্ন বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন পরিচালক নিজে, চন্দ্রমোহন, নাসিম, শীলা প্রভৃতি। ইহার বিভিন্ন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয় মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন, সহজ ও সরল এবং বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক বলিয়া অভিনয়ে অতিশয়োক্তি ও অলীকতা নাই বলিলেই চলে। সংগ্রাম সিংহের ভূমিকায় সোরাব মোদীর অভিনয় স্থানে স্থানে একটু প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে মাত্র। ছবিখানির সকলের চেয়ে প্রশংসার বিষয় ইহার দৃশ্যাবলী। দৃশ্যাবলী যেমন জমকাল, তেমনই ভারতের লুপ্তগৌরব স্থাপত্য-শিল্পকলার সুষ্ঠু নিদর্শন।

কয়েকখানি গান ইহার খুবই ভাল হইয়াছে। সংলাপের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভার ছাপ আছে। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ প্রথম শ্রেণীর না হইলেও বিশেষ কোন দোষ নাই। আবহ সঙ্গীতে নূতনত্ব নাই; বরং কয়েকস্থানে অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইয়াছে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আন্তঃপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে দুইটি খেলা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই খেলায় নবনগর দল শক্তিশালী বোম্বাই দলকে ৩৬ রাণে পরাজিত করিয়াছে। মাদ্রাজের খেলায় মহীশূর রাজ্যদল মাদ্রাজ দলের নিকট দুই উইকেটে পরাজিত হইয়াছে। উভয় খেলাতেই তীব্র প্রতিযোগিতা অনুভূত হয়। এই দুইটি খেলাতেই তৃতীয় দিনের চা পান পর্যন্ত খেলার জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ ক্রিকেট খেলায় উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইবার জন্য যে সাধনা করিতেছেন তাহার পরিচয় এই দুইটি খেলায় পাওয়া গিয়াছে। চৌকস বা অল-রাউণ্ডার খেলোয়াড়ের অভাব যে শীঘ্রই বিদূরিত হইবে তাহার প্রমাণ খেলোয়াড়গণ দিয়াছেন। ব্যাটিং বা বোলিং কোন বিষয়ই যে তাঁহারা অবহেলার চক্ষে দেখিতেছেন না তাহারও নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। দলের পতনমুখে ধীর স্থিরভাবে খেলিয়া কিরূপে দলের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্তের অভাব এই দুইটি খেলার মধ্যে ছিল না। ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বলময় তাহারই আভাষ খেলোয়াড়গণ দিয়াছেন।

বিজয় মার্চ্চেণ্টের অপূর্ব্ব দৃঢ়তা

বোম্বাই দল পরাজিত হইয়াছে কিন্তু বোম্বাই দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চ্চেণ্ট দলের অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য যে অপূর্ব্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। দলের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ এস এম কাদ্রি, হিন্দেলকার, নরীম্যান প্রভৃতি অল্প রাণে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, দলের পরাজয় একরূপ নিশ্চিত এইরূপ সময় খেলিতে নামিয়া পতন বন্ধ করত রাণ সংখ্যা বৃদ্ধি করা খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই বিষয় তদীয় ভ্রাতা উদয় মার্চ্চেণ্টের দানও উপেক্ষা করা চলে না। বিজয় মার্চ্চেণ্ট ২৬৭ মিনিট খেলিয়া ১৪০ রাণ করিতে সক্ষম হন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিজয় একবারও নিজেকে আউট করিবার সুযোগ দেন নাই। উদয়ও বিজয়ের ন্যায় খেলায় অপূর্ব্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃই শত রাণ পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ৯৪ রাণ করিয়া আউট হইতে হয়। মার্চ্চেণ্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের এই ক্রীড়াকৌশল দর্শকগণের মনে বহুদিন জাগরূপ থাকিবে। এই দুই ভ্রাতার পরেই বি জি খোটের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনিও দলের পতনমুখে নির্ভুলভাবে খেলিয়া ৫২ রাণ করিতে সমর্থ হন। ইহার পর বোম্বাই দলের অপর কোন খেলোয়াড় যদি এইরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে পারিতেন তবে খেলার ফলাফল বিপরীত হইত। কিন্তু নবনগর দলের সৌভাগ্য এমনই প্রবল ছিল যে, মার্চ্চেণ্ট ভ্রাতৃদ্বয়, খোটে প্রভৃতির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বোম্বাই দলকে পরাজিত হইতে হইল। নবনগর দলের মানকড়ের বোলিং বোম্বাই-য়ের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী হইয়াছে। তিনি ৮৭ রাণে ৪টি উইকেট দখল করেন।

এস ব্যানার্জ্জির প্রশংসনীয় খেলা

নবনগর দলের পক্ষে বাঙালী খেলোয়াড় এস ব্যানার্জ্জি ১০৬ রাণ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কলিকাতার মাঠে ব্যানার্জ্জি কয়েকবার শতাধিক রাণ করিয়াছেন কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলে ইহাই তাঁহার প্রথম শতাধিক রাণ। ২০৭ মিনিট খেলিয়া তিনি শতাধিক রাণ পূর্ণ করেন। তাঁহার এই কৃতিত্ব বাঙালী খেলোয়াড়ের সুনাম অনেকখানি বৃদ্ধি করিল। অমর সিং ৬৭ রাণ, মানকড় ৫৮ রাণ করিয়াও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। জয়েন্দ্রসিংহজীর শেষ সময় ৪৫ রাণও প্রশংসনীয়। বোম্বাই দলের তরুণ খেলোয়াড় তারাপোর ৯১ রাণে ৮টি উইকেট পতন সম্ভব করেন। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

নবনগর প্রথম ইনিংসঃ—৩৮৭ রাণ (এস ব্যানার্জ্জী ১০৬ রাণ, বি মানকড় ৫৮ রাণ, এল অমর সিং ৬৭ রাণ, এস মুবারক আলী ২৩ রাণ, **রণবীর সিংহজী ২২ রাণ**, আর ইন্দ্রবিজয় সিংহজী ৩০ রাণ, আর জয়েন্দ্র সিংহজী ৪৫ রাণ; গোদাম্বে ১১৩ রাণে ১টি, **কে তারাপোর ৯১ রাণে ৮টি**, আই বি খোটে ২০ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন।)

বোম্বাই প্রথম ইনিংসঃ—৩৫১ রাণ (বিজয় মার্চ্চেণ্ট ১৪০ রাণ, উদয় মার্চ্চেণ্ট ৯৪ রাণ, এস এম কাদ্রি ২৬ রাণ, জে বি খোটে ৫২ রাণ, কে নরীম্যান ১৫ রাণ, হিন্দেলকার ১০ রাণ; অমর সিং ৮৬ রাণে ২টি, এস ব্যানার্জ্জি ১০১ রাণে ২টি, মোবারক আলী ২৯ রাণে ১টি, মানকড় ৮৭ রাণে ৪টি উইকেট পাইয়াছেন।)

(নবনগর দল ৩৬ রাণে বিজয়ী)

মাদ্রাজ দলের কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডের খেলায় মাদ্রাজ দল দুই উইকেটে মহীশূর রাজ্যদলকে পরাজিত করিয়াছে। মাদ্রাজ দলের রাম সিং ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয় অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। একরূপ তাহার জন্যই মাদ্রাজ দল জয়লাভে সমর্থ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। তিনি মহীশূর দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩৫ রাণে ৫টি উইকেট দখল করেন। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতেও ৪৫ রাণে ৫টি উইকেট পান। মাদ্রাজ দলের প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৫৫ রাণ ও ৯১ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে অপূর্ব্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। তিনি উভয় ইনিংসেই মাদ্রাজ দলের দ্রুত উইকেট পতন রোধ করিয়া দলের রাণ সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। মহীশূর দলের দুইজন খেলোয়াড়ের নাম দারাশা ও রামকৃষ্ণাপ্পা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দারাশা মাদ্রাজ দলের প্রথম ইনিংসে ২৪ রাণে ৩টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৮ রাণে ৫টি উইকেট পতন সম্ভব করিয়াছেন। রামকৃষ্ণাপ্পা মহীশূর দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৬৩ রাণের মধ্যে একাকী ৯১ রাণ করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। খেলাটি বেশ দর্শনযোগ্য হইয়াছিল। পরবর্ত্তী রাউণ্ডে মাদ্রাজ দল হায়দরাবাদ দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে।

(মাদ্রাজ দল দুই উইকেটে বিজয়ী)

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেটে হিন্দু দল

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ১৫ই নবেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে। হিন্দু জিমখানা হিন্দু দলের খেলোয়াড়গণ মনোনীত করিয়াছেন। এই মনোনীত দলের মধ্যে মহারাষ্ট্র খেলোয়াড় রঙ্গেকারের স্থান হওয়া যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার স্থানে এইচ অধিকারীকে লইলে ভাল হইত। হিন্দু দল যে বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিম্নে মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

মেজর সি কে নাইডু (অধিনায়ক), ডি হিন্দেলকার, অমর সিং, সি এস নাইডু, এস ব্যানার্জ্জি, অমরনাথ, বিনু মানকড়, বিজয় মার্চ্চেণ্ট, এল পি জয়, কে রঙ্গেকার ও উদয় মার্চ্চেণ্ট।

অতিরিক্তঃ—এম জাগন্দেল, এইচ অধিকারী ও আর জে ঘারাট।

২৫শে অক্টোবর—

আরও পাঁচখানি বৃটিশ জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। চীলির ভালপ্যারাইসো হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে জার্ম্মান রণতরী ডুয়েটসল্যাণ্ডের আক্রমণে বৃটিশ ষ্টীমার ষ্টোনিগেট জলমগ্ন হয়। জিব্রাল্টারের নিকট টাফনা নামক একটি বৃটিশ জাহাজ জার্ম্মান ইউ-বোটের আক্রমণে জলমগ্ন হয়। ক্যানাচিসলম নামক একখানি বৃটিশ জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া গ্লাসগোতে সংবাদ আসিয়াছে এবং 'মোনিনরিজ' নামক একখানি বৃটিশ মালবাহী জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন যে, মার্কিন জাহাজ 'ক্রাউন সিটি' মোনিনরিজ জাহাজের পাঁচজন এবং 'সেডবেরী' নামক বৃটিশ মালবাহী জাহাজের সমস্ত নাবিককে উদ্ধার করিয়াছেন। ক্যানাচিসলম জাহাজ ডুবিতে ৬৩ জন ভারতীয় নাবিক মারা গিয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করেন যে, জার্ম্মানগণ কর্ত্তৃক আটক জাহাজ 'সিটি অব ফ্লিণ্ট'কে উদ্ধারের জন্য তিনি যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

২৬শে অক্টোবর—

কমন্স সভায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার সাপ্তাহিক বিবৃতি দেন। জার্ম্মান পররাষ্ট্র সচিব হের ফন রিবেনট্রপের বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া মিঃ চেম্বারলেন বলেন, "ইংলণ্ড জার্ম্মানীকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করে নাই। জার্ম্মানীর পররাজ্য লিপ্সার নীতি বৃটেনকে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছে।"

জার্ম্মানী এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াছে।

২৭শে অক্টোবর—

জার্ম্মানী সার সীমান্তে ৩০ ডিভিশন, হল্যাণ্ড সীমান্তে ১২ ডিভিশন এবং সুইস সীমান্তের বাসল ও কনষ্ট্যান্স হ্রদের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে ১২ ডিভিশন এবং ইতালী ও সুইস সীমান্তের সঙ্গমস্থল এবং কনষ্ট্যান্স হ্রদের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। ফ্রান্সে প্রেরিত বৃটিশ বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক লর্ড গর্ট ফ্রান্সস্থিত বৃটিশ সৈন্যের প্রধান ঘাঁটি হইতে রণাঙ্গন পরিদর্শনে যাত্রা করিয়াছেন।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, হের হিটলার বৃটেনের বিরুদ্ধে বিরাট আক্রমণ চালাইবার আয়োজন করিতেছেন।

২৮শে অক্টোবর—

জার্ম্মান বিমানবহর পুনরায় স্কটল্যাণ্ডের উপর হানা দেয়। ইষ্ট দালকিথে একটি জার্ম্মান বিমান ভূপাতিত করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে ৬৩—৩০ ভোটে নিরপেক্ষতা বিল গৃহীত হইয়াছে।

আমেরিকার উদ্দেশ্যে এক বেতার বক্তৃতায় বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড ঘোষণা করেন যে, বেলজিয়াম দৃঢ়তার সহিত তাহার নিরপেক্ষতা রক্ষা করিবে।

২৯শে অক্টোবর—

গতকল্য চেকোশ্লোভাকিয়ার সর্ব্বত্র চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে। লণ্ডনে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান উৎসবে ডাঃ বেনেসকে চেক জাতির নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লওয়া হয়।

পশ্চিম রণক্ষেত্রে আবহাওয়া খুব খারাপ ছিল। সার নদীর চতুর্দ্দিকস্থ নিম্ন ভূমিতে ও ভোসেজস অঞ্চলে তুষারপাত হয়।

লিথুয়ানিয়ান বাহিনী ভিলনা শহরে প্রবেশ করে।

৩০শে অক্টোবর—

শত্রুপক্ষের আক্রমণে তিনটি বৃটিশ জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ যে, নাৎসী পুলিশের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হের হিমলার নাৎসী কারাগারসমূহ হইতে বিরুদ্ধবাদীদের উচ্ছেদ সাধনকল্পে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রকাশ, এ পর্য্যন্ত সহস্রাধিক লোককে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

৩১শে অক্টোবর—

মস্কোতে সোভিয়েট সুপ্রীম কাউন্সিলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মঃ মলোটোভ বলেন, "বর্ত্তমান ইউরোপের বৃহত্তর শক্তিপুঞ্জের মধ্যে জার্ম্মান রাষ্ট্রই সত্বর যুদ্ধাবসানের ও জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌গ্রীব। আর বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ চালাইতে উৎসুক এবং শান্তি স্থাপন করার বিরোধী।"

ইতালীয় মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি সৈন্য বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। মন্ত্রিসভা নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। ছয়জন মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন। দুইজন জার্ম্মান-ভক্ত মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।

প্যারিসের খবরে প্রকাশ যে, জার্ম্মান জেনারেল ফন ব্রাউশিচ পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ডাঃ সাখ্‌ট জার্ম্মানী হইতে পলায়ন করিয়াছেন।

ফরাসী সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মোসেল ও সারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিশেষ তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। একটি পর্য্যবেক্ষণকারী বিমানপোত ভূপাতিত করা হয়। সার রণক্ষেত্রে জার্ম্মান ব্যূহের উপর দুইটি জার্ম্মাণ বিমান বিকল হইয়া যায়। সব কয়টি ফরাসী বিমান ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসে।

১লা নবেম্বর—

বৃটেন সমুদ্র অবরোধ করায় বর্ত্তমানে যেসব জার্ম্মান বাণিজ্য জাহাজ সোভিয়েট বন্দরসমূহে আটক রহিয়াছে, সোভিয়েট রাশিয়া তাহার সব কয়েকটি জাহাজই ক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছে।

বার্লিনের সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মানরা পশ্চিম রণাঙ্গন ও উত্তর সাগরে ছয়টি বিমান গুলী বিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করে। তন্মধ্যে চারটি বৃটিশ বিমান।

বৃটিশ চার হাজার টন ষ্টীমার "ব্রোন্‌টি" আটলাণ্টিক মহাসাগরে সাবমেরিনের আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে।

ফরাসী দুর্গ শ্রেণী ও সংবাদ আদানপ্রদানের যোগসূত্র ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মানরা পশ্চিম সীমান্তে এই সর্ব্বপ্রথম তাহাদের অতিকায় কামানসমূহ আমদানী করিয়াছে। নানাদিকে জার্ম্মানীর বিমানবহর পরিচালনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জার্ম্মানী শীঘ্রই বৃটেনের উপর যুগপৎ নৌ ও বিমান আক্রমণ সুরু করিবে বলিয়া যে মত প্রকাশ করা হইয়াছিল, উপরোক্ত সংবাদ-দ্বারা তাহাই সমর্থিত হইতেছে। প্রকাশ, মার্শাল গোয়েরিং এই উদ্দেশ্যে তাহার যোদ্ধৃ বিমানবহর পুনঃ সংগঠন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন এবং উহাদের কার্য্যকলাপ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিয়াছেন।

২রা নবেম্বর—

জার্ম্মানীর সহিত হল্যাণ্ডের যে সীমান্ত রহিয়াছে, তাহার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট সামরিক আইন জারী করিয়াছেন।

অদ্য কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার সাপ্তাহিক বিবৃতি দেন।

গত দুইদিন যাবৎ ইংলণ্ডের রাজা ৬ষ্ঠ জর্জ্জ উত্তর ইংলণ্ড ও মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলসমূহের বিমান ঘাঁটিগুলি পরিদর্শন করেন।

জেনেভার সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট রাশিয়া রাষ্ট্রসংঘের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

ফিনিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ এরকো বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লোপ পাইতে এবং তাহার আত্মরক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, ফিনল্যাণ্ডের পক্ষে এমন কোন ব্যবস্থায় সম্মত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৩রা নবেম্বর—

জার্ম্মান বেতারে ঘোষিত হইয়াছে যে, ক্যাটোয়াইস (পোল্যাণ্ড) হইতে ইহুদীদিগকে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। জার্ম্মান কম্যুনিষ্ট নেতা হের হেলম্যান মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৮শে অক্টোবর—

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দৌর্ব্বল্যের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া মহাত্মা গান্ধী অদ্যকার "হরিজন" পত্রিকায় 'কারণাবলী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহার এক স্থানে বলা হইয়াছে ঃ—"প্রতিপক্ষের নিন্দা করা এবং তাহার দৌর্ব্বল্যের সুযোগ গ্রহণ করাই যে কোনও ব্যাপারে পরাজিত হইবার প্রধানতম কারণ। অন্যান্য শ্রেণীর সংগ্রাম সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, সত্যাগ্রহ সম্পর্কে এই কথা বলা যায় যে, ইহার ব্যর্থতার কারণ ভিতরে অনুসন্ধান করিতে হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের আশানুরূপ ঘোষণা করিবেন বলিয়া কংগ্রেস যে আশা করিয়াছিলেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই আশা পূর্ণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেসকর্ম্মিগণের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতাই ইহার একমাত্র কারণ।"

লব্ধ প্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক, 'যমুনা'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল তাঁহার ঢাকুরিয়াস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের মারফতে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশনের নিকট আরও ৫০ কোটি বালির বস্তার অর্ডার দিয়াছেন। যুদ্ধ বাধিবার পর এতবড় অর্ডার আর কখনও দেওয়া হয় নাই।

কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুশ্লিম লীগের জেনারেল কাউন্সিলের এক বৈঠকে নিঃ ভাঃ মুশ্লিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এবং "মুশ্লিম ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী" নেতা মিঃ জিন্নার প্রতি আস্থা প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

এলাহাবাদে নিখিল ভারত অনুন্নত সম্প্রদায় লীগের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ডাঃ আম্বেদকর অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করিবার যে দাবী করিতেছেন তাহা অস্বীকার করিয়া এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৯শে অক্টোবর—

মাদ্রাজ পরিষদের সরকারবিরোধী দলের নেতা চেট্টীনাদের কুমার রাজা মুথিয়া চেট্টিয়ার গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি গবর্ণরকে বর্ত্তমান অবস্থায় মন্ত্রিসভা গঠনে তাঁহার অক্ষমতা জানাইয়াছেন।

জুহুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় জয়পুরের মহারাজা প্রমুখ তিনজন আরোহী গুরুতর আহত হইয়াছেন।

বর্দ্ধমান রাজ কলেজ মেগাজিনের মলাটের উপর বরাবরই একটি হংসের মাথায় পদ্মের ছবি প্রকাশিত হইত ; কিন্তু সম্প্রতি মেগাজিনের যে পূজা সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত ছবি নাই। এই সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, রাজ কলেজের মুসলমান ছাত্রগণ উক্ত ছবিতে আপত্তি করার ফলেই হংস ও পদ্মের ছবি ছাপান হয় নাই।

৩০শে অক্টোবর—

গতকল্য লণ্ডনে সহকারী ভারত-সচিব লেঃ কঃ এ জে মুইর হেডের মৃত্যু হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের এক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রদেব রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

কর্পোরেশনের আগামী নির্ব্বাচন সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাদি করিবার ক্ষমতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা অদ্য সন্ধ্যা ৭টার সময় গবর্ণরের নিকট পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছেন।

যুক্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ যুদ্ধ সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা ১২৭-২ ভোটে গৃহীত হয়।

মাদ্রাজের কংগ্রেসী সভা তাঁহাদের কার্যভার বুঝাইয়া দিয়াছেন। মাদ্রাজের মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা মতে মাদ্রাজ প্রদেশের শাসনভার গবর্ণর স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। মেসার্স (১) জি টি বোগ, (২) এইচ এম হুড ও (৩) টি জি রাদার ফোর্ডকে লইয়া একটি এডভাইসরী কাউন্সিল (পরামর্শ পরিষদ) গঠন করা হইয়াছে। এই কাউন্সিল গবর্ণরকে শাসনকার্য্যে সাহায্য করিবে।

যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন।

বিহার ও বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিয়াছেন।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সরকার-বিরোধী দলপতিদ্বয়কে উভয় প্রদেশের গবর্ণরদ্বয় মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের সরকার-বিরোধী দলপতি গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারিগণও পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন।

আসামের গবর্ণরের সভাপতিত্বে আহূত আসাম মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মহকুমা হাকিম ভারত রক্ষা অর্ডিন্যান্সের ৩৮ (৫) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত কমরেড শৈলেশ চ্যাটার্জি ও ও কমরেড ভারতরঞ্জন শর্ম্মাকে যথাক্রমে ৬ দিন ও ২০ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

১লা নবেম্বর—

দিল্লীতে লাট ভবনে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো, মহাত্মা গান্ধী, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মিঃ জিন্নার মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। এই বৈঠকের পূর্ব্বে ও পরে মিঃ জিন্নার ভবনে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে বৈঠক হয়।

লাট ভবনে লাট-নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনাকালে বড়লাট তাঁহার নিজ বিবৃতি এবং পার্লামেণ্টে প্রদত্ত ভারত সচিব ও স্যার স্যামুয়েল হোরের বক্তৃতার কতকগুলি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝান এবং ঐ সকল উক্তির যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। যুদ্ধ পরিচালনা এবং অপরাপর কতকগুলি ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যাহাতে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন, সে সম্পর্কে বড়লাট কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কংগ্রেস নেতাগণ ও মিঃ জিন্না অদ্যকার লাট ভবনের বৈঠকে কেবলমাত্র নিজেদের বক্তব্য জানান। বড়লাটের প্রস্তাবগুলি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিবেচনাধীন আছে।

২রা নবেম্বর—

দিল্লীতে গান্ধী-জিন্না আলোচনা হয়। আজ মহাত্মা গান্ধী একাকী মিঃ জিন্নার বাসভবনে গমন করেন। তাঁহারা সওয়া এক ঘণ্টা আলোচনা করেন। উহার পর মহাত্মা গান্ধী বিড়লা ভবনে যান এবং ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহিত আলোচনা করেন। এই বৈঠকের পর পণ্ডিত নেহরু মিঃ জিন্নার বাসভবনে গমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা হয় এবং আলোচনা শেষে উভয়ে বিড়লা ভবনে যান। মিঃ জিন্না সেখানে মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

লক্ষ্ণৌ-এ সিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে পুনরায় এক দাঙ্গার ফলে তিনজন নিহত ও ২০জন আহত হইয়াছে। এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ৪০জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

সীমান্তে উপজাতীয় দস্যুদের সহিত এক সংঘর্ষের ফলে ৭ জন ভারতীয় সৈনিক নিহত ও তিনজন আহত হইয়াছে। দস্যুদের ৬ জন নিহত ও ৩ জন আহত হইয়াছে।

লণ্ডনে লর্ড সভায় ভারত সম্পর্কে বিতর্ককালে লর্ড স্যামুয়েল, লর্ড স্নেল প্রভৃতি কংগ্রেসের দাবী সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড বিতর্কের উত্তরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া উল্লেখ করেন।

৩রা নবেম্বর—

গত ৩১শে অক্টোবর বিহার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছিলেন, অদ্য বিহারের গবর্ণর উক্ত পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণর মাদ্রাজের অনুরূপ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুযায়ী এক ঘোষণা প্রচার করিয়া স্বহস্তে বিহার প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর মন্ত্রিসভার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া শাসন ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনজন সদস্য লইয়া এডভাইসরী কাউন্সিল গঠন করিয়াছেন।

বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম লীগ ও সরকার-বিরোধী দলের নেতা স্যার আলি মহম্মদ দেহলবী মন্ত্রিসভা গঠনে অক্ষমতা জানাইয়াছেন।

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদে যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাবের আলোচনা আরম্ভ হয়।

দিল্লীতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও মিঃ জিন্নার মধ্যে তিন ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়। এই আলোচনার পর বিড়লা ভবনে কংগ্রেসী নেতৃবর্গের মধ্যে প্রায় চারি ঘণ্টা আলোচনা চলে।

৪ঠা নবেম্বর—

গত ৩১শে নবেম্বর বোম্বাই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছিলেন, অদ্য বোম্বাইয়ের গবর্ণর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণর ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারানুযায়ী একটি ঘোষণা প্রচার করিয়া স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং শাসন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া এডভাইসরী কাউন্সিল গঠন করিয়াছেনঃ—স্যার গিলবার্ট ওয়ালিস আই-সি-এস, মিঃ জে এ মদন আই-সি-এস এবং মিঃ এইচ এফ নাইট আই-সি-এস।

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাসের যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রস্তাব ৩৬—১৬ ভোটে গৃহীত হয়। উহার পর উড়িষ্যা মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন।

বিহারের গবর্ণর নিম্নোক্ত দুই ব্যক্তিকে লইয়া এডভাইসরী কাউন্সিল গঠন করিয়াছেনঃ—সি ই আর কাজিম সি-আই-ই, আই-সি-এস এবং মিঃ আর ই র‍্যাসেল সি-আই ই, আই-সি-এস। মিঃ র‍্যাসেল বিহার সরকারের চীফ সেক্রেটারী ছিলেন।

স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জির মাতা শ্রীযুক্তা শিবদাসী দেবী তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা শিবদাসী দেবী অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ও দয়াশীলা ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী অদ্যকার হরিজন পত্রে "পরবর্ত্তী পন্থা কি" শীর্ষক এক প্রবন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন—"কংগ্রেসসেবিগণ অহিংসার সর্ব্বপ্রকার অর্থে বিশ্বাসী এবং তাঁহারা সমস্ত নির্দ্দেশ বিনোবাক্যে পালন করিবেন, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হইলে আমি কোনরূপ আইন অমান্যে যোগ দিতে পারি না।"

কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটি আসামের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শক্তির পরিমাপ ও আসামের বিশেষ পরিস্থিতি সত্ত্বেও আসামের কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলীর আরও কিছুদিন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকার প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই।

কমন্স সভায় স্যার স্যামুয়েল যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী "ভালো এবং মন্দ" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

দিল্লীতে পুনরায় গান্ধী-লাট সাক্ষাৎকার হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে বড়লাটের নিকট পৃথক পত্র প্রেরণ করা হয়।

৫ই নবেম্বর—

যুদ্ধের সময় বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে বড়লাট মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্নার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং তৎসম্পর্কে বড়লাট, গান্ধীজী, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং মিঃ জিন্নার মধ্যে যে পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছে, বড়লাট অদ্য এক বিবৃতিতে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেস ও লীগের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার ফলে কোন মিটমাট হয় নাই এবং এই দুইটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মৌলিক মতভেদ রহিয়া গেল বলিয়া বড়লাট উক্ত বিবৃতিতে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। বড়লাট বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "তথাপি আমি একথা মানিতে প্রস্তুত নহি যে, এই ব্যর্থতাই চূড়ান্ত। ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই দুইটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এবং রাজন্যবর্গের সহিত পুনরায় আলোচনা করিবার অভিপ্রায় আমার আছে এবং যথাকালে আমি তদনুসারে আলোচনা করিব।"

বড়লাটের প্রস্তাবের সার মর্ম্ম এই যে, কেন্দ্রীয় শাসন ব্যাপারে মিলিতভাবে কার্য্য চালাইবার সুবিধার জন্য বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে এবং কংগ্রেস ও লীগের প্রতিনিধিরা যাহাতে শাসন পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেন, তদুদ্দেশ্যে প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চলনসই বোঝাপড়া হওয়া আবশ্যক। এই ব্যবস্থা সাময়িকভাবে করা হইবে এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা চলিবে। অপরাপর দলেরও দুই একজন প্রতিনিধি শাসন পরিষদে লওয়া হইবে। নূতন সদস্যদের পদমর্য্যাদা ও দায়িত্ব বর্ত্তমান সদস্যদের অনুরূপ হইবে। যুদ্ধ শেষে শাসন সংস্কার সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনার যে প্রতিশ্রুতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন, তাহার সহিত এই প্রস্তাবের কোন সংস্রব নাই। বর্ত্তমান আইন অনুসারেই এই ব্যবস্থা করা হইবে।

মিঃ জিন্না বড়লাটের প্রস্তাবের উত্তরে লিখিয়াছেন, "কংগ্রেসের নেতৃবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা চূড়ান্তভাবে জানাইয়াছেন যে, নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির প্রস্তাবে যাহা বলা হইয়াছে, তদনুরূপ ঘোষণা করা না হইলে, আপনার ২রা নবেম্বর তারিখের পত্রে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে তাঁহারা আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহেন। কাজেই প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সম্পর্কে কোন আলোচনা হইতে পারে নাই।"

শ্রীহট্টে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে সুরমা ভ্যালি কংগ্রেস কর্ম্মীদের সম্মেলন আরম্ভ হয়।

কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই প্রস্তাবের উত্তরে বড়লাটকে জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেসের অভিপ্রায় অনুসারে ভারত সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা না হইলে বড়লাটের পূর্ব্ব বিবৃতি অনুসারে কার্য্য করা অথবা বর্ত্তমান প্রস্তাব অনুসারে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করা কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব। তিনি আরও বলিয়াছেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এই ব্যাপারেও সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ দূর করিবার জন্য আমরা সকলেই চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু ভারতকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিবার ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কোন সম্পর্কই নাই। কংগ্রেস যে গণ-পরিষদ দাবী করিয়াছে, ব্যাপকতম ভোটাধিকারে তাহা আহূত করা হইবে এবং তাহাতে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও শ্রেণীর স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থায়ক শাসনতন্ত্র রচিত হইবে। কংগ্রেস কোন শ্রেণী, সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতা চাহে না। সমগ্র ভারতের স্বাধীনতাই তাহার কাম্য। যাহা হউক, উল্লিখিত ঘোষণার ন্যায় কোন ঘোষণা না করা হইলে কংগ্রেসের পক্ষে কোন বিবেচনা করা সম্ভবপর নহে।"

পুস্তক-পরিচয়

গৌরী মা—শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে শ্রীদুর্গাপুরী দেবী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী গৌরী মাকে অনেকেই জানেন। এই পুস্তকখানি তাঁহারই জীবন-চরিত। লেখিকা এই জীবনী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "গৌরীমার নিজের কথিত ও লিখিত বিবরণ এবং তাঁহার গর্ভধারিণী গিরিবালা দেবী, জ্যেষ্ঠ সহোদর অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সহোদরা বিপিনকালী দেবীর নিকট যে সকল বিবরণ পাইয়াছি, এই গ্রন্থ রচনায় তাহার উপরই নির্ভর করা হইয়াছে। গৌরীমার অন্যান্য নিকট আত্মীয়স্বজন এবং সমসাময়িক ভক্তগণের নিকট প্রাপ্ত বিবরণ এবং পত্রাদি হইতেও এই বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি। গৌরীমার সহিত সুদীর্ঘকালের সাহচর্য্যহেতু আমাদের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ জ্ঞানও যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছে।"

লেখিকা দুর্গাপুরী ব্যাকরণতীর্থা, বি-এ গৌরীমার প্রধানা শিষ্যা ও আত্মজাতুল্যা স্নেহপাত্রী। ভাষা প্রাঞ্জল এবং বর্ণনাভঙ্গী চিত্তগ্রাহী। গ্রন্থখানি বহু চিত্রে সুসজ্জিত হইয়াছে।

গৌরীমার বাল্যকাল হইতে ভগবৎ-প্রেরণা ও তাহার ফলে গৃহত্যাগ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীর কৃপালাভ, প্রব্রজ্যা, কঠোর তপস্যা, প্রত্যাগমন ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধারাবাহিকরূপে সুশৃঙ্খল ঘটনাবিন্যাসে এরূপভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষী হইয়াছে, গৌরীমার বহু উপদেশও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সারদেশ্বরী আশ্রমের সহিত গৌরীমার জীবন এমনভাবে জড়িত যে একটির সহিত আর একটিকে পৃথক করিয়া দেখা যেন সম্ভব হয় না। এই আশ্রম তাঁহার পরিণত সাধনার ফল স্বরূপে তিনি বাঙলাদেশকে দান করিয়া গিয়াছেন। বহু শিক্ষার্থিনী এই আশ্রমে শিক্ষালাভ করিতেছেন এবং বহু সম্ভ্রান্ত গৃহের পুর নারীগণ চিত্ত পবিত্রতা বিধান ও সংসার ক্লান্তি দূর করিয়া আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করিবার জন্য যদৃচ্ছা আশ্রমে গিয়া থাকেন। আশ্রম যেন তাঁহাদের নিজেদেরই গৃহস্বরূপ। দূর দেশের অভিভাবকগণ নিজ কন্যাগণকে আশ্রমে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন। বস্তুত, গৌরীমার কীর্ত্তিস্বরূপ এই আশ্রম বাঙলাদেশের এক বিশিষ্ট সম্পদ। গৌরীমার জীবনকথার সহিত কি ভাবে বারাকপুরে ক্ষুদ্র এক কুটিরে আশ্রম প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিল তাহারও ইতিহাস এই পুস্তকে আছে।

ভরসা করি বাঙলার প্রতি গৃহে এই পুণ্য জীবনী রক্ষিত ও পঠিত হইবে এবং বাঙলার প্রত্যেক পরিবারের মহিলাই আশ্রমের পরিচয় গ্রহণে তৎপরা হইবেন।

পরকীয়া:—উপন্যাস। শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। প্রকাশক—শ্যামবাজার পুস্তকালয়, ১৩১-সি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা চার আনা।

লেখক বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত নহেন। তাঁহার এই নবলিখিত উপন্যাসখানা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। তাঁহার লেখার বিশেষত্ব হইল এই যে, তাহাতে মৌলিকত্ব থাকে। তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া টাটকা একটা তাজা রস পাওয়া যায়। একঘেয়ে গতানুগতিকতার প্যাঁচঘোচে চিত্ত পরিশ্রান্ত হয় না। 'পরকীয়া'তেও এমন আনকোরা নূতন একটা বস্তু আছে, যাহাতে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। 'পরকীয়া' প্রণয়মূলক উপন্যাস; কিন্তু এ প্রণয় বালীগঞ্জের নয়, কয়লার খাদের কুলী-মজুরের। সে প্রেম পলকা নয়, সবল দেহে প্রবল এবং পুষ্ট; তাহাতে প্রাণ আছে। শৈবাল দলের মধ্যেও সরসিজের মত মধুর, কোমল হইলেও পাঁক হইতে উঠিয়া পরতে পরতে জলের চাপ কাটাইয়া—প্রবাহ এড়াইয়া দিনের আলোকে মুখ তুলিবার মত শক্তিশালী। সরল গ্রাম্য জীবনের সরস প্রেমের মাধুর্য্যে পরকীয়া সুন্দর হইয়াছে। গ্রাম্য-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে পরকীয়ার এই সব বিস্তারে নাগরিক জীবনের একঘেয়েমি হইতে পাঠক একটি অপূর্ব্ব আস্বাদ উপভোগ করিবেন। লেখকের প্রকাশভঙ্গী সবল, অনুভূতি স্বচ্ছ।

পারিজাত (সচিত্র শিশু-কাব্য):—শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম-এ, বি-টি। প্রকাশক—বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স, লিমিটেড্, স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

শিশুদের উপযোগী সহজ ভাষায়, সহজ বিষয় লেখা আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু নলিনীবাবু যে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ, অন্তত বিষয় নির্ব্বাচনে সে পরিচয় তিনি দিয়াছেন। শিশু-জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি অবলম্বন করিয়া কবিতাগুলি লিখিত। প্রত্যেক কবিতার সঙ্গে উহার বিষয়বস্তুর পরিচায়ক চিত্রও রহিয়াছে। শিশুদের প্রিয় ও পরিচিত বিষয়ের অবতারণায় বাঙলার শিশুমহলে 'পারিজাত' সমাদর লাভ করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

কাড়াকাড়ি (ছোটদের বই):—গ্রন্থকার—শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী। প্রকাশক—পি রায়, ৩-বি, শ্যামানন্দ রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বালকবালিকাদের জন্য বাঙলা দেশে নানা জাতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু সত্যকার খেলার ছলে আমোদ ও শিক্ষাদানের পুস্তক বিরল। সুবিনয়বাবু এই পুস্তকখানিতে প্রকৃত প্রস্তাবে ছোটদের আমোদ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছেলেরা নিজ হাতে কোন কিছু গড়িতে বা কোন ছোটখাট পরখ করিতে অতিমাত্রায় আকর্ষণ বোধ করে। এই পুস্তকের কাগজ-কাটা-খেলা, ধাঁধার ছবি, দেশলাইকাঠির খেলা ও গোড়ার ভাঁজ করিয়া দেখিবার ছবিগুলি যে ছোটরা অন্তর দিয়া উপভোগ করিবে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহা ছাড়াও বামনকুঞ্জের দেশ প্রভৃতি কৌতুক কাহিনী পড়িয়া আনন্দও পাইবে যথেষ্ট।

আধুনিক বালকবালিকাদের সৌভাগ্য যে এমন পুস্তক তাহারা হাতে পাইতেছে। ছবি ছাপা তক্‌তকে।

বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল (ছেলেমেয়েদের জন্য):—গ্রন্থকার—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত। প্রকাশক—এস কে মিত্র এন্ড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

পুস্তকখানি রূপকথার ধাঁচে লেখা হইলেও ইহাতে বৈজ্ঞানিক সত্যের মায়াই ভিতরে বাহিরে খেলা করিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান যাদুকরের ভেল্কির মতই আশ্চর্য ও অদ্ভুত ফল প্রসব করিতেছে। ছোটরা এই আজগুবি যেখানে পায়, সেখানেই ছুটিয়া যায়। রূপকথার আজগুবির লোভে তাহারা এই পুস্তক আয়ত্ত করিবে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের সত্যকার আশ্চর্য্য প্রভাবে আকর্ষিত হইয়া সেই অজানার লুক্কায়িত মণিকোঠা লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষত্বের দিক দিয়া ছোটদের মনে বিজ্ঞানের প্রতি দরদের একটুক বীজ অঙ্কুরিত হওয়াও কম কথা নয়। "বিদ্যুৎকে ভূতের মত খাটিয়ে নিয়ে ঘরে ঘরে মানুষ তার গৃহস্থালীর কাজ করছে"—এই সত্য অক্ষরে অক্ষরে দেখান হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, রূপকথা হইলেও এই পুস্তকের প্রাণবস্তুটি কি। সুন্দর ছবি, পরিপাটী ছাপা, এক কথায় অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের বালকবালিকাদের লোভনীয় পুস্তক।

জওহরলালের চিঠি:—লেখক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত। পি, ১৬৪-বি, ল্যান্স ডাউন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার কন্যাকে যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন—আলোচ্য গ্রন্থে রহিয়াছে সে-গুলির প্রাঞ্জল অনুবাদ। এই মূল্যবান গ্রন্থখানি যে বাঙালী পাঠক সমাজের ভালো লাগিয়াছে, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের খুব বেশী মিষ্টি খাওয়াইয়া যেমন তাহাদের শরীরের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকি—তেমনি তাহাদিগকে বড্ড বেশী গল্প শোনাইয়া এবং গল্প পড়াইয়াও তাহাদের চিন্তা করিবার শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলি। জওহরলালের চিঠিগুলি ছেলে-মেয়েদের চিত্তকে পরিচিত করিয়া দিবে প্রকৃতির বহু রহস্যের সঙ্গে—মানুষের ক্রমবিকাশের চমকপ্রদ কাহিনীর সঙ্গেও। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় চিঠিগুলির অনুবাদ করিয়া বাঙালী ছেলে-মেয়েদের মনের কাছে যে মহাসম্পদ বহন করিয়া আনিয়াছেন—সে জন্য তিনি নিশ্চয়ই ধন্যবাদের পাত্র। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।

সাহিত্য-সংবাদ

গল্প প্রতিযোগিতা

স্কুল, কলেজ বন্ধ থাকার দরুণ আশানুরূপ গল্প হস্তগত না হওয়ায় অনেকের অনুরোধে প্রতিযোগিতার তারিখ পিছাইয়া গল্প পাঠাইবার শেষ দিন ৩০শে নবেম্বর ধার্য্য হইল।

সেক্রেটারী, ফ্রেন্ডস্ এ্যাসেম্বলী, ৪২, রামচরণ শেঠ রোড, পোঃ সাঁত্রাগাছি, (হাওড়া)।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

ঝরণা সাহিত্য সঙ্ঘের উদ্যোগে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এবং চিত্রের যে প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রতিযোগী প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন:—

১। **কবিতা বিভাগে:**—প্রথম—শ্রীসরোজকুমার গোস্বামী (শ্রীরামপুর), "[illegible]লোর পথে"। দ্বিতীয়—কুমারী প্রীতিকণা ভট্টাচার্য্য (এলাহাবাদ), "রূপ-পিয়াসী"।

২। **প্রবন্ধ বিভাগে:**—প্রথম—শ্রীসিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (বজ্‌বজ্), "গাঁয়ের খেলা-ধূলা"।

৩। **গল্প বিভাগে:**—প্রথম—শ্রীকৃষ্ণকুমার দে (চন্দননগর), "ভুখা ভিখারী"।

ঝরণা সাহিত্য সঙ্ঘ, ঝরণা কার্য্যালয়,
তেমাথা, চন্দননগর।

প্রিয়বালা স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

প্রথম পুরস্কার ... ১২ টাকা   দ্বিতীয় পুরস্কার ... ৮ টাকা

বিষয়:—"বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রধান তিনটি চরিত্রের পৃথক ও মিলিত পরিণতি"। প্রবন্ধ ২,৫০০ শব্দের বেশী না হয়। ফুলস্কেপ্ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার লেখা হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৩০শে নবেম্বরের পূর্ব্বে সপ্তক অফিসের ঠিকানায় প্রবন্ধ পৌছানো চাই।

ম্যানেজার—**'সপ্তক'** বরিশাল

রচনা প্রতিযোগিতা

স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ কমিটির পরিচালনায় একটি রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিষয়: "পোষ্ট ওয়ার টেণ্ডেন্সী ইন্ ইংলিশ লিটারেচার"। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতাকে একটি রৌপ্য কাপ উপহার দেওয়া হইবে। প্রতিযোগিতা কলেজ-ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রচনা ২৬শে নবেম্বরের পূর্ব্বে ৯।৭বি, প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা; কমিটির সেক্রেটারী—শ্রীতারকনাথ রায়ের নিকট প্রেরিতব্য।

—শ্রীতারকনাথ রায়, সেক্রেটারী, কলেজ কমিটি।

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ স্মৃতি-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল

এইবারে সর্ব্বসাধারণ প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষাল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং বিদ্যালয়সমূহ প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার সেন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

(স্বাঃ) সুবিমল দে সরকার, সম্পাদক, (রচনা বিভাগ)

প্রগতি সঙ্ঘের
রচনা, গল্প, আবৃত্তি এবং শিল্প প্রতিযোগিতা

নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় দুইটি করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। রচনা এবং আবৃত্তি ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য এবং ছোট গল্প এবং চিত্র-শিল্প সাধারণের জন্য। উপরি উক্ত বিষয়গুলি পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার।

(ক) রচনা—১ম পুরস্কার একটি স্বর্ণ পদক, ২য় পুরস্কার—একটি স্বর্ণ কেন্দ্রীত পদক। বিষয়—চরিত্রগঠনে গৃহ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

(খ) ছোটগল্প—১ম পুরস্কার—একটি ছোট কাপ, ২য় পুরস্কার—একটি রৌপ্য পদক। বিষয়—যে কোন একটি গল্প।

(গ) আবৃত্তি—১ম পুরস্কার—একটি কাপ, ২য় পুরস্কার—একটি রৌপ্য পদক। বিষয়—রবীন্দ্রনাথের "শিবাজী-উৎসব"।

(ঘ) চিত্র-শিল্প—১ম পুরস্কার—একটি স্বর্ণ কেন্দ্রিত পদক, ২য় পুরস্কার—একটি রৌপ্য পদক। বিষয়—১৬"×১২" প্রাকৃতিক দৃশ্য।

প্রতিযোগিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় নাম, ধাম সহ রচনা ইত্যাদি পাঠাইবেন এবং (গ) চিহ্নিত অংশের প্রতিযোগিগণ ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে নাম পাঠাইবেন।

ঠিকানা:—সম্পাদক, প্রগতি সঙ্ঘ, শ্রীপশুপতিনাথ দাস, কালিকাপুর, বজ্‌বজ্, ২৪ পরগণা।

শ্রীরামপুর মহকুমা ছাত্রছাত্রী সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

শ্রীরামপুর মহকুমা ছাত্র-ছাত্রী সংস্কৃতি সম্মেলন নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে শ্রীরামপুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হইবে। উহার সঙ্গে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাও ডাকা হইয়াছে।

প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ—সকল স্কুল, কলেজ না খোলার জন্য পূর্ব্বে প্রকাশিত তারিখ ৮ই নবেম্বর পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮ই নবেম্বর করা হইল। সমস্ত প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা:—অনাথনাথ সান্যাল, শ্রীরামপুর পাব্‌লিক লাইব্রেরী, ১নং কুইন ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর।

ছাত্র-লীগের উদ্যোগে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

পবিত্র ঈদ-উপলক্ষে খুলনা জিলা ছাত্রলীগ প্রবন্ধ, তর্ক, শরীর-চর্চ্চা ও হাস্যকৌতুক বিষয়ে অনেকগুলি কাপ, মেডেল ও অন্যান্য মূল্যবান পুরস্কার দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। গত বৎসরও উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় ঈদ-উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান ও সমগ্র খুলনাবাসীর অকৃত্রিম সহায়তায় এই উৎসবটি খুলনার সামাজিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এবৎসরও তাঁহাদের সহৃদয়তা কামনা করে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে:—

১। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও বাঙালীর কর্ত্তব্য। (কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদের)।

২। ভারতবর্ষের মুসলমানগণ জাতি অথবা সম্প্রদায়। (কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদের)।

৩। আদর্শ নারী। (ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী যোগ দিতে পারেন)।

৪। ছাত্র-জীবনে রাজনৈতিক প্রভাব। (স্কুলের ছাত্রদের জন্য)।

৫। বাঙলার মুসলমান নারীদের কর্ত্তব্য। (ছাত্রীদের জন্য)।

প্রবন্ধ নিম্নলিখিত ঠিকানায় ১২ই নবেম্বরের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। প্রবন্ধ কোনক্রমে ৬ পৃষ্ঠার অধিক না হয়।

আফ্‌ছারউদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র-লীগ খান-লজ্, যশোর রোড খুলনা।

রচনা প্রতিযোগিতা

এই প্রতিযোগিতায় সাধারণে যোগদান করিতে পারেন এবং উহার কোন প্রবেশমূল্য নাই। প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০শে নবেম্বর ১৯৩৯। বিশেষ বিবরণের জন্য ষ্ট্যাম্পসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

শ্রীবিপ্রদাস দত্ত, (সম্পাদক), শান্তিইন্‌ষ্টিটিউট্। ২৬।১।এ শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট। পোঃ বহুবাজার, কলিকাতা।

কথায়।

আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ঝালকাঠী টাউন রিডিং রুমের সভাবৃন্দের উদ্যোগে ঝালকাঠী থিয়েটার হলে আবৃত্তি ও সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু ছাত্র ও মহিলা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছেন।

প্রতিযোগিতার ফলাফল:—

খেয়াল সঙ্গীত—প্রথম পুরস্কার কুমারী দেবীরাণী দাশগুপ্তা। দ্বিতীয় পুরস্কার কুমারী রেণুকণা দাস। তৃতীয় পুরস্কার কুমারী রেবা ঘোষ।

(খ) আধুনিক সঙ্গীত—প্রথম পুরস্কার কুমারী নিহারকণা ঘোষ। দ্বিতীয় পুরস্কার কুমারী আশালতা ঘোষ।

(গ) আবৃত্তি (মহিলা-বিভাগ) প্রথম পুরস্কার সত্যভামা রক্ষক দাস। বিশেষ পুরস্কার কুমারী শোভা দাস।

(ঘ) ঐ (পুরুষ) প্রথম পুরস্কার শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।
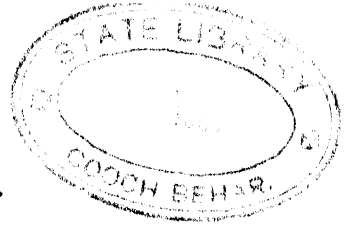
৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪৬ Saturday, 4th November, 1939 [৫০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের দাবীর উত্তর—

বড়লাটের বিবৃতির পর পার্লামেণ্টে স্যার স্যামুয়েল হোর এক দীর্ঘ বিবৃতিও দিয়াছেন। বৃটিশ রাজনীতিকদের বড় বড় কথা বলিতে কার্পণ্য কোন দিনই নাই। স্যার স্যামুয়েল হোরও বাক্‌বিভূতি বিস্তার অনেক করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথার চুম্বক এই যে, ভারতবাসীকে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে পুরাপুরি স্বাধীনতা এখনই দেওয়া যাইতে পারে না। স্যার স্যামুয়েল হোর লর্ড আরউইনের ঘোষণার নজীর দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীদিগকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিশ্রুতি যখন দেওয়াই হইয়াছে, তখন তাহাদের এখন আর কোন অভিযোগের কারণ থাকিতে পারে না। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ কি, তাহা আর পূর্ণ স্বাধীনতা এক কি না—এ বিষয়ে আর বিতর্ক উপস্থিত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না। করণ, ব্রিটিশ কর্ত্তারা স্পষ্টই বলিতেছেন যে, ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্মতি ছাড়া সেখানে রাজনৈতিক অধিকারের সম্প্রসারণ করা সম্ভব হইবে না। এই যে সর্ত্ত, ইহা একটা অসম্ভব সর্ত্ত, এ সর্ত্ত কোন-দিনই প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব হইতে পারে না, কোন দেশেই পারে না। সুতরাং ভারতের পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা কার্য্যত লাভ করা সম্ভব হইবে না, বিচারে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় ইহাই। বড়লাট এবং স্যার স্যামুয়েল হোর উভয়েই এই আশা দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পর ভারতের বিভিন্ন দলকে লইয়া একটি গোলটেবিল সম্মেলন আহ্বান করা হইবে। কিন্তু তেমন গোলটেবিল বৈঠকের হট্টগোলের পরিণতি কোথায় আমাদের বুঝিতে বাকী নাই। সকল দলের স্বীকৃত একটা শাসনতন্ত্র নির্ণয় করা ভারতে কেন, দুনিয়ার কোন দেশেই সম্ভব নহে; সর্ব্বত্রই অধিকাংশের মত অনুসারে শাসনতন্ত্র গঠিত হইয়া থাকে, সে পথ ছাড়া রাজনীতিক অধিকারের কার্য্যত সম্প্রসারণের পথ যখন নাই, তখন সংখ্যালঘিষ্ঠ যে যেখানে আছে সকলকে রাজী করাইয়া তবে আমরা ভারত-বাসীদিগকে স্বাধীনতা দিব, এই কথার অন্তর্নিহিত সদিচ্ছাকে আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীকার করিয়া লওয়া মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে আসে না। কংগ্রেস বারম্বার বলিয়াছে যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে সর্ব্বতো মান্য করিয়াই সে চলিবে। ইহা সত্ত্বেও বৃটিশ রাজনীতিকেরা নিজেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মুরুব্বিয়ানা ছাড়িতে নারাজ, এবং সে মুরুব্বিয়ানার সুযোগ তাঁহাদের অনন্তকাল থাকিতে কিছুই আটকাইবে না; সুতরাং এক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা-কামীদের পক্ষে ঐরূপ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা ছাড়া অন্য পথ নাই। ভারতের স্বাধীনতা সত্যই যাহারা চাহেন, তাঁহাদিগকে মুরুব্বীদের অভিভাবকত্বের আবছায়ায় থাকিবার মোহটা কাটাইয়া উঠিতেই হইবে। নিজেদের উপর নির্ভর করিতে শিখিতে হইবে। মুরুব্বীদের আশ্রয়ের মোহের সঙ্গে স্বাধীনতা খাপ খাইতে পারে না। ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় কি দেশের স্বাধীনতা চাহেন না? মুসলমানদের পক্ষ হইতে যাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের দোহাই দিতেছেন এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিতেছেন, তাঁহারা কি এই কথাই বলিতে চাহেন যে, মুসলমানেরা ভারতের স্বাধীনতা লইতে নারাজ!

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগ—

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে কংগ্রেস মন্ত্রি-মণ্ডলী পদত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের পর কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, এ সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে; ঠিকা মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা যে হইবে মাদ্রাজে তাহা দেখা গিয়াছে। মাদ্রাজের

বিরোধী দলের নেতা মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে অস্বীকৃত হন, তৎপরে স্বয়ং লাট শাসন ভার হাতে লইয়াছেন। কারণ যাহাই থাকুক, ঠিকা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিলেও তাহা সেখানে টিকিত না। যে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রি-মণ্ডলের শাসন চলিতেছে, সেই কয় প্রদেশে ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

		কংগ্রেস	অকংগ্রেস	মোট সংখ্যা
যুক্তপ্রদেশ	...	১৪৭	৮১	২২৮
মাদ্রাজ	...	১৬২	৫৩	২১৫
বোম্বাই	...	৮৯	৮৬	১৭৫
বিহার	...	৯৮	৫৪	১৫২
উড়িষ্যা	...	৩৫	২৫	৬০
মধ্যপ্রদেশ	...	৭১	৪১	১১২
সীমান্ত	...	২১	২৯	৫০
কোয়ালিশন		২৯		
আসাম	...	৩২	৭৬	১০৮
কোয়ালিশন		৫৮		

বড়লাট রাজনীতিক নেতাদিগকে ডাকিয়া পুনরায় পরামর্শ করিবেন। স্যার স্যামুয়েল হোর যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে আলোচনার সুযোগ আরও আছে বলিয়া শুনিতেছি। থাকে ভাল; কিন্তু আমাদের কথা এই যে, যে পর্য্যন্ত দেশের অধিকাংশের মতকে মান্য করিয়া লইবার পরিবর্ত্তে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের গোলক-ধাঁধাঁর মধ্যে ব্রিটিশের রাষ্ট্রনীতি থাকিবে, ততদিন সমস্যার সমাধান হইবে না। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের এই সিদ্ধান্তটি সুনিশ্চিত হইলেই এই আলোচনায় সাফল্যের আশা করা যায়।

মাদ্রাজ মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগ—

মাদ্রাজের মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগ গ্রাহ্য হইয়াছে এবং মাদ্রাজের গবর্ণর স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির সুনিশ্চিত সম্ভাবনা আছে, কর্ত্তৃপক্ষ যদি মনে-প্রাণে ইহা বুঝিতেন, তাহা হইলে মাদ্রাজে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত না, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। দিল্লীতে নেতাদের মিলিত বৈঠক হইয়া গেল। এক পক্ষে মহাত্মা গান্ধী এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ অপরপক্ষে মিঃ জিন্না ও স্যার সেকেন্দারকে লইয়া এই বড়লাটের যে আলোচনা, এই আলোচনায় সন্তোষজনক কোন ফল যে ফলিবে, এমন আশা করা কঠিন। কংগ্রেস চাহে, ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র, মুসলিম লীগের কর্ত্তারা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের আগাগোড়া বিরোধী। সমর সম্বন্ধে যে পরামর্শ সমিতি গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, সম্ভবত সেই পরামর্শ সমিতির সদস্য সংখ্যা একটু বাড়াইয়া সকল দলের সদস্য লইয়া আজেমোজে হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র শাসন-প্রণালীর বীজ কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রে বপন করিবার চেষ্টা হইবে; কিন্তু তেমন প্রচেষ্টায় কোন সুফল ফলিবে বলিয়া মনে করি না। কংগ্রেস পক্ষ হইতে যদি এমন প্রস্তাব মানিয়া লওয়া হয়, তবে সমস্যার সমাধান হইবে না। যে বিষ ভারতের রাষ্ট্রীয় দেহকে জর্জ্জর করিয়াছে, সেই বিষই পুষিয়া রাখা হইবে। দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বৃহত্তর আদর্শকে ভিত্তি করিয়াই ভারতের বিভিন্ন দলের মধ্যে স্থায়ী মিলন হইতে পারে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থবাদীদের সঙ্গে গোঁজা-মিলে ইষ্ট না হইয়া, পাকাপাকিভাবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইবার পক্ষে অনিষ্টই যে ঘটিবে, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে দেশবাসী এ শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

গোলটেবিলী নীতির প্রসার—

পরামর্শ সমিতির ক্ষমতা সম্প্রসারিত করা হউক, বিলাতের 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রও এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, গোড়াকার সমস্যা সেদিকে নয়। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন হইল আগে প্রয়োজন এবং দেশের শাসনতন্ত্র-গঠনে দেশবাসীর অধিকারকে স্বীকার করিয়া লওয়া দরকার আগে। স্বাধীনতার মূলসূত্র রহিয়াছে সেইখানে এবং যতদিন পর্য্যন্ত সেই দিক হইতে কাজ না হইতেছে, বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের একটু ঘষাই-মাজাই বা আংশিক রদ-বদলে কংগ্রেসের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। রাষ্ট্রীয় আদর্শ ব্যতীত, সাম্প্রদায়িক কোন ভিত্তিকে শাসনতন্ত্রে যদি প্রাধান্য দেওয়া হয়, তবে কার্য্যত দেশের তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবে। তথাকথিত দেশের লোকেদের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া গঠিত মন্ত্রণা-পরিষদ যদি গঠিত হয়, সেই সাম্প্রদায়িকতার নীতি অবলম্বনে, তবে তাহা অধিকতর মারাত্মক হইবে। দেশের সংখ্যাধিক্যের মত অনুসারে গঠিত শাসনতন্ত্রই স্থায়ীভাবে এ সমস্যার সমাধানে সক্ষম, কংগ্রেস উহাই চাহে।

হক সাহেবের প্রত্যাহার—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী যখনই কোন বিবৃতি বাহির করেন, তখনই তাহার কতকগুলি ক্রমপরিণতি সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। বিবৃতি, প্রতিবাদ, প্রত্যাহার হক সাহেবের উক্তির সঙ্গে এই তিন অঙ্গ অবিচ্ছেদ্য। হক সাহেব বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিয়া বিবৃতি জারী করিয়াছিলেন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যুক্তিসহকারে উত্তর দিবামাত্র হক সাহেবের জ্ঞান হইল যে তিনি যুক্তপ্রদেশের সম্বন্ধে অভি-যোগ বোম্বাইয়ের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। এখন আবার যুক্ত-প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ হয়। মৌলবী সাহেবের আর এক দফা প্রত্যাহার ছাপাইবার জন্য সংবাদপত্র-গুলিকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ

করিয়াছিলেন। আসামের প্রধান মন্ত্রী তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং একথাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, বাঙলার প্রধান মন্ত্রী যে অভিযোগ করিয়াছেন, সে অভিযোগের কোন কারণ যদি থাকে সেজন্য বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর প্রিয়বর্গ মুসলীম লীগওয়ালারাই দায়ী। লীগ-পরিচালিত মন্ত্রি-মণ্ডলীর নীতিরই জের ঐ সব ক্ষেত্রে চলিতেছে। এই সঙ্গে বড়দলুই মহাশয় বাঙলার প্রধান মন্ত্রীকে একটা খোঁচা দিতেও ছাড়েন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, হক সাহেবের ছত্র-ছায়াতলে বাসে যদি এতই আরাম, তাহা হইলে এত লোক বাঙলা দেশ ছাড়িয়া আসামে গিয়া অসুবিধা ও অবিচার ভোগ করিতেছে কেন? হক সাহেবের অন্তরে এই উক্তি বীররসের উদ্রেক করিয়া আর এক প্রস্থ বিবৃতি-প্রতিবাদ-প্রত্যাহারের পর্ব্ব উন্মুক্ত করিবে, পাঠকবর্গ এমন প্রত্যাশা করিতে পারেন।

যুক্তপ্রদেশের সম্বন্ধে অভিযোগ—

মৌলবী ফজলুল হক বোম্বাই ছাড়িয়া যুক্তপ্রদেশের ঘাড়ে চাপিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশের পক্ষ হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বাঙলার প্রধান মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়াছেন এবং দেখাইতে বলিয়াছেন, কি বিষয়ে তাঁহার অভিযোগ। হক সাহেব যদি তাঁহাকে তাহা জানান, তবে তিনি এ সম্বন্ধে তদন্ত করিতে প্রস্তুত আছেন। যুক্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ব্যবস্থা-পরিষদে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হইতেছে, হক সাহেবের ভ্রান্তি-বিলাস এখনও কাটে নাই। তিনি পাঞ্জাবের ব্যাপার চাপাইয়াছেন যুক্ত-প্রদেশের ঘাড়ে। পন্থজী বলিয়াছেন, পাঞ্জাবে ৩ শত ছাপাখানার জামিন তলব করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে সে সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র। হক সাহেব অবশেষে হয়ত দেখিতে পাইবেন যে, তিনি অভিযোগ করিয়াছেন আসামের ন্যায়, এক্ষেত্রেও সেই সব অভি-যোগ চাপিয়াছে গিয়া তাঁহারই অন্তরঙ্গ দোস্ত লীগওয়ালাদের উপর। আসামে স্যার সাদুল্লা এবং পাঞ্জাবে স্যার সেকেন্দর এই দুই বন্ধুকেই তিনি তাঁহার অবিবেচিত বাক্-বিক্ষোভে বিব্রত করিয়াছেন। লীগওয়ালাদের স্বরূপই তাঁহার উক্তিতে উন্মুক্ত হইয়াছে। অন্য কথায় তিনি নিজের পরিচয়ই দিয়াছেন নিজের কথায়।

মূল্যবান প্রস্তাব—

ভাবগর্ভ বাক্যরসের ভাণ্ডার বার্নার্ড-শয়ের বিপুল। সেদিন লণ্ডনের ফেবিয়ান সোসাইটিতে যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি রচনা পাঠ করেন। তিনি এই প্রস্তাব করেন যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি নির্ণায়ক এবং বক্তাদিগকে লইয়া একটি পরিষদ গঠন করা হউক। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন পার্লামেণ্টে যে-সব বক্তৃতা দিবেন, এই পরিষদের কর্ত্তব্য হইবে সেগুলি কড়াকাড়িভাবে পরীক্ষা করিয়া তবে প্রচার হইতে দেওয়া। বার্নার্ড-শয়ের উচিত ছিল, এই সঙ্গে ভারত সম্বন্ধে যাহারা ব্রিটিশ নীতির ব্যাখ্যাতা, যেমন স্যার স্যামুয়েল হোর প্রভৃতি, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা। বার্নার্ড-শয়ের আর একটি প্রস্তাব আরও বেশী মূল্যবান। প্রস্তাবটি হইল এই যে, 'হিটলারবাদ, পররাষ্ট্র-গ্রাস, শান্তি ও নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি সাধারণত পার্লামেণ্টারী যে-সব অর্থহীন' ভাষা বক্তৃতায় ব্যবহার করা হইয়া থাকে, সেগুলি বিধিবহির্ভূত যাহাতে হয়, তেমন ব্যবস্থা করা। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, জগতে সত্যের মর্য্যাদা যে অনেক বাড়িবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই!

হিন্দু হওয়া কি অপরাধ?—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রস্তাব বাঙলার প্রধান মন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আজমীঢ় হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি লম্বা সফরে বাহির হইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং পণ্ডিত নেহেরু স্বপ্নেও যে সব কল্পনা করেন নাই, মুসলমানদের উপর কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের তরফ হইতে যে এমন সব অবিচার হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতজীর নিকট উন্মুক্ত করিবেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে হক সাহেবের এক বিবৃতির উত্তরে সুভাষচন্দ্র জানাইয়াছেন যে, বাঙলার বর্ত্তমান শাসনে মফঃস্বলে হিন্দু উৎপীড়নের অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগসমূহ তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটা 'সাম্প্রদায়িক' বলিয়া তিনি প্রতীকারের কোন চেষ্টা করেন নাই। সুভাষচন্দ্রের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, সম্প্র-দায়ের কথা এখানে আসে না, মুসলমানদের অভিযোগের তদন্ত যদি সাম্প্রদায়িক বলিয়া বর্জ্জনীয় না হয়, তাহা হইলে হিন্দুদের অভিযোগই বা কেন হইবে? হিন্দু হওয়া কি এমনই অপরাধ যে, তাহাদের সম্বন্ধে অভিযোগের তদন্ত হওয়াও নিন্দনীয় হইবে? পণ্ডিত জওহরলাল হক সাহেবকে যুক্তপ্রদেশের তদন্তে আহ্বান করিয়াছেন, সুভাষচন্দ্রও তদ্রূপ বাঙলা দেশের তদন্তে হক সাহেবকে আহ্বান করুন—ইহাই আমাদের অনুরোধ।

রাজনীতিক আধ্যাত্মিকতা—

'ফরোয়ার্ড ব্লকের' ২৮শে অক্টোবরের সংখ্যায় সুভাষ-চন্দ্রের লিখিত মর্ম্মানুসন্ধান শীর্ষক প্রবন্ধটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই প্রবন্ধের একস্থানে সুভাষচন্দ্র লিখিয়াছেন—'সম্পূর্ণরূপে স্বার্থলেশহীন হইয়া অগ্রসর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অনুভূতি যদি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত-সারে স্বার্থ দোষে দুষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা যথার্থ পথে পরিচালিত করিবে না,—ভুল পথে লইয়া যাইবে এবং স্বার্থ যখন অনুভূতির উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, তখনই সমূহ বিপদ দেখা দিবে। কাজেই জাতির ভাগ্য লইয়া খেলা করিবার

সময় মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব স্বার্থলেশহীন হইতে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

স্বার্থলেশহীন হইবার চেষ্টাই আধ্যাত্মিক সাধনা। প্রেম মহাবল, কাম গন্ধ থাকিতে এই প্রেমের উপলব্ধি হয় না। এই প্রেমেতে প্রতিষ্ঠিত যিনি হইয়াছেন, তাঁহার মধ্যে মহাশক্তির খেলা আরম্ভ হয়। ইতর স্বার্থই যত অবীর্য্যের কারণ; প্রেমের আগুন চিত্তে জ্বলিলে অবীর্য্য দগ্ধ হইয়া যায়। অহঙ্কারের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া সাধকের সঙ্গে তখন সকলের যোগ ঘটে; ক্ষুদ্র স্বার্থের সেবাকে উপেক্ষা করিয়া তখন তিনি বৃহত্তর স্বার্থকে আস্বাদন করেন সকলের সেবার ভিতর দিয়া; তখন তিনি হন অনুশাসয়িতা, অন্য কথায় নেতা। এই স্তরে ভিতরের স্বরাজের উপলব্ধি বাহিরের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া রাজনীতিক স্বরাজকে প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতের আধ্যাত্মিকতার ইহাই মর্ম্ম কথা।

রুশিয়ার মনোভাব—

যুদ্ধের গতি নূতন আকার ধরিয়া উঠিবে বলিয়া মনে হইতেছে। রুশিয়ার সোভিয়েট সুপ্রীম কাউন্সিলে বক্তৃতায় মঃ মলোটোভ যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ইংরেজ এবং ফরাসীদিগকে দোষী করিয়া বলিয়াছেন,—'প্রথমে জার্ম্মান বাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে, তারপরে লালফৌজ আঘাত করে, এই দুই শক্তির আঘাতে ভার্সাই সন্ধি হইতে উদ্ভূত এই অ-পোলদের উপর অত্যাচারী রাষ্ট্রের উৎখাত হইয়াছে। জার্ম্মানরা এখন শান্তির জন্য উদ্গ্রীব, বিটেন এবং ফ্রান্সই শান্তি স্থাপন করিবার বিরোধী।' রুশিয়া ইংরেজ ও ফরাসীর কাছে শান্তির নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিবে, কি অন্য পথ ধরিবে এখনও বুঝা কঠিন। জগতের দৃষ্টি এখন রুশিয়ার দিকে আকৃষ্ট রহিয়াছে।

নব নির্ব্বাচিত কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট—

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। দেব মহাশয় ত্যাগপরায়ণ, নিস্পৃহ কর্ম্মী, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা হইতে তিনি সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া দেশমাতৃকার সেবার আনন্দ উপভোগ করিতে চাহেন। দলাদলির তিনি উদ্ধে। রাজনীতি ক্ষেত্রে মতভেদ যাঁহাদের সহিত তাঁহার ঘটে, তাঁহাদের সঙ্গেও মধুরতর সম্পর্ক তাঁহার সমানভাবে বিদ্যমান থাকে, বাঙালী জীবনে এই বস্তুটি বড়ই দুর্লভ। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দিয়াছিল, সুভাষচন্দ্রের ত্যাগ স্বীকারের ফলে তাহা মীমাংসিত হইল দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ওয়ার্কিং কমিটির কর্ত্তারা সুভাষচন্দ্রের মনোভাবের অনুকূলতা করিয়া কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যের বন্ধনকে বাঙলা দেশে সুদৃঢ় করিবেন, আমরা এইরূপ আশা করিতেছি।

পরলোকে ফণীন্দ্রনাথ পাল—

লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক 'যমুনা'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল গত শনিবার তাঁহার ঢাকুরিয়াস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। সাহিত্য সম্রাট শরৎ-চন্দ্রকে তিনিই প্রথম বাঙালী সমাজে পরিচিত করিয়া-ছিলেন। ফণীন্দ্রনাথের 'স্বামীর ভিটা', 'ইন্দুমতী', 'বন্ধুরে-বৌ', 'সুকুমার' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি এককালে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তিনি একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। ফণীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে বাঙলার সাহিত্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বাঙলা সাহিত্যের প্রবর্দ্ধমান প্রতিপত্তির মূলে ফণীন্দ্রনাথের অবদান সামান্য নহে। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আগামী সংখ্যা অর্থাৎ ৫১ সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গেই **'দেশ'**-এর ৬ষ্ঠ বর্ষ সমাপ্ত হইবে। পরবর্ত্তী সপ্তাহ হইতে নববর্ষ আরম্ভ হইবে।

সং, দেশ

বিধ্বস্ত মধ্য-ইউরোপ

শ্রীগুণময় আচার্য

মধ্য-ইউরোপে বর্তমান বিভীষিকার রুদ্রতাণ্ডব অতীতকে ছাপাইয়া এক অমানুষিক বর্বরতার অবতারণা করিয়াছে—অনেকের ইহাই বিশ্বাস। কিন্তু প্রায় যে কোন শতকের ইতিহাস অনুসরণ করিলেই বর্তমানের অনুরূপ দৃষ্টান্ত মিলিবে বিশেষ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর ত কথাই নাই। তাহা হইলেও যদি আমরা একবার সপ্তদশ শতকের প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া লই তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? স্পেন, চীন, বা পোল্যাণ্ডে তুমুল বোমাবর্ষণে যে নির্মম রক্তাক্ত ছাপ অঙ্কিত হইয়াছে ধনজন-সমৃদ্ধ নগরে-পল্লীতে, তাহা অপেক্ষা কোনক্রমেই বিভীষিকার ন্যূনতা দেখা যায় নাই ঐ শতকে জার্মানীর নর-নারীর উপর যে নিদারুণ অভিযান চলিয়াছিল তাহাতে। সেই নিষ্করুণ নির্যাতন আসিয়াছিল প্রতিদ্বন্দ্বী শাসকবর্গের পক্ষ হইতে—প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মগুরুদের তরফ হইতে—সমরোপলক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী অতিরিক্ত মুনাফাকারী-দের লুব্ধ স্বার্থোদ্ধার হইতে। ১৬১৮ হইতে ১৬৪৮—এই ত্রিশ বৎসরে মধ্য-ইউরোপে ধ্বংসের যে প্রলয়ঙ্করী মূর্তি প্রকটিত হইয়াছিল, বর্তমানে পুনরায় সে করাল মূর্তিই বুঝি দিগন্তে উদিত। তাই বর্তমানের ভয়াবহ ঘটনা পরম্পরা যেন পরিচিত বলিয়াই মনে হয়। সেই সপ্তদশ শতকের বিভীষিকার জয়যাত্রা যেন নূতন করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে।

কেবল তফাৎ এই 'প্রোটেষ্টাণ্টিজম্ বনাম ক্যাথলিকিজম্'-এর স্থানে ধরিতে হইবে 'কমিউনিজম্ বনাম ক্যাপিটালিজম্।' তাহা হইলেই যে মতবাদের বিরোধ চলিয়াছিল সেকালে তাহার আধুনিক আকারটি উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে। দৃষ্টি আরও একটু নিবিড় সন্নিবিষ্ট করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—মার্কসিজমের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা রূপ রঙিন যবনিকা-দ্বারাই প্রথমে হিটলার, মুসোলিনী এবং জাপান তাহাদের সাম্রাজ্যক্ষুধার ষড়যন্ত্রটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। সপ্তদশ শতকেও ঠিক এই প্রকারেই শাসকবর্গ তাহাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিরোধ ও লালসাকে পোপানুগত্য বা রিফর্মেশনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান করিয়াছিল। উভয় পক্ষই তখন 'দৈব আহ্বান' (divine calling) ও 'ভগবানের গীর্জা'র (God and his Church) দোহাই দিয়া বিপ্লবে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল।

ফলে ভাড়াটিয়া ফৌজ মধ্য-ইউরোপকে ছারেখারে দিয়া-ছিল—হাজার হাজার সৈনিক মৃত্যুবরণ করিয়াছিল—লক্ষ লক্ষ নর-নারী গৃহহারা, পরিজনহারা হইয়াছিল—সমগ্র অঞ্চল পরি-ণত হইয়াছিল শ্মশানে। লুণ্ঠন, নারীত্বের মর্যাদা হরণ—ইহাই ছিল ফৌজের প্রাপ্য বেতন। যাহা তাহারা বহন করিয়া লইতে পারিত না—তাহা বিনষ্ট করা হইত—ভস্মীভূত করা হইত। ত্রাসবুর্গ শহরে দুর্গ প্রাকারে দাঁড়াইলে দেখা যাইত চারিদিকে সারি সারি শত শত অগ্নিকুণ্ড। কিন্তু নিরুপায় নগরবাসী শহর ছাড়িয়া পলায়ন করিতেও সাহস পাইত না—পথিমধ্যে লুণ্ঠনের ভয়ে। প্রোটাষ্টাণ্টগণ গীর্জায় প্রবেশ করিয়া করিত লুণ্ঠন, তৎপর যিশু-মূর্তিকে ক্রুশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গাছে গাছে লট্‌কাইয়া রাখিত পথিপার্শ্বে। আবার ক্যাথলিক-দের বেতনভোগী সেনার হাতে প্রোটাষ্ট্যাণ্টগণ নিপীড়নপ্রাপ্ত হইত অতি নিষ্ঠুর। প্রোটাষ্ট্যাণ্ট গীর্জায় প্রবেশ করিয়া বাধা প্রদানকারী প্যাষ্টরের বাহু আর পদ ছেদন করিয়া বেদিকায় বসাইয়া রাখা হইত।

লুণ্ঠনের স্পৃহা এতই প্রবল ছিল যে, সমাধিস্থানে প্রবেশ করিয়া সৈনিকেরা কবর হইতে মৃতদেহ খুঁড়িয়া বাহির করিত লুক্কায়িত ধনরত্ন পাইবার আশায়। গৃহহারা পলাতক-দের সাক্ষাৎ মিলিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের হত্যা করিয়া সঞ্চিত অর্থ-বস্ত্রাদি গ্রহণ করিত।

অবশ্য সকল সেনা দল এতটা নিষ্ঠুর হইত না। কিন্তু লুণ্ঠনের প্রতি অপরিসীম ঝোঁক ছিল সবারই, এজন্য যে প্রিন্স বা রাজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহারা যুদ্ধে লিপ্ত হইত সেই প্রিন্স বা রাজা পর্যন্ত অধীনস্থ সেনাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হইতেন। ইলেক্‌টর ফ্রেডারিক, যিনি ইংলণ্ডের প্রথম জেমস্‌-য়ের কন্যাকে বিবাহ করেন, তিনি তাঁহার সেনা দলকে বলিতেন—শয়তানে পাওয়া (possessed of the devil)। সুইডেনের রাজা গুষ্টেভাস্ নিজ ভাড়াটিয়া জার্মান সৈনিকদের বলিয়াছেন,—"ঈশ্বর সাক্ষী, তোমরা নিজেরাই ধ্বংসকারী, তোমাদের পিতৃভূমিকে তোমরাই শ্মশান করিতেছ; তোমাদের দিকে তাকাইলে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।"

জাতীয়তা-বোধ তখনও যেন জন্মগ্রহণ করে নাই। তখন ডানপিটে আর গুণ্ডার দলই বেতনের লোভে সেনা দলে যোগ-দান করিত। তাহাদের নিজ দেশ বা দেশবাসীর প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করা সঙ্গত নয়, এই ধারণাও তাহাদের ছিল না। সামান্য লাভের আশায় এক পক্ষ ত্যাগ করিয়া বিরোধী পক্ষে যোগদান করিতে তাহারা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করিত না। সমান সাহস এবং সমান প্রতিহিংসার ভাবের সহিতই তাহারা পক্ষান্তর গ্রহণ করিত।

তাহারা আবার প্রত্যক্ষ রাজা বা প্রিন্সের অধীন কার্যে বহাল হইত না। অতিরিক্ত মুনাফাকারী দলের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহারা আজিকার লুব্ধ যুদ্ধ-সমর্থন-কারীদের মতই জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বাধাইয়া লাভবান হইত। তাহারা কিন্তু আধুনিক প্রফিটিয়ারের মত সমরোপ-করণ প্রস্তুতকারী নয়। তাহারা নিজেদের সেনা দলের নেতা ছিল। যে কেহ আহ্বান করিত, এবং ভাল রকম পুরস্কারের অঙ্গীকার করিত তাহার হইয়াই সদলবলে যুদ্ধ করিত। কাজেই যখন একটা যুদ্ধ সমাপ্ত হইত, তাহারা বেকার হইয়া পড়িত, তখনই আবার তাহারা নানাপ্রকার ফিকিরফন্দী খাটাইয়া তাহাদের অধীনস্থ সেনাদের নূতন কাজের যোগাড় করিত—রাজায় রাজায় বা রাজ্যের অভ্যন্তরে বিপ্লব উস্কাইয়া। ইহাদের ভিতর ওয়ালেন্‌ষ্টিন্, টিলি, ম্যানস্‌ফিল্ড, পিকোলো-মিনি প্রভৃতি বিখ্যাত। কত কবি তাহাদের বীরত্বের কীর্তি-কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। **কিন্তু তাহারা ছিল মানবতার শত্রু।**

ইতিহাসের খুঁটিনাটি ছাড়িয়া দিয়া মোটামুটিভাবে ইহাই বলা যায়—অতীতে জার্মান শাসক সাম্রাজ্য বৃদ্ধির লালসায়ই অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে—কিন্তু সফল হয় নাই তাহার প্রয়াস, হ্যাপসবুর্গ বংশের ঘটিল পতন এই কারণেই। আর এই কারণেই পরে হোহেনজোলার্নগণও শক্তি হারাইল। তথাপি আজ দেখিতে পাওয়া যায় হের হিটলার সেই অতীতের ব্যর্থ প্রয়াসেই অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে।

এখন যেমন, সেকালেও তেমনি ফ্রান্স তাহার তিন দিকের সীমানা রক্ষায় সমরে লিপ্ত হইতে সহজে চাহে নাই। জার্মানদের বিরুদ্ধে চেকদের আক্রোশ, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, গৃহহারা পলাতকদের নিরুদ্দেশ যাত্রা, মিথ্যা প্রচারের শতমুখী প্রচেষ্টা—অতীতের এই সকল বিচিত্রতা বর্ত্তমানেও বলবৎ।

বিগত মহাসমরের পর অনেকেই বিশ্বাস করিত অশান্তির বীজ চিরতরে দূরীভূত হইয়াছে। আবার একশত বৎসর পূর্ব্বেও এই প্রকার একটা তৃপ্তির ভাব ইউরোপে ছড়াইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটা মনুমেণ্ট গঠিত হইয়াছিল যেস্থানে রাজা গুষ্টেভাস্ হ্যাপস্বুর্গ রাজ বংশের সেনা দলকে পরাজিত করেন। সেখানে লেখা ছিল—"Freedom of belief for all the world," (সমগ্র দুনিয়ায় ধর্ম্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা)। তখনকার দিনে লোকে উহাই বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরও দেখা গিয়াছে অশান্তির বীজ লুপ্ত হয় নাই। সমর সম্ভাবনা অমর হইয়া আছে। বিগত মহাসমর তাহার মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে মাত্র।*

*মিস সি ভি ওয়েজউড প্রণীত A Seventeenth Century Parallel অবলম্বনে।

ফাগুন দিনের শেষে

নির্ম্মলকুমার মিত্র বি-এ

ফাগুন দিনের শেষে—
কে এলে, কে এলে আজ
নয়ন-ভুলানো বেশে।

মম যৌবন-বন মাঝে
শুন, ভৈরবী-সুর বাজে,
আর গাহে না পাখী গীতি
শাখীরা নাহি সাজে,
তুমি মঞ্জুল লীলা-ভরে
এলে খুশীর বাতাসে ভেসে।

হের, রজনী ঘন ঘোর,
আকাশে নাহি তারা,
হোথা ব্যাকুল রাঘু শুধু
কাঁদিছে দিশা-হারা;
এলে খুশীর বাতাসে ভেসে।
মনো-মোহন সাজে সাজি'—
আমি পূজিব কিবা দিয়া,
নাহি যে ফুল-রাজি!
শুধু মনেরি মধু দিয়া
প্রিয়! বরিনু হৃদয়-দেশে।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন আহারাদির পর সুধীর অক্ষয়ের সহিত বাহির য়ো পড়িল। যতীনের বাড়ীতে পৌঁছাইতে সন্ধ্যা হইয়া হবে। এই দুপুর রৌদ্রে কলিকাতায় কেহ বাহির হইতে হে না সত্য, কিন্তু গ্রামে আসিয়া গ্রামের ছেলেরা যেন স্থির হইয়া বেড়ায়। ঘর অপেক্ষা বাহিরই তাহার নিকট ধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়।

পথ চলিতে চলিতে সুধীর বলিল, যতীন ত আমাদের ওয়ার কথা কিছুই জানে না, ও যদি কোথাও গিয়ে থাকে, দিন দেরী করে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে গেলেই হত।

হাসিয়া অক্ষয় বলিল, না হে, বাড়ী ছেড়ে সে বড় কোথাও য় না, জমি তার দেখবে কে? কাজ ক'রে ফিরে এসে রত কোথাও যেতে পারে, কিন্তু সে ত আর বেশীক্ষণের ন্য নয়।

আর কোন কথা না বলিয়াই তাহারা আগাইয়া চলিল।

বৈকাল বেলা একটা বড় দীঘির নিকট আসিয়া অক্ষয় লিল, একটু ব'স এখানে, কিছু খাবার জোগাড় ক'রে নিয়ে াসি।

সুধীরের বসিতে এতটুকু আপত্তিও ছিল না। নিকটস্থ াছটায় হেলান দিয়া তাহারই স্নিগ্ধ ছায়ায় সে বসিয়া াড়িল।

গ্রামের বধূরা, মেয়েরা একে একে, দুয়ে দুয়ে কলসী াখে আসিতে লাগিল। এই যে সময়টা তাহারা তাহাদের াতের মধ্যে পাইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ না রিয়া তাহারা পারে না। গৃহের বাহিরে পরস্পরের সহিত কতটুকু সময়ই বা তাহাদের দেখা হয়। প্রতিদিন সকালে বিকালে নিজেদের খুশীমত ঘণ্টা দুয়েক ব্যয় করিয়া গৃহে ফিরিয়া শাশুড়ী অথবা মাতার তিরস্কারে এতটুকু কান না দিয়া পরের দিনের জন্য তাহারা ব্যস্ত হইয়া ওঠে। হাসিয়া, হেলিয়া-দুলিয়া যে যাহার স্বামীর এবং গৃহের কথা বলিতে বলিতে দীঘির ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধীর বসিয়া বসিয়া তাহাদের আগমন দেখিতে পাইল, অনেকের অনেক কথাই তাহার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল, কিন্তু এতটুকু আগ্রহ না দেখাইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর কিছু চিঁড়া, মুড়কি, বাতাসা ও কলা লইয়া অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। জামাটা খুলিয়া রাখিয়া দীঘির ঘাটের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল, না, ওখানে এখন না যাওয়াই ভাল। হাত-মুখ ধোওয়া প'ড়ে থাক। শুকনো চিঁড়েই চালাও। কথা শেষ করিয়াই একমুঠা মুখে পুরিয়া কলার খোসা ছাড়াইতে সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

আহার শেষ করিয়া অক্ষয় বলিল, একটু জল না পেলে চ'লবে না কিন্তু। চল চোখ-কান বুজে ঘাটেই যাওয়া যাক—দূরে থেকে খানিক গোলমাল ক'রতে ক'রতে গেলেই হবে।

সুধীর অক্ষয়ের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

অক্ষয়ের নেতৃত্বে সুধীরও হাত-মুখ ধুইয়া জল পান করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। একটি প্রগল্‌ভা যুবতী ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, জল যেন আর কোথাও নেই, পুরুষগুলোর যদি এতটুকু আক্কেলও থাকত!

অক্ষয় যেন এই কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল, সুধীরের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, শুনলে ত? একথা যে শুনতে হবে, তা আমি জানতুম। আমার কণ্ঠঠাকরুণও ঠিক এমনি কিনা। সংসার ত ক'রলে না আজও। আমি বলি কি, গোলমাল যখন হ'য়েছেই, তখন তার ব্যবস্থা তারই হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নাও। মিছি মিছি তোমার জীবনটাও নষ্ট ক'রে কি ফল পাবে? স্বর্গে গিয়ে মিলবে যদি ভেবে থাক ত সে ভরসা ছাড়, কারণ ভগবান যখন ইহকালই তোমার ব্যর্থ করে দিয়েছেন, তখন স্বর্গীয় হলে পরেও যে তোমার জন্যে তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠবেন, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আর এখন যমরাজের হাত, ষাঁড়ের ওপর বসে গুঁতোবার অভ্যেসই তাঁর হয়েছে, ঠাণ্ডা মেজাজ তাঁর কোনদিনই দেখবে না।

সুধীর বলিল, পরকালের কথা আমি একটুও ভাবি না, তাই সে-সব কথা ব'লে যুক্তি দেবার কোন দরকারই তোমার নেই।

অক্ষয় বলিল, তবে আমি ব'লব তুমি মেয়েদের প্রশংসা চাও। আবার বিয়ে ক'রলে পাছে তারা ছি ছি করে, এই তোমার ভয়। স্বার্থত্যাগ দেখাতে গিয়ে মস্তবড় স্বার্থপরতার কাজই করছ তুমি। বাঙলাদেশে বহু মেয়েই পিতামাতার দীর্ঘশ্বাসে শুকিয়ে উঠছে। তুমি সক্ষম হ'য়েও তাদেরই একজনের ভার নিতে রাজী না হ'য়ে পাপ ক'রছ ব'লেই আমি মনে করি। ওই যে মেয়েদের ঘাটে দেখে এলে, ওদের প্রাণশক্তি নষ্ট ক'রে দেবার কি অধিকার তোমার আছে বলতে পার?

অন্যমনস্কের মত সুধীর বলিল, তর্ক ক'রে অনেক কিছুই বোঝান যায় না অক্ষয়। একথা আর বেশীবার বলবার ইচ্ছে আমার নেই। শুধু এটুকু জেনে রাখ যে, এমন একটা জিনিষ আছে, যা তর্ক এবং যুক্তির চেয়েও বড়। কি সে জিনিষ, সে প্রশ্ন ক'র না—পার ত নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ। যাদের হাস্য-পরিহাস দেখে একটা দিক তোমার নজরে পড়েছে, তাদেরই সেই খুশীর আর একটা দিক কি তুমি ভুলে থাকতে চাও? যদি ভাবতেই হয় ত সম্পূর্ণ করে ভাব, যদি বুঝতে হয় ত এতটুকু ফাঁক রাখলেও ত চ'লবে না।

অক্ষয় কোন কিছু না বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি তুমি ব'লতে চাও স্পষ্ট ক'রেই বল। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

তেমনিভাবেই সুধীর বলিল, বুঝতে যখন পার নি, তখন

থাক্। প্রত্যেক জিনিষই যে যার নিজের ভাবে দেখে। তাই ওই হাস্য-পরিহাস আমি যেভাবে দেখেছি, তোমাকেও কি ঠিক সেই ভাবেই দেখতে হবে? কিন্তু শুধু যুক্তি দিয়েই যখন তুমি জিততে চাও, তখন সব কিছুই তোমার বিচার ক'রে দেখ্‌তে হবে বইকি। কিন্তু যাক্, আকাশের অবস্থাটা একবার দেখছ কি? আমাদের আলোচনার মধ্যে যত না সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার চেয়েও বড় রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে ওখানে।

উপর দিকে চাহিয়া অক্ষয় বলিল, আর ঘণ্টা দুয়েক চ'লতে পারলেই হয়। ছাতাটাকে ভাল ক'রে চেপে ধ'রে এগিয়ে চল, হঠাৎ ঝড় উঠ্‌তে পারে।

নিঃশব্দে কিছুদূর তাহারা আগাইয়া গেল। বহুদূরে আকাশের বুকে একটা বিদ্যুৎ চমকাইয়া তাহাদের অতি নিকটে আসিয়া পড়িল বলিয়াই মনে হইল।

চক্ষু বুজিয়া সুধীর বলিল, আর ত কোন উপায়ই নেই অক্ষয়। কাছাকাছি আর কোন গ্রামই ত বোধ হয় নেই।

ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। ক্রুদ্ধ বায়ু গর্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল। দূরের এবং নিকটের সমস্ত গাছই টলিতে লাগিল—হয়ত একটা তাহাদেরই উপর আসিয়া পড়িবে। আকাশের বুক চিরিয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া তাহাদের বুকের স্পন্দন আরও বাড়াইয়া দিল।

ছাতি বন্ধ করিয়া একটু সাহস দিয়া অক্ষয় বলিল, কাছাকাছি কোন একটা বাড়ী পাওয়া যেতেও পারে, কিন্তু ছাতাটা আর খুলে রেখ না।

বহুদূরে মাঠের মধ্যে একটা আলো দেখা গেল। তাহারা দুইজনেই সেদিক লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে লাগিল। প্রায় মিনিট পনের পর ছোট্ট একটি কুটীরের সম্মুখে আসিয়া মুহূর্তের জন্য দম লইয়া তাহারা সজোরে দরজা ধাক্কা দিতে লাগিল। ছোট্ট কুটীরখানাই ঝড়ের তাল সামলাইতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের দুইজনের একত্রিত জোর ধাক্কা খাইয়া দরজা এমন কি সারা কুটীরটিও কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই একটি যুবতী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। এক ঝলক বৃষ্টি লইয়া তাহারা দুইজনেই একসঙ্গে ঘরে প্রবেশ করায় যুবতীর কাপড়ও ভিজিয়া উঠিল। দরজা বন্ধ করিতে গিয়া যুবতী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নিকটেই আরও একজন আসিয়া দাঁড়িয়াছে বলিয়াই তাহার মনে হইল। তাহার সমস্ত শরীর যে এভাবে অপেক্ষা করিতে গিয়া ভিজিয়া গেল; সেদিকে তখন তাহার এতটুকু লক্ষ্যও ছিল না। সে অপলকদৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ তাহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল না। দরজার সম্মুখে একটি মনুষ্য-মূর্তি আসিয়া থামিয়া পড়িল; এই জল-ঝড়েও যেন তাহার কিছুই হয় নাই, এমনি অনেক কিছুই সে যেন অনায়াসে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে। দরজার সম্মুখে আসিয়াই সে হাসিয়া বলিল, আরে এ বৃষ্টিতে আবার দরজা খুলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে নাকি? না, বাঙলা দেশের মেয়েরা ভাবিয়ে তুল্‌লে দেখ্‌ছি। আমার চেয়েও বেশী স্নান ক'রে উঠেছেন যে। সরুন, ভেতরে ঢুকি।

যুবতী সরিয়া দাঁড়াইল, যুবক ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া বলিল, যান ত দিদি এবার ওগুলো ছেড়ে আসুন। যদি আর কেউ আসে ত আমি আছি, বাইরে দাঁড়িয়ে কাউকেই ভিজতে হবে না। যান দেরী ক'রবেন না।

যুবতী তাহার মুখের দিকে বিস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ইহাকে সে পূর্বে আর কখনও দেখে নাই, কিন্তু একথা বলিলে কে বিশ্বাস করিবে? উহার সহজ সরল কথাগুলি শুনিলে কেহ কি বুঝিতে পারিবে যে, উঁহাদের আর কখনও দেখা হয় নাই? যুবতী কোন কথা বলিতে পারিল না, তাহার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবার কথাও বোধ হয় তাহার মনে আসিল না।

তাহার অবস্থা বুঝিয়া হাসিয়া আগন্তুক বলিল, আমার কথায় আশ্চর্য হবার কি আছে? অচেনা হ'য়েও কি ক'রে ওসব বল্‌লুম, এই না? কিন্তু আপনিই বা আমাকে আসতে দেখে দরজা না বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন কি ক'রে? যাক্‌গে সে-সব, ঠিক হ'য়ে আসুন, খেতে হবে ত কিছু।

যুবতী এইবার হাসিল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, তাইত, বড়ই ভিজে গেছি আমি, কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, এই বৃষ্টির মধ্যে এসেও আপনার কাপড়-জামা শুক্‌নো রইল কি ক'রে? যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি সে জায়গাটা যে একেবারেই ভিজে গেল, স'রে আসুন, নইলে জ্বর হ'তে পারে শেষকালে।

যুবক নিজের জামা-কাপড়ের দিকে চাহিয়া জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, সেকথা আমার খুবই মনে আছে। তাইত আপনাকে ও-সব ছেড়ে আস্‌তে ব'ল্‌ছি। আপনি বাঙলার মেয়ে যখন তখন আমার জন্যে এতটুকু ভয়ও আমি করি না, ভয় আমাদের শুধু আপনাদের জন্যেই। মনে না করিয়ে দিলে ওসব বদলাবার দরকারই যে মনে করেন না আপনারা। পরের বেলা অতি তুচ্ছ বিষয়েও সজাগ, কিন্তু নিজেদের বেলা সম্পূর্ণ ঘুমন্ত, আর তাইত আমাদের ভয়। কিন্তু যাক্, আমারও একটা ব্যবস্থা করুন।

সম্মুখের ঘর হইতে সুধীর ও অক্ষয় বাহির হইয়া আসিল। নিজেদের ছোট সুটকেশ খুলিয়া পোষাক পরিবর্তন করিতেই এতক্ষণ তাহারা ব্যস্ত ছিল।

তাহাদের দিকে চাহিয়া আগন্তুক বলিল, এই যে, আপনারা যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত দেখ্‌ছি। পা-দুটোকে ক'রেছেন বটে! শুনেছি হরিণ খুব জোরে ছোটে, দেখি নি, তবে আপনারা যে বড় কম নন, সেকথা আমি জোর ক'রেই ব'লতে পারি। বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে চ'মকে ওঠায় দূরে থেকে আপনাদের দেখতে পাচ্ছিলুম বটে, কিন্তু কতবার যে পড়েছেন, তা ঠিক বুঝতে পারি নি। গা-হাত-পা ছ'ড়ে যায় নি ত?

হাসিয়া ফেলিয়া যুবতী পাশের ঘরে চলিয়া গেল এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই নিজের একখানা শাড়ী আনিয়া আগন্তুকের হাতে দিয়া বলিল, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া নিন্ আমিও ঠিক হ'য়ে নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রে দি।

আপনারা সবাই আমার অপরিচিত—নিজেদের পরিচয় আপনাদের নিজেদেরই ক'রে নিতে হবে। সে আর না দাঁড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

সুধীর তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, আমার একখানা কাপড়ও প'রতে পারেন আপনি। যুবক হাসিয়া বলিল, না, শাড়ীই ভাল, বেশ চওড়া পাড় আছে। তবে মেয়েদের কাপড়টা পছন্দ হ'লেও জামা আমার মোটেই পছন্দ নয়, তাই আপনার একখানা জামা বার ক'রে দিন।

সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া ঘরের মধ্যে পাতা মাদুরের উপর গিয়া তাহারা বসিল। অক্ষয় বলিল, চ'লেছিলুম বন্ধুর বাড়ী, কিন্তু মহাবিপদ যে অপেক্ষা ক'রেছিল, তা কি আর জানতুম? আর ঘণ্টা দুয়েক পরে হ'লেও চলত।

আগন্তুক বলিল, তা কি হয়। আমার ত মনে হচ্ছে এই হ'য়েছে বেশ—আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। বাঙলা-দেশে বহু অপরিচিত আছে, তাদেরই দু'জন পুরুষ আর একটি মেয়ের সঙ্গেও আলাপ হ'য়ে গেল ত। এ দেশের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হওয়া মস্ত সৌভাগ্যের বিষয় মনে রাখবেন। এদের সকলেই এক ছাঁচে গড়া, কিন্তু তবু যেন কোথায় প্রত্যেকেরই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, যেন পরস্পরের সঙ্গে কারও কোন মিল নেই। অদ্ভুত এরা। এ দু'টা চোখে অনেককেই দেখেছি, কিন্তু আজও তাদের বুঝে উঠ্তে পারি নি, তাই বোঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে শুধু দেখেই যাই। বসুন আপনারা, দেখে আসি আমার এ দিদিটি কি কাজে ব্যস্ত হ'য়ে আছেন এখন।

সে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার গমন পথের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া কি যেন জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। তাহাদের দুইজনের চক্ষেই প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু কোন উত্তরই মিলিল না।

আগন্তুক খুঁজিয়া খুঁজিয়া রান্নাঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়েটি তখন ভাত চাপাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া সে চক্ষু ফিরাইয়া চাহিল।

ঘরের মেঝেতে বসিয়া পড়িয়া যুবক বলিল, এইত, ভাবছেন কি বলুন ত? মহা সমস্যা না? কি দিয়ে খাওয়ান যায় এদের? হ্যাঁ, ভাববার বিষয়ই বটে।

মেয়েটি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, না, আপনার জন্যে ভাবি না আমি। যা খুসী দিলেই আপনার চ'লে যাবে, কিন্তু ওঁদের দু'জনকে দিই কি বলুন ত? ঘরে কয়েকটা আলু ছাড়া আর ত কিছুই নেই।

খুসী হইয়া যুবক বলিল, বলেন কি, আলুও আছে! গরম ভাত আলু দিয়ে—ও, সে যা হবে। আমার ত এখুনি—। কত দেরী হবে আর, আধ ঘণ্টা? ভাল কথা, আমার জন্যে চাল একটু বেশী নিয়েছেন ত?

মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসি থামাইয়া মেয়েটি বলিল, ব'লেছি ত আপনার জন্যে আমি এতটুকুও ভাবি না, কিন্তু সকলেই ত আর আপনার মত নয়। আমার অবস্থা আপনি বুঝবেন সে আমি জানি, আর এও জানি, হাসি আর আনন্দ আপনার নিত্য সঙ্গী। আমরা মেয়েরা আর কিছু না বুঝলেও এটুকু যে খুবই সহজে বুঝ্তে পারি, তা বোধ হয় আপনি নিজেও অস্বীকার ক'রবেন না। কথা বলিতে বলিতে মেয়েটির চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া জ্বলন্ত উনানটার দিকে চাহিয়া রহিল।

আস্তে আস্তে যুবক বলিল, কিছু ভাবনা নেই আপনার। ওদেরও কোন কিছুতে আপত্তি হবে না; আর যদি হয়-ই ত স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দেব যে, আমার দিদির বাড়ীতে এর চেয়ে কিছু বেশীর আশা নেই। অপছন্দ যদি হয় ত পথ প'ড়ে আছে খোলা, আর দরজায়ও তালা দেওয়া নেই—সোজা বেরিয়ে পড়লেও কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু আর কত দেরী?

মেয়েটি ব্যস্ত হইয়া বলিল, বেশী দেরী আর নেই। আমি জায়গা ঠিক ক'রে আসি, আপনি ততক্ষণ ব'সে থাকুন এখানে।

আরও মিনিট পনের পরে আহারে বসিয়া যুবক বলিল, আপনারা চ'লেছিলেন ত বন্ধুর বাড়ী, কিন্তু কতদূর সে জায়গাটা, আর নামটাই বা কি?

অক্ষয় বলিল, খুব বেশী দূরে নয়, এই কাছেই—হলদিপুরে। নাম শুনেছেন কি?

যুবক মাথা নাড়িয়া বলিল, বটে, হলদিপুরে? আমি যে তার পাশের গাঁ থেকেই আস্ছি। মেয়েটির দিকে চাহিয়া সে বলিল, বুঝেছেন দিদি, ওখানে কে এক সাধু এসেছেন, ওষুধ দিচ্ছেন। তাই শুনেই এসেছিলুম দেখা করতে—কিন্তু কোথাই বা তাঁর গেরুয়া, আর কোথাই বা মন্ত্রপড়া মাদুলী। ওষুধ দিচ্ছেন বটে, কিন্তু খাঁটি ডাক্তারী মতে। তবে সাধুজী সত্যিই মহৎ—ওখানকার ছেলেদের নিয়ে স্কুল ক'রেছেন—পয়সাও লাগে না তাদের, এমন কি বইও অনেক সময় তিনিই দেন। আবার চাষা-ভুষোদের সঙ্গেও কি সব নিয়ে আলোচনা করেন দেখে এলুম। কেউ বলে স্বদেশী, কেউ বলে শাপভ্রষ্ট, কিন্তু তিনি যে সৎ একথা অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই। আসবার সময় দেখা ক'রে আসবেন তাঁর সঙ্গে।

অক্ষয় বলিল, হলদিপুরেও গিয়েছিলেন নাকি আপনি?

নিশ্চয়ই। সেখানেও দেখে এলুম আর একজনকে, শক্তিমান পুরুষ। বাঙালী ভদ্রলোকের পাশ করা ছেলেও যে লাঙল ধ'রতে জানে, তা ভাবি নি। সাধুজীই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন।

সুধীর বলিল, তার ওখানেও গিয়েছিলেন নাকি? আমাদেরই বন্ধু সে—আমরা ত সেখানেই যাচ্ছি। কি নাম আপনার বলুন ত?

যুবক হাসিয়া বলিল, নামটা এমন বিশেষ কিছু শ্রুতিমধুর নয়। হেমন্ত ব'ললেই তাঁরা চিনতে পারবেন। আপনিই বোধ করি সুধীরবাবু, আর তাহ'লে ওঁকে অক্ষয়-বাবু হ'তেই হবে। আলাপ যে কখন কার সঙ্গে হয়! কিন্তু আর ব'সে থেকে লাভ কি? আহার যখন শেষ হ'য়েছে, তখন উঠে পড়াই ভাল।

হাত-মুখ ধুইয়া তাহারা ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে, এমন সময় পাশের ঘরে কে যেন খুব জোরে টানিয়া টানিয়া কাশিতে লাগিল। তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি ব্যস্ত হইয়া সেই ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল, আপনারা বসুন গিয়ে, আমি এক্ষুণি আসছি আপনাদের ব্যবস্থা ক'রে দিতে।

তাহারাও আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিল। ঘরের মধ্যে মিট্‌মিটে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহারই আলোয় তাহারা দেখিতে পাইল চৌকির উপর ছিন্ন একটি বিছানায় একটি বৃদ্ধ উপুড় হইয়া শুইয়া আছে আর তাহারই পিঠে ওই মেয়েটি ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছে। চেহারা দেখিয়া তাহার বয়স অনুমান করিবার সাধ্য কাহারও নাই, যাট হইতে ঊর্দ্ধতন যে কোন বয়সের বলিয়া তাহাকে চালাইয়া দেওয়া যায়।

হেমন্ত আগাইয়া গিয়া আরও গোটা দুই বালিশ এবং কাঁথা তাহার বুকের তলায় গুঁজিয়া দিল। বৃদ্ধ একবার চক্ষু তুলিয়া তাহার দিকে চাহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কাশির দমকে সক্ষম হইল না। সে কোনদিকে না চাহিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

মিনিট পনের কাশিয়া বৃদ্ধ হাঁপাইতে লাগিল।

হেমন্ত বলিল, একটু তেল গরম ক'রে মালিশ ক'রে দিতে হবে এবার। আর সেই সাধুকে একটা খবর দিলেও ত পারেন, আর কোন কিছু না হ'লেও একটু সাহায্য ত পেতে পারেন তাঁর কাছে।

মেয়েটি বলিল, তিনি নিজেই আসেন মাঝে মাঝে, তাঁদের ডাকতে হয় না তাঁরা আপনিই টের পান। তিনি একটা ওষুধ দিয়ে গেছেন, তাই খাইয়ে দিতে হবে—তেলের দরকার নেই।—

প্রসন্ন হাসিতে হেমন্তর মুখ ভরিয়া উঠিল, আস্তে আস্তে সে বলিল, সেই ভাল ডাক্তারের কথাই শোনা দরকার, আমরা ত শুধু বাজে ডাক্তারীই করি।—না জানলেও বক্তৃতা আমাদের থামে না। কিন্তু সাধুজী যখন আছেন এর মধ্যে তখন আমাদের চুপ ক'রে থাকাই ভাল। এসব সাধুরা সত্যিই মহৎ—ওঁদের কাজের সুবিধে ক'রে দেওয়াই আমাদের উচিত। এঁদের বিরুদ্ধে একটা কথাও ভাবতে নেই, নিজেদের চেয়ে পরকেই এঁরা মনে করেন বেশী, পরের কথা ভাবতে গিয়েই ঘর-সংসার এঁদের ভেসে যায়, অথচ সংসারী হবার অধিকার আমাদের চেয়েও তাঁদের কত না বেশী!

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক ব'লেছ বাবা, এঁরা মস্ত লোক। ওর মা মারা যাবার পর থেকে মেয়েটাকে আমিই আজ পর্যন্ত টেনে বেড়ালুম, কত কষ্ট যে গেছে সে আমিই জানি, কিন্তু কই এতটুকু দরদও ত কারও হ'তে দেখলুম না। তাই গাঁ ছেড়ে এমনি একা একা আছি, কিন্তু ওই অল্পবয়সী সাধু এসে যেন সব গোলমাল ক'রে দিলে। আবার যেন গাঁয়ের জন্যে মন কেমন করে, প্রতিবেশীদের মধ্যে গিয়ে আবার আসর জমাতে ইচ্ছে করে, তামাক টানতে টানতে দাবার চাল ব'লে দেবার জন্যে মনের ভেতর যে কি রকম ক'রতে থাকে তা কি ব'লব তোমায়। এ লোকগুলো নিজেরা সংসারের ধার দিয়েও যাবে না অথচ সংসারের বাইরে যারা যেতে চাইবে তাদের মনের মধ্যে একটা আকুল আগ্রহ জাগিয়ে দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে দেবে সংসারের মধ্যে। এরা নিজেরা পাগল ব'লেই সবাইকে এমন ক'রে পাগল ক'রতে পারে। বৃদ্ধ হাঁপাইতে লাগিল। মেয়ে আগাইয়া আসিয়া তাহাকে ওষুধ খাওয়াইয়া দিল।

বৃদ্ধ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, আমার জন্য কোন ভয়ই করি না, আর বেশী দিন আমার নেই, কিন্তু ওই মেয়েটা। আরও অনেককে ব'লেছি, কিন্তু কেউ ওর ভার নেয়নি। অনেকে সহানুভূতি দেখিয়ে ঘাড় নেড়ে ওর ভার নিতে রাজী হ'য়েছে কিন্তু ওই পর্যন্তই—কাজের বেলা কেউ আর এগিয়ে আসেনি। কি যে করি। তোমরা একজন যদি—

মেয়ে বাধা দিয়া বলিল, তুমি চুপ কর বাবা, আর বেশী কথা ব'ল না।—

হেমন্ত বলিল, কোন ভয়ই আপনার নেই। সেই সাধুজী যখন আছেন, তখন ব্যবস্থা ত' হ'য়েই আছে। এরা মানুষকে শুধু সেবাই করে না তাদের মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। জাতির ভবিষ্যতের এরাই কাণ্ডারী। এদের অবিশ্বাস ক'রেই মানুষ ঠকে। একটু বিশ্বাস চাই আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই—কিন্তু আপনি ঘুমোন আর একটা কথাও ব'লবেন না।

বৃদ্ধ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল আর একটি কথাও বলিল না।

মেয়েটি পাশের ঘরে তাহাদের শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সুধীর ও অক্ষয় আর বসিয়া না থাকিয়া শুইয়া পড়াই যুক্তিসংগত মনে করিল।

মেয়েটির কাছে আসিয়া হেমন্ত বলিল, একটা বাতি দিতে পারেন দিদি আমার একটু কাজ ছিল।

বাতি লইয়া হেমন্ত বসিয়া বসিয়া গোটা কয়েক চিঠি শেষ করিয়া যখন মাথা তুলিল তখন প্রায় তিনটা বাজে। তাহার লেখা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি কাছে আসিয়া বলিল, এবার একটু শুতে যান। কি যে এমন লেখা!

মৃদু হাসিয়া একটা চিঠি তাহার হাতে দিয়া হেমন্ত বলিল, কাল ঠিক আটটার সময় সাধুজী আসবেন তাঁর হাতে এটা দিয়ে দিবেন।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মেয়েটি বলিল, তিনি আসবেন সে কথা আপনাকে কে বললে? কাল'ত তাঁর আসবার কোন কথাই নেই।

তেমনি হাসিয়া হেমন্ত বলিল, কথা'ত অমন অনেক কিছুই থাকে না। কিন্তু চিঠিটা রইল, এলে দিয়ে দেবেন।

মেয়েটি বলিল, তা হ'ক কিন্তু এখন শুতে যান।

হাত-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া হেমন্ত বলিল, হাঁ যাব আর আধ ঘণ্টা বাদে, ততক্ষণ ব'সে ব'সেই একটু ঘুমিয়ে নি। কিন্তু আপনি আর জেগে থেকে অসুস্থ হ'য়ে সাধুজীর কাজ বাড়াবেন না।

মেয়েটি অবাক্ হইয়া বলিল, আধঘণ্টা বাদে যাবেন কোথায়?

(শেষাংশ ৬৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুসলিম সংহতির এক অধ্যায়

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল্

ইতিপূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছি যে, মুসলিম সংহতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইতেছে হিন্দু সংহতি। বিষয়টিকে আরও একটু বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন লোক আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু প্রধান সমস্যা হইতেছে, ইহাদের এইপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা দূর করিবার উপায় কি? মুসলমানগণ যদি নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র দল গঠন করে এবং সরকারকে পুনঃপুন চাপ দেয়, তবে সেইরূপ স্বতন্ত্র দল ত অন্য সম্প্রদায়ও করিতে পারে। ধরুন, দেশে সর্ব্বসাধারণের জন্য কোন সর্ব্বজনীন দল নাই। হিন্দুর দল, মুসলমানের দল, খৃষ্টানের দল, এইভাবে ধর্ম্মের ভিত্তিতে দল গঠিত হইল। বিভিন্ন দলের নেতারা স্ব স্ব সম্প্রদায়কে একত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। কিন্তু এমন যদি হয় যে, হিন্দুর স্বার্থে ও মুসলমানের স্বার্থে অথবা খৃষ্টানের স্বার্থে এমন বিরোধ উপস্থিত হইল, যে একজনের স্বার্থ অপরের স্বার্থে আঘাত না করিলে কিছুতেই পূরণ হইতে পারে না, সে ক্ষেত্রে কি করা উচিত হইবে? কোন শক্তি তাহাদের এই বিরোধ মিটাইয়া দিবে? এখানে দুইটি মাত্র পথ আছে, তাহার একটি আমাদেরকে বাছিয়া লইতে হইবে। হয় বিভিন্ন সম্প্রদায়কে স্নেহ ভালবাসা ও সদ্ভাব দ্বারা একটা আপোষ করিতে হইবে অথবা প্রবল ক্ষমতাশালী কোন তৃতীয় পক্ষের আশ্রয় লইতে হইবে। সে নিজের বিবেচনায় যাহা উচিত মনে করিবে তাহাই আমাদিগকে নত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। যদি তৃতীয় পক্ষের আশ্রয় না লইয়াই আমাদিগকে আপোষ করিতে হয়, তবে স্বতন্ত্র দল গঠনের কোনওরূপ প্রয়োজনীয়তা নাই। কারণ, স্বতন্ত্র দল গঠন করিলে আপোষের ভাব আর থাকিবে না। বিদ্বেষ রেষারেষির মধ্যেই স্বতন্ত্র দল কাজ করিবে। জনসাধারণকে হিন্দু উত্তেজিত করিবে হিন্দু স্বার্থ রক্ষার জন্য, আর মুসলমান করিবে মুসলমান স্বার্থ রক্ষার জন্য। ইহারা কিছুতেই একত্র হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ যখন ত্যাগ বিনিময়ের কথা উঠিবে তখন ত পারিবেই না। সুতরাং স্বতন্ত্র দল বা সাম্প্রদায়িক সংহতি হইতে পরস্পরের মধ্যে প্রচণ্ড রেষারেষি জাগিবে— এই রেষারেষি কাহারও মনে ঐক্য বোধ জাগিতে দিবে না। আর ঐক্যবোধ যদি না জাগে তবে স্বাধীনতা আসিতে বহু বিলম্ব হইবে। ইতিমধ্যে তৃতীয় পক্ষ নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের সমস্ত শক্তি লইয়া আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক সংহতির একটা প্রধান কুফল এই হইবে, চিরদিন ভারতবর্ষ পরাধীন থাকিয়া যাইবে। যদি সাম্প্রদায়িক নেতাদের ইহাই উদ্দেশ্য হয় তবে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইবে। কিন্তু তাঁহারা মাঝে মাঝে যে স্বাধীনতার বুলি আওড়ান, তাহা যে নিছক ভণ্ডামী তাহা অনায়াসে প্রমাণিত হইবে। আমাদের বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িক নেতারা এই গোপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন।

আমাদের দ্বিতীয় কথা হইতেছে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দল বা সংহতি গঠিত হইলে মাইনরিটিদের অবস্থা কি হইতে পারে তাহা প্রত্যেকের দেখা কর্ত্তব্য। সমগ্র ভারতে বাইশ কোটি হিন্দু যদি হিন্দু মহাসভার অধীনে একটি সঙ্ঘবদ্ধ দল গঠন করে এবং তাহারা যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, এই "হিন্দুস্থানে" অন্য কোন অহিন্দুকে কোন সুবিধা দিব না তাহা হইলে প্রবল তৃতীয় পক্ষের সাহায্য ব্যতীত মাইনরিটিগণ কি করিতে পারে? বাইশ কোটি অধিবাসীর সঙ্ঘবদ্ধ শত্রুতা কি সাত কোটি লোককে কাবু করিতে পারে না? হয়ত তাহাদিগকে সমূলে নিধন করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহাদের পথে নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি করিতে এই বাইশ কোটির দল যথেষ্ট। আর তৃতীয় পক্ষ সব সময় যে মাইনরিটিকে সাহায্য করিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? সুতরাং সাম্প্রদায়িক সংহতি বস্তুটা মাইনরিটিদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। এদেশের মাইনরিটিগণ যদি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী হইতেন তবে তাঁহারা মুসলিম সংহতি অথবা খৃষ্টান সংহতির কথা ভ্রমেও উত্থাপন করিতেন না। এই সব সংহতির প্রতিক্রিয়া তাহাদের উপর ভীষণভাবে হইবে। তাহার দাপট তাঁহারা সহ্য করিতে পারিবেন না। এসব কথা তাঁহারা যে বুঝেন না তাহা নহে। কিন্তু লীগপন্থী নেতাগণ চান যে দেশের বুকে বৈদেশিক প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকুক। তাই তাঁহারা এমন কাজ করিতেছেন যাহার জন্য দেশের লোক বিদেশী শাসনের প্রয়োজনীয়তাকে দরকারী বলিয়া মনে করিতে পারে; এবং হিন্দুগণ আরও সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে। মুসলিম সংহতির চাঁইগণ বলিয়া থাকেন যে, সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের কবল হইতে মুসলমান সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা স্বতন্ত্র দল ও সংহতি গঠন করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা দূর হইবে না। বরং আরও বৃদ্ধি পাইবে। বাস্তবিকই যদি হিন্দু সংহতি ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা মুসলমানের ভয়ের কারণ হয় তবে তাহার প্রতিকার মুসলিম সংহতি নয়। তাহার শ্রেষ্ঠ প্রতিকার জাতীয়তার ভিত্তিতে সর্ব্বদল গঠন। এই সর্ব্বদল সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবে, তাহাদের স্ব স্ব-বিরোধী স্বার্থের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিবে, এবং সকলকে সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় ভাবের প্রেরণা যোগাইতে থাকিবে। প্রকৃত মুসলিম স্বার্থের প্রতি যাহার দৃষ্টি আছে, সে সব সময় দেখিবে যাহাতে হিন্দু সংহতি প্রবল হইতে না পারে। এমন কাজ সে কিছুতেই করিবে না, যাহার প্রভাবে হিন্দুদের মনে সাম্প্রদায়িক বোধ জাগিতে পারে। তাহার আচরণ ও দাবী দাওয়া এরূপ ধরণের হইবে যাহার জন্য সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হিন্দুর মনেও বিদ্বেষ ও হিংসার ভাব জাগিতে পাইবে না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ মুসলিম সংহতির ধূয়া তুলিলে তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দু সংহতিও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। তাই বলিতেছিলাম যে, মুসলিম সংহতির পরিণতি হইতেছে হিন্দু-সংহতি। এবং হিন্দু সংহতি বন্ধ করিবার উপায় হইতেছে মুসলিম সংহতির আদর্শ চিরতরে পরিত্যাগ করা।

যেদিন মুসলিম লীগ মুসলিম সংহতির ধূয়া তুলিয়াছিল, সেদিন কেহ যে হিন্দু সংহতির বায়না ধরে নাই, তাহার কারণ কংগ্রেসের প্রভাব। কংগ্রেস চাহিয়াছিল, পরিশুদ্ধ জাতীয়তার উপর একটি ভারতীয় দল গঠন করিতে। সেইজন্য যাহাদের উপর কংগ্রেসের প্রভাব পড়িয়াছিল, সে সব হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংহতির মোহে প্রলুব্ধ হয় নাই। হিন্দু জনসাধারণও কংগ্রেসের প্রভাবাধীনে আসিয়া জাতীয়তার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিল। কিন্তু যে গোপন হস্ত মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল, সেই অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দু সংহতির আদর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুসলমান নেতারা যদি সত্যিকার ভাবে চাহিতেন যে, হিন্দুরা সাম্প্রদায়িকতা হইতে সরিয়া থাকুক, তাহা হইলে তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সংহতির সমস্ত আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহারা ধরিলেন উলটা পথ। তাঁহারা তীব্রভাবে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই হইল যে, বহু রুষ্ট হিন্দু হিন্দু সংহতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। বাঁটোয়ারা আসিয়া এই হিন্দু সংহতির প্রয়োজনীয়তাকে আরও বাড়াইয়া তুলিল। মুসলমানগণ মনে করিলেন যে, বাঁটোয়ারা তাঁহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ সুবিচার

করিয়াছে। আর হিন্দুরা মনে করিলেন যে, উহা তাঁহাদের প্রতি ঘোর অবিচার করিয়াছে। এই উভয় দলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার জন্য কংগ্রেস এমন একটা নীতি গ্রহণ করিল যাহা কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। কংগ্রেস বিরোধী হিন্দুরা এই সময় হিন্দু সংহতির ধুয়া তুলিবার একটা সুন্দর অবসর পাইলেন। বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু সংহতির আন্দোলন, মুসলিম লীগের সঙ্কীর্ণ নীতির অপরিহার্য্য পরিণতি। মুসলিম স্বার্থের দিক হইতেও বাঁটোয়ারাকে সমর্থন করা অপেক্ষা নিন্দা করিবার বহু কারণ বিদ্যমান থাকিতেও যখন মুসলমান উহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিলেন, তখন বাঁটোয়ারা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংহতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমান নেতাদের বুঝা উচিত ছিল যে, যে বাঁটোয়ারা মুসলিম সংহতির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে সহায়তা করিতে পারে, তাহা হিন্দু সংহতিও সৃষ্টি করিতে পারে। আজ দেশময় হিন্দু-সংহতির যে আয়োজন হইতেছে, তাহা কখনই হইত না, যদি মুসলমান নেতারা সমস্ত হিন্দু না হউক, অন্ততঃ জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের সহিত একত্র মিলিত হইয়া বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করিয়া সত্যিকারের গণতান্ত্রিক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেন। আজ হিন্দু সংহতির ভয়ে আতঙ্কিত হইলে চলিবে কেন? বিষবৃক্ষের বীজ লীগপন্থীরা রোপণ করিয়াছেন, তাহার ফল-ভোগও তাঁহাদিগকেই করিতে হইবে। তবে আশার কথা এই যে, হিন্দু সংহতির শত প্রলোভনেও এমন লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছেন, যাঁহারা সর্ব্বস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া জাতীয়তার আদর্শকে দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিয়া আছেন। কিন্তু মুসলিম লীগ তাহার নীতি পরিবর্ত্তন না করিলে এ অবস্থা অধিক দিন থাকিবে না। লীগ-নেতাদিগকে সমস্ত বিষয় ধীরভাবে আলোচনা করিতে বলি। তাঁহাদের ভুল একদিন ভাঙ্গিবে, কিন্তু আজ এ ভুল ভাঙ্গিলে যে উপকার হইত, পরে তাহা হইবে না। তখন হয়ত প্রতিকারের কোন পথ থাকিবে না।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(৬৯৪ পৃষ্ঠার পর)

হেমন্ত সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আপনিও শুতে যান। দেওয়ালে হেলান দিয়া চক্ষু বুজিয়া সে স্থির হইয়া রহিল।

পরের দিন ভোরে উঠিয়া তাহাকে আর দেখা গেল না।—সুধীর ও অক্ষয় বিস্মিত হইয়া উঠিল। মেয়েটি কিন্তু কিছুই বলিল না, শুধু মুখ গম্ভীর করিয়া অভিমানে সে নানা কাজে নিজেকে ব্যস্ত করিয়া রাখিল। যে লোকটি আসিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত কিছু ওলট-পালট করিয়া দিয়া গেল তাহাকে কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল। সে কোথা হইতে আসিয়াছিল, কোথায়ই বা গেল এবং কেনই বা ওই গভীর রাত্রে কোন কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল, তাহা না বুঝিলেও তাহার অদ্ভুত আচরণের কথা থাকিয়া থাকিয়া কেবলই তাহাকে আঘাত করিতেছিল। সে তাহার প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই, কিন্তু তাহাকে ভুলিয়া থাকা সম্ভব নহে।

সুধীর আর অক্ষয়ও আর দেরী না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত কাজ ফেলিয়া সে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। চারিদিকের বিরাট শূন্যতা যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিতেছিল -যে আসিয়াছিল সে আর আসিবে না হয়ত' আর কোনদিন দেখাও হইবে না' তাহার সঙ্গে। (ক্রমশ)

রোজা ও পূজা

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র রায়

মন্দিরেতে শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিতেছে বোধনের গান,
মস্‌জিদে মুছল্লীগণ তুলিতেছে পবিত্র আজান।
"ব্রহ্ম সত্য",--বেদমন্ত্র ঋষিমুখে শুনিয়াছি সদা,
কোর্-আণের মূল বাণী--"দুনিয়ায় একমাত্র খোদা"।
তবে আর কিসের বিভেদ? কেন তবে এই মারামারি?
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্‌কণা লাগি কেন আজি এত কাড়াকাড়ি?

শিরোমণি-দা

(গল্প)

শ্রীনিখিল সেন

একে একে সকলে ছেলে-পিলে লইয়া অভুক্ত বাহির হইয়া আসিল। ফটিক বাঁড়ুজ্যে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকাইয়া রহিলেন শূন্যচোখে। একটি নিশ্বাস তাঁহার বুক হইতে এক সময় ঝরিয়া পড়িল।

জলের মত সব কিছু আজ তাঁহার নিকট তরল হইয়া উঠিল। কিছুই আর বুঝিয়া উঠিতে বাকি রহিল না। ষড়যন্ত্র! বাড়ী বহিয়া তাঁহাকে অপমান করিয়া যাইবার ও বর-কর্তাদের সামনে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার ফুটিল এক ষড়যন্ত্র। আর ইহার পিছনে রহিয়াছে—লক্ষ্মী মুখুজ্যের ছেলের সঙ্গে মঞ্জুশ্রীর বিবাহে তাঁহার অটল আপত্তি। তাই কাশী চাটুয্যে প্রভৃতি গাঁয়ের অর্ধ-শিক্ষিত সমাজ-পতির দল তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইবার পূর্বে সংকল্প করিয়াই তাঁহাকে আজ অমন অপমান করিয়া গেল বাড়ী বহিয়া।

এমনতর এক ঘটনা ঘটিতে পারে এবং ঘটিবে বাঁড়ুজ্যে মহাশয়ের মনে পূর্বেই যে এ কথা উঁকি মারে নাই, এমন নয়। তিনি ঠিক জানিতেন মঞ্জুশ্রীর এই বিবাহ গাঁয়ের অনেকের চোখকেই ঝলসাইয়া দিবে। গতানুগতিকতার প্রথা ভাঙিয়া গেল বলিয়া, তাহারা ঠিক চমকাইয়া উঠিবে। বিরোধিতা করিতে হয়ত ইহারা শতমুখে চেষ্টা করিবে। কিন্তু বিমান ছেলেটিকে তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। কিছুদিনের স্বল্প আলাপে তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেনঃ মঞ্জুশ্রীকে যদি নির্ভাবনায় বিমানের হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়, সামাজিকতার দিক হইতে তাঁহার ক্ষতি একটু হইলেও হইতে পারে, কিন্তু মানবিকতার দিক হইতে যাচাই করিতে গেলে তাঁহার এক ছটাকও কোথাও লোকসান হইবে না—তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। মঞ্জুশ্রীর দিক হইতেও তিনি আগা-গোড়া তলাইয়া দেখিয়াছেন।.....

তবুও এই বিবাহের নিমন্ত্রণ ব্যাপার লইয়া তিনি অভ্যাগত অতিথিদের সবিনয় কাতর অনুরোধ করিয়াছেন বারে বারে। পরিচিত অপরিচিত অনেককে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন বিবাহে। কেহ আসিয়াছে; কেহ আবার আসে নাই। এমন কি, প্রতিবেশীদের অনেকেও শুধু সন্ধ্যার দিকে একবার আসিয়া এক খিলি পান আর তামাক খাইয়া গিয়াছে। অন্ন স্পর্শ কেহ করে নাই। কিন্তু যাহারা আসিয়াছে, তাহারাও যখন বসিবার জন্য ঠাঁই হইলেই একে একে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছেলে-পিলে লইয়া উঠানে নামিয়া আসিল অভুক্ত, রাগে ও অপমানে বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের কুঞ্চিত কঠিন মুখখানি আরো কঠিন হইয়া গেল। রাশীকৃত অন্ন-ব্যঞ্জনের অপব্যয়টা তিনি মনে মনে একবার নাড়াচাড়া করিলেন। তাঁহার মত একজন দরিদ্র শিক্ষকের পক্ষে ক্ষতির এই পরিমাণটা কতখানি গুরুতর, মনে মনে তিনি তাহা একবার ওজন করিয়া দেখিলেন।

মাথা নত করিয়া তিনি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পৌষের এই কনকনে রাত্রিতেও তাঁহার কপালে কয়েক ফোঁটা ঘাম জমিয়া উঠিল। চাপা একটি দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বুক হইতে এক সময় বাহির হইয়া আসিল। তিনি সহসা হাতের উল্টা পিঠ দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া লইলেন। স্বস্তির হাঁপ ছাড়িয়া তিনি যেন বাঁচিয়া গেলেন। পঙ্গু গেঁয়ো সামাজিকতার সব হীন রেষারেষিকে যেন তিনি এক মুহূর্ত পূর্বে দুহাতে সবলে ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলিয়াছেন আপনার কপাল হইতে।

এমন এক আবহাওয়ায় যাহা হওয়া খুব স্বাভাবিক তাহাই হইল। হৈ চৈ; চারিদিকে ঝামেলা বিশৃঙ্খলা। উষ্ণ হাওয়ার এই স্রোতটা একটু কমিয়া আসিলে তিনি আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া বর-যাত্রীদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেনঃ

—দয়া করে আপনারা এবার উঠুন। গ্রাম্য দেবতাদের জন্যে আপনাদের বহু কষ্টই—

বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের শেষের কথাগুলি মুখেই রহিয়া গেল। বলা আর হইল না। এমন সময় উঠানে হন হন করিয়া ছুটিয়া আসিলেন একজন আগন্তুক। কালো রুক্ষ কম্বলে তাহার সর্বাঙ্গ ঢাকা। হাতের পুরান লাঠিটার উপর নিজের আনত দেহখানাকে যতদূর পারা যায় খাড়া করিয়া বৃদ্ধ এই লোকটি প্রবল কাশিয়া ফেলিলেন। কাশির অদম্য বেগ একটু থামিতেই তিনি সামনে দাঁড়ান লোকটির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। বারান্দার কড়িকাঠে ঝুলান বাড়ীর বহু পুরাতন ঝাড়-লন্ঠনটির মৃদু আলো উঠানের মাঝখানটায় আসিয়া ফুরাইয়া গিয়াছে। ঝাপসা অন্ধকারে ঠাহর করিয়া কাহাকেও চিনিয়া উঠিতে না পারিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

—কৈ, ফটিক কৈ গো?

শির-বহুল দুখানি হাত বাহির করিয়া তিনি খাপ হইতে সুতা-বাঁধা নিকেলের চশমাখানি নাকের ডগায় বসাইয়া লইলেন। চোখ দুটি একবার চারিদিক ঘুরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

—কৈ ফটিক কৈ?

বাঁড়ুজ্যে মশাইকে সহসা দেখিতে পাইয়া প্রবল ঔৎসুক্যে তিনি একরূপ ফাটিয়া পড়িলেন। কয়েক পা আগাইয়া গিয়া কহিলেনঃ

—এই যে ফটিক! তোমার কাছেই কিন্তু এত রাত করে আসা ভায়া, এ সব কি শুনেছি বলতো?

—কি শিরোমণিদা?

বাঁড়ুজ্যে মশাই মুখ তুলিয়া ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু রামজয় শিরোমণি তাহা কানেই তুলিলেন না। বলিলেনঃ

—তিন কাল গিয়ে এক কালে এসে ঠেকলাম, বুদ্ধি হবার পর থেকে এমনিতরো ব্যাপার তো বাপু কোনদিন চোখেও দেখিনি, কানেও শুনি নি। কুলিন বামুনের ব্যাটা

হয়ে কিনা তুমি আজ মেয়ে দিতে চাইছ বদ্যির ঘরে। কালে কালে কি-ই না সব হচ্ছে।

আড় চোখে একবার রামজয় শিরোমণি বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের আনত শুষ্ক মুখের দিকে তাকাইয়া লইলেন। নিষ্প্রভ তাঁহার কোটরে বসা চোখ দুটি ধপ করিয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। হাতের মুঠোর মধ্যে তাঁহার লাঠিটা কয়েকবার কাঁপিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ স্বরে তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন ঃ

আমরা বেঁচে থাকতে বাপু, এমনিতরো অন্যায় ঘটতে দেবো না। না, কিছুতেই না।

—অন্যায় তো আমি কোথাও দেখতে পাচ্ছি না, শিরোমণি-দা।

বাঁড়ুজ্যেমশাই রীতিমত তোতলাইয়া উঠিলেন। প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়িয়া রামজয় শিরোমণি তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন।

—হ্যাঁ, অন্যায় নয়তো কি? গাঁয়ে ভাগ্যিস্ ছিলাম না; তাই য়্যাদ্দুর তুমি এগিয়েছ। লোচনপুরের যদু মুখুজ্যে এসে হাত ধরে কাকুতি করতে লাগলোঃ তোমার পায়ের ধুলো একবার দিতে হবে শিরোমণি-দা, নইলে ছাদ্দ-কম্ম সব হবে কিনা একদম ইয়ে—বাজে। পালকী বেয়ারাও যদু এনেছিল সঙ্গে করে। তা, অতো করে যখন সে বলছে, না গিয়ে কি আর চলে?

বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের মুখ হইতে চোখদুটি সরাইয়া নিয়া চারিদিকে তিনি একবার তাকাইয়া লইলেন। অনেক জোড়া চোখ গল্পের গন্ধ পাইয়া তাঁহাকে বুঝি সমর্থন করিয়াছে। তিনি আবার সুরু করিলেনঃ

গিয়ে দেখি সে এক বিরাট ব্যাপার! যদু তার মার জন্য বৃষোৎসর্গ কম্ম করছে। চোদ্দ গাঁ নেমন্তন্ন। চারিদিকে শুধু খাও-খাও রব। বললে কেউ তোমরা বিশ্বাস করবে না।.....এমন সময় বাধলো এক গোল নয়নপীরের নন্দ ভটচাজকে নিয়ে। নন্দ নাকি মাঝে মাঝে পেটের দায়ে গিয়ে নমঃশূদ্রপাড়ায় পুজো করে আসতো চুরি করে। তাই তাকে একঘরে করা হয়েছে সমাজ থেকে। নয়নপীরের লোকেরা ওকে নিয়ে তাই খাবে না। এদিকে লোচনপুরের লোকেরা বলছেঃ সে কি হয়? নেমন্তন্ন করে লোককে নিয়ে এসে অভুক্ত উঠিয়ে দেওয়া—সে কি কখন হয়? দু'দলের তাই বাধলো দলাদলি। বাপস্, সে কি হুলুস্থুল কাণ্ড রে! আর অমনি তখন ডাক পড়লো—ওরে ডাক, শিরোমণি-দাকে ডাক; এর একটা বিহিত করে দিক।

নিজের প্রশংসায় রামজয় শিরোমণির তোবড়ান গাল হাসিতে ভরিয়া উঠিল। বার কয়েক কাশিয়া গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া তিনি আবার কহিলেনঃ

—তাই তো, একা নন্দর জন্য এক বাড়ী লোক না খেয়ে চলে যাবে, তা কি হতে পারে কখন? নন্দর হাত ধরে বললামঃ এক কাজ কর নন্দ। তোরা বাপ-ব্যাটা পরিবারের তিন হপ্তার ডাল-চাল নিয়ে বাড়ী যা নন্দ। বুঝতে তো পারছিস ব্যাপারখানা—এখন কি করি বল?......হুঃ, চুল-চেরা বিচার বাপু, রামজয় শিরোমণির! নন্দ তাতেই খুশী হয়ে গেল।

গণেশ ভটচাজ এতক্ষণ হুঁকা হাতে পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা গিলিতেছিলেন। রামজয় শিরোমণি তাঁহার দুর্বল ডান হাতখানি বাড়াইয়া গণেশ ভটচাজের হাত হইতে হুঁকাটি অকস্মাৎ ছিনাইয়া লইলেন। একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া গণেশ ভটচাজকে কহিলেনঃ

ঠিক এমনি সময়ে গিয়ে পৌঁছলো বেণীরা। তারপর কোথায় গেল আমার খাওয়া, কোথায় গেল আমার নাওয়া। শুনে তো আমি আগুন—হ্যাঁ, এতোখানি অন্যায়! আমরা এখনো বেঁচে থাকতে কিনা এতোখানি ইয়ে—এ বিয়ে আমি হতে দেবো না। রামজয় শিরোমণি ডান হাতখানি সামনে সোজা বাড়াইয়া দিয়া প্রবলভাবে নাড়িতে লাগিলেনঃ না-না, আমি কিছুতেই এ বিয়ে হতে দেবো না; কিছুতেই না।

রামজয় শিরোমণি হঠাৎ আপনার গলার স্বর অসম্ভব রকম কমাইয়া ফেলিলেনঃ নরম গলায় বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেনঃ

শোনো ফটিক, এখনো সময় আছে, লক্ষ্মী মুখুজ্যের হাতে-পায়ে গিয়ে পরগেঃ যতীনের সাথে তোমার বোনঝির বিয়েটা বাপু এই লগ্নেই চুকিয়ে দাও।

সন্তোষজনক একটা উত্তর প্রত্যাশা করিয়া তিনি বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাঁড়ুয্যে মশাই কিন্তু তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া সহজ গলায় কহিলেনঃ

—না, এখন আর তা হবার উপায় নেই, শিরোমণি-দা।

রামজয় শিরোমণি এক গাল হাসিয়া বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের সব কথাগুলিকে অনেকটা হালকা করিয়া লইলেন। কহিলেনঃ

—আছে হে ভায়া, এখনো ঢের সময় আছে। চল, আমরাও শুদ্ধু যাচ্ছি আর এঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলগে, যাও।

—না, তা হবার নয় শিরোমণি-দা।

কেনো, কেনো নয় শুনি?

ধৈর্যের সীমা বুঝি রামজয় শিরোমণি এবার ডিঙাইয়া গেলেন। অগ্নিশর্মা হইয়া প্রাণপণে চেঁচাইয়া কহিলেনঃ

—জানো তুমি, এই—এতে আমাদের সমাজের কতখানি বদনাম রটবে? একবার তা খেয়াল রাখো?

বাঁড়ুজ্যে মশাই শুষ্ক, নিষ্প্রাণ একটু হাসিলেন। স্থির গলায় কহিলেনঃ

—না, আমার তা জানা নেই শিরোমণি-দা। কিন্তু আমাদের নিয়েই তো আজ দাঁড়িয়েছে সমাজ। সমাজ পাছে পালিয়ে যায় এই ভয়ে তাকে দুহাতে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরবার তো কোন মানে দেখি না। সমাজের জন্য তো আমরা নই; বরং মানুষের জন্যেই এসেছে সমাজ।......আজ আসর থেকে বর-পক্ষকে উঠিয়ে দিলে যে বদনামটা এঁরা রটাবে সারা দেশে, সেটা কি আমাদের বেশী হয়ে বিঁধবে না?

—দু-পাতা ইংরেজী পড়ে তোমার এত বাড় বেড়েছে? তুমি সমাজ মানবে না, জাত মানবে না তুমি?

—না, আপনাদের ওই সমাজ মানবো না এ কথা বলবার তো সাহস বা ধৃষ্টতা আমার আদৌ নেই। কিন্তু প্রত্যেক নিষেধেরই একটা অ[illegible]তুক বাড়াবাড়ি মুখ বুজে সইতে হবে, [illegible]রো বা কি মানে আছে? মঞ্জুশ্রীর এই বিয়েতে আমাদের [illegible]গল ও ভাল ছাড়া আমি তো কিছু মন্দ দেখছি না। [illegible]ন যদি তাতে গায়ে পড়ে সমাজ এসে বাধা দিতে চায়, নিজের [illegible]হে লোকসান করে কেনো তার বিধানকে আমরা মাথা [illegible]তে নেবো শুধু সংস্কারের এক দোহাই পেড়ে?

—এক-ঘরে হবার ভয় রাখো তো—ধোবা-নাপিতের ভয়?

রামজয় শিরোমণি প্রবল উত্তেজনায় হাঁপাইতে লাগিলেন।

—বেশ, তাই করবেন! বাঁড়ুজ্যেমশাই একটু স্মিত [illegible]সিলেনঃ এই তো ঘণ্টা কয়েক আগে আপনাদের সমাজ-[illegible]তর দলেরা মিলে বাড়ী বয়ে আমাদের যা অপমান করে [illegible]লেন, গরীব মানুষের কতকগুলো টাকা স্রেফ লোকসান [illegible]রে গেলেন, তাতেও আমি বিশেষ দুঃখিত নই শিরোমণি-দা।

শিরোমণির পিঠের তূণটি প্রায় নিঃশেষ হইয়া [illegible]সিয়াছে। বাছিয়া রাখা শেষের তীক্ষ্ন মরণ-বাণটি তিনি [illegible]বার সবেগে ছুঁড়িয়া মারিলেন। ধমকাইয়া কহিলেনঃ

—জানিস তুই ফটকে, তোর মাস্টারীর দফা আমি [illegible]ক্ষণে খতম করে দিতে পারি, জানিস তুই তা? ওই তো [illegible]দের সেক্রেটারী বিরাজবাবু; আমি হলাম কিনা তাঁর [illegible]ক্ষাগুরু—একবার তাঁকে বললেই হ্যাঁ, চাকরী তোমার [illegible]দম ইয়ে হয়ে গ্যাছে কলমের একটা খোঁচায়।

শূন্যে আঙুলের এক দীর্ঘ আঁচড় কাটিয়া তিনি [illegible]ঙ্গিতটা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন।

ধারাল এই তীরটি খ্যাঁচ করিয়া গিয়া বাঁড়ুজ্যেমশাইয়ের [illegible]কে গভীর হইয়া বিঁধিল। কাতর হইয়া কহিলেনঃ

—যেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তা আমি করবো কী [illegible]রে শিরোমণি-দা? মঞ্জুর এই বিয়েতে কোন খুঁত তো [illegible]মি দেখছি না; সুতরাং বিয়ে আমি—

—না, এ বিয়ে তুমি দিতে পারবে না কিছুতেই।

প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়িয়া তিনি বাঁড়ুজ্যে মশাইকে থামাইয়া [illegible]লেন। সবেগে হাত ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেনঃ

—দেখি, কেমন বিয়ে দিতে পারো? কই, গণেশ [illegible]বার গেল কৈ? গণেশ চল, বিয়েতে মন্ত্র তুমি পড়াতে [illegible]রবে না। আর কোনো নূতন পুরুৎ ঠাকুর যদি আসে [illegible]মাকে একবার খবর দিয়ো—রামজয় শিরোমণি তখন [illegible]খে নেবে।

হিড় হিড় করিয়া গণেশ ভটচাজের হাত ধরিয়া টানিতে [illegible]নিতে শিরোমণি বাহিরে পা বাড়াইলেন।

ঠিক এমনি সময়ে এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। [illegible]তর বাড়ীর দাওয়া হইতে মঞ্জুশ্রীর মা ছুটিয়া আসিয়া [illegible]রোমণির দুপায়ে হঠাৎ আছড়াইয়া পড়িলেন। কাঁদিয়া [illegible]লিয়া কহিলেনঃ

—আমার মঞ্জুর......

জমাট কান্নার বেগ তাঁহার বুকে ভারী একখানি পাথর বুঝি চাপাইয়া দিয়াছে। তিনি অসহায় শিশুর মত ফোঁপাইয়া উঠিলেন; অন্তরের অব্যক্ত বেদনা তাঁহার আর মুখ ফুটিয়া ভাষা পাইল না। পিতৃহীন অবোধ এই মঞ্জুশ্রীকে কোলে করিয়া তিনি শেষে আশ্রয় লইয়াছিলেন ভাইয়ের সংসারে আসিয়া! অভাব-অনটনে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝায় তাঁহার একমাত্র শান্তি ছিল এই মঞ্জুশ্রী। আজ যদি বিবাহ-আসর হইতে বর ফিরিয়া যায়, মঞ্জুর যে আর বিবাহ হইবে না। লজ্জায়, অপমানে তাঁহার যে কাল সকালে মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। শিরোমণির দুপায়ে মাথা খুঁড়িয়া তিনি রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—আমার মঞ্জুমার কি হবে, শিরোমণি-দা!

—কি হবে, আমি কি জানি! তোমার ভাই ওই ফটিক বাঁড়ুজ্যেকে গিয়ে শুধাও। নাও, পথ ছাড়—

যাইবার জন্য শিরোমণি পা বাড়াইলেন। কিন্তু এবারেও তাঁহার যাত্রাপথ রুদ্ধ হইল। কে এ নারী—স্রস্তবসনা, আলু থালু কেশ! সচকিত ভীরু দৃষ্টি মেলিয়া শিরোমণি দেখিলেন—সর্বনাশ। রণরঙ্গিণী মূর্তিতে তাঁহার সমুখে স্বয়ং তাঁহারই গৃহিণী!

শিরোমণিকে ভাবিবার বুঝিবার অবকাশ না দিয়া মঞ্জুর মাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া বুকে আঁকড়াইয়া শিরোমণি-গিন্নি হুঙ্কার দিয়া উঠিল—এততেও তোমার শিক্ষা হ'ল না! চিরটা কালই কি তোমার একভাবে যাবে? তোমার বিষজর্জর তপ্তশ্বাসে সোনার প্রতিমা অলকা-মা আমার উবে গেল। তাতেও সাধ মেটে নি সমাজ শাসনের। পাষাণ, সে দৃশ্য আবারও তুমি চোখ মেলে দেখতে সাহস কর।

সাপের মাথায় ধুলো-পড়া পড়িল। শিরোমণি যতই নির্মম হউক, কন্যা অলকার অকালে ঝরিয়া পড়ার শেল তাঁহাকে নির্জীব করিয়া দিয়াছে। কারণ কন্যাটির জন্য অন্তরের অন্তস্তলে ছিল তাঁহার অপরিসীম স্নেহ দরদ। একগুঁয়ে শিরোমণিকে যদি কেউ জল করিতে পারিত সে কেবল অলকা। সেই স্নেহের পুত্তলীর নিষ্করুণ প্রাণ বিয়োগের প্রাণান্ত ক্ষতটি হইতে আজ নূতন করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। অসাড় দেহে শিরোমণি থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন উঠানের মাঝে।

চোখের উপর তাঁহার ভাসিয়া উঠিল আর একটি রাত্রির দৃশ্য। অনেক বছর আগেকার এক দুঃস্বপ্নময়ী রজনী। সেদিনও অসহায় এক রমণী তাঁহার দুপায়ে এইভাবে লুটাইয়া পড়িয়াছিল কাতর ক্রন্দনে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শিরোমণি-গিন্নি এমনইভাবে চেঁচাইয়া উঠিয়াছিল—আমার অলকা-মার কি হবে গো!

কি সে নিদারুণ দুর্বিপাক। বিবাহের শেষ লগ্নটিও যখন ঘনাইয়া আসিল, এমন সময় জনকয়েক মাঝি ছুটিয়া আসিয়াছিল দুঃসংবাদ বহন করিয়া। বর আর বরযাত্রীসহ দুখানা নৌকাই সহসা ঝড়ে মারা পড়িয়াছে পদ্মার ক্ষুধিত বুকে। মাঝিরা ভিন্ন কেহ আর পৌঁছিতে পারে নাই ডাঙায়। বিবাহ-বাড়ীর এত হাসি-কোলাহল সব এক মুহূর্তে কোথায় যেন গিয়াছিল মিলাইয়া।

সেই একদিন আর আজ.............আজও তেমনই এক দুর্যোগময় রাত। রামজয় দমিয়া না গিয়া সে রাত্রিতেই বর খুঁজিয়া আনিলেন পাড়ারই তাঁহাদের গগন-খুড়াকে; না হইলে তাঁহার জাত যাইবে, কুল যাইবে, মান-সম্ভ্রম সব নষ্ট হইয়া যাইবে রাত পার হইলে।

কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া শুনিলেন, অলকার প্রাণহীন দেহ তাঁহাকে জাত-কুলের সকল মান-সম্ভ্রম হইতে বেকসুর খালাস দিয়া গিয়াছে। আকস্মিক আঘাতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদযন্ত্রটি কখন চিরতরে থামিয়া গিয়াছে। লাল চেলী-পরা, কপালে রক্তের মত লাল টক্‌টকে সিঁদুরের টিপ-পরা নিস্পন্দ তাহার দেহলতাকে ঘিরিয়া সকলে তখন দাঁড়াইয়াছে শোকের গভীর মূর্চ্ছনায়।

শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া শিরোমণির দু'ফোঁটা জল আজ আবার গড়াইয়া পড়িল। নীরবে চাদরের খুঁট দিয়া উষ্ণ ফোঁটা দুটিকে তিনি মুছিয়া লইলেন।

শিরোমণি-গিন্নি তখন আগাইয়া আসিয়া মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া মঞ্জুর মাকে কহিলেন—

—ছি ভাই, তুমি বসে থেক না স্তব্ধ হ'য়ে। আজ হ'ল কিনা আমার মঞ্জুর বিয়ে; ছি, বিয়ে বাড়ীতে কি অমন বিশ্রী কান্নাকাটি করতে আছে?

সস্নেহে বাঁড়ুজ্যে গিন্নি চোখ দুটি মুছাইয়া দিল। তারপর হঠাৎ বাঁড়ুয্যে-মশাইয়ের দিকে তাকাইয়া অহেতুক এক ধমক ছাড়িল—

—হ্যাঁ, বাঁড়ুজ্যেমশাই ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কি? যাও, ছুটে গিয়ে বিয়ের জোগাড়-যন্তর সব করে ফেলগে, নাও চল। লগ্নের আর কি-ই বা দেরী? আর শোন! বুঝলে কি-না, মঞ্জুর বিয়ের মন্তর আমি গণেশ-টনেশকে দিয়ে পড়াতে দেব না। তুমি ভাবছ কেন- তোমার শিরোমণিদা-ই সে সব সারবে, আমি বল্‌ছি।

পত্নীর ব্যবস্থায় প্রতিবাদ করিবার শক্তি তখন শিরোমণির লোপ পাইয়াছে, ইচ্ছাও ছিল না আর হয়ত। চিত্তে তাঁহার কোন্ বিষধরের সহস্র-ফণার দংশন-জ্বালা, কে বুঝিবে। হয়ত বিষাদক্লিষ্ট সে স্মৃতির উদ্দেশে এই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত।

শিরোমণি-গিন্নী, মঞ্জুর মা ও বাঁড়ুজ্যে সহ অন্দিরে চলিয়া গেলে এক সময়ে শিরোমণি আর বুক বাঁধিয়া নির্বাক্ থাকিতে পারিলেন না। ডাক-হাঁকে পাড়ার যুবকদের জড়ো করিয়া তিরস্কার সুরু করিলেন—আরে এই, চারু, এই ধীরু, তোরা বাবা আজ কাজের দিনে কোথা উধাও হলি বল্‌তো। বাড়ীতে কেউ এলে এম্‌নি করে গা-ঢাকা দিতে হয় বুঝি? দেখ দিখিন্, ভদ্দরলোকের ছেলেরা ঠায়ে এতক্ষণ শুকনো মুখে বসে আছেন, এঁদের খাবার-দাবারের চট্‌পট্ ব্যবস্থা করে নে। কি যে তোরা হলি বাবা!

বলেই ব্যস্ততার সঙ্গে ভিতর বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িলেন—কই, ফটিক কই, সময় হ'ল যে। এখন ও-সব সমাজ-টমাজ ভুলে যাও ভাই—আগে সবাই মিলে শুভ কাজটি সমাধা কর ত। কই হে, আসন কই!

গ্রামবাসী নিমন্ত্রিতের দলও একে একে ছেলেপিলের হাত ধরিয়া আসিয়া জুটিল।

বিদায় উপহার

শ্রীরসময় দাশ

বন্ধু, হেথায় তোমার কানন ছায়ে
দু'দিন বিরাম লভিনু মন্দ বায়ে।
ফুরালো সে খেলা—আবার পথের বাঁক
চির দিবসের পথিকেরে দিল ডাক।
আবার চলিতে হ'লো একা মুসাফির;
সময় যে নাই ফেলিতে আঁখির নীর!
ক্ষণিক মিলন পথের এ পরিচয়;
কিছু দিই নাই—বার বার মনে হয়।
কেবল তোমার প্রীতির উৎস বারি
ভরিয়া লইনু শূন্য হৃদয় ঝাড়ি।
যাত্রা পথের সেই যে পাথেয় মম;—
বিদায় বন্ধু! পথিকের ত্রুটি ক্ষম'।
ক্ষুদ্র দু'দিন এ জীবন বালুচরে
রবে অমলিন বহু দিবসের তরে!

ফরিদপুরের 'অরণ' গান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ

ফরিদপুর জেলার কয়েকটি 'অরণ গান'* সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিব।

পৌষ-সংক্রান্তি দিনে পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলার পল্লীঅঞ্চলের হিন্দুরা ভূমি পূজা করিয়া থাকে। এই উৎসব "বাস্তু পূজা" নামে পরিচিত। পূর্ব্বে মুসলমানেরাও বাস্তু পূজার অনুষ্ঠান করিত। সংক্রান্তি দিনের তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতেই হিন্দু-মুসলমান পল্লীবালকেরা দল বাঁধিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী যায় এবং দান গ্রহণ করে। তাহারা দান গ্রহণের সময় নানা প্রকার ছড়া গান গায়। ফরিদপুর জেলার পল্লী-অঞ্চলে এই ছড়াগুলি 'অরণ গান' নামে পরিচিত। 'অরণ' শব্দ 'অরণ্য' শব্দের অপভ্রংশ। সন্ধ্যাকালে পল্লীর জঙ্গল, বন প্রভৃতি অরণ্যের মধ্য দিয়া গান করিতে করিতে বালকগণ যাইত বলিয়াই বোধ হয় এই গানগুলি 'অরণ গান' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

(১)

বালকগণ গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছে। তাহাদের আশা—ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর করুণায় চাউল, কড়ি কিছু পাইবেই। অবশেষে তাহারা একটি গৃহস্থের বাড়ী পৌঁছিল। বাড়ীখানি মজবুত ছাটনীর চালে বাঁধা, তাহারা মনে করে এই গৃহস্থের বেশ সানাদানা আছে। কিন্তু দেখা গেল, বড় বাড়ী হইলে কি হয়, বাড়ীর গিন্নিটি বড় কুটিলা। বালকেরা ইহাতে নিরুৎসাহ নয়—তাহারা কিছু চাউল, কড়ি না লইয়া ফিরিবে না। তাহারা গিন্নির কাছে আবেদন করিতেই থাকিবে। এই সব কথা বালকেরা কি ভাষায় গাহিতেছে, দেখুন—

আইলাম রে অরণে,
লক্ষ্মী দিবে চরণে।
সোনার হাতে রূপার বালা,
এ ঘরখানা দ্যাখতে ভালা।
ঘরখান বড় ছাটনী,
গিন্নী বড় কুটনী।
সিও গিন্নী বিরসন,
আমারে দিব কত ধন।
চা'ল দিবি না দিবি কড়ি,
তোরে করব নড়ি দড়ি।
নড়ি দড়ি আনরে,
সোনার বান্দা খামরে।
দ্যাও ধন চলিয়া যাই,
আর বাড়ী যায়্যা পাবার চাই।
লক্ষ্মী মা দিয়া বর,
চা'ল কড়ি বার কর।

(২)

ইহার পর বালকেরা দাসপাড়া বা মথুরাপুর গ্রামে যাইবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না। মথুরাপুরে যাতায়াত বশেষ কষ্টকর, কারণ সন্ধ্যাবেলার আঁধারে একটা বড় জলাভূমি (সমুদ্দুর) পার হইয়া মথুরাপুর যাওয়া কি সম্ভবপর হইবে? কিন্তু তাড়াতাড়ি সেখানে যাইতে পারিলে ভাল রকমের "চাল গুটা ধন" পাওয়া যাইত—

আর বাড়ী মথুরাপুর,
আসতি যাইতি সমুদ্দুর।
সমুদ্দুর না দাসপাড়া,
তিন ছয়ে আঠার ঘোড়া।
ঘোড়ায় ঘোড়ায় তাড়িয়ে নিব,
চা'ল গুটা ধন বুঝ্যা পাব।
চালের ভাত গাছি গুছি,
কি কর মা মেজলা চাচী?
তোর মঙ্গলা বলে কি,
সোনার লাঙ্গলে গড়েছি।
সোনার লাঙ্গলে রূপার ফাল,
গাই গরু দিয়া জুড়েছি হাল।

আমার সংগৃহীত শাখিবোলের "এলাম রে ভাই...লাঙ্গল ভাঙ্গা খাবি কি" গানটির কয়েকটি লাইনের সঙ্গে এই গানটির শেষোক্ত কয়েকটি লাইনের হুবহু মিল রহিয়াছে।

(৩)

কান ভিন্দে কান ভিন্দে,
শিবের কাঁটায় কান ভিন্দে।
শিবের কাঁটায় লোহার বিষ,
আসল ধানের ছাতু দিস।
ও পুত ভাগরে,
বন্যা বাস গান রে।
বন বন বেলুয়া বন,
ফেউচ্যা রাজার ঘুড়িগণ।

....

মুগের ডাল কিবা গুণ,
পান্তা ভাতে ছটাক নুণ।
পান্তা ভাত ছলবলা,
খেড়ু ভাই খ্যাড় খ্যাড়া।
খেলা খেলতে লাগল হুল,
কে যাবে রে পয়গমপুর?

....

ঘোড়া এড়ে ঘুড়ী দ্যায়,
দুইটা গম ফড়্-ফড়ায়।
দুইটা গম না দুইটা মুলো,
ভর্যা যান ধান কুলা।

এই গানটিতে "আমন ধানের ছাতু"র কথা উল্লিখিত হইয়াছে। গম বা যবের ছাতুর কথাই আমরা সাধারণত জানি। আমন ধানের ছাতুর কথা আমরা সচরাচর শুনিতে পাই না।

(শেষাংশ ৭০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

* ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার (পুরুষানুক্রমিক) পল্লী গায়ক কাজিম ফকিরের (৭০ বৎসরের বৃদ্ধ) নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

দিনান্তিকা

(গল্প)

শ্রীবীরেশ ভট্টাচার্য্য

পুকুরঘাট থেকে ফিরবার পথেই সরোজের মনে হয়, এ কাজটা তার হয়ত সঙ্গত হয় নি। যদি কেউ দেখে থাকে! ঘোর সাঁঝে পুকুরঘাটে মাত্র দুটি প্রাণী—সরোজ আর চন্দ্রিকা। সমাজের কাক-পাখীটিরও নজরে পড়ে থাকে ত আর সরোজ-চন্দ্রিকার মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না এ গাঁয়ে। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ এর সন্ধান রাখবে। সরোজ নিতান্ত দুশ্চিন্তা নিয়েই বাড়ী ফিরে আসে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সরোজ তাড়াতাড়ি চা-পান শেষ করছে। জমিদারের ছেলে হ'লে হবে কি তার কত কাজ। গ্রাম-সংস্কার-সমিতির সে হ'ল একমাত্র নিয়ন্তা। কচুরিপানা, ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার, এঁদো পুকুরকে উদ্ধার করে পানীয় জলের ব্যবস্থা; চাষীদের ক্ষেতে-খামারে সময়ে জল সরবরাহের জন্য চাঁদা তুলে নলকূপ স্থাপন—সবই তদারক করতে হয় সরোজের।

চণ্ডীতলার ডোবাটার কচুরিপানা পরিষ্কার হলে সরোজ চল্‌লো তার দলবল নিয়ে নিকাশী পাড়ার খালটার উপর বাঁশের সাঁকো একটা বাঁধতে, নইলে যে বাজারে যেতে গ্রামবাসীর কত কষ্ট হয়। সেখানেই ছুটতে ছুটতে এসে হাজির চন্দ্রিকার ছোট ভাইটি হাতে একখানি চিঠি। 'সরোজ-দা চিঠি নও' বলে ছেলেটি প্রস্থান করল। চিঠি হাতে করে সরোজ বুঝল—আগের দিনের সাঁঝের ব্যাপার নিয়েই যে এ চিঠি, তা যেন সে দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছে। নইলে যার সঙ্গে দেখা হয় তার প্রায় রোজই, সে আবার চিঠি লিখ্‌তে যাবে কেন!

চিঠি পড়ে সরোজ যেন কেমন হয়ে যায়। দলের স্বেচ্ছা-সেবকদের ছুটি দিয়ে সে বাড়ীর দিকেই পা বাড়ায়—অন্তর তার জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। তার এ আহাম্মোকির জন্যেই ত নিরপরাধ চন্দ্রিকার উপর এই শাসন—এই নির্যাতন। ছি ছি এ সে কি করেছে। ভাল করে ভেবে দেখা উচিত ছিল তার আগে হতে।

চন্দ্রিকা! সেই পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটি যেদিন এসে তাকে সরোজ-দা ডেকে জমিদার বাড়ীর বাগান থেকে দুটি ফুল চেয়েছিল তার বাপের পুজার জন্যে, সে চন্দ্রিকাকে সরোজ ত কোন কালেই বোন ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারে নি। সরোজের আপন বোন নেই। সেই সেদিন থেকে আজ দীর্ঘ এগার বৎসর পরেও সরোজ চন্দ্রিকাকে ছোট্ট বোনই বলে বুকে আঁকড়ে রেখেছে।

তাই ত যেদিন চন্দ্রিকার বিয়ে হয়ে গেল পাশের গাঁয়ের কলেজের পড়ুয়া সতীশ-দার সঙ্গে, সেদিন সরোজ যেমন সুখী হয়েছিল এমন আর কেউ নয়। তবু কিন্তু সে চন্দ্রিকাকে ডাক্‌তে পারে নি বৌদি বলে। ছোট বোনকে কে আবার পারে স্নেহ-দরদ কাটিয়ে গুরুজন ভাব্‌তে। চন্দ্রিকাও পারে নি সরোজকে ঠাকুরপো সম্বোধন কর্‌তে। সে জানে দাদা চিরকালই দাদা। এজন্যে সতীশ প্রথম প্রথম চন্দ্রিকাকে বল্‌তে লৌকিক নিয়মগুলো মেনে চল্‌তে। কিন্তু হৃদয়ের স্বাভাবিক স্রোতোধারা কেউ পারে না কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে রুদ্ধ কর্‌তে। কাজেই সতীশ যখন দেখলে সরোজ আর চন্দ্রিকা এক বোঁটায় দুটি ফুলের মত অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ, তখন মনে মনে সে তৃপ্তিই পেল। কারণ একই হাই স্কুলে এ গ্রামে পড়বার সময় সতীশ সরোজকে সকল রকম উদার নীতি শিক্ষাদানে, জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কর্‌তে কার্পণ্য করে নি। তাই সতীশের আজ তৃপ্তি—তার সাধনার বীজ সরোজের অন্তরে অঙ্কুরিত হয়েছে। স্রষ্টার এ আনন্দ অন্যের উপলব্ধির বাইরে।

কিন্তু দুষ্টলোকের পাক-চক্রে মিথ্যা আরোপিত অপরাধে সতীশ আজ কারা প্রাচীরের অন্তরালে বন্দী জীবনযাপন কর্‌ছে। তাই বোন্ চন্দ্রিকাকে সান্ত্বনা দানের সকল দায়িত্ব আজ সরোজকেই নিতে হয়েছে স্কন্ধে।

সাঁঝের বেলা পুকুরঘাটে সরোজ আর চন্দ্রিকা একসঙ্গে সাঁতার কেটেছে—হুটোপাটি করেছে তাদের পশ্চাতে ফেলে আসা কৈশোরের দিনগুলি স্মরণ করে। সরল দুটি তরুণ-তরুণীর এ নিষ্পাপ আমোদ-প্রমোদকে কুটিল সমাজ যে বক্র দৃষ্টিতে দেখ্‌বে, তাতে আর আশ্চর্য কি। অমনি চন্দ্রিকার বাপের উপর ফতোয়া জারি হ'ল—এ স্বেচ্ছাচার বন্ধ কর, নইলে তোমায় সমাজচ্যুত করে একঘরে করে রাখা হবে। সরোজের উপর কিন্তু সমাজের রক্তচক্ষু পতিত হ'ল না। সে যে জমিদারের ছেলে। জমিদারের কাছ থেকে কোন না কোন রকমে উপকার পায় নি এমন লোক সারা গাঁয়ে মেলা ভার। তার উপর সরোজের সমিতির কাছেও অনেক ব্যাপারে সমাজপতিরা ঋণী। তাই যত কিছু শাসন ঐ গোবেচারী চন্দ্রিকা আর তাদের পরিবারটির প্রতি।

চন্দ্রিকার বাপ্ শাদাসিধে মানুষ হলেও সমাজপতিদের আক্রমণে—তাদের হলপ করা চাক্ষুষ প্রমাণের গুরুত্বে চন্দ্রিকাকে আর নির্দোষ ভাব্‌তে পার্‌ছিলেন না। অথচ মেয়ে যে সত্যই কোন জঘন্য কাজ কর্‌তে পারে একথাও তিনি বিশ্বাস কর্‌তে পারেন না। সেই পাঁচ বছর বয়সে মাতৃহীন এ মেয়েটিকে যে তিনি বুকের রক্ত দিয়ে মাতার দরদে মানুষ করে তুলেছেন।

সেদিন গভীর রাতে যখন চন্দ্রিকা তার ছোট্ট ভাইটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত, চন্দ্রিকার বাপ নিঃসাড়ে গেলেন তাদের শয্যা পার্শ্বে। ক্যান্ডেল একটি জ্বালিয়ে হাতে নিয়ে তিনি তাকালেন মেয়ের মুখের দিকে। নাঃ সরলা চন্দ্রিকা ত ঘুমে অচেতন। সত্যই যদি তার থাকবে কোন গোপন অভিসন্ধি, তা হলে সে কি এমনভাবে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় রাত কাটাতে পারে! কখনই না।

চন্দ্রিকার বাবা প্রশান্ত মনে ফিরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল চন্দ্রিকার হাতের দিকে। কি যেন অতি যত্নে মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে আছে না? তিনি আস্তে আস্তে মেয়ের মুঠো খুলে ধরলেন—একটুক্‌রা কাগজ বেরিয়ে পড়ল। কাগজখানি হাতে তুলে নিয়ে তিনি দেখলেন এ-যে চিঠি আর চন্দ্রিকাকেই লেখা। একবার ভাবলেন—না, চিঠিটা পড়া উচিত

নয়। কিন্তু পরক্ষণেই সমাজপতিদের অভিযোগ তাঁর কানে বেজে উঠ্‌ল উচ্চ তানে।

চিঠিখানি প'ড়েই তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মেঝেতে। হয়ত একটা অস্ফুট চীৎকারও মুক্তি পেয়েছিল তাঁর মুখ থেকে।

চন্দ্রিকার ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়-মড়িয়ে উঠে বস্‌ল—গায়ের কাপড় আঁচল সামলে নিয়ে বাবার দিকে চেয়ে রইল বিস্ময়-চকিত-নয়নে।—বাবা!..........

বাবা ফিরে দাঁড়ালেন মেয়ের ডাকে। তারপর রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে তিনি বলে উঠলেন,—আজ আমার ভুল ভেঙেছে। তোমায় আমি কোনদিন এত হীন ভাবতে পারি নি। কিন্তু আজ ত আর চোখকে অবিশ্বাস কর্‌তে পারি নে। আমার চোখে ধূলো দিয়ে তোমার এত কাণ্ড তলে তলে........ প্রেমপত্র লেখা-লেখি সরোজের সঙ্গে!

সরোজের নাম বাপের মুখে উচ্চারিত হ'তেই লজ্জায় চন্দ্রিকা জিব কেটে অস্থির হ'য়ে ওঠে ব্যাপার খুলে বলতে। কিন্তু লজ্জা-সরমে চন্দ্রিকার জিহ্বা আড়ষ্ট। শত চেষ্টায়ও সে বল্‌তে পারে না একটি কথা। মনে ভাবে কি লজ্জা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ বাবাও আমায় অবিশ্বাস করে।

চন্দ্রিকার বাবা ক্ষোভে অপমানে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বলতে থাকেন—সরল বিশ্বাসে আমি মিশতে দিই তোমায় সরোজের সঙ্গে, আর সেই বিশ্বাসের এই পরিণাম। এখানকার সমাজপতিরা ত ফতোয়া দিয়েছেই। এর পর যখন কথাটা ভেসে যাবে পাশের গাঁয়ে তোর শ্বশুরবাড়ীতে, তখন তারা আর ঠাঁই দেবে তোকে সেখানে? কালামুখী আমার মান ইজ্জত সব জ্বালি, নিজেরও ইহকাল পরকাল সব খোয়ালি। এখন যে কেঁদে ভাসাচ্ছিস্‌, ভাল মানুষটি সাজতে হচ্ছে, যেন কিছুই জানিস্‌নে। এই যে চিঠি, কে দিয়েছে শুনি তোকে?

চন্দ্রিকা নির্ব্বাক।

—কথা নেই কেন? বল্‌, বল্‌। তোকে বলতেই হবে কে দিয়েছে?

—স—রো—জ—দা দিয়েছে।

—আর কত চিঠি দিয়েছে এমনি ধারা সেই। লজ্জা করে না বলতে ও-ছোঁড়ার নাম। কেন তবে তোকে এত লেখাপড়া শেখালাম। ভগবান! এও লিখেছিলে আমার বরাতে!

আর চন্দ্রিকা নিজেকে সামলাতে পারে না—সে ছুটে এসে বাবার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে। বলে—বাবা! বাবা! তোমার মেয়ে কখনও হীন নয়। তুমি সরোজ-দাকে সব শুধাও। আমি বল্‌ছি তুমি বিশ্বাস কর, আমি অবিশ্বাসিনী নই।

আর কোন কথা চন্দ্রিকার মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না। উত্তেজনার আতিশয্যে চেতনা হারিয়ে সে এলিয়ে পড়ে বাপের চরণে।

চন্দ্রিকার বাবা দিশেহারা। মেয়ের এমন তেজের সঙ্গে বলা কথা কয়টায় সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু প্রমাণ যে তাঁর হাতে। না—না, নিশ্চয় এ মেয়ে মায়াবিনী—কি সর্ব্বনাশ! এমন শয়তানীকে তিনি ঘরে পুষেছেন। অকাট্য প্রমাণ—তিনি আবার চিঠিখানা পড়েন—

প্রাণের চান্দ্রিকা,

তোমার মুখের প্রতিটি সোহাগমাখা কথা আমার দিবারাত্রির ধ্যান। কতকাল—আর কতকাল এ পাষাণ প্রাকার তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে রাখবে। এ পাষাণ প্রাকার কি তোমার হিয়া প্রাকারে পরিণত হয়ে আমায় পুষ্পিত স্বর্গে নিয়ে যাবে না বাকি জীবনে। অসহ্য! যখন তোমার কথা মনে পড়ে আমি পাগল হয়ে যাই। প্রাণের চন্দ্রিকা! কবে তোমায় পাব সকল অন্তরায় দলিত করে—সব ব্যবধান ভেঙে-চুরে? দুই লাইন লিখে জানিও লক্ষ্মীটি। আমার যে নইলে আশ মেটে না। কেবল অতৃপ্তি! কেবল অসীম তৃষ্ণা। দৈব-দুর্ব্বিপাকে রিক্তের এ বেদনা তুমি ছাড়া কে বুঝবে!

তোমার—স

এ ত জলের মত পরিষ্কার। এর আবার জিজ্ঞাসা কি? দৈব-দুর্ব্বিপাকে রিক্ত যে সরোজ সে কথা আর বলে দিতে হয় না কারো। ছেলেবেলা থেকে ভাই-বোনের মত খেলা করলেও নিশ্চয়ই ওই সরোজটা ছড়িয়েছে এ বিষ।

সারা রাত্রি বৃদ্ধের আর নিদ্রা হ'ল না। কোন মীমাংসাও বৃদ্ধ করতে পারল না চন্দ্রিকা সম্বন্ধে। স্নেহের পুত্তলী কন্যাকে কে পারে বিসর্জন দিতে আপন হাতে—যাকে মনের মত শিক্ষিতা করা গেছে। আর একবার পদস্খলন হলেই কি তার আর সুপথে আসবার আশা রহিত হয়ে যায়।

বৃদ্ধ আর ভাবতে পারে না।—এ গ্রামে বাস করতে হলে তাঁকে কঠোর হতে হবে। সমাজপতিদের নির্দেশ পালন করতে হবে অক্ষরে অক্ষরে।

চন্দ্রিকা সেই যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আর হুঁস ফিরলেও সে মেঝে শয্যা করেই পড়েছিল লুটিয়ে। নির্ম্মম এ দুনিয়া বোঝে না স্নেহ—কদর করে না ভ্রাতৃ স্নেহের। ছিঃ ছিঃ কি ছোট অন্তঃকরণ এ মাটির ধরার। ভগবান! এমন নিষ্ঠুর জগৎ থেকে আমায় উদ্ধার কর। কান্নায় মেঝে ভাসিয়ে দেয়, চন্দ্রিকা আজ আর চন্দ্রিকা নাই—তার দেহে নাই শক্তি ঘরকন্নার কাজ করবার।

ছোট ভাইটি এসে আব্দার করে—দিদি ওঠ, খেতে দাও। ক্ষিদে পেয়েছে। দেখ না বাইরে কত রোদ।

—ওই কলসীতে মুড়ি গুড় আছে, চারটি নিয়ে খাওগে। আমায় জ্বালিও না।

—বা-রে, আজ রান্না করবে না?

—না।

মুড়ি গুড় কোঁচড়ে নিয়ে খোকা ছুটে যায় বাপের কাছে—বাবা, বাবা, দিদি ত উঠল না। রান্নাও করবে না। তুমি বাজার যাবে না? আমরা খাব কি?

বৃদ্ধের মুখ থেকে কোন কথাই শোনা যায় না। সেই যে বারান্দায় ঠায় বসে আছেন, তাঁর আর যেন সম্বিৎ নেই।

এমন সময় একসঙ্গে অনেকগুলো লোকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সবার আগে পৌঁছে সরোজ।—সরোজকে দেখে বৃদ্ধ রুখে উঠে কি বলতে যান, কিন্তু মুখের কথা তাঁর মুখেই

থাকে—নতুন এক মূর্তি এসে বৃদ্ধের চরণে প্রণত হয়।

—কে—কে—সতীশ! তুমি?

বৃদ্ধ আর আবেগ চেপে রাখতে পারেন না। সরোজ ও তার দলবলের সম্মুখেই সে চিঠিখানি বার করে দেখান সতীশকে।

সতীশের মুখখানি মুহূর্তে রাঙা হয়ে ওঠে। নতশিরে বলে—এ চিঠি আমারই লেখা। সরোজের চিঠির ভিতর দিয়েছিলাম, নইলে যে মাসে দু'খানার বেশী চিঠি দেবার হুকুম নেই বন্দীদের। দু'খানা আলাদা লিখলে আর ত এ মাসে চিঠি লেখা যেত না। করোনেশনের জন্যে হঠাৎ মুক্তি পেলাম। খবর দিতে পারিনি আগে।

কক্ষের ভিতর থেকে একটা গোঙানি শব্দ ভেসে আসে। সবাই ব্যস্ত হয়ে ছুটে যায়। মূর্ছিত চন্দ্রিকার মস্তক ক্রোড়ে নিয়ে সতীশ বসে পড়ে মেঝেয়। সরোজ শুশ্রূষায় মন দেয়। বৃদ্ধ আবার ফিরে যায় তার বারান্দার আসনে।

সতীশ সস্নেহে জিজ্ঞেস করে, একটু ভাল লাগছে চন্দ্রিকা?

—ও-গো এ দুনিয়া ছেড়ে চল বনে, যেখানে মানুষ নেই।

—যাব চন্দ্রিকা, একটু সেরে ওঠ, তার পর আমরা গিয়ে নতুন করে নীড় বাঁধব সমস্তিপুরে। সব ঠিক করে এসেছি।

—সেখানে এমন সমাজপতি নেই ত?

—না গো না। সেখানে সমাজপতি হব তুমি আর আমি।

ফরিদপুরের 'অরণ' গান

(৭০১ পৃষ্ঠার পর)

ইতিপূর্বে কোন পল্লী গীতিকাতেও আমরা আমন ধানের ছাতুর উল্লেখ পাই নাই। এই গানটিতে পান্তা ভাত, মুগের ডাল, ঘোড়া, গম প্রভৃতি কথাগুলিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কবিতাটিতে পল্লী-জীবনের চিত্র সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "দুইটা গম কড়্‌-কড়ায়" অর্থে দুইটা গমাপিসা যাঁতার শব্দ শোনা যায় বলিয়া মনে করি। বাঙলাদেশে গমের চাষ খুব কমই হয়। শস্যোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত গানে যখন গমের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তখন মনে হয় পূর্বে বাঙলা দেশে গমের চাষের বহুল প্রচলন ছিল। অন্য কোনও পল্লী গীতিকায় আমরা গমের উল্লেখ পাই নাই। সুতরাং এই পল্লী গীতিকাটিতে আমরা দুইটি নূতন বিষয়ের পরিচয় পাইতেছি—'আমন ধানের ছাতু' ও 'গম'। এই সব কারণে এই পল্লী গীতিকাটি বাঙলার প্রাচীন সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য।

(৪)

সরলচিত্ত, ধর্মপ্রাণ কৃষক ও গৃহস্থগণের নিকট দানের পরিমাণ অনুযায়ী কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা বর্ণনা করার জন্য বালকগণ নিম্নলিখিত ছড়াটি গাহিয়া থাকে:—

যে দিবে কুলার আগে,
তারে লক্ষ্মী ছাড়া যাবে।
যে দিবে মুঠি মুঠি,
তার হবে আগলা কুটী।
যে দিবে সেরে সেরে,
তার লক্ষ্মী ঘরে ঘরে।
যে দিবে আচায় আচায়,
তার লক্ষ্মী মাচায় মাচায়।
যে দিবে ভর্ণ কাঠায়,
তার হবে সাত বেটা।
সাত বেটা আঠার নাতি,
বুড়ার কাঁধে ডবল ছাতি।

[শব্দার্থ:—কুটী=কুঁড়ে। আচা=নারিকেলের মালা। মাচা=মঞ্চ শব্দের অপভ্রংশ। ভর্ণ=পরিপূর্ণ।]

শাঁখবোল, ধলই গান ও অরণ গান আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এইগুলির মধ্যে সাধারণ পল্লীজীবন ও গৃহস্থ পরিবারের কথাই চিত্রিত হইয়াছে। এই গানগুলির মধ্যে শস্য সম্বন্ধে এত কথা বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহা দেখিয়া আমরা স্পষ্টই বলিতে পারি, এইগুলি শস্যোৎসবের গান।

এখন 'ধলই'এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করিব। শাঁখবোলের ছড়াতে শিবের স্বস্তি-বচনের উল্লেখ পাইয়াছি। বাঙলা দেশে শিব মঙ্গল ও অভয়ের দেবতা রূপে পরিচিত। স্থানবিশেষে শিব ধলেশ্বর, ধবলেশ্বর, ধবলপতি নামে পরিচিত ছিলেন। ধলেশ্বরী শব্দ আমাদের খুবই পরিচিত (ধলেশ্বরী নদী)। 'ধলই' শব্দ (ধলুই, ধলোই বানানও গ্রহণ করা যাইতে পারে) 'ধবলপতি' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। ব্যুৎপত্তি এইরূপ—ধবলপতি=ধ অল অই=ধলই।* পরবর্তীকালে রাখাল বালকগণ শিবের রূপকে বহুবিশ্রুত ভস্মমণ্ডিত ধবল বর্ণে চিত্রিত করিয়া শিবকে ধবলপতি নামে অভিহিত করিবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? উত্তরবঙ্গের শাঁখবোলে শিবের স্বস্তি-বচনের অনুকরণে দক্ষিণবঙ্গের ধলই গানে "ধলই ঠাকুর" উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

---

*কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা ও শব্দ-তত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ব্যুৎপত্তি সমর্থন করিয়াছেন।

পল্লী-গীতিতে নাট্য-সম্ভার

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন,—শিশুর হাত-পা ছোড়ার মধ্যে ভাবের অভিব্যক্তি আছে। শিশু যখন হাসে, যখন কাঁদে, তখন তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একটা বিশেষ ভাব পরিলক্ষিত হয়। জননীর নিকট-ই সে ভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। ক্ষুধার তাড়নায় শিশু হয়ত কাঁদিয়া আকুল, মাকে কাছে পাইলে তাহার কাপড়-চোপড় ধরিয়া টানা-হ্যাঁচড়া করে, একান্ত হতাশ হইলে গড়াগড়ি দেয়, হাত-পা ছোড়ে—বড় সাধের পুতুলগুলির উপরও তাহার আক্রোশ কম হয় না। মা তখন বুঝিতে পারেন, এইবার আর উপায় নাই। তখন শত কাজ ফেলিয়া সতর্ক জননীর কাজ সন্তানকে স্তন্য দান করা।

সভ
যে, মনো
গ্রহণ করি
উদ্দেশ্যে
ক্রিয়া-কল
আহবান
গিয়াছিল
ভুলক্রমে
প্রতি দেব
অবতরণ
মিলন হই
সেজন্য
তাহার ছন্দ

ভাষা
যোগাযোগ
মতে পর
প্রথম স্তর

আমা
তাহাদের
তাহার ম
সঙ্গে বো
মেয়ে-পুর
গান করে,
এক।

রামায়
আসিতেছে
প্রকার অভ
করিতে হয়
দিতে হইল,
বসিতে হই
দেখিয়া অব
সে কাজ স
হইল। তাহ

সংস্কৃ
আছে কি
আরম্ভ সখে
কম ছিল।

নাটক অভিনীত হইতে থাকে। তাহার মধ্যে বড়লোকের খেয়ালই ছিল বেশী। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ বাঙলা নাটককে নূতন রূপ দিতে সক্ষম হইল। তখন হইতে বাঙলা নাটকের প্রতি লোকের আগ্রহ দেখা দিল।*

লোক-সঙ্গীত বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। তাহার সহিত বাঙলা যাত্রা-গানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের স্পন্দন সংযোগ আছে। থিয়েটারের মধ্যে আছে জড়তা ও কৃত্রিমতা, যাত্রা গান তাহা হইতে স্বতন্ত্র—তাহাতে আছে মুক্তির আনন্দ। বাঙলা যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত [illegible]

১। [illegible]

*Som
of Ind
Histo

জনতার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। আমরা ঢুকিতেই চিকোরদা বলিল--"হিমাদ্রি কোত্থেকে? অনেকদিন পর দেখা হ'ল, বস"--একটু হাসিবার চেষ্টা করিল--কিন্তু সে হাসি হঠাৎ একটা বেদনার ধাক্কায় কোথায় মিলাইয়া গেল।--

তাহার কথা হিমাদ্রিবাবুর কানে গেল কি না ঠিক বোঝা গেল না।--তিনি আস্তে আস্তে রোগীর এক পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। তারপর একদৃষ্টে রোগীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি ভাবিলেন বুঝিলাম না। একটা হাত তুলিয়া লইলেন। রোগী হঠাৎ চোখ চাহিল। তারপর কি যেন বলিতে যাইতে-ছিল, কিন্তু পারিল না--শুধু কয়েক ফোঁটা জল চোখ হইতে গড়াইয়া বালিশের উপর পড়িয়া গেল। হিমাদ্রিবাবু মাথাটাকে কোলে তুলিয়া নিলেন চোখ তা'র সজল হইয়া আসিল--রোগীর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল,--তারপর--সব চুপ্--হিমাদ্রিবাবু নড়িয়া উঠিলেন--"শিবানী, শিবানী"--চোখ তখন স্পন্দনহীন।

আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না--আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম--সেখানেও সেই বেদনার সুর বাজিতেছিল--ঝর্--ঝর্--ঝর্--।

নানা সাজে
পরিলক্ষিত

লে জ্ঞান
ও বা প্রকট
টোর ভাব
ন হইতে
কীর্ত্তন-গান

র নির্ভর
ব নহে।
য় ক্ষমা

বিচিত্র বার্তা

তিমির হাড়ের ফটক

ইংলণ্ডে এক সময়ে তিমি শিকারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। সেই সময়ে উত্তর সাগরে ত প্রচুর পরিমাণে তিমি পাওয়া যাইতই, এমন কি ইংলিশ চ্যানেলে পর্যন্ত বহু তিমি শিকার করা হইত। বিপুল সংখ্যায় লোক ব্যাপৃত থাকিত তিমি শিকারে; আবার একদল লোক তিমির হাড়ের কারবারে যথেষ্ট পয়সা উপার্জন করিত। সেইকালে তিমির

হাড় দ্বারা নানা কারুকার্য খচিত নিত্য প্রয়োজনীয় চিরুণী, কাগজ কাটা ছুরি, হেয়ারপিন্ প্রভৃতি তৈরী হইত। কেহ কেহ বিরাট আকারের তিমির হাড় বিশেষ করিয়া চোয়ালের হাড় স্তম্ভাদির কাজে লাগাইত কাষ্ঠের পরিবর্তে। সেই যুগে ইংলণ্ডের বহু সাগর-তীরের বন্দর তিমির আমদানীর জন্য বিখ্যাত ছিল। এই প্রকার বন্দরসমূহে অনেক বাড়ীর ফটকের থাম দেওয়া হইত তিমির হাড় দ্বারা। আবার অর্ধচন্দ্রাকার ফটকশিরে থাকিত খোদাই মূর্তি—উহাও তিমির হাড়ে প্রস্তুত। হুইটবি বন্দরের নিকট শ্লেইট্স্ নামক গ্রামে এমন একটি ফটক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

বিবাহের উপমায় সিড্নি স্মিথ

সিড্নি স্মিথ তাঁহার 'লেডি হ্যারল্ড্' নামক গ্রন্থে একস্থানে বিবাহ সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ—

বিবাহ ঠিক এক জোড়া কাঁচির অনুরূপ। এমনইভাবে উহার দুই শাখা সংলগ্ন যে উহাদিগকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া নেওয়া যায় না, অবশ্য অটুট রাখিয়া। প্রায়ই দেখা যায় শাখা দুইটি একে অন্য হইতে দূরে চলিয়া যায় বিপরীত পথে; কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে, অবশেষে পূর্ব-স্থানে ফিরিয়া আসিতে হয়। আরও বিচিত্র এই যে, শাখা দুইটি যখন বিপরীত দিকে সরিয়া যায়, তখন তৃতীয় ব্যক্তি ঐ দুই শাখার মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে আসিয়া পড়িলে, তাহাকে চরম দণ্ড প্রদান করিতে শাখা দুইটি সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকে—অবধারিত সেই দণ্ড হইতে কেহই রেহাই পাইতে পারে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর যাযাবর

জিপ্সি বা যাযাবরের দল সকল দেশেই দেখা যায়। বর্তমানে যে প্রকার যানবাহনে ও পোষাক-পরিচ্ছদে শোভিত দেখা যায়, অতীতে সে প্রকার অবশ্য ছিল না। ইংলণ্ডেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ঋতুতে জিপ্সি দল হাজির হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে সকল জিপ্সি হামেশা ইংলণ্ডে দেখা যাইত তাহাদের শকটও ছিল না, বাহনও ছিল না। নিজেদের যাবতীয় সম্পত্তি তাহাদের পুরুষেরা বাঁকে করিয়া বহন করিত। আর নারীগণ গলায় ঝুলাইয়া লইত মোটা দড়ির সাহায্যে। অসুস্থ অপটুদের আবার সাময়িক ঐ

বাঁকেরই এক পাল্লায় স্থান হইত। পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত অবসন্ন স্ত্রীকে জিপ্সি-স্বামী তাহার বাঁকের এক পাল্লায় জলচৌকীর মত আসনে বসাইয়া বহন করিয়া চলিত। কারণ, তাহাদের সন্ধ্যায় আশ্রয় গ্রহণের স্থান থাকিত নির্দিষ্ট। সেই নির্ধারিত গ্রাম বা চটিতে পৌঁছিতে না পারিলে তুষারের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় থাকিত না। দ্বিতীয়ত আহার্য সামগ্রীও যেখানে সেখানে মিলিত না। অনেক গ্রাম সেকালে ছিল জিপ্সী-বিরোধী। তাহারা জিপ্সিদের সন্দেহের চক্ষে দেখিত, কিছুতেই কোনপ্রকার আমল দিত না। এমন কি উহাদের সহিত কথা বলাও পাপ মনে করিত। তাই বাঁক ছিল তাহাদের শকট—একাধারে লটবহর ও মানুষ বহন করিবার।

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

(১৯)

পরের দিন রাত্রিতে চণ্ডীমণ্ডপে পা দিয়াই সুবোধ ইভার কথার সত্যতা বুঝিতে পারিল। গোটা-দুই কেরোসিনের লণ্ঠন টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছে, কয়েকজন লোক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন চটের উপর শুইয়া আছে। কেহ কেহ থেলো হুঁকায় করিয়া কড়া তামাকু টানিতেছে। হুজুগ দেখিতেই তাহারা আসিয়াছিল, বাবুদের আসিতে দেরী দেখিয়া সারাদিনের শ্রমক্লান্তিবশত কেহ কেহ চটের উপর শুইয়া পড়িয়াছিল। ও-ধারে জনকতক মাঝি বসিয়াছিল, তাহাদের মুখ হইতে তাড়ির উগ্র গন্ধ কথায় কথায় বাহির হইতেছিল।

একজন কৃষাণ বলিল, "মাশায় উসব পড়ালেখার হুজুগ লিয়ে আমাদের কি উপকার হবে বাবুমাশায়?"

সুবোধ ওজস্বিনী ভাষায় তাহাদের উপকারের বহর বুঝাইয়া বলিতে লাগিল। তাহারা ঘন ঘন হাই তুলিতে লাগিল।

অবনী বলিল, "শুধু এমনভাবে শুষ্ক পদ্ধতিতে বর্ণমালা চিনিয়ে ওদের তেমন কি উপকার হবে সুবোধ-দা? যাত্রা কথকতা এ-সবের ভিতর দিয়েও ওদের শিক্ষার সঙ্গে একটা আনন্দ আর প্রাণের যোগ বাঁধতে হবে। কিন্তু ও-সব কিছুতেই কিছু হবে না যদি আমরা এখানে তিষ্ঠাতে না পারি। তা'হলে যে অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সব চেষ্টা সব উদ্যম একটা ক্ষণস্থায়ী হুজুগে পরিণত হয়ে শীতশেষের ঝরাপাতার মত দুদিন বাদে নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে যাবে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জান সুবোধ-দা এখানে টেঁকাই দায়। দুদিন যদি থাক তুমিও টের পাবে। না আছে সঙ্গী না আছে কথা বলবার একটা লোক। যাদের মন বলে একটা জিনিষের একটুখানি বালাই আছে তারা শুধু খাওয়া-দাওয়া ঘুম নিয়ে এখানে থাকতে পারবে না। অসহ্য কষ্ট হবে। ম্যালেরিয়া আছে, অস্বাস্থ্য আছে, আরও নানাদিকে নানা অসুবিধা আছে স্বীকার করি কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা এই মানসিক দৈন্যের। এর থেকে যদি আমরা গ্রামবাসীদের অন্তত খানিকটা মুক্তিও না দিতে পারি তাহলে আশা করবার বাকী থাকে কি!"

তাড়ির গন্ধে এবং কড়া তামাকের ধোঁয়ায় সুবোধের মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল তথাপি মুখে ক্ষীণ হাস্য টানিয়া আনিয়া কহিল, "তোমার কথা খুব সত্যি অবনী। আর সত্যি বলেই ত এইদিকে দেশের বড় বড় লোকদের নজর পড়েছে। যাক এবার কাজ আরম্ভ করা যাক। প্রথম সঙ্কোচটা কেটে গেলে অনেক কিছুই সহজ হয়ে আসবে।"

চটের থলির উপর বসিয়া চিনিবাস ময়রা তখন বলিতেছিল, "এবারে রাসের সময়ে জয়দেবের মেলাটায় খুব লাভ করেছিলাম। সকাল থেকে ভিয়েনের কড়াই আর নামত না। হিসেব করে দেখ না পুঁটির মায়ের জন্যে একটা বিলিতী র‍্যাপার, দুজোড়া বাহারে পাড়ের শাড়ি, একটা নাকছাবি, এক-জোড়া রুপোর বাজু সব ঐ লাভের কড়ি থেকে খরিদ করে-ছিলাম।"

একজন কৃষাণ বড় বড় চোখ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু লড়াই নাগবেক না কি? আমাদের ছিপতি ঘোষ বলতেছিল তাই জন্যে আজকাল যখন তখন মাথার উপর দিয়ে উড়ো-জাহাজগুলা অমন বন্ বন্ করতি করতি যায়।"

বসন্ত বাগ্‌দী মহা উৎসাহে তাহার মাছ ধরার গল্প চালাইতেছিল। চুনো মাছ ও পুঁটি মাছ কলাপাতায় ভাগা দিয়া বিক্রয় করিয়া বেশ দু'পয়সা কেমন করিয়া লাভ করা যায় তাহারই ইঙ্গিতটা সে ব্যক্ত করিতেছিল।

একজন বোধ করি নেশার ঝোঁকে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল, "ক'লকেতার বাবুদের এ আবার কি হুজুগ রে ভাই। দুদিন বাদে আপুনি পালাবে বাবুরা। বর্ষাটি পড়তে দেও বাবা, তখন আর কোন বাবুকে থাকতে হয়নি ইখেনে। রায় বাহাদুর পাবার লেগে মিটিং করতে লেগেছে। হঃ, সব জানে এই শম্মা।"

নিষ্ঠার তেজ মনের মধ্যে যে করিয়া পারি জ্বালাইয়া রাখিব; এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে সুবোধ কোনক্রমে তাহার প্রথম দিনকার কর্ত্তব্য শেষ করিল। পথে আসিতে আসিতে অবনী বলিল, "আচ্ছা সুবোধ-দা, এদের যে অক্ষর পরিচয় করাচ্ছি, প্রথমভাগ পড়ে এরা তারপর পড়বে কি? মোটামুটি পড়তে শিখলে পরে যে সব বই এরা সহজেই পড়তে পারবে বা পড়ে তাদের উপকার হবে তেমন বই দেশে কোথা? রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, নিশ্চয়ই এরা পড়তে পারবে না। মাতৃভাষায় নানা বিষয়ের সহজ সরল বই না হইলে তোমাদের এ অভিযানের মানে কোথায়? কলকাতায় ফিরে যেয়ে এ কথাটা নিয়ে আলোচনা ক'র।"

সুবোধ ভাবিয়া দেখিল, কথাটার মধ্যে অনেকখানি গুরুত্ব রহিয়াছে। এ সমস্যার মীমাংসা না হইলে নিরক্ষরতা দূর অভিযানের মানে হয় না। এ বিষয়ে কলিকাতায় শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদের লিখিয়া তাঁহাদের গোচরে আনিয়া আন্দোলন করিবে বলিয়া সে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। বাড়ীতে ফিরিয়া রাত্রির খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা ছাদে মাদুর পাতিয়া শুইয়া অবনীর সহিত তাহার আলোচনা চলিল। ইভা আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য যোগ দিয়াছিল তাহার পর গৃহকাজে উঠিয়া গেল। অবনী গল্প করিতে করিতে কোন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল। জমিদার বাবুদের কাছারি বাড়ীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিয়া গেল। সুবোধের চোখে ঘুম আসিতেছিল না। নূতন জায়গায় অপরিচিত আবেষ্টনী, সারাদিনের কর্ম্মের উত্তেজনা তাহার মনকে অতি-মাত্রায় সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। তারাভরা আকাশের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া মনের ভিতর এমন সকল ভাব আনা-গোনা করিতেছিল কলিকাতায় যে কথা কখনও ভাবে নাই। কলিকাতায় মানুষের মনটা সর্ব্বদাই একটা না একটা কাজে এমন ব্যাপৃত হইয়া থাকে যে কাজের বাহিরে আর একটা যে ভাবের জগত আছে সে অনুভব দৈবাৎ ঘটে। এখানে দিগন্ত-ব্যাপী আকাশ; অস্ফুট জ্যোৎস্না এবং কম্পমান নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিয়া মনটা বিশাল অবকাশের মধ্যে ছাড়া পায়। সেই কথাটা সুবোধ চুপ চাপ শুইয়া থাকিতে থাকিতে প্রবলভাবে অনুভব করিল। (ক্রমশ)

পক্ষি-জীবনের রহস্য

শ্রীসমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশূন্যে পাখীতে পাখীতে ঠোকাঠুকি লাগে না কেন?

একসঙ্গে পাঁচশত পাখী ঘণ্টায় পঞ্চাশ কি ষাট মাইল বেগে ধাবিত হয় এক সারিতে কি দুই তিন সারিতে, ঠিক যেন আধুনিক শিক্ষিত ফৌজ। সময়ে উহারা ডাইনে বাঁয়ে মোড় ঘোরে—সহসা হয়ত ডিগবাজী খায়—কিন্তু এমনভাবে যুগপৎ সে চমৎকার কসরৎ উহারা করিয়া ফেলে যে কোন প্রকার দুর্ঘটনা কোন দিন ঘটে না।

আবার সময়ে সকলের তাক্ লাগিয়া যায় দেখিয়া যখন দুই হাজার পাখী একসঙ্গে বৃত্তাকারে ঘোরে আর নানা ভঙ্গীর কসরৎ করে একেবারে ফৌজের কুচকাওয়াজের সামরিক নিপুণতায়। তাহার ভিতরে যে পাখীগুলির ডানায় শাদা ও কালোর পাশাপাশি দুইটি প্রশস্ত ছাপ থাকে—তাহাদের দৃশ্য হয় আরও অদ্ভুত। এক মুহূর্ত্তে রূপার মত শাদা রংয়ে চক্ চক্ করে, পর মুহূর্ত্তে দেখায় কালো আর মেঘের গায় যায় মিলাইয়া। এই কসরতে কোন একটি পাখীই আপন সারির নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে পিছাইয়া পড়ে না বা আগাইয়া যায় না।

কেমন করিয়া উহারা এমন নিখুঁতভাবে একসঙ্গে পক্ষ সঞ্চালন করিতে পারে? একসঙ্গে ঘুরিতে ফিরিতে পারে ঠোকাঠুকি না করিয়া? এই সকল অভিযান কি মাত্র সমকালীন একটি মননশীলতায় আচরিত হয়?

মিঃ পেরি বলেন—উহাদের অনুভূতি অতি তীক্ষ্ণ ও দ্রুততর, তাই পাশের পাখীটির আচরণ দেখিয়া অনুকরণ করিতে উহাদের মুহূর্ত্তও লাগে না; এই জন্যই উহারা সমকালে একদল অনুরূপ চলন-ভঙ্গীতে উড়িতে পারে। কিন্তু যে প্রকারে আশ্চর্য্য mass-movement (গণ-চলাচল) উহারা প্রদর্শন করে, তাহাতে মাত্র অনুভূতি ও অনুকরণকে হেতু করা ভুল হইবে। উহার অতীতও অন্য একটা কিছু শক্তি উহাদের রহিয়াছে।

পরলোকগত মিঃ এডমাণ্ড সেলাস্ বলিয়াছেন,—চিন্তাশক্তি কোনও প্রকার অসূক্ষ্ম আকারেও উহাদের রহিয়াছে নিশ্চয়। তাই সমকালীন উড্ডয়নের সময় উহারা পরস্পর এই চিন্তার বিনিময় করিতে পারে কোনও প্রকার বাহ্যিক ইঙ্গিত বা সঙ্কেত ছাড়াও। এই প্রতিক্রিয়াকে তিনি thought transference in birds (পাখীর ভিতর চিন্তা বিনিময়) আখ্যা দিয়াছেন।

মিঃ ফ্রান্সিস্ পিট্ বলেন,—আসন্ন গতি পরিবর্ত্তনের ধারণা পাখীদের ভিতর উপলব্ধ হয় টেলিপ্যাথি দ্বারা। পাখীদের এই প্রকার চলাচলের সময় দুর্ঘটনা এত বিরল যে, দুর্ঘটনা উহাদের ঘটে না—এই নির্দ্দেশ দান করিতেই আমরা প্রলুব্ধ হই। আমাদের রাজপথে ট্রাফিক কন্‌ট্রোল থাকা সত্ত্বেও কত শত দুর্ঘটনা নিত্য হইয়া থাকে। উহাদের সে প্রকার কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকা সত্ত্বেও উহারা আমাদের রাজপথের শতভাগের একভাগও দুর্ঘটনায় পতিত হয় না। সুতরাং শুধু অনুকরণ—শুধু দৈহিক ক্ষিপ্রতা বলেই উহারা এমন সামঞ্জস্য বিধান করে একথা স্বীকার করা যায় না। কোন-না-কোন প্রকারের টেলিপ্যাথি উহাদের এইরূপে সমতালে পরিচালিত করে।

এই প্রকারে পাখীদের গণ-উড্ডয়নের সাফল্য সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। কিন্তু ঠিক কি প্রকার ইঙ্গিত—কি প্রকার অনুভব-শক্তির প্রেরণায় উহারা এমন দলে দলে জুটিয়াও একক একটি পাখীর মতই একতালে চলিতে পারে, তাহার সত্যতা আবদ্ধ রহিয়াছে পাখীদের মস্তিষ্কে। এবং আধুনিক বিজ্ঞান, অতি সেয়ানা হইলেও পাখীর মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া—উহার যান্ত্রিক জটিলতা ভেদ করিয়া নিখুঁত সত্যটি উদ্ধার করিতে আজও সমর্থ হয় নাই।

আর একটি রহস্য পাখীদের সম্বন্ধে হইল— ইহাদের বার্ষিক হাওয়া বদলের শফর। বয়সে বড় সুতরাং অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পাখীগুলি জুলাই মাসেই রওনা হয় গরম দেশের সন্ধানে। অগষ্টের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত চলে উহাদের বিভিন্ন দলের যাত্রা। কিন্তু ছানাগুলি অপটু বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। ঐগুলি কোন প্রকারে বাঁচিয়া উঠিলে সেপ্টেম্বরে যাত্রা করে। এই যে বুদ্ধেরা যায়, উহাকে অভিজ্ঞতা ধরিয়া লইলেও ছানাদের বেলা সেই কথা বলা চলে না। শফরে বাহির হওয়ার প্রবৃত্তি উহারা পায় উত্তরাধিকার সূত্রে, যেমন পায় পালকের রং, যেমন পায় গতি-ভঙ্গী, যেমন পায় শিকারে নিপুণতা। কোন চালক নাই সঙ্গে, কোন পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা নাই, তবু উহারা সেয়ানা বড় পাখীদের মতই ঠিক পথে—সাগর অতিক্রম করিয়া উচ্চ পর্ব্বত ডিঙাইয়া—চলিয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলেন, বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে শফরে বাহির হইবার এমন একটা প্রেরণা উহাদের প্রাণে আসে, উহারা আর নিশ্চল থাকিতে পারে না। উত্তরাধিকার সূত্রে এই প্রেরণার যেমন অধিকারী উহারা, তেমনই আবার কোন দিকে যাইতে হইবে, সেই ধারণাও উহাদের সহজাত। তথাপি পথের নিশানা অজানা হইলেও কি প্রকারে অবশেষে ছানাগুলি, ধাড়ীরা যে দেশে গিয়াছে, ঠিক সেই দেশে যাইয়াই হাজির হয়, ইহা আমাদের নিকটে চির রহস্যাবৃত রহিয়া গিয়াছে।

বস্তুত পাখী অতি রহস্যময় জীব এবং এই রহস্যই বৈজ্ঞানিককে ইহার প্রতি এতটা আকর্ষিত করিয়াছে।

পুস্তক-পরিচয়

তথাপি—উপন্যাস। **শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত।** মূল্য পাঁচ সিকা। কিশোর গ্রন্থালয়, ১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্ণকমলবাবু সুলেখক। তথাপি বলিব 'তথাপি'তে তাঁহার লেখার মুন্সীয়ানা এক অখণ্ড রস-মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছে। বইখানি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, আগাগোড়া উপন্যাসখানা ভাবরসে বাঁধা ছন্দোময় সঙ্গীতের মত সুমধুর। বইখানা শেষ না করিয়া উঠিতে পারি নাই। বড়লোকের ছেলে প্রণবেশ। সে গরীবের মেয়ে কল্যাণীকে বিবাহ করিয়া আনিল। কল্যাণীর রূপের শেষ নাই, কিন্তু পরে দেখা গেল এত রূপময়ী যে কল্যাণী সে বোবা। মুখে তাহার ভাষা ফোটে না। প্রণবেশ ক্ষুণ্ণ, কল্যাণীর অভিভাবকেরা তাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে বলিয়া উত্তেজিত। প্রণবেশের এই উত্তেজনা, তাহার এই অবাধ্যতা কিন্তু টিকিল না, হার তাহাকে মানিতে হইল। ভাষার যেখানে প্রকাশ নাই—বৈষ্ণব কবির কথায় 'ভাব বিনা নাহি সঙ্গ', নারীর মৌন-মাধুরী প্রণবেশের মনের সেই গূঢ় রাজ্যে ভাবের বৈভব ছড়াইল। প্রণবেশ গলিয়া গেল, মজিয়া গেল তাহার মহিমায়। ভাব-মাধুর্য্য মানুষের অহঙ্কৃত বিষয় বিচারের উপর প্রভাব বিস্তার করে কেমন বিচিত্র গতিতে, কেমন অনেকটা অলক্ষ্যে এবং যথার্থভাবে, উপন্যাসখানিতে লেখক তাহা উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন। নারী-পুরুষের মনোধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রহিয়াছে স্বর্ণকমলের লেখায়। কিন্তু স্বর্ণকমলবাবুর লেখার বিশেষত্ব হইল এই যে, তাঁহার মনোধর্ম্ম বিশ্লেষণ শুধু বস্তুগত নয়, সাইকোলজির সূত্রগত রূঢ়তা তাঁহার লেখায় নাই, তত্ত্বকে তলাইয়া লেখকের দৃষ্টি বিগাঢ় রস-সত্রে বিস্তৃত হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বিচার বাগ্‌বিন্যাসের ভিতরে পাঠকের চিত্তকে শ্রান্ত করে না, ছন্দোময় সঙ্গীতের সুরেই চিত্ত আপ্লুত হইয়া পড়ে। স্বর্ণকমলবাবুর লেখার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব যেটি আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে তাহা এই যে, তাঁহার রসানুভূতিতে আবিলতা নাই। তাহা সর্ব্বত্র স্বচ্ছ এবং সুনির্ম্মল। ভালবাসার শুভ্রমূর্ত্তি তিনি দেখাইয়াছেন। মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়া প্রেমের পবিত্রতাকে তিনি প্রস্ফুট করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তিনি অন্য ইতর আকর্ষণের উপরে। এই কাজটি করিতে গিয়া ধর্ম্মের বাঁধাবুলি তিনি আওড়ান নাই, নীতির লেকচার দেন নাই। অন্তর্দৃষ্টির যে পরিমাণ প্রাচুর্য্য থাকিলে নিছক রসের উপর দিয়া এই কাজটি সম্ভব হয়, সে পরিচয় তিনি দিয়াছেন। নিছক রসের আশ্রয়ে এই কাজটি তিনি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার লেখার কোথায়ও আড়ষ্টতা নাই, লেখনীর গতি স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল। নারীর অন্তরের রহস্যকে তিনি সুনিপুণভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, শবচ্ছেদকের ছুরিকায় নয়—রস-শিল্পীর তুলিকায়। নারীর অন্তরের সব রস এবং ছন্দকে তিনি যেমনভাবে জননীর মাধুর্য্যে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছেন, অথচ মামুলী নীতি এবং বাঁধা উপদেশ আওড়ানোর মধ্যে একেবারেই তাঁহাকে এজন্য আসিতে হয় নাই—তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। রস-সাধনার এখানেই কৃতিত্ব। বিধিমার্গের উপর রাগমার্গের এই অনুভূতিই রসের ঐকান্তিক অবদান। স্বর্ণকমলের কল্যাণীর এই রসোজ্জ্বল মৌন-মাধুরী বাঙলা দেশের উপন্যাস সাহিত্যকে স্থায়ীভাবে সমৃদ্ধ করিবে, এমন আশা আমরা করিতে পারি। ছাপা এবং বাঁধাই মনোরম।

মিস সুলেখা সেন ও অন্যান্য—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রণীত। মূল্য ষোল পয়সা। ২।২নং বিশ্বনাথ মতিলাল লেন, বহুবাজার; 'খেয়া' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ছোট বই; নাট্যাকারে লিখিত। রসসৃষ্টির চেষ্টা আছে।

রকমারি—(ছোটদের জন্য)

গ্রন্থকার—শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী, প্রকাশক—পি রায়, ৩বি শ্যামানন্দ রোড ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

ছোটদের উপযোগী অনেক কিছু জানিবার শিখিবার জিনিষ নিপুণ হস্তে গ্রন্থকার এই পুস্তকের মারফৎ পরিবেশন করিয়াছেন। প্রথমত ভৌতিক ছবি এবং ভৌতিক চশমার সাহায্যে উহা দেখিবার কৌশল হাতে-কলমে প্রদর্শিত। ইহাতে ছেলে-মেয়েরা কৌতুক পাইবে যথেষ্ট। ইহা ছাড়াও জীব-জন্তু পাখীর কথা, ছায়ার কারসাজি, ধাঁধাঁ প্রভৃতি নানা জাতীয় বিষয় অতি সরস সহজ কথায় বুঝান। মোটের উপর একখানি ছেলেদের মনের মত বই। এই ধাঁজের প্রয়াস বাঙলায় আর চোখে পড়ে না—মনে হয় বইখানি সহজেই ছোটদের চিত্ত অধিকার করিবে।

কালো ভ্রমর (দ্বিতীয় ভাগ)

ছেলেদের জন্য—গ্রন্থকার শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রকাশক, আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য চৌদ্দ আনা।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগ কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। ছোটদের সম্মুখে অপূর্ব্ব দুঃসাহসিকতার কাহিনী সেখানিতে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এই প্রকার য়্যাডভেঞ্চারের পুস্তক বাঙলার কচিদের হাতে যত বেশী দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। দ্বিতীয় ভাগেও এমন সব চমকপ্রদ অসীম সাহসের কাহিনী বিবৃত যে পুস্তকখানি সহজেই শিশুচিত্ত আকৃষ্ট করিবে। যে দুইটি মূল চরিত্রের অভিযানের কাহিনী দ্বারা প্রথম ভাগের সূচনা, তাহারই পরিণতি দ্বিতীয় ভাগে ছোটদের কৌতূহল বিশেষভাবে উদ্রেক করে। কাজেই প্রথম ভাগ যাহারা পড়িয়াছে, দ্বিতীয় ভাগ পড়িবার জন্য স্বভাবতই তাহাদের আগ্রহ জন্মিবে। তবে ছবিগুলি আরও পরিষ্কার হইলে বালক-বালিকাদের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইত।

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও তুরস্ক

তুরস্ক ইংরেজ কিম্বা জার্ম্মানীর মত বড় শক্তি না হইলেও আন্তর্জ্জাতিক পারিস্থিতির দিক হইতে তাহার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে, ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে তুরস্ক রহিয়াছে কেন্দ্র-শক্তিস্বরূপে, দার্দ্দেনেলিস প্রণালীর কর্ত্তৃত্ব তুরস্কের থাকাতে সামরিক গুরুত্ব তাহার খুব একটা বড় রহিয়াছে। এই সব নানা কারণে তুরস্কের সঙ্গে ইংরেজ ও ফরাসীর সন্ধি হইবার পর হইতে নিরপেক্ষ শক্তিনিচয় বিশেষভাবে রুশিয়া এবং ইটালী, এই দুই শক্তির নীতিতে একটা স্পষ্টতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে।

রুশিয়ার মতিগতি কিরূপ হইবে, এই সম্বন্ধে অনেক শক্তি এই সমর-সঙ্কটে যতটা পাকা করিয়া লওয়া দরকার ছিল, রুশিয়া তাহা করিয়া লইয়াছে। তাহার কার্য্যের ফলে পশ্চিম দিকে জার্ম্মানীর হাত বাড়াইবার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে, বল্‌কান প্রদেশেও জার্ম্মানীর চাল সেই সঙ্গে বিগড়াইয়া গিয়াছে। ইংরেজের সঙ্গে রুশিয়ার সম্প্রতি বাণিজ্য সম্পর্কে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে রুশিয়ার গুঁড়িকাঠের বদলে ইংরেজ তাহাকে টিন এবং রবার যোগাইবে, এইরূপ ঠিক হইয়াছে। রুশিয়া ফ্রান্স প্রভৃতি যুদ্ধরত শক্তিদের সঙ্গে পয়সা লইয়া মাল বিক্রয় করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছে; কিন্তু রুশিয়া নিজের নিরপেক্ষতার মতিগতিই সুস্পষ্ট করিয়া

লণ্ডনে তুর্কী সামরিক মিশন

সন্দেহের কারণ ছিল। রুশিয়া জার্ম্মানীর পক্ষ লইয়া যুদ্ধে নামিতে পারে, ইহাও অনেকে মনে করিতেছিলেন, ইটালীর সম্বন্ধেও অনেকের মনে সেইরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই দুই শক্তি যে নীতি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে হিটলারকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড হ্যালিফাক্স তাঁহার বক্তৃতায় বাল্টিকে রুশিয়ার নীতি কি আকার ধারণ করিতে পারে, সেজন্য আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু পরে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে দেখা যায়, ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতায় হস্তক্ষেপের কোনরূপ অভিপ্রায় রুশিয়ার নাই। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, এ সব রাজ্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের ইচ্ছা রুশিয়ার নাই। শুধু ইহাই নহে, রুশিয়া জার্ম্মানীকে ইহাও নাকি জানাইয়া দিয়াছে যে, সে সামরিক ব্যাপারে জার্ম্মানীকে সাহায্য করিবে না; করিবে না যে, ইহা বুঝাই গিয়াছিল; কারণ রুশিয়ার যদি তাহা করিবার মতলবই থাকিত, তাহা হইলে পশ্চিম সীমান্তে রুশ-সেনা বা বিমানবীরদের উপস্থিতি ইতিমধ্যেই দেখা যাইত। মোটের উপর নিজের তুলিয়াছে।

ইটালী কি করিবে, ইটালী সম্বন্ধে সম্প্রতি যে দুইটি সংবাদ আসিয়াছে, তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, ইটালীও পাকাপাকিভাবে নিরপেক্ষতার নীতিই অবলম্বন করিতে তৎপর হইয়াছে, জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িবার মতলব তাহার নাই। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এতদিন পর্য্যন্ত ইটালীর সীমান্তে অবস্থিত ফরাসী শহরসমূহে রাত্রিতে অপ্রদীপের ব্যবস্থা কড়াকড়িভাবে প্রচলন করা হইয়াছিল, কখন ইটালী জার্ম্মানীর পক্ষে নামিয়া বিপদ ঘটাইবে এই আতঙ্কে, এখন সেই কড়াকড়ি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উভয় দেশের সীমান্তবর্ত্তী শহরসমূহে স্বাভাবিক শান্তির সময়োচিত ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ফ্রান্স এবং ইটালীর মধ্যে পণ্য-দ্রব্যের আদান-প্রদানে কতকগুলি বাধা-নিষেধ জারী করা হইয়াছিল; সে বাধা-নিষেধ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর হইতে মিত্রশক্তি এবং অন্যান্য নিরপেক্ষ শক্তির নিকট ইটালী সব মাল বিক্রয় করিবে, সেগুলি

বিনা বাধায় ফরাসী দেশের ভিতর দিয়া বিভিন্ন দেশে যাইতে দেওয়া হইবে, ইটালীও সেইরূপভাবে ফরাসীদের মাল নিজেদের দেশের ভিতর দিয়া যাইতে দিবে। জার্ম্মানীকে সাহায্য করাই যদি ইটালীর মতলব থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইটালী এমন ব্যবস্থা মানিয়া লইত না।

ইংরেজের সঙ্গে তুরস্কের সন্ধির প্রভাব এই ব্যাপারে আছে এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। গত মহাযুদ্ধে দেখা গিয়াছে যে, তুরস্কের শক্তি কম নয়। বিগত মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে তুরস্ক নিরপেক্ষ ছিল, জার্ম্মানীরা গোপনে গোপনে তুরস্ককে হাত করিতেছিল, হঠাৎ একদিন তুরস্ক দার্দ্দেনেলিসের পথ বন্ধ করিয়া বসিল। জার্ম্মানীরা এই চালে রুশিয়াকে কাবু করিবার সুবিধা পাইল। তিন বৎসর পর্য্যন্ত দার্দ্দেনেলিসকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধ চলিল। কয়েকবার এই কেন্দ্রে মিত্রপক্ষকে কম পর্য্যুদস্ত হইতে হয় নাই।

তুরস্ককে নিজেদের দলে আনাতে ইংরেজ এবং ফরাসীর বিশেষভাবে শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে। তুরস্কের বলাবল কি অনেকেই তাহা জানেন না। সম্প্রতি তুরস্কের সমর-নীতি সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, তুরস্ক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ৪০ ডিভিশন সৈন্য সজ্জিত করিতে পারে। তুরস্কের অধিকাংশ সমরোপকরণই বিদেশ হইতে আসিত। চেকোশ্লোভাকিয়া যোগাইত বেশী মাল। দার্দ্দেনেলিস প্রণালীর তটে যে সব দূরবর্ত্তী কামান বসান হইয়াছে, সেগুলি সব জার্ম্মানীতে তৈরী। বিমান-ধ্বংসী কামান তুরস্কের অনেকগুলি আছে, এগুলি কতক ভিকার্স কোম্পানীর আর কতক স্কোডা এবং ক্রুপের কারখানার। গুলী-বারুদের ভাবনা তুরস্কের নাই। আঙ্কারা, ইয়াকিসিহান এবং কিরিকেলে কয়েকটি বড় গুলী-বারুদের কারখানা রহিয়াছে। এইগুলির মধ্যে কিরিকেলের কারখানাটি সব চেয়ে বড়। তুরস্কের বিমান-বহরে প্রায় ছয়শতখানা প্রথম শ্রেণীর উড়োজাহাজ রহিয়াছে। তুরস্কের নৌ-বহরে সেই নামকরা গোকেন এখনও আছে, সেনাদিগকে নূতন ধরণের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হইয়াছে। তুরস্কের আধুনিক ধরণের ১৪ খানা ডেস্ট্রয়ার আছে এবং নয়টি সাবমেরিন আছে। তুরস্কের প্রয়োজনীয়তা সামরিক দিক হইতে গুরুতর, তাহার প্রধান কারণ হইল, তুরস্কের ভৌগোলিক সংস্থান। জার্ম্মানী হঠাৎ তুরস্ক আক্রমণ করিবে, এমন ক্ষমতা তাহার নাই। ইউরোপে তুরস্কের সীমানার দৈর্ঘ্য ২৫০ মাইল মাত্র। এশিয়ায় তুরস্কের শত্রুতা বড় কাহারও সঙ্গে নাই। তুরস্কের খাদ্য-দ্রব্য যথেষ্ট। কয়লা, কাঠ, লৌহাদি ধাতু-দ্রব্য, এগুলি তুরস্কের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে, ইহা ছাড়া তুরস্কের বৃহৎ বৃহৎ তিনটি তেলের খনি রহিয়াছে, সমুদ্র-পথ তুরস্কের নিকট উন্মুক্ত; রুশিয়ার সঙ্গে কারবারের পথ তুরস্কের একেবারে খোলা। ইংরেজ এবং ফরাসী সামরিকগণ ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারদিগকে লইয়া তুরস্কে গিয়া দেখাশুনা করিতেছেন।

ইংলণ্ডের উপকূল রক্ষার ব্যবস্থা

তুরস্ক দ্রুতভাবে যন্ত্র-বিজ্ঞানচালিত ব্যবসার পথে উন্নতি লাভ করিতেছে। তুরস্কে শুধু ব্যবসার দিক হইতেই ব্যবসা নয়; তুরস্কে ব্যবসায়ীদিগকে স্বদেশ-প্রেমিকের মর্য্যাদা দেওয়া হয়। ব্যবসা সেখানে স্বদেশ সেবা; কারণ, তুরস্ক বুঝিয়াছে যে, আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিলে বর্ত্তমান জগতে স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই। তুরস্কের ভূত-পূর্ব্ব সুলতানগণ টাকার লোভে বিদেশীদিগকে নিজেদের

দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুবিধা দিতেন, ইহার ফলে, তুরস্ক দরিদ্র হইয়া পড়ে। তুরস্কের যত বড় বড় ব্যবসা, সব যায় বিদেশী মহাজনদের হাতে। ১৯১৪ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত তুরস্কে বিদেশীদের এই শোষণ নীতি চূড়ান্ত আকার ধারণ করে।

এই ক্ষতি পূরণ করিবার দিকে তুরস্কের নূতন গবর্ণমেণ্ট প্রথমত সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করেন। ইহার মধ্যেই সেই চেষ্টার ফলে তুরস্ক বিদেশী শক্তিসমূহের সব দেনা শোধ করিয়াছে। রেলগুলি গবর্ণমেণ্ট হাতে লইয়াছেন। তুরস্কে ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনে গবর্ণমেণ্টই প্রধান উদ্যোগী। আমেরিকার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ওয়েবষ্টার বলেন; তুরস্কের কারখানায় যত শ্রমিক কাজ করে, তাহার অর্দ্ধেকই বলা যায় সরকারী আমলা। ১৯৩৪ সালে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট একটি পঞ্চ-বার্ষিকী কার্য্যক্রম অবলম্বন করিয়া নানাদিকে যন্ত্রচালিত ব্যবসার সম্প্রসারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই পঞ্চ-বার্ষিকী কার্য্যক্রমের অধিকাংশ কাজই চার বৎসরের মধ্যেই সমাধা হইয়াছে।

আভ্যন্তরীণ সমস্যা এখন বিশেষ কিছু নাই বলিলেই চলে গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান বাধা ছিল, গোঁড়া ধর্ম্মান্ধ সম্প্রদায়। কিন্তু এই সতের বৎসরের মধ্যে তুরস্ক ধর্ম্মের গোঁড়ামি চুকাইয়া দিয়াছে। পর্দ্দা-প্রথা লোপ পাইয়াছে, পোষাক-পরিচ্ছদে তুরস্ক শ্বেতাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, বর্ণমালা হইয়াছে ল্যাটিন। আর্থিক উন্নতি বাড়িয়াছে সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়ামি দূর হইতেছে, এখন সংস্কারশীল দলেরই প্রাধান্য এবং সম্মান। জেহাদের নামে লোক খেপান আর তুরস্কে খাটিবে না। কামাল আতাতুর্কের পরলোক গমনের পর জেনারেল ইসমেত ইনোনী বর্ত্তমান তুরস্কের প্রেসিডেণ্ট। ইসমেত পাক্কা সংসারী লোক, তিনি ধর্ম্মভাবপরায়ণ এবং সুসঙ্কল্পশালী ব্যক্তি। ইংরেজ এবং ফরাসীর সঙ্গে তিনি যে মৈত্রীবন্ধ হইয়াছেন, তাহার মূলে আন্তর্জ্জাতিক নানা কারণ রহিয়াছে এবং এজন্য যে কিছু ঝুঁকি লওয়া উচিত, তাহা তিনি জানেন।

ইংরেজ কর্ত্তৃক জাহাজে নিষিদ্ধ মাল পরীক্ষা

মিনার্ভায় দেবী দুর্গা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্তের পৌরাণিক নাটক "দেবী দুর্গা" বর্ত্তমানে মিনার্ভা নাট্যমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। দেবী দুর্গার অলৌকিক দেবী-মাহাত্ম্য ও সুরথ রাজা কর্ত্তৃক সেই মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে মর্ত্তে দেবী পূজার প্রথম প্রবর্ত্তন প্রভৃতি নাটকের কাহিনীর বিষয়বস্তু।

নাটকখানির প্রাণ পুরুষচরিত্রে অভিনয় করিতেছেন শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন ছায়াচিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী ছায়া। শ্রীকামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, জীবন মুখার্জ্জি, শ্রীমতী নিভাননী, উমা মুখার্জ্জি প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন।

শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ইহার প্রযোজনা করিয়াছেন ও কাজী নজরুল ইসলাম ইহার গানগুলির রচনা ও সুর সংযোজনা করিয়াছেন।

নাটকখানির কাহিনী অতি পৌরাণিক, প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলিলেও চলে। তাই অন্যান্য অনুরূপ নাটকের মত ইহার স্বাভাবিক আবেদন আছে এবং সাধারণ ধর্ম্মভীরু নরনারীর প্রাণে ইহার বিভিন্ন ঘটনাবলী ভয়বিস্ময় জাগায়, যে দেব-দেবীকে কেন্দ্র করিয়া ইহার বিষয়বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতি ভক্তিও যে না জাগায় তাহা নহে। কিন্তু ইহার মুখ্যবস্তুকে পরিসমাপ্তি ও সার্থকতার দিকে টানিয়া লইতে যাইয়া এমন কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনার সন্নিবেশ করিতে করা হইয়াছে যাহার জন্য বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-প্রভাবিত মানব হৃদয়ের মণিকোঠায় যাইয়া ইহার আবেদন পৌঁছায় না, দ্বারে ঘা দিয়াই ফিরিয়া যায়।

অভিনয়ের দিক দিয়া নাটকখানি স্থবির, বিভিন্ন অভিনেতার চরিত্রঅঙ্কনকলা বাঙলার নাট্যজগতের ইতিহাসের বহু পুরাতন অধ্যায়ের। ইহার গানগুলির রচনা ও সুরে বিশেষত্ব আছে, সাজসজ্জা ও দৃশ্যপরিচালনা চোখ-ঝলসানো, মন-ভুলানোও অনেকটা; কিন্তু সেই মন সুরুচিসম্পন্ন মন যে নয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

নাট্য ভারতীতে 'মধুমালা'

কাজী নজরুলের লেখনীপ্রসূত "মধুমালা" নাটক নাট্য-ভারতীতে অভিনীত হইতেছে। নাটকখানি নীতিবহুল, তাই ইহাকে নীতি-নাটক বলা চলে। নাট্যকার নিজেই স্বরচিত গানগুলিতে সুর দিয়াছেন। তাঁহার এই কাজে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছেন শ্রীধীরেন দাস। ইহার আবহ সংগীত শ্রীরাইচাঁদ বড়ালের তত্ত্বাবধানাধীন, নৃত্য পরিকল্পনা করিয়াছেন শ্রীললিত গোস্বামী ও সমর ঘোষ। দৃশ্যপট পরিকল্পনার কার্য্য করিয়াছেন শ্রীমণীন্দ্র দাস (নানুবাবু) এবং শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নাটকখানির পরিচালনা করিতেছেন। বারান্তরে আমরা ইহার অভিনয়সাফল্য ও অন্যান্য বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিব।

* * * *

খ্যাতনামা নাট্যশিল্পী শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী নাট্যভারতী রঙ্গমঞ্চে যোগদান করিয়াছেন। "তটিনীর বিচার" নাটকে ডক্টর ভোনের ভূমিকায় তিনি পুনরায় অভিনয় করিতেছেন।
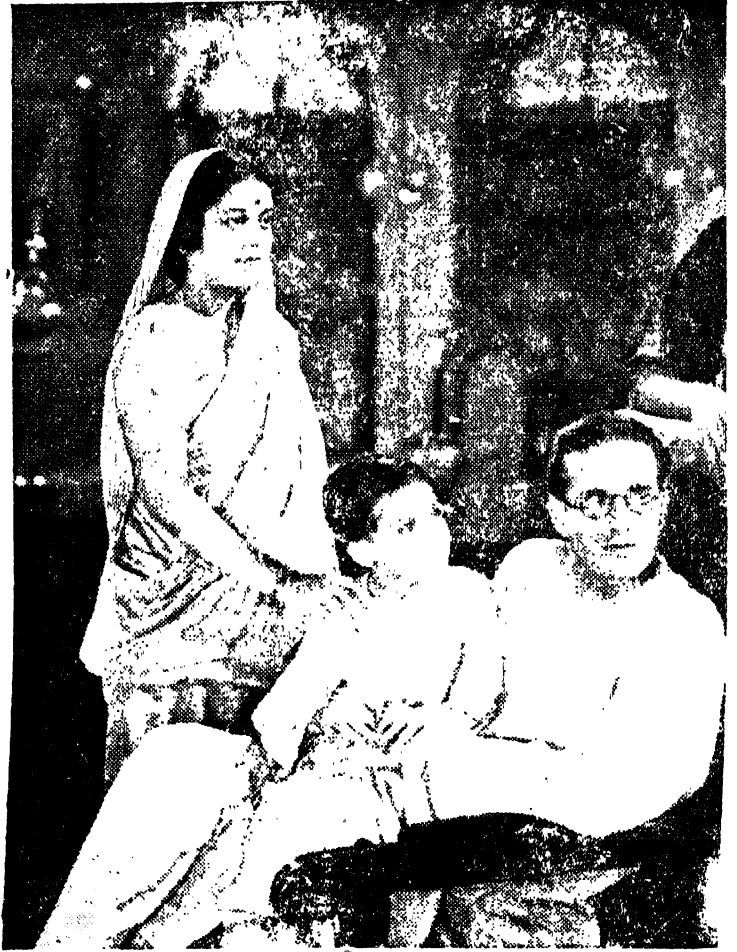
নিউ থিয়েটার্সের "পরাজয়" চিত্রের একটি দৃশ্যে শ্রীমতী কাননবালা এবং শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীহেমচন্দ্র ছবিখানি পরিচালনা করিতেছেন।

ষ্টুডিও সংবাদ

নিউ থিয়েটার্সের বাঙলা ছবি "পরাজয়ে"র কাজ শ্রীহেমচন্দ্র চন্দ্রের পরিচালনায় দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ইহার হিন্দী সংস্করণের কাজও শ্রীহেমচন্দ্র চন্দ্র বাঙলা সংস্করণের সমান তালেই চালাইয়া আসিতেছেন।

শ্রীফণী মজুমদারের পরিচালনায় তোলা নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী ছবি "কপালকুণ্ডলা" গতকল্য শুক্রবার একই সময়ে নিউ সিনেমা ও সিটি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিয়াছে। কপালকুণ্ডলার

(শেষাংশ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতের ক্রিকেট মরসুম আরম্ভ হইয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের প্রত্যেক শহরে ক্রিকেট খেলার বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সমস্ত শহরে প্রত্যেক শনি ও রবিবারে খেলার মাঠে ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের রীতিমত ভীড় হইতেছে। এই সমস্ত প্রদেশের ক্রিকেট পরিচালকগণও নীরব নাই। তাহারাও নিজ নিজ প্রদেশের সুনাম বৃদ্ধির জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করিতেছেন। নিজ নিজ প্রদেশের তরুণ উৎসাহী খেলোয়াড়গণ যাহাতে উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্যের অধিকারী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও তাহারা করিয়াছেন। ইঁহাদের উৎসাহ ও সুব্যবস্থার ফলে ইতিমধ্যেই এই সমস্ত প্রদেশের কয়েকটি খেলায় খেলোয়াড়গণ উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি কয়েকজন খেলোয়াড় বিশিষ্ট খেলায় শতাধিক ও দ্বিশতাধিক রাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বোলিং বিষয়েও উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন কেহ কেহ করিয়াছেন। কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড় ব্যাটিং ও বোলিংএ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিমূলক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার শীঘ্রই বোম্বাইতে আরম্ভ হইবে। এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দলে এই সমস্ত প্রদেশের খেলোয়াড়গণই স্থান পাইয়াছেন। আন্তঃ-প্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতাও শীঘ্র আরম্ভ হইবে। এই প্রতিযোগিতায় নিজ নিজ প্রদেশের সুনাম যাহাতে রক্ষা হয় তাহার জন্য এই সমস্ত প্রদেশের ক্রিকেট পরিচালকগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তরুণ উৎসাহী খেলোয়াড়গণকে লইয়া দল গঠন করিবার দিকেও এই সকল প্রদেশের পরিচালকগণের দৃষ্টি আছে। কয়েকটি প্রদেশের দল গঠিত হইয়াছে। দলের খেলোয়াড়গণের নাম পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়গণ নিয়মিতভাবে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সমস্ত প্রদেশের ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যেও ক্রিকেট খেলার বিশেষ উৎসাহ জন্মিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—এই সকল প্রদেশ ক্রিকেট মরসুমে উপযুক্ত সাড়া দিয়াছে।

বাঙলা প্রদেশ নীরব

বাঙলা প্রদেশ এখনও পর্য্যন্ত নীরব। ক্রিকেট মরসুম যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বুঝিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। খেলার মাঠে ক্রিকেট খেলার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। অন্যান্য বৎসরে এই সময় মাঠে কয়েকটি বিশিষ্ট দলকে ক্রিকেট খেলিতে দেখা যাইত, কিন্তু এই বৎসর হঠাৎ অক্টোবর মাসের কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ার ফলে এইরূপ বিলম্ব হইতেছে। আগামী সপ্তাহে খেলা আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা আছে। তখন এই নীরবতা কাটিবে সত্য, কিন্তু বোম্বাই বা মাদ্রাজ বা করাচীর ন্যায় ক্রিকেট খেলার উৎসাহ ও খেলোয়াড়গণকে উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে দেখা যাইবে না। প্রতি বৎসর বাঙলার ক্রিকেট মরসুম যেভাবে আরম্ভ হয় ও শেষ হয়, এই বৎসর তাহার কোনই ব্যতিক্রম হইবে না। প্রতি বৎসর বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ যেভাবে এই খেলাটি পরিচালনা করিয়া থাকেন, এই বৎসর সেইভাবেই পরিচালনা করিবেন। প্রতি বৎসর খেলার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া তাহারা যেরূপ দায়িত্বের পরিচয় দেন, এইবারও সেইরূপ দিবেন। বাঙলার ক্রিকেট খেলার উন্নতির কথা তাহারা কোনবার চিন্তা করেন নাই, এবারও করিবেন না। বিশেষ করিয়া গত বৎসর রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইয়া তাঁহারা যে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন সেই গর্ব্বই তাহাদের এই সকল চিন্তা হইতে দূরে রাখিবে। ইউরোপীয় খেলোয়াড়গণকে দলভুক্ত করিয়া দলের শক্তিবৃদ্ধি দ্বারা প্রতি বৎসর রণজি প্রতিযোগিতায় যেরূপভাবে বাঙলার মান রক্ষা করিয়া থাকেন, এইবারেও তাহাই করিবেন। উৎসাহী তরুণ বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড়গণকে উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইবার সাহায্য তাঁহারা কোন বৎসর করেন নাই; সুতরাং এই বৎসর নূতন করিয়া করিতে পারেন না। কুচবিহার মহারাজা বৈদেশিক ক্রিকেট শিক্ষক আনাইয়া শিক্ষার যখন ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন যে সমস্ত খেলোয়াড় ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তখন পরিচালকগণ কোনরূপ উৎসাহ দান করেন নাই বা আপত্তি করেন নাই, এইবারও তাহা করিবেন না। এই বৎসরের পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাঙালী খেলোয়াড় কেহই যে স্থান পাইলেন না তাহাতে তাঁহাদিগকে যদি কেহ দোষারোপ করে, তাঁহারা নির্ব্বিকারচিত্তে বলিবেন,—"বাঙালী খেলোয়াড় কেহই উপযুক্ত নহে বলিয়াই স্থান পায় নাই।" এমন কি রণজি প্রতি-যোগিতায় যদি বাঙলার দল এইবার বিজয়ী হইতে না পারে, তখনও তাঁহারা বলিতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিবেন না যে, "গত বৎসরের ইউরোপীয় খেলোয়াড়গণ থাকিলে এইরূপ অবস্থা হইত না।" বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণের মতিগতি যখন এইরূপ, তখন তাঁহারা যাহাদের পরিচালনা করেন তাহাদের মতিগতিতে যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে, ইহা আশা করাই অন্যায়। সেইজন্যই আজ অতি দুঃখে বলিতে হইতেছে "বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ কোথায়?" অর্থাৎ সেই সকল খেলোয়াড় যাঁহারা প্রকৃত বাঙলার ও বাঙালীর মান, মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে চান? যাঁহারা বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড়ের স্থান ভারতীয় ক্রিকেটে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাঁহারা কোথায়?

(৭১৬ পৃষ্ঠার পর)

ভূমিকায় লীলা দেশাই, নবকুমারের ভূমিকায় নাজাম, মতিবিবির ভূমিকায় কমলেশ কুমারী ও অন্যান্য ভূমিকায় জগদীশ, পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধ সান্যালের উপন্যাস "প্রিয় বান্ধবী" অবলম্বনে হিন্দী ছবি "জিন্দিগী"র প্রাথমিক কার্য্যে খুবই ব্যস্ত আছেন।

এসোসিয়েটেড প্রডাক্সনস লিমিটেডের দো-ভাষী ছবি "আলো-ছায়া ও তুফান"এর কাজ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। ইহার বিশিষ্ট ভূমিকায় পঙ্কজ মল্লিক, মলিনা, মঞ্জু, সুলেখা ইত্যাদি শিল্পীদিগকে দেখা যাইবে।

প্যারাডাইসে "জীবন সাথী"

সাগর মুভীটোনের আধুনিক সমাজচিত্র "জীবনসাথী" বা "কমরেডস" অদ্য শনিবার হইতে প্যারাডাইস সিনেমায় দেখান হইবে। ছবিখানির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করিয়াছেন সুরেন্দ্র, মায়া ব্যানার্জ্জি, হরিশ, জ্যোতি প্রভৃতি। ইহার আখ্যানবস্তু পরি-কল্পনায় কিছুটা নূতনত্ব থাকিলেও, ঐ আখ্যানবস্তুর পরিপোষক বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে গ্রথিত নাই; সেই কারণেই ইহা দর্শকের মনে ভালরূপ রেখাপাত করে না। অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব কেহই দেখাইতে পারেন নাই—তবে সুরেন্দ্রের গানগুলি বেশ শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

সমর-বার্ত্তা

১৫ই অক্টোবর—

পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রেরিত বৃটিশবাহিনী ফরাসী ব্যূহে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘাটিসমূহে পৌছিয়াছে এবং ঐসব ঘাটিতে অবস্থান করিতেছে।

গতকল্য জার্ম্মান সাবমেরিনের আক্রমণে 'রয়েল ওক' নামক বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ জলমগ্ন হয়। 'রয়েল ওক' ডুবির ফলে ৮ শতেরও বেশী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মোট ৪১৩ জন লোক রক্ষা পাইয়াছে।

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মানীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ফন ব্লমবার্গ ও অপর ৫জন উচ্চপদস্থ অফিসারকে ব্যাভেরিয়ার ল্যাণ্ডস্বার্গ দুর্গে বন্দী করা হইয়াছে।

বুখারেষ্টের এক সংবাদে প্রকাশ যে, রুশিয়া জার্ম্মানীকে কোন প্রকার সামরিক সাহায্য করিবে না বলিয়া তুরস্ককে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

জার্ম্মান বেতারের সংবাদে প্রকাশ, অর্থনৈতিক যুদ্ধের জন্য জার্ম্মানী ভবিষ্যতে সাবমেরিনের পরিবর্ত্তে ক্রেণ্ডারের ব্যবহার করিবে।

সোভিয়েট দক্ষিণ-পূর্ব্ব পোল্যাণ্ড ও শ্লোভাক সীমান্তে প্রচুর রণসম্ভার ও সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছে।

১৬ই অক্টোবর—

জার্ম্মান বিমানবহর স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে হানা দেয়; রয়েল এয়ার ফোর্সের সহিত উহাদের সংঘর্ষ হয়। ফার্থ অব ফোর্থের উপর প্রবল গোলাবর্ষণ চালাইয়াছিল। তিনখানি জার্ম্মান বিমানকে ভূপাতিত করা হয়।

১৭ই অক্টোবর—

বৃটিশ নৌ-সচিব মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় 'রয়াল ওক' জাহাজ ডুবির কথা উল্লেখ করিয়া এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, যুদ্ধ আরম্ভের পর গত ৬ সপ্তাহের মধ্যে ১৩খানি জার্ম্মান ইউ-বোট ধ্বংস হইয়াছে এবং ইউবোটের আক্রমণে বৃটিশ বাণিজ্যপোতের ক্ষতির পরিমাণ ১৭৪০০০ টন হইবে। পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষের যে সকল জাহাজ আটক করা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ২৯০০০ টন হইবে।

হের হিটলার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যস্থতার আশা ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বিপুলভাবে আক্রমণ চালাইবার চূড়ান্ত আদেশ দিয়াছেন।

জার্ম্মান বিমানবহর পুনরায় ফার্থ অব ফোর্থের উপর হানা দেয়। লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ফার্থ অব ফোর্থের উপর গতকল্যকার বিমান আক্রমণে দুইজন নৌ-বিভাগের অফিসার এবং তেরজন লোক নিহত হইয়াছে।

১৮ই অক্টোবর—

মস্কোতে রুশ-তুরস্ক আলোচনা শেষ হইয়াছে; কোন চুক্তি হয় নাই।

বেলগ্রেডে জার্ম্মান-যুগশ্লাভ বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

১৯শে অক্টোবর—

আনকারায় বৃটেন, ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই ত্রি-শক্তি চুক্তিতে নয়টি সর্ত্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বুলগেরিয়া মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন।

২০শে অক্টোবর—

ষ্টকহল্‌মে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও ফিনল্যাণ্ড এই চতুঃশক্তি সম্মেলনের বৈঠকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতা করার বিষয় বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থা অনুকূল নহে বলিয়া বৈঠক শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতা করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

২১শে অক্টোবর—

লুক্সেমবুর্গের সংবাদে প্রকাশ যে, পাল গ্রাস ও পালসেন ডোফ রাস্তার উপর ফরাসী গোলন্দাজবাহিনী প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

উত্তর সাগরে একটি রক্ষী পোত কর্ত্তৃক শত্রুপক্ষীয় বিমানবহর দৃষ্টিগোচর হয়। একটি সাঙ্কেতিক বার্ত্তা পাইয়া বৃটিশ সামরিক বিমানবহর তথায় উপস্থিত হয় এবং শত্রুপক্ষের বিমান পলায়ন করে। অদ্য অপরাহ্নে শত্রুপক্ষীয় বিমান প্রকৃতপক্ষে রক্ষীপোতসমূহের উপর আক্রমণ চালায় এবং রক্ষীপোতসমূহ হইতে গোলা বর্ষিত হয়। বৃটিশ সামরিক বিমানবহরের আক্রমণে শত্রুপক্ষের অনেকে হতাহত হয়।

লণ্ডনে নৌ-বিভাগ এবং বিমান বিভাগের দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উত্তর সাগরে রক্ষীপোতের উপর যে আক্রমণ হয়, তাহাতে শত্রুপক্ষের চারখানি বিমান যোগ দেয়। কয়েকখানি যুদ্ধ বিমান এবং রক্ষী জাহাজ তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। অন্ততঃ তিনখানি শত্রুপক্ষীয় বিমান, আমাদের যুদ্ধ বিমান কর্ত্তৃক ভূপাতিত হইয়াছে এবং অপর একখানি প্রবল গোলাবর্ষণের ফলে সমুদ্রের মধ্যে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়।

২২শে অক্টোবর—

হের হিটলার সমস্ত জেলার নাৎসী নেতাদিগকে বার্লিনে এক সম্মেলনে আহ্বান করিয়াছেন। এই সংবাদ সম্পর্কে "সাণ্ডে অবজারভার" পত্রের সংবাদদাতা মন্তব্য করিয়াছেন যে, হের হিটলার ব্যক্তিগতভাবে জার্ম্মান জনসাধারণের মনোভাব অবগত হইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

হিটলার শ্লোভাক দূতকে জানাইয়াছেন যে, পোল্যাণ্ডের কোন কোন অঞ্চল শ্লোভাকিয়াকে দেওয়া হইবে।

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী উচ্চ সামরিক কূট রণকৌশলে জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষের পরিকল্পনা সাময়িকভাবে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া সকলে অনুমান করিতেছে। জার্ম্মানরা জার্ম্মান এলাকা দখলকারী ফরাসীবাহিনীর উপর ব্যাপক আক্রমণ চালাইবার পরিকল্পনা করে। জেনারেল গামেলাঁ সম্মুখবর্ত্তী ঘাটিসমূহ ব্যতীত ফরাসী অধিকৃত জার্ম্মান এলাকার সৈন্যদিগকে গোপনে অপসারণ করেন এবং ঐসব ঘাটির সৈন্যেরা এরূপ আড়ম্বরসহকারে গোলাবর্ষণ করে যে, জার্ম্মানরা সন্ধানী আলো ইত্যাদির সাহায্যেও ফরাসীরা যে দুইদিন পূর্ব্বে উক্ত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহা জানিতে অসমর্থ হয়।

কয়েকটি পর্য্যবেক্ষণ ঘাটি ব্যতীত ফরাসীব্যূহ ফরাসী এলাকার সীমান্তে স্থানান্তরিত হইয়াছে। জার্ম্মানদিগকে এক্ষণে রাইন, মোসেল ও সারের বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধ্বংসস্তূপে পরিণত ছয় মাইল প্রশস্ত বেওয়ারিস এলাকার উপর দিয়া কামান ও সৈন্য লইয়া আসিতে হইবে।

২৩শে অক্টোবর—

প্যারিসে কয়েকটি সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, সামরিক সাহায্যের জন্য হের হিটলার যে আবেদন করিয়াছিলেন, মঃ ষ্ট্যালিন তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বৃটেনের বিমান-সচিবের দপ্তর হইতে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি বৃটিশ বিমানবহর দুইবার ইউ-বোট আক্রমণ করিয়াছিল। একবার উত্তর সাগরে এবং আর একবার আটলান্টিকে আক্রমণ চলে। আক্রমণের পর পাইলটগণ যেখানে ইউ-বোট জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়, সেই স্থান ঘেরাও করে। কিন্তু ইউ-বোটের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে নূতন নূতন সর্ত্ত উত্থাপন করায় ফিনিশ প্রতিনিধিমণ্ডলী নূতন করিয়া নির্দ্দেশ লইবার জন্য স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

২৪শে অক্টোবর—

সোভিয়েট-এস্তোনিয়া চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট সৈন্য এস্তোনিয়ার জেলাগুলিতে ছাউনি পাতিয়াছে।

ডানজিগে এক বিরাট জনতার সম্মুখে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জার্ম্মান পররাষ্ট্র-সচিব হের ভন রিবেনট্রপ বলেন, "জার্ম্মানীকে এই যুদ্ধে নামিতে বাধ্য করা হইয়াছে।"

সাপ্তাহিক সংবাদ

১২ই অক্টোবর—

ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স অনুসারে জলন্ধর জেলা কংগ্রেস ফরোয়ার্ড ব্লকের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত ব্রহ্মপতি যোশীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অস্থায়ী শিক্ষা-সচিব ডাঃ সত্যানন্দ রায় সন্ন্যাস রোগে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫০ বৎসর হইয়াছিল।

একটি রিভলবার লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগে রাজসাহীর সদর মহকুমা হাকিম অস্ত্র আইন অনুসারে সুধীর হালদার নামক এক ব্যক্তিকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শেষ গৃহী শিষ্য শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৩ই অক্টোবর—

কংগ্রেসী প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এম এ জিন্না ও কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হইয়াছিল, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

হায়দরাবাদে নিজাম প্রাসাদে নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলার নবনগরের জামসাহেবের সহিত মুসলিম লীগের ডিক্টেটর মিঃ জিন্নার সাক্ষাৎকার হয়। উভয়ের মধ্যে দুই ঘণ্টাকালব্যাপী আলোচনা হয়।

মিঃ জিন্না ও রাজন্যবর্গের মধ্যে মিতালী প্রতিষ্ঠাকল্পে পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খাঁর চেষ্টার ফলে এই সাক্ষাৎকার ঘটে।

বাঙলা ও সুরমা উপত্যকার (কংগ্রেস প্রদেশ) এ বৎসর প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক কংগ্রেসের প্রাথমিক সভ্য হইয়াছেন। এই সব প্রাথমিক সভ্যেরাই আগামী রামগড় কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। গত বৎসর বাঙলা ও সুরমা উপত্যকার প্রাথমিক কংগ্রেস সভ্যের সংখ্যা ছিল ৪,৪৬,৯৬৮ জন। এইবার ময়মনসিংহ জেলায় ৫৩২৫৫জন প্রাথমিক সভ্য হইয়াছেন। এত অধিক সভ্য কোন জেলায় হয় নাই।

মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা গান্ধীজীর মতে নরম এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। গান্ধীজী কংগ্রেসসেবীদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন যে, এই সংকটকালে তাঁহারা যেন এমন কোন কার্য্য না করেন, যাহা পরোক্ষভাবেও বিরুদ্ধতা বা শৃঙ্খলাহীনতা সূচনা করে। এইরূপ কোন কার্য্যের ফলে কংগ্রেসের মর্য্যাদা বিনষ্ট হইবে এবং তাহার প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইবে।

১৪ই অক্টোবর—

হরিজন পত্রিকায় "ভারতের মনোভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেন যে, মানুষ তাহার নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজ রক্তপাত করিতে পারে, এমনকি তাহার তাহা করাও উচিত। কিন্তু প্রতিপক্ষ যদি তাহার অধিকার সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত পোষণ করে, তবে সে প্রতিপক্ষের রক্তপাত নাও করিতে পারে।

সিন্ধুর গবর্ণর সুক্কুর-মঞ্জিলগড় আন্দোলন সম্পর্কে সিন্ধুতে ৬ মাসের জন্য অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

১৫ই অক্টোবর—

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আহ্বানে লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সিয়া-সুন্নি বিরোধের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এলাহাবাদ জেলার ৬০টি সভায় কিষাণ-দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কলিকাতাস্থ স্পেনের ভাইস-কন্সাল ডাঃ ধর্ম্মদাস ঘোষ তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৮ বৎসর হইয়াছিল।

১৬ই অক্টোবর—

বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বিহার ব্যবস্থা পরিষদে যুদ্ধ সম্পর্কে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের অনুরূপ যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাহা ৭৪-৬ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ভারতে গণতন্ত্রের নীতি প্রয়োগ এবং ভারতকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবার দাবী করা হইয়াছে।

১৭ই অক্টোবর—

কংগ্রেসের দাবীর উত্তরে বড়লাট এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বলিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন যে, যুদ্ধ শেষে ভারতের শাসনতন্ত্রের যেরূপ সংশোধন করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা রচনায় তাঁহারা ভারতের কয়েকটি সম্প্রদায়, দল, স্বার্থবিশিষ্ট শ্রেণী ও দেশীয় রাজন্যদের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিতে ইচ্ছুক। বড়লাট ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধ পরিচালনা এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য বৃটিশ ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও দেশীয় রাজন্যদের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া অবিলম্বে একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করা হইবে। ভারত সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি এই প্রশ্নের উত্তরে বড়লাট গত ১৯৩৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী কমন্স সভায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করেন।

বাঙলার গবর্ণর বিগত ২৬শে আগষ্ট তারিখের "দেশ" পত্রিকার সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে বাঙলা গবর্ণমেণ্টের এক ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বাঙলা গবর্ণমেণ্ট সমস্ত সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক বন্দী ও আইন অমান্যকারী বন্দীর মুক্তির বিষয় (যেগুলি বন্দিমুক্তি পরামর্শদাতা কমিটির নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছিল) বিবেচনা শেষ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ১৪৯ জনকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়াছেন, ৪৩ জনকে সর্ত্ত সাপেক্ষ মুক্তি দেওয়া হইয়াছে অথবা সর্ত্তসাপেক্ষ মুক্তি লইতে বলা হইয়াছে। ৭জন বন্দীর দণ্ডকাল যথেষ্ট মকুব করা হইয়াছে। কিন্তু ৪০জন বন্দীকে গবর্ণমেণ্ট মুক্তি দিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৮ই অক্টোবর—

ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড লর্ডস সভায় ভারত সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ১৯১৯ সালের ঘোষণার পুনরুল্লেখ করেন।

বড়লাটের বিবৃতি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃগণ বিবৃতি প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন যে, বড়লাটের ঘোষণা সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক।

১৯শে অক্টোবর—

কংগ্রেসী প্রদেশসমূহে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের অভিযোগ ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট উপস্থাপিত করিতে মিঃ জিন্নার অসম্মতি সম্পর্কে অধ্যাপক আবদুল মজিদ খান সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন।

ওয়ার্দ্ধায় বনিয়াদি শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী এক বক্তৃতা করেন।

২০শে অক্টোবর—

"টাইমস অব ইণ্ডিয়া" পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধীর নিকট এক আবেদন করা হইয়াছে যে, যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর এক সম্মেলন হইবে বলিয়া বড়লাট ঘোষণা করিয়াছেন। এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের গণ্ডি, মর্য্যাদা ও কর্ত্তব্য ইত্যাদি সম্বন্ধে এক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বড়লাটের নিকট হইতে পাওয়া যায় কি না, তাহার চেষ্টা করাই মহাত্মাজীর কর্ত্তব্য। "টাইমস অব

ইণ্ডিয়া" পত্রিকার একজন বিশেষ প্রতিনিধি ওয়ার্ধা যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করেন এবং উক্ত প্রবন্ধের উত্তরে মহাত্মার মতামত জানিতে চাহেন। মহাত্মা গান্ধী ইহার উত্তরে বলেন, "বড়লাটের ঘোষণার যতই ব্যাখ্যা ও সরলার্থ নির্ণয় করা হউক না কেন, যে পর্যন্ত কংগ্রেসের সুনির্দ্দিষ্ট দাবী পূরণ করা না হয়, সে পর্যন্ত আর কিছুতেই ইহা গ্রহণ যোগ্য হইবে না।" মহাত্মা গান্ধী বিশেষ জোর দিয়া বলেন, "কংগ্রেস যাহা চায় তাহা এই যে, ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হইবে, এই কথাই অতিশয় সুস্পষ্ট ভাষায় ও সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।"

২১শে অক্টোবর—

মহাত্মা গান্ধী অদ্যকার 'হরিজন' পত্রিকায় "সংখ্যাগরিষ্ঠদের কল্পনা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "আমরা স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইলে অবশ্যই স্বাধীনতা পাইব। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং মিত্রবর্গের পক্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠের যুক্তি প্রয়োগ না করাই ভাল। সোজাসুজি বলাই ভাল যে, ইংরেজ আরও কিছুদিন ভারতবর্ষকে পদানত রাখিতে চায়।"

২২শে অক্টোবর—

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন আরম্ভ হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীগুলিকে পদত্যাগ করিতে বলিয়া এবং এই বিষম সংকটের সময় নিজেদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার মত-বিরোধ বিসর্জ্জন দিবার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জ্ঞাপন করিয়া অদ্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, বড়লাটের বিবৃতিটি ওয়ার্কিং কমিটির মতে অসন্তোষজনক এবং সেই মামুলী নীতিরই পুনরাবৃত্তি। উহাতে ভারতীয়দের মধ্যে দলাদলির যে কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা গ্রেট বৃটেনের প্রকৃত অভিপ্রায় চাপা দিবার অজুহাত মাত্র। কমিটি দেশবাসীকে সর্ব্বপ্রকার বিরোধ বিসর্জ্জন দিয়া সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিতে সনির্ব্বন্ধ আবেদন জ্ঞাপন করিয়াছেন। হঠকারিতার সহিত আইন অমান্য, রাজনীতিক ধর্ম্মঘট অথবা অনুরূপ কোনও কার্য্য না করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

গত ১৭ই অক্টোবর বড়লাট যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া দিল্লীতে মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ জেলায় প্রবেশ নিষেধ করিয়া খাকসারদের বিরুদ্ধে যে ১৪৪ ধারা জারী হয়, তাহা অমান্য করিয়া ২১জন খাকসার গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত জাতীয় উদারনৈতিক সংঘের অধিবেশনে বড়লাটের ঘোষণা সম্পর্কে উক্ত সংঘের অভিমত বর্ণনা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে বড়লাটের বিবৃতিতে নৈরাশ্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

২৩শে অক্টোবর—

গতকল্য শ্রীহট্ট শহর হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী মিলম গ্রামে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় একদল মুসলমান প্রতিমা বহনকারী ও মিছিলে যোগদানকারী হিন্দু জনতাকে আক্রমণ করে। ফলে ২০জন শোভাযাত্রী গুরুতর আহত হইয়াছে।

সীমান্তের ডেরাইসমাইল খাঁয়ে দশেরার মিছিল সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমানে এক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে ১জন নিহত ও ১৪জন আহত হইয়াছে।

২৪শে অক্টোবর—

বিজয়াদশমী দিবসে কাটনীতে হিন্দু শোভাযাত্রিগণ ও মুসলমান জনতার মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে একজন লোক মারা গিয়াছে এবং ছয়জন আহত হইয়াছে।

নেল্লোরে কতিপয় হিন্দু নবরাত্রি শোভাযাত্রা বাহির করিলে মুসলমানগণ শোভাযাত্রা আক্রমণ করে। এই দাঙ্গায় একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে।

কানপুরে রামলীলা শোভাযাত্রায় মুসলমানগণ হানা দেয়—এই সম্পর্কে পুলিশকে গুলী চালাইতে হয়। গুলী চালনায় বহু লোক আহত হইয়াছে।

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হয়। আগামী ১৮ই নবেম্বর ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশন হইবে। ঐ সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি ওয়ার্কিং কমিটির বরাবরে পেশ করিবেন। মহাত্মা গান্ধীই এখন কার্য্যত কংগ্রেস তরণীর কর্ণ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পুনরায় বিরাট কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য নিজকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে আজ ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা হয়। মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

২৫শে অক্টোবর—

বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে আজ প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশানুযায়ী যুদ্ধ সম্পর্কিত এই প্রস্তাব বোম্বাই পরিষদেই সর্ব্বাগ্রে উত্থাপিত হইল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বোম্বাইয়ে সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি, বিশেষ করিয়া মুসলমানগণের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব ব্যাখ্যা করেন। কংগ্রেস সর্ব্বদাই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির স্বার্থ সংরক্ষণে আগ্রহশীল, এই কথাই তিনি জোর দিয়া বলেন।

২৬শে অক্টোবর—

কমন্স সভায় ভারত সম্পর্কে বিতর্ক হয়। মিঃ ওয়েজউডবেন, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্স, স্যার জর্জ্জ সুষ্টার প্রভৃতি কংগ্রেসের দাবী সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। স্যার স্যামুয়েল হোর বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার মামুলী প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

২৭শে অক্টোবর—

মাদ্রাজের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিয়াছেন।

স্যার স্যামুয়েল হোর কমন্স সভায় ভারত সম্পর্কিত বিতর্কে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তদুত্তরে মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতিতে স্যার স্যামুয়েলকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। (১) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন তুল্যার্থ না হইলে ভারতের পক্ষে তাহার কোন মূল্য আছে কি? (২) স্যার স্যামুয়েলের মতে, ভারতের সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার আছে কি? (৩) বৃটিশ জাতি সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা তথা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ত্যাগ করিয়াছে, এ ঘোষণায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু এই ঘোষণা সত্য কিনা, তিনি কি ভারতবাসীকে তাহা বিচার করিতে দিবেন?

গান্ধীজী বিবৃতিতে আরও বলিয়াছেন, "কংগ্রেস যে স্পষ্ট ঘোষণা দাবী করিয়াছে, তাহার উত্তরে স্যার স্যামুয়েল তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন উত্থাপন করায় মনে হয় যে, তাঁহার ঘোষণায় প্রকৃত কথা প্রকাশিত হয় নাই। কংগ্রেস ভারতবাসীদের মতামত জানিবার দাবী করে নাই; বৃটেনের অভিপ্রায় অবগত হইতে চলিয়াছে মাত্র। আমি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভারতে সত্যই এমন কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা শ্রেণী নাই, ভারত স্বাধীন হইলে যাহাদের স্বার্থ বা অধিকার বিপন্ন হইতে পারে। উপসংহারে গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, স্যার স্যামুয়েল যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শেষ কথা হয়, তাহা হইলে নৈতিকতার দিক দিয়া বৃটেনের উত্তর সন্তোষজনক বিবেচিত হইবে না।"

বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে যুদ্ধ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব সংশোধিত আকারে ৯২-৫৬ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। বোম্বাই মন্ত্রিসভা ৩১শে অক্টোবর পদত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

রাজকোট রাজ্যের শাসন-সংস্কার ঘোষিত হইয়াছে।

অন্ধ কুয়াশা

(গল্প)

শ্রীপ্রেমলতা দেবী

মুক্তি চায়—মুক্তি চায় তার নব-পরিবেশের রুদ্ধ কারা হইতে। অসীমের বুকে মুক্ত বিহঙ্গিনীর মত সে চায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে—শুভ্র মেঘপুঞ্জের মত সে চায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে মহাশূন্যের স্তরে স্তরে।

বিশাল রাজপুরীর মত মহলের পর মহলের শেষ নাই যে প্রাসাদের—সেই ঘনঘটাপূর্ণ কোলাহল মুখরিত অভিজাত অট্টালিকার মাঝে সে বন্দিনী। বন্দিনী নিশ্চয়—কারণ প্রাসাদের সর্ব্বত্রই তার অবাধ গতি হইলেও—তার পক্ষে নিষিদ্ধ শুধু আপন স্বামীর কক্ষখানি। শোভা ভাবে এমন ব্যর্থ জীবন উপহার দিবার কি দরকার ছিল বিধাতার!

সে তো চাহে নাই ঐশ্বর্য্য—সে তো চাহে নাই হীরা-জহরতে মোড়া সাজের পুতুল বনিয়া যাইতে। সে তো চাহে নাই পোকা-মাকড়ের মত সোনার পুরীতে অভিশপ্ত সদা-শঙ্কিত জীবন। তার চাইতে তার দরিদ্রা বিধবা জননীর শতজীর্ণ পর্ণকুটীরও যে ছিল দেবতার আশিসের মত সুন্দর। নিভৃত পল্লীছায়ার ধূলি কর্দ্দমময় সে অনুজ্জ্বল ছবিটি সে ফিরিয়া পাইতে চায়—কেন না, হউক মলিন, হউক অভিজাত্য-হীন দৈন্যের নগ্ন মূর্ত্তি, তবু সেখানে ছিল প্রাণ—প্রাণের তারে ছিল সজীব স্পন্দন। শোভা ত দারিদ্র্যকে ভয় করে না—আজ সোনার তালের উপর বসিয়াও সে রিক্তের অধম সে—তাহার প্রাণ যে মৃত—প্রাণহীন তাহার অস্তিত্ব—সে ত আজ ধনীর গৃহের আসবাবের বাহুল্যের মতই অপ্রয়োজনীয়—ধনীর খেয়ালের অপব্যয়ের মতই সার্থকতাহীন।

শোভার সান্ত্বনা—একমাত্র সম্বল—এই বাতায়ন। গৃহ-কর্ম্মের অবকাশে সে দেহমন সঁপিয়া দেয় এই বাতায়নের স্নেহময় বুকে। লক্ষ্য করে সোনালী সূর্য্যাস্ত কথা কয় নীলিমার গায়ে ফুটিয়া উঠা অগণিত নক্ষত্রসারির সঙ্গে—মরম-বেদনা যেন বাগানের ফুলগুলি সুষমা দিয়া মুছিয়া নেয়। শান্তি তবু সে যেন পায় বাতায়নে।

তা বলিয়া শোভা আলস্যে কাটায় না এক মুহূর্ত্ত। ঊষার আলো-ঝলমল প্রথম আরতির আমেজে শয্যা ত্যাগ করিয়া সে কাজে লাগিয়া যায়। তার শ্বশুর এটর্নী সুরেন্-বাবুর দ্বিতলের বসিবার ঘরখানি ঝাড়িয়া মুছিয়া—টেবিলের বইগুলি যথাযথ সাজাইয়া রাখিয়া সে যায় চা-পর্ব্বের অনুষ্ঠানে। তারপরে বড় জা', ভাসুর, তাঁদের ছেলেমেয়ে—সবার খাবার সাজাইয়া, চায়ের পেয়ালা ভর্ত্তি করিয়া ঝি-য়ের হাতে পাঠাইয়া দেয়। শ্বশুরের খাবার লইয়া যায় নিজ হাতে।

সুরেনবাবু প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করেন—তুমি খেয়েছ মা? শোভা নীরব থাকে। সুরেনবাবু আপন প্লেট হইতে দুটি একটি খাবার তুলিয়া নিয়া বাকি সবগুলাই শোভাকে খাইতে নির্দ্দেশ দেন। শোভা কুণ্ঠিত হইয়া সে খাবার লইয়া চলিয়া যায়। প্রথম দুই-একদিন সে প্রতিবাদ করিয়াছে, বলিয়াছে তাহার খাবার আছে, কিন্তু সুরেনবাবু তাতে কান দেন নাই। এ তার নিত্যকার প্রাপ্য।

তার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হয় সকলের পরে। তাই স্বামীর খাবার ও চা সে তৈরী করে এই সব পাট চুকিয়া গেলে। স্বামীর খাবার কিন্তু সে নিজে হাতে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না কক্ষে—সে যে নিষিদ্ধ কক্ষ। খাবার সাজাইতে সাজাইতে তার চোখে ধারা নামে। ঝি-চাকরেরও যে কক্ষে প্রবেশ অবারিত, সেখানে শুধু শোভা-ই বারিত—বঞ্চিত। কেন, এমন কি অপরাধ তাহার?

অপরাধ যে কোথায় তাহা সে আবিষ্কার করিতে পারে না। স্বামীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় তার যে সেই একদিন দুই মিনিটের; তাহার নিম্মর্ম রূঢ় স্মৃতি এখনও শেলের মত বিঁধিয়া আছে তার বুকে।

মায়ের জীর্ণ পর্ণকুটীর ত অভিজাত বরপক্ষের পদার্পণের যোগ্য নয়—তাই শোভার বিবাহ-সভা, বাসর সবই হইয়াছিল গ্রামের জমিদার বাড়ীতে। আর জমিদার স্বয়ং অগ্রণী হইয়া অশেষ রূপলাবণ্যবতী শোভার বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন তাঁহার বন্ধু এটর্নী সুরেনবাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে। সুরেনবাবুর দুই পুত্র—সুরেশ ও পরেশ। কিন্তু গুণে-জ্ঞানে, আকৃতি-প্রকৃতিতে পরেশ ছিল সর্ব্বপ্রকারেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহার মেজাজে খাপ খায় না বলিয়া সে জ্যেষ্ঠের মত আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ করে নাই—লইয়াছে প্রফেসারি। তবু উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সে জীবন-সঙ্গিনী সম্বন্ধে অতি উচ্চ এক আদর্শই মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। যত কিছু বিপদ আসিল এই মানস কল্পলোকের রঙিন স্বপ্নাবেশ হইতে।

শোভার সুস্পষ্ট মনে পড়ে বিবাহের সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনী। বরবেশী পরেশকে দেখিয়া সে আপন ভাগ্যকে প্রশংসা করিয়াছিল বার বার। এমন স্বামীর পায়ে নিঃশেষে আপনাকে বিলাইয়া দিতে চাহিয়াছিল শিহরণ-তরঙ্গে ভাসিয়া।

কিন্তু বাসর ঘরে সেদিন বর চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিল—শরীর নিতান্তই অসুস্থ এই কথা জানাইয়া। তাহার পর মায়ের বুক হইতে বিদায়—জন্মভূমি হইতে বিদায়, সেদিনের কথা ভাবিতে শোভার বুকের ভিতর গুরুগুরু করিয়া উঠে। সেদিন সে এক অজানা আনন্দে আত্মহারা হইয়া শত আশার আলোকে অবগাহন করিয়া যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সকল আশা—জীবনের সকল আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল ফুলশয্যার রাত্রির দুই মিনিটের স্বামী সম্ভাষণে।

বড় জা ও ঝি-য়ে মিলিয়া যখন কলিকাতার এই রাজ-পুরীর মত শ্বশুর গৃহের সুসজ্জিত শ্রেষ্ঠ কক্ষে শোভাকে ঠেলিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল, তখন শোভা আপন হৃৎস্পন্দনে বিভোর! কত না সুখের ছবি সে নিমেষে আঁকিতেছিল মনের দেওয়ালে।

হঠাৎ স্বামীর রূঢ় স্বর শোভাকে সচকিত করিয়া তাহার চির-নির্ব্বাসন ঘোষণা করিয়া দিল। শোভা সেদিন আকুতি-ভরা সজল আঁখি দুটি মেলিয়া অতি ধীরে বলিয়াছিল,—

সাহিত্য-সংবাদ

"জাগরণী" পত্রিকার মারফৎ হইতে গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যে পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল, উপযুক্ত সংখ্যক লেখা হস্তগত না হওয়ায় গল্প ও প্রবন্ধাদি পাঠাইবার তারিখ ১৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইল।—ইতি পরেশ সেন, বিদ্যানিকেতন পত্রিকা বিভাগ, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

কিশোর সঙ্ঘ

'কিশোর সঙ্ঘের' উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "ছাত্র ও রাজনীতি" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন —শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সিংহ (কক্সবাজার এইচ ই স্কুল; কক্সবাজার, চট্টগ্রাম); এবং দ্বিতীয় স্থান অর্জন করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার অধিকারী (জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ)। পুরস্কার শীঘ্রই প্রেরিত হইবে। (স্বাঃ) অনিলকুমার রায়চৌধুরী, সম্পাদক, কিশোর সঙ্ঘ, জিয়াগঞ্জ পোঃ, মুর্শিদাবাদ।

জৈন যুব-সঙ্ঘ

গত ৩রা জুন ২৯শ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় জৈন যুব-সঙ্ঘের উদ্যোগে যে গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হইয়াছিল—তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল। পুরস্কার শীঘ্রই প্রেরিত হইবে।

১। গল্পঃ ১ম—কুমারী মীনা সেনগুপ্তা (C/o. শ্রীযুক্ত এস পি সেনগুপ্ত, চিফ্ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, এগ্রিকালচারাল ফার্ম, তেজগ্রাম, ঢাকা); ২য়—শ্রীযুক্ত কুশলচাঁদ বাছায়ৎ (জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ)।

২। প্রবন্ধঃ ১ম—শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ ঘোষ (৪১নং বেলতলা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা) ২য়—শ্রীযুক্ত বিমলচাঁদ বোথরা (জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ)।—সন্দীপ সেঠিয়া, সম্পাদক, জৈন যুব-সঙ্ঘ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ফলাফল

গত ১৬ই ভাদ্র ৪২শ সংখ্যা "দেশ"এ যে প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি করা হইয়াছিল তাহার ফলাফল জানাইতেছি—

প্রবন্ধঃ—"সিনেমার আকর্ষণে বর্ত্তমান ছাত্রসমাজ" ১ম স্থান অধিকার করিয়াছেন, শ্রীদুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য। ত্রিপুরা ষ্টেট।

গল্পঃ—কোন পুরস্কারযোগ্য গল্প আসে নাই।

কবিতাঃ—"প্রতিদান"এর লেখক শ্রীসত্যনারায়ণ দাস বি-এল, ও এম-এ ছাত্র কলিকাতা রিপন ল' কলেজ, ১ম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ছবিঃ—১ম শ্রীপরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, শিবপুর বি ই কলেজ।

সমস্ত লেখা ও ছবি "তরুণ"এ প্রকাশিত হইবে। ১ম স্থান অধিকারীদের ।৵ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে। ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

শ্রীমহাদেব ধাড়া, "সম্পাদক তরুণ" গ্রাঃ মানশ্রী,—পোঃ—চিত্রসেনপুর, হাওড়া।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ১১ই কার্ত্তিক, ১৩৪৬ সাল Saturday, 28th October, 1939 [৪৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিজয়ার অভিনন্দন—

শারদীয়া মহাপূজার অবসানে আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক সকলকে বিজয়ার আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। জয় আমাদের জীবনে নাই, এখন চলিয়াছে পরাজয়েরই পালা। কিন্তু এজন্য দোষ দিব কাহার? দোষ আমাদের নিজেদেরই। বিজয়াকে সত্য করিতে হইলে, জীবনে যে সাধানার প্রয়োজন, সে সাধনা আমরা হারাইয়াছি। দশভুজার পূজা আমরা করি। কিন্তু দশের জন্য বেদনাবোধ, দশের সেবার মধ্যে আত্মনিবেদনের প্রেরণা আমাদের মধ্যে জাগে না। সে জিনিষ অন্তরে না পাইলে বিজয়া সার্থক হয় না। পূজার পরম পরিণতি হইল বিজয়ায়—বিসর্জ্জন সেদিন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে বরণ করিয়া লয়। মায়ের প্রেমের মাধুর্য্যে সেদিন প্রচন্ড হইয়া উঠে—ভাইয়ের টান এবং সেই টান ক্ষুদ্র স্বার্থের গন্ডীকে ভাঙ্গিয়া দেয়। ক্ষুদ্র স্বার্থের টানেই বন্ধন এবং বৃহতের অনুভাবনার উগ্রতাতেই আসে মুক্তি। মাতৃপূজার ভিতর দিয়া সেই বৃহতের অনুভাবনা আমাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে কি? যেদিন তাহা উঠিবে, সেদিন সকল হিসাব-নিকাশের বালাই চুকিয়া যাইবে। আমাদের স্বার্থগত বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া মহামায়ার লীলা আরম্ভ হইবে আমাদের মধ্যে। আমাদের সকল কাজ হইবে তখন মায়েরই মাধুরী বলের আকর্ষণে। সে আকর্ষণ কোন বাধা মানে না, কোন অন্তরায়ে চঞ্চল হয় না। হোম-স্বীকার সকলের অন্তঃকরণে স্বাভাবিক করিয়া তোলে। আমরা হোম-স্বীকারের সেই লক্ষণ নিজেদের অন্তরে অনুভব করিতেছি কি? পরার্থে আত্মনিবেদনের ভিতর পাইয়াছি কি একান্ত রস? বিজয়ার অনুষ্ঠান আত্মীয়তা উপলব্ধির সেই ব্যাপ্তির বৃহত্তর রসে আমাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুক। আমাদের সকল ভয় ভাঙ্গিয়া যাউক, বৃহতের সেবার সেই আনন্দের প্রবল টানে। বিচার-বুদ্ধির নামে স্বার্থগত কার্পণ্যের সংস্কার হইতে আমরা যেন মুক্ত হইতে পারি। আমরা যেন অতিক্রম করিতে পারি অবীর্য্যকে। বিজয় ভোগ্য শুধু যাহারা বীর তাহাদেরই। মায়ের মমতা আমাদের ভয় ভাঙ্গিয়া বীর রসে প্রমত্ত করিয়া তুলুক। এ যুগের তাহাই সাধ্য, তাহাই সাধনা।

কলিকাতায় পূজার উৎসব—

কলিকাতার সর্ব্বজনীন উৎসবগুলিই আজকাল প্রধান আকর্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। দুর্গাপূজার ভিত্তিই হইল সর্ব্বজনীনতার উপর। এই পূজার বহু প্রকরণের ভিতর দিয়া মাতৃভাবের সর্ব্বজনীনতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। মার্কন্ডেয় চন্ডীর বীজভূত দেবীসুক্তের মূল কথাই হইল সর্ব্বজনীনতা। পূজার এই সর্ব্বজনীনতার অনুভূতির দিকটা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র জাতির দৃষ্টি সেই-দিকে সর্ব্বপ্রথমে আকর্ষণ করেন 'বন্দে মাতরম্' এই গীতির ভিতর দিয়া। আজকাল আমরা সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের যে রূপটি দেখিতেছি, সেই অনুভূতি জাগান বঙ্কিমচন্দ্র। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে পূজার সেই সর্ব্বজনীনতা অনুষ্ঠানের বাহ্যরূপে বিকশিত হইয়া না উঠিলেও ভাবরূপে প্রগাঢ় ছিল। আজ আমরা ভাব হইতে পাইয়াছি ভাষা। আগাইয়া আসিয়াছি বলিয়া এদিক হইতে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু লক্ষ্য রাখা দরকার একটা বিষয়, তাহা এই যে, ভাষার উপর জোর দিতে গিয়া আমরা যেন ভাবকে হারাইয়া না ফেলি। বাহিরের দিকটা লইয়া মাতিয়া অন্তর-রসসূত্রকে হারাইয়া না বসি। শারদীয় উৎসবের দেবী-প্রতিমার যে সব আধুনিক পরিকল্পনা হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও আমাদের ঐ একই কথা। আমরা ভাষার চেয়ে ভাবকে বুঝি বড়, সুরকে বুঝি বড়, ছন্দকে বুঝি বড়। স্থূলেতর স্বর, বর্ণ এগুলির মূল্য না আছে, এমন নয়; কিন্তু আসল কথা হইল ভাব। সান্ত ছাড়িয়া অনন্ত, সীমাকে ছাড়াইয়া অসীম এবং

খণ্ডকে ছাড়াইয়া অখণ্ড রসের সঙ্গে অন্তরকে যুক্ত করিয়া দেওয়াতেই হইতেছে রসের সার্থকতা। ভাবকে ছাড়াইয়া ভাষা বড় হইয়া উঠে যেখানে, সেখানে শিল্পের দুর্গতি ঘটে, তপস্যা ছাড়িয়া দ্রব্য যেখানে হয় বড়, সেখানে ভাবনা নাই, রস নাই। বাহিরের বস্তুর উপর যে সব শিল্পী দেবীপ্রতিমা রচনায় জোর দিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই কথাটা ভাবিয়া দেখিতে বলি। অন্তর্মুখীন হইল ভারতীয় শিল্পের বিশিষ্টতা, বস্তুর হুবহু নকল করা সেখানে বড় নয়। অন্তর্মুখীনতাকে উপেক্ষা করিয়া বহিরঙ্গের উপর জোর দিলে ভারতীয় শিল্পের স্বধর্ম্ম লঙ্ঘন করা হইবে এবং পরধর্ম্ম সব সময়ই ভয়াবহ।

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত—

বড়লাটের ঘোষণার পর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগকে পদত্যাগ করিতে আহ্বান করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ৩১শে অক্টোবরের মধ্যেই উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিবেন। উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিবেন নবেম্বর মাসে, কারণ সেখানকার প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন তাহার পূর্ব্বে হইবে না। ওয়ার্কিং কমিটি যে এই সিদ্ধান্ত করিবেন, ইহা পূর্ব্বে হইতেই বুঝা গিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বড়লাটের বিবৃতি সমালোচনা করিয়া যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার পর আর এ সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কংগ্রেসের যাহা দাবী—বড়লাটের বিবৃতিতে তাহা একেবারে এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের সম্বন্ধে সদিচ্ছাপূর্ণ যে ধরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, বড়লাটের বিবৃতিতে তদতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং তাঁহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবৃতিগুলি কংগ্রেসের না জানা ছিল এমন নয়। তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেস যে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ চাহিয়াছিল, তাহার অর্থ এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিগুলি কংগ্রেসের পক্ষে পর্য্যাপ্তরূপে সন্তোষজনক হয় নাই। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিই আর এক প্রস্থ শুনাইয়া দেওয়ার মূলে কোন যুক্তি থাকে না। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবহারবিদ অধ্যাপক ল্যাস্কি 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রে খোলাখুলি এই কথাটা বলিয়াছেন। বড়লাটের বিবৃতিতে যে নীতি প্রতিফলিত হইয়াছে, রাষ্ট্রীয় অধিকারে জাগ্রত ভারতের পক্ষে তাহা সন্তোষজনক হইতে পারে না। ভারত প্রতিশ্রুতি অনেক শুনিয়াছে, এখন চায় কার্য্যত অধিকার। ভারতকে কার্য্যত অধিকার প্রদান করিবার নীতি নির্দ্দেশ করিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান রাজনীতিক বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেন। আমরা আশা করি, এখনও তাঁহারা সেই বুদ্ধির পরিচয় দিবেন।

পরামর্শ সমিতির মূল্য—

বড়লাটের বিবৃতিতে বিশেষ যদি কিছু থাকে তাহা হইল, যুদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ সমিতি গঠনের প্রস্তাবটি। কিন্তু এই পরামর্শ সমিতির রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা কার্য্যত কোন কর্ত্তৃত্বই থাকিবে না। দেশের লোক চায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব—তৎপরিবর্ত্তে এই ঠাট বাড়াইলে রাষ্ট্রনীতিতে দেশের লোককে অধিকার প্রদানের দিকে একটুও আগাইয়া যাওয়া হয় না। কংগ্রেসের দাবীর ধারে-কাছেও এমন পরামর্শ সমিতি যায় নাই। কার্য্যত অধিকারের বিচারে বলিতেই হয় যে, ঐ পরামর্শ সমিতি বাহিরের একটা ভড়ং মাত্র। মডারেট দলের উদার নীতি সঙ্ঘ পর্য্যন্ত সেই কথাই বলিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, ঐরূপ পরামর্শ সমিতিতে কেহ সন্তুষ্ট হইবে না। কংগ্রেস তো ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেই না। কংগ্রেসের সহযোগিতার আশ্বাস ও অঙ্গীকার সত্ত্বেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট চিরাচরিত নীতি হইতে এক চুলও নড়িলেন না। কংগ্রেস এই নীতির প্রতিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প। এজন্য ওয়ার্কিং কমিটি শৃঙ্খলার সহিত নিয়ম-নিষ্ঠার মাঝে পরবর্ত্তী নির্দ্দেশের জন্য দেশবাসীকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। ইহার পর কোন্ পথ অবলম্বিত হইবে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর এখন তাহা নির্ভর করিতেছে। কংগ্রেসী মন্ত্রিদল যদি পদত্যাগ করেন, তাহা হইলে ঠিকা মন্ত্রীগুলির দ্বারা কাজ চালান সম্ভব হইবে না; কারণ ব্যবস্থা-পরিষদের ভোটে সে সব মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া যাইবে, ফলে বিভিন্ন প্রদেশে রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্কট দেখা দিবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এখন এই সঙ্কট এড়াইতে পারেন যদি তাঁহাদের দূরদর্শিতা থাকে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ—

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার সম্পর্কে যখনই কোন প্রশ্ন উঠে, তখনই সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের অজুহাত আসে অপর পক্ষ হইতে, এই ব্যাপারটা একেবারে একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এবার 'হরিজন' পত্রে এই সংখ্যালঘিষ্ঠের দাবীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতির মূল কথাটা হইল এই যে, এদেশে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থহানির যে শঙ্কা অভিব্যক্ত করা হয়, তাহার মূলে কোন যুক্তি নাই। মুসলমান যে হিসাবে একত্ববোধসম্পন্ন, হিন্দুরা ধর্ম্মের দিক হইতে তেমন একত্ববোধসম্পন্ন নয়। হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন শাখা সম্প্রদায় রহিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার যে ভয় ভারতের স্বাধীনতা-বিরোধী এক দল লোক দেখাইয়া আসিতেছে, সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার জাগরণের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহা প্রতিষ্ঠিত হইল দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বৃহত্তর স্বার্থের অনুভূতির উপর। দেশের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণে প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব তাঁহারাই সব দেশে করেন, যাঁহাদের মধ্যে এই বৃহৎ অনুভূতি জাগিয়াছে। যাঁহাদের মধ্যে সে অনুভূতি জাগে নাই, সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সব

দেশেই এ ব্যাপারে উপেক্ষণীয়; কারণ তাঁহদের কথা ধরিতে গেলে জগতে এমন কোন দেশ নাই যে স্বাধীনতা লাভের যোগ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি সত্যই ভারতবর্ষকে রাজনীতিক স্বাধীনতা দিতে চাহেন, তাহা হইলে সে স্বাধীনতার বিরোধী যাঁহারা, তাঁহাদিগকে ডাকহাঁক করিয়া আনিবার মূলে কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকে না। কারণ তেমন লোকের একেবারে অভাবের পর যদি ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দিতে হয়, তাহা হইলে প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অনুভূতি যাঁহাদের মধ্যে জাগিয়াছে এবং সেই অনুভূতিকে ভিত্তি করিয়া যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, সব দেশেই রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা তাঁহাদের সঙ্গেই হয় এবং সেই হিসাবে ভারতে একমাত্র কংগ্রেসেরই সে অধিকার আছে।

হক সাহেবের অভিমান—

ওয়ার্কিং কমিটির বিবৃতিতে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী চটিয়া গিয়াছেন। এ দিকে আগাগোড়াই তাঁহার ভাব চটা, সুতরাং নূতন কিছু নাই; এই ব্যাপারে অর্থ-সচিব মিঃ নলিনীরঞ্জনের উপর তাঁহার অভিমানটাই হইল উপভোগ্য। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে তাঁহার বাঁধা বোলচালগুলি আর এক প্রস্থ আওড়াইয়াছেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের উপর, অত্যাচার হইয়াছে ইত্যাদি বলিয়াছেন। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল এই সব অভিযোগের উত্তর দিয়াছেন এবং এখনও তাঁহারা বলিতেছেন, স্বয়ং বড়লাট কর্ত্তৃক এ বিষয়ে তদন্তে সত্যাসত্য নির্ণয়েও তাঁহারা সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত; সুতরাং হক সাহেবের সে বীর রসে কেহ বিচলিত হইবে না। অর্থ-সচিব, তাঁহার অন্তরঙ্গ সেই বন্ধুটি কুসংসর্গে—অনিষ্টকারীদের দলে পড়িয়াছেন, এজন্য হক সাহেব উষ্মা-বিজড়িত অভিমান প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থ-সচিবের সঙ্গে তাঁহার এই মান অভিমানের পালার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় নূতন নয়; ইহাতে প্রীতির বন্ধন দৃঢ়ই করিয়া দেয়, সুতরাং প্রীতির সেই রীতি এবং গতি উপলব্ধি করিলেই হক সাহেবের আপশোষ দূর হইবে। ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশিবেই।

আমরা আর্য্য কি অনার্য্য?—

মাদ্রাজের জ্ঞানবৃদ্ধ জননায়ক শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘব আচারিয়ার সম্প্রতি সালেম শহরে একটি বক্তৃতায় বলেন, 'এই ভারতবর্ষ আর্য্যভূমি, এখানে যত লোক আছে সকলেই আর্য্য। অবশ্য এদেশে অল্পসংখ্যক আরব এবং মঙ্গোলীয় একদিন আসে, কিন্তু এই আর্য্য মহাজাতি সমুদ্রেই মিশিয়া গিয়াছে। ভারতের খৃষ্টান, শিখ, মুসলমান সবই আর্য্য।' শ্রীযুত আচারিয়ার আরও বলেন, 'যদি আমরা এই সত্যটিকে স্বীকার করিয়া না লই, তাহা হইলে আমরা কোনদিনই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব না। ভেদ নীতি এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ রক্ষার ফন্দীর জালে ভারত চিরদিন পরাধীন থাকিবে।' ভারতবাসীরা আর্য্য কি অনার্য্য এবং ভারতবাসীদের মধ্যে কে আর্য্য, কে অনার্য্য এ বিষয় গবেষণায় শুধু পণ্ডিতী কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন সার্থকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমরা নিজদিগের আর্য্যত্বের যত বড়াই-ই করি না কেন, যতদিন আমরা স্বাধীনতা লাভ না করিতেছি ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই জগতে কোন রকম মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিব না। একদিক হইতে বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, আমরা এখন সকলেই অনার্য্য, ক্রীতদাস, আমরা হীন শূদ্র। স্বাধীনতার সাধনার দ্বারা নিজদিগকে সংস্কৃত করিয়া লইতে পারিলে তবে আমরা আর্য্য বলিয়া গণ্য হইব। অধীন যে জগতে তাহার সম্মান নাই। সেই অধীনতার বেদনা আমাদের আর্য্যত্ব লাভের পক্ষে যথেষ্ট রকমে উগ্র হইয়া উঠার দরকার আগে।

বাঙালীর বিশিষ্টতা—

শ্রীযুত সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস মহাশয়ের সভাপতিত্বে পুরুলিয়ায় মানভূম জেলা সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। হালদার মহাশয় এই সম্পর্কে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। বাঙলা দেশের বিশিষ্টতার কথা তুলিয়া তিনি বলেন—"জাতীয় জীবনের জাগরণে বাঙলারই দান সর্ব্বাগ্রে। বন্দে মাতরমের পুণ্য মন্ত্র এই বাঙলা দেশেই সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত হয়। স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হয় সর্ব্বপ্রথম এই বাঙলা দেশেই; আবার জাতীয় সংগ্রামের প্রতীকস্বরূপ জাতীয় পতাকাকে রূপ দান করিল সর্ব্বপ্রথম এই বাঙলা দেশই। বাঙালী মৃত জাতি নয়। বাঙালী রামমোহন ও বিবেকানন্দকে জন্ম দিয়াছে। স্বামীজী বলেছেন, সন্ন্যাসের মিথ্যা মোহকে ঘুচিয়ে দিতে হবে। ভোগ কাকে বলে সে জানলে ত্যাগের মূল্য কি? বাঁচিতে যে শিখলো না তার মরার মধ্যে মহত্ত্ব কোথায়? আগে ভোগ কর্ত্তে শেখো তারপর ত্যাগের কথা বোলো। এখন সন্ন্যাস, বিরাগী কিছুতেই আমাদের প্রয়োজন নেই। চাই সত্যকারের যৌবন, যে যৌবন বাধা বিপত্তি মানে না, দুঃখ শোক জানে না, যে যৌবন ধ্যানের ধ্রুব তারাকে সম্মুখে রেখে সমুদ্র কল্লোলের মত অপ্রতিহত বেগে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলে। এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের শক্তির বিকাশ হোক, আশার আলো আমাদের আকুল কোরে তুলুক।" মানভূম সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির এই অভিভাষণের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের যে আবেগ রহিয়াছে আমরা সকলকে তাহা অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে বলি। বিশ্বপ্রেমের বড় বড় বুলি আওড়ান আপাতত কিছুদিন বন্ধ রাখিয়া যদি দেশকে আমরা ভালবাসিতে পারি, তবে কার্য্যত আমাদের দুর্গতি দূর হইবে। ভণ্ডামী এবং মিথ্যাচার কোন দিনই মানুষকে মানুষ করিতে পারে না।

সস্তায় স্বাধীনতা—

শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় ওরফে এম এন রায়ের নূতন কিছু করিবার কীর্ত্তি অনেক দিন হইতেই আছে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব এদেশের মডারেটেরা পর্যন্ত সমর্থন করিয়াছেন, স্যার শিবস্বামী আয়ারের মত ঝুনা মডারেটও তাহার মধ্যে যুক্তিমত্তা দেখিয়াছেন; কিন্তু এম এন রায়ের পথ ভিন্ন। তিনি বলিতেছেন, দিল্লী-চুক্তি ও গোল টেবিল বৈঠকের যে প্রস্তাব বড়লাট করিয়াছেন, তাহা হইতে উত্তম ফলের আশা করা যায়। অন্য কথায় এই বিশ্ববিপ্লবী দূরেপর ত্যাগ স্বীকারের পথে যাইতে অনাসক্ত। তিনি বলেন, পুনরায় দমন নীতির কোপে পড়া যুক্তিসংগত নয়; সুতরাং দুধও খাইব তামাকও খাইব, এই পথই বুদ্ধিমানের পথ। এম এন রায়ের এই অতিবুদ্ধির খুঁতী আপাতত বন্ধ রাখিলেই ভাল হয়—যথেষ্ট হইয়াছে।

লীগওয়ালাদের উল্লাস—

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগের সঙ্কল্প ঘোষিত হওয়াতে লীগওয়ালাদের মধ্যে নাকি পরম উল্লাসের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা আশা করিতেছেন যে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জিগীর জাঁকিয়া তুলিয়া এই ফুরসতে তাঁহারা অন্তত আসাম সীমান্ত প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে নিজেদের পক্ষে কেল্লা ফতে করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সাময়িকভাবে সফল হইলেও স্থায়ীভাবে সফল হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই; কারণ কংগ্রেসের প্রতিকূলে গবর্ণর স্বীয় বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তাঁহাদিগকে ছয় মাসের অধিক কাল চাকুরীতে বহাল রাখিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে লীগওয়ালাদের এই চাকুরীলোভী মনোবৃত্তিতে লীগের স্বরূপই দেশবাসীর নিকট উন্মুক্ত হইবে। ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতা সমষ্টির অন্তরে স্থায়ী কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। যদি তাহাই হইত, তবে মানুষে আর পশুতে কোন পার্থক্য থাকিত না।

ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপার—

ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে রুশিয়ার সমস্যায় ফিনল্যাণ্ড সমগ্র জগতের সহানুভূতি উদ্রেক করিয়াছে। ফিন জাতি মঙ্গোলীয় বংশ হইতে উদ্ভূত, ইউরোপীয় জাতিসমূহের চেয়ে এসিয়ার জাতিসমূহের সঙ্গেই ইহাদের শোণিতগত সম্পর্ক বেশী। ফিনেরা বিশেষ বুদ্ধিমান এবং সুশিক্ষিত। ইহারা খুব স্বাধীনতাপ্রিয়। ফিনিশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে রুশিয়ার এখনও আলোচনা হইতেছে। এই আলোচনার ফলে ফিনিশ জাতির স্বাধীনতা যে সত্যই বিপন্ন হইবে, এমন কোন সম্ভাবনা নাই। উভয় পক্ষের পারস্পরিক স্বার্থ সৌহার্দ্য-সূত্রে পাকা করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই আলোচনা চলিতেছে।

ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা—

ভারতের সম্মুখে সঙ্কট সন্ধিক্ষণ ঘনাইয়া আসিতেছে, এখন সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন ঐক্যের। অবশ্য দেশের স্বাধীনতা যাহারা চাহে না, নিজেদের আদর্শ তাহাদের পায়ে বিকাইয়া দিয়া ঐক্য খুঁজিতে হইবে, এমন যুক্তি আমরা মানি না; কিন্তু রাষ্ট্রীয় সাধনার মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে যাঁহাদের মধ্যে মতের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, শুধু পার্থক্য নীতির বা রীতির, তাঁহাদের মধ্যে এখন একতা একান্তই আবশ্যক। মহাত্মা গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ উভয়েই জাতিভেদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এই সম্পর্কে সেদিন সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন,—কিছুদিন যাবৎ আমাদিগকে পুনঃপুনঃ উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে, কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থীদের উপর অবাধে আক্রমণ চলিতেছে। ঐক্য ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দক্ষিণী দলের আন্তরিকতা সত্যই যদি থাকে, তাহা হইলে বামপন্থীদিগকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কারের যে নীতি তাঁহারা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত। নিজেদের ব্যক্তিগত বা দলগত প্রাধান্যের মোহকে বড় করিয়া দেখিবার অনিষ্টকারিতা এখনও তাঁহারা উপলব্ধি করুন এবং নিজেদের শক্তিকে সত্যকারভাবে দৃঢ় করিয়া তুলুন। ইহাই আমাদের অনুরোধ।

বাঙালী যৌথ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সমস্যা

শ্রীপ্রমথ ভট্টাচার্য্য এম-এ

ভারতীয় যৌথ ব্যাংকসমূহ গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ ব্যবসায়ে উন্নতি করিতেছে এবং প্রধানত ইউরোপীয় আধুনিক যৌথ ব্যাঙ্কেরই অনুগামী হইয়াছে। বিগত ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি ভারতীয় যৌথ ব্যাংক ব্যবসায় সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ ও নূতন আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উক্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পরে দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং বিভিন্ন নূতন সমস্যা এবং প্রশ্নেরও উদ্ভব হইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যাংক সম্বন্ধীয় বার্ষিক টেবুল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিবরণী, চেম্বার অব কমার্স সমূহের রিপোর্ট এবং বিভিন্ন ব্যাংক বিশারদদের বিবৃতি ও লেখা হইতে আমরা নিখিল ভারতীয় সমস্যার কতকটা আঁচ করিয়া লইতে পারি, যদিও প্রকৃত সুশৃংখল ও ধারাবাহিক গবেষণা ও তদন্তের অভাবে সমগ্র সমস্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করা কষ্টকর।

ভারতীয় সমস্যার অধিকাংশই বাঙালী পরিচালিত ব্যাংক সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু তদুপরি বাঙলার শিল্প-বাণিজ্যের নিজস্ব পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য ও এই প্রদেশের অধিবাসীদের মনোবৃত্তি বাঙালী ব্যাঙ্কের সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষত বাঙালী ব্যাংকসমূহের কার্য্যাবলী বিষয়ে প্রকৃত অনুসন্ধান ও গবেষণা এখনও আরম্ভ হয় নাই এবং এজন্য এই সমস্যার উপর সাধারণভাবে আভাস দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। এই প্রবন্ধে, বাঙালীর তাঁবে যে সকল সওদাগরী (কমার্শিয়াল) ব্যাংক পরিচালিত হইতেছে, তাহাদের সমস্যাই আলোচিত হইবে। অল্পকালের ভিতরে বাঙালী যৌথ সওদাগরী ব্যাংকসমূহ যথেষ্ট উন্নতির লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছে এবং সম্প্রতি ব্যাংক ব্যবসায়ের দিকে বাঙালীর তীব্র আগ্রহও সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক দেশেই ব্যাংকসমূহই শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রধান পরিপোষকরূপে কাজ করিয়া থাকে। দুঃস্থ অথবা উন্নতিশীল— উভয় প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকেই ব্যাংক উপযুক্ত জামিনে ঋণ দিয়া বাঁচাইয়া রাখে বা অধিকতর শক্তিশালী করে।

বিরাট যৌথ ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা দুই প্রকারে হয়। এক প্রকার—দেশের ব্যবসায়ের যথেষ্ট প্রসারের পূর্ব্বেই রাষ্ট্র বা বিত্তশালী ব্যক্তিদের সহায়তায়; অন্য প্রকার—শিল্প ও ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিলে তাহাদের প্রয়োজনের তাগিদে। বাঙলায় এই দুই প্রকার অবস্থারই অভাব।

গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার যে নিতান্তই অভাব, তাহা বলাই বাহুল্য, তদুপরি এই প্রদেশের ধনী ব্যক্তিরা কলিকাতার বাড়ী, কোম্পানীর কাগজ, মোটর গাড়ী লইয়া এত বিব্রত যে, দেশের এই অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা ভাবিবার তাহাদের অবকাশ বা উৎসাহ নাই। অপর দিকে বাঙলার শিল্প বা ব্যবসায়ের অবস্থা শোচনীয়। পুরুষানুক্রমে বাঙালীর অদ্ভুত চাকুরিয়া মনোবৃত্তি এজন্য যথেষ্ট দায়ী। ফলে প্রয়োজনের তাগিদেও বাঙালী ব্যাংক ভালভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এইখানে বাঙলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সমস্যায় প্রকৃত পার্থক্য রহিয়াছে।

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, গুজরাটি, সিন্ধি, কচ্ছি, চেট্টিয়ার কারবারী ও শিল্পপতিদের উৎসাহে ব্যবসায়ের প্রচুর উন্নতি হইয়াছে এবং সত্যিকারের দৃঢ় ভিত্তিসম্পন্ন কতকগুলি ভাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারতীয় বৃহত্তম পাঁচটি ব্যাঙ্কের মধ্যে একটিও বাঙালী ব্যাংক নাই। পরিণামে বাঙালী ব্যবসায়ীর যে অসুবিধা রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বাঙলায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়ের পরে বাঙালীর তাঁবে পরিচালিত ব্যাংকসমূহের প্রসার ও পরিপুষ্টির প্রশ্ন উঠে। এই প্রশ্নের আলোচনার পূর্ব্বে ব্যাংক ব্যবসায়ের দুইটি মূলগত সমস্যার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সেই দুইটি—ব্যাংক ব্যবসায়ে আমানতের ও দাদন প্রণালীর গুরুত্ব।

বিভিন্ন বৃহৎ ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র পর্য্যবেক্ষণে দেখা যায় প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ কার্য্যকরী মূলধন (প্রদত্ত মূলধন, আমানত ও অন্যান্য পুঁজির তহবিলের সমষ্টি) হইতে কত কম! অথচ তুলনায় এই অল্প মূলধন লইয়া সুবৃহৎ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান-সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং কোটি কোটি টাকা লেন-দেন করিতেছে। কোন্ যাদুর কুহকে ব্যাংক ইহা করিতে সক্ষম হয়? দিনের পর দিন আমানতকারীদের দাবী মিটাইয়া, সতর্ক পদক্ষেপে নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যে অবিচলিত থাকিয়া ব্যাংক যে আস্থা ও সুনাম অর্জ্জন করে, তাহার ফলেই উল্লিখিত বিরাট কার্য্যকরী মূলধন সংগ্রহ সম্ভব হয়।

দৈনন্দিন লেন-দেনের শেষে আমানতের একটা সুবৃহৎ অংশ ব্যাঙ্কে মজুত থাকিয়া যায় এবং স্বল্পকালের মেয়াদে এবং সহজে নগদে পরিবর্ত্তনীয় জামিনের বিনিময়ে ব্যাংক ঐ টাকা দাদন করে। দাদনী টাকাই আবার ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। কথাটি অদ্ভুত ঠেকিলেও সত্য। সংক্ষেপে ইহা একটু বুঝান যাইতেছে। যে টাকা ব্যাংক ঋণ দেয়, তাহা সবই ঋণ-গ্রহীতার বাক্সে গিয়া জমা হয় না। ঐ ঋণের অঙ্গীকার পাইয়া সে উহার উপর চেক কাটে এবং তাহা আবার নানা ব্যাঙ্কে জমা হয়, কাজেই মোট আমানতের পরিমাণ বিভিন্ন ব্যাঙ্কে এভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আমানতি টাকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিয়া এখন আমরা প্রশ্ন করিতে পারি যে, বাঙালী ব্যাঙ্কে আমানত বিপুল পরিমাণে অ-বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের মত বাড়িতেছে না কেন? বহু কারণের ভিতর প্রধান কয়েকটি আলোচনা করিলেই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে।

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙলায় এই প্রদেশীয় ব্যবসায়ীর সংখ্যা খুবই কম। অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ কারবারী এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানই ব্যাঙ্কে সর্ব্বদা চলতি হিসাব রাখিয়া থাকে এবং ব্যাংক হইতে ইহারাই স্বল্প সময়ের মেয়াদে ও উপযুক্ত জামিনে অনবরত টাকা নেয়। ক্যানিং ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও বড়বাজারে বাঙালী ব্যবসায়ীর সংখ্যা ভিন্নপ্রদেশীয়দের তুলনায় শতকরা কয়জন? স্বভাবতই অগণিত ভিন্নপ্রদেশীয় ব্যবসায়িগণ অ-বাঙালী ব্যাঙ্কেই তাহাদের হিসাব রাখিয়া থাকে।

কাপড়, পাট, তুলা, ধান, চাল, কয়লা, চিনি, তামাক, তিসি, লোহা, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানী এবং বিশেষত বাঙলার জেলায় জেলায় যে-সব চালানি কারবার চলে, তাহার ভিতরে বাঙালী যুবকগণ মাথা গলাইতে পারিতেছে না, যে-সব ব্যবসায়ী রহিয়াছে, তাহারাও হটিয়া আসিতেছে। মফঃস্বলের এই সব কারবার পূর্ব্বে সাহা, বণিক মহাজনগণ নিয়ন্ত্রণ করিত। এখন ভিন্নপ্রদেশীয়দের প্রতিযোগিতায় তাহারাও বিব্রত। এসব ব্যবসায়ে শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান বাঙালী যুবকদের দৃষ্টি এখনও বিশেষভাবে পড়ে নাই।

বাঙালী আমানতকারীর সামর্থ্যের পরে তাহার অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব আলোচনা করা আবশ্যক।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি, কতকগুলি বর্দ্ধিষ্ণু বাঙালী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অ-বাঙালী এবং বিলাতী ব্যাংক ব্যতীত টাকা জমা রাখে না, অথচ ঋণ গ্রহণের বেলায় বাঙালী ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হইতে তাহাদের আটকায় না। এই সব ব্যবসায়িগণই

নিজেদের দ্রব্য বিক্রয়ের বেলায় স্বাদেশিকতার বুলি আওড়ায়!

এই সংগে বাঙালী ব্যাংক ব্যবসায়ের ইতিহাসের স্মৃতি স্বতই আসিয়া পড়ে। বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাংকের পতনের কথা এখনও অনেকে বলিয়া থাকেন। অবশ্যই এই দুর্ঘটনা বাঙালীর শিল্প ও ব্যাংক প্রসারে যথেষ্ট বাধা প্রদান করিয়াছে। কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, ব্যাংক ব্যবসায়ের মূলগত কোন ত্রুটি বা গলদের দরুন ঐ প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয় নাই। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও নেতৃ স্থানীয়দের রাজনৈতিক দলাদলিই এজন্য বেশী পরিমাণে দায়ী। ঔদার্য্য ও শুভবুদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত নাগরিকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া তাঁহারা বাঙলাকে এক নিদারুণ কলংক হইতে মুক্ত করিতে পারিতেন।

তাছাড়া ইহাও বিবেচ্য যে গোড়ার দিকে এইরূপ ২।১টি অকৃতকার্য্যতার দরুন পাঁচ কোটি লোকের একটি সমৃদ্ধ ও উর্ব্বর প্রদেশের উৎসাহভংগের কোন হেতু নাই। ইউরোপ, আমেরিকার ব্যাংকিং ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়—প্রথম দিকটায় শত শত ব্যাংক কারবার গুটাইতে বাধ্য হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে দেশের ব্যাংক ব্যবসায়ের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় নাই।

বাঙলার লোন কোম্পানীর দুর্দ্দশাও এই প্রদেশে ব্যাংক ব্যবসায়ের যথেষ্ট মর্য্যাদা হানি করিয়াছে। বহু লোন কোম্পানী ব্যাংক নামে পরিচিত, যদিও খাঁটি কমার্শিয়াল ব্যাংক ব্যবসায় তাহারা করে নাই। এই সকল কোম্পানী মহাজনী কারবারেরই নামান্তর। স্বল্প মেয়াদে এবং সহজে নগদে পরিবর্ত্তনসাধ্য জামিনে ইহারা টাকা খাটায় নাই। তাই গত বাজার মন্দায় ইহারা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কমার্শিয়াল ব্যাংকিং হইতে যে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির তাহা এখন সকলেরই বুঝা উচিত।

বাঙালী ব্যবসায়ীর সংখ্যা কম থাকাতে বাঙালী ব্যাংকের আমানতি টাকার একটা মোটা অংশ চাকরিয়া, জমিদার প্রভৃতি হইতে আসে। কিন্তু এই সব আমানতকারীদের মধ্যেও অদ্ভূত মনোভাব দেখা যায়। বেকার পুত্রকে লইয়া অভিভাবক চাকুরির উমেদারিতে আসিবেন বাঙালী ব্যাংকে, কিন্তু নিজের টাকা জমা রাখিবেন বিদেশী ব্যাংকে।

বাঙালী ব্যাংকসমূহের কার্য্যপ্রণালী ও সম্যক অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যাদি সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া এবং বাঙালীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ব্যাংকের গুরুত্ব ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে নেতৃবর্গ ও সংবাদপত্র সকল উৎসাহ দান করিলে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত মনোবৃত্তি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বাঙালী ব্যবসায়ী ও আমানতকারীর সাধারণ সহানুভূতি ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, কিন্তু এবিষয়ে সুসম্বন্ধ সংগঠনকার্য্যের প্রয়োজন আছে। বাঙালী ব্যাংকসমূহের পক্ষে "ইণ্ডিয়ান টি সেস কমিটি"র ন্যায় একটি সুগঠিত প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হইলে ভাল হয়।

একটি অপ্রিয় সত্য এ স্থলে সকলেরই স্মরণ রাখা দরকার। স্বদেশী এবং বাঙালীত্বের দোহাই দিয়া আর যাহাই চলুক, ব্যবসা চিরকাল চলে না, যদিও গোড়ায় যথেষ্ট সাহায্য ইহাতে হয়। আমানতকারিগণের উপর দোষারোপ না করিয়া বাঙালী ব্যাংকের গঠন পদ্ধতি ও পরিচালনা প্রণালীর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন অনেক বেশী।

প্রথমত বাঙলায় ব্যাংকের মূলধন সমস্যাই প্রধান। যে কয়েকটি বাঙালী ব্যাংক আজ জনসাধারণের আস্থা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের প্রদত্ত মূলধন গোড়াতে যদিও অতিশয় কম ছিল, বিগত দশ বৎসর তাহারা নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও সততার সহিত কাজ করিয়া কার্য্যকরী মূলধন ও প্রদত্ত মূলধন, বাড়াইয়াছে এবং রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণও তাহাদের বাড়িয়াছে। এই ব্যাংক কয়েকটির মোট প্রদত্ত মূলধন বর্ত্তমানে ৩৫।৪০ লক্ষ টাকার অধিক হইবে না, বলা বাহুল্য এই পরিমাণের মাত্রা নিতান্তই নগণ্য।

এতদ্ব্যতীত কতকগুলি ব্যাংক অতি কম আদায়ী মূলধন লইয়া কাজ করিতেছে এবং এইখানেই সাবধান হওয়ার খুব প্রয়োজন। নূতন সংশোধিত কোম্পানী আইন অনুযায়ী প্রাথমিক আদায়ী মূলধন অনূ্যন পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া কার্য্যারম্ভের বিধান হইয়াছে (বলা বাহুল্য আইন দ্বারা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসায়ীদের নীতিজ্ঞান বৃদ্ধি অসম্ভব)। এদিক দিয়া কেহ বড় একটা অগ্রসর হইতেছে না; পুরাতন লোন কোম্পানী বা নির্জ্জীব ক্ষুদ্র ব্যাংক রূপান্তরিত করিয়া ব্যবসা করার দুর্ব্বুদ্ধিই বেশী লক্ষ্য করা যাইতেছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই সব ক্ষুদ্র ও পুরাতন কোম্পানীর মধ্যে নানা প্রকার গলদের অবধি নাই। নূতন আইনানুযায়ী সুগঠিত ব্যাংকে জনসাধারণের আস্থা বেশী হওয়া সম্ভব—ইহা ব্যাংক ব্যবসায়ের উদ্যোক্তাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় সমস্যা—পরিচালনা বিষয়ে। গত ত্রিশ বৎসরে বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষায় ব্যাংক ব্যবসায়ের কার্য্যপ্রণালী শৃংখলাবদ্ধ ও সুসম্বদ্ধ হইয়াছে। তাছাড়া বাঙালী ব্যাংক-বিশেষজ্ঞ এখন পাওয়া যাইতেছে। আধুনিক যৌথ ব্যাংক পরিচালনার ধারা বাঙালী ব্যাংক-ম্যানেজারগণ ক্রমশ আয়ত্ত করিতেছেন।

বাঙালী ব্যাংকের তৃতীয় সমস্যা শাখা স্থাপনা বিষয়ে। সওদাগরী (কমার্শিয়াল) ব্যাংকের পক্ষে "ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং" অতীব প্রয়োজন এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের পক্ষে কল্যাণকর, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রকার শাখা সম্প্রসারণ কার্য্যে ব্যাংকের পরিচালকদিগকে অত্যন্ত সতর্ক ও সুবিবেচক হইতে হইবে। বিদেশীয় ব্যাংক অপেক্ষা বাঙালী ব্যাংকের পক্ষে মফঃস্বলে শাখা স্থাপন সহজতর। আজকাল ব্যাংকিং কার্য্যে উদ্যমশীল ও পারদর্শী বাঙালী অল্প বেতনে ব্রাঞ্চের কাজে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় অফিসারদের মত স্থানীয় লোকদের সহিত সামাজিক মেলামেশায় ইহাদের অসুবিধা হয় না। দেশীয় ব্যবসায়ের আভ্যন্তরীণ ভাবধারা ও কার্য্যপ্রণালী এবং ব্যবসায়ীদের প্রকৃত প্রয়োজন ইহারা বুঝিতে পারে। এ-সব সুবিধা বাঙালী ব্যাংকের আছে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে সতর্কভাবে দেখিতে হইবে—স্থানীয় ব্যবসায়ের প্রকৃতি, হালচাল এবং টাকা লেন-দেনের পরিমাণ কিরূপ এবং প্রস্তাবিত শাখা ব্যবসায়ীদিগের কোন্ কোন্ প্রকারে সাহায্য করিতে পারে। অন্য ব্যাংকের শাখার সহিত অনিষ্টকর প্রতিযোগিতায় বৃথা শক্তিক্ষয় হইবে কি না, তাহাও বিশেষভাবে বিবেচ্য। মফঃস্বলের স্থান বিশেষে বহু ব্যাংক ভিড় করিতেছে এবং লোকসান দিতেছে। অথচ মহাদেশের মতন আয়তনযুক্ত ভারতবর্ষে বহু নূতন ও উপযুক্ত স্থানের অভাব নাই এবং অনেক জায়গায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের অভাবে তীব্র অসুবিধাভোগ করিতেছে। প্রতিযোগিতার ঝোঁকে না মাতিয়া স্থির ও সতর্ক বিচার-বুদ্ধি দ্বারা শাখা নির্ব্বাচন আবশ্যক।

আরেকটি গুরুতর বিষয় হইতেছে ব্যাংকিং কার্য্য পরিচালনায় বিভিন্ন স্তরের বৈজ্ঞানিক হিসাব প্রস্তুতের পদ্ধতি। ইহাকে "cost accounting" বলা হয়। কোন বাঙালী ব্যাংকে এইরূপ সতর্ক ও পরিণামদর্শী পদ্ধতির প্রচলন আছে বলিয়া লেখকের জানা নাই। কার্য্য পরিচালনার প্রত্যেক বিভাগেই নির্দ্দিষ্ট কাজটির জন্য যে খরচ হইল, তাহা ব্যাংক ম্যানেজারের না জানা থাকিলে আমানতি টাকার সুদ স্থির করা এবং দাদননীতি সম্যকরূপে পরিচালনা করা সুকঠিন। বর্ত্তমান অবস্থায় অল্প সুদ অর্জ্জন করিয়াই ব্যাংককে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, সুতরাং উক্ত হিসাব পদ্ধতির প্রচলনের গুরুত্ব আজকাল আরও বেশী।

বাঙালী ব্যাঙ্কসমূহ উহা উপলব্ধি করিতে পারিলে কল্যাণকর হইবে সন্দেহ নাই।

এখন দাদন নীতি বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য খাঁটি সওদাগরী ব্যাঙ্কের নীতি অনুযায়ী অল্প মেয়াদে এবং সহজে নগদে পরিবর্ত্তনীয় সম্পত্তিতে দাদন করিলে ব্যাঙ্কের ঝুঁকি ও বিপদ খুবই কম। কিন্তু সংযমশীল ও সতর্ক নীতিতে নিষ্ঠা না থাকিলে এই দাদন প্রণালী হইতে বিচ্যুত হওয়া ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের পক্ষে স্বাভাবিক।

বর্ত্তমানে বাঁধ্ধক্যু বাঙলার পুরাতন ব্যাঙ্কগুলির অনেকে বাড়ী, জমি, চা-বাগান প্রভৃতিতে পূর্ব্বে অনেক টাকা দাদন করিয়াছিল। কিন্তু সত্বরই আত্মসম্বরণ করিয়া তাহারা এসব ঝুঁকির কাজ কমাইয়াছে। যদিও হালে প্রধান কয়েকটি বাঙালী ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরিক শক্তি বাড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু পূর্ব্ব ভুলের ও লোকসানের সংশোধন সম্পূর্ণরূপে হইয়াছে কিনা বলা শক্ত। সুখের কথা আজকাল এই ব্যাঙ্কগুলি ক্রমাগতই খাঁটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের দাদননীতি মানিয়া অগ্রসর হইতেছে। সরকারী-আধা-সরকারী-মিউনিসিপ্যাল-ঋণপত্র, সুবৃহৎ এবং প্রসিদ্ধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বাজার চলতি শেয়ার, গুদামে বা নিজ হেফাজতে রক্ষিত আমদানী ও রপ্তানী মাল প্রভৃতির জামিনে দাদনই নিরাপদ ও শ্রেয়—ইহারা তাহা বুঝিয়াছে।

শুধু অল্প মেয়াদে এবং নগদে পরিবর্ত্তনীয় জামিনে দাদন না করিয়া শিল্প সংগঠনে দাদন বাঙলায় অত্যাবশ্যক কিনা এই গুরুতর প্রশ্ন নিয়তই উত্থাপিত হইতেছে। বাঙালী ধনিক যেরূপ অর্থনিয়োগে পশ্চাৎপদ, তাহাতে ব্যাঙ্কের পক্ষে বাঙালী শিল্প প্রতিষ্ঠায় ও পরিপুষ্টির জন্য দীর্ঘদিনের মেয়াদে অর্থ-নিয়োগ খুবই আবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রয়োজন ও সামর্থ্য এক কথা নহে। প্রথমত বাঙালী ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধন প্রয়োজনের অনুপাতে খুবই কম। দ্বিতীয়ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থনিয়োগ বিষয়ে বাঙালী ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা নাই। যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে দাদন করা হইবে, তাহা নিয়ন্ত্রণের ও পরিচালনায় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন বেশ জটিল। তৃতীয়ত দীর্ঘদিনের মেয়াদে দাদনের ঝুঁকি লইবার মত আভ্যন্তরিক শক্তি এখনও যথেষ্ট নহে। সুতরাং বর্ত্তমানে বাঙালী ব্যাঙ্কের পক্ষে ইউরোপীয় (কণ্টিনেণ্টাল) ব্যাঙ্কের প্রথা অনুসরণ না করিয়া ইংরেজী ব্যাঙ্কের নীতি অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্যই বাঙলার শিল্প সংগঠনের জন্য পৃথকরূপে শিল্পসহায়ক ব্যাঙ্ক (যাহা দীর্ঘ মেয়াদে দাদন করিবে) স্থাপনে সকলেরই উদ্যমশীল হওয়া উচিত।

এস্থলে বলা আবশ্যক, বাঙালীর উল্লেখযোগ্য বৃহৎ কয়েকটি ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধন ৬।৭ কোটি টাকার উর্দ্ধে হইবে না। অথচ এ তুলনায় বাঙলার ব্যবসায়ে টাকার চাহিদা কত অধিক, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।—এই চাহিদার সামান্য অংশ মিটাইবার ক্ষমতাও এই ব্যাঙ্কগুলির নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমানে সুগঠিত এবং সুপরিচালিত সওদাগরি ব্যাঙ্কের যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে; কিন্তু ক্ষীণজীবী ও অপরিণামদর্শী ব্যাঙ্কের আবির্ভাব সত্যই অনাবশ্যক এবং ক্ষতিকর। বাঙালী ব্যাঙ্কের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অসুবিধার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সকলেই জানেন বহু বিজ্ঞাপিত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী মহল এবং যৌথ ব্যাঙ্কসমূহকে নিরাশ করিয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে সুনিয়ন্ত্রিত, সুসম্বদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল—তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। যথেষ্ট পরিমাণে রি-ডিস্কাউণ্টিং-এর সুবিধা ও সংকটকালে প্রকৃত সাহায্যের আশা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউল ব্যাঙ্কের খুবই কম। বলাবাহুল্য স্বভাবত দুর্ব্বল বাঙালী ব্যাঙ্ক এসব ত্রুটি ও অসুবিধার ফলে আরও বেশী দুঃখভোগ করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত বিদেশীয় ও অবাঙালী ব্যাঙ্কের অসহযোগিতা ও শত্রুতা বাঙালী ব্যাঙ্কের উন্নতির অন্তরায়রূপে রহিয়াছে। কলিকাতার ক্লিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের সভ্য হওয়া বাঙালী ব্যাঙ্কের পক্ষে কত দুরূহ তাহা অনেকেই জানেন, বাঙালী ব্যাঙ্ক যত শক্তিমানই হোক না কেন প্রকৃত মর্য্যাদা পাইতে বিঘ্নের অবধি নাই। বলাবাহুল্য বহুপ্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও বাঙালী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসার হইতেছে। আভ্যন্তরীণ শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় জনগণের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যতকিছু পরিকল্পনা ও প্ল্যানিং কমিটি হোক না কেন, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংগঠন ও প্রসারের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত এবং উন্নতিশীল কর্ম্মপদ্ধতি গৃহীত না হইলে দেশের আর্থিক সমস্যার মূলগত সমাধান হইবে না।

ক্রন্দসী
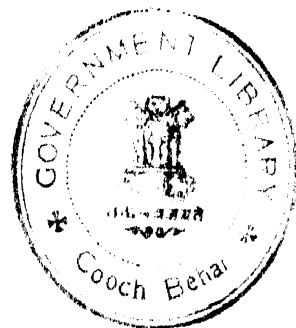
(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

রেলওয়ে ষ্টেশনে ট্রেন মাত্র দু'মিনিট থামে। সুবোধ কুলীর জন্য আর অপেক্ষা না করিয়া নিজেই তাড়াতাড়ি মোট-ঘাটগুলো নামাইল। ষ্টেশনের বাইরে তাহাদের জন্য দু'খানা ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া সুবোধ কহিল, "না, জায়গাটা মন্দ নয়; বিশেষ করে কলকাতা থেকে এসে ভালই লাগছে। ইভা তোমার ব্যাগটা দেখে নামিয়েছ ত?" ট্রেনটা বেলা তিনটার সময় এখানে পৌঁছায়, আজ কিছু লেট ছিল। ক্ষুদ্র রেলওয়ে ষ্টেশনটির বাহিরেই চারিদিকে অবারিত খোলা মাঠ। প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের অন্য প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ।

ইভার মেজ-দেওর তাহাদের লইতে আসিয়াছিল। জিনিষপত্র চাপান হইলে তাহারা গাড়ীর ভিতর চড়িয়া বসিল। গাড়ী গ্রাম্যপথে ধূলা উড়াইয়া মন্থরগতিতে চলিল।

পল্লীগ্রামের রাস্তার প্রহসনে গাড়ী কখন হেলিয়া পড়ে কখন বা উল্টাইবার যো হয়। সুবোধ ভীতকণ্ঠে কহিল, "এমন করে আর কতদূর যেতে হবে অবনীবাবু?"

ইভা হাসিয়া উঠিল, "এই ত মোটে মাইলখানেক এলে সুবোধ দা। এখনও পাঁচ মাইল রাস্তা প্রায় বাকী।"

ইভার দেওর অবনী একটুখানি ভরসা দিয়া কহিল, "না না, অত চিন্তিত হবেন না সুবোধবাবু। এর পরের রাস্তাটা অত খারাপ নয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে অনেক লেখালেখি করে মাটী ফেলেছে এ বছর। তাতে গর্ত্তটর্ত্তগুলো অনেকটা ভরাট হয়েছে। আপনি আসাতে আমি কিন্তু ভারি খুসী হয়েছি সুবোধবাবু। কলেজে এক রকম করে দিনগুলো কেটে যায় কিন্তু এই প্রকাণ্ড লম্বা গরমের ছুটি গ্রামে বসে কি করে যে কাটাব সে একটা মস্ত সমস্যা।"

সুবোধ প্রশ্ন করিল,—"আপনি কি কলকাতার কলেজে পড়েন? কই আপনাকে কোনদিন দেখেছি বলে ত মনে পড়ছে না।"

অবনী একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, "না আমি ত কলকাতায় পড়িনে। বীরভূমেরই হেতমপুর কলেজে পড়ি। এবার আই-এ দিলুম।"

সুবোধ উৎসাহিত হইয়া কহিল, "তাহলে আপনিও ত অনায়াসে আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। আপনাকে সঙ্গী পেলে আমার পক্ষেও অনেকখানি সুবিধা হয়।"

অবনী ঠিক বুঝিতে না পারিয়া উৎসুক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিল।

"কেন ইভার কাছে শোনেননি আমাদের প্ল্যানের কথা?"—এই বলিয়া সুবোধ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের বক্তৃতার দিন হইতে সুরু করিয়া আজ পর্য্যন্ত এ লইয়া তাহাদের মধ্যে যত জল্পনা-কল্পনা আলোচনা হইয়াছে সমস্তই একে একে বলিয়া গেল।

শুনিতে শুনিতে অবনীও উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং এই আলোচনার উৎসাহে তাহারা এতখানি পথের প্রায় সমস্তটাই যে কখন অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে তাহা টের পাইল না।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া অবনী কহিল, "বাঃ এই ত এরই মধ্যে আমরা কখন পৌঁছে গেছি। ঐ ত স্কুলের বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে, এই যে রায়েদের খামার। সুবোধবাবু এই আমাদের গ্রাম।"

ইভার শ্বশুরবাড়ীর সদর দরজার সামনে গাড়ী দাঁড়াইল, অবনী ও সুবোধ নামিয়া গেলে ইভাকে নামাইবার জন্য গাড়ী আবার ঘুরিয়া খিড়কির দরজার কাছে দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুরবাড়ীতে আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। গাড়ী হইতে নামিবামাত্র একটি প্রশান্তিতে ইভার হৃদয়মন ভরিয়া উঠিল। এমন দুর্লভ শান্তি এই অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাড়াগাঁ ছাড়া আর কোথাও কিন্তু সে অনুভব করে নাই। ঘরে ঘরে শাঁখ বাজিতেছে, সন্ধ্যার দীপ দেখাইয়া বধূরা তুলসীতলায় শীতলীর যোগাড় করিতেছে। গোয়াল-ঘরে ভিজে ঘুটের ধোঁয়া দেওয়া হইতেছে। বৈশাখ মাস। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই গাঁয়ের পথে নামকীর্ত্তন বাহির হইয়াছে। ছোটছেলেদের একটা দল আছে, তাহাদের উৎসাহও কিছু কম নয়। খোলে চাঁটি দিয়া দলের কর্ত্তার গলে প্রকাণ্ড এক ফুলের মালা পরাইয়া তাহারা ঠাকুরবাড়ীর নাটশালায় সঙ্কীর্ত্তন সুরু করিয়াছে। ইহার পর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী গাহিয়া ফিরিবে।

উমা আনন্দিত হাস্যে বৌদির অভ্যর্থনা করিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। প্রণতা বধূকে সস্নেহে উঠাইয়া শাশুড়ী কহিলেন, "এস মা এস। ক'দিন ছিলেনা, ঘর দুয়োর যেন আঁধার হয়েছিল।"

আজ তাঁহার বলিবার কথা স্নেহে এবং বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িল, চোখের প্রান্তও যেন সজল হইয়া উঠিল একটু। ছেলে বহুদিনের জন্য সুদূর বিদেশে গেছে সেই স্নেহকাতরতার কিছু অংশ ইভার উপর বর্ষিত হইল।

(১৮)

পশ্চিমের ঘরটায় বিকালের রোদ ঢুকিতেছে, পালঙ্কের উপর সুবোধ তখনও ঘুমাইতেছিল। অবনী ঠেলাঠেলি করিয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিল, "উঠুন! বেলা যে চারটে বেজে গেল, এর পর কখন আর বার হবেন? মুখহাত ধোয়া আছে, কাপড় ছাড়বেন, জল খাবেন।"

ঘুমভাঙ্গা চোখ মেলিয়া চাহিয়া সুবোধ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

"ইস্ আপনি যে একেবারে কুম্ভকর্ণ!"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "তা না হয়ে উপায়, দু'ঘণ্টা ধরে এত সাঁতার কাটালেন এবং তারপরে গোটা দুই মাছের মুড়ো দিয়ে এমন পরিতোষ সহকারে অতিথি সৎকার করলেন যে ঘুমটাও তদুচিত হয়েছিল।"

অবনী একটু থামিয়া লজ্জিতসুরে কহিল, "আমাকে আপনি নাই বা বললেন। বয়সে ছোট, ভাইয়ের মত।

সুবোধ সস্নেহ হাস্যে কহিল, "আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু এই সর্ত্তে যে, ওটা উভয়ত পালন করতে হবে। মোটে বছর দুইয়ের বড় দাদাকেও কেউ আর কিছু আপনি বলে না।"

অবনী লজ্জিতসুরে কহিল, "বেশ। তাহলে এবার চল সুবোধ দা। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে আজ একটা সভার মত করেছি। সময় দিয়েছি বিকেল পাঁচটা। গাঁয়ের ছেলে-

ছোকরা, মাইনর স্কুলের ক'জন মাষ্টার এরা সবাই আসবে। আমাদের সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্য ওদের আজ সহজ করে বুঝিয়ে জানাতে হবে। গরমের ছুটি ফুরিয়ে গেলে আমরা যখন চলে যাব তখনও ওরা যেন কাজ চালাতে পারে।"

অবনী ও সুবোধ চণ্ডীমণ্ডপে যখন আসিল তখন দু'একজন করিয়া ছেলেরা আসিতে সুরু করিয়াছে। অবনী আয়োজনের কিছু ত্রুটি করে নাই। গাঁয়ের সম্বল একটা ডে-লাইট ও গোটা দুই হ্যারিকেন লণ্ঠন প্রস্তুত করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছিল। সভা ভাঙ্গিতে যদি রাত্রি হয় তবে জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে। অবনীদের বাড়ী হইতে একটা টেবিল গোটাচারেক চেয়ার আনিয়া রাখা হইয়াছিল এবং স্থানীয় স্কুল হইতে গোটাকতক বেঞ্চি আনাইতেও ভুল হয় নাই। এমন কি টেবিলের উপর একটা ধোয়ান বিছানার চাদর ও একটা পিতলের ঘটিতে কিছু রজনীগন্ধা ফুলও সাজান ছিল। এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তারখানার ডাক্তারবাবু বয়সে তরুণ এবং গানবাজনারও নাকি একটু আধটু চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তিনি সস্তা দামের ছোট এক বক্স হার্ম্মোনিয়াম বাজাইয়া উদ্বোধন-সঙ্গীত গাহিলেন।

'আ' মরি বাঙলা ভাষা।'

গান শেষ হইলে সুবোধ উঠিয়া একবার চশমা মুছিয়া একবার কাশিয়া একবার লজ্জায় লাল হইয়া বলিতে সুরু করিল। এই তাহার জীবনের প্রথম বক্তৃতা, উত্তেজনাময় কি এক কাঁপিতেছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে উত্তেজনাময় কি এক অপূর্ব্ব অনুভূতি আসিয়া মিশিয়াছিল। পাড়াগাঁ সে ছোট হইতে কখনও দেখে নাই, কি তাহার সুখ-সুবিধা, কোথায় তাহার অভাব কিছুই ঠিক করিয়া জানে না। তবু বড় বড় অনেক কথা বলিয়া গেল। এ সমস্তর অধিকাংশই কলিকাতার সভা-সমিতিতে শুনিয়াছে। বক্তৃতা শেষ হইলে ঘন ঘন হাততালি পড়িতে লাগিল। যুবকদের মধ্যে একটা প্রশংসার অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল। সুবোধ উত্তেজিত হৃদয়স্পন্দনের মধ্যে বসিয়া পড়িল। অবনীকে অনুরোধ করিল, তুমি কিছু বল এইবার। ফাঁকি দিলে চলবে না।

অবনী উঠিয়া দাঁড়াইল। একেবারে ঘরোয়া কথায় সুরু করিল, গ্রামের আনন্দ গ্রামের জীবন ক্রমশ একেবারে কি করিয়া বিলুপ্ত হইতেছে। কথা বলিবার একটা লোক নাই, পড়িবার মত একটা বই নাই, শিক্ষা নাই, জ্ঞান নাই, স্বাস্থ্য নাই, মনের বুদ্ধির পক্ষে কোন রসদ কোন অবলম্বন নাই। সন্ধ্যা সাতটা বাজিতে না বাজিতে তেল পুড়িবার ভয়ে যে যাহার ঘরে খাইয়া শুইয়া পড়ে। সারারাত্রি ঘুমায়। আবার প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে এক পয়সার চুনো মাছ, দু' পয়সার শাক, বেগুন লইয়া মাতিয়া উঠে। খাওয়ার আয়োজন, খাওয়ার চর্চ্চা এবং দুটা মুখরোচক পর-প্রসঙ্গ পরচর্চ্চা ও দলাদলি ছাড়া গাঁয়ের লোকের জীবন কাটাইবার আর অন্য অবলম্বন নাই। শতকরা একজনও একটা খবরের কাগজের গ্রাহক নয়। মাসিক পত্র ত অনেক দূরের কথা। কেতাব হইতে ফ্যাক্টস্ এবং ফিগারস উদ্ধার করিবার দরকার নাই, আমাদের এই গ্রামের কথা বলিতেছি, সমস্ত গ্রামের মধ্যে বোসজা মহাশয়ের বাড়ীতে শুধু সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী আসে আর কোথাও কেহ একখানা খবরের কাগজের ছায়াও দেখিতে পাইবেন না। আমরা, যাহারা কলেজে পড়ি বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময় বাহিরে বিদেশে কাটাই, আমরা ছুটি ছাটাতে গ্রামে আসিয়া ভূতের মত ঘুরিয়া বেড়াই। খাওয়া এবং ঘুমান ছাড়া এখানে সময় কাটাইবার অন্য পন্থা নাই। সঙ্গ নাই, কথা বলিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। আসিয়া অবধি মন খাবি খায়। কতক্ষণে ছুটি ফুরাইবে, কতক্ষণে পালাইয়া বাঁচিব। অথচ শুনিতে পাই একদিন দেশের এমন অবস্থা ছিল না। দেশের জনসাধারণ বলিতে যাহারা বুঝায় সেই চাষী-মজুর দোকানদার সামান্য লোকেদের ভিতরেও কথকতা, রামায়ণ গান, কবির লড়াই, তরজা, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতির ভিতর দিয়া শিক্ষার স্রোত বহিত। তাহাদের মন উদার এবং সুকুমার হইবার অবসর পাইত। শুধু দিন কাটানোর যে পশুত্ব তাহা কাটাইয়া উঠিয়া তাহারা আনন্দের স্বাদ পাইত। আমাদের মধ্যে যাহারা দেশের সেবা করিতে চাই আমাদের পক্ষে দেশসেবার সবচেয়ে বড় উপায় গ্রামের জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা। কলেজের দীর্ঘ ছুটি বৃথা নষ্ট না করিয়া সে সময়টা এই কাজে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া।......

অবনীর বলা শেষ হইয়া গেলে ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তার বাবুটিও কিছু বলিলেন। তাহার পর কার্য্যক্রম স্থির হইয়া গেল, প্রাথমিক শিক্ষার কিছু বই শেলেট এবং খাতাপত্র জোগাড় করিয়া নাইট স্কুলের মত করিতে হইবে। দিনের বেলায় যে চাষীরা চাষ করে যে তাঁতীরা কাপড় বোনে যে মুটে-মজুররা শ্রমসাধ্য কাজ করিয়া বেড়ায়, তাদের রাত্রি ছাড়া অবকাশ মিলিবে না।

বাড়ীতে আসিয়া দুই বন্ধু আহারে বসিয়া ইভার কাছে বর্ণনায় রঙ চড়াইয়া আজিকার ব্যাপারটা বলিতে প্রবৃত্ত হইল। সমস্ত শুনিয়া আর কিছু না বলিয়া ইভা কেবল একটুখানি হাস্য করিল। পরিহাস করিয়া বলিল, 'অনেক বক্তৃতা দিয়ে নিশ্চয় তোমাদের খিদের জোর হয়েছে। আরও ক'খানা লুচি দি? আর একটু তরকারি মাছের?'

সুবোধ দস্তুরমত আহত হইয়া কহিল, "এতবড় একটা কাজে তোমার সহানুভূতি নেই? এর চেয়ে বেশী সেবা আমরা আর কোন পথে করতে পারি দেশের তুমিই বলে দাও দেখি?'

ইভা শান্তস্বরে কহিল, 'সে সম্বন্ধে আমিও তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু কথা হচ্ছে একাজ তোমরা পারবে কি? দুটো ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে উদ্বোধন সঙ্গীত গেয়ে বড় বড় গোটাকতক কথা বক্তৃতায় পুরে দিয়ে হয়ে গেল। সভা অন্তে সকলে সমবেত হাততালি দিলে। সে কাজ আর একাজে অনেক তফাৎ। ধৈর্য্য থাকবে?'

সুবোধ কহিল, 'নিশ্চয় থাকবে। সব কাজেরই প্রথমটায় হয়ত শক্ত ঠেকে, কিন্তু মনে নিষ্ঠার জোর থাকলে শেষ পর্য্যন্ত পথ সুগম হতে বাধ্য।'

ইভা গাঢ়স্বরে কহিল, 'এই নিষ্ঠার তেজ তোমাদের মনে অবিচলিত হোক আমি একান্তমনে প্রার্থনা করি।' **(ক্রমশ)**

আলোকের পশ্চাতে

(গল্প)

শ্রীদিবাকর রায়

বিবাহিত জীবনের মধুমাস যখন সকল স্বপ্নমায়া-সহ যায় অন্তর্হিত হইয়া, তখন লেখিকার দিদি হওয়া সৌভাগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু কোটিপতির ঘরণী দিদির ছোট ভগ্নী হওয়া অন্তত আমার পক্ষে ততোধিক ভাগ্য যে হইয়াছিল, একথা আমায় স্বীকার করিতেই হইবে।

তবু আমি ভাবিয়া পাই না কে বেশী সুখী ; কোটি-পতির অর্ধাঙ্গিনী দিদি আমার?—না, বিপুল অর্থের মালিক অবিবাহিতা লেখিকা ছোট ভগ্নী আমার? এ ভাবনার মীমাংসা কখনও করিতে পারি নাই। ভাবিতে গেলেই পর্দার ছবির মত সচল পরছায়ার সারি ভাসিয়া উঠে চোখের সমুখে।

আভা—আমার ছোট বোন্ আভা—তখন লেখিকা বলিয়া দেশজোড়া নাম কিনিয়াছে। আয় তাহার প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত। সে আয়ে ইচ্ছা করিলে সে থাকিতে পারে আমিরী চালে। তবু বাস করে সে মায়ের সঙ্গে—আমাদের পিতামহের আমলের সেই ছোট্ট বাড়ীখানিতে। আর তো কেউ নাই, ভাই আমাদের ছিল না একটিও। আমরা, বড় দুই বোন, কবেই পার হইয়াছি শ্বশুর গৃহে। তবে কিনা আমি গরীবের পুত্রবধূ, নেহাৎ নিঃস্বের পত্নী ; আমায় দায় পড়িয়াই মায়ের সংসারে লেখিকা বোন্‌টির স্কন্ধে মাসের অন্তত দশটি দিন কাটাইতে হয়—অবশ্য মায়ের সেবা-শুশ্রূষার অছিলায়। ভগবানের আশীর্বাদ—মাতৃত্ব-গৌরব আজিও আমার অনাস্বাদিত।

সে ছিল বর্ষার এক ধৌতসিক্ত অপরাহ্ন।

ভিতরের বারান্দায় বসিয়া চা-পান শেষ করিয়া অতনু কি যেন বলিতে চাহিতেছে বুঝিয়া আমি আভা ও অতনুকে নির্জনত্বের সুযোগ দিয়া বাগানখানিতে গেলাম। কিন্তু কান রহিল বারান্দার আশপাশে। প্রতিটি কথা কেন, চাপা দীর্ঘশ্বাসটি পর্যন্ত আমার কানে ধরা দেয়।

প্রথমেই প্রশ্ন করিল অতনু—আচ্ছা আভা আজও তুমি এ পচা বাড়ীটায় পড়ে আছ কেন বল দেখি?

আভা অস্বস্তি বোধ করিল, কুণ্ঠার সহিতই বলিল—কারণ, টাকা থাক্‌লেই তা নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌তে হবে, এমন আইন তো নেই।

নির্লজ্জের মতই অতনু বলিয়া ফেলে—আমায় যে কেন তুমি বিয়ে কর্‌লে না, তা আজও বুঝতে পারলুম না। কতবার তো সে আবেদন জানিয়েছি।

—অতনু-দা, তোমার কি স্মৃতি বলে কোন জিনিষ আছে?

—অ-খুশী হবার মত ব্যাপারের স্মৃতি আমি বয়ে বেড়াই না। আর মেয়েদের রেওয়াজ হ'ল বিদঘুটে স্মৃতি চেষ্টা করে মনে রাখা।

—তুমি একবার প্রস্তাব করেছিলে বিয়ের, আমিও রাজি হয়েছিলুম এজন্যে যে, তুমি আকুতি জানিয়েছিলে বিয়ে করে তোমার মদ্যপায়ীর জীবন থেকে তোমায় উদ্ধার কর্‌তে। কিন্তু মদ্যবর্জনে তোমার আগ্রহ দূরে থাক—আরো বেশী করে ডুবতে লাগ্‌লে......

—তাই বুঝি বিয়েতে শেষটায় রাজি হও নি। তখন আমি ছিলাম তরুণ, বুদ্ধিহীন। উচ্ছ্বাসের বশে তরুণেরা কত কি অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করে বসে। কিন্তু আমি জানতুম না, সেই সেদিন থেকে এতগুলো বছর ধরে তুমি সেই কথাই পুষে রেখেছ মনে আর তোফা তৃপ্তিলাভ কর্‌ছ নিজেকে সেয়ানা ভেবে।

—নিশ্চয়ই আমি সেয়ানা।

—হাঁ, আভা, তুমি যে খুবই সেয়ানা একটি নারী তাতে আর ভুল কি! কিন্তু এ সেয়ানাপনা তোমার জীবনে কোন্ উপহার এনে হাজির করেছে বল্‌তে পার?

—উপহার হয়ত কিছুই মেলে নি; কিন্তু 'অপহার'ও যে কিছু আনে নি, সেটাই বড় কথা।

—সেয়ানা বটে। আচ্ছা এখন তো আমাদের বিয়ে হতে পারে!

এক মুহূর্ত আভা ইতস্তত করিল, তাহার পর বিপুল উত্তেজনার তোড়ে বলিয়া উঠিল—"বিবাহ-বন্ধনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা একেবারে স্বর্গীয়।"

আভাকে এমনভাবে বিচলিত হইতে অতনু জীবনে কখনও দেখে নাই। তাই ঠাহর করিতে পারে না আভার মনের ভাব। বলে—বেশ তো, তা হলে আমি এখানেই বসে যাব। সুখের নীড় একটি গড়ে তুলবো দুজনে। তারপরে যখন ভগবানের দান আস্‌বে ক্ষুদে ক্ষুদে অতিথির আকারে—সে কচি দেব-শিশুগুলিকে, চোখে তাদের মায়াকাজল—কেমন দরদে মানুষ করে তৃপ্ত হব। বা রে! এ চিত্রে ভুলটি কোথায় শুনি?

—ভুল! কত শত ভুল এতে হবে তা যদি ঠিক ঠিক বলি পুরস্কার পাব তো?

—আচ্ছা, তা হলে অন্য কাউকে তো বিয়ে করতে পার?

আভা নীরব।

অতনু আগাইয়া আসে। আভার কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া বলে,—ও কথার জবাব অন্তত আমি দিতে পারি।

—না, আমায় ছেড়ে দাও।

—কথাটা বলা শেষ না করে ছাড়ছিনে। আমি জানি, তুমি আমায় ভালবাস। তুমি আমার অনুরাগে মুগ্ধ সেই দশ বছর আগে থেকে—

—বারো বছর। নির্লিপ্তের মত বলে আভা।

—তা হলে তুমি কেন নিজের প্রতি সুবিচার করছ না, আমায় তুমি আশ্রয় দাওনা কেন।

—একটা মাতালকে আশ্রয়, এক নিমেষও যে বেহুঁস ছাড়া থাকবে না আর এক মুহূর্ত যার মন বাড়ীতে টেঁকবে না, কেবলই ঘুরবে আলেয়ার পেছনে আর যেই হুঁস ফিরে আস্‌বে, অমনি বাড়ী ফিরে হাঁকবে—টাকা চাই।

—তা হলে না হয় কম্পেনিয়নেট্ ম্যারেজ—

আভা আর বরদাস্ত করিতে পারে না। অতি ক্ষিপ্রগতিতে তার হাতের চেটো চটাং করিয়া অতনুর গালে পড়ে।

"জান্তব বর্বরতা!" চীৎকার করিয়া উঠে অতনু। "সমাজ আস্কারা দিয়ে নারী জাতিটাকেই অযথা অধিকারে স্পর্ধার শিরে তুলেছে। কিন্তু সব জিনিষেরই সীমা আছে, এই নাও—

অতনু রুখিয়া যায় আভার দিকে। আভা আচমকা সরিয়া গিয়া চেয়ারখানা সমুখে রাখে। অতনু হুমড়ি খাইয়া পড়ে চেয়ারের উপরে, আভা তাহার স্পর্শের সত্যই বাহিরে থাকে।

আভা রুক্ষভাবে বলে—মাতালের কাজ নয় একটা সচল পদার্থকে আঘাত করা, তা করতে হলে মদ্য বর্জন করে শান্ত প্রকৃতিস্থ হতে হয়।

—অল্ রাইট্। তোমারই জয়।

ধুলো ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অতনু মাথার চুলগুলো হাত দিয়া পাট করিয়া লয়। —তুমি জয়ী, আর আমি বিদায় নিচ্ছি—গুড্ বাই। আর কোনদিন তোমায় বিরক্ত করবো না। ভগবান জানেন কেন আমি তোমার পিছনে ঘুরেছি এতকাল। কেন তোমার উপর আমার বিশ্বাস ছিল অটুট। আমি জানি না। তুমিও অন্য সব তরুণীদের মতই একটি। কেবল একটা আভিজাত্য তোমাতে দেখতে পাই—তুমি আমায় 'না' বল্তে পার।

—যাও, যাও, আর বড়াই কর্তে হবে না। তোমার মাতলামি কে না জানে।

—আমার ইচ্ছা হয় খুব কড়া কথা বলে তোমায় আঘাত দি। কিন্তু কথা খুঁজে পাইনে। কোন কিছুতেই তো তুমি ধৈর্য হারাও না। তোমার মত হৃদয়হীন তরুণীর শাস্তি হওয়া উচিত।

—আর কিছু বল্বে না?

—হ্যাঁ, তোমার দৃঢ়তা জাহান্নামে যাক্। অতনু আর দেরী করে না, গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া যায়।

স্বামীগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি। পর দিন ভোরবেলা আভার চিঠি লইয়া দারোয়ান হাজির। আভার ফোন্ থাকিলেও আমরা গরীব, বাড়ীতে ফোন্ নাই। চিঠি ছাড়া উপায় কি! আভা জানাইয়াছে, সে যাইবে মধুপুরে কয়েক মাসের জন্য। মা অবশ্য সঙ্গে যাইবে। চিন্তার কিছু নাই, অসুখ-বিসুখ কিছু নয়—চিকিৎসক বলিয়াছে বিশ্রাম দরকার।

আভা তো সহজে ডাক্তারের পরামর্শ নেয় না। নিশ্চয় একটা কিছু হইয়াছে। কাজেই গেলাম ডাক্তারবাবুর কাছে। এ বুড়া ডাক্তার আমাদের জন্মের আগে হইতে আমাদের পরিবারের চিকিৎসক। সে বলিল আভার বিশ্রাম দরকার, রোগ নাই কিছু।

রওনা হইয়া গেল আভা বাহিরে, আমি আর দেখা করিতে পারি নাই। প্রায় এক সপ্তাহ পরে মায়ের চিঠি পাইলাম। আভার খুব বেশী অসুখ। তবে এইবারের মত মনে হয় ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। মা জিজ্ঞাসা করিয়াছে আমি জানি কিনা অতনুর সঙ্গে আভার কি হইয়াছে। কারণ আর কিছুই নয় অসুখের সময় বারবার আভা প্রলাপ বকিয়াছে অতনুকে আর জীবনে সে দেখিতে চায় না।

ইহারও প্রায় পনের দিন পরে মা আবার লিখিয়াছে—আভার অসুখ সেই যে একটু কমিয়াছে, আর কমে না। বেশীর ভাগ, চোখে তার কি হইয়াছে। আভাকে কলিকাতায় আনা হইবে, দরকার হইলে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইবে।

দশদিন পরে, আভা আসিয়াছে সংবাদ পাইলাম। দেখা করিতে গেলাম। নিজের ঘরেই সে ছিল। চোখে ঘোর কালো চশমা। বড্ড ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে, রোগাও দেখাইতেছে বেজায়। কিন্তু হাসি মুখেই সে আমার সঙ্গে কথা কহিল। ৩২, ভিজিটের বড় ডাক্তার দেখিতেছে, আশা করিলাম ভাল হইয়া যাইবে দুই দিনে।

কয়দিন আর খবর করি নাই। মা হঠাৎ একদিন খবর পাঠাইল। সংক্ষিপ্ত সংবাদ—'মহা বিপদ, এস'। যাইতে হইল।

যে আভাকে সেদিন দেখিলাম, তাহার সহিত আমাদের চিরপরিচিত আভার আর কোন মিল না। সেই সাহস, সেই সহিষ্ণুতা কোথায় উবিয়া গিয়াছে। কক্ষ অন্ধকার। আভা শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। শুনিলাম রাতদিন শুইয়াই থাকে।

—কিরে আভা।

পাশ ফিরিয়া কহিল কি মেজদি এসেছ! তাহার পাশে বসিলাম। সে আমার হাতখানি চাপিয়া ধরিল। কথা মুখে ফুটিল না কাহারও। অবশেষে আমার মনে হইল, আমি একটা উপহার আনিয়াছি, আভার জন্যে। বাক্সটা তাহার হাতে দিলাম।

হাতে লইয়া সে বলিল—মেজদি এটা কি?

—খোল্ না, খুলে দেখ্।

—তুমি খোল।

আমি খুলিয়া তাহার হাতে দিলাম।

—ওঃ একটা রাইটিং প্যাড্। নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল—কিসের জন্যে?

—লেখবার জন্যে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল,—মেজদি, এটা তুমি নিয়ে যাও। আমার আর তো কোন কাজে লাগ্‌বে না। ডাক্তার বলেছে আমার চোখ সারবে না, অন্ধই থাকতে হবে সারা জীবন।

বলিতে বলিতে দুই চোখে তাহার ধারা ছুটিল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া বলিল,—স্বর্গের দেবতারা এর জন্যে তোমায় বড় একটা তারকায় পরিণত করবে নিশ্চয়, হতভাগিনী ছোট ভগিনীর প্রতি দরদের জন্য। কিন্তু আমার কাছে এটা বৃথা!

সেদিন বিদায় হইলাম। ইহার পর যে একটি বৎসর

কাটিল, তাহাতে কতবার গিয়াছি আভার কক্ষে। কিন্তু যখনই সেই আঁধার ভরা কক্ষে পা দিয়াছি, মনে হইয়াছে জীবন্ত-মৃতের সমাধিতে হাজির হইয়াছি। কেবল সজীবতার আমেজ যাহা একটু ছড়াইয়াছে রেডিওর মৃদু করুণ সুরখানি-ব্যস্, সেই সব। কেউ বোঝে না, আভা উঠিবার হাঁটিবার শক্তি রাখে কিনা। সে বিছানা ছাড়ে না এক নিমিষের তরেও।

ঐ বৎসরটা মনে হয় আমাদের সকলেরই একটা দুঃসময়—একটা অপার দুর্গতির বৎসর। কেবল আভার জন্যই নয়, আমাদেরও। আমার শ্বশুর বুড়োকালে শেয়ার মার্কেটে যাইয়া সর্বস্ব খোয়াইল। স্বামী আমার নিরুপায় হইয়া পড়িল। তাহার কারবার বুঝি আর টেঁকে না। বই-য়ের কারবার। আভারও অনেক বই স্বামী আমার প্রকাশ করিয়াছে। কি হইবে উপায়? নিজেদের বাস্তু, বাড়ী সব বিক্রী হইয়া গেল। কারবারের যা কিছু নগদ টাকা ছিল তাও গেল। কারবারের জন্য টাকা চাই। কিন্তু কে দিবে টাকা?

ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। সামান্য খাবারের জিনিষেও কত ধরকাট আরম্ভ করিলাম। আবার ভগবানকে ধন্যবাদ দেই, ছেলেমেয়ে আমাদের দেন নাই বলিয়া।

এক রাতে আমার মনে হইল—জামাইবাবু—বড়দির বর—অসিতবাবু তো ক্রোরপতি। দুই-চার হাজার টাকা তাহার কাছে কিছু নয়। দিবে না সে হাজার পাঁচেক টাকা কারবার মর্টগেজ রাখিয়া। স্বামীকে কিছু বলিলাম না। বড়দির কাছে চিঠি লিখিলাম। বড়দি অমনি জবাব দিল, 'শীগ্‌গির আয় প্রভা, আমি বড় নিরালায় কাটাচ্ছি'। বড়দি একথা কেন লিখিল, কেমন যেন সন্দেহ আমায় পাইয়া বসিল।

আমি জানিতাম অসিতবাবু যথেষ্ট পয়সা করিয়াছে ইনসিওরেন্স কোম্পানী খুলিয়া। তাহা ছাড়া তার বাপও রাখিয়া গিয়াছিল লক্ষ লক্ষ টাকা। কিন্তু শ্রীরামপুরে যে বাড়ী দেখিলাম তাহাদের রাজপ্রাসাদের মত, তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। খালের ধারে ছয় বিঘা জমি লইয়া সে প্রাসাদ। চারিদিকে বাগান—ফোয়ারা টিউব্ কল্। ফটকে সঙিনধারী পাহারা। দোতলা বাড়ীখানি ছবির মত—সমুখে লন্; ভিতরে মার্‌বেলে মোড়া অষ্টপৃষ্ঠ।

স্বামীর কারবারের গাড়ী লইয়া গিয়াছিলাম। ড্রাইভার হক্‌চকাইয়া গেল কোথায় ভিড়াইবে গাড়ী। একটা বেয়ারা আগাইয়া আসিয়া দেখাইয়া দিল লতায় ঘেরা রাস্তার মোড়টি। আমি গাড়ী হইতে নামিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বড়দি উপস্থিত সেখানে।

—এসেছিস প্রভা, কত যে খুশী হলুম। তোর জামাইবাবুর সঙ্গে কি কাজ রয়েছে লিখিছিলি। সেও খুশী হবে খুব তোকে দেখে তাই বল্‌লে। তার আসতে একটু দেরী হবে। তাদের কোথায় যেন ইনসিওরওলাদের কনফারেন্স।

কত কথা বড়দি বলিল। ছেলেমেয়ে দুটির কথা। বড়টি ছেলে বয়স বারোর কম নয়—কিন্তু আজ দুই বৎসর যাবৎ সে শয্যাশায়ী মৃগী রোগে। একেবারে মড়ার মত চেহারা হইয়া গিয়াছে। শয্যায় পড়িয়া থাকে সকল সময়। আভার কথাই মনে হইল। সে কথাও বলিলাম। বড়দির চোখেও জল গড়াইল, আভাকে কত কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। এই সকল কথার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের সংসারের দুর্দশা—সাময়িক ব্যবসায় দুরবস্থা সবই ফেলিলাম।

দিদি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—এই তো ছেলেটার দশা। আজ আবার মেয়েটা—শুভার জন্মতিথি। আজই কি ঠিক সময়ে তোর জামাইবাবু আস্‌বে। শুভা আবার ওদের ইস্কুলের কয়েকটি মেয়েকে বলেছে—জন্মতিথির পার্টিতে। তুই তো তবু রজতকে (আমার স্বামীর নাম) হামেশাই দেখতে পাস—যত রাতই হোক দোকান বন্ধ করতে। কিন্তু আমি তোর জামাইবাবুর দেখা পাই নে। জানিস, এ দু বছরে একবারও এ বাড়ী ছেড়ে বেড়াতে যেতে পারি নি দুজনে মিলে।

ভাবিলাম কি করিয়া বড়দি মা হইয়া রুগ্ন ছেলেকে একা ফেলিয়া সখের সফরে বাহির হইবে। বড়দিকে বলিলাম,

জান বড়দি তোমায় কেমন হায়রান্ দেখাচ্ছে। কিন্তু খোকার কথা বল্‌তেই তুমি এমন শিউরে উঠ্‌ছ কেন।

আমি ক্লান্ত নই, খোকার জন্যেই যত ভাবনা। বড় বড় ডাক্তার এসে দেখে যায়, ওষুধ দেয়, কোন ফল হয় না। কি যে বলে তোর জামাইবাবু সব কথা খুলেও বলে না। এভাবে দু-দুটো বছর তো পার করলাম। কি যে আছে বরাতে। এদিকে মেয়েটা ইস্কুলে যায়, বাবু যায় আফিসে, আমি একা এ রোগীকে পাহারা দি।

তারপর বাড়ীখানি ঘুরিয়া দেখাইল বড়দি। হ্যাঁ, এমন বাড়ীর গর্ব সে করিতে পারে। তারপর বড়দির শোবার ঘরের ভিতর দিয়া একটা গলিপথ; বড়দি বলিল, 'চল খোকার ঘরে'। গেলাম সে ঘরে।

ঠিক আভার ঘরের মত এখানেও মিহিসুরে রেডিও বাজিতেছে। বড়দির স্বরে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ—যেন এতে পয়সার সদ্ব্যবহারই তাহারা করিতেছে।

মস্তবড় বিছানা। আর খুদে এইটুকু শিশু যেন। আহা! কি চেহারা হইয়া গিয়াছে, সেই মোটাসোটা ছেলেটার। দুই বৎসরে এত পরিবর্তন।

এমন সময় শুভা আসিল ইস্কুলের গাড়ীতে, সঙ্গে আরও কয়টি মেয়ে। আমায় দেখেই "মাসীমা" বলিয়া ছুটিয়া জড়াইয়া ধরিল। তার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া অনেক কথাই বলিয়া ফেলিলাম। সে বার বার জিজ্ঞাসা করিল বড়দিকে—বাবা আসবে কখন, মা? আসবে ত? আমার পার্টিতে না এলে—(শুভা কাঁদ কাঁদ)।

বড়দি বাধা দিয়া বলিল না-আস্‌বে কেন, বলেছে যখন ঠিক আস্‌বে।

শুভা গেল বন্ধু-বান্ধবীদের অভ্যর্থনা করিতে।

পাড়ার দুইটি ছেলেও আসিয়াছে। এই দশ বছরের মেয়ে শুভা, কি সুন্দর পার্টির ব্যবস্থা করিতে লাগিল সম্মুখের লনে। টেবিল-চেয়ার পাতিয়া, খাবার, চায়ের সরঞ্জাম ঠিকঠাক করিয়া, সুন্দর টেবিল ক্লথ বাছিয়া বাহির করিয়া পরিপাটি সাজাইল।

শুভার বন্দোবস্ত শেষ না হইতেই জামাইবাবু হাজির হইল। লনে আমরা টেবিল ঘিরিয়া বসিলাম। বাহিরের অভ্যাগত কেহ নাই, কেবল শুভার মেয়ে-মাষ্টার সবিতা দেবী। আজ শুভার পার্টি—পরিবেশন সে নিজে করিবে। খাবারের ব্যবস্থাও আজ তাহারই হুকুমে।

জামাইবাবু কেমন এক হাসির সঙ্গে ডাকিল—শুভা! আর হাতের ভেলভেট কেসটি তুলিয়া ধরিল। শুভা ছুটিয়া আসিয়া বাপের গলা দুই হাতে বেড়িয়া ধরিল। জামাইবাবু কেস থেকে লকেটসহ হার ছড়া খুলিয়া পরাইয়া দিল শুভাকে। শুভা ভারী খুশী। ছুটিয়া আসিয়া আমায় দেখাইল হারটা, বড়দিকে দেখাইল, তারপর বন্ধুদের।

বড়দি বলিল, শুভার এত সব আছে, আমি কি যে দেব ঠাওরাতে পারলাম না। শেষে দিলাম ঐ শাড়ীখানি।

বেশ পরিতোষ ভোজের পর সেই লনেই হারমোনিয়াম আনা হইল। সবিতা দেবী হারমোনিয়ামে সুর দিল—তিনটি মেয়ে সুন্দর তান ধরিল। গানে গানে বাড়ীর আবহাওয়া ভরিয়া উঠিল। সকলের মুখেই তৃপ্তি—প্রশান্তি। হঠাৎ একটা নিদারুণ চীৎকার। মেয়েরা গান বন্ধ করিয়া দোতলার কোণের ঘরের খোলা জানালার দিকে ভীরু দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। শব্দ শোনার পর বড়দিকে আর দেখি নাই, কখন চলিয়া গিয়াছে। জামাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, মুখ তার কালো। দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। শুভা দৌড়াইয়া গিয়া বাপের হাত ধরিয়া তাহার সহিত মিশিয়া আছে।

কয়েক মিনিট সমানে সেই করুণ চীৎকার চলিল। অবশেষে সব নীরব।

জামাইবাবু আমায় বলিল, ওর ফিট হয়, ভয়ানক কষ্টে চেঁচায়, তখন মরফিয়া দিতে হয়। বিভা বোধ হয় তাই দিয়েছে।

বিভা হইল বড়দির নাম।

এইবার বুঝিলাম কেন খোকার নাম করিতেই, শিহরিয়া উঠিতেছিল বড়দি। বড়দি এই ভয়ই করিতেছিল নিশ্চয়।

সবিতা দেবী আবার মেয়েদের টেবিলে আনিলেন বটে, কিন্তু ভাঙা মজলিশ আর জোড়া লইল না। শুভাকে তার বাপ বলিল বন্ধুদের কাছে যাইতে, তার পার্টি। কিন্তু এতক্ষণে শুভার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিল। সে চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—'আমার পার্টিটা তবে মাটি হ'ল কেন। যতসব বিদ্‌ঘুটে ঘটবে আমার সব কাজে।' শুভার চোখমুখ লাল হইল, ক্রমে যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম। জামাইবাবু তাকে পাঁজাকোলা করিয়া লইয়া গেল ভিতরে। অন্যান্য সকলে চলিয়া গেল।

এতক্ষণে বড়দি বাহির হইল খোকার ঘর হইতে। আমি বলিলাম, যাই বড়দি। সেই মুহূর্তে জামাইবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "না প্রভা, একটু থেকে যাও। তোমার সাহায্য আমি চাই। এর হিল্লে করতে হবে। আর সওয়া যায় না।"

ভিতরে যাইয়া বসিতে বসিতে বড়দি বলিল,—'এতক্ষণে খোকা ঘুমিয়ে গেছে।' বেচারী বড়দি, তার জন্য দুঃখিত না হইয়া উপায় নাই।

জামাইবাবু এবার রাগে দুঃখে গর্জিয়া উঠিল,—শুভাও ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু বিভা, আর আমি সইতে পারি নে এ দৃশ্য। একটা রোগা ছেলে এমনভাবে তিনটি প্রাণীর জীবন অতিষ্ঠ করবে কেন! তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। শুভারও তো মানুষের মত বাঁচবার অধিকার আছে।

বড়দিও ঝাঁজাল সুরে বলিল,—তা যতই বল, আমার প্রাণ থাকতে খোকাকে অন্য কোথাও পাঠাতে পারবো না।

—জান, ডাক্তার বলেছে রুগ্ন ছেলের জন্যে জীবন্তটিকে হত্যা করছো তুমি। তুমি কি পাষাণী বিভা!

—আমি পাষাণী, না—তুমি পাষাণ! ছেলেটা নিরুপায় তার জন্যে দরদ নেই এতটুকু। এতই যদি মেয়ের হিত চাও, কত তো ভাল বোর্ডিং স্কুল আছে, বোর্ডিং-য়ে পাঠিয়ে দাও মেয়েকে। শুভার যাবার ঢের ঢের ভাল জায়গা আছে, কিন্তু হতভাগা ছেলের আমার যাবার ঠাঁই নেই কোথাও।

বলিয়া বড়দি নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল।

জামাইবাবু তবুও ছাড়ে না—বিভা তুমি পাগল। এ রোগীর শুশ্রূষা হাসপাতালেই হয় ঠিক, তুমি তার কি জান, বল ত? যে মেয়েটা আমাদের জীবনের একমাত্র সুখ আর আনন্দের সম্বল, তাকে পাঠাতে চাও চোখের বাহিরে আর যে একটা কালো ছায়ার মত আমাদের জীবনে অভিশাপ তাকেই চোখের আড় করতে পার না।

বড়দি আরও রুখিয়া চেঁচাইয়া বলিল—না, না। সে হবে না। আমার জীবন থাকতে নয়। আমায় মেরে ফেল আগে, তারপর ছেলেকে পাঠাও যমের দুয়ারে—হাসপাতালে।

বড়দি আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।.........

সন্ধ্যা হইতে বাকি নাই। উঠিতে হইল। আমি মোটরে উঠিতেছি, তখন জামাইবাবু ব্যস্ত ভাবে কাছে আসিল। —প্রভা, চললে? তোমার না কি কথা ছিল? স্থির হয়ে বসে দু'দণ্ড কথা বলবারও উপায় নেই দেখছো তো!

—হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু আজ যা তোমাদের মনের অবস্থা আজ থাক্। আর একদিন হবে।

—বল না, প্রভা, কি কথা। এ আমাদের নিত্যকার ব্যাপার। আমি কিছু সাহায্য করতে পারি তোমায়, তা যদি হয় বলে ফেল না।

—তোমার নিজেরই দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কি হবে আমাদের কথা শুনে।

—তা হলে বুঝি রজতের দোকান নিয়ে কিছু ব্যাপার? অত কুণ্ঠা কেন তোমার?

কাজেই বলিলাম সব কথা। টাকার আবেদনও জানাইলাম। জামাইবাবু বলিল,—এর জন্যে এত লজ্জা? আমি জানি রজতের দোকান বেশ ভাল চলছে। তা পাঁচ হাজার কেন, দশ হাজার নাও, অন্য কোথাও আর হাত পাততে হবে না। আমি উকিল পাঠিয়ে দেব। কাল সব ঠিক হয়ে যাবে। রজতকে বলে রেখ।

আমি 'ধন্যবাদ' মুখেও আনিতে পারিলাম না। জামাই-বাবুর উদারতায় মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

শীতের আমেজ পড়িয়াছে। অনেক দিন আভাকে দেখি নাই। যাইব তাহাকে দেখিতে। গাড়ী চাহিয়া আনিয়াছি স্বামীর দোকানের।

বোধ হয় এলগিন রোডের মোড়। ট্রাফিক পুলিশের হাত তোলায় মোটর থামাইতে হইয়াছে। দেখিলাম, একটা লোক এমনভাবে থামানো গাড়ীগুলির সুযোগ পাইয়া সব জানালায় আসিয়া হাত পাতে। ট্রাফিক পুলিশের হাত নামিল, আমার গাড়ী যেমন ষ্টার্ট লইবে, লোকটা আসিল জানালার কাছে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই গাড়ী আগাইয়া গেল। কি দেখিলাম—আমার বুকটা ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তবু মনকে প্রবোধ দেই ভুল দেখিয়াছি নিশ্চয়, নহিলে সে হইতে পারে না কখনও।

কিছুটা অগ্রসর হইলে ড্রাইভারকে বলিলাম গাড়ী ফিরাও। গাড়ী ঘুরাইয়া ফিরিয়া চলা হইল। আবার এলগিন রোডের মোড়। লোকটি সেখানেই রহিয়াছে। আলো-আঁধারের মায়া। রাস্তার আলোগুলো মিটমিট করে। পুলিশের নিয়ন্ত্রণে গাড়ী আবার থামাইতে হইল। হ্যাঁ, সত্যই অতনু—আমার ভুল হয় নাই, দোকানের আলো-গুলোর জেল্লায় বুঝিলাম অতনুই। কিন্তু অদ্ভুত এক অতনু। ইহা সম্ভব কখনও বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। তার ঢেউখেলান চুলগুলি যেন কাকের বাসা। বড় বড় চোখ দুইটা একেবারে রক্তজবা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হরিদ্রা রঙের দাঁতগুলোর ভিতর দুইটা বোধ হয় অন্তর্হিত। ফরসা রং যেন কালিতে লেপা। একটা কানের ডগায় রক্ত জমিয়া কালো ড্যালা পাকাইয়া আছে। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা—কোট, তাতেও কাদামাখা। পরণের ধুতিখানি একেবারে বিবর্ণ। তাতেও স্থানে স্থানে রক্ত আর কাদার দাগ।

কি করিব স্থির করিতে পারি না। গাড়ী থামানোই রহিল। বেশী দেরী করিতে হইল না।

'একটি পয়সা দেবে!'—আমাদের চক্ষু মিলিল। এক মুহূর্ত, তার পরই সে হাসিয়া উঠিল—'ধরা পড়ে গেলাম হাতে নাতে। সত্যি মেজদি দুটো পয়সা, এক কাপ চা......'

মোটরের দরজা খুলিয়া বলিলাম—উঠে এস।

গাড়ী চলিল গন্তব্য পথে। কিছুদূর চলিলে পর সে জিজ্ঞাসা করিল,—'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায়?'

—আমি আভাকে দেখতে যাচ্ছি।

—না, না, মেজদি আমায় নামিয়ে দাও।

আমি সে কথায় কান দিলাম না। সে যেন মনে মনেই কি ভাবিয়া হাসিল—ক্ষীণ দুর্বল হাসি। —"এ একরকম মন্দ হবে না। আমি বড়াই করে আভাকে অনেক কিছু বলেছিলাম। এখন আমায় দেখে সে বেশ গম্ভীর মুখে বলতে পারবে—'কেমন যা বলেছিলাম, ঠিক হ'ল তো!' বেশ সে-ই ভাল।"

সেই পুরাতন বাড়ী, সেই পুরাতন কক্ষ। সিঁড়ি বাহিয়া চলিলাম, অতনু বলিল—'এ সময়েও বাড়ী বসে আছে সে, আর সে পুরাতন বাড়ী ছাড়ে নি।'

কক্ষের দোর ফাঁক করিয়া ঢুকিলাম। পিছনে অতনু।

বিছানা হইতে আভা বলিল—কে?

—আমি আর সঙ্গে আছে একজন।

—সঙ্গে কে তোমার?

—অতনু।

লম্বা একটা ভীষণ নিস্তব্ধতা। —মেজদি, একটা জানালা খোল তো।

এক বছর পরে জানালা খুলিয়া বাহিরের বাতাস প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল।

বেশ স্বাভাবিক সুরে আভা বলিল,—"অতনুবাবু, ঠিক দেখতে পাচ্ছি আপনাকে চিরসুন্দর মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে ওখানে, খুশীতে আপনার মন ভরপুর।"

'অতনু এক পা বাড়াইল আভার দিকে, কিন্তু আভার কথার তোড় তাহাকে প্রস্তর মূর্তিতে পরিণত করিল।

রুক্ষ চুল, ফ্যাকাসে মুখ আর রক্তহীন ওষ্ঠ—আভাকে যেন এক অশরীরী আবেষ্টনে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। বালিশের উপর বালিশ দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় মাথা তুলিয়া আভা বলিতে লাগিল শ্লেষের সুরে,—"অতনু, ইউ স্কাউণ্ড্রেল, মোহনমূর্তি উদ্ধত শয়তানের অবতার, দেখ এখন আমায় বিয়ে না করতে পেরে কি বিপদ এড়িয়েছ! খুশী নও যে আমি তখন রাজি হই নি। সারা-জীবন তো তা হলে এ-অকেজো অন্ধটার ভার বইতে হ'ত। এদিকে এস তো তুমি—আমি একবার দেখি।

যন্ত্র চালিতের মত অতনু গেল শয্যাপার্শ্বে। 'বস এখানে, আমার পাশে' বলিয়া আভা হাত বাড়াইয়া অতনুকে টানিয়া বসাইয়া দিল। তাহার আঙ্গুল স্পর্শ করিল অতনুর বোতামহীন কোটের যেস্থানে সেফ্‌টিপিন আঁটা। তখনই বুঝিলাম সেকালের সেই সত্যকার আভা মরে নাই। আভা হাত বুলাইয়া অতনুর বর্তমান হালচাল বেশ মালুম করিয়া লইল। কিন্তু তার মুখের অভিব্যক্তি বদলাইল না, কণ্ঠস্বর বিকৃত হইল না। ছেঁড়া জামা, কাদা মাখা ধুতি, বিবর্ণ আকৃতি কিছুই বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। তবু আভা অবিচল।

আমি একটা অজুহাতে মায়ের কাছে গেলাম। নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিতেছিলাম না, কেন এই অঘটন ঘটাইলাম অতনুকে আনিয়া।

—আভা, কি ব্যাপার? হয়েছে কি তোমার?

—আমি দেখতে পাই নে।

—অসুস্থও খুব দেখতে পাচ্ছি।

—তেমন আর কিছু নয়।

—তবে শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছ কেন?

—সেফ্‌টিফিন আঁটা বোতামহীন কোটে সং সেজে বেড়াচ্ছ কেন তুমি অতনু?

—ভাল লাগে, আরাম লাগে। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নই করলে, সেই পুরানো 'ট্রিক্' ছাড় নি দেখ্‌ছি।

—খোষামোদ করছো আমায় 'ট্রিক' ঘাড়ে চাপিয়ে? আমার ট্রিক নেই কিছু। বিছনায় থাক্‌তে আমারও ভাল লাগে, আরাম লাগে।

—তার মানে বিছনা আঁকড়ে থেকে তিলে তিলে মরবার একটা অজুহাত মিলেছে। এভাবে আত্মহত্যা করছো কেন?

—আমার তো তবু একটা অজুহাত। কিন্তু তোমার কি? এ হালচালের অজুহাত কি শুনি?

—রিডাক্‌শন্, বাজার মন্দা, এ সবের ধার ধার না, জান্‌বে কি ক'রে?

—সব চাকুরে যে তোমার মত সখের পায়চারির ব্যবসায় ঢুকেছে তা অবশ্য শুনিনি।

—অন্তত চার ভাগের এক ভাগ।

—সে বিশিষ্ট এক ভাগ কি তোমার এতই প্রিয়?

—এবারে সত্যি করে বুঝলাম, কেন আমায় বিয়ে কর নি। বিয়ে করবার মত সাহসই তোমার নেই।

—কাণ্ডজ্ঞান আমার যথেষ্ট, বুদ্ধিও কম নয়।

—না, তোমার নেই। তা যদি থাক্‌তো, তবে বিছনায় পড়ে পড়ে মরবার পথ খোলসা করতে না।

শ্লেষ, তিক্ততা সকলই পরিহার করিয়াছে আভার কণ্ঠস্বরকে। নিষ্করুণ অর্ধস্ফুট সুরে বলিল—আর কি করবার ছিল, অতনু?

অতনুর মুখেও উচ্চারিত হইল—"হা ভগবান! জীবনে এমন বোকার মত প্রশ্ন শুনিনি, যতদিন বেঁচে থাক্‌বো......

আর অতনুর কণ্ঠে কিছু জুয়াইল না—মূক সে আকুতি তরল তপ্ত আগুনের আকারে তাহার গণ্ড বাহিয়া বক্ষ প্লাবিত করিল।

আভা বলিয়া চলিল—অতনু, আমার পাশে বসে আমায় বোকা বল্‌ছো, সাহস বটে। শক্তি আর মস্তিষ্ক তোমার যা আছে তার সদ্ব্যবহার করবে না, অপরকে দিবে দোষ। কাওয়ার্ড!

—আমায় বল কাওয়ার্ড!

—আমায় বল আহাম্মোক! যাক, তবে তো কাটাকাটি গেল। কেবল রইল—"একটা পয়সা দেবে!" "এক কাপ চা!"

এইবার আসিল—আসিল অন্তরের অন্তস্তল হইতে চীৎকার—আভা, আভা! কি আমরা করবো বল, বল! প্রাণ আমার কণ্ঠগত, বল, নইলে আর বল্‌বার শ্রোতা পাবে না এ জন্মের মত।

আভার হাত অতনুর হাতে আবদ্ধ হইল। —জানি না কি আমাদের করা উচিত, তবে এ বিছনায় আর থাক্‌বো না, মেজদি, মেজদি—

সেদিন অর্থাৎ রাত্রি হইতে সুরু হইল আভার দ্বিতীয় শৈশবের হাঁটি-হাঁটি-পা-পা শিক্ষা। সে রাত্রির আধ ঘণ্টার কসরতেই আভা হাঁপাইয়া উঠিল। তবে পা দুটি কাঁপিলেও আমাদের দুজনের সাহায্যে কিছুটা চলিতে পারিল। বিদায় কালে আভা বলিল,—মেজদি, অতনুবাবু পণ করেছে অন্ধ-আতুর সেবা। গত দুই মাসেও নাকি মদের নেশা কেটে গিয়েছে ভিখারীর পেশা নেবার আগ্রহে।

আমি বলিলাম—এবার তাহলে অতনুকে আতুর সেবার মাইনেটা আগাম দিয়ে দাও।

অতনু বলিল—চললাম। কিন্তু আবার যদি কাল এসে দেখি বিছনায়, তা হলে এ বাড়ীর সব বিছনা জড়ো করে 'বন্‌ফায়ার' করবো।

রোজ যাই আভার ওখানে। আভা এখন বিনা সাহায্যে বাড়ীখানির ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়—কোন বেগ পায় না। কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছি। বড়দির কাছেও যাইতে হইয়াছে, গাড়ী পাঠাইয়াছিল। খোকার অবস্থা দিন দিনই খারাপ হইতেছে। শেষ যেদিন গেলাম, বাড়ীতে ধাই, ডাক্তারের ছড়াছড়ি—বড়দির ফুটফুটে একটি ছেলে হইয়াছে। কিন্তু নিদারুণ সংবাদ তার তিন দিন বাদে—বড় খোকা তার যাতনার সীমায় পৌঁছিয়াছে চির দিনের জন্য। সেদিন যে ফিট হয়, তাহাতেই তার সব শেষ হইয়া গিয়াছে। বড়দির কাছে আর যাইতে সাহস নাই। জামাইবাবু আসিয়া জানাইয়া গিয়াছে বড়দি আর শিশুটি ভালই আছে।

সেদিন বিকালে গেলাম আভার ওখানে। বেয়ারা বলিল হুকুম নেই ডাকিবার। মাকে ডাকিলাম—সাড়া পাইয়া অতনু ছুটিয়া আসিল পশ্চাতে আভা—'আশিস্ দাও মেজদি!'

আভাও বলিল—হিন্দু মিশনে নিরালায় তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

অতনু আগাইয়া আসিয়া বলিল—কিছু মনে ক'র না মেজদি, বেয়ারাটার কথায়। আমরা নতুন বই একটা সুরু করেছি, আভা বলে আমি লিখে যাই। তাই 'ডিস্টার্ব' না হয় এজন্য হুকুম।

আভা বলিল—তুমি রোজ আস্‌বে মেজদি। তোমারও সাহায্য চাই। "একটা পয়সা দেবে—এক কাপ চা"—এ জিনিষটা তুমি যেমন করে বল্‌তে পারবে, আমি পারবো না। আমার বইয়ের প্লট এবার ভিখারীর পেশা।

ধর্ম্মরাজ পূজা ও শুদ্ধি

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

ধর্ম্মরাজ পূজা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই রূপান্তর হইলেও ইহার সঙ্গে অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানেরও কিছু যোগাযোগ রহিয়াছে। আজকাল 'শুদ্ধি' আন্দোলনে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে, অনেকেই ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতেছেন। কেহ কেহ ইহাকে একটা আধুনিক আন্দোলন মনে করিয়া শুদ্ধির নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। কিন্তু ইঁহারা জানেন না যে, 'শুদ্ধি' আজকালকার হুজুগ নহে, অতি প্রাচীন বৈদিক যুগেও এই 'শুদ্ধি' প্রচলিত ছিল। ইহা একটি অতি পবিত্র শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান এবং 'শিবের গাজনে' ও 'ধর্ম্মরাজ পূজায়' ইহারই শেষ চিহ্ন আজিও সারা বাঙলা জুড়িয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের এই অনুমানের কারণ বলিতেছি।

গত সন ১৩২৮ সালের তৃতীয় সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের 'মহাদেব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের একস্থানে 'ব্রাত' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছিলেন—'ব্রাত বলিতে দল বুঝায়। যে দলের কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহাকেই ব্রাত বলে। এই ব্রাতভুক্ত জাতিকে ব্রাত্য বলিত। ইহারা একপ্রকার যাযাবর ছিল। দুই চারি দিনের জন্য ইহারা যেখানে থাকিত, তহাকে ব্রাত্যা বলিত।'

সেকালে ঋষি ও মুনিদের একটা গোত্রেরই নাম ছিল যাযাবর। জরৎকারু এই যাযাবর গোত্রভুক্ত ছিলেন। শাস্ত্রী মহোদয় লিখিয়াছিলেন—"পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বলে ব্রাত্যেরাও ঋষিদের মত দৈবপ্রজা, অর্থাৎ দেবতাদের উপাসক। তবে তাহাদের দেবতারা স্বর্গে গিয়াছিলেন, উহারা দেবতাদের খুঁজিয়া পাইত না। মরুৎ দেবতারা তাহাদিগকে কতকগুলি সামগান শিখাইয়া দিয়াছিল, সেই গান করিলে তাহারা দেবতাদের খুঁজিয়া পাইত। সেই গানগুলির নাম ব্রাত্যস্তোম্। যে যজ্ঞে ব্রাত্যস্তোম্ হয় তাহার নামও ব্রাত্যস্তোম্। অন্য অন্য যজ্ঞে ঋত্বিক ছাড়া একজন মাত্র যজমান থাকে, দুজন যজমানের কথা বড় দেখা যায় না। কিন্তু ব্রাত্যস্তোমে যজমান হাজার হাজার হইতে পারে। আর সকলেই ব্রাত্যস্তোম্ করিয়া পবিত্র হইয়া যাইত ও ঋষিদের সঙ্গে সমান হইয়া যাইত। ব্রাত্যস্তোমের পর ঋষিরা ব্রাত্যদের সঙ্গে একত্রে খাইতেন, তাহাদের হাতের রান্না খাইতেন, তাহাদিগকে বেদ পড়িতে দিতেন, তিন বেদই পড়িতে দিতেন, তাহাদিগকে ঋত্বিক দিতেন, মোটামুটি তাহাদিগকে আপনার সমান করিয়া লইতেন।"

ইহা যে 'শুদ্ধি', সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। বৎসরের শেষে বোধহয় এই শুদ্ধিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। চৈত্র মাসে শিবের গাজনে এই শুদ্ধিরই শেষ চিহ্ন দেখিতে পাই। শিবের গাজনে যজমানের কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই। সকলেই ভক্ত হইতে পারে। সংযম করিয়া 'উত্তরী' গলায় লইয়া সকল জাতির লোকেই ভক্ত হইতে পারে। 'উত্তরী' যজ্ঞোপবীতেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। শুদ্ধির জন্য যজ্ঞই ছিল প্রধান অনুষ্ঠান। আজিও চৈত্র সংক্রান্তিতে হোমই প্রধান অনুষ্ঠান, এই দিনটির নামই হোমের দিন। সাধারণ লোকে বলে 'হোম' পরব বা হোম-পর্ব্ব। হোম প্রায় হিন্দুর প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই করণীয়, কিন্তু এই দিনটির বিশেষ করিয়া 'হোম' নাম হইবার কারণ কি? ব্রাত্যদের দেবতা স্বর্গে গিয়াছিলেন, তাহারা দেবতা হারাইয়াছিল, তাই ব্রাত্য অর্থে 'পতিত' কথাটি চলিত হইয়া গিয়াছে। ব্রাত্যদের এই যজ্ঞের সঙ্গে শিবের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। কারণ, ব্রাত্যদের দেবতাই ছিলেন শিব। শাস্ত্রী মহোদয় লিখিয়াছিলেন—"অথর্ব্ব বেদে উল্লিখিত আছে—ব্রাত্যেরা প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিলেন, আপনি আপনার ভিতর লক্ষ্য করিয়া দেখুন। প্রজাপতি দেখিলেন আলো, একটা সুবর্ণ রহিয়াছে। সে আলো তিনি জন্মাইয়া দিলেন, অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সে এক হইল, শ্রেঠ হইল, মহৎ হইল, ব্রহ্ম হইল। সে তপ হইল, সে সত্য হইল, সে বাড়িতে লাগিল, সে দেবগণের কর্তৃত্ব পাইল, সে ঈশান হইল, সে এক-ব্রাত্য হইল, অর্থাৎ ব্রাত্যগণের দেবতা হইল, ব্রাত্যগণ যেন এক হইয়া দেবতারূপে আবির্ভূত হইল। × × × ইনি পূর্ব্বদিকে চলিলেন, কতকগুলি সাম, কতকগুলি দেবতা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শ্রদ্ধা তাঁহার প্রিয়তমা মাগধ তাঁহার পরামর্শদাতা হইল। বিজ্ঞান তাঁহার কাপড় হইল, দিন তাঁহার উষ্ণীষ হইল, রাত্রি কেশ হইল, ইত্যাদি ইত্যাদি। × × × তাহার পর উদ্ধর্ব দিকে চাহিয়া এক বৎসর দাঁড়াইয়া রহিলেন, এইরূপে দেখা গেল, তাঁহার পাঁচ মাথা হইল। × × × দেবতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাত্য তুমি দাঁড়াইয়া আছ কেন? তিনি বলিলেন, আমার আসন্দী (চার পাই) দাও, দেবতাগণ দিলেন। চারিটি সাম উহার দুইটি বাজু ও দুইটি আড়ানি হইল, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত, চারিটি পায়া হইল, ঋকগুলি লম্বা দাঁড় হইল, যজুগুলি ছোট দাঁড় হইল। বেদগুলি বিছানার চাদর হইল, মন্ত্রগুলি বালিশ হইল, সাম বেদ বসিবার স্থান হইল, উদ্গীথ ঠেসান দিবার তাকিয়া হইল। দেবতারা তাঁহার অনুচর হইলেন ও তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। এক-ব্রাত্য মহাদেব স্তুত মমর গণৈঃ হইলেন, যে বেদ বিশ্বের আদ্য বিশ্বের বীজ, তিনি তাহাতে চাপিয়া বসিলেন।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে শতপথ ব্রাহ্মণে যে রুদ্র সর্ব্ব প্রভৃতি নাম আছে, তাহা কুমারেরই নাম, এই কুমারই অগ্নি। শিবের অষ্টমূর্ত্তির কথা এবং কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্মের সঙ্গে অগ্নির সম্বন্ধের কথা সকলেই অবগত আছেন। এই কুমার শিবের পুত্র। ইহা হইতেও অগ্নির সঙ্গে শিবের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ব্রাত্যস্তোমের জন্যই হোক, আর এই অগ্নির সঙ্গে সম্বন্ধের জন্যই হোক—হোম বৎসর শেষের চৈত্রের গাজনে বা শিবের গাজনের একটি প্রধান অঙ্গ, বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। অন্যথায় চৈত্রের গাজন 'হোম-পর্ব্ব' নামে পরিচিত হইত না। বৈদিক ঋষিরা রুদ্রের ভয়ে সর্ব্বদা অস্থির হইয়া থাকিতেন। সর্ব্বদাই রুদ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেন, আমাদের মেরো না, আমাদের ছেলে মেরো না, গরু মেরো না, বাছুর মেরো না, পশু মেরো না ইত্যাদি।

বৈদিক হোমের শেষে 'দর্ভজুটিকা' হোমের বিধি আছে। তাহার মন্ত্রটি এইরূপ—

"যঃ পশূনামধিপতি রুদ্রস্তন্তি চরোবৃষা
পশূনস্মাকং মাহিংসীরেতদস্তু হুতং তব স্বাহা।"

আমাদের মনে হয়, এই যে ব্রাত্যস্তোমে দেবতার অনুসন্ধান, ইহা পতিতোদ্ধারেরই অনুষ্ঠান, ইহাই শুদ্ধিযজ্ঞ। একদিন ভারতবর্ষকে বিশেষ বাঙালীকে এই শুদ্ধিযজ্ঞই বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। তন্ত্র যে এত উদার, তন্ত্রে যে সর্ব্ব বর্ণের সমানাধিকার, তাহার কারণ তন্ত্রে শিবেরই প্রাধান্য। তন্ত্রেও শুদ্ধির বিশেষ বিধি আছে।

দেবতা না মানিলে হিন্দু হওয়া যায় না। যাহাদেরই দেবতা হারাইয়াছে, তাহারাই শুদ্ধিযজ্ঞে দেবতাকে খুঁজিয়া পাইতে পারে, হিন্দু হইত পারে। শিবের গাজনের যজমানদের ভক্ত বলে। ভক্ত কথাটি লক্ষণীয়। হিন্দুদের মধ্যে যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত এই তিন শ্রেণীর সাধক দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান এই তিনের উপাসনা ভেদে জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত আখ্যা হয়। সুতরাং ভক্ত শব্দের সঙ্গে দেবতার অনুসন্ধান, উপাসনার সম্বন্ধ রহিয়াছে।

আমরা বলিতে চাই যে, ধর্ম্মরাজ পূজার সঙ্গেও এই শুদ্ধির একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজ পূজাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের রূপান্তর বলিব, না বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিগণের হিন্দু ধর্ম্মে ফিরিয়া আসার শুদ্ধি অনুষ্ঠান বলিব? ধর্ম্মরাজ পূজার সঙ্গে নারায়ণ শিলা পূজার অনুকরণ চিহ্ন জড়িত রহিয়াছে। শিবের গাজনের সুস্পষ্ট ছাপতো ইহার সর্ব্বাঙ্গে। ভক্ত হইবার জন্য সংযম, 'উত্তরী' গ্রহণ, পূজায় সর্ব্ব বর্ণের সমানাধিকার প্রভৃতি শিবের গাজনের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। উত্তরী গ্রহণ শুদ্ধিরই অনুষ্ঠান। হোম, হোমের অগ্নিস্পর্শ, হোম শেষ তিলক গ্রহণ ইত্যাদিও শুদ্ধির অঙ্গ বলিয়া মনে হয়।

যাঁহারা সমাজ সংস্কারক, যাঁহারা হরিজন আন্দোলন করিতেছেন, হরিজনদের মন্দির প্রবেশাধিকারের কথা চিন্তা করেন, তাঁহারা পল্লীগ্রামে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, আমরা মন্দির প্রবেশ ও মন্দিরের দেবতাকে স্পর্শ ও পূজার অধিকার তাহাদিগকে বহুদিন—প্রায় চারি পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বেই দিয়াছি। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাঁহারা পছন্দ করেন না, শ্রীমন মহাপ্রভু যাঁহাদের চক্ষুশূল, তাঁহারা ধর্ম্মরাজ পূজা ও শিবের গাজনের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। অস্পৃশ্যতা পরিহারের জন্য তাঁহাদিগকে নূতন মন্ত্র রচনা করিতে হইবে না, নূতন অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিতে হইবে না। ঢাকের বাদ্য, বলির পশু, রুধিরাক্ত খড়্গ প্রভৃতি অনেক কিছুই তাঁহারা আপনা হইতেই পাইবেন। নূতন কোন জিনিসকে পল্লীগ্রামের লোক সন্দেহের চক্ষে দেখে। সুতরাং পুরাতনেরই নূতন ব্যাখ্যা ও নূতন রূপ দিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং একবার পল্লীগ্রামের প্রতি, তাহার অতীতের প্রতি, তাহার আচার-অনুষ্ঠান, পূজা, পার্ব্বণ ও উৎসবাদির প্রতি দৃষ্টি ফিরাইতে অনুরোধ করি।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জন্মভূমিতে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অক্ষয়ের সহিত সুধীরের দেখা হইয়া গেল।

অক্ষয় আগাইয়া আসিয়া বলিল, ব্যাপার কি হে? অনেক দিন যে আর দেশের দিকে আসা হয় না, এ বেচারা এমন কি দোষ করেছে! তারপর পরশু তোমার কাকার চিঠি পেয়েই রওনা হয়েছ বুঝি।

সুধীর বলিল, না কাকার চিঠি আমি পাইনি, পাবার কথাও নয়। কলকাতা থেকে বেরিয়ে ছিলুম অনেকদিন আগেই। দেশেই আসিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু হঠাৎ কেন জানি না মতটা একটু বাদলে গেল। তাই কদিন একটু বেড়িয়ে এলুম অন্যদিকে, যাক্, এখানকার সব খবরই ভালত'!

অক্ষয় বলিল, হ্যাঁ, ভালই এক রকম তবে তোমার কাকার শরীর তেমন ভাল নয়, বয়স ত হয়েছে কম নয় এবার হয়ত হঠাৎ একদিন চোখ বুজবেন। তারপর অকস্মাৎ গলার স্বর অত্যন্ত নামাইয়া সে বলিল, আচ্ছা বৌকে হঠাৎ হারিয়ে ফেললে কি করে? এখানকার বুড়োরা কিন্তু অন্য কথা বলে; কিন্তু থাক সে সব শুনে তোমার কাজ নেই। কাকা বলেন, ওখানে বিয়ে করতে আগেই বারণ করেছিলুম কিন্তু তা না শোনাতেই এই ফল। ছেলেপেলেই যারা ধরে-বেঁধে বিয়ে দেয় তারা কি ভাল হতে পারে কখন-ও? আরও অনেক কথাই তাঁরা বলেন। কিন্তু কি হয়েছিল বলত?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুধীর বলিল, কাকার মত ছিল না এ বিয়েতে। তিনি চেয়েছিলেন বনেদি জমিদার বংশের মেয়ে যাঁরা হবে আমাদেরই সমান ঘর। কিন্তু সে মেয়েটিকে দেখে আমার ভারী পছন্দ হয়েছিল তাই কাকার অমতেই তাকে বিয়ে করি। দেশে আসব ভেবেছিলুম কিন্তু মনে হল কাকা যদি রেগে যান? যদি তিনি ওর সামনেই ওর এবং ওর পিতৃপুরুষের নিন্দা সুরু করেন? তাই দেশে না এসে পশ্চিমের দিকে রওনা হয়ে যাই, তারপর একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে কি খেয়াল হওয়ায় সেখানেই নেমে পড়ি—তারপর কি ঘটেছিল তা' ত' চিঠিতেই জানিয়েছি।

অক্ষয়ের মুখেও বিষাদের ছায়া পড়িল আস্তে আস্তে সে বলিল, এবার কি করবে ভেবেছ? যে গেছে তাকে পাবার আর ত' কোন উপায়ই নেই। তোমার সম্বন্ধে এতটুকু সংবাদও তাকে দাওনি বলেই আজ এ শাস্তি তোমার। কিন্তু সে যাক্, তার কথা ভেবেও আর লাভ নেই।

সুধীর বলিল, না ভেবেই বা করি কি! সে নিরাপদে আছে না মহাবিপদের মধ্যে পড়েছে তাও ত' জানতে পারলুম না। নিরাপদে আছে একথাটাও যদি জানতে পারতুম! তারও কোন উপায় নেই আমারও রইল না।

অক্ষয় বলিল, তার জীবন ত' নষ্ট হয়েছেই কিন্তু তোমারটা হয়ত এখন রক্ষা করা যায়। আমার মনে হয় আবার তোমার সংসারী হওয়া উচিত। তুমি আমায় ভুল বুঝ না বন্ধু কিন্তু তোমার জীবন ব্যর্থ করার মানে যে কি তা একবার ভেবে দেখেছ কি! তোমার কোন ভাইই নেই তোমার কাকারও কোন সন্তান নেই—তুমিও যদি সংসারী না হও তবে এ বংশের আর কি বাকী থাকবে?

ম্লান হাসি হাসিয়া সুধীর বলিল, বাকী যে কিছু থাকতেই হবে এরই বা এমন কি মানে আছে।

বিস্মিত হইয়া অক্ষয় বলিল, মানে নেই? পিতৃপুরুষের যে আকাঙ্ক্ষা পুরুষানুক্রমে বয়ে এসে তোমার মধ্যে সংক্রামিত হয়ে আছে তাকে আজ তুমি বুঝতে না পারলেও ভবিষ্যতে যখন বুঝতে পারবে তখন যে আর কোন পথই খোলা থাকবে না তোমার জন্যে। তাই ত' বলি সময় যে সুযোগ তোমার কাছে এনে দিয়েছে তাকে অবহেলা করো না। সুযোগ জীবনে আসে কিন্তু তাকে যে ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারে সেই ত' সত্যিকার বুদ্ধিমান।

'বুদ্ধিমান না হয় আমি নাই হলুম।' সুধীর বলিল।

অক্ষয় এতটুকু না দমিয়া বলিয়া চলিল, তোমাকে বুদ্ধিমান বলতে আর চাইও না আমি। দেশে না এসে নব বিবাহিতা বধূকে নিয়ে যে প্রথমেই সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় যায় তাকে বুদ্ধিমান মনে করবার ইচ্ছা আর আমার নেই, তাই আজ বন্ধু হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছি তোমায়।

সুধীর কোন উত্তর দিতে পারিল না, সম্মুখের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কাকা তাহাকে এতটুকু তীরস্কার না করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহার অলক্ষ্যে অক্ষয়কে কি ইঙ্গিত করিলেন—সেও তাহার অজ্ঞাতসারে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

তিনি বলিলেন, যা হবার তা হয়েছে সুধীর আর দেশের বাইরে তোমার যাওয়া হবে না।

সুধীর কোন কথা না বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া মুখ লুকাইয়া বাঁচিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর সে তাহারই বহু দিনকার ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওই যে কোণে ধুলা জমিয়াছে, ওই যে তাকের উপর উইয়ে বাসা বাঁধিয়াছে এবং ঘরের চতুর্দ্দিকে এই যে পাতা এবং ছেঁড়া কাগজ আসিয়া জুটিয়াছে উহারা সকলেই একসঙ্গে জোট পাকাইয়া যেন তাহাকে আক্রমণ করিল। আজ তাহাকে ঘিরিয়াই দুইটি সেবা-পরায়ণ হাত দুইটি সুন্দর মমতাপূর্ণ চক্ষু নিরন্তর কত ব্যস্তই না হইয়া থাকিত। কাপড়ে কোথায় ধুলো লাগিয়াছে চুলের কোথায় একটু ব্যতিক্রম হইয়াছে তাহাও আজ সেই অনুসন্ধিৎসু চক্ষুর নিকট হইতে লুকাইয়া রাখা সম্ভব হইত না। কিন্তু কেমন করিয়া যে সমস্ত সম্ভাবনা অসম্ভব হইয়া গেল তাহা সে ভাবিয়াও পাইল না। যাহাকে পাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না তাহাকে পাইয়া হরাইয়াছে বলিয়াই না তাহার এত দুঃখ। তাহাকে কোন দিনও যদি সে না দেখিত তাহা হইলে অন্য যাহাকে হউক লইয়াও সে সুখী হইতে পারিত হয়ত কিন্তু এখন আর তাহা সম্ভব হয় না। যাহাকে সে দেখিয়াছে যাহা সে পাইয়াছিল তাহাকে হারাইলেও আর কোন কিছু লইয়াও তাহার চলিবে না। বসিয়া বসিয়া সময় আর তাহার কাটিতে চাহে না। ধূলিপূর্ণ টেবিলের উপরই মাথা রাখিয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

বিকালে অক্ষয় আসিয়া বলিল, চল বেরিয়ে আসি খানিক

নৌকো করে। যে খালটা দিয়ে আমরা অনেকদিন গিয়েছি সেটা হয়ত আজও আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

সুধীর খুসী মনেই রাজী হইল। সেই তাহাদের পুরাতন দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। স্মৃতির কোঠায় যাহা যাহা আসিয়া পড়িয়াছে তাহাদের কাহারও দাম কম নহে।

তাহারা দুইজনে নৌকায় উঠিয়া পড়িল। অক্ষয় দাঁড় টানিতে লাগিল, সুধীর চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া হয়ত পুরানো কথাই ভাবিতেছিল।

নিকটেই খালের পাড়ে একটি যুবতীকে দেখিতে পাইয়া অক্ষয় বলিল, ওকে চিনতে পার সুধীর খুব ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি লজ্জা পাবার কিছু নেই। চেয়ে দেখ, ও কিন্তু তোমায় চিনতে পেরেছে। পালিয়ে যাবার কথাও ভুলে গেছে এতটুকু লজ্জাও হয়ত আর ওর নেই। চিনিতে পারলে।

সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া সুধীর বলিল, হ্যাঁ চিনেছি—ও পারুল না!

অক্ষয় বলিল, হ্যাঁ তাই, ও পারুলই। কিন্তু তোমার একটু দেরী হয়েছে ওর কিন্তু একটুও দেরী হয়নি। ওর কথা মনে পড়ে বোধ হয়।

সুধীর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। একটা গভীর নিশ্বাস তাহার বুক চিরিয়া বাহির হইয়া গেল। এ সেই পারুল যাহার কথা সে ভুলিবে না বলিয়াই ভাবিত। কিন্তু কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে উহার। নৌকা আগাইয়া গেল, মুখ ফিরাইয়া সে আর একবার সেই মেয়েটির দিকে চাহিল—সে তখনও তাহাদের দিকেই চাহিয়াছিল। আজ কম হইলেও আঠার বৎসর বয়স হইবে তাহার কিন্তু ওই বয়সই তাহার চিরকাল ছিল না। বছর পাঁচ আগেকার কথা স্পষ্টই মনে পড়ে। যেদিন তাহার কলিকাতায় পড়িতে আসিবার কথা সেদিনই খুব ভোরে দেখা হইয়াছিল উহার সঙ্গে। নূতন কলেজে পড়িতে যাইতেছে। সে মনের আনন্দে তাহাকে প্রজাপতির মত হালকা করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ওই মেয়েটির চোখে মুখে যে বিষাদ ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা তখন চোখে পড়িলেও মনের মধ্যে তেমন করিয়া দাগ কাটিতে পারে নাই। আর আজ চোখে না পড়িলেও মনের মধ্যে গভীর হইয়া তাহা কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছিল। সমস্ত কথার মধ্যে সেদিন সে কেবলই বলিতেছিল, 'এখানকার সব কিছুই বোধ হয় তুমি ভুলে যাবে সুধীরদা! সমস্ত, এর একটা কণাও তোমার মনে থাকবে না ত! সে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল কিন্তু কি বলিয়াছিল আজ আর তাহা মনে পড়ে না, হয়ত' শত চেষ্টায়ও পড়িবে না।—তারপর যাইবার সময় মাটির উপর আঙ্গুলে দিয়া তাহার নাম লিখিয়া সে বলিয়া গিয়াছিল, হয়ত' তোমার যাবার সময় আমি আসতে পারব না সুধীরদা, কিন্তু সে সময় ঠিক যাবার আগে আমার এই নামটা তুমি মুছে দিয়ে যেও। হয়ত' কোন কিছু ভাবিয়াই সে ওকথা বলে নাই, হয়ত' উহা তাহার বালিকা বয়সের একটা খেয়াল কিন্তু সে খেয়াল সে পূর্ণ করিয়াছিল—তাহার হাত দিয়াই সে সযত্নে তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই হাতের দিকে সে চাহিয়া দেখিল। তারপর প্রতি ছুটিতে দেখা হইয়াছে উহার সঙ্গে—পরস্পরের গা ছুঁইয়া কত প্রতিজ্ঞাই না করিয়াছে উভয়ে কিন্তু সমস্তই ত মিথ্যা হইয়া গেল, কোন কিছুই ত' আজ আর বাঁচিয়া নাই। একটা গভীর নিশ্বাস তাহাকে সচকিত করিয়া দিয়া গেল। সে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। বহুদূরে, প্রায় দেখা যায় না, একটি মেয়ে তখনও স্থির হইয়া এই দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুধীর মুখ ফিরাইয়া আবার আকাশের দিকে চাহিল।

অক্ষয় বলিল, ওই সেই পারুল কিন্তু আজ ও বিধবা।

সুধীর চমকাইয়া উঠিল, বিধবা! সমস্ত মুখ তাহার বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া গেল, বুকের মধ্যে কে যেন অনবরত খোঁচা দিতে লাগিল। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে স্থির হইয়া রহিল।

অক্ষয় বলিয়া চলিল, তোমার বিয়ের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মাও ব্যস্ত হয়ে ওঠে। একা মানুষ কিই বা ক'রতে পারে! তারপর জুটল এক বৃদ্ধ, অবশ্য তার ছোট ছেলের সঙ্গেও বিয়ে দেওয়া চলত' কিন্তু সেও তখন দু' ছেলের বাপ তাই বিয়ে ক'রতে হ'ল সেই বৃদ্ধকেই। কিন্তু লাভ হল যে তার মাসখানেকও কাটতে পায়নি—তারপর পারুল যাকে তুমি একদিন ভরসা দিয়েছিলে সে ফিরে এল নূতন এক সাজে।

সুধীর চীৎকার করিয়া উঠিল, থাম অক্ষয় দয়া কর। আর ওসব শুনিয়ো না আমায়। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, একবার মাথা তুলিয়াই তেমনিভাবে সে আবার বসিয়া রহিল। সমস্ত শরীর তাহার থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

অক্ষয় বলিল, না আর বেশী কিছু নেই, আর একটু শোন। আমি গিয়েছিলুম একদিন ওদের বাড়ী। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ায় একটু দুঃখও প্রকাশ ক'রেছিলুম বোধ হয়। ও কিন্তু হেসে ব'লেছিল, এ ত' আর আমার বিয়ে হয়নি অক্ষয় দা যে দুঃখ ক'রবে। হ'য়েছিল এক বুড়োর সঙ্গে খানিক ঠাট্টা, স্বামী আমার বুড়ো হ'তে যাবে কিসের জন্যে—সে বুড়ো হবার আগেই যে আমার চুল পেকে যাবে। রাজা-রাজড়ার গল্প প'ড়েছ ত', দুয়োরাণীর কথা কি ভুলে গেছ নাকি? জান সুধীর এতটুকু দুঃখের ছাপও দেখিনি তার মুখে কিন্তু কেন তা কি বুঝতে পারছ তুমি?

সুধীর চুপ করিয়াই রহিল।

হঠাৎ দাঁড় তুলিয়া ফেলিয়া অক্ষয় বলিল, কিন্তু থাক সে-সব কথা। একজনকে ভুলতে যখন পেরেছ তখন আর একজনকেও ভুলতে পারবে আশা করি। তাই ব'লছিলুম আবার বিয়ে কর। সংসার ব'লে একটা জিনিষ আছে আর সে জিনিষটার দামও কম নয়।

আস্তে আস্তে সুধীর বলিল,' একটা উদাহরণ দিয়েই ত' আর সব কিছুকে প্রমাণ করা যায় না। পারুলকে আমি ভুলেছি ব'লেই কি অলকাকেও ভুলতে পারব? ছেলেবেলার অনেক কিছুই যৌবনেও অনেকদিন পর্য্যন্ত টিঁকে থাকে তাই হয়ত' হ'য়েছিল পারুলের বেলায় কিন্তু

যৌবনের জিনিষ যদি ঠিক সে সময়েই এসে হাজির হয় ত' তাকে কি সহজে ভোলা যায়? আমার মনের অবস্থা তুমি হয়ত' ঠিক বুঝতে পারবে না অক্ষয় কিন্তু থাক্ এবার ফেরা যাক সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে।

অক্ষয় আর কোন কথা না বলিয়া নৌকার মুখ ঘুরাইয়া দিল।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া অক্ষয় বলিল, চল কাল আমাদের যতীনের বাড়ী যাওয়া যাক, দুদিন সেখানেই থাকা যাবে। মনে আছে বোধ হয় তার মাকে। কি যত্নই না করতেন তিনি। মেয়ের বিয়ের সময় তুমি যেতে পারনি, কত দুঃখ যে তিনি পেয়েছিলেন তাতে। তারপর ত' আর যাওনি ওদিকে, কালই চল।

সুধীর বলিল, বেশ, কাল দুপুরের দিকে রওনা হওয়া যাবে, সন্ধ্যের মধ্যেই পৌঁছতে পারব' তা'হলে। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, কয়েক মাস দেখা হয়নি ওর সঙ্গে, কার সঙ্গেই বা হয়েছে, কি করে আজকাল ও?

অক্ষয় বলিল, করে আজকাল খুব ভাল কাজ। নিজেদের জমি আছে তাই চাষ করায়, নিজের হাতেও অনেক কাজ ক'রতে হয় তাকে। বেশ ভালই আছে কিন্তু। সন্ধ্যের সময় যখন জমি থেকে ফেরে তখন ওর ক্লান্ত সুন্দর শরীরটার দিকে না চেয়ে পারা যায় না। সেই যতীন—ভারী আশ্চর্য্য না? অক্ষয়ের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু সেই অন্ধকারে নৌকার অন্য প্রান্তে বসিয়া সুধীর তাহা দেখিতে পাইল না। বাড়ী ফিরিয়াও সুধীর এতটুকু শান্তি পাইতেছিল না। পারুলের কথা থাকিয়া থাকিয়া সে কেবলই তাহার মনের হারাইয়া যাওয়া এক অংশ তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল। তাহাকে সে স্নেহ করে তাহার দুঃখ সে স্পষ্টই অনুভব করে। তাহাকে সে ভুলিবে না বলিয়াই ভাবিয়াছিল কিন্তু সেকথা সে রাখিতে পারে নাই, কিন্তু ভুলিয়াছে বলিয়াই কি সম্মুখে আসিয়াও তাহার কথা না ভাবিয়া পারা যায়? ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার ভবিষ্যত জীবন গড়িয়া উঠিবে ইহাই একদিন তাহার মনের মধ্যে বড় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে ফেলিয়া কেন্দ্রস্থলে অপর একটি মুক্তা সে গাঁথিয়া লইয়া খুসী হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই হয়ত' আজ বিধাতার অভিশাপ তাহার মাথার উপর নামিয়া আসিয়াছে। কি সে করিবে তাহা ভাবিয়াও পাইতেছিল না। শরীর খারাপ আহার করিবে না এই অজুহাত দেখাইয়া সে শুইয়া পড়িল। কিন্তু শুইয়া পড়িলেই যে চিন্তা আরও ঘিরিয়া ধরে তাহা আজ সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। অনেকক্ষণ স্থির হইয়া পড়িয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। রাত্রি খুব বেশী হয় নাই। আকাশের চাঁদ তাহাকে ভরসা দিতেছিল তারাগুলি সঙ্কেত করিতেছিল, সম্মুখের গাছগুলি যেন তাহাকে কোন একটা পথের সন্ধান দিতেছিল। সে আগাইয়া চলিল। আশেপাশের সমস্ত কিছুই তাহার চক্ষে পড়িতেছিল কিন্তু কিছুই যেন তাহার নজরে আসিতেছিল না। এ কোন পথে সে চলিয়াছে কোথায়ই বা যাইতেছে তাহা সে ভাবেও নাই ভাবিবার প্রয়োজনও সে মনে করে নাই হয়ত'। অনেকদূর চলিবার পর অকস্মাৎ কাহার ডাকে তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে চাহিয়া সে পারুলকে দেখিতে পাইল। তাহার চমক ভাঙিগয়া গেল। ইহা যে উহাদেরই বাড়ীর আঙিগনা তাহা বুঝিতে তাহার দেরী হইল না। এখানে সে বহুদিন আসিয়াছে। ওই যে একধারে পেয়ারা গাছটা দেখা যাইতেছে উহারই উপর সে কতদিন চড়িয়া বসিয়া কাঁচা পাকা পেয়ারা খাইয়াছে, ওই মেয়েটিকেও কত দিয়াছে তাহা এই অন্ধকার রাত্রে ওই মেয়েটির সম্মুখে কে যেন তাহাকে মনে করাইয়া দিল। সে স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পারুল এতটুকু লজ্জা না পাইয়া বলিল, কবে এলে সুধীরদা, আজই? দেখলুম তখন ঘাট থেকে।—তুমি চিনতে পেরেছিলে আমাকে?

ঘরের ভিতর হইতে তাহার রুগ্না মা ডাকিয়া বলিলেন, কে রে পারু?

পারুল বলিল, তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাক মা। সুধীরকে একটু দাঁড়াইতে বলিয়া সে চকিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটা ছোট জলচৌকী লইয়া আসিয়া আঁচল দিয়া ভাল করিয়া উপরটা মুছিয়া তাহাকে বসিতে দিয়া বলিল, আমি কিন্তু তোমায় চিনতে পেরেছিলুম দেখেই। মাত্র কয়েক মাস দেখা হয়নি কিন্তু কি চেহারা করেছ বলত'?

সুধীর এতক্ষণে কথা কহিতে পারিল, বলিল, নিজের চেহারার দিকে কি চেয়ে দেখনি কোন দিন, এ কি হ'য়েছ বলত' আজ! যা অনেক সাধনায় মেলে তা কি অত সহজে নষ্ট ক'রতে হয়?

সুন্দর হাসি হাসিয়া পারুল বলিল, কিন্তু আমার চেহারার আর ত' কোন দরকার নেই সুধীরদা। একটা পরীক্ষার জন্য একটা দরকার ছিল কিন্তু সে ত' শেষ হ'য়ে গেছে আর যেখানে পরীক্ষা দিয়েছিলুম সেখানে এটারও বোধ হয় তেমন কিছু দরকার হ'ত না।

সুধীর বলিল, আমারও ত' শেষ হ'য়ে গেছে। আমারই বা এ সবে দরকার কি!

পারুল বলিল, তোমার শেষ হ'তে যাবে কেন, যাকে হারিয়েছে সে কি তোমাকে ভুলতে পেরেছে মনে কর? মেয়েগুলো যে ভারী বোকা। যদি তাকে তুমি জোর ক'রেও সরিয়ে দিয়ে আর' কাউকে সেখানে এনে বসিয়ে দিতে তাহলেও হয়ত' সে তোমারই কথা ভেবে শুকিয়ে মরত'—তোমাকে কোন এক ফাঁক দিয়ে দেখে সারা রাতের ঘুমও যদি তার পালিয়েও যেত' তাহ'লে আমরা মেয়েরা এতটুকু আশ্চর্যাও হতুম না সুধীরদা। তোমরা হয়ত' ভাববে এসব চাতুরী, পাগলামী, আমরা কিন্তু তাকে অশ্রদ্ধা ক'রতে পারি না। এসব তর্ক ক'রে বোঝান যায় না, হৃদয় দিয়ে অনুভব ক'রতে হয়।

সুধীর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, চাঁদের আলো তাহার সমস্ত দেহই স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল কিন্তু মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার উপায় ছিল না। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া সে বলিল, তাকে ত' আর পাওয়া

যাবে না পারুল যে আমার চেহারাটার দিকে আবার নজর দিতে হবে। কিন্তু মেয়েরা কি চেহারাটারই শুধু দাম দেয়?

পারুলের সারা মুখ মুহূর্তের জন্য অত্যন্ত বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া উঠিল, কোনমতে নিজেকে সংযত করিয়া সে বলিল, সে কথা আর তোমাকে বলতে চাই না আমি, আমার বুড়ো স্বামী কি ব'লত জান? সে বলত, তোমাকে বিয়ে ক'রে তোমার জীবনটাই নষ্ট ক'রে দিলুম নূতন-বৌ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি বাকী দিনগুলো যেন তোমার সুখেই কাটে —আর যে কদিন আমি বাঁচি একটু যত্ন ক'রো আমায় বুড়ো ব'লে ঘৃণা ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিও না যেন। তার সেবাও ত' আমি ক'রেছি যে কদিন সে বেঁচেছিল এতটুকু অযত্নও হ'তে দিই নি। সুধীর দা আমি শুধু আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই তোমাদের কথা ভেবে। তোমরা কি? আর একজনের জীবন ব্যর্থ হচ্ছে একথা খুব ভাল ক'রে বুঝতে পেরেও কেন তোমরা নিজেদের সংযত ক'রতে পার না? চেহারাটার দাম আমরা বেশী দিই না, তোমরা? কিন্তু থাক এ-সব পুরানো ঝগড়া। বউকে খুঁজে বার করবার কোন চেষ্টা ক'রছ না আবার বিয়ের ব্যবস্থা হ'চ্ছে।

সুধীরের চোখে মুখে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল, চক্ষু তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া সে বলিল, আজও কি আমায় তুমি ক্ষমা করতে পারনি পারুল?

ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া পারুল বলিল, ক্ষমা কিসের, দোষ ত' তুমি কিছুই করনি! প্রথমে ওটাকে দোষ বলেই মনে হয়েছিল কিন্তু পরে বুঝেছি এসব দোষ নয়, স্বভাব। মানুষের স্বভাবে এমনি কতকগুলো জিনিষ থাকেই, প্রথমে সেটাকেই দোষ বলেই মনে হয় আসলে সে তা নয়। স্বভাবের ওপর ত' আর হাত নেই।

সুধীর উঠিয়া দাঁড়াইল কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। একবার তাহার মনে হইল চীৎকার করিয়া বলে, ইহা স্বভাব নহে, ইহা এমন কিছু যাহার কোন ব্যাখ্যাই করা যায় না। কিন্তু সেকথা তাহার বলাই হইল না বলিবার সাহসও আর তাহার ছিল না। চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে বলিল, আজ যাই পারুল পরে আবার দেখা হবে। আর কোন কথা না বলিয়া সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। পারুল যে স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারায় পিছন ফিরিয়া চাহিবার শক্তি আর তাহার ছিল না। অন্যমনস্কের মত সে কিছুদূর আগাইয়া আসিল।

অকস্মাৎ একটা বাঁশঝাড়ের নীচে দৃষ্টি পড়িবামাত্রই সে চমকাইয়া উঠিল। ভূত বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্বও সে বিশ্বাস করে না অথচ অন্ধকারে ঐ গাছের নীচে যাহাকে দেখা যাইতেছে তাহার সমস্তই মানুষের মত হইলেও মুখ দেখিয়া মানুষ বলিবার কোন উপায়ই ছিল না। ওই গাছ-গুলির ঠিক সম্মুখে হরিশদার বাড়ী, হরিশদা তাহার স্ত্রীকে লইয়া সেখানে বাস করে—সন্তানাদি আজিও হয় নাই। স্ত্রীভক্ত বলিয়া সকলে তাহাকে রাগাইয়া তোলে, সেও ওই কথা শুনিয়া নিতান্ত রাগ করিয়াই বাড়ী চলিয়া আসে। বোকা ধরণের মানুষটি। কিন্তু তাহার কথা মনে পড়িতেও সুধীরের অনেকটা সাহস বাড়িয়া গেল। ভূত বোধ হয় তাহাকে দেখিতে পায় নাই তাই অত্যন্ত সাধারণভাবে হরিশদার বাড়ীর দিকে চাহিয়া হয়ত' কর্ত্তব্যবোধেই নানারূপে অঙ্গ ভঙ্গি করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিতে যে সে পায় নাই তাহা একান্তই সত্য তাহা না হইলে মানুষকে দেখিয়া ওই প্রেত-রূপী ব্যক্তিও অমন করিয়া অঙ্গভঙ্গি করিতে লজ্জা পাইত। তাহার ভঙ্গি দেখিয়া সুধীর হাসিয়া ফেলিল নিকটে আসিয়া বলিল, কে হরিশদা নাকি? হঠাৎ ভূতের বেশে যে?

লজ্জিত হইয়া হরিশদা কোঁচার খুঁটে মুখের রং মুছিতে মুছিতে বলিল, আর ব'ল না ভাই তোমার বৌদির জ্বালায় কি আর টিকবার যো আছে। ভূত দেখবার ভারী সখ, তাই—, আর ব'ল না। কিন্তু এলে কবে? চল, ভেতরে চল। বৌদির সঙ্গে দেখা ক'রবে না?

সুধীর মাথা নাড়িয়া বলিল, আজ থাক্ আছি ত' কিছু-দিন, দেখা হবেই।

হরিশ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া তাহার কথায় সায় দিয়া মুখের রং মুছিতে মুছিতে বাড়ীর দিকে আগাইয়া গেল।

সুধীরের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। হরিশদার গমন পথের দিকে চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। হয়ত বৌদি জানালা দিয়া ভূত দেখিয়াছে কেমন করিয়া ভয় দেখাইতে গিয়া মানুষকে তাহারা হাসাইয়া দেয় তাহাও দেখিয়াছে বোধ হয়। ওই ভূতকে ঘিরিয়াই অনেক কথা হয়ত তাহার জমিয়াছে, স্বামীর নিকটে হাসিয়া হাসিয়া যখন সে-সব কথা বলিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে তখন সে তাহাদের মধ্যে পড়িয়া সমস্ত আনন্দ হরণ করিয়া বসে কেমন করিয়া? তাই সে হরিশদার সহিত যাইতে চাহে নাই কিন্তু মন যে তাহাকে ছাড়িয়া উহাদেরই আশে পাশে ঘুরিয়া মরিবে তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। হরিশদা দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটা নিশ্বাস যেন তাহাকে মুক্তি দিয়া বাহির হইয়া গেল। মুখ ফিরাইয়া লইয়া সে চলিতে লাগিল। আকাশে তারা উঠিয়াছে, কোথাও বা ঘেঁসাঘেঁসি, কোথাও অনেকদূর পর্য্যন্ত একে-বারেই নাই, এই পৃথিবীর অনেক কিছুই ভরিয়া আছে, নিজের বুক তাহার ঐ তারকাশূন্য আকাশের অংশের মতই ফাঁকা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সমস্ত বুকে কোথাও কিছু যেন অবশিষ্ট নাই আর কোন দিনই তাহার বুক ভরিয়া উঠিবে বলিয়াও তাহার মনে হইল না। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই অনেক-খানি পথ হাঁটিয়া সে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

(ক্রমশঃ)

বিচিত্র বার্ত্তা

বিশ্ব শান্তির প্রতীক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও প্রদেশের ক্লিভল্যাণ্ডে সাংস্কৃতিক উদ্যান (Cultural gardens) একটি গঠন করা হইয়াছে। উহাতে সারা বিশ্বের ২৬টি জাতির প্রসিদ্ধ পবিত্র শান্তি তীর্থ হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে। ইংলণ্ডের ওয়েষ্টমিনষ্টার য়্যাবে এবং স্কটল্যাণ্ডের আরগাইল-শায়ারের আইওনা কেথিড্রেল হইতে টিনলাইণ্ড বাক্সে করিয়া মাটি আনা হইয়াছে। এই প্রকারে অন্যান্য দেশ হইতেও আনা হইয়াছে। উক্ত উদ্যানে ২৬টি জাতির জন্য পৃথক পৃথক যে স্থান নির্দিষ্ট তথায় ঐ মাটি পৃথক পৃথক রাখিয়া দেশ-বিশেষের প্রতীক বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। আবার উদ্যানের মধ্যস্থলে একটি মনুমেণ্ট নির্মাণ করা হইয়াছে। ঐ মনুমেণ্টের চারিদিকে—২৬টি দেশ হইতে আনীত মাটির কিছু অংশ মিলাইয়া মিশাইয়া ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মধ্যস্থলের ঐ মনুমেণ্টে লিখিত রহিয়াছে—

"এখানে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের ঐতিহাসিক পুণ্য-তীর্থ হইতে সংগৃহীত মাটির দ্বারা বৃক্ষসমূহ জন্মান হইতেছে—"আমেরিকান্ লিজিয়ন্ পিস্ গার্ডেনস" সৃষ্টি করিবার জন্য। বিভিন্ন দেশের মৃত্তিকার এই প্রকার ওতপ্রোতভাবে মিশ্রণে ঐ মৃত্তিকায় লালিত-পালিত জাতিগুলির ভিতরও অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ও মৈত্রী স্থাপিত হউক। এই উদ্যান এমন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত যাহারা সমরের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এইজন্যই উদ্যানটি উৎসর্গীকৃত হইল বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান উদ্দেশ্যে এবং পৃথিবীতে চিরশান্তির স্থায়ী প্রতিষ্ঠায়।"

ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড হইতে যেমন রাজারাজড়াদের সমাধিস্থান মনোনীত করা হইয়াছে শান্তির প্রতীক মৃত্তিকা আনয়নে, অন্যান্য দেশ ও জাতির বেলাও তেমনই পবিত্র সমাধিস্থান হইতেই মৃত্তিকা আনা হইয়াছে। সুতরাং ক্লিভ্-ল্যাণ্ডের এই সাংস্কৃতিক উদ্যানে সমগ্র পৃথিবীর শান্তির যে শ্রেষ্ঠ প্রতীক তাহাই একত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রস্তরাস্ত্রদ্বারা ব্যবচ্ছেদ

আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব ১৯০০ সালে কোনও বৃটিশ চিকিৎসক এক ব্যক্তির মাথার খুলির উপর অস্ত্রোপচার করিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল ফ্লিণ্ট প্রস্তর দ্বারা নির্মিত অস্ত্রের সাহায্যে। শুধু অস্ত্রোপচার নয়, সে ঐ ব্যক্তির মাথার খুলির একখানি অস্থি খুলিয়া লইয়া পুনরায় তাহা যথাযথভাবে বসাইয়া দিয়াছিল। এমন নিপুণতার সহিত এই কার্য করা হইয়াছিল, যাহা বর্তমান যুগের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়েই শুধু সম্ভব। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অস্ত্রোপচার সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল আশ্চর্যরূপে এবং রোগীটিও নিরাময় হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত ছিল উহার পর।

প্রস্তর যুগের এই রোগী মানবটির মাথার খুলি ডরসেট্-শায়ারের ক্রিচেল ডাউনে খননকালে ষ্টুয়ার্ট পিলট এবং তাহার স্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ডরসেট শহরে বিখ্যাত সকল প্রত্নতাত্ত্বিকের সমক্ষে এই দম্পতি উক্ত 'খুলি'টি প্রদর্শন করিয়াছে এবং কি ভাবে খুলির কোন্ স্থান হইতে অস্থিখানি তুলিয়া পুনরায় বসান হইয়াছে, তাহাও তাহারা বুঝাইয়া দিয়াছে।

এই প্রকার 'ট্রিপ্যানিং' অপারেশনের নিদর্শন একটি রহিয়াছে রয়েল কলেজ অফ্ সার্জেন্স্-য়ে। ঐ খুলিটিতে অস্ত্রোপচার করা হয় ১৮৬০ সালে। কিন্তু এই প্রস্তরযুগের অপরাশেন ঐটি অপেক্ষা অনেক বেশী নিপুণতার সহিত অনুষ্ঠিত।

প্রস্তর যুগের ঐ রোগীটি হয়ত দীর্ঘকালের মাথা-ধরা ও বেদনায় আক্রান্ত ছিল; অথবা ঐ প্রকার কোনও যাতনার জন্য উন্মাদের মত আচরণ করিত। সে যুগের লোকেরা তাই রোগীর মাথা হইতে 'ভূত'কে অপসারিত করিতে মাথার খুলিতে ঐ প্রকার ফুটা করিয়া 'ভূত' তাড়াইয়া পুনরায় জুড়িয়া দিয়াছিল।

লণ্ডনের 'রয়েল কলেজ অফ্ সার্জেন্স্' ভবনে উক্ত খুলি শীঘ্রই প্রদর্শিত হইবে।

ফলের উপর তেলের প্রভাব

আমেরিকার অরিগন অঞ্চলের পোর্টল্যাণ্ড হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ডুমুর যখন একেবারে ডাঁশা থাকে তখন উহার উপর এক ফোঁটা করিয়া জলপাই তেল দিলে, উহা যেমন আকারে দ্বিগুণ হয়, তেমনই সুস্বাদু ও রসাল হয়। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে তেল দিবার একদিন পর হইতেই ফলের আকারে ও প্রকারে পরিবর্তন আরম্ভ হয়।

যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট করিয়াছি

ফটোগ্রাফার আনিয়া ফটোখানি হাতে দিলে কোনও বালকের মাতা বলিলেন—দেখ ফটোগ্রাফার, আমার ছেলের এই যে ফটোগ্রাফ তুমি তুলিয়া আনিয়াছ, কই ইহাতে তো আমার ছেলের প্রতিকৃতিতে তীক্ষ্নবুদ্ধির ছাপ আনিতে পার নাই—আমার পুত্রের চেহারা যাহাতে বুদ্ধিমানের মত দেখায় তাহা করিতে পার নাই কেন?

উত্তরে বিরক্ত ফটোগ্রাফার বলিয়া উঠিল—আমি তো যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস আপনার পুত্রের প্রতিকৃতি আমি যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহাই করিয়া দিয়াছি। তথাপি যদি আপনি বলেন ইহাতে তীক্ষ্নবুদ্ধির ছাপের অভাব, তাহা হইলে আমি কি করিব—আমি তো প্লাষ্টারের মূর্তি গঠনকারী ভাস্কর নই যে আপনার ফরমাস মত মূর্তি গড়িয়া আনিব। আপনার পুত্রের চেহারা যাহা, তাহাই ফটোতে উঠিবে, অন্য প্রকার করিতে হইলে প্লাষ্টারের প্রতিমূর্তি করিতে হয়।

মার্কিন রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

১৯৩৭ সালের অন্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৫০তম বর্ষ পূর্ণ হয়। তাই ১৯৩৮ সালে বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত কতকগুলি ইউরোপীয় ও আমেরিকান রাষ্ট্র তাহাদের ডাক টিকিটে মার্কিনের রাষ্ট্রপ্রতীক সন্নিবেশিত করিয়াছিল।

এই সকল রাষ্ট্রের ভিতর রহিয়াছে—ব্রাজিল, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, ফ্রান্স, গোয়াটেমালা, হাইতি, হণ্ডুরাস্, নিকারাগুয়া, পোল্যাণ্ড, সাল্ভাডর, এবং স্পেন। ১৭৮৭ হইতে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ১৫০ বৎসর ব্যাপিয়া মার্কিনের সাফল্যমণ্ডিত গণতান্ত্রিকতার বিষয়ও টীকিটে উল্লেখ করা হইয়াছিল সংক্ষেপে।

১০৯ জাতীয় কুকুর

আমেরিকান 'কেনেল' (কুকুর সম্বন্ধীয়) ক্লাবের যে প্রদর্শনী নিউ ইয়র্কে হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সর্বশুদ্ধ ১০৯টি বিভিন্ন জাতীয় কুকুর প্রদর্শিত হয়। উহার ভিতর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ওজনেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে কুকুরটি রৌপ্যকাপ পুরস্কার পাইয়াছে, সেটি হইল 'গ্রেট ডেন্' (Great Dane) জাতীয়। উহার ওজন ২০০ পাউণ্ড অর্থাৎ আমাদের দেশের হিসাবে প্রায় আড়াই মণ। আর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া যে কুকুরটি পারিতোষিক পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে, সেইটি হইল একটি চিহুয়া-হুয়া জাতীয়। ইহা আকারে এত ক্ষুদ্র যে গ্রেট ডেন্-য়ের প্রাপ্ত রৌপ্য কাপের ভিতর উহা অনায়াসে আস্তানা গাড়িতে পারে। উহার ওজন মাত্র তিন-চতুর্থ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় একপোয়ার কাছাকাছি।

দৃশ্যমান গন্ধ

এক মুহূর্তে ফুল হইতে যে সুগন্ধ মুক্তি পায়, তাহার ওজন কোনও সূক্ষ্ম তোলযন্ত্র দ্বারাই নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ঐ পরিমাণ সুবাস ছড়াইলেও আমরা উহার গন্ধ পাই।

গন্ধের সূক্ষ্মতা এমনই রহস্যময় যে, কোন কোন বিজ্ঞানী পরিশেষে অতি বিচিত্র অভিমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সাধারণত আমরা জানি গন্ধ বায়ুতে অতি সূক্ষ্মতম কণায় বিস্তারলাভ হেতু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অনুভূতি জাগায়। কিন্তু ঐ সকল বিজ্ঞানী মনে করেন, গন্ধ জিনিষটা একেবারেই কোন কঠিন পদার্থ নয়, উহা হারজিয়ান তরঙ্গের অনুরূপ কোন প্রকার স্পন্দন বা তরঙ্গ। মোটামুটিভাবে ধরিতে গেলে এই মতবাদ বিশেষ একটা অসম্ভব কিছু নয়। বিশেষ করিয়া যদি আমরা রেডিও-য়্যাকটিভ্ পদার্থের বিশিষ্টতা স্মরণ করি। গন্ধের এই রহস্যময় গুণের জন্যই উহাকে নগ্নচক্ষুরও গোচর করা কতকটা সম্ভব হইয়াছে। ফটোচিত্র, চলচ্চিত্র প্রভৃতি গ্রহণও আর অসাধ্য থাকে নাই।

এই অতিশয় কার্যকরী প্রণালীর আবিষ্কর্তা হইলেন ফরাসী দেশের কোনও বিজ্ঞানাধ্যাপক। প্যারীর 'একাডেমি অফ্ সায়েন্সেস্' এবং অন্যান্য বিজ্ঞান সমিতির নিকট তিনি তাঁহার পরীক্ষার প্রণালী ও ফলাফল জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বর্দোর অধ্যাপক হেন্রি দেভোঁ এই প্রক্রিয়া দ্বারা কোনও সুগন্ধ ফুলের সুবাসকে পারদের উপর স্থায়ী করিয়া ধরিয়া রাখিবার প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়ায় 'থিন্ লেয়ার্স্' ও 'মনোমলেকিউলার লেয়ার্স্'এর বিশিষ্ট ধর্মই প্রধানত কার্যকরী হয়।

যদি বিশুদ্ধ জলে বা পারদের উপরিভাগে একটু তেল অতি সন্তর্পণেও ঢালিয়া দেওয়া হয়, ঐ তেল বিস্তারলাভ করিয়া পারদ বা জলের উপর সরের আকারে ভাসিতে থাকে। এই সর বা থিন্ লেয়ার আলোক প্রতিফলনে দৃশ্যমান হয় এবং কতকগুলি রঙিন বৃত্ত কাটাকাটি করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তেল অবশ্য যে বিস্তারলাভ করে, তাহারও সীমা রহিয়াছে, সর্ব্ববৃহত্তম বিস্তার শেষ হইলে ঐ প্রকার বৃত্ত গঠিত হয়।

তেল না ঢালিয়া যদি কোনও উদ্বায়ী (volatile) পদার্থ ঢালা যায়, তাহা পারদের ভিতর শুষিয়া যায়। তাহার ফলে অতি পাতলা একটা সর (বা থিন্ফিল্ম্) গঠিত হয়। ফুল হইতে অতি দ্রুতগতিতে সুবাস উত্থিত হয়, এইজন্য এক মিনিটে ফুলের সুবাস পারদের উপরিভাগে কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ স্থান জুড়িয়া সর গড়িয়া তোলে—এই গঠন ক্রিয়ার চলচ্চিত্র অতি সহজেই গ্রহণ করা যায়। ইহাই ফুলের সুবাসের চিত্র বলা চলে।

গোলাপ, যুঁই, তামাকফুল প্রভৃতি লইয়া বহু পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল ফুলের সুবাস পারদের গাত্রে পড়িয়া যে সর প্রস্তুত করে, তাহা অনাবৃত রাখিলে ৩০ মিনিট পর্যন্ত সুগন্ধ স্থায়ী হয়, তাহার পর উবিয়া যায়। কিন্তু কাচের পরকলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে এক ঘণ্টা পর্যন্ত সুগন্ধ অবিকৃত থাকে। তৎপর অনাবৃত করিলে পুনরায় ৩০ মিনিটে গন্ধ উবিয়া যায়। গোলাপ ফুলের সুবাসই উপরি উক্ত প্রকার বিশিষ্টতা প্রকাশ করে।

চলচ্চিত্র ভিন্ন সাধারণ ফটোচিত্রও গ্রহণ করা যায় সুগন্ধের। পূর্বোক্ত পরখে যদি সুবাস পারদগাত্রে ছড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঐ গঠিত সরের উপর ধীরে ধীরে প্রবাহিত করা হয় (ফুঁ দেওয়ার মত ক্ষীণ শক্তিতে), তাহা হইলে বায়ুর জলীয় বাষ্প সুবাসকে ঠেলিয়া নেয় ও ঘন জমাট করে। এই প্রকারে একটি বাষ্পীয় বৃত্ত পাওয়া যায় যাহাতে সর বা ফিল্ম্ প্রতিভাত হয়। ইহা এতটা সময় স্থায়ী হয় যে, উহার ফটোচিত্র গ্রহণে কোনও প্রকার বেগ পাইতে হয় না।

পারদের উপরিভাগে যে পদার্থের সাহায্যে সর পড়ে সেটি নিশ্চয়ই ফুলের সুবাস। উহার গন্ধ ঠিক ফুলটির সুবাসের অনুরূপ। এখন একখানি কাচের পরকলা দিয়া যদি ঐ সরকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া একদিকে সরাইয়া নেওয়া হয়, তবে সরটির ঘনসন্নিবেশে সুবাসের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং এই অবস্থায় যখন উবিয়া যাইতে থাকে, তখন নগ্নচোখেই উহাকে দেখা যায় বাষ্পের আকারে। সুতরাং গন্ধ যে এই প্রক্রিয়া দ্বারা দৃশ্যমান হইয়াছে, একথা বলিলে অতিরঞ্জন হইবে না।

শব্দতরঙ্গের জাদু

আধুনিক জগতে শব্দতরঙ্গ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু টলেডো নগরের এক শব্দ-গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা আরও বিচিত্র সংঘটন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা এমন অদ্ভুত শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করিতে পারে, যাহা ফুটন্ত গরম দুধের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করা মাত্র দুধ টকিয়া ছানা হইয়া যাইবে। আবার অন্য এক প্রকারের আশ্চর্য শব্দতরঙ্গ তাহারা সৃষ্টি করিতে পারে, যাহার সাহায্যে দুধ একেবারে সুমিষ্ট হইয়া যাইবে—মনে হইবে যেন কতই না চিনি উহাতে মিশাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়া মানবদেহে বিকার উপস্থিত করিবার মত শব্দতরঙ্গও তাহারা জন্মাইতে পারে। ইহার ভিতর আবার একটি শব্দতরঙ্গ রহিয়াছে এমন যে উহার প্রবাহ সঞ্চারিত হইবামাত্র নিকটস্থ সকল নরনারীরই বমনের উদ্রেক হইবে। সুতরাং শব্দতরঙ্গের ভবিষ্যৎ অতি রহস্যময়ভাবে উজ্জ্বল। কালে ইহা আরও কত অঘটন ঘটাইতে সমর্থ হইবে, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই।

মোটর-যান চালনে নারী

যুদ্ধের উদ্ভবে সর্ব্বত্র মোটর-যান পরিচালনে অধিক সংখ্যায় নারী নিযুক্ত হইতেছে। যেখানে নারীগণ আকাঙ্ক্ষিত সংখ্যায় অগ্রসর হইয়া আসে না এই কাজটির দিকে, সেখানে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখান হইতেছে। এই অবস্থায় হনলুলুর পুলিশের বড়-কর্ত্তা এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। প্রকাশ্য রাজপথে নারী-চালিত মোটর দেখা গেলেই, পুলিশ তাহার গতি নির্বিঘ্ন-

... করিতে থাকে। যখনই তাহাদের মনে হয় এই মহিলা ... অতিশয় হুঁশিয়ার, তখনই পুলিশ আগাইয়া যাইয়া উক্ত মহিলা-চালককে বলে,—'এ পাশের ফুটপাথে এনে গাড়ী থামান।' মহিলা সচকিত হয়, মনে ভাবে হয়ত কোনও নূতন নিয়মকানুন ভঙ্গ করা হইয়াছে। সে সভয়ে গাড়ী থামায়। তখন পুলিশটি মহিলার হস্তে একটি সুদৃশ্য অর্কিড্ প্রদান করে। পুলিশের বড় কর্ত্তার আদেশ। দুইটি পুলিশ অফিসারের এইজন্য নামকরণ হইয়াছে "অর্কিড্ অফিসার"—তাহারা রাজপথে মোটর-চালন লক্ষ্য করে, এবং যোগ্য মহিলা-চালককে অর্কিড্ উপহার প্রদান করে।

স্মৃতির দাম

অমিয় ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি টি

শোকাকুলা স্বামীহারা
তরুণী চন্দ্রাবতী।
ভরা যৌবন নিয়ে ফিরে এলো পিতার পুরানো ঘরে
সিঁথির সিঁদুর মুছি'।
দুই কূল ভাঙ্গি স্ফীতা নদী যেন ফিরিল উৎস-মুখে।

* * * * *

উপদেশ দেয় শুভার্থী-দল আসি,—
"স্বামী-ধ্যান করো স্বামী-গত-প্রাণা সতি!
সাধনার বলে স্বামীরে আবার চিত্তে ফিরায়ে আনো।
বঞ্চিত বুকে সঞ্চিত হোক্ তাঁরই সুমধুর স্মৃতি।"

শত বাসনার কণ্টকে ক্ষত বক্ষে ফিরে না স্বামী,
ধ্যানে নানা বাধা আসে;
স্মরণে আনিতে স্বামীর মূর্ত্তি ভীড় করে নানা
মূর্ত্তির মায়াজাল,
—ব্যাকুলা চন্দ্রাবতী।
সাধ্বী নারীর সরল সাধনা চলে না অব্যাহত।

* * * * *

অবশেষে উপদেশ,—
"স্বামীর চিত্র সমুখে রাখিয়া ধ্যান করো এক মনে।
একটি ছবির পুণ্য প্রভাবে ম্লান হবে সব ছবি,
অটুট সাধনা চলুক জীবন ভরি'।"

স্বামীর তৈলচিত্র রাখিল রত্নবেদীর পরে,
অতি মনোরম, শিল্প শোভার সার!
যত দেখে তত মুগ্ধা চন্দ্রাবতী।
স্বামীরে ভাবিতে শিল্পীরে মনে পড়ে,
এত মায়া জানে চিত্রকরের তুলি?

দুটি চোখ যেন জীবন্ত, দেখে চেয়ে,
অধরে হাসির অমৃত-মাধুরী খেলে,
মুখ-মণ্ডলে প্রেমের অমিয় মাখা,
অঙ্গ ঘেরিয়া উছলিয়া উঠে পতিরই তো পরিচয়!
—বিস্ময় মানে সাধিকা চন্দ্রাবতী।

... পূজা করে তরুণী বিধবা নারী?
স্বামীর, না বাসনার?

পূজা ছাড়ি শেষে চিত্রাঙ্কনে বাসনা কেন বা হোলো?
শিল্পীরে ডাকি আপন কামনা জানায় চন্দ্রাবতী।
স্মৃতির সাধনা স্থগিত রহিল,
শিল্প-সাধনা চলে।
কত না চিত্র গড়িয়া উঠিল বিধবা নারীর হাতে!
বন, পাখী, ফুল, নগর-নগরী,
প্রাসাদ, পল্লী-বীথি,
প্রেম-বিহ্বল নর-নারী, আর ব্যথা-বিহ্বলা প্রিয়া,
সবই পায় ঠাঁই—চন্দ্রাবতীর রম্য চিত্রশালে।
অবশেষে আঁকে স্বামীর প্রতিচ্ছবি।
অতি অপরূপ!—আপন সৃষ্টি হেরিয়া বিধবা
আপনি গর্ব্ব মানে।

* * * * *

বহুদিন গেছে চলি'।
আজিও সে ছবি শোভা পায় তার রত্নবেদীর পরে।
স্রক্-চন্দনে আজিও চিত্র চর্চ্চিত সুরভিত,
আজিও গাহিছে যশোগাথা তার শিল্পরসিক-দল,
আজিও আসিছে শত শুভার্থী,
স্তব-কলরবে মুখরিত অঙ্গন,
চন্দ্রাবতীর অটুট সাধনা সার্থক হ'ল বুঝি!
সকলেরই মুখে "ধন্যা সাধ্বী নারী!
হারান দেবতা ফিরায়ে আনিল গড়ি' আপনার হাতে,
বক্ষে রেখেছে, কভু হয় নাই ম্লান!"

* * * * *

সেদিন প্রভাতে আপনার ঘরে
পূজায় বসিবে নারী,
সহসা হেরিল, কক্ষে জমিয়া উঠেছে আবর্জ্জনা।
ঝাঁটিয়া ফেলিতে গিয়া
দিল ছুঁড়ি শত আবর্জ্জনার সাথে,
তাহারই স্বামীর বহু পুরাতন মলিন-ধূসর
ছোট একখানি ছবি
উড়ে যায় ছবি বাহিরের পানে,—চাহিয়া হাসিছে নারী।
গর্ব্বের হাসি ফুটিল অধর-কোণে।
পুরান, মলিন স্বামীর ছবিতে প্রয়োজন নাই আজ!

ভুল

(ছোট গল্প)

শ্রীযতীন্দ্র সেন
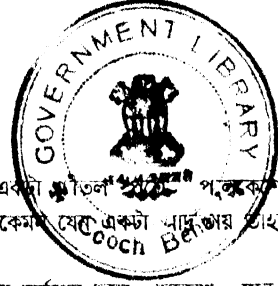
এমন সুন্দর জলসাটা একেবারে মাঠে মারা গেল। আলোগুলি নিভিবার আর সময় পাইল না!

যেমনি শ্রীমতী কমলা দেবী একটি মনোরম ভঙ্গীর সহিত নাচিতে সুরু করিয়াছেন, অমনি আলোগুলি গেল নিভিয়া। সঙ্গে সঙ্গে সব কয়টা পাখাও। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের অত বড় হলটা এক মুহূর্ত্তে যেন অন্ধকারের গাঢ়তায় ডুবিয়া গেল।

নীরন্ধ্র, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। অন্ধকারের আকস্মিক আবির্ভাবে সকলে উঠিল সচকিত হইয়া। একটা অসহিষ্ণু চাঞ্চল্য সারা হলটায় উস্‌খুস্‌ করিয়া উঠিল সহসা।

হলের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত লোকে ঠাসা। বন্যা-ত্রাণ-সমিতির আয়োজনে ও তাহারই সাহায্যকল্পে চ্যারিটি পারফর্মেন্স। চ্যারিটির মোহে নয়, পারফর্মেন্সের লোভেই টিকিট বিক্রয় হইয়াছে আশাতীত।

কৃতিত্ব আছে বন্যা-ত্রাণ-সমিতির। এতগুলী গুণীর একত্র সমাবেশ, আর দশ টাকার হইতে আট আনার পর্যন্ত সবগুলি টিকেট নিঃশেষে বিক্রয় করিবার এমন নিপুণ ব্যবস্থা সহসা দেখা যায় না।

নাঃ, আলোগুলি জ্বালিবার আর আশা নাই। কোথায় কি গোলমাল হইয়াছে কে জানে? বাহিরে ঝড়-বৃষ্টির যে মাতামাতি সুরু হইয়াছে, তাহাতে যে ইলেকট্রিক তার কোথাও ছিঁড়িয়া যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি!

কিছুক্ষণ বাদে কয়েকটা মোমবাতি জ্বালিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। তাহাতে হলের রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়া কিছুটা হাল্‌কা হইল বটে, কিন্তু আর জলসা সুরু হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই।

মিছামিছি অন্ধকারে ঠায় বসিয়া থাকিয়া লাভ নাই। ইহার পর বাহির হওয়াই দুষ্কর হইবে। অন্ধকারে বাহির হইবার পথে ঠেলাঠেলি, ধ্বস্তাধ্বস্তির কসরৎই হইয়া উঠিবে দুঃসহ। আগে থেকে বাহির হইয়া যাওয়াই ভাল।

পুলকেশ দুধারে সারি দেওয়া চেয়ারগুলি হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া, অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া, অন্ধকারে মুখ লুকানো পথটাকে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করিয়াই হলের বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল বারান্দায় সিঁড়ির মুখে। জলের ছাটে সমস্ত বারান্দাটাই ভিজিয়া গেছে।

সত্যি এদিক্‌কার লাইনের ইলেকট্রিক তারই ছিঁড়িয়াছে কোথাও। কলেজ স্কোয়ারের সবগুলি বাড়ীই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে আচ্ছন্নের মতো। এই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আলো নিভাইয়া ঘুমাইবার কথা নয় কাহারও। ইলেকট্রিক তারই ছিঁড়িয়াছে।

বৃষ্টির বিরাম নাই। নিশ্ছিদ্র, নিরেট অন্ধকারই যেন অজস্র ধারায় গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া অন্ধকারের পুরু কালো পরদাকে তীব্র আলোক-রেখায় যেন ফাঁড়িয়া দিয়াই মিলাইয়া যাইতেছে। ভিজে হাওয়ার একটা শীতল স্পর্শে পুলকেশের দেহে শিহরণ জাগে। কেমন যেন একটা আর্দ্রতায় তাহার মন বিষণ্ণ হইয়া উঠে।

অজস্র বর্ষণের ছলে আকাশ যেন আসিয়া মিলিত হইয়াছে মৃত্তিকার সাথে। কেমন যেন লুব্ধ উন্মত্ততায় মাতিয়া উঠিয়াছে বৃষ্টি-স্নাত প্রকৃতি।

এমনি উন্মত্ত শূন্যতা আজ জাগিয়াছে পুলকেশের মনে। সুদীর্ঘ অবিবাহিত জীবনের কৌমর্য্যের অটুট তপশ্চরণ বিচলিত করিয়া দিয়া এমনি দুর্ব্বলতা মাঝে মাঝে জাগে বই কি তাহার মনে। কিন্তু চোখ রাঙ্গাইয়া মনকে সে শাসন করে, পড়াশুনায় হইয়া উঠে সমাধিমগ্ন।

বাদ্‌লার এমন ঠান্ডা হাওয়ায় পুলকেশের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে একটি নিভৃত, উষ্ণ গৃহ-কোণের, আর একটি উষ্ণ দেহের সান্নিধ্যের। আর সেই সঙ্গে জাগে বহুদিনকার পরিচিত, স্মৃতির গোপন কোণের একখানি স্বপ্নময় মুখ। সে মুখখানি বীণার।

পুলকেশের এম-এ ক্লাশের সহপাঠিনী বীণা। শুধু সহপাঠিনী বলিলে ভুল হয়। পরিপূর্ণ যৌবনের প্রথম প্রণয়-অর্ঘ্য সে নীরবে নিবেদন করিয়াছিল বীণাকে।

পুলকেশ বীণাকে ভুলিতে পারে নাই। বীণার রূপ তাহার মনে রচনা করিয়াছে একটা মোহ। সেই মোহের কাছে তাহার হইয়াছে পরাজয়। তাহার প্রশ্রিত মন তাহার অজ্ঞাতেই অবসর ক্ষণে বীণার চিন্তায় মগ্ন হইয়া যায়।

পুলকেশের এই সুদীর্ঘ, নিস্পৃহ, কৌমার্য্য-জীবনের ইতিহাসের মূলে বোধ করি রহিয়াছে বীণার স্মৃতিই। বীণার আসনে অন্য কাহাকেও বসাইয়া হয় ত সে বীণার স্মৃতিকে লাঞ্ছিত করিতে চায় নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, অধ্যাপক পুলকেশ। অধ্যাপকোচিত সৌম্য গাম্ভীর্য্য তাহার মুখময় একটা কাঠিন্যের ছাপ আঁকিয়া দিয়াছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উর্দ্ধলোকে বিচরণশীল তাহার মন-সম্বন্ধে তাহার অকুণ্ঠিত দৃষ্টি অহরহ সজাগ।

পুলকেশের চোখে এখনও তাহার অজ্ঞাতেই বীণার উর্দ্ধমুখী অগ্নিশিখার মতো প্রদীপ্ত, উদ্ধত মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠে। সম্রাজ্ঞীর মত স্পর্দ্ধিত ভঙ্গীতে, আর রূপের জৌলুসে সকলকে দিক্‌-ভ্রান্ত করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত বীণা। চলিয়া যাইত হিল্‌-তোলা জুতার একটা রূঢ় ধ্বনি তুলিয়া।

ক্লাসে বীণার আগমনে ছেলেরা হইয়া উঠিত সচকিত। বহু মুগ্ধ, কৌতূহলী নেত্রের সম্মিলিত দৃষ্টি তীরের মত বিদ্ধ করিত বীণাকে। বীণার দম্ভ-কঠিন ওষ্ঠ-দুটিতে একটা অবজ্ঞার হাসি কুঞ্চিত হইয়া উঠিত।

তবু পুলকেশের ভাল লাগিত বীণাকে। ভালো লাগিত দুটি স্বপ্নাতুর-টানা-টানা চোখ, আর আল্‌তো করিয়া বাঁধা এক রাশ চুলের এলোখোঁপা।

শুধু পুলকেশকেই নয়, বীণা আকর্ষণ করিত সকলকেই চুম্বক-শলাকার মতো। অন্যান্য ছেলেদের ছেলে-মানুষী কান্ড মনে করিয়া এখনও হাসি আসে পুলকের মনে। তাহারা কলরব করিয়া, কিংবা বীণার আশে পাশে মৃদুগুঞ্জন তুলিয়া প্রকাশ করিতে চাহিত নিজেকে। প্রকাশ করিত তাহাদের বিমুগ্ধ হৃদয়ের অস্ফুট দু'টি একটি কথা। এই নির্লজ্জ কাঙ্গালপনায় কৌতুক অনুভব করিত বীণা। আভিজাত্যের চোখ-ঝলসানো দীপ্তি ও দম্ভে সে হইয়া উঠিত আরও রহস্যময়ী, আরও দুর্নিরীক্ষ্যা।

পুলকেশ বীণাকে ভালবাসিত নীরবে। কলরব ছিল না তাহার ভালবাসায়। বীণার প্রতি একটা অতলস্পর্শী ভালবাসায় সে ডুবিয়া গিয়াছিল অন্যের অলক্ষ্যে।

বীণার আকাঙ্ক্ষিত সান্নিধ্য লাভের অপ্রত্যাশিত সুযোগ কেমন করিয়া পুলকেশের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহা মনে করিতে এখনও তাহার অদ্ভুত লাগে। বক্স-নম্বর দেওয়া একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিয়া বীণাকে পড়াইবার টিউশনিটি শেষ পর্যন্ত পাইল পুলকেশ। পুলকেশের উপর এ অনুগ্রহ কেন? এ-গৌরব কি একমাত্র তাহার প্রতিভার? হয়-তো তাহাই। পুত্রের সমান বয়সী হইলেও রাশভারী রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্‌ট্ ম্যাজিস্ট্রেট্, বীণার পিতা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহাকে, ইহা সে বুঝিত। অনেকদিন তিনি আসিয়া পুলকেশের পড়ানো শুনিতেন। তাঁহার মুখে তাহার পান্ডিত্যের ও প্রতিভার অজস্র সুখ্যাতি শুনিয়া পুলকেশ লজ্জায় লাল হইয়া মাটীর সঙ্গে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিত।

পুলকেশ বীণাকে পড়াইত সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিয়া। কীট্‌স্, শেলি, সুইন্‌বার্ণ প্রভৃতি রোম্যান্টিক্ কবিদের কবিতা এবং রসেটি ও প্রির‍্যাফেলাইটিজম্ সম্বন্ধে পড়াইতে পড়াইতে সে ভুলিয়া যাইত নিজেকে, ভুলিয়া যাইত বাস্তব পরিবেশ, আর তাহার সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার নিভৃত মনের কথাগুলিই যেন বলিয়া যাইত। শেলির 'প্রমিথিয়ুজ আন্‌বাউন্ড', কীট্‌স্‌-য়ের 'ইজাবেলা' পড়াইতে পড়াইতে মাতিয়া উঠিত পুলকেশ। ক্যাসিওর প্রতি ওথেলোর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, ডেস্‌ডেমোনাকে হত্যা পুলকেশকে করিয়া তুলিত উদ্দীপ্ত।

সে দিনও আজিকার মতো এমনই বৃষ্টি নামিয়াছিল। এমনই অবিরল, উদ্দাম বৃষ্টি। সেদিনের এমনই ভিজে আবহাওয়ায় সুরু হইয়াছিল পুলকেশের মনো-বিকলন। বৃষ্টিতে তাহার মনও হইয়া উঠে ভিজে, আর অবাস্তব কল্পনায় প্রশ্রিত।

বৃষ্টিতে পৃথিবী ছায়াময় আর সিক্ত হইয়া উঠিতেই বীণার স্মৃতি তাহার মনের দিগন্তে হইয়া উঠে নিবিড়।

হ্যাঁ, সে দিনও এমনই নীরন্ধ্র বৃষ্টির মাতামাতি সুরু হইয়াছিল। সেদিন সন্ধ্যায় পুলকেশ বীণাকে পড়াইতেছিল সুইন্‌বার্ণের 'ম্যাচ' আর ব্রাউনিংয়ের 'লাষ্ট রাইড টুগেদার'। 'ম্যাচ'-য়ের রোম্যান্টিক আবহাওয়ায় প্রদীপ্ত হইয়াই 'লাষ্ট রাইড টুগেদার'-য়ের ট্র্যাজেডিতে পুলকেশের কণ্ঠ হইয়া উঠিল বিষণ্ন।

বাহিরে অবিরল বৃষ্টি ধারায় আকাশ যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। খোলা জানালার পথে জলের ঝাপ্‌টা আসিতেছে। জানালাটা বন্ধ করিয়া দিবার উৎসাহও যেন পুলকেশের দেহে-মনে নাই। তাহার মনে জাগিয়াছে একটা ব্যাকুল শূন্যতা। বীণাও চাহিয়া আছে উদাস দৃষ্টিতে খোলা জানালার পথে। বাহিরের প্রকৃতির উদ্দামতা তাহার মনেও কি জাগাইয়াছে কোনও নিবিড় মধু-গন্ধী অনুভূতি?

বীণার মরোক্কো লেদারে বাঁধাই একখানি খাতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে পুলকেশের চোখে পড়িল, দু'খানি রঙ্গীন কাগজ। দু'খানি চিঠি। একখানি লিখিয়াছে সুরথ রায় চৌধুরী। পূর্ব্ববঙ্গের ঐশ্বর্য্য পুষ্ট, মস্তিষ্কবিহীন জমিদার পুত্র। পাঁচবার ফেলের পর বি-এ পাশ করিয়া আসিয়াছে এম্-এ পড়িতে। এম্-এ ক্লাসেও হয়তো স্থায়ী বন্দোবস্তই করিয়া লইবে। সুরথের সঙ্গে বীণার ঘনিষ্ঠতা পুলকেশের চোখে পড়িয়াছে বই কি। ঘণ্টার শেষে প্রফেসরের পিছনে পিছনে বাহির হইয়া আসিত মেয়েরা। তাহার পিছনে পিছনে সুরথও। কোরাইডরে দাঁড়াইয়া সে বীণার সঙ্গে গল্প করিত। ইহা লইয়া কত ইঙ্গিত অনুচ্চ হাস্য-পরিহাসে ছেলেদের মধ্যে রহস্যময় হইয়া উঠিত। আর এক-খানি চিঠি লিখিয়াছে বীণা। চিঠির দুই একটি শব্দ, পুল-কেশের যাহা চোখে পড়িল, তাহাতে মনে হইল, বীণা গ্রহণ করিয়াছে সুরথের আত্ম-নিবেদন।

চিঠিখানি যেন সদ্য-লেখা। মেয়েলী ছাঁচের পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে যেন একখানি ক্ষুদ্র প্রেম-কাব্য রচিত হইয়াছে। একটি মধুর গন্ধের স্বপ্নে বিভোর হইয়া সুরথের হাতে পৌঁছিবার অপেক্ষায় যেন চিঠিখানি খাতার মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়া আছে।

সহসা বীণার দৃষ্টি পড়িল খাতার দিকে। সে সঙ্গে সঙ্গে হইয়া উঠিল কঠিন আর প্রদীপ্ত। জ্বলিয়া উঠিয়া খাতাখানি একরূপ ছিনাইয়া লইয়াই সে বলিল,—ছিঃ আপনার অভ্যাস বড় বিশ্রী। বড় নীচ আপনার মন। আপনার মতো উচ্চশিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তির কাছ থেকে এ রকম ব্যবহার আশা করি নি। জানেন, এ পত্র দেখ্‌বার কোনও অধিকার আপনার নেই!

রূঢ় ভর্ৎসনায়, আর লজ্জার গ্লানিতে পুলকেশ যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। তাহা ছাড়া, হৃদয়ের নিভৃত কোণে একটা দুঃসহ বেদনা উঠিল টন টন করিয়া।

—আমায় ক্ষমা করুন। অনুচ্চ কথা কয়টি পুলকেশের বিভ্রান্ত, আড়ষ্ট ওষ্ঠ দুটিতে আনমনে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে উঠিয়া বাহিরে আসিল। নামিয়া পড়িল পথে। অজস্র বৃষ্টিধারায় ভিজিয়া ভিজিয়া সে ফিরিল মেসে।

সেই তার বীণাকে পড়ানো শেষ। ইহার পর বীণা সুর-থের মোটরেই আসিত। আসিত পাশাপাশি বসিয়া। ছেলেরা পরোক্ষে বীণাকে ডাকিত 'মিসেস রায় চৌধুরী' বলিয়া। পুলকেশের মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়িয়া যেন রক্ত ঝরিত।

ইহার পর পাঁচ বছরের উপর কাটিয়া গেছে। বীণার খবর আর পুলকেশ জানে না। এখন বীণা মিশিয়া গেছে পুলকেশের

অনুভূতিতে। আচ্ছা, বীণা কি লক্ষ্য করিত পুলকেশের মুগ্ধ দৃষ্টি? রোম্যাণ্টিক্ কবিতাগুলি পড়াইতে পড়াইতে পুলকেশের গলার স্বর কাঁপিয়া যাইত। বীণার চোখে কি ধরা পড়িয়াছে তাহার দুর্ব্বলতা?

বারান্দার সমস্ত স্থানটুকুই ভরিয়া গেছে। একে একে আসিয়া জুটিতেছে অনেকেই। হলের ভিতর হইতে বারান্দা পর্য্যন্ত এক উন্মুখ, অধীর জনতা বৃষ্টি থামিবার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। সহসা হিল-তোলা জুতার শব্দ তুলিয়া কে যেন আসিয়া দাঁড়াইল পুলকেশের পাশে। এ পায়ের শব্দ পুলকেশের যেন বহুদিনের পরিচিত।

—কি বিশ্রী 'ওয়েদারই' হয়েছে। একটা অর্দ্ধোচ্চারিত স্বগত উক্তি।

গলার স্বর শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিল পুলকেশ। এ স্বর যে বীণার! গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখিবার উপায় নাই। চুরুট ধরাইবার ছলে সে দেশলাই জ্বালিল। তাহারই নিস্তেজ আলোতে সে চিনিতে পারিল বীণাকে। যাহার স্মৃতি মনে রেখায় রেখায় কাটিয়া বসিয়াছে, তাহাকে চিনিতে ভুল হয় না।

—কে, বীণা দেবী যে! নমস্কার।

—কে, প্রফেসার মুখার্জ্জি? নমস্কার। আপনিও এসেছিলেন দেখছি।

—না এসে আর কি করি? ছেলেরা টিকিট দিল গছিয়ে।

তাহার পর উভয়ের কুশল-প্রশ্নের বিনিময় চলিল। বীণার বাবা মারা গেলেন। ভাইরা কেহ মানুষ হয় নাই। দুই ভাই শ্রমিক-আন্দোলন করিয়া গেছে জেলে। আর দুই ভাই লেখাপড়া না করিয়া আড্ডা দিয়া বেড়ায়! বীণার বাবা বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইস্কুল ইন্সপেকট্রেসের চাকুরী লইয়া তাহাকেই সংসার চালাইতে হইতেছে। ছুটাছুটি করিয়া ইস্কুল দেখিয়া বেড়াইতে হয়। বড় খাটুনির চাকুরি বীণার।

—অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হোল না? কথার সঙ্গে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস যেন পুলকেশের বুক ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

—হ্যাঁ, অনেক দিন পরে বই কি। কই, এ্যাদ্দিন তো আপনি আমাদের কোনও খোঁজ-খবর নেন নি!

—নেই-নি, মানে নেওয়ার সাহস হয় নি। মনে হয়েছে আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন নি।

—ক্ষমা আপনাকে আমার করার কথা নয়। ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল আমার।

—আপনি কি একা এসেছেন? সুরথবাবু কোথায়? সুরথের সম্বন্ধেই বেশী কৌতূহল পুলকেশের।

বীণা যেন কিছুই শুনিতে পায় নাই। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সে বলিল,—এখন যাওয়ার উপায় কি, বলুন দেখি, মিঃ মুখার্জ্জি।

—তাই ত মুস্কিল দেখছি। ট্রাম ত বন্ধ হয়েই গেছে। বাস অবিশ্যি চলছে। কিন্তু তা'তে ত বাসা পর্য্যন্ত পৌঁছান

বাস্ অবিশ্যি চলছে। কিন্তু তাতে ত বাসা পর্যান্ত পৌঁছান

—হ্যাঁ, ট্যাক্সিই করুন। আপনার বাসা কোথায়?

—বালিগঞ্জে।

—তাহ'লে ত সুবিধেই হ'ল। আপনি আমাকে ভবানীপুরে নামিয়ে দিয়ে বালিগঞ্জে যাবেন।

অশ্রান্তগতিতে বৃষ্টি পড়িতেছে। তবে বেগ যেন একটু কমিয়া আসিয়াছে। ছাতা মেলিয়া কেহ কেহ রাস্তায় নামিয়া গেল। নামিয়া পড়িল পুলকেশ আর বীণাও।

বৃষ্টিতে একপ্রকার আধ ভেজা হইয়া পুলকেশ আর বীণা আসিয়া দাঁড়াইল মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়ে ট্যাক্সির অপেক্ষায়। ঠনঠনিয়ারও ওধার হইতে আশুতোষ বিল্ডিং অবধি জল জমিয়া ছোট নদীর মত দেখাইতেছে। ট্রামগাড়ীগুলি অন্ধকারে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে আচ্ছন্নের মত। বিশালকায় জলচর প্রাণীর মত বাস্‌গুলি হুস্ হুস্ করিয়া দুই ধারে জল ছিটাইয়া চলিয়াছে। অশ্রান্ত-বর্ষণ, মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে গ্যাস্‌পোষ্টগুলি মিট মিট করিয়া জ্বলিয়া যেন নিজের নিস্তেজ দীপ্তিতে লজ্জিত হইয়াই বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া আছে। সমগ্র কলিকাতা শহর যেন স্বপ্নাতুর বলিয়া মনে হইতেছে।

একটা টুরার্ ট্যাক্সি আসিয়া উপস্থিত হইতেই পুলকেশ ডাকিয়া থামাইল। উঠিয়া বসিল পুলকেশ, আর বীণা। সিডান্-বডির গাড়ী নয়। ভিতরে আলো নাই। কেবল হেড্-লাইট্ সম্মুখের জলসিক্ত রাস্তা আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে।

বৃষ্টি ভেদ করিয়া ট্যাক্সি ছুটিল। ক্যাম্বিসের হুডে জল যেন মানায় না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণার ঝাপ্‌টা চোখে-মুখে আসিয়া লাগিতেছে। পাশের স্ক্রীনগুলিতেও জলের ছাট্ ভাল করিয়া মানায় না।

নীরবতা ভাঙ্গিয়া বলিল পুলকেশ,—আজ আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল হঠাৎ। বড় অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে আপনার সঙ্গে এমনিভাবে দেখা হওয়াটা। আগাগোড়া ব্যাপারটা আমার কাছে অবাস্তব ঠেকছে।

—হ্যাঁ, একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই আমাদের দেখা হোয়ে গেলো। যদিও অনেক সময়ই আমার মনে হয়েছে আপনার সঙ্গে দেখা করবার কথা—

—মনে হয়েছে? তবে আমার সে সৌভাগ্য হয়নি কেন? পুলকেশের কণ্ঠ উষ্ণতায় জীবন্ত।

—দেখা করতে পারিনি, দ্বিধা এসে বাধা দিয়েছে। আমি অপরাধ করেছি আপনাকে রূঢ় আঘাত দিয়ে।

—অপরাধ আপনার নয়। অপরাধ হয়েছিল আমার। মানুষের মনে যে আদিম কৌতূহল আছে, আমার শিক্ষা, আমার মার্জ্জিত রুচি তাকে জয় করতে পারে নি। শুধু কৌতূহলই নয়, আরও কিছু হয়তো ছিলো। সে থাক্—

পুলকেশের কণ্ঠ গাঢ় হইয়া আসিল।

—থাক্‌বে কেন মিঃ মুখার্জ্জি? আমি সবই জানি।

—জানেন? উদ্দীপ্ত হইয়া সোজা হইয়া বসিল পুলকেশ।

—হ্যাঁ জানি। মানুষের মন বুঝতে মানুষের কষ্ট হয় না। সেই জন্য অনুতাপও আমার বেশী। আপনার সব খবরই আমি রেখেছি। কই, আপনি তো খোঁজ নেন্ নি আমার! কত বড় ঝড় আমার গায়ের উপর দিয়ে গেলো, আর যাচ্ছে! মানুষের অভিমান কি এতই দুর্জ্জয়?

কাতরতায় ক্লিষ্ট হইয়া আসিল বীণার কণ্ঠস্বর।

ঔদ্ধত্যের, তীক্ষ্নতার প্রতিমূর্ত্তি এই কি সেই বীণা? কোথায় মিলাইয়া গেল সে তেজ? বড় অদ্ভুত লাগিল পুলকেশের কাছে।

বৌ-বাজার ছাড়াইয়া গেলো ট্যাক্সি। গাড়ীর চাকায় রাস্তার সঞ্চিত জল আর্ত্তনাদ তুলিয়া একঘেয়ে শব্দে ভাঙিয়া দিতেছে নীরবতার প্রশান্তি।

তিমিরাহত স্তব্ধতাকে উচ্চকিত করিয়া বলিল পুলকেশ —সুরথবাবু কোথায়?

—কোথায়, জানি না। অনেকদিন খবর রাখি না তাঁর। লজ্জাকুণ্ঠিতস্বরে বলিল বীণা।

একটা হিংস্র আনন্দ ঝলকিত হইয়া উঠিল পুলকেশের মনে। বীণাকে পাইবার একটা উদগ্র লুব্ধতা। বীণাকে বিবাহ করিয়া তাহার অহমিকা ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া তাহাকে জয় করিবার আনন্দ বুঝি জাগিল পুলকেশের মনে। কেমন যেন উন্মত্ততায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বীণার অগ্নিশিখার মতো রূপ পুলকেশের মনের চোখে জাগিয়া তাহাকে করিয়া তুলিল দিগ্‌ভ্রান্ত।

—আমরা কি আমাদের জীবন নূতন করে আরম্ভ করতে পারি না বীণা দেবী? চালিয়ে নিতে পারি না দুটি জীবন একসঙ্গে মিলিয়ে?

পুলকেশের কণ্ঠ মিনতির সুরে ভারী হইয়া আসিল। সে কম্পিত হাতে বীণার উষ্ণ একখানি হাত তুলিয়া লইল। জীবন-যুদ্ধে পরিশ্রান্ত বীণা। ভীরু পাখীটির মতই সে যেন আশ্রয় চায়।

ওয়েলিংটন স্কোয়ার পার হইয়া ধর্ম্মতলা দিয়া চলিল ট্যাক্সি। বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছে। পুলকেশ বলিল,— আজকার এ রাত্রি আমাদের কাছে স্মরণীয়। একে ব্যর্থ হতে দেওয়া উচিত হবে না। ন-টার শো-তে মেট্রোয় সিনেমা দেখে বাসায় ফেরা যাক্।

মেট্রো সিনেমা হাউসের কাছে যাইয়া থামিল ট্যাক্সি। বীণার হাত ধরিয়া নামাইল পুলকেশ। মেট্রোর বারান্দার অসংখ্য তীব্র বিজলী বাতির অত্যুজ্জ্বল আলোকে তাহারা হইয়া উঠিল উদ্ভাসিত।

সহসা বীণার দিকে তাকাইয়া বিস্ময়াহত পুলকেশ যেন শিহরিয়া উঠিল। এই কি সেই অকম্পিত বিদ্যুৎ-শিখার মত বীণা? এ যে বীণার ভগ্নাবশেষ! মাথার চুল উঠিয়া কপালটা বিশ্রীভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। যেন একটা অপরিসীম শ্রান্তি চোখের কোলে কালো দাগ দিয়াছে আঁকিয়া। গাল দুইটি ভাঙিয়া দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কদর্য্য রুক্ষতায় মুখমণ্ডল কর্কশ। সুগঠিত, তন্বী দেহ ভাঙিয়া কোলকুঁজো হইয়া গিয়াছে।

এক মুহূর্ত্ত পরেই বিস্মিত, বিমূঢ় দৃষ্টি স্বাভাবিক করিয়া লইয়া পুলকেশ বলিল,—ক্ষমা করবেন, বীণা দেবী। বড় ভুল হয়ে গেছে আজ। আমার এক মুমূর্ষু মাসীমাকে দেখতে যাওয়ার কথা ছিল টালায়। এক্ষুণি যেতে হবে আমাকে। কি ভুলটাই না হয়ে গেছে--

ট্যাক্সি ফিরাইয়া তাহাতে চাপিয়া বসিল পুলকেশ।

বল্কান এবং বাল্টিক

পূজার সময়কার আন্তর্জ্জাতিক প্রধান খবর হইল ইংরেজ এবং ফরাসীর সঙ্গে তুরস্কের সন্ধি, তাহার পরের প্রয়োজনীয় খবর হইল বাল্টিক সমস্যা লইয়া সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও ফিনল্যান্ড এই কয়েক শক্তির মধ্যে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলম শহরে বৈঠক। বাল্টিক সমুদ্রতটে রুশিয়ার নজর পড়াতে এই কয়েকটি রাজ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইবে, ইহা স্বাভাবিক। ইহার উপর রুশিয়া ফিনল্যান্ডের সীমান্তের দিকে বিপুল সেনা সন্নিবেশ করাতে এই আতঙ্ক আরও বাড়িয়া যায়। ষ্টকহলমে বৈঠক হয়, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট কেলিওর সভাপতিত্বে বৈঠকের পর সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্কের রাজা এবং ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট উহারা প্রত্যেকে বেতারযোগে বাণী প্রচার করিয়াছেন। এই বাণীতে তাঁহারা তাঁহাদের নিরপেক্ষতা যাহাতে রক্ষিত হয়, সেজন্য যুযুধান শক্তিবর্গকে, বিশেষভাবে তাঁহাদের উল্লেখযোগ্য প্রতিবেশী রুশিয়াকে অনুরোধ করিয়াছেন। পরের খবরে দেখা যাইতেছে, মস্কোস্থ ব্রিটিশ রাজদূতও ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতা যাহাতে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, ফিনল্যান্ডের কাছে এমন কোন দাবী না করিবার জন্য রুশিয়াকে অনুরোধ করিয়াছেন। ষ্টকহলমের এই বৈঠক হইতে মনে হয়, অল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ লইয়া ফিনল্যান্ডের সঙ্গে রুশিয়ার যে সমস্যা দেখা দিবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহা আর বেশী দূর পাকিয়া না উঠিতেও পারে। বাল্টিক সমুদ্রতটে জার্ম্মানীকে কোণ-ঠাসা করিয়া রুশিয়া যথেষ্টই জাঁকিয়া বসিয়াছে। রুশিয়া সেখানে নিজের প্রভাব পুরোদস্তুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সুতরাং ঐ অঞ্চলে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়া নিজেদের নূতন অধিকার সুব্যবস্থিত করিবার পথে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি হয়, রুশিয়া অন্ততঃ এখন তাহা চাহিবে না। যে সব স্থানে রুশিয়া ইতিমধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সে-সব জায়গাতে পাকা-পাকিভাবে সুপ্রতিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিবে এবং ইতিমধ্যেই রুশিয়া সে কাজে অনেকটাই অগ্রসর হইয়াছে। রুশ অধিকৃত পোল্যান্ডে এবং অন্যান্য অঞ্চলে সোভিয়েট পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে।

রুশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের যে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়, সে আলোচনা ফাঁসিয়া গিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে তুরস্কের রাজনীতি একটা সুনিশ্চিত পন্থা ধরিয়া চলিয়া আসিতে থাকে। তুরস্ক বিভিন্ন শক্তিবর্গের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক দৃঢ় রাখিতেই চেষ্টা করে। রুশিয়ার সঙ্গে পূর্ব্বে তাহার সৌহার্দ্দ্যের ভাব ছিল না; কিন্তু আপাতত সে ভাবটা দূর হয়। কিন্তু গত ৫ বৎসর হইতে জগতের রাষ্ট্রনীতিক চক্র নূতনভাবে ঘুরিতে আরম্ভ করে। জার্ম্মানী ও ইটালী নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। ইটালী রোডস দ্বীপকে সুরক্ষিত করে এবং নানাভাবে ভূমধ্যসাগরে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়। তুরস্কের দৃষ্টি এদিকে আপতিত হয়, কিন্তু এদিকে বিশেষভাবে তাহার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি ঘটে, ইটালী আল-বেনিয়া দখল করিবার পর। তুরস্ক তখন এই ভয় করিতে থাকে যে, জার্ম্মানী এবং ইটালী এই দুইয়ে যোগ দিয়া ক্রমে বল্কান এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাঞ্চলে নিজেদের হাত বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। এই সঙ্কট হইতে নিজদিগকে নিরাপদ রাখিবার নিমিত্ত তুরস্ক যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া এবং গ্রীসের সঙ্গে মিলিত হয়। গত এপ্রিল মাসে তুরস্ক গ্রীসের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে তুরস্ক দার্দ্দেনেলিস প্রণালী সুরক্ষিত করিবার দিকে দৃষ্টি দেয়। এই ব্যাপার লইয়া মন্ট্রো বৈঠকের অধিবেশন হয়। মন্ট্রো বৈঠকে তুরস্কের সে অধিকার স্বীকৃত হয়।

সম্প্রতি তুরস্কের সঙ্গে কৃষ্ণসাগরে রুশিয়ার অধিকার সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা চলিয়াছিল। রুশিয়া এই দাবী করিয়াছিল যে, তাহার যুদ্ধ জাহাজগুলিকে কৃষ্ণসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরে যাইবার খোলা অধিকার তুরস্ককে দিতে হইবে এবং যে-সব শক্তি কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী নয়, সে-সব শক্তির কাহারও জাহাজ দার্দ্দেনেলিস প্রণালীর ভিতর দিয়া ভূমধ্য-সাগরে গতিবিধির অধিকার পাইবে না। তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী ইহাতে রাজী হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন যে, এইরূপ চুক্তির ফলে ইংরেজ এবং ফরাসীদের সঙ্গে তাঁহাদের বন্ধুতার নীতি বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিবে। রুশিয়া তুরস্কের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতায় আবদ্ধ হইতে চাহিয়াছিল যে সর্ত্তে, তুরস্কের প্রধান মন্ত্রীর মতে তাহাতে তুরস্কের যে ঝুঁকি লইতে হইবে, তাহা অতি কঠিন। রুশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের আলোচনা ফাঁসিয়া যাইবার পর ইংরেজ ও ফরাসীর সঙ্গে তাহার এই সন্ধি হইয়াছে। এই সন্ধির ফলে বলকানের আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার ওলট-পালট ঘটাইবে সন্দেহ নাই। বলকানে এবং বাল্টিকে জার্ম্মানীর অধিকার সম্প্রসারণের নীতি রুশিয়ার চাপে ব্যর্থ হইয়াছে, এদিকে বলকানেও তাহার সুবিধা করিবার পথ বন্ধ হইল বলিতে হইবে। বলকানের ব্যাপারে ইটালীরও স্বার্থ রহিয়াছে। এই সন্ধির ফল ইটালীর উপর কিরূপ ক্রিয়া করিবে বুঝা যাইতেছে না। সে যে নিশ্চেষ্ট থাকিবে না ইহা নিশ্চিত, তাহার পররাষ্ট্র নীতি এই ব্যাপারের পর হইতে অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয় এবং তাহার উপর আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির বিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

মোটের উপর, এই সন্ধির দ্বারা তুরস্ক বিশেষ রকম রাজনীতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। তুরস্কের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্টের রাজনীতিক বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের জন্য খ্যাতি আছে। বিগত মহাসমরের পর হইতে প্রধানত তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে তুরস্কের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে এবং এদিক হইতে তিনি কোন ভুল এ পর্য্যন্ত করেন নাই। ইটালী, জার্ম্মানী, রুশিয়া এই তিন দিককার রাষ্ট্রনীতির নিরিখ কসিয়া তিনি সম্প্রতি যে সন্ধি করিয়াছেন, তাহাতে তুরস্ক যে সমধিক নিরাপদ হইল, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বাল্টিক এবং বলকানের এই পরিস্থিতি জার্ম্মানীর উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে, আপাতত স্থূলভাবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। হিটলারী গলার আওয়াজে জার্ম্মানীর মনের অবস্থা অনেকটা চাপা থাকিবে; কিন্তু পোল্যান্ডের ব্যাপারের পর এ পর্য্যন্ত জার্ম্মানী সামরিক কৃতিত্ব বিশেষ কিছু দেখাইতে পারে নাই। উড়োজাহাজী আখড়াই এ পর্য্যন্ত

(শেষাংশ ৬৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কুমারটুলী সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রতিমা।

চৌরঙ্গী সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রতিমা।

চিত্রায় "জীবন-মরণ"

গত ১৪ই অক্টোবর হইতে চিত্রায় নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের "জীবন-মরণ" দেখান হইতেছে। ছবিখানির আখ্যানভাগ নিম্নোক্ত-রূপঃ—মোহন আত্মীয়-বান্ধবহীন গরীবের ছেলে এবং গীতা পাড়া-প্রতিবেশী ধনী-কন্যা। দুজনের ছেলেবেলা হইতেই মেলামেশা। তাহাদের ছেলেবেলাকার বন্ধুত্ব যৌবনে প্রেমে পরিণত হইল—একে অন্যকে বিবাহ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। কিন্তু গীতার মা ইহাতে রাজী হইলেন না। মোহন গরীব, রেডিওতে গান গাহিয়া যৎসামান্য যাহা রোজগার করে, তাহাতে কোনক্রমে তাহার দিন চলে। এরূপ সামান্য রোজগারের ছেলের সঙ্গে গীতার বিবাহ হয়, গীতার মা তাহা চান না। অধিকন্তু মোহনের দেহে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি আছে বলিয়া তিনি সন্দেহ করেন। গীতা মোহনকে মায়ের অভিমত জানাইলে, মোহন তাহার শরীরে যে কোন রোগ নাই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাঃ বিজয়ের নিকট গেল। বিজয় কিন্তু তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে বৎসরখানেকের জন্য শহর ছাড়িয়া অন্য কোথাও বিশ্রামের জন্য যাইতে বলিল। এদিকে বিজয়ের সঙ্গে গীতার বিবাহের আলাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল। মোহন বিজয়কে জানিতে দিল না যে, গীতার সঙ্গে কেবল যে তাহার জানাশুনা আছে তাহা নয়, তাহারা পরস্পরকে ভালও বাসে।

ইহার কিছুদিন পরে মোহনের স্বাস্থ্য সত্য সত্যই ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাশি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিল, রক্তও মুখ দিয়া একটু আধটু যে না পড়িল তাহা নয়। বিজয়ের উপদেশে এবং গীতাকে পত্নীরূপে লাভ করা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া একদিন সে কোথায় চলিয়া গেল, কেহ জানিতে পারিল না। মোহনের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, মারাত্মক ক্ষয়রোগের হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু এক বৎসর রঘুনাথপুর নামক কোনও স্থানের স্বাস্থ্যনিবাসের এক যক্ষ্মারোগবিশেষজ্ঞ বৃদ্ধ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া সে সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিল। নিখিল ভারত যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'যক্ষ্মা-দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে মোহন রেডিও মারফৎ ঘোষণা করিল যে, সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। বিজয়, গীতা প্রভৃতি তখন বুঝিতে পারিল, মোহন কোথায় কিভাবে আছে। বিজয়ের চেষ্টায় মোহন ও গীতার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল।

আখ্যান বস্তুর মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। তবে ইহার ভিতর দিয়া শিক্ষণীয় এইটুকু নূতন জিনিষ দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, উপযুক্ত সময়ে ধরা পড়িলে, উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলে যক্ষ্মারোগীও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারে। দেশের জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি এই ভীষণ রোগ নিবারণের প্রতি আকৃষ্ট করিবার মহান প্রচেষ্টা ইহাতে রহিয়াছে। এই দিক দিয়া ছবিখানির মূল্য যথেষ্ট সন্দেহ নাই।

ছবিখানিতে নায়ক মোহনের ভূমিকায় কুন্দনলাল সাইগল, নায়িকা গীতার ভূমিকায় লীলা দেশাই এবং ডাক্তার বিজয়, রেডিও ম্যানেজার, গীতার মা, গীতার বাবা, স্বাস্থ্যনিবাসের ডাক্তার প্রভৃতির ভূমিকায় যথাক্রমে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, নিভাননী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

অভিনয়ের দিক দিয়া বইখানি খুব বেশী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কুন্দনলাল সাইগলের অভিনয়ের দিক দিয়া পূর্ব্বের চেয়ে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মোহনের জটিল চরিত্রাভিনয়ে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সামান্য হাস্যরসমিশ্রিত চরিত্র অভিনয়ে তিনি যেরূপ দক্ষ, জটিল চরিত্র অভিনয়ে সেরূপ দক্ষ নহেন, তাহা তাঁহার বর্ত্তমান অভিনয়ে বেশ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। গীতার ভূমিকায় লীলা দেশাইয়ের অভিনয় মন্দ হয় নাই। ডাঃ বিজয়ের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাতের অভিনয় মোটেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় নাই। এই দোষটি তাঁহার অভিনয়ের আরও কয়েক স্থানে রহিয়াছে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় জড়তাপূর্ণ। রেডিও ম্যানেজারের ভূমিকায় অমর মল্লিক ও গীতার পিতার ভূমিকায় ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় আমাদের ভাল লাগিয়াছে। গীতার মার চরিত্রটি নিভাননী মোটেই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। স্বাস্থ্য-নিবাসের ডাক্তারের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় নাট্যমঞ্চের অভিনয় হইয়াছে, ছায়াচিত্রের অভিনয় হয় নাই।

ছবিখানির পরিচালনা ও আলোকচিত্র গ্রহণের কার্য্য করিয়াছেন, নীতীন বসু। ইহার আলোকচিত্র গ্রহণের কার্য্যে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

নীতীনবাবু আলোচ্য ছবির পরিচালনায় আমাদের নূতন কিছুই দিতে পারেন নাই। তাঁর আগেকার ছবিগুলিতে তিনি যেভাবে কাহিনীকে পরিসমাপ্তির পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন, "জীবন-মরণ" চিত্রে তাহা হইতে কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তবে ছবির সর্ব্বশেষাংশে তিনি কিছু নূতনত্বের আমদানীর প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিনখানি গান ছবিখানিতে সন্নিবিষ্ট করায়, গানের দিক দিয়া ইহা সমৃদ্ধ হইয়াছে। পঙ্কজ মল্লিক ইহার গান কয়খানির সুর সংযোগ করিয়াছেন। সাইগলের গান কয়খানি সুগীত হইয়াছে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়া যে গানখানি গাওয়ান হইয়াছে, অন্ততঃ আমাদের তাহা ভাল লাগে নাই।

শ্রীতে "শর্ম্মিষ্ঠা"

"শর্ম্মিষ্ঠা" পৌরাণিক ছবি,—কালী ফিল্মস লিমিটেডের "শারদীয়া অর্ঘ্য"। গত ১৮ই অক্টোবর শ্রী ও বিজলী চিত্রগৃহে একই সময়ে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ছবিখানিতে অভিনয় করিয়াছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, রাণীবালা, চিত্রা, সুহাসিনী, ঊষা প্রভৃতি। ইহার প্রযোজনা করিয়াছেন প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, পরিচালনা করিয়াছেন নরেশ মিত্র এবং শব্দযন্ত্রী, আলোকচিত্রশিল্পী, সুরশিল্পী ও দৃশ্যসজ্জা পরিচালকের কার্য্য করিয়াছেন যথাক্রমে জগদীশ বসু, ননী সান্যাল, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও মনোরঞ্জন ভৌমিক। ইহার কথা-কাহিনী ও সঙ্গীত মনোজ বসুর।

ছবিখানির আখ্যানভাগ অতি পৌরাণিক; তাই আর যাহাই হউক বিশেষ কাহারও অজানা নয়। অসুররাজ-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া ইহার বিষয়-বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে।

অভিনয়ের দিক দিয়া বইখানি একেবারে বিশেষত্ব বর্জ্জিত বলিলেই চলে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী ও শর্ম্মিষ্ঠার ভূমিকায় রাণীবালা সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। কচের ভূমিকায় মঙ্গল চক্রবর্ত্তী, যযাতির ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, দেবযানীর ভূমিকায় চিত্রার অভিনয়ে সুষ্ঠু অভিনয় করিবার আন্তরিক প্রচেষ্টার আভাষ রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গি অনেক স্থানেই ভাববৈচিত্র্যহীন। দুন্দুভির ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় প্রাণহীন। অন্যান্যের অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। কৃষ্ণচন্দ্র দের গান কয়খানি ভাল হইয়াছে।

ছবিখানির দৃশ্যসজ্জা পরিচালনায় নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ রহিয়াছে। শুক্রাচার্য্যের প্রয়োগশালা প্রভৃতি দৃশ্যে ঘটনার ও কালের মধ্যে পারম্পর্য্য বিধানের জন্য শিল্পীর সাধনার ইঙ্গিত মিলে।

বিরামের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছবিখানির গতি বাধামুক্ত; দর্শকদের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজিবার জন্য থামিতে হয় না। কিন্তু ইহার শেষাংশে ঘটনার সামঞ্জস্য বিধানে যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়াছে।

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আগামী ১৫ই নবেম্বর হইতে বোম্বাইতে আরম্ভ হইবে। এই প্রতিযোগিতাটি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিমূলক ক্রিকেট খেলা। প্রত্যেক বৎসরই এই প্রতিযোগিতা বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দলে যোগদান করিয়া থাকেন। এই প্রতিযোগিতায় হিন্দু, পার্শী, মুসলিম, ইউরোপীয়ান ও অবশিষ্ট—এই পাঁচটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলিয়াই এই প্রতিযোগিতার নাম পেণ্টাঙ্গুলার হইয়াছে।

পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার ইতিহাস

১৯১২ সালে সর্ব্বপ্রথম কয়েকজন উৎসাহী পার্শী ও ইউরোপীয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড়ের প্রচেষ্টায় বোম্বাই ট্রায়াঙ্গুলার প্রতিযোগিতা খেলার সূচনা হয়। এই সময় মাত্র তিনটি দল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে বলিয়াই ইহার নাম ট্রায়াঙ্গুলার প্রতিযোগিতা দেওয়া হয়। ১৯১৫ সালে মুসলিম দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় এই প্রতিযোগিতাটি কোয়াড্রাঙ্গুলার নামে অভিহিত করা হয়। এই পর্য্যন্ত ইউরোপীয়ান ও পার্শী দলই এই প্রতিযোগিতায় বেশীর ভাগ বিজয়ী হইয়াছে। ইহাদের পরেই হিন্দু দলের স্থান। সর্ব্বনিম্ন স্থানে মুসলিম দলের নাম করা যাইতে পারে। তবে গত ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে পর পর দুইবার দুই বৎসর মুসলিম দল এই প্রতিযোগিতায় বিজয় গৌরব অর্জ্জন করায় সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে হিন্দু দল বিজয়ী হয়। কিন্তু ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ পর পর দুই বৎসর বিজয়ী হইয়া পূর্ব্বের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। ১৯৩৭ সাল হইতে অবশিষ্ট দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় এই প্রতিযোগিতার নাম পেণ্টাঙ্গুলার দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট দলে দেশীয় খৃষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়গণ খেলিয়া থাকেন।

হিন্দু, মুসলিম, পার্শী, ইউরোপীয়ান ও অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড়গণকে বিভিন্ন জিমখানার পরিচালকগণ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ হিন্দু দল—হিন্দু জিমখানা, মুসলিম দল—মুসলিম জিমখানা, পার্শী দল—পার্শী জিমখানা, ইউরোপীয়ান দল—ইউরোপীয়ান জিমখানা ও অবশিষ্ট দল খৃষ্টান জিমখানা নির্ব্বাচিত করেন।

হিন্দু দল নির্ব্বাচনে গণ্ডগোল

হিন্দু দল ব্যতীত অন্যান্য দলের খেলোয়াড় নির্ব্বাচন লইয়া কোন বৎসরই বিশেষ গণ্ডগোল হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। কিন্তু হিন্দু দল নির্ব্বাচন প্রতি বৎসরই একটি বিশেষ সমস্যার বিষয় হইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া গত ৭।৮ বৎসর হইতে প্রতি বৎসরই ভীষণ গণ্ডগোল পরিলক্ষিত হইতেছে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এই সকল গণ্ডগোলের মূলসূত্র আরম্ভ হইয়াছে, ভারতের কোন না কোন ক্রিকেট উৎসাহী রাজা বা মহারাজা হইতে। ইঁহারা ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ইঁহাদের জন্যই ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ অনেক সময় বৈদেশিক ক্রিকেট দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ও বৈদেশিক ক্রিকেট শিক্ষকের সাহায্য লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এমন কি ভারতের অনেক বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়ও ইঁহাদের অন্নেই পালিত হইয়া থাকেন। অথচ ইঁহারাই গণ্ডগোল সৃষ্টি করেন, কেবল মাত্র নিজেদের বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে নাম জাহির করিবার উদ্দেশ্যে। খেলোয়াড় নির্ব্বাচন, অধিনায়ক নির্ব্বাচন—সকল বিষয়েই ইঁহারা হস্তক্ষেপ করেন। যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, ইঁহারা চান সকল সময়ই ইঁহাদের কাহাকেও না কাহাকেও দলের অধিনায়ক করা হউক এবং ইঁহাদের মনোনীত খেলোয়াড়দের দলে স্থান দেওয়া হউক। যখনই এই সকল উদ্দেশ্য সাধনে ইঁহারা বাধা পাইয়াছেন, তখনই ইঁহারা নানা রূপ গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছেন। অপরের নির্ব্বাচিত দলের মধ্যে যাহাতে শৃংখলা ভঙ্গ হয় ও দল শক্তিহীন হইয়া পরাজিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কূট রাজনৈতিক চালের সকল কিছুই খেলার মধ্যে আরোপ করিয়া থাকেন। নিজ নিজ আশ্রিত খেলোয়াড়গণকে নির্ব্বাচিত দলে না খেলিতে অথবা খেলিলেও মনোযোগ সহকারে না খেলিতে নির্দ্দেশ দিতে ইঁহারা কোনরূপ দ্বিধা বোধ করেন না। তলে তলে এই সকল ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বলিয়া ইঁহারা মনে করেন, সাধারণে ইঁহাদের ধরিতে পারিবে না। কিন্তু ইঁহাদের সেই ধারণা প্রতি বৎসরই ব্যর্থ হইয়াছে। বিশেষ করিয়া গত বৎসর পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার সময় কোন এক মহারাজার চাল এতই স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছিল যে, দর্শকগণ খেলার মাঠে রীতিমত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিন্দু দলের পরিচালকগণ দর্শকগণকে প্রশমিত না করিলে সেই দিনই অতিশয় অপ্রীতিকর কিছু ঘটিত।

এই বৎসরের নূতন ব্যবস্থা

গত বৎসরের অভিজ্ঞতা হিন্দু জিমখানার পরিচালকগণকে এই বৎসর বিশেষ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিয়াছে। উক্ত রাজা, মহারাজাদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবার জন্য তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। তাঁহারা মেজর নাইডুকে দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। যে সকল খেলোয়াড় উক্ত অধিনায়কের সকল নির্দ্দেশ মানিয়া না চলিবে অথবা দলের শৃংখলা ভঙ্গ করিবে তাহাকে দলে স্থান দিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অধ্যাপক দেওধর, এল পি জয়, বিজয় মার্চ্চেণ্ট, সুমন্ত দেশাই ও অপর দুইজন প্রবীণ খেলোয়াড়কে লইয়া একটি খেলোয়াড়-নির্ব্বাচন-কমিটি গঠন করিয়াছেন। মেজর নাইডুও এই নির্ব্বাচন কমিটিকে সাহায্য করিতে পারিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই নির্ব্বাচন কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া পরিচালকগণ মানিয়া লইবেন। হিন্দু জিমখানার পরিচালকগণের ব্যবস্থা খুবই প্রশংসনীয়। ইহা সম্পূর্ণ হইলে ভারতীয় ক্রিকেটের সকল গণ্ডগোলের অবসান হইবে।

সমর-বার্ত্তা

৫ই অক্টোবর—

লার্টভিয়া ও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

লুক্সেমবুর্গ সীমান্তে জার্ম্মান ও ফরাসী ট্যাঙ্কবাহিনীর মধ্যে এক যুদ্ধের পর ফরাসীরা একটি বন অধিকার করিয়াছে।

ফ্রান্সের এক ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে বার্গজাবার্ণ, পিরমাসেম, জুইব্রুকেন, সারব্রুকেন, সারপুই এবং মার্জিগ শহরগুলি ফরাসী কামানের পাল্লামধ্যে আসিয়া পড়ায় জার্ম্মানগণ ঐ সব শহরের সমস্ত অ-সামরিক নাগরিককে স্থানান্তরিত করিয়াছে।

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষ মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, শত্রুপক্ষের আক্রমণের ফলে গত সপ্তাহে মাত্র ৮৭৬ টন ওজনের বৃটিশ মাল সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে। বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজগুলি ইউবোট আক্রমণ করিতেছে বলিয়া জার্ম্মাণ পক্ষ হইতে যে অভিযোগ করা হইয়াছে, লণ্ডনে তাহা সরকারীভাবে অস্বীকার করা হইয়াছে।

৬ই অক্টোবর—

পর্য্যাপ্ত রণসম্ভার লইয়া বহু বৃটিশ সৈন্য ফ্রান্সে পৌঁছিয়াছে।

হের হিটলার জার্ম্মান রাইখষ্ট্যাগে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বড় বড় শক্তি-পুঞ্জের এক সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করেন।

৭ই অক্টোবর—

জার্ম্মানরা সারব্রুকেন ও রাইন রণক্ষেত্রে তিন দিক হইতে দৃঢ়তার সহিত আক্রমণ চালায়। জার্ম্মানরা ১২ বার হানা দেয়। কিন্তু ফরাসী গোলন্দাজবাহিনীর গোলাবর্ষণে তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়।

চ্যাংসা রণক্ষেত্রে জাপানীদের শোচনীয় পরাজয় হইয়াছে। চীনারা দাবী করিতেছে যে, ঐ যুদ্ধে ৩০ হাজার জাপানী নিহত হইয়াছে।

৮ই অক্টোবর—

উত্তর সাগরে বৃটেনের পর্য্যবেক্ষণকারী বিমানপোত একটি জার্ম্মান ফ্লাইং বোটকে গুলী করিয়া নামিতে বাধ্য করে।

৯ই অক্টোবর—

পশ্চিম রণক্ষেত্রে জার্ম্মানীর তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্ম্মান গোলন্দাজবাহিনী মেজেল অঞ্চলে অবিরাম গোলা বর্ষণ করে। বেলজিয়ামের সীমান্ত ধরিয়া লাক্সেমবুর্গের উত্তর হইতে আয়-ল্য-সাপেল পর্য্যন্ত জার্ম্মানরা সীমান্ত সংরক্ষিত করিতেছে। সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্তে কনষ্ট্যান্স হ্রদ হইতে বাসলে পর্য্যন্ত রাইন নদের ডান তীরে বহু সংখ্যক জার্ম্মান সৈন্যের সমাবেশ হইতেছে।

১০ই অক্টোবর—

বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ হইতে জার্ম্মানগণকে সরাইবার কার্য্য চলিতেছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনের মোজেল ও সারব্রুকেন অঞ্চলে ফরাসী-বাহিনীর অবিরত চাপের ফলে জার্ম্মান সমর নায়কের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছে। সেজন্য জার্ম্মানরা ঐ অঞ্চলে বিশেষ-ভাবে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে।

ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মিঃ দালাদিয়ের এক বেতার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, বিজয়লাভ না করা পর্য্যন্ত ফ্রান্স ও বৃটেন সংগ্রাম চালাইবে।

১১ই অক্টোবর—

যুদ্ধ বাধিবার পাঁচ সপ্তাহ কাল মধ্যে বৃটেন ফ্রান্সের রণ-ক্ষেত্রে ১,৫৮,০০০ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে। অদ্য কমন্স সভায় সমর-সচিব হোর বেলিসা ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে বৃটিশবাহিনীর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে বিবৃতি দিতে গিয়া উপরোক্ত কথাগুলি বলেন।

লিথুয়ানিয়া ও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে সোভি-য়েট পোল্যাণ্ডের ভিলনা অঞ্চল লিথুয়ানিয়াকে প্রত্যর্পণ করিয়াছে। পোল্যাণ্ড ১৯২০ সালে লিথুয়ানিয়ার নিকট হইতে ঐ অঞ্চল দখল করিয়াছিল।

১২ই অক্টোবর—

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বালেন আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি দিতে গিয়া হের হিটলারের শান্তি-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্পর্কে বৃটেনের সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, হিটলারের পরিকল্পিত ভিত্তিতে শান্তি বৈঠক আহ্বানে বৃটেন রাজী নহে। মিঃ চেম্বারলেনের মতে হের হিটলারের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই।

১৩ই অক্টোবর—

উত্তর সাগরে ১৫০টি জার্ম্মান সামরিক বিমান ও বৃটিশ রণতরীসমূহের মধ্যে সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালায়।

১৪ই অক্টোবর—

বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'রয়েল ওক' জার্ম্মান সাবমেরিণের আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে। 'রয়েল ওক' ২৯ হাজার টনের জাহাজ এবং উহা নির্ম্মাণ করিতে পঁচিশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। 'কারেজাস' ডুবির পর ইহাই বৃটেনের বৃহত্তম ক্ষতি।

বৃটিশ নৌবহর কর্ত্তৃক তিনটি জার্ম্মান ইউ-বোট ধ্বংস হইয়াছে।

সারলুই এবং পশ্চিম অঞ্চলে জার্ম্মাণ গোলন্দাজবাহিনী গুলী চালায়; ফরাসী গোলন্দাজবাহিনীও তাহার জবাবে গুলী চালায়। সুইস সীমান্ত ধরিয়া রুর, হ্যানোভির এবং ব্ল্যাক ফরেষ্ট অঞ্চলে জার্ম্মানগণ আরও অধিক সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে।

ফরাসীরা গত কয়েক দিনের মধ্যে রাইন নদের বহু সেতু ধ্বংস করিয়াছে। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ এক্ষণে রাইন নদের উভয় তীরে মুখামুখিভাবে অবস্থান করিতেছে।

বল্কান ও বাল্টিক

(৬৭৫ পৃষ্ঠার পর)

তাহার ব্যর্থ হইয়াছেই বলিতে হইবে। তাহার ডুবো-জাহাজও কোন রকম সুবিধাই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যুদ্ধ যতই চলিবে, ততই তাহার শক্তি ক্ষীণ হইতে থাকিবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথম মুখে জোর দেখানই জার্ম্মান জাতির নীতি, সেই নীতির ভিতর দিয়া এ পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর যে শক্তির পরিচয় এবার পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বেশই বুঝা যাইতেছে যে, পোল্যাণ্ডকে অসহায় অবস্থায় পাইয়া যে কেরামতি দেখাইয়াছিল, সে কেরামতি অন্য দিকে কুলাইবে না। তাহাকে দিন দিনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৮শে সেপ্টেম্বর—

মহাত্মা গান্ধী লর্ড সভায় লর্ড জেটল্যাণ্ডের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, বৃটেনের অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবে জানিতে চাহিয়া কংগ্রেস কোন অদ্ভুত বা অসম্মানজনক কার্য করে নাই। গান্ধীজীর মতে স্বাধীন ভারতের সহায়তারই মূল্য আছে; সুতরাং কংগ্রেস যাহাতে লোকের নিকট গিয়া বলিতে পারে যে, যুদ্ধের শেষে বৃটেনের স্বাধীনতার যতটা নিশ্চয়তা থাকিবে, ভারতের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা তদপেক্ষা কম থাকিবে না, তজ্জন্য একথা জানাইবার অধিকার তাহার নিশ্চিতই আছে। বৃটিশ জাতির বন্ধু হিসাবে গান্ধীজী বৃটিশ রাজনীতিকদিগকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা পূর্বের ভাষা ভুলিয়া গিয়া নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবেন।

স্বর্গীয় বিঠলভাই প্যাটেলের উইলের মামলায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বিচারপতি মিঃ বি জে ওয়াদিয়ার রায়ের বিরুদ্ধে যে আপীল রুজু করিয়াছিলেন, অদ্য বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ কানিয়া তাহা ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন।

আলীপুর জেল হইতে আরও পাঁচজন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বন্দীদের নামঃ—শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল সিং, সুশীল চক্রবর্তী, কুমুদনাথ ঘোষ, মণীন্দ্রনাথ সেন ও ফণী দাশগুপ্ত।

কলিকাতা ও শহরতলীর মিল অঞ্চলে বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রথম 'মহড়ার' অনুষ্ঠান হয়। বিমান আক্রমণ সতর্কীকরণ কমিটির উদ্যোগে এই মহড়া হয়।

২৯শে সেপ্টেম্বর—

লাহোরে বামপন্থী সমন্বয় কমিটির সভায় ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে দেশের বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে যে পরিষ্কার মনোভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহার প্রশংসা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; তবে উহাতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। কমিটি সমস্ত বামপন্থী দলকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের কার্যে যেন কোনরূপ বাধা না দেওয়া হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সমস্ত কংগ্রেসসেবীকে নিজেদের পার্থক্য ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য যে আবেদন করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করা হয়। তবে ইহাও বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণপন্থিগণ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত নরীম্যান প্রভৃতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিলে তাঁহাদের এই আবেদনের আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

৩০শে সেপ্টেম্বর—

ভারত রক্ষা অর্ডিন্যান্স অগ্রাহ্য করার অভিযোগে অমৃতসরে বিশজন অহ্‌র গ্রেপ্তার হইয়াছে।

অদ্যকার 'হরিজন' পত্রিকায় "রহস্যাবৃত সমস্যা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী অহিংসা নীতির সহিত যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁহার মনোভাবের 'বাহ্যিক অসঙ্গতি ও দুর্বোধ্যতা' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহার একস্থানে গান্ধীজী বলিয়াছেন, "ঈশ্বর যদি আমাকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিতেন তাহা হইলে আমি ইংরেজ জাতিকে অধীন জাতিসমূহকে মুক্তি দিতে নির্দেশ দিতাম।............কিন্তু আমার ঐরূপ কোন ক্ষমতা নাই।

১লা অক্টোবর—

মধ্যপ্রদেশের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত টি জে কেদার ও অপর ১১ জন ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য যে সব অভিযোগ আনয়ন করেন, সে সম্বন্ধে কংগ্রেস সভাপতি যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি শ্রীযুক্ত মিশ্রকে ঐ সব অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রে "ভারত কি সামরিক দেশ" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে গান্ধীজী ভারতের প্রধান সেনাপতির গত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের বেতার বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারত সামরিক দেশ নহে।

২রা অক্টোবর—

ডাঃ দেবেশচন্দ্র মুখার্জ্জি চীন হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে চীনে যে ভারতীয় চিকিৎসক দল প্রেরিত হয়, ডাঃ দেবেশ মুখার্জ্জি তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন।

বোম্বাইয়ের মিলসমূহে ব্যাপক শ্রমিক ধর্ম্মঘট হয়।

দিল্লীতে গান্ধী, নেহরু ও মৌলানা আজাদের মধ্যে আলোচনার পর কংগ্রেস-যুদ্ধ-সাব-কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। চেয়ারম্যান পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩রা অক্টোবর—

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দিল্লীতে বড়লাটের প্রাসাদে লর্ড লিনলিথগোর সহিত সওয়া দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক কমরেড সুধীর দাশগুপ্ত জরুরী প্রেস আইনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

৪ঠা অক্টোবর—

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল দিল্লীতে বড়লাট ভবনে লর্ড লিনলিথগোর সহিত সাক্ষাৎ করেন। বড়লাটের সহিত তাঁহার পৌনে এক ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়। অতঃপর বিড়লা ভবনে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আরম্ভ হয়।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মিটমাট সম্পর্কে দিল্লীতে পণ্ডিত নেহরু ও মিঃ জিন্নার মধ্যে আলোচনা হয়।

আন্দামান প্রত্যাগত রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরখেল (৩৪) দণ্ডকাল শেষ হইবার পূর্ব্বে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

৫ই অক্টোবর—

দিল্লীতে বড়লাট প্রাসাদে পুনরায় গান্ধী-লিনলিথগো সাক্ষাৎকার হয়। মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাটের মধ্যে দেড় ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে দেড় ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়।

৭ই অক্টোবর—

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়।

অদ্যকার 'হরিজন' পত্রিকায় 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য' শীর্ষক এক প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন, "লীগ অথবা উহার সদস্যদের প্রতি কোনরূপ তিক্ততা প্রকাশ করা কংগ্রেস সেবী এবং কংগ্রেসের পক্ষে অসঙ্গত।"

৮ই অক্টোবর—

বুলন্দসহর জেলে খাকসারদের সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে পুলিশ গুলী চালনা করে এবং তাহাতে ৫ জন খাকসার নিহত এবং বিশজন আহত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নাগপুরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

৯ই অক্টোবর—

ওয়ার্ধায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিকে ওয়ার্কিং কমিটির পূর্ব্বোক্ত বিবৃতি এবং জরুরী যুদ্ধ সাব-কমিটি গঠন অনুমোদন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে যথোপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান করিবার অনুরোধও এই প্রস্তাবে করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছে যে, ভারতীয়গণকে স্বাধীন জাতি বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে এবং অবিলম্বে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি আশা করেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ বিবৃতিই দেন না কেন তাহাতে এই ঘোষণার কথা থাকিবে। আজ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে এই প্রস্তাব সম্পর্কে তুমুল আলোচনা চলে। এই প্রস্তাবের উপর ২২টি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। অধিকাংশ সংশোধন প্রস্তাবই বামপন্থীদের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হয় এবং উহাতে যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসকে পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকিতে অনুরোধ করা হয়।

হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সাভারকর দিল্লীতে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে ৪৫ মিনিট আলোচনা হয়।

গতকল্য ও অদ্য কলিকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ কলিকাতা ও শহরতলীর প্রায় আট জায়গায় খানাতল্লাসী করিয়া কয়েকখানি আপত্তিকর পুস্তিকা উদ্ধার করে। এই সম্পর্কে ১২ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চুয়াডাঙ্গার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস ইসমাইল মাজদিয়া ট্রেণ সংঘর্ষ মামলার রায় দিয়াছেন। ড্রাইভার ডবলিউ জে পিয়ার্সন এবং গার্ড জি নেমী যথাক্রমে তিন বৎসর এবং দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ফায়ারম্যান এল ই গাথার এবং এ এম মুকদুম বে-কসুর মুক্তিলাভ করিয়াছে।

১০ই অক্টোবর—

ওয়ার্ধায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যুদ্ধ সম্পর্কিত ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের সংশোধন প্রস্তাবটি ৬৪-১৮১ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশন স্থগিত রাখা ও প্রয়োজন হইলে তৎপূর্ব্বে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অপরাহ্নের অধিবেশনে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর একটি বক্তৃতার পর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

দিল্লীতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত বড়লাটের সাক্ষাৎকার হয়। তাঁহাদের মধ্যে ৪৫ মিনিটকাল আলোচনা হয়।

১১ই অক্টোবর—

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা হয়। কংগ্রেসী সদস্যগণ, বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ ও প্রধান মন্ত্রীদের এক বৈঠকে আজ যুদ্ধ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির বিবৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন আইন-সভার কংগ্রেসী দলগুলির ইতিকর্ত্তব্য সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনান্তে বিভিন্ন আইন-সভার কংগ্রেসী দলগুলিকে ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি যুদ্ধ সম্পর্কে এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন যে, দেশীয় রাজ্যসমূহে যে স্বৈরাচার চলিয়াছে, উহা সমর্থন করিলে গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরুদ্ধাচারণই করা হইবে। যুদ্ধ বাধিয়াছে বলিয়াই দেশীয় রাজ্য-সমূহে স্বৈরাচার চলিতে থাকিবে, ইহা হইতেই পারে না। কমিটি সমুদয় দেশীয় নৃপতিমণ্ডলীকে দমনমূলক আইনসমূহ রদ করিতে ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

কলিকাতার স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ পুলিশ ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স অনুসারে কলিকাতা ও শহরতলীর নানাস্থানে খানাতল্লাসী করে। গত ৯ই তারিখে কলিকাতা গোয়েন্দা পুলিশ নানাস্থানে খানাতল্লাসী করিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর সকলকে আই-বি অফিসে লইয়া গিয়া নানা প্রশ্ন করা হয়। তারপর পুলিশ আব্দুল মোমিন, ভবানী সেন, প্রমোদ দাসগুপ্ত, সমর ঘোষ, অবনী লাহিড়ী প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দেয়। মাত্র ছাত্র ফেডারেশনের সভ্যা শ্রীমতী কনক দাসগুপ্ত ও তাহার ভগিনী শ্রীমতী সাধনা দাসগুপ্তকে ১০০০, টাকা ও ৭০০, টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বিরহী

(কথিকা)

শ্রীযূথিকা গুহ

শরৎকাল। ছোট্ট একটি নদী বয়ে যাচ্ছে—ছল্ ছল্ করে। জল তার ঢেকে গেছে শ্বেতরক্ত শতদলে;......নীল আকাশে পাল তোলা নৌকার মত ভেসে যায় এক একটুক্‌রা শুভ্র মেঘ।......

মহুয়া গাছের তলায় একটি মেয়ে সাজি-ভরা ফুলে মালা গাঁথ্তে বসেছে।......

সহসা দূরে শোনা যায় বাঁশীর মদির মন্দ্র......। মেয়েটি ত্রস্ত হয়ে নড়ে ওঠে; তাড়াতাড়ি মালা শেষ করবার জন্যে... সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে একটু।......

বাঁশী হঠাৎ থেমে যায়।......মেয়েটি তখন মালা শেষ করতে ব্যস্ত; বাঁশীর নীরবতা তার কানে যায় না হয়ত! মালা শেষ হয়ে এসেছে।......

হঠাৎ সে চম্‌কে ওঠে কার শীতল স্পর্শে। একটি সুশ্রী ছেলে কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়ে তার চোখ টিপে ধরেছে...... মেয়েটি বুঝতে পারে না।......বলে,—"ছাড় তো, লাগে না বুঝি?"...কিন্তু অনুতপ্ত হয়ে ছেলেটি বলে, "খুব লেগেছে না?"

মেয়েটি হেসে ফেলে—ওর মুখটি দেখে।......"থাক্ অনেক হয়েছে; আমাকে যে সেই গানটা বাঁশীতে বাজিয়ে শোনাবে বলেছিলে, শোনাও না আজ!" ছেলেটি ওর পাশে বসে পড়ে। মেয়েটি মালাটা তার গলায় দিল পরিয়ে। হেসে ছেলেটি বলে,—"গান না শুনে আগেই পুরস্কার নাকি? এবার যদি গান না শুনাই?" "ইস্, অত সাহস নেই তোমার।"...মৃদু হেসে মেয়েটি বলে! ছেলেটিও হাসে!......

ধীরে ধীরে পূরবী তানে বেজে ওঠে বাঁশী;...সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে।...মেয়েটি উঠে দাঁড়ায় চুপি চুপি কি যেন বলে ছেলেটিকে। তারপর.........মিলিয়ে যায় গ্রামের পথে।......

সেদিন একটু দেরী হয়ে যায়...ছেলেটির আসতে। এসে দেখে—'মেয়েটি নাই।' ভাবে—হয়ত কোথাও লুকিয়ে আছে।...

চিরপরিচিত মহুয়া গাছের কাছে এগিয়ে যায়...সে। ইতস্তত ত্রস্তভাবে তাকায়;...হঠাৎ দেখে গাছের নীচে পড়ে আছে একটি মালা...তার মাঝে—ছোট্ট একটুক্‌রা কাগজ।... বিস্মিত হয়ে কাগজ ধরে চোখের সামনে তুলে নেয় ছেলেটি।...

পড়তে পড়তে তার সামনে ভেসে ওঠে...কঠিন বাস্তবের নির্ম্মম রূপ।......

মন তার মুষড়ে পড়ে।...ইচ্ছা হয় না একটি মুহূর্ত্তও পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে। কিন্তু......

মেয়েটির শেষ অনুরোধ মনে পড়ে তার। 'মরা' আর হয় না।......কত কি আনমনে ভাবে সে।...সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চাঁদ তার স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে... পৃথিবীর উপর। গাছের পাতার উপর জ্যোছ্‌নার স্বচ্ছ আলো ঝিক্‌মিক্ করছে।...ছেলেটি বসে আছে তখনও—সেই মহুয়া গাছের তলায়।......আরো কিছুক্ষণ পরে সে উঠে পড়ে ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলে, হাতে তার মালায় জড়ান ছোট্ট চিঠিখানা...আর বাঁশীটি।......

......তারপর সে চলে কোন অজানার পানে......কেউ তা জানে না। তবে নাকি...বনে বনে বাজায় সে বাঁশী। এখনও মেঘলা দিনে উদাসী শুনতে পায় তার বাঁশী। মেঘদূতের যক্ষের মত নিৰ্জ্জন প্রান্তরে বা নদীর পারে বসে এখনও বুঝি-বা সে আনমনে বাজিয়ে চলেছে—বাঁশের বাঁশীটি।......

দেশ সাপ্তাহিকের আগামী ৫২শ সংখ্যা (১১ই নবেম্বর) প্রকাশিত হইবার সঙ্গেই ৬ষ্ঠ বর্ষ সমাপ্ত হইবে। নূতন অর্থাৎ সপ্তম বর্ষের আরম্ভ হইবে ১৮ই নবেম্বর প্রথম সংখ্যার প্রকাশ দ্বারা।

সম্পাদক—'দেশ'

পুস্তক পরিচয়

সাঁঝের প্রদীপ—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক বিরচিত। প্রাপ্তিস্থান—দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্—৪বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

কবি কালীকিঙ্করের 'সাঁঝের প্রদীপ' পড়িয়া মনে হইল সংসার বিষবৃক্ষে ভাল কাব্যকে যে অমৃতময় ফল বলা হইয়াছে, ইহা একটুও অত্যুক্তি নহে। সাঁঝের প্রদীপে বাঙলার কাব্যলক্ষ্মীর যে স্নিগ্ধমূর্ত্তি দেখিলাম, অনেকদিন এমন মূর্ত্তি দেখি নাই। ছন্দের কারিগরি দেখাইয়া বাহিরের চাকচিক্যে পাঠক-হৃদয়কে প্রলুব্ধ করিবার আয়োজন ইহার মধ্যে নাই। কবি অন্তর দিয়া যাহা অনুভব করিয়াছেন, সেই অনুভূতির নিবিড়তাই কবিতাগুলিকে এমন হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে। অনুভূতির তীব্রতা যেমন কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য, ভাষার সৌন্দর্য্যও তেমনি তাহাদের বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। কবি কালীকিঙ্কর গৌড়জনকে এমন নির্ম্মল এবং সুস্বাদু কাব্যরস পান করাইয়া সত্য-সত্যই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বাঁধাই, ছাপা সবই সুন্দর।

'ইনক্লাব' অর্থাৎ সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন। প্রথম খণ্ড। শ্রীশ্যামপ্রসন্ন দে কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ও প্রকাশিত। মূল্য বার আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্যামপ্রসন্ন দে, ব্যাস ঘেরা, পোঃ বৃন্দাবন, মথুরা।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা। মুদ্রাকর প্রমাদ এত বেশী যে, পাঠোদ্ধার করা কঠিন। ক্রান্তি কথাটির উপর গ্রন্থকারের বিশেষ বিতৃষ্ণা পরিলক্ষিত হইয়াছে। হিন্দী ভাষায় ক্রান্তি সম্বন্ধে আজকাল যে অর্থ ব্যক্ত করে, বোধ হয় তাহাই গ্রন্থকারের ভ্রান্তি ঘটাইয়াছে।

আরতি—লেখক শ্রীপ্রবোধ ঘোষ, ১১।৪এ, লেক রোড, কলিকাতা। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

প্রবীণ ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী বাঙালী পাঠক সমাজে এই ছোট বইটির পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,—"আরতি একখানি ছোট গল্পের ছোট বই।" লেখকের "ভাষা ও কথাবস্তু সম্পূর্ণ নূতন।" এই গুণেই আরতির গল্পগুলি চৌধুরী মহাশয়ের মত একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরসিকের মন মুগ্ধ করতে পেরেছে।

এই বইটির পত্রপুটে একুশটি ছোট গল্প আশ্রয় পেয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনের সামান্য এক-একটা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রেই এই গল্পগুলি অনাড়ম্বর স্বচ্ছ সংযত ভাষায় সংক্ষেপে বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পেই লেখকের দরদী হৃদয়ের, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের, সুকুমার বৈদগ্ধের এবং একটা বিশিষ্ট ভঙ্গীর দেখা পাই—যা দুর্লভ।

'আলো ও ছায়া', 'ভিক্ষা', 'আত্মপ্রসাদ', 'গাড়ীর আলাপ' প্রভৃতি গল্পে শক্তিমান লেখক তাঁর সংযত বলিষ্ঠ ভাষায় এমন এক-একটি রসের সঞ্চার করেছেন, যার উজ্জ্বল স্নিগ্ধ কমনীয়তায় মুগ্ধ হতে হয়।

প্রভাতের অরুণালোকে তৃণশীর্ষে সমুজ্জ্বল ছোট ছোট শিশিরবিন্দুর মতই 'আরতি'র গল্পগুলি বস্তুভারহীন সামান্য, কিন্তু উজ্জ্বল সুন্দর—পড়ে মন ব্যথিয়ে ওঠে কিন্তু আনন্দিত হয়।

সাহিত্য-সংবাদ

রচনা প্রতিযোগিতা

তন্তু কল্যাণ দলের আলোচনা সভার উদ্যোগে তন্তুবায় নরনারীর জন্য একটি রচনা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইবে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য দুইটি রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইবে—পুরুষদিগের জন্য একটি ও মহিলাদিগের জন্য একটি। রচনা দশ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় নিম্নলিখিত রচনার যে কোন একটি ৩০শে নবেম্বরের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

(১) বাঙলার তাঁত-শিল্প; (২) যে কোন কৃতী তন্তুবায়ের জীবনী; (৩) আধুনিক জগতে বিজ্ঞানের স্থান; (৪) পল্লী-সংস্কার; (৫) নারী-শিক্ষা; (৬) ছোট গল্প (পুরুষদিগের জন্য নহে)।

সম্পাদক—"**বয়ন**"; ১৭১-বি, অপার সার্কুলার রোড,

গল্প প্রতিযোগিতা

পুরস্কারঃ—১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারীর প্রত্যেককে একখানি করিয়া রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

উক্ত প্রতিযোগিতাটি কেবলমাত্র স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদিগের জন্য।

গল্পটি মৌলিক এবং পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, এরূপ হওয়া চাই। প্রত্যেকে একটির বেশী গল্প পাঠাইতে পারিবেন না। গল্পটি বাঙলায় হওয়া চাই এবং ১০ পৃষ্ঠার (ফুলস্কেপ সাইজ) অধিক হইবে না। ৩০শে অক্টোবরের ভিতর নাম ও ঠিকানাসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় গল্পটি পেঁৗছান চাই। প্রবেশ মূল্য নাই। মনোনীত যে কোনও গল্প স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

ঠিকানাঃ—সেক্রেটারী, ফ্রেন্ডস এ্যাসেম্বলী, ৪২, রামচরণ শেঠ রোড, পোঃ সাঁত্রাগাছি (হাওড়া)।

গল্প প্রতিযোগিতা

—১০৲ টাকা পুরস্কার—

অনিবার্য্য কারণ বশত আমাদের এই প্রতিযোগিতার সময় বর্দ্ধিত করিতে বাধ্য হইলাম। আগামী ২৫শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতার জন্য গল্প লওয়া হইবে।

কথা-ভারতী, পরিচালক—"সাজি", ৩৫নং অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা।

৬ষ্ঠ বর্ষ। শনিবার, ২৭শে আশ্বিন, ১৩৪৬ সাল Saturday, 14th October, 1939 ৪৮শ (শারদীয়া) সংখ্যা

আগমনী

মা আসিতেছেন। দশদিকে সাড়া জাগাইয়া, ভুবন সাগর নাড়া দিয়া, খাঁড়া দোলাইয়া মা আসিতেছেন; মা এমনই আসেন, আমরা চাই বা না চাই, তাঁহার কাজের বিরাম নাই, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কে কেন্দ্র করিয়া মায়ের এই লীলা অহরহ চলিতেছে। সব সময় তাঁহার এই লীলা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। সূক্ষ্ম চৈতন্য-শক্তি-স্বরূপিণী তিনি তাঁহার লীলা-চক্র ঘুরাইতে থাকেন, কখন কখনও তাঁহার এই লীলা স্থূল তত্ত্বে প্রকটিত হয়, দেবতাদের কার্য্য সিদ্ধির জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহার সেই অবতরণের ভিতর দিয়া ভক্ত তাঁহার বরদা মূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হয়। সর্ব্বস্ব সঁপিয়া মায়ের পূজা করে।

মা আজ এমন রূপেই আসিতেছেন। আজ তাঁহার মূর্ত্তি প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি; তিনি কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি এবং দারুণা তাঁহার বেশ। ধ্বংসলীলায় তিনি মাতিয়াছেন, রৌদ্ররূপে তিনি জাগিয়াছেন। যিনি শিব সীমন্তিনী, তিনি আজ জ্বালা-করাল-অত্যুগ্র-অশেষ-অসুর নিসূদনী-সিংহ-বাহিনী!

আমরা বাঙালী, এ মূর্ত্তি মায়ের দেখিতে আমরা অভ্যস্ত নহি; এ মূর্ত্তি দেখিলে আমাদের চোখ ধাঁধিয়া যায়; আমরা ভীত হই, প্রকম্পিত হই, আমরা কাতর হইয়া বলি—পাহি বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বম্। মা তোমার ঐ রূপ সংযত কর। তুমি যে আমাদের মা, স্নেহময়ী, দয়াময়ী তুমি, তোমার এ কি বেশ?

কিন্তু সাধক বলিলেন, যে স্নিগ্ধ মধুর, শরতের সুরত-ইন্দুখণ্ডের মতন অমল উজ্জ্বল কোমল সেই মূর্ত্তিই মায়ের একমাত্র মূর্ত্তি নয়। দেখ দেখ, অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে দেখ,—'অন্তরে' দেখিলে মায়ের দেখিবে অনন্ত বেশ। বাহিরের বিষয়-ভাবনা লইয়া মাকে দেখিয়াছ, অন্তরে তাঁহাকে দেখিয়াছ কি?—সেখানে তিনি আর খণ্ড নহেন, অখণ্ডৈক-রসানন্দ-কলেবর-সুধা সেখানে স্বচ্ছন্দ ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, বাঁধন সেখানে নাই, মা সেখানে অধীরা, অবীরা এবং উন্মাদিনী। তাঁহার মাথার কিরীটের কাঁপনিতে মেঘমালা খণ্ড খণ্ড হয়, তাঁহার ধনুকের জ্যা নির্ঘোষে চরাচর হয় বিক্ষুব্ধ, তাঁহার চরণের চাপে সপ্ত সমুদ্র উচ্ছলিয়া উঠে। মাভৈঃ মাভৈঃ রবে আকাশ-পাতাল হয় মুখরিত।

মায়ের এই যে মূর্ত্তি—এ মূর্ত্তি ভৈরবী মূর্ত্তি, এখানেই মাতৃ-প্রেমের পরম প্রচণ্ডতার প্রলয়ঙ্কর প্রকাশ। এ মূর্ত্তি যে দেখে নাই, সে মায়ের প্রেম বুঝে না, মায়ের স্নেহরসের গতি এবং প্রকৃতি জানে না। উন্মাদিনী মায়ের এই অখণ্ডৈক রসানন্দ যে আস্বাদন করে নাই, মাতৃ-ভাবের মননই তাহার নাই। মাতৃ-মহিমার মনন-বিহীন হইয়া সে দিনের পর দিন মরণের জাঁতাকলের মধ্যেই পিষ্ট হইতেছে এবং পোকা মাকড়ের মত মরিতেছে। শঙ্কাহারিণী তারিণীর নাম সে বৃথাই উচ্চারণ করে, অশেষ ভীতি-নাশিনী দুর্গার নাম তাহার মুখে অলসের সময়ক্ষেপ মাত্র। মাতৃ-মনন বিহীন যে সে যে মৃত—সে নিৰ্জ্জীব, সে মনুষ্যত্ব শূন্য, কাপুরুষ সে, কলঙ্কময় তাহার জীবন। বাস্তব জীবনে সাধনার অভাবের জন্যই এই বিভীষিকা। মাটিকে আশ্রয় করিয়া মা যে আছেন, তিনি যে ভূমিস্থায়ী এই তত্ত্বের উপর বাস্তব জীবন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা দেশকে ভালবাসিতে জানি না, জাতিকে ভালবাসিতে জানি না। এই মাকে ভালবাসি, একথা যখন আমরা বলি, তখন হয় মিথ্যাচার। এই মিথ্যাচারের জন্য আমাদের দৃষ্টি কার্পণ্য দোষ-দুষ্ট বলিয়াই সর্ব্বস্বরূপিণী—সর্ব্বেষাম্ আদিরূপিণী, মায়ের অখণ্ড ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তি—দেখিলে ভয় পাই। যে জীবনে বাস্তব সাধনা নাই, শুধু শোনা কথাতেই ভরা, শ্রবণ যেখানে মনন এবং নিদিধ্যাসন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, সেইখানেই এমন শঙ্কা। মায়ের মূর্ত্তি সত্যস্বরূপে দেখিতে হইলে শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন সমানভাবেই প্রয়োজন হয় এবং সেইভাবে মনের ময়লা কাটিয়া মায়ের মহতী ইচ্ছার কাছে নিজকে যন্ত্র করিয়া দিতে হয়। সুতরাং জীবনে সেজন্য চাই মন্ত্র এবং সেই মন্ত্র-সাধনার তন্ত্র।

এ দেশে যাঁহারা মাতৃসাধক ছিলেন, যাঁহারা তন্ত্র জানিতেন, মন্ত্র জানিতেন এবং সেই তন্ত্র-মন্ত্রকে সাধনার ভিতর

দিয়া সত্য করিয়া তুলিতে জানিতেন, মায়ের এই সুদুর্দ্দর্শ মূর্ত্তি তাঁহারা দেখিয়াছেন, জীবনের গোণা কালের মধ্যে নয়, কালের সীমাকে অতিক্রম করিয়া মহাকালের বুকে মায়ের এই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির লীলা তাঁহারাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কালরাত্রি, মহারাত্রির নিবিড় আঁধারে মায়ের সেই অন্তহীন উদ্দাম রূপের সুধা তাঁহারা পান করিয়াছেন। তাঁহারাই মায়ের সন্তান। যমের ভটাকে তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়া জাগ্রত নিত্য এবং সত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ভৈরবী মায়ের সে সাধনা বাঙালী ভুলিতে বসিয়াছে। আজ সে জাতি মৃত্যুগ্রস্ত, মরণত্রস্ত। কিন্তু মা তো সন্তানকে ভুলিতে পারেন না—! তিনি আসেন, সাড়া জাগাইয়া আসেন, ভীতির প্রতিবেশ প্রভাবের ভিতর দিয়াই অভয়া তাঁহার প্রচণ্ড প্রেমের ভৈরব আকর্ষণে আমাদের ইতর রাগকে ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করেন। ডাকিয়া বলেন,—দেখ, দেখ, আমাকে চাহিয়া দেখ। চোখ মেলিয়া মায়ের রূপ দেখ নাই, তাই শিহরিয়া উঠিতেছ। তুমি যে অভয়ার সন্তান, তুমি যে অমৃতের পুত্র, ত্যাগের অমোঘ এবং অনিবার্য্য আকর্ষণের মধ্যেও আভাষে তাঁহাকে উপলব্ধি কর। মা আজ আসিয়াছেন—সন্তানের প্রেমে পাগলিনী মা আমার আসিয়াছেন। যে মায়ের চাঁচর চিকুরে গিরিরাণী কত যত্ন করিয়া বেণী বাঁধিতেন, সেই মা আজ আসিয়াছেন জটাজুট সমাযুক্তা অর্দ্ধেন্দু কৃতশেখরা সাজিয়া, যে মায়ের গলায় ইন্দ্রনীল মহানীল পদ্মরাগের অপরিম্লান মালা শোভা পাইত, সেই মা আসিয়াছেন বিষজ্বালা সমাকীর্ণা ফণিহারের জ্বালা-মালা কণ্ঠে বিলম্বিত করিয়া; যে মায়ের করতল কোটি চন্দ্র সুশীতল, সেই মা করাল শূল করে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। মা আজ অগ্নিবর্ণা, অতি রৌদ্ররসে তিনি আজ মূর্ত্তিময়ী রণরঙ্গিণী।

এসো মা, ভৈরবী রূপে যদি তুমি আসিয়াছ, তোমার ঐ রূপের মধ্যে প্রচণ্ড দৈত্য দর্পহারী তোমার প্রচণ্ড প্রেমের মহতী শক্তি উপলব্ধি করিবার মত মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে জাগ্রত কর। তোমার দনুজদলন-লীলারস রূপ আমাকে দেখাও। দেখাও আমাকে তোমার সেই রূপ, যে রূপের মধ্যে নারায়ণি তোমার অখণ্ডৈক রসানন্দ নিহিত রহিয়াছে। বিশ্বাত্মিকা, বিশ্বের ভাবনা নিত্য তোমার রসধারাকে আশ্রয় করিয়া আকার ধরিয়া উঠিতেছে, বিশ্বের অন্তরে শতদলের দল ফুটিতেছে তোমার প্রেমের স্পর্শে। বিশ্বের বীজ-স্বরূপিণী তুমি, বিশ্বের বার্ত্তা তুমি, বিশ্বের ভিতর দিয়া তোমার লীলারই বিস্তার ঘটিতেছে। মানব সভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তির কারণ স্বরূপিণী তুমি—কারণানন্দদায়িনী, আজিকার এই কালরাত্রির ঘনান্ধকারের মধ্যে আনন্দময়ী মা তোমার আনন্দ লীলাকে আমার কাছে উন্মুক্ত কর—স্বচ্ছন্দ স্ফুরণং অত্র বিধেহি কুলরূপিণী!

এসো মা, তুমি অতি সৌম্যা এবং অতি সৌম্যা বলিয়াই তুমি অতি রৌদ্রা; এই যে তোমার রসতত্ত্ব—এই যে তোমার লীলাতত্ত্ব—আমার জীবনে আজ সত্য হউক। তোমার এই কয়েক দিনের পূজার ভিতর দিয়া আজিকার এই মহাসন্ধি-ক্ষণে বিশ্বের অন্তর রসে নিজকে সিক্ত করিয়া প্রগাঢ় প্রেমের প্রভাবে তোমার আনন্দামৃতের আস্বাদন আমাদের ভিতর নিত্য করিয়া দাও। বিশ্ব-কল্যাণ-বিধাত্রী কল্যাণময়ী, তোমার সেই বিশ্ব-কল্যাণ লীলায় আমরা যেন নিজদিগকে নিবেদন করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি। আজ জগতে তোমার যে খড়্গের খেলা আরম্ভ হইয়াছে, সেই খড়্গের মঙ্গল-মূর্ত্তি প্রকট কর মা-

অসুরাসৃগ্বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে
করোজ্জ্বলঃ
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে
ত্বাং নতা বয়ম্।

মিলন-মঙ্গল

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পি-এইচ-ডি

চারিদিকের হৃদয়বিদারী বিরোধের মধ্যে মিলন-মঙ্গল গাহিতে বসিলাম, মিলনের দেবতা আমার সহায় হউন। যাকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াই আমরা প্রতিবেশীকে ভাই বলিয়া জড়াইয়া ধরি,—মিলনের প্রয়োজনীয়তা নিবিড়তররূপে উপলব্ধি করি। আমাদের জন্মভূমি জননীকে বহুদিন—বহু-বহু বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দু, মুসলমানে মিলিয়া সাড়ম্বরে পলাশী প্রাঙ্গণ হইতে ছুঁড়িয়া ভাগিরথী গর্ভে ফেলিয়া দিয়াছি। মা আর উঠেন নাই—কবে উঠিবেন, বিধাতাই জানেন। কিন্তু মাতৃহীন আমাদের বিজয়ার আলিঙ্গনের দিন কি আসিবে না? আমরা কি চিরকাল কাফের-যবন আওড়াইতে আওড়াইতে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিব? আছে কি? ভক্তি যেখানেই অর্পণ করিবে, অর্ঘ্য যেখানেই নিক্ষেপ করিবে, তাঁহার শ্রীচরণেই যাইয়া পড়িবে। উপনিষদ বলিয়াছেন;—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ।"—দৃশ্যমান্ জগতের এই ঈশ্বরময়তত্ত্ব সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সাধকগণের দৃষ্ট সত্য। কবীর বলিয়াছেন, তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে ভয় পাই, তাঁহার নিকট দুঃখ নিবেদন করিতে বাক্য স্তব্ধ হইয়া যায়। ঐরূপ করিলেই তো প্রমাণ হইবে, তিনি আমা হইতে ভিন্ন কিছু। লাহোরে দিবানিশি অবস্থান করিয়া আমি লাহোর অভিমুখে যদি রওনা হইতে চেষ্টা করি, তাহা শুদ্ধ
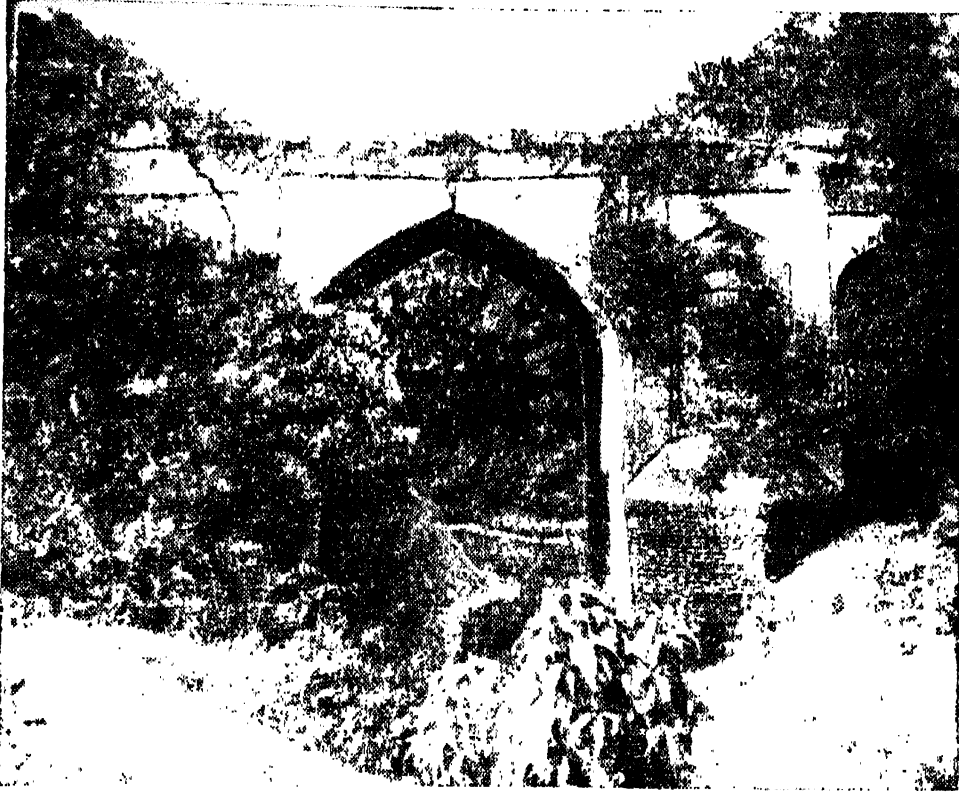
চাঁপাতলীর পুল—মনোয়ার খান বাগের দেওয়ানদের কর্ম্মচারী লাগা রাজমল কর্তৃক নির্ম্মিত। নারায়ণগঞ্জ হইতে ৪ মাইল দূরে।

এই মারাত্মক উচ্চাটন মন্ত্র দেশবাসীকে যাঁহারা জপিতে শিখাইতেছেন, তাঁহারা দেশের যে কি ঘোর অনিষ্ট করিতেছেন, বুঝিতেছেন না। কিন্তু দেশ তো চিরদিন এ মন্ত্র জপিত না। দেশবাসী চিরকাল পীরের দরগায় সিন্নি দিয়া, ঠাকুরাণীর থানে মানত করিয়া, পরম নিশ্চিন্তে ভাই-বেরাদর, খুড়া চাচা সম্পর্ক পাতাইয়া শান্তিতে বাস করিয়া আসিয়াছে। এই শান্তিতে স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া যে বা যাহারা অশান্তির আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে,—মহাকালের অব্যর্থ সূক্ষ্ম বিচারে তাহারা কিছুতেই অব্যাহতি পাইবে না। ঈশ্বর ভয়ানক হিংসুক,—পীর বা ঠাকুরাণীকে ভক্তি করিলে তিনি বিসদৃশ রকমে গাল ফুলাইয়া বসিয়া থাকেন,—এই সেমিটিক ভ্রান্ত মনোভাবের প্রশ্রয় যাঁহারা দিতেছেন, তাঁহারা হয় ভুল করিতেছেন, নচেৎ নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনের জন্য সেই অসীম অব্যয় সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ সত্তা সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছেন। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ সেই মহারসেরই প্রকাশ, অহর্নিশ তাহাতেই নিমজ্জিত, পরিপ্লুত, অণুতে অণুতে বিদ্ধ। তাঁহাকে ছাড়াইয়া যাইবার কোন উপায় পাগলের অভিযানই হইবে। তাই মনের খেদে পূর্ব্ববঙ্গের বাউল মদন সেখ গাহিয়াছিলেন—

"সাঁইরে, তোর পথ ঢাকাছে মন্দিরে মসজিদে।
তবু যদি পথ খুঁজ্যা পাই, রুইখ্যা খাড়য় গুরু আর মুরশিদে।
তোর পথ ঢাকাছে মন্দিরে মসজিদে॥ *

কুমিল্লায় ত্রিপুরারাজ গোবিন্দ মাণিক্য নির্ম্মিত সুজা-মসজিদের কথা মনে পড়ে। সম্রাট শাহজাহানপুত্র হতভাগ্য সুলতান সুজা আরাকানে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। ভ্রাতা নক্ষত্র রায় কর্তৃক সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইয়া মহাপ্রাণ গোবিন্দ মাণিক্যও তখন আরাকান রাজের আশ্রয়ে দিন কাটাইতে ছিলেন:—

গোবিন্দ মাণিক্য রাজা রসাঙ্গের দেশে।
সুজা বাদশা ভ্রাতাসনে বিবাদ বিশেষে॥
আউরঙ্গজেব বাদশাহ যখনে হইল।
রাজ্য ভ্রষ্ট হৈয়া, সুজা রসাঙ্গেত গেল॥

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।

গোবিন্দ মাণিক্য রাজা সেই স্থানে ছিল।
হেন কালে সুজা বাদশা উপস্থিত হৈল॥
ত্রিপুরে রসাঙ্গ রাজা বৈসে সিংহাসনে।
বাদশা দেখিয়া ত্রিপুরে উঠিল তখনে॥
সিংহাসন হইতে নামে ত্রিপুর রাজন।
সুজা বাদসা সিংহাসনে করিল স্থাপন॥
রসাঙ্গের মহারাজা বলিল আপন।
কি কারণে ছাড়িছ রাজে দিছ সিংহাসন॥
রাজা বলে নরেশ্বর করি নিবেদন।
এহি ত সুজা বাদশা বিখ্যাত ভুবন॥
তুমি আমি হেন রাজা আছে বহুজন।
তাহান রাজ্যেতে কত হইবে পালন॥
এহান চাকর নিকট না পারি বসিতে।
আর সিংহাসনে ত্রিপুর বসিল স্থিরেতে॥

গোবিন্দ মাণিক্য এবং নক্ষত্র রায় বা ছত্র মাণিক্যের মুদ্রা-বিচারে পাই গোবিন্দ মাণিক্য ১৫৮১ শকে সিংহাসন আরোহণ করিয়া বর্ষকাল রাজত্ব করিয়া সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন এবং ছত্র মাণিক্য ১৫৮২ শকে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১৫৮১=১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ। ১৫৮২=১৬৬০ খৃষ্টাব্দ। ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালা মতে, গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করিলে, বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্র রায় যাইয়া সুলতান সুজার দরবারে নালিশ করেন এবং সুজার নিকট হইতে রাজত্বের সনদ লাভ করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করিতে অগ্রসর হন। তৎশ্রবণে গোবিন্দ মাণিক্য ভ্রাতৃ বিরোধে অসম্মত হইয়া সিংহাসন ছাড়িয়া আরাকানে চলিয়া যান এবং আরাকান রাজের আশ্রয় লাভ করেন।

সুজার ইতিহাস বিচারে সম্যকরূপে এই ঘটনার কাল নির্দ্দেশ করা যায়। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী খাজোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজা বাঙলা দেশে হটিতে বাধ্য হন। অতঃপর এক বৎসরেরও অধিক কাল বাঙলা বিহারের সীমান্তে রাজমহল ও তাণ্ডায় তিনি আওরঙ্গজীবের সেনাপতি মীরজুমলার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন। অবিশ্রান্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের পর পরাজিত হইয়া অবশেষে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে তিনি তাণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা পলাইতে বাধ্য হন এবং ১২ই মে ভুলুয়া হইতে আরাকানী জাহাজে আরাকান রওনা হইয়া যান। মধ্যে মীরজুমলা পরিচালিত মোগল দলের নানারূপ ভাগ্য বিপর্য্যয় ও বিপদ ঘটিয়াছিল এবং ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে মীরজুমলার সহকারী আওরংজীবপুত্র মহম্মদ মীরজুমলাকে পরিত্যাগ করিয়া সুজার পক্ষে যোগ দেওয়াতে মীরজুমলার পক্ষ অত্যন্ত দুর্বল এবং সুজার পক্ষ ভারী হইয়াছিল। এই বৎসর-কালেই নিয়োগের কালে, যখন সুজার মন ভ্রাতার বিরুদ্ধে নিতান্ত তিক্ত ছিল, তখনই নক্ষত্র রায় ভ্রাতা গোবিন্দ মাণিক্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সম্ভবপর মনে হয়। সুজার তখন দারুণ অর্থাভাব, নক্ষত্র রায় প্রদত্ত বিপুল নজরও নক্ষত্র রায়ের সাফল্যের অন্য প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হউক, ১৬৫৯–১৬৮১ শকাব্দের শেষে গোবিন্দ মাণিক্য ভ্রাতাকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া আরাকান রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মাস কয়েক পরে তাঁহার নিগ্রহকর্ত্তা সুজাও ভাগ্যের কুটিল আবর্ত্তনে সেই একই আশ্রয়ে যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। আরাকান রাজ সভায় উভয়ের সাক্ষাৎ দৃশ্য রাজমালা হইতে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

পূর্ব্বের নিগ্রহকারী কিন্তু বর্ত্তমানের দুর্ভাগ্যের সঙ্গীর প্রতি এই মহানুভব নির্ব্বাসিত রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। গোবিন্দ মাণিক্যের সসম্মান ব্যবহারে আরাকান রাজের নিকটও হতভাগ্য সুজার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইল। আরাকান রাজের এক কন্যার সহিত সুজার বিবাহ হইল। সুজা গোবিন্দ মাণিক্যকে প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ নিমচা নামে এক বহুমূল্য তরবারী এবং হীরকাঙ্গুরী উপহার দিলেন। নিগ্রহকারক ও নিগৃহীতের বন্ধুত্ব বন্ধন সুদৃঢ় হইয়া উঠিল।

রাজমালায় সুজার শেষ দশা কি হইল এই সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে। স্যার যদুনাথ সরকার তাঁহার আওরঙ্গজীবের বিখ্যাত ইতিহাস লিখিবার কালে সম্ভবতঃ এই আকরটির খবর রাখিতেন না। কারণ তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে সুজার বিবরণ সমাপ্ত করিয়া, সুজার কি হইল এই সম্বন্ধে তিনি কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তিনি মোগল এবং ওলন্দাজ আকরে প্রাপ্ত বিবরণের আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু রাজমালার উল্লেখও করেন নাই। স্যার যদুনাথ প্রদত্ত বিবরণে দেখা যায়, সুজা প্রায় চল্লিশ জন অনুচর সহ আরাকানে প্রস্থান করেন। উহাদের মধ্যে দশজন বার্হার সৈয়দ, ১২ জন মোগল এবং বাকী সব ভৃত্য শ্রেণীর লোক ছিল। আরাকানে যাইয়া আরাকান দরবারে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সুজা আরাকান সিংহাসন হস্তগত করিবার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং ধরা পড়িয়া আরাকান রাজের সৈন্যগণ হস্তে নিহত হন। ওলন্দাজ ফেক্টরির লিপিবদ্ধ বিবরণ মতে কিন্তু দেখা যায়, সুজা নিজের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া গোলমালে ত্রিপুরার দিকে পলাইয়া যান এবং ধরা পড়েন নাই। ব্রহ্মদেশের ইতিহাস লেখক হার্ভি সাহেবও লিখিয়াছেন, শহরে আগুন লাগাইয়া পলাইবার কালে তিনি ধরা পড়েন এবং নিহত হন। (Harvey's Burma. P. 147)

এ ক্ষেত্রে রাজমালা কি বলে, নিশ্চয়ই শ্রবণযোগ্য :—

রসাঙ্গের রাজকন্যা বাদশা বিভা কৈল।
সেই কালে সুজা বাদশা কুবুদ্ধি জন্মিল॥
রসাঙ্গের রাজা বধ করিতে মতন।
চল্লিশ জন মল্ল আনি করে নিয়োজন॥
আঙ্গরাখিরা পরাইয়া দোলাতে উঠিয়া।
দোলা প্রতি দুই মল্ল রহিল বসিয়া॥
একখানি দোলা মধ্যে কাহার অষ্টজন।
রসাঙ্গের রাজবাড়ী করিছে গমন॥
রাজকন্যা রাজবাড়ী যায় বলি কহে।
ষষ্ঠ দেউরী পার হৈল না করিয়া ভয়ে॥
সপ্তম দেউরী পরে বলে চৌকিদার।
এত সব দোলা আসে এ কোন বিচার॥
দ্বার বন্ধ দ্বারী খুলে করিল তালাস।
দোলা হতে নামে যোদ্ধা যুদ্ধেতে বিনাশ॥
মারিলেক মল্লগণ রাজার ভুবন।
গুপ্তভাবে সুজা শাহা স্থানান্তে গমন।
উদ্দেশ নাহিক বাদশা করিল তালাস।

*　　　*　　　*　　　*

বিবেচ্য যে এই কালে গোবিন্দ মাণিক্য আরাকান রাজ সভায় অবস্থান করিতেছিলেন এবং উপরে বর্ণিত ঘটনাসমূহের প্রায় প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। অনুচরগণের সংখ্যা চল্লিশ ছিল, রাজমালার বিবরণে তাহাও মিলিতেছে। এই ঘটনায়ই আরাকান রাজের চিত্ত বিরূপ হইয়া যায় এবং—

গোবিন্দ মাণিক্য প্রতি বলেন রাজন।
রাজ্যে যাও নরেশ্বর আপন ভুবন॥

গোবিন্দ মাণিক্য এই অনুরোধ বা আদেশে চট্টগ্রাম আসিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন এবং কয়েক বৎসর পরে ছত্র মাণিক্যের মৃত্যু হইলে পুনরায় ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই অবস্থায় গোবিন্দ মাণিক্য প্রচারিত বিবরণই রাজমালায় গৃহীত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। কাজেই, সুজা ধরা পড়েন

মহাকাল

(গল্প)

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

মহানগরের ভীড় এবং কলহাস বড় বাড়ীটির পথপ্রান্তে এসে অকস্মাৎ যেন থেমে গেছে। সম্মুখের রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে জনতার মিছিল আর বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন ভঙ্গী যানবাহন। তারি মাঝ দিয়ে ছিট্‌কে এসেছে ছোট্ট শান বাঁধান একটু গলি-পথ। তারি উপরে বিরাট প্রাসাদের আলোকিত রূপসজ্জা। মানুষের ভীড় এখানেও আছে, কিন্তু ছন্দহীন নয়। অকারণ পথিকের পথবিন্যাসে এ গলি-পথ কখনও চঞ্চল হয়ে ওঠে না। শুধু কর্মীর দল ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানকার তার দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে—

প্রকাণ্ড কারবার।

লোকটি কিন্তু আজও ওদিককার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিল। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বড় বাড়ীটির তেতলার একটি কক্ষের দিকে। দু'চোখে তার অফুরন্ত বেদনা ঝাপসা কালো বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ভাষাহীন আর্ত চোখে না পাওয়ার উদ্বেগ গাঢ় হ'য়ে দেখা দেয়।

রোজই সে এসে এখানে দাঁড়ায়। দশটা হ'তে পাঁচটা পর্যন্ত, এক মুহূর্তও তার নড়বার যো নেই। এত বড় একটা ব্যবসাকে তার চালাতে হচ্ছে। কে আসছে যাচ্ছে, সবারই খবর রাখাও দরকার। আর তেতলার সেই ঘরটিতে রয়েছে তারি ভাবী-বধূ।

তাই সময়ের মূল্য তার গভীর। দশটার পর এগারটা, তারপর বারটার ঘণ্টাও বাজে—এমনি করে পাঁচটার সময় যখন অফিস ছুটি হয়ে যায়, তারও ছুটি মেলে। আরে— সেদিনও ত কারবার তেমন ফেঁপে ওঠেনি—তারই চেষ্টায়ই ত এত দূর হয়েছে।

মনে মনে সে হেসে ফেলে। শান্তাকে পাবে ব'লেই ত তার এত কঠোর চেষ্টা। যা কিছু গড়ে ওঠে—যা কিছু মহান সবই ত মানুষের শ্রান্তিহীন ইতিহাসের এক একটি ছিন্ন দল! একটা অতৃপ্ত কামনাকে রূপশ্রী করার জন্যই ত এ সব কিছুর পাদপীঠের প্রথম কথা।

টিফিন ক'রতে অবশ্য সে যায়। একটার তোপ পড়লে তাকে যেতে হয় একবার মুক্ত আমিরীর হোটেলে। এত বড় একটা কারবার যার হাতে, ফুরসৎ তার দরকার বৈকি—তা ছাড়া প্রেষ্টিজের দায়ও ত আছে—না গেলে চল্‌বে কেন! লোকেই বা ভাববে কি? কারবারের ডিরেক্টর মিঃ রায় হয়ত তার ঐশ্বর্য বিষয়ে সন্দিহান পর্যন্ত হয়ে উঠ্‌তে পারেন।

তাই তাকে যেতে হয়। টিফিন অবশ্য সে যে-সে হোটেলে গিয়ে করে না। ছিন্ন বসন, শরীরের সাথে আরও ক্ষয়ে পড়ে—গলার কাছে এক টুকরা কাপড় গেরো দিয়ে বেঁধে নেয়। এইটেই তার প্যাণ্ট—আর নেকটাই। হাতের লাঠিটা ঘুরাতে ঘুরাতে সে চলে। ধীরে ধীরে এসে বসে বাঁধান পুকুরটার পাশে। লোকজন তাকে দেখলেই সরে দূরে গিয়ে বসে—অত বড় একটা হোমরা-চোমরা লোককে সমীহ করে নিশ্চয়। করবে না—জাঁদরেল একটা কারবারের সে হ'ল

[illegible]

দরজা জানালার ওপাশে উপরে ফ্যান—মারবেল পাথরের ফ্লোর। চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে। কতগুলা তরুণী মেম-টাইপিষ্ট। আরে এক টেলিফোনের কানেক্‌শানই ত ছটা লাইনে—আলাদা অপারেট করা হয়।

ঘাসের উপরে সে বসে, নইলে আর আমিরী কি হল। কোঁচড়ের কাপড়ের পুঁটলি হ'তে ভাত-তরকারী-রুটি খেতে থাকে। অচেনা একটি মেয়ে তাকে রোজ এসব দিয়ে যায়। দু-দুবার তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পর্যন্ত। কত কষ্টে পালিয়ে এসেছে। পালিয়ে না এলে শান্তাকে পাওয়া তার কিছুতেই হ'ত না। মেয়েটি বোধ হয় শান্তাকে তার কাছ হতে সরিয়ে রাখতেই চায়। কিন্তু মেয়েটি ওর কাছে তবু ভাল—রোজ ভাল ভাল খাবার দিতে কসুর নেই। কিন্তু শান্তার কাছে ও......তার হাসি পায়।

তার টিফিন চলে।

তারপর ঊর্দ্ধশ্বাসে সে এসে দাঁড়ায় তার নিজ স্থানে। একদিনও সে কামাই করে নি, লেট্ হয় নি এক মিনিট। সেই যে কতকাল আগে একবার বিরাট ভূমিকম্পে সব কিছু ভেঙে চৌচির-পাষাণের মত ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল—সেদিনও সে পালায় নি। সবাই চীৎকার করে উঠেছিল—পালারে পালা।

সে হেসেছিল। পালায় নি!

এমনি করে বছরের পর বছর কেটে গেছে, তার কামাই হয় নি। ঋতুর পর ঋতু বসন্তের আলোয় হাতছানি দিয়ে ডেকে গেছে। গ্রীষ্ম এনেছে কত দাহ; বর্ষার অবিশ্রাম জল-প্রলয় কিছুতেই সে হটে নি। কামাই সে করে নি।

কুমারেশ মনে মনে হাসে।

কামাই ক'রলে ডিরেক্টর আর তার সাথে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন না নিশ্চয়ই। শান্তাকে পাবে ব'লেই ত তার এত কষ্ট সহ্য ক'রতে হচ্ছে। ডিরেক্টর ত ব'লেই দিয়েছেন যে, তার মত বড় ঘরের মেয়েকে বিয়ে ক'রতে হলে আগে উন্নতি ও সঞ্চয়, মানে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট চাই।

কিন্তু এবারে সে কথা আর বলা চলে না। এখন দস্তুরমত সে একটা সম্মানিত ব্যক্তি—টাকা?

হা-হা-হা!

কুমারেশ হেসে ফেলে—

গলায় ঝুলান টিনের চাক্‌তিগুলি ঝন্‌ঝন্ ক'রে বেজে ওঠে।

কুমারেশের যখন একুশ বছর বয়স, তখন এ কারবারে সে ষ্টেশনারী ডিপার্টমেণ্টের কেরাণী হয়ে প্রবেশ করে। ত্রিশ টাকা তখন তার মাইনে। মনের চারদিকে কত খুসী, কত আনন্দ সাগরের কল্লোল-ধ্বনির মত মনের মাঝে নীড় বেঁধে উঠেছে। রঙ আর রঙ। পৃথিবী সেদিন কি সুন্দরই ছিল তার কাছে।

এমনি দিনে তার আলাপ হয়ে গেল শান্তার সাথে। আলাপের প্রয়োজন হয়ত ছিল না—তবু। তাদেরই

চাঁপার কুঁড়ির মত শান্তা ছিল সুষমাময়ী। তার কাজলপরা দুটি কালো চোখে ছিল রাজ্যের না-বলা ভাষা। সে ভাষা বুঝেছিল শুধু কুমারেশ।

ম্যাট্রিক পাশ করে শান্তা তখন ঢুকেছে কলেজে। কি একটা পারিবারিক উৎসব উপলক্ষে কুমারেশেরও ছিল শান্তাদের ওখানে আমন্ত্রণ। সে দিনই ত আলাপ হল তার বেশী করে! আশমানি রঙের কি লাবণ্যময় শাড়ীই না সে পরেছিল সে দিন।

কুমারেশ যেতেই শান্তা বলল, আসুন কুমারেশবাবু! বাবার কাছে রোজই আপনার কথা শুনি।

কুমারেশ কি বলবে ভেবেই পেল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বসুন না, শান্তা বল্‌ল—বসুন। আসুন, সবাইত আসেনি —আসুন গল্প করি।

কুমারেশ হেসে বল্‌ল, কি গল্প?

শান্তাও হাসল, কি গল্প আমিই যদি বলব, তবে আমিই বল্‌তে পারতাম।

তারা বসেছিল দোতলার করিডোরে। তখন বাড়ীটা ছিল দোতলা। করিডোরের পাশে ছোট্ট-টব বসান ফুলের গাছে ভরে উঠেছিল লাল নীল সব ফুল।

সেই দিকে তাকিয়ে কুমারেশ চুপ করে বসে রইল শুধু!

তারপর দিন চল্‌ল গড়িয়ে!

কিশোর ও তারুণের বয়ঃসন্ধিতে আগত দুইটি তরুণ মন ধীরে ধীরে কবে একান্তই নিকটবর্তী হয়ে গেল কেউ বুঝতে পারল না।

সে আজ কত কালের আগেকার সব কথা। তারপর কত বসন্ত ঝঙ্কার দিয়ে ফিরে গেছে—গন্ধভরা উতলা বাতাসে দক্ষিণের শিহরণ কতবার কতভাবে এনেছে স্পন্দন। সে সুরটির এক ফালি মায়া বুঝি বন্দী হয়ে আছে কুমারেশের চোখে—চির আকুতি নিয়ে।

ময়লা কাপড় পরা কুমারেশ আজও দাঁড়িয়েছিল। মাথায় চুল পাক ধরে সাদা হয়ে কুঁচকে গেছে। তোবড়ান গাল। ঢং ঢং করে পাঁচটার ঘণ্টা বেজে গেল। অফিস ছুটির ঘণ্টা। পঙ্গপালের মত কেরাণী আর কর্মচারী; আর্দালী আর অফিসারের দল বেরিয়ে যাচ্ছে। বড় মাইনে যাদের তাদের জন্য অপেক্ষা করছে বাড়ীর মোটর।

এবারে কুমারেশকেও তার গৃহে ফিরতে হবে। গৃহ তার নেই। তবু—তবু তাকে ফিরতে হবে তার মনের গৃহে। হাতের লাঠিটা পদদ্বয়ের নীচে দিয়ে শব্দ করল ভোঁস ভোঁস ভোঁস। তার মোটর চলল।

ধীরে ধীরে এসে সে দাঁড়ায় সারকুলার রোডের মোড়টার কাছে। ও পাশে হসপিটালের কাছে এক ধারে কতকগুলি ভাঙ্গা খোয়া। ধীরে ধীরে সে চল্‌ল তার উপর দিয়ে। খোয়া পেরিয়েই খানিকটা অনধিকৃত স্থান। এখানেই তার গৃহ। কয়েকটা ভাঙ্গা হাঁড়িকুঁড়ি, এলোমেলো নানান জিনিষ। এমন কোন তুচ্ছ জিনিষও নেই যা সে রাস্তার [illegible] আধ ফুট খানেক উঁচু মাচা তার উপর তার দোতলা। দোতলার উপরও কদিন হতে কাণ্ড সাজান হচ্ছে—তেতলা তৈরী না হলে শান্তাকে সে এনে রাখবে কোথায়?

কুমারেশ হঠাৎ আপন মনে হেসে ওঠে।

কি যেন সে ভাবতে চেষ্টা করে। ছেঁড়া কাঁথাটার উপর এসে বসে। ইস্‌ ডিরেক্টর রায়কে এখন একদিন এনে বাড়ী-ঘর সব দেখাবারও ত দরকার।

কুমারেশ উঠে দাঁড়ায়।

কত তার ঐশ্বর্য, গাড়ী ঘোড়া মোটর—লোকজন। কিসের অভাব তার। দেখে নেবে সে রায়কে। অমন হাজার হাজার রায় তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে পারলে ধন্য মনে করে। না। ডিরেক্টর বোধ হয় এখনও জানেন না যে এর মধ্যে তাঁর ভাবী জামাতা তারই দোকানের কর্ম-সচিব হয়ে উঠেছে। তারই হুকুমে এখন গাড়ী চলে, ঘোড়া চলে। তারই অফুরন্ত শ্রমে ডিরেক্টর বাড়ী বসে অত টাকা উপায় করে।

কুমারেশ হাঁড়ি একটা হাতে করে বাজাতে বাজাতে চলতে সুরু করে। হাতের লাঠিটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরোয়। মুখ দিয়ে শব্দ করতে থাকে—ভোঁস্‌-ভোঁস্‌-ভোঁস্‌। ...চালাও গাড়ী... জোরসে চল...এই ম্যানেজার সাব যাতা হ্যায়...শালা জানতা নেই হাম ম্যানেজার। নিজের গালেই সে চটাপট চড় লাগাতে থাকে।

হাঁড়িটাও সে বাজাতে থাকে। তাতে পোরা টিনের চাকতি। কত রাস্তা হতে সে কুড়িয়ে এনেছে। তার ঐশ্বর্য, তার ধন-সম্পদ, কত টাকাই সে জমিয়েছে......হাজার হাজার ......লাখ লাখ। রাস্তায় রাস্তায় যত মোটর চলে—গাড়ী চলে, এ তো সব তারই। সে হল মালিক, দয়া করে সবাইকে চাপতে দেয়। বড়লোক সে, আহা বেচারীদের নেই, দেবে না চাপ্‌তে! বাস! তবে আর শান্তাকে পাওয়া তার আটকায় কে? রায় তাকে ধাক্কা মেরে একদিন ফেলে দিয়েছিল—দেখে নেবে সে রায়কে।

কিন্তু ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। সামনের ডাস্টবিনটা হাতড়িয়ে দেখল কিছু নেই। ফুটপাথের উপরই সে বসে পড়ল।

আকাশে রাত ছেয়ে গেছে।

সোনালী চাঁদের আলোয় পৃথিবী সুন্দর সজীব।

মাথাটা যেন তার ঝিম ঝিম করতে থাকে। কত আজে-বাজে কথাও মনে হয়। বি-এ পাশ করার পর সে যেন কোথায় চাকরি করতে এসেছিল। তারপর—তারপর স্পষ্ট কিছু তার মনে পড়ে না।

শরীরটা কুমারেশের আর্ত বেদনায় কাঁপতে থাকে শুধু।

মাথাটা চেপে সেখানেই শুয়ে পড়ে। না মনে তার কিছু পড়ে না। তবু মৃত আত্মার মাঝ হতে সে টেনে আনতে চায় সেই সব হারান স্মৃতি। পারে না। মাথাটায় যেন পাষাণ দিয়ে কে ঠুকছে। দৈত্য-পুরীর সব দৈত্যরা যেন জোট পাকিয়ে তার মাথাটা কেড়ে নিচ্ছে।

কুমারেশ ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে।

পাহারা দিচ্ছে। ঘুমন্ত পৃথিবীতে এখন নিশ্বাসের ধ্বনি শুধু শোনা যায়।

কুমারেশের হালকা ঘুম ধীরে ধীরে আরও হালকা হয়ে ওঠে।

এম-এ ক্লাশে সে ভর্ত্তি হয়ে একদিন গিয়েছিল মাত্র। চাকরি জুটে যায় বলে পড়া ছেড়ে দেয়। শান্তা। শান্তার বাবা রায়। শান্তাকে তার মনে পড়ে। শান্তাকে বুঝি সে চেয়েছিল...তারপর একদিন শান্তার বিয়ে হয়ে যায়। কুমারেশ বিবর্ণ মৃতের মত ফ্যাকাশে চোখে চারদিক তাকায়! সব গোলমাল হয়ে ওঠে।

না-না-না কুমারেশ চীৎকার করে ওঠে!

না-না-না তার শান্তার বিয়ে হয় নি। তার শান্তা এখনও ঠিক তেমনটি আছে। তার বিয়ে হয় নি। শান্তা ত তারি অপেক্ষায় বসে আছে।

হা-হা-হা করে কুমারেশ হেসে ওঠে। আজ আর তার ভাবনা কি—অগাধ তার ধন-গৌরব, প্রতিষ্ঠা, যশ-সম্মান যা সে কামনা করেছিল, সবই সে পেয়েছে; যা কিছু মানুষ কামনা করে সবই তার এসেছে স্রোতের বন্যার মত।

সকাল হয়ে গেছে।

আলোর রশ্মি আঁকা-বাঁকা পথে, পথের তুচ্ছ রেণুটি পর্যন্ত রাঙিয়ে তুলেছে কেমন লাল আলোয়। ধীরে ধীরে সে গৃহের দিকে ফিরতে থাকে। ভোর বেলা বাইরে থাকলে কি চলে। কত লোক আসবে ইনটারভিউতে। এসব ঝামেলা আর তার ভাল লাগে না। চাকরি চাই, চাঁদা চাই। কেবল চাই-চাই। এমনি করে দিতে থাকলে ফতুর হয়ে যেতে কদিন।

কিন্তু সব চেয়ে ভয় তার সেই তারই বয়সী সেই মেয়েটিকে। রোজই মহিলাটি সকাল বেলা একবার করে আসে। খাবার দিয়ে যায়। খাবার দিক, কুমারেশের তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু আবার যদি ধরে নিয়ে যায়। হস্‌পিটাল কুমারেশের ভাল লাগে না। যত সব পাগলা লোক থাকে সেখানে। সে কি পাগলা নাকি। তবু মহিলাটি ভাল। টানা টানা দুটি আয়ত গভীর চোখে কুমারেশের দিকে আদর করে তাকায়। তা বলে শান্তার চোখের সঙ্গে তুলনাই হয় না।

মেয়েটিকে কুমারেশ ভয় করে, তবু তাকে যেতে হবে।

ধীরে ধীরে সে চলতে থাকে।

রাস্তার পাশেই সেই প্রকাণ্ড মোটরটা তার চোখে পড়ে। আজও তাহলে এসেছে।

হঠাৎ কুমারেশ থমকে দাঁড়ায়।

মহিলাটির সঙ্গে সেই দরোয়ানটাও এসেছে। ও ব্যাটাই পাজি, ওকে দেখলেও ওর রাগ হয়। দরোয়ানটাই ত দু-দুবার তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হস্‌পিটালে।

কি ভেবে কুমারেশ আবার সম্মুখে আসতে থাকে। ক্ষিদে পেয়েছে। খাবারও তার চাই। মনে মনে সে হাসে—সম্মানী লোক হতে পারলে বাইরের লোকও খাবার নিয়ে সাধে। আর দরোয়ানটা যদি ধরতে আসে, আচ্ছা করে কামড়ে দেবে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সে মহিলাটির দিকে হাত পাতল।

বয়স বছর চল্লিশ। সীমন্তে সিন্দুরের বিন্দু জ্বল জ্বল করছে। সারা দেহে স্বর্ণাভরণ। একদৃষ্টিতে মহিলাটি তাকিয়ে রইলেন কুমারেশের দিকে: আমায় আজও তুমি চিনতে পারলে না?

কুমারেশ উদাস চোখে হাত পেতে থাকে।

মহিলাটি বলেন: আমার নাম শান্তা—বুঝলে—

কুমারেশ শোনে আর মনে মনে হাসে। হ্যাঁ, শান্তা বইকি!—কোথাকার কে ঠিক নেই, মায়া দেখিয়ে ভুলাতে চায়—শান্তাকে দূরে সরিয়ে। ডাইনী! নিশ্চয় ডাইনী। সে যাকে ভালবাসে, সে থাকে সেই বড় বাড়ীটার তেতলায়। রায় ব্যাটাই কিছুতেই শান্তাকে তার সঙ্গে দেখা করতে দিতে চাচ্ছে না, আর সেই ঘরেই শান্তাকে বন্দী করে রেখেছে। শান্তা নিশ্চয়ই তারি জন্য অপেক্ষায় বসে আছে। এ মেয়েটা নিশ্চয় ডাইনী।

হাত পেতে রুটিটা নিয়েই সে ছুটতে আরম্ভ করে দেয়। অফিসের হাজিরার টাইম পেরিয়ে যেতে দিতে সে পারে না। কিন্তু আজ মাথার চুলে তার পাক ধরেছে—এ খবর সে জানে না। পৃথিবীর চক্রে কত আবর্ত্ত সৃষ্টির অমিয় পরশে ক্ষীণ ও ভঙ্গুর হয়ে লয় পেয়ে মিশে গেছে—কিছুই কুমারেশের মনে নাই। কুমারেশ শুধু শান্তাকে চায়।

স্থাণুর মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে শান্তা ধীরে ধীরে গিয়ে তার মোটরে ওঠে। সেও যেন কি হারিয়ে ফেলেছে—তার সমস্ত ধনভাণ্ডারের বিনিময়েও যা আর ফিরে সে পাবে না।

শান্তা শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মোটর চলতে থাকে।

উদয়াস্ত

শ্রীযতীন্দ্র সেন

আমি, তুমি উদয়াস্ত, দুই দিকে দুইটি শিখর;
পৃথিবীর দুই প্রান্তে যুগ যুগ মোরা আছি চেয়ে।
সায়াহ্নের স্বপ্ন হোথা, হেথা জাগে আলোক-শিহর—
দিবস-রজনী-ঘেরা অয়ন-চক্রের পথ বেয়ে।
হেথায় অনাদি ঊষা, হোথা সাঁঝ, অনাদি গোধূলি;
আমি তুমি দুটি সীমা যেন চির-দিন-রজনীর।
ব্যথায় পাষাণ হোয়ে চেয়ে আছি উৎসুক, অধীর।
পৃথিবীর দুই প্রান্তে আমি, তুমি দুটি মেরু হেন—
পরশ-কাতর, আর ব্যথা-খিন্ন তুহিন-তন্দ্রায়।
আলো-ছায়া-পাখা মেলি' মহাকাল চলিয়াছে যেন,
আমরা দুজনে সাঁঝ, চেয়ে আছি মৌন প্রতীক্ষায়।
আমার ক্রন্দনে রাঙা প্রাচী-নভে উদয়-লগন।

সে যে আমি, সেই আমি

(গল্প)

শ্রীহাসিরাশি দেবী

বিরাট জনতার মধ্যে সু-উচ্চ মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে—যে তরুণীটি তখন ওজস্বিনী ভাষায় দেশোদ্ধারের জন্য বক্তৃতা দিচ্ছিল, তখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা। পথে পথে গ্যাসের আলো জ্বলে উঠলেও বাগানের সে জায়গাটা গাছের ছায়া প'ড়ে একটু অন্ধকার, একটু আবছা আলোর মত।

বাগানের একটু বাঁ পাশ ঘেঁসে একটা গ্যাস জ্বলছিল,—তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে—বাগান ঘিরে হাজার লোক দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ বা আস্তে আস্তে কথা ব'লছে পাশের লোকের সঙ্গে, কেউ বা নীরব।

ধীরে ধীরে ভিড় ক'মতে লাগলো, তরুণীটির বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকজনও স'রে গেল,—যারা তখনও দাঁড়িয়ে রইল—তারা সংখ্যায় অল্প।

বক্তৃতার আলোচনা সমালোচনা ওদের মধ্যে তীব্রভাবেই চ'লেছিল,—তাই পাশ কাটিয়ে বক্তারা যে কখন একে একে চ'লে যাচ্ছে হয় সেদিকে দৃষ্টি ছিল না আর নয় ইচ্ছে ক'রেই লক্ষ্য করেনি।

কিন্তু এদেরই মধ্যে থেকে হঠাৎ যে মানুষটি মুখ ফিরিয়ে একটু সচকিত হ'য়ে উঠলো—তার সর্ব্বাঙ্গে একখানা মূল্যবান শাল জড়ানো— ; হাতের ঘড়িটায় আলো প'ড়ে ঝক্‌ঝক্‌ ক'রছে, মুখে একটা আনন্দ উজ্জ্বল ভাব।

মৃদু অথচ তীব্র স্বরে ব'লে উঠলো—"মাধু, তুমি?"

উত্তর দিয়ে সেই তরুণীটি বললে—হ্যাঁ, আমিই ; কিন্তু এখানে কোন কথা নয়, আসুন আমার সঙ্গে।

ওরা দুজনে একটু ক্ষিপ্র পায়ে বাগানের পথ পার হ'য়ে গিয়ে উঠলো একখানা মোটরে ; ড্রাইভার গাড়ীতেই ছিল, নেমে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে গাড়ীর দরজা খুলে দিলে ; ওরা উঠে বসলো পাশাপাশি ; তারপরে গাড়ী ছুটলো, বেশ জোরে। বোধ হয় তীব্রবেগেই।

দুধারে সোঁ সোঁ শব্দ, বাড়ী, ঘর, গাছপালার ভিড় কাটিয়ে খোলা মাঠ দিয়ে ছুটলো সেই গাড়ী, যেন আজ ও উদ্দেশ্যহীন—দিকহারা, বন্ধনশূন্য। গাড়ীর ভিতরে উপবিষ্ট মাধুরীর গলায় ফুলের মালা তখনও বুকের ওপরে থেকে কাঁপছিল—গাড়ীর গতির সঙ্গে ; উন্মত্ত হাওয়ায় কপালের ওপরে এসে পড়া চুলের গোছা, কানের দুল জোড়া দুলছে, কাঁপছে ; মাঝে মাঝে হাতের সরু চুড়ীতে অন্য চুড়ী এসে পড়ারও শব্দ হ'চ্ছে মৃদু রিন্‌ রিন্‌।

গাড়ীর ভিতরে নিস্তব্ধ!

সেই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে কথা বললে মাধুরী,—আপনি—আপনিও এসেছিলেন আজ এখানে? আমি কিন্তু আশা করিনি।

সত্যই সে যে এতটা আশা করেনি এটা যেন তার কণ্ঠস্বরেই ধরা প'ড়লো : একটু কম্পিত, একটু বা উচ্ছ্বসিত সে কণ্ঠস্বর।

অজয় উত্তর দিল—সহাস্যে—"কেন, সেটা কি একেবারেই অসম্ভব?"—

"না, অসম্ভব নয়,—তবে আপনার বইয়ের ভাণ্ডার ছেড়ে—"

অজয় হাসলো—"বড়ই কঠিন নয়? কিন্তু কঠিন কিছুই —

পৃথিবীতে নেই মাধুরী। তার সাক্ষী তুমি ভেবে দেখ চার বছর আগের কথা, সম্ভব তোমার সে সবই মনে আছে, ভোলনি কিছুই—।"

মৃদুস্বরে মাধুরী যেন নিজের মনেই উত্তর দিলে—"যাক্‌, যাক সেকথা।"

অজয় যেন হাসির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে,—"বেশ যেতে দাও। কিন্তু মাধু, আজ তুমি যা বলাটা ব'ললে, এতে এমন একজনও ওখানে ছিল না, যার না গায়ের রক্ত গরম হ'য়ে উঠেছিল! হ্যাঁ, একখানা বক্তৃতা বটে। বুঝবার মত।"

মাধুরী নিস্পন্দ ব'সে ছিল, তেমনি নিস্পন্দই ব'সে রইল। উত্তর দিল না।

গাড়ী যেমন চ'লছিল,—তেমনিই চ'লতে লাগলো আবার উদ্দেশ্যহীন ভাবে।

হঠাৎ এক সময়ে মাধুরী একটু যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠলো ; অন্ধকারে হাত ঘড়িটা একবার দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে সে বলে উঠলো—"কটা বাজলো ব'লতে পারেন?"

অজয় ব'ললে—"পারি, কিন্তু আজ একটি অনুরোধ, তুমি আমায় আর যা বলো সব সহ্য ক'রবো, কিন্তু ঐ 'আপনি', আজ হ'তে আর ক'র না, ঐটি সহ্য করতে পারছি না।"

মাধুরী এ কথায় আহত হ'ল না, ব'ললে—"তা হ'লে বল, রাত হ'য়েছে ; আমি বাড়ী ফিরবো, গাড়ী ফিরাতে বল—ড্রাইভার........"

মাধুরী নিজেই ডাকতে যাচ্ছিল, বাধা দিল অজয় ; বললে—"আমি ঠিক সময়েই তোমায় বাড়ী পৌঁছে দেব মাধুরী, কিন্তু—"

"না, না আজ আমায় বাড়ী পৌঁছে দাও—রাত হল।"

এই সময় পথের পাশের একটা জ্বলন্ত আলোর এতটুকু এসে পড়ল মোটরের ভেতরে। অজয় দেখলে মাধুরীর মুখে চোখে একটা দুশ্চিন্তার ছায়া। বললে—"কিন্তু ধর, যদি আজ নাই ফিরতে পারি—"

মাধুরী কি বলবে ঠিক বুঝতে না পেরে অজয়ের মুখ দেখবার—ওর মনের কথা বুঝবার অনর্থক চেষ্টা করল, কিন্তু গাড়ী তখন আলোর রাজ্য ছেড়ে আবার অন্ধকারে এসে পড়েছে, কিছু দেখা গেল না। গম্ভীরস্বরে অজয় বললে—কিন্তু তুমি যে আমার ভাবী বধূ একথা ত সকলেই জানে।

"না জানে না, অনুমান করে মাত্র।" কঠিন স্বরে মাধুরী উত্তর দিল।

অজয় বললেঃ "তাহলেই হল ; জানাও যা, অনুমান করাও তাই। তাই বলছি, আজ যদি নাই-ই ফিরি—"

"ওঃ, কাল তাহ'লে সমস্ত দৈনিকের মাথায় মাথায় দেখা যাবে আমার এই কাজের সমালোচনা! সকলেই চাইবে জবাবদিহি! না, না ; তুমি আমায় রক্ষা কর, আমায়......"

মাধুরীর গলার স্বর কেঁপে উঠল।

অজয় বললে—গাড়ী ফিরাও ড্রাইভার........

ড্রাইভার যেন একাজে সর্ব্বদা প্রস্তুত, হয়ত মনিবের

ওরা অগ্রসর হ'ল পূর্ব্ব পরিত্যক্ত পথ ধরে, লোকালয়ের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু দু'জনেই নির্ব্বাক। .....

অনেকদিন, অনেকদিন হ'ল ঐ অজয়ের সংগে পরিচয়। অজয় তখন বি-এ পড়ে, আর মাধুরী সবেমাত্র স্কুলের গণ্ডী ডিঙিয়ে কলেজের উঠোনে ঢুকেছে।

এই সময়ে অজয় নিয়েছিল ওকে পরীক্ষার উপযোগী ক'রে গড়িয়ে তুলবার ভার আর মাধুরী হ'য়েছিল ওর ছাত্রী। কিন্তু ধীরে ধীরে কেমন করে যে এই পরিচয় ঐ সম্মানের দাবীটুকু ছাড়িয়ে মনের মণিকোঠাও অধিকার ক'রেছিল, সে কথা মাধুরী জানেনি, বোঝেওনি; বুঝলে একদিন যেদিন অজয় বললে: "তোমায় আমি কোন্ রূপে কাছে পেতে চাই জান?"

মাধুরী উত্তর দিয়েছিল—না, কি এমন রূপ সে?

একটু গম্ভীর হ'য়ে অজয় বললে—"সে রূপ—কল্যাণী বধূর!"

মাধুরী যেন বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে শুনল—সে রূপে কোনও তীক্ষ্ণতা কোনও উগ্রতা থাকবে না; চির মধুর চির শান্ত সে রূপ। যেমন একখানি হাল্কা রঙের লালপাড় শাড়ী পরা, পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর, মুখে উজ্জ্বল হাসি, চোখে স্নিগ্ধ দৃষ্টি।......মাধুরীর কানের কাছে অজয় চলে যাবার কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত সে কথাগুলো মধুস্বরে গুঞ্জনধ্বনি তুলেছিল। তারপরে সে সুরের রেশ যে কখন কিভাবে কোন্ অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়ে কোন্ অতলে ডুবে গেল, তার ঠিকানা সে আর বহুদিন পেলে না। তবে মাঝে মাঝে কানে এসেছে বটে, শুনেছে—অজয় হয়ত ক'লকাতায় নেই, নয়ত সে তার চিরদিনের সাথী বিদ্যাচর্চ্চার মধ্যে এমন ডুবে আছে, যে মুখ তুলে অন্যদিকে তাকাবার তার অবকাশ নেই।......

মাধুরীও তার সে ধ্যান ভাঙেনি, দেখাও করেনি আর তার সঙ্গে। কিন্তু আজ হঠাৎ হ্যাঁ, হঠাৎই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল; হঠাৎই শুনলে দেশের দুঃখে দুর্দ্দিনে ওরও প্রাণ কেঁদেছে, ওরও ধ্যান ভেঙেছে। হাসি পেল মাধুরীর।

হ্যাঁ, অজয় করবে দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘোচাবার চেষ্টা? তা যদি হত তবে আজ এতদিন, জীবনের উনচল্লিশটা বছর সে মিথ্যা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শুধু বইয়ের পাতারই আঠার মত লেপ্টে থেকে মনের জড়ত্ব প্রতিপন্ন করত না। কিছুতেই না, আত্মস্নানি তার আসতই, কিন্তু—না, কাল যে মুখ সে চকিত দৃষ্টিতে গ্যাসের আলোকেও দেখতে পেয়েছে যে স্থানে সে গত কার্য্যের জন্য অনুশোচনার আভাষও পায়নি। সে যেন কি রকম একটা ভাব......বুঝতে পারা যেন মাধুর সাধ্য নয়!

গত রাত্রের দীর্ঘ ঘুমের পর যখন মাধুর ঘুম ভাঙল, তখন চারিদিক রৌদ্রে ভরে গেছে। কর্ম্মকোলাহল মুখর কলকাতা শহর, এখানে পক্ষীকূজন শোনা যায় না, কদাচিৎ কখনও কোনও বাড়ীর পোষা দুই একটা পাখী ডাকাডাকি করে মাত্র। তেমনি একটা কোকিল ডাকছিল ওপাশের বাড়ী থেকে।

মাধুরী বিছানা ছেড়ে উঠে বরাবর কলতলায় গেল মুখ ধুতে, ফিরে আসতেই দেখলে—বামুনদিদি এক হাতে চায়ের কাপ অন্য হাতে একখানা খামে মোড়া পত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাধুরীকে ফিরতে দেখে বললে—এই পত্রখানা দিদিমণি, খানিক আগে একটি লোক দিয়ে গেছে।

পত্র খুলে মাধুরী দেখলে সে পত্র অজয়ের। অজয় লিখেছে সে তার সংগে সন্ধ্যার দেখা করতে চায়, সে যেন বাসায় থাকে।

মাধুরীর ভ্রূকুঞ্চিত হ'য়ে উঠল; অজয় তাকে কি ভাবে, সে কি খেলার পুতুল যে যখন সে যা বলবে তাই তাকে ক'রতে হবে, ক'রতে বাধ্য সে! কেন?

শুধু আজ নয়, চিরদিনই তার এই খেয়ালী ভাবের কাজের প্রতিবাদ মাধুরী ক'রে এসেছে, যতটা সম্ভব বাধাও দেবার চেষ্টা ক'রে তাকে ফিরাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে কাজে সফলতা সে লাভ ক'রেছে যে কতটুকু তা আজও হিসেব ক'রে উঠ্‌তে পারেনি।

অজয় চিরদিনের খেয়ালী, ধনীর দুলাল অজয় যখনই দেখেছে মাধুরী তার মতে মত দিল না, তখনই সে যেন নিজের খেয়ালটাকেই প্রশ্রয় দেবার জন্য দীর্ঘদিনের জন্য অদৃশ্য হয়েছে। আবার যখনই দেখা হয়েছে তখন মাধুরী দেখেছে অজয় তার ঝোঁক ভুলে গেছে, একেবারেই যেন মুছে গেছে সে স্মৃতি।

মাধুরীর মনে হ'য়েছিল তাকে বিবাহ করার ইচ্ছাও শুধু অজয়ের একটা খেয়ালই মাত্র, আর কিছু নয়; তাই সে তার কথায় তাড়াতাড়ি মত দিতে পারেনি; আর শুধু এই মতামত জানাবার জন্যেই যে তাকে কত দিন, কত বিনিদ্র রাত্রি দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে সে কথা হয়ত অজয়ও জানে না। আবার আজ সেই খেয়ালেরই পুনরুত্থান! মাধুর মুখের ভাব কঠিন হ'য়ে উঠল; একখানা পোষ্টকার্ড লিখে সংগে সংগে পোষ্ট করে দিলে যে, সে সন্ধ্যায় বাসায় থাকবে না, অনেক কাজ আছে।

পরদিন সে বামুনদিকে জানালে তাকে কিছুদিনের জন্য গ্রামে গ্রামে কাজ ক'রে বেড়াতে হবে, সুতরাং তার যাত্রার আয়োজন করুক।......

সেইদিনই পড়ন্ত বেলায় সমস্ত জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলে উঠতে গিয়ে মাধুরী হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, দেখলে অজয়ের গাড়ী কিছু দূরে দাঁড়িয়ে—আর গাড়ীর দরজা খুলে নেমে বাড়ীর নম্বর মেলাতে মেলাতে সে এই দিকেই অন্যমনস্ক-ভাবে অগ্রসর হ'চ্ছে। হয়ত ও এখনি সামনে এসে দাঁড়াবে—এখুনি ডাকবে "মাধু—"

মাধুরী শিউরে উঠল।

না, অজয়ের সম্মুখ থেকে সে তাহ'লে নড়তে পারবে না, ও আহ্বানে সাড়া না দিয়ে সে থাকতে পারবে না কিছুতেই।

মাধুরী এক লাফে গাড়ীতে উঠে পড়ে এ পাশের পর্দ্দা

টেনে দিলে; তারপর কম্পিতস্বরে হুকুম করলে "চালাও ষ্টেশানকো।"

দেশের কাজ........

গ্রামে গ্রামে—পাড়ায় পাড়ায়—মেয়েদের মধ্যে, ছেলেদের মধ্যে কাজ করবার নেশায় মাধুরী যেন মাতাল হ'য়ে উঠেছিল। কেমন করে চরকায় সুতো কাটতে হয়, তাঁত চালাতে হয়, কুটীরশিল্প দিয়ে কেমন করে নিজেদের অভাব ঘোচে—কি রকমে স্বাস্থ্য বাঁচাতে হয়—এগুলো যেন সে হাতে কলমে ক'রবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। শুধু রাতটুকু ছাড়া যেন তার বিশ্রামেরও সময় নেই। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে একখানা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে চমকে উঠল; নিরুদ্দেশের খালি জায়গায় মুদ্রিত রয়েছে মাধু!—ফিরে এস, আমি আর তোমায় বিরক্ত করব না, আর তোমার দেশের কাজে বাধা দেব না, যদি তুমি চাও তবে তোমার সঙ্গে দেখাও করব না। তুমি এস, আবার ফিরে এস— অজয়।

বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়তেই মনের মধ্যে যেন সাপে কামড়াবার মত জ্বালা দিয়ে উঠল—চোখ দুটো ছল-ছলিয়েও এল হয়ত, কিন্তু না; দুর্ব্বলতা মনে আনবার সময় এ নয়। আজ তার এখানকার তৈরী সব জিনিষ বিক্রীর জন্য সেণ্টারে পাঠাতে হবে, অনেক আয়োজন আছে তার।

কাগজখানা ছুড়ে ফেলে মাধুরী উঠে দাঁড়াল; যেন মনের উপর জোর করেই— তারপর মৃদু সুরে গাইতে গাইতে পোষাক বদলাতে লাগল—

"আনন্দেরই সাগর হ'তে এসেছে আজ বান;
দাঁড় ধরে বস্‌বে সবাই,
খুব ক'সে দাও টান।"

ধীরে ধীরে হাতের কাজ ফুরিয়ে আসে, দিন, রাত, বৎসর যাবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ভেঙ্গে পড়ে মাধুরীর, মন ওঠে উৎসাহহীন হয়ে। আবার একটা বর্ষার পড়ন্ত বেলায় ও ওর জিনিষপত্র গুছিয়ে বিদায় নেয়—পল্লীগ্রামের কাছে, পল্লীর প্রতিবাসীর কাছে, তারপর ওদের সর্ব্বাঙ্গে পল্লীর শান্ত আকাশে মাঠভরা ধান, আর বৃষ্টির জলের ওপরে মায়ের মত সস্নেহ দৃষ্টিপাত করতে করতে বিদায় নেয়।

দীর্ঘ দিনের ব্যবধান।.....

আবার সেই জনকোলাহলপূর্ণ কলকাতা শহর, আর তারই রাজপথ ব'য়ে ছুটে চলেছে মাধুরীর ট্যাক্সি অজয়ের বাড়ীর উদ্দেশ্যে।.....

আজ তার দুর্ব্বল দেহ মন এমন একটা আশ্রয় চায়, যার কাছে কোনও কৃত্রিমতার স্থান হবে না; যে শুধু আশ্রয়ই দেবে বিনা দ্বিধায়, আশ্রয় লাভের দুর্ব্বলতার খোঁজ করবে না, জবাব চাইবে না, কৈফিয়ৎ তলব করবে না কোনও কাজের।

মাধুরী ভাবে তেমন জায়গার অভাব তো তার নেই! যে দ্বার তার জন্য চির উন্মুক্ত, তার কাছে তার ত কোনও দ্বিধা, কোনও সঙ্কোচ নেই।

অজয় যে আজও তার অপেক্ষা করছে, শুধু ফিরবার! সে ত জানে না, আজ সে পৃথিবীর কোনও জায়গায়, কোনও কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেনি,—আজ যে সে এতটুকু শান্তি এতটুকু সুখের আশায় ছুটে আসছে তার—শুধু তারই কাছে।

অজয়ের বাড়ীর দরজার কাছে গাড়ী থামল। অজয়েরই বাড়ীর তক্‌মাআঁটা চাকর গাড়ীর দরজা খুলে নামিয়ে নিলে সসম্মানে।

ধীরে ধীরে মাধুরী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে অগ্রসর হ'ল অজয়ের লাইব্রেরী ঘর লক্ষ্য ক'রে। সেই ঘরের মধ্যে এক টেবিল বইয়ের সম্মুখে বসে অজয় তখন কি পড়ছিল, কি-ইবা ভাবছিল—সেই জানে!

দরজার কাছে মাধুরীর সাড়া পেয়ে মুখ ফিরাল—কে?

পর্দ্দা সরিয়ে মাধুরী বললে—আমি মাধুরী।

মাধুরী? অজয় যেন একটু চমকে উঠল; তারপরেই বিস্মিত কণ্ঠে বললে "মাধুরী? কে সে?—কৈ? কাউকে মনে পড়ছে না ত?"

একটা অস্ফুট কাতোরক্তি মাধুরীর যেন বুক ফেটে বার হ'তে চেষ্টা করছিল—সেটাকে সামলে নিয়ে মাধুরী একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে অজয়ের দিকে চাইল—"মনে পড়ছে না? ও,—তবে বোধ হয় আমিই ভুল করেছি।"

"আচ্ছা নমস্কার।"—

শীর্ণ হাত দুখানা একত্র ক'রে ও ললাট স্পর্শ ক'রল, তারপর যেমন ধীর পদক্ষেপে এসেছিল, তেমনি অজয়ের ঘরের দরজার পর্দ্দা ছেড়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, ধীরে ধীরে।......

সে চলে গেল, কেন গেল তা অজয় জানে, কিন্তু কোথায় গেল তা জানলে না—শুধু নিস্পন্দভাবে বসে রইল চেয়ারখানার উপর, আর তার চোখের সম্মুখে বইগুলো, ওর লেখাগুলো ঝাপসা হ'য়ে এল স্মৃতির বাদলে।

সঙ্গীতের রূপ ও রস

শ্রীসুধাময় গোস্বামী, গীতিসাগর
(সভাগায়ক মণিপুর ষ্টেট্)

সঙ্গীতের মূল তত্ত্ব বলতে বোঝায় আনন্দ। এই আনন্দ সকল সময়েই মানুষের ভিতর স্বতঃস্ফূর্ত। জীবনে পবিত্রতম আনন্দানুভূতিই হচ্ছে মানুষের একমাত্র কাম্য, কেননা নানারূপ বিরুদ্ধ শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে জীবনে যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের অভাব অনুভূত হয় এবং তা থেকে যে দুঃখ ও দুর্দ্দশার উদ্ভব হয়, তাকে সম্বল করে মানুষ সর্ব্বদা মনস্থির করে চলতে পারে না। তাই একান্তভাবে মানুষ চায় সুন্দরতম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে জীবনকে পরিচালিত করে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। মনে হয় সঙ্গীতই একমাত্র ঐরূপ সাধনের সহজ উপায়; কারণ সঙ্গীতের প্রাণস্বরূপ সুরের আবেদন অন্তরের গভীরতম স্তরে পৌঁছে তার সকল ক্লেশ ও জড়তাকে দূরীভূত করে জীবনকে আনন্দরসেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে। মানবজীবনে এই অপূর্ব্ব আনন্দাস্বাদের স্পৃহা সঙ্গীত জাগিয়েছে ও জাগাবে, কারণ সুরের এই ব্যাকুল ও সকল আবেদন শাশ্বত। সঙ্গীতের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে এই হ'ল মোটামুটি কথা।

সঙ্গীত হচ্ছে সকল শিল্প বা কলার মধ্যে একটি বিশিষ্ট কলা, যাকে সুধীজন আখ্যা দিয়েছেন অন্যতম "ললিতকলা" (fine Art) যিনি ঐ বিষয়ের সাধন করেন তিনি হচ্ছেন শিল্পী (Artist) অর্থাৎ কলাবিৎ। প্রকৃত শিল্প বলতে বোঝায় 'স্বরূপের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ।' শিল্প শ্রেষ্ঠ পদবাচ্য হতে গেলে তাকে সুন্দর হ'লেই হবে না, হতে হবে সত্য ও মঙ্গল। শ্রেষ্ঠ শিল্প কেবল প্রেয়ই নয় শ্রেয়ও।

যে কোন শিল্প বা কলাবস্তুকে দুইদিক দিয়ে বিচার করা চলে। তার বাইরের দিক, আর তার অন্তরের দিক। এ ক্ষেত্রে এইটুকু বলে রাখতে চাই, ব্যবহারিক জগতের সাধারণ পদার্থ বিশ্লেষণের তুলাদণ্ড দিয়ে সঙ্গীতকে পরীক্ষা করা চলবে না। তাতে বিরোধের উদ্ভবই হবে, সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে না। এইজন্য সঙ্গীতের বিচারে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে সাধারণ পদার্থ অপেক্ষা বিলক্ষণ দৃষ্টি নিয়েই তাকে দেখতে হবে। যেহেতু সঙ্গীতের রূপ ও রস এ দুটিই অনুভূতির বস্তু, ব্যবহারিক জগতের সাধারণ বস্তু যেমন নয়। সাধারণ বস্তুতে বাহ্যেন্দ্রিয় দিয়ে যা আমরা প্রত্যক্ষ করি তাই হচ্ছে রূপ, আর অন্তর বাহির—উভয় ইন্দ্রিয় দিয়ে যা গ্রহণ করি তাকে রস বলতে পারি। রূপ বিচার বিশ্লেষণের বস্তু, রস বিচার বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির বিষয়। দুইয়েরই সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সঙ্গীতের কিন্তু রূপ ও রস উভয়েই অনুভবের বস্তু। বাহ্যেন্দ্রিয় এ ক্ষেত্রে অতি গৌণ, কর্ণেন্দ্রিয়ের সহায়তা বিনা তার অনুভব অসম্ভব বটে; কিন্তু সঙ্গীতের রূপ ও রসের আস্বাদন একমাত্র অন্তরিন্দ্রিয়ের আয়ত্তে।

রূপ ও রসের সম্বন্ধ হচ্ছে দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটির সার্থকতা নেই বললেই হয়। বাদ দেওয়া ত দূরের কথা, কোন একটিকে প্রধান করে তুললেও ওজন ঠিক রাখা যায় না। আত্মাকে যেমন একান্ত অত্যন্ত অতিরিক্ত করে ধরার ফল,—শঙ্করচার্য্য, তেমনি দেহকেও অত্যন্ত ঐরূপ করে ধরার ফল—চার্ব্বাক। উপনিষদের মতে উভয়েই—অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি।

সিদ্ধান্তে এইটুকু বলে রাখা ভাল যে, রূপ ও রসে মূলগত কোন পার্থক্য নেই। রসের পরিপূর্ণতাই রসাত্মক সঙ্গীতের রূপ। রসের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি না হওয়া পর্যন্ত অপূর্ণ রসসৃষ্টিকে সঙ্গীতে রূপ আখ্যা দেওয়া যায় না। রসের পরিপূর্ণতার অভাবে সঙ্গীতের প্রকৃত রূপ পরিস্ফুট হবে না। তবে পূর্ণতার পূর্ব্বাবস্থাকে রূপাভাষ বলে অভিহিত করতে পারি। রসসৃষ্টি হিসাবে অভিনবত্ব বা কৃতিত্ব তাতেও রয়েছে বলে তারও মূল্য যথেষ্ট আছে এবং সেইজন্য তাকে অস্বীকার করা চলবে না।

সত্যকার শিল্পী সঙ্গীতের সৌন্দর্য্যকে ধরবেন প্রাণের যে বিশুদ্ধ রসবোধ তার সহায়ে। সঙ্গীতের স্বরূপের দ্বারোদ্ঘাটন যথার্থ দিব্য দৃষ্টির উন্মেষ ব্যতীত সম্ভব নয়। এই দিব্যদৃষ্টির উন্মেষ রসবোধে আর রসবোধের প্রতিষ্ঠা দিব্যদৃষ্টির মধ্যে।

দেখা যায় যে, সাধারণত সঙ্গীত গড়ে ওঠে স্থূলত কতকগুলি উপাদান নিয়ে—যেমন রীতি, ভঙ্গিমা, বাক্য, অর্থের গৌরব, বর্ণের বিন্যাস, বিকাশ পদ্ধতি, রচনা সজ্জা প্রভৃতি বিষয়গুলি। লোক-সঙ্গীতের বিভাগ অনুসারে উক্ত সবগুলির কোনটি বা মুখ্য কোনটি বা গৌণ হিসাবে প্রয়োজন হয়ে থাকে।

বাহ্যত সঙ্গীতের রূপ ও রসে আমরা যে পার্থক্য দেখি, তার স্বাভাবিক কারণ বিশ্লেষণ করে বিচার করতে গেলে বুঝতে পারি যে সঙ্গীত মাত্রেই আছে কতকগুলি বিশেষ ধরণের গঠন-কৌশল এবং ভাবের অভিব্যক্তি। গুণীরা যাকে expression বলেন। সেই expression অর্থাৎ অভিব্যক্তি হবে—রসাত্মক। প্রথমে ধরা যাক রূপ ও রসের দার্শনিক ব্যাখ্যা কি হ'তে পারে। তাঁরা বলেন, বস্তুর সত্তা হচ্ছে সত্য। সেই সত্তার যে আনন্দ—তাহাই রস। রস সৃষ্টির অর্থ, সত্যের ভিতরে যে আনন্দ তাকে বিকাশ করা, আর আনন্দের যে সুসীম, সুঠাম, সুবিন্যস্ত ব্যক্ত সৌন্দর্য্য তাহাই রূপ। সেইরূপ সঙ্গীতেও যে সত্য অর্থাৎ ধ্বনির নৃত্য ও সুরের খেলা, সৌন্দর্য্য কিম্বা আনন্দের ছন্দে শৃঙ্খলিত, সংগঠিত (organised) না হ'য়ে স্বাচ্ছন্দস্বরূপে প্রকাশে অসমর্থ, তাহা প্রকৃত রূপ ও রস সমন্বিত সঙ্গীতের আসরে অপাংক্তেয়।

রূপ ও রস, এই উভয়বিধ বস্তু সঙ্গীতে শুনতে হবে নূতন ও বিশেষ কান দিয়ে, সে হচ্ছে উপলব্ধি। প্রায়ই দেখা যায় যে, কোথাও সঙ্গীতের প্রাণশক্তি অর্থাৎ রসতত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করে, আর কোথাও বা সৌন্দর্য্য অর্থাৎ রূপ প্রাণকে আচ্ছন্ন করে। যদিও মূলগত কোন বিভেদ নেই, তবুও বাহ্যত একের আধিক্য অন্যের চেয়ে বেশী কখনও কখনও মনে হয়। যেমন এক ধরণের গুণীর অন্তর্দৃষ্টি গভীর। তাঁরা সঙ্গীতের সুরের architectural দিক অর্থাৎ গঠন-কৌশল বা রচনা সজ্জা ও অলঙ্কার প্রভৃতির জন্য ব্যস্ত হন না। দিব্য-দৃষ্টি প্রভাবে এবং নিজের সাধনজনিত যে উপলব্ধি ও হৃদয়াবেগ, ঐ সকলের মিলনে প্রাণময় কোষে যে রস পরিগ্রহ

(৫৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্যপশুর মুষ্টিযুদ্ধ

কালিফোর্নিয়ার মোহেভ্ মরুভূমি অঞ্চলে যাইয়া একটি পাহাড়ের গায়ে কাদা-মাটী ও পাথরের সাহায্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মিঃ এফ্ ভি স্যাম্সন্ বন্যপশুর স্বাধীন লীলা-খেলা পরিদর্শন করিতে থাকেন। ক্রমে জানোয়ারগুলি মিঃ

বন্যপশুর মুষ্টিযুদ্ধ—একটি চিপমাঙ্ক ঝাঁকাইয়া নুইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে চরম নক্ আউট্ মুষ্ট্যাঘাত প্রদান করিতে উদ্যত।

স্যামসনের সহিত এমন নির্ভীকভাবে মেলামেশা করিতে থাকে যে, মিঃ স্যামসন উহাদের বহু হুটোপাটির ফটো গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। নানাবিধ জানোয়ার আসিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিলেও, ভোঁদড় জাতীয় চিপমাঙ্কগুলিই কসরং দেখাইত বেশী। উহাদের এই কৌতুকপ্রবণতা দেখিয়া মিঃ স্যামসন উহাদের মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। সেই শিক্ষার ফলেই দেখা যাইতেছে, প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি চিপমাঙ্ক মানুষের মত দুই পায়ে দাঁড়াইয়া রীতিমত বক্সিং-য়ের কায়দায় লড়িতেছে। অংপ সময়ের ভিতর উহারা মুষ্টি-যুদ্ধের প্রধান প্রধান কৌশলগুলি বেশ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের কৌতুকপ্রবণতা ও স্মৃতিশক্তি দুই-ই অসাধারণ।

সন্ধানী আলোর লেন্স্ সাহায্যে ফটো

নিউ ইয়র্ক সিটির মিউজিয়াম অফ্ সায়েন্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর অভ্যন্তরে যে কাচ প্রস্তুতের নকল ক্ষুদ্রাকার কারখানা রহিয়াছে এবং যেস্থানে আলোকের প্রতিফলন, বক্রণ, বিকর্ষণ, সমতাপাদন প্রভৃতি ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়, সেই কক্ষে সন্ধানী আলোর একখানি ৪৮ ইঞ্চি ব্যাসের বিরাট প্যারাবোলিক্ মিরর্ রহিয়াছে যাহার সাহায্যে ১০ লক্ষ বাতি সমকক্ষ রশ্মি বিচ্ছুরণ সম্ভব হয়। কোনও দর্শক যখন

উচ্চশক্তির প্যারাবোলিক মিররে প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তি—এক ব্যক্তির পরছায়া শ্যামযমজের মত সংলগ্ন—নাকে নাকে

এই মির্‌রটি পর্যবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত, সেই সুযোগে এক চতুর ফটোগ্রাফার দর্শকের সেই অবস্থায় ফটো গ্রহণ করে। প্যারাবোলিক্ মির্‌রে প্রতিফলনের প্রতিক্রিয়ায় ফটোখানি হয় একেবারে অদ্ভুত। একই ব্যক্তির দুই মুখী দুইটি প্রতিকৃতি—বিরাট নাক দুইটি দ্বারা শ্যাম যমজের মত একত্র সংযুক্ত অবস্থায় চিত্রে দেখা যাইতেছে। এই জাতীয় মিররের পরছায়ায় নানা প্রকার বিকট আকার দেখা যায় স্বাভাবিক মানুষটিরও। এই জন্য মেলা প্রভৃতিতে আমরা উহা দ্বারা নানা হাস্যকর প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি হইতে হামেশা দেখিয়া কৌতুক অনুভব করি।

মৎস্যকে বিচিত্র শিক্ষাদান

ইউরোপের প্রাচীনতম য়্যাকোয়েরিয়াম (অর্থাৎ গবেষণার্থ মৎস্য পালনের কৃত্রিম জলাশয়) নেপ্লসে অবস্থিত। সেখানে ডাঃ ওস্নার মৎস্য লইয়া নানাবিধ গবেষণা পরিচালনের ফলে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মৎস্যেরও স্মৃতিশক্তি রহিয়াছে এবং উহাদের নানা প্রকার কসরং শিক্ষা দিলে উহারা তাহা দীর্ঘকাল স্মরণ রাখিতে পারে। পালকের হাত হইতে নির্ভয়ে খাদ্য গ্রহণ করিতে কোন মৎস্যকে অভ্যস্ত

করাইতে মাত্র দুই মাস সময় লাগে। ইহা ছাড়া ডাঃ ওস্নার ঐ য়্যাকুয়েরিয়ামের মৎস্যদের নানা কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন—তন্মধ্যে একটি হইল গোলাকার একটি চাকার ভিতর দিয়া

এক মাসে মাছগুলিকে রক্ষকের হাত হইতে খাবার গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়—গোল চাকাটির ভিতর লম্ফপ্রদানেও উহারা অভ্যস্ত হয় অল্প সময়ে

লাফাইয়া যাওয়া। এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে উহাদের মাত্র এক মাস সময় লাগিয়াছে। এখন শিক্ষকের ইঙ্গিতমাত্র উহারা হুপের ভিতর দিয়া অবলীলাক্রমে লম্ফ প্রদান করে।

ট্যাঙ্কের অভিনব যাত্রাপথ

সোভিয়েটের রেড আর্মির একটি ট্যাঙ্ক বিরাট একটি হাতীর ন্যায় নদীতে পোঁতা থামগুলির মাথায় মাথায় পা দিয়া যেন পার হইয়া যাইতেছে। সোভিয়েটের একোবিংশ বার্ষিকী উপলক্ষে যে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়, সেই চলচ্চিত্রের পদে পরিচালিত করিয়া নদীর অপর তীরে নেওয়া সম্ভব হয়। অতিশয় গুরুভার একটি সাঁজোয়া ট্যাঙ্ককে এইভাবে নিরালম্বপ্রায় পথে নদী পার করা বিচিত্র প্রয়াসই বলিতে হইবে।

বোমা-নিরোধক রং

বৃটিশ বিজ্ঞানীরা এমন এক বিচিত্র রং আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহাকে বোমা-নিরোধক বলা যাইতে পারে। কারণ, রাসায়নিক অগ্নি-উৎপাদনশীল পদার্থের প্রজ্বলন ক্রিয়া প্রতিরোধ করিবার শক্তি ঐ অভিনব রং-য়ের বিভিন্ন উপাদানের ভিতর রহিয়াছে। সুতরাং ঐ রং-য়ে আবৃত পরিচ্ছদ, কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত আসবাব প্রভৃতি বোমার সংস্পর্শে আসিলেও বোমার প্রজ্বলন প্রতিহত হইবে। কিন্তু বিস্ফুরিত বোমার উপর ঐ রং-বিশিষ্ট পদার্থ নিক্ষেপ করিলে অবশ্য সুফল পাওয়া যাইবে না। এই রং কেবল প্রজ্বলনই প্রতিরোধ করিতে পারে। এখনও উহা লইয়া গবেষণা চলিয়াছে উহার প্রতিরোধ শক্তি নিখুঁত করিবার জন্য।

রাক্ষুসে গঙ্গাফড়িং

জীবজগতে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক প্রকৃতির বিধান। ইহা দ্বারা অতিবৃদ্ধি খর্ব্ব হয়। কিন্তু দেশভেদে এই খাদ্য-খাদক সম্পর্কের আশ্চর্য হেরফের দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার বেলজিয়াম-অধিকৃত কঙ্গো অঞ্চলে ইহার একটি অদ্ভুত নিদর্শন নজরে পড়ে। কেন না, সেখানে এক জাতীয় গঙ্গাফড়িং রহিয়াছে, যাহা ইঁদুর শিকার করিয়া খায়। ইঁদুরের মত জীবকে যে একটা গঙ্গাফড়িং সাবাড় করিবে, ইহা অবশ্য আমাদের দেশে অভাবনীয় কাণ্ড। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে অসম্ভব কিছুই নাই এবং প্রকৃতির কোন্ রহস্য যে বিস্ময়াবৃত নয়, ইহাই বুঝিয়া উঠা কঠিন।

শুধু স্তম্ভের মাথায় মাথায় সাঁজোয়া শকটের নদী অতিক্রমের প্রয়াস—রেড আর্ম্মির মহলা

অংশবিশেষে রেড আর্মির কৃতিত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে এই দৃশ্যটি তোলা হয় ফিল্মে। কাঠের থামগুলির মাথায় বসান ছিল সেতু। সেই সেতু অপসারণ করা হয়, তৎপর এই আর্ম্মোরড রুশীয় ট্যাঙ্কটিকে ঐ স্তম্ভ শিরের পথে নিরা-

বেলজিয়ান কঙ্গোর গঙ্গাফড়িং অবশ্য আকারে বড় (যেমন তথাকার হাতীও অন্য দেশের হাতী অপেক্ষা বৃহত্তর) এবং মুখটিও এমনভাবে তৈরী যে নিজ দেহ অপেক্ষা বৃহৎ শিকারও উহা গলাধঃকরণ করিতে সক্ষম।

গুজবের গোড়া

[কৌতুক চিত্র]

শ্রীঅখিল নিয়োগী

অতি প্রত্যূষে গাঁয়ের গোলক চাটুয্যে দাঁতনকাঠি সংগ্রহ করবার জন্যে দক্ষিণ পাড়ার হরিহর বাগে ঢুকেছিলেন। বাসনা ছিল, প্রাতঃকালের এই বিলাসটি সমাধা করার ফাঁকে একবার বাজারটা ঘুরে যাবেন। গাঁয়ের লাগোয়াই একটি তর্‌তরে নদী ...তারি বাঁকে সকাল বেলাতেই বাজার বসে।

হরিহরের বাগে যখন তিনি ঢুকলেন, কান খাড়া করলে দিব্যি শোনা যেতো যে তাঁর মুখ থেকে অস্ফুট একটি সংগীত নির্গত হচ্ছে। কিন্তু যেভাবে তিনি সেখান থেকে বের হলেন সেটা সম্পূর্ণ অভিনব ও আকস্মিক! চক্ষু ঘূর্ণিত, কচ্ছ স্খলিত এবং দক্ষিণ পদের কাষ্ঠ-পাদুকা নিরুদ্দেশের পথে!

গাঁয়ের সদর রাস্তায় নেমেও তিনি তাঁর গতি কিছুমাত্র মন্থর করলেন না। বস্তুত, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একটি জ্যান্ত মানুষের দর্শন মিললো, ততক্ষণ তিনি হোঁচট খেয়েও এগুতে লাগলেন।

ঠিক বাজারটার কাছাকাছি গিয়ে রাস্তার তে-মোহনার কাছে পরাণ মণ্ডলের সঙ্গে দেখা।

পরাণ মণ্ডল গুড়ের কারবার করে। এক হাঁড়ি গুড় নিয়ে সে বাজারেই যাচ্ছিল। চাটুয্যে বিন্দুমাত্র ভণিতা না করে, হাঁড়ি থেকে এক খাবলা গুড় মুখে ফেলে দিলেন, তারপর তর্‌তর করে নদীর পাড় ভেঙে একেবারে নীচে নেমে গেলেন এবং কয়েক আঁজলা জল পান করে টেকো মাথার ওপর নদীর ঠাণ্ডা জল বুলোতে লাগলেন।

পরাণ মণ্ডল চাটুয্যের কাণ্ড দেখে রাস্তার মাঝখানেই থমকে দাঁড়াল এবং চাটুয্যে আবার হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠে এলে জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কি চাটুয্যে মশাই? ভয়-টয় পেয়েছেন নাকি?

চাটুয্যে চোখ দুটোকে কপালে তুলে বললেন, ভয় বলে ভয়! সেই জন্যে ত আগে কোন কথা না বলে গুড়-জল খেয়ে নিলাম।

পরাণ মণ্ডল কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছে বলুন ত?

চাটুয্যে জবাব দিলেন, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না— মণ্ডলের পো। দাঁতন আনতে ঢুকেছিলাম হরিহরের বাগে। অন্ধকারের মধ্যে দেখি কি একটা জানোয়ারের চোখ ঠিক যেন জোনাকির মত জ্বলছে!

মণ্ডলের পো হেসে বললে, চোখের ধাঁধায়ও অনেক সময় ভুল দেখা যায়। যাই হোক, ভয়টা যখন পেয়েছেন, বাড়ী ফিরে যান,—আচমকা ভয় পেলে জ্বরটর আসাও বিচিত্র নয়।

ঠিক কথাই বলেছ মণ্ডল, এই বলে চাটুয্যে বাড়ীর দিকেই পা চালিয়ে দিলেন, তারপর হঠাৎ ফিরে এসে পরাণকে ডেকে একটু 'কিন্তু কিন্তু' ভাবে ঠোঁট নাড়তে লাগলেন।

পরাণ বললে, কিছু বলবেন আমায়?

গলাটা যথাসম্ভব খাটো করে চাটুয্যে জবাব দিলেন, হ্যাঁরে—শোন, আমার ভয় পাবার কথাটা কাউকে বলিস নি যেন! গাঁয়ের লোকেরা এই নিয়ে—হয়ত—

জিব কেটে ও কান মলে পরাণ বললে, আপনি বলছেন কি মানুষী করে কি আমি আপনাকে লোকের সামনে খ[illegible] করতে পারি! রামচন্দ্র! রামচন্দ্র!

নিশ্চিন্ত হয়ে চাটুয্যে মশাই বাড়ী ফিরলেন।

এই ঘটনার ঘণ্টাখানেক পর—গাঁয়ের বিন্দে পিসি পাঁড়[illegible] মার করে ছুটতে ছুটতে দাওয়ায় এসে হাতের মাজা বাসনগ[illegible] ঝনাৎ করে নামিয়ে রেখে ছোট বোন নিস্তারিণীকে [illegible] বললেন, শুনেছিস্ নিস্তার, ও বাড়ীর চাটুয্যে মশাইকে হরি[illegible] বাগে আজ সকালে দানোয় পেয়েছিল। এই বড় বড় ভাঁ[illegible] মত দুই চোখ......এক পাটি মুলোর মত দাঁত—; ওঁকে [illegible] ঘাড় মটকাচ্ছিল আর কি! শুধু বামুনের ছেলে বলে গায়[illegible] মন্তরের জোরে বেঁচে এসেছেন।

নিস্তারিণী বাল-বিধবা। সারা জীবন পিত্রালয়েই কেটে[illegible] ..এখন বেশ বয়েস হয়েছে। প্রৌঢ়া বললেও চলে। দাঁতে মি[illegible] দিয়ে পাড়া বেড়ান এঁর প্রকাণ্ড একটি বিলাস। দিদির ক[illegible] এই মুখরোচক খবরটা পেয়ে, হাতের কাজ-কর্ম্ম একদি[illegible] সরিয়ে রেখে তিনি উঠে পড়লেন। তারপর খড়ের চালে গোঁ[illegible] মিশির কৌটাটি থেকে খানিকটা গুঁড়ো বাঁ হাতের তেলো[illegible] ঢেলে, ডান হাতের তর্জ্জনীটি ভগ্নাবশেষ দাঁতগুলির ও[illegible] বুলাতে বুলাতে গজেন্দ্রগমনে খিড়কির দোর দিয়ে পাড়[illegible] দিকে অগ্রসর হলেন।

নিস্তারিণী পাড়া বেড়িয়ে ফেরবার খানিক বাদেই দত্তে[illegible] খিড়কির পুকুরে সেনগিন্নী দত্তগিন্নীকে বললেন, ভাগি[illegible] দিদি উনি সঙ্গে ছিলেন—নইলে আজ চাটুয্যে মশায়ের কি [illegible] হ'ত বলা শক্ত......উনি বলছিলেন—দুটো শিং নয়তো [illegible] ধারাল তরোয়াল!

দত্তগিন্নীর আর কলসীতে জল ভরা হ'ল না—ভুলে কল[illegible] পুকুর ঘাটে ফেলে রেখে ছুটতে ছুটতে ভিজে কাপড়ে[illegible] শয়ন ঘরে প্রবশ করলেন। দত্তমশাই তখন শামলা এ[illegible] কোর্টের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

দত্তগিন্নী বললেন, ওগো শুনেছ! প্রকাণ্ড এক ব্রহ্মদৈ[illegible] নাকি বাসা বেঁধেছে হরিহর বাগে। চাটুয্যে মশায়ের কাঁধে [illegible] করেছে শুনেছি! আমি ভাবছি ও বেলা আমাদের এখানে স[illegible] নারায়ণের সিন্নি কে দেবে! চাটুয্যে মশাইয়ের ত' এখন-ত[illegible] অবস্থা!

মৃদু হেসে দত্তমশাই বললেন, হ্যাঁ, এরকম একটা [illegible] বাজারের পথে শুনেছিলাম বটে, কিন্তু সে ত' দৈত্য-দানা নয়[illegible] শুনলাম এক সিদ্ধ মহাপুরুষ এসেছিলেন কাশী থেকে। ভাব[illegible] যাব একবার সন্ধ্যের দিকে হাতটা দেখাতে......

—কি যে তুমি বল ছাই তার ঠিক নেই! ভাগ্যিস [illegible] পাড়ার সেনমশাই সঙ্গে ছিলেন, তাই চাটুয্যে মশাই প্রাণ নি[illegible] বেঁচে এসেছেন! সেনগিন্নী ত' নিজে মুখেই আমায় সব ব[illegible] গেলেন!

দত্তমশাই জিজ্ঞেস করলেন, কি বলে গেলেন তিনি শুনি[illegible]

দত্তগিন্নী বললেন, প্রকাণ্ড দুটো শিং, নাক দিয়ে আগুনে[illegible] হলকা বেরুচ্ছে। পেটের ওপর এক চোখ জ্বলু জ্বলু করছে!

দত্তমশায়ের ছেলে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে মা-বাবা[illegible]

ইস্কুলে গিয়ে এই খবর শুনিয়ে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দেবে!

দত্তগিন্নী বললেন, ওরে পটলা আজ আর হরিহর বাগের কাছ দিয়ে ইস্কুলে যাসনে—একটু ঘোরাপথে যাস্ তা-ও ভাল; বুঝলি?

পটলা মাথা নেড়ে বললে, হুঁ, বুঝিছি মা, তুমি শীগ্গির আমার জামা বের করে দাও, ইস্কুলের বেলা হ'ল যে!

সেদিন ইস্কুলের টিফিনের সময় পরাণ মণ্ডলের ছেলে নফ্‌রা আর দত্তদের ছেলে পটলার মধ্য কথা কাটাকাটি সুরু হ'ল:

নফ্‌রা বললে, তুই ত' ভারী জানিস......বাবা নিজে চক্ষে দেখেছে, ল্যাজটা ত্রিশ হাতের কম নয়—

পটলা রেগে-মেগে জবাব দিলে, লেজ আবার কোথায়? দুটো শিং, আর পেটের ওপর একটা চোখ আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে

নফ্‌রা বললে, আরে রেখে দে তোর আগুনের ভাঁটা' ঐ লেজের ঝাপটে বড় বড় গাছ পালা পর্যন্ত ভেঙে ফেলতে পারে! একটা ভাঙা ডাল ত' বাবাই কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। তাই পুড়িয়ে আজ আমাদের রান্না হ'ল। বললে বিশ্বেস করবিনে—উনুনে এমন আঁচ হয়েছিল যে, তিন মিনিটে রান্না শেষ! ব্রহ্মদৈত্যদের তেজ জানিস ত'? বাবা বলেছে একটা গোটা গাছই কাল নিয়ে আসবে—

পটলা ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে, কি যাতা বলিস তার ঠিক নেই ; সেনমশাই নিজে চাটুয্যে মশাইকে তার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন......ভাঁটার মত একটা চোখ ঠিক পেটের মাঝখানে, আর নাক দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে!

—যা—যা সব মিথ্যে কথা! নফ্‌রা বিশেষ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলে।

—মিথ্যে কথা! পটলার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে নফ্‌রার গালে এক বিরাট চড় বসিয়ে দিলে!

আর যাবে কোথায়! দুজনের সুরু হ'ল রাম-রাবণের যুদ্ধ!

মজা দেখতে ছেলের দল ভিড় করে দাঁড়াল, কিন্তু ছেলেরা দোষ করলে যাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা করার কথা, সেই হেড-মাষ্টার আর পণ্ডিত মশাই দু'জনে তখন বসবার ঘরে বসে তুমুল তর্ক তুলেছিলেন!

পণ্ডিতমশাই বললেন, আপনারা ইংরেজী শিক্ষিত নাকি... সহজে এসব কথা বিশ্বাস করতে চান না......

হেডমাষ্টার মশাই টেবিলে একটা চাপড় মেরে বললেন, যার অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই, সে কথা কি করে বিশ্বাস করি বলুন?

ঠিক এমনি সময়ে হেডমাষ্টার মশাইয়ের চাকর ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে—বাবু, শীগ্গির বাসায় চলুন...... গিন্নীমা ফিট্ হয়ে পড়েছেন.....

অ্যাঁ বলিস কিরে'—হেডমাষ্টার মশাই তখুনি তার পেছন পেছন ছুটলেন পেছনে পড়ে রইল সমস্ত যুক্তি আর তর্ক।

পণ্ডিতমশাই গর্বের হাসি হেসে কৌটা খুলে এক টিপ নস্যি নিয়ে অনুনাসিক স্বরে বললেন, ভগবান এমনি করেই লোককে শিক্ষা দিয়ে থাকেন!

খবরটা দাবানলের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে সেদিন সন্ধ্যেবেলার হাট আর ভাল করে জমল না। যে কয়-জন দোকানী তারি মধ্যে এসেছিল—বিকিকিনি একেবারে নেই দেখে তারাও বেলাবেলি সওদা গুটিয়ে যার যার ঘরে রওনা হ'ল।

সন্ধ্যে-প্রদীপ জ্বলবার আগে থেকেই সারা গ্রামে একটা থমথমে ভাব ঘনিয়ে এল।

গাঁয়ের সব মাতব্বরেরা একসঙ্গে জুটে মজলিস করে স্থির করলেন, এখন একবার গিয়ে চাটুয্যের খবর নেওয়া দরকার। উত্তেজনার প্রবল আতিশয্যে লোকটি মরে গেল না বেঁচে রইল সে খোঁজও এখন পর্যন্ত নেওয়া হয় নি!

কিন্তু পাছে কে কতখানি তৈরী করে রটিয়েছে, সেটা ধরা পড়ে, এই ভয়ে কেউ এগোতে চান না। তবে কৌতূহল এমনই বস্তু, যার মোহ কাটিয়ে ওঠা একরকম অসম্ভব।

পণ্ডিতমশাইকে দলের অধিনায়ক করে তখন এক-পা, দু-পা করে তাঁরা চাটুয্যের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'লেন।

চাটুয্যেমশাই বাইরের ঘরেই বালাপোষ মুড়ি দিয়ে বসে আদা নাড়ি খাচ্ছিলেন।

সবাইকে একসঙ্গে তার বাড়ী ঢুকতে দেখে তিনি একেবারে হকচকিয়ে গেলেন।

পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন বোধ করছেন চাটুয্যেমশাই?

চাটুয্যে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বললেন, না—না, আমার ত কিছু হয়নি।

সকলে এ-ওঁর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

পণ্ডিতমশাই বললেন, রোগী যদি জোর করতে থাকে যে, আমার কিছু হয়নি—তবে জানতে হবে সেই রোগই মারাত্মক।

গাঁয়ের বিচক্ষণ কবরেজ জনার্দ্দন গাঙ্গুলী সে কথায় সায় দিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, সত্যি কথাই বলেছ পণ্ডিত......আরে তুমি বিচক্ষণ ব্যক্তি কি না, তাই অভিজ্ঞের কথাই তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে......দেখি একবার হাতখানা—

চাটুয্যেমশাই সভয়ে হাতখানা বালাপোষের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন।

জনার্দ্দন গাঙ্গুলী নয়ন কুঞ্চিত করে বললেন, হুঁ! দৈত্য-দৃষ্টি! এর খাঁটি ঔষধ আমার কাছেই পাওয়া যাবে......ওহে কেউ এসতো আমার সঙ্গে লণ্ঠন নিয়ে—

গাঁয়ের একটি উৎসাহী যুবক লণ্ঠন হাতে গাঙ্গুলী-মশাইকে দেখিয়ে নিয়ে রওনা হ'ল।

গাঁয়ের অতি প্রাচীনেরা মাথা নেড়ে বললেন, এ কবরেজী অষুধে হবে না ভায়া—ওঝার খোঁজ কর। এবং পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

কলেজে-পড়া একটি ছেলে উৎসাহের সঙ্গে বললে, সেই সঙ্গে মিঃ বাগচীকেও খবর দিলে হয়—তিনি আজই এসে গ্রামে পৌঁছেছেন—

পণ্ডিতমশাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ বাগচীটি হ'ল কে?

কলেজের ছেলেটি জবাব দিলে, ও! জানেন না বুঝি...? ও পাড়ার তারক বাগচীর ছেলে বি বাগচী। সম্প্রতি বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে এসে কলকাতায়ই প্র্যাকটিস সুরু করেছেন। কি একটা বৈষয়িক কাজে আজই গাঁয়ে এসেছেন।

এইবার হেডমাষ্টার মশাই উৎসাহিত হয়ে বললেন, নিশ্চয়! নিশ্চয়! এত বড় একজন গুণী ব্যক্তি যখন গাঁয়ে উপস্থিত আছেন.....তাঁর পরামর্শটা আগে নেওয়া উচিত.....হাজার হোক, এটা বিজ্ঞানের যুগ সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই ত'! —বলেই তিনি একবার আড় চোখে পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে তাকালেন!

উৎসাহী যুবকটি তখুনি একটা লাঠি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সবাই তাকে সাবধান করে বললেন, একটা আলো নিয়ে যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য; সে কথায় কান না দিয়ে যুবকটি সাঁই সাঁই করে ইয়ং বেঙ্গলরূপে রওনা হ'ল।

কবরেজ মশাইয়ের 'বড়ী' সবে মধুর সঙ্গে মেড়ে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ওঝার দল কখন এসে পড়বে, সেই আলোচনা চলছে, এমন সময় মিঃ বাগচী এসে উপস্থিত হ'লেন।

হেডমাষ্টার মশাই যেচে এগিয়ে গিয়ে নিজে আলাপ-পরিচয় করলেন এবং সমস্ত ঘটনাটা বুঝিয়ে বললেন।

গ্রামের বৃদ্ধ মাতব্বরের দল একটা অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে মুখ ফিরিয়ে রইলেন......পণ্ডিত মশাইকেই যেন একটু বেশী উত্তেজিত বলে মনে হ'ল।

কিন্তু হেডমাষ্টার মশাইকে ভাল করে জেরা করে ব্যাপারট ভালভাবে জেনে নিয়ে মিঃ বাগচী বিরাট অট্টহাসি কে উঠলেন।

পণ্ডিতমশাই অর্দ্ধস্বগতভাবে বললেন, লোকটা কি পাগল নাকি!

মিঃ বাগচীর কানে হয়ত কথাটা গিয়ে থাকবে। তিনি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে হাতজোড় করে জবাব দিলেন আজ্ঞে, আমি সম্পূর্ণ সুস্থই আছি, তবে আপনাদের ভাবভঙ্গ দেখে মনে হচ্ছে—ঐ বিশেষণে আপনাদেরই অভিহিত কর চলে। কেননা, ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—আমার টেরিয়ার কুকুরটা আজ খুব ভোরে আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল আমি শ্মশান অবধি গিয়েছিলাম, সেখানে কুকুরটা প্রকাণ্ড একটা হাড় কুড়িয়ে পেয়ে তাই নিয়ে ঐ জঙ্গলে লুকিয়ে সদ্ব্যবহার করছিল। আমি অনেক কষ্টে ওকে খুঁজে বের করি। আর একটা কথা—ওর চোখ অন্ধকারে সত্যি জোনাকীর মতই জ্বলে। চাটুয্যেমশাই হয়ত তাই দেখে ভয় পেয়েছেন। আচ্ছা, আসি নমস্কার—

মিঃ বাগচীর জুতোর শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। কিন্তু গ্রামের মাতব্বরের দল সবাই তখনও স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে......! এমন একটা উদ্দীপনা অকস্মাৎ নষ্ট হয়ে গেল দেখে সবাই মনে মনে এই বিদেশী ভাবাপন্ন ডাক্তারটির মুণ্ডু চর্ব্বণ করতে লাগলেন।

হেডমাষ্টার মশাই শুধু একবার আড়চোখে পণ্ডিত-মশাইয়ের দিকে তাকালেন।

সঙ্গীতের রূপ ও রস

(৩৯২ পৃষ্ঠার পর)

করে, সেই রসানুভূতিকে তাঁরা যে কোনভাবে যে কোন ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। প্রকৃত গুণীর বিচারই হবে সেইখানে, যেখানে তিনি যা বলেছেন তা সুষ্ঠু করে বলতে পেরেছেন কিনা, এর ওপর; কেমন করে বলেছেন বা কি বলেছেন তার ওপর নয়। তাঁদের রস-মাধুর্য্যের উৎপত্তি হয় প্রাণেরই স্পন্দনে। যেহেতু—সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং প্রাণ যখন দুলে ওঠে, তখন তার ভিতরের সকল জিনিষ বাইরে এসে প্রকট হয়। এই সৃষ্টির আনন্দেই গুণী প্রেমে আপন ভোলা হয়ে পড়েন। আবার আর এক প্রকারের গুণী আছেন, যাঁদের সঙ্গীতে বিপরীত ভাব দেখতে পাই—অর্থাৎ intensely lyrical দিকটা তাঁদের সুরের উদ্দীপনার চাপে অস্পষ্ট হয়ে যায়। এতে হয় কি যে, ধ্বনির সাথে সুরের গঠন-কৌশলের বিশেষ কৃতিত্ব একটানা জুড়ে দেওয়া হ'লে ধ্বনি আড়ষ্ট ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং তার নিজস্ব সৌন্দর্য্য প্রকৃতপক্ষে কম বিকাশে সমর্থ হয়। যদিও ঐরূপ গুণী তাঁদের সঙ্গীতের রূপ পরিগ্রহ ব্যাপারে সুরের গঠন নৈপুণ্যের ও মনোহর ছন্দ প্রকরণের কারুকলার রূপ সম্পদ হিসাবে একটি বিশেষ মূল্য আছে। কেননা সঙ্গীতে এই যে বস্তুগত রস অর্থাৎ ধ্বনি বা সুর-লালিত্যকে অতিক্রম করে রূপগত যে রস-সৃষ্টি তাও তাতে উদ্দিষ্ট রস হ'তে পারে: কারণ রূপগত সৌন্দর্য্যের ওপর চিত্তের এই যে রঞ্জনী বৃত্তি ও অহেতুক টান শিল্পীর পক্ষে যথেষ্টও গণ্য হয়ে থাকে। সংক্ষেপভাবে বিচার করে দেখ্‌লে মনে হবে যে, সাধকের মনোভাবের প্রকাশনৈপুণ্যে সুরের রূপ পরিগ্রহ করে। তাঁর মনের আবেগ যে পরিমাণে শ্রোতার চিত্তে সঞ্চারিত হয়, রস-সৃষ্টি হিসাবে সুর-বিকাশ সে পরিমাণেই সার্থক একথা বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না বলে মনে হয়।

প্রকৃতপক্ষে রূপ ও রসের সম্মিলিত স্বরূপ প্রকাশ সঙ্গীতে যেভাবেই করা হোক না কেন, তাকে করে তুলতে হবে জীবন্ত। সেটা সম্ভব একমাত্র জীবনের সাথে একটা সরস সরাগ সম্পর্কে, একটা সহানুভূতির বন্ধনে। নতুবা জীবনকে যে শিল্প অস্পৃশ্য মনে করে দেখে, কেবল বৈয়াকরণিকের চক্ষু দিয়ে তাহা সুন্দর সুঠাম অনবদ্যাঙ্গ হতে পারে, কিন্তু তা প্রাণবান হয় না, একথা ঠিক।

উপরোক্ত দুইয়েরই পরিপূর্ণ সুসঙ্গতি অল্প কয়েকজন গুণীর মধ্যে দেখা যায়। যথার্থ জ্ঞানের আছে একটা অনুভূতি ও তার আছে সাক্ষাৎদৃষ্টি, আর ভাবের আছে সাক্ষাৎ স্পর্শ—উভয়ই অপরোক্ষ উপলব্ধি। এই উপলব্ধির গভীরতার সঙ্গে বিষয়ের নিজস্ব মহিমা মিলিত হয়ে প্রকৃত সত্যের রস

(শেষাংশ ৬০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তুরস্কে ভাষা-বিপর্য্যয়

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

তুর্কি বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে তুরস্কে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহা ওস্মানলী-সাহিত্য নামে পরিচিত। বর্ত্তমানে তাহা Turkche (টারকেচে) নাম ধারণ করিয়াছে। মধ্য এশিয়াস্থিত তুরস্কদের আদিভূমিতে প্রাচীনকালে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান ভাষা নানা প্রভাবের চাপে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন শক্তি লাভ করিয়াছে। তুর্কি ভাষায় Turk শব্দের অর্থই হইতেছে "শক্তি"।

বৈকাল হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু প্রস্তরখণ্ড, প্রস্তর স্তূপ ও স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে, তাহার গাত্রস্থ চিহ্নাদি হইতে তুর্কি-সাহিত্যের প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই সব প্রস্তরখণ্ড অষ্টম শতাব্দীতে খোদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সে যুগের তুর্কিজাতি শক্তিশালী জাতি ছিল। তাহারা সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে আলটাই পর্ব্বত ও চীনের প্রাচীর পর্য্যন্ত একটা বিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের এই সাম্রাজ্য বেশীদিন টিকে নাই। কিন্তু তাহারা যে সুচারুরূপে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিল—চীনের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। প্রাক্ ইসলাম যুগের তুর্কিদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত সম্প্রদায় ছিল উইঘুর জাতি। ইহারা টীন উপত্যকার চতুষ্পার্শ্বে বসতি বিস্তার করিয়াছিল। তাহাদের রাজধানী ছিল "তুরফান"। এই উইঘুর সম্প্রদায় সাহিত্যচর্চ্চা করিতে ভালবাসিত। তাহাদের সাহিত্য-সাধনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তাহাদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। তাহাদের সাহিত্যের মধ্যে বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ইহার কিছু কিছু নিদর্শন সম্প্রতি মধ্য এশিয়াতে পাওয়া গিয়াছে। উইঘুর সাহিত্যের বর্ণমালা প্রচলিত বর্ণমালা হইতে একটু বিভিন্ন। তবে কতকগুলি শব্দ সাংকেতিক অক্ষরে (Runic) লিখিত আছে। ইহাকে নিকটবর্ত্তী আরমানী বর্ণমালার পরিবর্ত্তিত আকার বলিলেও চলে। এই উইঘুর বর্ণমালার উপর ভিত্তি করিয়া মোঙ্গল ও মানচু বর্ণমালা রচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কয়েক যুগে তুর্কীদের নানা শাখা চীনা তুর্কিস্থানের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এখানে ইন্দো-জারমান সাহিত্য প্রচলিত ছিল। কিন্তু উইঘুর সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উইঘুর ভাষা প্রবল হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে তুর্কিজাতি সাইবেরিয়া, দক্ষিণ রুশিয়া এবং দানিয়ুব নদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে বিস্তৃত হইতে থাকে। দশম শতাব্দীতে পূর্ব্বদেশীয় তুর্কিগণ উত্তর-পূর্ব্ব পারস্য আক্রমণ করে এবং তথাকার মুসলমান শক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। সেই সময় হইতে তাহারা দলে দলে উত্তর পারস্যের মধ্য দিয়া এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করিতে লাগিল। একাদশ শতাব্দীতে সেলজুক তুর্কিগণ সমস্ত এশিয়া মাইনর অধিকার করিল এবং ১৪৫৩ খৃঃ অব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলের পতনের পর তুর্কিজাতি প্রাচীন বাইজাণ্টিয়ান সাম্রাজ্য গ্রাস করিয়া ফেলিল।

তুরস্কের এই সব বিভিন্ন শাখা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ভাষার পবিত্রতা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছিল। তুর্কিদের বিভিন্ন শাখার ভাষার মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য ছিল, কিন্তু মূলগত বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। চীনা তুর্কিস্থান, উজবেগ, তাতার ও আনাটোলিয়াতে যে তুর্কি ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাদের পরস্পরের পার্থক্য ইউরোপ-প্রচলিত Romana-languageএর পার্থক্য হইতে অনেক কম ও অস্পষ্ট। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যাহাদের সাম্রাজ্য সুদূরপ্রসারী ছিল এবং যাহাদের ভাষা সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহাদের ভাষার মধ্যে মূলগত পরিবর্ত্তন খুব অল্পই হইয়াছিল। তবে তুর্কিগণ যতই পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়াছে ততই তাহাদের কথ্য ভাষা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, একটু আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তুর্কো-তাতার ভাষার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে, যথাঃ—

(১) এই ভাষার স্বরবর্ণ নরম ও কর্কশ এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার শব্দের মধ্যে একটা স্বরগত ঐক্য বিদ্যমান আছে। সেইজন্য যে সব শব্দে একাধিক শব্দাংশ (Syllable) আছে, তথায় স্বরবর্ণ মূল ধাতুর পার্শ্বে বসিয়া থাকে। যথাঃ—তুর্কি ভাষার infinitive-এর চিহ্ন হইতেছে 'Mak' অথবা 'Mek'। 'Gel' ধাতুর infinitive হইতেছে 'Gel-Mek' (to come=আসা)। অন্যত্র, Bak ধাতুর infinitive হইতেছে Bak-Mak (to see=দেখা)। এইভাবে ধাতুর পার্শ্বে শব্দ যোগ করিয়া স্বরবর্ণ ব্যবহৃত হয়।

(২) যে সমস্ত শব্দাংশ Causation, Reciprocity, the Passive প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে সেগুলিকে পদের মধ্যে বসাইলে ক্রিয়া পদের অর্থের তারতম্য হয়। যথাঃ (১) Bil-Mekএর অর্থ হইতেছে জ্ঞাত হওয়া কিন্তু Bil-Dir-Mek-এর অর্থ হইতেছে শিক্ষা দেওয়া। (২) 'Gar'-Mek'=দেখা কিন্তু 'Gar-ush-Mek'=আলাপ-আলোচনা করা অথবা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করা। (৩) 'Gar-ush-dur-mek'=মানুষকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনয়ন করা। এইভাবে একটি মাত্র শব্দাংশ যোগ করিয়া Negative শব্দ গঠিত হয়, যথাঃ—'Gar-me-mek'=Not to see (না দেখিতে পাওয়া)। "eme" শব্দাংশ যোগ করিয়া অসম্ভাব্যতার ভাব ব্যক্ত হয়, যথাঃ—Gar-em-mek=Not to be able to see। এইভাবে নূতন নূতন শব্দ গঠিত হয়। যদি অর্থ স্পষ্ট করিয়া রাখিতে পারা যায়, তবে একই ধাতুতে বহু শব্দাংশ যোগ করা চলিতে পারে।

ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে তুর্কি ভাষার স্বতন্ত্র বর্ণমালা ছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর তাহারা আরবী বর্ণমালা গ্রহণ করিল। শুধু তাহাই নহে, বহু আরবী শব্দ ও ভাব তুর্কি ভাষায় প্রবেশ করিল। অতঃপর তুর্কি কবিগণ যখন কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা পারস্যের কবিকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে বহু ফারসী শব্দ তুর্কিতে প্রবেশ করে। কালক্রমে তুর্কি ভাষায় বহু আরবী ও ফারসী শব্দ ও বাক্য প্রবেশ করিতে লাগিল। ইহাতে অনেক খাঁটি তুর্কি লেখক চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের ভয় হইল যে আরবী ও ফারসীর চাপে হয়ত তুর্কি ভাষার নিজস্ব

সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া পড়িবে। সেইজন্য কতিপয় তুর্কি পন্ডিত ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মহাবীর কামাল আতাতুর্কের প্রভাবে দেশে এক প্রচণ্ড রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব হইয়া গেল। তুর্কি ভাষার পক্ষে এই বিপ্লব বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। কামাল পাশা যে সব সংস্কার আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে তুর্কি ভাষার বর্ণমালার পরিবর্ত্তন। ইতঃপূর্ব্বে আরবী অক্ষরে তুর্কি ভাষা লিখিত হইত। ১৯২৮ সালে কামাল এক আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, অতঃপর আর আরবী অক্ষর ব্যবহৃত হইবে না। তৎপরিবর্ত্তে ল্যাটিন অক্ষরে তুর্কি ভাষা লিখিত হইবে। তাঁহার এই আদেশ যেমন অদ্ভুত তেমনি যুগান্তকারী। তিনি শুধু এইখানেই ক্ষান্ত হইলেন না। ইহার পর হইতে আরম্ভ হইল তুর্কি ভাষা হইতে বিদেশী শব্দ বিতাড়নের পালা। এই সমস্ত বৈদেশিক শব্দের মধ্যে আরবী, ফারসী ও ফরাসী ভাষার শব্দ বেশী ছিল। বাছিয়া বাছিয়া এইগুলির পরিবর্ত্তে তুর্কি প্রতিশব্দ আবিষ্কৃত হইল এবং সেইগুলি ব্যবহার করিবার জন্য আদেশ জারী করা হইল। বর্ণমালা নূতনভাবে চালাইতে গেলে তুর্কি শব্দগুলিকে ল্যাটিনে রূপান্তরিত করিবার অনুরূপ রীতি নীতি ও বিধিব্যবস্থা প্রচলন করা আবশ্যক। আর দরকার পার্লামেন্টের অনুমতির। কামাল সহজেই সেই অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু অন্য ভাষার অক্ষরে শব্দকে রূপান্তরিত করা দুরূহ কাজ। ইহার জন্য গভীর জ্ঞান, পরিশ্রম ও ভাষাতত্ত্বের আদি কথা ভাল করিয়া জানা দরকার। বিভিন্ন সংস্কারের মত অতি সহজে ও বিনা বিপ্লবে ভাষার সংস্কার চলিতে লাগিল। যাহাকে বলে ভাষা বিপর্য্যয়—এখানে তাহাই হইল, অথচ দেশে উহার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না। প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি তুর্কি ভাষার আদ্যোপান্ত ইতিহাস পাঠ করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল (Turk-Dili-Fettic Cemiyeti)। এই সমিতির কাজ হইল, বর্ত্তমান প্রচলিত তুর্কি ভাষার সমস্ত অভিধান যত্নের সহিত পাঠ করিয়া বৈদেশিক শব্দ বাহির করা এবং তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা। তুর্কি সাহিত্যে কবিতায় ও গদ্যে, কথিত ভাষায় ও প্রাচীন শিলালিপিতে যে সব অপ্রচলিত শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার তালিকা প্রস্তুত করাও এই সমিতির কাজ। এইভাবে প্রায় দুইশত পুস্তক ও অভিধান পরীক্ষা করা হয়। তারপর প্রত্যহ যে সব বৈদেশিক শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহাদের প্রত্যেকটির পার্শ্বে একটি করিয়া তুর্কি প্রতিশব্দ লিখিয়া সমুদয় বিবরণ সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইল। এইসব অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ যে সব তথ্য পাওয়া গেল সেগুলিকে Tarama dergisi অর্থাৎ "Arrangement of Combings" এই নামে প্রকাশিত করা হইল। খাঁটি তুর্কি শব্দ চয়নের ইহাই প্রথম স্তর। যেখানে একই বৈদেশিক শব্দের বিভিন্ন তুর্কি প্রতিশব্দ পাওয়া যায়, সেখানে ঠিক শব্দটি বাছিয়া লইবার জন্য নূতন উপায় অবলম্বিত হইল। সেইরূপ শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ লিখিয়া সেগুলিকে তুরস্কের ও বিদেশের সুধীবর্গের নিকট তাঁহাদের মতামতের জন্য প্রেরিত হইল। কোন কোন বৈদেশিক শব্দের তুর্কি প্রতিশব্দের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, কোথাও কোথাও ত্রিশটিতে দাঁড়াইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ দু-একটা শব্দের কথা উল্লেখ করিব: আরবী 'আল্লাহ' শব্দের তুর্কি প্রতিশব্দের সংখ্যা প্রায় সতেরটি। ইহার মধ্যে প্রাচীন মধ্য এশিয়ার তিনটি সুন্দর ও কবিত্বপূর্ণ শব্দের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। যথা—Lidi (Lord প্রভু) Munku (immortal অমর) এবং Tanri (Sky আকাশ)। কিন্তু মজার কথা এই যে, তুর্কি ভাষায় কোরআন শরীফের যে অনুবাদ হইয়াছে তাহাতে সম্ভবত আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু সেই অনুবাদের সর্ব্বত্র আরবী 'আল্লাহ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই ভাষা বিপর্য্যয়ের পর হইতে সংবাদপত্রগুলি নূতন শব্দ প্রয়োগের ব্রত বিশ্বস্তভাবে পালন করিতে লাগিল। সাংবাদিকগণ এমনভাবে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন যে, তাহাতে এইসব নূতন শব্দ প্রাধান্যলাভ করিল। এইসব নূতন শব্দ সাধারণ পাঠকের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। সেইজন্য তাহাদের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক রচনা ও লিখিত বক্তৃতার শেষের দিকে শব্দার্থ সংযোগ করিয়া দিতে হইল। সাধারণের পরিচিত প্রতিশব্দ দিয়া কঠিন শব্দগুলির ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। তাহারা পুনঃপুনঃ এইসব শব্দের সহিত পরিচিত হইতে লাগিল, ইহার ফলে সাধারণ লোক অনেক নূতন শব্দ শিখিয়া ফেলিল। সরকারী কর্ম্মচারিগণ, বৈজ্ঞানিকগণ, ঔপন্যাসিকগণ ও সাহিত্যিকগণ এগুলি ব্যবহার করিয়া লোকসমাজে চালাইতে লাগিলেন। লেখক ও বক্তাগণ যে কোন নূতন পরিস্থিতির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারেন, কিন্তু জনসাধারণ তাহা পারে না, তাহাদেরকে নূতন কিছু গ্রহণ করাইতে হইলে সামান্য প্রচেষ্টায় হইবে না। তুরস্কের এইসব লোকের পক্ষে পুরাতন আরবী শব্দ পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ ব্যবহার করা অত্যন্ত কষ্টকর হইল। পূর্ব্বে যে সমিতির কথা উল্লেখ করিয়াছি (Turk-Dili-Fettik Cemiyeti) সেই সমিতির তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সময়ে তিনটি কংগ্রেস সভার অধিবেশন হয়। প্রথম কংগ্রেস ভাষা পরিবর্ত্তনের পন্থা নির্দ্ধারণ করে। দ্বিতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন সময়ের পরিশ্রমের ফলগুলি প্রকাশ করে। পরবর্ত্তী কাজ হইল এইসব নূতন শব্দ সম্বলিত একটি অভিধান প্রকাশ করা। অতঃপর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কিন্তু এই কংগ্রেস ভাষা পরিবর্ত্তন ও পবিত্রীকরণ ব্যতীত আর একটা গভীর বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে থাকে। এই কংগ্রেসের সভ্যগণ ঘোষণা করিলেন যে, তুর্কি ভাষা সৌর ভাষার (Sun Language) অন্তর্গত। সৌর ভাষার আদর্শ অনুসারে তুর্কিগণ দাবী করিল যে, তাহাদের ভাষা ইন্দো জার্ম্মান ও সেমিটিক ভাষা হইতেও প্রাচীন। সুতরাং এইসব ভাষায় এমন কোন শব্দ থাকিতে পারে না যাহা মূলত তুর্কিভাষা হইতে গৃহীত হয় নাই। ইন্দো জার্ম্মান ও সেমিটিক ভাষার শব্দ তুর্কি ভাষার নিকট বিদেশী শব্দ নহে। এই নূতন মতবাদের ফলে তুর্কিভাষা হইতে আরবী, ফারসী ও ফরাসী শব্দ বা অন্যান্য

ধার করা শব্দ পরিহার করিবার গুরুত্ব একেবারেই কমিয়া গেল। সাহিত্যে ও গ্রাম্য কথায় বিদেশী শব্দের সংখ্যা শতকরা ষাটেরও অধিক। এমন কি অনেক কৃষকও বিদেশী শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রথম ও তৃতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ও সৌরভাষার দাবী করিবার পূর্ব্বে সরকারী ও সাহিত্যিক ভাষায় বহু নূতন তুর্কি শব্দ ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু নূতন ও অভিনব শব্দ তুর্কির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিল। এই সময় বহু আরবী ও ফারসীর পরিবর্ত্তে নূতন শব্দ ও প্রকাশভংগী আসিয়া তুর্কি ভাষায় প্রবেশ করিল। কিন্তু এখন আর সেরূপ হয় না। কতকগুলি বৈদেশিক শব্দকে তুর্কি রূপ দেওয়া হইয়াছে যেমন—Okul (School)। এই নূতন শব্দ ফরাসী ecole ও তুর্কি ধাতু Oku (to read) এই উভয়ের সংমিশ্রণ হইতে গঠিত হইয়াছে। বিশেষণ গঠন করিবার জন্য শব্দের শেষে el ও al ঢুকাইয়া দেওয়া হইল। যথা—তুর্কির মূলশব্দ ulus হইতে ulusal; তুর্কি genish (widespread) হইতে genil (general) গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় বিভাগের "মন্ত্রী" শব্দের প্রাচীন Vezir শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়া তৎস্থলে Bakan (over seeing) শব্দ প্রবর্ত্তিত হইল। শিক্ষামন্ত্রীর পূর্ব্বতন নাম ছিল Vezir ul-Ma-arif; কিন্তু এক্ষণে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া kultur-baken শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা ব্যতীত নূতন ধরণের মিশ্র শব্দ প্রবর্ত্তিত হইল, সেইজন্য শব্দের অগ্রে একটা prefix লাগাইয়া দেওয়া হইল। যথা—Arsi—ulusal (international) এই prefix তুর্কি Ara (between) শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বে তুর্কি-ভাষায় এই জাতীয় prefix ছিল না। সুতরাং ইহা এক্ষণে তুর্কি ভাষার ক্রমবিকাশের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবে। বর্ত্তমান তুর্কিভাষার দু-একটা প্রামাণিক অভিধান ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দিন দিন যেভাবে শব্দ পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাতে অভিধান লেখকের পক্ষে আধুনিকতম শব্দ সংগ্রহ করা কষ্টকর হইবে। অদ্যাবধি লাটিন অক্ষরে তুর্কিভাষার কোন ব্যাকরণ রচিত হয় নাই।

প্রথমে অনেকে ভয় করিয়াছিলেন যে, এই নূতন বর্ণমালা দেশে আদৃত হইবে না। কিন্তু ক্রমেই ইহার আদর বাড়িতেছে। যাহারা নূতনভাবে পাঠাভ্যাস করিতেছে তাহাদের পক্ষে ইহা আরবী ও ফারসী হইতেও অধিকন্তর সহজ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। দেশের শিক্ষিত লোকগণ বিশেষত ছাত্রগণ আজকাল এই নূতন ষ্টাইলে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ওসমানলী কবিতা অর্থাৎ খলিফার আমলের কবিতাগুলি এখন নূতন বর্ণমালায় লিখিত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগের বহু লেখক প্রাচীন বর্ণমালার সহিত পরিচিত। কিন্তু অল্পদিন পরে দেশের লোক প্রাচীন পদ্ধতি ভুলিয়া যাইবে। তুরস্কের ইতিহাস ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ছাত্রগণ এই প্রাচীন ভাষা শিখিবে ও আলোচনা করিবে Academic উদ্দেশ্য লইয়া। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তুর্কি ভাষার স্বরবর্ণের ধ্বনি প্রকাশের জন্য আরবী বর্ণমালা অনুপযুক্ত। কারণ আরবীতে স্বরবর্ণ মাত্র তিনটি। কিন্তু তুর্কিভাষার নূতন বর্ণমালার জন্য আটটি স্বরবর্ণের ব্যবস্থা হইয়াছে। লাটিন পোষাকে যে সব আরবী শব্দ কিছুদিন আগে ব্যবহৃত হইত এক্ষণে তাহাদের আরবী অস্তিত্বের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং কালক্রমে তাহাদের বৈদেশিকতার জ্ঞান একেবারেই দূর হইয়া যাইবে এবং সেই সংগে তাহাদের অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যও নষ্ট হইয়া যাইবে। সাধারণ লোক ২৯টি লাটিন বর্ণমালার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ করিয়া অধিকতর উপকৃত হইবে, তাহারা সহজেই শিখিতে পারিবে; বিশ্বের অপরাপর ভাষার সহিত তাহাদের সংযোগ আরও নিকটতর হইবে। বিদেশী পরিব্রাজকদের একটা বিশেষ সুবিধা হইবে যে, তাহারা তুরস্কে আসিলে অপরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া ষ্টেশনের নাম পড়িতে পারিবে। অল্পদিনের মধ্যে দেশের লোকের সহিত পরিচিত হইতে পারিবে। ভবিষ্যতের কথা মানুষের জানিবার উপায় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানের অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যতটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, এই প্রকার ভাষা বিপর্য্যয়ে তুরস্কের ক্ষতি হইবে না বরং ইহাতে নানাদিক দিয়া তুরস্ক লাভবান হইবে।

সঙ্গীতের রূপ ও রস

(৬১৭ পৃষ্ঠার পর)

প্রকট হয়। সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, রূপের মধ্যে মানুষ খুঁজছে প্রেয়, আর রসের মধ্যে শ্রেয়। শ্রেয় ও প্রেয় এই দুইয়ে মিলিয়ে তবে মানুষের পূর্ণ অখণ্ড তৃপ্তি এবং এই অখণ্ড তৃপ্তি বিশ্বজনীন প্রেমের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, কেবলমাত্র অল্প কয়েকজন মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

"Music is an energy and an art" একথাটি ধ্রুব সত্য। কেননা সংগীত হেন যে চারুশিল্পের রসাস্বাদ করতে হলে শিল্পীকে শুধু সাধক হলে চলবে না, হতে হবে কবি। রস যিনি অনুভব করেন তিনি দ্রষ্টা অর্থাৎ সাধক বা ঋষি এবং সেই রসকে যিনি রূপ দেন তিনি স্রষ্টা অর্থাৎ শিল্পী বা কবি। এই সৃষ্টির মধ্যে রূপ ও রস এক সংগে মিলেছে এবং সংগীতে রূপ ও রস একত্র সমাবেশের জন্যে বিশ্বসৃষ্টির এই শ্রেষ্ঠ অবদান বিশেষ কলা ও বিজ্ঞান বলে গণ্য।

পরিশেষে এই কথায় আমি বক্তব্য সমাপ্তি করব যে, সংগীতে আধুনিকের চাই সূক্ষ্মতা ও বিচিত্র গতি এবং তাহার প্রতিষ্ঠায় চাই প্রাচীনের বিপুলতা ও গভীর শান্তি। হৃদয়ের নিম্ন গ্রামগুলোকে সংহত করে উচ্চ গ্রামগুলোকে যাতে জাগিয়ে দেয় এমন শান্ত ও সুসংযত সংগীতেই মানুষের পূর্ণ অখণ্ড তৃপ্তি ও দিব্যভাবের উন্মেষ। কবি Wordsworth বলেছেন—

"The Gods approve
The depth and not the tumult of the Soul."

শিল্পে মাতৃমূর্ত্তি

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল মৈত্র

এই জগতে প্রাণীর প্রথম ও প্রধানতম আশ্রয় তাহার মাতা। মাতৃগর্ভ হইতে যেদিন প্রথম আলোবায়ুর সম্পর্কে মানব শিশু আসে, সেই দুঃসহ অসহায় অবস্থায় তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল মাতৃবক্ষ। তারপর যতদিন না এই জড় জগতের নিষ্ক্রিয় অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা লাভ করে ততদিন মাতাই তাহার একমাত্র সহায়। সুতরাং মানব সভ্যতার অতি প্রাচীন অবস্থা হইতে মানুষের সমাজে মাতার স্থান সর্ব্বোচ্চে। যুগে যুগে কবি ও শিল্পীর নিকট মাতা ও সন্তানের মৌলিক সম্পর্কটি নানারূপে প্রতিভাত হইয়া শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা দান করিয়াছে। সেই প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন শিল্পীর বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে মাতার অন্তর-রূপটি চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া এক মহা-রূপাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে।

শিল্পীর মাতৃকল্পনাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমত এক অসীম ভাবলোক উপলব্ধি করিয়া রূপকের সাহায্যে সেই ভাবকে ব্যঞ্জনা দেওয়া এবং তাহাতে মাতৃত্ব আরোপ করা। দ্বিতীয়ত করুণা ও স্নেহের কোমলকান্ত প্রতীক হিসাবে সাধারণ মাতৃমূর্ত্তির মধ্য দিয়া তাহাকে অভিব্যক্ত করা। প্রথম ক্ষেত্রে শিল্পীর সাধনার মূল উৎস আধ্যাত্মিক, এবং দেশীয় ধর্ম্ম ঐতিহ্য সম্পর্কযুক্ত। ইহার দৃষ্টান্ত ভারতের শিল্পরাজ্যে যথেষ্ট মিলিবে। সংহার প্রলয়কারিণী করালী কালী, যাহার রুদ্রতালে সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি বিপর্যাস্ত হইতেছে, সেই রুদ্রাণী মহাশক্তিই বিশ্বমাতা। এই কল্পনার সহিত মাতার চিরন্তন মধুর রূপের কোন সম্পর্ক নাই। শিল্পী এখানে রুদ্র রূপের মধ্যে মহামঙ্গলের আভাষ পাইয়াছেন। মাতা যখন সন্তানকে আঘাত করেন তখনও সে মাতাকেই আঁকড়িয়া থাকে। আদ্যাশক্তির নিকট জীব এমন অসহায় যে তখনও আদ্যাশক্তিকে শরণ নেওয়া ব্যতীত আরকোন উপায় থাকে না। তাই মহাকালী রুদ্ররূপা হইলেও তিনিই মঙ্গলময়ী মাতা। কালী, দুর্গা ইত্যাদির অমূর্ত্ত ভাবাদর্শ শিল্পীকে তাই রূপকের সাহায্য লইতে উৎসাহিত করিয়াছে এবং এই সকল রূপের উপর মাতৃত্ব আরোপ করিয়া এক মধুর আদর্শের নির্দ্দেশ দিয়াছে।

মাতা ও মাতৃস্নেহের স্বাভাবিক রূপটি কিন্তু শিল্পীদের বেশী উৎসাহিত করিয়াছে। বেশীর ভাগ সময়েই ইহার প্রেরণা আসিয়াছে ধর্ম্ম ও পুরাণ হইতে। ভারতে গণেশ জননী ও গোপাল যশোদার পৌরাণিক বিবরণ ভারতীয় শিল্পীকে মাতৃ-রূপের এক নূতন ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিয়াছে। ইউরোপীয় শিল্পে মাতৃমূর্ত্তির প্রেরণা আসিয়াছে যীশু ও মেরীর পৌরাণিক কাহিনী হইতে। মাতার সন্তানাশ্রয়ী কোমল রূপটি, তাহার

গোপাল-যশোদা — শিল্পী—অসিতকুমার হালদার

তদ্‌গত আধ্যাত্মিক রূপটি ইউরোপীয় শিল্পে যেমন দেখা গিয়াছে এবং প্রাচুর্য্যের দিক হইতেও তাহা এত বিশাল যে বিশ্ব-শিল্পরাজ্যে তাহা তুলনাহীন। আধুনিক কালে বাঙলা দেশের কোন কোন শিল্পীর তুলিতে ভারতীয় ঐতিহ্যগত মাতৃরূপ সার্থকভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। আবার ঐতিহ্যগত মাতৃকল্পনা ব্যতীতও নিছক মাতা ও সন্তানের চিরন্তন মাধুর্য্যের সম্পর্কটুকু শিল্পীর দৃষ্টিপথ হইতে দূরে থাকে নাই। রূপকের মধ্য দিয়া ও যথার্থতার মধ্য দিয়া শিল্পে মাতৃ মহিমা ঘোষিত হইয়াছে।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে শিল্পে মাতৃমূর্ত্তির

প্রেরণা মূলত আধ্যাত্মিক। ভারতীয় রূপক শিল্প ছাড়িয়া দিলেও ইউরোপে যীশু ও মেরীর পৌরাণিক চিত্রাবলীর প্রেরণা আসিয়াছে খৃষ্টধর্ম্মের ভক্তিবাদ হইতে। ইউরোপীয় শিল্পাচার্য্যগণের প্রথম বনস্পতি গিয়োত্তোর গুরু, সিমাবুর "Madonna and Child Enthroned" নামক চিত্রে যীশু ও মেরীকে দেখাইবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু বতিচেলির "The Magnificat", রাফায়েলের "The Madonna of San Sisto" নামক চিত্রে আধ্যাত্মিক ভাবকে অতিক্রম করিয়া যে প্রগাঢ় মাতৃ স্নেহের রূপটি ব্যক্ত হইয়াছে, অন্যত্র তাহা একান্ত দুর্লভ। মাতার বাহু বেষ্টন দ্বারা সন্তান ধারণের মধ্যে, সন্তানের মস্তকটি ঈষৎ হেলিয়া গাত্রে নির্ভর করিয়া থাকার মধ্যে রূপকের মাধুর্য্য অদ্ভুতভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। রূপককে অগ্রাহ্য করিলেও নিছক রূপ ও বক্তব্যের দিক হইতে দেখিলে শিল্পী সার্থকভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। আর একটি চিত্র এই স্থলে উল্লেখযোগ্য। লোভরগ্যালেরীর চিত্রশালায় রক্ষিত স্তন্যদায়িনী মাতৃমূর্ত্তি (যাহা লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কর্ত্তৃক অঙ্কিত বলিয়া প্রচলিত) মানবীয় সুষমায় উজ্জ্বলিত। ইউরোপীয় শিল্পে মাতৃমূর্ত্তির বাহুল্যের মধ্যে কয়েকটি চিত্র ভাব প্রকাশের দিক হইতে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অন্যান্য মাতৃমূর্ত্তির মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা ব্যক্ত করিবার প্রয়াসই যেন বেশী। অথচ শিল্পসৃষ্টির দিক হইতে সেগুলি কোন মতেই তুচ্ছ নহে।

ইউরোপে মাতৃমূর্ত্তিকে আধ্যাত্মিক আবেষ্টন হইতে মুক্ত করিয়া বাৎসল্য রসের দিক হইতেও আঁকিবার প্রয়াস দেখা গিয়াছে। তবে প্রচেষ্টা অনেক দেরীতে হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পী রেনল্ডের অঙ্কিত "Mrs. Hoare and her infant son" নামক চিত্রে ও শিল্পে ত্রিকোণবাদের আবিষ্কারক পিকাসো অঙ্কিত "Mother and Child" নামক চিত্রে এবং অন্যান্য কয়েকটি শিল্পীর হাতে বাৎসল্য রসের মাধুর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে বাৎসল্য রসের এই দিকটা যে একেবারে বাদ পড়িয়াছে একথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে 'মাতা ও শিশুর' ভাস্কর্য্যমূর্ত্তি মানবীয় বাৎসল্য রসের একটি উজ্জ্বলতম নিদর্শন। মাতার ভঙ্গিমা ও দৃষ্টির মধ্যে ও সন্তানের উন্মুখ আবেগের মধ্যে বাৎসল্যের নিগূঢ় রূপটি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। খাজুরাহের একটি মন্দিরে সন্তান ক্রোড়ে মাতার মূর্ত্তির মধ্যে ঐ চিরন্তন সত্যই উদ্ভাসিত হইয়াছে। অজন্তার গুহা চিত্রশালায় "সন্তান ক্রোড়ে রমণী" ও "মাতা ও সন্তানের বুদ্ধকে ভিক্ষাদানের" চিত্রে বাৎসল্যের মধুর রূপটি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভারতীয় বাৎসল্য রসের চিত্রে কি ভাস্কর্য্যে আধ্যাত্মিক বিশেষ উদ্দেশ্যটি বহন করে না; বাৎসল্য রসকেই আধ্যাত্মিকতার পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়া এক দিব্য ভাবের স্বর্গলোক সৃজন করিয়াছে।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে শিল্পকলার যে জয়যাত্রা সুরু হইয়াছে, তাহার তরুণ বাহকেরা মাতৃ-মহিমার আদর্শকে বর্জ্জন সরোবর রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদার সম্পর্কই বিভিন্ন কবির কাব্যে অদ্ভুত কুশলতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। আবার শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া আর একবার বাৎসল্যের মহিমা বৈষ্ণবকাব্যে ব্যক্ত হইয়াছে। আধুনিক শিল্পকলাও এ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই। শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসুর প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত 'চৈতন্যের জন্ম' এবং আনন্দবাজার দোল-সংখ্যায় প্রকাশিত ঐ নামেই আর একটি চিত্রে মাতৃমহিমা বিঘোষিত হইয়াছে। বস্তুত, এই চিত্র দুইটি এত উচ্চদরের যে, বিশ্ব-শিল্পরাজ্যে এর সমকক্ষ পাওয়া একান্তই কঠিন। চিত্র দুইটি বিভিন্ন রীতিতে অঙ্কিত। প্রথমটিতে বঙ্গীয় পটুয়া পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টি ভারতীয়
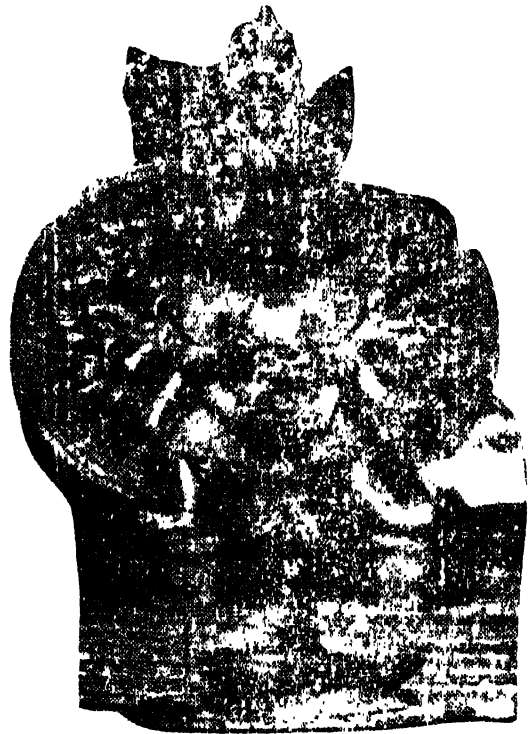
[illegible]

প্রথায় অঙ্কিত। প্রথমটির প্রাদেশিক রীতিটুকু বাদ দিলেও শিশু-চৈতন্য ক্রোড়ে শচীদেবীর মূর্ত্তিতে যে প্রশান্তি ও কোমলতা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার প্রগাঢ়তা স্পর্শাতুর মনকে সমূলে আকৃষ্ট করিয়া আনে। দ্বিতীয় চিত্রটির ব্যঞ্জনা আরও গভীর ও সর্ব্বব্যাপী।

ইউরোপীয় শিল্পে ও ভারত-শিল্পে মাতৃত্ব যেভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মাতৃত্বের অংশটুকু বাদ দিলেও পারিপার্শ্বিক অলঙ্করণ ও পরিবেশের একটি বিশেষ শিল্পগত অর্থ আছে। অর্থাৎ শিল্পীর অলঙ্কারপ্রিয়তা ও আসল বক্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু দুই একটি শিল্পধারায় সকল রকম পরিবেশের প্রভাবকে বর্জ্জন করিয়া বিশুদ্ধ মাতৃমহিমাকে প্রকাশ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা গিয়াছে। ইউরোপে কিছুদিন হইতে নিগ্রো শিল্প লইয়া এক মহা কলরব

উঠিয়াছে। এরকম ভাবপ্রকাশক শিল্প বিশ্ব-শিল্পে আর ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই, কোন কোন শিল্প সমালোচক এইরূপ বলিতেছেন। এই নিগ্রো শিল্পে কাষ্ঠনির্ম্মিত এক মাতৃ মূর্ত্তিতে বাৎসল্যের ধারণাকে অতি সুনিপুণভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। নিগ্রো শিল্পের যা প্রধানতম গুণ তাহা হইতেছে সারল্য ও অকপট শিল্প-প্রেরণা। প্রথম দর্শনে মূর্ত্তির অপ্রাকৃত গঠন বৈশিষ্ট্যে মনে এক বিজাতীয় রসের সৃষ্টি করে। দেহের অনুপাতে মস্তকের অতিমাত্রিক বৃহত্ত্ব, উন্মুক্ত স্তন-দ্বয় বীভৎসতার আবহাওয়া আনয়ন করে। কিন্তু যদি আমরা নিগ্রো শিল্পের মূল রীতি ও পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইয়া এই মূর্ত্তিটি অবলোকন করি তাহা হইলে এর সারল্য ও অকপটতায় বিস্মিত না হইয়া পারি না। বাৎসল্য রসের সুষমা কি সহজ আধারের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে! কোন অবান্তর প্রসঙ্গ দিয়া মূল বক্তব্যটিকে আবরণ দিয়া শোভন করিবার প্রচেষ্টা নাই। আপন সহজ দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। বস্তুত, তথাকথিত সভ্য জগতের বাহিরে যে বিরাট মূক মানব সমাজ রহিয়াছে, সেখানেও মাতৃস্নেহের ন্যায় আদিম বৃত্তি কি অনাবিল নির্ম্মলতার সহিত শিল্প-প্রেরণার উৎস মুখে গঙ্গাধারার ন্যায় নির্গত হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়।

শিল্পগত এই রকম সারল্য বঙ্গীয় পটুয়া শিল্পের মধ্যে অতি স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বর্ত্তমানে পটুয়া রীতির শ্রেষ্ঠ সাধক শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রসমূহে এই সরলতা অতি আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত প্রকাশ পাইয়াছে। সামান্য কয়েকটি রেখার টানে, কয়েকটি প্রধান রঙের সমাবেশে যে গভীর ভাব প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে, তাহা আর কোন প্রকার শিল্পপদ্ধতিতেই সম্ভব হয় নাই। এই পটুয়া রীতিতে অঙ্কিত যামিনী রায়ের "মা ও ছেলে" নামক চিত্রটি দ্রষ্টব্য। সামান্য কয়টি রেখার মধ্য দিয়া এক অবিনাশী ব্যঞ্জনা প্রকাশ হইয়াছে। অঞ্চল দিয়া সন্তানের দেহ আবেষ্টনের মধ্যে র পকের আশা-

মা ও মেয়ে — শিল্পী—লে ব্রুঁ

সম্পাত হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতেও পারে, আবার অলঙ্করণ-হীনতা ও বিবরণের সংক্ষিপ্ততা দ্বারা একাধারে সরলতার অভি-ব্যক্তি ও কেন্দ্রীয় মাধুর্য্যের দিকে দর্শকের চিত্ত আকর্ষণের একটা প্রচেষ্টাও হইতে পারে। তৎসত্ত্বেও চিত্রটি একটি সার্থক সৃষ্টি।

সাধারণত দেখা গিয়াছে শিল্পীর বাৎসল্য রসের ধারণা একমাত্র মানবী মূর্ত্তির পরিকল্পনার মধ্যেই নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু এ ধর্ম্ম কেবল মানব জাতিরই একচেটিয়া নহে। এ ধর্ম্মের সর্ব্বব্যাপিতা অতি নিম্নস্তরের প্রাণী হইতে ক্রমবিকাশের শ্রেষ্ঠ কুসুম মানব জাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আধুনিক বাঙালী শিল্পীর নিকট এ সত্য অজ্ঞাত থাকে নাই। একালের শিল্পে অন্যতম যুগপ্রতিভা নন্দলাল বসুর একটি চিত্রফলকে অত্যাশ্চর্য্যভাবে বাৎসল্য রস শতদলের মত মুকুলিত হইয়াছে। যে চিত্রটির কথা বলিতেছি, তাহা টেম্পারা পদ্ধতিতে অঙ্কিত। সাতটি বিভিন্ন মাতৃমূর্ত্তিতে চিত্রের সম্পূর্ণ রসটি ব্যক্ত হইয়াছে। মধ্যে মানবী মাতা এবং ডাইনে ও বামে তিনটি করিয়া পশু-মাতার চিত্র। মাতৃত্বের ঐশ্বর্য্যে সকলের পদাধিকারই যে সমান এই রহস্যটুকু শিল্পী অতি নিপুণ রসিকতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেকটি মাতাই সন্তানকে স্তন্য দিতেছে এবং বদনসমূহে অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে দিব্যদ্যুতি ধারণ করিয়াছে। এই রকম একটি স্তন্যদানরতা পশুমাতার চিত্র অবশ্য মুঘল চিত্রকলায় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু নন্দলালের এই সাতটি বিভিন্ন মাতৃরূপের একটি মাত্রই উদ্দেশ্য—তাহা চিরন্তন প্রকৃতিকে ব্যক্ত করা। ডেকোরেটিভ অংশ এই চিত্র ফলকে রহিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রয়োগ মূল উদ্দেশ্যকে কিছু-মাত্র ব্যাহত করে নাই। অনাবশ্যক space টুকু ভরাট করিবার ইহা একটি শিল্প-কৌশল মাত্র। সত্য প্রকাশের মধ্যে যে জাতি-ভেদ নাই, মানবী মাতার সহিত পশুমাতার তুলনা করিয়া এই মহাসত্যই শিল্পী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। মাতৃত্বের নগ্ন অন্তর-রূপটি শিল্পী আমাদের প্রত্যক্ষ করাইয়া মহাভাবের স্বর্গলোকে উন্নীত করিলেন।

ছিন্ন-দিশা

(গান)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ছায়ার আড়ালে তোমারি যে আলো জ্বলে ঃ
চাঁদের কুহেলি আসে গগন তলে।
মুকুলের মাঝে
নীলিমার সাঁঝে
মুকুতা [illegible] দলে...
ছায়ার আড়ালে আলো যে অতলে জ্বলে!

"আয় আয়" ব'লে যে-বাঁশি তোমার বাজে ঃ
মনে শুনি যারে—প্রাণে হায় শুনি না যে।
অনুরাগ-উচ্ছাসে
বেণুর সুরেও
মূরছনা শতদলে...
যেথা হৃদয়ের আলো তব সাথে জ্বলে।

আঁধারে মিলাও যে রূপ রাঙাও বীণ ঃ
মরণে শুনাও জীবন-রাগিণী।
তুফান-পাথারে
তারা-অভিসারে
তরী মোর যেন চলে...
ছায়াপারে যেথা আলো সুরে কথা বলে।

প্রবাল-পুরীর দেশ

শ্রীকরুণাময় বসু

বকুলের গন্ধে অন্ধ আকাশ জাগো হে বালক জাগো,
যে নিদ-ভ্রমর এসেছে তোমার দ্বারে ;—
এখনো তোমার স্বপন-পাখায় বিদায় কেন যে মাগো ?
ভুল ক'রে বুঝি ফুল দুলিয়াছ তারে।

পথ ভুলে যাওয়া পথিক চলেছে পথে
উদয়াচলের স্বর্ণ শিখর রথে,
ঝিকিমিকি সবুজ শিরীষ পাতায় প্রভাতের বাণী দোলে ;
যে চাঁদ মরেছে, ছায়াখানি তার দোলে সাগরের কোলে।

হৃদয়-কোণে পড়িয়াছে কোন করুণ রাতের স্মৃতি,
দুটি দুরন্ত [illegible] রয়েছে বুকে ;
কতো যে বেদনা, মুছে যাওয়া কোন হারানো প্রাণের প্রীতি
আঁখি কোণে তার ভাসিছে সকৌতুকে।

কতো যে গিয়েছে চৈত্র রাতের তিথি,
কতো শ্রাবণের শ্যামলিমা ছায়া বীথি,
মরু বালুচরে করুণ আখরে যে লেখা লিখিল ভুলে ;
ফিরে ফিরে তাই মুছি' দেয় পুনঃ সন্ধ্যার এলো চুলে।

পথিক চলেছে, সে কোথায় আছে প্রবাল পুরীর দেশ,—
নীল পাহাড়ের ওপারে ঘুমায় বুঝি ;
জোছনায় কাঁপে নারিকেল বন স্বপ্ন-নদীর শেষ,—
মায়া-হরিণীরে বৃথাই মরিছে খুঁজি।

কতো সুখ এল, কতো সুখ গেল ভুলে,
তবুও দাঁড়িয়ে জীবনের কূলে কূলে ;
শুক্তায় হায় শুকতারা ফোটে, তবু মুকুতার খোঁজে
পরাণ সঁপিল সারা নিশি দিন সাগরের তীরে ও যে।

বাংলার নৌক্রীড়া

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ

পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ নদীগুলি বর্ত্তমানে মরণোন্মুখ হইলেও বর্ষাকালে পরিপ্লাবিত হইয়া স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করে। দুর্গোৎসবের বিজয়া উৎসব সাধারণত নদীগুলির তীরে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতি বৎসর হইয়া থাকে। এইসব স্থানে একদিনের জন্য মেলা বসে এবং শত শত নর-নারী (হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে) মেলায় উপস্থিত হয়। বিজয়া উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান যুবকগণ কর্ত্তৃক বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং মেলায় উপস্থিত লোকেরা জয়ধ্বনিতে যুবকগণকে উৎসাহ দান করে। পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মহাধুমধামে বাইচ প্রতিযোগিতা হয়। বাইচের সময় যুবকগণ সুমধুর ছড়া গান গায়। এগুলি পল্লী অঞ্চলে 'সারি' গান নামে অভিহিত। প্রতিযোগিতা যখন তুমুল আকার ধারণ করে, তখন দর্শকগণ ও যুবকগণ উচ্চ জয়ধ্বনি আরম্ভ করে। 'পান্‌সী' নৌকাগুলিতে বহু কলা গাছ উঠান হয়। এইসব বাইচে অনেক সময় নৌকা নদীর অতল জলে ডুবিয়া যায়, কলাগাছের ভেলার সাহায্যে জীবন রক্ষার জন্য নৌকাতে কলাগাছ লওয়া হইয়া থাকে। জন্মাষ্টমী বা বিজয়াতে বাইচ প্রতিযোগিতায় সগৌরবে জয়লাভ করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমান যুবকগণ শ্রাবণ মাসের শেষ দিক হইতেই বাইচ চর্চ্চা আরম্ভ করে। এতদঞ্চলে ইহা বাইচের 'আখর' নামে পরিচিত।

মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গাতীরে ভাদ্র মাসে বাইচ উপলক্ষে 'বেড়া' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে গঙ্গা বক্ষে শত শত নৌকার সমাবেশ হয়। নৌকাগুলির মধ্যে বহু কলা গাছ উঠান হয় এবং নৌকাগুলি দীপমালায় সুসজ্জিত থাকে। সন্ধ্যার সময় নৌকাসমূহ গঙ্গার স্রোতে বাইচ আরম্ভ করে। চারিদিকে ঢাক, ঢোল, সানাই বাজিয়া উঠে। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান নর-নারী সেদিন গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া এই উৎসবে যোগদান করে। এই উপলক্ষে গঙ্গাতীরে মেলার আয়োজন হয়। গভীর রাত্রে খুব জাঁক-জমকে এই উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

খৃষ্টপূর্ব্ব যুগ হইতেই নদীমাতৃক বাঙলার নৌকাই প্রধানতম যানবাহন। বাঙলার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, যখন ভারতের অপরাপর দেশে নৌকার ব্যবহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, তখন বাঙালীরা বেতে বাঁধা নৌকায় দেশ-দেশান্তরে ধান্য চাউল লইয়া ব্যবসা করিতে যাইত। বাঙালীরা সেই নৌকার নাম দিয়াছিল "বালাম।" পৌষ সংক্রান্তি দিবসে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সহস্র সহস্র "ময়ূরপঙ্খী"* নৌকা বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হইয়া শ্যাম, কাম্বোডীয়া, মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি দূরদেশে বাণিজ্য করিতে যাত্রা করিত। বিদায়কালীন মঙ্গলগীতি ও শঙ্খধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া যাইত। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাঙলার বীর বিজয় সিংহ নৌ-জাহাজের সাহায্যে লঙ্কাদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে বরেন্দ্র-বীর দিব্যের ইতিহাস হইতেও আমরা বাঙালীর অসাধারণ নৌ-শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। সামন্তরাজ দিব্য পাল সম্রাট তৃতীয় বিগ্রহ পালের "নাবাধ্যক্ষ" অর্থাৎ নৌ-সেনাপতি ছিলেন। পাল রাজগণের "শিলা নৌকা"সমূহ যেমন যুদ্ধার্থ সমুদ্র বক্ষে শোভা পাইত তেমনই দিব্যের 'ভীমা', 'পত্রপুতা', 'গত্বরা' প্রভৃতি রণপোতসমূহ গঙ্গা করতোয়া বক্ষ সর্ব্বদা পরিশোভিত রাখিত। তাঁহারা রাজ্য মধ্যে "নাবতাক্ষেণী" বা পোতনির্ম্মাণ স্থান ছিল। 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র (অষ্টাদশ শতাব্দীর) উত্তর বঙ্গের নদী-পথে নৌ-যুদ্ধের চিত্র আঁকিয়াছেন। সুতরাং ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙালী নৌচালনা ও নৌ-যুদ্ধে অসাধারণ পারদর্শিতালাভ করিয়াছিল। কোনও শত্রুপক্ষ বহু নৌ-সাহায্যে কোনও রণবীরের নৌকা ঘেরিয়া ফেলিলে, কি কৌশল প্রণালীতে শত্রুপক্ষীয় নৌ-সৈন্য দলের হাত হইতে জীবনরক্ষা করা যায়, তাহাতে বাঙালী বীর সুশিক্ষিত ছিল। বাইচ খেলা বোধ হয় অদ্যাপি সেই স্মৃতি বহন করিতেছে। এই নৌ-ক্রীড়া যে জলপথে বাঙালীর শক্তিচর্চ্চার পরিচায়ক, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

---

*শিল্পজাত ময়ূরপঙ্খী নৌকা অদ্যাপি মুর্শিদাবাদ জেলার বহু পল্লী-মেলাতে বিক্রীত হইয়া থাকে। এক শত বৎসরের প্রাচীন একটি ময়ূরপঙ্খী নৌকা আশুতোষ মিউজিয়মে (কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়) সংরক্ষিত আছে।

শরতের মেঘ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

শরতের ক্ষুব্ধ মেঘ আজি যাহা ভারতের শিরে
পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার-ষড়যন্ত্রে গুমরিয়া ফিরে,
উদ্যত বিদ্যুৎ-কষা আজি যার উদ্ধত স্পর্দ্ধায়
মঙ্গলের ছল করি খণ্ডিতে দণ্ডিতে শুধু চায়,
কে তারে কহিবে ডাকি—ওগো বন্ধু, রাখ অভিনয়
জানি তুমি শূন্যগর্ভ, কল্যাণের ধারা তব নয়!
হও রুদ্র—তুমি ক্ষুদ্র, তুমি শুধু বাক্যের বণিক,
কালিমাখা বাষ্প আর বায়ুভরা বুদ্বুদ ক্ষণিক!
দু'দণ্ডে টুটিয়া যাবে সুকঠিন সত্যের সংঘাতে
ও প্রচণ্ড স্ফীত মূর্ত্তি ফোঁটা দুই তপ্ত অশ্রুপাতে।
ঊর্দ্ধে ওই দেখ চাহি মার্ত্তণ্ডের দীপ্ত অভিযান—
অন্ধ অভিসন্ধি পরে করে তার শায়ক সন্ধান!
নিম্নে হের মহাজাতি ঊর্দ্ধমুখে তারি প্রতীক্ষায়
মাগে তার ইষ্টসিদ্ধি ভারতের ভাগ্যের কৃপায়।

মানুষের মন

(গল্প)

শ্রীআশালতা দেবী

নাঃ, আর পারা যায় না......। দিবারাত্রি বড় বৌমা, আর বড় বৌমা, প্রকৃতি একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। এত বড় বৃহৎ পরিজন বেষ্টিত বাড়ীর মধ্যে বড় বধূ ছাড়া যেন কেহ সংসার দেখিবার আর দ্বিতীয় লোক নাই।

মেজ ও সেজ বধূর কোলে কচি ছেলে, না ও নূতন বধূ সম্প্রতি জননী পদে অধিষ্ঠিত হইবে। আর ছোট বধূ শান্তা তো নিতান্ত ছেলে মানুষ, এখনও ছয় মাস পার হয় নাই, তাহার বিবাহ হইয়াছে। সুতরাং সংসারের যত কিছু ঝক্কি ঝামেলা বড় বধূর।

মেজ ননদ সাবিত্রীর সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে, পূজার তত্ত্ব যাইবে, অতএব বড় বৌমা সমস্ত গুছাইয়া সাজাইয়া দাও, না ও নূতন বধূ সাধ খাইবে, পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রিত হইয়াছে, এসব দেখিবার ভার বড় বৌমার।

কিন্তু এত খাটিয়াও বড় বধূর নাম নাই। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় সকলকে খাওয়াইয়া, বিকালের জলখাবার লুটিয়া নিজেও দুইটি মুখে দিয়া সে যখন দুধের বাটিটা লইয়া উপরে উঠিল, তখন মেজ বধূর ঘরে তাসের আড্ডা পুরাদমে চলিতেছে। বারান্দা ঘুরিয়া ত্রিতলে উঠিবার সিঁড়ি, ত্রিতলে বড় বধূর ঘর, পাশ কাটাইয়া যাইতে যাইতে শুনিল, মেজবধূ বলিতেছে: আমরা কি আর বুঝি না বৌ, ওসব বড়দির চালাকি, নাম কেনবার জন্যে মুখে মুখে কাজ জুগিয়ে দেন। নইলে আমরা বুঝি কাজ করতে ভয় পাই! বাবাঃ কলকাতার পাশ করা মেয়ে, উঁর বুদ্ধি হবে না তো হবে কি জেলী বউএর।......

আর শুনিবার প্রবৃত্তি হইল না। প্রকৃতি আপন মনেই ত্রিতলায় উঠিয়া গেল। এই কথা সে নিত্য শুনিতেছে, সকলেই কানাঘুষায় আলোচনা করে, বড়বধূ কাজ করে নাম কিনিবার উদ্দেশ্যে......প্রকৃতি ইচ্ছা করিলে প্রতিবাদ করিতে পারে, কিন্তু অনর্থক সংসারে একটা অশান্তির সৃষ্টি করা তার স্বভাববিরুদ্ধ।

এত নির্বিরোধী বলিয়াই এই সংসারে সে বড়টা বৎসর সুনামের সহিত কাটাইয়া দিল। যেন একটি নিস্তরঙ্গ নদী।

ছেলেমেয়েরা সব বড় হইয়া উঠিয়াছে, বড় ছেলেটি ম্যাট্রিক দিয়া আই-এ পড়িতেছে, মেজ মেয়ে সুনীলার সম্বন্ধ প্রায় স্থির, আরও দুইটি ছেলেমেয়ে তারাও খুব ছোট নয়। এতগুলি ডাগর সন্তানের জননী, এই তুচ্ছ ঘরকন্নার অভিযোগ স্বামীর কানে তুলিতেও ইচ্ছা যায় না, ছিঃ একেইতো আত্মভোলা মহেশ্বর স্বামী তার, কি ভাবিবেন!

শাশুড়ীর ঘরের তাকের উপর দুধের পাত্রটা রাখিয়া বড় বধূ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, মা, আপনার বাতের মালিশটা এবার করে দি-ই......কাল দিয়ে ব্যথাটা একটু নরম পড়েছে না?......

বৃদ্ধার চোখে বোধ হয় তন্দ্রা আসিয়াছিল, জড়িত স্বরে তিনি কহিলেন, কে বড়বৌমা, বেলা কত মা?

ঘড়ি দেখিয়া প্রকৃতি উত্তর দিল: প্রায় তিনটা বাজে।

বৃদ্ধা কহিলেন, তবে তুমি একটু গড়িয়ে নাও গে মা, একটু পরেই তো সব ইস্কুল কলেজ থেকে এসে পড়বে, ক্ষিদে ক্ষিদে করে, তোমাকেই সব ছিঁড়ে খাবে এখন। যাও, রাত্তিরে বরং একটু মালিশ করে দিও।

একটু ইতস্তত করিয়া প্রকৃতি উঠিয়া গেল। সত্যই ক্লান্তিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া আসিতেছিল। প্রকৃতির ঘরের পাশেই শান্তার ঘর। পর্দ্দাটা ভাল করিয়া টানিয়াও দেয় নাই শান্তা, ছোট দেবরের কয়দিন ধরিয়া সর্দ্দিজ্বর হইয়াছে, কলেজ কামাই করিয়া এই অবসরে প্রিয়ার হাতের মিষ্ট সেবাটুকু প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়া লইতেছে।

পর্দ্দাটা উহাদের ভাল করিয়া টানিয়া দেওয়া উচিত। আজকাল ছেলেমেয়েরা যা বেহায়া হইয়াছে! সমস্ত যেন প্রকাশ করিয়া না দেখাইলে উহাদের তৃপ্তি হয় না!

অথচ বেশী দিনের কথাই বা কি, মনে হয়, এইতো সেই দিন......

প্রকৃতি অন্যমনস্ক চিত্তে ঘরে ঢুকিয়া ফ্যানের মাত্রাটি বাড়াইয়া দিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িল। অলস মস্তিষ্কে কত গত জীবনের স্মৃতি-ছবিই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রকৃতি তখন সবেমাত্র 'ঘর-বসত' করিতে আসিয়াছে। প্রকৃতির স্বামী নির্ম্মলের তখন বি-এ পরীক্ষার সময়। দিবারাত্র পড়ার ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া সে যেন হাঁফাইয়া উঠিত, বধূর সহিত সপ্তাহে একবার কি দুইবার মাত্র দেখা হইত, তখন প্রকৃতির শ্বশুর বাঁচিয়া ছিলেন, পাছে ছেলেটি ফেল্ করিয়া বসে, এইজন্য এত সাবধানতা। কিন্তু......

একদিন প্রকৃতির ঘরে দিনে-দুপুরে 'চোর' ধরা পড়িল। নির্ম্মল সপ্রতিভ ভাবেই জবাব দিল, নীচে বড্ড গরম আর মশা, ওখানে বুঝি মানুষে পড়তে পারে......।

কিন্তু নূতন বধূ প্রকৃতি সেদিন লজ্জায় সারাদিন মুখ লুকাইয়া বেড়াইয়াছিল, আর ইহারা.........মাগো, শান্তাটা কি জোরেই হাসে, যেন উপলাহত ঝর্ণা......কুল কুল করিয়া হাসির ধ্বনি শোনা যাইতেছে......ইহারা কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি করিতেছে......

বড়বধূ পাশ ফিরিয়া শুইল।

বড় দেওয়াল ঘড়িটায় চারিটা বাজিতেই প্রকৃতি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। গায়ের কাপড়-চোপড় সংযত করিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। মেয়েটার বাসের হর্ণ শোনা যাইতেছে, বড় ছেলে সমীর ও ছোট মন্টুর গলা পাওয়া যাইতেছে, মেজ ও সেজ বধূর ছেলেগুলোও বোধ হয় স্কুল হইতে আসিল, নীচে তাহার কত কাজ, জল খাবার তৈয়ারী আছে, তবু ফল ছাড়ানো, সরবত তৈয়ারী করা, প্রত্যেকের ডিশে খাবার দেওয়া, সাহায্য করিবার ছাই একটি লোক আছে কি। কেউ নামিবে না......
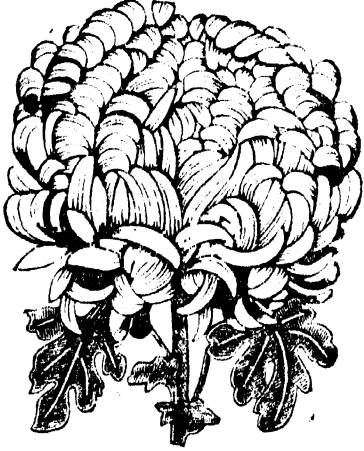
গুণের আদর সবাই বোঝে
আঃ! এইটুকু ছেলের যন্ত্রণায় দু'খানা বিস্কুটও খেতে পারব না। সন্তোষ বিস্কুট দেখিলেই ওর বিস্কুট চাই-ই-চাই নতুবা অনর্থ বাধাবে কান্নাকাটি করে, অথচ অন্য কোন বিস্কুট দিলেও নিবে না—ফেলে দিবে। আর বেশী খেলেও কিন্তু কোন অসুখ করে না। তাছাড়া বাস্তবিক ওদের প্রীতি, থিন-এরারুট, এবং তৃপ্তি বিস্কুটগুলো বেশ মচ্‌মচে, বিশুদ্ধ, টাট্‌কা ও সুস্বাদু—যত খাওয়া যায় শুধু খেতেই ইচ্ছা হয়। এইজন্যই এত অল্প সময়ের মধ্যে এত জনপ্রিয় হয়েছে। দাম সস্তা—সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।
সন্তোষ বিস্কুট কোং
সন্তোষ বিল্ডিং, মাণিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা

কাজকর্ম্ম চুকিয়া গেলে তখন সকলেই একে একে কাহবেঃ ওমা, বড়দি, ডাকতে তো হয় ভাই.....বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

কেহ কহিবেঃ ছেলেটা এমনি হয়েছে, যে ছাড়তে চায় না, তা সত্যি ভাই বড়দি, একবার ডাকতে তো পারতেন!

বড়বধুরই যেন দোষ। কাজ করিবার জন্য সবাই প্রস্তুত, শুধু বড়বধূ একবার ডাকিলেই সব আসিত। বড়বধূ শুধু হাসিমুখে বলে, থাকগে ভাই, তোরা সব কচি ছেলের মা, নামলেই ওগুলো কে'দে হাট বাধাবে, ন' বউএর শরীরটা ভাল নয়, আমার হাতে তো আর কাজ নেই, ক'রলামই বা। নে, খেয়ে নে ভাই, তোদের আবার ছেলে কাঁদবে।

বধূর দল প্রসন্ন মনে আহারে বসিয়া গেল। এইটুকুর জন্য কেহ সামান্য মুখের কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করিল না, করিবেই বা কেন, ইহা তো বড় বধূরই নিত্য-নির্য়মিত কাজ।

সংসারের পাট চুকাইয়া রাত্রে প্রকৃতি যখন শয্যায় প্রবেশ করে, তখন প্রত্যেক দিনই হয় বারোটা না হয় একটার কাছাকাছি রাত হইয়া যায়। শাশুড়ীর মালিশ করিয়া, তাঁহার মশারী ফেলিয়া, নিজের ছেলেমেয়েগুলি কে ঘুমাইল, কে পড়িবার টেবিলেই মাথা রাখিয়া ঢুলিতেছে ইত্যাদির তদারক করিতেই তাহার সময় কাটিয়া যায়, গভীর রাত্রে সে নিঃশব্দ পায়ে নিশাচরীর মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

বাহিরেও তাহার ডাকের অন্ত নাই। বাগ্দী পাড়ার প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের অসুখে বড় বধূর ওষুধ দেওয়া চাই, কামার বউ, তেলী বউ, গয়লানী, নাপিত বউ সকলে একবাক্যে প্রশংসা করে, বড় বৌঠান্ না থাকলে এ সংসার ছন্নছাড়া হ'য়ে যেত মা.........ভাগ্যিস এমনটি বউ গুণের বউ পেয়েছিলে।

সেজ দেবর মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলে, বড় বৌদি আজকাল প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছেন তো খুব.....শেষ রক্ষা হবে তো?

বড়বধূ সস্নেহ দৃষ্টিতে দেবরের পানে চাহিয়া উত্তর দ্যায়, তাইতো প্রার্থনা করি ভাই, যেন শেষ পর্যন্ত মুখ রেখে চলতে পারি, তবে প্রোপাগাণ্ডা চালাবার বয়স আর নেই, ওরা যা বলে, ওদের ওটা অন্ধভক্তি বলতে পারো।

রাত্রে নির্ম্মল অনেকক্ষণ জাগিয়া নথীপত্র দেখেন, মস্ত বড় নামকরা উকীল তিনি, মামলা জয়ে সিদ্ধহস্ত। বড়বধূ ঘুরিয়া ফিরিয়া কাজ করে, আলবোলার নলে শেষ টান দিয়া তিনি গাঢ় স্বরে বলেন, আর কতক্ষণ খাটবে রাণী, ঘুম কি তোমার পায় না? বাড়ীতে এত চাকর দাসী, এত আশ্রিত-আশ্রিতা, তবু তোমাকে দেখলুম না একদণ্ড বিশ্রাম করতে!

প্রকৃতি মিষ্টি হাসিয়া জবাব দেয়, বিশ্রাম করবো, তবে এখন নয় গো, ছেলের বউ আসুক আগে, তারপর; সমীর আর গণ্টুর যখন বউ আসবে, তখন কি খাটবো ভেবেছ? তখন সেটা হবে তাদের সংসার। আর এ ... হাতে গড়া সংসার.....কাজ করতে তো আমার একটুও কষ্ট হয় না।

নির্ম্মল সেই প্রশান্তমুখী কর্ম্মলক্ষ্মীর পানে চাহিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিয়া নিঃশব্দে শয্যায় শুইয়া পড়েন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শয্যা, নিভাঁজ, কোমল। বড়বধূর হাতের সযত্নে প্রস্তুত। বালিশগুলিতে এমব্রয়ডারী করা সুদৃশ্য কভার দেওয়া......। টেবিলে নীল শেড্ দেওয়া ল্যাম্পটিকে জ্বালাইয়া প্রকৃতি বলেঃ তুমি শোও, আমি তোমার পা টিপে দিই?

নির্ম্মল প্রতিবাদ করিয়া বলে, না না......এত কাজের পর-

প্রকৃতি কোনও কথা না বলিয়া নির্ম্মলের পা দুইটি কোলের উপর চাপিয়া ধরে, নরম হাত দুইখানি দিয়া টিপিতে টিপিতে বলে, দেখ, সংসারের ভীড়ে তোমাকে দেখবার অবসর পাইনা, যেটুকু পাই, সেটুকু থেকে তুমি বঞ্চিত ক'র না। সকলেই আমাকে ডেকে পায়, কিন্তু তুমি তো কোনও দিন পাওনি......ডেকেও পাওনি, শুধু সংসারের ভীড়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেছি......শুধু রাতটুকু......এটুকু তুমি বাধা দিও না—

আবেগে বড়বধূর কন্ঠস্বর কাঁপিতে থাকে.....

পরিণত বয়স্কা জননী, এত বড় সংসারের কর্ত্রী সে যে ভুলিয়া যায়, এই মুহূর্ত্তে তার মনে হয় দুইটি বাহু দিয়া সে স্বামীর কন্ঠালিঙ্গন করিয়া শুইয়া পড়ে.....! কিসের সংসার, কিসের কর্ত্তব্য......স্বামীকে সে কতটুকু পাইয়াছে.....স্বামীর প্রীতি সে কতটুকু উপভোগ করিতে পারিয়াছে, কেবল কাজ কাজ.....সে যেন একটা যন্ত্র.....হৃদয়ের সমস্ত সুকোমল বৃত্তিকে নিদারুণ ভাবে হত্যা করিয়া শুধু অম্লান মুখে খাটিয়া যাইতেছে.....। কিন্তু, এখন যেমন নির্ম্মল মিষ্টি গলায় তাহাকে আহ্বান করিতেছে, তখন করে নাই কেন? তখন সেও তো অর্থের নেশায় যশের আকাঙ্ক্ষায় তরুণী পত্নীকে অবহেলা করিয়াছিল, আজ বুঝি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই ভুলগুলি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে!

প্রকৃতির জানুর উপর একখানি হাত রাখিয়া শ্রান্ত নির্ম্মল ক্ষণেকের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

পা দুইখানি সযত্নে নামাইয়া প্রকৃতি সরিয়া আসিয়া কতক্ষণ নির্ম্মলের সুপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রগের কাছে চুলগুলিতে সামান্য পাক ধরিয়াছে, অত্যধিক পরিশ্রমের হেতু চোখের কোণেও ঈষৎ কালীর রেখা, কিন্তু তবু কত সুন্দর, তাহার স্বামী কত সুন্দর...কত মায়াময়...

প্রকৃতির দুইটি ওষ্ঠ আস্তে আস্তে নির্ম্মলের প্রশস্ত ললাটের উপর আপনার অজ্ঞাতেই নত হইয়া পড়ে।......

শুভদিনে সুনীলার বিবাহ হইয়া যায়।

কন্যা বিদায়ের দুইদিন পরে, অর্থাৎ ফুলশয্যার দিন হইতেই নির্ম্মলের শরীরটা অসুস্থ হইয়া পড়ে। বিবাহের খাটুনী, মানসিক উদ্বেগ ইত্যাদি মিলিয়াই যে এই শারীরিক

কিন্তু বড় বধূর সন্ধানী দৃষ্টি যেন নির্ম্মলের অন্তস্থল খুঁজিয়া ফেরে। কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে সে নির্ম্মলের কাছে গিয়া দাঁড়ায়, তাঁর শুষ্ক ম্লান মুখ দেখিয়া প্রকৃতির অন্তর কাঁপিয়া উঠে।.....

নির্ম্মল নীলাকাশে দেখিতে দেখিতে আসিয়া দাঁড়ায় এক খণ্ড কাল মেঘ.....সেই মেঘ থেকেই সহসা খসিয়া পড়ে বজ্র......। এমন সোনার সংসারে যে অকস্মাৎ মহাকাল আসিয়া হানা দিবে, এমন সর্ব্বনাশা চিন্তা কেহ স্বপ্নেও করে নাই........। যেদিন চলিতেছিল নিশ্চিত নিরুপদ্রবে, সেই দিনই যে এমন সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিবে, একথা কে কল্পনা করিয়াছিল। লক্ষ্মীপ্রতিমা বড়বধূ, ভগবান তাহারই ললাটের সধবার চিহ্ন নির্ম্মম হস্তে মুছিয়া লইয়া কতখানি তৃপ্তি পাইলেন কে জানে, কিন্তু নির্ম্মলের শূন্য শয্যায় নিরাভরণা বড় বধূ সেই যে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া রহিলেন, তাহাকে উঠাইবার সাধ্য কাহারও রহিল না।

উপরে বাতগ্রস্তা গৃহিণীর মর্ম্মভেদী স্বর শুধু ভাসিয়া আসিতে লাগিল, ওরে সে ত আমার স্বর্ণলঙ্কা ছারখার করে চলেই গেছে, ওটাকে তোরা টেনে তোল...ও গেলে তোদের মুখে জল দেবার আর কেউ থাকবে না।

কিন্তু প্রকৃতির কাছে আসিয়া তাহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে কেহ সাহস পায় না...কাঁদিয়া সে মাটি ভিজাইতেছে না সত্য, কিন্তু তার বুকের ভিতর যে প্রচণ্ড আগুন জ্বলিতেছে সে দাহের চিহ্ন তার চোখেমুখে, সর্ব্ব অবয়বে...শ্যামল স্নিগ্ধ মূর্ত্তিটি যেন প্রখর রবিতাপে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সেই সংসারের আহ্বান... প্রকৃতি আবার নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল। ছেলেমেয়েগুলি রোজই ছল ছল চোখে তার কাছটিতে বসিয়া থাকে, শ্বশুরবাড়ী হইতে সদ্য বিবাহিতা কন্যা সুনীলা আসিয়া কাঁদিয়া মার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে...ভূষণহীনা জননীর এই শোকার্ত্ত মূর্ত্তি যে তাহাদের অন্তরে কতখানি হইয়া বাজে, বড় বধূ বোধ হয় বুঝিতে পারে...জা ও ননদেরা ম্লান মুখে আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের মৌন ম্লান দৃষ্টির ভাষাও বড় বধূর চোখে ধরা পড়িয়া যায়।

বড়বধূ উঠিয়া বসে। নির্ম্মলের প্রকাণ্ড তৈলচিত্রের পানে চাহিয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া নামিয়া আসে...... পৃথিবীতে তাহার এক দণ্ড শোক করিবারও সময় নাই...... নির্মল চলিয়া গেলেও দায়িত্ব তাহার এখনও মিটে নাই, ছেলেগুলিকে মানুষ করিয়া সংসারী করিতে হইবে যে।

আবার রথচক্রের মত সংসারের চাকা গড়াইয়া চলে। বড়বধূর কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই, আড়ালে অনেক আত্মীয়া কুটুম্বিনীরা মুখ টিপিয়া বলেঃ দেখেছ, কি শক্ত প্রাণ... এক ফোঁটা চোখে জল নেই গা? এমন কাঠপরাণী... মা, মা, আমরা হ'লে কেঁদে মাটি ভাসাতাম।

বড়বধূর কানে একথাও প্রবেশ করে, কিন্তু এখনও সে প্রতিবাদ করে না, উর্দ্ধে চাহিয়া দুই চক্ষু মুদিয়া সে কি যে বলে অন্তর্য্যামীই জানেন..............

কিন্তু অন্তর তাহার সকলেরই কল্যাণ কামনা করে।

বিকালে সমীর কলেজ হইতে ফিরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকেঃ মা, কে এসেছে দেখ, শীগ্‌গির নেমে এস.....

প্রকৃতি দ্বিতলে বসিয়া ঠাকুরপূজার জন্য সলিতা পাকাইতেছিল। পুত্রের ডাকে সে নীচে আসিয়া প্রসন্নগলায় বলিয়া উঠিলঃ ও মা, জয়ন্ত যে, তুমি কোত্থেকে ভাই.....এস, এস, ভাল আছ ত? রাণুদি ভাল আছে? রাণুদির ছেলে-মেয়েরা?

জয়ন্ত কথার জবাব দিবে কি, সদাহাস্যময়ী প্রকৃতির এই নূতন বেশ দেখিয়া সে যেন বিস্ময়ে বেদনায় হতবাক হইয়া গিয়াছিল!

জয়ন্ত প্রকৃতির নিকটাত্মীয় নয়, দূর সম্পর্কের ভাই, তবুও ওই ছেলেটিকে প্রকৃতির বাবা মানুষ করিয়াছিলেন বলিলেই চলে, তাই জয়ন্তকে প্রকৃতিরা দূরে বলিয়া ভাবিতেই পারিত না। প্রকৃতির আপন ভাই ছিল না বলিয়া জয়ন্তকে সে সত্যই নিজের ভাই-এর মতই স্নেহ করিত। জয়ন্ত কিছুদিন মেডিকেল কলেজে পড়িয়াছিল, তাহার পর অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে পারে নাই।

আপনার ঘরে জয়ন্তকে বসাইয়া প্রকৃতি তাহার পরিচর্য্যায় উন্মুখ হইয়া উঠে। তেতলার ছাদের উপর একখানি ঘর চাকরের সাহায্য না লইয়া নিজের হাতেই ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া প্রকৃতি কহিল, এই ঘরটাতে আপাতত তুমি আর সমীর থেক কেমন? দু'দিন থাকতে হবে কিন্তু, দিদির বাড়ী এসেই পালাই পালাই করলে চলবে না।

জয়ন্ত হাসিয়া ফেলিল, প্রকৃতির হাত হইতে ঝাড়নখানি কাড়িয়া লইয়া কহিল, সে হবে'খন পরে, উপস্থিত তুমি এই ধোয়া-মোছা রেখে আমাকে একটু চা এনে দাও ত দেখি।

প্রকৃতি ব্যস্তগলায় কহিল, ওমা তাইত, দেখেছ কি ভুলো মন আমার। সমীর তোরও বোধ হয় খাওয়া হয়নি নয়? কিছু আজ মনে নেই রে.....জয়ন্ত বস ভাই, আয় সমীর তোর আর জয়ন্তর খাবার নিয়ে আসি গে.....

জয়ন্ত এ বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে আসিত, সুতরাং এখানে সে নিতান্ত অপরিচিত নহে। প্রকৃতির পিছনে সেও নামিয়া গেল, কহিল, সকলকে প্রণাম করে আসিগে চল, এসে পর্যন্ত ও-টা হ'য়ে ওঠেনি দিদি, তোমার শাশুড়ী আজও বেঁচে আছেন ত?

ঈষৎ বিমনা গলায় প্রকৃতি জবাব দিল, আছেন বইকি, না থাকলে এত বড় শাস্তিটা মাথা পেতে নেবে কে ভাই?

সমীর ও জয়ন্তকে খাইতে দিয়া প্রকৃতি অন্য কাজে চলিয়া গেল। আর তাহার গল্প করিবার সময় নাই, দুইটা উনান জ্বলিয়া যাইতেছে, ভাঁড়ার বাহির করিবার জন্য ঠাকুর ক্রমান্বয়ে তাগাদা দিতেছে......দেবরদের জলখাবার গুছাইতে হইবে—তাহার যে অনেক কাজ!

সমীর মাকে সরিয়া যাইতে দেখিয়া জয়ন্তর মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া অনুনয়ের সুরে কহিল, আর দু'টো দিন তুমি থেকে যেও জয়ন্ত মামা, অনেক দিন পরে আজ মাকে প্রথম হাসিমুখে দেখলাম। মা যে বেঁচে উঠবেন, এ ত আমরা মনেও করিনি.....

ইহারই ভিতর অবসর করিয়া প্রকৃতি একবার ঘুরিয়া আসিল। জয়ন্তকে লক্ষ্য করিয়া সস্নেহে কহিল, রাত্তিরে তুমি কি খাবে বলত জয়ন্ত? ভাত না লুচী?

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া জয়ন্ত কহিল, তুমি বল কি দিদি, এইমাত্র এতগুলো লুচি গিলে আবার রাত্রে লুচির বন্দোবস্ত! তাহলে আমি পালাব কিন্তু বলে রাখছি। স্রেফ্ দুটি ভাত, গরম ভাত আর একটু ঝোল হ'লেই আমার চলে যাবে দিদি, খাওয়ার বিষয়ে অতখানি বিলাসিতা আমার নেই।

মেজবধূ দালানের একধারে বসিয়া কোলের ছেলেটিকে দুধ খাওয়াইতেছিল, মুখ টিপিয়া হাসিয়া সে কহিল, তোমার না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার দিদিটি তোমাকে লুচি না খাইয়ে ছাড়বেন কেন ভাই.....তুমি ত হাজার হোক কুটুমের ছেলে।

গায়ে পড়িয়া মেজবধূর এই সশ্লেষ উক্তি প্রকৃতির কেমন ভাল লাগিল না, যাইতে যাইতে সে শুধু ধীরগলায় বলিয়া গেলঃ না মেজবউ, কুটুমের ছেলে বলে ওকে খাতির করব না আমি, সে খাতির তোমাদের বাড়ীর কেউ এলে পাবে। কিন্তু ও আমার শুধু ভাই বলেই ওরই ইচ্ছে মত খাওয়া ও খেতে পারবে।

মেজবধূ অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া গেল বটে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় তিন জা ও ননদের কাছে মন্তব্য প্রকাশ করিলঃ ইস্ তবু যদি আপনার মার পেটের ভাই হ'ত... কে-না কে, তার জন্যে টস্ দেখে বাঁচি না.....

যাই যাই করিয়াও জয়ন্ত যাইতে পারিল না। প্রকৃতি তাহাকে এত শীঘ্র ছাড়িয়া দিল না। জয়ন্তকে পাইয়া সে যেন আপনার কুমারী জীবনকে ফিরিয়া পাইয়াছিল। ছেলেদের আসন্ন পরীক্ষা বলিয়া তাহাদের সে কাছে পায় না, বড় ও মেজ মেয়েটি শ্বশুরবাড়ী, জায়েদের সংগে সে মিশিতে চাহিলেও তাহারা আজকাল প্রকৃতিকে এড়াইয়া চলে, প্রকৃতি যেন নিঃসংগ জীবন আর বহন করিতে পারিতেছিল না। এই সময় আসিয়া পড়িল জয়ন্ত... প্রকৃতি যেন বাঁচিয়া গেল।

দেশ-বিদেশের সাহিত্যালোচনায়, গল্পে, কথায় জয়ন্ত প্রকৃতির বিলীয়মান চিন্তাশক্তিকে অল্পে অল্পে জাগাইয়া তুলিল। খানকতক ডাক্তারী বই আনিয়া সে প্রকৃতিকে নিয়মিত পড়াইতে সুরু করিল।

মুখে কেহ কিছু বলিতে সাহস না করিলেও প্রকৃতির বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট সমালোচনা হইতে থাকে, জায়েরা আড়ালে আঁচলে মুখ ঢাকিয়া হাসে, ননদরা গৃহিণীর কাছে গিয়া নালিশ করেঃ সংসারে এবার কাল ঢুকেছে মা, আর তোমার সংসার রইল না... দাদা যাবার পর থেকে বড়বৌদির মেজাজ বদলে গেছে দেখেছ? ওই ভাইটাকে নিয়ে দিনরাত নেকাপড়া না মাথামুণ্ডু হয়। মা-গো, এতগুলো ছেলে-পুলের মা, ছি ছি......

গৃহিণী অবশ্য কান দেন না কথায়, বলেন, যাঃ যা নিজের

কেবল ছোটবধূ শান্তা এই দলটিকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলে। বড়বধূকে সে সত্যই মায়ের মত ভক্তি করে, বড়বধূর অনুগত শিষ্য সে... শান্তা জানে, এইসব মেয়েদের হইতে প্রকৃতির স্থান বহু বহু উর্দ্ধে... তার বড়দিদির তুলনা নাই।

সত্যই সমস্ত দিবসের পর, রাত্রের সব কাজগুলি একে একে চুকাইয়া সে যখন নিজের ঘরে গিয়া নির্ম্মলের তৈল-চিত্রখানিকে সযত্নে প্রণাম করিয়া অপলকদৃষ্টিতে সেই প্রশান্ত, সৌম্যসহাস আননের দিকে চাহিয়া থাকে, তখন তার দুই চক্ষু আর বাধা মানে না... দেবতার পায়ে পূজার ফুলের মতই ঝর ঝর করিয়া অশ্রুমুকুতাগুলি ঝরিয়া পড়ে। নিঃশব্দ আকাশ, আর অন্তরীক্ষের অদৃশ্য বিধাতাই তার মর্ম্মবেদনার একমাত্র সাক্ষী হইয়া থাকে।

সেদিন বিকালে প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিতে-ছিল। সমীর চলিয়া গেছে কলিকাতায় পরীক্ষা দিতে... জয়ন্তও চলিয়া যাইবে, কাল প্রত্যুষে... ইতিমধ্যে কামার বাড়ী হইতে একটি ছোট মেয়ে আসিয়া চুপি চুপি প্রকৃতির কাছে জানাইয়া গিয়াছেঃ মার বোধ হয় খোকা হবে আজ, দিদি-ঠাকরুণ, মা আজ রাত্তিরে আপনাকে একবার যেতে বলেছে।

প্রকৃতি ভাবনার অকূল সমুদ্রে পড়িল যেন।......

বেচারী কামার বউ... বাড়ীতে জনপ্রাণী নাই... থাকিবার মধ্যে ওই মেয়েটি... রাত্রে সে কাহার সহিতই বা কামারপাড়ায় যায়।...

সমীর থাকিলে কোনও গণ্ডগোলই হইত না, মণ্টু ছেলেমানুষ... চাকরগুলোও আজকাল তাহার বাধ্য নহে, মেজবধূ একে একে সকলকে বশীভূত করিয়া লইয়াছে। যাহার স্বামী নাই, তাহার আবার এত প্রতিপত্তি কেন।

রাত্রে কাজ মিটিতেই প্রায় বারোটা বাজিয়া গেল। প্রকৃতি উপরে জানালার ধারে অস্থিরচিত্তে আসিয়া দাঁড়াইল। আসন্ন মাতৃত্বের বেদনায় সেই বেচারী না জানি কত যন্ত্রণাই পাইতেছে... স্বামী কয়েকদিন হইল বাহিরে গিয়াছে... এই গভীর রাত্রে তাহার কি হইল কে জানে।

বাতাসের সংগে ভাসিয়া আসে যেন অসহায়া জননীর অস্ফুট কাতরোক্তি......প্রকৃতি সর্ব্বাংগে ছটফট করিয়া উঠিল। সমস্ত বাড়ীখানি নিস্তব্ধ... এমন সময় প্রকৃতি কাহার সাহায্য লইবে। সহসা সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দরজাটা খুলিয়া দ্রুতপদে জয়ন্তর ঘরের সুমুখে আসিয়া মৃদুগলায় ডাকিল, জয়ন্ত, জয়ন্ত......

জয়ন্ত ঘুমায় নাই, ভোরের ট্রেনেই যাইতে হইবে বলিয়া জিনিষপত্রগুলি একে একে গুছাইয়া রাখিতেছিল।

প্রকৃতির ডাকে সে ক্ষিপ্রহাতে খিলটা খুলিয়া দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, কি বলছ দিদি, এত রাত্রে যে—

প্রকৃতি ব্যাকুল গলায় কহিল, বড্ড দরকার, একবার এস না ভাই... আমার সংগে কামারপাড়ায়, একটি বউ প্রসব-ব্যথায় মরে গেল বুঝি, কেউ নেই তার—শুধু ছ বছরের একটা

পিতৃহীন

(নক্সা)

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

মণিলাল যেদিন মাথা ন্যাড়া করে নিরীহ শান্ত মুখে ক্লাসে এলো, আমরা সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সেই কালোপেড়ে ধুতি নেই, লম্বা লম্বা চুল নেই, গরদের পাঞ্জাবী নেই—একেবারে নিস্পৃহ নির্জীব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণটি। ন্যাড়া মাথার মাঝখানে ক্ষীণকায় একটি টিকি এই আকস্মিক সাত্ত্বিকতাকে যেন সগর্বে ঘোষনা করবার জন্যেই জেগে আছে। ধুতি ও পাঞ্জাবী সে পরে এসেছিল বটে, কিন্তু যে কোন মুহূর্তেই যে গেরুয়া বহির্বাস এবং কমণ্ডলু নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে, তার আভাষই তার গতিবিধিতে সুস্পষ্ট!

জিজ্ঞাসা করলাম, কি মণিলাল, ব্যাপার কি?

করুণকণ্ঠে মণিলাল বললো, কি আর? ফাদার আদার ওয়ার্লডে গেছেন।

বলতে বলতেই তার গলা ভারী হয়ে এলো। চোখ দিয়ে টস টস করে কয়েক ফোঁটা জলও পড়ে গেল। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে সে বললো, তিন মাস প্যারালিসিসের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষটা সারেন্ডার করলেন আর কি! আমি সেফ অরফ্যান হয়ে গেলাম ভাই!

আবার কান্না! বলা বাহুল্য খবরটা দুঃখেরই। কিন্তু নিতান্তই বন্ধু-প্রীতি ছাড়া আরও একটা দুঃখের কারণ ছিল—সেটা এখানে প্রকাশ করে বলাই ভালো।

মণিলালের বাড়ী আমরা কখনো যাই নি। তার বাবাকেও দেখি নি। তবে মণিলালের চালচলন এবং সাজ-সজ্জা থেকে অনুমান করতাম, ভদ্রলোক বেশ মোটা টাকাই আয় করে থাকেন। কি তিনি করতেন, তা অবশ্য জানতাম না, মণিলালও বলতো না—তবে যেভাবে সে লিজার পিরিয়ডে চপ, কাটলেট, কেক, পুডিং, পেষ্ট্রি, সন্দেশ, আর বন্ধু-সমাজে বিতরণ করতো, সিনেমায় নয়ত খেলার মাঠে, ষ্টীমার পার্টিতে, নয়ত মোটর ট্রিপে যেভাবে দলবল নিয়ে বেরুতো এবং যে সমস্ত জামা-কাপড়, জুতো, ছাতা, ঘড়ি, চশমা নিত্য উল্টে-পাল্টে পরে আসতো, রেডিও, টেলিফোন, রকমারি মোটর-কারের নাম, নম্বর ও মেকার যেরকম অসাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আওড়াতো এবং যেভাবে অনতিকাল মধ্যেই বিলেত চলে যাওয়ার ভয় দেখাতো, তাতে আমরা তাকে একটা ছোটখাটো কুমার বাহাদুর বলেই ধরে নিয়েছিলাম।

তার এই ধনাঢ্যতার অংশীদার হতে পেতাম বলেই তার পিতা সম্বন্ধেও আমাদের একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত কৃতজ্ঞতার ভাব ছিল। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতা যে কত গভীর, তা টের পেলাম মণিলালের পিতৃ বিয়োগের খবর শুনে।

বিষণ্ণ হয়ে বললাম, তাই ত। বড় দুঃখের কথা!

মণিলাল দু'হাতে বুক চেপে ধরে বললো, দুঃখ? আমার কেরিয়ারটা ষ্ন্টেড হয়ে গেল হীরেন, আমি লষ্ট। জানো ত' আমি এই বছরই সেল করবো ঠিক ছিল—আর টি এন ভোসের মেয়ে মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে আমার এনগেজ-মেণ্টেরও ফাইনাল হবে কথা ছিল—কিন্তু জাষ্ট সী, কোথা থেকে কি হয়ে গেল!

[illegible]

ভাবে পেলেও, সেদিককার বিবরণ সে আমাদের কাছে তেমন-ভাবে প্রকাশ করে-নি। তবে এরকম একটা কিছু পেছনে আছে, সে অনুমান তার কথাবার্ত্তা থেকে অবশ্য করতাম।

বললাম, কি করবে ভাই, ভাগ্য! তবে সাহস হারিয়ো না। সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে।

মণিলাল বললো, ইউ ডোণ্ট নো হীরেন, বাবা কি ভীষণ দেনা রেখে গেছেন! বাড়ী, গাড়ী, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স এণ্ড সাচ থিংস বাইরে সাজানো ছিল, যেই দি ওল্ড ম্যান ইজ গন, অম্নি সবই অন্তর্ধান। আজ এমন পুঁজি নেই যে, মা'র-আমার পেটের ভাত হয়। চার মাস কলেজের মাইনে বাকী—নাম কাটা গেছে, দু'দিন বাদেই পরীক্ষা, তার ফীজ আছে—ও গড, কি করে কি হবে!

শুনে সত্যিই ব্যথিত হলাম। আমাদের মতো গরীব ঘরের ছেলেদের এ শ্রেণীর বিভ্রাট ত লেগেই আছে। কিন্তু মণিলালের মতো অবস্থাপন্ন ঘরে যে মানুষ, তার অবস্থাটা এরকম ক্ষেত্রে কি দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমেয়।

বললাম, যদি কিছু মনে না করো ত বরং একবার প্রিন্সিপ্যালের কাছে যাই চলো। কিছু ব্যবস্থা হতে পারে। ক্লাস বসতে তখনো দেরী ছিল। মণিলাল কাঁদো কাঁদো মুখে বললো চলো ভাই। যদি কিছু করে দিতে পারো।

প্রিন্সিপ্যালের একটা বিশেষত্ব ছিল। তিনি অন্য কোন অজুহাতেই কান দিতেন না, শুধু মৃত্যুর কথায় তাঁর চোখে জল এসে যেতো এবং এই সময় তাঁকে দিয়ে যা খুসী করিয়ে নেওয়া যেতো। শুনেছি, একজন মেয়ের মৃত্যুর নাম করে তাঁর কাছ থেকে একবার একশ' টাকা আদায় করে নিয়ে সেই টাকা দিয়ে সেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। এই দুর্ব্বলতাটা তাঁর সুপরিচিত—তাই আশা করছিলাম, একটা কোন ফল হবেই।

প্রিন্সিপ্যাল সমস্ত ব্যাপারটা শুনলেন। বলা বাহুল্য ওকালতিটা করতে হল আমাকেই—মণিলাল শুধু দাঁড়িয়ে ফোঁপাতে লাগলো।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, তা বেশ, তা বেশ, তা তোমার বাবা মারা গেলেন কবে?

মণিলাল কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, ১৭ই স্যার।

প্রিন্সিপ্যাল দাড়িটি ধরে বললেন, তা বেশ তা বেশ, তা তোমার ক'মাসের মাইনে বাকী?

উত্তর এলো, চার মাসের স্যার।

—তা বেশ, তা বেশ! তা হবে, হবে, কিছু ভাবনা নেই। তা তা বেশ!

এতবড় একটা শোকের ব্যাপার—প্রিন্সিপ্যালও রীতি-মতো বিগলিতই হয়েছেন, কিন্তু তাঁর মুদ্রাদোষটির উৎপাতে আমার হাসি পেতে লাগলো। জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম। মণিলালও ঘাড় গুঁজে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করতে লাগলো।

প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপকোচিত ভাষায় অনেক সান্ত্বনা দিলেন।

তিনি বললেন, বাস্তবিকই তা অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়া পুরুষের পক্ষে একটা বিষম দুর্ভাগ্য। দুঃখের

আর,বি,দাস

পরিমাণ মেয়েরও হয়ত সমানই—কিন্তু মেয়ের জীবন পৈতৃক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ নয়, তাই সে এটাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে, যা পারে না পুরুষে। টাকা-পয়সা বাড়ী-ঘর থাকলেও, পিতৃহীন ছেলে ভালো করে বেড়ে ওঠে না—সূর্য্যের আলো পায় না যেসব গাছ, তারা জল-মাটি যতই পাক, ভালো করে কোনদিনই বাড়তে পারে না! বাপের দৃষ্টি হল, পুরুষ মানুষের জীবনের ওপর সূর্য্যালোকের মতন—যা তারে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন সমস্ত ধাপগুলির ভিতর দিয়েই এগিয়ে নিয়ে যায়! প্রাণবান করে তোলে।

প্রিন্সিপ্যালের ওর্জস্বিনী ইংরেজী ও অপূর্ব্ব অলংকার বিন্যাসে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পয়সাট নিতে হলে, ধমকটা খেতেই হয়। চুপ করেই রইলাম দুজনে।

ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল এবং অন্য কয়েকটি প্রফেসার ইতিমধ্যে ঘরে এসে ঢুকলেন। কেস শেষ পর্যন্ত খারাপ হয়ে যেতে পারে ভেবে বললাম, একটা ব্যবস্থা স্যার আপনাকে করতেই হবে।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, তা বেশ, তা বেশ। তা তুমি ক্লাসে যাও। তোমার বাকী বেতন মাপ করে দেওয়া যাবে—আগামী বেতনও লাগবে না, ফীজ সম্বন্ধেও যা'হক একটা ব্যবস্থা করে দিলেই হবে খন। মন দিয়ে পড়াশুনো করো—মন খারাপ করো না। তা তা..............।

একটি ছোকরা অধ্যাপক বললেন, ব্যাপার কি?

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, একটা পার্সোনাল বিরীভমেন্ট..... যাও, তোমরা ক্লাসে যাও, আমি সব ব্যবস্থা করে দোব। আজই একটা এমার্জেন্সি মিটিং..............।

কার্য্যোদ্ধার হল। মণিলাল আমার হাত দুটি ধরে বললে, ভাই হীরেন, তোমার কাছে আমি এতার গ্রেটফুল রইলাম। গড বি উইথ ইউ।

টেস্ট পরীক্ষায় মণিলাল জুত করতে পারলো না। জুত ত দূরের কথা, সব বিষয় জড়িয়েও তার নম্বর পুরো একশ' হল না। প্রিন্সিপ্যাল ত কড়া নোটিশ দিয়ে দিলেন, যারা পাশ নম্বর পায়-নি, তাদের কিছুতেই এলাউ করা হবে না।

মণিলাল বললে, কি করি ভাই? কমাস থেকে কি যাচ্ছে, সবই ত জানো। পড়তে পারি-নি।

বললাম, তা ত জানি। কিন্তু কি করি বলো ত? গোপেন, আশু, সন্তোষ এরাও ফেল করেছে, তবে ওদের গার্জ্জেনরা এসে বলে গেছেন, বোধ হয়, ওদের এলাউ করবেন। তোমার ত গার্জ্জেন নেই।

মণিলাল বললে, এক মামা আছে—অকাট মুখ্যু। তাকে আনবো না-কি? তবে সে ব্যাটা হয়ত মামলা কাঁচিয়ে ফেলবে।

—তবু দেখো না একবার চেষ্টা করে।

—দেখি কোন নূতন ফন্দী বের করতে পারি কি-না।

কমন-রুমে বসে দুজনে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। মামার নাম করে একখানা চিঠি কারকে দিয়ে লিখিয়ে প্রিন্সি... একটা অনুরোধ-পত্র লেখালে ফল হবে কি-না, এম্নি আরও অনেক কিছু।

মণিলাল বললে, তুমি দেখে নিও হীরেন, ফাইনালে আমি যে করে হোক, পার হয়ে যাবোই। টেস্টে শালা বিট্রেয়ার অনন্ত পাশে বসেছিল.........একটু বললে না, তাই ত!

শুনে বিরক্ত লাগলো, কিন্তু তার সম্বন্ধে আমার মনে ইতিমধ্যেই বেশ দুর্ব্বলতা জন্মে গেছলো!

বললাম, আচ্ছা, দেখাই যাক না, চেষ্টা করে।

হঠাৎ প্রিন্সিপ্যালের বেয়ারা অক্ষয় এসে মণিলালকে ডাকলো—বললো, সাহেব আসতে বললেন এখুনি।

বললাম, দেখো, প্রিন্সিপ্যাল নিজেই ডেকে পাঠিয়েছেন—একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন।

দুজনে এলাম। আমি বাইরে দাঁড়ালাম, ও ভেতরে ঢুকলো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা হুংকার ও গর্জ্জনধ্বনি। তারপর একটি ভারী গলার আওয়াজ, হতভাগা, শুওর! কলেজে মাথা মুড়িয়ে এসে বলা হয়েছে, বাবা মরেছে.........আর তাই বলে ফাঁকি দিয়ে কলেজের মাইনেগুলো গাফ করা হয়েছে। টেস্টের ফল জানতে এসে আমি অপ্রস্তুতের একশেষ!

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, তা বেশ, তা বেশ, তা তোমার এরকম আচরণের অর্থ কি? তা তা...........।

মণিলাল করুণ কণ্ঠে বললো, স্যার উনি একটি পয়সা হাতে দেবেন না—বড় হয়েছি, খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-আহ্লাদের জন্যে পয়সা ত চাই—তাই কলেজের মাইনে চুরি করেছি, আর সেই জন্যেই বলেছি যে উনি..............।

মণিলালের পিতা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, মশাই শুনুন। ঐ হতভাগা একটা খৃষ্টানের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ঘুনু ঘুনু করছিল আজ কমাস ধরে। তার পুজো জোগাবার জন্যে এ পর্যন্ত ঢের টাকা চুরি করেছে। স্ক্রুড্রাই-ভার দিয়ে গিন্নীর সেকেলে হাত-বাক্সর কব্জা খুলে দফায় দফায় তিন হাজারের ওপর গায়েব দিয়েছে। টের পেয়ে সেদিকটা সামলানো হল—তখন আমার ঘড়ি-চেন, মায়ের গায়ের গহনা যা পায়, তাই বেচে দেয়। একদিন অসহ্য হতে দিলাম ধরে ঘা-কতক—আর নাপতে ডেকে মাথা মুড়িয়ে ছেড়ে দিলাম। তখন এসে আপনাদের মাথা দেখিয়ে বলেছে, বাবা মরেছে—বুঝেছেন, এই করে ফ্রী আদায় করেছে, আর আমার কাছ থেকে কলেজের নাম করে টাকা নিয়ে সেই ছুঁড়ীকে দিয়েছে—দেখেছেন কি ছেলে!

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, তা বেশ, তা বেশ, তা তা তুমি ত অতি বদছেলে!

মণিলাল জবাব দিল, কি করবো স্যার, উনি ত আমার দিকটা কন্সিডার করবেন না কিছুতেই!

ভদ্রলোক বললেন, কন্সিডার? ওরে হতভাগা, এখনো যে তোকে আস্ত রেখেছি এই ত যথেষ্ট কন্সিডার করেছি! আমি ভাবছিলাম, বুঝি মার খেয়ে রোগ সেরে গেছে—তা না, ভেতরে ভেতরে তুমি পলিটিক্স চালিয়েছো। বাবা মরে গেছে?

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, তা বেশ, তা বেশ, তা আপনি কি বলেন এর পর?

ভদ্রলোক বললেন, কি আবার বলবো, পুলিশে দোব ওকে। আমার সঙ্গে জোচ্চুরি করেছে—আমার টাকা মেরেছে। আপনি সাক্ষী............।

চম্পট দিলাম—কে জানে, ব্যাপার কতদূর গড়াবে। শেষটা সঙ্গে থাকার অপরাধে আমিও হয়ত জড়িয়ে পড়বো! সাম্নে পরীক্ষা—তাতে মেজকাকা ত বাঘ বললেই হয়।

সেই থেকে মণিলালের আর কোন খবর পাই-নি। দীর্ঘ ক'বছর পরে সেদিন শুনলাম, মণিলাল মঞ্জুশ্রী দেবীকে নিয়ে নাকি ছায়াচিত্রের অভিনয়ে নেমেছে। অভিনয়ে তার সাফল্য যে অনিবার্য্য, এ তার ছাত্র-জীবনেই টের পেয়েছিলাম! গোটা কলেজকেই সে একদা অভিনয়ের কৌশলে মাৎ করে দিয়েছিল।

মানুষের মন

(৬০৯ পৃষ্ঠার পর)

বিব্রতগলায় জয়ন্ত কহিল, কিন্তু কাল ভোরেই যে আমি রওনা হ'তে চাই দিদি, না গেলেই নয়।

প্রকৃতি কহিল, বেশত তাই যেও। উপস্থিত ওষুধের ব্যাগটা নিয়ে আমার সঙ্গে চলত। আহা একটা মানুষ মুখে জল দেবার কেউ নেই... আমি ত জানি, সে কি কষ্ট......

'তবে চল।' বলিয়া জয়ন্ত তার ব্যাগটি তুলিয়া লইল।

সারারাত্রি 'যমে-মানুষে' টানাটানি করিবার পর কামার বউ-এর একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল যখন, তখন রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রকৃতি তাহাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাইয়া কহিল, এবার একে একটু ওষুধ দাও ত ভাই, ভাগ্যিস ডাক্তার মানুষ তুমি ছিলে সঙ্গে, নইলে বউটা ত মরতেই বসেছিল।

জয়ন্ত ঔষধ দিয়া কহিল, আমার ট্রেনের কিন্তু সময় হ'য়ে এল দিদি, আমি যাই, কাল-পরশু নাগাদ এসে সুটকেশটা নিয়ে যাব'খন.........

জয়ন্ত প্রকৃতির পায়ের নীচে নত হইয়া প্রণাম করিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, তোমাকে কেউ চিনল না দিদি, এইটাই সবচেয়ে দুঃখ। তবে আসি দিদি! তাহার চিবুকে সস্নেহে হাত দিয়া প্রকৃতি স্নিগ্ধ গলায় কহিল, এস ভাই।

দিঘীর জলে স্নান সারিয়া সিক্তবস্ত্রে প্রকৃতি প্রসন্নমনেই গৃহে ফিরিতেছিল। খিড়কীর দরজা দিয়া ভিতরে ঢুকিতেই সে শুনিতে পাইল, উপরে গৃহিণী সক্রোধে কহিতেছেন: কি করে জানব মা, যে দুধকলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছি... চার-পাঁচটা ছেলের মা, সদ্য কপাল পুড়তে না পুড়তেই কলঙ্কের ঢাক বাজালি!.....

প্রকৃতির পা দুইখানি সহসা আড়ষ্ট হইয়া গেল! সর্ব্বাংগ উত্তেজনায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, শাশুড়ী তাহা হইলে কাহার উদ্দেশ্যে এসব কথা কহিতেছেন, সদ্য বিধবা, কে—সে কে? না না তাহাকে এমন হীন সন্দেহ করিতেই পারে না......

এক পা এক পা করিয়া প্রকৃতি দালানের উপর উঠিতেই শান্তা ভিজা কাপড়েই ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

ঃযেওনা বড়দি, যেওনা ওপরে, ওরা সব মানুষ নয়, ওদের হৃদয় নেই, বিষ ছড়াচ্ছে মুখে, সে বিষ সইতে পারবে না দিদি......

এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর রঙ বদলাইয়া গেল যেন, ঠিক—কাল সে জয়ন্তকে লইয়া অতরাত্রে গিয়া আর ফিরে নাই। তাই—

কিন্তু এতদিনকার সুনাম কি এক নিমিষে ধূলোয় লুটাইয়া পড়িল, এ কি তাসের ঘর... কেহ তাহাকে বুঝিল না... ভগবান!

স্তব্ধ প্রকৃতি দুই হাতে বুক চাপিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর সহসা উন্মাদিনীর মত আকাশে চোখ রাখিয়া দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।

শান্তা ধরিয়া রাখিতে পারিল না—স্বামীকেও রাজি করাইয়া পাঠাইতে পারিল না বড় বধূকে ফিরাইয়া আনিতে।

[illegible] দেখিতে দেখিতে ঘন আম

চারি কোটি বৎসর পরে

শ্রীস্—
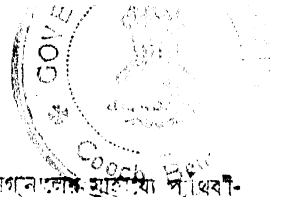
এক আধ বছরের পরিবর্তনের কথা বলিতেছি না। একেবারে চারি কোটি বৎসর পরে পৃথিবীর দশা যাহা হইবে, তাহার কথাই বলিতেছি।

চারি কোটি বৎসরে পৃথিবীর পরিবর্তন নেহাৎ কম হওয়ার কথা নহে। হইয়াছেও তাহাই। মানুষ যখন পৃথিবীতে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন তাহার আকাশে চাঁদ ছিল। প্রতি ২৯ দিনে চাঁদ উপগ্রহটি একবার করিয়া পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসিত। চাঁদের প্রভাবেই পৃথিবীর জলে জোয়ার-ভাটা খেলিত। কিন্তু এরূপ স্রোত-প্রবাহে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। চাঁদের প্রভাবে যে জোয়ার-ভাটা হয়, পৃথিবীর উপরে তার প্রভাব বড় কম হইল না! স্রোত-প্রবাহের সংঘর্ষে পৃথিবীর আবর্তন-গতিবেগ ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিল। পৃথিবীর দিনমান ঈষৎ বৃদ্ধি পাইল। এদিকে জোয়ার-ভাটার প্রভাব গাড়ীর 'ব্রেকের' ন্যায় কাজ করিতে লাগিল। মানুষ যেমন নানারূপ 'টাইডেল ইঞ্জিন' ব্যবহার করিয়া জোয়ারের শক্তিকে সদ্ব্যবহার করিবার ব্যবস্থায় তৎপর হইল, স্রোত-প্রবাহের 'ব্রেক' কষিবার শক্তিও অধিকতরভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে, দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর দিনমান বেশী বাড়িয়া গেল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশে নানারূপ পরিবর্তন সূচিত হইল। পৃথিবী গ্রহের বহুস্থান জোয়ার-ভাটার সংঘর্ষের ফলে কৃত্রিম তাপ পাইয়া অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। দিনমানও বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আশী লক্ষ বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইল।

উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু গিগনেলের সাহায্যে পৃথিবী-গ্রহে তাঁহাদের পৌঁছ খবর পাঠানো ছাড়া তাঁহারা আর ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হন নাই। এরূপ অনুমিত হয়, চন্দ্রলোকেই তাঁহারা সমাধিলাভ করিয়াছেন।

'রকেট' বা হাউই সাহায্যে অন্য গ্রহে অবতরণ খুব

চাঁদ হইতে পৃথিবীর দৃশ্য। এমন যে সুন্দর চাঁদ, ইহাই একদিন পৃথিবীর বক্ষে ভাঙিয়া পড়িয়া পৃথিবীর বিপদ ঘটাইবে।

মানুষ বড় হুঁসিয়ার জীব। চিরদিনই সে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতের ব্যবস্থায় সে চিরদিনই মনোযোগী। পৃথিবীর আবর্তন বেগ দ্রুত কমিয়া আসিতেছে লক্ষ্য করিয়া তখন হইতেই তাহারা পৃথিবী ছাড়িয়া অন্য গ্রহে বসতি স্থাপন করিবার চেষ্টায় উদ্যোগী হইল। পৃথিবী হইতে অন্য গ্রহে পৌঁছিবার চেষ্টা পূর্বেও যে না হইয়াছে তাহা নহে! কিন্তু তাহাদের সে সমস্ত চেষ্টা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে ঐ সব গ্রহ লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত হাউই ছাড়া হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশগুলিই হয় বাতাসের সংঘর্ষে আসিয়া, না হয় নৈসর্গিক শূন্যতায় ধূমকেতু প্রভৃতির উৎপাতের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ জানা যায়, সঙ্গে অক্সিজেন

সহজসাধ্য ছিল না। রকেটের লেজের দিকে বিস্ফোরক পদার্থ থাকার দরুণ তাহার বিস্ফোরণ তেজে সাধারণত হাউইগুলি ঊর্ধ্বে প্রধাবিত হইত। অপরাপর গ্রহের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তাহার আকর্ষণ প্রভাবের মধ্যে আসিয়া যাহাতে হাউইগুলি অধিকতর ধীরে ধীরে গ্রহ মধ্যে আসিয়া পতিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও হাউই মধ্যে করা হইত বটে; তথাপি এরূপ অবতরণ অত্যন্ত মারাত্মক হইত এবং বহুক্ষেত্রেই অভিযাত্রীদল পতনের চোট সামলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। এই কারণেই পৃথিবী হইতে অপর গ্রহে উপস্থিত হইবার চেষ্টা বহুকাল শুধু ব্যর্থতায়ই পর্যবসিত হইয়াছিল। তবে জানা যায়, ৯৭,২৩,৮৪১তম সালে একদল অভিযাত্রী

উক্ত গ্রহ সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহাতে জানা যায় ঐ গ্রহ মানুষের উপনিবেশের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। ঐ অভিযাত্রীদিগেরও আর কোন সংবাদ পরে পাওয়া যায় নাই। তবে অনুমিত হয়, মঙ্গলগ্রহের তৎকালীন অধিবাসিবৃন্দের হস্তে তাঁহারা নিহত হন। অপরাপর গ্রহে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা এভাবে ব্যর্থ হইলেও পৃথিবীর মানুষ কখনও দমিয়া যায় নাই। কারণ এরূপে জানা যায়, উপরোক্ত ঘটনার পাঁচ লক্ষ বৎসর পরে একদল অভিযাত্রী সত্যসত্যই শুক্রগ্রহে আসিয়া পৌঁছিতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁহাদের অদৃষ্টও সুপ্রসন্ন ছিল না! কারণ শুক্র গ্রহের অত্যধিক তাপে ও তাহার বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের অল্পতা-হেতু তাঁহারা শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এদিকে পৃথিবীতে স্রোত-প্রবাহ আশঙ্কাজনক অবস্থার চেষ্টা করিতে লাগিল। ফলে, আত্মরক্ষা করা গেলেও শেষরক্ষা সম্ভবপর হইল না।

দুই কোটি পঞ্চাশলক্ষতম বৎসরে পৃথিবীবাসী নরনারী সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল, পৃথিবীর শেষ-দশা উপস্থিত হইতেছে। আর ১০ লক্ষ বৎসরের মধ্যেই ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। অধিকাংশ লোক ইহাই অদৃষ্টের লিখন মনে করিয়া নির্বিকারচিত্তে দিন গুণিতে লাগিল। কিন্তু মানুষের মধ্যে সাহসী ও নির্ভীক লোকের অভাব কোনদিন পরিলক্ষিত হয় নাই। ইঁহারা বাঁচিবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। ফলে, পৃথিবীর নিকটতম শুক্রগ্রহে উপনিবেশ স্থাপন করার সঙ্কল্প তাঁহাদিগকে দৃঢ়ভাবে পাইয়া বসিল। অভিযানের পর অভিযান পরিচালিত হইতে লাগিল। পর পর প্রায় ২৮৪টি অভিযান ব্যর্থ হইলে পর একদল

মঙ্গলগ্রহের কাল্পনিক দৃশ্য। এই গ্রহে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য পৃথিবীর লোকেরা কম চেষ্টা করে নাই!

সৃষ্টি করিয়াছে। ১,৫৮,৬৬,২৫২তম বৎসরে দিনমান বাড়িতে বাড়িতে আগেকার তুলনায় ৪৮ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাত্রিকালও তেমনি দীর্ঘ ও তুহিনশীতল হইয়াছে। দিনমানে তাপের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। নানারূপ শ্রান্তিহর ও তাপহারক যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়া মানুষ কোনওরূপে টিকিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছে বটে, কিন্তু যেরূপে দ্রুত পট-পরিবর্তন হইতেছিল, তাহাতে এভাবে কতদিন চালান যাইবে, তাহা ভাবিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। কোন কোন উদ্ভিদ পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া কোনওরূপে বাঁচিয়া রহিল বটে, কিন্তু বহু পশু-পক্ষী, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী জীবের বংশ লোপ পাইল। প্রখর তাপযুক্ত দিনমানের জন্য শৈত্য বিধানের ও তুহিন-শীতল রাত্রিকালের শৈত্য দূরীকরণার্থ উত্তাপের ব্যবহার দাবী বৃদ্ধি পাইল। স্রোত-প্রবাহের [illegible] করিয়া মানুষ কোনরূপে অবস্থার সহিত মিটাইবার

নির্ভীক অভিযাত্রী বাস্তবিকই পরিশেষে আসিয়া শুক্র-গ্রহে অবতরণ করিতে সমর্থ হইলেন এবং তাঁহাদের নিশ্চিত মৃত্যু আসিবার পূর্বেই "ইনফ্রারেড" রশ্মির সাহায্যে সঙ্কেত করিয়া শুক্রগ্রহের বিস্তারিত অবস্থা তাঁহারা পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে জানাইয়া গেলেন।

তাঁহাদের রিপোর্ট পৃথিবীর তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ও চিন্তানায়কগণ অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন পৃথিবী ধ্বংস হইলেও মানুষকে আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। শুক্রগ্রহে প্রচণ্ড তাপ এবং অক্সিজেনের অভাব। এই দুই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যদি মানুষ টিকিয়া থাকিতে পারে, তবেই সেখানে মানুষের উপনিবেশ সম্ভবপর। বহুদিন হইতেই পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ বিবর্তনবাদ অনুযায়ী কৃত্রিম উপায়ে মানুষ সৃষ্টি করিবার পরীক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা এ বিষয়ে যে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে শুক্রগ্রহে

বসবাস করিতে পারে এরূপ উপযুক্ত মনুষ্য-বংশ সৃষ্টি করা তাঁহারা অসম্ভব মনে করিলেন না। পৃথিবীতে বংশ পরম্পরা যে মানুষ জাতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতে মানবীয় মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন এবং দশ হাজার বৎসর মধ্যেই তাঁহারা রাসায়নিক ও গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করিয়া এরূপ এক মনুষ্য-জাতি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন, যাহারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলস্থ অক্সিজেনের দশভাগেরও একভাগ কম অক্সিজেনে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইল। তাহাদের দেহের উত্তাপও ছয় ডিগ্রি অতিরিক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

তারপরে বড় রকমের কয়েকটা হাউই এরূপ লোকের অভি-যাত্রী দলকে লইয়া শুক্রগ্রহ অভিমুখে প্রধাবিত হইল। নিক্ষিপ্ত হাউয়ের ১৭৩৪ জন লোকের মধ্যে ১১ জন ব্যক্তি মাত্র নির্বিঘ্নে ঐ গ্রহে অবতরণ করিতে সমর্থ হইলেন। কয়েকটি হাউই মধ্যে এরূপ জীবাণু ভর্তি করিয়াও ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল যেগুলি শুক্রগ্রহে পৌঁছিয়াও তাহাদের প্রভাবে শুক্রগ্রহে মনুষ্যজীবনের প্রতিকূলী জলচরের জীবনকে বিনষ্ট করিল। পূর্বোক্ত ১১ জন ব্যক্তি শুক্র-গ্রহে বীরবিক্রমে প্রবেশলাভ করিলেন, তাহাদেরই বংশধরগণে শুক্রগ্রহে বংশবিস্তার করিয়া খোসমেজাজে সমানে তাঁহাতে বসতি করিতে লাগিলেন।

শুক্রগ্রহে পৌঁছিবার পরবর্তী ইতিহাস মানুষের জীবনে এক দিগ্বিজয়ের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। আমাদের এতদিনকালের পরিচিত পৃথিবীর অধিবাসীদের তুলনায় ইহারা নানাদিকেই বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণভাবে সামাজিক বন্ধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। পার্থিব জীবনের বহুকালের বহু সমস্যাও দূরীভূত হইয়াছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও শক্তির অভিনব বিকাশ এসম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেডিও-তরঙ্গ ধরিবার জন্য মানুষকে আর যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না! তাহাদের নূতন এক বৃত্তির বিকাশে বেতারবার্তা তাহারা স্বতঃই গ্রহণ করিতে পারে। চুম্বক সম্পর্কে এক সহজাত শক্তির উদ্ভব হওয়ায় অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে আর মানুষের দিক বিভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মানুষের যেন নবজন্ম লাভ হইয়াছে।

শুক্রগ্রহে উপস্থিত হইবার পর তাহারা তাহাদের আদিম বাসভূমি পৃথিবীগ্রহের যে অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন তাহা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গত কয়েক লক্ষ বৎসরে চাঁদ ক্রমেই দ্রুতবেগে পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ইহার অন্তিমদশা আসিতে যে আর বিলম্ব ছিল না এতদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হইল। পৃথিবী ও চাঁদের আকর্ষণের ফলে যে স্রোত-প্রবাহের উৎপত্তি তাহার প্রতিক্রিয়া চাঁদের মধ্যে শীঘ্রই প্রকট হইল এবং অনতিকাল মধ্যে আমাদের এতকালের নয়নরঞ্জন চাঁদ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। শুক্রগ্রহ হইতে ইহা বেশ প্রত্যক্ষ করা গেল। পৃথিবীর অবশিষ্ট মানুষ অধিবাসীদের নিকট হইতেও সিগনালযোগে নানা হৃদয়বিদারক সংবাদ আসিতে লাগিল।

চাঁদের যে পৃষ্ঠদেশ পৃথিবীর দিকে রহিয়াছে তাহাতে একটা নিম্নস্তর পরিলক্ষিত হইত। সহসা একদিন চাঁদের সেই অঞ্চলে মস্ত বড় একটা গহ্বরের সৃষ্টি হইল এবং তাহার মধ্য হইতে জ্বলন্ত লাভা-প্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল। (রেডিও-এ্যাকটিভিটির দরুণ চাঁদের ভিতরটা যে তখনও উত্তপ্ত ছিল ইহা তাহারই প্রমাণ।) এভাবে যেমন চাঁদ পৃথিবীকে আবর্তন করিতে লাগিল তাহার প্রভাবে পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলের উষ্ণতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। পৃথিবীর নদ-নদী হ্রদ-খাল-বিল শীঘ্রই সব জলশূন্য হইয়া গেল। উদ্ভিদাদি বিনষ্ট হইল। তিনদিনের মধ্যেই চাঁদ একটা জ্বলন্ত লাভা ও ধূলি-প্রবাহে পরিণত হইল। খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া ইহার স্তূপগুলি পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল। পৃথিবী হইতে এ সময়ে শুক্রগ্রহে যে সংবাদ পৌঁছে, তাহাতে জানা যায়, পৃথিবীর বাদ বাকি অধিবাসীরা ভূগর্ভে আশ্রয় (আধুনিক বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার ন্যায়) গ্রহণ করিয়াছে। তারপর চাঁদ হইতে যে ধূম, লাভা ও অগ্ন্যুদ্গম হইতে লাগিল তাহাতে দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। শুক্রগ্রহ হইতে পৃথিবীর অবস্থা কয়দিন আর দৃষ্টিগোচর হইল না। তারপর যখন ধূলিজাল ও ধূমজাল পরিষ্কৃত হইল, তখন দেখা গেল, আমাদের এককালের সেই নদ-নদীমেখলা শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর আর সেই রূপ নাই। ধ্বংসপ্রাপ্ত চাঁদের স্তূপ প্রচণ্ডবেগে ইহার উপর আপতিত হওয়ায় ইহার উষ্ণমণ্ডলস্থিত ব্যাপক অঞ্চল গভীরভাবে বসিয়া গিয়াছে। অন্যান্য অংশ উত্তপ্ত সমুদ্রকটাহে ও আগ্নেয়গিরির লাভা-প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। মনুষ্যবাসের চিহ্নমাত্র কোথাও নাই।

আমাদের আদিম বাসভূমির এই অবস্থা কি চিরদিন এমনি থাকিবে? শুক্রগ্রহে মানুষের যে বংশধরগণ আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা তাহাদের পিতৃপিতামহের এই আদিভূমিকে কি একেবারেই বর্জন করিবে? শুক্রগ্রহের বর্তমান রাষ্ট্রনেতা-গণ এখন সেই চিন্তাই করিতেছেন। তাঁহারা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, আরও ৩৫ হাজার বৎসরকাল চাঁদ এইরূপ খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে আপতিত হইবে। ইহার পর পৃথিবী এক নবরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে বলিয়া মনে হয়। পৃথিবী-পৃষ্ঠের আগেকার উষ্ণমণ্ডল এখনই উচ্চ পর্বতের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহার দুই প্রান্তে দুই মহাসমুদ্র উহার মেরুদ্বয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ৩৫ হাজার বৎসর বাদে আবার হয়ত মানুষ এইস্থানে পুনঃ উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিবে। শুক্রগ্রহের মানুষেরা তাহার জন্য এখনই তোড়জোড় করিতেছে।

পিতৃপুরুষের দেশ পুনর্দখল করিবার পর মানুষ অপরাপর গ্রহেও উপনিবেশ স্থাপন করিবার আশা পোষণ করে। বৃহস্পতি গ্রহে যাইবার তোড়জোড় শুক্রগ্রহবাসী মানুষ এখনই ভাবিতেছে। উক্ত গ্রহের আবহাওয়ায় যেরূপ প্রকৃতির মানুষ জীবনধারণ করিতে পারিবে সেই ধরণের মানুষ সৃষ্টির পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকগণ এখনই মনোনিবেশ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, সাধারণ মানুষের চারিভাগের একভাগ

(শেষাংশ ৬২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উদ্ভিদের প্রাণ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(হাস্যরসাত্মক গল্প)

দুর্দান্ত জমিদার রাঘব রায়কে লোকে ভয় করত ঠিক যমের মত। সকলের মুখেই শোনা যেত রাঘব রায়ের প্রচণ্ড দাপটে বাঘে গরুতে নাকি এক ঘাটে জল খায়!

প্রবাদটা সত্য কি মিথ্যা জানি না তবে একথা ঠিক যে, রাঘব রায় ছিল খুব রাশভারি লোক। যেমনি লম্বা-চওড়া চেহারা তেমনি গুরুগম্ভীর আওয়াজ। সহজে কেউ কাছে ঘেঁসতে সাহস করত না। তাঁর মেজাজটা ছিল বেজায় চড়া এবং সামান্য কারণেই তিনি ভীষণ রকম রেগে উঠতেন।

বয়স যে তাঁর খুব বেশী হয়েছে তা নয়, তবু সর্বদাই একটা গাট্টাদার মোটা লাঠি নিয়ে তিনি ঘুরতেন। কি বাইরে বেড়াতে যাবার সময় আর কি বাড়ীর ভিতর বা বৈঠকখানায় যাতায়াত করবার সময় লাঠি হাতে ছাড়া তাঁকে কেউ কখনও দেখেনি। লোকে বলত ওতো লাঠি নয় যেন যমের গদা! কেউ বলত ওই লাঠিই ত মানুষটাকে এমন ভয়ানক করে তুলেছে, রাঘব রায়কে আমরা ভয় করিনি, ভয় করি ওর হাতের ওই বেয়াড়া লাঠিগাছটাকে!

রাঘব রায়ের একটিমাত্র ছেলে অর্জুন রায়। ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে। হরিপদবাবুকে রাঘব রায় মোটা মাইনে দিয়ে রেখেছিলেন তাঁর ছেলের গৃহশিক্ষক করে। একমাত্র এই হরিপদবাবু ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন লোক রাঘব রায়ের সঙ্গে কথা বলা দূরে থাকু, সামনে যেতেই সাহস করত না। দূর থেকে তিনি আসছেন দেখলেই পালাত।

এই হরিপদবাবুকে একদিন পাড়ার লোক সবাই ধরে বসল,—মাষ্টারমশাই, দোহাই আপনার! রাঘব রায়ের ওই লাঠিগাছটা যে কোন উপায়ে হোক আমরা সরিয়ে ফেলতে চাই! আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

হরিপদবাবু হেসে বললেন—অসম্ভব! তোমরা চেষ্টা করলে হয়ত খোদ রাঘব রায়কে সরিয়ে ফেলতে পার, কিন্তু তার ওই লাঠি গাছটাকে একচুলও কেউ নড়াতে পারবে না!

একথা শুনে সবাই তাঁর মুখের দিকে বিস্মিত-চোখে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি নিয়ে চাইতে তিনি বললেন—আশ্চর্য হচ্ছ শুনে? কিন্তু লাঠির ইতিহাসটা জানলে বুঝতে পারবে কথাটা আমি মিথ্যে বলিনি। শোন তবে সে কাহিনী—

রাঘব রায় প্রত্যহ ভোরে উঠে অর্জ্জুনকে নিয়ে বেড়াতে যায় জান বোধ হয়। আমাকেও প্রায়ই ডেকে সঙ্গে নিয়ে যান। একদিন এমনি এক ভোরে রাঘব রায় এসে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। বললেন—অর্জুন আজ যাবে না, কাল রাত্রে সিঁড়িতে ঠোক্কর খেয়ে তার ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে বেশ চোট লেগেছে, আজ চল আমরা দুজনেই বেড়িয়ে আসি মাষ্টার!

বেরিয়ে পড়লুম 'দুর্গা' বলে। হেমন্তের হিম-শীতল প্রভাত। পথের দু'ধারে মাঠের বুকে ঘাসের মাথায় শিশির-বিন্দুর মুক্তা ছড়ান রয়েছে। শিউলি ফুলের অজস্র অঞ্জলি কুয়াসার তরল ছায়া নবীন মেঘের মত দৃষ্টিকে আড়াল করে আছে।

রাঘব রায় তাঁর বলিষ্ঠ লম্বা পা ফেলে জোরে জোরে চলেছেন এগিয়ে; আমি এই ক্ষীণজীবী মানুষ অতিকষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে চলেছি তাঁর সঙ্গে প্রাণপণে সমান তাল রেখে! সদ্যস্ফুট নানা ফুলের একটা সম্মিলিত সুগন্ধে ভরা ভোরের সুকোমল ঠাণ্ডা বাতাস ক্ষণে ক্ষণে আমাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন ছুটে পালাচ্ছিল আশপাশ দিয়ে ঘুরে! পূব দিকের আকাশটা একটু একটু করে ক্রমে রাঙা হয়ে উঠছে! লাগছিল মন্দ না! কিন্তু রাঘব রায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটা তো সোজা কথা নয়, মাইল দুয়েক চলতে না চলতেই আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগলুম। রাঘব রায় বার দুই পিছু ফিরে আমার অবস্থা দেখে ধমকে **উঠলেন**—তোমার হ'ল কি মাষ্টার? এইটুকু চলে এসেই হাঁপিয়ে পড়েছ' নাকি? আমি অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে বললাম—আজ্ঞে না হাঁপিয়ে পড়িনি, নতুন জুতো কিনা, পায়ে একটা ফোস্কা পড়েছে। আসবার সময় বুদ্ধি করে যদি আপনার মতো একগাছা লাঠি নিয়ে বেরুতাম তা'হলে আর চলতে কোন কষ্ট হ'ত না।

রাঘব রায় তাঁর নিজের হাতের লাঠিগাছটা আমাকে দিয়ে বললেন—এই নাও, আমার লাঠিগাছটা দিচ্ছি, এইবার কিন্তু হন্ হন্ করে হাঁটা চাই মাষ্টার।

লাঠিগাছটা পেয়ে চলবার অনেকটা সুবিধে হ'ল। আরও মাইলখানেক এগিয়ে যাওয়া গেল তার সঙ্গে, কিন্তু, লাঠি আমাকে দিয়ে রাঘব রায় নিজে এইবার কাবু হয়ে পড়লেন। হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে পকেট থেকে টেনে বার করলেন একখানা প্রকাণ্ড শিকারিদের ছোরা! তার এক বিঘত লম্বা শাণিত ফলাটা সকালের রোদে ঝক্‌মক্ করে উঠল!

ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল, মুখও শুকিয়ে গেল, সর্বনাশ! এই নির্জ্জনে মাঠের মাঝখানে ছোরা খুলে দাঁড়াল কেন? লোকটা আমাকে খুন করবে নাকি? যে দুর্দ্দান্ত রাগী জমীদার, ওদের পক্ষে কিছুই ত' অসম্ভব নয়।

রাঘব রায় ছুরির ধার পরীক্ষা করবার জন্য বার দুই নিজের বাঁ হাতের আঙুলে ঠেকিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন!

আমিও সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম—ধূ ধূ করছে দু'পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ, গ্রাম ও ধানক্ষেত সমস্ত পার হ'য়ে কখন যে চলে এসেছি প্রায় নদীর ধারের কাছাকাছি কিছু জানতে পারি নি! আশেপাশে কোথাও জনপ্রাণীটিও দেখা যাচ্ছে না। এখানে যদি রাঘব রায় আমাকে এখন খুন করে রেখে যায়—কেউ তা জানতেও পারবে না। রাঘব রায়ের ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল—লোকটা কেমন যেন উস্‌খুস্

হঠাৎ সেই খোলা ছুরি হাতে নিয়ে বোঁ করে লোকটা নদীর ধারের দিকে ছুটলো!

আমি যদিও প্রথমটা চমকে উঠেছিলাম, কিন্তু যখন দেখলুম, খানিক দূরে গিয়েই একটা ঝুপসি পানা গাছের ডাল টেনে ধরে ভদ্রলোক প্রাণপণে কাটবার চেষ্টা করছে, আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম!

যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেখান থেকে এক পাও আর নড়তে সাহস হয়নি। দূরে থেকেই চেয়ে দেখছিলেম—রাঘব রায় ছোরা নিয়ে গাছের ডালটা কাটবার জন্য ভীষণ ধস্তাধস্তি করছে:

দশ পনেরো মিনিট কেটে গেল। দরদর করে ঘেমে উঠল সেই প্রচণ্ড জোয়ান রাঘব রায় তার প্রকাণ্ড ছুরি নিয়ে। গাছের ডাল আর কিছুতেই কাটতে পারছে না, যত বাধা পাচ্ছে ততই যেন রোক চেপে উঠছে তার।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল! বেশ রোদ উঠে পড়েছে তখন। আমার মাথার টাক তেতে গরম চাটু হ'য়ে উঠলো! ভাবছি—হাতের এই লাঠিটা লাঠি না হয়ে যদি ছাতি হ'ত তাহলে এ সময় অনেকটা আরাম পাওয়া যেত!

হঠাৎ ডাক এল কানে—মাষ্টার! এদিকে এগিয়ে এস না একটু—তফাতে দাঁড়িয়ে বুঝি তামাসা দেখছ?—

অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলুম কাছে। রাঘব রায় তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছেন! তবু গাছের ডাল কাটার রোক ছাড়েন নি। বললুম—কী হবে ও গাছের ডাল দিয়ে? কেন এত কষ্ট করছেন?

রাঘব রায় দম নিতে নিতে বিরক্ত হ'য়ে বললেন—কী হবে? জান না কি হবে? আমার লাঠিগাছটি ত দিব্যি দখল ক'রে বসে আছ! এদিকে লাঠি একগাছা না হলে যে আমি এক পা'ও চলতে পারিনে!

বললুম—নিন্ না আপনার লাঠি, আমি লাঠি না হ'লেও চলতে পারব।—

রাঘব রায় বিদ্রূপের কণ্ঠে বললেন—থাক্ থাক্, সে আমার জানা আছে! লাঠি দিলুম তাই চলতে পারলে—নইলে ত' রাস্তার উপরই প্রায় শুয়ে পড়বার যোগাড় করছিলে!

মনিবের সঙ্গে তর্ক করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। আমি তাঁর বেতনভোগী কর্ম্মচারী; তাঁর মুখের উপর কিছু বলা আমার অনুচিত। চুপ করেই রইলুম।

রাঘব রায় বললেন—এটা কী গাছ বলত মাষ্টার? এমন শক্ত ডাল আমি এর আগে আর কোন গাছেরই দেখি নি। আমার এ ছুরিতে লোহা কেটে ফেলা যায়, কিন্তু ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করছি তবু এ ডালটার আধখানার বেশি কাটতে পারিনি এখনো।

আমি বললুম—এইবার উল্টোদিকে চাড় দিয়ে ভেঙে ফেলুন না!

রাঘব রায় একটু ম্লান হেসে বললেন—হুঁ! আমি মাষ্টার নই বটে, কিন্তু ও বুদ্ধিটুকু আমার মাথাতেও এসেছিল! বলা খুব সহজ, কিন্তু একবার এসে চেষ্টা ক'রে দেখ না।

দু'হাতে ডালটাকে বেশ ক'রে বাগিয়ে ধ'রে দিলুম সজোরে উল্টো দিকে এক মোচড়!

'উঃ-হুঃ-হুঃ-হুঃ!' আমার হাতের কব্জী গেল মুচড়ে ডালটাকে আমি ঈষৎ একটু বাঁকাতে পর্যন্ত পারলুম না! রাঘব রায় হো হো ক'রে হেসে উঠলেন!

আমি আরও বারকতক ব্যর্থ চেষ্টা করে শেষে লজ্জিত হ'য়ে বললুম এটা কেমন যেমন্না লাগছে। অন্য কোন একটা সরু দেখে ডাল কেটে নেবার চেষ্টা করলে হ'ত না?

মাথা নেড়ে জলদগম্ভীর স্বরে রাঘব রায় বললেন—না, ঐ ডালটাই আমার চাই, তোমার কেরামতি বোঝা গেছে—এখন সরে এসো,—আমিই আর একবার দেখি—" সরে এলুম মাথা হেঁট করে। রাঘব রায় আবার পড়লেন সেই ডাল নিয়ে মহা বিক্রমে কাটতে! আরও এক ঘণ্টা ধস্তাধস্তি টানাটানি—ছুরিখানা দু'হাতে ধরে করাতের মত ঘস-ঘস ঘযে ঘযে চালিয়ে কিছুতেই ডালটা আর গাছের গুঁড়ি থেকে খসান যায় না!

রাঘব রায় ঘেমে নেয়ে উঠল—দম বেরিয়ে যাবার মত হাঁপাতে লাগল। তবু ছাড়ে না! কী রকম ভয়ানক জেদী একগুঁয়ে লোক যে এই মানুষটা তার পূর্ণ পরিচয় পেয়েছিলুম সেদিন।

হঠাৎ তিনি উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন—মাষ্টার! হয়েছে! হয়েছে!—এইবার ছেড়ে আসছে হে—কিন্তু তখনি তাঁর কণ্ঠস্বর একেবারে বদলে গেল, অত্যন্ত বিস্মিতভাবে যেন বলে উঠলেন—একি! একি! মাষ্টার! দেখ'ত—দেখ'ত—! শীগ্গির এস এদিকে—

ছুটে গেলুম কাছে। তিনি অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখিয়ে দিলেন, গাছের গুঁড়িটার যেখান থেকে তিনি ডালটা কেটেছেন সেইদিকে!

মানুষের হাত পা কেটে গেলে যেমন ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে তেমনি করেই তাজা টক্‌টকে লাল রক্ত গাছের গা থেকে ঝরছে!

রাঘব রায়ের দু'হাত রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে! ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—আপনি ছুরিতে হাত কেটে ফেলেননি ত?

'তোমার মাথা কেটে ফেলব!'—দাঁতে দাঁত চেপে রাঘব রায় গর্জন করে উঠলেন।

আমি ভয়ে শিউরে একেবারে আঁৎকে উঠলুম! রাঘব রায় বললেন—'আমার হাত যদি কাটত, আমার হাত দিয়েই রক্ত ছুটত—গাছের গা দিয়ে রক্ত ছুটবে কেন—নীরেট কোথাকার?'

আমি বললুম—তাহ'লে ও রক্ত নয়, ও নিশ্চয় গাছের রস—রক্তের মত লালচে রং!

তোমার মুণ্ডু!—তোমার পিণ্ডি!—আরে! আরে!—এই দেখ এই দেখ—মাষ্টার, হাতের রক্তের দাগ হুহু ক'রে মিলিয়ে যাচ্ছে,—কী আশ্চর্য্য!—বলে রাঘব রায় তাঁর হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। আমি এবার সুযোগ বুঝে বললুম—হুঁ! বলছিলুম না—ও রক্ত নয়, গাছের রস, গরীবের কথা

মিলিয়ে যেত? এ গাছেরই রস। এ রস নিশ্চয় সুরাসারের মত গুণবিশিষ্ট! রংটা লাল—বাইরে হাওয়ার সংস্পর্শে এসেই উপে যাচ্ছে!......

"থাক্ থাক্ আর মাষ্টারি করতে হবে না তোমাকে। আমি তোমার ছাত্র নই! ছুরিখানা ধরো! এ একেবারে ডাহা রক্ত মাংসের ব্যাপার!"—বলে রাঘব রায় মাষ্টারের হাতে ছুরিখানা দিয়ে, গাছের ডালটির পাতা ছাড়াতে ছাড়াতে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললেন. বেলা তখন প্রায় নটা হবে।

যেতে যেতে রাঘব রায় বললেন—এ যা সুন্দর ছড়ি হবে মাষ্টার, ভারি মজবুত! দেখতেও খাসা! কেটে বার করতে দম নিকলে গেছে বটে, কিন্তু পরিশ্রম সার্থক!

আমি যদি এ কথার কোন জবাব না দিতুম, তাহ'লে হয়ত আমার অদৃষ্টে সেদিন যে লাঞ্ছনা হয়েছিল তা হ'ত না, কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনা কে খণ্ডাতে পারে বল? বলে ফেললুম—ঐ একগাছা ডালকাটা বাজে লাঠির জন্য সকাল থেকে আমাদের যা পরিশ্রমটা করতে হ'ল সে আর বলে কাজ নেই। এর চেয়ে ছ' আনা কি আট আনা পয়সা খরচ করলে বাজারে ঢের ভাল লাঠি পাওয়া যেত!—"

একথা শুনে রাঘব রায় একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠল! বললে তুমি একটা নীরেট মুর্খ দেখছি! লোকে যে বলে অনেক পাপ করলে তবে একটা ইস্কুল মাষ্টার হয়—কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়! হাজার পয়সা খরচ করলেও এ জিনিস তুমি কোথায় পাবে?

বাধা দিয়ে বললুম ওটা কৃপণের যুক্তি। অর্থ খরচে কি না হয়? এর চেয়ে ঢের ভাল লাঠি পাব, যদি টাকা খরচ করতে রাজি থাকি!—

রাঘব রায় এবার প্রচণ্ড রেগে দাঁতে দাঁত দিয়ে বলে উঠল চুপ কর বেয়াদপ! কার সঙ্গে কি ভাবে কথা কইতে হয় জান না? ইচ্ছে করছে, এই লাঠির বাড়ি ঘা কতক তোমার মাথায় মেরে তোমাকে সহবোধ শিখিয়ে সায়েস্তা করে দিই!—

কথা শেষ হ'তে না হ'তেই লাঠির বাড়ি সজোরে দু'এক ঘা মেরে দিলেন আমার মাথায়। চোখে অন্ধকার দেখলুম! সঙ্গে সঙ্গে কপালটা ফুলে উঠল।

ভীষণ চটে গিয়ে বললুম আমাকে মারবার আপনার কোন অধিকার নেই! আমি ভদ্রলোক—শিক্ষকতা করি, আপনার বাড়ীর চাকর-বাকর নই,—আপনি আমার গায়ে হাত তোলেন কোন্ সাহসে?

কিন্তু রাঘব রায় দেখি একেবারে চুপ! মুখে কথাটি নেই। বার বার শুধু হাতের লাঠিগাছটার দিকে আর আমার কপালের ক্ষতচিহ্নটার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন—আমি কিন্তু তোমায় মারিনি মাষ্টার!

তার চোখে মুখে ও কণ্ঠস্বরে একটা গভীর বিস্ময় ফুটে উঠেছে দেখে!

আমার কপাল তখনও টিনটিন ব্যথা করছে। ক্রুদ্ধ বচনের সঙ্গে চেঁচিয়ে বললাম—'আমি কিন্তু তোমায় মারিনি মাষ্টার!' **এখনি মেরে এখনি অস্বীকার করতে লজ্জা করছে না? আমার কপালটা কি আপনা আপনিই ফুলে উঠল! ছি ছি! বড়লোক হলেই কি এমনি মিথ্যেবাদী হয়?—**

রাঘব রায় বললেন—আমি জীবনে কখন মিথ্যে কথা বলিনি মাষ্টার! যদি সত্যিই আমি তোমায় মারতুম তাহ'লে নিশ্চয়ই স্বীকার করতুম—রাগের মাথায় অন্যায় করে ফেলেছি, কিন্তু, বিশ্বাস কর, আমি মারিনি, মারবার চেষ্টাও করিনি। শুধু মুখে যেই বলেছি মারব, আমার হাতের এই লাঠিগাছটা তেড়ে উঠে তোমায় মারলে—!

রাঘব রায়ের এই ন্যাকামী শুনে আমার রাগ আরও বেড়ে গেল! বললুম—আমি কচি খোকা নই, আমাকে বোকা মনে করে যা তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেই পরিত্রাণ পাবেন না। আমি এই মারপিট করার জন্যে আপনার নামে ফৌজদারী মামলা করব! গুণ্ডামী করবার আর জায়গা পাননি!—

রাঘব রায় যেন জ্বলে উঠল! চিৎকার করে বললে—মুখ সামলে কথা বল মাষ্টার! আমি দুর্দ্দান্ত জমিদার হতে পারি কিন্তু গুণ্ডা নই! তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা আমায় বল কিনা গুণ্ডা?

আমি বললাম—আলবাৎ বলব—একশবার বলব—গুণ্ডা! খামকা ভদ্রলোককে ধরে যারা ঠেঙায় তারা ইতর অভদ্র—

কী! তুমি আমায় ইতর বললে? আমি গুণ্ডা, আমি ইতর! যা মুখে আসছে তাই বলছ যে, আশকারা পেয়ে বড্ড সাহস বেড়ে গেছে দেখছি! কুকুরকে নাই দিলেই মাথায় ওঠে; দাঁড়াও তোমার থোতা মুখ ভোঁতা করে ছেড়ে দিচ্ছি...

কথা শেষ হতে না হতেই রাঘব রায়ের হাতের সেই সদ্য কেটে আনা লাঠি গাছটা দমাদম আমার পিঠে এসে বার দুই-তিন সজোরে পড়তেই আমি একেবারে 'বাপরে, মারে!' বলে চেঁচিয়ে উঠে পড়ি-কি-মরি করে ছুটে পালালুম সেখান থেকে... জানই ত 'যঃ পলায়তি স জীবতি!'

"মাষ্টার, আমাকে মাপ কর মাষ্টার, শোন শোন" বলতে বলতে ঊর্দ্ধশ্বাসে রাঘব রায়ও ছুটে এলেন আমার পিছু পিছু! আমি কি তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারি? খানিক দূর গিয়েই হাঁপিয়ে পড়লুম। রাঘব রায় এসে আমায় ধরে ফেললে!

আমি ইষ্টনাম জপ করতে সুরু করলাম, জানি আজ আর আমার রক্ষে নেই' ও আমাকে খুন না করে ছাড়বে না! সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম কে জানে?

কিন্তু রাঘব রায় এসে আমার হাত দুখানা চেপে ধরে যখন কাতরকণ্ঠে ক্ষমা চাইতে লাগল, আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না! বারবার শপথ করে বলতে লাগল—বিশ্বাস কর মাষ্টার, এ কাজ এই সর্ব্বনেশে লাঠির! আমি তোমার উপর রেগে উঠতেই লাঠিগাছটা তেড়ে গিয়ে মেরে বসেছে! আমি এ লাঠির কাণ্ড দেখে অবাক! আশঙ্কা হচ্ছে এটা হয়ত কোন ভৌতিক ব্যাপার!

রাঘব রায় যেভাবে কথাগুলা মিনতি করে বলতে লাগল আমি তার কথা আর অবিশ্বাস করতে পারলুম না! তবে ভূত আমি মানিনি তাই বললুম, দেখুন ও ভৌতিক টৌতিক **কিছু নয়, ডালটা ত এইমাত্র কেটে আনা হল! আমার মনে**

হয় ওটা সেই হেজেল্ গাছের ডাল যা নিয়ে বারি সন্ধানীরা জলের খোঁজে বেরয়। মাটির ভিতর যেখানে জল থাকে, হেজেলের ডাল সেখানে ঝুঁকে পড়ে মাটীর ওপর আঘাত করতে সুরু ক'রে দেয়!

রাঘব রায় একটু ম্লান হেসে বললেন, তোমার যত সব অদ্ভুত কথা! তাহলে তুমি কি বলতে চাও যে তোমার মাথাটা জলে ভরা? তোমার কপালটা ত আর মাটি নয়—সেখানে কেন লাঠি গাছটা গিয়ে আঘাত করলে?

আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লুম। কিছুক্ষণ ভেবে বললুম, দেখুন আর একটা কারণে এ রকম হতে পারে। আপনার শরীরে যে ইলেক্‌ট্রিসিটি প্রবাহিত হচ্ছে খুব সম্ভব লাঠি গাছটায় তা সংক্রামিত হয়েছিল! একেবারে সদ্য ভাঙা কাঁচা ডাল কি না! আপনি আমার উপর ভয়ানক রেগে উঠেছিলেন—সেই রাগের মাথায় আপনার হাতের মাংসপেশী-গুলো নিশ্চয় ফুলে কেঁপে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্‌ট্রি-সিটির 'পাওয়ার' বেড়ে গিয়ে ভিজে লাঠির মধ্যে চার্জ হয়েছে, তাই আপনার অনিচ্ছাতেও লাঠিগাছটা ঠিক্‌রে উঠে আমাকে আঘাত করেছে!

রাঘব রায়ের কিন্তু এটা ঠিক মনে ধরল না, বললেন—না মাষ্টার, তা কেমন করে হবে? ইলেক্‌ট্রিসিটির ব্যাপারই যদি বল, তাহলে বলব; লাঠিগাছটা ত আর আমার ষ্টীলের বা লোহার নয়, যে ওর মধ্যে আমার শরীরের উত্তেজিত বৈদ্যুতিক শক্তি সংক্রামিত হবে। আসলে এটা গাছের ডাল কাটা—সুতরাং কাঠ ছাড়া ত আর কিছু নয়। আর কাঠ হল 'নন-কনডক্টর'—অতএব—

আমরা লাঠির সম্বন্ধে এই রকম সম্ভব অসম্ভব নানা আলোচনা করতে করতে বাড়ী এসে পৌঁছলুম। রাঘব রায় নীচেয় আমারই ঘরের কোণে লাঠিগাছটা রেখে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ধাঁ করে লাঠিগাছটাও ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাঁর পিছু পিছু ঠক্ ঠক্ করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে সুরু করলে! আমি ত অবাক!

ব্যাপার দেখে আমার দুই চোখ বিষম ভয়ে একেবারে কপালে উঠে গেল! সর্ব্বনাশ! তবে কি সত্যিই এ ভৌতিক ব্যাপার না কি?—

ওপর হ'তে রাঘব রায় চীৎকার ক'রে উঠল "মাষ্টার! মাষ্টার! শীগগির এস লাঠিগাছটা আমার ওপরে পাঠালে কেন—এখনি নিয়ে যাও!

আমার পা তখনও ভয়ে কাঁপছে! টলতে টলতে ওপরে গিয়ে হাজির হলুম। দেখি, লাঠিগাছটা তৎক্ষণে বিস্মিত রাঘব রায়ের কম্পিত ডান হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করছে!

রাঘব রায় দুর্দ্দান্ত সাহসী পুরুষ! কোন ভয়াবহ সাংঘাতিক ব্যাপারকে বা ভীষণ হিংস্র জানোয়ারকে তিনি একটুও ভয় করেন না! কিন্তু এই একগাছা লাঠির এমন সৃষ্টি ছাড়া অদ্ভুত কাণ্ড দেখে তিনিও ভয়ানক ভড়কে গেলেন! কিছুতেই হাত মুঠো করে লাঠিটা না ধরে তিনি বালকের মত ছুটে পালালেন তেতলার সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে, তাঁর অন্দর-মহলের দিকে। আমিও [illegible]

তখন আর উচিত অনুচিত বিচার করবার অবস্থা ছিল না আমার! রাঘব রায়ের পিছু পিছু আমিও তেতলায় চোঁচা দৌড়! লাঠিগাছটাও যে ঠক্ ঠক্ শব্দে উঠে আসছে আমাদের পিছনে তাড়া করে—বেশ বুঝতে পারলুম! একবার করে সভয়ে পিছনে চাইছি আর প্রাণভয়ে দুজনে ছুটে পালাচ্ছি, এমন সময় রাঘব রায়ের শোবার ঘরের চৌকাঠে পা বেধে দুজনে দুজনের ঘাড়ের উপর ঠিক্‌রে পড়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কুমড়ো গড়াগড়ি খেয়ে গেলুম!

বাইরেই ঘরের কোলে দালানের উপর লাঠির ঠক্ ঠক্ করে আমাদের পিছু পিছু চলে আসার আওয়াজ আসছিল কানে। রাঘব রায় বিদ্যুৎবেগে উঠে গিয়ে চট্‌পট্ ঘরের দরজা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি খিল এঁটে দিলেন!

যাক্, নিশ্চিন্ত! আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম! দুজনে দুজনের মুখের দিকে একটু যেই নিরাপদ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঈষৎ ভরসার হাসি হেসেছি—বন্ধ দরজায় হঠাৎ দমাদ্দম্ লাঠির আওয়াজ! দুজনেই চমকে উঠলুম! হাসি মিলিয়ে গেল! মুখ শুকিয়ে উঠল।

ঘরের দরজা বুঝি ভেঙে পড়ে! সে কি ভীষণ ঠকাঠক্ খটাখট্ দমাদম্ আওয়াজ!

পাশের ঘর থেকে রাঘব রায়ের স্ত্রী বিরজা দেবীর বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

আঃ! কী হচ্ছে ও? জ্বালাতন ক'রে মারলে যে! বুড়ো মদ্দর সক্কালবেলা ও কি ছেলেমানুষী হচ্ছে? দরজাটা যে ভেঙে গেল!

রাঘব রায় আর আমি নিঃশব্দে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইলুম। কারুর মুখে কথা নেই।

লাঠিগাছটা এবার দ্বিগুণ জোরে দরজায় ঘা মারতে সুরু করলে।

রায় গৃহিণী চীৎকার করে উঠলেন—"আঃ! কী ক'র সক্কালবেলা? পাড়াসুদ্ধ লোককে অস্থির ক'রে তুললে যে! মাতলামি সুরু করেছ না কি?"

রাঘব রায়ের মুখের ভাব দেখে বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, তাঁর সমূহ বিপদ! 'ডাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমীর' অবস্থা! তিনি আর কালবিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনা করে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে দিলেন।

লাঠি একেবারে জীবন্ত প্রাণীর মত সুড় সুড় করে ঘরে এসে ঢুকল এবং রাঘব রায়ের ভীত কম্পিত মুঠোর মধ্যে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে আশ্রয় নিলে! যেন সে রাঘব রায়ের কতকালের পরিচিত এক অতি প্রিয় পোষা জীব!

রাঘব রায় প্রাণপণে হাত ঝেড়ে লাঠিগাছটাকে এড়াতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। লাঠি যেন ঠিক আঠার মত লেপ্‌টে রইল তাঁর ডান হাতের তালুতে!

রাঘব রায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে একটা অস্বস্তিকর চীৎকার করে উঠে লাঠিগাছটাকে ইংরেজীতে গাল দিতে লাগলেন—"Get out! you scoundrel!......Be off at once!......"

"হ্যাঁগো! ও কার সঙ্গে অমন ক'রে কথা কইছ তুমি?

আবার। সঙ্গে সঙ্গে ওঘর থেকে তাঁর এ ঘরে আসার পদশব্দ পাওয়া গেল।

আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে নীচেয় নেমে গেলুম। আসবার মুখে কিন্তু রায়গিন্নীর এই কথাগুলো আমার কানে এলো—"আরে মোলো! ও সেই খোকার মাষ্টার মুখপোড়া না? সাহস ত' কম নয়। চুপি চুপি ভোর রাত্রে ভেতরের একেবারে অন্দর মহলে এসে ঢুকেছিল! তোমায় দেখতে পেয়ে বুঝি ছুটে পালাল? বিদেয় কর বিদেয় কর, অমন নচ্ছার লোককে আর বাড়ীতে রেখ না—"

আমার শুধু মনে হ'ল—ধরণী দ্বিধা হও! আমাকে শেষে এও শুনতে হ'ল!

সেইদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর রাঘব রায় এসে ঢুকলেন বার মহলে আমার সেই নীচের ঘরে। এই একটা দিনের মধ্যেই সে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দাম্ভিক নাস্তিক রাঘব রায় যেন একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন দেখা গেল। মুখখানি ম্লান ও বিবর্ণ। দুই চোখে যেন অপরাধীর মত একটা সকুণ্ঠ দৃষ্টি:

আড়চোখে চেয়ে দেখি—হাতে তাঁর তখনও সেই সর্বনেশে লাঠি! জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইতেই তিনি একেবারে কাতর হয়ে উঠে বললেন—মাষ্টার! আমায় বাঁচাও! এ লাঠি ত আমায় কিছুতেই ছাড়ছে না! এ ভূতে-পাওয়া লাঠি নিয়ে আমি এখন কি করি বল?

ক্ষণকাল চিন্তা করে বললুম—দেখুন, আপনি ভয় পাবেন না। লাঠিগাছটা সজীব বলে মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু ভূতে-পাওয়া নয়। ভূত আপনি বিশ্বাস করবেন না। ভূত টুত কিছু নয়, ওটা আসলে গাছের ডাল! সম্পূর্ণ সচেতন বস্তু আর কি! উদ্ভিদেরও যে প্রাণ আছে এ আমাদের শাস্ত্রকারেরা অনেককাল আগেই লিখে রেখে গেছেন; তাছাড়া আমাদের স্যার জগদীশচন্দ্র বসু থেকে সুরু করে আধুনিক য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরাও অনেকেই স্বীকার করেছেন যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে। তারা অচল ও নির্ব্বাক হ'লেও ঠিক মানুষের মতই তারা সচেতন জীব! মাদক দ্রব্য সেবন করালে ওদের নেশা হয়! আঘাত করলে ওরা আহত হয়, বিষপ্রয়োগে ওরা মরে—

বাধা দিয়ে রাঘব রায় অধীরভাবে বলে উঠলেন—তোমার ও 'বিজ্ঞান পাঠ' আমার ছেলেকে পড়িয়ো, এখন এ লাঠি কি করে ছাড়ে আমায় তার উপায় কর।

গম্ভীরভাবে বললুম—দেখুন, আমার মনে হয় ও লাঠি আর আপনাকে ছাড়বে না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ও আপনার সঙ্গী হয়েই রইল!

একটা আতঙ্কপূর্ণ ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রাঘব রায় বললেন—তাহলে উপায়! এ লাঠির জন্য যে আমার জীবন এই একদিনেই দুঃসহ হয়ে উঠেছে!

প্রশ্ন করলুম—কেন, ও ত শুধু আপনার হাতের মধ্যে

উত্তেজিতভাবে রাঘব রায় বললেন—আর বিশেষ কিছু করেনি? কেন, তুমি কি আজকের ঘটনা কিছু শোননি?

মাথা নেড়ে বললাম—কই না! আবার কি করেছে? আমি ত কিছু শুনিনি।

ওঃ! তাই বল! শোন তবে এর কাণ্ড। বলে রাঘব রায় সুরু করলেন—তুমি ত সকাল বেলা গিন্নীর সাড়া পেয়েই নীচেয় পালিয়ে এলে। গিন্নী তোমায় দেখতে পেয়ে মনে করলেন—

বাধা দিয়ে বললুম—থাক, ওকথা ছেড়ে দিন। ছি ছি! আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে ক'রছে—উনি যে আমাকে এ রকম চরিত্রের লোক ব'লে ভাবতে পারেন আমার ধারণা ছিল না—

রাঘব রায় বললেন—কিছু মনে কর না মাষ্টার, যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তিনি তোমাকে দেখেছিলেন তাতে ও রকম সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক! তাছাড়া, এই লাঠিই হ'ল যত নষ্টের মূল! তিনি ঘরে ঢুকেই হাতে আমার এই দিগগজ লাঠি দেখেই বলে উঠলেন—ও কি! মাষ্টারকে ঠেঙালে নাকি?

গম্ভীরভাবে বললুম—হুঁ!

লাঠি দেখে গিন্নী বললেন—আরে রাম রাম, এ কোথা থেকে আবার একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে এসেছ! নাঃ তোমায় নিয়ে আর পারলুম না। যত জঞ্জাল কুড়িয়ে এনে এ রকম ঘরে জড় করা আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে! একি দুখ্‌চিটে বুদ্ধি তোমার? ফেলে দাও ওটাকে, এখনি দূর করে ফেলে দাও—

"বিপদে মধুসূদনম!" আমি তখন মনে মনে 'ত্রাহি মধুসূদন' 'ত্রাহি মধুসূদন' জপ করছি। ফেলে দাও বললেই যে এ লাঠি ফেলা সম্ভব নয়—মূর্খ স্ত্রীলোক কি তা বিশ্বাস করবে? কি বলব, কিছু ঠিক করতে না পেরে একটা ঢোক গিলে বলে ফেললুম—তাড়াতাড়ি সামনে আর কিছু না পেয়ে এই গাছের ডালটা নিয়েই মাষ্টারকে পিটেছি!

একথা শুনে আমি আবার চমকে উঠলাম! লজ্জায় ও ক্ষোভে আমার মুখ একেবারে মড়ার মুখের মত সাদা হয়ে গেল! ছি ছি! জন্মের মত এই ভদ্র মহিলাটির কাছে আমি দুর্বৃত্ত বলেই গণ্য হয়ে থাকব। মৃদু আপত্তিজনক একটু বিরক্তির সুরেই বললুম, তা যাই বলুন, একজন ভদ্র মহিলার কাছে—নাঃ এ কাজটা কিন্তু আপনার ভাল হয়নি।

আমার কথায় কান না দিয়ে রাঘব রায় বলে যেতে লাগলেন—গিন্নী এসে হাত থেকে লাঠিগাছটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে বারান্দায় ফেলে দিলেন এবং মুখ ভার করে নিজের কাজে চলে গেলেন।

লাঠিগাছটা হাত থেকে বিদেয় হওয়াতে আমি একটা নিশ্চিন্ত আরামের নিশ্বাস ফেলে ঘরের মধ্যে পাতা ঈজি-চেয়ারখানায় হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

কিন্তু, দু'মিনিটও কাটল না! বারান্দা থেকে লাঠিগাছটা সোজা উঠে এসে সটান আমার হাতের মুঠোর মধ্যে মাথা গুঁজে

কতক্ষণ যে নিরুপায়ের মত হতাশ হ'য়ে ইজিচেয়ারখানায় অসহায়ভাবে পড়েছিলুম জানি না। অনেক বেলায় আমার স্ত্রী আমাকে স্নানাহারের তাড়া দিতে এসে যেই দেখলেন যে, আমি আবার সেই লক্ষ্মীছাড়া দুখচিটে লাঠিটা হাতে ক'রে বসে রয়েছি—ভীষণ চটে উঠলেন!

আমি তাঁকে ব্যাপারটা সব খুলে বলতে গেলুম, বোঝাতে গেলুম এর রহস্য কি, কিন্তু, হ'য়ে গেল 'উল্টা বুঝলি রাম!' এই নিয়ে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রীতিমত একটা বচসা বেধে গেল! কথা কাটাকাটি থেকে রাগ চড়ে গেল! এতো জান আমি একটু রাগী মানুষ। তার উপর, অত বেলা পর্য্যন্ত তখনও স্নানাহার হয়নি, সকাল থেকে এই লাঠি নিয়ে মেজাজ একেই খারাপ হয়েছিল। স্ত্রীর বিদ্রূপ ও কড়া কথায় ক্ষেপে উঠলুম একেবারে! বলে ফেললুম মুখ সামলে কথা বল বলছি; নইলে আমার হাতে আজ—

বাস্! 'তোমার অদৃষ্টে মার আছে' একথা আর বলতে হ'ল না! হাতের লাঠি চোখের পলকে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে দিলে বসিয়ে গৃহিণীর পিঠে বেশ উত্তম-মধ্যম দু'চার ঘা!

আর যাবে কোথা! স্ত্রী একেবারে চিৎকার ক'রে মরা-কান্না জুড়ে দিলেন! ওগো বাবাগো মেরে ফেললে গো—

ঝী চাকরেরা দৌড়ে এল। রান্নামহল থেকে পিসীমা ছুটে এলেন। ঠাকুর ঘর থেকে আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ বেরিয়ে পড়লেন—সে এক সীন! গিন্নীর খাস ঝী সৌরভি মাগী বলে উঠল—'হেইগো পিসীমা দেখসে এসে, বাবু যে মেইরে মারে খুন করলো গো!'

মাগীকে তেড়ে উঠে যেই ধমক দিয়ে বলেছি, 'চুপ কর্ হারামজাদি—' হাতের লাঠি তেড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অমনি তার উপর—দিলে বসিয়ে দমাদম্ দু'চার ঘা। মাগী একেবারে গিন্নীর চেয়ে চতুর্গুণ চিল-চেঁচিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল!

পিসীমা এই বেলেল্লা কাণ্ড দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। গভীর দুঃখের সঙ্গে বললেন,— ছিঃ ছিঃ রঘু তুই শেষে এই বয়সে এমন হ'লি!

বলতে গেলুম বুঝিয়ে—না, পিসীমা আমি কিন্তু, কে শোনে সে কথা! পিসীমা তখন রেগে আগুন! চীৎকার করে বললেন,—দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা!—আমার বাপের ভিটেয় বসে দিন-দুপুরে মাতলামী করবি, আমি বেঁচে থাকতে এ সহ্য করব না! দরওয়ান ডেকে ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বার করে দেব।

ঝী চাকরের সামনে শাশুড়ীর সামনে পিসীমা আমাকে এ ভাবে অপমান করাতে আমি সহ্য করতে পারলুম না, বলে ফেললুম—পিসীমা! মুখ সামলে—

পিসীমা রুখে উঠে বললেন—কেন, চুপ করব কেন? মারবি না কি?—

কি যেন বলতে যাচ্ছিলুম—কিন্তু হাতের লাঠির আর তর সইল না!

ছি, ছি, ছি! বাপের চেয়েও বয়সে বড় আমার বুড়ো পিসিমা—শেষে তাকেও কি না এই সর্ব্বনেশে লাঠি—

আমি উত্তেজিত হয়ে উঠে ...

অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে রাঘব রায় বললেন—হাঁ মাষ্টার, পিসীমাকেও! আর, শুধু পিসীমাই নয়, শাশুড়ী ঠাকরুণও বাদ পড়েননি!

এ্যা! বলেন কি মশাই!—বলে আমি বেশ একটু বিচলিত হয়ে উঠলুম।

রাঘব রায় বলতে লাগলেন—পিসীমার দুরবস্থা দেখে শাশুড়ী ঠাকরুণ একেবারে কাঁকিয়ে কেঁদে উঠে বললেন—হায় হায়! এ কার হাতে মেয়ে দিয়েছি আমরা! এমন গোঁয়ার গোবিন্দর গলায় মালা দেওয়ার চেয়ে মেয়ের আমার গলায় পাথর বেঁধে জলে ঝাঁপ দেওয়া যে ঢের ভাল ছিল গো!

বুঝতেই পারছ মাষ্টার, এর পর রাগ সামলে থাকা আমার কুষ্ঠিতে নেই, ধাতেও সয় না! ধমক দিয়ে বলে উঠলুম—চুপ্ করুন আপনি—ফের যদি কথা বলবেন—

বাস! আর কথা কিছু আমাকেও বলতে হ'ল না। সর্ব্বনেশে লাঠি তেড়ে গিয়ে শাশুড়ীর খাতির রাখলে না।

ফলে তিনি তাঁর মেয়ে নিয়ে তখনি অনাহারে এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন। আমার অন্ন-জল আর তাঁরা কখন মুখে তুলবেন না বলে গেছেন। আর পিসীমা সৌরভি ঝিকে নিয়ে গাঁয়ের বুড়ো শিবতলার ঠাকুর বাড়ীতে গিয়ে উঠেছেন!

রাঘব রায় বলে যেতে লাগলেন—এই দুর্ঘটনার পর স্নানাহারে আমারও আর রুচি ছিল না। যত রাগ এসে পড়ল এই বেয়াড়া লাঠিগাছটার উপর। আমার শোবার ঘরে সেই যে বড় আলমারীটা আছে, লাঠিগাছটাকে তার ভিতর পুরে চাবি দিয়ে রেখে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু চোখের পাতা বুজতে না বুজতে আলমারীর মধ্যে সে কি ফাটাফাটি ব্যাপার! ঘট্ ঘট্ ঘটাঘট্ সে কি আওয়াজ! কানে তালা ধরে যাবার যোগাড়! লাঠিগাছটা যেন আলমারী ভেঙে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে! এমন উৎপাত লাগিয়ে দিয়েছে তার ভিতর যে ঘুমায় কার সাধ্য! বাধ্য হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে হ'ল। পাছে সে হট্টগোল শুনে বাড়ীর লোকজনগুলো আবার দৌড়ে আসে, এই ভয়ে আলমারী থেকে লাঠিগাছটাকে বার করে নিয়ে একেবারে বেরিয়ে পড়লুম বাড়ী ছেড়ে রাস্তায়। কত লোক কত কথা জিজ্ঞাসা করলে, কোন কথার জবাব দিইনি কাউকে। সন্ধ্যের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চুপি চুপি চোরের মত বাড়ী ঢুকেছি। পাড়ায় আসবার পথে অনেক জায়গায় শুনলুম, লোকে আমার সম্বন্ধেই আলোচনা করছে। কানে এল, কেউ বলছে একেবারে ক্ষেপে গেছে, কেউ বলছে নেশা করে মাথাটা বিগড়েছে—কেউ বলছে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে, কেউ বলছে সজ্ঞানে কি মানুষ এ কাজ করতে পারে? বুঝতে পারলুম সন্ধ্যের আগেই পাড়ায় পাড়ায় আমার কেলেঙ্কারি একেবারে ব্রহ্মাণ্ড হয়ে গেছে!

সর্ব্বনেশে লাঠির হাত থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায় দু'জনে বসে অনেক রাত পর্য্যন্ত পরামর্শ চলল। কিন্তু কোন উপায়টাই শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হবে বলে মনে হ'ল না। রাঘব রায় স্বীকার করলেন সন্ধ্যের মুখে একখানা ভারি পাথর এই লাঠির সঙ্গে বেঁধে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন,

ওধারের ঐ বড় দিঘীটার জলেও একবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলুম ঠিক মাঝ বরাবর! কিন্তু হলে কি হবে? এতো লাঠি নয়, এ এক ভূত। আমি বাড়ী ঢুকে ফটক বন্ধ করতে বলবার আগেই লাঠি সাঁতরে দিঘী পার হয়ে ঠিক এসে হাতের মুঠোয় হাজির!

হঠাৎ আমার মাথায় একটা মতলব এল। বললুম রায় বাহাদুর! আর ভয় নেই, এক কাজ করা যাক্ আসুন। আগুনে জেলে লাঠিটাকে একেবারে ভস্ম করে ফেলা যাক্!

"ঠিক বলেছ!" রায় বাহাদুর একেবারে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন 'এটা আমার মনে হয়নি একবারও' 'থ্যাঙ্ক ইউ!' চল তাহলে, এই বেলা কেউ কোথাও নেই, লাঠিগাছটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে ফেলি চল!

দুজনে চুপি চুপি পা টিপে টিপে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলুম। উনুনে আঁচ গন্ গন্ করছে তখনও! খুসী হয়ে রাঘব রায় তাড়াতাড়ি যেমন লাঠিগাছটা উনুনের মধ্যে দিতে যাবে, হাতে আঁচ লেগে আঙ্গুলগুলো ঝলসে গেল! বাপরে মারে গেছিরে! হাতটা পুড়ে গেল—মাষ্টার! পুড়ে গেল! বলে রাঘব রায় হাতে ফুঁ দিতে দিতে লাফালাফি সুরু করে দিলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—"হাতে একটু তাত লেগেছে বুঝি? রাঘব রায় রেগে উঠে আমায় ভেঙচে বললেন—"হাতে একটু তাত লেগেছে বুঝি? ন্যাকা! দেখতে পাচ্ছ না, হাতখানা পুড়ে ঝলসে গেল! ঘা কতক পিঠে পড়লে বুঝতে পারতে—সামনে তোমার ওটা কুলপী বরফের হাঁড়ি নয়—আগুনভরা উনুন—"

কিন্তু রাঘব রায়ের কথা শেষ হ'তে না হ'তে লাঠি তেড়ে উঠে আবার আমায় পিঠে বেশ ঘা কতক দিয়ে দিলে! মারের চোটে আমার দু'চোখ কপালে উঠে গেল! এবার কিন্তু রাঘব রায়ের উপর রাগ হয়নি। রাগ হ'ল লাঠিগাছটার উপর! রাঘব রায় অপরাধীর মত স্থির হ'য়ে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে বললুম—"আর ভালমানুষটি সেজে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? হাতের ওই সর্ব্বনেশে খুনে লাঠিগাছটা উনুনের ভেতর গুঁজে দিয়ে চলুন এখান থেকে সরে পড়ি!"

রাঘব রায় তৎক্ষণাৎ লাঠিগাছটাকে উনুনের মধ্যে পুরে দিলেন। জমীদার বাড়ীর উনুন—সে যেন যজ্ঞিবাড়ীর উনুন—প্রকাণ্ড ফাঁদ! সেই উনুনের এক উনুন আগুনের ভিতর যতদূর পারলেন লাঠিগাছটা ঠেলে দিয়ে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার অগ্নি-সংকার নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট—পনের মিনিট কেটে গেল! লাঠিগাছটা যেমন তেমনি আগুনের মধ্যে খাড়া! একটু ধোঁয়াও বেরুল না, একটু কাঠপোড়া গন্ধও উঠল না—একি হ'ল!

আমার মনে হ'ল আগুন যেন নিভে গেছে! বললুম সেকথা রায় বাহাদুরকে। তিনি বললেন, "হতেই পারে না! আগুন সারারাতেও নেভে কি-না সন্দেহ! একবার হাত বাড়িয়ে তাপটা পরীক্ষা করে দেখ না—"

করতে গিয়ে দেখি হাতে মোটেই আঁচ লাগে না। ক্রমে ক্রমে একটু করে আরও হাত নামিয়ে ধীরে ধীরে উনুনের আগুন পর্য্যন্ত এসে দেখি—ও হরি! কোথায় আগুন—কোথায় আঁচ! একেবারে ঠাণ্ডা জল! বললুম—"যা বলিছি তাই, আগুন নিভে উনুন একেবারে ঠাণ্ডা হিম—

"বল কি মাষ্টার?" রাঘব রায় বিস্মিত হয়ে স্বয়ং পরীক্ষা করবার জন্য উনুনের উপর যেই হাত বাড়িয়েছেন লাঠিগাছটা অমনি টকাৎ করে উনুনের ভিতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসে রায় বাহাদুরের হাতের মুঠোয় এসে ঢুকল সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়। আমরা কেউই এজন্য প্রস্তুত ছিলুম না। আমি ত চমকে উঠে তিন হাত পেছিয়ে আসতে গিয়ে রান্নাঘরের মেঝেয় রাখা চাকি-ডলনের উপর পা পড়ে পিছলে একেবারে গড়িয়ে পড়ে গেলুম। রাঘব রায়ও লাঠি শুদ্ধ উল্টে ডিগবাজী খেয়ে পড়ল!

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমি ত দুটো এস্পিরীন্ ট্যাবলেট খেয়ে এক গ্লাস জল ঢক্ ঢক্ করে গলায় ঢেলে তবে ধাতস্থ হই! রায় বাহাদুর খেয়ে ফেললেন প্রায় আধ বোতল হুইস্কী সোডা!

তারপর সুরু হ'ল আবার আমাদের আলোচনা। এই সর্ব্বনেশে লাঠি নিয়ে এখন কি করা যাবে? এর হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি? এ পাপ কি করে বিদেয় করা যায়?

বললুম—"দেখুন, রায় বাহাদুর, যতদূর দেখা গেল তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, আপনি যখনই রেগে উঠে কাউকে মারবার মত মনের অবস্থায় গিয়ে পৌঁছচ্ছেন, তখনই লাঠি-গাছটা আপনার মনের ইচ্ছেকে কাজে পরিণত করছে—"

রায় বাহাদুর বাধা দিয়ে বললেন—আমি কি আমার স্ত্রীকে মারবার ইচ্ছে করেছিলুম? আমি কি আমার বুড়ো পিসীমাকে ঠ্যাঙাতে চেয়েছিলুম? ঝিয়ের গায়ে হাত তোলবার ইচ্ছে কি আমার কস্মিন্‌কালেও ছিল? শাশুড়ীকে প্রহার কোন ভদ্র-জামাই কখনও করে?

বললুম, "আহা-হা! আবার চটছেন কেন? ভুলে যাচ্ছেন, আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে সেই সর্ব্বনেশে লাঠি এখনও অক্ষতদেহে জলজ্যান্ত বর্ত্তমান রয়েছে! চটলেই এখনি ওটা এক অনর্থ ঘটিয়ে বসবে। আপনি যতক্ষণ না চটেন, ততক্ষণ লাঠিও কোন উৎপাত করে না! বেশ যে কোন সাধারণ লাঠির মতই নির্বিরোধী থাকে!"

রাঘব রায় আবার চটে উঠলেন— কী? একে কি তুমি বলতে চাও যে কোন সাধারণ লাঠির মত? সাধারণ লাঠি নীচে থেকে উপরে উঠে আসে?—বন্ধ দরজা ঠেলে ঘরে আসতে চায়? আলমারী ভেঙে বেরুবার চেষ্টা করে? আগুনে দিলেও পোড়ে না—জলেও ডোবে না—

বলতে না বলতে সভয়ে চেয়ে দেখি যে, রাঘব রায়ের হাতের সেই সর্ব্বনেশে লাঠি আমাকে মারবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছে!

কপালের ফুলো আর কালশিরার দাগ এখনও মেলায় নি। হাতজোড় করে বললুম—"দোহাই রায়

হটে পালাবার চেষ্টা করছিলুম, এমন সময় দেখি রায় বাহাদুর নিজেই অনেকখানি দূরে পিছিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে পাদচারণা করতে করতে অতি মোলায়েম গলায় মৃদু-মধুর কণ্ঠে বলতে লাগলেন—না, না, দেখুন মাষ্টারবাবু, আপনি অতি সজ্জন, অতি ভদ্রলোক, আপনারই মত ভালমানুষ প্রায় দেখা যায় না। আমি আপনার উপর ভারি সন্তুষ্ট হয়েছি!

দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি রাঘব রায়কে এই রকম 'সবিনয় নিবেদন' অবস্থায় আরও কিছুদিন কাটাতে হয়েছিল। কারণ, ঠিক এর অব্যবহিত পূর্ব্বে কয়েকবার অপরিচিত পথিক, রেলের সহযাত্রী কুলি-মজুর, ফিরিওয়ালা প্রভৃতিকে লাঠির দ্বারা আঘাত করবার জন্য 'এ্যাসল্টের' অপরাধে ফৌজদারী আদালতে তাঁর মোটা রকম জরিমানা হ'য়ে যাবার পর তিনি আর কোন কারণেই নফরের উপর কখনও চটতেন না!

রাঘব রায়ের এ অবস্থা দেখে বাস্তবিকই আমার প্রাণে বড় কষ্ট হয়েছিল। কি ক'রে এই জীবন্ত লাঠির হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করা যায়। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে মাটির মধ্যে এক গভীর গর্ত্ত খুঁড়ে তার মধ্যে সেই সজীব লাঠিকে সমাহিত করবার সুবুদ্ধি দিয়ে রাঘব রায়কে আমি লাঠি দায় থেকে পরিত্রাণ করেছিলাম। সেই থেকে কৃতজ্ঞতা-বশত তিনি আমাকে তাঁর সমস্ত ষ্টেটের ম্যানেজার করে দিয়েছেন।

---

* ইংরেজীর ছায়ানুসরণে।

চারিকোটি বৎসর পরে

(১১৫ পৃষ্ঠার পর)

দীর্ঘাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ ও মোটা রকমের হাড়বিশিষ্ট মানুষ ঐ গ্রহের উপযুক্ত হইবে এবং তাঁহারা সেইভাবেই তাঁহাদের গবেষণা পরিচালনা করিতেছেন। বৃহস্পতি গ্রহে যেরূপ শৈত্য বিরাজ করে, তাহার প্রভাব কাটাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে এরূপ মানুষ সৃষ্টি করা কার্যকর হইবে না বিধায় বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেছেন উক্ত গ্রহে হাউইর সাহায্যে এরূপ আণবিক পাঠাইবার ও মজুত রাখিবার ব্যবস্থা করা হইবে, যাহাতে মানুষ ঐ গ্রহে পৌঁছিয়া অন্তত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হয়। ইতিমধ্যে তাহারা হয়তো নিজেদের জীবনধারণোপযোগী শাক ও অন্যান্য মাল-মসলার সন্ধান করিয়া নিতে পারিবে। বৃহস্পতি গ্রহে এভাবে উপনিবেশ স্থাপন করা যদি সম্ভবপর হয়, তারপর তাহারা ক্রমে অন্যান্য গ্রহও দখল করার চেষ্টা করিবে।

চারি কোটি বৎসর পরে দীর্ঘকালের সাধনায় মানুষের পক্ষে এ সব কিছু করা কোনরূপ অসাধ্য নহে। তবে ইতি-মধ্যেই পৃথিবীতে নিজেদের মধ্যে যে মারামারি কাটাকাটির ব্যবস্থা করিয়াছে তাহার জের কাটাইয়া মানুষের সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইলেই হয়।

সনেট

বিভূতি চৌধুরী

(এক)

নির্জ্জন দেহের দ্বীপে আমি মোর বাঁধিয়াছি বাসা,
কামনা-প্রবল কীট তোলে সেথা অস্ফুট গুঞ্জন—
কি যেন সংগীত রচে নিত্য সেথা মাধুকরী মন,
আছাড়ি ভাঙিয়া পড়ে প্রাণ—ঢেউ মত্ত সর্ব্বনাশা
মানুষ-বসতি নাই—আছে এক কেশবতী মেয়ে,
চোখে তা'র খেলা করে পাতালের অনন্ত নাগিনী,
সেথা সন্ধ্যা আসে তা'র চুলের অরণ্যপথ বেয়ে
সে মেয়ের রূপ-বিষে অন্ধ সেথা সূর্য্য সৌদামিনী।

কেশবতী কন্যা পাশে ঢেউ গোণে প্রাণের সাগরে,
উত্তাল দুরন্ত ঢেউ—কেঁপে ওঠে বুকের পাঁজর,
হাসে কন্যা, ভাবি বুঝি সেই দ্বীপ উড়ে যায় ঝড়ে—
নিঃশ্বাসে স্তনাগ্রচূড়ে বাড়বাগ্নি কাঁপে থর্ থর্।
রক্তে লাগে কি যে নেশা ধরি তা'রে বুকেতে আঁকড়ি,
ডুবে যাক্ নাহি ক্ষতি সাগরে ময়ূরপংখী তরী।

(দুই)

তোমার ও দেহ যেন একখানি আফিমের গাছ,
সর্ব্বাঙ্গে বিষের নেশা—অণুতে অণুতে বিষ-ফুল
ফুটে আছে, কি সুন্দর মরণের মধুঢালা ছাঁচ,
মৃত্যুময়ী ঘুম আনে দুই চোখে কালো এলো চুল।
ঘুম নয় মৃত্যু সে যে—মৃত্যু নয় বিস্মৃতি স্বপন,
স্বপ্নের সাগর তলে ওই দেহ নিয়ে যায় টানি—
শরীর এলায়ে পড়ে, হিম হয় রক্তের কাঁপন,
গোক্ষুর শাখিনী বিষে গড়া যেন দেহ-রাজধানী।

তবু যেন ভালবাসি সর্ব্বনাশী তনুর উষ্ণতা,
আর কত সুরে কবি মরণের নাম উচ্চারণ—
ও দেহের স্পর্শে বাঁচে হৃদয়ের যত মৃত কথা,
আফিম্ ফুলের বিষ মৃত্যু নয় আনে উজ্জীবন।
মোর রক্তে কথা কয় লাখ লাখ আফিমের ফুল,
আমারে ঢাকিয়া দিক ওই দেহ ওই কালো চুল।

পাহাড়িয়াদের আহ্বান-সঙ্কেত

শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য

ঢাক—জয়ঢাক যে সেই আদিমকাল হইতে টেলিফোনের কাজ করিয়া আসিয়াছে—টেলিগ্রাফের অভাব দূর করিয়াছে এবং রেডিও ও দৈনিক সংবাদপত্রের শূন্যস্থান পূরণ করিয়া বিরাজ করিতেছে, অসভ্য-বর্ব্বর আমরা যাহাদের বলি, তাহাদের ভিতর, ইহাতে সন্দেহ কিছুমাত্র নাই। এমন কি, আগুন লাগার হুঁসিয়ারি সংবাদ প্রেরণ ও প্রহরীদের সঙ্কেতে, আহ্বানেও এই ঢেঁড়াই তাহাদের প্রধান সম্বল। ঢাক-তৈরীর কৌশল যদি সহসা কোনদিন তাহাদের শক্তির অতীত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে তাহাদের বিষম যে বিপদ উপস্থিত হইত, তাহার সহিত একমাত্র তুলনা হইতে পারে, —আজিকার সুসভ্যজাতিদের ভিতর হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ফিকির-ফন্দী অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইবার অভিশাপের সহিত।

বোম্বাই প্রদেশে শস্যক্ষেত্র হইতে পাখী প্রভৃতিকে তাড়াইবার জন্য অদ্ভুত শিঙা

আদিম যুগোচিত সেই যে ঢাক,—উহার নির্ম্মাণে উপাদান-ভেদ, উহার আকার পার্থক্য এবং উহার বাদন-কায়দার বিশিষ্টতা অঞ্চলভেদে একেবারেই স্বতন্ত্র, একথা বলিতেই হইবে; যেমন উল্লেখযোগ্য আবার উহার বিভিন্ন সঙ্কেত-ধারা, যাহার তাৎপর্য্য স্থলভেদে নেহাৎই আলাদা আলাদা।

আফ্রিকার বনাঞ্চলে যে সংবাদবাহকের ঢাকটি—আকারে উঁচু। একটা [illegible] বসিবার স্থান করিয়া লইতে পারে। এই বিরাট ঢাকগুলি তৈরী করা হয় মোটা মোটা গাছের গোটা গুঁড়িটার ভিতরের সবটা কুরিয়া ফাঁপা করিয়া ফেলিয়া। উহার উপর আর চামড়ার আবরণ দেওয়া হয় না দুই মুখে; এক পার্শ্বে একটি চির কাটা হয়, ঐস্থানে আঘাত করিলেই গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত মুখরিত করিয়া তোলে।

অপরদিকে আবার এমন ক্ষুদে ক্ষুদে ঢাকও দেখিতে পাওয়া যাইবে আমেরিকার নানা আদিম জাতির ভিতর যাহার আকার ছয় ইঞ্চি হইতেও অধিক হইবে না।

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথমে নজরে পড়ে আফ্রিকার জাইলোফোন (Xylophone); বিভিন্ন ওজনের কাঠের ছোট বড় কতকগুলি দাণ্ডা পর পর সাজাইয়া এই যন্ত্রটি প্রস্তুত কতকটা বর্ত্তমান মেটালোফোনের মত—তফাৎ শুধু এই যে, লোহার পাতের স্থানে কাঠ ব্যবহৃত হইয়াছে। জাইলোফোনের কাঠগুলি রাখা থাকে খড়ের উপর, আর হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করিয়া বাজান হয়। আবার ঝুলান জাইলোফোনও কোন কোনও স্থানে প্রচলিত। ঐ গুলিও কাঠেরই কাঠামোতে দুইটি লম্বা খুঁটির মাথায় এড়ো বাঁশ বা কাঠের সঙ্গে ঝুলান।

ইউরোপের কোন কোন পল্লীগ্রামে কিছুদিন পূর্ব্বেও আগুন লাগার সংবাদ সমগ্র গ্রামে এবং আশেপাশে সঙ্কেতে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইত গাড়ীর চাকার কানা (rim), কারণ তখনও বিদ্যুতের ব্যবহার ব্যাপক হয় নাই।। ঝুলান ড্রাম্ (ঢাক) বা জাইলোফোন ছিল সেই কায়দার।

এই সকল আদিম জাতীয়েরা আজিও যে ঢাক ব্যবহার করে, তাহা অবশ্য প্রতিবারেই একই উদ্দেশ্যে নয়। হয় তো একটি দিনের ভিতরই বহুবার বহুপ্রকার বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে ঢাক ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

অতি প্রত্যুষে শিকারে বাহির হইবার জন্য দলের সকলকে একত্র করিবার উদ্দেশ্যে ঢাক বাজান হইল। ঢাকের শব্দে অগোণে সকল শিকারী আসিয়া জুটিল দলপতির আস্তানায়। তারপর একদল বাহির হইল নূতন শিকার বাগাইতে আর বাকি সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া গেল আগের দিনে পাতিয়া রাখা ফাঁদে শিকার পড়িয়াছে কি না দেখিতে। সময়ে উহারা অন্য কোনও ফাঁদ না পাতিয়া স্থানে স্থানে গর্ত্ত কাটিয়া রাখে —এতটা গভীর যে উহাতে জল চুয়াইয়া উঠে। অনবধান জীব-জন্তু উহাতে পড়িতে পারে, কিম্বা জলপান করিতেও কোন জন্তু আসিতে পারে ঐস্থানে। এইরূপ গর্ত্ত হয়ত ৫।৭ জায়গায় করা থাকে। যে দল উহার একটি গর্ত্তে অনুসন্ধানে গেল, তাহারা হয়ত একটা মহিষকে হুটোপাটি করিতে দেখিল সেখানে। এখন বন্য মহিষকে বন্দী করা ২।৩জনের কার্য্য নয়। তাই এই দল তখন সেই সংবাদ জানাইতে চেষ্টা করে দলের বাকি সকলকে অর্থাৎ অন্যান্য ক্ষুদে ক্ষুদে দলগুলিকে। সেই উদ্দেশ্যে এই দলের একজন গর্ত্তের পাশের নির্দ্দিষ্ট একটা বড় গাছে চড়িল। ঐ গাছটির মোটা একটা [illegible]

অংশ কুরিয়া উহাদের ঢাকের আকার করা হইয়াছে। লোকটি উহার হাতের বর্শার বাঁট বা লাঠি দ্বারা সেই ফাঁপা ডালের অংশটিতে ঘা দেয়। তাহার সেই ইসারা বুঝিয়া বনের অন্য অংশ হইতে অনুরূপে একটি গাছ হইতে জবাবস্বরূপে সাড়া আসে তেমনই শব্দে। উহা যেমন প্রথম সঙ্কেতকারীর নিকট জবাব, তেমনই আবার আরও দূরস্থ শিকারী দলের নিকট ফিরিয়া আসিবার সঙ্কেত।

আবার কোন কোন বন্য জাতির ভিতর সঙ্কেত-প্রেরণের বৃক্ষ ফাঁদ বা গর্ত্তের পাশে না রাখিয়া সারা বনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থানে করিয়া রাখা হয় এবং তাহা দলের সকল ব্যক্তির নিকটই জানিত থাকে। আকস্মিক বিপদ যে দিক হইতেই আসুক দলের কেহ না কেহ টের পাইবেই এবং বনমধ্যস্থ সমদূরবর্ত্তী সঙ্কেত বৃক্ষের একটি না একটি হইতে ইসারায় সে বিপদ জানাইয়া দিতে পারিবে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আতঙ্কের উদ্রেক হয় শ্বেতাঙ্গের চিত্তে যে শব্দে তাহা হইল আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির বনবাসী আদিম জাতীয়ের রণডঙ্কায়। ঐ ঢাকই আবার যখন শুধু দূরবর্ত্তী অঞ্চলে সংবাদ প্রেরণের জন্য বাজান হয়, তখন উহার বাজনা এতটা ভয়ঙ্কর থাকে না। যখন কোনও শত্রু-জাতি আক্রমণ করিতে আসে তখন এই ঢাকের সাহায্যেই দলবল একত্রিত করা হয়। এমনই রকমে আবার যখন কোন দুর্ব্বিপাকের আবির্ভাব আশঙ্কা করা হয়, যেমন বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুরন্ত জানোয়ারের প্রাদুর্ভাব, দাবাগ্নি প্রভৃতি, তখনও এই ঢাকের বিভিন্ন তাল এবং বোল দলের সকলকে সতর্ক করিয়া দেয়।

দৈনিক সংবাদপত্রের মতই ঢাকের আওয়াজ নিজ নিজ জাতির ভিতর মৃত্যু, সন্তান-জন্ম, বিবাহ কিম্বা কোন উৎসবের সংবাদ প্রচার করিয়া দেয়। সুসভ্য দেশে যেমন নিতান্ত ব্যক্তি-গত আদান-প্রদান চলে টেলিফোনের মারফত, তেমনই আদিম জাতির ভিতর কুশলপ্রশ্ন অথবা অবসরের আলাপ চলে ঢাকের বোলের আদান-প্রদান। এমনও দেখা যায় যে, দলপতি সাঙ্গোপাঙ্গে বিশেষ কার্য্যে লিপ্ত; একাধিক দিন হয়ত সে গৃহে প্রত্যাগমন করে নাই। বিশেষ কার্য্য সামাধা করিয়া দলপতি ঢাকের বাদ্যের সাহায্যে জানাইয়া দিল নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট যে, সে আসিতেছে এবং গৃহেই আহার গ্রহণ করিবে, সঙ্গে থাকিবে এত-সংখ্যক লোক।

ইহা ছাড়াও ঢাকের দ্বারা কলহ-কোন্দলও জাঁকাইয়া তোলা হয়। কারণ ঐ যন্ত্রটির এমন বোলও রহিয়াছে, যাহা দ্বারা গালাগালি পর্য্যন্ত বর্ষণ করা যায়। কাজেই বিপক্ষীয় কোন ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ প্রকাশে একজন ঢাকটি লইয়া তাহার ঝাল ঝাড়িতে থাকে অদ্ভুত বাদ্যে। বিপক্ষীয় ব্যক্তি আবার তাহার প্রত্যুত্তরে পাল্টা জবাব দিতে থাকে ঢাকের বিচিত্র বোল ফুটাইয়া। এই প্রকারে আবার কখনও একজনের সাহায্যার্থে দলের অন্যান্য আসিয়া যোগদান করে নিজ নিজ ঢাক লইয়া। বিপক্ষীয়ের বন্ধুবর্গও তখন পশ্চাৎপদ থাকে না। সেই সময়ে সারা অঞ্চল কাঁপাইয়া ঢাকের বোলে বচসা চলিতে থাকে আশ্চর্য্য রকমের।

টেলিগ্রাফের 'টরে-টক্কা'র মত ঢাকের বোলেরও রীতিমত 'ভাষা' রহিয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে হয়ত বিভিন্ন কায়দায় এবং বিভিন্ন শব্দ-তানে সে ভাষা প্রস্তুত। কিন্তু ব্যবহার উহার টেলিগ্রাফের মত একটা সাঙ্কেতিক অভিব্যক্তি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে।

যাঁহারা পল্লীগ্রামে ঢোলের বাদ্য শুনিয়াছেন বহুস্থানে, তাঁহারা জানেন ঢুলীরা মুখে বোল আওড়াইয়া তাহা ঢোলে বাজাইয়া শোনায়। আবার এমনও দেখা যায় যে শাদা কথা মুখে বলিয়া তাহাও ঢোলের শব্দে অনুকরণ করে, যেমন "দুর্গা দুর্গা" "বল মন কৃষ্ণ কথা" "ঠাকুর কর্ত্তা।" ঠিক এমনইভাবে

বিপদের সঙ্কেতদানের শিঙা ও 'বাওসে'র শঙ্খ

আদিম জাতীরো তাহাদের কথাভাষার অনেক শব্দকে ঢাকের শব্দে হুবহু নকল করিয়া কথোপকথনের একটা 'ভাষা' তৈরী করিয়া ফেলিয়াছে।

ভারতে এবং আশেপাশে যে সকল আদিম জাতি—তাহাদের ভিতর ঢাক প্রধান সম্বল থাকিলেও, শিঙা, শাঁখ, কাঁসর প্রভৃতির রেওয়াজ দীর্ঘকাল হইতে। এই সকল যন্ত্র হইতেও ৩।৪ রকম স্বতন্ত্র ধ্বনির সৃষ্টি করিয়া সঙ্কেতে মনোভাব, বিপদ-আপদ জ্ঞাপন সুন্দরভাবেই চলিয়া থাকে।

ইহাদের ভিতর যে ঢাক প্রচলিত তাহা যেমন স্থানভেদে বিভিন্ন আকারের তেমনই নির্ম্মাণের নিপুণতা ও উপাদানের বৈশিষ্টতাও যথেষ্ট। কোথাও হয়ত মাটির তৈরী নাগরা দামামা

প্রচলিত। কোথাও বা পাথর খুদিয়া বাটিপানা করিয়া উহাকে চামড়ায় মুড়িয়া ডঙ্কা তৈরী। কোথাও মাদল কোথাও ডুগ-ডুগির রেওয়াজ। কাঠের ঢাক চামড়ায় মুড়িয়া ব্যবহারই দেখা যাইবে বেশী। আর একটি অদ্ভুত জিনিষ ব্যবহার করা হয়, উহা হইল লাউয়ের 'বাওস'। লাউ শুকাইয়া ফাঁপা করিলে শক্ত খোসাটি চমৎকার কলসীর ন্যায় পাত্রে পরিণত হয়। উহা-দ্বারা প্রস্তুত একতারা প্রভৃতি যন্ত্র-সহযোগে বহু ভিক্ষুক গান করিয়া থাকে এদেশে। আদিম জাতীয়েরা এই 'বাওস' ৫।৭টি একত্রিত করিয়া এবং উহার খোলা মুখ পাতলা বৃক্ষ ত্বকে মুড়িয়া লয়। ৫।৭টি একত্র বাঁধা হইলে উহার উপর বাঁশের বাখারি কিম্বা পাতলা কাঠের পাটি কতকগুলি লম্বালম্বি করিয়া জুড়িয়া, তাহার উপর হাতুড়ির ঘায়ে গম্ গম্ শব্দে বাজাইয়া থাকে।

এই জাতীয় যন্ত্র মধ্য-আফ্রিকায়ও ব্যবহৃত হয় কোথাও কোথাও। কলসীর বদলে পানীয় রাখিবার জন্যও কাজে

ষাঁড়ের শিং দিয়া তৈরী শিঙা—দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু অঞ্চলে ব্যবহৃত

লাগান হয়। আবার অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন অঞ্চলে বাওসের বদলে মৃৎপাত্র এই প্রকারে মুড়িয়াও ৫।৭টি জুড়িয়া ঢাকের ন্যায় ব্যবহার করা হয়।

শিঙা সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে সকল দেশে গো-মহিষাদি জন্তুর বন্য-হিসাবেও অস্তিত্ব ছিল না, সে সকল দেশে শিঙার প্রচলন হয় নাই। ঢাকই তাহাদের সঙ্কেত জ্ঞাপনের একমাত্র যন্ত্র ছিল। এইজন্য আমেরিকার পেরু প্রভৃতি অঞ্চলে যে সকল আদিম জাতি সেকালে দেখা গিয়াছে, তাহাদের ভিতর শিঙার প্রচলন হয় নাই। কারণ, শিঙা প্রধানত প্রস্তুত হয় মহিষ বা বৃষের শিং হইতে। অভাবে অন্য জন্তুরও যেমন মোটা শিং পাওয়া গেলে তাহা হইতেও প্রস্তুত করা চলিত। আফ্রিকা ও আমেরিকার কোন কোন জাতি মাটী দ্বারাও শিঙা প্রস্তুত করিত। ভারতে মধ্যযুগেরও বহু পূর্ব্বে হইতে ধাতু নির্ম্মিত শিঙার প্রচলন হইয়াছিল। চীনদেশে কাষ্ঠের শিঙা, বিশেষ করিয়া লতাবিশেষের বক্রাগ্র লইয়া শিঙা প্রস্তুত বহুকাল চলিয়াছিল। তবে সেখানেও মাটির শিঙা অজানা ছিল না।

মেক্‌সিকোর য়্যাজটেক জাতি (যাহাদের বংশধর বলিয়া আধুনিক মেকসিকান্ গর্ব্ব বোধ করেন) যে ধাতু নির্ম্মিত বিরাট ঢাক ব্যবহার করিত অতীত যুগে তাহা ছিল প্রকাণ্ড একটি টবের মত—যাহার ভিতরে দাঁড়াইয়া বাদক উহার নিনাদে সারা মুলুক প্রতিধ্বনিত করিত। ইহাদের ভিতর শিঙার প্রচলন ছিল না, কিন্তু উহার স্থানে ব্যবহার করা হইত বিরাট আকারের শাঁখ, যাহাকে সচরাচর আমরা পঞ্চমুখী শঙ্খ বলিয়া থাকি।

শব্দ-সঙ্কেতের আর একটি উদাহরণ হইল—প্রস্তরের সাহায্যে ধ্বনি। যে সময়ে গোলা-বারুদের আবিষ্কার হইয়াছে, সে সময় হইতে তোপধ্বনি দ্বারা নানাপ্রকার ইঙ্গিত প্রকাশ প্রচলিত। কোথাও তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে হাউই ছুড়িয়াও সঙ্কেত জ্ঞাপন করা হয়। মধ্যযুগ হইতে পতাকা ও আলোক-দ্বারাও নানা সাঙ্কেতিক বাণী প্রচার হয়। কিন্তু আদিম জাতীয়েরা তোপধ্বনির পরিবর্ত্তে যে প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা প্রকৃতই আশ্চর্যজনক। উচ্চ ঢিবি বা পাহাড়ের চূড়ায় বড় বড় পাথরের চাংড়া লতায় জড়াইয়া খুঁটার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিত। পাহাড়ের যেদিক সবচেয়ে খাড়া, চূড়া হইতে সেই পার্শ্বে পাথরের চাংড়াগুলি আলগা করিয়া দেওয়া হইত লতা কাটিয়া। যে কয়টি ধ্বনি করা দরকার, ততটা চাংড়া ফেলা হইত। এইগুলির সগর্জ্জন পতনের শব্দ বহুদূর-দূরান্তর হইতে শোনা যাইত। কাজেই তোপধ্বনির ন্যায় সঙ্কেত উহা দ্বারা জ্ঞাপন করা সম্ভব হইত। আবার পাহাড়ের উপর বস্তি থাকিলে, উহাই ছিল তাহাদের বিপক্ষকে ঘায়েল করিবার প্রধান অস্ত্র।

ইহা ব্যতীত প্রকাণ্ড পাথরের চাংড়ায় পাথর বা ধাতুদণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়াও সঙ্কেত-বাণী প্রেরণ করা হইত। হিমালয়ের পাদদেশে কোন কোন জাতি আজিও এই প্রকার পাহাড়-চূড়ার নির্দ্দিষ্ট প্রস্তরে ঘা দিয়া বিপদ-আপদে দলবল জুটায়।

ঢাক বা জয়ঢাকের কার্য্য আর এক প্রকারে সারিয়া লওয়া হয়। দুই-আড়াই ইঞ্চি পুরু ও ১২।১৩ ইঞ্চি চওড়া তক্তা একখানি মাটিতে পোঁতা হয়। মাটির উপরে ৩।৪ ফুট পরি-মাণ জাগিয়া থাকে। উহার অগ্র ভাগ হইতে ২ ফুট কি আড়াই ফুট পর্য্যন্ত করাত দ্বারা চেরা হয় ৩।৪ স্থানে সমব্যবধানে—কিন্তু কাষ্ঠ খণ্ডগুলিকে বিচ্ছিন্ন বা ফাঁক করা হয় না। তক্তার এই চেরাস্থানে আঘাত করা হয় পাথর বা ধাতুদণ্ড দ্বারা। এই সঙ্কেতধ্বনিও বহুদূর পর্য্যন্ত প্রেরণ করা যায়।

দুরন্ত জানোয়ারদের ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে একপ্রকার ফিকির আজিও দেখা যায় পল্লী গ্রামে, যে সকল অঞ্চলে

হামেশাই শাঘভাল্লুক প্রভৃতি দুরন্তগুলোর প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে উহাকে বলা হয় 'ঠাটা'। গোটা বাঁশের ৩।৪ হাত লম্বা একটি টুকরো—উহার অগ্রভাগ খানিক দূর পর্যন্ত চেরা। ঐ চেরা অংশের একার্দ্ধ ধরিয়া ঝাঁকি দিলে, বিকট ঠক্ ঠক্ শব্দ হয়। এই ঠাটার ব্যবহার আসাম অঞ্চলের পাহাড়িয়াদের ভিতর ব্যাপক। উহা দ্বারা সংকেত-বাণী প্রেরণও খুব সহজ। কাজেই উহা উভয় প্রকার কার্যে লাগান হয়।

তিব্বতের লামাদের শিঙা: বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুর দ্বারা পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানের সূচনা জ্ঞাপন করা হয়

শব্দ দ্বারা সংকেত-জ্ঞাপনের পর অন্য যে প্রথা, তাহা হইল অগ্নিকুণ্ড সাহায্যে। নিবিড় অরণ্যের ভিতর কিম্বা যেখানে প্রাচীরের মত বহু উচ্চ পর্ব্বতমালা রহিয়াছে অন্তরায় সেখানে অগ্নির দ্বারা সংকেত দেখা যাইবার কথা নয়। তাই যে সকল অঞ্চলে প্রায় সমান উচ্চতার পাহাড় রহিয়াছে, কিম্বা যেখানে দিগন্ত বিস্তৃত কেবলই সমতল ক্ষেত্র সেখানেই অগ্নিকুণ্ড দ্বারা সংকেত করা হয়।

ভারতের প্রায় সকল পাহাড়িয়া মুল্লুকেই অগ্নিকুণ্ড দ্বারা বিপদাপদের ইসারা প্রদান এক প্রধান কৌশল। মুঘল আক্রমণ-কালে আরাবল্লী পর্ব্বতের চূড়ায় চূড়ায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আক্রমণ সংবাদ রাজপুতদিগের রাজধানীতে পৌঁছিতে কাল বিলম্ব হইত না। স্কটল্যাণ্ডেও বহুবার এই কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে অতীত যুগে।

উত্তর আমেরিকার আদিম জাতীয়েরা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দ্বারা সংকেতে নানা সংবাদ প্রেরণ করিত। আগুনের কুণ্ড জ্বালা হইল, বেশ জ্বলিয়া উঠিলে আগুনের শিখা নিভাইয়া প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি করা হইত এবং ভিজা কাঁথা বা বৃক্ষত্বকের বস্ত্র সাহায্যে ধোঁয়াকে নানা আকার দান করা হইত। স্তম্ভের আকারে লম্বা একটানা ধোঁয়া, পাকখাওয়া কুণ্ডলী, বিচ্ছিন্ন খণ্ডে পৃথক পৃথক কতকগুলি পর পর প্রেরণ—এই প্রকারে ধোঁয়ার রকমফের হইতেও নানাপ্রকার ইঙ্গিত প্রকাশ সম্ভব হইত। টেলিগ্রাফের ভাষা যেমন dot (বিন্দু) ও dash (রেখা)র বিভিন্ন প্রকার সমাবেশে নানা কথার সৃষ্টি হয়, ধোঁয়া-দ্বারাও সেই প্রকারের সাংকেতিক ভাষার সৃষ্টি করিয়া বহু দূরবর্ত্তী ব্যক্তির সহিত সংবাদ আদান-প্রদান চলিত।

রাত্রিকালে ধোঁয়ার পরিবর্ত্তে আগুনের শিখাদ্বারা সংকেত করা হইত। এই সময়ই ভিজা কাঁথার প্রয়োজন ছিল অত্যধিক। আগুনের শিখা উঁচু হইয়া উঠিল, ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহাকে ভিজা কাঁথা দ্বারা এমনভাবে ঘিরিয়া দেওয়া হইল যে, আর উহার লেশমাত্র আভাও দৃষ্টিগোচর হইবে না দূর হইতে। আবার শিখার উজ্জ্বলতার তারতম্য করিয়াও ইঙ্গিত সফল করা হইত।

যে সকল দেশে বর্ষা-বাদল বেশী, সেই সকল অঞ্চলে যে অগ্নিশিখা কিম্বা ধোঁয়া সংকেতের উপযোগী নয়, এই কথা আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। এই কারণেই অগ্নিশিখার রেওয়াজ ভারতের মধ্য ও পশ্চিম অংশে যেমন দেখা যায়, পূর্ব্ব অংশে তেমন দেখা যায় না। তৎপর সমতল ক্ষেত্রের অভাবও এক প্রধান কারণ। এই সকল অন্তরায়ের জন্য ঢাক-জয়ঢাক প্রভৃতির বাদ্যই সেই সকল মুলুকে প্রচলিত বেশী। দর্শন অপেক্ষা শ্রবণের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে বেশী।

তোপধ্বনির পরিবর্ত্তে কি কৌশল অবলম্বন করা হইত তাহার কথা বলা হইয়াছে। ঠিক তেমনই এক কৌশলে উহারা হাউই ছোড়ার কার্যটিও আরত্তে আনিয়াছে। গোলা-বারুদের আবিষ্কার না হওয়ায় উহারা হাউইয়ের গুণাগুণ জানিত না বটে, কিন্তু মহাশূন্যে উঠাইয়া কোনও সংকেত জ্ঞাপন করিলে যে উহা সমগ্র দেশবাসীর নজরে পড়িবে—এই জ্ঞান উহাদের ছিল পুরোপুরি। তাই উহারা জ্বলন্ত তীর নিক্ষেপ করিত আকাশের দিকে। তীরের মধ্যস্থলে কি গোড়ায় ন্যাকড়া জড়াইয়া তাহাতে ভারী কোন তেল মাখাইয়া আগুনে ধরান হইত; তারপর ঐটিকে ধনুকে জুড়িয়া ছোড়া হইত। ভারী তেলের অভাবে জ্বলিবার উপযোগী গাছের কস শুকাইয়া রাখা হইত ন্যাকড়ায় জড়াইয়া। এই প্রসঙ্গে বলা যায়,

কাঁঠালের কস দ্বারা মশাল তৈরী করিতে কোন কোন পল্লী-গ্রামে আজিও দেখা যায়।

বিশেষ করিয়া এই সঙ্কেতটি ছিল কোনও লুক্কায়িত দলকে আক্রমণের সুযোগ উপস্থিত এই সংবাদ দিতে অথবা প্রবল বিপক্ষের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিয়া পলায়নের উপদেশ দান করিতে। অবশ্য পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত যে কোন সঙ্কেতের জন্যই উহা ব্যবহার করা হইত।

আর একটি সঙ্কেত আদিম জাতীয়েরা কাজে লাগাইত। উহাকে উর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সূর্য্যরশ্মি মসৃণ কোনও পদার্থে প্রতিফলিত করিয়া উহা দ্বারা ইসারায় সংবাদ প্রেরণ। কাচ অবশ্য উহারা পাইত না, কিন্তু পালিশ চকমকি পাথর অথবা তামাকে ঘষিয়া পালিশ করিয়া উহারা এই কাজে ব্যবহার করিত।

নিকটবর্ত্তী স্থানে শব্দ প্রেরণ করিতে যে কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা হইত না বা এখনও করা হয় না, এমনও নয়। চীৎকার বহুদূরে পৌঁছাইবার জন্য মুখের দুইপাশে হাতের দুই চেটো বাটিপানা বক্র করিয়া কতকটা গ্রামোফোনের চোঙের আকার দেওয়া ত সাধারণ কায়দা এখনও দেখা যায়। তাহা ছাড়া হাতের চেটোদ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া এবং খুলিয়া পর্য্যায়ক্রমে শব্দ বাহির করা হইত। অথবা মুখের সম্মুখে হাতের চেটো বা আঙ্গুল নাড়িয়া স্বরে একটা কম্পনের সৃষ্টি করা হইত। ডাকাতের দলের সর্দ্দারগণ যে প্রকারে হাঁক দিত বলিয়া কথিত হয়।

শেষ কথা হইল আকারে ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ। যতদিন উহারা নিজ নিজ গণ্ডীতে নিরালা জীবনযাপন করিত ততদিন উহার কোনই প্রয়োজনীতা হয় নাই। কিন্তু যখনই অন্য জাতীয়ের সহিত সাক্ষাৎ মিলিয়াছে, তখন ইসারায় ভিন্ন মনোভাব জ্ঞাপনের আর উপায় ছিল না। এইজন্য আদিম জাতীয়েরা যে প্রকার সুকৌশলে হস্তপদ ও বদনমণ্ডলের নানা ভঙ্গী ও সঞ্চালনে মনের কথা বুঝাইতে পারে, সুসভ্যজনেরা কখনই সেই প্রকার পারিবে না।

জাগাও

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

এক মুষ্টি অন্ন তরে যাহারা বাড়ায়ে থাকে হাত,
তাহাদের মুক্ত কর ধরা হতে হে জগৎনাথ।
যে দারিদ্র্য মহাপাপ অপরাধ চলেছে বাড়ায়ে,
তাহাকে বরণ করে উহারাই চলেছে আগায়ে।
নিজেদের সত্তা ওরা ভুলে গেছে,—আছে জড় হয়ে,
অমঙ্গল যাহা কিছু ধরায় আনিছে ওরা বয়ে।

দেখেছি ওদের—ওরা আবর্জ্জনা হতে খাদ্য বাছে,
দেখেছি ওদের—ওরা যেতে ধনীদের আগে পাছে।
শৃগাল কুকুর সাথে করে দ্বন্দ্ব আহার্য্য লাগিয়া,
অতি ক্ষুদ্র দান লভি পরিপূর্ণ হয় ক্ষুদ্র হিয়া।
যুগ যুগান্তের স্মৃতি বংশধরে ওরা রেখে যায়,
আশে পাশে রহে ওরা—অতি দীন, অতি অসহায়।

পথপার্শ্বে বৃক্ষতলে গড়ে নেয় নিজেদের স্থান,
উদরে অনন্ত ক্ষুধা সমস্তার মনে অপমান।
ইহারা হারায় প্রাণ ধনীদের চাকার তলায়,
কে জানিবে সে বারতা,—চিহ্ন কিছু রহে না ধরায়।
কেবল গণনা কালে জানা যায়,—নাম কিছু নাই,
কেন এরা বেঁচে থাকে,—ভগবান, তোমারে সুধাই।

ধরণীর আবর্জ্জনা,—সমব্যথা পায় না যাহারা,
বেঁচে থেকে মরে থাকে, সমাজের বহু দূরে তারা;
কাতর প্রার্থনা বাণী শুধু যাহাদের মুখে ফুটে,
বুদ্বুদের মত তারা মুহূর্ত্তের তরে জেগে ওঠে,
কেন বেঁচে থাকে ওরা এই হীন দীনতা বরিয়া,
দয়াময়, কহ—কেন, ইহাদের রেখেছ বাঁধিয়া?

দাও শক্তি জাগাইয়া,—যে শক্তি ঘুমায়ে রহিয়াছে,
দাও দৃষ্টি—দেখে যেন কিবা আছে আগে আর পাছে।
যে অন্ন ধনীর তরে, আছে তাতে সম অধিকার
মানুষ সে—নয় ঘৃণ্য, শ্রেষ্ঠতম রচনা ধাতার।
কেন করে আত্মদান ধনীর রথের চক্রতলে,
অন্যায় পীড়নে মৃত্যু নহে বিধিলিপি—দাও বলে।

দাও শক্তি, দাও জ্ঞান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াব
সত্য ন্যায্য অধিকার মানুষের মাঝে ফিরে পাব
একই গৃহতলে ধনী, দরিদ্র লভিবে যবে স্থান,
সেই শক্তি লভিবারে ইচ্ছা দাও ওগো ভগবান।
মিথ্যা হয়ে যাক মিথ্যা এই ধনী দরিদ্রের জ্ঞান,
সত্য কর, পূর্ণ কর মানুষেরে তুমি ভগবান।

একফালি স্বর্গ

(গল্প)

শ্রীসুকুমার মজুমদার

ছাদহীন ছোট্ট উড়োজাহাজটিতে চেপে হৃদয় যখন উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল শন্‌শন্‌ করে, তখন আকাশটা ছাই রঙের ইস্পাতের পাতে মোড়া। হৃদয়ের সিটের চারপাশে তারের জাল—আরও কত কি!

হৃদয়ের স্বস্তি নেই। হাতে তার ছেনি আর হাতুড়ি। ইস্পাতে মোড়া আকাশটাকে হাতের কাছে পেয়ে, তারই চাকলা চাকলা ছেনি দিয়ে কেটে ফেলে দিচ্ছিল তলায়—একেবারে রসাতলে। আকাশের গায়ে বেশ বড়সড় একটা ফুটো করে তার বিমানসমেত সে ঢুকে গেল ভিতরে।—আঃ কি সুন্দর!

কেবল তারার রাজ্য সেটা। মাঝে মাঝে ধূমকেতু, নানা আকারের গ্রহ উপগ্রহ। হৃদয়ের হাতের ছেনি কখনও বিনা কাজে স্তব্ধ থাকতে পারে না। এপাশে ওপাশে দূরে দূরে রয়েছে সব জ্যোতিষ্ক। হঠাৎ একটা তারাকে হাতের কাছে পেয়ে সে তার ছেনির ধার পরীক্ষা করতে লেগে গেল। এক ঘা—দুই ঘা—তিন ঘা! অমনি বিপুল এক প্রলয় গর্জনে স্বর্গ মর্ত রসাতল থরহরি কম্পিত করে—উল্কা এক টুক্‌রা পাত হ'ল, ঠিক যেন দশ হাজার শয়তান একসঙ্গে ছুটেছে সৃষ্টি তোলপাড় করতে।

হৃদয়ের মনটা খুশীতে ভরে ওঠে—যাক্‌ তবু দিনের কাজ কিছুটা সারা হ'ল। আরও বেশী তৃপ্তি এল এমনো যে—সে বিপুল শক্তিশালী, সারা আকাশ জুড়ে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে একটা ওলট্‌পালটের প্রলয় আনা তার কাছে অতি সহজ ব্যাপার। একটা গ্রহের গায়ে ছেনি ঠেকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে কসে হাতুড়ির ঘা দিতে তার ভারি আরাম লাগে; তার পর এন্তার্ ঘা চালিয়ে যতক্ষণে না গ্রহটা টুক্‌রা টুক্‌রা হয় হৃদয়ের হাত থামবার নাম করে না। সেই ঠকাঠক শব্দ যত ঘোর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়, হৃদয় ভাবে সেও একটা নেহাৎ কেউকেটা নয়—জবরদস্ত গোছেরই একটা ব্যক্তি।

এমন সময় কে যেন তার বাঁ কাঁধে ভর দিয়ে গা ঘেঁসে বস্‌ল বিমানে। "আঃ রাসমণি—রাসী এসেছিস্‌! এ ত টেরই পাইনি। ভয় করছে বুঝি? কিছু ভয় নেই, আমায় শক্ত করে ধরে বসে থাক্‌।" হৃদয় খুশীই হয়, তার কাণ্ড-কারখানা দেখে রাসীটা নিশ্চয় নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করবে —হৃদয়ের গৌরবে গর্বিতই হবে মনে মনে। এমন একটি ওস্তাদ মিস্ত্রির নিপুণতা দেখে সে দেবতাকে ধন্যবাদ দেবে যে, হৃদয় মিস্ত্রির প্রতি অনুরক্ত হবার সুবুদ্ধি দেবতা তাকে দিয়েছিল।

হৃদয় হয়ত যেটুকু কাজ করা দরকার তার চেয়ে বেশীই করে যাচ্ছিল এবং যতটুকু আওয়াজ সৃষ্টি নিতান্তই প্রয়োজন তার চেয়েও ঢের বেশী কলরোলের উদ্ভব করছিল—শুধু রাসীর তাক্‌ লাগাবার জন্যে। যখন কোন বিকট শব্দে রাসমণি চমকে ওঠে, হৃদয় মুচ্‌কি হাসে; কোন তারকার ধাঁধানো তীব্র ছটায় যখন রাসমণি চোখ ঢাকে, হৃদয় তার পিঠে হাত বুলিয়ে আশ্বাস দেয়। এই নিবিড় মহাশূন্যে তারার মালার মাঝখানে বিমানে বসে রাসমণিকে দেখাচ্ছিল অতি সুন্দর—মিশকালো চুলের গোছা, পরণে গোলাপী শাড়ী, কানে দুল্‌ছে দুটি দুল ঠিক একজোড়া তারার মত—রাসমণি বড় সুন্দর।

"তোমায় হুবহু আকাশ-পরীর মত দেখাচ্ছে রাসী" বলেই হৃদয় হেসে উঠ্‌ল, কারণ সত্যই ত রাসী এখন আকাশ-পরী। কিন্তু বিমানের ঘর্ঘর শব্দে রাসমণি শুন্‌তে পায় না কিছু। সে মুখখানি তুলে ধরে হৃদয়ের মুখের কাছে, মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। হৃদয়ের হাসির জবাবে সেও হাসে —সে হাসির জাদু হৃদয়কে দিশেহারা করে ফেলে।

মাঝে মাঝে রাসমণি হৃদয়ের বাহু ধরে চাপ দেয়; কথা যখন শোনা যায় না বিমানের ঘর্ঘরে, তখন ইসারা-ইঙ্গিত ছাড়া উপায় কি! হৃদয় বোঝে সে ইসারা—রাসমণি এখন হাতের কাজ থামিয়ে ফিরে যেতে বল্‌ছে। সেও ইসারায় জানায় আর বেশী দেরী নেই। হৃদয় এখানে জমাট হাওয়া কেটে খান্‌ খান্‌ কর্‌ছে। স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছে কপোলে ললাটে। রাসমণি গোলাপী শাড়ীর আঁচলখানি দিয়ে কোমল পরশে মুছিয়ে দেয়। পুলক স্পন্দনে হৃদয়ের যেন ঘুমের ঢুল আসতে চায়। রাসমণির কানের দুল একটি হৃদয়ের বাঁ কাঁধে সুড়সুড়ি দেয়, রাসমণির আঙ্গুল ক'টা হৃদয়ের চুলের ভিতর খেলা করে। হৃদয়ের ভারী ইচ্ছা হয় এখন হতচ্ছাড়া নবীনটা দেখুক এসে রাসমণি সত্যি সত্যি কার অনুরাগে মুগ্ধ। রাসমণি আবার কখন ভয়ে হৃদয়ের বাহু আঁকড়ে ধরে —হৃদয় হাত শক্ত করে "সামলা" বলিয়ে থাকে। রাসমণি টের পেলেই ভেঙ্‌চে ওঠে, হৃদয়ও পাল্টা মুখ ভেঙচায়।

হৃদয় ভাবে—যাক্‌, এইবার যাওয়া যাক্‌। আর কেন যথেষ্ট বাহাদুরী দেখান হয়েছে। এমন সময় কোথা হতে যেন তারই নাম ধরে আহ্বান আসে। তবে কি নবীনও উঠে এল এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। হৃদয় তার ছাদহীন বিমানে দাঁড়িয়ে যায় চারদিকে নজর বুলাতে। না—নেই তো আশপাশে কোথাও। নীচে থেকে উঠে আসছে বুঝি। হৃদয় বিমানের তারগুলো ধরে ঝুঁকে পড়ে নীচু দিকে তাকাতে। একটা ধূমকেতু শাঁ করে বেরিয়ে যায় তার কাঁধের ওপর দিয়ে। চম্‌কে লাফিয়ে উঠে হৃদয় আর টাল সামলাতে পারে না— ডিগবাজি খেয়ে পড়তে থাকে মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে। সে যেন বায়ুসাগরে ডুব দিয়েছে—আকাশটা ঝাপ্‌সা হয়ে যায় ক্রমে, তারার মালা আব্‌ছা আলোয় মিট্‌মিট্‌ করে, বিমানে বসা প্রণয়িনী রাসমণির মূর্তি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। আর এদিকে ঐ নীচু রসাতল থেকে মাটির ধরা ছুটে আসে তাকে টেনে নিয়ে নিজ অঙ্কে স্থান দিতে।

সারাদেহের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে মাথায় এসে ভর করে; পেটটা ওঠে ফুলে; দুপাশে ছুটে পালায় কত কি, সে আঁক্‌ড়ে ধরে, মুঠোয় তার বাষ্প আকারে মেঘ শুধু পায় সে— অবলম্বনহীন। হৃদয় পড়্‌ছে পড়ছে, কতবার খেল ডিগবাজি, ওরই মাঝে অতি কষ্টে উৎসুক দৃষ্টি মেলে ধরে তাকায় আকাশের দিকে—রাসমণিকে দেখায় বিন্দু একটির মত। হায় হায় রাসমণিকে সে হারাল চিরতরে। রাসমণি ত বিমান চালাতে জানে না!

বিষম আতঙ্কে হৃদয় চোখ দুটি বুজে থাকে। মাটিতে

আছড়ে পড়ার দৃশ্য সে দেখতে পারবে না..................

তার মনে হ'ল সে যেন যুগ যুগ ধরেই পড়ছে নীচে—মাটির ঘা আর লাগে না। সর্ব শরীর তার কাঁপছে, ঘামে সে নেয়ে উঠেছে—ব্যাপার কি! সাহস করে চোখ মেলে ধরতেই দেখে—শুয়ে আছে বিছানায়। তবু কিছুক্ষণ সে আর আঙুলটিও নড়াতে পারে না। মাথা থেকেও এ বিভীষিকা-পূর্ণ স্বপ্নটা ঝেড়ে ফেলতে পারে না। তার মনে এল টেকো ঈশানের কথা: ঈশান বুড়ো রাতে ঘুমের ঘোরে চীৎকার করে উঠেছিল যে, দুটো পা-ই তার নেই। তার স্ত্রী বলেছিল—হল্লা কর কেন! পা-দুটো তোমার ঘুমুচ্ছে। কিন্তু পরদিন লোহার কড়ি চাপা পড়ে বেচারীর ডান পায়ের আঙুল কটা কেটে যায়। বাকী জীবনের মত খুঁড়িয়েই চলতে হয় তাকে।

পুরুতে ঠাকুরকে স্বপ্নের কথাটা বলতেই গম্ভীরভাবে পুরুত বলল—ওসব আকাশ-পরীদের কারসাজি—চাঁদের আলো বয়ে ওরা জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকে আর অঘটন ঘটায়। জানালা খুলে কখনও শুতে নেই জ্যোৎস্না রাতে। রাসমণিকে একথা যখন হৃদয় বললে—রাসমণি বললে—ধোৎ, ন্যাকামি করতে হবে না আমার কাছে। 'মাল' টেনে খানা-খন্দে পড়ে থাকবে আর খোয়াব দেখবে রাজা হবার! ও নেশা না ছাড়লে কথাই বলব না আমি তোর সঙ্গে। রকম দেখ না হতভাগার!

বস্তির কে না জানে রাসমণির মন পাবার জন্যে হৃদয় আর নবীনে আড়াআড়ি। আবার ওস্তাগার অর্থাৎ প্রধান মিস্ত্রির অধীনে তারা কাজ করে, সে এদের রেষারেষির সুযোগ নিয়ে দ্বিগুণ কাজ আদায় করে—দুজনায় পাল্লা দিয়ে। ওরাও একে অপরের চেয়ে বেশী কাজ করে বাহাদুরী নেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। আড়াআড়িতে প্রাণ দেবে তবু অন্যকে কাজে এগিয়ে যেতে দেখতে পারবে না।

নবীন অবশ্য হৃদয়ের মত বলিষ্ঠ নয়; কিন্তু সে যেমন একগুঁয়ে তেমনি কষ্টসহিষ্ণু, দেহের বলে সে যা না পারে মনের বলে তাতে জোঁকের মত লেগে থাকে। কিন্তু প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নবীনের একটা সুবিধা ছিল। রাসী আর নবীন একই গাঁ থেকে এসেছে, তার কথা বুঝতে রাসীর বেগ পেতে হয় না। কিন্তু হৃদয় এসেছে পূব রাজ্যের এমন এক গাঁ থেকে যার কথার অনেকটাই রাসী বুঝতে পারে না। বস্তির সকলে বলাবলি করে নবীনের ও একটা মস্ত দাবী। মেয়েদের সময়ে প্রাণটা কাঁদে পেছনে ফেলে আসা গ্রামখানির জন্যে। তখন নিজের গাঁয়ের চির অভ্যস্ত বুলি শুনলেও মনটা ঠাণ্ডা হয়।

তাই যখনই রাসী আর নবীন গেঁয়ো বুকনীতে কথা বলে, হৃদয়ের হৃদয়ে লাগে দুরন্ত দোলা। আবার ও-রকম কথা বলেই তারা তৃপ্ত থাকে না, হাসেও, আর ফিরে ফিরে তাকায় হৃদয়ের দিকে যেন বুঝিয়ে দিতে যে সে নিতান্তই তাদের দুটির গণ্ডীর বাহিরে। তখন আর হৃদয়ের মাথার ঠিক থাকে না। এতটা রুখে ওঠে যে ভয়ে ভয়ে রাসী নবীনকে বিদায় দিয়ে হৃদয়ের কাছে চলে আসে।

কিন্তু রাসমণি এমনি সেয়ানা, তার হাবভাবে বোলচালে কোথাও ধরা দেয় না কার পক্ষপাতিনী সে বেশী। একদিন যদি রবিবার পেয়ে নবীনের সঙ্গে যায় কালীঘাটে আর নবীন উপহার দেয় সুন্দর একজোড়া কাচের চুড়ী; তার পরের রবিবার সে হৃদয়ের সঙ্গে যাবে পরেশনাথের মন্দির দেখতে আর জুলুম করে কুলপী বরফ খেতে।

হৃদয় অনেকদিন রাসমণির মার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে। কিন্তু রাসীর মা নানা অজুহাতে পাকা কথা দেয়নি। হৃদয়ও দমে যায় না, শেষ একদিন বিষম পীড়াপীড়ি করে ধরলে। সেদিন মা বলল—মেয়ের আমার তেমন মন নেই মনে হচ্ছে এ বিয়েতে। তাকে আগে রাজি করাও। আর কি কথা আছে, হৃদয় গিয়ে রাসীকে লাগাল কসে দু ধমক; কথা তাকে দিতে হবে বিয়ের আজই। ধমক দিলে হবে কি, রাসমণি হৃদয়কে ভাল রকমই চেনে। সে বললে—আজ নয়, কাল বলব। হৃদয় তাতেই আশ্বস্ত হ'ল, কারণ তার হিসেব করা ছিল—পরের দিন রবিবার, আর ঐদিনে রাসীকে সিনেমায় নিয়ে যাবার কথা তারই। খুশীমনে হৃদয় আপন ডেরায় ফিরে গেল।

সোমবার সকাল বেলা মিস্ত্রি মজুর—সবাই কাজে লেগে গেছে। কিন্তু একটা রহস্যময় আবহাওয়ার আমেজ চারিদিকে। যেন ভাবী ঝটিকার পূর্ব মুহূর্তের নীরবতা ছমছম করছে আকাশে বাতাসে। কাজ করছে বটে সবাই, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তারা কি দেখতে যেন আকুল কৌতূহল নিয়ে চোখ মেলে ধরছে যেখানে হৃদয় আর নবীন কাজ করছে। কারও আর জানতে বাকি নেই যে, গত রবিবারে রাসীকে সিনেমায় নেবার পালা হৃদয়ের থাকলেও, রাসীর দেখা পায়নি হৃদয় সারাটি দিন ধরে। একথাও সবাই জানতে পেরেছে যে, রাসী গিয়েছিল সিনেমায় কিন্তু নবীনের সঙ্গেই। সে সুযোগ পেয়ে নবীন তার স্যাঙাৎদের জানিয়েছে, এবার থেকে হৃদয়ের আর কোন স্থানই হবে না রাসীর কাছে।

সবাই সচকিত—কখন কি হয়। কারণ হৃদয় এ ব্যাপার নিয়ে হাঙ্গামা একটা বাধাবেই। নীরবে বরদাস্ত করবার মত মেজাজই তার নয়। এদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী যুগল উন্মত্তের মত কাজ করে যাচ্ছে। তেতলা একটা বাড়ী তৈরী হচ্ছে—তারই লোহার কড়ি দিয়ে কাঠামো গড়বার কাজ প্রায় সারা—সেই তেতলা সমান উঁচুতে বল্টু আঁটা, রিভেট করা আজই শেষ করা চাই, ফোরম্যানের হুকুম। কাজে মন ঢেলে দিয়েছে দুজনে—কথা বলেনা একটিও—তাদের দুজনের ভিতর ত নয়ই, অন্যের সঙ্গেও না।

এমনি করে বেলা হ'ল দুপুর। এবারে তাদের খাবার জন্য বিশ্রাম আধ ঘণ্টা। সারাদিন ধরে চলবে কাজ, সময় নষ্ট করা হবে না বৃথা, তাই বস্তিতে যেতে পাবে না খেতে। সেই উঁচু ভারা থেকে নেবে আসে। যে যার খাবারের পুঁটলি নিয়ে বসে ঠ্যাং ছড়িয়ে। হৃদয় নিয়ে বসে মোটা মোটা রুটি চারখানা

আর কিছুটা চচ্চড়ি। এক টুকরা আধসিদ্ধ আলু কি শক্ত! ফস্ করে সেটা ঈশানের টেকো মাথায় টিপে ভেঙে নিয়ে ফেলে দেয় হৃদয়। ঈশান জ্বলে উঠে হৈ চৈ সুরু করে। এ হৃদয়ের নিত্যকার মস্করা। যা হোক করে টেকো ঈশানকে চটান চাই।

খেতে খেতে হৃদয়ের হুঁস হয়—চচ্চড়িতে নুন যেন নেই। —হেই তেমুদের কারু কাছে নুন আছে? ঈশান রুখে ওঠে —নুন না সন্দেশ এনে রেখেছি বাবুর জন্যে। হৃদয় হেসে ওঠে। নবীনের কাছে ছিল নুন, নিজের যা লাগবে রেখে বাকীটা কাগজের পুরিয়া করে ছুড়ে দিলে। পুরিয়াটা হৃদয়ের হাতের কাছে পৌঁছাল না, পায়ের ওপর পড়ে ছড়িয়ে গেল। আর যাবে কোথা! হৃদয় তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে একখানা ইঁট কুড়িয়ে নিল। কি ভেবেছিস্ ভূত কোথাকার? পাজি, শয়তান ইয়ারকি বার করে দিচ্ছি মাথার ঘিলু সমেত—

রাগে কাঁপতে থাকে হৃদয়। নবীন হতভম্ব। ইচ্ছে করে এ কাণ্ড সে বাধায়নি। তার মুখে চোখে অনুতাপের ছাপ। হাজার হোক মনটা তার শাদা। ঈশান দেখে ব্যাপার সাঙিন্। ত্রুটির অনুপাতে হাঙ্গামাটা হতে যাচ্ছে নেহাৎ বেপরিমাণ। —কি করিস্ হৃদে! সামান্য একটা খুঁত নিয়ে বাড়াবাড়ি ভাল নয়। রাসী কি বল্‌বে বল্ ত!

মীমাংসার নিরিখে কথাকয়টা কিছুই নয়। কিন্তু হৃদয় যেন কতকটা লজ্জিতের মত হয়েই থপ্ করে বসে পড়লো। সত্যই তো, যদি রাসী নবীনকে বেছেই নিয়ে থাকে, তবে তো আর হাত তোলা যায় না ওর ওপর। হয়ত রাসীর প্রাণে আঘাত লাগবে। এমনই কত কি ভেবে চুপচাপ বসে হৃদয় আপন খাবারে মন দিল।

খাবারের পর আবার নিদারুণ তোড়ে কাজ চলেছে। শেষ কড়িটা বাকি। এটা শেষ করতে হবে আজ, দুমাথা থেকে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে। একদিকে গেল ঈশান আর হৃদয়। অন্যদিকে টেনু আর নবীন। হৃদয়ের যেন কি হয়েছে, নেহাৎ আনাড়ীর মত উবু হয়ে ভারার মাচা ধরে আস্তে আস্তে সে যায় কড়ির এক মাথায়। ঈশান হাসি আর চাপ্‌তে পারে না—খাটিয়া একখানা এনে দেব নাকি হৃদে দাত! হৃদয় কথা কয় না। হাত দিয়ে ইসারা করে সরঞ্জাম এগিয়ে দিতে।

ঈশান আর হৃদয় খটাখট বল্টু আঁটছে। ওদের ঝুড়িতে আর বল্টু নেই। ফোরম্যানকে বলে বল্টু পাঠাতে। ততক্ষণ নবীনের কাছে চায় ঈশান বল্টু। নবীন ছুড়ে দেয় কয়টা—কিন্তু তা আধপথে এড়ো কড়িটির গায়ে ঠেকে থাকে। হৃদয় গর্জে ওঠে চোক রাঙিয়ে—লোফালুফি খেলা হচ্ছে শুয়োর? দে এগিয়ে হাতে।

—আমি তোর চাকর-নফর কি-না।

—তবে রে হারামজাদা!

উত্তেজনায় হৃদয় ঘাড়ে পড়ে আর কি! তখনই নীচু থেকে ফোরম্যানের হুকুম ভেসে আসে—দে না বাপু এগিয়ে। কথা কাটাকাটি করে মিছে সময় নষ্ট, আর কাজ মাটি করিস কেন।

নবীন নাচার হয়ে এগিয়ে দেয়। হৃদয়ের গর্বের হাসি লক্ষ্য করে নবীনেরও রাগ হয়। নবীন কথা বল্‌তে বেজায় অপটু, বুদ্ধিও একটু মোটা ধরণের। তাই বলে ওঠে—

মুখের জোরে মেয়েমানুষের মন ভুলান যায়—তাকে বিয়েতেও রাজি করান যায়। কিন্তু এমন নবাবী মেজাজ নিয়ে ধরে রাখা যায় না বেশী দিন। রাসীকে বিয়ে করছিস্ বটে, তোদের ছাড়াছাড়ি হ'ল বলে। বলেই নবীন বল্টু কটা দিয়ে ফিরে যায়।

বড় বড় চোখ করে হৃদয় তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। বলে কি এ! ওঃ এজন্যই রাসী কাল ওকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিল চিরবিদায় নিতে। হৃদয়ের বুকটা হাল্‌কা হয়ে যায়, মুখে ফুটে ওঠে হাসিরেখা। ইচ্ছে হয় এখনি নবীনের হাত ধরে ক্ষমা চায়।

খটাখট্ পটাপট্। কাজ আর কাজ। কথা কইবার ফুরসৎ কোথায়। ভাব্‌বারইবা অবকাশ থাক্‌বে কেমন করে। অবশেষে কড়ির ওমাথাটা জোড়া হয়ে যায়, নবীনের কাজ তখনও ঢের বাকি। উল্লাসে দিশেহারা হৃদয় উঠে দাঁড়ায় মাচার ওপর। কেমন করে সরু তক্তা যায় ফাঁক হয়ে আর সে ফাঁকে গলিয়ে মাথা নীচু পা উপরে হয়ে পড়ে যায় হৃদয়। কিন্তু এতকাল মিস্ত্রিগিরি সে বৃথায় করে নি। উপস্থিত বুদ্ধি তার কম নয়। সে অবস্থায় একমাত্র উপায় বাঁচবার—দুপায়ে মাচার তক্তা আঁকড়ে থাকা। হৃদয় তা-ই করলে। শুধু দুপায়ের কয়টা আঙ্গুলের অবলম্বনে ঝুলছে সে, মাথাটা নীচু দিকে। চারিদিকে চেচাঁমিচি উঠ্‌লো—গেল! গেল! এখান থেকে পড়লে আর হৃদয়ের একটি অস্থিও অভগ্ন থাক্‌বে না।

সবাই হতভম্ব। কেবল বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র কাজ করলো নবীন। হাঁ নবীন—সে-ই সরঞ্জাম তোলা ঝুড়িটা দড়ি বেঁধে নীচের মাচায় নিয়ে গিয়ে টেনু আর ঈশানকে ডেকে সে ঝুড়ি বাগিয়ে ধরতে বল্‌লে হৃদয়ের মাথার নীচে। তারপর উপরের মাচার সেই ফাঁক হওয়া তক্তা বেয়ে গেল একেবারে হাল্‌কা পায়ে কাঠবিড়ালীর মত, হৃদয়ের পা চেপে ধরতে।

হৃদয়ের কেবলই মনে পড়ে নবীনের রক্তরাঙা দুচোখ যখন সে বল্টু এগিয়ে দেয়। তার মনে হ'ল, তক্তা ফাঁক দৈবাৎ হয় নি, একই মাচায় বসে কাজ করছে, নিশ্চয় নবীনের ষড়যন্ত্র হৃদয়ের ওপর প্রতিশোধ নেবার। ও-ই মতলব করে তক্তা সরিয়ে রেখেছিল। এ না হয়ে যায় না। তাই যখন সে মরণ-দোলায় ঝুলে ঝুলে দেখলো, নবীনই আস্‌ছে উপর মাচা বেয়ে, আবার কুমতলব নিয়েই নিশ্চয় আস্‌ছে, হৃদয়কে শেষ করে রাসীকে বিয়ে করবার লোভে। চাঁচিয়ে নিয়ে হৃদয় আপ্রাণ চেষ্টায় চেঁচালো—"আমার কাছে ওকে আস্‌তে দিও না", "ও যেন আমায় ছোঁয় না"। কিন্তু নবীন সে-শত চীৎকার অগ্রাহ্য করে হৃদয়ের দুটি পা চেপে ধরলো—এড়ো কড়িকাঠে আর মাচায় দেহ উবুড় করে দিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে নাবিয়ে দিলে হৃদয়ের দেহটিকে ঈশান আর টেনুর ধরা ঝুড়ির উপর।

ঝুড়িশুদ্ধ হৃদয়কে নীচে নাবিয়ে নিয়ে এল এরা তিনজনে মিলে। হৃদয় ঝুড়িতেই বসে রইল দম নেবার জন্য। যখন কথা বলবার শক্তি হ'ল, বল্‌লে—ভাই নবীন, আমায় মাফ কর। ভগবান তোকে—

বাধা দেয় নবীন, অল্পবুদ্ধি নবীন অদ্ভুত হাসির সঙ্গে বলে ফেলে—আমায় তারিফ্ করতে হবে না। তোর জন্যে তো এ কাজ করিনি।

হৃদয় এতক্ষণে উঠে দাঁড়ায়, নবীনের হাত ধরে বলে—ভাই, সত্যি আমি একটা গাধা।

—নিশ্চয়।

—তার চেয়েও বেশী, আমি একটা কাঠ-গোঁয়ার।

—নিশ্চয়, কাঠ-গোঁয়ার। মনে রাখিস্ একটা কাঠ-গোঁয়ারের কাছে কোনো নারীই মিলনের স্বর্গ পায় না—একফালি স্বর্গ শুধু। তার আবার উল্টো পিঠ রয়েছে বুঝলি!

—বুঝিনি, খুব বুঝেছি। আজ কিন্তু তোর যেতে হবে আমার সঙ্গে কেরামতের তাড়ির আড্ডায়—যত চাস—

—ধোৎ পাজি! রাসীর কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলি। নেশা করতে যে মানা—আমার যাবার না হয় কারণ আছে, তুই যাবি কি করে!

হৃদয় ছুটে গিয়ে নবীনকে জড়িয়ে ধরলো—ঠিক কথা মনে করে দিয়েছিস্ ভাই।

ঝড়

(১)

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আসে ঝড় ওই আসে,
আসে বিপ্লব, লণ্ড ভণ্ড করি রুদ্র উল্লাসে।
মহাসমুদ্র করি উত্তাল,
রোধি মহাকাল দিয়া শরজাল,
ভীম হুঙ্কারে আসিছে বেতাল
ধরণী কাঁপিছে ত্রাসে।
তাল তমালের ভাঙিয়া পড়ে শির
লুণ্ঠিত দেহ বনস্পতির,
চারু জনপদ ঝলসিয়া যায়
বাসুকীর নিঃশ্বাসে।

২

আসে প্রলয়ঙ্কর।
উদ্ধত ধ্বজ বিজয় রথের শব্দ যায় ঘর্ঘর
আসে হূণ ওই আসে ভান্ডাল
আসিছে আর্য, আসে চণ্ডাল
ওই নির্ভীক আসিতেছে গ্রীক
বিপুল শক্তিধর।
ওই ঝড় আসি ভাঙে সোমনাথ
চিতোরের গড় করে ধূলিসাৎ
কাশী সারনাথ নালন্দা মঠ
করে ফেলে জর্জর।

৩

আসিছে যুগান্তর
শত বিচিত্র বাহিত্রে ভরি নব নব বন্দর।
রচিয়া ঘূর্ণী, শত আবর্ত
করি আলোড়ন স্বর্গ মর্ত্য,
মন্থন শেষে আসে অমৃত
আসিতেছে সুন্দর।
জগৎ জুড়িয়া আসিছে সৌখ্য
একই হৃদয় একই লক্ষ্য
দেবতার সনে কাছাকাছি হবে
ধরণীর নারী নর।

তুমি এসেছিলে যবে

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি এসেছিলে যবে,
অগোচরে মম জেগেছিলো প্রাণ সঙ্গীত-গৌরবে!
মালতী লতায় পাতায় পাতায় যে শোভা দেখেছি চেয়ে
আমার মনের গোপন কোণের আড়ালে তা ছিল ছেয়ে,
প্রহর শেষের ধূসর আলোয় খোলা জানালার পাশে,
কতো যে সন্ধ্যা ম্লান হয়ে গেছে দিনের দীর্ঘশ্বাসে,
আজি অবেলায় এ অবহেলার কেমনে বুঝাবো বলো?
তুমি তো চাহিয়া দেখোনি সে আঁখি—দেখোনি তা ছলোছলো!

তুমি এসেছিলে যবে,
ভাবিয়াছিলাম মোর ভাঙা বীণ্ আবার বাজানো হবে,
কতো স্বপ্নের মায়া দিয়ে ঘেরা চন্দ্রিল রজনীতে,
মনে পড়ে আজ? যাত্রা মোদের একখানি তরণীতে?
চোখেতে তোমার উদাস দৃষ্টি সমুখে অসীম জল,
কথা আর গান—গান আর কথা চলেছে অনর্গল,
তারি মাঝে হায়, চেয়ে দেখি একি—টলোমলো মোর তরী
সুনীল আকাশ মেঘে মেঘে মেঘে একেবারে গেছে ভরি!

তুমি এসেছিলে যবে,
ভাবিয়াছিলাম জাগিতে পারিব, বাঁধন ছেঁড়ার রবে।
জাগিতে পারিব নূতন আলোকে নূতন দৃষ্টি নিয়ে
পার হবো দেশ বন্ধুর যতো দুর্গম পথ দিয়ে,
সাগর বেলায় ক্ষণিক খেলায় আমরা ঘুরিব শুধু,
থাক না পিছনে হাহা করা যতো সাহারা মরুর ধূ ধূ!
তুমি আসিয়াছ মোর জীবনের ঘন বন পথ বাহি,
চাওয়া-পাওয়া মোর এক হয়ে গেছে, আর তো কামনা নাহি!

তুমি এসেছিলে যবে,
ভাবিয়াছিলাম তোমার পথেতে আমারে ডাকিয়া লবে,
সন্ধ্যা আকাশে বৈশাখী মেঘ হানুক কৃষ্ণছায়া,
ঝঞ্ঝা বাতাসে দিক্ না উড়ায়ে মেঘ-সন্ধ্যার মায়া,
নামুক বেদনা সারা ধরা ঘিরি—নাহি ভ্রূক্ষেপ তাতে,
ঘনো দুর্যোগে পিচ্ছিল দিনে, তুমি আছ মোর সাথে।
তোমার চরণে চরণ মিলায়ে আমারো চলিত হবে,
ভাবিয়াছিলাম মন্দ্র পদপাতে তুমি এসেছিলে যবে॥

তাম্রকূট কর্পোরেশন লিমিটেড

(নক্সা)

প্রবোধ সরকার

"দাদা—অ দাদা—শ্‌নেছেন ?"

'দাদা' ডাক্‌টা সম্মানের কিন্তু 'অ দাদা' কথাটা ও কথাটার উচ্চারণ কানে বড় বেখাপ্পা ঠেকে, 'অ দাদা'—না 'আমআদা' বোঝাই শক্ত।

মাণিকতলার পুলের ধারে চলার গতি রুদ্ধ করে অর্থাৎ দস্তুর মত ব্রেক কসে, ছোট ভায়ের সন্ধানে চোখ ফেরাতেই হ'ল।

"এমন ভোরবেলা হন্তদন্ত হ'য়ে চলেছেন কোথা ?"

প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে যাই, কিন্তু বিস্মিত হইনি। অবাক্ হয়ে বিস্ময়-বিজড়িতকণ্ঠে উত্তর দিই,—"ভোর কোথায় হে—বেলা যে সাড়ে ন'টা। তারপর—?"

উত্তর আসে,—"ভোরবেলায় একটু morning walk করতে বেরিয়েছি; আচ্ছা আজকাল কোলকাতায় কি রাত থাকতে থাকতেই দিনের আলো দেখা দিচ্ছে? ভোর হ'তে আর বাকী কত ?"

"ফেরা হ'ল কবে ?"

"রাঁচি থেকে তো ?—সে অনেকদিন। আরে দাদা—সেখানে কি ভদ্দোর লোক থাকতে পারে! পাগল—শুধু পাগল! খালি সব পাগলামি করে। আমায় কি বলে জানেন?—বলে 'পাগল'। "পাগল—পাগল বলে বড্ড খেপাতো, তাই তাদের পাগলামির জ্বালায় একদিন আমি পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে এসেছি। ভাল করিনি? আর কিছুদিন থাকলে—"

"আরও ভাল করতেন।"

ভদ্রলোক আমার মন্তব্যে দস্তুরমত চটে হাতের লাঠিটা রাস্তার বুকে ঠুকে বিকৃত মুখে বললেন,—"ধোৎ—আপনি কিছু বুঝেন না। রাঁচির টিকিট কেটে আপনাকেও রাঁচি পাঠান উচিত! আমি কি সত্যি পাগল যে—পালাব না?"

সর্ব্বনাশ! একি কামড়ে টামড়ে দেবে নাকি! নাঃ, যাত্রাটা মোটেই সুবিধার নয়। সক্কালবেলা—পড়বি তো পড় এক পাগলের পাল্লায়।

"আচ্ছা নমস্কার! বড্ড ব্যস্ত আছি। আবার দেখা হবে।"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই right-about turn করি। সংগে সংগে ভদ্রলোক আমার ডান হাতখানা পিছন থেকে চেপে ধরে বললেন,—"তাও কি হয় Brother! আজ আমার বাড়ী তোমার নিমন্ত্রণ, খাবার—শোনবার আর দেখবার। এ্যাই ট্যাক্সি, একদম বাঁধকে।"

বুঝলুম প্রতিবাদে বিশেষ সুফলের আশা নেই। নির্ব্বিবাদে ট্যাক্সিতে উঠে বসি।

সম্বোধনটা যখন "আপনি" ছেড়ে তুমিতে এসে নেমেছে তখন নিমন্ত্রণ না খাইয়ে সত্যিই দেখছি ভদ্রলোক সহজে ছাড়বে না। তবে ট্যাক্সি চড়ে ভাড়া না দিতে পারলে থানায় গিয়ে লাল-পাগড়ীর আতিথ্য স্বীকার করতে হয়। কে জানে পাগলটার পকেট গড়ের মাঠ কি না, ব্যাগটা খুলে দেখি কতকটা আশ্বস্ত হবার জন্য। না, অপদস্ত হবার ভয় নেই।

ট্যাক্সি বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে হু হু শব্দে ছুটে চলেছে। "Cheer you! জোরসে চালাও। নাও—ধরো।" বলেই ভদ্রলোক দু'তাড়া নোট আমার হাতের ভিতর গুঁজে দিলেন।

"অবাক হয়ে দেখছ কি—আমার দুটো পকেটই ছেঁড়া। এ্যাই—রোখো, এই বাগিচাকা অন্দরমে চালাও।"

ট্যাক্সি একটা বাগানবাড়ীর ভিতর ঢুকে বাড়ীটার সামনে থামে। বাড়ীটার সামনে একটা ঝুলন্ত বিরাট সাইন বোর্ডের গায়ে লেখা— "তাম্রকূট কর্পোরেশন লিমিটেড!"

ভদ্রলোক পরম সমাদরে তাঁর বৈঠকখানায় আমায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। 'আসছি' বলে কোথা চলে গেলেন হন্ হন্ করে।

বেয়ারা এসে সেলাম করে বললে,—"বাবু আপকো বোলাতা হ্যা।"

বাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলুম।

"এসো ভায়া—একটু টিফিন করে নেওয়া যাক, অনেক কাজ"—বলেই একটা আধসেরি সিদ্ধ ডিম আমার সামনে এগিয়ে দিলেন। জিনিষটার দিকে আমায় অবাকবিস্ময়নেত্রে চেয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক বললেন,—"Crocodile egg—কুমীরের ডিম, ভারী উপাদেয়, আমেরিকা থেকে আনিয়েছি। বড় বড় কাজ করতে হ'লে এ জিনিষ খেতেই হবে, brain ভারী ঠাণ্ডা রাখে।"

"কিন্তু আমি যে মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। গুরুর নিষেধ তো আর অবহেলা করতে পারি না।"

"Well and good!" বলেই ভদ্রলোক দু'হাতে ডিমটা ধরে কামড়ে কামড়ে খেতে সুরু করলেন।

"দে—বাবুকে তবে এক গ্লাস চিরেতার জল এনে দে! চিরেতার জল ভারী উপকারী, পেটও ঠাণ্ডা করবে আর সংগে সংগে মাথাটাও ঠাণ্ডা রাখবে। লোকে কথায় বলে—মুড়ি আর ভুঁড়ি।"

বেয়ারা এক গ্লাস টকটকে রাঙা চিরেতা ভিজান জল নিয়ে এল।

উঃ শেষকালে বরাতে এও ছিল।

"দ্যাখো, একটা বিরাট সভা করতে হবে আর তুমি হবে সেই সভার President! তামাক খাওয়ার উপকারিতাটা সে সভায় তোমায় বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিতে হবে।" "তাম্রকূট কর্পোরেশন লিমিটেডের" তোমাকেই আমি প্রথম মেম্বর করব। চল, আসল ব্যাপারটা তোমায় জলবৎ তরলং করে বুঝিয়ে দিই।"

ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের tiffin করা অর্থাৎ ঐ বিরাট ডিমটাকে coffin করা হ'য়েছে।

বাগানের একাংশ।

ব্যাপারটা সত্যই তাজ্জব। প্রায় এক বিঘা জায়গার ওপর একটা বিপুল আয়তনের লৌহনির্ম্মিত গড়গড়া, তার গগন-স্পর্শী মনুমেণ্টের মত নলচেটির ওপর তেমনই বিরাট আকারের একটা কল্কে যেন টালার ট্যাঙ্ক। আগুন সমেত

কলকের মধ্যে এক সময়ে কমপক্ষে একশ' মণ তামাক পুড়বে। গড়গড়াটার গায়ে অজস্র ছিদ্র। ঐ সমস্ত ছিদ্রের গায়ে নল সংযুক্ত হ'য়ে সারা শহরে "ধূম" সরবরাহ হবে, যেমনভাবে কলকাতা শহরে জল বা বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। প্রত্যেক বাড়ীতে 'মিটার' বসান থাকবে,—কে কতটা তাম্রকূট সেবন করলেন তা তাঁর মিটার দেখলেই বোঝা যাবে। গড়গড়ার গায়ে "হাইড্রোলিক প্রেস" বসিয়ে তাম্রকূটসেবীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পাঁচতলা সাততলার উপরেও সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে—একটা কলকে পুড়তে সময় লাগবে প্রায় আট ঘণ্টা, কাজেই আট ঘণ্টা অন্তর কলকে পাল্টাবার জন্য কপি কলের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এল!

বিরাট বাগানের আর এক অংশে বসল এক বিরাট সভা। বড় বড় তামাকখোর বাবুদের আনা হয়েছে বাড়ী বাড়ী মোটর পাঠিয়ে। আর বাদ বাকী তৃতীয় শ্রেণীর দল এলেন পায়ে হেঁটে। সভা আরম্ভের পূর্ব্বে সভাস্থান লোকে লোকারণ্য। আশপাশের গাছগুলোয় উৎসুক তাম্রকূটসেবী ছোকরার দল বাদুড়-ঝোলা ঝুলছে।

আমার সভাপতি করে ভদ্রলোক "তাম্রকূট কর্পোরেশন লিমিটেড" ও তাম্রকূট সেবনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা আধা-ইংরেজি—আধা-বাঙলা—আধা-হিন্দী ভাষায় সভায় বিবৃত (বিরক্তও বলা যায়) করলেন। সিগার, সিগারেট, বিড়ি পানে অকালে হয় ডিসপেপ্সিয়া, যক্ষ্মা, তাই সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এই বিশুদ্ধ ধূমপানের আয়োজন—বিশুদ্ধ—পবিত্র—প্রাচ্য ভাবধারায় পরিপুষ্ট। সেই বক্তৃতা শুনে বুড়োর দল বললে—"বাজে" আর ছোকরার দল বললে—"ব্রেভো!" বুড়োরা বিরক্ত বিশেষ করে এইজন্য যে, গ্যাস, ইলেকট্রিকের মত এবং মিটার ভাড়া দিতে হবে মাস মাস—এরও কন্‌জাম্‌শনের বিলের টাকা দিতে হবে তারিখ মত, নইলে কনেক্‌শন দেবে কেটে। তার ওপর আবার নতুন পাইপ কনেক্‌শন বাড়ী অবধি করার খরচ লাগবে আলাদা। বুড়োরা তো চটবেই, যদিও তাদের লক্ষ্য করেই এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

আবার ছেলে-ছোকরারা বাড়ীতে বড় একটা সিগারেট ফোঁকে না। তাদের দরকার লুকিয়ে ছাপিয়ে ধূমপান। তা তো আর সম্ভব হবে না। রাস্তার টেলিফোন বুথের মত এক-একটা তাম্রকূট বুথ না খোলা অবধি! তাদের প্রস্তাব গৃহীত করবার জন্য তারা তাই সুরু করলে বিষম হুল্লোড়। উপস্থিত পথে-ঘোরা কুকুরগুলো সভার লোকের হৈ হৈ শুনে সমস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে সুরু করলে—সভায় পড়ে গেল একটা মহা হৈ চৈ ব্যাপার; মানুষ থামে তো কুকুর চ্যাঁচায় আর কুকুর থামে তো মানুষ চ্যাঁচায়, শেষ পর্য্যন্ত কুকুর সম্প্রদায়ই চীৎকারে জয়লাভ করে অর্থাৎ তাম্রকূট কর্পোরেশন স্থাপনে বিপুল প্রতিবাদ জানায়।

যুবকদলের সঙ্গে কুকুরদলের এই সমবেত প্রতিবাদ শুনে সভার উদ্যোক্তা 'ক্রকোডাইল এগ' মশাই তখন ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে যুবকদের সান্ত্বনা দিলেন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! তোমাদের সুবিধের জন্যে শহরের গলিগুলোয় এক একটি নিরালা কোণে তাম্রকূট বুথ থাকবে শ্লট মেসিনের মত। এক-আনি একটি দিলেই—পাইপ-পিস্ একটি বেরিয়ে আসবে আর পনর মিনিট তা ব্যবহার করা চলবে।

চারিদিকে হাততালি আর বাহবা—ব্রেভো!

কিন্তু যুবকদলের অভিযোগের নিষ্পত্তি হলেও কুকুরদের হয় না। তারা প্রতিবাদ জানাতেই থাকে। তখন ক্রকোডাইল মশাই বেগতিক দেখে 'হাইড্রোলিক প্রেস' সাহায্যে তাম্রকূট মিশ্রিত জল ফোয়ারার আকারে বর্ষণ করে দিলেন বেচারাদের ওপর। বেচারারা লেজ গুটিয়ে হতাশ হয়ে অন্য মজলিসের খোঁজে চম্পট দিল। যাবার বেলা ক্রকোডাইল মশায়ের প্রতি দু-একটা দাঁত খিঁচুনি—দু-একটা কেঁউ কেঁউ ঝাড়তে ছাড়ে নি। তার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, মানুষগুলো কি স্বার্থপর! ওরা করবে ধূমপান আর আমাদের বেলা বরাদ্দ হুঁকার জল।

পরদিন সকালে জনৈক খোনা সংবাদপত্র বিক্রেতা জোর গলায় রাস্তা দিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছে—হিঁটিং হুঁটু (সংবাদপত্রের নাম)—জঁব্বর খঁবর তাঁজা খঁবর—তাঁম্রকূট কঁর্পোরেশন"—দুম ফঁটাস!

বিখ্যাত পত্রিকা "হিটিংহটে" নিম্নলিখিত খবরটি বেরিয়েছে:—

—: তাম্রকূট কর্পোরেশন :—

দুম ফটাস

কিছুদিন পূর্ব্বে কৈবল্যধনবাবু ওরফে "কাবলা" লটারীতে প্রথম পুরস্কার পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ফলে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় এবং তাঁহার সহৃদয় আত্মীয়-বর্গ বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রাঁচি (পাগলা গারদে) প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি পাগলা-গারদের গরাদ বাঁকাইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তাম্রকূটসেবীদের সুবিধার্থে "তাম্রকূট কর্পোরেশন" নাম দিয়া একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু গতকল্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন সভাতেই "তাম্রকূট কর্পোরেশনের" স্বর্গ-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সভার প্রারম্ভে কৈবল্যধনবাবু যে বক্তৃতা করেন তাহার সারাংশ:—

হে বালক-বৃদ্ধ-প্রৌঢ়-কাণা-খোঁড়া প্রভৃতি উপস্থিত ভদ্র ও অভদ্রমণ্ডলী! তামাকের মত সুস্বাদু খাদ্য—না—না ওর নাম কি—হ্যাঁ নেশা জগতে আর দুটি নেই। যত বড় বড় বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তি জগতে জন্মেছে—তারা সবাই তামাকখোর, তামাক না খেলে মানুষের বুদ্ধিই খোলে না। খাওয়ার পর এক ছিলিম তামাক না খেলে মনে হয় যেন কিছুই খাওয়া হয়নি। লোকে তামাক খেয়ে ঘুমোয় আবার ঘুমিয়ে উঠে তামাক খায়। লোকে যে কোন একটা কাজ আরম্ভ করবার আগে তামাক খায়—কাজ করতে করতে তামাক খায় আবার কাজ শেষ ক'রে তামাক খায়। শুধু মানুষ নয় জন্তু জানোয়ারও তামাকের উপকারিতা বুঝেছে, তার প্রমাণ ও-দেশের শিম্পাঞ্জি আর এ-দেশের ধেড়ে ইন্দুর, গরুও তামাক-পাতা খায়।

(শেষাংশ ৬৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতের ছায়াচিত্র শিল্প

আজ ছায়াচিত্র শিল্পের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতে এই শিল্পের বয়স যদিও ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতি বৎসর, তথাপি বয়স অনুপাতে এই শিল্প তেমন সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে নাই। ইহার কারণ অনেক। তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান কারণ, উক্ত শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের অল্পতা। দ্বিতীয় কারণ, ইহার উদ্যোক্তাগণের দূরদৃষ্টির অভাব ও শিল্পের জাতীয় প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাহাদের অমার্জনীয় নির্লিপ্ততা।

গ্রহণ করেন নাই। বিলাস-ব্যসনের মত নিজেদের খেয়াল চরিতার্থতার উপায় হিসাবে সাময়িকভাবে এই শিল্পের আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেই খেয়াল চরিতার্থ হইবার পর উহা পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অবশ্য উঁহাদের মধ্যে খাঁটি প্রতিষ্ঠান যে ছিল না তাহা নহে। এই সকল খাঁটি প্রতিষ্ঠান হয়ত উপযুক্ত স্থান হইতে আর্থিক সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলে বহুদিন বাঁচিয়া থাকিত এবং উক্ত শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে ও উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত থাকিতে সক্ষম হইত।

ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক দেশেই ছায়াচিত্র শিল্প

উপরে:—এসোসিয়েটেড প্রোডাকসনসের প্রথম ছবির একটি ভূমিকায় শ্রীমতী সন্ধ্যা অভিনয় করিতেছেন। শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস ইহার পরিচালক। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন পংকজ মল্লিক, মলিনা, মঞ্জুশ্রী ইত্যাদি।

পাশে:—নিউ থিয়েটার্সের "জীবন-মরণ" চিত্রে শ্রীমতী লীলা দেশাই এবং শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীনীতীন বসু, চিত্রায় শীঘ্রই দেখানো হইবে।

গত পঁচিশ বৎসরে বহু ছায়াচিত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্ম হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। যে সব প্রতিষ্ঠান আজও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিকলাঙ্গ ও অর্দ্ধমৃত। এই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী কে? পূর্বেই বলিয়াছি, এই শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের অল্পতাই ইহার জন্য দায়ী। তবে মূলধনের অল্পতাই যে এই শিল্পের বর্তমান অবস্থার একমাত্র কারণ তাহা নহে। এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের যাঁহারা কর্ণধার ছিলেন, তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞান এ বিষয়ে নিতান্ত কম ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উক্ত শিল্পকে আন্তরিকতার সহিত

প্রকৃত কল্যাণকর জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হয়। সে দেশের অধিকাংশ স্থানেই এই শিল্প সম্পূর্ণভাবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইয়া উঠে। প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার কার্যে এই শিল্প কিরূপ বিস্ময়কর সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। সরকারী নীতি ও কর্ম-পদ্ধতি এই শিল্পকে সোপান করিয়া সাধারণে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার যে চমৎকার সুযোগ পায়, সেইরূপ সুযোগ আর কোন [illegible] পায় না। কিন্তু আমাদের দেশে ছায়াচিত্র শিল্পকে এইরূপ [illegible]

সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন। জাতির বহুকল্যাণকর কার্য সম্পন্ন করিতে উক্ত শিল্প অপরিহার্য এইরূপ মনে করিয়া ভারত সরকার যদি এই শিল্পের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান-গুলিকে যথাসময়ে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিতেন ও সহানুভূতি দেখাইতেন, তাহা হইলে এই শিল্প আজ এইরূপ শোচনীয় পরিণামের সম্মুখীন হইত না। সংবাদপত্র মারফৎ এই বিষয়ের প্রতি সরকারের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণের প্রচেষ্টা বহুবার করা হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, দেশীয় কোন শিল্পের প্রতি দেশের সরকারের যতটুকু দায়িত্ব ও কর্তব্য, দেশের জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে তদপেক্ষা কোন অংশে কম নহে; বরং বেশী। আমাদের দেশে ধনী ব্যক্তির অভাব নাই অভাব ধনের সদ্ব্যবহার করিবার সৎসাহসের। কথায় বলে, ভারতের মূলধন ঘরমুখী। বিভিন্ন জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন খাটাইয়া লাভবান হওয়ার চাইতে বাঙ্গালী ধনীরা ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিয়া নিতান্ত সামান্য সুদেই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন। ধনিক সম্প্রদায়ের আরেকটুকু আর্থিক কৃপাদৃষ্টি এই শিল্পের উপর পড়িলে ইহা জগতের অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পরূপে পরিণত হইতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি, যাঁহারা এই সব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, তাঁহারা অনেক সময়েই তুচ্ছ খেয়ালের বশবর্তী হইয়াই তাহা করেন। বস্তুত শিল্পের প্রকৃত উন্নতিসাধন তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। ব্যক্তিগত অর্থগৃধ্নুতা শিল্পের মহত্তর উদ্দেশ্য ও আদর্শকে অনেক সময়েই ব্যর্থ করিয়া দেয়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের মাপকাঠিতে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা যে সকল ছবি তোলেন তাহা অতিশয় সাধারণ শ্রেণীর, ক্ষণস্থায়ী ও হীন রুচি-সম্পন্ন। অধিকাংশ ছবির বিষয়-বস্তু পৌরাণিক, ঐতিহাসিক অথবা নিতান্তই মামুলী বা উগ্র আধুনিক সমাজের চিত্র।

যে সকল ছবি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে তোলা হয়, তাহাতে ইতিহাসের মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অনেক সময়েই থাকে না। শুধুমাত্র অতীত ঘটনার রহস্য-নিদ্রিত কঙ্কাল ছবিখানিকে সর্বকালে সর্বজনের নিকট আদরণীয় করিয়া রাখিবে ইহা আশা করা বৃথা। পৌরাণিক চিত্রগুলি আবার কেবলমাত্র জনসাধারণের ভাবপ্রবণতা ও ধর্মবিশ্বাসের উপরই বাঁচিয়া থাকিতে চায়। আবার সামাজিক বলিয়া যে সকল ছবি বাজারে চালু হইতে চায়, তাহারা সমাজের বর্তমান বা অতীতের সঠিক প্রতিচ্ছবি নহে।

ছায়াচিত্র শিল্প যাহাতে সমাজ ও জাতির বৃহত্তর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষেরা আদৌ করেন না। শিক্ষা বিষয়ক ছবি যদি তাঁহারা তোলেন তাহা হইলে এই শিল্প লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে নানাবিধ শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে অল্প খরচে ছোট ছোট শিক্ষা-বিষয়ক ছবি তুলিতে পারেন এবং মূল ছবির সঙ্গে ইহা যোগ করিয়া দিতে পারেন। এই সকল ছবির আখ্যানভাগের জন্য তাঁহাদিগকে আদৌ ভাবিতে হইবে না। পৌরাণিক ও আধুনিক বীরত্বের কাহিনী, দেশের মহাপুরুষদের উপন্যাসের ন্যায় বিচিত্র জীবন-কাহিনী, বিভিন্ন দেশের লোক-চরিত্র, আচার-বিচার ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি প্রভৃতি যদি তাঁহারা ছবির পর্দায় ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা যে তথাকথিত আধুনিক ছবি হইতে কোন অংশে কম আকর্ষণীয় হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

তারপর ছায়াচিত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকগণ এই শিল্পের ভবিষ্যতের কথা এতটুকুও ভাবিয়া দেখেন না। যদি সত্যই তাঁহারা কিছু চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে নূতন অভিনেতা অভিনেত্রী গঠনের প্রচেষ্টা নাই কেন? দুই বা ততোধিক অর্ধস্ফুট, ক্বচিৎ দু'একজন প্রতিভাশালী নট-নটীকে চালিয়া সাজিবার অসহনীয় মনোবৃত্তি তাহাদের পাইয়া বসিয়াছে। তাহাদের সৃজনী প্রচেষ্টার অভাবে ছবিগুলি একঘেয়ে মামুলী ধরণের হইয়া পড়ে,—নূতনত্বের অবদান তাহাতে অল্পই থাকে। অবশ্য মালিকেরা বলিবেন, প্রকৃত প্রতিভাশালী অভিনেতা অভিনেত্রীর অভাবেই তাঁহারা ঐরূপ করিয়া থাকেন। হয়ত অভাব আছে স্বীকার করি; কিন্তু ইহার দূরীকরণের চেষ্টা কি করা হইয়াছে? নূতন লোককে তাহার শিল্পী-প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ কি তাঁহারা দিয়া থাকেন? অবশ্য নূতন কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে গোড়াতেই কোন দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দিয়া, কোনও ছবির 'বাজার দর' কমাইয়া দিতে আমরা বলি না। সামান্য ভূমিকা হইতে তাহাকে রীতিমত শিখাইয়া তোলা উচিত। এই শিক্ষা-নবীশী কার্যে লোক নির্বাচনের সময়ে যে সকল লোক উহাকে জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, শুধু তাহাদিগকেই নিযুক্ত করা উচিত। ব্যক্তিগত খেয়াল ও সখ মিটাইবার জন্য এ্যামেচার হিসাবে যাঁহারা এই পেশা অবলম্বন করিতে চান, তাহাদিগকে কোনপ্রকারেই মনোনীত করা উচিত নয়; কারণ, তাঁহাদের কার্যে একনিষ্ঠতার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। উহা শিল্পের ক্রমোন্নতির পথে রীতিমত বিঘ্নস্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে অভিনেত্রীদের সম্বন্ধেও কয়েকটি অপ্রিয় সত্য কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কোনও নূতন অভিনেত্রী যেই মাত্র কোনও নূতন ছবিতে নামিলেন এবং রূপে বা অভিনয়ে ছায়াচিত্র শিল্প জগতে কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, অমনি সমাজের কোন ধনী মহাপুরুষের সুনজরে পড়িলেন এবং তাহারই প্রভাবাধীনে হইলেন। ফলে, তাহার প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফুরণের পথে বিঘ্ন জন্মিল, অভিনয় করা হইল তাহার নিকট একটি গৌণ কাজ। অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার ফলে তাহার সৃষ্টি প্রতিভারও অবনতি হইতে লাগিল। অভিনেত্রীদের সম্পর্কে এই যে সমস্যা, ইহার সমাধান তাহাদের নিজেদের উপরেই প্রায় সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ভর করিতেছে। শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহাদের যত উন্নত হইবে, ইহার সমাধানও তত শীঘ্র হইবে।

ছায়াচিত্রের জন্য ভাল গল্পের অভাব, বর্তমানে একটি বিশেষ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই গল্পের জন্য অধিকাংশ সময়ই সাহিত্যিকদের রচিত নাটক, উপন্যাস ও গল্পের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাজারে নাটক নভেলের অভাব নাই। অভাব ছায়া-চিত্রোপযোগী বিষয়বস্তুর। প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকই যদি অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়োগের মত গল্প রচনার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে সাহিত্যিক নিয়োগ করেন, তাহা হইলে এই সমস্যার সুসমাধান হইতে পারে।

সধবা

(গল্প)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রতিনাথের দিনের পর দিন বড়ই দুর্যোগের ভিতর দিয়া কাটিতে লাগিল।

ঠিকা ঝি অবশ্য একটা মিলিয়াছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও রতিনাথ পাচক বা পাচিকার কোন সন্ধান পান নাই।

স্ত্রী রমা তাহার রুগ্ন দেহটাকে লইয়া কোন মতে দুই বেলা আহার্য বস্তু যোগাইতেছে বটে। কিন্তু রতিনাথের মনে হয়, ইহা অপেক্ষা অনাহারে জীবন যাপন করা সুখের।

রন্ধন করিতে অগ্নির উত্তাপ যতটা প্রয়োজন, রমার রসনার উত্তাপ তাহা অপেক্ষা বহু গুণে অধিক।

কঠোর স্বভাবা রমাকে চিরদিনই রতিনাথ অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। কয়েক বৎসর হইতে রমা বাতব্যাধিতে ভুগিয়া তাহার কর্মেন্দ্রিয়গুলি যেমন শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল, সেই অনুপাতে বাড়িয়া চলিল তাহার রসনেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা আর গতিবেগ।

মুখরা সে চিরদিনই।

কিন্তু এতদিন রতিনাথের সংসারে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে নাই। পোষ্ট মাষ্টারী চাকুরী। চিরকাল শহরে কাটাইয়া ঝি ও পাচকের উপর সংসারের ভারার্পণ করিয়া এই প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

আজ শহর হইতে সামান্য পল্লীগ্রামে বদলী হইয়া আসিতেই এতদিনকার সরল সুগম পন্থাগুলি দুর্গম ও দুর্ভেদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অবশেষে একদিন একজন রাঁধুনীর সন্ধান মিলিল।

থানার দয়ারাম একদিন আসিয়া সংবাদ দিল, তাহারই স্বজাতীয়া একজন রাঁধুনীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সে তাহার রুগ্ন স্বামীর ভরণ-পোষণের বিনিময়ে তাঁহার পাচিকা-বৃত্তি গ্রহণ করিতে সম্মত আছে।

রতিনাথ আগ্রহের সহিত তাহার প্রস্তাবে রাজী হইলেন।

সেই দিন রাত্রে রমাকে একটু সন্তুষ্ট করিবার জন্যই পাচিকার কথাটি তাহার কানে তুলিলেন।

অপ্রসন্ন মুখে রমা বলিল, ভাল করে খোঁজ নিয়ে তারপরে এনো; বিদেশে এসে শেষে যার তার হাতে খেয়ে জাত-জন্ম না খোয়াতে হয়।

যদিও তাহার সম্বন্ধে বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করা দরকার মনে করেন নাই তথাপি রতিনাথ বেশ উৎসাহের সহিত বলিলেন,—হ্যাঁ, সে আমি ভাল করে খোঁজ না নিয়ে কি আনতে বলেছি!

আবার প্রশ্ন হইল,—বয়স কত?

এইবার রতিনাথ বিপদে পড়িলেন। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তথাপি তিনি সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন,—ও ব্যাটা ত ঠিক বলতে পারলে না। হয়ত বছর চল্লিশ হবে।

—হ্যাঁ, তাই ভাল, বুড়ো হলে যেমনি তা'র দিয়ে কাজ চলে না, আবার কাঁচা বয়সের লোক দিয়েও তেমনি কাজ পাওয়া কঠিন। মেয়েটি সধবা না বিধবা?

—সধবা।

রমা আর কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া শুধু বলিল,—বেশ।

রতিনাথ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রতিনাথ অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিয়া রমার নিকটে পৌঁছাইয়া দিয়া বলিলেন,—কাল এরই কথা বলেছিলাম।

রমা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া উষ্ণস্বরে বলিল,—একে দিয়ে কাজ চল্‌বে! তবে যে কাল বল্‌ছিলে বয়স বছর চল্লিশেক হবে।

রতিনাথ এতক্ষণ ধরিয়া ইহারই প্রত্যাশা করিতেছিলেন। তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—যা শুনেছিলাম তাই বলেছি। ওরা আবার অত বোঝে নাকি! কথা শেষ করিয়াই রতিনাথ ব্যাপার অধিক দূর অগ্রসর হইবার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এইবার রমা স্ত্রীলোকটিকে লইয়া পড়িল।

বলিল,—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস।

আগন্তুক উপবেশন করিল।

—তোমার নাম কি?

মৃদুকণ্ঠে সে উত্তর দিল,—গৌরী।

—জাতে কায়স্থ ত? দেখ বাছা জাত ভাঁড়িয়ে আমাদের পরকালটা খেও না!

কুণ্ঠিতা হইয়া গৌরী বলিল,—না মা, তা' কেন হবে? পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করেছি তার ফল ভোগ করছি। আবার বোঝা ভারী করব?

—তোমার কে কে আছেন?

রমার এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে গৌরী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া যেন নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইল। তারপর তাহার অতীত জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া গেল।

গৌরীর করুণ ইতিহাস রমার হৃদয়ের গোপন তারে আঘাত করিল। কঠোর হৃদয়া রমার নয়ন যেন তাহার অজ্ঞাতসারেই ঈষৎ আর্দ্র হইয়া উঠিল। এই সর্ব্বহারা মেয়েটির উপর একটা সহানুভূতির সুর রমার হৃদয়ে যেন স্বতঃই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

রমা তাহার নিকটে একটু সরিয়া আসিয়া বলিল,—দেখ বাছা, আমি তোমার মায়ের বয়সী, আমাকে এত সঙ্কোচ কিসের?

তাহার কথায় যেন একটু লজ্জিত হইয়াই গৌরী মাথার কাপড় একটু সরাইয়া দিল।

রমা যেন একটু মুগ্ধ হইয়াই কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সুন্দরী জীবনে সে অনেক দেখিয়াছে; কিন্তু এমনটি তাহার চোখে আর কখনও পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

এ সৌন্দর্য যেন শান্ত গম্ভীর। ইহাতে কোন উদ্দামতা কি তীব্রতা নাই। আছে শুধু পবিত্র স্নিগ্ধতা।

গৌরীর পরিধানে লাল চওড়া পেড়ে শাড়ী। হাতে শঙ্খ ও লৌহ বলয় ছাড়া আর অন্য কিছু ছিল না। কিন্তু

ইহাতেই তাহাকে এমনই মানাইয়াছিল যে, অন্য কোন অলঙ্কারের তাহার দরকার ছিল না।

গৌরী রমাকে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—মা, বেলা হয়ে পড়ল। কি করতে হবে বলে' দিন।

গৌরীর কথায় রমার চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল,—হাঁ, এস।

রাত্রে রতিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—মেয়েটি রান্না যেন ভালই জানে বোধ হল। ওর কাজ-কর্ম্ম তোমার পছন্দ হয়েছে ত?

রমা মাত্র একটি "হুঁ" বলিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। তাহার উত্তর দিবার ভঙ্গী দেখিয়া রতিনাথ উদ্বিগ্ন হৃদয়ে একটি আসন্ন ঝটিকার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রমার যেন চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল,—তোমার কাছে না জেনেই একটা কাজ করেছি।

উষ্ণ বায়ু শীতল হইতে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া রতিনাথ বলিলেন,—কি?

—আহা, মেয়েটি যেমন রূপে, তেমনি গুণে। কিন্তু পোড়াকপালির অদৃষ্ট বড় মন্দ।

রতিনাথ ভূমিকার পর কোন্ বিষয়ের অবতারণা হইবে নিঃশব্দে তাহারই প্রতীক্ষায় রহিলেন।

রমা বলিতে লাগিল,—মেয়েটি বড়ই লক্ষ্মী, ঝিকে কাজ করতে দেখে কি বললে জান? মা আমিই আজ থেকে আপনার সব কাজ করব, ওকে দিয়ে আর দরকার কি? ওকে বিদায় করে দিন। আমি আপত্তি করলেও সে ঝিকে সরিয়ে দিয়ে তার কাজ করতে লাগল। আমি তখন বাধ্য হয়ে তার পাওনা পরিষ্কার করে দিয়েছি।

রতিনাথ বলিলেন,—তা বেশ করেছ।

—আরও শোন। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটলে কিন্তু এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত মুখে দিলে না। আমি কত অনুরোধ করলাম কিছুতেই সে রাজী হল না। বললে,—'বাড়ীতে তিনি না খেয়ে আমার পথের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁকে ফেলে আমি কি করে খাই মা?' সে যখন এখানে খাবেই না, কাজেই তাকে দুটি টাকা দিয়ে বললাম, এই তোমার সংসারের খরচ, ফুরিয়ে গেলে আবার চেয়ে নিয়ে যেও।

রতিনাথের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। যাহার হাত দিয়া কখনও একটি পয়সা অপব্যয় হইবার উপায় নাই, এক দিনের পরিচয়ে সে নগদ দুইটি টাকা দান করিয়া বসিয়াছে, ইহা কম বিস্ময়ের কথা নহে!

রমা বলিতে লাগিল,—কেমন লক্ষ্মী মেয়ে শোন। সারা দিনটা ধরে আমার কি সেবাই না করলে! আজ যেন অন্য দিনকার চাইতে অনেকটা ভাল বোধ করছি। গৌরী সন্ধ্যের আগেই চলে গেল। যাবার আগে রাতের রান্না-বান্না কাজ-কর্ম এমনই ভাবে করে রেখে গেছে যে, আমার কোন কিছুই করতে হয়নি।

রতিনাথ দেখিলেন বহুদিন পরে আজ রমার মুখে একটা প্রসন্নতার আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি পরম তৃপ্তিভরে গৌরীর উদ্দেশ্যে মনে মনে অজস্র আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,—যা বলছ তাতে এমন লক্ষ্মী মেয়ে খুব কমই মেলে।

সমবেদনার সুরে রমা বলিল,—তা হবে না? গৌরীর কথায় মনে হ'ল, ও বনেদী ঘরের মেয়ে। ওর স্বামীও নাকি বি-এ পাশ করে মোটা মাইনের চাকুরী করছিল। পক্ষাঘাত হয়ে বাড়ীতে এসে শয্যা নিয়েছে। বিষয় সম্পত্তি যা ছিল তা দিয়ে এতদিন রোগীর খরচ আর পেট চালিয়ে এসেছে। এখন আর কোন উপায়ই নেই।

রতিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—মেয়েটির বাপের বাড়ীতে কেউ নেই?

—ছিল সবই। বাপ মস্ত জমিদার, বিস্তর বিষয় সম্পত্তি ব্যাঙ্কে টাকাও আছে যথেষ্ট। গৌরীর মা মারা যেতেই ওর বাপ আবার বিয়ে করেছিলেন। তিনি আজ তিন বছর মারা গেছেন। গৌরীর সৎ মা-ই এখন সংসারের কর্ত্রী। আর তার বাপ ভাইয়েরা এসে বসেছে সংসারে শিকড় গেড়ে।

তারপর প্রায় এক বৎসর অতীত হইয়া গেছে।

গৌরীর কর্ম ও সেবা-নৈপুণ্যে রমার দেহের ও মনের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

রমার চরিত্রের চিরদিনের উগ্রতা গৌরীর সংস্পর্শে নিভিয়া গিয়া মাতৃত্বের একটা অনাবিল অমৃতধারায় স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

রমার বুভুক্ষু হৃদয় যেন গৌরীকে অবলম্বন করিয়াই সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে চাহে।

কিন্তু গৌরী রমার হৃদয়ের এত খবর জানে না।

সে আসে রমার সংসারে কাজ করিতে, তাহার করুণা উদ্রেক করিতে নহে। গৌরীর অনলস হস্ত অবিশ্রান্ত কার্য করিয়া যায় বটে, তাহার প্রাণের কোন সাড়া তাহাতে জাগিয়া উঠে না।

রমার চক্ষে সমস্তই ধরা পড়ে। রুদ্ধ অভিমানে তাহার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।

একদিন রমা গৌরীকে নিকটে ডাকিয়া বলিল,—আমার একটা কথা রাখবি?

—কি মা?

দেখ গৌরী যদিও তুই আমার পেটে জন্মাস্ নি, তবু আমার মেয়ের চেয়েও অনেক বেশী করেছিস। আমায়ও ভগবান কোন কিছু দেন নাই। তাই বলছি, ওঁর পেন্সন নেবার আর বেশী দেরী নেই। তারপর আমরা দেশে গিয়ে থাকবো। তুইও তোর স্বামীকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে চল, তাহলে বোধ হয় শেষ জীবনে একটু শান্তি ভোগ করে মরতে পারব।

কথার শেষে রমা আগ্রহের সহিত গৌরীর দিকে চাহিল।

কিন্তু গৌরীর কণ্ঠ নীরব।

রমা ঈষৎ উষ্ণ স্বরে বলিল,—চুপ করে' রইলি যে, আমার কথার জবাব দিলিনে?

—ওঁকে জিজ্ঞেস না করে কি জবাব দেব মা?

—বেশ আজই কথাটা শুনিস তাহলে।

পরদিন গৌরী আসিতেই রমা আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, আমি যা জিজ্ঞেস করতে বলেছিলাম তা বলেছিলি?

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া গৌরী বলিল,—না মা তিনি বাড়ী হন নাই, সব কথা শুনে তিনি বললেন,—তাঁর পৈতৃক ভিটেই যেন আমাদের শেষ নিশ্বাস পড়ে।

রমা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া গেল।

২

বর্ষাকাল। সেদিন ভোরবেলা হইতেই প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা সুরু হইয়াছিল। রতিনাথ নিবিষ্ট মনে অফিসের কার্য করিতেছিলেন।

এমন সময় দয়ারাম ডাকের বস্তা ধপাস্ করিয়া ফেলিয়া তাহার ভিজা গামছা নিংড়াইয়া গা মুছিতে মুছিতে বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল,—কি বৃষ্টিই নামছে বাবু! আজ যদি সারা দিনরাত এমনই ভাবে কাটে, তবে মাঠের ধান পাট সবই যে ডুবে যাবে!

রতিনাথ একবার তাহার দিকে চাহিয়া পুনরায় আপন কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। দয়ারাম তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য আবার বলিতে লাগিল,—কাল যে জায়গা শুকনা দেখে গিয়েছি, আজ সেখানে কোমর জলেরও বেশী দাঁড়িয়েছে।

এবারও তাহার কথায় কোন সাড়া মিলিল না। দয়ারাম তখন রতিনাথের নিকটস্থ হইয়া ডাকিল,—বাবু!

এবার রতিনাথ সাড়া দিলেন।

—যে মেয়েটি আপনার বাসায় কাজ করে, হরনাথের বাড়ীও সেই গোপীপুরে কিনা। হরনাথ আবার হল আমাদের গাঁয়ের বিশ্বনাথের সম্বন্ধীর ছেলে।

বিরক্ত হইয়া রতিনাথ বলিলেন,—অত কথা শোনবার সময় এখন নাই। পরে শুনব।

—বেশী কথা নয় বাবু, শুনুন। তারপর তার কাছে অই মেয়েটির কথা যা শুনলাম, তাতে গা কাঁটা দিয়ে উঠল।

এবার রতিনাথ ফিরিয়া বসিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রকম?

—ওটা একটা বদ্ধ পাগল!

—পাগল, কই এতদিন আমার এখানে কাজ করছে, তার কোন পাগলামির লক্ষণ দেখিনি ত! বরং সে যেভাবে কাজ কর্ম করে তাতে মনে হয়, সে খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

হ্যাঁ, এদিকে সে খুবই ভাল। কিন্তু তার পাগলামি অন্য রকম। সে সবার কাছে পরিচয় দেয়, সে সধবা, কিন্তু তার স্বামী বহুদিন মরে গেছে।

রতিনাথ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিলেন,—তবে, তার স্বভাব চরিত্র ভাল নয় বুঝি!

—আজ্ঞে তা খুবই ভাল। কিন্তু ওখানেই হচ্ছে গোল। সে বলে বেড়ায়, সে সধবা। ভোরবেলায় উঠে ও ঘর-দোর নিকিয়ে যায় স্নান করতে, তারপর ফুল তুলে ওর স্বামীর খুব বড় একটা চেহারা তোলা আছে, তাই বসে বসে পূজো করে। পরে রান্না করে সেখানে ভোগ দেয়। সে সময় মেয়েটা একবার হাসে, আবার কাঁদে। নয়ত বক্ বক্ করে বকতে সুরু করে দেয়। তারপর আসে আপনার বাসায় কাজ করতে। এখান থেকে কাজ-কর্ম সেরে বাড়ী গিয়ে স্নান করে ফের আবার পূজোর পালা। তারপর আবার রান্না করে ভোগের ব্যবস্থা। তারপর সারারাত কত গান; হাসি গল্প চলতে থাকে অথচ বাড়ীতে আর দ্বিতীয় প্রাণীর খোঁজ পাওয়া যায় না।

দয়ারাম একটু চুপ করিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—ওর বাড়ীতে কেউ যেতে পারে না বাবু। কাউকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখলে ও বড় রেগে যায়। বলে আমার এ ঠাকুর ঘরের কাছে যদি কেউ আসিস, তাহলে ঘোর অমঙ্গল হবে। তাই কেউ ও বাড়ীতে যেতেও চায় না।

রতিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন?

সকলে বলে, ওর উপর নাকি অপদেবতার দৃষ্টি আছে।

রতিনাথ স্তম্ভিত হইয়া এতক্ষণ দয়ারামের কাহিনী শুনিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইল, যদি দয়ারামের কাহিনী সত্য হয়, তবে গৌরীর একনিষ্ঠ সাধনায় তাহার গৃহ সত্যই দেবতার পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে।

রতিনাথ রমার নিকট সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিলেন। রমার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে বলিল,—এখন বুঝলোম কেন সে কোথাও যেতে চা'য় না।

রতিনাথ রমাকে নিষেধ করিয়া দিলেন, তাঁহারা যে তাহার এ সব কথা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা যেন সে না জানিতে পারে। যে মিথ্যাকে সে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সাধনায় সেই মিথ্যাই সত্যের সন্ধান বলিয়া দিক্।

তাহার পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

রতিনাথ পেন্সন লইয়া সস্ত্রীক পল্লীগ্রামের বাড়ীতে যাইয়া বাস করিতেছেন। রমা গৌরীর কথা বিস্মৃত হয় নাই। আসিবার সময় পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও সে ভিটা ছাড়িয়া আসিতে রাজী হয় নাই। এমন কি কিছু অর্থ-সাহায্য পর্যন্ত গ্রহণ করে নাই।

রমা প্রতি শারদীয়া পূজোর সময় গৌরীর একখানি লাল পেড়ে শাড়ী, তার স্বামীর কাপড়, ১ জোড়া শাঁখা, সিন্দুরের কৌটা পাঠাইয়া দিত।

একবার পার্শ্বেল ফেরত আসিল। তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে, প্রাপক মৃত। রমা কাঁদিয়া উঠিতেই রতিনাথ বলিলেন,—সারা জীবনের সাধনায় আজ ওর সিদ্ধিলাভ ঘটেছে। দুঃখ করবার কিছু নেই এতে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই জাতীয় জীবনের সহিত খেলা-ধুলো ও ব্যায়াম চর্চ্চা জড়িত। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যে পড়িয়া সময়ে সময়ে ইহার বাহ্যিক চিহ্ন না পাওয়া গেলেও ইহার অস্তিত্ব কখনই লোপ পায় নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপানের জাতীয় জীবনের সহিত খেলা-ধুলো ও ব্যায়াম চর্চ্চার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখিয়া বর্ত্তমানে আমরা আশ্চর্য্য হইয়া থাকি কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই একদিন এইরূপ ছিল। এমন কি আদিম যুগেও খেলা-ধুলো ও ব্যায়াম চর্চ্চার কদর ছিল। সেই সময়ের ব্যায়াম চর্চ্চার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অন্ন-সংস্থানের জন্য দৈহিক বল লাভ করা ও শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করা। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম উন্নত জাতি হিসাবে যে চীনদের ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন, তাহাদেরও মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চা সর্ব্বজনপ্রিয় ছিল। অভ্যন্তরীণ কলহের ফলে চীন দেশ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় ব্যায়াম চর্চ্চার আদর কমিয়া যায়। বর্ত্তমানে সেই কলহের অবসান হইয়াছে এবং চীন দেশে পুনরায় ব্যায়াম চর্চ্চা ও খেলাধুলোর উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে জাতীয় জীবনের ভিতর ব্যায়াম চর্চ্চার স্থান যে ছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই। জাতিভেদ, বিভিন্ন ধর্ম্ম ধীরে ধীরে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করায় ভারতবাসী একরূপে ব্যায়াম চর্চ্চার কথা ভুলিয়া যায়। তাহার পর যেটুকু বর্ত্তমান থাকে তাহাও লোপ পায়, বৈদেশিক শক্তি-সমূহ ভারতের উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়া, দেশবাসীর শারীরিক উন্নতির প্রতি মনোযোগ না দেওয়ায়। এইরূপে ভারতবাসী ব্যায়াম চর্চ্চার সহিত জাতীয় জীবনের যে কোন সম্বন্ধ আছে তাহা ভুলিয়া যায়। এখনও পর্য্যন্ত যে ভারতবাসী ব্যায়াম চর্চ্চা আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করিতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণও উহাই। কিন্তু এইভাবে ভারতবাসী চিরকাল যে জাতীয় জীবন হইতে খেলা-ধুলো ও ব্যায়াম চর্চ্চাকে বাদ দিয়া রাখিবে তাহা মনে হয় না। গত কয়েক বৎসরের ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জাতীয়তাবাদিগণকে ব্যায়াম চর্চ্চার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে দেখিয়াই আমাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছে। ভারতের মধ্যে বাঙলাদেশ সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। সরকার আর উদাসীন থাকিতে পারে না। বাঙলার ছাত্রসমাজ, যুবক সমাজকে ব্যায়ামচর্চ্চার প্রতি উৎসাহ দান করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা হইল। তবে সরকারের ব্যবস্থার সাহায্য বাঙলার ছাত্রসমাজ ও যুবসমাজ সকলে গ্রহণ করে নাই। নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়াই অনেকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। বাঙলার জাতীয় জীবন নূতনভাবে গঠন করিবার যাঁহারা ভার লইয়াছেন তাঁহাদের এই ব্যায়ামচর্চ্চা আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি না থাকায় উৎসাহী ব্যায়াম-ব্রতিগণ বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তবে যাঁহারা এই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা মনে দৃঢ় ধারণা পোষণ করেন যে, বাঙলা তথা সারা ভারতের জাতীয় জীবনের সহিত ব্যায়ামচর্চ্চা ও খেলাধুলোর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। তাঁহারা জানেন, ব্যায়ামচর্চ্চার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান জাতীয় আন্দোলনকারীদের না থাকার ফলেই তাঁহাদের এই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। ব্যায়ামচর্চ্চার দ্বারা কেবল যে দেশের মধ্যে গুণ্ডার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে না, ইহা যে নূতন জাতীয় জীবন গঠনের পথ করিয়া দিবে—ইহা সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা অনুভব করিতেছেন। রাশিয়া, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশেও একদিন এইরূপভাবে ব্যায়ামচর্চ্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য দেশবাসীকে বুঝাইতে হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের দেশেও যদি সেইরূপ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহাতে আমাদের লজ্জা অনুভব করিবার কিছুই নাই। বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি কংগ্রেস পরিচালিত প্রদেশসমূহের মন্ত্রিগণ এই আন্দোলনে সাড়া দিয়াছেন। তাঁহারা ব্যায়ামচর্চ্চা আন্দোলনের উদ্দেশ্য প্রচার করিতেছেন। প্রাদেশিক সরকারের অর্থভাণ্ডার হইতে এই প্রচারের সাহায্য করা হইতেছে। জাতীয় আন্দোলনের সহিত ইহার সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টাও চলিয়াছে। কেবলমাত্র বাঙলাদেশ—যেখানে ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্যায়ামচর্চ্চা আন্দোলন দেখা দিয়াছিল সেইখানেই প্রচারের কোন ব্যবস্থা নাই। সরকার যে অর্থ সাহায্য করেন তাহা তাঁহাদের পালিত বিভিন্ন জেলার ব্যায়াম পরি-চালকদের জন্য ব্যয়িত হয়। যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা সরকারী স্কুলসমূহ লাভ করে। জাতীয়তাবাদী ক্লাব, এসোসিয়েশন বা সঙ্ঘ এই অর্থভাণ্ডারের কোন সাহায্য পায় না। দেশবাসী একদিন সাহায্য করিবে এই আশা মনে পোষণ করিয়া তাহারা চলিয়াছে। একনিষ্ঠতা ও নিঃস্বার্থ সাধনা বিফল হয় নাই, এই ব্যায়াম-ব্রতিগণের সাধনাও বিফল হইবে না।

জাতীয় আন্দোলনকারিগণ জাতির সর্ব্বতোমুখী উন্নতি কামনা করেন। সমাজ ক্ষেত্রে, বাণিজ্য ক্ষেত্রে, ধর্ম্ম ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই—এইজন্য তাঁহারা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু জাতির কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি ছাড়া উদ্দেশ্য সাফল্যলাভ করিতে পারে না, ইহা একদিন তাঁহাদের উপলব্ধি করিতেই হইবে। এই কথা একদিন ইউরোপে যখন "সোকোল" আন্দোলনকারিগণ প্রচার করিয়াছিল তখন বিভিন্ন দেশের জাতীয় জীবন গঠনকারিগণ উপহাস করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া চেকগণ, জার্ম্মানগণ, সুইডিশগণ শক্তিশালী জাতিরূপে দেখা দিলেন তখন ইউ-রোপের সকল দেশের কর্ণধারগণের চক্ষু খুলিয়া গেল। গত ইউরোপীয় মহাসমর তাহার পর যেটুকু সন্দেহ ছিল তাহাও দূর করিল। সেই হইতে ব্যায়াম চর্চ্চা ইউরোপের সকল জাতির জাতীয় জীবনের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সেইরূপভাবে আমাদের জাতীয় জীবন গঠনকারিগণের চক্ষু খুলিবে, ইহা আশা করা কোনরূপেই অন্যায় হইবে না।

জলাঞ্জলি

(গল্প)

শ্রীননীগোপাল সেন

পুলক মাতার নির্দেশ পালন করিল এবং যেদিন পৌঁছিল সেদিন অপরাহ্ণেই ঝামেলাটা চুকাইয়া বেশ একটু তৃপ্তির সঙ্গেই বাহির হইল মাতার বান্ধবী বিধবার কক্ষ হইতে। বাঁচা গেল। আর সে আসিতেছে না এ বাড়ীমুখো প্রৌঢ়াদের মহাভারত-রামায়ণের আবেষ্টনে।

বাগানটায় পা দিয়া তার মুখে আসিল শিস্ দিবার প্রেরণা, বুকটা যে তার হালকা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শিস্ দেওয়া হইল না। সেই মুহূর্তে পিছনের কোন্ কক্ষ হইতে যেন তরুণীর কণ্ঠরব হিল্লোলিত হইল আবৃত্তির সুরে: মায়া জড়িত সে সুরের রেশ অজানিতেই পুলকের চক্ষু দুটিকে বন্দী করিল জানালার পথে। পুলক ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়, মেয়েটি চেয়ারে বসিয়া আছে, কোলে একখানা বই। তার মনে হইল—তুলনা-নিরপেক্ষ এমন একটি চরম নিদর্শন জীবনে সে এই প্রথম দেখিল। অবশ্য শিল্পীদের য়্যালবামে নির্জীব মূর্তি সে দেখিয়াছে এমনই, কিন্তু সজীব—না, দেখে নাই আর। কি সুন্দর সরল অনাড়ম্বর ভঙ্গিটি! তার কখনই ধারণা ছিল না, এমন একটা আস্তর-খসা বাড়ীর বেরং পারিপার্শ্বিককে চেয়ারে-বসা এক তরুণী রহস্য বিস্তার করিতে পারে যে নাকি বিস্ময়-বুদ্বুদের সীমাহীন দিগন্তকে রুদ্ধ করিয়াছে, রূপে রসে গন্ধে।

বাগানে দাঁড়াইয়া সেই নিমেষেই সে আগামী দিনের মাছ ধরিবার অভিযান স্থগিতের সঙ্কল্প করিল। প্রতিজ্ঞা করিল, ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত প্রতি অপরাহ্ণে সে দোল খাইবে দিদির হাসপাতাল কোয়ার্টার্স থেকে মাতার বান্ধবী—না, না, মাসী-মার বাড়ী অবধি। এমন তরুণী যে গৃহবাসিনী—সে পরিবারের সঙ্গে অঘনিষ্ঠতা ক্ষমার যোগ্য নয়।

এতক্ষণে পুলক তার স্তব্ধ চেতনার ঘোর কাটাইয়া সচল করিতে পারিয়াছে সকল ইন্দ্রিয়কে। কাজেই বুঝিতে পারিল তরুণী কবিতা আবৃত্তি করিয়া শিখাইতেছে দশ-এগার বৎসরের অন্য একটি চঞ্চলিকাকে।

পুলক ভাবে—সেয়ানার ভাবনা—কূটনীতিকের বিকল্প—প্রেম মুগ্ধের সোনালী কল্পনা, কিন্তু ভাবনা তো বলিয়া দিতে পারে না তরুণীর হাতে ওখানা কোন্ কাব্য-কথা! তাই কয়টা বড় গাছের আড়ালে আড়ালে পা দুটি তাকে লইয়া যায় যতটা সম্ভব জানালার কাছাকাছি। আর তখনই পুলকের আঁধার-ঘেরা হৃদয়ে একফালি চাঁদ দেখা দেয়—তরুণী সহসা বই বন্ধ করিয়া টেবিলে রাখে; তারপর উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সমুখের দেওয়ালে। যেমন এই বয়ঃসন্ধিকালের তরুণীরা হামেশা করিয়া থাকে। ব্যস! পুলক আর দেরী করে না। স্কুলের দৌড় প্রতিযোগিতা স্মরণ করিয়া অদমিত ক্ষিপ্রতায় ডাকঘরে চলিয়া যায় এবং এক কপি 'নবীন সেনের গ্রন্থাবলী'র অর্ডার পাঠাইয়া দেয় কলিকাতায়।

পরদিন আবার পুলক গেল অপরাহ্ণে। আজ সে অনায়াসেই মাসী-মা সম্বোধনে বিধবাকে আপ্যায়িত করিতে পারিল। মাসী-মাও বাড়ীময় ডাক-হাঁক তুলিয়া ছবি ও রুবিকে আপন কক্ষে আনিয়া পুলকের সহিত পরিচিত করিলেন। ছবি আর রুবি—দুটি বোন, এ-ই এখন বিধবার জীবনের সম্বল। পুলক আজ পুষ্পিত স্বর্গে। তার মনে হইল, আরও তো কত ছুটি সে বেঘোরে কাটাইয়াছে, তখন দিদি আর জামাইবাবুর এখানে আসিবার খেয়াল তার না হইয়া কি অসঙ্গত কার্যই না হইয়াছে। যাক্, তবু সে প্রস্তুত হইল ছবিরাণীর প্রতি সশ্রদ্ধ মধুর হাসি বর্ষণ করিয়া যে কাব্য-কথাখানা দুই-এক দিনেই আসিয়া পৌঁছাইবে, তাহার উপহার দানের যোগ্য ভূমিকা সারিয়া রাখিতে।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই যাহা মাসী-মার মুখে শোনা গেল, তাহা যেন 'করপোরেল রায়'-য়ের মতই মনে হইল। এবং পরক্ষণেই একটা ইলেকট্রিক শকের মত সে মালুম করিয়া লইল যে, আগন্তুকও নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় এই পরিবারের নিকট তাহা অপেক্ষাও বিশেষ আপন জন।

বিগত মহাসমরে য়্যাম্বুলেন্সে যোগদান করিয়া রায় গিয়াছিল মেসোপটেমিয়ায়, তথা হইতেই 'করপোরেল' খেতাব লইয়া দেশে ফিরিয়াছিল। পরিচয় সূত্রে এই মুখবন্ধ মাসী-মার মুখে শুনিয়া পুলক আরও দমিয়া গেল। কিন্তু ....

করপোরেলের চোখ দুটি অসম্ভব জ্বল জ্বল করিলেও তাহা কোটরগত। মুখের উপর এমন একটা ছাপ, যাহা সরলতা ও প্রাণখোলা হাসির ধার ধারে না। আশা মাত্র এইটুকু। সজীব, চঞ্চল বিংশ শতাব্দীর স্কুল-কলেজে-পড়া তরুণী এমন একখানি ভ্রুকুটি-কুটিল মুখশশীর প্রতি কিছুমাত্র আকর্ষণ অনুভব করিতে পারে না।

পুলক আর করপোরেলের ভিতরেও শিষ্ট আলাপ বিনিময় হইল, কিন্তু তাহা দর্শনমাত্র বন্ধুত্বে পরিণত হইবার মত কথাবার্তা নয়। করপোরেল ভাবিতেছিল, এ দুনিয়াটা বাসের যোগ্য হইত যদি পুলক-নামধারী ছোকরার গুরুভার ধরা-পৃষ্ঠকে প্রপীড়িত না করিত। আর পুলকের কাছে তো ইহা নিতান্তই ঔদ্ধত্য যে তার সেয়ানা পরিকল্পনার প্রথম ধাপ সুরু হইবার আগেই এমন অসময়ে দুনিয়ার লোক-সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে একজনও—আর সেই একজন হইবে 'করপোরেল' বয়সে প্রায় প্রৌঢ় এবং গোঁফ এক জোড়ার মালিক।

যাক্ তাতেও কিছু আসিয়া যাইবে না—মনে ভাবে পুলক—একবার 'নবীন সেনের গ্রন্থাবলী'খানা আসিয়া পড়ুক না কলিকাতা হইতে, তখন নিশ্চয় নূতন পরিস্থিতি আসিয়া করপোরেলকে পাঠাইয়া দিবে যুদ্ধক্ষেত্রে স্ট্রেচার বহন করিতে। করপোরেলের স্থান সেখানে ছাড়া আর কোথায় হইতে পারে, পুলক ভাবিয়া পায় না। তা ছাড়া, এক জোড়া সুন্দর গোঁফই সব কিছু নয় দুনিয়ায়—গায়ের শাদা রং ও নয় এবং মনকরা কথা বলিবার শক্তি-প্রাচুর্য সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না, কবিভাবাপন্না তরুণীর কাছে সব চেয়ে বড় হইল অন্তর—নিখুঁত শাদা অন্তর—উজ্জ্বল সজীব অন্তর। দ্বিতীয় দিনের এই সাক্ষাতের পর আরও দুই-তিন দিন কাটিতে থাকুক, পুলক অনুভব করিল,—তখন তার নিজের এই নিখুঁত শাদা অন্তর কমসে কম হৃদ-জনের উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। কারণ উপহার পুস্তক।

এই আশাই তাকে ছবিরাণীর সাক্ষাতে মজলিশের সজীব প্রাণস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিল। এতটা সাফল্য লাভ তার হইল যে, সেদিন মাসীমার বাড়ী হইতে একসঙ্গে বাহির হইয়া করপোরেল পুলককে বলিল,—শুনুন পবনবাবু!

—পবন নয়, পুলক বলুন।

—আপনি কি পুলকবাবু, বেশী দিন এখানে থাকবার মৎলব করেছেন নাকি?

—নিশ্চয়ই। বেশ কিছুদিন থাকবো।

—আমি বলছি, সেটা ঠিক হবে না।

—আমার চোখে এ মুলুকটা লাগে ভাল।

—কিন্তু চোখ দুটোয় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হলে, তখন তো চোখে কিছুই ভাল লাগবে না।

—ব্যাণ্ডেজ! আমার চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হবে কেন?

—হ'তে তো পারে:

—কেন হ'তে পারে?

—ঠিক জানি নে। তবে হ'তে পারে এই মনে করছি। আচ্ছা গুড্ বাই।

সে রাতে যে পুলকের মনের খোরাক যথেষ্টই জুটিল করপোরেলের বাক্য হইতে, সে কথা যেমন সত্য, তেমনই ইহাও সত্য যে, রাত ভোর হইলেও মনের সে বিস্বাদ খোরাক নিঃশেষ হইতে চাহিল না। করপোরেলের কণ্ঠস্বরে তো আবছা কিছুই ছিল না—পরিষ্কার কথাগুলি। পুলক করে কি তবে। জীবনে তার এই তো প্রথম স্পন্দন-মায়া।

পুলক বোধ হয় কলিকাতায় সহসা ফিরিয়া যাইবার কথাই ভাবিয়া দেখিত, কিন্তু ডাকপিয়ন তাকে সমাধান দিয়া গেল সকল সমস্যার—'নবীন সেনের গ্রন্থাবলী' সম্বলিত প্যাকেটটি ডেলিভারী দিয়া। বইখানির প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতেই পুলকের মন দৃঢ় হইল। সে 'পলাশীর যুদ্ধ' হইতে মুখস্থ করিতে লাগিল—"সাধে কি বাঙালী মোরা চির-পরাধীন"....

অবশেষে মাসীমা উঠিলেন, পুলক আর ছবিকে এই কক্ষে অপেক্ষা করিতে বলিয়া। দোর অবধি পৌঁছিয়া তিনি ছবিকে বলিলেন—তোর মামা মোহনলালকে চিঠি লিখতে যাচ্ছি, তুই লিখবি চিঠি?

—না মা, তুমিই লিখে দাও আমার হ'য়ে, মধুপুর তাঁর কেমন লাগছে জানাতে।

দোর ভেজান হইল। পুলক একবার কাশিল,—তিনি তা হ'লে আর পুরনো ঠাঁইটিতে নেই?

দিশেহারা ছবি বলে,—কি বলছেন, বুঝতে পারলুম না ও।

—আমি বলছিলুম কি, আমাদের কবি তো মোহনলালকে পলাশীর মাঠে—

—আপনি কি বলতে চান, 'নবীন সেন' পড়েন আপনি?

—আমি? নবীন সেন? বললে বিশ্বাস করবেন কি না জানি নে—"নবীন সেন" তো আমার আগাগোড়া ঠোঁটস্থ! অন্তত খানিকটা তো নিশ্চয়—সাধে কি বাঙালী মোরা—

—আমারও বেজায় ভাল লাগে। —'আমরা বীরের জাতি, বীর ধর্ম্ম রণ'.....

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। এই ধরুন না—সাধে কি বাঙালী মোরা চির-পরাধীন.....কি আশ্চর্য্য, আপনি আর আমি দেখছি এ বিষয়ে একেবারে মিলে গেছি।

—আমার কাছে তো 'নবীন সেন'-এর কাব্য একেবারে যাকে বলে অসাধারণ।

—কি আইডিয়া! পলাশীর যুদ্ধ.....

—আজকালকার লোকগুলো কি আহাম্মক, কি বেয়াড়া—নবীন সেনের নামে নাক সিঁটকায়। আমার মনের মত এঁর সবগুলো কাব্য।

—আমারও। ভেবে দেখুন যে প্রতিভা পলাশীর যুদ্ধ লিখতে পারে—সবই আছে তার ভিতর। অন্তত আমার তো তাই মত। আমি আর কিছু চাই নে।

উভয়ে উভয়ের দিকে অপলক দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়া ঘামিয়া উঠে।

—কি সুন্দর! আমার কিন্তু আদপেই ধারণা ছিল না। মানে, আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, কাব্যের চেয়ে খেলাধুলোর দিকেই আপনার ঝোঁক হয়ত বেশী। অর্থাৎ যাকে বলে চঞ্চল তরুণ।

—কি বলছেন? আমি চঞ্চল? খেলাধুলো? গুড্ গড্! শুনলে অবাক হবেন—সাঁঝের বেলার সখ আমার হ'ল বিড়াল-ছানার মত নবীন সেনের কাব্যখানি নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা—সারা দুনিয়াকে ভুলে।

—আপনি 'কুরুক্ষেত্র' খানা পছন্দ করেন না?

—সে কথা আর বলতে। আর পলাশীর যুদ্ধও। সাধে কি বাঙালী মোরা.....

—আর 'অমিতাভ?'

—তাতে কি আর ভুল আছে। তার উপর আবার পলাশীর.....

—আপনি বুঝি পলাশীর যুদ্ধের বড় ভক্ত?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

—আমার সবই ভাল লাগে। তবে এখানকার আমবাগান আমায় পলাশীর যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমায়ও দিচ্ছে। কি আশ্চর্য্য মিল আমাদের। ও আমবাগানটা দেখে অবধি আমিও তাই ভাবছিলাম, এ যেন আমার কতকালের পরিচিত।

—আর তারই পাশের নদীতীর.....

—ঠিক বলেছেন আপনি—নদীতীর! হ্যাঁ, ভাল কথা, নদীতীরের ব্যাপারে একটা কথা বোধ হয় আপনার আপত্তি হবে না। কাল চলুন না আমরা নদীর খালটায় রোয়িং করে আসি। চমৎকার হবে—তাই না?

—হ্যাঁ, তা হবে। কাল বলছেন?

—কালই। আমার আইডিয়া একখানা ছোট্ট নৌকা—টিফিন কেরিয়ার—আপনি আর আমি—আর অবশ্য 'নবীন সেন'—

—কিন্তু কাল যে করপোরেল রায়ের ওখানে নেমন্তন্ন। তার পুকুর থেকে মাছ ধরবে কিনা।

—তার পরে যাব আমরা।

—বেশ তাই হবে।

—অনেক পরেই যাওয়া যাবে। বেশ জিরিয়ে তারপর। টাইমের বাঁধাবাঁধি না-ই রইল। শেষটা যাওয়া যাবে সিনেমায়। ঠিক—সে বেশ হবে। টপিং—ফাইন—ওঃ আমবাগান, নদীতীর, আমার তো রাতটা কেটে যাবে—পলাশী—সাধে কি বাঙালী মোরা—

সেই মুহূর্ত হইতে পুলক-শিহরণে পুলক যেন সোনালী স্বপ্নে ভাসিয়া চলিল। তার অমন নির্ঘাত চাল কি কখনও বিফল হয়? বুরো করপোরেল! আর তোমার চোখ রাঙানীকে পরোয়া করিবে কে!

বেলা চারি ঘটিকা না হইতেই পড়ন্ত রোদ মাথায় করিয়া পুলক বসিয়া আছে ভাড়া-করা ছইহীন নৌকাখানিতে। ছবি এই আসে, বুঝি এই আসে, এমনই একটা স্পন্দনে দিশাহারা হইয়া। পুলকেরও অবশেষে মনটা দমিয়া যায়। সত্যই কি ছবি করিবে ছলনা।

—হ্যালো! মিঠে-কড়া রোদটা আরামের না?

বিরক্তির উপর বিরক্তি। এ যে করপোরেল হতচ্ছাড়াটার কণ্ঠস্বর। পুলক মুখ তুলিয়া তাকায়।

—বেশ কাটান গেল আজকের দুপুরটা। আমি আর ছবি। আর তুমি এখানে রোদে ভাজা হচ্ছ। সে কথা থাক্। কই, কলকাতা গেলে না ছোকরা?

পুলক এমনিতেই ছিল আগুন হইয়া, তার উপর 'ছোকরা'? ভাবিয়াছে কি লোকটা? একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই বলিল,—কই, কেউ তো আমায় কলকাতা থেকে আহ্বান জানায় নি।

—জানিয়েছে কেউ, আর কেউ না হোক আমি জানিয়েছি।

বীরত্বের আমেজে পুলক চাহিল বুকটা উঁচু করিতে। কিন্তু বসিয়া থাকা অবস্থায় সে কাজটা সোজা নয়। —কি বলছেন আপনি বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

—না বোঝবার কিছু নেই! বেশ খোলসা কথা। রাত চারটায় চাঁদপুর থেকে ষ্টীমার ছাড়ে গোয়ালন্দ মুখো—খাসা ষ্টীমার। রাত দুটোর সময় আমি এসে তোমায় ষ্টীমারটিতে তুলে দেব, যদি তোমার ঘুম না ভাঙে।

—নন্‌সেনস্!

—ওকথা তোমার উল্টে যাবে, জানতো আমি বক্সিংয়ে চ্যাম্পিয়ান। মনে রেখ। তৈরী হয়ে থেক পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে। ততক্ষণ মহা খুশীতে রোদ পোহাও ছোকরা।

পুলক আরামের নিশ্বাসের সঙ্গে আগন্তুকের প্রস্থানের পথপানে নিরীক্ষণ করে।

এমন সময় কোথা হইতে যেন কে আসিয়া লাফাইয়া পড়ে নৌকায়। আর একটু হইলে পুলক গিয়াছিল আর কি কুপোকাৎ হইয়া।

হি-হি-হি—আমি রুবি। দিদি আসতে পারবে না আজ। চলুন—নৌকা চালান।

যাক্, তবু সময়টা কাটান যাইবে। খুব কতক্ষণ নৌকা চালাইয়া আর রুবির সঙ্গে বক বক করিয়া পুলক ক্লান্ত। খালের ধারে নৌকা ভিড়াইয়া তদের টিফিন খাওয়া শেষ করে। খাবারের টাকাটাই মাটি। এবার পুলক এলাইয়া পড়ে। রোদ এড়াইতে সার্টটা খুলিয়া মুখে ঢাকা দিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে গলুইতে। এত ক্লান্তির পর ঘুম আসিতে দেরী হয় না।

হঠাৎ কি একটা শব্দে পুলক উঠিয়া বসে। রুবি কোথা? নৌকায় তো নেই! সর্বনাশ! ঐ যে খালের জলে ওটা কি ভাসছে? রুবি নিশ্চয়ই—ঐ যে হলদে রঙের জামা।

গেঞ্জি গায়েই পুলক ঝাঁপাইয়া পড়ে খালের জলে। কাছাকাছি যাইয়া হাত বাড়াইতেই শুধু ফ্রকটা চলিয়া আসে। হায়! হায়! মেয়েটা নিশ্চয় ডুবিয়া মরিয়াছে।

এখন উপায়! কি বলিবে সে ছবিকে? কি-ই-বা কৈফিয়ৎ দিবে মাসীমার কাছে?

ফিরিয়া যেমন নৌকায় উঠিল—পুলকের কান্না পায়। পরণের ধুতিখানা কখন বেমালুম খসিয়া পড়িয়াছে জলে। তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া রাখা সার্টটা দিয়া কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করে।

আর সেই মুহূর্তেই ঠিক শোনা যায়—পুলকবাবু, আপনার সার্টটা দিন তো খুলে।

কণ্ঠস্বর স্বয়ং ছবির। পুলক কল্পনা করিতে পারে নাই, তার জীবনে এমন সময়ও আসিবে, যখন ছবির আগমন সে বিষ নজরে দেখিবে। কিন্তু তা-ও বাস্তবে পরিণত হইল। রুবি ডুবিয়া মরিয়াছে আর সে দায়িত্ব পুলকের। সে কথাটা অন্ততঃ না বলিলে নয়। কি করে, নেহাৎ নিরুপায় হইয়া পুলক বলে—

—রুবি—কি যে হল। আপনারা আমায় দুষবেন, কিন্তু আমি ইনোসেণ্ট, দিব্যি গেলে—

—দিব্যি গালতে হবে না। রুবির কিছু হয় নি। সে ঠিক আছে। কিন্তু একটা রামছাগলকে সাইস করে সে চাঁদ সুলতানা করতে গিয়ে ফ্রকটা হারিয়েছে। ছাগলটা শিং দিয়ে ওর জামাটা নাকি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে জলে। মেয়েটার গায়ে কিছু নেই। বাড়ী নে যাই কি করে। দিন না আপনার সার্টটা। ঢেকে ঢুকে নি। ও বসে আছে ওই ঝোপটার ভেতর লজ্জায়।

পুলক হতভম্ব। সার্ট সে দেবে কি! সে কি করিয়া ছবিকে জানাইবে যে, সে উলঙ্গ। —উহুঁ, উহুঁ, বলিতে বলিতে পুলক লাফ দিয়া নৌকা হইতে তীরে পড়িয়া দে ছুট!

ছবি ত একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট। সামান্য ভদ্রতার লেশও জানে না এ ভদ্রলোক—আর এ বিদ্‌ঘুটে যুবককেই সে নেক-নজরে দেখিবে কি না, মনে মনে ভাবিতেছিল।

এমন সময় সারা পল্লী কাঁপাইয়া চীৎকার উঠিল—চোর! চোর!

পুলক পশ্চাতে তাকাইয়া দেখে স্বয়ং করপোরেলের মুখ হইতে সেই হাঁক-ডাক। আর চারিদিক হইতে জনতা ছুটিয়া আসিতেছে—সবার আগে নেতা করপোরেল।

করপোরেলের রক্তচক্ষু সার্থকতা লাভ করিল অবশ্য পুলকের অশেষ নাকালের বিনিময়ে। সে কথা আর না বলাই ভাল। তবে করপোরেলের মুখের বাক্য বেদ বাক্যেই পরিণত হইল। কেননা, পরদিন আর পুলককে কেহ চাঁদপুরে দেখে নাই। ছবিরাণীও বাকি জন্মে পুলকের মূর্তিটি চোখে দেখে নাই দ্বিতীয়বার।

আধুনিকতার ঝিলমিলি

(একটি চিত্র)

শ্রীশম্ভু—

গোড়া থেকেই বাবা আর মা আমার অতীনের সম্বন্ধে নির্বাক্। তা বলে মনের দেওয়াল তাদের ছিল না অস্বচ্ছ। শাদাপাড় মিশ্‌কালো শাড়ীখানা আমার যেমন ফিন্‌ফিনে স্বচ্ছ, যাকে মা শুধু আজিকার আধুনিকতার দাবী থেকে স্খলিত হবার ভয়ে অশোভন বল্‌তে সাহস পায় নি, সেই মিহি শাড়ীখানার মতই স্বচ্ছ দেখ্‌তে পাওয়া যেত তাদের মনের ভাব।

আমার মাতাপিতার মনের চাব-কাঠাটি এই রকম। আমায় তারা ভালবাসে খুব—এত বেশী যে সময়ে আমায়ও ভাবিয়ে তোলে, কিন্তু তা হলে কি হবে, জীবনের সকল পরতে অতি আধুনিক বনে যাবার জন্যে তাদের জীবন-মরণ পণ একেবারেই হয়ে পড়েছিল দুরন্ত রকমের উগ্র। সত্যি করে তবু অন্তরের অন্তরে লুকানো থাকে ওরই বিপরীত ভাব। মুখে তারা বলে উদগ্র প্রগতির মন্ত্র বুলি কাজে তাদের কেবল সনাতনী সঙ্কীর্ণতার অষ্টগ্রন্থি।

বাবার য্যাড্‌ভার্‌টাইজিং এজেন্সির কাজ; তাই মা-বাবা দুজনে মিলে সংগ্রহ করে। তারা দুজনে প্রতি শনিবার, রবিবার রাতে হোটেল থেকে খেয়ে আসে, কেননা, সেখানে গেলে বাবার এজেন্সির অনেক কাজ পাওয়া যায়। সুবিধে হয়। সিনেমায় যেতে হয়, নইলে আপটুডেট বনা যায় না। রেসেরও একটু আধটু খবর রাখতে হয়, হবে না? আধুনিক ভদ্র সমাজে মেশবার এও একটা সেরা উপায়।

বাবার বয়স কতকটা আধুনিক আমেজের পঞ্চাশ; খাকি শর্ট মানায় ভাল যদি সোনার সিগারেট পাইপ্‌টি থাকে মুখে। তখন তরুণের মত লাফিয়ে চল্‌তে বাবার বাধে না। কিন্তু আপশোষ পরদিন যে পায়ের ব্যথায় মুখ দিয়ে তার হুঁ-হাঁ ছাড়া লম্বা কথা বেরোয় না একেবারে, সে আমি লক্ষ্য করেছি কতবার। হায় বাবার কি দুর্দশা! মুখ ফুটে ককাতেও পারে না।

মা হল ছিপ্‌ছিপে, আমার চেয়েও। আর আশ্চর্য নির্ভরতা বাবার স্কন্ধে। সময়ে তা মেঘাচ্ছন্ন হয়, যখন হোটেলে ডিনারের সময় বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে হয়। মা যেন সেখানে নেহাৎই বেমানান—যেন গভীর জলের মাছ ডাঙায় পড়ে অতিষ্ঠ। তবু মা যেমন দরদ জানে এমন আর কেউ নয়।

আমি হাজার বার বলেছি মাকে যে তার ঠাঁই হল গৃহে—শত গুণে যা তাকে মানায়। মায়ের মহিমময়ী দেবী মূর্তি যদি আমি পেতাম। আমার কথার জবাবে মা বলে "জীবিকার জন্যে রেবা ডার্লিং এ-সব করতে হয়, যা-কিছু সবই তো সুখ-শান্তির আশে।" বলেই মা বেরিয়ে যায় বাবার সঙ্গে সিনেমায়।

কাজেই নাহাত এ উদার আধুনিক প্রথা বাধ্য হয়েই আরোপিত হ'ল আমার শিক্ষার ব্যবস্থায়। বাস ঐ পর্যন্ত। কিন্তু যতক্ষণ তাদের সামর্থ্যে কুলায় তারা আমায় চোখে চোখে রাখে। যখন চোখের আড় হই, তখন শতভাবে শত লোকের কাছে গোয়েন্দার নিপুণতায় আমার হালচালের খোঁজ খবর নেওয়া হয়। (তাদের একমাত্র কন্যার বেলাও তারা সনাতনী দৃষ্টি রাখ্‌তে চায় অষ্টপর, কিন্তু প্রকাশ্যে পারে না আধুনিক বলে নাম কিন্‌বার আগ্রহে।)

যা তারা কিছুতেই ধারণা কর্‌তে পারে না তা হ'ল যে আধুনিকতা যুগ নিরপেক্ষ। অতীতের সব কিছু বর্জন করলেই প্রগতি হয় না অথবা আধুনিক সবকিছু গায়ে মাখালেই উদার হওয়া যায় না। আমার মতে আধুনিকতা শুধু লোকের বয়সের উপর নির্ভর করে। চল্লিশ বছরের পর আর কেউ সত্যি সত্যি আধুনিক থাকে না। অনেকে আবার এর চেয়েও কম বয়সে আধুনিক বনবার সখ মিটিয়ে ফেলে। কেন না, জন্ম থেকে আমাদের দেশে সবাই রক্ষণশীল—কম আর বেশী।

বাবা-মা চল্লিশের কোঠা পার হয়েছে—তারা আমায় আধুনিক রুচিতে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছে মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আধুনিকতার ধুয়া গান করতে বাবার বিরাম নেই। মাও তাতে মাথা নেড়ে সায় দেয়। নইলে যদি কেউ একবারের তরেও তাদের সেকেলে ব'লে আখ্যা দেয়। সেটা তাদের অসহ্য।

বাবা বলে—"আমরা রেবাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছি।

মা বলে—"রেবা আমার একাই যেতে পারে হিল্লী-দিল্লী; একটু ভয় করি না, আমরা।"

কিন্তু অতীন্‌-দার সঙ্গে সিনেমা যাওয়ার কথা উঠ্‌লে দশবার দশ রকম অন্তরায় না সৃষ্টি করে। শেষ হুকুম দিলেও গোয়েন্দা পাঠায় আমাদের অজ্ঞাতসারে। মেয়েকে স্বাধীনতা দিবার ও অহেতুক ভয়কে অগ্রাহ্য করবার শিক্ষা-দানে মায়ের এতটা দিলদরিয়া ভাব।

এ ব্যবস্থার ফলে আঠার বছরে পা দিয়ে যখন অতীন্‌-দার সঙ্গে নিবিড় অনুরাগে আবদ্ধ হলাম, আমি আশ্চর্য হলাম না, জেনে যে, বাবা ঢের আগে থেকেই অতীন-দার নাড়ী-নক্ষত্র সব ঠাউরে রেখেছে, বোধ হয় আমার চেয়েও বেশী। আমার কাছে অতীন-দা হেভ্‌নলি, বাবার কাছে তা নিশ্চয়ই নয়।

অবশ্য বাবা মুখ ফুটে কোনদিন আপত্তি করে নি। বলেছে—"নারী নিশ্চয়ই তার জীবন সংগী বেছে নিতে অধিকারিণী। বাপ-মা সেখানে হস্তক্ষেপে অনধিকারী। আমাদের দেশের সনাতনী মতিগতির ভূতগুলো তা বুঝবে না।"

একটা কথা স্বীকার করতে হবে, মা নাকি তেমনি স্বাধীনতা পেয়েছিল স্বয়ম্বরা হতে। তবে তার ছিল দেদার সম্পত্তি তার বাপের কাছ থেকে পাওয়া। যাক্, তা হলে আমারই মনোনয়ন করতে হবে আমার বর। করলাম মনোনীত। অতীন-দা ছাড়া আর কে হতে পারে আমার মনের মত। দৃশ্যত এবং মনে-মুখের অমিল ফুটিয়ে বাবা-মা করলো অন্য প্ল্যান্। আরও আশ্চর্য সে প্ল্যান আমার জ্ঞাতসারে নয়।

এমন অবস্থায় পাশ্চাত্য-তরুণী করে এলোপ্ (elope); আদালতের আশ্রয়ও কেউ কেউ নেয় মা-বাবাকে

(শেষাংশ ৬৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সমর-বার্ত্তা

১লা অক্টোবর—

জিগফ্রীড লাইনের উপর একটি প্রচণ্ড বিমান যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পাঁচটি বৃটিশ বিমান ও ১৫টি জার্ম্মান বিমানের মধ্যে ৩৫ মিনিটব্যাপী সংগ্রাম চলে। এই বিমান যুদ্ধে শত্রুপক্ষের কয়েকটি বিমান ঘায়েল ও ভূপাতিত করা হয়।

সারব্রুকেন ফরাসী বাহিনীর বেড়াজালে পড়িয়াছে। ফরাসী বাহিনীকে হটাইয়া দিবার জন্য জার্ম্মানদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

"টেলিগ্রাফ" পত্রের বার্লিনস্থ সংবাদদাতা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, হের হিটলারের শান্তি প্রস্তাবে মোটামুটি দুইটি বিষয় থাকিবে—(১) পোল্যাণ্ডকে জার্ম্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে ব্যবধান-রাষ্ট্রে পরিণত করা, (২) অমীমাংসিত সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য পঞ্চশক্তি সম্মেলন আহ্বান। সিনর মুসোলিনীর মারফৎ লণ্ডন ও প্যারিসে ঐ প্রস্তাব প্রেরিত হইবে।

২রা অক্টোবর—

জার্ম্মান বাহিনীর প্রথম সৈন্যদল ওয়ারসতে প্রবেশ করিয়াছে এবং প্রাগা শহরতলী সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়াছে।

উত্তর সাগরে একটি জার্ম্মান সাবমেরিনের আক্রমণে ডেনমার্কের "ভেণ্ডিয়া" নামক একটি ষ্টীমার জলমগ্ন হইয়াছে। জাহাজের নাবিকদের মধ্যে ১১ জন নিহত হইয়াছে। জার্ম্মান বিমান বাহিনী বাল্টিক সাগরে কয়েকটি সুইডিস জাহাজ দখল করে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র লিথুনিয়ার সহিত একটা অনাক্রমণ চুক্তি করিবার প্রস্তাব করিয়াছে।

এস্তোনিয়ার সীমান্ত হইতে বিশ ডিভিসন রুশ সৈন্য লাটভিয়ার সীমান্তে প্রেরণ করা হইয়াছে। রুশিয়ার দাবীর মধ্যে ইহা অন্যতম:—লাটভিয়ার বন্দরে রুশিয়ার পোতাশ্রয় নির্ম্মাণের অধিকার এবং লাটভিয়ার মধ্যদিয়া রুশিয়ার মাল প্রেরণের অধিকার।

৩রা অক্টোবর—

ফরাসী বাহিনী জার্ম্মান এলাকার ১৫০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান দখল করিয়াছে।

প্যারিসের এক সংবাদে ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মানীর এক বিমান সংঘর্ষের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তিনখানি ফরাসী বিমান ও পাঁচখানি জার্ম্মান বিমান গোলার আঘাতে ভূপাতিত হইয়াছে।

কমন্স সভায় যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি দান প্রসঙ্গে রুশ-জার্ম্মান চুক্তির কথা উল্লেখ করিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন ঘোষণা করেন যে, কোনরূপে ভীতি প্রদর্শনে বৃটেন এবং ফ্রান্স বিচলিত হইবেন না। যে উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা যুদ্ধ করিবেন।

বৃটেন ও ফ্রান্সের চতুর্দ্দিকস্থ সমুদ্রে মার্কিন জাহাজসমূহের 'অন্যায় ব্যবহার' সম্পর্কে সতর্ক করিয়া জার্ম্মানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট এক নোট পাঠাইয়াছেন।

কাউণ্ট সিয়ানো বার্লিন হইতে রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

তাম্রকূট কর্পোরেশন লিমিটেড

(৬৩৪ পৃষ্ঠার পর)

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, তামাক খাওয়া ছাড়া জাতির কিছুমাত্র আশা নেই। মহাকবি বাল্মীকি তামাক খেতে খেতে রামায়ণ রচনা করেছিলেন—এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে।

তাই বলি—আপনারা ও তোমরা ভদ্র ও অভদ্র যাঁরা আছেন—

এরপর Shame! Shame! ধ্বনির মাঝে কৈবল্যধন-বাবুকে জোর করে বসিয়ে দেওয়া হয়।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশঃ—

"উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী! আমার বলবার কিছুই নেই, আর ইচ্ছাও নেই। আমায় জোর করে সভাপতি করা হয়েছে। আমি 'তাম্রকূট নিবারণী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা, আমার আসল বক্তব্য ব্যক্ত করলে ক্যাবলাবাবু (মাপ করবেন) কৈবল্যধনবাবু ভয়ানক বিরক্ত হবেন এবং ঐ কুকুরগুলোর মত আমাকেও বিদায় দেবেন, তবে একটা অতি বড় সত্য কথা আমাকে বলতেই হবে। কথাটা হচ্ছে,—

তামাক খাওয়ার ফল অতি বিষময়,—বিশেষত ছেলে-ছোকরাদের পক্ষে। অল্প বয়সে তামাক খেলে বুদ্ধি খোলা তো দূরে থাক, বুদ্ধির ঘরগুলি সব তামাকের ধুঁয়োর ভর্ত্তি হয়ে গুবরে-মাথা হয়ে যায়। ছোট ছেলেদের পক্ষে তামাক খাওয়াও যা আর অল্প অল্প করে হোমিওপ্যাথি ডোজে বিষ পান করাও তা। মোট কথা, অল্পবয়সে তামাক খেলে বুদ্ধি-বৃত্তি হবে নিছক ঐ কৈবল্যধনবাবুরই মত।"

আধুনিকতার ঝিলমিল

(৬৪৭ পৃষ্ঠার পর)

মরে আনন্দে। মন মরারা করে আত্মহত্যা। বেপরোয়ারা করে গোপনে বিবাহ। আমি জেদ ধরলাম—গোপন-টোপন নয়, অমৃত সমাজে বিয়ে হবে, ফোনে জানান হবে বাবা আর মাকে ; তারপর মুখোমুখী বোঝাপড়া।'

কিন্তু আধুনিক বাবা-মা আমার সবজান্তা।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অমৃত সমাজে গিয়ে আমায় 'অতীন-দা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল বাবার গলায়। বাবা বল্লেন—বেবী, তোমার বাপ-মা আধুনিক। তাদের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না তোমার অতীনের সঙ্গে বিবাহে। কিন্তু সে তো অপেক্ষা করতে পারলে না। তোমার সঙ্গে মধুচন্দ্র যাপন দূরে থাক, শুভ-বিবাহের কাজটুকুর অবসরও তার রইল না। কেননা, জরুরী আহ্বানে দুটি সরকারী সঙ্গী তাকে তাদের দেশে নিয়ে গেল—চার্জ ডাকাতি।

এর পর কৈবল্যধনবাবু জোর করে সভাপতিকে তার আসনে বসিয়ে দেন।

সভা অন্তে ভুরিভোজনের পর সভাস্থ সকলকে তামাকু সেবন করতে দেওয়া হয়। বিরাট গড়গড়াটির কার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায় ছিল। সমস্ত লোক এক সঙ্গে অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী তামাকু সেবনের ফলে গড়গড়ার মনুমেণ্টের মত নলচোটি চৌচির হইয়া ফাটিয়া গিয়াছে। বহু লোক ঐ বিরাট অগ্নিকাণ্ডে হত ও আহত। কৈবল্যধনবাবু এখন হাসপাতালে।

৬ষ্ঠ বর্ষ ।   শনিবার, ২০শে আশ্বিন, ১৩৪৬   Saturday, 7th October, 1939   । ৪৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

দিল্লীর বৈঠক—

গত ৩রা অক্টোবর বড়লাটের সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল ও কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সাক্ষাৎকার হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা দিল্লীতে উপস্থিত থাকিয়া এই আলোচনায় কংগ্রেস পক্ষ হইতে কি ভাবে বক্তব্য উপস্থিত করা হইবে, তাহা স্থির করিয়াছিলেন। আলোচনার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। এই আলোচনার পরিণতি কি আকার ধারণ করিবে, এখনও বুঝা যাইতেছে না। বড়লাট গত ৫ই অক্টোবর মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মতও জানিয়াছেন। তিনি এই সব মত ভারত সচিবের গোচরীভূত করিবেন; পরে সেখান হইতে উত্তর আসিলে বড়লাট ঘোষণা দিবেন; সুতরাং কিছু সময় এই সব ব্যাপারেই কাটিয়া যাইবে। ৭ই এবং ৮ই অক্টোবর নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইতেছে, আশা করা গিয়াছিল যে, বড়লাটের ঘোষণার পরে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি নিজেদের কর্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে না। বড়লাট বাহাদুর কিরূপ মতিগতির সঙ্গে কংগ্রেস পক্ষের প্রস্তাবগুলি দিল্লীর বৈঠকে গ্রহণ করেন, নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি তাহাকে ভিত্তি করিয়াই আলোচনা করিবেন। ইতিহাসে আজ একটি স্মরণীয় সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি; এই সময়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ আদর্শ-নিষ্ঠা, সঙ্কল্প-শীলতা এবং সর্ব্বোপরি সংহতি-শক্তি সহকারে যদি চলেন, তাহা হইলে ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনার ক্ষেত্রে সত্যই এক নব যুগের আবির্ভাব ঘটিতে পারে। পক্ষান্তরে, এমন সন্ধিক্ষণে যদি তাঁহারা অদূরদর্শিতা এবং দুর্ব্বলতার সামান্য পরিচয়ও প্রদান করেন, তাহা হইলে সেই ত্রুটি জাতির পক্ষে শোধরান সহজে সম্ভব হইবে না। কোন দেশ বা জাতির ইতিহাসেই সকল দিক হইতে অগ্রসর হইবার অনুকূল পরিস্থিতি সব সময় আসে না, সাহসের সঙ্গে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করাতেই নেতৃত্ব-শক্তির পরীক্ষা হয়। আজ ভারতের ইতিহাসে তেমনই একটা পরীক্ষার কাল আসিয়াছে।

লর্ড জেটল্যাণ্ডের উক্তি—

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বিবৃতিতে ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড খুশী হইতে পারেন নাই। তাঁহার মতলব এই যে, আমরা এখন লড়াইয়ে নামিয়াছি, লড়াই শেষ হইলে ভারতবর্ষের সম্পর্কে আমাদের নীতি কি রকম হইবে না হইবে, সেই কথা তোলাই ভাল ছিল। এখন ঐ ধরণের দরাদরির ভাব কি ভাল দেখায়? লর্ড জেটল্যাণ্ডের এই উক্তিতে অনেকে নাকি ইতিমধ্যেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন, আমরা সেই নৈরাশ্যের কোন কারণ দেখি না। ইংলণ্ডের কোন রাজনীতিকের কথাকেই আমরা বেদবাক্য বলিয়া মানি না। সুবিধামত তাঁহাদের সুর ঘুরে, এ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। ভারত-সচিব মহোদয়ের কাছে আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে, ইহার মধ্যে দরাদরির ভাবটা কোথায়? এবং বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলীকে বিব্রত করিবার প্রশ্নই বা উঠে কিসে? ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল নিজেরাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা মানব-স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নামিয়াছেন, জগতে তাঁহারা নবযুগ আনয়ন করিবেন। ভারতবর্ষ শুধু তাঁহাদের নিকট হইতে জানিতে চাহে যে, যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের যে আদর্শ সেই আদর্শ হইতে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ বহির্ভূত হইবে না। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অভিধানে ভারতবর্ষও জগতের মধ্যে পড়ে এবং জগতের যে স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ভারতবর্ষও তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে না। ভারতবর্ষ চাহে এই প্রতিশ্রুতিটা—শুধু চাহে, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের ঘোষণা। লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারতবর্ষের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল পুরুষ বলিয়াই গর্ব্ব করিয়া থাকেন। ভারতবাসীরাও মানুষ, মানুষের স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের দিক হইতেও ভারতবাসীদের দাবী এবং ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস যে দাবী করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার বিবেচনা করিয়া কথা বলা উচিত ছিল। সে বিবেচনার অভাব তিনি দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথাই যে

তাঁহার সেই কথার কোন নড়চড় হইবে না. আমরা ইহা মনে করি না।

ব্রিটিশ-নীতির পরীক্ষা—

লর্ড জেটল্যান্ড কংগ্রেসের প্রস্তাবকে যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, ইংলন্ডের সকলে সে দৃষ্টিতে ঐ প্রস্তাবকে দেখিতেছেন না। লন্ডনের 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এন্ড নেশন এবং 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রের মন্তব্যই এ পক্ষে প্রমাণ "নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এন্ড নেশান' এই মন্তব্য করিয়াছেন যে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ স্বাধীনতার যে আদর্শের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদর্শ শুধু তাদের ঘরোয়া ব্যাপার নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র তাহা প্রযোজ্য, ভারতবর্ষে অবলম্বিত নীতির ভিতর দিয়া কার্য্যত ইহার উত্তর দেওয়া উচিত। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' বলিতেছেন 'যে উদ্দেশ্যে গ্রেট ব্রিটেন আজ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, ভারতের সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ কোনরূপ আপত্তি না তুলিয়াই তাহা সমর্থন করিয়াছেন। নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার গণতান্ত্রিকতাকে রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে ভারত এবং ইংলন্ডের আদর্শ আজ একই। এ সময় ভারতবাসীরা যে আপন দেশে সাম্রাজ্যবাদের লোপ এবং গণতন্ত্রের প্রসার হইতেছে দেখিতে চাহিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।"

লর্ড জেটল্যান্ডের বক্তৃতা পাঠ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন,—"ইতিমধ্যে জগতে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং জগৎ পরিবর্ত্তনের পথে ভয়াবহ গতিতে অগ্রসর হইতেছে। লর্ড জেটল্যান্ড সেকেলে মনোবৃত্তি লইয়া কথা বলিয়াছেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মুখে এ শ্রেণীর কথা শোভা পাইত। * * কেবলমাত্র স্বাধীন ও স্বেচ্ছামন ভারত প্রকাশ্য ঘোষিত আদর্শের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া কার্য্য করিতে পারে।

কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে এখন চাহিতেছে, তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি বিবৃতি মাত্র। ইহাতে ব্রিটিশ জাতির মর্য্যাদার কোন হানি ঘটিবে না, পক্ষান্তরে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে চাহেন, এমন ঘোষণা তাঁহারা যদি করেন তাহাতে বর্ত্তমান যুদ্ধে তাঁহাদের আদর্শের নৈতিক দিকটা সমগ্র জগতে অধিকতর সুপরিস্ফুট হইবে এবং জগতের দৃষ্টিতে তাঁহাদের মর্য্যাদা শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। ঘোষণা করিলেই যে, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতামূলক কার্য্যক্রম ভারতে আইনের দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যুদ্ধ শেষ হইবার পর ভারতের প্রতিনিধিদের সহিত মিলিত হইয়া বিধি-বিধান নির্ণয় করা যাইতে পারে।

জিন্না সাহেবের জাতীয়তাবাদ

৫ই অক্টোবর দিল্লী শহরে বড়লাটের সঙ্গে জিন্না সাহেবের দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে। আলোচনার ফল কি হইয়াছে আমাদের জানা নাই এবং জানিবার প্রয়োজনও বিশেষ কিছু জনমতের কোন সম্পর্ক নাই। সমগ্র ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তদনুযায়ী নীতি-নির্দ্দেশের ব্যাপারে জিন্না সাহেবের মতের মূল্য জাতীয়তাবাদী ভারত দিতে প্রস্তুত নহে। সম্প্রতি জিন্না সাহেব হায়দরাবাদে গিয়া এক জবর বক্তৃতা দিয়াছেন এবং সেই বক্তৃতায় নিজকে জাতীয়তাবাদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেসীদের পাল্লায় পড়িয়া 'জাতীয়তাবাদী' শব্দের আভিধানিক অর্থ উল্টাইয়া গিয়াছে। একথার উত্তর এই যে, 'জাতীয়তাবাদী' কথার অর্থ বদলায় নাই, অর্থ ঠিকই আছে, জিন্না সাহেবের নীতির সঙ্গে খাপ খায় না বলিয়াই তিনি বদলাইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা দিতেছেন। জিন্না সাহেবের নীতির ইহাই বিশেষত্ব, তাঁহার নীতি হইল সুবিধাবাদ। যে নীতি সাম্প্রদায়িকতার উপর জোর দেয়, সে নীতি জিন্না সাহেবের সুবিধাবাদের দিক হইতে বাস্তব হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তাহা জাতীয়তাবাদের বিরোধী নীতি। ভারতের জনকয়েক সংকীর্ণচেতা সুবিধাবাদী ছাড়া অপর কেহ তাহা সমর্থন করে না। বৃহত্তর স্বার্থের ভিত্তি ধরিয়া ভারত আজ চায় বাস্তব স্বাধীনতা এবং সে স্বাধীনতা সাম্প্রদায়িক ভেদমূলক নীতির প্রধান পরিপন্থী। ভারতের সমষ্টি চেতনার সঙ্গে ঐরূপ অনুদার নীতির যোগ একেবারেই নাই। ভারতের জনগণের পক্ষ হইতে কথা বলিবার অধিকার একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। জিন্না সাহেব সুবিধাবাদের দিক হইতে কংগ্রেসকে হাজার গালাগালি দিলেও জনগণের অন্তর হইতে কংগ্রেসের প্রভাব কমিবে না, কমে যে নাই, লীগওয়ালাদের কাঁদুনী হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। কংগ্রেসের শক্তির ভিত্তি হইল, দেশের জনগণের চিত্তের এই অধিকারের উপর। সেই শক্তি ব্যক্তির নহে, সমষ্টির। সমষ্টির উপর কংগ্রেসের এই প্রভাবের মনস্তাত্ত্বিক কারণ যাহাই থাকুক না কেন, প্রভাবটা যে আছে ইহা বাস্তব এবং রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে অধিকারলাভের পক্ষে—অধিকারের যাচাইয়ের পক্ষে মূল্য থাকে এই প্রভাবেরই' লীগওয়ালাদের নীতিতে তথাকথিত বাস্তবের নামে সুবিধাবাদের তুলনা কংগ্রেসের এই রাষ্ট্রীয় শক্তির সঙ্গে হয়ই না। মহাত্মা গান্ধী এতদিন পরে খোলাখুলি এ কথা বলিয়া দিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মন যোগাইবার যে ঝোঁকটা মহাত্মাজীর মধ্যে অতীতে আমরা দেখিয়াছি, এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, সে ঝোঁকটা তাঁহার কাটিয়া গিয়াছে। উহাতে আমরা খুসী হইয়াছি। ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার কংগ্রেসেরই আছে এবং কংগ্রেসের কথা রাষ্ট্রীয় অধিকারের চেতনায় প্রবুদ্ধ ভারত মানিবে, হীন স্বার্থের দরাদরি করিবার স্থান জাগ্রত ভারতে নাই, এই কথাটা মহাত্মাজী অভ্রান্ত ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়া তাঁহার নেতৃত্ব মর্য্যাদাকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

ভারতের শক্তি—

'হরিজন' পত্রে মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি লিখিয়াছেন, প্রকৃত জীবনের পথ দেখাইবার যোগ্যতা জগতের সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। বর্ত্তমানে ভীতি হইতে

মুক্ত হইয়া ভারত যদি জগৎকে মারামারি, কাটাকাটি হইতে উদ্ধারের পথ না দেখায়, তাহা হইলে অহিংসার পথে কংগ্রেসের এ পর্য্যন্ত যত পরীক্ষা সব ব্যর্থ হইবে। ভারত যদি না দেখাইতে পারে যে, ধ্বংস করিবার ক্ষমতা অর্জ্জনের দ্বারা নয়, অপ্রতিরোধের ভিতর দিয়া মানবের প্রকৃত মর্য্যাদা বজায় থাকে, তাহা হইলে ধন-জন ধ্বংসের যে নারকীয় লীলা চলিতেছে, তাহার নিবৃত্তি এইখানে ঘটিবে না। হিংসার নিন্দনীয় পথে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শিক্ষিত করা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে অহিংসার পবিত্র পথে প্রণোদিত করাও যে সম্ভব, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়া বিলাতের 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্র এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, আধুনিক যুগে মহাত্মা গান্ধীর জীবন অপূর্ব্ব এবং তুলনারহিত। আধুনিক ইউরোপের পশুবলের পথ মহাত্মার পথ নয়। কিন্তু ইউরোপের এই যে বল যাহাকে আমরা পশুবল বলি, তাহাও সব ক্ষেত্রে নিছক পশুবল নয়, তাহার মূলেও নৈতিক শক্তি রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'মানুষকে যথেষ্ট পীড়া দেয় য়ুরোপ, মানুষকে যথেষ্ট সেবাও করে য়ুরোপ। য়ুরোপকে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, জ্ঞানের জন্য, হৃদয়ের স্বাধীন আবেগে সেই দুঃখকে, সেই মৃত্যুকে চিরদিনই বরণ করিতে দেখেছি।' মানুষ এই শক্তির দিক হইতে কতটা উপরে উঠিতেছে, ইহাই হইতেছে বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—'য়ুরোপের সেই শক্তিতে আর যাই হোক, ঔদাসীন্য নেই। এই ঔদাসীন্যেই তামসিকতা।' সত্ত্বের নামে তামসিকতাকে পূজার পাপ হইতে মানুষকে মুক্ত রাখাও বড় প্রয়োজন।

গুণ্ডামীর বাড়াবাড়ি—

সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ভাঙ্গাইয়া এক শ্রেণীর ধড়িবাজ লোক নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, তাহারা আদর্শের ধার ধারে না, সংস্কৃতি বা দেশের স্বার্থকে বুঝে না। কিন্তু তরুণদের অন্তর স্বভাবতই উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে, বিষয়ের ঘুণ তরুণদের চিত্তে ধরে না। ইহাই আমরা বুঝি। সেই তরুণদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি যখন মধ্যযুগীয় অসংস্কৃত অসৌজন্য এবং গুণ্ডামীর আকার ধরিয়া উঠে তখন আমরা অধিক আশ্চর্য্য হই এবং দেশের অধোগতি ভাবিয়া আতঙ্কিত হই। বরিশালে এবং কুমিল্লায় ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে, শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চাটুজ্যে প্রভৃতি হিন্দু নেতাদের উপর যে আচরণ করা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, সাম্প্রদায়িক ধড়িবাজদের প্রচারকার্য্য কতটা বিষজ্বালায় দেশকে জারিয়া ফেলিতেছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক নিজে কুমিল্লা কলেজের ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন সিদ্ধান্ত করাতে বুঝা যাইতেছে যে, বাঙলার মন্ত্রীরা এতদিনে এই সম্পর্কে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। কিন্তু এই ... করা দরকার যে, জাতীয়তার উদার দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দিকে লোকের চিত্ত উন্মুখ হয় যে সব নীতির ফলে, বর্ত্তমান সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে, সেই সব নীতির পরিবর্ত্তন সাধন করা দরকার। চিন্তার ধারাকে বদলাইয়া দেওয়া চাই। দেশের স্বার্থ এবং জাতির স্বার্থের প্রাধান্য যে সব নীতিতে সুস্পষ্ট হইবে সাম্প্রদায়িকতার উপরে সেই সব নীতি এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিবে। নিন্দনীয় স্থলে যে কার্য্যরূপ দেখা যাইতেছে, তাহার মূলের কারণটি দেখিয়া, সেই কারণকে দূরে করিতে হইবে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দান—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে বঙ্গের সেবা-মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। বাঙলা দেশের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব বিনিয়োগ করিয়াছেন; বাঙলার তরুণেরা কিসে মানুষের মত মানুষ হইয়া দেশের মুখ এবং জাতির মুখ উজ্জ্বল করিবে, এই চিন্তাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা; গত অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের একমাত্র সাধ্য এবং সাধনাই হইয়াছে বাঙলা দেশের উন্নতি। আজ তিনি কর্ম্ম-জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও এই বাঙলা দেশের ছাত্র এবং তরুণদের কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। সম্প্রতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ১০ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন, এই টাকার সুদ হইতে প্রতি এক বৎসর অন্তর বিজ্ঞান কলেজে যে সব গ্রাজুয়েট ছাত্র প্রাণিতত্ত্ব অথবা উদ্ভিদতত্ত্ব-সম্বন্ধে গবেষণা করিবে, তাহাদের মধ্যে যোগ্যতমকে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করা হইবে। ইতিপূর্ব্বেই বিজ্ঞান কলেজের অতিরিক্ত গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এবং নাগার্জ্জুন বৃত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার দানে ধন্য হইয়াছে। বাঙলা মায়ের এই সাধন-নিষ্ঠ সন্তানের আদর্শ বাঙলা দেশ এবং বাঙালী জাতির চিরদিন সম্পদ হইয়া থাকিবে।

রুষিয়ার মতিগতি—

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলোটোভ সম্প্রতি পোলীশ রাজ্য দখল সম্বন্ধে বেতারযোগে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিতেছেন—'কেহই প্রত্যাশা করিতে পারে নাই, পোলীশ রাষ্ট্র এত সহজে ঘায়েল হইবে; কার্য্যত সে যখন ঘায়েল হইয়াছে, তখন লালফৌজ তাহার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছে। * * পোল্যাণ্ডে এমন একটা অবস্থা দেখা দিয়াছে যাহাতে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে তাহার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ...

পোল্যাণ্ডে যে কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, যাহার ফলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিপদাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ ছিলেন, এখন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা আর উদাসীন থাকিতে পারেন না।'

পোল্যাণ্ডের পরাজয়ে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কোন দিক হইতে বিপদের আশংকা করিতেছিলেন, এই উক্তি হইতেই আভাষে তাহা বুঝা যায়। শেষাংশে তাহা আরও সুস্পষ্ট। সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব বলিতেছেন—

'নেতৃত্ব পরিত্যক্ত পোল্যাণ্ড আজ সহজ শিকারে পরিণত হইয়াছে এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক যে কোন রকম আকস্মিক ঘটনা সেখানে ঘটিতে পারে।'

জার্ম্মানীকে সোভিয়েট রুষিয়া কেমন দৃষ্টিতে দেখে বিবৃতিতে তাহা বুঝা যায় এবং ইহাও বুঝা যায় যে, জার্ম্মানীর শক্তি যাহাতে বাড়ে সোভিয়েটের তাহা কাম্য নয়।

পূজার বাজার—

পূজার বাজার ক্রমেই জাঁকিয়া উঠিতেছে। একান্ত যাঁহার অভাব, তাঁহাকেও বৎসরের মধ্যে একমাস কিছু না কিছু বেশী খরচ করিতে হয়। বস্ত্র এবং প্রসাধন দ্রব্যেই এই ব্যয় হয় বেশী। এই পূজার বাজারে যে টাকাটা আমরা ব্যয় করি, সে টাকাটা আমাদের দেশবাসীর কাজে যাহাতে লাগে সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সেইভাবে যদি আমরা টাকাটা খরচ করি, তবে নিজেদের সখতো মিটেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের অভাব মিটাইয়াও আমরা অন্তরে একটু গভীরতর আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারি। সকলে এই দিকটা ধরিতে পারেন, এমন আশা করা যায় না, তাঁহারা যাহাতে খরচ কম হয়, অথচ ভাল জিনিষ পাওয়া যায়, এইটাই বেশী দেখেন। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই দিক হইতেও বাঙলা দেশের উৎপন্ন বস্ত্র এবং প্রসাধন দ্রব্য আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। আমরা আশা করি দেশবাসী মাত্রেই পূজার বাজারে যাহাতে বাঙলার টাকা বাঙালীর ঘরে থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

ভারতে ব্রিটিশ নীতি—

প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের উল্লেখ আছে; এমন কি, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এবং রোডেশিয়ারও নাম আছে, কিন্তু ভারতের নাম নাই। শ্রমিক সদস্য মিঃ এটলী ভারতবর্ষের কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—অধীন জাতি হিসাবে নহে, ব্রিটেনের সমান অংশী-দারস্বরূপেই ভারতীয়দিগকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান করা হইতেছে, পার্লামেণ্ট হইতে এরূপ ঘোষণা করা উচিত। মিঃ গ্যালাচার নামক একজন সদস্য কমন্স সভায় এই প্রশ্ন করেন যে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বিবৃতিতে সম্প্রতি যে নীতি ঘোষণা করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইয়াছে কি না; উত্তরে বলা হয় যে, বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইবে। বলা বাহুল্য কৌশলে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। কয়েকদিনের মধ্যেই বিবৃতি আশা করা যাইতেছে।

কলিকাতায় টাইফয়েডের প্রকোপ—

ভারত সরকারের ১৯৩৭ সালের স্বাস্থ্য-বিভাগীয় রিপোর্টে প্রকাশ, এক জ্বর-রোগেই ঐ বৎসর ভারতবর্ষে ৩০ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। ইহার মধ্যে ১০ লক্ষ মারা গিয়াছে ম্যালেরিয়া জ্বরে। এই সংখ্যার মধ্যে বাঙলা দেশের অবদান কতটা বুঝা যাইতেছে না; তবে বাঙলাদেশ যে এ বিষয়ে কোন প্রদেশের পিছনে নয়, একথা বলাই বাহুল্য। কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত হিসাবে দেখা যায়, ১৯৩৮ সালে এই কলিকাতা শহরে কেবল টাইফয়েড রোগেই মারা গিয়াছে ১২৮৪ জন লোক এবং বর্ত্তমান বৎসরে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত শহরে ঐ রোগে মৃত্যু-সংখ্যা এক হাজার; বৎসরের আরও তিন মাস বাকী আছে; সুতরাং বার্ষিক হারটা পূরা হইবে সন্দেহ নাই। অন্য দেশের লোক ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া পরমায়ুর মাত্রা বাড়াইতেছে; কিন্তু আমরা ক্রমেই স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছি। আমাদের আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসের আধ্যাত্মিকতা ইহা নয়, ইহা সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিগত উদাসীনতা। এই যে কলিকাতা শহরে কয়েক মাস হইল টাইফয়েড রোগ বলিতে গেলে একরকম মহামারীর মত চলিতেছে, আমরা মনে-প্রাণে ইহার প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করিতেছি কি? এ সব ব্যাপারে সজাগ হইবার প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বনে কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য করিবার কর্ত্তব্য প্রত্যেকের রহিয়াছে, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

পশ্চিম সীমান্তে সংগ্রামের গতি

একমাস হইল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এই এক মাসের ঘটনার হিসাব নিকাশ দিতে গিয়া ব্রিটিশ নৌ-সচিব মিঃ চার্চ্চিল সেদিন জানাইয়াছেনঃ—

'এই একমাসের মধ্যে প্রধানত তিনটি ব্যাপার ঘটিয়াছে। প্রথমত রুষিয়া এবং জার্ম্মানী পোল্যান্ড দখল করিয়াছে; কিন্তু পোলজাতি দমে নাই এবং ওয়ারস রক্ষার জন্য পোলেরা যে বীরত্ব দেখাইয়াছে, তাহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহারা অপরাজেয় এবং আবার তাহারা মাথা তুলিবে। দ্বিতীয়ত রুষিয়ার প্রাধান্য বৃদ্ধি। রুষিয়া নাৎসী আক্রমণ প্রতিরোধের প্রবল শক্তি লইয়া পূর্ব্ব সীমান্তে দাঁড়াইয়াছে। পাইতেছেন যে, বাল্টিক সমুদ্রে প্রভাব বিস্তারের আশায় কোরিডর এবং ডানজিগের উপর তাঁহার এত নজর ছিল, রুষিয়া সেই চাল ব্যর্থ করিয়া দিল। এস্তোনিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া রুষিয়াই বাল্টিক সমুদ্রে পাখা বিস্তারে আজ উদ্যত। বাল্টিক সমুদ্রের ধারে এস্তোনিয়ার উপর রুষিয়ার প্রভাব জার্ম্মানীর পক্ষে ভীতির কারণ না হইয়া পারে না। রুষিয়ার সঙ্গে এস্তোনিয়ার দশ বৎসরের জন্য যে বাণিজ্য-চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে রুষিয়া এস্তোনিয়ার উপকূলবর্ত্তী বাল্টিক সমুদ্রের দুইটি দ্বীপে এবং সমুদ্রের ধারে পেলডিস্কি বন্দরে নৌ-বহরের ঘাঁটী এবং উড়োজাহাজের ঘাঁটী করিবার

বেলজিয়মের ভূগর্ভস্থ দুর্গ হইতে সৈন্যগণ বিশ্রাম-শিবিরে যাইবার জন্য উঠিয়াছে

রুষিয়া জার্ম্মানীকে কার্য্যত শাসাইয়া দিয়াছে যে, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে সে যেন হাত বাড়াইতে না যায়। তৃতীয়ত ডুবো জাহাজযোগে আতঙ্ক সৃষ্টি করা জার্ম্মানীর পক্ষে ব্যর্থ হইয়াছে। হিটলারের শান্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া চার্চ্চিল জানাইয়াছেন যে, হিটলার নিজের খুশীমত যুদ্ধ বাধাইয়াছেন, যুদ্ধ শেষ করিব আমরা।

পোল্যান্ডের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে, এবং এই ব্যাপারের পর জগতের রাষ্ট্রনীতিক কেন্দ্রস্থল এখন স্থানান্তরিত হইয়াছে মস্কোতে। সেখান হইতে যেভাবে কাঁটা ঘুরিতেছে, জার্ম্মানীকে সেইভাবে চলিতে হইতেছে। প্রকৃত-পক্ষে দেখা যাইতেছে, এ পর্য্যন্ত একরকম ফাঁকির উপর দিয়া সুবিধা করিয়া লইয়াছে রুষিয়া এবং রুষিয়া যেভাবে চারিদিক হইতে জার্ম্মানীকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে তাহার সেই প্রেমের ডোরে জার্ম্মানী পিষ্ট হইতে বসিয়াছে। জার্ম্মানীর জয়লাভের আশা, হিটলারী-তন্ত্রের মাথা তুলিবার সম্ভাবনা জগৎ হইতে চিরতরে লুপ্ত হইয়াছে। রুষিয়ার এই চাল হিটলার না বুঝিয়াছেন [illegible]

অধিকার লাভ করিয়াছে। এইভাবে রুষিয়া নূতন সুযোগে এস্তোনিয়ার উপরে জাঁকিয়া বসিল। পূর্ব্ব প্রুসিয়ার কোয়েন্সবার্গের অদূরে অতঃপর তাহার নৌ-বহর থাকিবে এবং নাৎসীদের সঙ্গে যোগ দিয়া এস্তোনিয়া এতকাল রুষিয়ার স্বার্থের যে আতঙ্ক ঘটাইয়াছে, তাহা হইতে রুষিয়া নিরাপদ থাকিবে। এস্তোনিয়াতেও রুষিয়া যে সুবিধা করিয়া লইয়াছে ল্যাটভিয়াতেও সেই সুবিধা সে করিবে। জার্ম্মানী রুষিয়ার এই চালটা না বুঝিতেছে তাহা নয়, কিন্তু পোল্যান্ডের বাঁটোয়ারার ন্যায় এক্ষেত্রেও সে নিরুপায়। রুষিয়াকে বাধা দিতে সে পারে না। তারপর, বলকান রাজ্যগুলিতে শ্লাভ জাতির সংহতি শক্তিকে জাগাইয়া রুষিয়া জার্ম্মানীর সে দিক হইতে সকল সুবিধা পাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে রুষ-প্রভাবে আজ জার্ম্মানী পরিবেষ্টিত। জার্ম্মানী ইহা হাড়ে হাড়ে বুঝিলেও এখন সে সব সহ্য করিয়া যাইবে, রুষিয়াকে চটাইবার সাহস তাহার নাই। [illegible]

সহজেই বুঝা যাইতেছে। আলবেনিয়া দখল করিয়া ইটালী ধীরে ধীরে বলকানে নিজের প্রভাব বিস্তার করিবে, এই আশা করিতেছিল। রুশিয়া বলকানের ব্যাপারের মধ্যে আগাইয়া আসিয়া তাহার সে সাধে বাদ সাধিল। জার্ম্মান-ইটালী পরীতের পথে আজ রুশিয়া হইয়াছে অন্তরায়। এই সব বাধা দূর করিবার জন্য পোল্যান্ডকে রুশিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে একেবারে ভাগাভাগি না করিয়া রুশিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে নামে মাত্র স্বাধীন একটি পোল রাষ্ট্র গঠন করিবার কথা জার্ম্মানী তুলিয়াছে; কিন্তু তাহার ফলেও মধ্য ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে রুশিয়ার রাজনীতিক প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইবে না। ইটালীর পররাষ্ট্র-সচিব কাউণ্ট সিয়ানোর বার্লিন গমনের মূল কারণ রহিয়াছে এইখানে। হিটলার-ষ্টালিন জোট বাঁধিয়া আজ শান্তির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন, স্থায়ী শান্তি ইহাতে ঘটিবে না; বরং বৃহত্তর বিগ্রহের পথই প্রশস্ত হইবে। পোল্যান্ডের স্বাধীনতা যখন গিয়াছে, তখন আর লড়াই চালাইও না, জগতের শান্তির সেবক হও,—হিটলার রুশিয়ার বেনামে আজ যে কথা বলিতেছেন, তাহার কোন মূল্যই নাই; সুতরাং ইংরেজ কিংবা ফরাসী কেহই এমন পরামর্শ মানিয়া চলিতে পারিবেন না। এই যুক্তিকে মানিয়া লইলেই পশুবলের প্রাধান্যকেই সভ্যতা ও মানবতার উপরে স্থান দিতে হয়।

সর্ত্ত না মানিলে ঝুঁকি আছে,—রুশ-জার্ম্মান সর্ত্তের তাৎপর্য্য যে ইহা—এ কথাটা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু জগৎ হইতে 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতির প্রাধান্যকে নষ্ট করিতে হইলে এই ঝুঁকির একদিন না একদিন সম্মুখীন হইতেই হইবে। আগেই যদি এই ঝুঁকির সম্মুখীন ইংরেজ এবং ফরাসী হইত, তাহা হইলে হিটলারী জোর এতটা বাড়িত না, কিন্তু এখন ইংরেজ বা ফরাসীর পক্ষে আর পিছাইবার উপায় নাই; সুতরাং যুদ্ধ চলিবে এবং তাহার ফলে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে মিতালীর মূল্যেরও পরীক্ষা হইয়া যাইবে। স্বার্থের হিসাব-নিকাশ করিয়া আধুনিক যে সব আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে এই মিতালীর দিক হইতে অনেক অঘটন ঘটিতে পারে। রাজনীতিতে আজ যে মিত্র, কাল সে শত্রু; এই কয়েক দিনেই এইরূপ সম্পর্কের পরিবর্ত্তন আমরা দেখিয়াছি এবং অচিরে এইরূপ অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন আরও ঘটিতে দেখা যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

পূর্ব্বদিকে আপাতত লড়াই খতম হইল এবং সুরু হইল পশ্চিম সীমান্তের পালা। পশ্চিম সীমান্তে ইতিমধ্যেই লড়াইতে জোর বাড়িয়াছে। ফরাসীরা যোদ্ধা হিসাবে ইউরোপের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট—জার্ম্মানীর জিগফ্রিড লাইন এখনও ভাঙ্গে নাই বটে, কিন্তু ফরাসী সেনা খুব খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে। ফরাসীদের আক্রমণের ফলে রুর প্রদেশের বড় শহর সারব্রুকেনের পতনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। লোকজন সব শহর ছাড়িয়া গিয়াছে। ঘন ঘন কামান এবং উড়োজাহাজের লড়াই চলিতেছে। জার্ম্মানীর নীতি হইল আকস্মিক জোরের সঙ্গে আগাইয়া যাওয়া, ম্যাজিনো লাইন থাকিতে জার্ম্মানী সে দিক দিয়া সুবিধা করিতে পারিবে না। ইংরেজ এবং ফরাসী দুইটি প্রধান শক্তির সঙ্গে লড়িয়া ম্যাজিনো লাইন ভাঙ্গিয়া ফ্রান্সের ভিতরে ঢোকা কিংবা ইংরেজ ফরাসীদের সমর-শৃঙ্খলা ব্যাহত করা জার্ম্মানীর পক্ষে সম্পূর্ণই অসম্ভব; সুতরাং অন্য কৌশল অবলম্বনের জন্য জার্ম্মানীকে ফিকির দেখিতে হইবেই; সেই ফিকিরটি কি আকার ধারণ করিবে ইহাই হইতেছে কথা। জার্ম্মানী আপাততঃ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে কিছু বলিতে চাহিবে না; কারণ, তাহা করিতে গেলে হাঙ্গামায় কিছু না কিছু জড়াইয়া পড়িতে হইবেই; কিন্তু যুদ্ধ যদি বেশী দিন চলে, কিংবা ফরাসী এবং ইংরেজ জোরের সঙ্গে জার্ম্মানীর অভ্যন্তরভাগে জিগফ্রিড লাইন ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে, তাহা হইলে রণ-চাতুর্য্যের খাতিরে বাধ্য হইয়া জার্ম্মানীকে হল্যান্ড কিংবা বেলজিয়ামের অথবা লাক্সেমবার্গের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া তাড়াতাড়ি ফ্রান্সের ভিতর গিয়া জার্ম্মানীর অভ্যন্তরভাগের আতঙ্ক কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রাণের দায়ে তাহাকে এটি না করিলে চলিবে না। এই দিক হইতে ল্যাক্সেমবার্গের ইতিমধ্যেই আক্রমণের কারণ ঘটিয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। জার্ম্মানী যদি ল্যাক্সেমবার্গের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া সেখানে ঢোকে, রুর আক্রমণকারী ফরাসী সেনাদের দক্ষিণ ব্যূহকে সে বিব্রত করিতে পারে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা জার্ম্মানীর পক্ষে নূতন ব্যাপার কিছুই নয়, গত ১৯১৪ সালেও সে ল্যাক্সেমবার্গের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়াছিল এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রদেশটিকে নিজেদের দখলে রাখিয়াছিল। ল্যাক্সেমবার্গ ছোট রাষ্ট্র হইলেও খনিজ সমৃদ্ধি তাহার আছে, সেখানকার লোহার খনি হইতে অনেক লোহা পাওয়া যায়। জার্ম্মানীকে যদি কোন রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিতে হয়, তবে প্রথমেই পালা পড়িবে ল্যাক্সেমবার্গের; তার পরের পালা বেলজিয়াম এবং হল্যান্ডের।

বেলজিয়াম এবং হল্যান্ড, এই দুইটিই স্বাধীন রাষ্ট্র। নির্ব্বিবাদে তাহারা কেহই নিজেদের নিরপেক্ষতা নষ্ট করিতে দিবে না, ইহা নিশ্চিত। বিগত মহাসমরে বেলজিয়াম বিপুল বিক্রমে জার্ম্মান আক্রমণে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘ দিন আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। এবার সে জার্ম্মানীর দিককার সীমান্তভাগকে এই জন্য বিশেষভাবে সুরক্ষিত করিয়াছে এবং ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইনের অনুকরণে ভূগর্ভস্থ দুর্গশ্রেণী সন্নিবেশ করিয়া সীমান্তদেশ সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। বেলজিয়ামের এই সীমান্ত-ভাগস্থ সুদৃঢ় লাইন ৮৩১ মাইল ব্যাপী। এই সব দুর্গে বেলজিয়ামের ৮০ হাজার সৈন্য এবং ৪ হাজার সেনানায়ক রহিয়াছে। ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী ব্যবস্থা আছে পুরাদস্তুরে। ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে মাইন পোতা আছে, একটু নাড়াচাড়া লাগিলেই মাইনগুলি বিস্ফোরিত হইয়া উপরকার শত্রুদিগকে একেবারে উড়াইয়া দিবে। মাঝে মাঝে মাটির নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া এমনভাবে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, শত্রুদের ট্যাঙ্কগুলি জোরে আসিলে সেই সব গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গিয়া বন্দী হইবে।

বেলজিয়ামের ভিতর ঢকাও এই সব কারণে জার্ম্মানীর

পক্ষে গতবারের মত সুবিধা হইবে না; সুতরাং অন্য পথে হল্যাণ্ডের উপরও তাহার নজর পড়িতে পারে। কিন্তু ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কম করেন নাই। হল্যাণ্ডের মোট সৈন্যসংখ্যা ষোল লক্ষ আশী হাজার। হল্যাণ্ডের উত্তর এবং পশ্চিম দিকে সমুদ্র-পরিখা রহিয়াছে, হল্যাণ্ড নীচু জায়গা, নদী-নালায় পূর্ণ। হল্যাণ্ডকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বন্যার জলে প্লাবিত করিয়া ফেলা যায়। এইভাবে জার্ম্মান সৈন্যেরা ভিতরে ঢুকিলে তাহাদের বিপদ আছে। কৃত্রিম বন্যার জলে তাহারা নিজেদের লাইন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বন্ধ হইয়া পড়িবে। হল্যাণ্ডের উপকূলে বড় বড় জাহাজ চালাইবার সুবিধা নাই, চড়ায় আটকাইয়া বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে; এইজন্য হল্যাণ্ড বিশেষভাবে রণতরীসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এগুলি রাইন নদীর মুখে বসিয়া আক্রমণকারী জার্ম্মান সৈন্যদিগকে সহজে কাবু করিয়া ফেলিতে পারিবে। হল্যাণ্ডের বিমান-বীরদের বিশেষ সুনাম আছে। হল্যাণ্ডের বিমান-বীরগণ এবং বিমান নির্ম্মাতাদের খ্যাতি জগদ্বিখ্যাত। রুষ বৈমানিকদের চেয়ে কারিগরীতে এবং উড্ডয়ন-দক্ষতা হল্যাণ্ডের বিমানবীরদের কম নয়, এ পরিচয় তাহারা বহুবার দিয়াছে। সুতরাং বিমান পথে হল্যাণ্ডকে সহজে কাবু করা জার্ম্মানীর পক্ষে সম্ভব হইবে না।

রুষিয়ার মতিগতি কি হইবে? এ সম্বন্ধে এখনও নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। ইংরেজ কিংবা ফরাসী রুষিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চাহে না, তাহাদের এই মতিগতির পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। রুষিয়া কি জার্ম্মানীর পক্ষ লইয়া যুদ্ধে নামিবে? রুষ এবং জার্ম্মানী আজ স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজ ও ফরাসীকে এই কথাই জানাইয়া দিয়াছে যে, পোল্যাণ্ডের অস্তিত্ব—তাহার রাষ্ট্র হিসাবে থাকা না থাকার ব্যাপার আমাদের, তোমাদের তাহাতে কোন কথা বলিবার নাই; তোমরা পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি অবশ্য দিয়াছিলে, কিন্তু পোল্যাণ্ডের স্বাধীন রাষ্ট্রই যখন নাই, তখন স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কাহার? আমরাই এখন পোলিশ রাষ্ট্র। বাস্তবকে বুঝিয়া চল। ফরাসী এবং ইংরেজেরা এমন যুক্তি—বাস্তবের এই দোহাই না মানিয়া রুষিয়া যদি জার্ম্মানীর পক্ষ হইয়া নামে তবে ইংরেজের কর্ত্তব্য কি হইবে? চেম্বারলেন সে জবাব দিয়াছেন। রুষিয়া ও জার্ম্মানীর মিলন অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও অসম্ভব কূটনীতির দিক হইতে কিছুই নাই। জার্ম্মানীর সুবিধা হইবার পথ রুষিয়ার চালে খতম হইয়াছে, এ কথা সত্য; কিন্তু মিতালীর বাহ্য দিকটা লইয়া রুষিয়া আরও কিছু দূর আগাইয়া যাইবে কিনা, এখনও বিবেচ্য আছে। এবং সেই মতিগতির উপর যে যুদ্ধ বর্ত্তমানে ফ্রান্স এবং জার্ম্মানীর সীমান্তদেশের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার ব্যাপকতা আরও বাড়িবে কিনা নির্ভর করিতেছে। যদি তেমন ব্যাপকতা বাড়িবার মত কারণ রুষিয়ার মতিগতির ফলে দেখা না দেয়, তাহা হইলে পশ্চিম সীমান্তে ইংরেজ এবং ফরাসীর সমবেত চাপে জার্ম্মানীকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে। ওদিকে জার্ম্মানীতেও সোভিয়েট প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে, ইংরেজ এবং ফরাসীর নীতি জার্ম্মানীর হিটলারবাদকে বিচূর্ণ করিবার পক্ষে রুষিয়াকে সাহায্য করিবে। রুষিয়া নীতির দিক হইতে এইটি কতটা বুঝিয়া কাজ করিতেছে, নিজেদের মতবাদের উপর কি পরিমাণ নিষ্ঠা কার্য্যত তাহার আছে অর্থাৎ ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করিবার আদর্শ তাহার কতদূর পাকা তাহা তাহারই ...

লোহার বেড়ায় শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক আসিয়া ঠেকিলে বেলজিয়মের এই কংক্রীট নির্ম্মিত গুপ্তস্থান হইতে ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান ছাড়া হইবে।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। বন্ধুরা সকলেই আসে যায় কিন্তু প্রতুল সেই যে গিয়াছে আজিও আসে নাই, কবে আসিবে অথবা আসিবেই কি না তাহাও কেহ বলিতে পারে না—তাহারাও ভাবিয়া পায় না। অলকার একান্ত আগ্রহে সতীশ তাহার বাসায় গিয়া খোঁজ করিয়াছিল বটে কিন্তু নূতন কোন তথ্যই সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে নাই, তাহার একমাত্র ঘরটার দরজায় মস্ত একটা তালা ঝুলিয়া থাকিতেই সে দেখিয়া আসিয়াছে। ঘরের সমস্ত জানালাই বন্ধ, বাহির হইতে এতটুকু আলো প্রবেশের পথও সে রাখিয়া যায় নাই, সতীশের দৃষ্টি এবং অনুমানও তাই রুদ্ধ দরজায় ঘা খাইয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রতুলকে সে চেনে তাই তাহার কথা লইয়া আর বৃথা ভাবিয়া মরে না, কিন্তু অলকা তাহাকে ঠিক এমনি করিয়া ভুলিয়া থাকিতে পারে না। এই যে সতীশের বন্ধুদের আহারের জন্য রান্নাঘর সমস্ত কিছুই সংগ্রহ করিয়া দিতেছে, ওই যে আলমারীর মধ্যে আরও কত কি রহিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য সে দৃষ্টি মেলিয়া রাখিতে পারে না। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সতীশের সুন্দর গৃহটি সে সাগ্রহে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে তাহাকেই হারাইয়া সে কেমন করিয়া উহাদের সহিত মিশিয়া থাকিতে পারে? নিশ্চিন্ত নীরবে সে যে কেমন করিয়া সমস্ত বন্ধনই উপেক্ষা করিয়া সরিয়া গেল তাহাও সে ভাবিয়া পায় না। তাহারই দাদা প্রতুল—তাহাকে ভুলিতে পারিবে না কখনও। অথচ দিদি বলিয়া যাহাকে ওই লোকটি কাছে টানিয়া লইল যাইবার সময় তাহাকে কি সে মুহূর্ত্তের জন্যও মনে রাখিতে পারিল না? তাহাকে ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, কঠিন যাহারা তাহাদের মনে রাখিয়া লাভ কি অথচ ভুলিয়া যাওয়াও কি সহজ?

সেদিনও রোজকার মত সতীশের ঘরে বন্ধুদের সমাগম হইয়াছিল।

মহিম একটু গোঁড়া, পুরাতনের অনেক কিছুই লইয়া নূতনের কিছু কিছু ঘষিয়া মাজিয়া মিশাইয়া সে তাহার চলিবার পথ করিয়া লইয়াছে। সে যাহা করিয়াছে তাহার তুলনা মিলে না মিলিবেও না এই তাহার মত। বন্ধুরা তাই সহজে তাহাকে নিষ্কৃতি দেয় না, তাহার মত ও পথকে যতই তাহারা আক্রমণ করে ততই সে তাহা আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার মত ও পথের দেহে প্রাণ সঞ্চার করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে। আজিও তাহাকে আক্রমণ করা হইয়াছে, এবং কোনও মতে টিকিয়া থাকিবার জন্য সে তাহার তূণের চোখা চোখা কথাগুলি হাতড়াইয়া বাহির করিয়া শত্রুপক্ষকে কাবু করিবার জন্য সে নিক্ষেপ করিতেছিল।

অনেক কথার পর নিতাই হঠাৎ বলিল, আচ্ছা মহিম তোমার চমৎকার কয়েকটা মত আছে আর সেই মতের জোরে সুন্দর পাঁচ বাঁধানো কয়েকটা পথও ত' তুমি করেছ—এখন বল দেখি আমাদের সাহিত্যিকের নবতম আবিষ্কারকে নিয়ে কি করা যায়?

মহিম তাহার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া বলিল খোঁচা দিলে বটে কিন্তু কি তুমি জানতে চাও আমার কাছে সেটাই ব'ললে না সোজা ক'রে। কি তুমি ব'লতে চাও সেটাই বল একটু পরিষ্কার ক'রে, তারপর দেখি আমার নিয়মের মধ্যে ফেলতে পারি কি না তাকে।

নিতাই বলিল, বেশ তবে বুঝিয়েই ব'লছি, সতীশ হঠাৎ আবিষ্কার ক'রেছে অলকা দেবীকে—এখন তোমার মতে তাঁর কি করা উচিত।

সকলেই তাহার চমৎকার উপদেশ শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

সতীশ ধীরে ধীরে বলিল, এ প্রশ্ন আমিই করছি তোমাদের সকলকে, আমি অনেক ভেবেছি কিন্তু কোন উপায়ই ক'রতে পারিনি। কি ক'রে ওর আত্মীয়দের আমি খুঁজে বের ক'রতে পারি? তোমরা বেশ ক'রে ভেবে দেখ, এটা জানা আমার একান্ত প্রয়োজন।

জগদীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, সে ঠিক, অনেক দিন ভেবেও আমরা কোন পথ পাইনি—প্রতুলবাবুও সব কিছু জানেন কিন্তু তাঁর কথা না ভাবাই ভাল, এসব তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না। কিন্তু তোমাদের সবার মতটা জানান উচিত কারণ ভবিষ্যতে আমাদের একটা পথ ঠিক ক'রে নিতে হবে ত'?

নিতাই বলিল, তাই ত' মহিমের মত আমরা সব চেয়ে আগে জানতে চাই।

মহিম খানিকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিল, আগে নিয়ম ছিল এক বছর স্বামীর কোন খোঁজ না পেলে বিধবার মত জীবন-যাপন করা। আমি অবশ্য অতটা ক'রতে বলি না, তবে—।

তাহার কথা শেষ হইতে পারিল না, অনেকেই হাসিয়া উঠিল।

বিধান বলিল, তবে আধা বিধবার মত চালালেই যথেষ্ট আর এক বছরের যায়গায় বছর ছয়েক করা যেতে পারে, এই ত'?

মহিম আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, তাই ব'লে কি তুমি ব'লতে চাও এসবও ঠিক? স্বামীর খোঁজ যার পাওয়া যাচ্ছে না, সে আছে একজন অপরিচিত লোকের কাছে তাকেও থাকতে হবে ঠিক ঘরের বৌয়ের মতই আনন্দিত হ'য়ে

'তবে কার মত মুখ ক'রে থাকবে?' জগদীশ জিজ্ঞাসা করিল।

মহিম উত্তেজিত হইয়া বলিল, কার মত মুখ ক'রে থাকবে জানি না তবে হাসি তার চ'লবে না, চ'লবে না তার সাজ পোষাক আর অপরের মাঝে এসে বসা।

সতীশ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এত স্পষ্ট করিয়া সে ত' কোন দিনও নিজের মনের ভাব ব্যক্ত ক'রে নাই। ইহাই যদি তাহার মনের কথা হইয়া থাকে তাহা হইলে সকলকে ত' সে কোন দিনই ভাল চক্ষে দেখিতে পারিবে না, কোন দিনই সৎ বলিয়া তাহাকে এতটুকুও শ্রদ্ধা করা দূরে থাকুক অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে অপমানই করিবে নিশ্চয়। এই যে আরও অনেকে বসিয়া আছে তাহাদের কাহারও কাহারও

মনেও হয় ত' এমনি অনেক কিছুই লুকাইয়া আছে, হয় ত' অকস্মাৎ এমনি করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াই একদিন তাহাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইবে। কাহাকে ফেলিয়া যে কাহাকে বিশেষ করিয়া বিশ্বাস করা চলে তাহা সে ঠিক ভাবিয়াও পাইল না।

নিতাই বলিল, স্বামীকে সে ত' বুঝতেও পারেনি, অল্প কিছুক্ষণ তার সঙ্গে দেখা, হয়ত' একটা কথাও হয়নি, এক্ষেত্রে কি ক'রেই বা তোমার ব্যবস্থা লোকে মেনে নিতে পারে?

গম্ভীর হইয়া মহিম বলিল, কি ক'রে মেনে নিতে পারবে জানি না, কিন্তু মেনে নিতে হবে, নেওয়া উচিত এটুকুই জানি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বদলের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মন বদলায়। স্বামীর অবর্ত্তমানেও যদি মেয়েরা হেসে বেড়ায় তবে পতনের এতটুকু দেরীও হয় না।

জগদীশ বলিল, ওসব ছেলেবেলাকার কথা, নীতিবাগীশের অনেক উপদেশই আমরা জানি, কিন্তু সেই নীতির চেয়েও বড় মানুষ। তোমার কথার উত্তর দেওয়া সহজ হ'লেও সে সবগুলোকে উপেক্ষা করাই বোধ হয় আরও ভাল। হাসতে হবে কি না তা' জানবার দরকার আমাদের নেই, আমাদের শুধু জানা দরকার কি উপায় করা যায় এখন। তার সম্বন্ধে যদি কিছু পরামর্শ দিতে পার ত' দাও।

পরামর্শ দিতে বলা সহজ, দেওয়াও হয়ত' অনেক সময় সহজ কিন্তু তাই বলিয়া এক্ষেত্রে কেহই কোন কিছু বলিতে সাহস করিতেছিল না। মহিম তাহার কথা বলিয়াছে, অন্য সকলেই তাহার মতকে নিতান্ত বাজে বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে সত্য, কিন্তু সঠিক কোন পথও কেহ দেখাইতে পারে নাই। সতীশ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিল না, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা যাহা প্রয়োজন তাহা ত' কই কাহারও কাছে শুনা যাইতেছে না—কতকগুলি কথা শুনিয়া লাভ কি, অনেক কথাই সে নিজে কহিতে পারে, প্রয়োজন হইলে লিখিতেও পারে।

জগদীশের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, যদি কোন কিছুই কেউ না বলতে পার ত' ওকথা আর তুল না, ওসব আমার পক্ষে এখন ভুলে থাকাই ভাল।

মহিম তাহার দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, তার মানে তুমি বলতে চাও যে ওর স্বামীর খোঁজ না পেলে ও তোমার কাছেই থেকে যাবে? তা কি ক'রে হ'তে পারে! পরস্ত্রীকে কি শেষ কালে—!

নিতাই হাসিয়া উঠিয়া বলিল, ভয় নেই মহিম, পরস্ত্রীকে নিজের স্ত্রী সতীশ কোন দিনই ক'রবে না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমার আদর্শ রসাতলে যাবে না কিছুতেই।

হাসিয়া অজিত বলিল, সতীশ ত' আর মহিম নয় তাই ত' আমাদের আদর্শবাদীর এত ভয়। সাহিত্যিক সতীশ দরদী নিশ্চয় তাই কোন মেয়ের দুঃখ দেখে যদি—কি বলতে মহিম এই ত' তোমার মহা ভাবনা, আমিও কিন্তু তোমার দলে। মুখটাকে অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া সে মহিমের দিকে চাহিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে সতীশ বলিল, কিন্তু অলকাকে নিয়ে আর তামাসা ক'রতে দিতে চাইনা আমি। সে আমার আশ্রয়ে আছে বটে তবু নিজের মর্য্যাদা সে বোঝে, কোন কাজে অথবা কথায়ও তার অপমান হ'তে দিতে আমি পারব না। তোমরা যদি পার ত' অন্য কথা বল। সতীশের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল তাহা দেখিয়া সকলেই তাহার মনের সত্যকার কথা বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিল। এ কথা লইয়া আর আলোচনা করিয়াও কোন ফল হইবে না, হইবে শুধু তাহাদেরই বন্ধুকে আঘাত করা ইহা তাহারা অতি সহজেই বুঝিতে পারিল। কেবলমাত্র মহিম সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হয়ত' মনস্তত্ত্বের অনেক কিছুই সে পড়িয়াছে, হয়ত' সতীশের মুখ হইতে তাহার মনের সব কিছুই সে বাহির করিয়া লইতে চায়—এমনি না হইলে তাহার পথকে সে বাঁচাইবে কেমন করিয়া, মতকেই বা আঁকড়াইয়া ধরিয়া কি উপায়ে তাহাকেই সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া অমোঘ বলিয়া প্রচার করিবে!

আস্তে আস্তে মহিম বলিল—কি ক'রতে চাও তুমি?

সতীশ চক্ষু তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, সমস্ত মুখে তাহার বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কোন কথাই সে বলিতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষুতে একান্ত অনুরোধ ঝরিয়া পড়িল, মুখের ভাষা অপেক্ষাও উহা স্পষ্ট হইয়া সমস্ত আলোচনা থামাইয়া দিতে মিনতি জানাইতেছিল—তাহা সকলে বুঝিতে পারিলেও মহিম বোধ করি বুঝিল না অথবা বুঝিয়াও উপেক্ষা করিল।

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, কি তুমি ক'রতে চাও তাকে নিয়ে?

ম্লান চক্ষু মেলিয়া সতীশ বলিল, আমি কিছুই ক'রতে চাই না মহিম, কিন্তু সত্যিই কি তুমি চুপ ক'রবে না? আমি আর ওসব শুনতে চাই না, তুমিও যদি ক্ষান্ত দাও ত' আমি খুবই সুখী হব।

ঠিক এমনি সময় রামহরি উপেনবাবুকে সেই ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য সতীশের চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্যই। পরমুহূর্ত্তেই সতীশ নিতান্ত অবশ হইয়া পড়িল। এই বার যে কথা উঠিবে তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার এতটুকু পথও সে খুঁজিয়া পাইল না। এ সময় একটি লোকের কথা কেবলই তাহার মনের দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল, যদি সে এখানে এ সময় উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে সমস্যা হয়ত' অনেকটা সহজ হইয়া যাইত। পরের সমস্ত বিপদ অত্যন্ত সাধারণভাবে সকলের অজ্ঞাতেই কেমন করিয়া সে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লয় এবং কেমন করিয়া সমস্ত কিছু কাটাইয়া উঠিয়া সে সহজভাবেই কথা কহিয়া যায়, তাহা তাহার অপেক্ষা ভাল করিয়া আর কে জানে? কিন্তু কোথায় সে, বিদায় লইয়া যে যায় নাই, বলিয়া কহিয়া কি সে কোন দিনও আসিবে? ধূমকেতুর মত সে আসিয়া পড়ে, নিতান্ত অলসভাবেই দিন কাটাইয়া দিতে এতটুকু আপত্তিও সে করে না; আবার কখন ঠিক ধূমকেতুর মতই সে বাহির হইয়া যায়—সকলের অজ্ঞাতে অথচ তাহাকেও এতটুকু না লুকাইয়া। তাহাকে ভাবা যায় না অথচ না ভাবিয়াও উপায় নাই। এই যে জগদীশ, নিতাই প্রভৃতি তাহাকে ভরসা দিতেছে তাহাদের সেই ভরসা কতটুকু? এই বার যে কথা উঠিবে তাহার কাছে তাহারা নিজেরাও হয়ত' এতটুকু

ভরসা পাইবে না। কিন্তু আর ভাবিতেও সে পারিল না, সহজভাবেই সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উপেনবাবু বলিলেন, তারপর আছেন কেমন? এখানে এসে অসুখ আর হয়নি ত'?

ম্লান হাসি হাসিয়া সতীশ বলিল, না আর কোন অসুখই হয়নি, আসুন আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

উপেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই। এঁরা যে আপনার বন্ধু তা' আমি আগেই বুঝতে পেরেছি, কেবল আমার পরিচয়-টাই পাননি এঁরা—না পেলেও ক্ষতি নেই বোধ হয় কারণ এই সাহিত্যিক সমাজের মধ্যে আমার মত উকীলের প্রবেশ চিরকালই নিষেধ থেকে যাবে। সেখান থেকে এসে আর দেখা হয়নি তাই আসা। সময়ও বড় একটা পাই না কিন্তু ওপরওয়ালার অর্থাৎ আমার তাঁর তাগাদার দৌড়ও কম নয়, ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন আজ।

জগদীশ বলিল, আদেশের জোর আছে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের লাভই হ'য়েছে তাতে, আপনার সঙ্গে আলাপ ত' হয়ে গেল।

কপালে করাঘাত করিয়া উপেনবাবু বলিলেন, আমি বিখ্যাত কিছু নই যে আলাপ হবার গৌরবে আপনারা ফুলে উঠবেন, অতএব বিনয় প্রকাশের কোন প্রয়োজনই নেই। আদেশটা কিন্তু আমার কাছে একটু বড় ব'লেই মনে হ'য়েছে, কোথায় গেলুম তাঁর কাছ ঘেঁসে একটু বসতে, তা নয়—। আপনার বরাত কিন্তু ভাল, আচ্ছা তাও বাড়ীতে—আপনার গিন্নীটি কিন্তু বেশ, এমনি স্ত্রী যদি আমিও পেতুম!

বন্ধুরা বিস্মিত হইয়া উঠিল। নির্জ্জন পথে গভীর রাত্রে একা পথ চলিতে চলিতে অকস্মাৎ সম্মুখে ভূত দেখিলে মানুষ যেমন করিয়া চমকাইয়া ওঠে ঠিক তেমনিভাবে চমকাইয়া উঠিয়া মহিম বলিল, কার স্ত্রীর কথা ব'লছেন আপনি? সতীশের—?

উপেনবাবু বলিলেন, নিশ্চয়, সতীশবাবুর স্ত্রীর কথাই ব'লছি আমি। সত্যি অমন স্ত্রী আর হয় না। এই ত' কিছুদিন আগে তাঁকে নিয়ে উনি গিয়েছিলেন বেড়াতে, আমরাও ছিলুম সেখানে—আহা! স্ত্রীকে বুকের কাছে নিয়ে যখন উনি দাঁড়িয়ে থাকতেন, সেই মেলার কথা মনে আছে ত' সতীশবাবু—কিন্তু কি হ'ল আপনার, অমন ক'রছেন কেন, অসুখ করেনি ত'?

সতীশের মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সমস্ত দেহ টলিতে লাগিল। সে আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না, মুহূর্ত্তেই তাহার মুখের সমস্ত রক্তই কে যেন নিঃশেষে শুষিয়া লইল। সম্মুখস্থ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া সে স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

সমস্ত কিছু শুনিয়া মহিম উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, আর থাকিতে না পারিয়া সে বলিল, আপনি অন্যকার কথা ব'লছেন কি উপেনবাবু? কিন্তু সে ত' সতীশের স্ত্রী নয়।

উপেনবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, স্ত্রী নয় মানে? তবে তিনি সতীশবাবুর কি হন!

'কেউ নয়।' মহিম উত্তর করিল।

ভুরু কুঁচকাইয়া উপেনবাবু বলিলেন, মিথ্যা কথা। আমাদের কাছে তাঁকে স্ত্রী ব'লেই পরিচয় দিয়েছেন উনি। যদি এর মধ্যে রহস্য কিছু থেকে থাকে ত' আমায় মাপ করবেন। আমি জানতুম না যে অনেকের এমন অনেক স্ত্রীই থাকে, তাঁদের বিভিন্ন স্থানে যে বিভিন্ন পরিচয় থাকে তাও আমি ভাবিনি। কিন্তু যাক আমি চলি, আমার স্ত্রীও আসতে চেয়েছিলেন, সৌভাগ্য ব'লতে হবে যে তাঁকে এখানে—হয়ত' সে মহিলাটি, যাঁর বিভিন্ন রূপ আপনি দিতে চান, এখানেই আছেন এখনও। থাকুন তিনি, আপনারাও থাকুন, আমি চললুম।

উপেনবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সতীশ কিন্তু কিছুতেই মাথা তুলিতে পারিতেছিল না। আজই হয়ত' তাহার সমস্ত কিছু শেষ হইয়া যাইবে, আজই হয়ত' তাহার সমস্ত সম্মান সকলের পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। কেহই তাহাকে তুলিয়া ধরিতে আসিবে না, সকলেই হাসিবে এবং হাসিয়াই দেখিয়া চলিয়া যাইবে মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া এতটুকু সহানুভূতিও জানাইবে না।

জগদীশ ধীরে ধীরে বলিল, অমনি ক'রে থাকলে ত' চলবে না সতীশ। আমি ও-সব কিছুই বিশ্বাস করি না। সবই মানুষের ভুল, আর ওই ভুল জিনিষটা এমনই মজার যে কেউ তা ঠিক বুঝতেও পারে না।

সতীশ মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, তারপর ফিরিয়া চাহিল অন্য সকলের দিকে। কোন কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না সমস্ত মুখে ভাসিয়া উঠিল একটা অসহায় ভাব।

মহিম এই বার উত্তেজিতভাবে বলিল, ছিঃ, এ আমি ভাবতেও পারিনি। এমনি ক'রেই কি মানুষের অধঃপতন হয়। মানুষ হ'য়েও মনুষ্যত্ব নেই এতটুকু? এতটুকু সংযমও নেই কি? পরের স্ত্রীকে—ছিঃ।

মহিম উঠিয়া দাঁড়াইল। এখানে তাহার মত লোকের থাকা চলে না। যাহারা ভোগটাকেই বড় করিয়া তুলিয়া ত্যাগের কথা ভাবিতেও ভুলিয়া গিয়াছে তাহাদের সহিত আর যাহারই সম্পর্ক থাকুক তাহার কিছুতেই থাকিবে না। সে যাহা ভাল মনে করে তাহার বাহিরেও হয়ত কিছু কিছু সে মার্জ্জনা করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া এত বড় অধঃপতন সম্মুখে দেখিয়াও সে না সরিয়া থাকিতে পারে কেমন করিয়া! উঠিয়া সকলের দিকে একবার চাহিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

অজিত প্রভৃতি অন্য সকলেই উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আজ তাহলে আমরা আসি। পরে একদিন আসা যাবে, আজ কিন্তু দেরী হয়ে গেছে।

নিতাই বলিল, কিছুই বুঝতে পারছি না সতীশ কিন্তু বুঝতে চাই আমি, ভেবে দেখবার সময় চাই—তারপর যা হয় হবে, আচ্ছা আসি আজ।

সকলেই বাহির হইয়া গেল, গেল না কেবল জগদীশ। সে যে কেন গেল না তাহা সেই জানে, সতীশ কিন্তু ভাবিয়া পাইল না। তাহাকে এমন করিয়া কোন দিনও সে ভাবিয়া দেখে নাই, সে যে এত বড়ও হইতে পারে তাহা ধারণা করিতেও সে পারে নাই।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে সতীশ বলিল, কিন্তু তুমি জগদীশ?

মৃদু হাসিয়া জগদীশ বলিল, আমি? আমার কথা

শেষাংশ ৫৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

যুদ্ধ

অনেক দিন—অনেক দিন আগে পৃথিবীর অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতো যে জংলী মানুষ হাতে নিয়ে তীরধনুক আর সুতীক্ষ্ণ বর্শা—সেই পশুচর্ম্ম-পরিহিত ব্যাধের হিংস্র প্রবৃত্তি বারে বারে তার নগ্ন কদর্য্যতায় আত্মপ্রকাশ করছে লড়ায়ের মধ্যে। সভ্যতা মানুষের বাহিরের একটা আবরণ মাত্র। অন্তরে সে আজও রক্তলোভাতুর বর্ব্বর। তাই রণডঙ্কা বেজে উঠ্‌লেই তার শিরায় শিরায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে উত্তপ্ত রক্তধারা।

আশ্চর্য্য এই যে, বিধাতা পুরুষকে মানুষ খুন করবার জন্য তৈরী করেনি। নারীর কাজ যেমন সৃষ্টি করা—পুরুষেরও তাই। নারী সৃষ্টি করে সন্তানকে। দশমাস দশদিন গর্ভ ধারণের দায় থেকে পুরুষ যে মুক্তি পেলো—সেও সৃষ্টরই জন্য। পৃথিবী ছিলো অহল্যার মতো প্রাণহীন পাষাণ হ'য়ে। পুরুষ এলো দুর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের মতো শস্যহীনা পৃথিবীকে হেমন্তের সোনালি ধানের প্রাচুর্য্যের মধ্যে জীবন্ত ক'রে তুলতে। লাঙল নিয়ে ইতিহাসের রংগমঞ্চে পুরুষ দেখা দিলো বলরামের বেশে। হলধরের চরণস্পর্শে পৃথিবীর অংগে অংগে খেলে গেল পুলকের শিহরণ। কুমারী ধরিত্রীকে দিয়ে পুরুষ প্রসব করালো রাশি রাশি শস্যসম্ভার। ধরণীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে পুরুষ তাকে হলমুখে ক'রে তুললো ফলে ফুলে ঐশ্বর্য্যশালিনী।

কিন্তু কৃষিকার্য্যের মধ্যে মুক্ত জীবনের আনন্দ কোথায়? শত্রুর দলকে লড়ায়ে হারিয়ে দিয়ে তাদের স্তূপীকৃত ছিন্নমুণ্ডের পীরামিডের উপরে জয়ধ্বজা উড়িয়ে দেবার গৌরব কোথায়? বিপদ নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে খেলা করবার সুতীব্র উল্লাস কোথায়? কৃষকের শান্ত জীবন—তার মধ্যে সমরজয়ী বীরের অমর মহিমা কোথায়? সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মাঠে কেবল খাটো আর খাটো আর খাটো! খোন্তা আর শাবল দিয়ে দিনের পর দিন খুঁড়ে চল মাটি, ওপড়াও আগাছা! এ কি একটা জীবন? এর চেয়ে যোদ্ধার জীবন অনেক বেশী আনন্দের, অনেক বেশী গৌরবের! প্রভাতের সূর্য্যালোকে হাজার হাজার বীরের হাতে বর্শার ফলাগুলি জ্বলছে অগ্নিশিখার মতো। শত শত রণ-অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে আর দামামার নির্ঘোষে আকাশ মুখরিত। শূন্য দিয়ে ছুটে চলেছে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর। তরবারির সংগে তরবারির আঘাত লেগে ঠিকরে পড়ছে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। ক্ষত স্থান থেকে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছে রক্তধারা! গভীর খাদ ভরে যাচ্ছে সৈনিকের মৃতদেহে আর সেই মৃতদেহের উপর দিয়ে দুর্গ অধিকার করতে ছুটে চলেছে উন্মাদ কলরবে সিপাহীর দল। দিকে দিকে ব'য়ে চলেছে রক্তের নদী। আকাশ-বিদারী জয়ধ্বনি! আহতদের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ! ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারের উপরে দোদুল্যমান রক্ত-নিশান! যুদ্ধশেষে বিজয়ীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন! অলিন্দে অলিন্দে পুরনারীদের কণ্ঠে হুলুধ্বনি! বিজেতার রথের চূড়ায় অজস্র পুষ্পবর্ষণ। বার্ণার্ড শ'এর Back to Methuselah-তে দুটি চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। একটি আদমের (Adam) আর একটি কইনের (Cain)। আদম কৃষিজীবী মানুষ। হাতে তার কোদাল। তার কণ্ঠে কৃষিবিদ্যার জয়ধ্বনি। পুত্র কইনের হাতে কৃষকের কোদাল নয়, বীরের বর্শা। কইনের কণ্ঠে যুদ্ধের জয়গান। তার রসনায় নীট্‌শের সুপারম্যানের বাণী। শান্তির পূজারী সে আদৌ নয়—সে চায় লড়াই, সে চায় হত্যা, সে চায় বিপদকে আলিঙ্গন করতে, মৃত্যুর সংগে মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়াতে। তার কণ্ঠস্বরে মুসোলিনীর আর হিটলারের প্রতিধ্বনি। সে বলছে, He who has never fought has never lived. তার গায়ত্রীমন্ত্র হচ্ছে, And it is courage, courage, courage that raises that blood of life to crimson splendor. নির্ভীকতাই জীবনকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে মরণজয়ী মানুষের রক্তিম গরিমার মধ্যে। সে বলে—কৃষিজীবী নির্ব্বিরোধী মানুষ নারীপ্রেমের মাধুর্য্যের আস্বাদন পাবে কেমন ক'রে। নারীর কোমল দুটী বাহুর মধ্যে বিশ্রামের যে সুনিবিড় সুখ—সে সুখের আস্বাদ জানে বীর। যোদ্ধা কইন তার মাতাকে বলছে পিতার প্রেমের জীবনের প্রতি কটাক্ষ ক'রে, What does he know of love? Only when he has fought, when he has faced terror and death, when he has striven to the spending of the last rally of his strength, can he know what it is to rest in love in the arms of a woman.

চাষী—সে কি বুঝবে প্রেমে কি তৃপ্তি। নারীর মধ্যে পুরুষের কত যে আনন্দ, কত যে শান্তি—সে জানে যোদ্ধা। জয়লক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করবার জন্য বীর যখন তার শক্তিকে নিঃশেষে ব্যয় ক'রে ফেলে, রণক্ষেত্রে মৃত্যুর সংগে যখন সে মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়ায়, তখনই সে জানে যুদ্ধ-শেষে ক্লান্তদেহে নারীর কোলে মাথা রেখে চুপটি ক'রে শুয়ে থাকবার তৃপ্তি কি অপরিমেয় আর অনির্ব্বচনীয়।

বলা বাহুল্য, লড়ায়ের মধ্যে মানুষের পৌরুষের যে দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। লড়াইকে ঘিরে তাই গুঞ্জরিত হ'য়ে উঠ্‌ল কত গান, কত কাব্য! রামায়ণ-মহাভারতের মত মহাকাব্যের আখ্যানবস্তু লড়াই—রাম-রাবণে লড়াই, কুরু-পাণ্ডবে লড়াই। হোমারের রচিত মহাকাব্যেও শুনতে পাই তরবারির ঝনৎকার। আমাদের দেবতাগুলির হাতেও অস্ত্র। এ্যাপোলোর হাতে আমরা কেবল বীণা দিয়ে খুসী থাকতে পারিনি, তার হাতে দিয়েছি ধনুর্ব্বাণ। কৃষ্ণের হাতে যেমন আছে বাঁশি, তেমনি আছে সুদর্শন চক্র। ইন্দ্রের হাতে বজ্র, শিবের হাতে ত্রিশূল, কালীর হাতে কৃপাণ, রামচন্দ্রের হাতে ধনুর্ব্বাণ। আমাদের দেবতারা সবাই যোদ্ধা। মানুষের মধ্যে যোদ্ধার রূপ দেখে আমাদের মন বড় খুসী হয়। ব্যবসাদারের হাতের দাঁড়িপাল্লা আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করে না। কিন্তু সৈনিকের হাতে তরবারি যখন সূর্য্য-কিরণে ঝল্‌সে ওঠে, আমাদের চোখে তার সেই রণসজ্জা বড়ো ভাল লাগে। আমরা ব্যবসাদারের মধ্যে দেখি জীবনকে আঁকড়ে ধ'রে থাকবার যে প্রবৃত্তি তারই প্রকাশ। তার মধ্যে নেই আত্মদানের মহিমা। কিন্তু সৈনিকের যে জীবন, তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই জাতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য অবহেলায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার উন্মাদনা।

কিন্তু কইনের যে দৃষ্টিভঙ্গিমা, সেই দৃষ্টিভঙ্গিমাই যে মানুষের সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে আজ ঠেলে দিতে বসেছে এতে কি কোন সন্দেহ আছে? যে মানুষ রণক্ষেত্রে যত বেশী রক্ত ঝরিয়েছে, ঐতিহাসিকেরা তাদের কণ্ঠে পরিয়েছে তত বেশী পুষ্পমালা। আসলে নেপোলিয়ন, সীজার, অলেকজাণ্ডারের প্রতিভা হচ্ছে তাদের নরহত্যা করবার ক্ষমতায়। Back to Methuselahতে নেপোলিয়ন বলছে,—

My talent is to organise this slaughter; to give mankind this terrible joy which they call glory; to let loose the devil in them that peace has bound in chains.

একটা বিরাট রকমের নরবলির বাবস্থা করা তো যে সে লোকের কাজ নয়। হাজার হাজার মানুষকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে তাদের জবাই করবার ব্যবস্থা করতে পারে এক একজন নেপোলিয়নের, মুসোলিনীর অথবা হিটলারের প্রতিভা। আত্মপ্রকাশের অন্যপথ খোলা নেই যাদের কাছে —মানুষ মেরে যশস্বী হবার আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যেই দুর্দমনীয়। নেপোলিয়ান বলছে,—

I cannot be great as a writer: I have tried and failed. I have no talent as a sculptor or painter, and as lawyer, preacher, doctor, or actor, scores of second-rate men can do as well as I, or better. I am not even a diplomatist. I can only play my trump card of force. What I can do is to organise war.

হিটলার আর মুসোলিনীর মতো মানুষের যুদ্ধ ছাড়া খ্যাতি লাভের আর কোনো পথ ছিল না। সেক্সপীয়ারের মতো লেখক হবার আশা নেই, র‍্যাফেলের মতো চিত্রকর, মাইকেল এঞ্জেলোর মত ভাস্কর অথবা বেটোফেনের মতো সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া অসম্ভব। একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেতা অথবা উকীল হলেও খ্যাতির ক্ষুধা মিটবে না। যশোলক্ষ্মীর মন্দিরদ্বারে পৌঁছাবার একটা পথ খোলা আছে—সে পথ রক্তপ্লাবিত রণক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে। অতএব নীটশের অগ্নিবাণী প্রচার কর দিগ্‌দিগন্তে, গাও শক্তিপূজার জয়গান, যুদ্ধের বাজনা বাজিয়ে আকাশকে মুখরিত ক'রে তোলো দেশের যুবকগুলোকে জাতিপ্রেমের গরম গরম বুলি শুনিয়ে পাগল ক'রে দাও। রণ-ডঙ্কা ভীম নিঘোষে বেজে উঠ্‌লো। দলে দলে বেরিয়ে এলো যুবকেরা—অন্তরে তাদের বিরাট রোম সাম্রাজ্য গড়বার স্বপ্ন—ভূমধ্যসাগর পার হয়ে পৌঁছালো তারা আফ্রিকায়—আবিসিনিয়ার বুকের উপর দিয়ে হাবসীদের রক্তের বন্যা ব'য়ে গেল। শান্তি যে শয়তানকে শৃঙ্খলিত ক'রে রেখেছিলো লক্ষ লক্ষ ইটালিয়ানদের বুকে—মুসোলিনীর রণ-হুঙ্কার সেই শয়তানকে দিলো শৃঙ্খল থেকে মুক্তি।

এই যে হাজার হাজার মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করছে—এদের নিজেদের মধ্যে অপরিচয়ের দুস্তর ব্যবধান। কারও উপর কারও ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই। দাবার ছকে বোড়েকে যেমন খেলোয়াড় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে, তেমনি ক'রে হাজার হাজার সৈনিককে রণক্ষেত্রের ছকে বোড়ের মতো টিপছে মুসোলিনীর আর হিটলারের দল। কেন? ক্ষমতার লোভে। হাজার হাজার মানুষের জীবনকে শাসন করবার যে লোভ—সে লোভকে দমন করা বড়ো কঠিন। নিজ হাতে তারা মারে না—তাদের হুকুমে একদল আর এক দলকে হত্যা করে।

কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা—তারা মারামারি-কাটাকাটিতে যোগ না দিলেই তো পারে। পারে তো—কিন্তু মানুষের স্বভাবের মধ্যেই মারামারি-কাটাকাটি করবার একটা প্রবৃত্তি আছে। সেই প্রবৃত্তি মানুষগুলোকে রণক্ষেত্রের দিকে পরিচালিত করবার জন্য কিয়ং পরিমাণে দায়ী। রণক্ষেত্রে শৌর্যের পরিচয় দিয়ে খ্যাতি অর্জনের কামনাও জনসাধারণকে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে। যুদ্ধে না গেলে লোকে কাপুরুষ বলে বিদ্রূপ করবে এই লোকভয়ও মানুষকে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ঠেলে দেয়। লড়ায়ের অগ্নিপরীক্ষায় পৌরষকে যাচাই করবার প্রবৃত্তিও মানুষের মধ্যে কম তীব্র নয়। তা ছাড়া যুদ্ধ না করলে জন্মভূমি পরহস্তগত হবে—এই ভয়েও মানুষ রাইফেল নিয়ে রণক্ষেত্রে ছুটে যায়।

মানুষ স্বভাবতই মরতে ভয় পায়। যে সব কারণে মানুষ তার এই স্বাভাবিক মৃত্যুভয়কে অতিক্রম ক'রে রণক্ষেত্রে জীবনকে বিপন্ন করতে অগ্রসর হয় এখানে সেগুলির উল্লেখ করা গেল। কিন্তু যুদ্ধ বেশী দিন চললে হিটলার আর মুসোলিনীর বিপদ। লড়াই যত বেশী দিন চলবে সৈনিকদের মৃত্যুর আশঙ্কা তত বেশী। একটা সময় আসে যখন সৈনিকেরা ঘরে ফিরে যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। মৃত্যুকে অহর্নিশি সামনে রেখে ট্রেঞ্চের জীবন আর তারা বহন করতে চায় না। যুদ্ধের খরচ চালাবার জন্য টাকা যোগায় যারা তারাও শেষে বিরক্ত হয়ে ওঠে। এই রকম অবস্থার মধ্যেও যখন যুদ্ধ চলতে থাকে তখনই দেশের মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের দাবানল জ্বলে ওঠবার সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসে। যুদ্ধ না করলেও বিপদ—কারণ যুদ্ধ থামিয়ে দিলে খ্যাতির দরজা বন্ধ হ'য়ে যায়।

এবারের যুদ্ধের সঙ্গে আগেকার যুদ্ধের বেশ একটু তফাৎ আছে। সেবারে যুদ্ধে যারা হত হয়েছিল তাদের মধ্যে রণক্ষেত্রের সিপাহীর সংখ্যাই ছিল বেশী। এবারে কিন্তু উল্টো। রণক্ষেত্রে সিপাহীরা ট্রেঞ্চের গর্তের মধ্যে নিরাপদে মূষিকের জীবন যাপন করছে—কিন্তু ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে ইউরোপের রাজধানীগুলি। বিরাট বিরাট অট্টালিকাগুলো ধূলিসাৎ হ'য়ে যাচ্ছে। এখন চলবে আকাশ থেকে বোমা ফেলে শত্রুপক্ষের বড়ো বড়ো সহর ভাঙ্গার পালা। তারপর আসবে বিষাক্ত গ্যাস ছাড়বার পালা। বাড়ী ঠিক থাকবে—কিন্তু মানুষের কোনো চিহ্ন থাকবে না।

জগদ্ব্যাপী চিতানলের মধ্যে আমাদের এতকালের সভ্যতার আজ অবসান হতে বসেছে। এই মানুষকে দিয়ে

বিধাতার উদ্দেশ্য বুঝি সফল হোলো না। বিধাতা চেয়েছিলেন মানুষকে অনন্ত শক্তি আর অনন্ত জ্ঞানের পথে এগিয়ে দিতে। বৃহৎ থেকে বৃহত্তর জ্ঞানের এবং শক্তির পথে মানুষের এগিয়ে চলাকেই আমরা ক্রমবিবর্ত্তনবাদ বলি। এই ক্রমবিবর্ত্তনবাদের পথেই মানুষ এসেছে মহাকালের রঙ্গমঞ্চে। মানুষের সঙ্গে জীবাণুর তফাৎ হ'চ্ছে একটা জায়গায়—শক্তির এবং জ্ঞানের পূর্ণতার পথে মানুষ জীবাণুকে অনেকখানি পশ্চাতে ফেলে এসেছে। কিন্তু মানুষকে দিয়ে বিধাতা যে স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছিলেন—যে স্বর্গে মানুষ মানুষকে দারিদ্র্যের মধ্যে, অজ্ঞতার মধ্যে, পাপের পঙ্কিলতার মধ্যে ব্যর্থজীবনের গ্লানিকে বহন করতে দেবে না, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে ঠকাবে না, হত্যা করবে না—সেই স্বর্গ রচনার আশাকে এই মহাযুদ্ধ বিফল করে দিয়েছে। অনন্ত জ্ঞান আর অনন্ত শক্তির পথে মানুষের যে অগ্রগতি—সেই অগ্রগতির পথ আজ রুদ্ধ করেছে ভীরুতা, ঘৃণা, লোভ, কুসংস্কার, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, রিরংসা আর অজ্ঞতা। কিন্তু মানুষ বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করলো না বলে তো তিনি হাতগুটিয়ে ব'সে থাকবেন না। Man is not God's last word; God can still create. If you cannot do His work, He will produce some being who can.

বিধাতা তাঁর কাজ করে চলেছেন ভুলের মধ্য দিয়ে, পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। অতীতে অনেক জানোয়ার পৃথিবীতে এসেছিলো মহাকাল তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তাদের সৃষ্টি করাই ভুল হয়েছিল। মানুষ যদি বিধাতার ইচ্ছাকে সফল করতে না পারে—অতীতের অনেক অতিকায় জানোয়ারের মতো মানুষও ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। নতুন ধরণের মানুষ আসবে নতুনতর দৃষ্টি নিয়ে। জ্ঞানকে তারা প্রেমের সঙ্গে মেলাবে—আকাশকে তারা মাটির সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে দেবে—বিজ্ঞানকে তারা কল্যাণের বাহন করবে।

বন্ধন হীন গ্রন্থি

৫৫৪ পৃষ্ঠার পর

থাক এখন। দোষ তুমি করেছ কিনা জানিনা, কিন্তু যদি ক'রেই থাক তাতেই বা আমার সরে যাবার এমন কি আছে।

সতীশ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আর বসিয়া থাকিতে সে পারিতেছিল না। উঠিয়া সে ঘরময় দ্রুত পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, তুমিই বা যাবে না কেন? কেন যাবে না বলতে পার জগদীশ?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জগদীশ বলিল, তুমি একটু চুপ ক'রে বস সতীশ। কেন আমি যাব না তা না শুনলেও তোমার চলবে-শুধু এটুকু শুনে রাখ আমার না গেলেও চলবে।

সতীশ আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে অলকা ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার মুখ চোখ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল, আস্তে আস্তে সে বলিল, আমি অনেক কিছুই শুনেছি সতীশবাবু। আমার জন্যে আপনাকে যে এতটা অপমানিত হতে হবে সে ভয় আমার ছিল না, অবশ্য খুব বেশী ভরসাও যে ছিল তা নয়। একজন ছাড়া সবাই আপনাকে অপমানিত ক'রে গেছেন, আপনাকে কি ব'লে ধন্যবাদ দেব তা' আমি ভেবেও পাচ্ছি না জগদীশবাবু।

তাহার চক্ষুতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া জগদীশ মৃদু হাসিয়া বলিল, ধন্যবাদ আমাকে দিতে হবে না বৌদি, অন্য সকলেই চলে গেছে বলেই যে আমাকেও চলে যেতে হবে তারও ত কোন মানে নেই। আপনি ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছেন সেটাও ত আমার কম লাভ নয়, আর কিছু না বললেও চলবে।

সতীশ তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল, তাহার মুখের ভাব এতটুকু ত বদলায় নাই। অনেক কিছুই ঘটিয়া যাইতেছে সত্য, কিন্তু কোন কিছুর সাহতই যেন তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

অলকা মৃদুস্বরে বলিল, আপনি এবার বসুন ত' স্থির হ'য়ে। এ অপমানেই যদি আপনি এতটা বিচলিত হয়ে পড়েন ত আর বেশী দিন আপনার এখানে থাকা চলবে না দেখছি। কিন্তু আর বেশী অপমানিত হতে দিতেও চাইনা আপনাকে। চলুন আবার আমরা বেরিয়ে পড়ি। আপনার ভাগ্যের সঙ্গে আমার ভাগ্যও যখন জড়িয়ে গেছে তখন আর কি উপায় হতে পারে বলুন?

জগদীশ সায় দিয়া বলিল, সে কথা মন্দ নয়, কিছুদিন নিশ্চিত থাকতে পারবেন তাতে। তাহার মুখের উজ্জ্বলতা কমিয়া গেল, একটা বিষাদের ছায়া সেখানে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

অলকা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, দুঃখ করবেন না জগদীশবাবু। আপনি কাছে থাকলে হয়ত অনেক উপকারই হ'ত আমাদের, কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায়ও যে নেই।

ম্লান হাসি হাসিয়া জগদীশ বলিল, না দুঃখের হয়ত কিছু নেই এতে তবু একটু হয় বই কি। ভবিষ্যতে যদি কোন দিনও কারও সাহায্যের দরকার হয় আপনার ত আমাকে ভুলবেন না।

মৃদুস্বরে অলকা বলিল, আমাকে সাহায্য করায় বিপদ আছে তবু ভুলব না আপনার কথা। তারপর সতীশের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, আপনার ত চুপ করে থাকলে চলবে না। বন্দোবস্ত সব ঠিক করতে হবে ত। আমি একা ত আর সবকিছু করতে পারি না।

সতীশ বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া সমস্ত কিছু ঠিক করিবার জন্য

স্বদেশী ডাকু

(গল্প)

শ্রীঅমিয়বালা দেবী

সুধীর সত্যই সে রাতে ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। নিশুতি রাতের মুক্ত বায়ু তাহার উত্তপ্ত ললাটে স্নিগ্ধ পরশ বুলাইয়া দিল। ব্যাপারটা আবার ভাবিয়া দেখার অবকাশ তাহার মিলিল তখন।

কিন্তু স্থিরচিত্তের সুস্থ ভাবনা যে অপ্রিয় সত্য মেলিয়া ধরিল তাহাতে তাহাকে স্বীকার করিতে হইল অপরাধের মাত্রাটা তাহারই বেশী। তথাপি গোঁ ধরিয়া যখন চলিয়া আসিয়াছে, তখন আর সহজে নিজে গরজ করিয়া বাড়ী ফিরিলে, আর কেহ না হোক—যাহার উপর রাগ করিয়া সে বাড়ী ছাড়িয়াছে, সে-ই রমাই হাসিবে বেশী। রমার সে জয়ের হাসি!—না, সে হাসি অসহ্য। সুধীর স্বেচ্ছায় সে অপমান মাথা পাতিয়া লইবে না।

পত্নী হিসাবে অবশ্য রমাকে খুব খারাপ বলা চলে না। সুধীর ভাবিতে পারে, তবু গৃহস্থ ঘরের বধূ ও নহে। [illegible] একালের একটা মেয়ে [illegible] তাহার পক্ষে এমনই বা কি দোষের! সুধীরের মনের তারে কোমল সুরে ঘা লাগে।

তা হোক, সুধীর এমনই কি একটা সৃষ্টিছাড়া প্রস্তাব করিয়াছিল যে রমা স্ত্রী হইয়া স্বামীকে প্রাধান্যের মধ্যেই আনিবে না। ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত, তরুণের প্রাণে কবিত্বের সাড়া জাগা কিছু অস্বাভাবিক নয়। সে না হয় বলিয়াছিলই নিশুতি রাতে এ ফুটন্ত চাঁদের আলোয় নদীর ধারে বেড়াইতে যাইতে। কেমন সুন্দর হইত তাহারা দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া চাহিয়া থাকিত নদীর বুকে চাঁদের অফুরন্ত নৃত্যলীলার দিকে। তা বলিয়া রমা এমন ফোঁস করিয়া উঠিবে কেন!—বল কি! এত রাতে নদীর তীরে! পাগল না ক্ষেপা?

পাগল!—হাঁ, সুধীর তখন সত্যই ছিল পাগল! তরুণ বুকে তখন কতই না [illegible] পিয়াস [illegible] সংবেদনের সুরের ঝংকার। বলিয়াছিল, চল না, লক্ষ্মীটি, কেউ টেরও পাবে না। সে হবে যেন নবীন স্বপ্ন! চাঁদের আলোয় মুক্ত তীরে দাঁড়ালে তোমায় যা দেখাবে হবে—যেন অপ্সরী! চল, চল।

রমা দেখাইয়াছিল ভয়—প্রথমত অভিভাবকদের। তারপর গুণ্ডা বদমায়েসের। কত নারীহরণ হয় এই সকল পল্লীগ্রামে।

সুধীর ইহাতে আপন পৌরুষে পাইয়াছিল আঘাত। মাসেল ফুলাইয়া ঘুসি পাকাইয়া জানাইয়াছিল ডজনখানেক গুণ্ডাকেও সে কেয়ার করে না। তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইবে রমাকে, এমন বুকের পাটা কোন ব্যাটার।

কিন্তু তাহার জবাবে রমার মুখের লম্বা বক্তৃতা শুনিয়াই তাহাকে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। রমা বলিয়াছিল—হায় রে, তোমরা করবে বাহুবলে নারীকে রক্ষা! তোমরা মুছাবে বাঙলার নারীর চোখের জল—শান্ত করবে তাদের নির্যাতিত ক্ষুধিত আত্মার হাহাকার। তোমরা জান নারী রক্ষা সমিতি গঠন করতে, চাঁদা সংগ্রহ করতে আর সভায় সভায় বক্তৃতা করে বেড়াতে। বীরপুরুষদের আবার আস্ফালন কত!

শেষে রমা করিবে তাহাকে এমন অপমান! তবু সুধীর শেষ চেষ্টা করিতে ছাড়িল না,—আজ যদি কলকাতার কোন তরুণীকে একথা বলতাম, সে কদর বুঝতো। কত কত স্বামী-স্ত্রী, তরুণ-তরুণী লেকের ধারে, ইডেন গার্ডেনে, গঙ্গার পারে—

আর বলিতে হইল না। রমা বাধা দিয়া সুধীরের মুখের কথা শেষ করিল—মোটরে চেপে বেড়াতে যায়। এই ত! সেখানে রাস্তায় রাস্তায় ইলেকট্রিক লাইট, মোড়ে মোড়ে পাহারাওলা, চারিদিকে কত শত পথচারী—তবে না বাবুদের সাহস। এখানে পুলিশ পাবে কোথা? আলো পাবে কোথা? —নাও যাও, ও কথা আর মুখে এন না। লোকে বলবে নেশা করেছ। আর বাবা-মা জানতে পেলে, লজ্জা রাখবার ঠাঁই পাবে না। বাবুদের বড়াই আর মুখ ফক্কুড়ী সম্বল কি না। নাও, সর, আমার ঘুম পাচ্ছে। তুমি না হয় চাঁদের দিকে [illegible] আমায় ছেড়ে দাও [illegible] সারাদিনের খাটুনির পর। উঃ!

সুধীরেরও তো রক্ত মাংসের শরীর। অপমান, বক্তৃতা, শেষে বলে কি না ঘুম পাচ্ছে। অমন একটা রোমান্টিক প্রস্তাব—রমার কাছে তার কোন মূল্যই নাই, তার ঘুমটাই হইল বড়। আজ ছমাস পরে বাড়ী আসিয়াছে সুধীর দুই সপ্তাহের ছুটিতে। কেরাণী চাকরী, যখন তখন ছুটি মিলে না। মনে ভাবিল [illegible] হইল। রমার প্রাণে কি কবিত্বের মায়া একটুকুও দেন নাই বিধাতা। এমন চাঁদের হাসি—তার বদলে কি না ঘুম। না, সুধীরের মরম কথা রমা বুঝিবে না, বুঝিবার শক্তি নাই—কোন আগ্রহও নাই। কথায় কথায় [illegible] সুধীরের অসহ্য। মুখে বলিল, বেশ, ঘুমাও তুমি [illegible]!

[illegible] হইল, [illegible] উঠানে—[illegible] হইয়া [illegible] নীরবতা [illegible] গাড়ীখানাকে ধরিবার।

ষ্টেশনে আসিয়া দেখিল এক্সপ্রেসখানা তখনও ছাড়ে নাই। এই ট্রেনেই সে যাইবে। বুঝুক রমা কেমন সুধীরের কেবল বড়াই! গাড়ীতে উঠামাত্রই ছাড়িয়া দিল। বেশ হইল—অমন স্ত্রীর সান্নিধ্য হইতে বহুদূরে সে যাইতেছে আর ফিরিবে কি না তা-ই বা কে জানে! থাকুক রমা তাহার একগুঁয়েমি লইয়া। বক্তৃতার আবার বহর কত! যেন মিশনারী মেম-সাহেব। বসিয়া বসিয়া সুধীরের ভাবনা বাড়িয়া যায়। সারা রাত রমা কি তাহার খোঁজ করিবে না একবারও? একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠে তাহার মুখে—কেমন জব্দ! তখন বক্তৃতা থাকিবে কোথায় শুনি? না সে আর অবাধ্য স্ত্রীর কথা ভাবিবে না। কেন কিসের জন্য ভাবিবে? যে করিতে পারে এমন অপমান—কিন্তু রমা ত কথার মালা গাঁথিতে শিখিয়াছে মন্দ নয়। যাক—সিগারেট একটা ধরান যাক।

কি সর্ব্বনাশ! পকেটে হাত দিয়া সুধীরের মনে হইল

রেলের পাশখানা ত আনে নাই। পকেটে পয়সাও রহিয়াছে মাত্র ৫।৬ আনা। রেলের কর্মচারী বলিয়া টিকেট না কাটিয়াই উঠিয়াছে গাড়ী

এক ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। সুধীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে ট্রাভেলিং টিকেট চেকার আসিতেছে। না, এ গাড়ীতে উঠিল না বটে। কিন্তু পরের ষ্টেশনেই হয়ত আসিবে। সুধীরের আর নিশ্চিন্তে একটু ঘুমাইবারও অবকাশ রইল না। ষ্টেশনে ট্রেন পৌঁছিলেই সে নামিয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আঁধার কোণে থাকে দাঁড়াইয়া। তারপর গাড়ী সচল হইলে চেকার যে কামরায় নাই, সেখানিতে উঠে।

ঘণ্টা দুই পরে। ঘুমে চোখ বুজিয়া আসে, কিন্তু ঘুমাইবার উপায় নাই। এ কি বিপদ। এইবার ট্রেন থামিলে সে গেল প্লাটফরমের চায়ের দোকানে। চা খাইলে নিশ্চয় ঘুম পালাইবে। নাইট ডিউটির সময় ঐ করিয়াই ত তাহারা ঘুম তাড়ায়। চায়ের কাপ লইয়া বসিতেই আবার রমার নিষ্করুণ মুখখানি ভাসিয়া আসে তাহার সমুখে—ইস্! কি দুষ্টামিভরা হাসি। কেমন অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে মাথা নাড়ে। এতটা কঠোর হওয়া কি সুধীরের সঙ্গত হইয়াছে।.......... আরে ট্রেন যে ছাড়ল.........

সুধীর তাড়াতাড়ি চায়ের দাম দিয়া ছুটিল। একখানি কামরা মাত্র, তারপরেই গার্ডের গাড়ী। কামরার পাদানীতে পা দিতে যাইবে হাতল ধরিয়া—ওরেব্বাপ সে কামরাতেই চেকার! সুধীর হাতল ছাড়িয়া দিল। আর একটু হইলে গিয়াছিল আর কি পড়িয়া ট্রেনের তলায়! কি হইত তবে! এর জন্য দায়ী ত একমাত্র রমাই.

ষ্টেশনের মুসাফিরখানা। এখানে ওখানে তিন চারটি লোক পোঁটলা পুঁটলি লইয়া বসিয়া আছে। অবগুণ্ঠনবতী নারীও রহিয়াছে।

ট্রেন্ আতা হ্যায়! ট্রেন আতা হ্যায়! সুধীর দেখিল একখানা ডাউন লাইনের ট্রেন্ আসিতেছে। এক্সপ্রেস চলিয়া যাওয়াতে সে দুঃখিত হইল না। কারণ বিনা টিকিটে নিরুদ্দেশ যাত্রী হইতে তাহার আর মন নাই। আর চেষ্টা এই ডাউন ট্রেন চেঞ্জ করে টিকেট ... পরে বাড়ীর ষ্টেশনের দেখা পাইবে। সেখানে তো চেনা লোক রহিয়াছে, চেকারের হাতে রেহাই পাইতে সহজেই পারিবে। বাড়ী পৌঁছিয়া পাশখানা আর অর্থ লইয়া আসিয়া তখন যেখানে খুশী যাওয়া চলিবে। তবে এখানেও সহজে চেকারের হাতে পড়া হইবে না। নির্জ্জন কামরায় উঠিতে হইবে—গাড়ী ছাড়িলে পরে।

ধীরে ধীরে প্লাটফরমে পায়চারি করে। রাত অনুমান আড়াইটা হইবে। বাড়ীর ষ্টেশনে পৌঁছাইতে দেড় ঘণ্টার বেশী লাগিবে না। বাকি রাতটুকু ষ্টেশনেই কাটাইয়া দিবে। এই যে ট্রেন ছাড়ল! এ গাড়ীখানায় লোকের ভিড় খুবই কম। বাস্। উঠিয়া পড়িল। কিন্তু উঠিয়াই হতভম্ব হইয়া পড়িল। আবছা আলোয় ভুল করিয়া সে মেয়ে-কামরায় ঢুকিয়াছে। সুধীর ভাবিল পরের ষ্টেশনে নামিয়া গেলেই চুকিয়া যাইবে লেঠা। কিন্তু তাহাকে উঠিতে দেখিয়াই সুরে বেসুরে কড়ি ও কোমলে কামরার মেয়ে তিন চারটি চেঁচাইয়া উঠিল। সুধীর দিশাহারা। কামরা থেকে লাফ দিয়া পড়িবে কি না ভাবিতে ভাবিতে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বুঝিল ট্রেন চলিয়াছে পূর্ণবেগে—এখন লাফান অর্থই আত্মহত্যা! সে মেয়েদের দিকে পিছন ফিরিয়া রহিল। কিন্তু তাহাতেও বিপদ যে কাটে নাই তাহা বুঝিল এক নারীকণ্ঠের দৃঢ়তাব্যঞ্জক আশ্বাস দানে—আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমি এখুনি শিকল টেনে গাড়ী থামাচ্ছি।

পিছন ফিরিয়া তাকাইতেও সাহস পায় না সুধীর—বুকের ভিতর তাহার কে যেন হাতুড়ি পিটিতেছে। পা দুটা কাঁপিতেছে। অবশেষে থপ্ করিয়া সে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল। আর এক দফা চীৎকার উঠিল মেয়েদের তরফ হইতে। সুধীর মরিয়া হইয়া কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইল। ব্যাপার যে সঙিন্, মেয়েটি যদি চেন টানে তবেই চক্ষুস্থির।

কোন রকমে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ককাইয়া গোঙাইয়া সুধীর যে সকল ব্যাকরণ-বহির্ভূত শব্দের সৃষ্টি করিল তাহার মর্ম্ম এই যে সে না বুঝিয়া ভুলে এ ফিমেল্ কামরায় উঠিয়াছে—পরের ষ্টেশনেই নামিয়া যাইবে। তাহার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ যেন তাঁহারা মাফ করেন।

সুধীর হাঁপাইয়া উঠিল। বিকৃত কণ্ঠও তাহার সময়ে সময়ে অস্ফুট হইয়া যাইতেছিল। একে ত বক্তৃতায় অনভ্যস্ত, তদুপরি মেয়েদের মজলিশে। পিছন ফিরিয়া বসিয়া থাকিলেও মেয়েদের চকিত দৃষ্টি যেন তাহার পিঠে দংশন করিতেছে বিষধরের আক্রোশে।

এতক্ষণে কামরার চীৎকার থামিল। সুধীরের যেন মেরুদণ্ড রহিত হইয়া গেল। সে বুকে অসম সাহস বাঁধিয়া কষ্টে চারিদিকে চোখ বুলাইল। যে মেয়েটি চেন টানিতে উঠে সে এখনও হাত বাড়াইয়াই রহিয়াছে। পোষাকে আষাকে সে নিখুঁত আধুনিকা—বয়স ২২।২৩ হইবে.

সুধীরকে চাহিতে দেখিয়া মেয়েটি ঈষৎ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা আপনার কথা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু চলন্ত গাড়ীর পাদানীতে পা দিয়েও কি আমাদের দেখেছিলেন মেল্। তা হলে পরের ষ্টপে গিয়ে চশমা কিনে নেবেন একজোড়া।

সুধীর বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল মেয়েটির দিকে।

তরুণী যেন নীরব শ্রোতা পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। বলিল,—আপনি পলিটিক্যাল প্রিজনার নন্ ত? পালাচ্ছেন কোন জেল থেকে। ভয় নেই। কেউ ধরিয়ে দেবে না আপনাকে। তা হলে আমার পরামর্শ নিন।

বিস্ময়চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সুধীর মৃদুস্বরে বলিল—কি বলুন!

নাতিপর চোখ দুটি আরও নাচাইয়া অদ্ভুত গ্রীবাভঙ্গিতে হেলিয়া দুলিয়া তরুণী চাপা হাসিতে ফুলিয়া উঠিয়া বলিল,—আপনি যে বিপ্লবী তা বুঝতে বেগ পেতে হয় নি। একটা কাজ করুন। আমার শাড়ী ব্লাউজ পরে আপনি কনেবউ সেজে বসে যান এখানে আর আমি আপনার ধুতি পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে খাসা তরুণ সাজি। পুলিশের বাবারও সাধ্য হবে না আপনার গায়ে হাত দিতে।

বলিয়া তরুণী তরল হাসিতে ফাটিয়া পড়িল।

সুধীর মেয়েটির কৌতুকে খুশী না হইলেও মনে মনে তারিফ করিল এই বলিয়া যে, হাঁ, আধুনিকা বটে। যেমন তেজস্বিনী তেমনি আবার হাসিখুশীও। এমনটিই ত আজকালকার তরুণের মনের মত। নইলে রমা—রমা এর পদনখেরও যোগ্য নয়। একটু সাহসও যদি থাকে। সুধীরের মুখে কোন কথাই জুয়াইল না। সে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তরুণীর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টি মেলিয়া ধরিল।

প্রৌঢ়া একটি বলিয়া উঠিল তরুণীকে—ছায়া, তুই কি বল তো যেখানে সেখানেই তোর রঙ্গ। দেখছিস্ না বেচারা কি রকম মুশড়ে পড়েছে। গাড়ী থামলেই নেমে যাবে বল্‌ছে। কেন বেচারাকে দিক্ করিস্। আহা বুঝতে পারে নি।

হাসিয়া যুবতীটি লুটাইয়া পড়ে,—ও দিদিমা, চুপ কর। দেখ্‌ছ না তোমার বেচারি ভদ্রলোক কি রকম মুখ কাচুমাচু করে আছে। এখুনি হয়ত কেঁদে ফেল্‌বে। আর তোমার সহানুভূতি সহ্য করতে পারছে না।

অপর কয়টি মেয়েও হাসিয়া উঠিল। একজন বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল—ছায়ার কথাই নিশ্চয় ঠিক। ও স্বদেশী ডাকাতই হয় তো কাকিমা।—বলিয়া সকলেই একসঙ্গে সুধীরকে ভাল করিয়া দেখিতে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করিল। এই রকম একটি নারী চক্রব্যূহে নজরবন্দী হইয়া তাহাদের ঝাঁজাল বুকনীতে সুধীর একেবারে নেকের সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

যাক্, ফাঁড়া শেষ হয় কাটিল। গাড়ীর গতি মন্থর হইয়া আসিল। কাছেই ষ্টেশন। কিন্তু ষ্টেশনে নামিলে ত সেই পুরাতন বিপদ কোন্ ডাকাতের হাতে নাকাল হইতে হয়, তাহার ঠিকঠিকানা নাই। বিশেষ করিয়া ফিমেল্ কামরা হইতে নামিলে। সুধীর উঠিয়া আস্তে আস্তে দরজার কাছে দাঁড়াইল। যুবতীর দিকে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, সে মুচ্‌কী হাসিতেছে। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুধীর সহজস্বরে বলিল,—আমি যাচ্ছি, আপনারা নিশ্চিন্ত হন। আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন।

বলিয়াই দুই হাত তুলিয়া কপালে ঠেকাইয়া কাহাকে কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া সেই জোড়া জোড়া টানা টানা চোখের বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টির সমুখে দোর খুলিয়া লাফাইয়া পড়িল। হা হা করিয়া সকলগুলি মেয়েই অতিশয় ব্যস্ততায় ছুটিয়া আসিল জানালার কাছে। অনেকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুধীরের দশা লক্ষ্য করিতে লাগিল আকুল প্রাণে। ঐ চেন্‌-টানার সাহসিকাও। তাহার শুষ্কভীত চক্ষু, ভয়ব্যাকুল মুখখানি সেই পড়ন্ত অবস্থায়ও সুধীর দেখিতে পাইল। কেন যেন পতনাহত অবস্থায়ও সুধীরের মনে বেশ তৃপ্তিই বোধ হইল। সে যতক্ষণ দেখা গেল সেই করুণ মুখখানির দিকে নজর বুলাইতে লাগিল।

গাড়ী চলিয়া গেল। পতিত অবস্থায় শুইয়া শুইয়া সুধীরের মনে হইল সারা দেহ ভাঙিয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল সে নড়িতেও পারিল না। ট্রেনখানি দৃষ্টির বাহিরে গেলে সে একটু হাঁফ ছাড়িল। তাহার ভয় হইয়াছিল ঐ মেয়েটি যদি তাহার বিপদ দেখিয়া চেন টানে। যাক্, সে ভয় গেল। কিন্তু পায়ে হাতে পিঠে যেন অসম্ভব ব্যথা। অতি কষ্টে হাত বুলাইয়া দেখিল পড়িয়াছে কয়লার গুঁড়ার স্তূপে। সারা গায়ে জামায় কালিমাখা হইয়াছে। তাহার বেজায় রাগ হইল রমার উপর। দাঁতে দাঁত চাপিয়া একটা কঠোর কথাই বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু রমা যে অনুপস্থিত। কে শুনিবে সে কথা—তৃপ্তি তাহাতে নাই। রমা কাছে থাকিলে সে ঐ ছায়া না মায়া মেয়েটির দিকে দেখাইয়া বলিত—দেখ ত কেমন দরদ-মাখা মন আধুনিকা এটি!

কয়েক মিনিট নির্বাকে পড়িয়া থাকিয়া একবার নড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। নাঃ তেমন কিছু হইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, পা-টার গোড়ালিতে ব্যথা—মুচকিয়া গিয়াছে হয় ত। কনুইটা জ্বলিতেছে। একটু ছড়িয়া গিয়াছে। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে দু পা চলিল অতি আস্তে।

অন্ধকার পাতলা হইয়া আসিতেছে। মাথার উপরে তারাগুলো যেন ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সুধীর চলিল। অন্ধকারে যথাসম্ভব হাতড়াইয়া জামা কাপড় ঝাড়িয়া লইল। তারপর লাইন ধরিয়া ষ্টেশনের দিকেই যাইতে লাগিল। বসিয়া থাকিলে তাহার চলিবে না।

এখান হইতে বাড়ী বেশী দূরে নয়। হাঁটিতে আরম্ভ করিলে চারদিক ফরসা হইবার আগেই বাড়ী পৌঁছিতে পারিবে। কিন্তু শরীর ও মনের উপর যে রকম জুলুম চলিয়াছে তাহাতে এই দীর্ঘ পথ হাঁটা এখন তাহার পক্ষে প্রকৃতই অসম্ভব। পা-টায় বড্ড ব্যথা, সারা শরীরে যেন হাতুড়ি পেটা হইয়াছে। এক পা চলিতেও সে আর যেন পারে না। সারা রাত্রি ঘুম নাই, চোখ দুটি রক্তজবা। কনুই ছড়িয়া রক্তের দাগ লাগিয়াছে জামায়—এখানে ওখানে। তার উপর কয়লার গুঁড়া তাহার ভোল বদলাইয়া দিয়াছে যেন ভিখারী, না হয় চোর। হঠাৎ দেখিলে কেহ চোর ভিন্ন অন্য কিছুই ভাবিতে পারিবে না।

সে অতি কষ্টে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া একটা নিরালা কামরা দেখিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। বাহিরে যাত্রীদের সোরগোল, ফিরিওয়ালার হাঁকডাক। সুধীর বসিয়া আছে একা সে কামরায়। একটা ষ্টেশন মাত্র, এখনই গাড়ী পৌঁছিয়া যাইবে সেখানে, তারপর বাড়ী পৌঁছাইতে পাঁচ মিনিট। ঘুমে এলাইয়া পড়ে, তবু সে শুইবে না, কি জানি যদি ষ্টেশন পার হইয়া যায় অজান্তায়।

কামরার ভিতর বৈদ্যুতিক নীরবতা। সুধীর যতই চেষ্টা করে দূর করিতে চিন্তা তাহাকে ততই বেশী করিয়া পাইয়া বসে। আর চিন্তার উদয়ে একখানি মুখই তাহাকে ক্লিষ্ট করে বেশী—সে হইল ঐ তেজস্বিনী আধুনিকার সপ্রতিভ চোখদুটির পাশে রমার ম্লান প্রতিচ্ছবি। কি সুন্দর সাবলীল ভঙ্গি আধুনিকার, জড়তার লেশ নাই। কোমলতার সঙ্গে তেজস্বিতা না হইলে কি মানায়। রমা যেন সত্যই কলা বউ। সুধীরকে নাকাল করিয়াছে দুজনেই, তবু ঐ মেয়েটির উপর ত তাহার রাগ হয় না—তাহার কথায় দুঃখ

হয় না; বরং কি মধুর একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করে। আর রমা—অমার্জিত রুচির অসভ্য এক নারী। উঃ কি কর্কশ রমার কণ্ঠস্বর.

এরই মধ্যে কখন যে ঘর্মসিক্ত ভুঁড়ি লইয়া মাড়োয়ারী একটি উঠিয়া বসিয়াছে সুধীরের সম্মুখের বেঞ্চে তাহার হুঁস নাই। উহার দুর্গন্ধ পোটলা আর নিঃশ্বাসের ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ সুধীরকে সচকিত করিল। না বাঁচা গেলনা ঢেকার নয়।

কিন্তু হঠাৎ লোকটা প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল—এ বাবু, আপকো কাপড়ামে খুন্ কাঁহে জী? গরুকা কিস্‌কো তামাম বদনমে! মারোয়াড়ীর পাগড়ী খসিয়া পড়িল, মাথার তরমুজের বোঁটার মত শিখাটি নাচিয়া উঠিল। কম্পিত হস্তে লাঠিটা ধরিয়া লোকটা বার বার একই প্রশ্ন করিতে লাগিল।

এত লাঞ্ছনার পরও সুধীরের হাসি পাইল লোকটার ভাবভঙ্গিতে। তবু উহাকে ঠাণ্ডা করিতে হয়, নতুবা একটা ফ্যাসাদ বাধাইতে কতক্ষণ! সে কথা বলিতে যাইবে অমনি লোকটা আর সম্বরণ করিতে পারিল না, খপ্ করিয়া সুধীরের হাত ধরিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—এ মুসাফেরী জরুর হায় জরুর। হামারা পাস্ লোহারাম হোনেসে হাম কায়সে তোমারা পাস লাগ গিয়া। পুলিশ, পুলিশ, সিপাহী—

খানিকক্ষণ সুধীর বিড়ালের নখে ইঁদুরছানার মত ঝুলিতে লাগিল। এদিকে ট্রেনের বেগ কমাইয়া দিয়াছে। সুধীর বুঝিল তাহার গন্তব্য স্থল সন্নিকট। যাহা করিতে হয় এখনই করিতে হইবে। মাড়োয়ারী তাহার হাত ধরিয়াই আছে। হাঁকডাক করিয়া করিয়া মাড়োয়ারী হাঁপাইতেছে, যেন হাতের মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সুধীর বুঝিতে পারে। আর সে দেরী করে না মুহূর্তও। এক আচমকা ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া লইতেই মাড়োয়ারী কুপোকাৎ। আর সেই অক্কে সুধীর বিপরীত দিকের দোর দিয়া নামিয়া গেল। ট্রেন প্লাটফরমের পাশে ঢুকিল.

তারপর বাঙালীর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী সুধীর ঘরমুখো রওনা হইল। ভোর পাঁচটা, শুকতারাটা পূর্বাকাশে তখনও জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল। অন্ধকার ঝোপে ঝোপে আটকিয়া আছে। পাখীরা বাসায় বসিয়াই অরুণের আবাহনগীতি বন্দনা সুরু করিয়াছে। শীতল বাতাসে ক্লান্ত সুধীরের শরীর জুড়াইয়া গেল। সুধীর বাড়ী আসিয়া ঢুকিল। সে ধীরে ধীরে বৈঠকখানা ঘরের শিকল খুলিয়া খালি ফরাসের উপর শুইয়া পড়িল। বাড়ীর মধ্যে যাইতে, রমার সঙ্গে দেখা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। এত কষ্টের মূলই সে। শয়ন ঘরের জানালার দিকে চাহিয়া দাঁত চাপিয়া বলিল, আমি খুনীর মত, চোরের মত তাড়া খেয়ে ঘুরেছি আর উনি দিব্য দোতলার খোলা হাওয়ায় ঘুম দিচ্ছেন। এ জীবনে এমন অবহেলা করে যে তার মুখ দেখছিনা। বলিয়া চাদরটা মুড়ি দিল।

হঠাৎ প্রবল ধাক্কায় তাহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। সে সহসা মনে করিতে পারিল না যেটা হইয়া গিয়াছে সেটা স্বপ্ন না এই যে দাঁড়াইয়া আছে আর মিটি মিটি হাসিতেছে রমা এইটাই স্বপ্ন! রমার প্রশ্নে তাহার এই স্বপ্নঘোর কাটিল। রমা বলিল, এত রাগ করে কোথায় গিছলে বল ত? আমি কত খুঁজে খুঁজে হয়রান্। এই বাইরে ঘরে না হলে পাঁচ সাত বার দেখে গেছি। কখন এসে শুলে? আমি ত প্রায় ভোর পর্যন্ত জেগে ছিলাম এই দরজায় চোখ রেখে, দোর বন্ধ দেখে যদি ফেরৎ চলে যাও, তাই দোর খুলেই রেখে ছিলাম।

সুধীর কথার একটি জবাবও দিল না। মনে মনে বলিল, কৃতার্থ করেছিলে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল রমা, তারপর করুণসুরে বলিল, এখানে শুলে কেন? ঘরে গিয়ে শোও না। তারপর হাসিয়া বলিল, কি রাগ! বাপ্ রে!

সুধীর নীরব। রমা আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া একটানে চাদরটা খুলিয়া হাসিয়া উঠিল। সুধীর এবার চেঁচাইয়া উঠিল, রমার দিকে অগ্নিগর্ভ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, এখানে কেন? যাওনা ঘরে গিয়ে আরামে শুয়ে থাকনা। আমি না হয় জাহান্নমেই গেলাম। তাতে তোমাদের কি?

রমা কিন্তু গেল না। অতি নরম সুরে বলিল, আমি ঘাট স্বীকার করছি। নাও ওঠ। সে অপরাধের কি ক্ষমা নেই। এখন ঘরে চল। এবার সুধীর চাদর ফেলিয়া উঠিয়া বসিল, চাদর ফেলিয়া চক্ষু বড় করিয়া রমার দিকে চাহিয়া বলিল, কে বলে তোমায় এখানে ঘ্যান ঘ্যান করতে। বলিয়া নিজেই শুইয়া পড়িল।

রমা কিন্তু অবিচল, সহিষ্ণুতায় তাহার দ্বিতীয় নাই। হঠাৎ রমা অস্ফুটধ্বনি করিয়া উঠিল, এ কি তোমার কপাল কাটল কি করে? সারা দেহ রক্তে কালি-কাদায় মাখা। এ দশা কি করে হল? রমা ব্যাকুলতায় কাঁপিয়া উঠিল.

সুধীর কঠোর কণ্ঠে বলিল, এর জন্য দায়ী কে জান? তুমি, তুমি, সম্পূর্ণ তোমার জন্যে।

রমা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলিল, আমার জন্যে? আমি কি করলাম?

সুধীর অবাক হইয়া দেখিল—রমার সে শঙ্কাকাতর মূর্তির ঠিক ঐ আধুনিকার জানালা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পতিত সুধীরকে দেখিবার সময়ের মূর্তির সহিত কি সুন্দর একটা মিল রহিয়াছে। তেমনি চোখ দুটি করুণ আর ছলছল, তেমনি অধরোষ্ঠ কম্পিত, বুকটাও হয়ত ঢিব ঢিব করিতেছে।

সুধীর আর চোখ ফিরাইতে পারিল না—রমা, তুমি এত সুন্দর হতে পার! তবে আমায় জ্বলাতে রুক্ষ হয়ে থাক কেন!

—কি যে বল তুমি। নাও, উঠে এস।

রমা যেন ছোট ছেলের মত সুধীরকে একপ্রকার কোল আবদ্ধ করিয়াই স্নানের ঘরে লইয়া গেল।

আসামের রূপ

(ভ্রমণ কাহিনী)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

প্রকৃতিদেবী আসামকে যে শুধু বাহ্যিক রূপবৈচিত্র্যেই পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা নহে, তাহার প্রস্তরাবালময় পাহাড়ের অভ্যন্তরভাগে যে ধনভাণ্ডার লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহার তুলনাও বিরল।

লক্ষ্মীমপুর জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে খামতি রাজ্যেরই পাশের পর্ব্বতমালায় আসামের কয়লাসম্পদ লুক্কায়িত আছে, মার্গারিটা হইতেই এর সূচনা তবে ষ্টেশনের নিকটে কোন খাদ নাই। কয়লা খাদ দেখিতে হইলে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইতে হইবে। আবার গাড়ীতে চাপিয়া মার্গারিটা হইতে আর একটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া চারিদিকের কয়লা ভাণ্ডারের মধ্যবর্ত্তী লিডু ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম, ইহা ডিব্রুসদিয়া রেল লাইনের এ অংশের শেষ সীমা।

সূর্য্যদেব মাথার উপরে। ষ্টেশনের কর্ম্মচারীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম কলিয়ারীর কর্ম্মচারীরা এখন সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে, খনি দেখিতে হইলে একবেলা অপেক্ষা করিয়া ছুটির পরে কলিয়ারীর বাবুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করিয়া সব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নিরুপায় হইয়া ষ্টেশনেই কিছু জলযোগ সারিয়া লইলাম, **তৎপর** ষ্টেশনের একজন বাঙালী বাবুর কাছে আমার পোটলাপুঁটলী গচ্ছিত রাখিয়া একাই কলিয়ারীর কলোনী দেখিতে বাহির হইলাম।

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইতেই একটি দুইটি করিয়া ছোট বড় বাড়ী চোখে পড়িতে লাগিল, চারিদিকে বহু বৃক্ষলতাশূন্য টিলা উলঙ্গভাবে দাঁড়াইয়া আছে, এর মধ্যেই ছাড়া ছাড়া বাড়ী, অফিস, কারখানা একদিকে কুলী লাইন; বাবুদের বাসাগুলিও এভাবে এক পার্শ্বে নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিলাম। দুই একটি বৃক্ষশূন্য পাহাড়ের মাথে সাহেব কর্ম্মচারীদের বাংলো সর্ব্বাগ্রেই চোখে পড়ে। কোথাও শৃঙ্খলা বা সৌন্দর্য্যের চিহ্নমাত্র দেখিলাম না বরং মনে হয়, যেন এ পুরীর বাড়ীঘর, ঘাট, মাঠ **সর্ব্বত্র** একটা রূঢ় পোড়া রূপ লাগিয়া আছে, এ যে শুধু দাহ্য পদার্থ কয়লারই দেশ তার পরিচয় যেন পদে পদে জাগাইয়া রাখিবার উৎকট প্রয়াস চারিদিকে। আকাশে চৈত্রের মধ্যাহ্ন রোদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে, রাস্তায় লোকজনের চিহ্নটি পর্য্যন্ত নাই, বাড়ীগুলি অধিকাংশই জনশূন্য বলিয়া মনে হইল, আভরণহীন পাহাড়গুলিও রৌদ্রে পুড়িয়া বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর ইহাদের আড়াল হইতে অসংখ্য বন্য উল্লুকের একটানা বিকট 'হুপ্ হুপ্' শব্দ আসিয়া সারা অঞ্চলময় যেন একটা পৈশাচিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে।

কলোনীর এই রূঢ় মূর্ত্তি দেখিবার উৎসাহ আর আমার বেশী সময় রহিল না। একটি ট্রলি লাইন ধরিয়া জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, অবশ্য নিতান্ত উদ্দেশ্য বিহীনভাবে নহে। এ লাইনটি ষ্টেশন হইতেই আসিয়াছে এবং আমি ষ্টেশনেই জানিতে পারিয়াছিলাম, ইহা কয়লা খাদের মুখ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি উঁচু পাহাড়ের সম্মুখীন হইলাম, এই পাহাড়ের মধ্য দিয়া একটি সরু সুড়ঙ্গপথ কাটিয়া কোনরূপে ট্রলি লাইনটি তাহার ভিতর দিয়া টানিয়া নেওয়া হইয়াছে। সুড়ঙ্গমুখে লাল-নীল নিশান হস্তে একটি কুলী বালককে পাইয়া অগত্যা তাহাকেই আমার কয়লা খাদ দেখা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কোন প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে পারিল না, তবে একটু জোরে এবং আদেশের স্বরেই জানাইয়া দিল—যদি আমার সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে যেন অতি সত্বরই তাহা করিয়া ফেলি, কয়েক মিনিট মধ্যেই খাদ হইতে কয়লা লইয়া গাড়ী আসিতেছে।

কুলী বালকের কথামত আমি দ্রুতপদেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম; কিন্তু সুড়ঙ্গমুখের পরিধি দেখিয়া ইহার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে মনে মনে যে ধারণা করিয়াছিলাম, বাস্তবে দেখিলাম তাহা অন্যরূপ, অন্ধকার গহ্বর যেন আর শেষ হইতে চায় না, তাহার উপর ট্রলীর দুই লাইনের মধ্যবর্ত্তী রাস্তা ক্রমেই আষাঢ়ের পল্লীপথের মত কর্দ্দমাক্ত হইয়া চলিতে লাগিল, আর উপর হইতে পাহাড় চুয়ান হিম শীতল জলের বড় বড় ফোঁটা গায়ে পড়িতে লাগিল। এই জলকাদা ভাঙ্গিয়া এবং বারকয়েক হোঁচট খাইয়া ছয় মিনিটে সুড়ঙ্গটি অতিক্রম করিলাম। ট্রলি লাইন সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইয়া অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই দক্ষিণে মোড় ফিরিয়া আবার বিশাল পর্ব্বতের গভীর অন্ধকারময় আর একটি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাই কয়লা খাদের প্রবেশ দ্বার, এই সুড়ঙ্গমুখের ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত একটি ছোট পাকা গৃহে একজন এংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোককে উপবিষ্ট দেখিয়া আমি সোজা তাহার কাছেই গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং আমার উদ্দেশ্য জানাইলাম। তিনি প্রথমেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—খাদে প্রবেশের দিন আজ নহে, আজ কাজের দিন, কাজেই খাদে প্রবেশ করা বিপজ্জনক। রবিবার দিনটিতেই কলিয়ারীতে প্রবেশ করা নিরাপদ। রবিবারের আর তিনদিন বাকী, যদি সেদিনটি পর্য্যন্ত লিডুতে অপেক্ষা করি, তবে তিনি খাদের অভ্যন্তরে আমাকে লইয়া গিয়া সব ভালরূপেই দেখাইতে পারেন জানাইলেন। আমি সে সম্বন্ধে পরে চিন্তা করিয়া দেখা যাইবে বলিয়া আপাতত যাহা দেখা সম্ভব তাহাই দেখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ভারতের অন্যান্য স্থানের কয়লা খনিতে যেমন সাধারণ ভূপৃষ্ঠ হইতে হাজার হাজার ফুট নিম্নে গিয়া কয়লার সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেই পাতালপুরী হইতে 'লিফ্‌ট'এর সাহায্যে কয়লা উঠাইতে হয়, এখানে কিন্তু সেরূপ নহে। আসামের কয়লা পর্ব্বতের অভ্যন্তরে ঠিক পর্ব্বতাকৃতিতেই যেন পাহাড়গুলির কাঠামোরূপে ভূপৃষ্ঠের উপরে স্তূপাকারে বিরাজ করিতেছে। এ স্থানের কয়লা আহরণ করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। পর্ব্বতের এক পার্শ্ব হইতে সাধারণ

ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে রেলওয়ে ট্যানেলের মত সুড়ঙ্গ কাটিয়া তাহার ভিতর দিয়া ট্রলি লাইন বসাইয়া পর্বতাভ্যন্তরস্থ কয়লা স্তূপের নিকট পর্যন্ত নেওয়া হইয়াছে, তৎপর কয়লা কাটিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ট্রলি বোঝাই করিয়া সব বাহিরে করা হইতেছে, এভাবে ক্রমশ সেই স্তূপীকৃত কয়লা কর্তিত হইয়া বিশাল পর্ব্বতের ভিতরে সৃষ্টি হইয়াছে অন্ধকারময় এক বিরাট প্রান্তর।

কয়লা খাদে কোন ইঞ্জিনাদি প্রবেশের নিয়ম নাই। খাদ-মুখের সোজাসোজি বাহিরে একটি 'পাওয়ার হাউস' হইতে ট্রলি লাইনের উপর দিয়া দুইটি তারের রজ্জু খাদের ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, এই রজ্জু অবলম্বনেই খাদ হইতে ট্রলিগুলি বাহিরে চলিয়া আসে, তৎপর খাদমুখ হইতে একটি ছোট ইঞ্জিন আবার এগুলিকে টানিয়া লইয়া যায় যথাস্থানে। এরূপভাবে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ লক্ষ্মীমপুর জেলার তথা আসামের পূর্ব্ব সীমানার পর্ব্বতমালা হইতে দিনের পর দিন হাজার হাজার মণ কয়লা বাহির হইয়া সারা ভারতে বিতরিত হইতেছে, আরও কত বৎসর যে এ আহরণ ও বিতরণ চলিবে কে জানে।

আমার পূর্ব্বোল্লিখিত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক এই কলিয়ারীর একজন 'ফোরম্যান'। তাঁহার সহিত দাঁড়াইয়া অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা বলার পরেই দেখিলাম, পাওয়ার হাউসের সহিত সংলগ্ন ঘূর্ণায়মান রজ্জুটি অবলম্বন করিয়া বিকট শব্দ করিতে করিতে একসার কয়লা বোঝাই ছোট ছোট ট্রলি খাদের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ীর উপরে উপবিষ্ট কয়েকটি রক্তচক্ষু নরাকৃতি সজীব কয়লার মূর্ত্তিও চোখে পড়িল, ইহারাই কয়লা খাদের প্রাণ।

গাড়ীগুলি খাদমুখ হইতে সরিয়া গেলে ফোরম্যান সাহেব আমাকে লইয়া সুড়ঙ্গপথে খাদ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। ক্রমশ অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া চলিতে লাগিল, আমি নিঃশব্দে সাহেবের পশ্চাদনুসরণ করিয়া চলিলাম। উপরে বৃক্ষলতা সুশোভিত স্বাভাবিক বিরাট পর্ব্বত, হয়ত কত বন্য পশু পাখী তখনও সেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, আর ইহার তলদেশের একটি সুড়ঙ্গপথে আমরা দুইটি প্রাণী রওয়ানা হইয়াছি, তাহারই অন্তরের সারশূন্য বিকট অন্ধকারময় রূপ দেখিতে। যাহা হউক, সে মূর্ত্তি আর আমার দেখা হইল না, কিছুদূর গিয়াই সঙ্গী বলিলেন—আর অগ্রসর হওয়া উচিৎ নয়, এখনই আরও কয়েকখানি গাড়ী আসিয়া পড়িতে পারে। শুনিলাম ঠিক একইরূপে রাস্তায় আরও প্রায় এক মাইল অগ্রসর হইলে খাদে পৌঁছা যাইবে। অর্দ্ধপথ হইতেই আমরা আবার ফিরিয়া চলিলাম। বাহিরে আসিয়া ফোরম্যান সাহেব আমাকে তিন দিন অপেক্ষা করিয়া পরবর্ত্তী রবিবার পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইতে বলিলেন; কিন্তু তিন দিন অপেক্ষা করিয়া কয়লা খাদের তিমিরাচ্ছন্ন রূপ দেখিবার মত উৎসাহ তখন আর আমার ছিল না, বিশেষত সেই লিডুর মত পোড়াদেশে (লিডুবাসিগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন) তিন দিন বাস করা আমার তখনকার মনের অবস্থায় অসম্ভব বলিয়া মনে হইল।

আমি আর দেরি না করিয়া কয়লা খাদের ক্ষণিকের বন্ধু ফোরম্যান সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া সোজা ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বেলা তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, প্লাটফরমে একখানি গাড়ীও প্রস্তুত ছিল। অল্পক্ষণ পরেই কয়লা পাহাড় ছাড়িয়া তেলের পাহাড় অভিমুখে ছুটিলাম।

* * *

ঘরে ঘরে যখন সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আর রজনীর কালো ছায়া অতি সন্তর্পণে ধরণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইতেছে, ঠিক এমনি সময়ে আসিয়া ডিগবয়ে নামিলাম।

ডিগবয়ের মাটিতে আমার এই প্রথম পদার্পণ নহে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আরও একবার এই তেলের পাহাড়ে আসিয়া নামিয়াছিলাম এবং তখন কিছুকাল বাসও করিয়াছিলাম। সেদিন যে উৎসাহ, যে আনন্দ এবং সর্ব্বোপরি যে নির্ভরতা লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আজ নিছক ভ্রমণ করিতে আসিয়াও তার কণামাত্র অনুভব করিলাম না। একটা বিস্মৃত ব্যথা আবার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেদিন ডিগবয়-এ আসিয়া নিজস্ব বলিয়া দাঁড়াইবার একটি স্থান ছিল, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর তেল কোম্পানীর কেরাণী সম্প্রদায়ের একজন ছিলেন। হয়ত আজও থাকিতেন; কিন্তু এক ছুটিতে দেশে গিয়া আর পুনরায় কর্ম্মস্থানে ফিরিবার অবকাশ তাঁহার হইল না, পরপারের ডাকে সারা দিতে হইল।

আজ অতি পরিচিত হইলেও নিতান্ত অপরিচিতের মত ডিগবয়-এ আসিয়া রাত্রিবাসের আস্তানার জন্য একটু ভাবিতে হইল। জানিতাম বিগত দিনের যে কোন বন্ধু গৃহে গেলেই সাদরে গৃহীত হইব, তবু যেখানে একদিন নিজ গৃহই ছিল অথচ ভগবান অতর্কিতে সব ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিলেন, সেখানে আর মাথাটুকু গুঁজিবার জন্য অতীতের পরিচয়সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে প্রবৃত্তি হইল না। আমার রাত্রিবাসের জন্য হোটেলই উত্তম স্থান বলিয়া মনে করিলাম।

পরদিন ভোরবেলা পরিচিত সিটির সঙ্গে শয্যাত্যাগ করিয়া ডিগবয় শহরে বেড়াইতে বাহির হইলাম। তেলের পাহাড়ের অফিস, কারখানা, হাট-বাজার এমন কি শহরবাসী লোকজনের আহার-বিহার নিদ্রা পর্য্যন্ত এই বিকট রব সিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমিও স্থান-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া সিটির সঙ্গেই বাহির হইলাম। রাস্তায় লোকজন ও মোটরের ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়াছে, অধিকাংশই চলিয়াছে নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে, কেহ কেহ কারখানা বা তেল-মাঠ (oil field) হইতে রাত্রির পালা শেষ করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। এক তেল কোম্পানীকে কেন্দ্র করিয়াই রাস্তায় এত ব্যস্ততা, এত ছুটাছুটি। পিপীলিকার ঝাঁকের মত দলে দলে লোক চলিয়াছে, ইহাদের মধ্যে আবার কত জাতি, কত বর্ণ, পোষাক-পরিচ্ছদেরই কত নমুনা, কত বিচিত্র চেহারারই বা সমন্বয় এখানে। ডিগবয়-এর ইহা একটি অতি বড় লক্ষ্য করিবার বিষয়—বোধ হয় সারা ভারতের এমন কোন প্রধান জাতি নাই, যাহাদের অল্পবিস্তর এখানে কাজ করে না, এমন কি

বহির্ভারতের ও প্রাচ্য পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দেশেরই দুই একজনকে হইলেও ভারত সীমান্তের এই তেল খাদে দেখা যায়।

এখানকার পাহাড়ের হাজার হাজার ফুট মাটির নীচ হইতে তেল সংগ্রহ এবং এই সংগৃহীত নানাপ্রকার তেলের মিশ্রিত মণ্ড পরিষ্কৃত ও তাহা হইতে প্রত্যেককে পৃথক করিয়া তাহাদের নিজ নিজ কাজের উপযোগী করিতে কোম্পানীকে শত শত কল-কারখানা ও বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হইয়াছে, এই কলকব্জাকে চালাইতে আবার বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ লোকজনের প্রয়োজন হইয়াছে, এজন্যই সারা ভারতের এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্যের নানাজাতির সমাবেশ এখানে। এই ত গেল কোম্পানীর মুখ্য (Practical line) প্রয়োজনের কথা, তারপর ইহাদের আনুষঙ্গিক হিসাব-পত্র, আমদানী-রপ্তানি এবং সর্ব্বশেষে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি মিলিয়া নানা বিভাগ নানা অফিসের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এগুলির জন্য প্রয়োজন হইয়াছে বহু কেরাণী বহু পরিদর্শক পরিচালক এবং বহু ডাক্তার কম্পাউণ্ডারের। সর্ব্বসমেত প্রায় দশ হাজার ভারতীয় কর্ম্মচারী না কি এখানে সর্ব্বদা কাজ করিতেছেন আর দুইশতাধিক ইউরোপীয়ান ইহাদের উপর নানা বিভাগের কর্তৃত্ব করিয়া চলিয়াছেন।

এই নানাদেশীয় নানা ভাষা ভাষী কর্ম্মচারীদের জন্য প্রয়োজন হইয়াছে পোষ্টঅফিস, বাজারহাট, হাট বাজার দোকানের বর্ত্তমান ডিগবয়ে এসবের কিছুরই কোনরূপ ত্রুটি আছে বলিয়া মনে হয় না। আধুনিক নগরবাসীদের প্রতিটি শহরের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তার প্রায় সবই, সিনেমা থিয়েটার ক্লাব, টেনিসকোর্ট, ফুটবল খেলার মাঠ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সপরিবারে দশ বার হাজার কর্ম্মচারীর আবাস পল্লীতে অবস্থিত সহরের এই সুন্দর স্থানটিকে আরও সুন্দর আরও মনোরম করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

ডিগবয় মূল শহরটি চারিদিকের পর্ব্বতমালার মধ্যস্থ একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত। শহরের ঠিক মধ্যস্থলে প্রায় এক বর্গ মাইল স্থান জুড়িয়া তেল পরিষ্কারক কারখানার (Refinery) প্রকাণ্ড বাড়ীটি দাঁড়াইয়া আছে, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে কোথাও এক মাইল কোথাও দেড় মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে সারে সারে ভারতীয় কর্ম্মচারীদের অসংখ্য গৃহ, অধিকাংশই ব্যারাকের বাড়ী এবং সবগুলির গঠন-প্রণালী প্রায় একইরূপ। কর্ম্মচারীদের পদমর্য্যাদা ও মাসিক বেতনের তারতম্যানুসারে তাহাদের বাড়ীগুলিও বিভিন্ন ছোট বড় আকারে বিভিন্ন গঠন-প্রণালীতে বিভিন্ন পাড়ায় নির্ম্মাণ করিয়া সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা হইয়াছে। বাড়ীগুলির আকার অতি ছোটই কিন্তু এই ছোট বাড়ীগুলিতেও আলো বাতাস প্রবেশের, জল নিকাশের এবং অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়ের যথাসম্ভব সুন্দর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, ফলে আজ ডিগবয়ের স্বাস্থ্য বাঙলা ও আসামের যে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানের সমতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে অথচ দশ বৎসর পূর্ব্বেও এই ডিগবয় ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরের ডিপো বলিয়া পরিচিত ছিল, পারতপক্ষে কেহ তখন এদেশে আসিতে চাহিত না।

ডিগবয়ের ঘনবসতি সমতল ক্ষেত্রের দক্ষিণ প্রান্তের টিলাবহুল পর্ব্বতমালায় বহুদূরে পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি পাহাড়ের শিরে দাঁড়াইয়া আছে এক-একটি সুদৃশ্য বিরাট বাংলো। সুসজ্জিত পুষ্পোদ্যান ও চারিপার্শ্বের তৃণাচ্ছাদিত সবুজ রূপের মধ্যে রঙ বেরঙ-এর শতাধিক বাংলো ডিগবয় শহরের এই পার্ব্বত্য অংশটিকে আলোয় আলোময় করিয়া রাখিয়াছে। বলাবাহুল্য যে এই সুদৃশ্য অঞ্চলের অধিবাসী ইউরোপীয়ান সম্প্রদায়।

অন্যদিকে সমতল ক্ষেত্রের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমানা হইতে আরম্ভ হইয়াছে এই কোম্পানীর কামধেনু তেলমাঠ। প্রায় পনর বর্গমাইল (৩×৫) বিস্তৃত স্থানের পর্ব্বতমালা চুষিয়া আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ বাহির করা হইতেছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ। এই সুবিস্তৃত মাঠের পাহাড়গুলির গায়ে হাজার হাজার ফুট মাটি খুঁড়িয়া বসান হইয়াছে অসংখ্য নলকূপ আর এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ দিবারাত্র কূপগুলি হইতে টানিয়া তোলা হইতেছে সারা জগতের নিত্য প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার তেল। সবগুলি হইতেই যে টানিয়া তুলিতে হয় তাহাও নহে, এমাঠে এমনও অসংখ্য কূপ আছে যাহা হইতে 'পাম্প' করিয়া তেল উঠাইবার ত প্রয়োজন হয়ই না বরং নলকূপ বসানর সঙ্গে সঙ্গে ফোয়ারার মত এমনভাবে আকাশপানে তৈলধারা ছুটিতে থাকে যে সময় সময় বেসামাল হইয়া সাময়িকভাবে কূপ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

সাধারণতঃ ডিগবয় কেরোসিন ও পেট্রোলের উৎস বলিয়া পরিচিত, কিন্তু ইহাদের সহিত আর যে কয়টি জিনিষ মিশ্রিত থাকে তাহাদের পরিমাণ এবং আয়ও নিতান্ত অল্প নহে। অন্যগুলির মধ্যে মোমই প্রধান, তা ছাড়া আরও কয়েকপ্রকার তেল, এসিড ও সর্ব্বশেষে কয়লা পর্য্যন্ত এই তেল হইতেই বাহির করা হয়।

সারা মাঠের কর্দ্দমবৎ মিশ্রিত তৈলমণ্ড সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই বিরাটকায় নলের ভিতর দিয়া মাঠ হইতে চলিয়া যাইতেছে পরিস্কারক কারখানায় আবার সেখানেও পরিষ্কৃত পৃথগীভূত হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই যথাস্থানে প্রেরিত হইতেছে, এভাবে এখানে দিবারাত্রই চলিয়াছে কল-কারখানার অবিশ্রান্ত ঘরুঘরু, শোঁ-শোঁ, দিবারাত্রই চলিয়াছে কর্ম্মীদের ব্যস্ততা।

শুনিয়াছি আসামের বহু বনজঙ্গলের মত আসাম সীমান্তের এই ডিগবয়ও একদিন ঘোর বনে আবৃত ছিল। দিবারাত্র এখানেও চরিত অসংখ্য বন্য জন্তু-জানোয়ার, আর আজ এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে এক বিরাট নগর। হিংস্র পশু তাড়াইয়া এই তেলের পাহাড়। দেশ-দেশান্তর হইতে ডাকিয়া আনিয়াছে কত সুসভ্যজনকে, কত দেশপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার, ভূতত্ত্ববিদ্, রাসায়নিককে সাদরে স্থান দিয়াছে তাহার বুকে। যদিও আজ ভারতবাসী দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, পিঠ ঢাকিয়া কাপড় পরিতে পারে না, তবুও দরিদ্র ভারতমাতা তাঁহার ক্ষুদ্র অঞ্চল আসামের এই ক্ষুদ্রতম কোণটিতে এমনি সম্পদ লুকাইয়া রাখিয়াছেন যাহাদ্বারা

আজ লক্ষাধিক লোকের অন্ন জুটাইয়াও বৎসরে কোটি কোটি টাকা বিলাতে কোম্পানীর মালিকদের ঘরে পাঠাইতেছেন। ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদ্‌ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন আরও অন্তত শত বৎসর সমানভাবেই তৈলহরণ করা যাইবে। কে জানে ম্যাদ আরও বাড়িয়াও যাইতে পারে, দিনের পর দিন নূতন নূতন কূপের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে তেল-মাঠের আয়তনও বর্দ্ধিত হইতেছে।

আমার ডিগবয়'এ নূতন করিয়া কিছু দেখিবার ছিল না তবুও ইহার সুন্দর পার্ব্বত্য রাস্তাগুলি এবং তেল-মাঠের মনোরম দৃশ্য আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল।

সেদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বাহির হইয়া শহরের মধ্য দিয়া সোজা উত্তর মুখে তেল মাঠের উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম। পিচঢালা প্রশস্ত রাস্তায় কিছুকাল চলিয়া সমতল ক্ষেত্র সীমানায় যেস্থান হইতে ভূমি ক্রমশ উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে সেস্থানে অবস্থিত একটি মনোরম, মনোলোভা ইউরোপীয়ান পল্লীর মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম। নাতিউচ্চ পাহাড়ের সমতল প্রশস্ত শীর্ষে পাশাপাশি বাড়ী লইয়া এই ক্ষুদ্র পল্লীটি নিজের সৌন্দর্য্যে যেমন চারিদিক আলো করিয়া রাখিয়াছে তেমনি তাহার কোলে দাঁড়াইয়া চারিদিকের ছবির মত দৃশ্যাবলী দেখিয়াও মোহিত হইতে হয়। একপার্শ্বে পল্লীর ঠিক পায়ের কাছ হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে সাহেবদের বিরাট গল্ফ মাঠটি তাহার মসৃণ ও নিখুঁত সবুজ রূপ লইয়া আর দক্ষিণে শহরের সমতল ভূমিতে বিরাজ করিতেছে, সারি সারি সজ্জিত বাড়ী-ঘর, পথ-ঘাট, বাজার, তারপর সমতল ক্ষেত্র শেষ হইয়া আরম্ভ হইয়াছে ক্রমশ ঊর্দ্ধে উত্থিত সবুজ বনানী, আবার উত্তরদিকে পল্লী-প্রান্ত হইতেই বিশাল তেল-মাঠের সূচনা।

আমি চারিপার্শ্বের প্রভাতের নিস্তব্ধরূপ দেখিতে দেখিতে পল্লী অতিক্রম করিয়া তেল মাঠে প্রবেশ করিলাম। এখানে প্রকৃতির উপর মানুষের হাত পড়িয়া কৃত্রিমতা ফুটিয়াছে যথেষ্ট সত্য, কিন্তু কোথাও মানবশক্তি প্রকৃতির সহিত বিদ্রোহ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, বরং সর্ব্বত্রই যেন মানব প্রকৃতির সঙ্গে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

সমগ্র মাঠে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বসান হইয়াছে অসংখ্য পাতালস্পর্শী নলকূপ আর তাহাদের পাশে পাশে স্থাপিত হইয়াছে বহু কল-কব্জা, বয়লার ট্যাঙ্ক। সারা মাঠময় মাকড়সার জালের মত পাহাড়গুলিকে বেড়িয়া চলিয়াছে পিচ-ঢালা কালো কুচকুচে পথগুলি, কোথাও সবুজ পাহাড়ের পদতল দিয়া কোথাও কটি বেড়িয়া আবার কোথাও সুউচ্চ শীর্ষ অতিক্রম করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া অসমতল ক্ষেত্রের ঢেউ-খেলান রাস্তাগুলি সমগ্র মাঠটিকে যেন সত্যই জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে আর সবুজ শাড়ীর কালো পাড়ের মতই শতগুণে বাড়াইয়া তুলিয়াছে শ্যামল পর্ব্বতমালার সৌন্দর্য্য। শুধু সৌন্দর্য্যেই রাস্তাগুলির শেষ নহে, এমনি সুকৌশলে এই প্রশস্ত পথরাজি নির্ম্মিত হইয়াছে যে, ইহার প্রত্যেকটি শাখায় প্রত্যেকটি বাঁকে এমনকি রাস্তার পর্ব্বতশীর্ষস্থ সর্ব্বোচ্চ অংশেও বিরাটাকার মালবাহী মটর গাড়ীগুলি পর্য্যন্ত অনায়াসে চলিতে পারে।

এ পথগুলি আর মনোরম পর্ব্বতমালাই আমাকে পাঁচ বৎসর পরে আবার ডিগবয়ে টানিয়া আনিয়াছিল। একে একে অনেকগুলি পরিচিত রাস্তায় একাকী ঘুরাফিরা করিয়া কখনও পর্ব্বত শিখর হইতে সারা ডিগবয়ের দৃশ্য দেখিয়া কখনও পাহাড়ের পদতল ঘেঁসিয়া তাহারই রূপ দেখিতে দেখিতে চলিয়া বেলা প্রায় দশটায় আস্তানার পথে ফিরিয়া চলিলাম।

মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়াই কড়া-রৌদ্র মাথায় করিয়া অতীত দিনের দুই একজন বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইলাম। কাহারও সহিত দেখা হইল, কাহারও বন্ধ দরজায় ঘা দিয়া বিফল মনোরথ হইয়াই ফিরিলাম।

সন্ধ্যাবেলা, পূর্ব্বদিন যে গাড়ীতে আসিয়া নামিয়াছিলাম ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পর আবার সেই গাড়ীতেই আসাম জঙ্গলের বনজঙ্গলে ও আধুনিক সভ্যতায় সমৃদ্ধ কক্ষটি হইতে দ্বিতীয়বার শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া ডিব্রুগড়ের পথে রওয়ানা হইলাম। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক মালায় সজ্জিত বিরাট তেল-মাঠ সহ ডিগবয় শহরটি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আমার চলার পথে অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে নিষ্প্রভ হইয়া অতি কষ্টেই যেন বনের অন্তরালে প্রবেশ করিল, জানি না এবার ও শেষ বিদায় দিল কি-না।

শারদোৎসব

সুষমারাণী সেন

সুনীল গগন কোলে;
দিক্‌-বালিকার অঞ্চলখানি দোদুল ছন্দে দোলে —
কাশের হাসিতে রাখালী বাঁশীতে বোধনের সুরে সুরে,-
রূপালী আলোর স্বরগ সুষমা মাধুরীর মত ঝুরে
বলাকা-পাখার বিধূননে মৃদু শব্দের ঝঙ্কার
অন্তরীক্ষে রচনা করিছে বন্দনা গীতি কা'র!
স্বপন মায়ার কাঁচ রোদ দোলে কমল ফুলের বনে
উচ্ছলি' নদী দুকূল নাচায়ে ছুটে চলে কলস্বনে—
স্নিগ্ধ-সমীরে সুন্দরী মোর শ্যামলা ধরণী তলে;
রবির কিরণে শিশিরের কণা ঘাসের শিয়রে জ্বলে
কুঞ্জবীথির বনছায়াতলে বিহগীর কাকলীতে—
ভরিয়া উঠিল ভুবন আজিকে সুমধুর রসে গীতে!
শারদোৎসবে আজি—
মা'র আগমনী আকাশে বাতাসে কি সুরে উঠিল বাজি
শিশুর কণ্ঠে প্রচারিত হ'লো মার শুভ আগমন
তাইত শেফালী অঙ্গন ভরি' আঁকিয়াছে আলিপন
মৌমাছি আর প্রজাপতি করে পাখায় পাখায় খেলা
চঞ্চলি উঠে কলগুঞ্জন বনপথে সারা বেলা!
জ্বলিয়া উঠিল দেউলে আজিকে প্রদীপমালার শিখা
জননী আসিবে তাই-কি চলিছে বিজয়পত্র লিখা?

ইভা কহিল, "সে তো অনায়াসে পার। এই ক'টা দিন থেকে তোমার কলেজ বন্ধ হলেই না হয় তুমি আমি একসঙ্গে সেখানে যাব। এ পর্য্যন্ত খুবই সোজা। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।"

"কি কথা? কিন্তু উনি কী সুন্দর বললেন ইভা, এদিকটায় আমরা যেন এতদিন অন্ধ হয়েছিলাম।" সুবোধ মুগ্ধকণ্ঠে কহিল

ইভা বলিল, "বলেছেন খুব সুন্দর আর অতি সত্যি—যা বলেছেন হৃদয়-মন দিয়ে তা অনুভব করেই বলেছেন। কিন্তু আমি কি ভাবছিলাম জান, সত্যিকার কার্য্যক্ষেত্রে যখন নামবে, তখন পারবে কি সইতে তার আবহাওয়া? বয়স্কদের লেখা-পড়া শেখানো মুখের কথা নয়; বিশেষ করে পাড়াগাঁয়ে।"

সুবোধ কহিল, "তা জানি। আর সেইজন্যেই বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে খুব শীগ্‌গির আমাদের ট্রেনিং দেবার একটা ব্যবস্থা হচ্ছে

ইভা হাসিয়া বলিল, "সে ট্রেনিং নয়, সেদিকটা খুব কঠিন হবে না। কিন্তু তোমার এই ফ্যাশনেবল ধুতি পাঞ্জাবি চশমা নিয়ে সেখানে দাঁড়ালে ওরা করবে তোমাকে অবিশ্বাস। মনে করবে—নিছক পরোপকারের উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি ওদের মধ্যে দাঁড়াওনি। নিশ্চয়ই মাথায় অন্য ফন্দীফিকির আছে

সুবোধ। "তাহলে আমাকে কি করতে হবে? এসব খুলে রেখে মোটা নহাতি একখানা কাপড় প'রে তারই খুঁটটা গায়ে দিয়ে ওদের কাছে দাঁড়াতে হবে?"

ইভা আবার হাসিল, "না গো, বাইরের খোলসটাই শুধু বদলালে চলবে না, মনটাকেও করতে হবে ওদের বিশ্বাসের যোগ্য। নইলে ওদের মাঝে আমলই পাবে না।"

সুবোধও হাসিল, কহিল, "তাহলে ভাই তুমিই শিখিয়ে দাও না কেমন করে পরচর্চ্চা করতে হয়, কেমন করে দলাদলির চক্রান্ত করতে হয়। আমি তো ও-সব জানি না, বরঞ্চ তুমি জানতে পার। অনেকদিন ধরে পাড়াগাঁয়ে আছ।"

এবারে ইভা হাসিতে গিয়া গম্ভীর হইয়া গেল; "ও, এই বুঝি তোমার ওদের উপর ধারণা — আর শ্রদ্ধার নমুনা! কিন্তু এইটুকুই শুধু ওদের পরিচয় না, অন্যদিকও আছে। যদি ধৈর্য্য থাকে সে পরিচয়ও পাবে ক্রমশ। কার্য্যক্ষেত্রে নেমে দেখ প্রথমে। মুখে বললে কিছু হয় না।"

তাহারা এমনই গল্প করিতে করিতে যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন বাড়ীর দুয়ারে অন্য একটা বড় মোটর দাঁড়াইয়া। ইভার মা বলিলেন, "ও বাড়ীতে আজ অমিয়াকে দেখতে এসেছে তাই ছোট বৌ গাড়ী পাঠিয়ে যেতে বলেছে, যাবি? গেলে ওরা খুব খুশী হবে চল। এই বয়স থেকেই তোর যত সভা-সমিতিতে হুজুগ। ওসব করবারও একটা বয়স আছে; যে বয়সের যা। সেনাগিন্নী বা চপলামাসী যখন ওসব ক'রে বেড়ায়, তখন একরকম মানে হয়, কিন্তু তোর এসব কি অসঙ্গত খেয়াল......" বলিতে বলিতে ইভার মায়ের মুখে একটুখানি হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার মনে পড়িয়া গেল জামাই দীর্ঘদিনের জন্য প্রবাসে গেছে। একটা কিছু অবলম্বন না হইলেই বা মেয়েটা থাকে কেমন করিয়া। ইভাকে যাইবার জন্য আর একবার জিদ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে তুই এখন এখানে থাকবি তো? অমিয়ার যদি এইখানে পাকাপাকি হয়ে যায়, তাহলে আষাঢ়ের প্রথমেই বোধ হয় বিয়ে হবে। বিয়েটা দেখে অন্তত যাবি তো। আমার মতে মনে হয় এখন তুই এখানেই থাক না। অবশ্য যদি তোর শ্বশুর বা শাশুড়ীর অমত না হয়। জামাই পড়তে বিদেশ গেছেন—এখন ঐ পাড়াগাঁয়ে তোর না থাকলেও চলে।"

ইভা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না না, আমার অতদিন থাকা চলবে না। সুবোধদার গরমের ছুটি সুরু হলেই আমরা দুজনে একসঙ্গে যাব।"

ইভার মা একটু অপ্রসন্ন হইলেন। এই তো সেদিনও যখন বিয়ের কথা হয় ওখানে, পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরঘর শুনিয়া মেয়ের সে কি মুখভার! ইহারই মধ্যে উল্টাদিকে হাওয়া বহিতেছে। মেয়েদের মনের অন্ত পাওয়া ভার।

ইভা বলিল, "মা আজ তুমি একাই অমিয়াদের বাড়ীতে যাও, আজ আর আমি যাব না। বড় ক্লান্ত লাগছে।"

মোটর অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া তাড়া দিতেছিল—ইভার মা চলিয়া গেলেন। বিবাহের কথামাত্রেই মেয়েদের মনে যে একটি চিরন্তন কৌতূহল থাকে সেই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ইভা অত রাত্রিতে তাহার মা বাড়ীতে পা দিবামাত্রই প্রশ্ন করিল, "কি ঠিক হ'ল মা? তোমার যে আসতে এত দেরী?" তাহার মা বিস্তারিত করিয়া বলিতে সুরু করিলেন, কেমন করিয়া অমিয়া গান গাহিল, কেমন করিয়া এস্রাজ বাজাইল। বরপক্ষ হইতে কেমন করিয়া কি কি প্রশ্ন করা হইয়াছিল।

তা অমিয়া মেয়েটা খুব সপ্রতিভ, একটুকু থতমত খায় নাই। নীলাম্বরী ঢাকাই শাড়ীর সঙ্গে চুণীর ধুকধুকিটা তাহাকে মানাইয়াছিল বেশ।

শেষে একটা বড়রকম নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ছোটবৌর জামাইভাগ্য ভাল—যে ছেলেটি জামাই হবে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল সে আই সি এস। দিনাজপুরে পোষ্টেড্ হয়েছে। এই মরেমাত্র মাস দুই কাজে ঢুকেছে, বয়সও বেশী নয়।"

এই বলিয়া তিনি শুইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দীর্ঘ-নিশ্বাসের মানে বুঝিয়া ইভা মনে মনে একটু হাসিল। শশাঙ্ক প্রথমে অমনই আই সি এস পড়িতে বিলাত যাক এ ইচ্ছা তাহার ছিল, তাহার আত্মীয়স্বজনেরও ছিল। কিন্তু আজ এই যে সে কেবল ব্যবসায় শিখিতে ওদেশে গেছে, ইহাতে আত্মীয়েরা মনে মনে বীতশ্রদ্ধ ও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। যাহারা আর কিছুই পারে না অথচ যাহাদের বাপের পয়সা থাকে তাহারাই এমনতর আজগুবি ব্যবসা অথবা কৃষি শিখিতে ওদেশ যায়। আর কিছুই করে না কেবল কতকগুলো পয়সা উড়াইয়া আসে। তাহাদের পড়াশুনার কথা শুধু বাজে ভণ্ডামি। হ্যাঁ, এই চাকরীর মধ্যেই যদি একটু বড় দরের চাকরীর সুবিধা করিতে পার,—যদি কেরাণী না হইয়া ডেপুটি কিংবা মুন্সেফ হও সে এক কথা। আর ম্যাজিষ্ট্রেট্ হওয়া সেই তো সাধনার চরম সমাপ্তিস্থল! এমন বস্তুর মায়া কাটাইয়া শশাঙ্ক যে তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি এবং বাপের পয়সা সত্ত্বেও ব্যবসার নাম করিয়া বিদেশে গেছে ইহাতে ইভার মায়ের মনে বরাবর একটা ক্ষোভ জমিতেছিল, আজ ফাঁক পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাসের আকারে সেটা ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

ক্রমশ

প্রগতির স্বরূপ ও বাঙালী সমাজ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

প্রগতি কথাটার ব্যাখ্যা সহজ নয়। উপসর্গ বাদ দিলে তার অর্থ কোন কোন সময়ে সহজবোধ্য হইলেও সমাজ জীবনের গতি নিরূপণ স্বভাবতঃই কষ্টসাধ্য। কিন্তু অর্থনিরূপণের পরিসমাপ্তি এইখানেই নয়, কারণ গতি ও প্রগতি একার্থবাচক নয়। পরিবর্তন অর্থেই উন্নতি হ'লে কোন সমাজের অবনতি অসম্ভব হ'ত। অথচ সমাজশাস্ত্রীদের মধ্যে অবনতি-বাদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বললে নেহাত অতিরঞ্জন হবে না। অবশ্য শাস্ত্রবচনের দোহাই ছাড়াও সমাজ জীবনের অবনতি দৈনন্দিন ঘটনা। সেইজন্য আমাদের সমস্যা বাস্তবিক দ্বিবিধ। প্রথমতঃ বাঙালী সমাজ শরীরের গতি নির্ণয়, দ্বিতীয়তঃ সেই গতি প্রগতি কি না সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত।

মনে রাখা ভাল যে মানুষের জীবনে যেমন ক্ষয় হোক্ বা বৃদ্ধি হোক্ কোন প্রকারের গতি প্রায় অপরিহার্য, সমাজের বেলাও অনুরূপ ব্যবস্থা। পরিবর্তনহীন সমাজ প্রায় অচল। যুগে যুগে যেমন পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন হবে, জড়জগৎ-জীবজগতের আকার বদ্‌লাবে ও সমাজ-শরীরের বিভিন্ন পরিবর্তন হবে, তেমনি সমাজেরও পরিবর্তন হবে। এই সাধারণ সূত্র অনুসারে বলতে পারা যায় যে এই বিচিত্র বহুমুখী প্রভাবের মধ্যে বাঙালীর পরিবর্তন হচ্ছে এবং হবেও বা। গত দেড়শ বছরের মধ্যে বাঙালীর সমাজের যে পরিবর্তন হয়েছে, তা যদি আমাদের পিতামহদের কেহ মর্ত্যে আগমন করতেন তাহলে বুঝতে ও বোঝাতে পারতেন। যদি লর্ড কর্ণওয়ালিশকে ভারতবর্ষের মুক্তবাণী সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে হ'ত বা ওয়েলেস্‌লিকে ক্লিমেন্ট আটলীর পন্থা নির্ণয় করতে হ'ত, তাহলে এঁরা যে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যেতেন একথা সহজেই অনুমেয়। আরও ভেবে দেখা যায় যদি ঈশ্বরগুপ্তকে সংবাদ প্রভাকরের জন্য সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বিরোধী-সভার বিবরণ তৈরিই করতে হ'ত বা লর্ড মিন্টোকে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে কংগ্রেস বিধান পরিষদী দলনেতা হ'ত তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই বিপদে পড়ে যেতেন। সেইজন্য কালের গতির সঙ্গে সমাজের রীতি বদ্‌লেছে একথা সহজেই এবং সম্ভবতঃ নির্ভয়ে বলা যায়।

কিন্তু গতি সম্বন্ধে এই নির্ভীক মত প্রচার দুঃসাহস না হলেও প্রগতি সম্বন্ধে একরম কোনও সর্বজনসিদ্ধ সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়, কারণ বর্তমানে গতির স্বরূপ নির্ণয় দুরূহ ও প্রগতির মাপকাঠী সম্বন্ধে মতানৈক্য প্রচুর। বহু লেখকের বিশ্বাস প্রগতি কয়েকটি জাতিবিশেষের জন্মগত অধিকার এবং অন্ত্যজদের প্রগতিতে কোনও অধিকার নেই। আবার বহু সমাজশাস্ত্রী প্রগতির জন্মাধিকারে সম্মতি দিয়েও প্রগতির সম্ভাবনায় আস্থাবান নন। গত শতাব্দীতে ফরাসী পণ্ডিত লাপুজ বলেছিলেন আর্য জাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং সমসাময়িক সভ্যতার ধারা ও আকার প্রকার অবনতির দিকে চলেছে। জার্মান মনীষী স্পেংলারের নাম এই সঙ্গে মনে করা যেতে পারে। ইতালীয় লেখক জিনিও সমমতা-বলম্বী এবং মার্কিনী পণ্ডিত হান্টিংটনের লেখার মধ্যেও অনুরূপ আশঙ্কার চিহ্ন পাওয়া দুষ্কর নয়।

কিন্তু এই সকল লেখকদের মনীষার উপর সন্দেহ প্রকাশ না করেও বলতে পারা যায় যে এঁদের আশঙ্কা বিশেষ অমূলক নয়। শ্রদ্ধেয় আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল বলেছিলেন জাতিগত শ্রেষ্ঠতার বাণী নিরর্থক ও জন্মগত প্রগতির বুলি মিথ্যা। বিলাতী পণ্ডিত হব্‌-হাউসের মতও এর বিরোধী নয়। কাজেই বর্ণ বৈষম্যের জন্য বাঙালী জাতি যে প্রগতির অধিকার হতে বঞ্চিত একথা একবার মনে করারও কারণ নেই।

কিন্তু স্বাধিকারতাই প্রগতির লক্ষণ নয় এবং আমাদের আলোচনায় ধারা (Process) বিবর্তন (evolution) ও প্রগতির (Progress) মধ্যে বিভেদ রাখা অবশ্য কর্তব্য। কারণ পূর্ববর্তী অবস্থার সঙ্গে পরবর্তী অবস্থার নিরবচ্ছিন্ন যোগই ধারার একমাত্র লক্ষণ, তাতে সমাজের গঠনের সম্বন্ধে কোনও কথাই নেই। কিন্তু সমাজগঠনের পরিবর্তন বিবর্তনের অন্যতম ও প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ বলা অত্যুক্তি হবে না। আবার এই বিবর্তন যখন উন্নতি পথগামী তখনই তা প্রগতি পদবাচ্য। কিন্তু এই "উন্নতি" শব্দটি বহুরূপী। হবহাউস বলেছিলেন যে যখন ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকে না তখনই এই উন্নতির পরাকাষ্ঠা, তাই প্রয়োজন, সমাজ জনের সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের মনের শুধু সমন্বয় ঘটান—তাতেই প্রগতি সম্ভব। কিন্তু তিনি অন্যত্র বলেছেন যখন সমাজের আয়তন, কর্ম-পটুতা, স্বাধীনতা ও পারস্পরিক সাহায্য বৃদ্ধি পায় তখনই প্রগতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। কিন্তু তাঁর এই চতুর্বিধ ব্যাখ্যার মধ্যে অস্পষ্টতা প্রচুর। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারা যায় আয়তন বৃদ্ধি সামাজিক প্রগতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একথা স্বীকার করা কঠিন, কেন না সমান্তরে (horizontal) ছাড়াও বিসমস্তরে (vertical) গতি প্রগতির পর্যায়ভুক্ত এবং তার সঙ্গে আয়তনের কোনও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই। সেইজন্য যদিও তাঁর ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমন্বয় শাস্ত্রবচন হিসাবে খুবই দরকারী তথাপি তাঁর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি অস্পষ্ট এবং সেজন্যে আরও দুই একজন লেখকের দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। ইতিমধ্যে একটি দল গড়ে উঠেছে যাঁরা বিশ্বাস করেন সমাজের উন্নতি অবনতি চক্রবৎ আসে যায় এবং আস্তেকোইং হতে সুরু করে সোরোকিন পর্যন্ত এই দলে নাম লিখিয়েছেন এবং মার্ক্সও কিছু পরিমাণে এঁদেরই দলভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ সোরোকিনের বক্তব্য স্মরণীয়। তাঁর মতে প্রত্যেক সমাজ তিনটি স্তরে বিভক্ত এবং প্রথম (ideational) হতে দ্বিতীয় (Sensate) ও দ্বিতীয় হতে তৃতীয়ে (idealistic) যাওয়ার নামই প্রগতি। কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে মানব মন কখনও একরকম বাঁধা ধরা গণ্ডীতে চলতে অভ্যস্ত নয় এবং যে সময় তৃতীয় স্তরে সমাজ এসে উপস্থিত হবে সে সময় যে দ্বিতীয় স্তরের লেশ-মাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না একথা বলা মানব মনের সহজ ধর্মকে অস্বীকার করা। তাই প্রগতির তত্ত্বানুসন্ধানে এঁরাও ব্রাত্য। ঠিক এই কারণেই সম্ভবত ঐতিহাসিক টয়েন্‌বী চক্রবাদীদের দলে ভেড়েন নি' কারণ তাঁর মতে প্রগতির মাপকাঠী তিনটি—মানুষের প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের উপর বেশী প্রভাব, মানুষের মানুষের উপর বেশী প্রভাব ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে প্রাণিতত্ত্ববিদ্ হক্সলী লিখছেন জাতীয় সচেতনা বৃদ্ধিই প্রগতির নামান্তর। কাজেই এই মত বহুত্বের মধ্যে আমাদের বুদ্ধিনাশ নেহাৎ অসম্ভব নয়।

কিন্তু তা হলেও প্রগতির স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব কি না সে প্রশ্নের হাত থেকে এখনও এড়াতে পারা যায় নি, সমাজশাস্ত্রের বড় পুঁথি খুললে দেখতে পাওয়া যাবে লেখকেরা প্রগতির ব্যাপক সংজ্ঞা নির্দেশ করে—জাতিগত প্রগতি, শিল্পতান্ত্রিক প্রগতি সাংস্কৃতিক প্রগতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার কথা কইবেন; পুনশ্চ উল্লেখ করবেন এই প্রগতি একমুখীন বহুমুখীন বা সমস্তরবর্তী বিসমস্তরবর্তী হতে পারে এবং এর প্রত্যেকটি প্রগতির মাপকাঠীতে মাপা দরকার। এখানে স্বীকার করা ভাল যে এই রকম আলোচনার স্থানাভাব ও পাণ্ডিত্যাভাব বর্তমান ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট, তাই আরও সহজ আলোচনার ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। শাস্ত্রবচনের পরকল্পার মধ্যদিয়ে আমাদের সমাজ-শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত না করে প্রথমে দেখা যাক্ আমাদের সমাজের প্রধান গতি কোন্‌দিকে এবং সেগুলির প্রগতি কি অপ্রগতির পরিচায়ক পরিশেষে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দুরূহ না হওয়া অসম্ভব নয়।

অনেকেই বলবেন আমাদের জাতীয় তহবিলের জমার অঙ্ক এখন কম নয়। যেমন প্রজনন ক্ষমতার হ্রাস যদি ক্ষয়িষ্ণুতার পূর্ব লক্ষণ হয় তাহলে আমাদের ক্ষয়িষ্ণুতার কোনও আশা নেই। কারণ জন্মের হারে আমরা স্পেন, ইতালী, কানাডা এমন কি মার্কিন রাজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিই। সেই সঙ্গে মৃত্যুহারের কমতিতেও আশার লক্ষণ মেলে। কিন্তু উন্নতির সীমা এখানেই নয় এবং হবহাউসীয় মতে আয়তন বৃদ্ধিতে সংস্কৃতির কারণ থাকলেও এর আরও বিশদ

ব্যাখ্যাতেও আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। একদিকে জাতি যেমন প্রসার লাভ করছে অন্যদিকে তেমনি 'জাত বেজাতের' বেড়া ভেঙে আসছে এবং কোনও কোনও 'জাতের' মধ্যে অন্য 'জাতের' লোক মিশে যাওয়ার উদাহরণের কমতি নেই। কিন্তু জন্মহারই জাতির একমাত্র সমস্যা নয় এবং জনসংখ্যার 'উত্তম' (optimum) থিয়োরীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মালথুসীয় যুক্তির গৌরব হানি ঘটেছে। কিন্তু সে দিকেও আমাদের বহুমুখীন উন্নতির অভাব নেই। প্রথমত আমাদের যন্ত্র-শিল্পের ক্রম প্রসার আশাপ্রদ সন্দেহ নেই। গত কুড়ি বৎসরে ফ্যাক্টরীর সংখ্যা বৃদ্ধি আশানুরূপ না হলেও নিরাশাজনক নয়। এ ছাড়া আমাদের নতুন নতুন পেশার উদ্ভব এ বিষয়ে সাহায্য করেছে। বীমা ব্যবসা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চাষী মজুরদের ক্রমবর্ধমান সংহতি যেমন একদিকে জাতীয় সচেতনার পরিচায়ক তেমনি অন্যদিকে তার ফলে জাতীয় আয়ের একটি মোটা অংশ তাদের দিকে অদূর ভবিষ্যতে যাবে এ আশা করা অন্যায় নয়। কলেজ ও স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ও ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি সকলেরই নজরে পড়বে। আইন-দপ্তরে আজকাল চাষী মজুর সংক্রান্ত আইনের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং চৌরঙ্গী হতে 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা' আমাদের গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে দেশ বিদেশের যে খবরাখবর জন-গণ-মনে জাগিয়ে তুলছে তা বাঙলা সমাজে অভিনব সন্দেহ নেই।

এই আলোচনা হতে স্পষ্ট বোঝা যায় বাঙালী সমাজ প্রগতির পথে চলেছে কারণ সমাজের যে সমস্ত গতির আলোচনা আমরা করেছি তা প্রগতির সংজ্ঞাবাহুল্য সত্ত্বেও বহু লোকের মতেই প্রগতির পর্যায়ে পড়বে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এমন বহু নির্মোহ বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা এই উদাহরণগুলির পাল্টা উদাহরণ সংগ্রহ করে বাঙলার অবনতির কাহিনী প্রমাণ করে দেবেন। তাঁরা বলবেন উচ্চ জন্মহারের সঙ্গে উচ্চ মৃত্যুহার স্বাস্থ্যের পরিচয় নয়; পাশ্চাত্য সভ্যতা ও যন্ত্র নিষ্ঠার ফলে যেমন আমাদের 'জাত-বেজাতের' গণ্ডী ভেঙে আসছে এবং আন্তর্জাতিক ও আন্তর্বর্ণিক বিবাহ এখন আর স্বর্গোদ্যানের নিষিদ্ধ ফল নয়, তেমনি অন্যদিকে আমরা বেশী পরিমাণে 'জাত' ভক্ত হয়ে উঠেছি কারণ আজকাল ব্রাহ্মণ সভা, কায়স্থ সভা, বৈদ্য সম্মেলন, মাহিষ্য সম্মেলন সভাসম্মেলন সমিতি, সাবিত্-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় যে রকম 'নিখিল বঙ্গ' 'অখিল বঙ্গ' ভাবে সুরু হয়েছে তাতে দুই হিন্দু সভার মিলনও ছোট ব্যাপার।

এই আপত্তিগুলি যথাযথ আলোচনা না করে প্রবন্ধ সমাপন নিরর্থক। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে এই আপত্তিগুলিতে সার অনেক আছে। কিন্তু তাতে প্রগতির বাধা জন্মায় না কারণ এ বিষয়ে বিশুদ্ধিবাদীদের পতন অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য যাঁরা বিশুদ্ধবাদী নন তাঁদের পক্ষে একেত্রেও প্রগতির সম্ভাবনা স্বীকার করে নেওয়া কঠিন নয়। কিন্তু আমাদের অতদূর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ এরকম কয়েকটি উদাহরণ ইতস্তত সংগ্রহ করে অবনতি প্রমাণ করলেও গভীরতর বিচারের ফল অন্যরূপ বিচিত্র নয় এবং এই বিচার করবার চেষ্টা করেই আমরা প্রবন্ধ শেষ করব।

আমাদের সমাজের এই বহুমুখীন গতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এর মধ্যে একটি বিষয় সুপরিস্ফুট। আমাদের সমাজ-জীবনের সাম্প্রতিক গতি সমস্তর অপেক্ষা বিসমন্তরেই বেশী, কারণ আজ-কাল যেমন জাত-বেজাতের গণ্ডী এক ধারে ভেঙে আসছে তেমনি গোটা সমাজে যন্ত্র নিষ্ঠার ফলে বিপ্লবের যে যে চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠা স্বাভাবিক তার ব্যতিক্রম নেই। এই ধরণের গতির সঙ্গে গড়ন ও ভাঙন অনিবার্য কারণ সমাজ-শরীরের নব কলেবরের সঙ্গে কিছু ভাঙনের হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই যদিই আমাদের কোথায়ও কোথায়ও কিছু কিছু ভাঙনের নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে শঙ্কার কারণ নেই। এই বিসমন্তরে গতি আমাদের প্রগতিরই পরিচায়ক কারণ যখন আমাদের সমন্তরে গতির বেগ সীমাবদ্ধ হয়ে আসে তখনই আমরা বিসমন্তরে দৃষ্টিলাভ করি। এর আপেক্ষিক কঠিনতা প্রগতির পরিচায়ক। কিন্তু এরও পেছনে দৃষ্টিপাত করলে আরও একটি বৃহত্তর বস্তুর সন্ধান মেলা অসম্ভব নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সমগ্র বাঙলা সমাজে সামাজিক বিবর্তনের একটি ঊর্ধ্বগামী দিকে চলেছে—তারপরে চক্রবাদীদের মত অবনতি আসবে কি না জানা নেই। বাঙালী জাতি অধুনা সমগ্রতার দিক থেকে সমষ্টির দিক থেকে ভাবতে শিখেছে, সমাজ শরীরের খণ্ড খণ্ড অংশই তার চোখে পড়ে না। গত শতাব্দীতে যাঁরা বাঙলার দিকপাল ছিলেন তাঁদের সকলের কীর্তিই ব্যক্তিগত কারণ তাঁদের কীর্তির প্রভাবে সমষ্টি প্রভাবান্বিত হলেও তাঁদের কীর্তির কারণ সমষ্টির মধ্যে নেই। রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন হতে তাঁর কবিতা চিরকাল বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ বলে স্বীকৃত হলেও একথা অস্বীকার করা চলে না যে তাঁর সাহিত্য ছিল ব্যক্তিগত সাহিত্য পলাতক সাহিত্য (তাঁর প্রবন্ধগুলি অবশ্য আলাদা বিচার্য)- তা একেলা বসে একেলার জন্য লেখা সাহিত্য। তেমনি জগদীশ-চন্দ্রের সাধনা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মেধার ফলে সাহিত্যে প্রতিফলিত হলেও তাঁর মধ্যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী যোগ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। তেমনই গত শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ সভার মুখপত্র কায়স্থ-পত্রিকার প্রবন্ধগুলিকে সাহিত্যিক প্রচেষ্টা বলে মেনে নিলে বাঙলার ভবিষ্যৎ এখনও বহুযুগের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন কিন্তু তা বলে তার সামাজিক দাম কম ছিল না। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই একক সমস্যার পরিবর্তে ব্যাপক সমস্যার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। একারণে আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্য ও রাজনীতির তফাৎ খুব বেশী নয় এবং 'স্পেন হতে চীন প্রদোষে বিলীন' বাপুজী দক্ষিণ করে আন যুক্তরাষ্ট্রের মিঠাই', বা—

> আজ অবশেষে জনগণে মিশি নেতা।
> এ্যাসেম্ব্লি হল জমাট কর কি সাধে?
> ক্রেতা বিক্রেতা তুমিই তাদের সেথা।
> রক্তের দাগ ঢাকবে আর্তনাদে।

প্রভৃতি আমাদের আধুনিক বলিষ্ঠ কবিতার সুন্দর নিদর্শন। এদিকে সমাজশাস্ত্র আর শিল্পতন্ত্রের দূরত্ব সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে কারণ আধুনিক শিল্পতন্ত্র 'মজদুর সমাজের' ইতিবাচক বা নেতি-বাচক শাস্ত্রবচন ছাড়া কিছুই নয়।

কাজেই এই যে জাতীয় সচেতনতা এবং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী এইটেই বর্তমান পরিবর্তনের মূলসূত্র একথা বলা বোধহয় অন্যায় নয়। অবশ্য সব দিকে এর বিকাশ সমান নয় কারণ সাহিত্যে যে লক্ষণ ১৯৩৮ সালে দেখা দিয়েছে রাজনীতিতে তার প্রথম পরিচয় ১৮৮৮ সালে। আমাদের শিল্প-জীবনে এদিকে জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটির আগে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা নেই। বর্তমানে আমরা বিবাহ-বিধি ও সমাজ সম্বন্ধে এত সভা-সমিতির উল্লেখ করেছি এই দিক দিয়ে তার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

গত শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরেজী সভ্যতার রস কিছুদিন পান করার পর বাঙালী সমাজের গোড়াকার ভিত্তিতে যে কাঁপন লেগেছিল তার সাড়া থেমে যাওয়ার পর গত মহাযুদ্ধ পর্যন্ত আর কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নি। যখন দেশী ও বিদেশী সভ্যতার অদ্ভুত সংমিশ্রণে ইঙ্গবঙ্গ শ্রেণীর জীবের অভ্যুদয় হয় তখন সেকালের লেখকেরা 'একেই কি বলে সভ্যতা' বলে প্রশ্ন করে-ছিলেন এবং তাঁদের চিন্তাধারা সমাজ-জীবনের দিকে দিকে বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু সহজলভ্য চাকরির প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যার চলতি সমাধান হওয়ায় তারপর সমাজ-জীবনের ভিত্তি সম্বন্ধে সুশৃঙ্খল চিন্তার প্রয়োজন অনেকেই বোধ করেন নি। কিন্তু

শেষাংশ ৫৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পুস্তক পরিচয়

জীবন-প্রবাহ—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত এবং ৯০, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা এতদিন একজন প্রথিতযশা দেশবৎসল শ্রমিক-নেতারূপেই জানিয়া আসিয়াছি। আলোচ্য গ্রন্থ জীবন-প্রবাহ বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহাকে প্রচুর যশের অধিকারী করিবে। শিশুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এযাবৎকাল যে সকল বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংসারপথে চলিতে চলিতে তিনি লাভ করিয়াছেন, জীবন-প্রবাহে সেগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। এ যেন একটা প্রকাণ্ড নদীর উপর দিয়া নৌকা বাহিয়া চলিয়া যাইবার মত। দুই তীরে কত রকমের দৃশ্য—কোথাও লোকাকীর্ণ জনপদ, কোথাও অরণ্যময় পার্বত্য প্রদেশ, কোথাও জনশূন্য মরুভূমি, কোথাও বা শস্য-শ্যামল দিগন্তব্যাপী প্রান্তর—দেখিতে দেখিতে মন কোথায় হারাইয়া যায়। ডাক্তার সুরেশচন্দ্রের জীবনপ্রবাহের মুকুরে যে সকল মানুষের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই বাঙলার জাতীয়-জীবনের নানাক্ষেত্রে সুপরিচিত। জীবনপ্রবাহ না পড়িলে ইঁহাদের অনেকেরই জীবনের কাহিনী আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। জীবনপ্রবাহের মধ্যে আমাদের সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসেরও একটি চমৎকার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, জীবনপ্রবাহে চরিত্রগুলি বেশ ভাল করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাষা যেমন সরল তেমনিই প্রাঞ্জল। আমরা জীবনপ্রবাহের দ্বিতীয় খণ্ড পড়িবার প্রতীক্ষায় দিন গুনিতেছি।

রামায়ণবোধ বা বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ—ডাক্তার শ্রীভুবনেশ্বর মিশ্র প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—নিত্যব্রতী বাবা বেদান্ত আশ্রম, ৫৩।৩, তাঁতিপাড়া লেন, হাওড়া এবং পি মিশ্র, ১৯নং শিবেশ্বর চন্দ্র লেন, কলিকাতা।

অধ্যাত্ম রামায়ণ বা রামগীতাকে দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে গণ্য করা হয়। বাল্মীকি রামায়ণ মহাকাব্য স্বরূপে সর্বত্র সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। গ্রন্থকার এই কাব্যের ইতিহাসের দিকটা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল বাল্মীকি রামায়ণের তাঁহার অধ্যাত্ম এবং যৌগিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যায় গ্রন্থকারের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অধ্যাত্ম জ্ঞানবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থপাঠে ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানামোদী মাত্রেই অনেক নূতন জিনিষ পাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। বৈয়াকরণ-বিদ্যায় রামায়ণের ন্যায় একখানা মহাকাব্যের তত্ত্বের দিক হইতে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টায় একটা বিপদ আছে, ইহাতে কাব্যের রসধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হইতে পারে; কিন্তু অনুভূতির যে স্তরে উঠিলে আমরা যাহাকে কাব্যের রস বলি, গভীর অধ্যাত্মলোকেই তাহা প্রতিভাস-পর্যায়ে দাঁড়ায়, সেই গূঢ় রসের নিবিড় উপলব্ধি বিবিধ আলঙ্কারিক ভাষায় কাব্যাকারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। মহর্ষি বাল্মীকির সেই অন্তররাজ্যের রহস্য উদ্ঘাটনের উদ্যম গ্রন্থকার যেভাবে করিয়াছেন তাহাতেও সেই পরম রসের প্রগাঢ় ভাবোপলব্ধি নানা ছন্দোময়ী ভাষার ঝঙ্কার হইতে উদ্ধার করিয়া উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের মহর্ষি এবং মহাকবি এই দিক হইতে এক। বাল্মীকি শুধু মহাকবি ছিলেন না, তিনি মহর্ষি ছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে তাঁহার অন্তর-সাধনার যে রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন, গ্রন্থকার দেশবাসীকে তাহারই আস্বাদ নিজের উপলব্ধিমত দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রচুর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।

আরাধনা—পাগল গুরুদাস ঠাকুরের গান। মূল্য বারো আনা। খাটাল পাইন বুক ডিপো, মেদিনীপুর। অধ্যাত্ম-সাধকের রসোপলব্ধির সরস অভিব্যক্তিতে সংগীতগুলি মধুর এবং মর্মস্পর্শী। এগুলি পাঠ করিয়া ফকীর ফিকিরচাঁদের গানগুলি মনে পড়ে।

ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। ভরদ্বাজ পাবলিশিং হাউস, ১১, মোহনলাল স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

লেখক শিশু-সাহিত্যে সুপরিচিত। ডিকেন্সের মূল গ্রন্থখানা বেশ বড়, লেখক সেই গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসারের অনুবাদ করিয়াছেন। ভাষা ঝরঝরে এবং ছেলেদের উপযোগী সরস এবং প্রাঞ্জল। এ বইয়ের আদর হইবে।

প্রগতির স্বরূপ ও বাঙালী সমাজ

(৫৬৯ পৃষ্ঠার পর)

বর্তমানে আমরা আমাদের সমাজের ভিত্তি নিয়ে চিন্তা করছি কারণ অর্থনৈতিক সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠার সঙ্গে ও পারিপার্শ্বিক আকার বদলানর সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী বাঙলার সমাজে দেখা দিয়েছে বলে মনে হয় তা প্রগতির বহুসংজ্ঞারই পড়ে। হবহাউস হতে সুরু করে হাক্সলী পর্যন্ত যে কটি মতবাদের উল্লেখ হয়েছে তার কোনটির মাপকাঠীতেই এটিকে অবনতি বলে প্রমাণ করান সম্ভব নয়।

মানুষ জাতটাকে বৃহত্তর প্রাণি জগতের অংশ বিশেষ বলে ধারণা করলে দেখা যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাণি জগৎ হতে আরম্ভ করে আধুনিক মানুষ পর্যন্ত উন্নতির রীতি এই প্রকারের। প্রাণি জগতে উন্নততর জীবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সুষ্ঠুতর সমন্বয় উন্নতির একটি অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। কালে এমন যুগের আবির্ভাব অসম্ভব নয় যে সময় পারিপার্শ্বিকের কর্তা মানুষই হবে।........ দ্বিতীয়ত জীবনে বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতা প্রাণিজগতের উন্নতির সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরিশেষে যে চেতনতার শিখা জীবজগতের গোপন অন্তরাল হতে জ্বলতে জ্বলতে মানব হৃদয়ে এসে পৌঁছেছিল তা যদি ব্যষ্টির গণ্ডী হতে সমষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে যায় তাতে শঙ্কিত হবার কারণ নেই, এমন কি তাতে যদি সাহিত্যে বা আর্টে বিশিষ্টবাদীরা মর্মাহত হন তা হলেও নয়।

ছোটলোক

(গল্প)

শ্রীনীহারবিন্দু রুদ্র

শীতের সকাল, জানালার ধারে ইজিচেয়ারটায় রাত্রির অবসন্ন দেহ এলিয়ে দিয়ে শহরের বিখ্যাত ডাক্তার মিঃ গুহো হয়ত বা নিজের কথাই একটু চিন্তা করছিলেন, রৌদ্রের ক্ষীণ আভা পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে, অনুগত ভৃত্যের মত তার সমস্ত শক্তি নিয়ে শীতের দারুণ প্রকোপ বাধা দিয়ে পদসেবায় রত। মন্দ লাগছিল না, তাই চোখ বুজে, কল্পনার জাল বুনে রঙিন স্বপন-নেশায় মিঃ গুহো বিভোর হয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ বাহিরে একটা কান্নার সুরে ঘরের বাতাস পর্যন্ত যেন বিষিয়ে উঠল।

"বাবু, ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেকে বাঁচাও, ঐ আমার শেষ একটু সম্বল, আমার বংশের শেষ প্রদীপ, চিরদিন তোমার গোলাম হয়ে থাকব, আমার ছেলেকে বাঁচাও।" হারাধন মুচী ততক্ষণে ডাক্তারের পা দুটি জড়িয়ে ধরে চোখের জলে প্রায় ভিজিয়ে তুলেছে। সুখের আমেজ ভেঙে যেতে ডাক্তার ধমক দিল তাকে "যা বেটা ছোটলোক মুচী কোথাকার, ছাড় পা, সকাল-বেলা আর মরবার যায়গা পাওনি, এসেছ মরা কান্না কাঁদতে, যা বেরো।"

"বাবু তাকেই শুধু আজ তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি। তাকে বাঁচাও আমার জীবন নিয়ে তাকে বাঁচাও।" ব্যর্থকরুণ ক্রন্দন তার রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখটিকে অশ্রুতে ভাসিয়ে তুলেছে আর জীর্ণমলিন কাপড়ের খুঁটে উদ্গত অশ্রু রোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা তার ভীতিকাতর চাহনিকে বড় করুণ করে তুললেও কিন্তু হারাধন মিঃ গুহাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি।

সে অনেক দিনের কথা, বছর দুই আগের পেটমোটা রুগ্ন হাড়ের সমষ্টি একটিকে মানুষ নামে পরিচয় দিয়ে, হারাধনের স্ত্রী যখন একদিনের জ্বরে হঠাৎ এ-পারের দাবী মিটিয়ে পর-পারের ডাকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল, তখন হতে নিজে আধপেটা বা উপোসী থেকে, হারাধন নিজের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে তুলবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল তার এইটুকু শেষ চিহ্নকে; তার নিবু-নিবু ক্ষীণ দীপটিকে বাহিরের দুরন্ত বাতাসের হাত হতে বাঁচাতে গিয়ে অতি সাবধানে হারাধন একটির পর একটি করে দীর্ঘ দুই বৎসর সংগ্রাম করেছে। এবার বুঝি আর বাঁচে না, দিন দুই হতে ছেলেটির জ্বর। রোগ ওদের লেগেই আছে, সংসারের এককোণে শহরের বাহিরে বিরাট আবর্জ্জনার ভিতর যাদের দিন কাটাতে হয় পরের অনুগ্রহদৃষ্টি নিয়ে, রোগ তাদের চিরসহচর। দারুণ বুভুক্ষা নিয়ে অভি-শাপময় জীবনের বোঝা ওরা বেশীদিন বইতে পারে না, তাই নিশ্চিন্ত মৃত্যুর কোলে মাথা রেখে ওরা আরামের শেষ নিশ্বাস ফেলে, আর ওদেরই বিন্দু বিন্দু শক্তিতে গড়া বিরাট সৌধে বসে আমরা তাই দেখি, হয়ত বা কোনদিন বিচলিত হই, হয়ত বা মোটেই হই না।

মিঃ গুহো শহরের খ্যাতনামা ডাক্তার, বড়লোকের গাড়ীর ভিড়ে ছোটলোকের প্রবেশ অধিকার ওখানে নাই। টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নাই ওদের, আর কোত্থেকেই বা দেবে। দুবেলা পেট-পুরে খেতে পায় না, একমুষ্টি ভিক্ষার জন্য যাদের দিনরাত পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়, ডাক্তারের মোটা ভিজিট, রোগীর পথ্য তারা কী করে যোগাবে। চালকহীন প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে এই লোভী নরপিশাচের দিকে একবার মাত্র তাকায় হারাধন তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে পড়ে বাহিরে, যখন তার দৃষ্টি কান্নার ব্যথায় অশ্রুতে ঝাপ্‌সা হয়ে আসে।

টাকার সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ, বাহিরের বিরাট আবর্জ্জনার ভিতর দৃষ্টি দেওয়া ওদের চলে না। ভিক্ষা দিতে গেলে ভিক্ষুকের অভাব হয় না বরং বেড়ে যায়, ওদের দুর্দ্দশার দুঃখকে দূর করার চেষ্টা করা, শুধু ওদের প্রশ্রয় দেওয়া, ওদের স্পর্দ্ধাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়, চা-পান করতে করতে ডাক্তার গুহো হয়ত একথাই ভাবছিলেন।

শহরের বুকে, দরিদ্র অস্পৃশ্যদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে ডাক্তারের গাড়ী ছুটেছে ক্ষীপ্রগতিতে। নষ্ট করার মত প্রচুর সময় ওদের নাই—ওরা সময়ের মূল্য বুঝে, কিন্তু তবু কেন অনেকক্ষণ পরে ডাক্তারের মন একটু চঞ্চল হয়ে উঠে। ফিরবার পথে হঠাৎ তার বিরাট গাড়ীখানা মুচীপল্লীর বাহিরে দাঁড়িয়ে দুই-একটা রুদ্ধ নিশ্বাস ছেড়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। মিঃ গুহো ধীরে ধীরে এগিয়ে যান পল্লীর দুর্গন্ধময় পথে, কিন্তু একটা চাপা কান্না মাঝপথে তাকে বাধা দিল। কান্নার ভিতর দিয়ে কি জানি একটা তীব্র অভিশাপ ডাক্তারের বুকে বেজে ওঠে। হারাধনের বুকফাটা করুণ কান্না মিঃ গুহার অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত আলোড়িত করে দেয়।

মৃত্যু যাদের কাম্য তিলে তিলে, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হতে নিজেদের বাঁচাবার ব্যর্থতা যাদের ঘিরে আছে, মৃত্যুর কঠিন ছাপ যাদের চোখে-মুখে, আনন্দ কোলাহল সব কিছু ছাপিয়ে যাদের শমন এসে দাঁড়ায় দুয়ারে, যারা শুধু পয়সার অভাবে এতটুকু সেবা, একটু করুণা যাচতে গিয়েও বার বার বাধা পেয়ে ফিরে আসে নিজেদের দারিদ্র্যের ভিতর তাদের জন্য দায়ী কে। দায়ী ওরা, ওদের দারিদ্র্য, ওদের অক্ষমতাই ওদের পঙ্গু করে দিয়েছে, কিন্তু ওদের ক্ষমতাটাকে তুচ্ছ করে, অক্ষমতাটাকে যারা বাহিরের বুকে তুলে ধরে সংসারের আবর্জ্জনার ভিতর ওদের দূষিত বাতাসে ঠেলে দিয়েছে, এ লজ্জা তাদের।

মিঃ গুহো পা পা ফিরে এলেন তাঁর গাড়ীতে, মৃত্যুর বীভৎস দৃশ্য দেখবার মত যথেষ্ট মনের বল তাঁর ছিল না, কারণ অতীতের একটা কাহিনী অনেকক্ষণ হতে তাঁর মনে উঁকি মারছিল, তাঁর মনুষ্যত্বে ধিক্কার দিচ্ছিল। বছর তিনেক আগে কী করে যে ঐ হারাধন মুচী নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে ডাক্তারের ছেলেকে বাঁচাতে [illegible] বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আজ সেকথা ডাক্তার ভাবতেও পারে না। সেদিনও এমনি এক সকালে চার বছরের খোকা পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে শহরের জনতার দিকে তাকিয়ে ছিল। কোথা হতে এক পাগ্‌লা ঘোড়া মানুষের ভীতি উৎপাদন করে বিজয়ী বীরের মত জনতার মাঝখান দিয়ে ছুটিয়ে আনছিল তার [illegible]। ভয়ে পথের দুধারের লোকজন নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ছুটে

পালাচ্ছিল একটু আশ্রয়ের সন্ধানে। অবুঝ শিশু কিন্তু অজানা আনন্দে পথেই দাঁড়িয়ে রইল।

একটু, এক মুহূর্ত কোথা হতে হারাধন চিলের মত ছোঁ মেরে ছেলেকে সরিয়ে নিল নিজের বুকের ভিতর, মানুষের চীৎকারে বাহিরে এসে ডাক্তার গুহ ছেলেকে ফিরে পেলেন, হারাধনের উপর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল তার মন, আজ যদি মুচী হয়ে ওনা জন্মাত, হয়ত—হয়ত মিঃ গুহ তাকে বুকে করে নিজের আনন্দ অভিনন্দন জানাতেন। বাড়ীর আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে হারাধনের কথা সকলে প্রায় ভুলেই গেল।

গোলমালে হারাধনের পায়ে একটু চোটও লেগেছিল। দিন উষধ দিতেই তা সেরে গেল। তারপর একদিন ডাক্তার হারাধনকে তার কাজের পুরস্কার স্বরূপ দশ টাকার একখানা নোট বখশিস করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে পীড়িত হারাধন সে টাকা নিতে পারে নি। সেও [illegible] হয়ত ভেবেছিল অতীতের একটা করুণ দিনের কথা, দিনের সে মহান হৃদয়ের পরিচয় ও দিয়েছিল তার কোন প্রতিদান কিন্তু সে পায়নি, স্ত্রীর মৃত্যু সময়েও না, ছেলের মরণেও না। প্রতিদান হয়ত সে চায়নি কোনদিন, কিন্তু একটু করুণা হয়ত সে মনে মনে কামনা করেছিল। কিন্তু হায়রে দারিদ্র্য, বাহিরের উপেক্ষা নিয়ে যারা ঘিরে আছে, পেছন ফিরলে তাদের কথা আমাদের মনে যদি না থাকে, তার জন্য অভিসম্পাত দেব কাকে।

ছোটলোকের মহান্ প্রাণের স্মৃতি কবে যে মিঃ গুহর মন হতে মুছে গিয়েছিল কে জানে। হয়ত সেদিনের সে স্মৃতি মনে করেই আজ হারাধন তার পুত্রের কল্যাণ কামনায় একটু করুণা ভিক্ষার জন্য গিয়ে ফিরে এসেছে ব্যর্থতা নিয়ে। তার চাহনীর ভিতর দিয়ে সে যে অতীতের একটি বিস্মৃত দিনের করুণ ঘটনা মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল তা ডাক্তার বুঝতে পারেনি।

যাদের ছায়া মাড়াতেও পাপ, ঘৃণায় মনটা বিষাক্ত হয়ে ওঠে, নিজের বলতে যাদের এতটুকু মাথা গুঁজবার স্থান নেই, পরের অনুগ্রহদৃষ্টিকে যারা নিজেদের সৌভাগ্য মনে করে তাদেরই দুঃখ ঘাড়িয়ে দিতে গিয়ে যে কত কোটি প্রাণ নিঃশেষে আত্মবলি দিয়েছে, ছোটলোক তারা, না যারা নিজেদের চারদিকে বিরাট স্বেচ্ছাচারিতার বাঁধ রচনা করে মানুষ হয়েও মানুষের কামনাকে উপেক্ষা করে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখতে গিয়ে নিঃসঙ্কোচে দূরে ঠেলে দিতে পারে, তারা।

বালুর চর

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

দূরে নদী আছে—এদিকে বিশাল চর,
ধূ ধূ করে বালু ধাঁধিয়া চোখ যায়;
সেই বালু দিয়ে সেথানে রচেছি ঘর
উপাদান তার বেদনায়—নিরাশায়,
একটি সবুজ গাছ যায়নাকো দেখা,
পড়ে না সেথায় কাহারও চরণরেখা,
পাখীও আসে না গাহিতে হেথায় গান—
সেই বালুচরে একা আমি বসে থাকি,
দিন আসে পুন দিন হয় অবসান।

বরষার ধারা যবে সেথা নেমে আসে
খসে খসে পড়ে আমার গড়ানো ঘর,
সে বালুর বুক ভরে না সবুজ ঘাসে,
কানে আসেনাকো পাপিয়ার কোন স্বর।
কত আশা নিয়ে ছুটি যে জলের পানে,
অসীম পিপাসা তার পানে মোরে টানে,
পথ না ফুরায় মরুভূমে আমি যাই,—
কোথা সেই নদী কলভরা কূলে কূলে;
দুটি পা টানিয়া পিছনে ফিরিয়া চাই,
এই মরুমাঝে মরণে যে যাই ভুলে।

কোথা কাঁদে চখা চখীরে চাহিয়া নিতি
পরাণে তাহার সে করুণ সুর বাজে
অন্তরে মম ধ্বনিছে তাহার গীতি,—
কোথা শ্যামবন, কোথা ফুলদল রাজে?
কোথা পথভোলা অলি আসে ফিরে ফিরে,
বসন্ত বায় বয়ে যায় কোথা ধীরে,
কোথা চাঁদ উঠে ছড়াইয়া দেয় আলো,
কোথা আছে আশা, স্নেহ, ভালোবাসা জাগ?
আমার কুটিরে জাগিছে নিকষ কালো,
আমি একা জাগি এখনও আলোর লাগি।

শত বরষর একদা যাইবে চলে,
পান্থ কোনও একদা আসিবে হেথা
মরুর বাতাস কানে কানে কথা বলে—
জাগাবে তুলিবে অন্তর মাঝে ব্যথা।
খুঁজে পাবে সে চিহ্ন আমার কিছু,
আমি রেখে যাব যা কিছু আমার পিছু
পথহারা পথে বয়ে যাবে জলধারা,
সে পথও হারাবে মরুর মাঝারে এসে,
পান্থ কোনও হবে হেথা পথহারা,
কারও বাণী হেথা আসিবে না কানে ভেসে

এই বালুচরে একা একা বসে থাকি—
আপন সমাধি আপনি রচনা করি,
দূরের পানেতে মেলে রাখি দুটি আঁখি,
হতাশায় মোর অন্তর উঠে ভরি।

অধিক আহারের বিরুদ্ধে আইন

বর্তমানে নাজিদের অভিমত এই যে, অধিক আহার একেবারে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ। নাজিদের এই অভিমত কিন্তু মৌলিক নয়, কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ইংলণ্ডে অধিক আহার অপরাধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়াই আইন প্রচলিত ছিল। ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে ঐ আইন তুলিয়া দেওয়া হয়। এই আইনের নাম ছিল 'ষ্ট্যাটিউট অফ্ এডওয়ার্ড দি থার্ড' এবং বিধান ছিল যে কেহই নিত্যকার আহারে দুই উপচারের বেশী গ্রহণ করিতে পারিবে না (ডিনারেই হউক আর সাপারেই হউক)। তবে কোনও উৎসব বা বিশেষ অনুষ্ঠানের সময়ে এক বেলা তিন পদের ব্যবহার করিতে পারিবে।

এই জাতীয় অধিক আহারের বিরুদ্ধে আইন ইউরোপে অতি প্রাচীন এবং বর্তমানেও কোন না কোন আকারে ইটালী, জার্মানী ও স্পেনের কোন কোন অঞ্চলে রহিয়াছে—সেই সকল স্থানে রুটি আর একটি মাত্র তরকারী, ইহাই গ্রহণ করা আইন। এই আইনের প্রথম প্রবর্তক—লাইকার্গাস, সোলন প্রভৃতি। সর্বাপেক্ষা কড়া আইন ছিল লকিয়ান বিধিদাতা জালিউকাসের। ইনি ৪৫০ খৃষ্ট পূর্ব সালে অবিমিশ্র মদ্য পানও নিষিদ্ধ করেন। লেক্স অর্কিয়া ইহা অপেক্ষাও কঠোর ব্যবস্থা দেন নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ও খাদ্যোপচারের সংখ্যা বাঁধিয়া দিয়া। আবার মার্কাস্ এমিলাস্ স্করাস্ বিভিন্ন শ্রেণীর নর-নারীর জন্য পৃথক খাদ্য-পদসংখ্যা নির্ধারণ করেন। কেটো, সিজার প্রভৃতিও সাধারণের একপ্রকার ও অভিজাতবর্গের অন্য প্রকার উপচার সংখ্যা নির্ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন।

ইংলণ্ডে এডওয়ার্ড দি সেকেণ্ড, এডওয়ার্ড দি ফোর্থ এবং হেনরি দি এইট্থ্—এই তিন রাজার শাসনকালে কঠোর বিধি প্রচলিত করা হয় অতিরিক্ত ভোজনের বিরুদ্ধে। কাজেই দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে এই অবস্থা হইয়া পড়ে যে, লোকে যে জিনিসটি বেশী পছন্দ করে, সে জিনিসটি কদাচই খাইতে পাইয়াছে, এমন কি তেমন খাদ্য খাইতেও সাহসী হয় নাই—আইনের কবলে পড়িয়া দণ্ডভোগ করিবার ভয়ে। সাধারণ লোকে অনেক উৎকৃষ্ট খাদ্যই গ্রহণ করিতে পাইত না; গমের রুটি মশলাদার মাংস, মাছ প্রভৃতি গরীবদের পক্ষে প্রকারান্তরে ছিল নিষিদ্ধ। ঐ সব জিনিষ ছিল উচ্চ শ্রেণীর "জীব"দের জন্য নির্দিষ্ট। মোটা রুটি যাহা গম ছাড়া অন্য কোনও নিকৃষ্ট ফসলের চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত, তাহাই বরাদ্দ করা ছিল দরিদ্রের জন্য। মুখরোচক প্রায় সকল খাদ্যই বড়লোকদের জন্য একচেটিয়া ছিল। যাহা হউক ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে এই সকল বিধি-বিধান উঠিয়া যায়। কিন্তু রাষ্ট্র হইতে কোন আইন প্রচলিত করা না হইলেও আজ ভারতে কিন্তু ইংলণ্ডের ঐ যুগের অবস্থাই স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মার্কিনের নিকেল মুদ্রা

হামেশা দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুদ্রাটি প্রকৃতই যে ধাতুতে প্রস্তুত তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া উহা অন্য ধাতুতে তৈরী বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে এবং তাহাই দেশে বদ্ধমূল ধারণা হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের দেশের 'পয়সা' এখন আর অমিশ্র তাঁবায় প্রস্তুত হয় না, তথাপি উহাকে তামার বলাই লোকের অভ্যাস। উহা যে ব্রঞ্জ হইতে তৈরী একথা অনেকেই জানেন, তথাপি সে ভুল কেহ সংশোধন করেন না সচরাচর মুখের কথায়। ঠিক এই প্রকার মার্কিনের যে "জেফারসন মুদ্রা" 'নিকেল মুদ্রা' বলিয়া ঐ দেশে বিখ্যাত, উহা কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এমন একটি মিশ্র ধাতুর, যাহার ভিতর বার আনা অংশই তাঁবা, বাকি সিকি অংশ নিকেল।

রদ্দি কাগজের বেহালা

রিজ্‌ফিল্ডের একজন প্রসিদ্ধ কাষ্ঠ-আসবাব প্রস্তুতকারক, (উইলিয়ম টি হয়েট নামধারী) নানাপ্রকার কৃত্রিম উপাদানেও আসবাব প্রস্তুত করিয়া থাকে। সম্প্রতি সে বেহালা তৈরী করিয়াছে বর্জিত ছিন্ন কাগজ ও ন্যাকড়া প্রভৃতি হইতে। এই যন্ত্র হইতে যে সুর উত্থিত হয়, তাহা দেশ প্রচলিত কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত যে কোন প্রসিদ্ধ বেহালা হইতে কোন্ প্রকারেই খারাপ নয়। বিশেষ করিয়া উহা হাল্কা বলিয়া ধরা সম্ভব হয় যে কৃত্রিম কাষ্ঠ দ্বারা উহা প্রস্তুত, নতুবা দূর হইতে দেখিয়া কোনও পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। ছেঁড়া কাগজ ন্যাকড়া প্রভৃতি জলে সিদ্ধ করিয়া মণ্ডবৎ তৈরী করিয়া উহা পেষণ যন্ত্রে পরতে পরতে চাপ দিয়া নীরেট একটা 'ব্লক' গড়া হয়। তারপর নির্দিষ্ট আকারে আনয়ন করা হয়।

মিঃ হয়েট বলে সে স্বপ্নে এই গঠনপ্রণালী প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তদবধি এই কৃত্রিম উপাদানে বেহালা প্রস্তুত করিতেছে।

হতাশ জনতা!

আমেরিকার অরেগন প্রদেশের পোর্টল্যাণ্ড শহরে একদিন দেখা গেল একটি চৌদ্দতলা বাড়ীর সর্বোচ্চ ছাদের বেষ্টিত প্যারাপেটের উপর দিয়া একটি কুকুর টহল ফিরিতেছে। সঙ্কীর্ণ প্যারাপেটের শির হইতে কোন মুহূর্তে পদস্খলিত হইয়া কুকুরটি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় তাহার ঠিক নাই। নিম্নের রাস্তায় ভিড় জমিয়া গিয়াছে—আকুল-জনতা কুকুরের প্রাণ রক্ষায় ক্ষিপ্র। পার্শ্ববর্তী অট্টালিকাসমূহ হইতে নানাজনে চেষ্টা করিল কুকুরটিকে নিরাপদ স্থানে আনয়ন করিতে, কিন্তু কুকুরটি কিছুতেই ঐ সু-উচ্চ সঙ্কীর্ণ আশ্রয় স্থান ত্যাগ করিবে না। সারা পল্লীর জানালায় জানালায় কৌতূহলোদ্দীপ্ত দর্শকের মস্তক গিস্ গিস্ করিতেছে। সকলেই হতাশ—কুকুরটা এই বুঝি পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়! ফুট পতাকাস্তম্ভ হইতে রং করা শেষ করিয়া নামিয়া আসিল পেইণ্টার রয় স্মিথ—অমনি কুকুরটি প্যারাপেট হইতে নামিয়া রয়ের পা চাটিতে লাগিল লেজ দুলাইয়া। রয় স্মিথই এই অষ্ট্রিয়ান্ সেপার্ড-কুকুর শ্রেণীর মালিক।

স্বপ্ন

(কথিকা)

শ্রীসুনীলকুমার রায়

জানালার ফাঁক দিয়ে পাহাড়টার চূড়োর একটা দিক তার চোখে পড়ে। সেইদিকে চেয়েই দিন কাটে তার; সেইদিকে চেয়েই সে বুঝতে পারে সকাল হ'ল, মেঘলা দিন কি না, বৃষ্টি পড়ছে কি না।

কিন্তু কতদিনই বা আর ভাল লাগে রোদে পোড়া পাথরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে। তবু সে চেয়ে থাকে বাইরের পানে —ভাবে আর ভাবে।

দুপুরের দিকে তার কুঠুরীর পাশের একটা ছোট দরজা খুলে যায়, 'খাবারের' একটা মাটীর ভাঁড় এগিয়ে আসে, আবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কতবার সে চেষ্টা করেছে, যে খাবার দিয়ে যায় তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে, তাকে জানাতে যে সেও মানুষ; কিন্তু সে চলে যায় রোজ রোজ। দুপুরে সে বাইরের পানে চেয়ে থাকে, আপনার মনে কত কি ভাবে। গান গাইত আগে—আজকাল গান গাওয়া বারণ। আগে ভোরের দিকে সে ব্যায়াম করত আবদ্ধ ঘরে—আজকাল আর ভাল লাগে না। চুপ করে থাকে বসে। এক একদিন তার মনে হয় পাগল হয়ে যাবে না তো সে? অনেকেই তো এইরকম অবস্থায় পাগল হয়। তারপরই ভাবে—না না, পাগল হবে কেন সে? সে এম-এ পাশ, তার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, চিন্তাশক্তি আছে। সে কেন পাগল হবে? শুধু শুধু খুব জোরে একবার চেঁচিয়ে ওঠে, পরক্ষণেই ভাবে একি সে অকারণে এরূপ চীৎকার করছে কেন? কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যায়। হঠাৎ ভেসে আসে প্রহরীর স্বর—'এ শুয়োর, এ বুর্বাক্, চিল্লাও মৎ।' লজ্জায় সে লাল হয়ে ওঠে।

পালাবার পথ খুঁজতে চেষ্টা করে সে; কিন্তু মনে হয় সমস্ত ঘরটা যেন তার চেষ্টাকে বিদ্রূপ করছে। সে হো হো করে হেসে ওঠে। ধীরে ধীরে, নিরুপায় সে, পাহাড়ের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেয়। তারপরেই ভাবে কাল থেকে অনশনব্রত করবে সে। অনশন করলে না কি মুক্তি পাওয়া যায়। একদিন যায়, দুদিন যায়, পাঁচদিন যায়—কোন ফল হয় না। একদিন সন্ধ্যাবেলা তার সমস্ত শরীর গরম হয়ে ওঠে, সে দাঁড়াতে পারে না, শুয়ে প'ড়ে ভাবতে থাকে। সে ভাবে, ছাড়া সে পাবে নিশ্চয়ই। দেশের লোক চেষ্টা করছে তার মুক্তির জন্য, সে মুক্তি পাবে না? শহরে, পার্কে পার্কে সভা হচ্ছে, রাস্তায় রাস্তায় আন্দোলন! উৎসাহী ছাত্রদল, তরুণদল ক্ষেপে উঠেছে তার মুক্তির জন্য—এবার সে ছাড়া পাবে নিশ্চয়।

হ্যাঁ, এবার সে মুক্তি পাবে। ওই ত পাশের ছোট দরজাটা খুলে গেল; হাসিমুখে পাহারাওয়ালাটা বেরিয়ে এল—হ্যাঁ, পাহারাওয়ালাটা হাসবেই ত, হাসবে না? একটা লোক কতদিন পরে মুক্তি পেল! আঃ, কি আরাম; সে বাইরে এসেছে—সে আজ বাইরে; সে আজ ছোট বাঁকা নদীটির ধারে, পাহাড়ের তলায়, জেলের পাঁচিলের বাইরে। আঃ, জেলের ধারে নদী ছিল বুঝি? কই সে ত দেখেনি যখন জেলে আসে? ওহো তখন যে সন্ধ্যা ছিল। আর এখন—এখন যে ভোর। বা পাখীরাও তো বেশ ডাকে আজকাল। ঐ যে পাহাড়ের মাথাটা দেখা যায়—সেটা দেখা যেত তার ঘর থেকে—তার মায়া হয় পাহাড়টার ওপর; না না, সে যাবে, তার দেশে যাবে যে, যেখানে নেই পাহাড়, আছে নদী, আছে গাছ আর আছে ধানের ক্ষেত, পাখীর গান। সে দেশে যাবে—বাঙলার ছাত্রদের দেখবে, গর্ব্ব করবে—তার দেশের ছাত্রেরা, তার দেশের তরুণেরা তাকে বাইরে টেনে এনেছে, তার দেশের তরুণেরা।

'এই শুয়োর, কিঁউ কেয়া চিল্লাতা হ্যায়?' ভেসে আসে। একি! না, সে এখনও মুক্তি পায়নি তাহলে।

কিন্তু পাবে সে—ছাত্রদল যে তার পিছনে, তার দেশ, তার দেশবাসী যে তার মুক্তির জন্য কাঁদছে! শীগ্গিরই সে মুক্তি পাবে।

পাহাড়টার ধারে ধারে টকটকে লাল হয়ে গেছে—এখন সন্ধ্যা। একদিন ভোরে সে ঠিক মুক্তি পাবে, একদিন ভোরে।

সে পাহাড়ের চূড়োটার দিকে চেয়ে থাকে, ভাবে আর ভাবে।

তুমি কি তাদের দিয়াছ অন্ন

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

পীড়নে পীড়নে যারা মরেও মরে না অত্যাচারের মাঝে,
বিধাতা যাদের দেখে না নয়ন দিয়ে,
তুমি কি বন্ধু ফেলেছ দুফোঁটা অশ্রু প্রভাতে সাঁঝে
কবিতা লিখিতে তাদেরি জীবন নিয়ে?

দুর্ব্বল যারা পেয়েছে শুধুই লাঞ্ছনা নিতি নিতি,
যাদের জীবনে হাসেনি চাঁদিমা তারা,
তুমি কি বন্ধু তাদের লাগিয়া রচিয়াছ দুখ-গীতি
বিনিদ্র রাতি যাপিয়া আপন হারা?

যাদের জীবন ভিত্তি করিয়া জাগিয়াছে সভ্যতা
যাদের রক্তে গড়িয়া উঠেছে দেশ,
সমাজ তাদেরে পিষিয়া মারিছে দিনে রাতে সর্ব্বদা,
বাঁচার শক্তি করিয়া দিয়াছে শেষ।

তুমি কি বন্ধু বুকের রক্তে বাঁচাতে তাদের প্রাণ
ঝাঁপিয়ে পড়েছ সবহারাদের মাঝে?
তুমি কি তাদের দিয়াছ অন্ন গাহি জীবনের গান,
বাসিয়াছ ভাল সুখে দুখে শত কাজে?

ছায়াচিত্র-শিল্প জগতে নূতন সমস্যা

বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের ছায়াচিত্র-শিল্প জগতে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। সমস্যাটি জটিল। ছায়াচিত্র-শিল্পকে অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে ইহার আশু সমাধান প্রয়োজন। এই সমস্যাটি ছায়াচিত্র-শিল্পের প্রয়োজনীয় দ্রব্য, ফিল্ম প্রভৃতি সরবরাহ সম্পর্কে। ভারতের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে ছায়াচিত্র-শিল্পের স্থান নেহাৎ অবহেলার নহে। কিন্তু এই একটি বিরাট শিল্পের আবশ্যকীয় উপকরণের জন্য ভারতকে বিদেশ, বিশেষ করিয়া জার্ম্মানীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক পোলাণ্ড আক্রমণের পর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যখন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, তখন ফিল্ম প্রভৃতি অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণের ব্যবসায়ী জার্ম্মান ফার্ম্মগুলি ভারত হইতে তাহাদের পাততাড়ি গুটাইল; সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ম ও অন্যান্য জিনিষের সরবরাহ সম্পর্কে ভারতীয় ছায়াচিত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। জার্ম্মানী ব্যতীত অন্যান্য যে সকল দেশ হইতে ঐ সকল দ্রব্যের আমদানী হইত, তাহারাও বিবদমান শক্তিসমূহের সাবমেরিণ প্রভৃতির ভয়ে ঐ সকল দ্রব্যসম্ভার লইয়া সমুদ্র পাড়ি দিতে সাহস করিতেছে না। ভারতের ছায়াচিত্র-শিল্পের এই যে অসহায় অবস্থা, ইহার জন্য দায়ী কে? সাধারণ শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য যে দেশ পরমুখাপেক্ষী, যে দেশে নিজেকে অতি সামান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল করিবার সৎপ্রচেষ্টা নাই, সেখানে এইরূপ সমস্যার উদ্ভব হইবে না ত হইবে কোথায়? যাহোক্, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভারত সরকার ও বৃটিশ সরকারের, ফিল্ম প্রভৃতি জিনিষপত্রাদি লইয়া বিদেশী জাহাজ যাহাতে ভারতে নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পৌঁছিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। যে সকল দেশে ছায়াচিত্র তুলিবার উপকরণাদি প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহারা যাহাতে ভারতের সঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবসা করা অপেক্ষাকৃত লাভজনক ও লোভনীয় মনে করে, সেজন্যও ভারত সরকারের নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এই সকল দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক কমাইয়া দিলে, ছায়াচিত্র-শিল্পের সমস্যা দূরে হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ফিল্ম প্রভৃতি অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণাদি তৈরীর জন্য ভারতে অবিলম্বে কারখানা স্থাপন করা উচিত। এই সম্পর্কে ভারত ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে এবং ধনী জনসাধারণেরও অগ্রণী হওয়া আবশ্যক। ছায়াচিত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি করিয়া গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া ফিল্ম প্রভৃতি উপাদান তৈরী সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারাবাহিক গবেষণার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ছায়াচিত্র ও ইহার প্রভাব

ছায়াচিত্র, বিশেষ করিয়া অতি-আধুনিক ছায়াচিত্রগুলি সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড দিন দিন ব্যাধিগ্রস্ত ও পঙ্গু করিয়া তুলিতেছে এই অভিযোগ এদেশে ছায়াচিত্র-শিল্পের অভ্যুত্থানের সময় হইতেই শুনা যাইতেছে। অভিযোগ যে একেবারে মিথ্যা নহে, তাহা এই শিল্পের অতি-বড় পৃষ্ঠপোষকও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অভিযোগকারীদের মধ্যে এরূপ উগ্র মতাবলম্বী লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা ছায়াচিত্রের এই অনিষ্টকারিতার জন্য গোটা শিল্পেরই উচ্ছেদ কামনা করেন। এই শিল্পের পক্ষে ও বিপক্ষে ওকালতী করিবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। এইরূপ ব্যাপক বিষয়ের অবতারণা করিবার ইচ্ছা বর্ত্তমানে আমাদের নাই। বিভিন্ন ছায়াচিত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানের তোলা ছবি যখন জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশের অনুমতির জন্য বোর্ড অব সেন্সারের নিকট উপস্থিত হয় তখন যদি এই বোর্ড অব সেন্সার প্রকাশের ছাড়পত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবিখানি কিরূপ বয়স্ক লোকদের দেখিবার উপযোগী এবং কিরূপ বয়স্কদের উপযোগী নয়, তাহারও একটি ছাপ মারিয়া দেন এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট বয়স্ক লোক ব্যতীত অন্যলোক যাহাতে ঐ ছবি দেখিবার অনুমতি না পায়, তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বিভিন্ন ছায়াচিত্র গৃহে যোগ্য ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে আমাদের মনে হয়, ছায়াচিত্রের নৈতিক চরিত্র দূষিত করার প্রভাব অনেকটা কম হইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়াম পরিচালনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ এতদিন পুঁথিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। শিক্ষা অর্থে তাঁহারা পুঁথিগত শিক্ষাই বুঝিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহাদের সেই ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পুঁথিগত শিক্ষার দ্বারা যে পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয় না, কেবল মানসিক উন্নতির পথ করা হয়, শারীরিক কোনই উন্নতি হয় না, ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন। আধুনিক সভ্য জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মতালিকা তাঁহাদিগকে এই বিষয় উপলব্ধি করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এই জন্য বর্ত্তমানে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচালকগণ ছাত্রগণের শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম চর্চ্চা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণও এই দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। ছাত্র মহলে সমিতি গঠন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে শারীরিক শিক্ষা দিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সমিতি ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ও স্বাস্থ্যোন্নতি করিবার জন্য উৎসাহিত করে। এই সমিতি ব্যায়াম চর্চ্চার স্পৃহা যাহাতে ছাত্রগণের মধ্যে বৃদ্ধি পায়, তাহার জন্য সময়ে নানারূপ ব্যায়াম ও খেলাধূলা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এই সমিতির অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব খেলিবার মাঠ আছে ও একজন অভিজ্ঞ ব্যায়াম শিক্ষক এই মাঠে খেলাধূলা পরিচালনা করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সকল ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতি বৎসর কয়েক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। এই সমিতির বাৎসরিক কর্ম্মতালিকা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, খেলাধূলা ও ব্যায়ামের প্রায় সকল বিষয়েরই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস প্রভৃতি বিভিন্ন খেলাধূলায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নৌকা-বাইচ, মুষ্টি-যুদ্ধ, সন্তরণ, এ্যাথলেটিকস্, জিমন্যাষ্টিকস্ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। এই সকল কথা শুনিলে, ইহা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ ব্যায়াম ও খেলাধূলার সকল বিভাগের উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সকল খেলাধূলা ও ব্যায়াম প্রতিযোগিতার সকলগুলির ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মহলের সমিতি বা এ্যাথলেটিক ক্লাব করে না। কতকগুলি নিঃস্বার্থপর ব্যায়াম-উৎসাহীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এই সকল প্রতিযোগিতার অনেকগুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নিম্নে কোন বিষয়টি কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহার তালিকা দেওয়া হইল। এই তালিকা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে ব্যায়াম উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার সকল কৃতিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরি-

ফুটবলঃ—(১) ইলিয়ট শীল্ড (আই এফ এ পরিচালনা করেন); (২) হার্ডিঞ্জ বার্থ-ডে শীল্ড (ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট পরিচালনা করেন); (৩) ইণ্টার কলেজ ফুটবল লীগ (বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন); (৪) হেরম্ব মৈত্র মেমোরিয়াল শীল্ড (বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন)।

হকিঃ—ইণ্টার কলেজ হকি লীগ (বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত)।

ক্রিকেটঃ—ইণ্টার কলেজ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নাই। কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার খেলোয়াড় নির্ব্বাচন বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিক ক্লাবের ক্রিকেট বিভাগ করিয়া থাকে কেবল।

সন্তরণঃ—ইণ্টার কলেজ সন্তরণ (বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া থাকেন)।

নৌকা-বাইচঃ—ইণ্টার কলেজ বাইচ (বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া থাকেন)।

জিমন্যাষ্টিকস্ঃ—ইণ্টার কলেজ প্যারালাল বার প্রতিযোগিতা (বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন)। সাধরণ ফ্রি-হ্যাণ্ড ব্যায়াম প্রতিযোগিতার কোনই ব্যবস্থা নাই।

মুষ্টি-যুদ্ধঃ—ইণ্টার কলেজ মুষ্টি-যুদ্ধ (স্কুল অব ফিজিকাল কালচার পরিচালনা করেন)।

এ্যাথলেটিকস্ঃ—ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস (ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট পরিচালনা করেন)।

ভ্রমণঃ—ইণ্টার কলেজ ভ্রমণ (ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট পরিচালনা করেন)।

সাইকেলঃ—ইণ্টার কলেজ সাইকেল (ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট পরিচালনা করেন)।

মহিলা বিভাগঃ—ইণ্টার কলেজ মহিলা স্পোর্টস এসোসিয়েশন এই বিভাগের সকল ব্যবস্থা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় এই বিভাগের কোনই ব্যবস্থা করেন না। উক্ত এসোসিয়েশন, মহিলাদের জন্য বার্ষিক এ্যাথলেটিক স্পোর্টস, বাস্কেট-বল প্রতিযোগিতা, ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন।

টেনিসঃ—ইণ্টার কলেজ টেনিস প্রতিযোগিতা (বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন)।

বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছা করিলেই সকল প্রতিযোগিতার ভার লইতে পারেন এবং তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কেন যে ভার গ্রহণ করেন না, তাহা তাঁহারাই জানেন না। তাহা একমাত্র এ্যাথলেটিকস্ বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহাও প্রচারের অভাবে সকল ছাত্রকে উৎসাহিত করিতে পারে না। শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকার ফল হইয়াছে এই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রতিযোগিতাতেই এই পর্য্যন্ত সুনাম অর্জ্জন করিতে পারে নাই। ইহাই যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়াম বিভাগের অবস্থা, তখন ইহা সুপরিচালিত

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ১৩ই আশ্বিন, ১৩৪৬ Saturday, 30th September, 1939 [৪৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গান্ধী-লিন্‌লিথগো সাক্ষাৎকার—

গত মঙ্গলবার লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে মহাত্মাজীর আর এক দফা আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে মহাত্মাজীর সঙ্গে বড়লাটের প্রথম আলোচনা হয়। সেই আলোচনার ফল কি হয়, আমরা জানিতে পারি নাই। মহাত্মাজীর কথায় প্রকাশ পায় যে, তিনি শূন্যহস্তে লাটপ্রাসাদ হইতে ফিরেন। ইহার পর ওয়ার্দ্ধাতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয় এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে এসব কথা উঠিয়াছিল নিশ্চয়ই এবং ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের উপরও যে সে আলোচনার প্রভাব ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; সুতরাং এই আলোচনার মধ্যে কংগ্রেসের দাবীদাবি এবং এ সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বক্তব্যের কথাও আসিয়াছে, এমন মনে করা অসঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে ভারতবাসীদিগকে গণতন্ত্রের প্রকৃত অধিকার দেওয়া হয় নাই। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আজ মানব-স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, জগতে তাঁহারা নবযুগ আনিতে চাহেন। মানব মৈত্রী প্রতিষ্ঠার দ্বারা জগতে নবযুগের প্রবর্ত্তনায় সাহায্য করিতে ভারতবর্ষ কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না। স্বাধীন ভারতই মানব-স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে। আমরা আশা করি, গান্ধীজীর সঙ্গে লর্ড লিনলিথগোর এই আলোচনার ফলে ভারতবর্ষ আপনার স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহিমায় জগতের প্রতি বৃহত্তর কর্ত্তব্য প্রতিপালনে তাহার শৌর্য্যময় স্বরূপ প্রকাশ করিতে সুযোগ লাভ করিবে।

আলোচনার ভবিষ্যৎ—

২৫শে সেপ্টেম্বর ২টা ১৫ মিনিটের সময় মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করিতে যান এবং ৬-১৫ মিনিটের সময় ফিরিয়া আসেন; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল আলোচনা চলে। এই আলোচনার সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কোন বিবৃতি বাহির হয় নাই। ২রা অক্টোবর বড়লাট দিল্লীতে যাইয়া জওহরলালজী এবং উপস্থিত প্রধান প্রধান কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করিবেন, [illegible] জিন্নার সঙ্গেও তাঁহার আলোচনা হইবে। ইহার পর বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের অনুমোদনক্রমে বড়লাট একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। পার্লামেন্টের লর্ড সভায় কথাটা সেদিন উঠিয়াছিল। একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেন,—"কংগ্রেসের মুখপাত্রগণ সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বৃটেন ও ভারত এই উভয় দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কতকগুলি সর্ত্ত প্রতিপালিত না হইলে, বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেনের সহিত সহযোগিতা করা কংগ্রেসের পক্ষে কঠিন হইবে। এই সর্ত্তগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে; কাজেই সেগুলি সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করিতে চাহি না, তবে বড়লাট ব্যক্তিগতভাবে নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন। মোস্লেম লীগের নেতৃবর্গের সঙ্গেও বড়লাট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন।"

ইহার পর এক বিবৃতি বাহির হইবে এ অনুমান আমরাও করিতেছি। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বৃটিশ সরকারের ঘোষণায় ঔপনিবেশিক স্বরাজই ভারতের লক্ষ্য বলিয়া পূর্ব্বে বৃটিশ সরকার যে সকল ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা পুনরায় অনুমোদন করা হইবে। আমাদের বক্তব্য এই যে, ১৯১৭ সালে সাধারণভাবে লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছিল বর্ত্তমানে তাহাই পর্য্যাপ্ত হইবেনা। ভারতবাসী নিজেদের দেশের শাসনব্যাপারে কোন কোন অধিকার পাইল, ভারতের রাষ্ট্রনীতিক মর্য্যাদা লাভ হইবে তাহার বিচারে প্রতিজ্ঞাপূর্ণ ঘোষণায় নয়, ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার কাজের ভিতর দিয়া।

উড়োজাহাজ সম্বন্ধে সতর্কতা—

গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা ও শহরতলীতে উড়োজাহাজ আক্রমণের মহড়া হইয়া গেল। ইটালী, রুশিয়া অথবা জাপান যুদ্ধে যোগদান না করা পর্য্যন্ত কলিকাতার উপর উড়োজাহাজ হইতে আক্রমণের আতঙ্কের কোন কারণ

অবলম্বন করিবার প্রয়োজন আছে। এ পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে কলিকাতা কর্পোরেশন যে সজাগ হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে। ইউরোপের সব শহরে এইসব ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে—সুতরাং কর্পোরেশনেরও উদাসীন থাকা উচিত নয়। কিন্তু দেশের লোক এখনও সতর্কতা সম্বন্ধে মোটামুটি কি করা উচিত, ইহা জানে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সহজ ও সরল ভাষায় এমনভাবে আগে সতর্কতার মূল সূত্রগুলি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার, যাহাতে তাহারা নিজেরাই এ সম্বন্ধে উদ্যোগী হইতে পারে এবং সেই সঙ্গে তাহারা নিজেরা যাহাতে এদিকে উদ্যোগী হয় তেমন প্রচারকার্য্য আবশ্যক। কর্পোরেশন এই রকম ব্যবস্থার জন্য মাত্র ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ টাকা প্রয়োজনীয় রক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষে যে একেবারেই উপযুক্ত নয়, ইহা সকলেই বুঝিবেন; এইজন্যই ব্যক্তিগতভাবে এ সম্বন্ধে প্রচেষ্টা জাগাইবার প্ররোচনার প্রয়োজন এবং সেই প্রচেষ্টা যাহাতে কার্য্যকর করা সম্ভব হয়, কর্পোরেশনের তাহাতে সুযোগ যথাসম্ভব দেওয়া উচিত।

পাটের বাজারে কারসাজি—

যুদ্ধ বাধিবার পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে পাটকলগুলি বহু চট ও থলের অর্ডার পাইয়াছে, কিন্তু ইহার ফলে পাটের বাজার যেমন চড়া উচিত ছিল, তাহা হইতেছে না। ইহার মধ্যে চটকলওয়ালাদের পক্ষ হইতে কারসাজি আরম্ভ হইয়াছে। চটকলওয়ালা সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা শ্রেণীভেদে ৮৷০ টাকা হইতে ৯৷০ টাকার বেশী মূল্যে পাট ক্রয় করিবেন না। চটকলওয়ালা সমিতির পক্ষ হইতে ঐ সমিতির চেয়ারম্যান ম্যাকডোনাল্ড সাহেব একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, এই দর দেওয়াতে পাটচাষীদের উপর অনুগ্রহই করা হইয়াছে। তিনি পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দিবার পক্ষে যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। পাটের সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিবার আমরা পক্ষপাতী; কিন্তু সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিবার প্রস্তাবের আমরা ঘোরতর বিরোধী। গবর্ণমেণ্ট অনেক জিনিসের দর অবশ্য বাঁধিয়া দিয়াছেন, কিন্তু অন্য জিনিসের সঙ্গে পাটের কোন তুলনা হয় না। পাটের দর বাড়িলে তাহাতে মুষ্টিমেয় পুঁজিওয়ালা দোকানদারেরই লাভ হইবে এবং ক্রেতা জনসাধারণ শোষিত হইবে—এরূপ সম্ভাবনা নাই। পাট বাঙলার জনসাধারণের এবং কৃষকের সম্পদ এবং কৃষকদের হাতে পয়সা বাড়ার উপরে বাঙলার সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক উন্নয়ন ঘটিবার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত; এইজন্যই আমরা ইহাই চাই যে, বাঙলার যাহারা পাটচাষী—যুদ্ধের বাজারের টানের যোল আনা সুবিধার অধিকারী তাহারা হয়। বাঙলার জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে আগে কৃষকদের উৎপন্ন মালের দর বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। যুদ্ধের কাজে পাটের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক, এই যুক্তি দেখাইয়া শ্বেতাঙ্গ চটকলওয়ালারা পাটের সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিবার দিবার চেষ্টা করিতেছে, যদি এই চাপে বাঙলা সরকার তাহাদের মতে মত দেন, তাহা হইলে পাটচাষীদের জন্য তাঁহারা যত কিছু করিয়াছেন বা করিতে যাইতেছেন বলিতেছেন—সব নিছক ধাপ্পাবাজিতে পরিণত হইবে।

যোগ্যতার আদর—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বৎসর সুপ্রসিদ্ধ মহিলা সাহিত্যিক শ্রীমতী নিরুপমা দেবীকে ভুবনমোহিনী দাসী সুবর্ণ পদক উপহার প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী এই সম্মানলাভ করাতে সকলেই আনন্দিত হইবেন। তাঁহার গল্প, উপন্যাস বাঙলার সর্ব্বত্র আদৃত এবং দেশের সর্ব্বত্র তিনি শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মনীষী লেখক এবং বহু শাস্ত্রে পণ্ডিত শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্তকে বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান বৎসরে 'গিরিশ অধ্যাপক' নিযুক্ত করিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি গিরিশ সাহিত্যের রস নূতন আকারে দেশবাসীকে দিবেন, আমরা তাঁহার গবেষণামূলক আলোচনা হইতে গিরিশচন্দ্রের সাধনার অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান লাভ করিব, এই আশা করিতেছি।

লেডী অবলা বসুর দান—

লেডী অবলা বসু আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে উদ্ভিদ-বিদ্যা অনুশীলন সম্পর্কে দুইটি গবেষণামূলক বৃত্তির ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত বাঙলা সরকারের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিবেন স্থির করিয়াছেন। আচার্য্য বসু উদ্ভিদতত্ত্বের ভিতর দিয়া জগৎকে নূতন সম্পদ দানে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজই ছিল তাঁহার সাধনার পুণ্য পীঠভূমি। এইখানে অধ্যাপনার সময়ই গবেষণার প্রেরণা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অবদান বাঙালীর নূতন মনীষাক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করিবে এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সাধনার ধারাকে সজীব রাখিবে, আমাদের ইহাই বিশ্বাস। বাঙলা সরকারের কর্ত্তব্য তাঁহার এই দানকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করিয়া তদ্দ্বারা বাঙলার সংস্কৃতি যাহাতে সমৃদ্ধ হয়, অনতিবিলম্বে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

বাঙলার তাঁত শিল্প—

গত রবিবার বঙ্গীয় বয়নশিল্প সমিতির প্রদর্শনীক্ষেত্রে সাংবাদিকদের একটি প্রীতি সম্মিলনীতে আহূত করা হয়। সমিতির সম্পাদক দুঃখ করিয়া বলেন, এই বাঙলাদেশ প্রতি বৎসর ১২॥ কোটি টাকার কাপড় খরিদ করে; কিন্তু এই টাকার খুব সামান্য অংশই বাঙলাদেশে থাকে; অথচ বাঙলাদেশে যে কয়েকটি কাপড়ের কল রহিয়াছে তাহা হইতে উৎপন্ন বস্ত্রে এবং বাঙলার তাঁতশিল্প হইতে উৎপন্ন কাপড়ের সাহায্যে বাঙালী বস্ত্র সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারে, সুনিশ্চিতভাবে

মিলের কাপড়ের চেয়ে বেশী মহার্ঘ। দত্ত মহাশয় বুঝাইয়া দেন যে, এ যুক্তি ভুল। বাঙলার তাঁতিদের ক্ষমতা হ্রাস পায় নাই; কিন্তু বিলাস ও প্রসাধনদ্রব্য হিসাবে তাঁহাদের সূক্ষ্ম কারিগরির কদর সমাজে পূর্ব্বে যেমন ছিল, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন কদর এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। মোটা কাপড় সকলের পরিতে হইবে, আমরা এমন মতের সমর্থক নহি। আমাদের মত এই যে, বিলাসের স্থান সমাজে আছে এবং চিরকাল থাকিবেও। বাঙালী বাঙলার মিলের কাপড় এবং তাঁতের কাপড় খরিদ করিয়া ঘরের টাকা ঘরে রাখুন, বাঙালীর মুখে অন্ন তুলিয়া দিন, তাহা হইলে বিলাসও ত্যাগের পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। এই পূজার বাজারে সূক্ষ্ম বস্ত্র, নানা রকমের রঙীন এবং পাড়দার কাপড়ের কাটতি বাঙলাদেশে প্রতি বৎসর হইয়া থাকে। দেশের দারিদ্র্য সত্ত্বেও বাজারে এ সময়ে কেনা-বেচা কিছু কম হয় না। দেশবাসীর প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, তাঁহারা বাঙলার তাঁতিদের কাপড় ক্রয় করুন, বাঙলার মিলের কাপড় কিনুন। দেখিবেন প্রতিযোগিতায় এদেশের মিলের কাপড় কিংবা তাঁতের কাপড় ভারতের অন্য কোন স্থানের বস্ত্র অপেক্ষা হীন তো নহেই, বরং অনেকাংশে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

গান্ধী জয়ন্তী—

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে গান্ধী-জয়ন্তী প্রতিপালিত হইবে। নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ দেশবাসীর দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী জগতের অন্যতম মহামানব, জগতকে তিনি তাঁহার জীবন এবং সাধনার ভিতর দিয়া নূতন সত্যের সন্ধান দিয়াছেন। ভারতের রাজনীতিক সাধনায় তিনি যুগপ্রবর্ত্তক। জনগণের অন্তরে ব্যাপকভাবে রাষ্ট্র-চেতনার উদ্বোধন তাঁহার সাধনার মুখ্য বস্তু বলা যাইতে পারে; এই ভিত্তির প্রয়োজন ছিল ভারতের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠালাভের পক্ষে। ভারতের ইতিহাসে সমষ্টি-চেতনার এই সঞ্চার এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। আমরা সকলে তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিকতাকে উপলব্ধি না করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার এই দানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার কাছে আমাদের সকলকেই মাথা নত করিতে হয়। মহাত্মাজী খদ্দরের উপর পূর্ব্বে যেমন জোর দিতেন, এখনও তেমনই জোর দিতেছেন। বাঙলায় খাদি প্রতিষ্ঠান, অভয় আশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া খাদি উৎপাদন এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে, গান্ধী-জয়ন্তীতে দেশবাসী সেই সাধনাকে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া মহাত্মাজীর প্রতি কার্য্যত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন।

বহু নির্য্যাতিতের মুক্তি—

সর্দ্দার পৃথ্বী সিং আজাদ এতদিন পরে সত্যই মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সর্দ্দারজী পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিত আসামী। ১৯১৪ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন, তাহার পর কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া তিনি চীন, জাপান, ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং ১৬ বৎসর পর ভারতে ফিরিয়া আসিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহাত্মাজী তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে পরামর্শ দান করেন এবং এই আশ্বাস দেন যে, তিনি তাঁহার মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। মহাত্মাজীর এই আশ্বাস যে সার্থক হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। সর্দ্দারজী মহাত্মার অহিংস-নীতিতে এখন পুরাপুরি বিশ্বাসী হইয়াছেন এবং তাহা বুঝিয়াই পাঞ্জাব সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন। পাঞ্জাব সরকার যাহা করিয়াছেন, বাঙলা সরকারের পক্ষে তাহা করিতে বাধা কি আমরা বুঝি না। বাঙলার দণ্ডিত রাজনীতিক বন্দীরাও পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে, তাঁহারা হিংসার নীতি বর্জ্জন করিয়াছেন এবং এখন তাঁহারা অহিংস নীতিতেই বিশ্বাসী।

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—

এলাহাবাদ শহরে 'বিচিত্রা' সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গেল। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্যার লালগোপাল মুখুজ্যে। বাঙলার বাহিরে যে সব বাঙালী আছেন, মাতৃভাষার সাধনাসূত্রে বাঙলার সঙ্গে তাঁহাদের যোগ রাখা একান্তই আবশ্যক, এইজন্য এই সব সম্মেলনকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকি। সম্মেলনে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি প্রস্তাব হইল কেবলমাত্র হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষাকে যুক্তপ্রদেশে সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার বাহন করা সম্পর্কে। আমরা বরাবর এমন ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছি। মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করিবার সুবিধা হইতে বাঙালী ছাত্রদিগকে বঞ্চিত করিবার এই নীতির অনিবার্য্য ফল এই দাঁড়াইবে যে, মাতৃভাষার সাহায্যে যাহারা শিক্ষার সুযোগ পাইবে, বাঙালীর ছেলেদিগকে তাহাদের নীচে পড়িয়া থাকিতে হইবে। তারপর, এই ব্যবস্থার ফলে বাঙলা ভাষার চর্চা গৌণ ব্যাপার হইয়া পড়িবে, বাঙলার সংস্কৃতি হইতে বাঙালী ছেলেরা বিচ্ছিন্ন হইবে। প্রত্যক্ষভাবে এই নীতির মূলে সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতা নাই, একথা বলিলেও কার্য্যত ইহাতে প্রাদেশিকতাই প্রশ্রয় পায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা তাহাদের নিজের নিজের মাতৃভাষার সাহায্যে করিতে পারেন এবং শিক্ষানীতির দিক হইতে আদর্শ মনে করেন, যুক্তপ্রদেশ তাহা করেন না কেন? শিক্ষানীতির দিক হইতে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করার সমীচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর কাহারও নাই। ইহা সত্ত্বেও যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট নানা অছিলায় সেই আদর্শকে লঙ্ঘন করিতে চাহিতেছেন কেন, আমরা তাহাই জিজ্ঞাসা করি। আমরা আশা করি, এখনও এ বিষয়ে তাঁহাদের চৈতন্য হইবে এবং যে নীতির ফলে প্রাদেশিকতা বাড়িতে পারে, তাঁহারা তেমন নীতি বর্জ্জন করিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, সেই নিখিল ভারতের জাতীয়তার আদর্শ-নিষ্ঠার পরিচয় দিবেন।

মুসোলিনীর মুক্তি—

সিনর মুসোলিনী শান্তির প্রস্তাব লইয়া আগাইয়া

আসিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, পোল্যাণ্ডের ব্যাপার যখন চুকিয়া গিয়াছে, তখন যুদ্ধটা যাহাতে ব্যাপক না হয় তাহাই করা উচিত। সিনর মুসোলিনী পোল্যাণ্ডের বর্ত্তমান পরিণতিকেই শান্তির ভিত্তি করিতে চাহেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, হিটলারের মনস্কামনা যখন সিদ্ধ হইয়াছে, তখন হিটলার এখন আর যুদ্ধ না চালাইবার মতে আপত্তি করিবেন না। এ যুক্তি বুঝা যায়; কিন্তু পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাঁহারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাঁহাদের পক্ষেও এ যুক্তি মানিয়া লওয়া কঠিন। কারণ, তাহা করিলে তাঁহাদের যাহা আদর্শ তাহার অন্যথাচরণ করা হয় এবং জোর যার মুল্লুক তার, এই বর্ব্বর নীতিকেই সমর্থন করা হয়। পোল্যাণ্ডের ব্যাপারের মূলে রহিয়াছে এই আদর্শ এবং সেই আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে হিটলারী গর্ব্বকে চূর্ণ করা দরকার—গায়ের জোরের উপরে নীতিকে প্রতিষ্ঠা করিবার মহত্তর মানবীয় আদর্শ যে জগৎ হইতে এখনও অন্তর্হিত হয় নাই, ইহা সমঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এই বৃহত্তর আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথে মুসোলিনীর যুক্তি সাহায্য করিবে না; সুতরাং ইহার প্রতিবাদ হওয়া স্বাভাবিক।

পরলোকে ফ্রয়েড

বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সারাজীবন সংগ্রাম করিয়া ফ্রয়েড আজ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে চেকোশ্লোভাকিয়ার এক ইহুদী পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। মানুষের মনের দুয়ারে নূতন সত্যকে বহন করিয়া আনিয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে চমকাইয়া দিয়াছেন যাঁরা ফ্রয়েড সেই প্রতিভার বরপুত্রগণেরই অন্যতম। গ্যালিলিও যেদিন প্রকাশ করিলেন, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে পৃথিবী সেদিন মানুষ নতুন সত্যের দীপ্তি দেখিয়া বিস্ময়ে চমকিত হইয়াছিল। ডারউইন যেদিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন, মানুষের উৎপত্তি বাঁদর হইতে এবং বাঁদর মানুষে রূপান্তরিত হইতে লক্ষ লক্ষ বছর লাগিয়াছে, তখন মানুষ আর একবার বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিল। মানুষকে শেষবার চমকাইয়া দিলেন ফ্রয়েড মনের অবচেতন প্রদেশের অদ্ভুত বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া। তিনি বলিলেন, মানুষ যাহা করে, অধিকাংশ স্থলেই তাহার মূলে মানুষের মনের নিজ্ঞান প্রদেশের দুজ্ঞেয় রহস্য। মানুষের স্বপ্নজগতের যেসব রহস্য ফ্রয়েড আবিষ্কার করিলেন তাহারা যেমন নূতন তেমনই চমকপ্রদ। মানুষের যৌন জীবনের সূত্রপাত যে তাহার নিতান্ত শৈশবে শিশুদের জীবনকে আমরা যতটা নিষ্পাপ মনে করিয়া থাকি তাহারা যে তত নিষ্পাপ নয়—এসব তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়া ফ্রয়েড বৈজ্ঞানিকগণকে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত করিয়া দিলেন।

নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া ফ্রয়েড আমাদের মনের কুহেলিকাচ্ছন্ন জগতের উপরে যে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন তাহা চিকিৎসা-জগতে যেমন যুগান্তর আনিয়াছে, শিক্ষা-জগতেও তেমনি নবযুগের আবির্ভাবকে সত্য করিয়া তুলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ ফ্রয়েডকে জগতের বড়ো বড়ো সমাজ-সংস্কারকগণের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত করিবে। ফ্রয়েড মানুষকে মুক্তির সন্ধান দিয়াছেন। আমরা সত্যের পূজারী, মুক্তির পূজারী, মানবতার পূজারী ফ্রয়েডের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ—

স্যার রেজা আলী মুস্‌লীম লীগ দলের একজন বড় নেতা। ইনি সেদিন সিমলাতে এক বক্তৃতায় কংগ্রেস এবং মোস্লেম লীগ কর্ত্তৃক গৃহীত যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্যের কথা তুলিয়া বলেন, কংগ্রেস ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সুস্পষ্ট ঘোষণা দাবী করিয়াছে। পক্ষান্তরে লীগ শাসনতন্ত্রগত অধিকারের দাবীকে মুখ্য করে নাই। গত ২৬ মাস ধরিয়া কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল-শাসিত প্রদেশসমূহে মুসলমানদের উপর যে অবিচার হইয়াছে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাহারই প্রতীকার করিতে বলিয়াছে। কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগ এই দুইয়ের আদর্শে পার্থক্য কেমন আকাশ-পাতাল, স্যার রেজা আলীর এই উক্তি হইতেই বুঝা যাইবে। কংগ্রেস ভারতের সর্ব্বজনীন স্বার্থকে ভিত্তি করিয়া বৃহত্তর রাষ্ট্রের অধিকার চাহিতেছে, চাহিতেছে স্বাধীনতা; আর লীগ সাম্প্রদায়িক স্বার্থকেই বড় বলিয়া বুঝিতেছে এবং গবর্ণরদের হাতে এইসব সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার ক্ষমতা যাহাতে বেশী থাকে, দেশের যাঁহারা প্রতিনিধি তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া—ইহাই দাবী করিতেছে। মোটামুটি এক পক্ষ চাহিতেছে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব, অপর পক্ষ চাহিতেছে অপরের প্রভুত্ব-প্রসারিত কৃপা। দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আদর্শগত এই পার্থক্য বিদ্যমান থাকিতে মিল হওয়া সম্ভব নয়। স্বাধীনতা মুসলমান সম্প্রদায় চাহেন না, তাঁহারা মাতৃভূমির মুক্তি চাহেন না, এমন কথা বলিলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অবমাননাই করা হয়; অবমাননা করা হয় সেই সম্প্রদায়ের, যে সম্প্রদায় স্বাধীনতার ধ্বজা জগতের বিভিন্ন স্থানে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে। মুসলীম লীগের মত যে মুসলমান সমাজের মত নয়, মুসলমান সমাজের দাবী ভারতের স্বাধীনতা—এই সত্যটি সুপরিস্ফুট হইলেই হিন্দু-মুসলীম সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। যাহারা মুসলমানের স্বার্থের দোহাই দিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের সেবা করিতেছে, সেই সব ধড়িবাজদের সম্বন্ধে মুসলমান সম্প্রদায় যতই সচেতন হইবেন, ততই এই মিলনের পথ প্রশস্ত হইবে। মুস্‌লীম লীগের মত যে ভারতের মুসলমানদের মত নয়—মুসলমানেরা গণতন্ত্রের সেবক, তাঁহারাও ভারতের গণতন্ত্র চাহেন, আজ জগতে নিজেদের মর্য্যাদা অব্যাহত রাখিতে হইলে ভারতের মুসলমানকে এই সত্য ঘোষণা করিতে হইবে। জগতের মুসলমান সমাজ এবং বিভিন্ন মুস্‌লীম শক্তিও ইহাই আশা করিতেছেন।

আর্ট

বিজ্ঞানের কারবার সত্যের সঙ্গে, আর্টের কারবার সুন্দরকে নিয়ে। কিন্তু যা কেবলই সুন্দর, যার সঙ্গে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই—তাকে খুব উচ্চস্তরের আর্ট বলা চলে না। যে সৌন্দর্য্য সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন তা হচ্ছে নিম্নস্তরের সৌন্দর্য্য। এই নিম্নস্তরের সৌন্দর্য্যের মধ্যে আর্টের পরিপূর্ণতা নেই। নিছক সত্য নিয়েও আর্টের কারবার চলে না। ফোটোগ্রাফি যে আর্টের কোঠায় পড়ে না তার কারণ সেখানে কেবল সত্যের শাসন। পেণ্টিং আর্টের কোঠায় পড়ে কারণ শিল্পীর মনের মাধুরির সংস্পর্শে এসে সত্য সেখানে সুন্দর হ'য়ে উঠেছে।

সত্যের সঙ্গে যেখানে সুন্দরের যোগ নেই সেখানে আর্টের মধ্যে আমাদের চিত্ত তেমন তৃপ্তি খুঁজে পায় না। সব যেন কেমন অবাস্তব ব'লে মনে হয়। প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্ট যাঁরা—তাঁদের চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে পাই—সেটা হ'চ্ছে কৃত্রিমতার অভাব। কোনো চরিত্রকেই অস্বাভাবিক ব'লে মনে হয় না। সত্যের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হ'লেই উপন্যাসে সাহিত্য-রস আর তেমন ভ'রে ওঠে না—আমাদের মন ক্রমাগত খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকে। শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথের ছবি কেন আমাদের এত ভালো লাগে? কারণ এই রকম ডানপিটে নির্ভীক কিন্তু হৃদয়বান ছেলে দুষ্প্রাপ্য হ'লেও অবাস্তব নয়। ইন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মন থেকে বেরিয়ে এলেও পাঠক-পাঠিকাদের মনে হয়—সে যেন তাদের কতকালের চেনা। পথের দাবীর অপূর্ব্ব যদিও ইন্দ্রনাথের মত সাহসী এবং স্বাবলম্বী নয়—তবুও অপূর্ব্বের চরিত্রসৃষ্টি সাহিত্যিকের চোখে নিখুঁত। বাঙালীর ঘরের সাধারণ ভালো ছেলে যেমন ভাবপ্রবণ কিন্তু মেরুদণ্ডহীন হ'য়ে থাকে—অপূর্ব্বও তাই। অপূর্ব্বের চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র সত্যকে কোথাও আঘাত করেন নি। পথের দাবীর সব্যসাচীকে আঁকতে গিয়ে শরৎচন্দ্র শিল্পী হিসাবে কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। সব্যসাচীর চরিত্রের চারিদিকে বিপ্লবীর একটা অপার্থিব মহিমা রচনা করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের কল্পনা সত্য থেকে এত দূরে স'রে গিয়েছে যে, পথের দাবীর ডাক্তারের ছবি অত্যন্ত অস্বাভাবিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সব্যসাচী কখনো এক হাতে দাঁড় বায় না—সব সময়ে দু'হাতে দাঁড় বায়। তার সরু সরু আঙুলের চাপে অতি বড়ো জোয়ানের হাতও ভেঙে যাবার উপক্রম হয়। সব্যসাচীর মুখে বারম্বার সুনিয়াৎসেনের কথা। সুনিয়াৎসেনের সঙ্গে কখনো তার দেখা সাংহাইতে, কখনো টোকিওতে। সব্যসাচীর চরিত্র আঁকতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বড়ো বেশী কল্পনা-শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এইজন্য তার মুখের কথাগুলি শুনে পাঠকপাঠিকার চিত্ত মুগ্ধ হ'লেও তার চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে সাহিত্যরস ভালো ক'রে জ'মে ওঠেনি। রামের সুমতি, শ্রীকান্ত, পণ্ডিত মশাই, পল্লী-সমাজ, বিরাজ বউ প্রভৃতি পুস্তকে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার যে এমন গৌরবময় প্রকাশ দেখতে পাই তার কারণ আছে। যাদের চরিত্র এই সকল গ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে—তাদের সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাদের জীবনকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জানবার সুযোগ তিনি লাভ করেছিলেন। এই জন্যই পল্লীসমাজ প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল নরনারী ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তারা কেউ অস্বাভাবিক নয়। তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই আমাদেরই নিতান্ত কাছের যারা তাদেরই চিরপরিচিত জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। অপরিচিত কেউ নয়। সত্যের সঙ্গে তাদের সামঞ্জস্য এমন গভীর ব'লেই তাদের চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে আর্টের এতখানি উৎকর্ষ ফুটে উঠেছে। সব্যসাচীর চরিত্র আঁকবার বেলায় শরৎচন্দ্রের প্রতিভা হয়ে গেছে যেন মেঘে-ঢাকা চাঁদের মতো। ঐ ধরণের বিপ্লবীদের জীবনকে গভীরভাবে জানবার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন নি। হয়তো কারও মুখে তাদের শৌর্য্যের এবং আত্মত্যাগের কাহিনী শুনে থাকবেন। সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকায় পথের দাবীতে কল্পনার বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে এবং সেই জন্যই পথের দাবীর নায়কের মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র অনেক চমকপ্রদ সত্যকে অননুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করলেও শেষ পর্য্যন্ত বর্ম্মার বিপ্লবী ডাক্তার তার লোহার মত শক্ত সরু সরু আঙুলগুলি নিয়ে কেমন যেন অবাস্তব থেকে যায়। একথা খুবই সত্য যে আর্টকে তার উৎকর্ষের পূর্ণতা লাভ করতে হ'লে সত্যের শরণ নিতেই হবে। সুন্দর যত সুন্দরই হোক—সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেললে আর্ট ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে বাধ্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মঙ্গলের সঙ্গে সাহিত্যের কোনও সম্পর্ক আছে কি না। অনেকের ধারণা সত্য শিব সুন্দরের মধ্যে সত্য এবং সুন্দর যেমন আর্টের লক্ষ্য, মঙ্গলও তেমনি আর্টের লক্ষ্য। আর্টের পক্ষীরাজ ঘোড়াকে লাঙলে জুড়ে যাঁরা সমাজের উপকারার্থে তাকে দিয়ে ফসল ফলাতে চান—উঁচু-দরের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের ধারণাকে কতখানি মর্য্যাদা দান করা উচিত—ভেবে দেখতে বলি। সাহিত্যিক আর যাই হোন, পাদ্রী সাহেব অথবা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য নন। একথা সত্য যে টলষ্টয় অথবা বঙ্কিম অথবা রল্যাঁর মত প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে আমরা দেখেছি—পাপ ক'রে মানুষ অহর্নিশি কি দুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে। বঙ্কিমের শৈবলিনী পাগলিনী হ'য়ে গেছে, টলষ্টয়ের এ্যানা কেরেনিনা পরপুরুষের প্রেমে প'ড়ে শৈবলিনীর মতই কুলত্যাগিনী হয়েছে আর সেই মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হয়েছে রেলগাড়ীর চাকার তলায় জীবন দিয়ে। রোমা র'ল্যার মানস সন্তান ক্রিস্তফ্ বন্ধুপত্নীর সঙ্গে ব্যভিচার ক'রে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অন্তরে অনুতাপের বৃশ্চিকদংশন অনুভব করেছে। তবুও টলষ্টয়, বঙ্কিম অথবা রল্যাঁ—এঁদের কাউকে গীর্জ্জার পাদ্রীসাহেবের কোঠায় আমরা ফেলতে পারিনে। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয় দেখাবার সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে এঁদের কেউ উপন্যাস রচনায় ব্রতী হননি। টলষ্টয় সম্পর্কে একজন বড়ো সমালোচক লিখেছেন, He lets life teach its own lessons

এরা যে শাস্তি ভোগ ক'রেছে—ঔপন্যাসিক ইস্কুলের হেড মাষ্টার সেজে সে শাস্তি জোর ক'রে তাদের উপরে চাপাননি। জীবনে যেমন যেমন তারা কাজ করেছে, ফলও তারা তেমনি তেমনি ভোগ করেছে। এ্যানার মত নারীর আত্মহত্যা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। একদিকে তার প্রেমিক, আর একদিকে তার পুত্র—এ দুয়ের আকর্ষণের টানাটানির মধ্যে পড়ে যে দুঃসহ বেদনা এ্যানা ভোগ করছিল, তার থেকে মুক্তির উপায়কে সে খুঁজে পেল আত্মহত্যার মধ্যে। শৈবলিনীর সংযমের দৈন্যই তার যত দুঃখের মূলে। গোপনে বন্ধুপত্নীর সঙ্গে ব্যভিচারের মধ্যে যে মিথ্যার কালিমা রয়েছে সেই মিথ্যাচরণের দুঃসহ গ্লানি কিম্ভাবকে নিমেষে নিমেষে ভোগ করিয়েছে নরকের যন্ত্রণা।

আর্টের সঙ্গে মঙ্গলের তবে কি কোন সম্পর্ক নেই? সাহিত্যের নামে আমরা কি তাহ'লে নোঙরামিকে সমাজে প্রশ্রয় দিতে পারি? জীবনে যা কিছু ঘটে তাই কি সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান ব'লে গণ্য হতে পারে? এসব বড়ো গুরুতর প্রশ্ন। তবে এই পর্যন্ত আমরা জোরের সঙ্গে নিশ্চয়ই বলতে পারি যে, "Art for Art's sake"এর ধুয়ো তুলে সমাজের নরনারীদের রুচিকে বিকৃত ক'রে তুলবার কোন অধিকার নেই আমাদের।

কিন্তু একথাও অতি বড়ো সত্য যে, সমাজপতিরা নীতির দোহাই দিয়ে এমন সব আদর্শকে সমর্থন ক'রে আসছেন যাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া সমীচীন মানুষের আত্মপ্রকাশের পথকে প্রশস্ত করবার জন্য। আমরা যেসব ধারণাকে মনের মধ্যে পোষণ ক'রে থাকি তাদের উপরে কোন চিন্তাবীর এসে খড়্গাঘাত করলে আমরা চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ ক'রে গেলো গেলো রব তুলি, ভাবি আমাদের পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে আমরাও রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমরা যে সব ধারণাকে সত্য ব'লে সযত্নে মনের মধ্যে পোষণ ক'রে থাকি—তাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কি আমাদের বিচার-বুদ্ধির দৈন্যই পরিলক্ষিত হয় না? দুর্নীতির গ্রাস থেকে সমাজকে রক্ষা করো ব'লে যারা সুনীতির জয়ধ্বজা উড়িয়ে ঘন ঘন সিংহনাদ ছাড়ে—তারা কি নির্বুদ্ধিতার আধিপত্যকে অবিচলিত রাখবার জন্যই হুঙ্কার দেয় না?

এই নির্বুদ্ধিতার অচল দুর্গকে ধূলিসাৎ ক'রে একটা নূতন আদর্শের জয়ধ্বজা উড়িয়ে আসে আর্টিস্ট। সমাজকে দুর্নীতির গ্রাস থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিয়েছেন যাঁরা সেই সমাজপতিদের দৃষ্টি একান্তভাবে নিবদ্ধ ভাবীকালের উপরে। মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়া নির্বুদ্ধিতা। কেন? কারণ সমাজের ভবিষ্যতের উপরে তার প্রভাব হবে বিষময়! বিধবার পুনর্বিবাহ অনুচিত। কেন? তাহলে সমাজ ছারখারে যাবে। বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন কোনমতেই সমর্থন যোগ্য নয়। কেন? তাহ'লে সংসারে ঘরে ঘরে নরনারীর বিবাহিত জীবন অভিশপ্ত হবে। আর্ট সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গল-অমঙ্গল নিয়ে মাথা ঘামায় না—ভাবীকালের শৃঙ্খলার উপরে জোর দেওয়া সে প্রয়োজন মনে করে না। তার কাজ বর্ত্তমানকে নিয়ে। Art neglects the safety of the future for the gain of the present. নগদ পাওনার উপরে তার প্রচণ্ড লোভ। সমাজের ভবিষ্যতকে নিরাপদ রাখবার জন্য বর্ত্তমানকে বলি দিতে আর্ট একান্তই নারাজ। আনন্দ চাই—এখনই চাই—এখানে চাই—এই হ'চ্ছে আর্টের বাণী। বিধবা মঞ্জুলিকার প্রেমের জীবনকে উপেক্ষা করেছে তার পিতা—কারণ পুলিনকে বিয়ে করলে সমাজ নাকি রসাতলে যেতো। কবি কিন্তু সমাজের ভবিষ্যতের কাছে মঞ্জুলিকার বর্ত্তমানকে বলি দিতে কোনমতেই রাজি হলেন না। মঞ্জুলিকার বাবা যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে গেল—কবি তখন তাকে পুলিন ডাক্তারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন ফরাক্কাবাদে। সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটুও মাথা ঘামালেন না তিনি। মঞ্জুলিকার এমন একটা যৌবনই যদি ব্যর্থ হ'য়ে গেল—তবে সমাজ থাকলো আর গেলো তা নিয়ে আর্টিস্ট একটুও মাথা ঘামানো প্রয়োজন বোধ করে না। রবিঠাকুর দিলেন বিধবা মঞ্জুলিকার সঙ্গে পুলিন ডাক্তারের বিয়ে আর ইবসেন ঘরের বধূ নোরাকে দাম্পত্য জীবনের কারাগার থেকে বৃহত্তর জগতের উদার বক্ষে দিলেন মুক্তি। নোরা যখন স্বামীগৃহ থেকে চলে যাচ্ছে পতি পুত্রকে পিছনে রেখে তখন সমাজের ভবিষ্যত তার কাছে একেবারেই বড়ো নয়, বড়ো হ'চ্ছে তার কাছে আত্ম-প্রকাশের আনন্দ। তাকে এই মুহূর্ত্ত থেকেই জীবনের পূর্ণতার মধ্যে বাঁচবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে আর তার জন্য প্রয়োজন স্বামীর রাহু গ্রাস থেকে মুক্তি। আর্টিস্ট ইবসেন সমাজের ভাবী কল্যাণের বেদীমূলে নোরার বর্ত্তমানকে বলি দিতে পারেন নি। ধরা-বাঁধা পথে গতানুগতিকের নির্দ্দেশ মেনে চলবার জন্য আর্টিস্টদের আবির্ভাব নয়। আর্টের কাজ হচ্ছে সমাজের চিরাচরিত অর্থহীন আইনকানুনের বন্ধন থেকে মানুষের প্রাণকে মুক্তি দেওয়া—তাকে জানা থেকে অজানার পথে চলবার উৎসাহ জোগান—তাকে পুরাতনের বক্ষ থেকে নূতনের পথে নিয়ে যাওয়া। The incidental service of art to society lies in its adventurousness.

পোলদের স্বদেশ-প্রেম

স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পোল জাতি যে শৌর্য্য-প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা জগতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। পোল জাতি কতকটা ভাবপ্রবণ জাতি। জগতের ইতিহাসে ইহার পূর্ব্বে তাহারা এ পরিচয় প্রচুরভাবেই দিয়াছে যে, তাহারা মরিতে জানে। স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য কোন বাধা-বিঘ্নকেই তাহারা গ্রাহ্য করে না। সে বেলা তাহারা বে-পরোয়া এবং একেবারেই বে-হিসাবী। বিখ্যাত ফরাসী মনীষী ভলটেয়ার তাঁহার 'দ্বাদশ চার্লস' পুস্তকে পোল জাতির এই প্রকৃতির কথা তুলিয়া বলিয়াছেন,—পোলদের অভিজাত সম্প্রদায়ই সে দেশের আইন-কানুনের কর্ত্তা এবং দেশরক্ষার ভার তাহাদেরই হাতে। যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিলে তাহারা ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ লোক যোগাড় করিতে পারেন। তাহাদের মধ্যে সুশৃঙ্খলার অভাব আছে, অভিজ্ঞতা এবং আনুগত্যের অভাবও দেখা যায়; কিন্তু স্বাধীনতার জন্য প্রবল একটা প্রেরণা তাহাদিগকে সদাসর্ব্বদাই দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তোলে। পোলেরা পরাজিত হইতে পারে, তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া যায় এবং কিছু সময়ের জন্য অধীনও করা সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু তাহারা অচিরেই অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফেলে। কাজেই পোল জাতির প্রকৃতির কথা বলিতে গেলে এই কথা বলিলেই পরিষ্কার হইবে, তাহারা কঞ্চির মত বাতাসের চোটে কিছু সময়ের জন্য নোয়াইতে পারে, কিন্তু আবার মাথা নাড়া দিয়া উঠে। এইজন্য পোল্যাণ্ডের কোন শহর কেল্লার দ্বারা সুদৃঢ় নয়; তাহারা নিজেরাই তাহাদের রাষ্ট্রের প্রাকার। পোলেরা কখনই তাহাদের রাজাদিগকে কেল্লা তৈয়ার করিতে দেয় নাই; কারণ তাহারা এই ভয় করিয়াছে যে, দেশরক্ষার চেয়ে এইগুলির সাহায্যে রাজারা সুরক্ষিত হইয়া দেশের লোকের উপর অত্যাচার করিবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পোলদের যে পদাতিকবাহিনী ছিল, তৎসম্বন্ধে ভলটেয়ার বলেন যে, ঐ সব সেনা সুসজ্জিত নয়, তাহারা যাযাবর তাতারদের মত— ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম কোন দুঃখকষ্টই তাহাদিগকে কাবু করিতে পারে না।

পোলেরা দেশের স্বাধীনতা আপাতত হারাইতে বসিয়াছে বলা যায়। তাহারা হিসাব বুঝে নাই। তাহারা স্থির বুঝিয়াছে যে, যদি হিটলার যে কথা বলিয়াছেন, সেই অনুসারে তাহারা আজ ডানজিগ এবং পোলিশ কোরিডর ছাড়িয়া দিত, তাহা হইলে কালই জার্ম্মানী অন্য কৌশলে তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিতে চেষ্টা করিত। পোলেরা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই, তাহা সম্ভবও নয়, তাহারা সাহসী সন্দেহ নাই; কিন্তু জার্ম্মানদের ন্যায় পোলদের সেনা-বিভাগ যন্ত্রবলোপেত নয়, তিন দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া তাহারা পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। মিত্রশক্তি প্রত্যক্ষভাবে সমর-ক্ষেত্রে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে নাই।

রুশিয়ার পোল্যাণ্ড অভিযানের কারণ হইতে পারে জার্ম্মানী যাহাতে পোল্যাণ্ডকে হাত করিয়া রুশ-সীমান্তে জঙ্গী জোরে জাঁকিয়া বসিতে না পারে তাহাই। কিন্তু আপাতত তাহার ফলে এই সমস্যা দেখা দিয়াছে যে, পরোক্ষভাবে জার্ম্মানী পশ্চিম সীমান্তে লড়িবার সুবিধা উহার ফলে তাড়াতাড়ি পাইয়াছে। দ্বিতীয় সমস্যা এই যে, রুশিয়া পোল্যাণ্ডের যে জায়গা দখল করিয়াছে, সে যে তাহা পোল রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দিবে ইহা মনে হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে পোল স্বদেশপ্রেমিকদের প্রতি যাঁহারা সহানুভূতিসম্পন্ন তাঁহাদের দৃষ্টিতে রুশিয়ার এই আচরণ আপাতত রহস্যময় বলিয়াই মনে হইবে। রুষিয়া এখনও নিরপেক্ষ রহিয়াছে। সুতরাং রুষিয়ার রণ-চাতুর্য্যের দিক হইতে জার্ম্মানীর প্রতিকূলে ঘটনাচক্র যে না ঘুরাইতে পারে, এমন নয়।

পোলেরা লড়িয়াছে, মৃত্যুপণ করিয়া লড়িয়াছে। বিস্ময়কর তাহাদের এই বীরত্ব; কিন্তু যাঁহারা পোলাণ্ডের ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা ইহাতে বিস্মিত হইবেন না। পোল জাতির লোকসংখ্যা মুষ্টিমেয় হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের স্বাজাত্য-মর্য্যাদা বড়ই প্রবল। অতীতের গৌর-বোজ্জ্বল স্মৃতি তাহাদিগকে বলিতে গেলে উন্নত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের এই অনুভূতি একেবারে মজ্জাগত যে, জগতে তাহারা একটা জাতির মত জাতি। ভার্সাইয়ের সন্ধিতে তাহাদের যে রাষ্ট্রীয়তা দেওয়া হইয়াছে সেইখানেই তাহাদের রাষ্ট্র-বুদ্ধি সৃষ্টি হয় নাই। মধ্যযুগেও এই পোল জাতির সভ্যতার প্রভাব বালটিক সমুদ্রের তটভূমি হইতে কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালার পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পোলদের সেই সংস্কৃতি বহু জাতিকে সংহতিবদ্ধ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতেও এই পোল জাতি মধ্য-ইউরোপে প্রভাবশালী যতটা ছিল, জার্ম্মানেরা ততটা ছিল না। বালটিক সমুদ্রের ধারে তখন জার্ম্মান জাতির পূর্ব্ব-পুরুষেরা জায়গা-জমি দখল করিতে চেষ্টা করিতে থাকে; কিন্তু পোলেরা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেয় এবং পরে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের রক্ষকস্বরূপে এই পোল জাতিই ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীদিগকে ভিয়েনা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল। এইভাবে পূর্ব্ব হইতে প্রাচ্য রুশ জাতির আক্রমণ হইতেও পোলেরা প্রতীচ্য সভ্যতাকে বহু দিন নিরাপদ রাখিয়াছে। সাতশত বৎসরকাল পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখিবার পর এই পোলজাতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বাধীনতা হারাইয়াছিল; কিন্তু পোলেরা কোনদিনই স্বাজাত্য-মর্য্যাদাবোধ হারায় নাই।

অবিরত সঙ্ঘাত-সংঘর্ষময় জীবন পোল জাতিকে দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তোলে। গত অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহারা বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিল; কিন্তু তাহার পর আর আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। রুষ-জার্ম্মান খপ্পরে পড়িয়া পোল্যাণ্ড তিন টুকরা হইয়া গেল।

তদবধি পোলজাতির অধঃপতনের যুগ আসে। এই অধঃপতনের যুগেও পোলেরা স্বদেশপ্রেম হারায় নাই, বরং যে স্বদেশপ্রেম অভিজাত সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগত মর্য্যাদার মধ্যে

মঃ ষ্ট্যালিন ও হের ভন রিবেনট্রপ

পশ্চিম রণাঙ্গন

রুষ-জার্ম্মান চুক্তি স্বাক্ষর
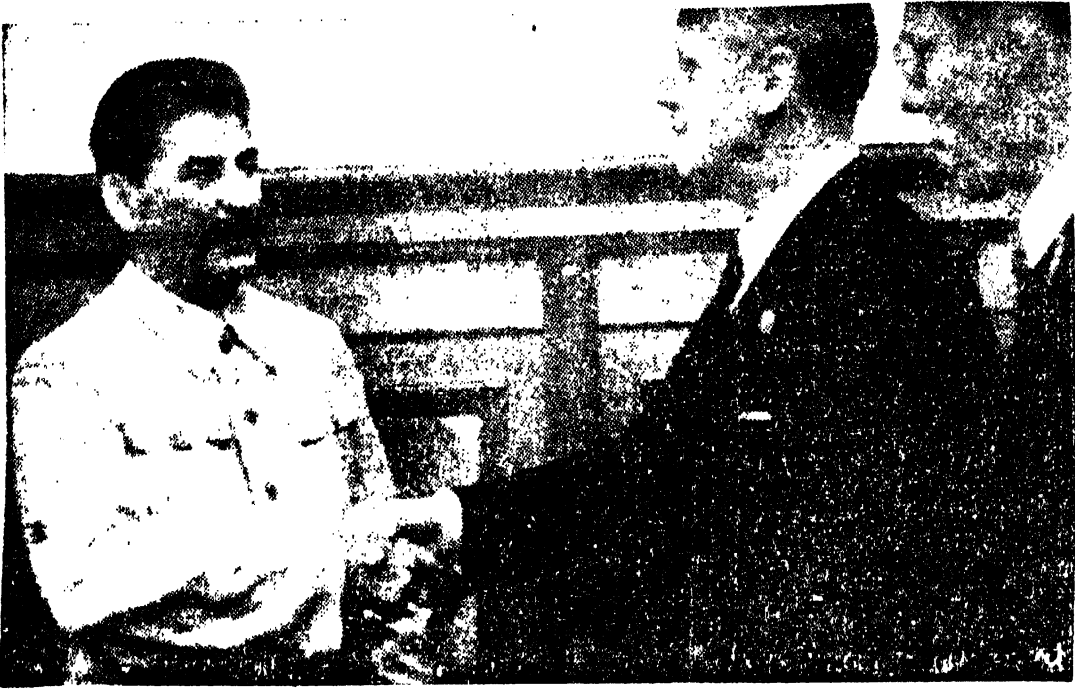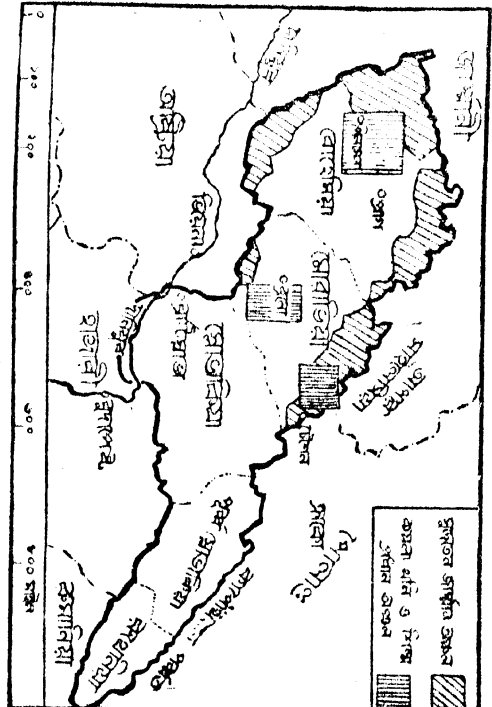
নিবন্ধ ছিল, তাহা কৃষকদের মধ্যে পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। রুষ এবং জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদীরা পোলদের উপর বরাবর অত্যাচার করিয়াছে, এইজন্য এই দুই জাতির উপর তাহাদের বরাবর একটা বিজাতীয় ঘৃণা আছে এবং সেই ঘৃণাকে তাহারা রাষ্ট্রীয় সংহতির দায়ে ছাড়িতে পারে নাই. পরিশেষে এই ঘৃণা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যাকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছিল, একথাও অস্বীকার করা যায় না। এই সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দিক হইতেও রুষদের অপেক্ষা জার্ম্মানদের উপরই তাহাদের বিদ্বেষ ছিল বেশী। কারণ, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে পোলজাতি এই শিক্ষা লাভ করে যে, রুষ তাহাদিগকে অধীন করিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু জার্ম্মানী চায় তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে। জার্ম্মান সাম্রাজ্যের ভিত্তির মূলেই ছিল পোল্যাণ্ডের নাশ। পোল্যাণ্ড যদি শক্তিশালী রাষ্ট্র থাকিত, তাহা হইলে জার্ম্মান সাম্রাজ্যই আজ গড়িয়া উঠিতে পারিত না। রুষদের শাসন হইতে পোলদের লাভ কিছু না হইয়াছে, একেবারে বলা যায় না; কিন্তু বিসমার্কের মূলনীতিই ছিল পোলদিগকে ধ্বংস করা! অথবা পোল্যাণ্ডকে জার্ম্মানীর একটি প্রদেশে পরিণত করা। জার্ম্মান রাষ্ট্র-নায়কগণ এই নীতিকে কতটা গুরুত্ব প্রদান করিতেন, গত ১৮৯৬ সালে ডাক্তার স্যাটলার জার্ম্মান রাষ্ট্রসভায় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—জার্ম্মান এবং পোলদের মধ্যে শত্রুতা স্বাভাবিক। আমাদের রাজধানী হইতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ দূরে আর একটা স্বাধীন রাজ্য থাকিবে—আমরা জার্ম্মানরা ইহা বরদাস্ত করিতে পারি না। আমাদের এই অবস্থাটা পোলদের বুঝিয়া দেখা উচিত; তাহাদের বুঝা উচিত যে, ঐরূপ স্থানে আমরা কোন স্বাধীন জাতিকে থাকিতে দিতে পারি না। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান রাজনীতিক বোজেন বার্ল একদিন দম্ভভরে বলিয়াছিলেন,—পোল রাষ্ট্রটা জার্ম্মানীর স্বাধীন অস্তিত্বের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

বিগত মহাসমরের আরম্ভ হয় ১৯১৪ সালে। ঐ সময় পোল্যাণ্ড জার্ম্মানী, রুষিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার মধ্যে বিভক্ত ছিল। স্বদেশের স্বাধীনতার কামনায় পোলেরা দুই পক্ষেই লড়াই করিয়াছিল এবং উভয় পক্ষই তাহাদিগকে হাত করিয়া নিজেদের কাজ বাগাইবার চেষ্টা করিয়াছে। রুষিয়া তাহাদিগকে এই লোভ দেখায় যে, সে যদি যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহা হইলে পোল-দিগকে স্বাধীনতা দিবে, ইহার পর জার্ম্মানীও অনুরূপ ঘোষণা করে। কিন্তু প্রধানত প্রেসিডেণ্ট উইলসনের চেষ্টাতেই পোল-রাষ্ট্র গঠিত হয়। তিনি তাঁহার চতুর্দ্দশ সর্ত্তের মধ্যে স্বাধীন পোল্যাণ্ডের গঠনকে ঢুকাইয়া দেন। জার্ম্মানী এই সর্ত্ত স্বীকার করিয়া প্রথমে লয় নাই। পরে ১৯৩৫ সালে হিটলার পোলরাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া-ছিলেন, কিন্তু হিটলারের তখনকার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। ঐ সময়ের মত পোল্যাণ্ডের দিকে চাপ না দিয়া অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, রাইন অঞ্চল প্রভৃতি অধিকার করিবার দিকেই তাহার ঝোঁক ছিল। ক্রমে ক্রমে সেগুলিকে হাত করিয়া লইয়া অবশেষে তিনি দৃষ্টি দিলেন পোল্যাণ্ডের দিকে। প্রাচীন জার্ম্মান ও পোলদের প্রকৃতি আবার পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

হের হিটলার নিজে তাঁহার বক্তৃতায় ইংরেজের উপর যুদ্ধ বাধাইবার দায়িত্ব চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু পোল সেনাধ্যক্ষ মার্শাল স্মিগলী-রীজ কিছুদিন পূর্ব্বেই একথাটা বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ডানজিগ লইয়া পোল্যাণ্ড কোন সমস্যা বাধায় নাই; পক্ষান্তরে পোল কর্ত্তৃপক্ষ বারম্বার এই কথাই বলিয়াছেন, ডানজিগ লইয়া জার্ম্মানীর সঙ্গে তাহাদের গোলযোগ মিটিয়াই গিয়াছে। গত ১৮৩৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী হের হিটলার নিজেই তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—"ডানজিগ আর পোল-জার্ম্মান সম্পর্ক বিপর্য্যস্ত করিবে না।"

কিন্তু অন্য দিককার ব্যাপার—যেই হিটলারের পক্ষে কিছু সুবিধাজনক হইল তিনি অমনিই সুর ঘুরাইয়া লইলেন। জার্ম্মানীর প্রাচীন নীতি প্রকট হইল। জার্ম্মান রাষ্ট্রনীতিক-গণ আবার বলিতে লাগিলেন এবং হের রিবেনট্রপ নূতন কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করিলেন, যাহাতে জার্ম্মানী ইউরোপে সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারে। সেজন্য ইহারই অঙ্গস্বরূপে আসিয়া পড়িল পোল্যাণ্ড দখল করা। জার্ম্মান রাষ্ট্রনীতিকগণ দেখিলেন, পোল্যাণ্ডের উপর জার্ম্মানীর কর্ত্তৃত্বের অর্থ—মধ্য এবং পূর্ব্ব ইউরোপের উপর তাহার প্রভুত্ব। পোল্যাণ্ড যদি জার্ম্মানদের হাতে যায়, তাহা হইলে বাল্টিক এবং ইজিয়ান সাগরের মাঝে যে সব ছোট ছোট রাষ্ট্র আছে সেগুলি সব স্বাভাবিকভাবেই জার্ম্মানীর প্রভাবে আসিয়া পড়ে। ফ্রেডারিক দি গ্রেট বলিতেন,—ডানজিগের কর্ত্তা যে হইবে, ওয়ারসয়ের রাজার চেয়ে সে হইবে পোল্যাণ্ডে বড় ক্ষমতাশালী। জার্ম্মানী এই তত্ত্ব আবার হৃদয়ঙ্গম করিল, সুতরাং ডানজিগ স্বাধীন শহর রাখিলে চলিবে না, তাহাকে জার্ম্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার হইয়া পড়িল।

পরের উপর কর্ত্তৃত্ব করা, প্রভুত্ব চালান, জার্ম্মান জাতির দার্শনিকতা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ক্যাণ্ট, হেগেল, ফিসটেসে নেটসে প্রভৃতি জার্ম্মান দার্শনিকেরা ন্যূনাধিক পরিমাণ এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। জার্ম্মান দার্শনিক ফিসটের মত এই যে, একমাত্র জার্ম্মান জাতিরই এমন ধর্ম্ম আছে যাহার বলে সে জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে অধিকারী। গত মহাসমর বাধিবার মুখে কাইজার বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা দলন করিয়া ক্যাণ্টের দার্শনিকতার দোহাই দিয়া বলিয়াছিলেন, ঐ কার্য্যের দ্বারা জার্ম্মানী মানব-সভ্যতার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিল। কিন্তু অহঙ্কার এবং বল-দর্পের সাহায্যে এই যে আস্ফালন এবং দুর্ব্বলের উপর এই পীড়ন, ইহাই কি মানব-সভ্যতার অঙ্গ? পশুর ধর্ম্ম হইতে পারে ইহা, কিন্তু নিশ্চয়ই মানুষের নয়।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

অলকা প্রস্তুত হইয়া লইবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

ঘুরিতে ঘুরিতে প্রতুল হঠাৎ জানালার সম্মুখে গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন দেখিল, হয়ত' বা কিছু শুনিলও তারপর ঘুরিয়া অত্যন্ত সহজ ভাবেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না কাহাকেও কোন কথা বলিবারও যেন তাহার ছিল না। তাহার চলিবার পথে কেহ নাই, আছে শুধু সে আর তাহার সম্মুখে দিগন্ত প্রসারিত জনশূন্য পথ। যদি কোন পথিক অকস্মাৎ পথে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে সে মুখ ফিরাইয়া লয় না, পরিচয় করিয়া লইবার জন্যও থামিয়া থাকে না। বিশ্রাম যেন তাহার নাই অথচ বিশ্রাম তাহার নাই একথা ভাবিবার এতটুকু কারণও ত' কই সে কাহারও সম্মুখে তুলিয়া ধরে নাই। এমনি করিয়াই কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া অথচ এতটুকু অগ্রাহ্যও না করিয়া সে যেন তাহার চলিবার পথ করিয়া লইয়াছে—সকলেই তাহাকে ভালবাসে, সেও না বাসিয়া পারে না, অথচ ভালবাসার কোন অর্থই যেন তাহার কাছে নাই। সে অত্যন্ত সহজ হইয়াও যেন অবোধ্য, অত্যন্ত সরল হইলেও তাহাকে বুঝিবার কোন পথই যেন সে খোলা রাখে নাই। যেমন সহজ ভাবেই সে আসিয়া পড়ে তেমনি সহজ গতিতেই সে বাহির হইয়া যায়। ইহা লইয়া যে প্রশ্ন উঠিতে পারে, মানুষের মনে যে ইহারই জন্য নানা দ্বন্দ্ব দেখা যাইতে পারে তাহা যেন সে জানেও না, ইহাকে কাছে ডাকিয়া যত্ন করিবারও উপায় নাই, যাও বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিবারও কোন পথ আছে বলিয়া মনে হয় না। অলকা কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, তাহাকে অনুসরণ করিবার শক্তিও তাহার ছিল না, ধীরে ধীরে সে আবার বসিয়া পড়িল।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জগদীশ বলিল, প্রতুলবাবু গেলেন কোথায়! হঠাৎ হ'লই বা কি তাঁর? মাথার গোলমাল নেই ত' কিছু!

ম্লান হাসি হাসিয়া সতীশ বলিল, না ওর মাথা আমাদের চেয়েও পরিষ্কার। গেল যে কোথায় তা জানি না, কিন্তু আজ যে আর আসবে না সে ঠিক—হয়ত আসবে না ও অনেক দিন। ঠিক এমনি ক'রেই আর একবার ও গিয়েছিল, কিন্তু ফিরেছিল তিন মাস পর। যেমন সহজ ভাবে ও যায় তেমনি সহজ ভাবে কোন দিনই ফেরে না ও।

জগদীশ বলিল, এ ত' বুঝলুম, কিন্তু আমাদের যাওয়াও কি তাই বলে থেমে থাকবে নাকি? প্রস্তুত হ'য়ে নিন বৌদি, একটু আগেই বেরোনো উচিত কি বল সতীশ, কবিকে আবার ধরা চাই ত'।

সতীশ মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল, তা নিশ্চয়, প্রতুলের আসা-যাওয়ার সঙ্গে তাল রাখবার চেষ্টা ক'রে কোন লাভই নেই। তুমি প্রস্তুত হ'য়ে নাও অলকা।

অলকা উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আজ আর যাওয়া হবে না আমার, আপনারা যান আপনাদের কবিকে নিয়ে। সে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না, সমস্ত প্রশ্ন ও কথাকে জোর করিয়া থামাইয়া দিয়া সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

সে বাহির হইয়া গেলেও সতীশ একটা কথা বলিতে পারিল না শুধু সম্মুখের দিকে অন্যমনস্কের মত চাহিয়া রহিল। চক্ষের সম্মুখে কিছুই তাহার ভাসিয়া আসিল না, কিছু আসিবে বলিয়াও মনে হইল না। তাহার মুখের দিকে জগদীশ কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলে, কি যেন একটু ভাবিল। কপালে তাহার এতটুকু কুঞ্চনও দেখা গেল না, যেন ইহা সে জানিত কোন কিছুই তাহার অজ্ঞাতে ঘটিয়া যায় নাই। সতীশের অন্যমনস্কতাও যেন তাহার কাছে জল বাতাসের মতই সহজ—অঙ্ক কসিয়া সে যেন আরও অনেক কিছুই অতি সহজে বলিয়া দিতে পারে। ঠোঁটের কোণে একটু বক্র হাসি হাসিয়া সে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলে সতীশ?

অন্যমনস্কের মতই সতীশ বলিল, হুঁ।

ধীরে ধীরে হাত নাড়িয়া জগদীশ বলিল, তবু ভাল যে বুঝিবার শক্তি তোমার হ'য়েছে। কিন্তু আমি বলি কি জান একটু শক্ত হও। যা তুমি পেয়েছ তা' তুমি ছাড়বে কেন বলত'। কেন অপরকে দেবে তার ভাগ! আমি হ'লে কিন্তু—থাক, যাওয়া তাহলে আজ আর হ'লই না?

অকস্মাৎ সতীশ যেন ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিল, সমস্ত শরীর একবার যেন তাহার কাঁপিয়া উঠিল—ক্রোধে অথব অপমানে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। জগদীশের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁত দিয়া একবার ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল যাওয়া হবে নাই বা কেন? আমি একা মানুষ, কোন কিছুতেই আমার আসে যায় না। চল, আজ যেতেই হবে।

জগদীশের অনেকখানি উৎসাহই কমিয়া গিয়াছিল তথাপি সে অস্বীকার করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনেক রাত্রে থিয়েটার দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াই সতীশ বিছানায় তাহার ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিল। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, হয়ত' কেহই জাগিয়া নাই, বৃদ্ধ রামহরি হয়ত' এই শীতে নিজের ঘরে বসিয়াই তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে নিজের অজ্ঞাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আর তাহারই পাশের ঘরে ওই যে মেয়েটি থাকে সে কি কিছুই টের পায় নাই? সে কি ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে অবজ্ঞা করিতেছে না? কিন্তু কেনই বা সে তাহার জন্য বসিয়া থাকিবে, কেনই বা সে তাহার জন্য তাহার স্নেহ মমতার এক কণাও খরচ করিতে আসিবে! সে ত' তাহার কেহই নয়—শুধু আশ্রয়প্রার্থী হিসাবেই সে আসিয়াছে তাহার সম্মুখে, তাহার বদলে প্রতিদান দিতে ত' সে আসে নাই, কোন দিন দিবেও না হয়ত'। একটা গভীর নিশ্বাস তাহার অলস ক্লান্ত দেহকে মুহূর্ত্তের জন্য সচেতন করিয়া দিল। তাহার কেহ নাই, অলকা তাহার নয়, তাহার জন্য ভাবিবার কথাও তাহার নহে। কখন কেমন করিয়া যে সে ধীরে ধীরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল তাহা

জানিতেও পারিল না। আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর কাহার ডাকে সে সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিল। কে যেন তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। চক্ষু চাহিয়া সে অলকাকে চিনিতে পারিল। কিন্তু এ মূর্ত্তি সে আর কখনও দেখে নাই, সুন্দর আলুলায়িত কেশদাম তাহাকে বেষ্টন করিয়া মোহময় করিয়া তুলিয়াছে, অমন সুন্দর চক্ষু সে যেন আর দেখে নাই—বিশ্বের মায়া-মমতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই তাহাকে তখন মনে হইতেছিল। সে অবাক বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ক্ষণিকের জন্যও এ সৌন্দর্য্য সে যেন দৃষ্টির অগোচর রাখিতে চায় না। তাহাকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া অলকা লজ্জিত হইয়া পড়িল। বুকে কিসের যেন আঘাত পড়িতে লাগিল, নিজের অজ্ঞাতেই মুখ চোখ তাহার লাল হইয়া উঠিয়া তাহাকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিল। সমস্ত পৃথিবীতে তখন আর কেহ জাগিয়া নাই, জাগিয়া রহিয়াছে শুধু দুইটি যুবক যুবতী, অতি নিকটে থাকিয়াও তাহারা পরস্পরের কেহই নয়—সুন্দর হইয়াও তাহারা সুন্দরের পূজারী হইতে পারে না।

কোনও রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অলকা বলিল, উঠুন, খাবার এনেছি আপনার—দেরী করলে জুড়িয়ে যাবে সব।

সতীশের মোহ তখনও কাটে নাই, আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া সে বলিল, গরম খাবার তুমি এ সময় পেলে কোথায় অলকা?

অলকা কোন কথা বলিল না, সুন্দর এক টুকরো হাসি তাহার আরও সুন্দর মুখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল।

অকস্মাৎ সতীশ যেন পাগল হইয়া উঠিল, আর থাকিতে না পারিয়া অলকার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে কাছে আনিতে চাহিল। অলকার চোখে-মুখে একসঙ্গেই অনেক কিছু ফুটিয়া উঠিল। তাহার চক্ষে যে ভয় যে বিষাদের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল তাহা যেন সতীশকে সবলে আঘাত করিল। অলকার হাত ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া ছাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে দাঁড়াইয়া সে স্তব্ধ হইয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একি করিল সে? এতটুকু সংযমও তাহার নাই, একথা রূঢ় সত্যের মত তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। এমন নিস্তব্ধ রজনীতে অনাত্মীয় যুবতীকে সম্মুখে পাইলেই কি অমনি করিয়া নিজের সমস্ত সম্মান পদতলে দলিত পিষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়? যে তাহারই অসুখে সেবা করিয়া রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটাইয়া দিয়াছে, যে তাহারই আহারের জন্য অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিতে এতটুকু ইতস্ততও করে নাই, তাহাকে এমনি করিয়া অপমান করিবার সাহস তাহার হইল কি করিয়া? কেমন করিয়া সে আবার উহারই নিকটে যাইবে, কেমন করিয়া সে তাহাকে তেমনি করিয়া সম্বোধন করিবে? ও ঠিকই বুঝিয়াছিল, তাই বহুদিন পূর্ব্বেই তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল—কিন্তু তাহার নিজের স্পর্দ্ধার যেন সীমা নাই, সব কিছু অতিক্রম করিয়া নিজেকে বিরাট বলিয়া মনে হইলে মানুষের এমনি পতনই হইয়া থাকে। আর কোন কিছুই সে ভাবিতে পারিল না, রেলিঙে মাথা রাখিয়া সে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। কতক্ষণ অমনি করিয়া সে পড়িয়াছিল তাহা সে জানে না, অকস্মাৎ আবার যেন কাহার ডাকে তাহার চমক ভাঙিল। চক্ষু না তুলিয়াও এবার সে বুঝিতে পারিল, কে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আস্তে আস্তে অলকা বলিল, এমনি করেই যদি আপনি সারা রাত কাটিয়ে দিতে চান ত আমারও ত শুতে যাওয়া হবে না। অনেক কষ্ট করেই ওগুলো ভেজে এনেছি, গরম থাকতে থাকতেই বাকী কষ্টটা আপনাকে করতে হবে।

একবার চক্ষু তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়াই চক্ষু নামাইয়া সতীশ বলিল, তুমি কি অলকা, তুমি কি মানুষ নও! এরই মধ্যে আমায় ক্ষমা করলে কি করে? আজ আমার—।

ম্লান হাসি হাসিয়া অলকা বলিল, আমি মানুষ বলেই ত ক্ষমার প্রশ্ন ওঠেনি সতীশবাবু। আমি যদি রক্তে মাংসে গড়া মানুষ না হতাম ত অনেক প্রশ্নই উঠতে পারত আর আপনিও ত মানুষ—দেবতা হ'য়ে ত আর জন্মান নি, আর সে সাধও বোধ হয় আপনার নেই।

সতীশ বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, এতক্ষণের সমস্ত লজ্জাই যেন কেমন করিয়া সে সযত্নে মুছিয়া লইয়াছে, আর এতটুকু দ্বিধাও তাহার নাই, এতটুকু চিন্তাও না।

তেমনি হাসি হাসিয়াই অলকা বলিল, অবাক্ হবার কিছু নেই এতে। মামা বলতেন, মানুষ কখনও দেবতা হয় না অলকা, চারটে পা আছে বলেই যেমন সে-সব জীবদের আমরা জন্তু বলে মনে করি, তেমনি দোষ আর গুণ আছে বলেই না আমরা মানুষ। ওই দোষ আর গুণ না মিশলে মানুষ সৃষ্টি হয় না—তাই ত নিবারণদার কাছেও কোন ভয় আমার ছিল না। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমার মস্ত বড় বিপদে মানুষের মহান গুণ নিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন বলেই যেমন আপনাকে আমি দেবতা বানিয়ে বসব না, ঠিক তেমনি আপনার কোন ত্রুটি আমার চোখে পড়েছে বলেই আমার কাছে আপনি কিছু পশু হয়ে যাবেন না। কিন্তু আর দেরী করবেন না আসুন, আমার এত্ত্বগুণ ঘুম পাবে।

সতীশ কিছুই বলিতে পারিল না, হয়ত কোন কিছুই সে বুঝিতে পারিতেছিল না। ধীরে ধীরে সে অলকাকে অনুসরণ করিল।

আজ যেন অলকার যত্ন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার আহার শেষ হইলে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া মশারি ফেলিয়া ভাল করিয়া সে চারিদিক গুঁজিয়া দিল। এক গ্লাস জল ভরিয়া টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিয়া সমস্ত উচ্ছিষ্ট তুলিয়া লইয়া মুহূর্ত্তের জন্য একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে খাটের দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর আলো নিভাইয়া দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশ)

কেইপ টাউন

(ভ্রমণ কাহিনী)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

(৩)

মিঃ কেশব বলেছেন রোজই তাঁর ঘরে দ্বিপ্রহরে একটার সময় খানার খেতে। ঘরটা হতে বের হয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি [illegible]লো তখন সাড়ে বারটা। তাড়াতাড়ি করে আঁধারে আ[illegible]গৃহে চললাম। বেশী দূর যেতে হল না। দরজায় ঠিক [illegible] টোকা দিতেই এক লম্বা ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক হাসি[illegible] আমাকে অভ্যর্থনা করলেন এবং আমিও তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম, বন্দেমাতরম বলে। বন্দেমাতরম শব্দটা যেন তাঁর ভাল লাগল না। আমারও তাঁর কালো শিখাধারী টুপিটা ভাল লাগছিল না। উভয়ে ঘরের ভিতর গিয়ে বসলাম। সঙ্গের যুবক এক পাশে বসল। তারপর সামান্য দু'একটা কথা বলার পরই আমি বললাম, "এখন খেতে যেতে হবে, অন্য সময় আসলে হবে না?" এই ভদ্রলোকেরও নাম বলব না, তাঁকে আমরা রাম বলেই এখন থেকে বলব। ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় গিয়ে খাব? আমি বললাম যাব মিঃ কেশব-এর ঘরে। মিঃ রাম হেসে বললেন, এই ছোঁড়া বড়ই হিন্দুদ্রোহী। আমি বললাম, তা ঠিক নয়, তবে জাতবিচার চায় না মাত্র। হিন্দুর মাঝে জাতের পত্তনের পর কি সর্ব্বনাশ হয়েছে তা ত আপনি ভাল করেই অবগত আছেন। যদি তাই না হত, তবে আজ আপনার মাথায় কাফের টুপি দেখা যেত না, কি বলেন মিঃ রাম। মিঃ রাম হেসে বললেন, তা সত্য কথা, এখন খেতে যান।

মিঃ কেশব আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যেতে বসার পরই জিজ্ঞাসা করলেন গিয়েছিলাম কোথায়। সকলের শেষে যখন বললাম, মিঃ রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন তিনি কেঁপে উঠলেন। বললেন, লোকটা কেইপ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজ করছে অনেক দিন হয়। শুধু তাই নয়, মুসলমান হয়েও নামাজ পড়ে না, কোন মুসলিম কাজে যায় না, শুধু কথায় কথায় বিস্মিল্লা আর ইন্‌সা আল্লা বলে, এ যে কাফের। আমি বললাম, কাফের অছুত হতে ভাল। ঐ ত পেটেলরা আপনার ঘরে এতদূরে এসেও চা খায় না; কিন্তু রামের ঘরে সকলে খায় এবং সেও সকলের ঘরেই খায়। তবে আপনি বলতে চান রাম কংগ্রেসের কোন ধার ধারে না। কেন ধারবে বলুন ত? এই ত এরই মাঝে কত কথা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শুনেছি। দেখান ত একটা লোক কংগ্রেসের হয়ে এক পয়সা খরচ করেছে, কিম্বা ইমিগ্রেসন আপিসের বিরুদ্ধে কিছু করেছে? মিঃ কেশব গুজরাতী ধরণে চুপ করলেন। গুজরাতী, সে হিন্দু হউক আর মুসলিম হউক রাগ গায়ে হাত দিয়ে কোন কথা বললেই চুপ করে যায়। বিদেশের গুজরাতী বাঙালীর ভক্ত। শরৎচন্দ্রের এমন বোধ হয় কোন বই নাই, যা আফ্রিকাতে না পাওয়া যায়। আর অন্যান্য বই ত আছেই। তবে বাঙলা ভাষায় নয়, গুজরাতী ভাষায়।

খানার সমাপ্ত পরে ঘরে এসে একটু বিশ্রাম করলাম। তারপর সেই [illegible] এক পেটেল এসে বললো, এখানে একটু হুঁসিয়ার হয়ে চলবেন, কাছের বাড়ীটা ভাল নয়। পেটেলকে বললাম, তা আমাকে আর বুঝাতে হবে না। কাজ না করে খাওয়াটা হ'ল ধনী লোকের ধর্ম্ম! এই ধর্ম্মের মাঝে কত আপদ রয়েছে, তা ঐ ঘরের লোক এখনও কি আপনাকে বলে দেয় নাই? বম্বের ছোট ছোট গলি দেখলে কি আপনার সে জ্ঞান হয় না? হবে না ভায়া, হবে না। যাক এখনি আমি মিঃ রামের সঙ্গে দেখা করতে যেতেছি, বোধ হয় আপত্তি আছে? আপত্তি বড় কিছু নয়, তবে লোকটা ভাল নয় বলেই আমরা জানতাম। তারপর সে হ'ল মুসলমান আর আপনি হিন্দু এবং হিন্দু সভার পক্ষপাতী কি-না, তাই ভাল দেখায় না, এই বলতে চাই। আমি বললাম, হিন্দুসভা আর যে সভাই হউক না কেন, আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কারো কাছে বিক্রয় করি নাই, একথা হিন্দুসভার মাতব্বরদেরে বলে দিবেন। এই বলেই বের হয়ে পড়লাম।

তখন বেলা হবে আড়াইটা। যথায় যেতেছি তার পথ ভুল হয়ে গেছে বলেই মনে হল। টেনেন্ট ষ্ট্রীটে এসে ফের ঘুরলাম এবং আঁধারে আলো গৃহের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজার সামনে একটি ছোকরা। তার গাল দুটা ফুলা এবং আনারের মত লাল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল "You are Mr. Ramnath?" আমি বললাম, হাঁ আমারই নাম রামনাথ। যুবক আমার মুখের দিকে বেশ কতক্ষণ তাকাল তারপর বললো, এখানে এখন কেউ নাই, চলুন আমার ঘরে। তার ঘর অনেক দূরে পাহাড়ের গায়। উঠতে উঠতে আমার মুখ দিয়ে শ্বাস পড়ছিল। সে যত কথা জিজ্ঞাসা করছিল, তার উত্তর হাঁ, হুঁ, বলেই কাটিয়ে দিলাম, তারপর তার ঘরে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আমাকে বসতে দিল বটে; কিন্তু তার ঘরে পৌঁছিবার পরই তার মন যেন বিগড়ে গেল। বুয়ার ভাষায় আমাকে গালি দিতে লাগল। কোথায় একটু আদর যত্ন করবে তা না করে, গালি। আমার কি জানি এক বাৎসল্য ভাবের উদয় হল, ছুরিটা হাতে নিয়েও রেখে দিলাম। কিন্তু যুবক তা বুঝতে পারল। আমাকে বললো, "শুধু গালি দিতে এখানে আনি নাই, বেশী রাগ হলে মারতেও পারি। যে ছুরির বড়াই করছেন, এই নেন একটা আমিও দিতেছি, দুটা ছুরি দুহাতে নিয়ে আক্রমণ করুন, দেখবেন আপনি কেমন ইণ্ডিয়ান, আর আমি কেমন ইণ্ডিয়ান? আমি ভাবছিলাম যুবক কালার্ড-ম্যান হবে।

তার ছুরিটা একদিকে কাটে মাত্র, আমারটা কাটে দুদিকে। তবে ধার বেশ, লম্বাও দেড় ফুট হবে। তার ছুরিটা দিয়ে নখ কাটতে কাটতে বললাম, এখন বল আমাকে কেন নিয়ে এসেছ?

নিয়ে এসেছি আর কিছুর জন্য নয়, তোমরা হিন্দুরা সন্তান জন্মাতে পার, কিন্তু তোমাদের কি যে ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম মতে সন্তান পালন করতে পার না কেন তারই সর্ব্বপ্রথম জবাব দাও।

জবাব আর কি দিব? হিন্দু যদি এই ছেলে নিয়ে দেশে যায় এবং লোকে টের পায় ঐ ছেলের জন্ম অন্য জাতের মেয়ের গর্ভে হয়েছে তবে তাকে জাত থেকে তাড়িয়ে দেয়, সমাজচ্যুত

করে। হিন্দু যেমন আপনাকে পর করতে পারে এই পৃথিবীতে এমন আর কেউ করতে পারে না। যুবককে কিছুই বললাম না এসব কথা, শুধু কাছে টেনে এনে বসালাম। মুখের সিগারেটটা তার টেনে ফেলে দিয়ে বললাম, "You should not smoke now" যুবকের মাথা নত হয়ে আসল, দুঃখ হলো, চোখ দিয়ে জল বের হলো, তারপর যুবক আমার হলো। আমি তাকে বললাম, হিন্দুর ছেলে কাঁদে না, কেঁদো না, প্রতিকার কর। যুবক বললো, কি প্রতিকার করব বল। শরীর মন সব ঢেলে দিয়েছি কালার্ডম্যানদের জন্য। যুবক বললো "যে যুবতী তাকে ভালবাসে, গুপ্ত বিবাহ হয়েছে, তাকে সে বলেছে, বিবাহ ত' হলো; কিন্তু এই বিবাহের ছেলে-মেয়ে হবে "দেশের উন্নতি" "কালার্ডম্যানদের উন্নতি"তে অর্পিত। বিলাসের সামগ্রীমাত্র হবে না। যুবতী মেনে নিয়েছে যুবকের কথা। এখন তারা কর্ম্মী। গল্পে পাঠ করেছি এরূপ কথা। শরৎচন্দ্র এই কথাটা নানাভাবে বলেছেন; আজ তার প্রত্যক্ষ দর্শন হলো। আমি যদিও নিরক্ষর পর্যটক, তবুও আমার শান্তি এসব দেখেই।

যুবক চা বানাল। আমরা চা খেতেছিলাম। এমন সময় লাল শিখাধারী তুর্কিটুপি মাথায় দিয়ে মিঃ রাম এসে বললেন, হাঁ তবে এখনও বেঁচে আছেন? হাঁ বাঁচব না? আপনাকে ত এখনও ঐ যুবক খুন করে নাই, তবে আমাকে কেন করবে? মিঃ রাম বললেন, তিনি মুসলমান, যদি ঐ ছেলে মুসলমানের মতো হবে কোন বালাই ছিল না, তাঁরই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতেন; কিন্তু এছেলে হিন্দু, তার প্রতি কোন আক্রোশ নাই, আক্রোশ তার হিন্দুদের প্রতি—তারপর বাঙালী হিন্দুর প্রতি আর কারোর উপর নয়, এর বাবা বানার্জ্জি ছিলেন, জাহাজে কাজ করতেন। জাহাজ হতে পালিয়ে শহরে আসেন, তারপর এর যখন জন্ম হয়, তখন আবার পালিয়ে যান। এর মা মনের দুঃখে মরেছেন, আর একে পালন করেছে মিশনারী, তাই এর নাম খৃষ্টান ধরণের; আপনি বাঙালী হিন্দু বলেই, আপনার উপর তার আক্রোশ। আমি যুবককে অভয় দিয়ে বললাম, যখন আমি কলকাতা যাব, তখন তোমাকে আমি নিয়ে যাব। বানার্জ্জি নাম ছেড়ে দিয়ে, বিশ্বাস হবে, রাজি আছ? যুবক বললো, সে কলকাতা দেখতে চায়, ভারতে আসতে চায়।

মিঃ রাম এবং এই দুইজনাকে নিয়ে চললাম, আমার "আঁধারে আলো" গৃহে। তথায় এসে দেখি অনেকগুলি যুবক যুবতী একত্রিত হয়েছে। আমাদের দেখেই সকলে চুপ করল। একজন প্রৌঢ় বয়সের লোক যিনি নিজেকে হটেনটট বলে মানেন, তিনিই আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমার পরিচয় যথারীতি দিবার পর, ভারতের কথা উঠল। এই ভারত যেন তাদের কিছু উপকার করতে পারবে এই হলো তাদের ধারণা। আমি ভারত সম্বন্ধে নানা কথা শুনলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের সমাচার কি? মিঃ হটেনটট বললেন, সমাচার আর কি হতে পারে! যেমন হয়ে থাকে গোলামদের মাঝে তেমনি হয়েছে, এর বেশী নয়। হটেনটট নিজেই বললেন কালার্ডম্যানদের মাঝে বর্ত্তমানে তিন শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণী হলো, নিজেদের তারা ইউরোপীয়ান বলে পরিচয় দেয়; কিন্তু ইউরোপীয়ানগণ তাহা গ্রাহ্য করে না। তাদেরে বিকৃত শব্দে বলা হয় "Side Liner"। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হলো তাদের উটের মত চুল নাই, তবে রংটা এখনও বাদামী, এরাই হলো মধ্যম শ্রেণীর লোক। আর তৃতীয় শ্রেণী হলো অর্দ্ধ এবং অর্দ্ধ। শাদা অর্দ্ধেক আর কালো অর্দ্ধেক। একে অন্যকে ভাল দৃষ্টিতে দেখে না সত্য কথা, কিন্তু স্কোলীবায়দের মাঝে সে প্রভেদ নাই। স্কোলীবায়রা কোন ধর্ম্মেরও ধার ধারে না। তারা বলে অন্তুতের আবার প্রার্থনা কি? মনের মাঝে যখন দুঃখ হয়, তখন মাতৃভাষায় যে কথা মুখ হতে বের হয়, ভগবানের দিকে তাই হলো প্রার্থনা।

মিঃ হটেনটট বললেন, এখন আমাদের প্রভেদ ভুলতে হবে, সে জনাই স্কোলীবায়দের সর্দ্দার আমি হয়েছি। স্কোলীবায় না করতে পারে এমন কাজ নাই। এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা গণ্ডগোল শুনা গেল। শুধু আমি এবং মিঃ হটেনটট বাইরে এলাম। দেখলাম এক অপূর্ব্ব কাণ্ড। একটা স্কোলীবায়কে একটা পুলিশ উরুতে গুলী করেছে এবং আর একটাকে পাকড়াও করেছে। মিঃ হটেনটট চট করে ঘরে গেলেন এবং চোখের ইসারা করা মাত্রই পঙ্গপালের মত একটা পুলিশকে স্কোলীবায়রা ঘিরে ফেলে বেশ করে মারল, তারপর অন্য পুলিশ আসবার পূর্ব্বেই কে কোথায় চলে গেল, তাই দেখবার মত জিনিস। হেনোভার ষ্ট্রীটের এবং টেনেণ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়টা গোমূর্খ আর পুলিশটা পড়ে আছে একদিকে। পল্টনী পুলিশ আসার সঙ্গে সঙ্গেই বোকা দেখান মত যুবকগুলি কেউ কল হতে জল এনে সারজেণ্টের মুখে, কেউ জুতা খুলে মাসাজ করা কেউ বুকে মাসাজ করা আরম্ভ করেদিল। যেন তারা কিছুই জানে না, পথের লোক মাত্র। তারপর দেখিয়ে দেওয়া হল ওদিকে বদমাসরা পালিয়েছে। পুলিশ তত বোকা নয়, আমাদের দেশের পুলিশের মত, শুধু সারজেণ্ট এবং আহত স্কোলীবায়টাকে এম্বুলেন্সে তুলিয়ে দিয়েই চলে গেল।

আমি এবং মিঃ হটেনটট তাঁর ঘরে এসে মিঃ রামের সঙ্গে বসে চা খেতে লাগলাম। মিঃ হটেনটট বললেন, এরূপ করে আর চলবে না। বান্টুদের হাতে আনতে হবে, তাদেরে শিক্ষা দিতে হবে, তারপর দেখব। আমি বললাম, ইণ্ডিয়ানদের আনবেন না? মিঃ হটেনটট বললেন, ইণ্ডিয়ান এসেছে এদেশে টাকা রোজগার করতে এর বেশী নয়। দেখছেন না ওদের ক'টা দল? আমি বললাম, ক'টা দল বলুন ত? মিঃ রাম বলতে লাগলেন—কানামিয়ারা হলো সকল হতে সংখ্যায় বেশী। কানামিয়া মানে সুরাতের সুন্নি মুসলিম। তারপর হলো সংখ্যায় বেশী চর্ম্মকার। এর পরেই পাঠান। এই তিন শ্রেণী ছেড়ে দিলে বাকী থাকে বাঙালী মুসলিম, পেটেল, ব্রাহ্মণ, বানিয়া এবং হিন্দু। এখানে হিন্দু মানে মাদ্রাজী খৃষ্টান এবং হিন্দু। কারো সঙ্গে কারো মিল নাই। সুরাতী হিন্দুরা মাদ্রাজী হিন্দুদের হিন্দু বলতে রাজি নয়। কানামিয়া পাঠানদের মসজিদে যায় না। ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ

গণ্ডগোল লেগেই আছে। আমার কাছে এই সমাচার আশ্চর্য্য বলেই মনে হলো।

মিঃ হটেনটট হতে আমি বিদায় নিতে চেয়েছিলাম অনেক পূর্ব্বেই, কারণ আমাকে অনেক কিছু দেখতে হবে। মিঃ হটেনটট বললেন, দয়া করে একবার "White poors"দের সঙ্গে কথা বলে, তাদের আচার পদ্ধতি দেখে আমাদের জানাবেন তারা গরীব কেন? আমি মিঃ হটেনটটকে বললাম, নিশ্চয়ই দেখব তারা গরীব হয়েছে কেন? কিন্তু তারা হলো শাদা গরীব, তাদের অভিযোগ আমাকে বলবে কেন? আমি কে তাদের? তবুও দেখতে হবে শাদা গরীবদের। কিন্তু তারা আমার সঙ্গে কথা বলবে কি?

কেপটাউনের যেদিকে পাহাড়টা হঠাৎ নীচু হয়ে এসে হঠাৎ সাগরে মিলেছে, সেই যে ভূমিখণ্ড তারই উচ্চতম স্থানে শাদা গরীবদের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার নিজের খরচে ঘর তৈরী করেছেন। সেই ঘরগুলিতে জলের পাইপ, বাথ-রুম, Modern Sanitation, বিজলী বাতি সবই আছে। অথচ তার ভাড়া সপ্তাহে সাড়ে বার হতে পনর শিলিং। খুব সস্তা বলতেই হবে। কারণ ঐ শ্বেতকায় গরীবরা যখন কাজ পায় তখন তারা সপ্তাহে দশ পাউণ্ড-এর কম কেউ পায় না। সেই কাজ যদি Colouredman, ইণ্ডিয়ান কিম্বা নেটিভ করে তবে তারা পায় দুই পাউণ্ড দশ শিলিং মাত্র। যথায় এক পেয়ালা চায়ের দাম তিন পেনি অর্থাৎ তিন আনা, তথায় আড়াই পাউণ্ড সপ্তাহে। তাতে কি হয় একটা লোকের!

শাদা গরীবদের দেখে আমার মন একটুও খারাপ হলো না, বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকায়। তার কারণ হলো শাদা যতক্ষণ দরিদ্র থাকে, ততক্ষণই তাদের কদ্‌র থাকে। যেই হাতে পাউণ্ড আসে অমনি, ইণ্ডিয়ানদের "কুলি" বলতে থাকে, নিগ্রোদের "কাফের" বলতে থাকে এবং কালোদেরে মাথার উপর চড়ে পাকামি নেয়। তবে এদের দরিদ্রতার কারণ খুঁজে দেখা চাই। এই পল্লীতে বেশ ঘুরেছি তাদের।

ইংরেজ এবং শাদা ধনীরা যেমন শহরে কারবার করে, তেমনি গ্রামেও কারবার চালায়। এই ধনী সম্প্রদায় চাষীদের দাদন দেয় এমনভাবে, যে সমস্ত না চাষীর ঘর হতে আরম্ভ করে জমিটুকু পর্যন্ত মহাজনের আওতায় আসে। যেই দেখল ধনী আর বাকী দিলে তার লোকসান হবে, অমনি দাদনের টাকা হতে আরম্ভ করে খাজে জিনিসের দাম পর্যন্ত কসে নিয়ে আদালতে হাজির হয়। বিচারক ধনীর টাকার ডিক্রী দিয়েই সমুদায় সম্পত্তিটা নিলামে ওঠান। এদিকে চাষী ঘর ছেড়ে শহরে আসে কাজের জন্য, সে ভুলে যায় তার সুবর্ণ কুটীরের কথা। সে আসে শহরে সরকারী সাহায্যের উপর বাস করতে। ইংলেণ্ডে প্রত্যেক বেকার মজুরদের সতের শিলিং, স্ত্রী থাকলে আরও দশ শিলিং এবং ছেলেপিলে থাকলে প্রত্যেকের জন্য আরও তিন শিলিং সপ্তাহে মজুর পরিবারকে দেওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রত্যেক শাদা বেকার মজুরকে সপ্তাহে চার পাউণ্ড করে দেওয়া হয়। এতে দরিদ্রভাবে শাদা গরীব পল্লীতে এদের দিন কেটে যায়। এই সংবাদটা ঠিক কি মিথ্যা তাই ঠিক করবার জন্য চললাম শাদা পল্লীতে। শাদা পল্লীর কাছ দিয়ে একটা বড় পথ চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।

সেই পথটা ধরেই চলতে লাগলাম। পথের দু'দিকে সাজানো বাগান। নানারূপ পুষ্প বৃক্ষে নানারূপ ফুল ফুটে রয়েছে। ছেলেরা তারই পাশে খেলছে। ছেলেদের পরা প্যাণ্ট এবং সার্ট ছিন্ন, মুখ দেখলেই মনে হয়, ওদের খাওয়া ভাল করে হয় নাই, অথবা তাদের যতটুকু যত্ন নেওয়া দরকার ততটুকু নেওয়া হতেছে না। কিন্তু তা হলেও সিংহের বাচ্চা সিংহই হয়। আমার তাদের বার বার পাশ কাটানোর জন্য একটা সাত বৎসরের ছেলে আমাকে বললো "তুই চলে যা নিগার" অবশ্য কথাটা বলেছিল ডাচ ভাষায়। আমি ছেলেটিকে বললাম "তুমি ইংরেজী বলতে জান?" ছেলেটি বললে ইংরেজীতে "Not English"। সাত বৎসরের ছেলে আমাকে দেখে একটুও ভয় পায় নাই, অথচ ঐ ছেলেই যখন অন্য কোন ছেলেকে দেখে, তার জাতভাই আসছে তাকে মারতে, কোন অন্যায়ের জন্য, তখন সে পালিয়ে যায়। অনেকক্ষণ ছেলেটার কাছে দাঁড়ালাম তারপর চলে আস্‌লাম ভাবতে ভাবতে ঐ ছেলে কেন আমাকে মানুষ বলেও গণ্য করে নাই!

মাথা নত করে পথে চলছি নীচের দিকে, কারণ যেতে হবে কোন ইণ্ডিয়ানের বাড়ীতে। মাথা নত করে চল্‌ছি, ডান-বাঁ কোনদিকে লক্ষ্য নাই। পেছন থেকে আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে মিঃ পালসেনীয়া বল্‌লেন, "রামনাথ কোথায় গিয়ে-ছিলেন, এত চিন্তা করে লাভ নাই। আমাদের হিন্দুদের দ্বারা যা হয়, তার কসুর করব না, চলে যান সিনেমা দেখ্‌তে, এই নেন আড়াই শিলিং।" মিঃ পালসেনীয়া ভাবছিলেন, হয়ত আমি টাকার জন্য ভাব্‌ছি, কিন্তু তা নয়। তাকে কিছুই বল্‌লাম না—কিসের জন্য ভাবছি। আড়াই শিলিং তাঁর কাছ হতে নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে চল্‌লাম, মিঃ রামের বাড়ীতে, মুসলমানের ঘরে, যাকে ছোটবেলা হতে ঘৃণা করতে শিখেছি।

হেনোভার ষ্ট্রীটে লোকে লোকারণ্য। সকলেই আজ মাইনে পেয়েছে। টেনেন্ট ষ্ট্রীটটার মোড়ে মোড়ে মদের দোকান। দোকানগুলি দু'ভাগে বিভক্ত। একদিকে ইউরোপীয়ান আর একদিকে নান্‌-ইউরোপীয়ান। ইউরো-পীয়ান-দিকে লেখা রয়েছে only for Europeans; আর অন্যদিকে লেখা রয়েছে, only for non-Europeans; সেদিকেই গেলাম। দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করে দেখি লোকে সে গৃহ ভর্ত্তি। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরটা অন্ধকার হয়েছে। আমি প্রবেশ করা মাত্র একজন লোক বল্‌ছে, হয়ত ঐ লোকটা দক্ষিণ আমেরিকা হতে এসেছে। কাউকে কিছু বল্‌লাম না। ছয় পেনি খরচ করে এক গ্লাস বিয়ার কিনে একটা চেয়ারে গিয়ে বস্‌লাম, গ্লাসটা রাখলাম টেবিলের উপর। কিন্তু টেবিলের উপর যা দেখ্‌লাম, তাতে বমি হবার মত উপক্রম হল। একদিকে কখানা হাড় পড়ে আছে, একদিকে ভারতীয় "পাকুড়ী" পড়ে আছে, তারপর একটা

(শেষাংশ ৫২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবনের জয়যাত্রা

(গল্প)

শ্রীসুকুমার দত্ত

প্রতিদিনকার রুটিন অনুযায়ী সন্ধ্যার পর নদীর পারে হাওয়া খাইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম, পথে সিনেমা হলের সম্মুখে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই পুরাতন সহপাঠী মাণিকের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। পিছন হইতে কাঁধের উপর প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়া সে বলিয়া উঠিল, "হ্যালো, অনিমেষ যে! ইউনিভারসিটি থেকে একটা হোমরা চোমরা হয়ে বেরুলে পর আমাদের মত হতভাগাদের কথা তোর মনেই থাক্‌বে না, সে আমি আগেই জান্‌তুম। তারপর, খবর সব ভাল তো?"

তিন তিনবার আই-এ ফেল উপাধিধারী মাণিক রাইটার্স বিল্ডিংএ ভাল কাজ করে এ খবরটা আগেই জানা ছিল এবং তাহার কুশল প্রশ্নটি যে আমারই বেকার জীবনের প্রতি কটাক্ষ মাত্র—পলিটিক্সের ছাত্র হইয়া এই সহজ কথাটা বুঝিয়া উঠিতে বিশেষ বুদ্ধির প্রয়োজন হইল না। মাণিক-কেও দোষ দেওয়া যায় না—বরাবর লাষ্ট বেঞ্চে বসিয়া যে ছেলে নেহাৎ ভাগ্য বলে হঠাৎ আঙুল ফুলিয়া কলা গাছ হইয়া বসিয়াছে তাহার মুখে এরূপ প্রশ্ন আর বিস্ময়ের কি? বরং বিস্ময় আছে আমার মধ্যে আগাগোড়া ফার্ষ্ট বেঞ্চে বসিয়া আই-সি-এস, বি-সি-এস প্রভৃতি প্রতিশ্রুতিশেখর বুলি আওড়াইতে আওড়াইতে নামের পিছনে অধুনা বহুশ্রুত ঐ গ্র্যাজুয়েট শব্দটা জুড়িয়া দিয়া শেষটায় কিনা পাদুকার তলদেশ ক্ষয় করিয়া বসিলাম!

যাক্ সে সব আক্ষেপের কথা। আপাতত মাণিকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। বলিলাম, "বাবা দু'এক পয়সা রেখে গিয়েছিলেন—সেই শেষ সম্বলটুকু ভেঙেচুরেই দিন কাটাচ্ছি, এখন তুইই বিবেচনা করে দ্যাখ্, খবর ভাল কি মন্দ!"

মামুলী ধরণের সহানুভূতি প্রকাশ করিতে যাইয়া মাণিক আমার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "চাক্‌রী পেলে ও সব ঠিক হয়ে যাবে—আমি তো ভগবানের কাছে দিনরাত এই প্রার্থনাই করছি। ও হয়ে যাবে একদিন—ঘাবড়াও মাৎ। এই আমার কেস্‌টাই দ্যাখ্ না কেন—তিন বারেও যখন আই এ পাশ করতে পারলুম না বাবা ধৈর্য্য হারিয়ে বললেন, ওরে হতভাগা, অত বড় একটা ঢোলের মত মাথায় গোবর ছাড়া ভগবান আর কিছুই কি রাখেন নি! আবার চাক্‌রী যখন পেলুম তখন তিনিই আবার সবাইকে ডেকে বল্‌তে সুরু করলেন—লেখাপড়ায় খারাপ হলে হবে কি, ফন্দিবাজ-চালাকীতে মাণিক আমার এম-এ পাশ ছেলেকে পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে আন্‌তে পারে! জগৎটাই এম্‌নি বুঝ্‌লি?"

অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলাম, শেষটায় মাণিকের কাছেও পরামর্শ লইতে হইল! আজও মনে আছে, হাই ইস্কুলের সেকেন্ড মাষ্টার মাণিককে 'বুদ্ধির জাহাজ' বলিয়া সার্টিফাই করিতেন!

আবার সে বলিয়া চলিল, ঠোঁটে কৃত্রিমতার মৃদু হাসি, "সত্যি বল্‌ছি, তোর মত একটা জিনিয়সের মূল্য এই বাঙলা দেশটা বুঝলো না—স্বাধীন দেশে জন্মালে তোর মূল্য হত লাখ্ টাকা!"

বাধা দিয়া কহিলাম, "দার্শনিকতা রেখে দে, ঐ শোন্ বিদ্যাপতির একটা গান।"..........লাউড স্পীকারের আনুকূল্যে স্বাভাবিক গানটি কৃত্রিমতার চতুর্গুণ আওয়াজে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল,—

"সখি কে বলে পীরিতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিলাম
কাঁদিয়া জনম গেল।"

ভাববিহ্বল চিত্তে দুজনেই গানটি আগাগোড়া শুনিলাম—মাণিক বলিয়া উঠিল, "সিম্পলি মারভেলাস! কি বলিস?"

সেন্টিমেণ্টটা উভয়েরই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল—বলি-লাম, "স্কাইলার্ক-এর গান শোনার বেলায় শেলির কবি চিত্তে কতখানি ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল ঠিক পরিমাপ করতে না পার্‌লেও এ ক্ষেত্রে যে আমার মধ্যেও ইমোশন তার চেয়ে কম ছিল না একথা বাজী রেখে বল্‌তে পারি!"

মাণিক আমায় বাহবা দিয়া কহিল, "ব্রাভো! কথায় কথায় শেলি, কিট্‌স, বাইরন বাপ্‌রে ......।"

তারপর মাণিক আমাকে সম্মুখের এক রেস্তোঁরায় লইয়া গেল এবং দস্তুর মত প্রমাণ করিয়া ছাড়িল যে মাণিক আর ছেলেবেলার সেই ক্ষুদে মাণিক নাই, এখন সে রীতিমত দু'এক পয়সা খরচ করিতে দিলদরিয়া! রাত্র আট্‌টার সময় মাণিককে গুড্ বাই জানাইয়া চপ্ কাটলেটের অন্ত্যেষ্টি ঘটিত ঢেকুর তুলিতে তুলিতে গৃহে ফিরিলাম........।

বাড়ী ফিরিয়া দেখি, শোবার ঘরটি ইতিমধ্যে সমগ্র পরিচ্ছন্নতায় এক নতুন কলেবর লাভ করিয়াছে; বিছানার উপর দুই ছড়া গাঁদা ফুলের মালা প্রেমিক-প্রেমিকার সুকুমার স্পর্শ হইতে বঞ্চিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। স্ত্রী রাণীর মুখে আনন্দ আর ধরেনা—ঘটা করিয়া সে নানা রকম সব রান্না করিতেছে। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এসব কি হচ্ছে—দিনে দিনে সখ যে তোমার কেবলি বেড়ে যাচ্ছে!"

রাণী মাছের ঝোলের কড়াটা মিটসেফের মধ্যে রাখিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, "বলতো আজকে কিসের এত ঘটা?"

কোন হেতুই খুঁজিয়া পাইলাম না—বাগ্রকণ্ঠে কহিলাম, "সত্যি বল, কিসের জন্য? মাছ ভাজা, মাছের ঝোল, চপ্, কপির ডালনা—ওঃ, আমার যে আর দেরী সইছে না!"

রাণী হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কি হ্যাংলা রে বাবা!"

কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলাম, "হ্যাংলা না হলে যে রাণুর মত সোনার প্রতিমা জুটতো না—জুটতো নেহাৎ একটা কালো খাঁদা।"

—"যাও"।

চৌকাঠের ওপর পা দিয়া কহিলাম, "যো হুকুম, যাই তবে......।"

—"আঃ, শোন, সত্যিই তোমায় যেতে বল্‌লুম নাকি?"

বলিলাম, "তবে আর যেয়ে কাজ নেই।"

আমার হাতে একটা চপ্‌ তুলিয়া দিয়া রাণী কহিল, "মনে আছে, আজকে ২৫শে মাঘ—আমাদের মিলন তিথি?"

চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, "তাই বল। গতবার ঠিক এমন রাতেই তো বলেছিলে—দেবতা আমার, আমি তব চরণ আশ্রিতা, পরশিনু এই চিরআকাঙ্ক্ষিত চরণ দুটি......।"

রাণী এবার রাগিয়া কহিল, "হুঃ, চরণাশ্রিতা দাসী না আরও কিছু। নিজেই বরং ভগবানকে অসংখ্য কোটি প্রণিপাত জানিয়ে বলেছিলে—ওহে দয়াময়, আজি যে রতন মোরে দিলে উপহার......,"

অসমাপ্ত কথাটি আমিই মিলাইয়া দিলাম, "ত্রিভুবনে তাহা দুটি পাওয়া ভার!"

দুজনেই এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। চপ্‌ মুখে দিয়া স্বাভাবিককণ্ঠে বলিলাম, "পাঁচটা টাকা দাও তো, তোমার জন্য একখানা শাড়ী আর কিছু স্নো টেু নিয়ে আসি।"

সুটকেশ খুলিয়া আমার হাতে পাঁচ টাকার একখানা নোট দিয়া রাণী কহিল, "আমার জন্য তোমার পছন্দসই যা আনবার এন—আর তোমার জন্য একখানা ধুতি নিয়ে এস, তা না হলে কিন্তু আমি শাড়ী পরব না। আর আমার জন্য লিপ-ষ্টীক্‌ আনতে ভুল না। ফেরার পথে সেলুন থেকে হয়ে এস—ও-বাড়ীর ললিতাদি প্রায়ই বলে, ভরা-গালে কলম-কাটা জুল্‌ফিতে তোমায় মানায় বেশ!"

রসিকতা করিয়া বলিলাম, "শীগ্‌গির 'রাম রাম' বলে তুলসীপাতা এনে দাও আমার মাথায়।"

রাণী তর্জ্জনী তুলিয়া কহিল, "যাও—কি যে ছাই-ভস্ম বল!"

বলিলাম, "তাহলে আমার অবস্থা শোচনীয় হোক ডাইনীর নজর লেগে।"

রাণী কহিল, "কচি খোকা কিনা, ডাইনীর ভয়!......ভাল কথা, একখানা সাবান নিয়ে এস—গায়ে মাথা সাবান।"

—"বাবুগিরি কত—সাবান, লিপষ্টিক। শেষে হয়ত একদিন বাড়ী ফিরে তোমায় আর রাণু বলে চিনতেই পারবো না। এই বলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম......।

মনের সাধে আকণ্ঠ ভোজন করিয়া উভয়েই শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। রাণীর মুখে আনন্দ উপ্‌ছাইয়া পড়িতেছে। তাহার পরণে সদ্যক্রীত গোলাপী রঙের শাড়ী—ফর্সা রঙে দুধে-আল্‌তায় মত মানাইয়াছে! কানে কদম ফুলের মত বড় বড় দুটি ঝুম্‌কা—চটুল দেহের সাবলীল সঞ্চালনে কর্ণের আভরণ চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে!

সিন্দুরের কৌটাটা আমার হাতে দিয়া রাণী আব্দার ধরিয়া বসিল, "হ্যাঁগা, আমায় সিন্দুর পরিয়ে দাও না—সিঁথির উপর দিয়ে সোজাসুজি খুব লম্বা করে যেমনে?

অগত্যা তাহাই করিলাম।

মালা হাতে করিয়া রাণী প্রথমটায় আমাকে হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করিল, পরে আস্তে আস্তে মালাছড়া আমার গলায় পরাইয়া দিল। একটু অবাক হইলাম—মুখরা রাণীর এমন শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি আর তো কোনদিন দেখি নাই! সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন তাহার লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে!

মালা-বদল পর্ব্ব শেষ করিয়া রাণীকে কাছে বসাইয়া বলিলাম, "রাণু, গান্ধর্ব্ব মতটা ভারী সুন্দর না?"

রাণী গম্ভীরভাবে বলিল, "হুঁ"।

রাণীর এই আকস্মিক গাম্ভীর্য্যে একটু বিস্মিত হইলাম—তাহার কোমল বাঁ হাতখানি আমার হাতের মধ্যে লইয়া বলিলাম, "রাণু, তুমি যেন কি ভাবছ!"

রাণী বলিল, "কি ভাবছি বলতো?"

বলিলাম, "ভাবছ এই—আমার এখানে এসে শুধু দুঃখই পাচ্ছ, অন্য কারও হাতে পড়লে হয়ত এর চেয়ে......।"

কথাটা শেষ করিতে পারিলাম না, রাণী ইতিমধ্যেই ক্ষুব্ধ অভিমানে আমার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিল। কেন যেন একটু ব্যথা পাইলাম, তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলাম, "ছিঃ রাণু, কেঁদে ফেল্‌লে? দ্যাখ তো, তোমার কান্নাটা আমাদের মিলন-তিথিকে কি রকম বেসুরো করে দিচ্ছে! আরে সত্যিই আমি ওকথা বল্‌লেুম নাকি? আচ্ছা, এবার আমি ঠিক করে বল্‌ছি, তুমি ভাবছ—প্রথম প্রথম তোমায় আমি কত আদর করতুম, এক মিনিটও চোখের আড় হতে দিতুম না। এখন আর ততটা আদর করি না—কথায় কথায় তোমাকে শুধু বকি, এই না?"

রাণীর ক্রন্দনবেগ এবার আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অনেক সান্ত্বনার পর রাণী অশ্রুসিক্তকণ্ঠে কথা কহিল, "আমার মাথা ছুঁয়ে আছ—বল, আর কোনদিন আমায় মিছিমিছি কড়া কথা বলবে না, এখন থেকে আগের মত ভালবাসবে......।" এই বলিয়া রাণী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাণীকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "রাণু, অনাদর তোমায় আমি কোনদিন করিনি—যেটুকু করেছি সেটুকুর জন্য দায়ী—দুঃসহ বেকার জীবন! লক্ষ্মীটি, আর কেঁদ না—দেখ্‌ছ না কি সুন্দর রাত্রিটি একেবারে মাটি হয়ে যাচ্ছে! হারমোনিয়ামটা এনে তোমার সেই প্রিয় গানটা একবার শোনাও লক্ষ্মীটি।"

দুই বছর পরের কাহিনী।

মাঘ মাসের শীতের রাত্রি। সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ক্লান্তিতে চোখের পাতা ক্রমশই বুজিয়া আসিতেছিল—পাশের বাড়ীতে গ্রামোফোন বাজিয়া উঠিতেই কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া গেল। রেকর্ড চলিতেছিল, "সখি কে বলে পীরিতি ভাল।"... আমার সেই অতিপ্রিয় গানটি। গ্রামোফোন বাজনাদারদের রসবোধকে কিছুতেই প্রশংসা করিতে পারিলাম না, কেন না এই অতি পুরাতন গানটা শোনা মাত্রই সারা মনটা বিরক্তিতে ছাইয়া গেল। মনে হইল, গানটার রস এবং মাধুর্য্য সমস্তই যেন কালের প্রবাহে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে—বাকী আছে শুধু

(শেষাংশ ৫৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

লীগ-কংগ্রেস আপোষ

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

আবার লীগ-কংগ্রেসের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তির কথা উঠিয়াছে। কিছুদিন হইতে দৈনিক 'কৃষক' এ বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। এবং কংগ্রেস নেতাদেরকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহারা যেন লীগের সহিত একটা আপোষ করিয়া ফেলেন এবং তারপর সম্মিলিত শক্তি লইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করুন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য মিঃ আসফআলি কংগ্রেস নেতাদের নিকট এই মর্ম্মে তার করিয়াছেন যে, তাঁহারা যে প্রকারেই হউক, লীগের সহিত মিটমাট করিয়া একটি সর্ব্বদল-সম্মিলনী গঠন করেন। এই-ভাবে আরও অনেকে লীগ-কংগ্রেসের মধ্যে একটা আপোষ-রফা করিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আপোষ-রফা জিনিষটা মন্দ নয়। ঝগড়া-বিবাদের পরিবর্ত্তে মিলিয়া মিশিয়া থাকাটাই সব সময় শ্রেয়। কিন্তু যে কোন সর্ত্তে আপোষ ও যে কোন প্রকার ত্যাগ করিয়া মিতালি পাতাইবার প্রবৃত্তিটা সব সময় ভাল নয়। ইহা আত্মহত্যার নামান্তর। বিশেষত, যখন দুই দলের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য থাকে, তখন আপোষ-নিষ্পত্তির সম্ভাবনা খুব কম। কংগ্রেস লীগের পার্থক্যকে আমরা সেইরূপ মৌলিক আদর্শগত পার্থক্য বলিয়া মনে করি। এই আদর্শের বিভিন্নতা যতদিন থাকিবে, ততদিন উহাদের মধ্যে সত্যিকারের আপোষ-নিষ্পত্তি হইতে পারে না। আজ যদি সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে গোঁজামিল দিয়া কোন প্রকার আপোষ-রফা হয়, তবে কাল তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং পরদিন উহাদের মধ্যে আবার অহি-নকুলের মত সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে।

যাঁহারা লীগ কংগ্রেসের মধ্যে আপোষ চান, তাঁহাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। এইরূপ আপোষের কি প্রয়োজনীয়তা আছে? আঠার বৎসর পূর্ব্বে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে অসহযোগিতার প্রশ্ন লইয়া যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, আজিও বিরোধের সেই কারণ অক্ষুন্ন ও অব্যাহত আছে। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কংগ্রেস লীগকে বাদ দিয়া, শুধু বাদ দিয়া নয়, লীগের সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করিয়া জাতীয় সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। কংগ্রেসের সম্মুখে বহু পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে বহু ত্যাগ ও বহু লাঞ্ছনা করিতে হইয়াছে—সরকার পক্ষের বহু নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। এই ভীষণ পরীক্ষার সময় সে যদি লীগকে বাদ দিয়া সংগ্রাম করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, তবে আজ কি এমন কারণ ঘটিল, যাহার জন্য লীগের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হাত বাড়াইতে হইবে। সেদিন মান-অভিমানের বিষয় লইয়া লীগ-কংগ্রেসের বিরোধ বাধে নাই,—সে বিরোধের কারণ ছিল, আদর্শগত। সেই আদর্শগত পার্থক্য আজিও বিদ্যমান থাকিতে লীগ-কংগ্রেসে আপোষ কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? সেইজন্য এই প্রকার আপোষকে আমরা স্নেহের চক্ষে দেখি না।

অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় লীগ-কংগ্রেসের বিরোধের একটা কারণ ছিল রাজনৈতিক সংগ্রামের কার্য্যক্রম লইয়া। কংগ্রেস চাহিয়াছিল সংগ্রাম করিতে, আর লীগ চাহিয়াছিল সহযোগ ও মিতালি করিতে। তারপর আসিল গোলটেবিল বৈঠক। সেই সময় বিটিশ সরকার লীগ নেতাদিগকে আপনাদের স্বপক্ষে করিয়া লইলেন। তাহারা জাতীয় দাবী অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক দাবীকেই সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া মনে করিলেন। সুতরাং লীগ কংগ্রেসের মিতালির পথ আরও দুর্গম হইয়া উঠিল। বাঁটোয়ারা সেই বিরোধকে আরও ঘনীভূত করিয়া দিল। কংগ্রেস মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে 'না গ্রহণ, না বর্জ্জন' নীতি গ্রহণ করিল। কিন্তু ইহাতে লীগ সন্তুষ্ট হইল না। লীগ নেতারা দৃঢ়ভাবে বাঁটোয়ারাকে সমর্থন করিতে লাগিলেন। বাঁটোয়ারা বিরোধীদিগকে মুসলমানের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বিরোধের কারণ আরও ঘনীভূত হইল। কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিল, তখন লীগ-কংগ্রেসে আপোষের পথ আরও সংকীর্ণ হইয়া উঠিল। এই সময় বহু লোকের অনুরোধ-উপরোধের প্রভাবে এত সব বাধা থাকিতেও আবার লীগ-কংগ্রেসের মধ্যে আপোষের কথা উঠিল। এই জন্য মহাত্মা গান্ধী ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের সহিত মিষ্টার জিন্নার আলাপ-আলোচনা হইতে লাগিল। ইহার ফলাফল দেশবাসী বিশেষভাবে অবগত আছেন। এই আলোচনার কালে মিষ্টার জিন্না দাবী করিয়া বসিলেন যে, (১) কংগ্রেসকে স্বীকার করিতে হইবে যে, মুসলিম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিষ্ঠান; (২) কংগ্রেসকে প্রকারান্তরে ঘোষণা করিতে হইবে যে, কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান। এইভাবে লীগ নেতা মিষ্টার জিন্না কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসরের সাধনার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। কংগ্রেস নেতারা ইহাতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং আপোষের কথা ভাঙ্গিয়া গেল। ব্যাপার আরও কিছুদূর অগ্রসর হইল। অতঃপর মুসলিম লীগ ধুয়া ধরিল, সম্মিলিত ভারতের কথা কল্পনা করা যাইতে পারে না। সমগ্র ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করিতে হইবে। এক অংশের নাম হইবে হিন্দু-ভারত ও অপর অংশের নাম হইবে মুসলিম-ভারত। লীগ নেতারা আরও ঘোষণা করিলেন যে, ভারতে গণতন্ত্র অচল। এখানে এক সম্প্রদায় সকল সময় অন্য সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করিবে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করাই হইল ভারতের নিরাপত্তার একমাত্র উপায়। কিন্তু কংগ্রেস, মুসলিম লীগের এই নীতি কোনও দিনই স্বীকার করিতে পারিবে না। যাঁহারা লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে আপোষের কথা উত্থাপন করেন, তাঁহারা উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত এই সব মূলীভূত পার্থক্য ও বিভিন্নতার দিকটা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। বর্ত্তমানে উহাদের মধ্যে যোজনব্যাপী ব্যবধান রহিয়াছে, একে অপরের নিকট আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত, উহাদের মধ্যে কোনরূপ আপোষ হইতে পারে না।

তবুও যখন আপোষের কথা উঠিয়াছে, তখন দু'একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বহু পূর্ব্বে মুসলমানের জন্য চাকরী-সমস্যা, আইন-সভায় সদস্য সমস্যা এবং ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির নিরাপত্তার সমস্যা—এই ত্রিবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম লীগ গঠিত হইয়াছিল। আমরা বিশ্বাস করি, এই সব বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ রফা হইবার পথ বন্ধ হয় নাই। এবং উহা আপোষ দ্বারা নির্দ্ধারিত হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমানেও কেবলমাত্র ঐ তিনটি বিষয়েই আপোষ

হইতে পারে। মুসলিম লীগের অন্যান্য অদ্ভুত ও জাতীয়তা বিরোধী দাবী সম্বন্ধে কোনও কথা চলিতে পারে না। লীগ নেতারা যদি সেগুলির উপর জোর দেন, তবে আপোষের আশা চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। ভারতকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বণ্টন করিবার কল্পনা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র মুসলিম প্রতিষ্ঠান গঠনের দাবী, পৃথক নির্ব্বাচনের দাবী, বিশ্ব মুসলিম বা প্যান-ইসলামের স্বপ্ন, স্বতন্ত্র মুসলিম স্বার্থের দাবী,—এই সব জাতীয়তা বিরোধ দাবী, মুসলিম লীগকে সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তারপর লীগ-কংগ্রেসের মধ্যে আপোষ আলোচনার কথা উঠিতে পারে। কিন্তু লীগ নেতাদের ভাবগতিক দেখিয়া ত মনে হয় না যে, তাঁহারা ইহাতে স্বীকৃত হইবেন; লীগ যদি বর্ত্তমান নীতিতে দাঁড়াইয়া থাকে, তবে তাহার সহিত আপোষ করিতে যাওয়া কংগ্রেসের পক্ষে আত্মহত্যাকর কার্য্য হইবে। এরূপ করিতে গেলে লীগের গুরুত্বকে অনাবশ্যকভাবে বাড়াইয়া দেওয়া হইবে মাত্র। আমাদের বিশ্বাস, কংগ্রেস যদি সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা চিন্তা করিতে ভুলিয়া যায়, তবে তাহাতেই দেশের অধিকতর মঙ্গল হইবে। সাম্প্রদায়িকতাকে অস্বীকার করা এবং সাম্প্রদায়িক নেতাদের প্রতি উদাসীন ভাব প্রদর্শন করাই হইল, সাম্প্রদায়িকতা দূর করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। সব সময় জাতীয়তার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, কালক্রমে সমস্ত গণ্ডগোল মিটিয়া যাইবে। উপস্থিত কংগ্রেসের সম্মুখে এমন কোন সংকট আসিয়া পড়ে নাই, যাহার জন্য লীগ নেতাদের নিকট ধরা দিতে হইবে। লীগ অচিরেই তাহার লোকপ্রিয়তা হারাইবে, মুসলমান একদিন তাহার ভ্রম বুঝিবে। আর লীগের সহিত আপোষ করিতে গেলে উহার গুরুত্ব আরও বাড়িয়া যাইবে। সেইজন্য আমরা কংগ্রেস নেতাদের অনুরোধ করি, লীগের সহিত আপোষ করিবার কোন দরকার নাই। অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত আদর্শের উপর দাঁড়াইয়া থাকিলে, শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসেরই জয় হইবে।

কেপটাউন

(৩২২ পৃষ্ঠার পর)

লোক ক্রমাগতই টেবিলের এক পাশ হতে থুথু ফেলছে। থুথু, বাইরে কোথাও কেউ ফেললে পাঁচ পাউণ্ড জরিমানা দিয়া থাকে, কিন্তু এ মদের দোকান, দোকানী সবই সহ্য করে যেতেছে, আর পয়সা মারছে।

আমার বিয়ারের গ্লাস যেমন করে রেখেছিলাম তেমনি পড়ে আছে দেখে একজন বল্‌লো "Finis." আমি বল্লাম, I no "finis" I "finis" by and by, লোকটা আর কথা বল্‌ল না। আমি শুনতে লাগলাম এরা কোন্ ভাষায় কথা বলে, কি কথা বলে। কারণ মদের দোকানের কথা বড়ই সাদাসিধে, এতে মিথ্যা নাই। যদিও মদ খারাপ, কিন্তু যখন সেই অখাদ্য মদ পেটে যায়, তখন মিথ্যাকে তাড়িয়ে দিয়ে সত্যের নূতন সংসার করে তুলে। তবে মদও পর্য্যন্ত হয় রাষ্ট্রনৈতিক সত্য বলাতে, আর পর্য্যটকদেরে সত্য বলাতে। তবে আমি ঐ শ্রেণীর পর্য্যটক নই। আমার রাষ্ট্র নাই, আমি দাস, আমি মিথ্যা কথা কার জন্যে, কার কাছে বলব, আর যদিও বা বলি, তবে কোন লাভ নাই, লোকসানই বেশী। অতএব আমার কথা ছেড়ে দিয়ে যদি স্বাধীন দেশের পর্য্যটকের কথা বলি, তবে কথাটা শোভা পাবে বেশ ভাল করে।

বিয়ারের গ্লাসটা যেমন ছিল, তেমনি রেখে দিয়ে হঠাৎ ঘর হতে বের হয়ে পড়লাম। কারণ এখানে আমার মনের মত লোকের দেখা পাই নাই, যার সঙ্গে কথা বলে একটু শান্তি পেতে পারি। গ্লাসটা একদম অস্পর্শিত অবস্থায় রেখে যেতেছি দেখে একটা লোক বেশ ভাল ইংরেজীতে বল্‌লেন, মহাশয় ঐ গ্লাসটা যে একদম রেখে গেলেন। আমি বল্‌লাম, এতে অন্যের থুথু পড়েছে, তাই থাকুল, যদি আপনার ইচ্ছা হয়—বলেই চলে আস্‌লাম।

ইউরোপে অনেক মদের দোকানে, কাফেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছি, কিন্তু তথায় মাতাল বল্‌ত হিটলার ভাল লোক, অবশ্য জার্ম্মেনীতে, অন্যত্র অন্য কথা বল্‌ত। কিন্তু এখানকার মদের দোকানে কালার্ডদের সঙ্গে মিশে দেখেছি, তারা বলে শুধু মেয়েমানুষের কথা এবং অন্য বাজে কথা। যার যেদিকে মতি, সেই মানসিক ভাব ফুটে উঠে মদের দোকানে। ঐ যে ছেলেটা আমাকে গালি দিয়েছিল, তার একমাত্র কারণ হ'ল এদেশের কালো লোক বর্ণশঙ্কর এবং ইণ্ডিয়ান শুধু বেঁচে থাকতে চায়, তাতে সম্মান থাক আর না থাক। বেঁচে থাকাই যাদের উদ্দেশ্য, তারা নিশ্চয়ই ছেলেরও গালি খাবে, লাথি খাবে, পথে মরবে, তবুও বেঁচে থাকবে। কিন্তু বুয়র ছেলে তা নয়, সে জন্মেছে কালো লোকের উপর রাজত্ব করতে, তাতে যে বাধা দিবে, তাকেই সে মারবে, সেই মারার জন্য যদি নিজেকে মরতে হয়, তবুও সে রাজি, কিন্তু কালো লোকের উপর রাজত্ব করা হ'ল তার জন্মগত অধিকার।

মদের দোকানে দোকানে ঘুরে মনটা একটু পাতলা হয়েছিল, এদিকে সিনেমা আরম্ভ হয় আটটার সময়, সেই সময়ও অনেকটা কেটে গেছে, তাই রাত্রের খাওয়া খেয়ে নিয়ে পথে বের হলাম, পথের মানুষ, দেখতে পথের মাঝে কি হতে পারে।

ক্রন্দসী

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্ত)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

(১৪)

আজ সকালে শশাঙ্কর চিঠি আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি লিখিয়াছে। পথের বর্ণনা কিছু কিছু আছে, মানসিক উৎকণ্ঠা এবং করুণতার আভাস আছে। পরে আরও বড় চিঠি দিবে। নূতন দেশে নূতন জীবনের পারিপার্শ্বিককে স্থির হইয়া বসিতে কিছু সময় লাগিবে। চিঠি পাইয়া ইভার মনটা আজ খুব ভাল ছিল তাই তাহার মা যখন আসিয়া বলিলেন, 'আজ সারাদিন কোথাও যাস নাই, একা ঘরে বসে আছিস। অমু জেদ ধরেছে আজ না কি ভাল ছবি আছে, তা সিনেমায় যাবি ত যা না। সুবোধ যাবে তোদের সঙ্গে।'—তখন সে সহজেই রাজী হইয়া গেল।

অমু ওরফে অমিয়া ইভার খুড়তুতো বোন। এলাহাবাদে মা বাপের সঙ্গে থাকে। এখনও বিবাহ হয় নাই এবং সেই চেষ্টাতেই তাহার পিতা মাতা কিছুকালের জন্য কলিকাতায় আসিয়া বাসা করিয়া আছেন।

ইভাদের বাড়ীর কাছেই বাড়ী লইয়াছেন। ইভার মা মনে করিতেছিলেন, স্বামী দীর্ঘদিনের জন্য প্রবাসে গেছে এ সময়ে ইভার মন বিষণ্ণ হইয়া থাকাই স্বাভাবিক। সমবয়সী সখীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া না হয় সিনেমা দেখিয়া সময়টা কাটাইলে কিছু মনোভার কমিতে পারে।

অমিয়া একেবারে সাজিয়া-গুজিয়া তৈরী হইয়া আসিয়াছিল। ইভাকে তাড়া দিয়া একেবারে ব্যস্ত করিয়া তুলিল, 'ওকি ভাই ইভাদি, তুমি যে বড় এখন কাপড় ছাড় নাই। ওকি এই কাপড়েই যাবে না কি? বুড়ীর মত এই সাদা কাপড়ে?

তাহার চঞ্চলতা দেখিয়া ইভা হাসিল। তৈয়ারী হইয়া লইয়া তাহারা যখন সিনেমায় পৌঁছিল, তখন ন'টার শো আরম্ভ হইতে আর বড় দেরী নাই। ছবিটা নূতন এবং ভাল বলিয়া নাম বাহির হইয়াছে। তাই ভীড়েরও আর যেন অন্ত নাই। টিকিট করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। সকলের চেয়ে নীচু ফোর্থ ক্লাশের টিকিটের উমেদারই বেশী। তাহারা মরিয়া হইয়া টিকিট ঘরের সামনে ঠেলাঠেলি করিতেছে। সেই জনসংঘাতের দিকে চাহিয়া ইভা ভাবিতেছিল; ইহারা অনেকেই হয়ত সামান্য অবস্থার লোক। সারাদিন জীবন-ধারণের জন্য একটানা ক্লান্তিকর খাটুনির পর সস্তায় ঘণ্টা দুই একটু রোমাণ্টিক আবহাওয়ায় কাটাইতে আসিয়াছে। সমস্ত দিনের ভিতর এইটুকুই হয়ত তাহাদের জীবনের আনন্দ, নূতনত্বের খোরাক। সুবোধ বহুকষ্টে ভীড় ঠেলিয়া টিকিট করিয়া লইয়া আসিল।

ঘণ্টাখানেক পরে, তখন রাত হয়ত দশটা সাড়ে দশটা হইবে। অভিনয় অর্দ্ধেকটা হইয়া গিয়াছে, ইন্টারভেলের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অমিয়া নিম্নস্বরে নানাপ্রকার সমালোচনা জুড়িয়াছে। এইমাত্র ছবির যে অংশটুকু হইয়া গেল তাহার মধ্যে কে কি রকম অভিনয় করিল, কাহারটা কেমন এবং কতটুকু স্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা হইতে সুরু করিয়া সমাগত মহিলাদের ব্লাউজের ছাঁট কাহার কোনরূপে ধরণের ইত্যাকার সমস্ত রকম আলোচনাই ছিল তাহার ভিতর। হঠাৎ অমিয়া ইভার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল, 'ঐ দেখ রেবাদি বসে রয়েছে। ঐ যে নীল কাপড় পরা ফর্সা মত একটি মেয়ে, ঠিক তার পাশেই।'
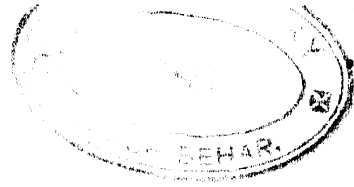
ইভা চাহিয়া দেখিল, রেবাই বটে। একজন ছিপ্‌ছিপে সুশ্রী তরুণ একটা ট্রের উপর চায়ের পেয়ালা লইয়া রেবার সম্মুখে আসিল। তাহার ভাবভঙ্গী অতিশয় সুকোমল। রেবা পেয়ালাটা তুলিয়া লওয়ায় সে যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। কৃতার্থ হওয়ার চেয়েও বেশি। অমিয়া আবার ফস্‌ফিস্‌ করিয়া কহিল, 'ঐ ছেলেটি কে জান ইভাদি? বজ্র মুভিটোনের 'চাঁদের আলোর দেশ' ছবিখানা দেখনি? তাতে রেবাদি সেজেছিল নায়িকা, প্রতিমা। আর ঐ ছেলেটি সেজেছিল নায়ক দীপঙ্কর। রেবাদি আজকাল আবার নাচতেও শিখছে। এবার একটা নতুন ছবিতে ওর না কি নাচের পার্ট আছে।'

আর কথা বলিবার অবসর মিলিল না। ইন্টারভেলের সময় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। আবার ছবি সুরু হইল। ছবির পর্দ্দায় পর্দ্দায় এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য গল্প রসতরলতায় অতিমাত্রায় সিক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ইভা অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল। এই ত বিবাহের কিছুদিন আগে অমিয়ার মত সে-ও উৎসাহ করিয়া কত নূতন টকি দেখিতে আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছে, কখনও হাসিয়াছে, কখনও সমস্ত মন ভরিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছে। অথচ আজ এ সমস্তই যেন ছেলেখেলার মত বোধ হইতেছে। এত অল্পদিনে তাহার মনের এমন পরিবর্ত্তন হইল কেমন করিয়া সেই কথাটা অনুসন্ধান করিতে গিয়া বুঝিতে পারিল, দেশের যাহা প্রাণ, যাহা দেশের আসল পরিচয় সেই পাড়াগাঁয়ে সে নিবিড়রূপে ঘনিষ্ঠ হইয়া এই যে এতদিন ছিল ইহাই তাহাকে আসল নকলের তফাৎ বুঝাইতে শিখাইয়াছে। এ বোধ যে কত গভীর আজ সে কথা সে যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিল এমন কোনদিন পারে নাই। তাহারই চোখের সামনে ঐ যে অগণিত দর্শকবৃন্দ ছবিটা যেন গিলিতেছে তাহারা যে সেই সত্যের মণিকোঠায়—যেখানে দেশের সত্যকার দুঃখ, সত্যকার সমস্যা অনির্ব্বাণ বেদনার দাহে জ্বলিতেছে সেখানে একদিনের জন্যও প্রবেশ করে নাই। এমন একটা অসম্ভব গল্প তাই কি তাহাদের কাছে একটুও হাস্যকর মনে হয় না?

তখন ছবিতে হইতেছিল একজন আর্টিষ্ট ছবি আঁকিতে যাইয়া মডেলের সহিত প্রেমে পড়িয়াছে। মান-অভিমান-ঈর্ষা সমেত প্রণয়-কাহিনীর তরঙ্গাঘাত চলিতেছে। কিন্তু নারীর ছলনাময়ী রূপের পরিচয় পাইয়া আর্টিষ্ট তাহার সামাজিক অভ্যস্তজীবন ছাড়িয়া দিয়া এক গভীর জঙ্গলে উদাসী হইয়া চলিয়া গেল। তাহার পরের ঘটনা আরও অস্বাভাবিক এবং আরও নাটকীয়। কিন্তু গানের সুরে সুরে প্রেক্ষাগৃহ সঙ্গীত ঝঙ্কৃত এবং দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ। মনে হয় এ ছবি এখন মাসের পর মাস সুগৌরবে চলিবে। ইহারই পাশাপাশি আর একটা

ছবি ইভার মনের পর্দ্দায় ফুটিয়া উঠিতেছিল: তাহার শ্বশুর বাড়ীর গাঁয়ে রায়েদের সেই মেয়েটা, ন'বছরের মেয়ে সর্ব্বদাই কোলে একটা না একটা ছেলে আছে। মায়ের বছর বছর সন্তান হয় বিশেষ করিয়া সন্তান সম্ভাবনার সময় যে ছেলেটা একেবারে কোলে থাকে তাহার সমস্ত দুর্গতি মোচনের ভার ঐ ন'বছরের মেয়েটার উপর। মাথায় তাহার চুলে তেল নাই, জামায় বোতাম নাই এইটুকু মেয়ে জগতের আনন্দে শিক্ষায় তাহার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। যে কয়দিন পিতৃগৃহে থাকে এমনই করিয়া ছেলে বহিবে, তারপর কোন এক অপরিজ্ঞাত গৃহস্থালীতে যাইয়া ভর্ত্তি হইবে। সেখানেও হাঁড়ি ঠেলিবে, ছেলে প্রসব করিবে, পাড়ামন্দ পরচর্চ্চা করিবে।

এ সব কাহিনীর করুণতা কেহ কি হৃদয় দিয়া অনুভব করিবে না কোনদিন? দেশের লোকের মনে তুলিবে না প্রতিধ্বনি? যে সমস্যা দেশের নয়, যে অতি তরল অবাস্তব ভাববিলাস আকাশকুসুমের মত মিথ্যা তাহাই সবার চিত্ত জুড়িয়া থাকিবে!

ছবি কখন শেষ হইয়া গেল। অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া ইভা তেমন মনোযোগ করিয়া দেখে নাই। সেজন্য অমিয়ার কাছে তাহাকে দস্তুর মত অপদস্থ হইতে হইল। রাস্তায় আসিতে আসিতে অমিয়া মুখে বিগলিত কণ্ঠে কহিতেছিল: "আচ্ছা ইভাদি সেই জায়গাটা তোমার কেমন লাগল বল; যেখানে রঞ্জত রঞ্জনকে ক্ষমা করে বলছে: 'আমার ভিতরের ছোট আমিটা হিংস্র ক্ষুধায় তোমাকে আক্রমণ করে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায় কিন্তু একে পার হয়েও একটা বড় আমি আছে। সে তোমাকে শান্তচিত্তে ক্ষমা করলে। ত্যাগের গৌরবে আপন অধিকার ছেড়ে দিলে। উঃ সেখানটা শুনতে শুনতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। মার্ভেলাস্!

সুবোধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল: 'আজ দেখছি সারারাত্রি অমিয়ার ঘুম হবে না। কিন্তু আর যাই হোক, বিমল তরফদার পোজ্‌গুলো দেয় ভাল তবে বড্ড একঘেয়ে হয়ে আসছে ক্রমে। সেই আস্তে আস্তে কথা বলা, সেই চোখের উপর একটু আড়ভাবে হাত রাখা—নাঃ নতুনত্ব আনতে পারছে না মোটেই।' অমিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল, 'তুমি শুধু পোজ্‌ দেখছ, কিন্তু যাই বল লোকটার জিনিয়াস আছে। আর কি সংযম!

এমনই করিয়া ছবির সমালোচনা করিতে করিতে তাহারা যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন রাত অনেক। ঠিক হইল এত রাত্রিতে আর নিজেদের বাড়ী না যাইয়া অমিয়া রাত্রিটার মত এখানেই থাকিবে। সকালে উঠিয়া নিজেদের বাড়ী যাইবে। (ক্রমশ)

বাণী-দীপালী

শ্রীপুলিনবিহারী গুপ্ত

তোমার ভাষা বুঝতে পারে এমন ধারা জ্ঞান
আছে কার এই দেশে?
ভেসে বেড়াও বাহির পথে বনে বনান্তরে
দেখুক সবাই এসে।

বৈশাখেরি প্রলয়-ডাকা ভীষণ ঝড়ে ঝড়ে,
হাসে পাগল এই ধরণী এপাশ ওপাশ নড়ে,
সিন্ধু যখন জল ছেড়ে দেয়—মুক্তি সে চায় ওরে,
বাহির হলেম পথে!
ইচ্ছে ছিল অভিসারে গভীর অন্ধকারে
ছুটবো প্রবল রথে।

বক্ষে তোমার মহোৎসবের [illegible] করতালি,
মন্দিরে আজ পূজারী নেই শূন্য পড়ে থালি,
বন্ধঘরে একান্তে তাই জ্বালিয়ে বসে বাতি
বলছ সে কোন্ বাণী।
ধরার পরে অন্ধকারে আজ অভিসার তব
বিপুল হানাহানি।

আবার সবে প্রভাত বেলা শিশির ভেজা ঘাসে
ঝলমলানো রোদের মায়ায় মুক্তা-মাণিক হাসে
তোমার বাণী নূতন ছাঁদে হেথায় নেমে আসে
কাহার আকর্ষণে?
প্রথম দেখা আমার সাথে ঈষৎ নম্র নত
নেহাৎ অকারণে?

এই সে মোদের নীরব ভাষা নিত্য নব রূপে,
বিশ্ব সভায় কোলাকুলি হচ্ছে চুপে চুপে,
সাদা চোখের মণিকোঠায় বাঁধবে অপরূপে
সাধ্য কাহার আছে!
বহু যুগের সাধন বলে গভীর ধ্যানের বসে
পেলাম বুকের কাছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে সংগ্রাম

পোল্যাণ্ডের লড়াই একরকম শেষ হইয়াছে বলা যায়, রুষিয়া এবং জার্ম্মানী পোল্যাণ্ড ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে, মোটের উপর রুষিয়ার ভাগেই বেশী জায়গা এবং ইউক্রেনের উর্ব্বরা ভূমি প্রভৃতি ভাল ভাল অঞ্চল পড়িয়াছে। জার্ম্মানীর নিজের হয়ত মতলব ছিল, পোল্যাণ্ডকে সমগ্রভাবে নিজের জবরদখলে আনা, রুষিয়া যেভাবেই হউক, তাহার সে সাধে বাদ সাধিয়াছে এবং রুষিয়া কতকটা বিনা লড়াইতে নিছক চাতুর্য্যের বলে জার্ম্মানীর উপর দিয়া এই কাজটি হাঁসিল করিয়া লইয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া রুষিয়া এবং জার্ম্মানীর মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিবে কি না বলা যায় না; তবে একথা ঠিক যে, মনোমালিন্য ঘটিবার যথেষ্ট কারণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং রুষিয়ার ভবিষ্যৎ মতিগতির উপর বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্ব রণাঙ্গনে আপাতত যুদ্ধের ব্যাপকতা এবং প্রচণ্ডতা, অবস্থা যেমন আছে তেমন থাকিলে ঢিলা পড়িয়া যাইবে। পোলবাহিনী বাধা দিতেছে বটে; কিন্তু সে বাধা স্থায়ী হইবে না। পরিশেষে পোল সেনারা সম্ভবত বিচ্ছিন্ন-ভাবে গরিলা যুদ্ধ চালাইবার নীতি অবলম্বন করিবে।

এইদিকে পশ্চিম রণাঙ্গনে সার ও রাইনের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে লড়াইতে জোর বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ফরাসী পক্ষ হইতে আক্রমণ তীব্রতর আকার ধারণ করিয়াছে। উড়োজাহাজে বোমা বৃষ্টি এবং তোপ দাগান হইতেছে। পূর্ব্ব রণাঙ্গন হইতে জার্ম্মানীর সেনারা, বড় বড় সেনাপতিরা এমন কি স্বয়ং হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনে আসিয়াছেন। একদিকে ফরাসীদের দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন, অপরদিকে কতকটা সমপরিমাণ দুর্ভেদ্য জার্ম্মানদের জিগফ্রিড লাইন— এই দুই লাইন ভাঙ্গিয়া কোন শক্তির পক্ষেই চমকপ্রদ কিছু করা সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। এই ম্যাজিনো লাইন এবং জিগফ্রিড লাইন যেভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাকে ইউরোপের পাতাল দুর্গশ্রেণী সন্নিবেশ বলা যাইতে পারে। সব মাটির তলে—সুড়ঙ্গের ভিতর। এই লাইন প্রথমত ভাঙ্গা কঠিন, তারপর ভাঙ্গিয়া সংকীর্ণ পথে নিজেদের সৈন্যদল লইয়া ভিতরের দিকে শত্রুর দেশের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া যুদ্ধ চালানও কঠিন। কারণ শত্রুপক্ষ লাইনের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল হইতে সংকীর্ণপথে অগ্রগামী সেনাদলকে ঘিরিয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং সমগ্র লাইনকে এলাইয়া দিয়া তবে আগান সম্ভব হয়।

ফরাসীদের ম্যাজিনো লাইন লাক্সেমবুর্গ হইতে সুইজারল্যাণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ম্যাজিনো লাইনের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় ১৯২৯ সালে এবং ১৯৩৬ সালে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। অনবরত ১৫ হাজার লোক খাটিয়া এই কাজ সমাধা করে; এই লাইন খুঁড়িয়া ১২০০০,০০০ কিউবিক মিটার মাটি বাহির করা হয়, ১৫ লক্ষ কিউবিক মিটার কংক্রীট এবং ৫০ হাজার টন ইস্পাত বসাইয়া এই লাইন মজবুত করা হইয়াছে। মাটি কাটিয়া প্যারিস হইতে লীজ পর্য্যন্ত রীতিমত পাকা রাস্তা বাঁধাইতে হইয়াছে। কেল্লাগুলি সবই সুড়ঙ্গের মধ্যে, উপর হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, কোথাও কোথাও টিলার মত, গুল্মলতায় আচ্ছাদিত কুঞ্জকাননের মত মনে হয়। এই লাইনটি শত্রুপক্ষের প্রতিরোধে দুর্দ্ধর্ষ। [illegible] কোন ব্যবস্থা অবলম্বনেই ত্রুটি করা হয় নাই। কামান পাতিবার জন্য ভূপৃষ্ঠে মাঝে মাঝে যে সব গম্বুজ তোলা হইয়াছে, সেগুলি এমনই সুদৃঢ় যে, উপর হইতে বোমা ফেলিয়া সেগুলির কিছুই করা যায় না। শত্রুপক্ষের বিষাক্ত বাষ্প যাহাতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া অনিষ্ট না করিতে পারে, সেজন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। ভিতরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উপরে আছে দুর্ভেদ্য ঢাকনি, তাহার মধ্য দিয়া থাকে কামানের মুখ-গুলি বাহির করা, দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে শত্রুপক্ষের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া তদনুসারে কামান দাগা হয়। দূরবীক্ষণ-যন্ত্র ব্যতীত ভিতর হইতে বাহিরের কিছুই দেখিবার উপায় নাই। ভিতরে টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে, এই টেলিফোন লাইনের সাহায্যে খবরাখবর চালান হইয়া থাকে। এইভাবে সুরক্ষিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া শুধু আত্মরক্ষা নয়, শত্রুপক্ষকে আক্রমণেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই দুর্ভেদ্য পরিখার অন্তরালে থাকিয়া শত্রুপক্ষের অতি তীব্র গোলাবর্ষণও প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। সেনাদল লাইনের ভিতর দিয়া প্রকৃতপক্ষে সম্মুখে দিকে তরঙ্গোত্তাল যে অগ্নিসমুদ্র সৃষ্টি করিতে পারে, শত্রুপক্ষের পদাতিক বাহিনীর পক্ষে তাহা অতিক্রম করিয়া আসা সম্পূর্ণই অসম্ভব। লাইনের মাঝে মাঝে বড় বড় দুর্গ আছে, কোথায়ও কোথায়ও গোটা এক একটা পাহাড় খুদিয়া এই সব দুর্গ করা হইয়াছে এবং বর্ম্মাবৃত করা হইয়াছে, মাসের পর মাস ধরিয়া এই সব দুর্গে স্বচ্ছন্দে বাস করা চলে। এই লাইনের সম্মুখভাগে শত্রুপক্ষকে প্রতিরুদ্ধ করিবার নানারূপ কৌশল আছে। কাঁটা তারের বেড়া তো আছেই; তাহা ছাড়া মাটিতে উঁচু করিয়া বর্শা-ফলকের মত খুব গভীরভাবে লোহার কাঁটা বসান আছে,—ধারাল দিকটা উপরে থাকে। শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক এই লৌহ শঙ্কু-সংকট অতিক্রম করিতে পারে না। ট্যাঙ্কগুলি যাহাতে এই সব কাঁটা লাফাইয়া পার না হইতে পারে, সেজন্য কাঁটাগুলি নানারকম উঁচুনীচু করিয়া মাটিতে প্রোথিত করা হইয়াছে। ট্যাঙ্কগুলি এই সঙ্কটপথ অতিক্রম করিতে যখন চেষ্টা করিবে, তখনই ভিতর হইতে কামানের বাহির-করা মুখ হইতে গুলী চালান হইবে। উপরে যে সব লোক পাহারায় থাকে, সংকট মুহূর্ত্তে বুঝিলে তাহারা বৈদ্যুতিক শক্তিবলে দাঁড়ান অবস্থাতেই নীচে চলিয়া যাইতে পারে। কতকটা লিফ্‌টের মত লোহার পাটাতনের উপরে তাহারা থাকে।

ফরাসীদের এই ম্যাজিনো লাইনের সমান্তরালভাবে জার্ম্মানদের জিগফ্রিড লাইন—উত্তরে হল্যাণ্ড হইতে দক্ষিণে সুইজারল্যাণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই লাইনে ইস্পাত ও কংক্রীটে নির্ম্মিত খুব কম হইলেও ১২ হাজার দুর্গ রহিয়াছে। ভূগর্ভস্থ এই সব দুর্গের মধ্যে কলের কামান, গোলাবারুদ, সৈন্যসামন্ত সব আছে। মোজেল উপত্যকার অনেক স্থানে পাহাড় কাটিয়া সুড়ঙ্গ করা হইয়াছে। ভূগর্ভে সকল দুর্গে যেখানে সৈন্যেরা থাকে, সেখানে বৈদ্যুতিক আলো,

বৈদ্যুতিক পাখা, বিষ-বাষ্প নিরোধের ব্যবস্থা প্রভৃতি সবই আছে। তবে কেহ কেহ মনে করেন যে, ম্যাজিনো লাইন যতটা দুর্ভেদ্য, জিগফ্রিড লাইন ততটা দুর্ভেদ্য নয়।

এই দুই লাইনের মাঝে কোথায়ও কোথায়ও কয়েক মাইল স্থান ব্যবধান আছে; এই ব্যবধানের মধ্যেই লড়াই হইতেছে এবং জার্ম্মানদের সার অঞ্চলের নিকট যেস্থানে ব্যবধান কিছু কম এবং পাহাড়ের অন্তরায় হইতে স্থানটি কতকটা উন্মুক্ত—সেইখানেই ফরাসীরা নিজেদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছে।

সার অঞ্চলটি ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক হইতে জার্ম্মানীর একটি প্রয়োজনীয় কেন্দ্র। পূর্ব্ব-প্রুশিয়া, সাইলেসিয়া প্রভৃতি খনিজ-প্রধান অঞ্চল হইতেও কারবারের দিক হইতে জার্ম্মানীর পক্ষে সার অধিক মূল্যবান। যুদ্ধের তোড়জোড়ের প্রধান মাল-মসলাই হইল কয়লা এবং লোহা; সার অঞ্চলে এই দুই জিনিষই যথেষ্ট আছে। দক্ষিণ জার্ম্মানীতে লোহার যে সব বড় বড় কারখানা আছে, সার হইতে প্রাপ্ত লোহা এবং কয়লার উপরই সেগুলিকে প্রধানত নির্ভর করিতে হয়। ফরাসীদের এই অঞ্চল আক্রমণের ফলে শহরে ব্যবসায়-বাণিজ্য যে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রের বাণিজ্য-সম্পাদক সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, রুষিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর যে সন্ধি হইয়াছে, তাহার ফলে জার্ম্মানীর কারখানার জন্য কাঁচামালের অভাব যে এমন কিছু কমিবে, ইহা মনে হয় না। সন্ধি অনুসারে জার্ম্মানী রুষিয়াকে বিভিন্ন কাঁচামাল এবং আধা পাকা মাল, রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ করিবে। ইহার মধ্যে অস্ত্র থাকিবে কিছু পরিমাণ। অস্ত্র ছাড়া বর্ত্তমানে রুষিয়ার খনিজদ্রব্য অন্য কিছু এত বেশী পরিমাণ নাই যে সে নিজের দরকার মিটাইয়া অন্ততঃ কিছুদিনের মধ্যে বাহিরে রপ্তানি করিতে পারে। জার্ম্মানী রুষিয়া হইতে শস্য, মাংস, দুধের জিনিষ, গাছ-কাঠ এসব পাইতে পারে; কিন্তু রুষিয়া লোহা, কয়লা, তুলো, রবার, ধাতুদ্রব্য এসব কিছু বাহিরে পাঠাইতে পারিবে না। সমুদ্রপথে অন্য কোন স্থান হইতে কোন রকম সাহায্য পাইবার আশা জার্ম্মানীর নাই। আমেরিকা নগদ টাকায় সমরোপকরণ বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত করিবে বলিয়া মনে হয়। সে সিদ্ধান্তের ফলে জার্ম্মানীর সাহায্য তো হইবেই না, বরং সঙ্কট বাড়িবে। কারণ আমেরিকা হইতে জাহাজযোগে নগদ টাকা রাখিয়া দিয়াই নিজের দেশে পর্য্যন্ত মাল লইয়া আসিবার ক্ষমতা জার্ম্মান নৌ-শক্তির নাই।

জার্ম্মানী এখনও নিজেদের ডুবোজাহাজ ও উড়োজাহাজের গর্ব্ব করিতেছে। কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসীর আক্রমণে এই সময়ের মধ্যে জার্ম্মানীর যত ডুবোজাহাজ ধ্বংস হইয়াছে, বিগত মহাযুদ্ধে তাহা হয় নাই। উড়োজাহাজের গর্ব্বও এ পর্য্যন্ত ফাঁকাই রহিয়াছে। ইংরেজের ঘরবন্দী-নীতির কৌশলে হিটলারকে যে অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে, সেকথা তিনি নিজের মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইংরেজেরা জার্ম্মানীর নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এই অভিযোগ করিয়াছেন। নৌ-শক্তি ইংরেজের প্রধান শক্তি। এই নৌ-শক্তির প্রতিরোধ করিবার পক্ষে আছে দুইটি বস্তু—প্রথম ডুবোজাহাজ, দ্বিতীয় উড়োজাহাজ। ডুবোজাহাজের সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, বিগত মহাসমরের প্রথম দিকটাতে জার্ম্মানদের ডুবোজাহাজের উপদ্রবে ইংরেজের নৌ-শক্তির বিশেষ ক্ষতি ঘটিলেও এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ডুবোজাহাজ নষ্ট করিবার অনেক কৌশলও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অথচ ডুবোজাহাজের কারিগরিতে বিশেষ কোনরূপ উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয় নাই। উড়োজাহাজের আক্রমণের আতঙ্ক যে রণতরীর পক্ষে খুব বেশী, এ পর্য্যন্ত জার্ম্মানরা তাহা দেখাইতে পারে নাই। তবে একথা সত্য যে, আতঙ্ক কিছু আছে এবং মাঝে মাঝে জাহাজ ডুবি দুই একটা হইবেও; কিন্তু তাহাতে ইংরেজ-নৌ-শক্তির শৃঙ্খলা নষ্ট হইবে না বা আর্থিক বিপর্য্যয় ঘটবে না। অথচ জার্ম্মানীর দিক হইতে এই বিপর্য্যয় ঘটিতে বেশী দেরী হইবে না। জার্ম্মানী ইতিমধ্যেই সন্ধির জন্য উৎসুক হইয়াছে, প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালাইবার মত সামর্থ্য তাহার নাই, আর্থিক সঙ্কটের ভয় আছে।

বৃটেন ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং সে দায়িত্ব প্রতিপালনে তাহারা দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ। সুতরাং লড়াই চলিবে, তবে সেই লড়াইয়ের গতি কি আকার ধারণ করিবে এখনও বলা যাইতেছে না; যে কোন মুহূর্ত্তে ইহা বিশ্বব্যাপী আকার ধারণ করিতে পারে।

গুণী ও বীণা

শ্রীপুলিনবিহারী গুপ্ত

সাধকের সাধনার মধ্যমণি,
গায়কের কণ্ঠের শ্রেষ্ঠ ধ্বনি,
উদয়াচলে তুমি আলোক ধারা
অস্তবেলায় দূর সন্ধ্যাতারা।
কল্পলোকেতে বুঝি কবিরে ডাক,
শিল্পীর দুনয়নে স্বপন আঁক?
বিস্ময়ে হেরে সবে বিমোহন রূপ
ঝঙ্কারের মাঝখানে আছ হ'য়ে চুপ

কেহ চাহে শ্রীচরণ—শ্বেতকমল,
ভাবে বিহ্বল কেহ, হৃদি টলমল।
তরুণীর অঞ্জন, তরুণের প্রেম,
সকলের মাঝে চির উজ্জ্বল হেম।

বীণা নিয়ে গুণী কত গর্ব্ব ভরে,
ত্রিলোকের সুধাস্নানে হর্ষ করে।

কলঙ্কী-চাঁদ

(গল্প)

শ্রীবরুণ ঘোষ

দাগী বদমায়েস। বার বছর বয়সে ত্রিলোচন প্রথম জেল খাটে একটা পকেট-মারার অভিযোগে। জেল ও খাটত না, প্রায় সটকেই পড়েছিল ; কিন্তু কপাল খারাপ, পালিয়েও ধরা পড়ল। খুব দোষ ত্রিলোচনকে দেওয়া যায় না। তিনদিন শুধু রাস্তার জল খেয়ে সে কাটিয়েছে। রাত কাটাবার ভাবনা অবশ্য ওর ছিল না। ফুটপাথের এককোণে না হয় কারুর বাড়ীর রোয়াকে বেশ আরামেই সে রাতগুলো কাটিয়ে দিত। কিন্তু যত মুস্কিল কি ঐ পেটের জন্যেই? পোড়া পেট কি কিছুতেই বুঝবে না যে তিলুর পকেটে একটা পাই পয়সাও নেই? এক আধটা পয়সা যে সে মোট ব'য়ে কি অন্য কোনও সদুপায়ে যোগাড় করতে পারত না, তা নয় ; কিন্তু......তার চেয়ে বিনা কষ্টে যদি হয় মন্দ কি? অগত্যা পকেট কাটার চেষ্টা, আর তার ফলে প্রচুর প্রহার আর উনিশ দিন কয়েদ বাস। প্রথম অপরাধ ব'লে হাকিম ওকে সতর্ক ক'রে ছেড়ে দিলেও দিতে পারতেন ; কিন্তু পালাবার সময়ে যে ওকে ধরল, কামড়ে ত্রিলোচন তার হাতের অনেকটা মাংসই ছিঁড়ে নিয়েছিল। সুতরাং সহজে রেহাই পাওয়া তার ভাগ্যে ঘটল না।

কিন্তু ত্রিলোচন জেলে গেলেই বা কি? ভাবনা করবার দুনিয়াতে বোধ হয় ওর কেউই ছিল না। কে ওর বাপ-মা কেউই তা জানত না, বোধ হয় নিজেও না। ওর বরং ভালই হ'ল। বাইরে না খেয়ে মরছিল, ভিতরে গিয়ে খেয়ে বাঁচবে। শুধু যা একটু খাটতে হবে, আর মাঝে মাঝে প্রহার ; তা তিলুর খুবই অভ্যাস আছে—মানে দুটোই।

আজ তার তেইশ বছর বয়স। এই এগার বছরের ভিতরে সে ষোলবার জেল খেটেছে। এই এগার বছরে জেলের ভিতরের সঙ্গেই তার পরিচয় বেশী। সেখানেই সে বেশী আরামে থাকে। প্রতিবারেই যখন সে জেলের গেটে ঢোকে পুরোনো ওয়ার্ডার ও কর্ম্মচারীরা বলে 'এই যে বাছা তিলে, এসেছিস আবার?' ত্রিলোচন কিছুই বলে না—কেবল দাঁত বার ক'রে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে। পাথর ভাঙ্গা থেকে আরম্ভ ক'রে ইঁদারা থেকে রাশি রাশি জল তোলা—সবই ওকে করতে হয়। বলিষ্ঠ শরীর—সব কঠিন কাজগুলো জোটে ওরই কপালে। সময় সময় ওয়ার্ডারদের রুলের গুঁতো, চড়, চাপড়টা ত আছেই।

সেই ত্রিলোচন এখন তেইশ বছরের যোয়ান। জেলে ঢোকার সময় সেই যে ছোট ক'রে চুলগুলো ছাঁটিতে হয়েছিল, সেগুলোকে আর সে বাড়তে দেয় নি। খোঁচা খোঁচা চুল-গুলোয় তেল না পড়াতে একটা কেমন রুক্ষতা এনে দিয়েছে ওর দেহে! ছোট ছোট চোখ দুটোতে সব সময়েই সন্দেহের চাউনি। জীবনের গোড়া পত্তনের আগে থেকেই যে কেবল দুঃখ আর অবজ্ঞাই সকলের কাছ থেকে পেয়ে এসেছে—প্রীতি মানুষ, সমাজ নামে একটা সভ্যতার সৃষ্টি, বিশাল দুনিয়া ও সমগ্র সৃষ্টিকেই সে যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে তার আর আশ্চর্য কি? সেইই কোন দিন তাকে ভালবাসে নি, সুতরাং এই মনুষ্য [illegible] তার কোন কাজেই [illegible] না। যে বয়সে স্বভাবতঃই মানুষ একটুখানি স্নেহের জন্যে লালায়িত, সেই সময়েই তার স্ফুটনোন্মুখ মনের কোমল বৃত্তিগুলো আইন ও শৃঙ্খলার রথচক্রতলে নিষ্পেষিত হ'য়ে তার ভাবী কালের পথ রুদ্ধ ক'রে দিল। দরদী প্রাণের একটু স্পর্শে হয়ত সে নবজীবন লাভ ক'রে তার অনাগত মানবতাকে সোনার রঙএ রাঙিয়ে সফল ক'রে তুলতে পারত, কিন্তু সে পেয়েছে অপরিসীম ঘৃণা ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞা। কেউই কোন দিন তার ভিতরের আসল মানুষটিকে যাচাই ক'রে নেবার প্রয়োজন বোধ ক'রে নি, তার উপরকার খোলসটাই সকলের চোখে বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

প্রায় চার মাস ত্রিলোচন জেলের বাইরে। বিগত জীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার কোনরকম বোঝাপড়া হয়েছিল কিনা কে বলবে? হয়ত তাই হবে, না হলে সে হঠাৎ সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জনের জন্যে এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠবে কেন? বোধ হয় এতদিন পরে তার মনে কারাজীবনের উপর একটা সাংঘাতিক বিতৃষ্ণার ভাব এসেছে ; হয়ত সেও পাঁচজনের মত বাঁচতে চায়।

আজ প্রায় মাস দুই হ'ল ত্রিলোচন একটা অয়েল মিলে দৈনিক পাঁচ আনা হিসাবে কুলীর কাজ পেয়েছে। শহরের পূর্ব্বাঞ্চলের কোন ধনী লোকের বাড়ীর অব্যবহৃত ঘোড়ার আস্তাবলে সে থাকবার স্থান পেয়েছে। রোজ খুব ভোরে সে কাজে চলে যায়, সন্ধ্যার পরে বাড়ী ফেরে। এই বাঁধাধরা দৈনন্দিন জীবনে বেশ মধুর আনন্দের আস্বাদন পাচ্ছে সে। বিগত দিনের দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা এখন প্রায় তার বিস্মৃতির কোঠায় জমা হয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সে মিল থেকে বাড়ী ফিরছিল। 'বাবু একটা পয়সা দাও'। করুণ কণ্ঠের এই মিনতি শুনে সে ফিরে চাইতেই তার বুকটা গভীর ভাবে আলোড়িত হ'য়ে উঠল। ফেলে আসা জীবনের একটা ঘটনা, পর্দ্দার গায়ে বায়স্কোপের ছবির মত তার বুকে এসে বাসা বাঁধল এগার বছর আগে তারও ত এই বয়সই ছিল—সেওত ঠিক এমনি ভাবেই পয়সা চেয়ে লোকের কাছে শুধু গালাগালিই লাভ করেছে। সে-ই বা কেন দয়া করবে? একটা কঠিন দৃষ্টি হেনে সে চার পা এগিয়ে গেল।

'বাবু'! আবার সেই করুণ আবেদন। সে ফিরে না এসে পারল না ; জিজ্ঞাসা করল "তোর নাম কি?"

'কমল'।

'তোর কে আছে?'

কেউ নেই.........তাই জন্যেই না আজ দুদিন উপোস ক'রে মরেছি। মুড়ি খেতে একটা পয়সা তুমি দেবে না?'

ছেলেটির ডাগর চোখ দুটি জলে ভরে এল।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ত্রিলোচন আবার জিজ্ঞেস করল 'তুই আমার কাছে থাকবি?'

ছেলেটা নির্ব্বোধের মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

'আয়'—ত্রিলোচন তার হাত ধরে একেবারে নিজের আস্তানায় হাজির। সেই থেকে কমল তার কাছেই আছে। মিলওয়ালা বাবুকে বলে ক'য়ে সে কমলকেও মিলে একটা

বেয়ারার কাজ যোগাড় করে দিয়েছে। একটানা স্রোতের মত দুটো তরুণ জীবন অগাধে বয়ে চলেছে।

সাত মাস কেটে গেছে। কিছুদিন থেকে ত্রিলোচন কমলের একটু ভাবান্তর লক্ষ্য করছে; সে যেন তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। প্রায়ই অনেক রাত ক'রে বাড়ী ফেরে.....একটু-আধটু নেশাও সে আজকাল করতে শিখেছে বলে তার মনে হয়। মাঝে মাঝে ত্রিলোচনের পয়সার থলি থেকে দু' চার আনা পয়সাও কম পড়ে। যাক্—এসব তুচ্ছ ব্যাপার সে ততটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। কিন্তু তার প্রতি কমলের এই ঔদাসীন্যে সে অন্তরে তীব্র বেদনা অনুভব করে।

সেদিন ত্রিলোচনের ফিরতে একটু রাত হ'য়ে গিয়েছিল। আস্তাবলের কাছে কিসের গোলমাল শুনে সে ব্যগ্রভাবে এগিয়ে গেল। বাড়ীর কর্ত্তা তাঁর সোনার হাতঘড়ি খুঁজে পাচ্ছেন না; সন্দেহ ক'রে তিনি কমলকে রূঢ়ভাবে জেরা করছেন। একটা গভীর ভয়ের ভাব কমলের সারা মুখে ছেয়ে রয়েছে; চোখে আকুল হতাশা সুপরিস্ফুট।

সামনেই পুলিশের ফাঁড়ি। উপায়ান্তর না দেখে হয়ে ভদ্রলোক পুলিশ ডাকতে গেলেন।

'তিলুদা কি হবে? আমি যে সেই ঘড়ি নিয়ে কাল রাতে বেচে দিয়েছি!'

অস্ফুটভাবে এই বলে কমল কেঁদে ফেলল।

'টাকা কি করেছিস?' ত্রিলোচন কর্কশভাবে জিজ্ঞেস করল। কমল নির্ব্বাক। ত্রিলোচন বুঝল। একটু পরেই কিছু দূরে পুলিশের ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। আর সময় নেই। মুহূর্ত্তের জন্যে ত্রিলোচনের চোখ দুটি বিস্ফারিত হ'য়ে জ্বলে উঠল।

ভদ্রলোকটি দারোগা ও জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ও কমলকে দেখিয়ে দিলেন।

'এই নিন্ আমার হাত—ঘড়ি আমিই চুরি করেছি।'

হঠাৎ ত্রিলোচন কমলকে আড়াল ক'রে তার হাত দুটো বাড়িয়ে দিল।

হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে দারোগাবাবু তাকে নিয়ে চলে গেলেন। কমল চুপ। কি ঘটল সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

জীবনের জয়যাত্রা

(৩২৯ পৃষ্ঠার পর)

তেপান্তরের মাঠের রাজপুত্তুর রাজকন্যার কাহিনীর মত একটা একঘেয়ে গতানুগতিকতা। সময় এবং অবস্থার ব্যবধানে সংসারের অমূল্য এবং উজ্জ্বল জিনিষগুলি ঠিক এই রকম—ভাবেই ত অবহেলা এবং বিস্মৃতির অন্ধকারে মিলাইয়া যায়!

কবিত্ব বা দার্শনিকতার একটু আভাসও আমার মধ্যে নাই। কিন্তু কি জানি কেন হঠাৎ আজ দুই একটি বড় বড় কথা মনে পড়িয়া গেল। ভাবিলাম—রাণীর জীবনেও ত সংসারের এই চিরন্তন সত্যটির ব্যতিক্রম ঘটে নাই! এমন এক-দিন ছিল, যখন রাণীকে কাছে পাইবার জন্য উন্মুখতার সীমা ছিল না, রাণীর সান্নিধ্যের কাছে সংসারের সমস্ত পাওয়া ম্লান হইয়া যাইত। কিন্তু আজ? পাশেই রাণী ঘুমাইয়া আছে—আমাদের দু'জনের মধ্যে সংকোচ বা বাধার কোন বালাই নাই। তবু দাম্পত্যের মান-অভিমান কোথা যেন উবিয়া গিয়াছে। নিস্পৃহতায় সমস্ত চিত্তবৃত্তিগুলি আজ এমন ধারা সঙ্কুচিত হইয়া আসে কেন?.........তবে কি এটা দারিদ্র্যের হস্তক্ষেপ?............কিন্তু রাণীর ত আমার উপর একটুও বিরক্তি জন্মে নাই! দিন দিন তাহার শ্রদ্ধা এবং ভাল-বাসা ত বাড়িয়াই চলিয়াছে—আমাদের নৈরাশ্যের আঁধারকে স্নেহের প্রদীপ জ্বালাইয়া দূর করিতে রাণীর ত কোন ক্লান্তি কোন কষ্ট হয় বলিয়া মনে হয় না।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসিয়া ধাঁধাইয়া দিতে লাগিল। রাণীকে সজাগ করিয়া কহিলাম, "রাণু, আমি কি এখনও তোমায় ভাল-বাসি?"

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে রাণী বলিল, "পাগল!"

পুনরায় কহিলাম, "ওই পাগলা একবার পাইলে সাধ্ নাথ্ মুখ দিয়ে দিয়া রাখনু!"

রাণী রাগিয়া কহিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

মুখের প্রশ্নকে থামাইতে পারিলাম না, বলিলাম, "চল বাইরে খানিকটা ঘুরে আসি।"

রাণী বিস্মিত হইয়া কহিল, "এই কন্‌কনে শীতে আর এই অন্ধকারে!"

উত্তর দিলাম, "হাঁ, এই অন্ধকারেই। জীবনের যেদিকে চাই সেদিকেই অন্ধকার সুতরাং অন্ধকারকে অবহেলা করলে চলবে কেন বল? তাছাড়া অন্ধকারই ত সুন্দর; মনে নেই শরৎবাবুর কথাটা—মরি মরি এমন রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি!'

"নেশা-টেশা কিছু ক'রেছ না কি?" এই বলিয়া রাণী আমাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিয়া বুকের উপর লেপটা টানিয়া দিল।

মানুষের তৈরী বিরাট আনারস

আকারে বিরাট আনারস হইলেও লোভনীয় ফল ইহা নয় আদপেই। হাওয়া দ্বীপের হনলুলু শহরে পানীয় জল সরবরাহের কারখানায় এইটি প্রস্তুত—জল ধরিয়া রাখিবার ট্যাংক
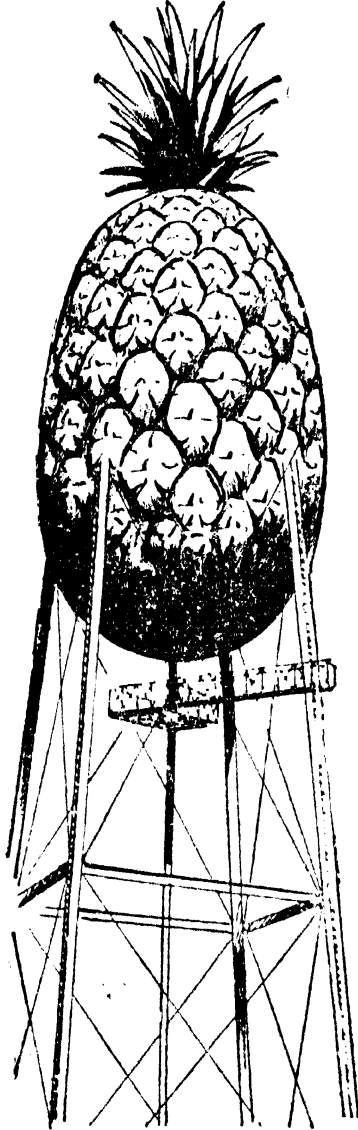
হিসাবে। বিরাট বলিলেও ইহার ঠিক আকারের ধারণা হয় না। আনারসটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ ফুট। উহার বাহিরের পিঠে আনারসেরই মত 'চোখ' রহিয়াছে অগণিত। মাথার কাছে কতকগুলি আনারসের পাতার আকারে ঝুঁটি একটি রহিয়াছে। কিন্তু সাধারণত আনারসের বোঁটার কাছে ত ঝুঁটি থাকে না, ঝুঁটি থাকে ফলটির নীচু দিকে। সুতরাং বলিতে হয় আনারসটিকে বসান হইয়াছে উল্টা করিয়া—বোঁটা নীচে ও ঝুঁটি উপরে করিয়া। আপাতদৃষ্টিতে তবুও বেশ সুন্দরই দেখা যাইতেছে।

বিমান-বহরের আগমন নিরূপণ

বিমানের আগমন নিরূপণ করিবার যে যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা শব্দতরঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় উত্থিত স্পন্দন দ্বারা সূচনা নির্দেশ করে। কিন্তু এই যন্ত্র এখনও তেমন সূক্ষ্মভাবে বিমান আগমনের সাড়া জাগাইতে পারে না। কোন কোন দেশে এইজন্য শূকর লইয়া পরীক্ষা চালিতেছে। জীবজন্তুর ভিতর শূকরই না কি খুব বেশী অনুভূতি-প্রবণ এই প্রকার স্পন্দনের পক্ষে। উহারা অতি দূরাগত ক্ষীণ শব্দও সহজেই মালুম করিয়া নিতে পারে। সকলেই জানেন উহাদের কণ্ঠরব মৃদু। কিন্তু অতি দূরবর্তী স্থান হইতেও বাচ্চা যদি সামান্য কাতরাইয়া উঠে ধাড়ী শূকর তাহাতেই সচকিত হইয়া উঠে। অথচ সাধারণভাবে এতটা দূর হইতে বাচ্চার মৃদু ক্রন্দন উহার শুনিবার কথা নয়। তবুও ধাড়ী সাড়া দেয়। এই সকল কারণে বুঝিতে পারা যায়, শূকর অতি সূক্ষ্ম স্পন্দনেরও প্রতিক্রিয়াশীল অনুভূতির অধিকারী। অনেককেই আশা করেন যে সকল অঞ্চলে বহুমূল্য যন্ত্রাদি রাখা সম্ভব হইবে না, সেখানে শূকরই বিমান আগমন-জ্ঞাপক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। অবশ্য ব্যাপারটা এখনও পরীক্ষাধীন।

ডাক টিকিটে অধ্যাপকের প্রতিকৃতি

হাঙ্গেরীতে যে সকল ডাক টিকিট প্রবর্তিত, তাহাদের ভিতর কতকগুলিতে স্থান পাইয়াছে দেব্রেৎজেনের মাগিয়ার কলেজের প্রাচীন বিখ্যাত অধ্যাপকগণের প্রতিকৃতি। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য স্বাধীন দেশে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। রাষ্ট্র হইতে দেশহিতৈষী এই সকল পণ্ডিতগণের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থ এই ব্যবস্থা সারা বিশ্বে অতি অল্প দেশেই করা হইয়াছে। যদি আমরা স্মরণ রাখি যে অধ্যাপকগণই জাতির ভাবী বংশধরদিগের বহু প্রকার উন্নতির মূল, তাহা হইলে কৃতী অধ্যাপকদিগের মত জাতীয় গঠন কার্যে শ্রেষ্ঠ অংশ আর কেহ গ্রহণ করে না, এই কথা মানিতেই হয়। সেই দিক দিয়া দেশবাসীর নিকট হইতে যোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান অধ্যাপকগণ অবশ্যই দাবী করিতে পারেন।

ইটালীতে মদ্য উৎপাদন

ইটালীর প্রতি নর-নারী-শিশুর মাথা পিছু ২৩ গ্যালন করিয়া মদ্য এই বর্ষে প্রস্তুত হইবে—রপ্তানীর পরিমাণ বাদেই। গত বর্ষে পারিবারিক উৎপাদন ছিল ১০৬ কোটি গ্যালন অপেক্ষাও বেশী।

রঙিন ব্যথা

(গল্প)

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

(১)

দু' বৎসর আগেকার কথা। তখন আমি কলকাতার কলেজে পড়ি। বয়স আঠার বেশী হবে না। বেশ মনে পড়ে, সে রাত্রি ছিল ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভরা। দু'এক টুকরা শুভ্র মেঘ হাল্‌কা পালকের মত আকাশে ছুটে বেড়াচ্ছিল। স্নিগ্ধ ঝির্‌ঝিরে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। ঘরের জানালা খুলে খাটের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ঠেস দিয়ে এক মনে কি একটা বই পড়ছিলাম। হঠাৎ হাওয়ার সঙ্গে ভেসে এল পাশের বাড়ী থেকে হারমোনিয়ামের মিষ্ট সুরের সঙ্গে সুমধুর কোমল কণ্ঠের তান—

"ও গো সুন্দর—
মনের গহনে তোমার মুরতিখানি
ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় গড়ে যায় বারে বারে
বাহির বিশ্বে তাই তো তোমারে টানি।"

ভারি মিষ্ট লগল ঐ সুন্দর গানখানি। হাতের উপন্যাস আর ভাল লাগল না। বিছানা ছেড়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ পরে গীতধ্বনি আমার কানে অমৃত বর্ষণ ক'রে থেমে গেল। আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। কেননা পাশের বাড়ীটা ছিল খালি—মাসাবধি আগে ভাড়াটে উঠে যাবার পর লোক এসেছে বলে জানা ছিল না। ভাবলাম, বোধ হয় নূতন কেউ ভাড়াটে এসে থাকবে। জানালা ছেড়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম ; কিন্তু ঘুম এল না। চুপ ক'রে পড়ে রইলাম। আমার শূন্য মস্তিষ্কে তখন চিন্তা রাজ্যের এক বিষম বিপ্লব চললো। 'কে এ গানখানি গাইল—কে সে তরুণী? এমন মধুর মিষ্ট গলার স্বর কার কণ্ঠ হ'তে ভেসে এল?' ঘড়িটায় ঢং ঢং ক'রে বারোটা বেজে উঠল। ভারি বিরক্তি বোধ হল। বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি সুরু ক'রে দিলাম। কিন্তু ঘুম চোখে এল না। কেবল চিন্তা আর চিন্তা—'কেমন সুন্দর গাইছিল! বেশ মধুর গলার আওয়াজ তো!'

সে রাত্র কাট্‌লো মনের মাঝে গানের সমালোচনা ক'রে। পরদিন সকালে বাহিরে বেরিয়ে প্রথমে আমার নজর পড়লো পাশের বাড়ীর দিকে। দেখি, দু'টি বৃদ্ধ একসঙ্গে বসে চা পান ক'রছেন। তখন আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে নূতন ভাড়াটে নিশ্চয় এসেছে। তারপর লোক পরম্পরায় জানতে পারলাম ঐ বাড়ীর কর্ত্তার নাম অনুকূল বসু। অনুকূলবাবু রিটেয়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। আর গতকল্য রাতে যার গান শুনে আমি মুগ্ধ হ'য়ে বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম—শুনলাম, সে নাকি অনুকূলবাবুর একমাত্র কন্যা।

দিন কয়েক কেটে গেল। অনেক চেষ্টা ক'রলাম, গায়িকাকে দেখবার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা আমার কপালে সহজে ঘটে উঠ্‌লো না।

সেদিন শনিবার। কলেজ থেকে বাড়ী ফির্‌ছি। সদর দরজা পার হ'য়ে ভিতর বাড়ীতে পা দিতেই সহসা নজর পড়লো একটি অপরিচিতা তরুণীর উপর। তরুণী নতমুখে বসে বৌদির সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। তরুণী আধুনিক সজ্জায় সজ্জিতা। যদিও চোখে চশমা বা হাতে রিষ্টওয়াচ ছিল না তবুও বলা যেতে পারে তরুণী আধুনিকা। একখানি রঙিন শাড়ীতে দেহখানি আবৃত, কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ, দোদুল বেণী, সামান্য অলঙ্কারে সে এক অপূর্ব্ব শোভা। আমি তার পানে বারেকের তরে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। আমার পায়ের শব্দ শুনে সচকিত হয়ে সে চোখ দু'টি আমার মুখের উপর মেলে ধরলো। আমার দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি এক হ'য়ে গেল। পরক্ষণেই সে লজ্জায় একেবারে নত হ'য়ে গেল। সামান্য একটু হেসে বৌদি বলে, "ওকে দেখে আবার লজ্জা কি? ও আমার ঠাকুর পো।"

আমি সেখানে না দাঁড়িয়ে অন্যের ঘরে ঢুকে পড়লাম। এর পর তরুণী যে কতক্ষণ আমাদের বাড়ী ছিল তা জানি না। আধ ঘণ্টা পরে ঘর থেকে বেরিয়ে তরুণীকে দেখতে পেলাম না। বৌদির মুখে শুনলাম, কাজের অছিলা দেখিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিয়েছে সে। বৌদিকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "হাঁ বৌদি, ও মেয়েটি কে?"

"ওকে জান না? আমাদের পাশের বাড়ীর ভাড়াটেদের মেয়ে, বীণা"।

"ও তাই না কি! ওই বুঝি মাঝে মাঝে গান গায়?"

"হাঁ, মেয়েটি বেশ চমৎকার, যেমন গান-বাজনায় তেমনি শেলাই-বুননে পাকা। ওর হাতের প্রত্যেকটি কাজই সুন্দর আর পরিপাটি।"

আমি বৌদিকে আর কোন প্রশ্ন না ক'রে স্যাণ্ডেলটা পায়ে দিয়ে বাহিরে যাবার জন্য উৎসুক হ'য়েছি এমন সময় বৌদি পিছন থেকে ডাকল, "ঠাকুর পো।"

"কেন?" বলে বৌদির দিকে তাকালাম।

"বলছিলাম কি, একটি পাত্র দেখে দিতে পার?'

"কার জন্যে?"

"বীণার জন্যে। বীণার মা বাপ তো বীণার বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাই বলছিলাম, যদি তোমার কোন বন্ধুবান্ধব থাকে—তো খবর দিও না, আহা! বেশ চমৎকার মেয়েটি—তবু জানাশোনা ঘরে পড়লে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা হবে। মেয়েটি বেশ . . . . . .

"আচ্ছা চেষ্টা ক'রে দেখব।" বলে আমি গন্তব্যস্থানের দিকে পা চালালাম।

(২)

মাস খানেক পরের কথা। অনুকূলবাবুর সঙ্গে তখন আমাদের ঘনিষ্ঠতা খুব বেড়ে উঠেছে। আমারও মাঝে মাঝে অনুকূলবাবুর বাড়ী যেতে হত। অনুকূলবাবু ভারী আলাপী, তাঁর সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা হ'ত। অনুকূলবাবু ছিলেন পপুলার ম্যান।

সে দিন আষাঢ়ের এক প্রভাত। ক্যালকাটা তিন গোলে মোহনবাগানের কাছে পরাজিত হ'য়েছে, এই সংবাদ দিতে গেছি অনুকূলবাবুর কাছে। দেখি, বৈঠকখানা শূন্য।

চাকরের মুখে শুনলাম, বাবু গেছেন বাজারে। কি করি বাড়ী ফেরবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। এমন সময় বীণা ঘরের মধ্যে এসে আমার যাবার পথে বাধা দিয়ে বললে, "যাচ্ছেন কেন? বসুন না, বাবা এখুনি এসে পড়বেন। অনেকক্ষণ বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন।" বীণা সেই প্রথম আমার সঙ্গে কথা বললো—যদিও সে আমাদের বাড়ী যাওয়া আসা করত—বৌদির সঙ্গে আলাপ জমাতে এবং আমার ইস্কুলের লাইব্রেরীর বই, পত্রিকা পড়বার জন্য আনতে। আমিও কথা বলতে সাহস করিনি। যাই হোক, বীণার অনুরোধ, বাঁশীর মত মিষ্ট সুরের আহ্বান আমি প্রত্যাখ্যান ক'রে যেতে পারলাম না। একখানি চেয়ার টেনে আবার বসলাম। বীণা কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "চা খাবেন?"

আপত্তি ক'রে বললাম, "না থাক, এই চা খেয়ে বাড়ী থেকে বেরুচ্ছি।"

"তা হোক, শুধু আধেক কাপে কোন ক্ষতি হবে না। এখনি আসছি" বলে একটু গোলাপী হাসি হেসে বীণা ঘর থেকে চলে গেল। হাসিটি অতি মধুর লাগল আমার। মনে হল যেন হাসির একটা জীবন্ত বিদ্যুৎশিখা আমার সামনে থেকে সরে গেল।

মিনিট দুই পরে অনুকূলবাবু বৈঠকখানায় প্রবেশ করে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কতক্ষণ এসেছ প্রশান্ত?"

"এই মিনিট পাঁচ হল।" আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজার পর্দার নীচে দুটি কোমল চরণ দেখা গেল। তারপর ঘরে ঢুকল দু' কাপ চা হাতে বীণা। চায়ের কাপ দুটি টেবিলের উপর রেখে বীণা আলগোছ পদক্ষেপে সেই ঘর ত্যাগ করল। অনুকূলবাবু বললেন, "প্রশান্ত, এই আমার মেয়ে বীণা। এর পাত্রের জন্যই তোমায় বলেছিলাম।"

পাত্রের কথা শুনে মনটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে স্বীকার করতে হল চেষ্টা করে দেখবো। তারপর বীণার তৈরী চা পান ক'রে সে দিনের মত বাড়ী ফিরলাম।

* * *

তারপর আমি বীণার সঙ্গে নির্ভয়ে কথা বলতাম। আর বীণাও আমার সঙ্গে আলাপ করত বিনা সঙ্কোচে। মাস খানেক কেটে গেল। মনে হল, বীণার সঙ্গে যেন আমার একটা খুব বড় প্রয়োজন আছে। তাই মাঝে মাঝে বীণার কথা ভাবতাম। বীণার সেই মুখ, আমার প্রথম যৌবনের সমস্ত কামনার প্রদীপটিতে দীপ্ত শিখার মত জাগিয়ে জ্বল জ্বল করতে থাকে। আবার কখন বা বীণা কায়স্থ—এই কথাটা মনের মধ্যে জেগে তীক্ষ্ণ ছুরির মতই আমার সমস্ত আশা, আনন্দ কল্পনাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলত। একদিন ভাবলাম বীণাকে সব কথা খুলে বলি, যদি বুঝাতে পারি, কি তীব্র পিপাসা কি প্রবল অনুরাগ আমার প্রাণে! হোক সে কায়স্থ-দুলালী বা আমি ব্রাহ্মণ সন্তান। অন্তরের এই যে প্রবল আকর্ষণ, সে কি মানুষের হাতে গড়া? এই জাতির কৃত্রিম বেড়াটাকে ভাঙতে পারবে না? ভেঙে দুজনকে এক করে দেবে না? বীণা মানব আমিও মানুষ। মনুষ্যত্বের অপমান করে কেন এই জাতিভেদের ঝিলিমিলি টেনে পরস্পরের মধ্যে একটা মস্ত ব্যবধান গড়ে তুলতে দেব!

সেদিন গোধূলি বেলায়, বীণাদের বাড়ী হাজির হলাম। অনুকূলবাবুকে দেখতে না পেয়ে বীণাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কাকাবাবু কোথায়?"

বীণা আমার প্রশ্নের উত্তর মুখে বলতে লজ্জা অনুভব ক'রল। অবশেষে একখানি ছোট কাগজে লিখে জানাল যে, অনুকূলবাবু তার জন্য পাত্র দেখতে গেছেন শ্যামবাজারে।

আমার বুকে যেন শেল বিঁধলো। বীণার বিয়ে! ভাবলাম, তবে কি বীণা আমার হবে না! আমার প্রথম যৌবনের বাসনার ধন বীণাকে আমার পাবার আশা নেই। বীণা পরের ঘরে চলে যাবে। বেশী ভাবতে পারলাম না। পাগলের মত বীণার হাত দুটি ধরে বললাম, "বীণা!"—

বীণা ভয় চকিতের মত আমার পানে চাইল।

"বীণা আমি তোমায় ভালবাসি, হও তুমি কায়স্থ, তাতে কি বাধা। আমি জাতিভেদ মানি না। তুমি রাজি আছ বীণা, আমাকে—?"

বীণা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল—কোন কথা বললো না। আমি তার মুখের পানে উৎসুক নয়নে তাকিয়ে রইলাম। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বীণা বিদ্যুৎবেগে সে ঘর থেকে চলে গেল। তারপর আমি কতক্ষণ যে মূক মৌন পুতুলের মত সেখানে ছিলাম জানি না। হঠাৎ ঘড়ির ঢং ঢং শব্দে হুঁস এল। চোরের মত নিঃশব্দে বেরিয়ে ভীরুপদে পথে এসে দাঁড়ালাম। তখন নিজেকে আর ক্ষমা করতে পারছিলাম না। একি করলাম! মুহূর্তের দুর্ব্বলতায়, ক্ষণিক উত্তেজনায় একটি তরুণীর কাছে এমন ভাবে—ছিঃ ছিঃ! দারুণ ধিক্কারে সমস্ত হৃদয় ভরে উঠল। বীণা কি ভাবল, অনুকূলবাবু শুনলে কি মনে করবেন! বাড়ীতে আর মন টিকল না। পূজার ছুটিতে কলেজ বন্ধ হতে আর বেশী বাকি ছিল না। আমি সে দিনই সুটকেশ, বেডিং নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পুরীর অভিমুখে।

(৩)

পুরীতেও শান্তি পেলাম না। সমুদ্রের হাওয়া আমার বিষাদ ভরা মনে বারবার জাগিয়ে দিল সেই কুণ্ঠাজড়িত ভাবনা। শয়নে স্বপনে জাগরণে সকল সময় আমার সামনে বীণার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানিই বায়স্কোপের ছবির মত ভেসে উঠতে লাগল। একবার ইচ্ছা হয় ক'লকাতায় ছুটে যাই—না হয় একটা চিঠি লিখি বীণাকে। হয়ত এখনও সময় আছে। পরক্ষণেই সেই রাতের কথা মনে জেগে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাই লজ্জায়।

পূজার ছুটি ফুরাল। ক'লকাতায় ফিরলাম। বাড়ীতে ঢোকবার আগে পাশের বাড়ীর দিকে তাকালাম। আমার কানে এসে পৌঁছাল বীণা কণ্ঠের সুরের ঝঙ্কার—

"তার বিদায় বেলার মালাখানি
আমার গলে রে—
দোলে দোলে বুকের কাছে পলে পলে রে।"

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গানখানি শুনলাম। প্রথমে মনে হল বীণা বুঝি আমার বিদায়ে ব্যথিত হ'য়ে গানখানি গাইছে। কিন্তু গান থামার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। এ তো বীণার কণ্ঠস্বর নয়, এ যে অপরিচিত কণ্ঠ। তার ভিতর ছিল না সেই যাদু, যার পরশে বুকে আমার ফুটে উঠতো শ্বেত শতদল। বিষণ্ণ মনটাকে বহন করে বাড়ীর ভিতর ঢুকে বৌদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, বীণার কথা। বৌদি উত্তর দিল, "তারা খুলনায় চলে গেছে—অন্য এক ঘর ও বাড়ীতে ভাড়াটে এসেছে।"

* * *

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন করে একটা বছর কেটে গেল। বীণার কোন খবর নেই; কিন্তু আমার মন সদাই অন্যমনস্ক, সর্ব্বদাই চঞ্চল, দৃষ্টি উদাস। সেদিন আমার ঘরের ইজিচেয়ারে শুয়ে ভাবছিলাম। বীণার করুণ সুন্দর মুখখানিই বারে বারে চিত্তে দিচ্ছিল দোলা। এমন সময় আমার চিন্তার স্রোতে বাধা দিয়ে বৌদি ডাকল, "ঠাকুর পো।"

—"কেন ?"

"তোমার দাদা বলছিল, অবনীবাবুর বোনের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা। আমি বলি কি তুমি নিজে একবার মেয়েটিকে দেখে এলে ভাল হয় না।"

"কে যাবে—আমি ?"

"হাঁ গো, তোমার পছন্দ হলে, দু হাত এক হয়ে যায়।"

"আমি বিয়ে করব না বৌদি।"

"তা কি হয়। বিয়ে না করলে চলবে কেন ? কেমন দু ভায়ে ঘর করব, আমি তো আর একা এ সংসারে থাকতে পারব না। দু'দিন বাদে ঠাকুরঝির বিয়ে হ'য়ে যাবে—পরের ঘরে চলে যাবে। আমার দিন কাটবে কি করে ? বিয়ে করতেই হবে। লক্ষ্মী ভাই, একবার দেখে এস।"

'না বৌদি আমি বিয়ে করব না—যাও—মিছে জ্বালাতন করো না।" এমন সময় ছোট বোন গীতা একখানা চিঠি হাতে দিয়ে গেল। বৌদি আর কোন প্রশ্ন করল না।

চিঠিখানি নিয়ে, প্রেরিতার নাম পড়ে বুকটা কেমন কেঁপে উঠলো। যতদূর সম্ভব সে ভাব দমন করে আগ্রহে চিঠিখানি বার বার পড়লাম। বীণা লিখেছে—

প্রশান্তবাবু,—

নিষ্ঠুরভাবে সেদিন আমায় দূরে সরিয়ে নিতে হয়েছিল নিজেকে আপনার কাছ থেকে। তাতেও যে কত বড় শেল বিঁধেছিল বুকে সে কথা বলবারও আজ আমার অধিকার নেই। কারণ আমি নারী। কিন্তু সে রঙিন্ ব্যথাই আমার ক্ষুদ্র যাত্রাপথটুকুর সম্বল। দূরে হতে সে-ই ভাল। আপনার ব্যথাতুর হৃদয়ের আকুল আকুতিটুকু আঁকড়ে ধরে আপনার 'বীণা' আপন সত্তাকে লুপ্ত করে দিয়েছে আঁধারে—নিঃসঙ্গ —স্তব্ধ। আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে বীণার যে মৃত কঙ্কাল সে কঙ্কাল বহন করেই এ জগতে প্রাণহীন বীণা প্রায়শ্চিত্ত করে চলবে তার অভিশপ্ত পারিপার্শ্বিকের চিতায়। অশ্রু সাগরের হাতছানি আমায় টেনে নিয়ে চলেছে দূর-দিগন্তে—ভুলে যান বীণাকে, ভুলে যান ধূমকেতুর মত আপনার আকাশে সে উঁকি দিয়েছিল। আমিও ভুলবো—ভুলে রূপ-রস-গন্ধের অতীত মোহন মূরতিকে নিরাকারে পরিণত করবো। এ পারে আর যেন দেখা না হয়—এ মিনতি আমার এজন্য, পরপারের রঙিন্ মিলন-পথে কোন কণ্টক না বেদনা সৃষ্টি করে। শেষ কথা আমার—মুছে ফেলবেন আমায় আপনার মনের মুকুর থেকে। বীণা নেই—তার ঝঙ্কার নীরব। ইতি—'বীণা'।

বৌদি কখন ঘর থেকে চলে গেছে। যে দিকে তাকাই ঝাপসা আবছা বাষ্প যেন আমায় গ্রাস করে রেখেছে। তবু কোন্ সুদূর হতে ভেসে আসে মধুর কণ্ঠে সে কি করুণ গানখানি—ওগো সুন্দর .....

নমস্কার হে রবীন্দ্র

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক

নমস্কার হে রবীন্দ্র, এ দীনের লহ' নমস্কার !
হে বিশ্ববন্দিত কবি, লহ আজি ভক্তি-উপহার।
তোমার বিপুল দান বঙ্গবাণী-জননীর করে,—
মূর্ত্ত রবে দীপ্তরূপে চিরতরে জগতের ঘরে।
তুমি ত চিনালে মা'কে দেশে দেশে নানা ছন্দে গানে,
বিচিত্র সে রূপপ্রভা উজলিল সারা বিশ্বপ্রাণে।

মৃন্ময়ী জননী নয়, দেশমা'র দিব্য মূর্ত্তিখানি
এঁকে দিলে সাত কোটি তনয়ের বুকে, ভাল জানি।
পল্লীবাটে নদীকূলে বটছায়ে মা'র হাসি ফোটে,
তুমি ত হেরেছ তাহা, প্রাণ তব ওইখানে ছোটে
হেরি মোরা মুগ্ধ হ'য়ে—হে সন্ধানী, কি পেলে ওখানে ?
বাঙলা মাকে !—তাঁরই শুভ দৃষ্টি বুঝি পড়িয়াছে প্রাণে।

রাখাল চাষীর ঘর—সে যে মোর জননীর ঠাঁই —
তুমি ত বোঝালে তাহা; সেথা মা'র স্বর্ণ ঝাঁপি পাই।
অনাদরে ঘৃণাভরে যাহাদেরে রাখিয়াছি ঠেলে,
তাদের কুটীর মাঝে জননী যে স্নেহদীপ জেলে
উজলি' আছেন ব'সে,—এ বারতা জানাইলে সবে,
তোমার অতুল কীর্ত্তি ধরা মাঝে চিরোজ্জ্বল রবে।

পুস্তক পরিচয়

পটুয়া সঙ্গীত—শ্রীগুরুসদয় দত্ত, সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বাঙলার ভাবের একজন খাঁটি ভাবুক। 'প্রেমের দৃষ্টিতে হয় স্বরূপ প্রকাশ'—বাঙলাদেশের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের প্রভাবে বাঙলার পল্লী-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁহার প্রাণের পরিচয় হইয়াছে। বাঙলার পল্লী-নৃত্য এবং ভাস্কর্য্য, গীতি এবং চিত্র—এগুলি এতদিন বাঙলার শিক্ষিত সমাজের দ্বারা একরূপে অবজ্ঞাত ছিল, দত্ত মহাশয় বিজাতীয় আবহাওয়ার সেই প্রভাব হইতে দেশবাসীর চিত্তকে অন্তর্ম্মুখীন করিয়াছেন, ঘরের সম্পদ দেখাইয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের পটুয়া সঙ্গীত তাঁহার বহু বৎসরের সুদীর্ঘ সাধনার ফল। গত ১৯২৯ সাল হইতে বাঙলার পল্লী-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের সাধনায় তিনি প্রবৃত্ত হন, ১৯৩১ সাল হইতে বাঙলার পট-চিত্রের সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করিতে থাকেন। এই সম্পর্কে বিভিন্ন মাসিকপত্রে তিনি অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং পটুয়া চিত্রের স্থান রস-শিল্প হিসাবে যে কত উচ্চে—দেশবাসীকে তাহা দেখাইয়াছেন।

আলোচ্য পুস্তকের ভূমিকায় দত্ত মহাশয় এই চিত্র-শিল্প এবং সঙ্গীতের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকের 'পরিচায়িকা' বা ভূমিকাটি এই দিক হইতে মূল্যবান হইয়াছে। সকলের দৃষ্টিতে সব জিনিষ ধরা পড়ে না, বিশেষত রসের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব গূঢ়, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে, তাহার মর্ম্ম ধরিতে হইলে প্রেমের প্রয়োজন হয়। দত্ত মহাশয়ের বাঙলার প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় এই পরিচায়িকায়।

দত্ত মহাশয় পটুয়া, পট-চিত্র এবং পট-গীতির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'আজকাল শিল্পী বলিতে আমরা যাহা বুঝি পশ্চিম বাঙলার পটুয়াগণ সেই শ্রেণীর শিল্পী নহে। ইহারা স্বকপোলকল্পিত অথবা আত্মখেয়ালপ্রসূত কোন বিষয়ে চিত্র-লেখনের চেষ্টা করে নাই। জাতির গভীর অধ্যাত্ম জীবনে যে ভাব-নদীর ধারা অবিরত প্রবাহিত হইত, ইহারা সেই ভাব-ধারার সঙ্গে আপন আত্মাকে ওতপ্রোতভাবে পরিপ্লুত করিয়া একান্ত-ভাবে তাহারই ভক্ত সাধক হইয়া সেই ভাব-ধারা সম্পাদিত রসাবলীর সহজ রূপ সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং একাধারে ইহারা ভক্তসাধক, কবি, গায়ক ও চিত্র-শিল্পী অর্থাৎ একদেশ-দর্শী শিল্পী নহে; আত্মার সুগভীর ভাবরসের ও ভক্তির, চিত্র-শিল্পের, কাব্যের ও সুরের স্রষ্টা ও সাধকরূপ পূর্ণাঙ্গ শিল্পী।'

ভক্তির একনিষ্ঠ প্রবাহের ফলে এই গীতিকাগুলি সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত রস-সম্পদে ভরপুর।'

'গীতিকায় যাহা উহ্য, তাহার অভিব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে চিত্রে, আবার চিত্রে যাহা উহ্য তাহার অভিব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে গীতিকায়।'

বাঙলার এই সব রস-শিল্পের সাধনা, এইদিক হইতে আধ্যাত্মিকতার অখণ্ড অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলি কেবল বাবসা হিসাবে বাহির চটক লইয়াই থাকে নাই, সমগ্র জাতীয় জীবনকে গভীর অধ্যাত্ম আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে এবং আজ যদি বাঙলার জাতীয় জীবনকে নাড়া দিতে হয়, বাঙলাদেশের এই স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ এবং স্ব-ধারা ধরিয়াই করিতে হইবে। শুধু শুধু বিদেশী রাজনীতির থিওরি আওড়াইলে চলিবে না।

বাঙলার জাতীয়তাবাদী সাধকগণ এই তত্ত্বটি একদিন বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনী-কুমার, অরবিন্দ এই পথে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দেশবন্ধু দাশ একান্তভাবে নিজেকে বঙ্গের ভাব-সাধনায় নিমগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। সেইভাবে তাহাদের রাজনীতিক সাধনা অধ্যাত্ম সাধনার স্তরে উন্নীত হইয়া জাতির অন্তরের সঙ্গে মাধুর্য্য-রসসূত্রে যুক্ত হইয়াছিল। আত্মীয়তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাঁহারা পাতাইতে পারিয়াছিলেন জাতির সঙ্গে। দত্ত মহাশয়ের পটুয়ার সঙ্গীত বাঙলার আত্মার চিরন্তন স্বাধীনতাপরায়ণতার স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত নিদর্শন স্বরূপে স্বাদেশিকতার উদ্বোধনে সহায়তা করিবে। বাঙালীকে ঘরের দিকে ফিরাইবে; বাঙালী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের উন্মেষ সাধন করিবে।

পুস্তকের বাঁধাই, ছাপা—সাজ-সজ্জা সর্ব্বাংশে সুন্দর। দত্ত মহাশয় বাঙলার নানাস্থানে ঘুরিয়া পটুয়াদের বহু চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই সংগ্রহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পট-চিত্রগুলির প্রতিচ্ছবি এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।

বাঙলাদেশে শিল্পী যামিনী রায় সকলেই নহেন, তথাপি সাধারণেও বুঝিতে পারিবেন হুবহু প্রতিকৃতির অপেক্ষা অন্তর্ভাবের অভিব্যঞ্জনার দিক হইতে এই চিত্রগুলি কত উচ্চে। দত্ত মহাশয়ের পটুয়া সঙ্গীত বাঙলার সাহিত্যে একটি স্থায়ী অবদান স্বরূপ হইবে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই পুস্তকের প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের একটি বড় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

ছেলেদের গীতা—অধ্যাপক হরিপদ শাস্ত্রী এম-এ। মূল্য ।৵০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বইখানার নাম দেখিয়া আমরা আগ্রহসহকারে বইখানা পড়িয়াছি। কারণ এই ধরণের বই বাঙলা দেশে এক রকম নূতন বলা যায়। লেখকও সুপণ্ডিত ব্যক্তি; কিন্তু এই সব বিষয় ছেলেদের মতন করিয়া উপস্থিত করিতে হইলে যতটা সরল করিয়া এবং সরস ভাবে সংযত ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে হয়, বিশ্লেষণ এবং নির্ব্বাচনের যে কৃতিত্বের প্রয়োজন হয়, পুস্তকখানাতে যথেষ্ট রকম তাহা যে পাইয়াছি, এমন কথা বলিতে পারি না। দার্শনিক পারিভাষিক প্রভাব হইতে ভাষাকে যথাসম্ভব মুক্ত করিয়া উপস্থিত করিতে না পারিলে এসব জিনিষ কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের উপভোগ্য করা যায় না এবং তাহা করিতে গেলে সূক্ষ্মতার দিকে বেশী রকমে না গিয়া স্থূলে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নৈতিক কর্ত্তব্যের উপরই জোর দিতে হয়। সেই কর্ত্তব্য প্রণোদনার মুখে দেশাত্মবোধ, অন্যায় প্রতিরোধের প্রবৃত্তি, শিক্ষানুরাগ, সমাজ-সেবা, মানবতা অনেক কথাই ছেলেদের উপভোগ্যভাবে গীতার ভিতর দিয়া উপস্থিত করা সম্ভব হইতে পারে। সে ভাবে গীতা ছেলে-মেয়েদের বুঝাইবার প্রয়োজন দেশে যথেষ্টই রহিয়াছে। গ্রন্থকার এই দিকে পথ দেখাইয়াছেন, এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

সাহিত্য-সংবাদ

সাহিত্য

সত্যেন্দ্র স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা

'বেহালা যুব সম্প্রদায়ের"র উদ্যোগে একটি রচনা প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে কোন "ভর্ত্তি ফি" লাগিবে না। জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে ছাত্র-ছাত্রীমাত্রেই ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন। প্রত্যেক রচনা বাঙলা ভাষায় এবং ফুলস্কেপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিতে হইবে। রচনার সহিত স্বতন্ত্র কাগজে নাম, ঠিকানা, স্কুলের বা কলেজের নাম, শ্রেণী এবং তৎসহ স্কুল বা কলেজের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী বা প্রিন্সিপ্যালের সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে। সম্প্রদায় নির্ব্বাচিত বিচারকদিগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। রচনা গ্রহণের শেষ তারিখ ২৭শে আশ্বিন, ১৩৪৬ সাল (14. 10. 39)। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত রচনাসমূহ পুরস্কার বিতরণী সভায় পঠিত হইবে এবং রচনাগুলির মনোনীত লেখক-লেখিকাদিগকে একখানি করিয়া পুস্তক এবং একটি করিয়া রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

রচনার বিষয়সমূহ

১। "ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসীর কর্ত্তব্য"
(কেবলমাত্র কলেজের ছাত্রদের জন্য)।

২। "ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতরমণীর কর্ত্তব্য"
(কেবলমাত্র কলেজের ছাত্রীদের জন্য)।

৩। "মাতৃভক্তি" (কেবলমাত্র স্কুলের বালকদের জন্য)।

৪। "জীবগণে পূজে যেই, সেইজন পূজিছে ঈশ্বর"
(কেবলমাত্র স্কুলের বালিকাদের জন্য)।

যাঁহারা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সতর্কতার সহিত উপরোক্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী তাঁহাদের লিখিত রচনাগুলি পাঠাইবেন।

শ্রীনির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর রোড, বেহালা, দক্ষিণ কলিকাতা।

গল্প প্রতিযোগিতা

"পাথরঘাটা (চট্টগ্রাম) বিদ্যানিকেতন" কর্ত্তৃক পরিচালিত হাতের লেখা "জাগরণী" পত্রিকায় যে কোন বিষয়ে একটি ছোট গল্প ও "মহাযুদ্ধ কি আসন্ন ?" একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইবে। যাঁহারা শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া সুদৃশ্য রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে। গল্প প্রতিযোগিতায় শুধু স্কুলের ছাত্রেরাই যোগ দিতে পারিবেন। মনোনীত গল্প ও প্রবন্ধ "জাগরণী"তে প্রকাশিত হইবে। লেখাগুলি ৩০শে আশ্বিন তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌঁছাইতে হইবে। পরেশচন্দ্র সেন, সেক্রেটারী (পত্রিকা বিভাগ), "বিদ্যানিকেতন", পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।

চন্দননগর—গোন্দলপাড়া সম্মেলন

(অম্বিকাচরণ স্মৃতি মন্দির)

ষষ্ঠদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা—১৯৩৯।

বিষয়ঃ—১। সর্ব্বসাধারণের জন্য আবৃত্তি—"বন্দীর বন্দনা"—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত "বিপ্লবী নায়িকা" নামক পুস্তক হইতে। প্রবন্ধঃ—চন্দননগরের বর্ত্তমান ছাত্র যুবকদের কর্ত্তব্য।

২। সেকেণ্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আবৃত্তি—"বুদ্ধিমান ছেলে" শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার লিখিত "গান, আবৃত্তি, অভিনয়" নামক পুস্তক হইতে।

৩। মহিলাদের জন্য সূচীশিল্প প্রতিযোগিতাঃ—কেবল মাত্র মহিলারা ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন। রুমালের মাপ ১৮"×১৮" ইঞ্চি হইবে ও উহার একটি কোণে বাঙলায় "গোন্দলপাড়া সম্মেলন চন্দননগর" এই কথা কয়টি লিখিতে হইবে।

নিয়মাবলীঃ—(ক) আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯।

(খ) রুমাল ও প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ৭ই অক্টোবর ১৯৩৯।

(গ) "মহালয়ার দিন" আবৃত্তি প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।

(ঘ) যাঁহারা নাম দিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সম্পাদকের নিকট "গোন্দলপাড়া সম্মেলন, অম্বিকাচরণ স্মৃতি-মন্দির" এই ঠিকানায় আবেদন করিতে পারেন; অথবা নিম্নলিখিত যে কোন ব্যক্তির নিকট নাম লিখাইতে পারেন। তাঁহার নিকটেই আবৃত্তির জন্য কবিতা চিঠিপত্র ও অন্যান্য সংবাদ পাওয়া যাইবে। বিনীত—

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, গোন্দলপাড়া সম্মেলন। শ্রীবিজয়কুমার সরকার এম-এ, শিক্ষক, ভদ্রেশ্বর হাইস্কুল। শ্রীমৃণালকুমার ঘোষ এম-এ, শিক্ষক, গড়বাটী হাইস্কুল। শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায় (চুঁচুড়া)। শ্রীহরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যা বি-এল, শিক্ষক, ডুপ্লে স্কুল। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায় এম-এ, অধ্যাপক, ডুপ্লে কলেজ। শ্রীকৃষ্ণদাস পাল এম এ, শিক্ষক, বঙ্গ বিদ্যালয়। কুমারী মাধুরী ব্যানার্জ্জি (শিক্ষয়িত্রী, কাশীশ্বরী পাঠশালা)। কুমারী কমল দাস (ছাত্রী, হুগলী কলেজ)। কুমারী উমা ব্যানার্জ্জি (ছাত্রী, কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির)।

ফলাফল

বিগত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত (চৈতালী সঙ্ঘের সাহিত্য-শাখার উদ্যোগে) রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

১। শ্রীশচীন্দ্রনাথ চৌধুরী (আশুতোষ কলেজ), ২। শ্রীঅনিলকুমার ত্রিপাঠী (মেদিনীপুর), ৩। শ্রীঅমরকৃষ্ণ বসু (খুলনা), বিশেষ পুরস্কার—শ্রীভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া কলেজ)। শ্রীপ্রভাতকুমার হালদার, সম্পাদক, সাহিত্য-শাখা।

প্রবন্ধ বিচার ফল

পাইকপাড়া লাইব্রেরী

১৭নং চন্দ্রনাথ সিমলাই লেনস্থ পাইকপাড়া সাধারণ পাঠাগারের বিগত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরুষদিগের মধ্যে শ্রীমান গোপালচন্দ্র সাধু প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন এবং মহিলাদিগের মধ্যে শ্রীমতী রেণু লাহিড়ী প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়কে আগামী ১৪ই আশ্বিন পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব সভার অনুষ্ঠানে পারিতোষিক প্রদান করা হইবে। ইতি—

সুবিখ্যাত ছায়াচিত্র পরিচালক শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে মেনিঞ্জাইটিস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র ভারতের ছায়াচিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে একজন পথ-প্রদর্শক ও উচ্চশ্রেণীর পরিচালক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইদানীং তিনি নিজেই একটি ফিল্ম কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচালনায় তোলা ছবি কয়খানির মধ্যে "মা" ও "গৌরাঙ্গ" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও চরিত্রমাধুর্য্যের জন্য সকলের খুবই প্রিয় ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

*　　*　　*　　*　　*

ক্যালিফোর্নিয়ার লস-এঞ্জেলস শহরে আমেরিকার ছায়াচিত্র প্রযোজক কার্ল লেমেলের মৃত্যু হইয়াছে। কার্ল লেমেল একজন খ্যাতনামা প্রযোজক ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর অনেক ছবি তিনি তুলিয়াছিলেন; তন্মধ্যে "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রণ্ট" অন্যতম।

কার্ল ১৮৬৭ সালে জার্ম্মানীর অন্তর্গত লপহেমে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে তিনি আমেরিকার ইউনিভার্সেল পিকচার্স কর্পোরেশনের অংশীদার হন।

রঙমহলে 'মাটির ঘর'

নবীন নাট্যকার শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "মাটির ঘর" রঙমহলে অভিনীত হইতেছে। নাটকখানির প্রযোজনা করিয়াছেন প্রভাত সিংহ ও পরিচালনা করিয়াছেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ অনাদি দস্তিদার। ইহার বিভিন্ন বিশিষ্ট ভূমিকায় দুর্গাদাস, প্রভাত সিংহ, তারা ভট্টাচার্য্য, সিধু গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, পদ্মাবতী, ঊষারাণী, শান্তি, বেলারাণী প্রভৃতি। অধিকসংখ্যক চরিত্রকে সমানভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে নাটকের যে দোষ ঘটে আলোচ্য নাটকখানিতেও তাহাই ঘটিয়াছে। বহু চরিত্রকে সমানভাবে চিত্রিত করিতে যাইয়া নাট্যকার কোন চরিত্রকেই ভালভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই; বরং বিভিন্ন চরিত্রের এক 'জগা খিচুড়ী' তৈরী করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

নাট্য-ভারতীতে "আবুল হাসান"

নাট্য-ভারতীতে (এলফ্রেড থিয়েটার) শ্রীশচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটক "আবুল হাসান" এর অভিনয় সম্প্রতি আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। নাটকখানি পুরাণ। অধুনালুপ্ত রঙ্গমহল নাট্যমঞ্চে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ইহা পূর্ব্বে বহুবার অভিনীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা ইহা অভিনয় করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বহু কৃতবিদ্য অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন। মদন্না পণ্ডিতের ভূমিকায় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔরংজেবের ভূমিকায় সন্তোষ সিংহ, মমতাজের ভূমিকায় রাণীবালা ও মা-সাহেবার ভূমিকায় সুহাসিনীর অভিনয় আমাদের ভাল লাগিয়াছে। আবুল হাসানের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর যান্ত্রিক অভিনয় কাহারও ভাল লাগিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। নাটকের দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা বিশেষত্ব-বর্জ্জিত।

নিউ সিনেমায় 'আপ কী মরজী'

সুদামা প্রডাকসানস্-এর ছবি 'অ্যাজ ইউ প্লিজ' বা 'আপ্ কী মরজী' বর্ত্তমানে নিউ সিনেমায় দেখান হইতেছে। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন সর্ব্বোত্তম বাদামী ও ইহার সুর-শিল্পীর কাজ করিয়াছেন জ্ঞান দত্ত। ইহার বিভিন্ন ভূমিকায় সবিতা দেবী, মতিলাল, বাসন্তী, মজহর প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানির দৈর্ঘ্য বেদনাদায়ক। ইহার নারী চরিত্রে যাহারা অভিনয় করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বাসন্তী ব্যতীত অন্যান্য সকলকেই অধিকাংশ সময় অস্বাভাবিক অবস্থাধীন বলিয়া মনে হয়। হয়ত ইহার জন্য বইখানির আখ্যানভাগের অতি আধুনিকত্বই দায়ী। মোহনলালের অভিনয় আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। সবিতা দেবীর শেষের দিকে কয়েকটি দৃশ্যের অভিনয়ও মন্দ হয় নাই। বাসন্তীর অভিনয় বিশেষ করিয়া তাহার গান কয়খানি ছবিটির বিশেষ সম্পদ।

শারদীয়া সংখ্যা
"দেশ"

মূল্য—তিন আনা।

দেশ পত্রিকার আগামী ৪৮শ সংখ্যাই শারদীয়া সংখ্যারূপে ১৪ই অক্টোবরের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্বানুসৃত প্রথানুযায়ী পরবর্ত্তী সপ্তাহে দেশ প্রকাশ বন্ধ থাকিবে। ৪৯শ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে ২৮শে অক্টোবর। ধারাবাহিক প্রবন্ধ-উপন্যাসাদি শারদীয়া সংখ্যায় সন্নিবেশিত হইবে না। ৪৯শ সংখ্যা হইতে পুনরায় ঐ সকল যথারীতি স্থান লাভ করিবে।

সম্পাদক—"দেশ"

ষ্টুডিও সংবাদ

নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী ছবি "কপালকুণ্ডলা" বাঙলার বাহিরে বহু চিত্রগৃহে অনেকদিন হইতে দেখান হইতেছে। কলিকাতার নিউ সিনেমায় আগামী ১৪ই অক্টোবর ইহা মুক্তিলাভ করিবে ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন ফণী বর্ম্মা এবং ইহাতে কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, নবকুমার প্রভৃতির ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন যথাক্রমে লীলা দেশাই, কমলেশ কুমারী, নাজম প্রভৃতি।

নীতীন বসুর "জীবন-মরণ" ছবিখানির কার্য্য শেষ হইয়াছে। খুব সম্ভব ছবিখানি আগামী ১৪ই অক্টোবর চিত্রায় মুক্তিলাভ করিবে।

প্রমথেশ বড়ুয়া তাহার পরবর্ত্তী ছবি "প্রিয় বান্ধবীর" কাজ লইয়া খুবই ব্যস্ত আছেন। সু-সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধ সান্যালের উপন্যাস প্রিয় বান্ধবী হইতে ছবিখানির আখ্যানভাগ লওয়া হইয়াছে। যমুনা ও সাইগল ইহার বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করিবেন।

*　　*　　*　　*　　*

ফিল্ম প্রডিউসার্স লিমিটেড তাহাদের প্রথম ছবির আখ্যানভাগের জন্য শ্রীনিরঞ্জন পালের "মায়ের ডাক" শীর্ষক গল্পটি মনোনয়ন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্ত্তমানে তাঁহারা ছবিখানির জন্য শিল্পী সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন।

বাঙলার খেলা-ধূলার উৎসাহের কি অপমৃত্যু হইবে?

অনেক সময়েই আমরা শুনিয়া থাকি, বর্ত্তমানে বাঙলাদেশে খেলাধূলা বিষয়ে কল্পনাতীত উৎসাহ জাগিয়াছে। বাঙলাদেশের বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া সকলেই খেলা-ধূলার মধ্যে অপূর্ব্ব সজীবতা ও আনন্দ লাভ করিতেছে। ব্যায়াম উৎসাহিগণ এই উৎসাহ ও উদ্দীপনা বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে যাহাতে বাঙলাদেশ খেলা-ধূলার সকল বিষয়ে অভাবনীয় উন্নতি করিতে পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন ও করিতেছেন। অদূর ভবিষ্যতেই বাঙলাদেশ নাকি ক্রীড়া জগতের সর্ব্ববিষয়ে ভারতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

যাঁহারা এই সকল মতামত প্রচারের জন্য দায়ী তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে মহৎ সে সম্বন্ধে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই, তবে তাঁহাদের সাফল্যের পথে যে বিরাট বাধা ধীরে ধীরে ঘনীভূত হইতেছে সেই দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই দেখিয়া আমরা বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। বাঙলাদেশে খেলা-ধূলার উৎসাহ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই কথাও বলিতে দ্বিধা বোধ করি না যে, বাঙলাদেশের এই খেলা-ধূলার বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার অপমৃত্যু ঘটাইবার জন্যও বিশেষ তোড়জোড় চলিয়াছে। খেলা-ধূলার উন্নতিকল্পে যে সকল সুব্যবস্থা করা হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন, আমরা তাহার মধ্যে ধ্বংসলীলার প্রচ্ছন্ন ছবিই দেখিতে পাইতেছি। সুপরিচালনার নামে কতকগুলি স্বার্থান্বেষী লোক খেলা-ধূলার বিভিন্ন বিভাগে গণ্ডগোলের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছেন বলিয়া বুঝিতে পারি। এই সকল লোক এতই কর্ম্মতৎপর যে বাঙলাদেশের খেলা-ধূলার এমন একটি বিভাগ নাই যেখানে বিরোধ বা দলাদলি সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন নাই। কি ফুটবল, কি সন্তরণ, কি ভলিবল, সকল বিষয়েই পরিচালনার ভার দখল করিবার জন্য রীতিমত দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। এই সকল বিষয় পরিচালনার জন্য নব নব ফেডারেশন, নব নব এসোসিয়েশন গঠিত হইতেছে। যে বিষয়টি পরিচালনার জন্য এসোসিয়েশন বর্ত্তমান আছে সেই বিষয়ের জন্য নূতন ফেডারেশন ও যে বিষয়ের ফেডারেশন বর্ত্তমান আছে সেই বিষয়ের জন্য এসোসিয়েশন গঠিত হইতেছে। অথচ এই সকল নব নব ফেডারেশন বা এসোসিয়েশন বিজ্ঞপ্তি-পত্রের মধ্যে প্রচার করিতেছে "সুপরিচালনার জন্য গঠিত হইয়াছে।" সুপরিচালনা যদি ইহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য তবে একটি পরিচালনা কমিটি বর্ত্তমান থাকিতে আর একটি নূতন পরিচালনা কমিটি ভিন্ন নামে গঠন করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। পূর্ব্বের গঠিত কমিটির পরিচালনার দোষ-ত্রুটি দূর করিয়া সুপরিচালনার ব্যবস্থা তাঁহারা করিতেন। ইহার উত্তরে একটি যুক্তি ইঁহারা দেখাইতে পারেন যে দোষ-ত্রুটি দূর করিবার চেষ্টা করিয়া সক্ষম না হওয়ায় এইরূপ পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সেই যুক্তি সাধারণের মনস্তুষ্টি করিতে পারে, কিন্তু আমাদের পারে না। আমরা জানি ও বিশ্বাস রাখি যে একনিষ্ঠ নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার সাফল্যের পথ কেহই রোধ করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের প্রচেষ্টার মধ্যে কিছু গলদ যে ছিল সেই বিষয় আমাদের কোন সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া পুরাতন এসোসিয়েশন বা ফেডারেশনের বিরুদ্ধে নূতন এসোসিয়েশন বা ফেডারেশন গঠন করিয়া তাঁহারা বাঙলার খেলা-ধূলার যে বিরাট ভবিষ্যত কল্পনা করিতেছেন, তাহা কোনদিনই বাস্তবে পরিণত হইবে না কল্পনাতেই শেষ হইবে। পুরাতন কমিটি নিজের অস্তিত্ব রাখিবার জন্য যত প্রকার কৌশল সম্ভব, অবলম্বন করিবে এবং নূতন কমিটিও নিজ আধিপত্য বিস্তারের জন্য কৌশল অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। ফলে দুই কমিটির মধ্যে দ্বন্দ্ব দিন দিন তীব্র হইতে তীব্রতর হইবে। এবং উভয় কমিটিই প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া একে অপরকে অপদস্থ করিবার জন্য ফন্দি-ফিকির আবিষ্কারে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। খেলা বিষয়টি দুইটি পরিচালকমণ্ডলীর দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া দিন দিন অবনতির পথে চালিত হইবে। বর্ত্তমান বাঙলাদেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। কি ফুটবল, কি সন্তরণ, কি ভলিবল, কি কুস্তি সকল বিষয়েই দলাদলি ক্রমশই তীব্রতর হইয়া পড়িতেছে। এই দ্বন্দ্বের যে অবসান শীঘ্র হইবে তাহার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আই-এফ-এ নিজ সিদ্ধান্তে অটল হইয়া বসিয়া আছে, অপর দিকে বিদ্রোহী দলসমূহ বি-এফ-এ গঠন করিয়া রীতিমত ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভও করিয়া দিয়াছে। বেঙ্গল ভলিবল এসোসিয়েশন নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য নানাপ্রকার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতেছে। নব গঠিত ভলিবল ফেডারেশন নিজ শক্তির পরিচয় দিবার জন্য সামান্য কয়েকটি ক্লাবকে অবলম্বন করিয়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছে। সন্তরণ বিভাগে ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সহিত ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের দ্বন্দ্বের অবসান না হওয়ায় বাঙলার সন্তরণ দিন দিন অবনতির পথে চালিত হইতেছে। হাডু-ডু খেলায় বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন ও নিখিল বঙ্গ কপাটী-সঙ্ঘের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। কুস্তি বিভাগেও অনুরূপ কলহ বিদ্যমান। এইরূপভাবে বাঙলার খেলাধূলার সকল বিভাগেই বিরোধ, গণ্ডগোল বর্ত্তমান এবং সকল বিভাগের বিরোধ ক্রমশই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং এই অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ছাড়া বাঙলার খেলাধূলার অপমৃত্যু যে অনিবার্য্য ইহাতে কি সন্দেহ আছে?

সমর-বার্ত্তা

১৯শে সেপ্টেম্বর—

লালফৌজের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগামী সৈন্য দল লাউ এবং ভিলনার দিকে অগ্রসর হইতেছে। রুশ প্রধান সেনাপতি মার্শাল ভোরোশিলফ পোল্যাণ্ডে লালফৌজ-বাহিনীর পরিচালনা করিতেছেন।

জার্ম্মানবাহিনী ব্রেষ্টলিটোভস্ক শহর সোভিয়েট বাহিনীর হাতে ছাড়িয়া দিয়া শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। এই শহরটি সোভিয়েটের হাতেই থাকিবে।

পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট মসিকি ও সমগ্র মন্ত্রিমণ্ডলী রুমানিয়ার সেরনভিট্জ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

জার্ম্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ ওয়ারসর রক্ষী সৈন্য ও বে-সামরিক অধিবাসীদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে আহ্বান করে; কিন্তু পোলরা আত্মসমর্পণ না করায় জার্ম্মান সৈন্যেরা পুনরায় চারিদিক হইতে নগরী আক্রমণ করিয়াছে। ওয়ারসর ১০ লক্ষ অধিবাসীর পক্ষ হইতে পোল সৈন্যগণ এখনও নগরী রক্ষা করিতেছে।

জার্ম্মানরা দাবী করিতেছে যে, এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ হাজার লোককে তাহারা বন্দী করিয়াছে এবং বিপুল সমরসম্ভার হস্তগত করিয়াছে।

বুখারেষ্টের সংবাদে প্রকাশ, ১০ হাজার পোল সৈন্যকে নিরস্ত্র করিয়া রুমানিয়ায় অন্তরীণ করা হইয়াছে।

পশ্চিম রণক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করিয়া সারব্রুকেন অঞ্চলে ফরাসী গোলন্দাজবাহিনী গোলা বর্ষণ করে। ফরাসী নৌ-বহরের আক্রমণে শত্রুপক্ষের একটি সাবমেরিন ধ্বংস হইয়াছে।

পোল্যাণ্ডের উপর সোভিয়েট আক্রমণের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বৃটিশ সরকারের এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, বৃটেনের মিত্র যখন জার্ম্মানীর বিপুল শক্তির দ্বারা পর্য্যুদস্ত, তখন তাহাকে আক্রমণ করিবার যে যুক্তি সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন, তাহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মতে ঠিক নয়। এই সকল ঘটনার পূর্ণ তাৎপর্য্য এখন স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে না; তবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই উপলক্ষে বলিতেছেন যে, পোল্যাণ্ডের প্রতি তাঁহাদের বাধ্যবাধকতা পালনের জন্য এবং লক্ষ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণোৎসাহে যুদ্ধ চালাইবার জন্য সমগ্র জাতির সমর্থনে গবর্ণমেণ্ট যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহার তারতম্য ঘটিতে পারে, এমন কিছু ঘটে নাই।

হের হিটলার ডানজিগের অধিবাসীদের নিকট এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সদম্ভ ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধ তিন বা সাত বৎসর স্থায়ী হইলেও জার্ম্মানীর পক্ষ হইতে আত্মসমর্পণের কোন কথাই উঠিবে না। তিনি বলেন, "আমাদের উপর পতিত একটি বোমার উত্তর আমরা ৫টি বোমা দিয়া দিব। এমন এক মারণাস্ত্র আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, যাহা জগতের অপর সকল জাতির অপরিজ্ঞাত; সকলকে আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি, আমাদের বিরুদ্ধে যাহারা অঙ্গুলি উত্তোলন করিবে, তাহাদিগকে কৃতকার্য্যের জন্য পরিণামে যথেষ্ট অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে। তখন মানবতার নাম করিয়া আমাদের উপর দোষারোপ করা চলিবে না।"

২০শে সেপ্টেম্বর

জার্ম্মান কমাণ্ডার ইন-চীফ জেনারেল ভন ব্রাউশিচ ঘোষণা করিয়াছেন যে, পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শেষ হইয়াছে এবং পোলিশ বাহিনী ধ্বংস হইয়াছে। জেনারেল ব্রাউশিচ গতকল্য পশ্চিম-রণক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছেন।

জার্ম্মান বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বাহিনী সমগ্র রুমানিয়-পোলিশ সীমান্ত অধিকার করিয়াছে। কুটি দখলের সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট বাহিনীর পোলিশ সীমান্ত দখল শেষ হইয়াছে।

রাশিয়া পোল্যাণ্ড অভিযান করায় বহু পোলিশ সামরিক কর্ম্মচারী যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ভগ্ন হৃদয়ে রুমানিয়ায় গিয়াছেন। প্রায় ৬০ হাজার সামরিক ও অসামরিক আশ্রয়প্রার্থী রুমানিয়ায় পৌঁছিয়াছে।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন কমন্স সভায় যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁহার তৃতীয় বিবৃতি দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ইউরোপকে জার্ম্মান আক্রমণের ভীতি-মুক্ত করাই বৃটিশের প্রধান লক্ষ্য। হিটলারের ডানজিগ বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া মিঃ চেম্বারলেন বলেন, "যত ভয়ই দেখান হউক না কেন, আমরা অথবা আমাদের মিত্র ফরাসীগণ কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব না।"

প্যারিসের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চূড়ান্তভাবে জয়লাভ না করা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে সব সামরিক ও আর্থিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, মন্ত্রিসভা তাহা অনুমোদন করিয়াছে। ফ্রান্স ঘোষণা করিয়াছে যে, জার্ম্মানীর নিকট হইতে কোন শান্তি প্রস্তাব আসিলে তাহা বিবেচিত হইবে না।

২১শে সেপ্টেম্বর—

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য সোভিয়েট বাহিনী গ্রোডনো, কোভেল এবং লাউ অধিকার করিয়াছে। পক্ষান্তরে পোলরা দাবী করিতেছে যে, তাহারা লাউ রক্ষা করিতেছে। রবিবার পোলিশদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে জার্ম্মান বাহিনীর দুইটি ডিভিশন সান নদীর তীরে হটিয়া যায়। এই যুদ্ধে দুইজন জার্ম্মান জেনারেল নিহত হন। তন্মধ্যে জেনারেল রিটউইজ অন্যতম। পোলরা পশ্চিমে জুরা ও ভিস্চুলা নদী এবং পূর্ব্বে ওয়ারস পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড এখনও নিজেদের অধিকারে রাখিয়াছে।

রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ কালিনেস্কু কাইপায় "আয়রন গার্ডের" হস্তে নিহত হইয়াছেন।

২২শে সেপ্টেম্বর—

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, পিসা, নারিউ, ভিশ্চুলা ও সান নদীসমূহের বরাবরে সীমান্ত স্থির করিয়া পোল্যাণ্ড ভাগাভাগি করিয়া লইতে জার্ম্মান ও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট রাজী হইয়াছেন। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সীমান্ত নোভোগ্রোডের ২০ মাইল উত্তরে পোল পূর্ব্ব প্রুশিয়ার সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে মডলিন পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে ওয়ারসর ভিতর দিয়া স্যাণ্ডোমায়াজের উত্তরে ভিশ্চুলা ও সান্ নদীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। এ স্থান হইতে জেমাসলের ভিতর দিয়া সান নদীর বরাবর এই সীমান্ত রেখা লুপকাওয়ের নিকটে হাঙ্গেরীর সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অর্থাৎ সমগ্র পোল-রুমানিয়া ও পোল-লুথোনিয়ার সীমান্ত সোভিয়েটের করায়ত্ত হইবে।

পোল্যাণ্ড ভাগাভাগি সম্পর্কে ওয়ারস শহরটি ভিশ্চুলা নদী দ্বারা বিভক্ত হইবে। সহরের বৃহত্তর এবং অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ ভিশ্চুলা নদীর পশ্চিম বা বাম তীরে অবস্থিত। কাজেই জার্ম্মানী ও সোভিয়েটের মধ্যে এই ভাগাভাগিতে উহা জার্ম্মানীর বখরায় পড়িবে। নদীর দক্ষিণ বা পূর্ব্ব তীরে শহরের যে অংশ অবস্থিত, তাহা আকারে পশ্চিম-তীরের অংশের প্রায় অর্দ্ধেক এবং শহরতলী বলিয়া পরিচিত। উহাকে প্রাগা বলা হয়। শহরের এই অংশ পড়িবে সোভিয়েটের বখরায়।

সোভিয়েট সৈন্যেরা লাউ শহর দখল করিয়াছে। কোয়েল ও ক্রোয়েডন শহরও সোভিয়েট দখল করিয়াছে।

সার রণাঙ্গনে ফরাসী বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত আছে। ফরাসীরা সুয়েটব্রুকেনে তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে। সারব্রুকেনের দক্ষিণ অঞ্চলে এবং ব্লাইস নদীর উভয় তীরে ফরাসী সেনাবাহিনী গুলী চালায়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৯শে সেপ্টেম্বর—

মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি যুদ্ধ সম্পর্কে এক দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। কমিটি পোল্যান্ড, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছে এবং জার্ম্মাণীর অহেতুক আক্রমণের নিন্দা করিয়াছে। কমিটি মনে করে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও বড়লাট যদি কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে মুসলমানদের জন্য ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তাহা হইলে এই সঙ্কট সময়ে বৃটেনের পক্ষে মুসলমানদের পূর্ণ সহায়তালাভ সম্ভবপর হইবে না। ভারতের স্বাধীনতালাভের পক্ষপাতী হইলেও কমিটি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিয়াছে যে, মুসলিম লীগের সহিত পরামর্শ না করিয়া এবং তাহার অনুমোদন ছাড়া কোন শাসন-সংস্কার ঘোষণা করা উচিত হইবে না।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র গত ৮ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় মিঃ বি সি চ্যাটার্জ্জি কর্ত্তৃক লিখিত "ক্লাইং নিড অব দি আওয়ার" শীর্ষক এক বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ায়, বাঙলা গবর্ণমেণ্ট জরুরী ক্ষমতা নিয়ন্ত্রক প্রেস আইন অনুযায়ী উহার জামানতের তিন হাজার টাকা হইতে দুই হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

"অর্চ্চনা" নামক মাসিক পত্রিকার গত শ্রাবণ সংখ্যায় "হক মন্ত্রিমণ্ডল" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় উহার নিকট হইতে এক হাজার টাকা জামানত দাবী করা হইয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার দুই সপ্তাহের মধ্যে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মোট ২১ লক্ষেরও অধিক টাকা দান করিয়াছেন।

২০শে সেপ্টেম্বর—

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, আগামী ১লা নভেম্বর হইতে আগামী বৎসর ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত কেহ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কলিকাতা ও শহরতলীর কোনও প্রকাশ্য স্থানে বাহির হইতে পারিবে না।

কলিকাতা নগরীর জল সরবরাহের ব্যবস্থায় কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিলে শহরবাসীরা যাহাতে জল সরবরাহের জন্য অন্যের উপর নির্ভর না করেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করার প্রস্তাব সম্পর্কে নাকি কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন বাঙলা সরকারের নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন। উক্ত পত্রে তিনি নাকি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কলিকাতায় ২ লক্ষ টাকা মূল্যের বাড়ী-ঘরের মালিক যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ বাড়ীতে নলকূপ বসাইতে বলা হউক। মেয়র নাকি এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, শহরের পার্কে ও স্কোয়ারসমূহেও নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

বরিশালে মিঃ এস এন ব্যানার্জ্জির সভাপতিত্বে বাখরগঞ্জ জেলা হিন্দু-মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, মিঃ এন সি চ্যাটার্জ্জি প্রমুখ বিশিষ্ট হিন্দুনেতাগণ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ" নামক একখানি পুস্তক সম্পর্কে সাম্যবাদী নেতা শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এই সম্পর্কে ভবানীপুরে 'নিউ প্রেসের' অপর ছয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারত সরকার ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স অনুসারে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, ১৮ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত কোন ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজা বিনানুমতিতে ভারত ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

২১শে সেপ্টেম্বর—

পরলোকগত স্যার জগদীশ বসুর পত্নী লেডী অবলা বসু প্রেসিডেন্সী কলেজে দুইটি গবেষণামূলক বৃত্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙলা গবর্ণমেণ্টকে ৫০ হাজার টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

কলিকাতা শহরের কয়েকটি স্থানে খানাতল্লাসী করে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। তবে পুলিশ বহু পুস্তক হস্তগত করিয়াছে ও কয়েকজনকে গোয়েন্দা বিভাগে লইয়া গিয়া জবানবন্দী লওয়ার পর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কমরেড রেবতী বর্ম্মণকে ২৪ পরগণা জেলা হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।

২২শে সেপ্টেম্বর—

আজ এই মর্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে যে, কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে লবণের দর সের প্রতি পাঁচ পয়সা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। দেশীয় ঔষধাদির মূল্য কিছুমাত্র বাড়ান চলিবে না।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কমরেড অপূর্ব্বকাঞ্চন দত্ত রায়, কমরেড শৈলেশ চ্যাটার্জ্জি ও কমরেড ভারতরঞ্জন শর্ম্মাকে তিন বৎসরের জন্য জামীন মুচলেকায় আবদ্ধ করেন। অন্যথায় তাঁহারা তিন বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করিবেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর—

'জয়পুরে সত্যাগ্রহের সন্তোষজনক অবসান অহিংসারই বিজয় সূচিত করে'—মহাত্মা গান্ধী অদ্যকার হরিজন পত্রিকায় এক প্রবন্ধে এই কথা বলিয়াছেন।

কলিকাতা শহরে নাগরিকদের সুখ সুবিধার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন যে সকল কার্য্য করেন, সেইগুলিকে বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য কর্পোরেশন কিছুদিন পূর্ব্বে একটি কমিটি গঠন করেন। বিমান আক্রমণে জল সরবরাহের বর্ত্তমান ব্যবস্থা যদি বিনষ্ট হয় তবে শহরে যাহাতে জলের অভাব না হয়, তজ্জন্য কমিটি বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৬ শতাধিক নলকূপ বসান নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, কর্পোরেশনের প্রত্যেক ওয়ার্ডে অন্যূন ২০টি নলকূপ বসাইতে হইবে এবং প্রত্যেক নলকূপের জন্য পাঁচশত টাকা ব্যয় হইবে।

২৪শে সেপ্টেম্বর—

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে দণ্ডিত বন্দী সর্দ্দার পৃথ্বী-সিং আজাদ ওয়ার্দ্ধা জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

জগদ্বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁহার লণ্ডনস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

সিন্ধুর মন্ত্রিগণ পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে "সিন্ধু জাতীয় দল" নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্স দলের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। জাতীয়তার ভিত্তিতে দলের কার্য্যতালিকা ও নীতি নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং সিন্ধুর জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করা হইবে।

২৫শে সেপ্টেম্বর—

পরলোকগত মিঃ বিঠলভাই প্যাটেল উইল দ্বারা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে যে অর্থ দান করিয়াছেন, বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ওয়াদিয়া তাহা অসিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করায় উহার বিরুদ্ধে সুভাষবাবুর পক্ষ হইতে যে আপীল করা হইয়াছিল, অদ্য বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি কানিয়ার এজলাসে উহার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ৬ই আশ্বিন, ১৩৪৬ Saturday, 23rd September, 1939 [৪৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত—

বহু আলোচনা এবং গবেষণার পর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি বর্ত্তমান পরিস্থিতির সম্বন্ধে তাঁহাদের বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে অনেক তত্ত্ব কথা আছে। আমরা তত্ত্ব কথা বেশী ভাল বুঝি না, বিশেষতঃ রাজনীতিক ব্যাপারে সূক্ষ্ম তত্ত্ব অপেক্ষা বাস্তব স্থূল ব্যাপারকেই আমরা বেশী বুঝি। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটির বিবৃতির মূল কথাটি কি ভারতের একজন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের উক্তি হইতেই আমরা তাহা উদ্ধার করিয়া দিতেছি। অধ্যাপক স্যার রাধাকৃষ্ণন্ ওয়ার্কিং কমিটির এই বিবৃতি পাঠ করিয়া বলিয়াছেন—'কার্য্যকরী সমিতির ঘোষণায় ভারতীয় জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইয়াছে। নাৎসী অনাচার এবং পররাষ্ট্র লোভের বিরুদ্ধে ভারত দাঁড়াইবে এবং তাহার প্রতিরোধকল্পে ত্যাগ স্বীকার করিবে। জগতের শান্তি ও স্বাধীনতা নিরাপদ করিবার জন্য এই ঘোষণা করা হইয়াছে। তবে ভারতের নেতারা জানিতে চাহেন, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রাখিবার জন্য এই যুদ্ধ হইতেছে—না, তাহার উন্নতি হইবে এবং ভারতবর্ষও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ঘোষিত আদর্শের সমশ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইবে? অতএব এই যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভারতকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।'

ওয়ার্কিং কমিটির বিবৃতির চুম্বক স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের উক্তির ভিতর হইতে পাওয়া যাইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে আদর্শ বা তত্ত্বকে ধরিয়া যুদ্ধে নামিয়াছেন বলিয়াছেন, সে তত্ত্ব বা আদর্শের দিক হইতে ভারত-সম্পর্কিত কিরূপ নীতি তাঁহারা অবলম্বন করিবেন, ওয়ার্কিং কমিটি তাহাই জানিতে চাহিয়াছেন। সহযোগী 'ষ্টেটসম্যান' বলিতেছেন—"বৃটেন ও ভারতের সম্পর্ককে স্থায়ীভাবে পরস্পরের প্রীতি বিশ্বাস ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে স্থাপন করিবার সময় আসিয়াছে। ইহা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য অংশের অনুরূপই হইবে। যদি এই সুযোগ ব্যর্থ হয় তাহা হইলে আমাদের সাধারণ স্বার্থের অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। আমাদের উচ্চাদর্শ ও আমাদের কাজের মধ্যে যেন কোন পার্থক্য না থাকে।"

এই পার্থক্য এতকাল বজায় রহিয়াছে। ব্রিটিশ আজ সে পার্থক্য সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার প্রেরণা লাভ করুক ভারত ইহাই দেখিতে চায়। এখন চাই প্রকৃত কাজ।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্মনীতি—

ওয়ার্কিং কমিটির বিবৃতি আগাগোড়া উপদেশমূলক, কিন্তু নিজেরা তাঁহারা কিভাবে চলিবেন, সে কথা কিছু নাই। যুদ্ধ সম্পর্কে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত ওয়ার্কিং কমিটি একটি সাব-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সাব-কমিটি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীকে যথা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নির্দ্দেশ প্রদান করিবেন। মহাত্মাজী অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থার এই যে নীতি ইহাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মত এই যে, বৃটেনকে বিনাসর্ত্তে একেবারে অনপেক্ষভাবেই সাহায্য করা উচিত। মহাত্মাজীর অহিংস নীতির ইহা একটা বিশিষ্ট দিক। ওয়ার্কিং কমিটির বিবৃতির মুসাবিদা জওহরলালজী করিলেও মহাত্মাজীর প্রভাব ইহাতে রহিয়াছে। গান্ধীজী এই বিপদকালে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অভূতপূর্ব্ব মানসিক পরিবর্ত্তনের প্রশংসা করিতেছেন। বিবৃতির মুখ্যতা রহিয়াছে সেই অংশে; ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার অনেকটাই গৌণ রহিয়া গিয়াছে—সেই মুখ্য অংশের উপরে অবস্থার একান্ততায়। গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের এই আহ্বান ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকগণকে কি নিজেদের

আদর্শ-নিষ্ঠায় আজ উদ্বুদ্ধ করিবে, ইহাই সমগ্র ভারতের প্রশ্ন। বোম্বাইয়ের 'টাইমস' পত্র, আমাদিগকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—"অতীতে অনেক ভুল করা হইয়াছে। কিন্তু এই সন্ধিক্ষণে বৃটেনের সঙ্কট হইতে লাভ করিবার চেষ্টা করা রাজনীতিক ভূয়োদর্শনের পরিচায়ক নহে।" বৃটেনের সঙ্কটের সুযোগ লাভ আমরা করিতে চাহি না। আমাদের কথা এই যে, অতীতে যে-সব ভুল করা হইয়াছে, সেগুলির সংশোধন করিলে এই সঙ্কটকালে বৃটেন এবং ভারত দুইয়ের পক্ষেই মঙ্গল ঘটিবে।

জগত্তারিণী পদক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বৎসর জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে প্রদান করিবেন, স্থির করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত ছিল, এই পদক পূর্ব্বেই তাঁহাকে প্রদান করা। এই পদক প্রদান করাতে হীরেন্দ্রনাথের সম্মান কিছুই বাড়ান হইবে না; কারণ, তিনি তাঁহার জীবনব্যাপী বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবা এবং সাধনার প্রভাবে দেশবাসীর অন্তরে শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য বাঙলার ঘরে ঘরে সুবিদিত; সুতরাং তাঁহার যোগ্যতার দিক হইতে এই পদক প্রাপ্তির প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। তবে এই কথা বলা যায় যে, যোগ্যের আদর করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নিজদিগকেই গৌরবান্বিত করিলেন।

অমূলক আতঙ্ক—

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর বিকাল বেলার দিকে কলিকাতায় এই মর্ম্মে একটি সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হয়,—"বেলা ২টা ২৬ মিনিটের সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে সংবাদ আসে যে, শত্রু পক্ষীয় একটি বিমান পোর্ট ক্যানিং এর উপর দিয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ বিপদ জ্ঞাপক সঙ্কেত দেওয়া হয়, যে সমস্ত স্থান হইতে জনসাধারণকে বিপদজ্ঞাপক ইঙ্গিত দেওয়ার কথা ২টা ৩৮ মিনিটের সময়ে, সেই সমস্ত স্থান হইতে ঐ ইঙ্গিত দেওয়া হয়। ইহার অল্পক্ষণ পরেই রাজকীয় বিমানবাহিনীর একটি বিমান দমদম হইতে রওনা হয়। উহাকে শত্রু পক্ষীয় বিমানের সন্ধান করিবার এবং সন্দেহ হইলে উহাকে ভূপাতিত করিবার আদেশ দেওয়া হয়। ৩টা ৩৫ মিনিটের সময় আর একটি বিমান ডায়মণ্ডহারবারের উপর দিয়া উত্তর দিকে গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। পুনরায় বিমান আক্রমণের আশঙ্কা জ্ঞাপক সঙ্কেত প্রচারিত হয় এবং আকাশে রাজকীয় বিমান বাহিনীর উক্ত বিমানকে এই সংবাদ জানান হয়।"

পরে জানান হয়,—"এই আতঙ্ক অমূলক, প্রথম বিপদ-জ্ঞাপক সঙ্কেত প্রচারের কারণ ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজের একটি বিমান, ২।টার সময় অবতরণ করে। দ্বিতীয়বার বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেত প্রচারের কারণ ছিল রাজকীয় বিমান বহরের একটি বিমান। উহা এত উচ্চে ছিল যে, কলিকাতার দক্ষিণদিকের অধিবাসীরা উহা চিনিতে পারে নাই। জন-সাধারণ ইহা হইতে উপলব্ধি করিবেন যে, পর্য্যবেক্ষণকারিগণ যতই দক্ষ হউন না কেন, ভুল হইবেই।"

কলিকাতা হইতে জার্ম্মানী এত দূরে যে, একলাগোয়া উড়িয়া জার্ম্মানী হইতে কলিকাতার পোর্ট ক্যানিংয়ে শত্রু পক্ষের উড়োজাহাজ আসা সম্ভাবনার অতীতই বলিয়া মনে হয়; সুতরাং ভুল-ভ্রান্তি যে ইহার মূলে আছে, এমনটাই স্বভাবত মনে হইয়াছিল। সে যাহা হউক বর্ত্তমান যন্ত্র-বিজ্ঞানের যুগে অসম্ভব কিছুই নয়। আতঙ্কের কারণ যে অমূলক ইহা সুনিশ্চিত জানিতে পারিয়া লোকে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে; কিন্তু শুধু নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলেই চলিবে না, আতঙ্কের কারণ যখন ঘটিতে পারে, যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহাদেরও এমন ধারণা, তখন বিপদের প্রতিকারের ব্যবস্থাই করা প্রয়োজন।

স্বদেশীর সুযোগ—

অনেক সময়ে শাপে বর হয়। যুদ্ধের তাণ্ডবের ভিতর দিয়াও পরাধীন আমরা আমাদের বরাত ফিরিতে পারে। ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার ফলে বর্ত্তমানে ভারতে কার্পাস, পাট, রাসায়নিক দ্রব্য, পশম, চামড়া, লোহা-লক্কড় প্রভৃতি শিল্পে সমৃদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধের দরুণ আমদানী পণ্যের হ্রাস অপরিহার্য্য, সুতরাং অনেককেই দায়ে পড়িয়াও ভারতে প্রস্তুত দ্রব্য পুরোপুরি ব্যবহার করিতে হইবে। বিগত মহাসমরের সুযোগে বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের কাপড়ের কলওয়ালারা সুবিধা করিয়া লইয়া-ছিল; আজ বাঙলার দ্বারে সেই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাঙলা দেশের চারিদিকে এই সুযোগে নানাবিধ স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরম্ভ হইতে পারে এবং বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতার অভাবে সেগুলির প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সম্ভাবনা খুবই রহিয়াছে। বাঙলা দেশে ২৫।২৬টি কাপড়ের কল রহিয়াছে, এই সব কাপড়ের কল-গুলি বোম্বাই অঞ্চলের কাপড়ের কলগুলির ন্যায় ধনবলে এবং যন্ত্রবলে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। দেশবাসীরা যদি বাঙলার এই সব শিল্পদ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহারা বঙ্গদেশজাত দ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহা হইলে শুধু যে বাঙলা দেশকে স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য করা হইবে, এমন নহে, বঙ্গব্যাপী বেকার সমস্যার সমাধানেও সাহায্য করা হইবে। অমঙ্গলের ভিতর দিয়া আজ মঙ্গলহস্তের সে ইঙ্গিত যে দিক দিয়া আসিতেছে, আমরা যেন তাহার ষোল আনা সুযোগ গ্রহণ করিতে অবহেলা না করি।

ভারতের সামরিক স্পৃহার উদ্বোধন—

ডাক্তার মুঞ্জে সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—টেরিটোরিয়াল বাহিনী, বিশ্ববিদ্যালয় বাহিনী এবং জাতীয় সেনাবাহিনীসমূহ গঠন করা হউক। এইগুলির ভিতর দিয়া যুবকদিগকে দ্রুতগতিতে সামরিক শিক্ষা প্রদান করা হইতে থাকুক। ইহা ছাড়া দেরাদুনের সামরিক কলেজে অধিক সংখ্যক ভারতীয় ছাত্রদিগকে সেনানী বিদ্যায় শিক্ষিত করা হইতে থাকুক। এই পথে ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার সম্বন্ধে অধিকতর নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিবেন এবং জার্ম্মানীকে দমিত করিবার দিকে অধিকতর শক্তি প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবেন। 'লীডার' পত্রের সিমলাস্থ সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় বিমান বাহিনী গঠন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে সুযোগ্য বিমান চালক সংগ্রহ করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন বিমান সঙ্ঘের সহিত যোগাযোগ করিতেছেন। যে বিমান বাহিনী গঠনের কথা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণের দ্বারা গঠিত হইবে। জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ যেরূপ আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ইউরোপের দিকেই প্রধানত তাঁহাদের শক্তিকে নিযুক্ত রাখিতে হইবে, এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীরা যাহাতে ভারতরক্ষার যোগ্যতা লাভ করে, সেদিকে এখন মনে প্রাণে চেষ্টা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। বাঙলা দেশ হইতে দুইটি বাঙালী বাহিনী গঠন করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেই প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করা আমরা বর্ত্তমানে একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

বাঙালীর দাবী—

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাঙলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, সে জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ একটি আবেদনপত্র পাঠাইবেন স্থির করিয়াছেন। এই আবেদনপত্রে জানান হইয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা, উর্দ্দু, হিন্দী, উড়িয়া, অসমীয়া, বার্ম্মিজ, আর্ম্মেনীয়, মারাঠী, গুজরাটী, মৈথিলী, তামিল, কানাড়ী, মালয়ালম্, সিংহলী, গারো, মণিপুরী, পর্ত্তুগীজ, লুসাই এবং সাঁওতালী—ভারতের এই সব বিভিন্ন ভাষায় ম্যাট্রিক হইতে বি-এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। ভারতের কয়েকটি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালী ছেলেদের পক্ষে এইরূপ সুবিধা নাই এবং বাঙলা ভাষাকে ভারতের একটি প্রধান ভাষা বলিয়া স্বীকার করা হয় না, এমন কি ইচ্ছা করিলেও কোন ছাত্রের পক্ষে সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা শিখিবার সুযোগ নাই। ইহার ফলে বাঙলার বাহিরে এই সব স্থানে যে সব বাঙালী ছেলে আছে তাহাদিগকে শিক্ষালাভে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং মাতৃভাষার সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন হইবার কারণ ঘটে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রদিগকে যে সুবিধা দিয়াছেন, অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য বাঙালী ছেলেদিগকে সেই সব সুবিধা দিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা করা।

বাঙলা ভাষাকে দাবাইবার জন্য কোন কোন প্রদেশের কর্ত্তারা তৎপর হইয়াছেন। বাঙালী কোন দিনই সঙ্কীর্ণ এই ধরণের প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু বাঙালীদের এই পারস্পরিক সহযোগিতার প্রবৃত্তির অনুকূল সাড়া যদি কোন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ দিতে না চাহেন, তাহা হইলে বাঙলা দেশেও তাঁহাদের সেই মনোবৃত্তির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন তাঁহাদিগকে হইতে হইবে। আমরা আশা করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আবেদন তাঁহাদিগকে তৎসম্বন্ধে অবহিত করিয়া যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সহায়তা করিবে।

হিটলারের আক্রোশ—

হিটলারের আক্রোশটা দেখা যাইতেছে ইংরেজের উপরই বেশী। ডানজিগে গিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন,—"মিঃ চেম্বারলেন, মিঃ ইউডেন ও মিঃ ডাফ-কুপারকে এবং আর সকলকেই আমি বারবার সতর্ক করিয়া দেই কিন্তু তাঁহারা সকলেই আমাকে উপহাস করেন। আজ তাঁহারা সকলেই গম্ভীরভাবে বলিতেছেন যে, এক্ষণে আর পোল্যাণ্ডের সমস্যার কথা উঠিতেছে না; এক্ষণে জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের সমস্যার কথা উঠিতেছে।" হিটলারের এই কথার উত্তর এই যে, হিটলার যে নীতি ধরিয়া চলিয়াছেন, তাহা নৃশংস বর্ব্বরতার বিভীষিকায় জগৎকে উত্তরোত্তর অভিভূত করিয়া চলিয়াছে। পোল্যাণ্ডে সেই নীতির একটি বিচ্ছিন্ন পরিণতি মাত্র। জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া নাৎসী দল সাম্রাজ্য বিস্তারে চলিয়াছে। সভ্যতার বিরুদ্ধে হিটলার শত্রুতা ঘোষণা করিয়াছেন; সুতরাং হিটলারী এই আসুরী প্রবৃত্তির উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা শুধু পোল্যাণ্ডের একটি বিশিষ্ট দেশগত সমস্যা নহে, সমগ্র জগতের সমস্যা। এই বর্ব্বরতার প্রভাব হইতে জগৎকে মুক্ত করিবার প্রেরণা মানবেরই মনোধর্ম্মের মধ্যে রহিয়াছে। যুগে যুগে মানবতার যে উচ্ছ্বাসে সভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, আজ কি হিটলার গায়ের জোরে তাহার ব্যত্যয় ঘটাইতে পারেন? বোমা, বিষবাষ্প কিম্বা অনাবিষ্কৃত অত্যুগ্র মারণাস্ত্রের বিভীষিকা মানুষকে পশু করিয়া ফেলিতে পারে নাই এবং আজও পারিবে না।

জাপানের নূতন মূর্ত্তি—

রুষ-জাপান চুক্তির ফল ইতিমধ্যেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাপান চীনে আবার বোমা-বর্ষণের উপর জোর দিয়াছে। ইংরেজ ও ফরাসী আজ ইউরোপে লড়াইতে ব্যস্ত, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কোন চিন্তার কারণ নাই মনে করিয়াই বোধ হয়, জাপান এখন আমেরিকার উপর নজর দিয়াছে। জাপানের একখানা সংবাদপত্র আমেরিকাকে হুমকী দেখাইয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরে এযাবৎ সে মোড়লগিরি ফলাইয়া আসিয়াছে, এখন আর মোড়লী চলিবে না। আমেরিকা এশিয়ায় এই মোড়লীর মতিগতি যদি না ছাড়ে, তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমি রণাঙ্গনে পরিণত হইবে। আমেরিকা যাহাতে ইংরেজ এবং ফরাসীর দিকে না ঝুঁকে সেই জন্যই কি জাপানীর এই হুমকী এবং জার্ম্মানীর সঙ্গে জাপানের মিতালীর সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আছে কিনা কে বলিবে? রুষ-জার্ম্মান সন্ধির ফলে পোল্যাণ্ডের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, রুষ-জাপান চুক্তির ফলে চীনেও তাহারই অভিনয় সুরু হইবে এ আশঙ্কার কারণ আছে।

যুদ্ধে ভারতের দান—

বিলাত হইতে ভারত সম্পর্কিত এক বেতার বক্তৃতায় লর্ড হেলী বিগত মহাসমরে ভারতবর্ষের দানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ মেসোপোটেমিয়া, পূর্ব্ব আফ্রিকা, ফ্লাণ্ডার্স এবং ফ্রান্স প্রভৃতি বিভিন্ন রণাঙ্গনে সৈন্য এবং লোক-লস্করে ১২ লক্ষ লোক পাঠায়। ভারতবর্ষ যুদ্ধের বাবদ দুই শত কোটির অধিক টাকা প্রদান করে এবং ২০ কোটি মণের অধিক রসদ সরবরাহ করে। গ্রেট ব্রিটেন আজ মহাসমরে লিপ্ত হইয়াছে, ইহার ঝুঁকি লইতে ভারতবর্ষ সর্ব্বাংশেই প্রস্তুত আছে। স্বাধীন ভারতই স্বাধীনতার পূর্ণ মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে সক্ষম, অধীনতার অনুভূতি থাকিতে আত্মশক্তির স্ফুরণ হয় না, মানবের এই স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের বাস্তব দিকটা ব্রিটিশ রাজনীতিকদের উপলব্ধি করিবার মত বিজ্ঞতা আছে, ভারত এখনও এই আশা করে।

হে বীর

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—এক—

হে বীর তোমার অস্ত্র ঝলকি তোলো,
দেখো মেঘে মেঘে ঢেকেছে আকাশতল;
অতীত দিনের মোহময় স্মৃতি ভোলো,
বাহুতে তোমার আসুক প্রচুর বল!
জাগো আজিকার আলো ঝলোমল প্রাতে
জাগো নিদারুণ অন্ধ রাত্রি শেষে;—
আলোকের চাবী আজিও তোমারি হাতে
অন্ধকারেতে যেওনা নীরবে ভেসে,

—দুই—

বন্ধু তোমার সমুখে সমাধি-ভূমি,
পিছনে তাহারি কাঁপিছে রণাঙ্গন,
জীবনের নদী তারি তটদেশ চুমি,
বহিয়া এসেছে; বহিবে চিরন্তন!
দেখো দুর্য্যোগে ঢেকেছে আকাশতল,
আঙুরের বনে খেয়ালী মনেরে ভোলো.
থেকো না নীরবে এমনি অচঞ্চল,
হে বীর তোমার অস্ত্র ঝলকি তোলো।

—তিন—

সন্ধ্যা আকাশে দুর্য্যোগ আজ ঘনো,
ফাল্গুনী মেঘ উধাও নিরুদ্দেশ
তাহারে ভাবার অর্থ আছে কি কোনো
সে ভাবনা আজ করো করো নিঃশেষ!
দেখ না তোমার সমুখে যাত্রী চলে
ঘোর মরুভূমি পার হ'য়ে কোন দূরে
চরণ মিলাও আজি তাহাদের দলে
যাত্রা তোমার সমতলে বন্ধুরে!

—চার—

মরুভূমি পারে দেখো সবুজের সীমা,
হে বীর আজিকে এখনো বসিয়া রবে?
তোমার জীবনে আজো কাঁপে পূর্ণিমা?
আজো থেকে থেকে ছায়া ফেলে তারা সবে?
বন্ধু আমার, আর দেরী নয় শোনো,
আঙুরের বনে উদাসী মনেরে ভোলো
তাদের ভাবার অর্থ আছে কি কোনো
হে বীর তোমার অস্ত্র ঝলকি তোলো!

দেশের কথা—ভারতের পণ্য—

চা (TEA)

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ব্যবহৃত চা'র পরিমাণ

প্রতি বৎসরই চা'র ভক্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আন্দাজে ধরা হয় যে, সকলে মিলিয়া প্রতি বৎসর ৯০ কোটি পাউণ্ড চা পান করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ এই প্রয়োজনের শতকরা ৪০ ভাগ সরবরাহ করে, সুতরাং চা বাণিজ্যে ভারতের বিশেষ স্বার্থ জড়িত।

জগতের মধ্যে ইংরেজ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চা-পান করিয়া থাকে। Tea market Expansion Board দেশ বিদেশের হিসাব সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন, ইংরেজ মাথা পিছু ৯·১ পাউন্ড চা-পান করে। পরে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, হলাণ্ড, মিসর প্রভৃতি দেশের স্থান। আমেরিকা তামাক খুব বেশী ব্যবহার করে, চা'র নেশা এখনও তেমন ধরিয়া বসে নাই; মাথা পিছু ·৬২ পাউন্ড ভাগে পড়িয়াছে। পরিশিষ্ট (ঠ) হইতে প্রতি দেশের জনপ্রতি চা'র প্রয়োজন বুঝিতে পাবা যাইবে।

প্রচারের ফলে চা'র কাটতি বৃদ্ধি পাইতেছে; আমেরিকা রুক্ষ চা (Black Tea) তেমন পছন্দ করিত না; এখন তাহারা আমদানী বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতবর্ষে ১৯৩৭-৩৮ সালে ৮ কোটি ৬৯ লক্ষ পাউণ্ড চা খরচ হইয়াছিল; প্রচারের ফলে উহা ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রায় সওয়া নয় কোটি পাউণ্ডে পৌঁছিয়াছে। সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য—ভারতের অনেক লোকই এখনও চা-পান করে না। 'ভদ্র' সমাজে তাহারা অপাংক্তেয়।

চা'র বাক্স

চা রপ্তানির সমস্ত লাভ দেশে থাকে না, তাহার প্রধান কারণ এই সকল ব্যবসায়ীদের অনেকেই বিদেশী এবং মূলধনের বহুলাংশ বিদেশ হইতে আনা, সুতরাং মুনাফা এ দেশে থাকে না। দ্বিতীয়ত চা রপ্তানি করিতে এবং ভাণ্ডারজাত করিতে বাক্সর দরকার। এই সকল বাক্স তৈয়ারীর জন্য বিদেশ হইতে তক্তা আসে এবং প্রায় কোটি টাকা বিদেশে যায়।

আমাদের দেশীয় নানা কাঠ দ্বারা বাক্স করিবার চেষ্টা হইয়াছে; তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই। চা কাঠের গন্ধ টানিয়া লয়; যে কোনও গন্ধযুক্ত কাঠ ব্যবহার করা চলে না। এক শিমুলে দিয়া পরীক্ষা হইয়াছে; তাহাতে কাজও চলে, কিন্তু পরিমাণে বেশী পাওয়া যায় না। বহু চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত মীমাংসা হয় নাই। চা অতি সত্বর বাতাস হইতে আর্দ্রতা টানিয়া লয় এবং এতদবস্থায় থাকিলে শীঘ্র "ছাতা" ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাহা না হইলে কাগজের বা কাপড়ের বা অন্য পাত্রে রাখা চলিতে পারিত; কিন্তু তাহার উপায় নাই। উপরন্তু বাহিরের বায়ুর সহিত সংযোগশূন্য করিবার জন্য ভিতরে ধাতুর, বিশেষত সীসার পাত দিতে হয়, এমন কি তপ্ত অবস্থায় চা এই আধারে ঢালিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিতে হয়।

আমদানী করা বাক্সের মোটা লাভ করে ইংরেজ, অর্থাৎ চার ভাগের তিন ভাগ তাহার অংশে পড়ে। ফিনলাণ্ড, এসটোনিয়া এবং অপরাপর দেশও কিছু কিছু সরবরাহ করে: পরিশিষ্ট (ড) দ্রষ্টব্য।

শক্তিবর্দ্ধক, দুর্ব্বলতা নাশক, পুষ্টিকর প্রভৃতি নানা গুণের চা'র বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার বিপক্ষে কিছু বলিতে গেলে হয়ত মহা কলরবের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলা যায়, অভ্যাস জন্মায় এবং শরীরের পুষ্টিকর পদার্থ কিছু নাই এই দুই কারণে—তামাক সম্বন্ধে যে মতবাদ আছে, তাহা এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পুষ্টি যদি কিছু করে, তাহা চা'র দুধ ও চিনি; তাহা ছাড়া গরম জল পানে শরীরের দুর্ব্বলতা ক্ষণিক দূর হয়, তাহা ছাড়া চা'র উপাদানের মধ্যে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি আছে, তাহার কাজ কিছুই নহে। অনেকের গুণে ভাল নহে, উপরন্তু ক্ষতিকারক। ট্যানিন আছে শতকরা ১৮·১৫ ভাগ; ইহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। তাহা ছাড়া Theine বা Caffeine ৪·১০, Legumin ২৪·০০, Waxes and Gums ২·৮৮, Pectin প্রভৃতি ১২·৬, Cellulose fibre ২১·২ অপর কয়টি প্রধান উপাদান (Bamber-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী)। Theine বা Caffeine থাকায় চা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় এবং Tannin হইতে ইহার ঝাঁজ বা উগ্রতা এবং রঙ পাওয়া যায়।

নেশা হিসাবে এমন ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকে শিশু সন্তানের দুধ জোগাইতে পারে না, কিন্তু চা'র জন্য দুধ লয় এবং শিশুদের ঐ চা পান করাইয়া রাখে। পাঁচটি প্রাণীর এক পরিবারে কুড়ি টাকা আয় এবং তন্মধ্যে তিন টাকা হইতে চার টাকা পর্য্যন্ত মাসে চা'র জন্য খরচ করিতে দেখিয়াছি।

ব্যবহার

নেশার জিনিষ বলিয়াই ইহার খ্যাতি এবং বোধ হয় একমাত্র ব্যবহার। চা-বীজের অন্য ব্যবহার আছে। ইহা হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা জ্বালানীরূপে এবং সাবান তৈয়ারীর জন্য কাজে লাগে। আগে ভারতের বীজ হইতে তৈল পাইবার জন্য আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ক্রয় করিত; এখন হংকঙ বাজারে চা বীজ তৈল বিক্রয় করিতেছে, সুতরাং ভারতের দুর্দ্দশা।

পরিশিষ্ট ড

জলপথে চা রপ্তানি

পরিমাণ ও মূল্য

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা
১৮৩৮	·৪৮৮	—
১৮৬৪	২,৮০	—
১৮৭৫-৭৬	২,৪৩,৬২	২,১৬,৬৪
১৮৮৫-৮৬	৬,৯৬,৬৬	৪,১৯,৭০
১৮৯৫-৯৬	১৪,২০,৮০	৭,০২,৩৩
১৯০০-০১	১৯,০৩,০৫	৯,৬৩,০৯
১৯০৫-০৬	২১,৪২,২৩	৮,৮৭,৭৬
১৯০৭-০৮	২২,৭০,২২	১০,৩০,০৩
১৯১০-১১	২৫,৪৩,০১	১২,৪১,৬৪

১৯১৫-১৬	৩৩,৮৪,৭০	১৯,৯৮,১১
১৯১৬-১৭	২৯,১৪,০৩	১৬,৭৭,১০
১৯১৯-২০	৩৭,৯১,৬৫	২০,৫৬,৫০
১৯২০-২১	২৮,৫১,৫২	১২,১৪,৯৮
১৯২১-২২	৩১,৩৮,৭৮	১৮,২২,০২
১৯২২-২৩	২৮,৮২,৯৬	২২,০৪,০০
১৯২৩-২৪	৩৩,৮৭,৫৫	৩১,৬৪,৬১
১৯২৪-২৫	৩৪,০১,০৭	৩৩,৩৯,২৪
১৯২৫-২৬	৩২,৫৭,৩৩	২৭,১২,১৭
১৯২৬-২৭	৩৪,৯২,৬৪	২৯,০৩,৭৮
১৯২৭-২৮	৩৬,১৬,১৪	৩২,৪৮,৪৯
১৯২৯-৩০	৩৭,৬৬,৩৪	২৬,০০,৬৪
১৯৩২-৩৩	৩৭,৮৮,৩৭	১৭,১৫,২৮
১৯৩৩-৩৪	৩১,৭৮,১৬	১৯,৮৪,৪৯
১৯৩৪-৩৫	৩২,৪৮,৩৩	২০,১৩,১৯
১৯৩৫-৩৬	৩১,২৭,০৬	১৯,৮২,৪১

গত তিন সালের রপ্তানি

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা
১৯৩৬-৩৭	৩০,১৮,৩৮	২০,০৩,৮১
১৯৩৭-৩৮	৩৩,৪২,২৬	২৪,৩৮,৬৯
১৯৩৮-৩৯	৩৪,৯৯,১২	২৩,৪০,৫০

পরিশিষ্ট চ

স্থলপথে চা রপ্তানি

	হাজার পাউণ্ড
১৮৯৬-৯৭	১৫,১৩
১৯০৫-০৬	২৫,৪৭
১৯১৩-১৪	২২,৪১
১৯১৭-১৮	১৪,৪৮
১৯১৯-২০	১,২৮,৪৫
১৯২৪-২৫	৮৩,৬৯
১৯৩০-৩১	৫৮,৫৫

১৯৩০-৩১ পর্যান্ত যে চা যায়, তাহার সমস্ত পরিমাণ "বহির্বাণিজ্য" বলা চলে না। ইহার পর হইতে অ-ভারতীয় সমস্ত রাজ্যের সহিত বাণিজ্যের হিসাব রাখিতে চেষ্টা করা হয় এবং নিম্নলিখিত আনুমানিক পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়:—

	হাজার পাউণ্ড
১৯৩১-৩২	৫৯,৩১
১৯৩২-৩৩	৫৫,৬৭
১৯৩৩-৩৪	১,০৮,৬১
১৯৩৪-৩৫	১,৮৬,৯৮
১৯৩৫-৩৬	১,২৮,০৮
১৯৩৬-৩৭	১,২৪,৬০

পরিশিষ্ট ছ

(১৯৩৮-৩৯)

ক্রেতার নাম ও শতকরা অংশ

মোট রপ্তানি (জলপথে)

পরিমাণ—৩৪,৯৯,১২,০০০ পাউণ্ড

মূল্য—২৩,৪০,৫০,০০০ টাকা

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ব্রিটেন	৩০,৬৩,৭২	২০,৫৩,৭৫	৮৭.৭
কানাডা	১,৫২,৬৯	৯৬,৬৮	৪.১
ইরাণ	৫১,১১	৪৬,৮৪	২.০
আমেরিকা	৭৯,৫২	৪৬,৮৪	১.৯
সিংহল	৩৯,৩৩	২৬,২০	১.১
এরে (আয়র্লণ্ড)	৩২,৯৫	১৯,৩৭	·৮

ব্রহ্ম, অষ্ট্রেলিয়া, জার্ম্মানী, ইউরোপীয় তুরস্ক প্রভৃতি।

পরিশিষ্ট (জ)

বিক্রেতার অংশ—বন্দর হিসাবে

(১৯৩৮-৩৯)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
বাঙলা	২৯,৩৩,৩৮	১৮,৪৭,৬৭	৭৮·৯
মদ্র	৫,৬৩,০৩	৪,৯১,৭১	২১·০
বোম্বাই	২,৪২	১	—

পরিশিষ্ট (ঝ)

আমদানী চা'র বিভিন্ন অংশ

	পাউণ্ড	টাকা	টাকার শতকরা অংশ
হরিৎ (Green) চা	২৪,৮১,৬৯৬	৯,৯৮,৮৯৭	৬৩·৪
"ব্রিক" (Brick) "	১২,০০,৮৯৬	৩,১৪,৬৬৯	২০·০
কৃষ্ণ (Black) "	৩,৯৯,৭৪৪	২,৫৯,৪৭৩	১৬·৪

পরিশিষ্ট (ঞ)

রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সমিতির অনুমোদিত

ভারত হইতে রপ্তানির জন্য চা'র পরিমাণ:—

(Indian Overseas Export allotment of Tea)

১৯৩৩-৩৪	৩২,০৫,৭০,৫৬০	পাউণ্ড
১৯৩৪-৩৫	৩২,৯৯,৯৯,১৫০	"
১৯৩৫-৩৬	৩১,১১,৪২,০৫৫	"
১৯৩৬-৩৭	৩০,৮৯,৩০,৯০২	"
১৯৩৭-৩৮	৩২,৮৫,২৬,১৩৩	"
	(ভারতের জন্য)	
	৭৫,০০০	"
	(ব্রহ্মের জন্য)	

পরিশিষ্ট (ট)

চা শুল্কের হার

	প্রতি পাউণ্ডে
১৯২১ সালের ৩০ এপ্রিল পর্য্যন্ত	সিকি পাই
১৯২৩ সালের ২০ এপ্রিল পর্য্যন্ত	আধ পাই
১৯৩৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর	¾ পাই
	বা প্রতি ১০০ পাউণ্ডে ছয় আনা
১৯৩৫ সালের ১২ এপ্রিল	আট আনা

(শেষাংশ ৪৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পোল্যাণ্ডের রণক্ষেত্রে রুশিয়া

যুদ্ধ ঘোষণার নিয়ম আধুনিক সভ্যযুগে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রুষ সেনাদল হঠাৎ পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া পোল্যাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পোল্যাণ্ডের উপর রুষিয়ার এই আক্রোশের কারণ হঠাৎ কিছু বুঝিয়া উঠা মুস্কিল; তবে রুষদের সরকারী মুখপত্র 'প্রভদা' সম্প্রতি এই সুর ধরিতে আরম্ভ করে যে, পোল্যাণ্ডের ইউক্রেনিয়ান এবং হোয়াইট রাশিয়ানদের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে না; কিন্তু এই অভিযোগকে তখন কেহই গুরুত্ব দেয় নাই বরং আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, 'প্রভদা'র ঐ সব কথার কোন মূল্যই নাই। এরূপ মনে করিবার মতিগতি কিছুই বুঝা যায় নাই। সোভিয়েটেরা বরং এমন কথাই বলিতেছিল যে, এজন্য ইংরেজ বা অন্য কাহারও সঙ্গে সন্ধির আলোচনা চালাইতে তাহাদের কোন অন্তরায় ঘটে নাই, নেহাৎ শান্তিপূর্ণ এই উদ্যম; সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিবার চেষ্টা। ইহার পরেই খবর পাওয়া যায় যে, রুষিয়ার সঙ্গে মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত ব্যাপার লইয়া জাপানের সন্ধি হইয়া গিয়াছে, তখনই মনে করা গিয়াছিল যে, জার্ম্মান প্রভৃতি ফ্যাসিষ্ট চক্রের উদ্যমের আবার নূতন অভিব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিল। জাপানের কিছুদিনের ব্যাপার দেখিয়া মনে করা গিয়াছিল যে, এই চক্রের গতি বুঝি শিথিল হইয়াছে। সেই চক্রের আবর্ত্তন সূত্রেই পরে দেখা গেল রুষিয়া কর্ত্তৃক
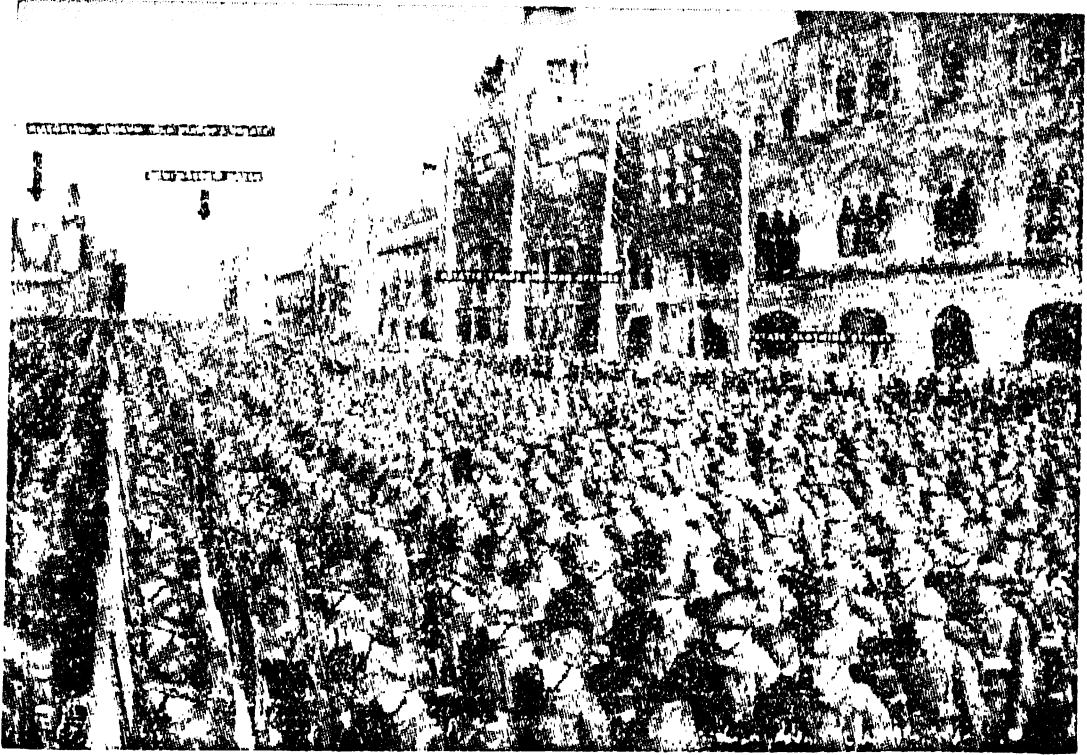
মস্কো রেড স্কোয়ারে রেড আর্ম্মির কুচকাওয়াজ

কতকগুলি বিশেষ কারণও যে না ছিল, এমন নয়। ইংরেজের সঙ্গে রুষিয়ার যখন সন্ধির আলোচনা হয়, তখন রুষ সরকারী বিভাগ পোলদের রুষদের উপর অত্যাচারের কোন অভিযোগ করেন নাই। তাঁহারা বরং অভিযোগই করিয়াছিলেন যে, পোল্যাণ্ডকে জার্ম্মানীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে রুষ সৈন্যদিগকে পোল্যাণ্ডের মধ্যে ঢুকিতে দেওয়া দরকার; কিন্তু ইংরেজ তাহাতে রাজী না হওয়ার জন্যই পোল্যাণ্ডকে রক্ষার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা রুষিয়া করিতে পারিল না এবং ইংরেজের সহিত সোভিয়েটের সন্ধি হইল না। রুষ সেনাদিগকে পোল্যাণ্ডে ঢুকিতে দেওয়ার অর্থ কি, তখন একথার অর্থ প্রকৃতভাবে বুঝা যায় নাই, তাহা বুঝা যাইতেছে। এখন রুষিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর সন্ধির পোল্যাণ্ড আক্রমণ। রুষিয়ার এই চালে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক পরিস্থিতি একটা বিষম রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং কখন কি হইবে, নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যাইতেছে না। পোল্যাণ্ড নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরবিক্রমে সংগ্রাম করিতেছিল এবং তাহাদের আক্রমণে এবং শরৎকালে দুর্য্যোগপূর্ণ পোল্যাণ্ডের আবহাওয়ার সুযোগ পাইয়া জার্ম্মানদের অগ্রগতি দস্তুর মত রুদ্ধও হইয়াছিল; কিন্তু একদিকে রুষিয়া অন্যদিকে জেনারেল গোয়েরিংয়ের উড়ো জাহাজের অবিচারিত বোমাবৃষ্টি ইহার মধ্যে পোলদের ঘাটী বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠে। শেষে যে খবর আসিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে

গিয়াছেন। রুমেনিয়া নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সুতরাং রুমেনিয়া হইতে পোল মন্ত্রীদের সংগ্রাম চালান কঠিন, তাহাতে রুমেনিয়াও ঝুঁকির মধ্যে গিয়া পড়িতে পারে। পরে খুব সম্ভব পোল গবর্ণমেণ্টকে ফ্রান্স অথবা ইংলণ্ডে আশ্রয় লইতে হইবে। পোল বাহিনী পোল্যাণ্ডের রণাঙ্গনে নিজেদের সেনাপতির অধীনেই লড়াই চালাইবে। সুতরাং যুদ্ধের দিকথার অবস্থা গুরুতরই ছিল। এদিকে তুরস্ককে ইংরেজের দল ছাড়া করিবার চেষ্টা চলিতেছে; তুরস্কের পররাষ্ট্র-সচিব সত্বরই রুষ-তুরস্ক সন্ধি করিবার উদ্দেশ্যে মস্কোতে রওনা হইতেছেন।

রুষিয়া আজ পোল্যাণ্ডের যে অঞ্চলে প্রবেশ করিতেছে ১৯১৪ সালে তাহা রুষিয়ারই রাজ্য ছিল। ঐ সময় ওয়ারস রুষ অধিকৃত পোল্যাণ্ডের রাজধানী ছিল এবং রুষদের সীমানা ছিল, ওয়ারস হইতে ১৪০ মাইল পশ্চিমে। ঐ সময়,

মিশরে ইংরেজ উড়োজাহাজ ধ্বংসী কামান

এখন যাহাকে বলা হইয়া থাকে পোলিশ 'করিডর' তাহা ছিল না; পূর্ব্ব প্রুশিয়া জার্ম্মানীর সহিত যুক্ত ছিল এবং মেমেলের উত্তরদিকে বাল্টিক সাগরোপকূল জার্ম্মানদের অধিকারে ছিল।

রুষিয়া স্পষ্টভাবেই পোল্যাণ্ডের সঙ্গে তার যে সন্ধি-সর্ত্ত ছিল তাহা ভঙ্গ করিয়াছে। ১৯১৯ সালে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে রুষিয়ার যে সন্ধি হয়, তাহাতে পোল গবর্ণমেণ্ট পোল্যাণ্ডের সংখ্যালঘিষ্ঠ সকল সম্প্রদায়ের পৌর-অধিকার সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকেন। তাঁহারা এই প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে তাহাদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করিবার সুবিধা দান করা হইবে; পোল্যাণ্ডের সব বিদ্যালয়ে ঐ সকল সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য মাতৃ-ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। পূর্ব্ব গেলিসিয়ার ইউ-ক্রেনিয়ান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় লইয়া পরে একটা সমস্যা দেখা দিয়াছিল। ১৯২৪ সালে পোল আইন-পরিষদ এই সম্বন্ধে একটি আইন পাশ করেন যে, যে সব অঞ্চলে ইউ-ক্রেনিয়ান ও হোয়াইট রাষিয়ানদের সংখ্যা বেশী, সেই সব অঞ্চলে তাহারা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে পারিবে বা যে ভাষা সে অঞ্চলে প্রধানত চলিত সেই ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবে। এই সময় পোল্যাণ্ডের পূর্ব্ব সীমান্তে বিশেষ একটা গোলমাল দেখা গিয়াছিল, এবং এই অভিযোগ করা হইতেছিল যে, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টই এসব উস্কাইয়া তুলিতেছেন।

ইউক্রেনিয়ান হোয়াইট রাষিয়ান, এই সব শব্দগুলি বুঝিতে একটু গোল ঘটে। গত ১৯৩১ সালে পোল্যাণ্ডের লোকসংখ্যার ২ কোটি পোল লোক অর্থাৎ শতকরা ৭০ জন লোক পোল ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত এবং শতকরা দশ জন লোক ব্যবহার করিত ইউক্রেনিয়ান ভাষা এবং ২০ লক্ষ লোক রাষিয়ান ভাষা ব্যবহার করিত। ইহাতেই দাঁড়ায় এই পোল্যাণ্ডের সংখ্যালঘিষ্ঠের সমস্যা।

মোটের উপর রুষিয়া আজ যে অভিযোগ করিতেছে, সে অভিযোগের অপরাধ রুষিয়াই পোলদের উপর সব চেয়ে বেশী করিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া রুষিয়া পোল জাতির সকল স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল, মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার তাহাদের একেবারেই ছিল না। পোল্যাণ্ডের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রুষ ভাষাকে জোর করিয়া চালান হইয়াছিল। পোল শহরগুলির নাম পর্য্যন্তও পাল্টাইয়া ফেলা হইয়াছিল, তারপর জার শাসিত রুষিয়া পোলদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা তো অবর্ণনীয়। পোল স্বাধীনতাসেবীদিগকে রুষিয়া নির্ম্মমভাবে দমন করিয়াছে এবং সেদিন পর্য্যন্ত পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রুষিয়ার একমাত্র অভিযোগ এই ছিল যে, পোল্যাণ্ড কিছু ফ্যাসিষ্ট-মতঘেঁষা। আজ সেই সোভিয়েট রুষিয়া পুরাপুরি ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়া বিপন্ন পোলদের স্বাধীনতা হরণে উদ্যত হইয়াছে এবং ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে।

রুষিয়ার উদ্দেশ্য কি? বুঝিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। ১৮ই সেপ্টেম্বরের লণ্ডনের একটি সংবাদেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ সংবাদে জানা যায় যে, সাইলেসিয়া, ডানজিগ ও করিডর জার্ম্মানীর হাতে ছাড়িয়া দিয়া ইউক্রেন নিজেদের হাতে রাখা এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মানীর মধ্যে অবশিষ্ট যে জায়গাটুকু থাকিবে সেইটুকুকে পোলিশ রাষ্ট্র করা রুষিয়ার ইচ্ছা। বিগত যুদ্ধের পরে লিথুনিয়া, লাটভিয়া ও এস্থুনিয়া এই যে সব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল, সেগুলি রুষিয়ার কবলিত হইবে এমন কারণ ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যেই রুষিয়া ভিলনা দখল করিয়া লইয়াছে। জার্ম্মানী একা পোল্যাণ্ড নিজের সৈন্য প্রতাপে দখল করিয়া বসিলে পোল্যাণ্ডে অপ্রতিহত সেই জার্ম্মান প্রভাব রুষিয়ার পক্ষে আতঙ্কের কারণ ঘটিবে; সুতরাং এই জন্য রুষিয়া নিজেও আগাইয়া গিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছে, রুষিয়ার পোল্যাণ্ড আক্রমণের মূলে এমন গূঢ় অভিসন্ধি আছে, এমন কথা অনেকে বলিতেছেন। কিন্তু মোটের উপর স্বাধীন

পোল্যাণ্ডের পক্ষে সমানই এবং পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে যাহারা উদ্যত তাহাদের নিকট রুষিয়ার এই আচরণ সমভাবেই নিন্দনীয়।

মোর্টের উপর যুদ্ধের অবস্থা অত্যন্ত জটিল। ইংরেজ এবং ফরাসী পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ, রুষিয়া সেই পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণে অবতীর্ণ হইয়াছে, এমন অবস্থায় রুষিয়ার সঙ্গে ইংরেজ ও ফরাসীর সম্পর্ক গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিন রাজনীতিকগণ এই আশঙ্কা করিতেছেন যে, মিত্রশক্তি যদি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তাহা হইলে শুধু ইউরোপ নয়, সুদূর প্রাচ্যেও ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হইবে। জাপান সেই সুযোগে এমন এক স্বৈরাচারী সঙ্ঘর্ষ বাধাইয়া দিবে যে, যাহার ফল চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক হইবে। ঘটনাচক্রের যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহাতে বেশই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষেরও আতঙ্কের কারণ ঘটিতে পারে। জগতে আজ পশুশক্তি সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ও মানব মৈত্রীকে দলন করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। হিটলার এই পশু শক্তি প্রেরক পুরুষস্বরূপে দাঁড়াইয়াছেন। যাহারা মানব স্বাধীনতার বিরোধী, মানবতার বিরোধী তাহারা হিটলারকে প্রশ্রয় দিয়া মানব-জগতের সর্ব্বনাশ সাধনে আজ সমুদ্যত। শান্তির কথা, মৈত্রীর কথা ইহারা গ্রহণ করিতেছে না। নির্ম্মম পাশবিক অত্যাচারে ইহারা ধ্বংসলীলা চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভারতের সংস্কৃতি আজ স্বভাবতই ই পশুবলকে বাধা দিবার জন্য প্রয়োজিত হইবে এবং ইহাতে মানব স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিকতাকে রক্ষা করিবার জন্য, দুর্ব্বলকে ত্রাণ করিবার উদ্দেশ্যে যাহারা দণ্ডায়মান হইয়াছেন, ভারত সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে সমর্থন করিবে। এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ বা সংশয় নাই। ভারতের স্বদেশপ্রেমিকগণ পোল স্বাধীনতাকামীদের সর্ব্বতোভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ভারতবাসীরা এই আশা করিতেছে যে, আজ পোল স্বদেশ-প্রেমিকগণ বিপন্ন হইলেও তাহাদের শক্তি পরাভূত হইবে না। স্বেচ্ছাচারী পশুশক্তির আক্রমণকে নির্জ্জিত করিয়া মানবতা এবং সংস্কৃতি জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। পশু শক্তির যে গর্জ্জন তাহা ক্ষণিক, অচিরেই মানব-মৈত্রী এবং গণতান্ত্রিকতার কাছে তাহাকে পদানত হইতে হইবে। বর্ব্বরতার এই শক্তিকে প্রতিহত করিবার কর্ত্তব্য আজ সমগ্র মানবের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করুক।

চলার পথে

(৫০২ পৃষ্ঠার পর)

সম্বন্ধে কত সম্ভব-অসম্ভবের কল্পনা করে চলেছি, এমন সময়ে একদিন হঠাৎ তার চিঠি পেলাম। শিলং থেকে লিখছে:—

"সুশান্ত-দা, আজ অনেকদিন তোমার খোঁজই রাখি না। অবাক হয়েছ, আমি অমন নিষ্ঠুর হলাম কি করে! পড়াশুনা আমার দ্বারা তারপরে আর ঘটে ওঠেনি। ছুটে এলুম পাহাড়ে—ভেবেছিলুম পাহাড় তার বিপুল বিশাল ক্রোড়ে আমায় একটুকু ঠাঁই দিতে কার্পণ্য করবে না, আমায় আদর করে বুকে টেনে নিবে। কিন্তু সেও আমায় প্রত্যাখ্যান করল! এখন একটা মেয়ে স্কুলের শিক্ষকতা নিয়েছি। দেশি চারিদিককার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কলকোলাহলে আমার বুকের নিঃসঙ্গতাকে ডুবিয়ে রাখতে পারি কি না। দেহের সে বল আর নেই, মনের সে সজীবতা অনেক আগে হারিয়ে ফেলেছি; গলা দিয়ে মাঝে মাঝে দু'এক ঝলক সদ্য তাজা রক্ত উঠছে। জীবনের পরে কি নিবিড় বিতৃষ্ণা! নিঃসীম নীল সমুদ্র আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বোধ হয় শীঘ্র সংসারের দাবী-দাওয়া চুকিয়ে পরপারে পাড়ি দেব।

সন্ধ্যায় বাসায় এসে শীঘ্র ঘুমোতে চেষ্টা করি। গভীর নিশীথে যখন জেগে উঠি, মনটা কি এক অস্ফুট ব্যথায় কাতরিয়ে ওঠে; কোথায় সে ব্যথার উৎস খুঁজে পাই না।

আমার অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ো।

তোমার— "সবি"

ক্রন্দসী

(৪৬৮ পৃষ্ঠার পর)

ফটোটি ঘিরিয়া আছে। কাল কি পরশু সে হয়ত শশাঙ্কর চিঠি পাইবে। ফটোখানার দিকে চাহিয়া একটুখানি মৃদুহাসির তরঙ্গ তাহার অধরোষ্ঠে খেলিয়া গেল। মনে পড়িল কিছুদিন আগে এই ঘরে এমনই রাত্রিতে মা-বাবার কথাবার্তায় তাহার পাড়াগাঁয়ে বিবাহের কথায় সে বিরক্তিতে কেমন করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যে তাহার ঐ মিষ্টার বটব্যাল বা মিষ্টার পাকড়াশীর মত কাহারও সঙ্গে বিবাহ হয় নাই। তাহা হইলে সেও হয়ত এতদিন একটি জেশফিতা এবং জর্জ্জেটের প্রত্যক্ষ প্রলাপ হইয়া দাঁড়াইত এবং ফলে টেপা পুতুলের মত একঘেয়ে আলাপ ও পালিশ করা মিষ্টতা বিতরণ করিতে অনুক্ষণ ব্যস্ত হইয়া উঠিত। আর সবচেয়ে করুণ ব্যাপার হইত, তেমন জীবনের মাঝে যে দৈন্যমাত্র বা দুর্গতি আছে এ তথ্য নিজেদের ভিতরও তাহার কাছে ধরা পড়িত না। কিন্তু সে জীবন হইতে সে যে মুক্তি পাইয়াছে; চিন্তার আলোকে জীবনটাকে পুরোপুরি বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার দৃষ্টিভঙ্গী অর্জ্জন করিয়াছে এজন্য শশাঙ্কর প্রতি সুনিবিড় কৃতজ্ঞতায় তাহার সারা মন ভরিয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

অন্তরালে

(গল্প—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

কটকে পৌঁছিয়া আমরা আশ্চর্য্যের সহিত দেখিলাম,—আমার স্বামী একখানা অপরিসর ঘরে একখানি মাদুরের উপর পড়িয়া জ্বরের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ঘরের আসবাব বলিতে একটা জল রাখিবার মাটির কলসী, একটা এল্যুমিনিয়মের গ্লাস, ভাত রাঁধিবার একটা এল্যুমিনিয়মেরই হাঁড়ি এবং খানকয়েক শালপাতা এদিক-সেদিক পড়িয়া আছে। একটা টাঙানো বাবুই দড়ির উপর দুই একটা আধ-ময়লা কাপড়-জামা ঝুলিতেছে,—আর একখানা দেশী কম্বল ঘরের এক কোণে স্তূপীকৃতভাবে পড়িয়া আছে।

আমাদিগকে দেখিয়াই আমার স্বামী আগ্রহের সহিত উঠিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পারিলেন না। সন্তোষদাদা তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'থাক্, থাক্, তোকে আর উঠতে হবে না। তোর ব্যস্ত হবার দরকার নেই।' বলিতে বলিতে তিনি মাদুরেরই এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। আমিও অন্য পার্শ্বে বসিলাম।

তাহার পর সন্তোষদাদা বিস্তৃতভাবে তাঁহার পীড়ার সংবাদ লইয়া বলিলেন,—'তা হাঁরে নিকাশ, এমনতর অসুখ অথচ চিকিৎসার ব্যবস্থা তুই একেবারে করিস্ নি! আর এইরকমভাবে তুই আছিসই বা কি করে? ভদ্রলোকের কথা ত দূরে,—পথের ভিখারীরও বোধ হয় এর চেয়ে ভাল থাকবার ব্যবস্থা আছে! ছ'মাসের ওপর হলো, তুই এখানে বাস করছিস,—অথচ একটা মানুষের বাস করতে হলে যা' যা নিতান্তই প্রয়োজন,—তাও যে তোর নেই! ব্যাপার কি?'

রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখে একটু ক্ষীণ হাসি টানিয়া স্বামী বলিলেন,—সন্তোষদাদা, ব্যাপার সেই দু'হাজার টাকা! যতদিন ঐ টাকাটা সঞ্চয় করে ফিরিয়ে দিতে না পারি,—ততদিন এর চেয়ে ভালভাবে থাকবার উপায় আমার নেই, ভাই! তা' করতে গেলে, ঐ টাকা জমিয়ে উঠতে অনেকদিন লেগে যাবে। মনের মাঝে একটা দারুণ আত্মগ্লানি নিয়ে ততদিন ধৈর্য্য ধরে থাকা, মানুষের পক্ষে অসম্ভব! তবে তোমরা যতটা অব্যবস্থা বা অভাব দেখছ, আমি ঠিক তা' দেখছি না। প্রথমটা একটু কষ্ট হলেও এখন এই ব্যবস্থায় আমার বেশ চলে যায়। ঐ এল্যুমিনিয়মের হাঁড়িতে করেই চাট্টি ভাত আর যা হোক কিছু একটা তরকারী করেনি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবার খাই, ঐ ভাত আর তরকারী। বাসন-কোসনের খরচও আছে, হাঙ্গামাও অনেক। তার চেয়ে ঐ শালপাতাতেই চলে। শোবার জন্যে এই মাদুরটাই যথেষ্ট! লেপ, তোষক, বালিশের ব্যবস্থা করতে অনেকগুলি টাকার দরকার, কাজেই ওসব বাদ দিয়েছি। এখানে প্রথম যখন এসেছিলাম,—তখন একটু একটু শীত ছিল, তাই গায়ে দেবার জন্যে ঐ কম্বলটা কিনেছিলাম, ঐ আমার লেপ! বলিতে বলিতে তিনি পতিত কম্বলটার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিলেন।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী যেন ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। আমি আর নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিলাম। সন্তোষদাদারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না। গাঢ় কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—'কিন্তু এ যে নিজের জীবনটাকে একেবারে শেষ করে ফেলবার পথ করেছিস ভাই। ব্যবসায়ে লাভ আর ক্ষতি এই দুটো জিনিষই হয়। কিন্তু ক্ষতি পূরণের জন্যে তোর মত কে কোথায় জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করতে বসে? না,—এ তুই ভারী ছেলে-মানষী আরম্ভ করেছিস্।

'সন্তোষদা!'—স্বামীর স্বরে এক পুঞ্জীভূত তীব্র বেদনার সুর বাজিয়া উঠিল,—'যদি জানতে ঐ ক্ষতির জন্যে আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে কি অপার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করেছি, কি মর্ম্মান্তিক ব্যথার আগুনে আমাদের দু'জনের হৃদয় পুড়ে খাক হয়ে গেছে, তাহলে আর এ-কথা বলতে না। সেই জ্বালা-যন্ত্রণার তুলনায় আজকের এ কষ্ট বুঝি বা কিছুই নয়! আর ঐ টাকা দু'হাজার যতদিন বাবাকে ফিরিয়ে দিতে না পারছি, ততদিন আমাকে এইভাবেই থাকতে হবে।' বলিতে বলিতে তিনি ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন,—তাঁহার চক্ষু দুইটিও জলে ভরিয়া আসিল।

সন্তোষদাদা বুঝিলেন,—উপস্থিত ঐ সকল আলোচনা বাদ দিয়া রোগীর সুচিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করাই মঙ্গল। আমিও তাঁহাকে সেইরূপ যুক্তি দিলাম এবং দুইজনে মিলিয়া যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সহসা কয়েকটি দুস্থ শীর্ণ ছেলে-মেয়ে বাসার দরজার সম্মুখে আসিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল,—বাবু!

কষ্টে মাথা তুলিয়া তাহাদের দেখিতেই স্বামী মাদুরের নিম্নে রক্ষিত একটি ছোট ব্যাগ হইতে কয়েকটি পয়সা বাহির করিয়া সন্তোষদাকে বলিলেন, দাদা পয়সা কটা ওদের দাও ত।

পয়সা কয়টি ছেলে-মেয়েদের দিয়া সন্তোষদা আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওরা কারা?

ওরা?—স্বামী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন,—ভারী গরীব! কারো বাপ নেই, কারো মা নেই, কারো কেউই নেই। কোনদিন খেতে পায়, কোনদিন পায় না। আমার নিজের অবস্থা এমন হলেও ওদের দুঃখে বড় কষ্ট হয়! তাই ওরা এলেই আমি দু'চার পয়সা করে না দিয়ে পারি না। আহা, বেচারাদের ভারী কষ্ট!

দরিদ্রের প্রতি তাঁহার সমবেদনার কথা আমার ত নয়ই,—সন্তোষদাদারও অবিদিত ছিল না। তাঁহার কথা শুনিয়া আমাদের উভয়েরই চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল।

পরদিন, আমার স্বামীর অসুখ কিন্তু অতিমাত্রায় বাড়িয়া গেল। যেমন বাড়িল জ্বর, তেমনি বাড়িল বুকে বেদনা! আমি অত্যন্ত ভয় পাইলাম। সন্তোষদাদার হাত দুইটি ধরিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলাম,—দাদা, দাদা, এ বিপদে আপনিই আমাদের ভরসা। যাতে উনি ভাল হয়ে ওঠেন, তা আপনাকে করতেই হবে।

সন্তোষদাদাও চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—'আমাকে কি তোর অত

করে বলতে হয়, বোন! কিন্তু আমি ত টাকাকড়ি বিশেষ সঙ্গে আনিনি! অথচ বিকাশকে ভাল করে তুলতে হলে যথেষ্ট টাকা খরচ করে সুচিকিৎসা করাতে হবে। তা'—হঠাৎ নীরব হইয়া গিয়া তিনি কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন,—তবে ভাবিস না তুই। টাকা জমা করে ব্যবসারের ক্ষতি পূরণ করার জন্যে বিকাশ যখন এত কষ্ট বরণ করেছে, তখন নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও ওর কিছু টাকা জমা আছে। জ্বর একটু কমলে আমি ওকে সে কথা জিজ্ঞেস করবো, আর সেই টাকাতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো।

আমি আশান্বিত হইয়া বলিলাম,—'খুব ভাল যুক্তি! তাই করুন দাদা।'

সন্তোষদাদা বলিলেন,—বিকাশ অবশ্য সে প্রস্তাবে সহজে রাজী হবে না,—তবে আমি যেমন করেই হোক্ রাজী করবো। এখন ভগবানের ইচ্ছায় জ্বরটা কমলেই হয়।

আমি আর কিছু না বলিয়া মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলাম।

বিকালের দিকে স্বামীর জ্বর বেশ একটু কমিয়া গেল। তিনি দুই একটা কথাবার্ত্তাও বলিতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিয়া সন্তোষদাদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ রে বিকাশ, এত কষ্ট করে টাকা ত জমাচ্ছিস,—তা' টাকা জমা রেখেছিস কোথায়?

'কেন, সন্তোষদাদা?'—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বামী বন্ধুর দিকে চাহিলেন।

সন্তোষদাদা তাঁহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলেন। তিনি উত্তর দিলেন,—টাকা অবশ্য পোষ্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে রেখেছি। কিন্তু ও টাকা ত আমার চিকিৎসায় খরচ করবার জন্যে নয়, সন্তোষদাদা?

সন্তোষদাদা বলিলেন,—বুঝেছি, তুই কি বলবি। কিন্তু আগে বেঁচে ওঠ, তারপর সে সব কথা।

স্বামী আপত্তি করিলেন। বলিলেন,—না, না, এ আমার জীবনের—।

সন্তোষদাদা তিরস্কারের সুরে বাধা দিলেন,—'আর আর বলতে হবে না। তুই বেঁচে ওঠ; আমি তোকে কথা দিচ্ছি,—আমার জমি-জমা বেচেও তোকে আমি দরকার টাকা যোগাড় করে দেব। তুই তোর ব্যবসা দিবি। পরে রোজগার করে আমার টাকা শোধ করবি।

স্বামী আর কিছু বলিলেন না।

তাহার পর সন্তোষদাদা যথারীতি ব্যবস্থা করিয়া পোষ্ট-অফিসে স্বামীর যত টাকা জমা ছিল,—সমস্তই তুলিয়া আনিলেন। আমার প্রাণ অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু অদৃষ্টলিপি কে মুছিতে পারে? টাকা তোলা হইল,—স্বামীর চিকিৎসা ঔষধ পথ্যে তাহার সমস্ত নিঃশেষে ব্যয়ও হইয়া গেল; সেবা-শুশ্রূষারও কোন ত্রুটি হইল না। আমি এবং সন্তোষদাদা প্রাণ-ঢালিয়াই সেবা করিলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ হতভাগিনীর ভাগ্যে বিধাতা বৈধব্যই লিখিয়া দিলেন। আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া স্বামী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শোকের প্রচণ্ড আঘাতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

নারীর পরম ধন,—নারী জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া সন্তোষদাদার সহিত শূন্য প্রাণে যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, তখন আমাকে দেখিয়া এবং আমার মুখে সমস্ত শুনিয়া বাড়ীর সকলে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন; আমার শ্বশুরও দুই এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিলেন,—কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য এবং দুঃখের বিষয়, তিনি আমাকে আর গৃহে স্থান দিতে রাজী হইলেন না। কারণ, আমি একজন অনাত্মীয় পর-পুরুষের সহিত অত দূর দেশে গিয়াছিলাম,—আমার স্বভাব-চরিত্র পবিত্র আছে কি-না, তাহা সন্দেহের বিষয়!

যে শ্বশুরের অনুমতি লইয়াই আমি অনাত্মীয় হইলেও আমাদের পরমাত্মীয় সন্তোষদাদার সহিত কটক গিয়াছিলাম,—এই দারুণ দুঃসময়ে সেই শ্বশুরের মুখে ঐরূপ মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ক্ষোভের আধিক্যে কিছু-ক্ষণের জন্য আমার মুখে কোন কথা ফুটিল না! পরে শ্বশুরের পা দুইটি ধরিয়া আকুলভাবে বলিলাম,—'বাবা, একি বলছেন, আমি ত আপনার অনুমতি নিয়েই কাজ করেছি। তা' ছাড়া, নির্ম্মল চরিত্র সন্তোষদাদার ওপর ঐ হীন কটাক্ষ করা কি আপনার উচিত হচ্ছে! আপনার ছেলে ত সকল মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন, এখন আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন! এ সময় মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আপনিও যদি আমায় তাড়িয়ে দেন,—আমি দাঁড়াবো কোথায়?

কিন্তু শ্বশুর আমার কোন কথাই শুনিতে চাহিলেন না।

সন্তোষদাদা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন এবং আমার শ্বশুরের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে ঘৃণায় রাগে যেন ফুলিয়া মরিতেছিলেন! মানুষ যে কত ছোট হইতে পারে, আজ আমার শ্বশুরের ব্যবহার দেখিয়া তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। তিনি দৃপ্তভাবে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন,—দামিনী, বরাবরই আমি তোকে ছোটবোন বলেই জানি। তুই এ-গাঁয়ের বৌ হলেও তোর স্বামীর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার জন্যে আমি তোর দাদার স্থান অধিকার করেছি। কিন্তু যে শয়তান, সে সকলকেই ছোট করে দেখে,—মানুষের মহত্ত্বের দিকটা সে দেখতে পায় না। বিকাশ যাঁর ছেলে, অন্তত তিনি এতটা নীচ হতে পারেন, তা কোনদিনই ভাবতে পারিনি। তোর আমার মধ্যে সম্পর্ক যে কত পবিত্র, তা সর্ব্বদর্শী ভগবান জানেন। তোর শ্বশুর তোকে আশ্রয় না দিলে, আমি দেব। আমি বড় ভাই,—তুই ছোট বোন। আজ থেকে আমার ঘরই তোর ঘর।—বলিতে বলিতে তিনি আমার শ্বশুরের সম্মুখ হইতেই আমাকে টানিয়া লইয়া নিজের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু অভাগিনী আমি সেরূপ মহৎ স্নেহের আশ্রয় পাইয়াও থাকিতে পারিলাম না। দুই চারি দিন যাইতে না যাইতেই গ্রামের লোক আমাকে ও সন্তোষদাদাকে জড়াইয়া এমন সব অশ্রাব্য ও অকথ্য কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করিল যে,—আমার জন্য যাই হোক,—সন্তোষদাদার জন্য আমি অতিশয় আকুল হইয়া উঠিলাম। অবশ্য সেসব কুৎসার কথা শুনিয়া সন্তোষদাদা, এমনকি তাঁহার স্ত্রী পর্য্যন্ত আমাকে

বচলিত হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। তাহার উপর সমাজের মাতব্বরগণও যখন সত্যেন্দ্রনাথকে চোখ রাঙাইতে আরম্ভ করিল,—তখন আমার ব্যাকুলতার আর অন্ত রহিল না। অবশেষে সত্যেন্দ্রনাথকে বন্ধুদের হাত হইতে মুক্তি দিবার জন্যই একদিন গোপনে কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। বাপের বাড়ীতে সেরূপ কেহ ছিল না,—সুতরাং সেদিকে আর পা বাড়াইলাম না।............

তাহার পর হইতেই পাচিকাবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। আত্মহত্যা করা মহাপাপ,—তাই তাহা করিতে পারি নাই। নয় এ জীবন রাখিয়া লাভ কি! কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষতি-পূরণের জন্য স্বামী জীবনের যে সকল সুখ-সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন; ভগবান জুটাইয়া দিলেও আমি আর সেই সকল সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পারি না। কাজেই কটকে গিয়া তাঁহার জীবন-যাত্রা-প্রণালী যেরূপ দেখিয়াছিলাম, আমি সেইভাবেই জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাইয়া যাইতেছি। আর স্বামী গরীব-দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়া আনন্দ পাইতেন বলিয়া, আমি সারা বৎসরের বেতনস্বরূপ যে টাকাটা পাই, তাহার সমস্তই প্রতি বৎসর স্বামীর মৃত্যু তারিখে খরচ করিয়া দরিদ্রদিগকে অন্ন-বস্ত্র দান করিয়া থাকি। তাঁহার শ্রাদ্ধের জন্য অন্য কোনরূপ অনুষ্ঠান করি না। আমার বিশ্বাস,—তাঁহার স্বর্গত আত্মা ইহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করে। সেদিন আমার স্বামীর মৃত্যুর তারিখ ছিল বলিয়াই আমি সারা বৎসরের সঞ্চিত টাকা খরচ করিয়া দরিদ্রদিগকে আহার করাইয়া, বস্ত্রদান করিয়াছি।"

গৃহিণীর মুখে দামিনীর সম্যক পরিচয় পাইয়া আমি কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলাম। দামিনীর প্রতি আমার বিপুল শ্রদ্ধাও জন্মিল। আমি বাস্তভাবে দামিনীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলাম,—"মা, তুমি যথার্থই সতী-সাধ্বী! এ যুগে তোমার কথা কাহিনী বলেই মনে হয়। তুমি আসায় আমার বাড়ী পবিত্র হয়েছে। কিন্তু তোমাকে পাচিকার কাজে রেখে আমি ভারী অন্যায় করেছি। তবে সেটা আমার জ্ঞানত ত্রুটি নয়। যা' হোক আজ থেকে তোমায় আর ও-কাজ করতে হবে না। তুমি আমার মেয়ের মত থাকবে। বৎসরান্তে আমি তোমাকে তোমার স্বামীর মৃত্যু দিনে গরীব-দুঃখীকে অন্ন-বস্ত্র দানের জন্য পঞ্চাশ টাকা করে দেব।"

দামিনী আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—বাবা, আপনি মহৎ! কিন্তু আমাকে কাজ করতে নিষেধ করবেন না। তবু আমার সান্ত্বনা যে, আমি নিজের পরিশ্রমের ফলে আমার স্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ করছি। আমার সে সান্ত্বনা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। তা ছাড়া, বাপের বাড়ীতে মেয়ের রান্না বান্না করাও ত দোষের বা লজ্জার কথা নয় বাবা!

দামিনীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। আমি মুগ্ধনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিলাম,—দেবী না হতে পারে,—কিন্তু দামিনী প্রকৃতই নারী।

ভারতের পণ্য,—চা

(৪৭৮ পৃষ্ঠার পর)

১৯৩৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী	বারো আনা
১৯৩৯ সালের ৩১ মার্চ্চ	এক টাকা চার আনা
তাহার পর হইতে	এক টাকা ছয় আনা

পরিশিষ্ট (ঠ)

জনপ্রতি ব্যবহৃত চা'র পরিমাণ

(International Tea market Expansion Board-এর হিসাব হইতে গৃহীত)।

	পাউণ্ড
ইংলণ্ড	৯·১
অষ্ট্রেলিয়া	৭·০
কানাডা	৩·৫
হল্যাণ্ড	২·৭
মিশর	১·০
আমেরিকা	·৬২
সুইডেন	১৮
বেলজিয়ম	·০৮

পরিশিষ্ট (ড)

আমদানী চা'র বাক্স

তিন বৎসরের হিসাব

	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
ইংলণ্ড	৩০,২৬,১৫৩	৪৮,০২,৪০৯	৬৫,১৬,৭৮২
ফিনল্যাণ্ড	৩,৩০,৪২৫	৪,৭১,৭৯১	৫,৪০,১০৮
এসথোনিয়া	৮,৪২,৯০৬	৯,২২,৪৯৬	৭,০১,৯৬৭
অপরাপর	৫,২৭,৩২৮	৯,৭৩,১৭৭	১২,৭১,১৮২
মোট	৫৬,২৬,৮১২	৭১,৭০,১৭৩	৯০,৩০.০৩৯

১৯৩৮-৩৯

প্রতি দেশের শতকরা অংশ

ইংলণ্ড—	৭২·১৬
এসথোনিয়া—	৭·৭
ফিনল্যাণ্ড—	৬·০
অপরাপর—	১৪·১৪

আধুনিক যুদ্ধে উড়োজাহাজ

কালকাতায় আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর উড়োজাহাজের মহড়া হইবে। আধুনিক লড়াইতে উড়োজাহাজের স্থান খুবই বিশিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধের জয়-পরাজয় এই উড়োজাহাজের সংখ্যা এবং শক্তির উপরই নির্ভর করে। জার্ম্মানীর উড়োজাহাজ পোল্যাণ্ডে ধ্বংসলীলা বিস্তার করিতেছে; কিন্তু ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিংয়ের গর্ব্বস্বরূপ এই জার্ম্মান বিমান বাহিনী এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড কিম্বা ফ্রান্সের উপর আক্রমণ চালাইতে সাহস পায় নাই; পক্ষান্তরে, ইংরেজের উড়োজাহাজ জার্ম্মানীর নৌ-বহরের ঘাটির উপর বোমা ফেলিয়াছে

ইংরেজের নব্য বর্ম্মাবৃত সামরিক বিমান

এবং জার্ম্মানীর উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সামরিক গুরুত্ব-সম্পন্ন স্থানগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, ইস্তাহার ছড়াইতেছে। জার্ম্মানী গর্ব্ব করিয়া সেদিনও বলিয়াছে, ইংরেজ আমাদিগকে ঘর-বন্দী করিবে, এই ভয় দেখাইতেছে; আমরা উড়োজাহাজ দিয়া আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে কাবু করিব। বাস্তবিকপক্ষে জার্ম্মানীর সে ক্ষমতা আছে কি? জার্ম্মানীর উড়োজাহাজের সংখ্যা কত, ঠিক করিয়া বলা কঠিন, কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে, জার্ম্মানীর আঠার হাজার উড়োজাহাজ আছে।

"ইউ এস এভিয়েসন" পত্রের মার্কিন সম্পাদক মিঃ এস গল ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে লিখেন যে, জার্ম্মানীর দশ হাজার হইতে এগার হাজার সামরিক বিমান আছে, এইগুলির মধ্যে মাত্র তিন হাজার বা সাড়ে তিন হাজারখানা প্রথম শ্রেণীর উড়োজাহাজ। কর্ণেল চার্লস লিণ্ডবার্গ এ সম্বন্ধে একজন ওয়াকিবহাল ব্যক্তি বলিয়া বিশ্ববিখ্যাত। তিনি ব্রিটিশ ও মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষকে এই খবর যোগাইয়াছিলেন যে, জার্ম্মানীর ৯৭০০খানা সামরিক উড়োজাহাজ আছে। কার্ল ফন ওয়েগাণ্ড মার্কিন সংবাদপত্রের একজন নামকরা বৈদেশিক সংবাদদাতা। তিনি বলেন, জার্ম্মানীর উড়োজাহাজের সংখ্যা ২৮০০ হইতে তিন হাজারের মধ্যে। "ফোরাম ম্যাগাজিন" পত্রের হিসাব অনুসারে জার্ম্মানীর উড়োজাহাজের সংখ্যা আঠার হাজার। মেজর জর্জ ইলিয়ট বিমানবিদ্যা সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তি। ইনি সম্প্রতি "আকাশে বোমা ফাটিল" এই নাম দিয়া নিউ ইয়র্ক হইতে একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি বলেন, জার্ম্মানীর চার হাজার প্রথম শ্রেণীর উড়োজাহাজ আছে, চার হাজারখানা রিজার্ভ আছে এবং মাসে হাজারখানা উড়োজাহাজ জার্ম্মানীর কারখানাসমূহে প্রস্তুত হইতে পারে। জার্ম্মানীর কতকগুলি নূতন উড়োজাহাজের কারখানা করিতেছে। আগামী শরৎকালে জার্ম্মানী যদি কারখানাগুলি তৈয়ার করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সে ইহার পর মাসে

১৬০০ করিয়া উড়োজাহাজ প্রস্তুত করিতে পারিবে। জার্ম্মানীর মিস্ত্রীরা উড়োজাহাজ বেশ ভাল তৈয়ার করিতে পারে, সেগুলি বেশ দ্রুতগামী এবং কার্য্যক্ষম হয়, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ একমত। ফরাসী বিমান বাহিনীর নেতা জেনারেল ভেইলেমিন বলেন, জার্ম্মানী যে সব উড়োজাহাজ তৈয়ার করিতেছে, সেগুলি খুব শক্তিশালী এবং দ্রুতগতিবিশিষ্ট এবং খুব উচ্চ হইতেও বোমা ফেলিবার ক্ষমতা সে সব উড়োজাহাজের আছে।

জার্ম্মানীর বিমান বিভাগের কাজে চার লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। ইহাদের মধ্যে এক লক্ষ ষাট হাজার লোক উড়োজাহাজের কাঠামো তৈয়ার করে এবং অবশিষ্ট লোকেরা মোটর, হাল, পাখা প্রভৃতি অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ার করিয়া থাকে। উড়োজাহাজের মিস্ত্রীদের সংখ্যা বাড়াইবার দিকে জার্ম্মানীর বিশেষ দৃষ্টি আছে।

শিষ্ট উড়োজাহাজগুলি রিজার্ভস্বরূপে রাখা হইয়াছে। আক্রমণাত্মক সংগ্রাম চালাইবার কাজে ঐগুলি খাটান সম্ভব নহে। লড়াইয়ের কাজে সেগুলির মূল্য খুবই কম। বর্ত্তমানে জার্ম্মানদের কল-কারখানার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে মাসে তিন শতের বেশী উড়োজাহাজ তৈয়ারীর ক্ষমতা জার্ম্মানদের নাই। যদি মাসে তিন শত করিয়া উড়োজাহাজও জার্ম্মানীরা তৈয়ার করিতে পারে, তাহা হইলেও জার্ম্মানীর বিমান শক্তি ইংরেজ-ফরাসীর শক্তির সমবেত শক্তির চেয়ে যতদিন পর্য্যন্ত আমেরিকার কারখানার বিমান সরবরাহের সাহায্য ইংরেজ-ফরাসীরা নিজেরাই সব না পাইবে, ততদিন বেশী থাকিবে। রেনী ফ্রোসের এই মত।

অন্য দেশের চেয়ে জার্ম্মানী বিমান আক্রমণের পক্ষে বিশেষভাবে উন্মুক্ত, জার্ম্মানীর দুর্ব্বলতা এই দিক হইতে রহিয়াছে। জার্ম্মানীর দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী বড় বড়

এইচ এম এস 'ব্যারেহাম'

উড়োজাহাজ তৈয়ারী করিবার মাল-মসলার অভাব জার্ম্মানদের বিশেষভাবে আছে, এই অভাব পূরণ করিবার জন্য ৩৫০০ শত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপাদান তৈয়ারীর জন্য গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং অনেকক্ষেত্রে তাঁহাদের আবিষ্কৃত কৃত্রিম উপাদান খাঁটি মালের চেয়ে ভাল হইয়াছে। কয়লা হইতে পেট্রল উৎপন্ন করিবার কাজেও তাহারা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

রেনী ফ্রোস জার্ম্মানীর সামরিক ব্যাপার সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ইনি চিকাগো হইতে প্রকাশিত "কেন" পত্রে লিখিয়াছেন "জার্ম্মানীর বিমানবাহিনী এবং বিমান আক্রমণের প্রতিরোধী গোলন্দাজদিগকে লইয়া ১১০,০০০ লোক আছে। তাহাদের সাংবাদিকদের লেখায় হামেসাই জেনারেল গোয়েরিংয়ের ১০ হাজার সামরিক উড়োজাহাজের কথা শোনা যায়। প্রকৃতপক্ষে জেনারেল গোয়েরিংয়ের হাতে এই সংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ প্রথম শ্রেণীর উড়োজাহাজ আছে। অবশহরে বাস করে। শত্রুপক্ষের উড়োজাহাজগুলি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঐ সব শহরে হানা দিতে পারে; কতকগুলি শহরে তো কয়েক মিনিটের মধ্যে হানা দেওয়া যাইতে পারে। জার্ম্মানীর গর্ব্ব অনুসারে ফরাসীদের লুভার এবং ইংলণ্ডের ওয়েষ্টমিনষ্টার শহরে যদি জার্ম্মানদের বিমান আক্রমণের ভয় থাকে তাহা হইলে জার্ম্মানদের বহু শহর এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলগুলিতে সে ভয় আরও অনেক বেশী রহিয়াছে। জার্ম্মানের সামরিকগণ বিশেষভাবেই অবগত আছেন যে, জেনারেল গোয়েরিং দৈত্য-দানবের মত হঠাৎ কিছুটা সময় বিক্রম দেখাইতে পারে; কিন্তু স্থায়ীভাবে বিমানপথে জয়লাভ করার শক্তি জার্ম্মানীর নাই।

গত ছয় বৎসর ধরিয়া জার্ম্মান বিমান বীরদের এই বিশ্বাস ছিল যে, তাহাদের বিমান-শক্তি অজেয়। কিন্তু তাহাদের এই গর্ব্ব যে এখন আর তেমন খাটে না, ইহা বুঝা গিয়াছে। স্পেনের লড়াইতেই দেখা গিয়াছে, জার্ম্মানীর বিমান বীরেরা তেমন

সুবিধা করিতে পারে নাই। জার্ম্মানী এবং ইটালী সমবেত-ভাবে বিমানযোগে ধ্বংসলীলা চালাইয়াও স্পেনের সাধারণ-তন্ত্রীদিগকে সহজে কাবু করিতে পারে নাই। পোল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে, জার্ম্মান্ বিমান-বীরদের শত্রুদের আক্রমণ এড়াইয়া অক্ষতদেহে ফিরিবার সম্ভাবনাও পূর্ব্বের মত নাই। এখন তাহাদের শতকরা খুব কম হইলেও দশখানা উড়োজাহাজ ভূপাতিত হইতেছে এবং বিমান বীরেরা বন্দী হওয়াতে বিমানবহরের শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। ব্রিটিশ পক্ষের বিমানবহরের শক্তি অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, ১৮ মাস পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই। তখন দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ব্রিটিশ বিমান বহর খুব কমই কাজ করিতে পারিত। কিন্তু এই সেদিনও নিতান্ত দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও ব্রিটিশ বিমানবীরেরা জার্ম্মানীর ঘরের দুয়ারে কীয়েল খালের মুখে গিয়া উড়ো-জাহাজ দ্বারা আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মানীর জাহাজ ডুবাইয়া দিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে ব্রিটিশ বিমান বহরের খুব কম উড়ো-জাহাজের মধ্যেই আঁধারে চলিবার উপযুক্ত কল বসান ছিল কিন্তু এখন সে অবস্থার আশ্চর্য্যরকম উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বিলাতে বিমান বিভাগের চীফ মার্শাল স্যার হিউ ডাউডিং কিছুদিন পূর্ব্বে একটি বক্তৃতাতে বলিয়াছেন, বিমান-শক্তি দ্বারা আমাদের যে শক্তি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারি এবং আমার এ বিশ্বাসও আছে যে, প্রবল বিমান-বহর লইয়া যদি কেহ ইংলণ্ড আক্রমণ করে, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের উদাম রুদ্ধ হইবে।

আক্রমণকারী উড়োজাহাজকে ভূপাতিত করিতে হইলে, শক্তিশালী সার্চ্চ লাইটের প্রথম প্রয়োজন। দিনের বেলায় আক্রমণকারীদিগকে সহজে ধরিবার জন্য অনেক কল-কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু রাত্রি বেলায় উড়োজাহাজের সঙ্গে লড়িতে হইলে সার্চ্চ লাইটের দ্বারা শত্রু কোথায় আছে আগে দেখা প্রয়োজন। সার্চ্চ লাইটের জোরে যদি শত্রুর উড়ো-জাহাজ সুস্পষ্টভাবে দেখা না যায়, তাহা হইলে সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়; কিন্তু একবার যদি শত্রুর উড়োজাহাজ কোথায় আছে, ধরিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে শত্রুর ভূপাতিত হইবার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। তখন নীচে অন্ধকারের আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া শত্রুর উপর মেসিন কামান চালান সম্ভব হইতে পারে। এই দিক হইতে ব্রিটিশ বিমান-বহরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইংরেজের এই দিক হইতে দুর্ব্বলতার কোন সুযোগ যদি জার্ম্মানী পাইত, তবে সে নিশ্চয়ই এত দিনের মধ্যে ইংলণ্ডের উপরে হানা দিত; কিন্তু সে জানে যে, আক্রমণ করিতে গেলে ফিরিয়া আসা সহজ হইবে না এবং সফলতার সঙ্গে আক্রমণ চালানও প্রখর সার্চ্চ-লাইটের আলো এড়াইয়া একরকম কঠিন; ইহা ছাড়া বেলুনের বেড়া রহিয়াছে। একটু নীচে নামিয়া সুবিধা করিতে চেষ্টা করিতে গেলেই বেলুনের বেড়াজালের মধ্যে আটকাইয়া পড়িবার আতঙ্ক রহিয়াছে। এই বেলুনের বেড়া ক্রমেই অধিক উচ্চে বিস্তৃত করা হইতেছে এবং এই বেলুনের বেড়া থাকার দরুন লণ্ডনের উপর আসিয়া বোমা ফেলিতে জার্ম্মান বিমান বীরেরা সাহস পাইয়া উঠিতেছে না। অবশ্য বেলুনের বেড়া সর্ব্বত্র নাই; বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থানেই আছে; কিন্তু রক্ষীদের দৃষ্টি এড়াইয়া নীচে আসিবার সুবিধা একমাত্র রাত্রিতে হইতে পারে; কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঘাঁটির উপর তাগ্ করা আর খাটে না; যেখানে সেখানে বোমা ফেলিতে হয়। কোন পক্ষই বেহুদাভাবে দামী জিনিষ নষ্ট করিতে চাহে না, অনেক খরচ বৃথা যায়। তাহা ছাড়া বন্দী কামানের আক্র-মণের ভয় তো সর্ব্বত্রই আছে। আধুনিক লড়াইয়ে বায় এত বেশী যে, বেশী দিন বেহুদাভাবে ব্যয় বহন করিয়া উঠা কেহই সমীচীন বোধ করে না। সেভাবে নিজদিগকে ফতুর হইয়া পড়িতে হয়; কারণ, রক্ষাব্যবস্থা সকলেরই রহিয়াছে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের বিমান-বহরে রক্ষা-ব্যবস্থার এমন উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, সেখানে বিমান আক্রমণ চালাইতে গেলে অনেক টাকার জোর পিছনে থাকার দরকার এবং জনবলের হানির ঝুঁকিও অনেক। ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর এরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, প্রয়োজনীয় কেন্দ্র চড়াও করিয়া বহিঃশত্রুর পক্ষে ইংলণ্ডে গিয়া বোমা ফেলা একরূপ অসম্ভব। জার্ম্মানী প্যারিস শহরের উপর রাত্রিকালে বিমানযোগে অতর্কিতে আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল, সে সংবাদ পাঠকেরা জানেন, কিন্তু বিমানের গতি-শব্দ গ্রহণ-যন্ত্রের কৌশলে তাহাদের আবির্ভাব ধরা পড়িয়া যায় এবং তাহাদিগকে প্যারিস শহরের উপর হইতে আঁধারে গা ঢাকা দিয়া অনেক উঁচু দিয়া পলাইয়া আসিতে হইয়াছিল।

তোমার চাহনি

শ্রীসবিতারাণী চৌধুরী

বাজিছে মংগল-শংখ, ওঠে হুলুধ্বনি,
নিতান্ত সহায় হীনা—পরমাদ গণি
মনে মনে, যবে মোরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি,
কহে সর্ব্বজন, 'তোল মুখ, খোল আঁখি,
'শুভদৃষ্টি' তরে!" লজ্জা ও সরমে মরি
আধদৃষ্টি দিয়া হেরিনু তোমারে, স্মরি
ধাতার চরণ। সেই সে মুহূর্ত্ত হ'তে
যে ছবি হইল আঁকা হিয়ার পরতে,
কোন মতে দাগ তার নাহি মুছে আর,—
তোমাময় হ'য়ে গেল হৃদয় আমার!
বিশাল আঁখির তব দৃষ্টি সুমধুর
তাহারই প্রসাদে মোর প্রাণ ভরপুর!
দৃষ্টির উপমা যত আছে ধরা 'পরে
তোমার চাহনি সবে পরাজিত করে!

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

তাহারা বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল জগদীশ। ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে চম্‌কিয়া গেল। তাহারই অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া ওই যে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মেয়েটি তাহাকে ত' সে পূর্ব্বে কোথাও দেখে নাই। তাহাকে পূর্ব্বে দেখে নাই ইহাও যেমন সত্য আজ এমনি সময় দেখিয়া আর কখনও যে তাহাকে ভুলিতে পারিবে না তাহাও ঠিক তেমনই সত্য বলিয়াই তাহার মনে হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত সে তাহার বিস্মিত দৃষ্টি দিয়া ওই মেয়েটির সমস্তই যেন শুষিয়া লইতে লাগিল। অলকার বুক একবার কাঁপিয়া উঠিল। এইবার হয়ত' তাহাকে প্রকৃত পরীক্ষায় পড়িতে হইবে, হয়ত' তাহার সমস্ত কিছু শুনিয়াও বিশ্বাস করিবার কোন হেতুই পাইবে না এই লোকটি। যেমন করিয়া সে চাহিয়া আছে তাহাতে তাহাকে সহজ বিশ্বাসী বলিয়া মনে হয় না, যাচাই করিয়া না দেখিয়া কোন কিছুই যে সে বিশ্বাস করিবে না ইহা অবধারিত সত্য বলিয়াই তাহার মনে হইল। যে আসিয়াছে সে সতীশের মত নয় প্রতুলের মত যেমনিতেও সে যাইতে পারে না।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র এমনিভাবে তাহারা দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহাদের দুইজনের মনে অনেক কথাই আসিল, অনেক কথাই মিলাইয়া গেল।

প্রতুল বলিল, কি হে জগদীশবাবু, যে, বড় বেকায়দা সময়ে—ভাগ একটা বেড়ে গেল দেখছি, আপনাকে দেখলেই মনে হয় যেন আপনি গন্ধ শুঁকেও অনেক কিছু টের পান। সে একটু জোরেই হাসিয়া উঠিল।

জগদীশ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, কোনও রকমে একটু হাসিয়া বলিল, কি করি বলুন, মেসে বসে বসে কি আর ভাল লাগে? তাই এলুম সাহিত্যিকের কাছে, সময় খানিকটা বেশ কেটে যাবে।

তেমনিভাবে হাসিয়াই প্রতুল বলিল, নিশ্চয় নিশ্চয় আপনি নিশ্চয় বুঝেছিলেন যে সতীশের হাতেও কোন কাজ নেই, বেচারা হয়ত' বেঘোরে ঘুমুচ্ছে—বেশ, বেশ। কিন্তু আমি চলি। চলুন দিদি। অলকা যেদিকে দাঁড়াইয়াছিল সেই-দিকে চাহিয়া প্রতুল আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। তাহাদের কথা বলিবার অবসরে সে যে বাহির হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে তাহার মুহূর্ত্ত মাত্রও দেরী হইল না। দ্রুত পদে সেও বাহির হইয়া গেল।

সতীশ বলিল, এস হে, ওর বাজে কথায় কান দাও কেন? এতদিন ধ'রে ওকে দেখে এসেও আজ ওরই কথায় তোমাকে লজ্জা পেতে দেখে আমিও আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি।

নিতান্তই সহজভাবে হাসিয়া প্রতুলের প্রত্যেক কথাকেই যেন একান্ত সহজভাবে উড়াইয়া দিয়া জগদীশ বলিল, না, ওর কথা আমি আমলেও আনি না। পৃথিবীতে অনেক রকম মানুষই আছে। এই আমাদের মেসেই আমার পাশের বিছানাতেই ছিলেন এক ভদ্রলোক, তাঁর কাজ ছিল শুধু চিন্তা করা। মানুষ কি যে এত' ভাবতে পারে তা' আমি বুঝতেও পারি না। একদিন তাঁকে বেড়াতে নিয়ে গেলুম, এই ভিক্টোরিয়া হলের ওদিকে, তা তিনি গেলেন পালিয়ে—বাইরের হাওয়া না কি তাঁকে পাগল ক'রে দেয়। আমি অবাক্ হ'য়ে যাই, বলে কি এ? মেসে ফিরে এসে শুনি তিনি দেশে পালিয়েছেন পাছে আমি আবার তাঁকে বাইরের জগতের মধ্যে নিয়ে যাই। এরা সব পাগল। পৃথিবীটা যেন একটা পাগলা-গারদ, আমরাই দু'চারটে যা ছিট্‌কে বেরিয়ে গেছি।

সতীশ হাসিয়া বলিল, সে কথা সত্যিই জগদীশ, তোমার একথাটা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কিন্তু যাই বল এ পাগলগুলোরও প্রয়োজন বড় কম নয়—এরা আছে ব'লেই বেঁচে আছে সাহিত্য, বেঁচে আছে মানুষ। ভগবানের দস্তুরমত বুদ্ধি আছে একথা স্বীকার ক'রতেই হবে।

'ভগবানের বুদ্ধি নেই ব'লেই মনে হচ্ছিল না কি?'

সতীশ বলিল, নিশ্চয়ই, ভগবানও যে ওই পাগলা-গারদের একজন আসামী, হয়ত' বা বড় আসামীই। এমনি ক'রেই সে ঘটনাগুলি সাজিয়ে রেখেছে যে মনে হয় যেন একটা উপন্যাস। হয় সে পাগল নয়ত' বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। কখন কার ঘাড়ে যে কে চেপে ব'সবে, বিয়োগান্ত হবে না সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবার ব্যবস্থা হবে তা' যেন ধারণাও করা যায় না একটু আগেও। এই ধর না আমারই কথা, কেমন ক'রে যে এমনি ব্যাপার ঘটে গেল তা' আমি বুঝতেও পারিনি, আর ব্যাপারটা ঘটবার এক মুহূর্ত্ত আগেও কিছু টের পাইনি, এ যেন হঠাৎ ট্রেনের গতি পরিবর্ত্তনে আকস্মিক ধাক্কা, তাল সামলান একেবারেই অসম্ভব।

জগদীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। অল্প কয়দিনের মধ্যে উহার এমন কি ঘটিয়া গেল যাহা ট্রেনের আকস্মিক ধাক্কার মতই তাল সামলান অসম্ভব? হয়ত' ওই মেয়েটিই তাহার আসল কারণ, হয়ত' উহারই জন্য আজ সতীশকে দিক্ ভুল করিতে হইয়াছে, হয়ত' বা ভীষণ ধাক্কা লাগিয়া সে তাহার গতানুগতিক গতিপথ হইতে অচিরেই ছিট্‌কাইয়া পড়িবে। সে তাহার মনের আগ্রহ চাপিয়া, বুকের দ্রুত স্পন্দন কোন রকমে বাহিরে প্রকাশ করিতে না দিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সতীশও একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনাই ব্যক্ত করিল।

সতীশের বক্তব্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জগদীশের মুখের উপর দিয়া একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। এ কিসের চমক, হাসির না বিদ্রূপের তাহা দেখিবার মত খেয়াল সতীশের ছিল না, বিশেষভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেও কেহ বুঝিতে পারিত কি না সন্দেহ।

ধীরে ধীরে মুখ চোখের ভাব গম্ভীর করিয়া জগদীশ বলিল, ব্যাপারটা ত' খুব ভাল নয়। এতদিন তোমরা এক-সঙ্গে ছিলে—সাধারণ মানুষে তোমাদের বিশ্বাস ক'রবে কি না কে জানে? তারপর ওর স্বামীর খোঁজও যদি পাওয়া যায় ত' সে কি তাকে ফিরিয়ে নিতে রাজী হবে?

অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইয়া সতীশ বলিল, রাজী হবেই বা না কেন? ও ত' কোন দোষই করে নি।

নিতান্ত চিন্তিতভাবেই জগদীশ বলিল, সে আমি না হয় বিশ্বাস করি, কিন্তু জগতের সব কিছুই ত' আমি নই। দোষ ও করেনি একথা কি সবাই স্বীকার ক'রবে? হয়ত' অনেকে ব'লবে যে দোষ ও করেছে তার চেয়ে বড় দোষ মেয়েদের আর হয় না। আমি তোমাকে যেমন চিনি তেমন ত' আর সকলে চেনে না। বিশেষ করে সাহিত্যিকদের ওদিক দিয়ে দুর্ব্বল ব'লেই মনে করে অনেকে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, তার মানে? কি ব'লতে চাও তুমি? তুমি নিশ্চয় ব'লতে চাও না যে—

ম্লান হাসি হাসিয়া, চোখে মুখে করুণতা ফুটাইয়া জগদীশ বলিল, হ্যাঁ, মাপ ক'র বন্ধু, আমি তাই ব'লতে চাই—কিন্তু এ আমার কথা নয়, যাকে একটু আগে দেখেছি এখানে তাকে আমি অবিশ্বাস ক'রতে চাই না, তোমাকে ত' করি-ই না। কিন্তু ভয় অন্য সবাইকে, হয়ত' ওই প্রতুলও।—

অন্যমনস্কভাবে সতীশ বলিল, না প্রতুল সব জানে ওকে বিশ্বাস ক'রতে এতটুকু দ্বিধা করাও চলে না, ও মনুষ্য জগতের বাইরে।

একটা চক্ষু কুঁচ্‌কাইয়া জগদীশ বলিল, কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল বটে, কিন্তু একটা কথা সতীশ, হ্যাঁ কথাটা প্রয়োজনীয়, দেখ' ওই প্রতুলের জন্যে যেন তোমার সম্মানের হানি না হয়। অবশ্য তুমি সবই বুঝবে তবু জানিয়ে রাখা ভাল পরে যেন দোষের ভাগী হ'তে না হয় আমায়। বন্ধুর কর্ত্তব্য একটু কঠিন হ'লেও তা' ক'রতে আমার আপত্তি নেই তা' বোধ হয় তুমি জান।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, না প্রতুলকে আমি বিশ্বাস করি, আমার কোন অনিষ্টই সে কোন দিন ক'রবে না তা আমি জানি।

'সে ত' খুবই ভাল কথা, তবে ত' অনেক ভাবনাই চুকে গেল।' জগদীশ আস্তে আস্তে বলিল।

রামহরি আসিয়া তাহাদের দুইজনের সম্মুখে দুই প্লেট খাবার রাখিয়া বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সতীশ বলিল, তোর মা কোথায় রে রামহরি?

রামহরি দাঁত বাহির করিয়া বলিল, তিনি প্রতুলবাবুর কাছে।

গম্ভীর মুখে সতীশ বলিল, এখানে তাদের আসতে বল না।

তেমনিভাবে হাসিয়াই রামহরি বলিল, সেখান থেকে কি আসবার জো আছে মা'র। প্রতুলবাবু বললেন, রান্নাঘরে বসে খেতেই ভাল লাগে—গরম গরমও হয় আর একটু বেশীই পাওয়া যায়। সেখান থেকে বেরোবার পথও তার বন্ধ—দরজা আগলে ব'সে আছেন তিনি। মা-ও আসবার তেমন ইচ্ছে নেই। তোমরা ততক্ষণ খেয়ে নেও খোকাবাবু।

রামহরি আর কিছু না বলিয়া সতীশকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

জগদীশ এতক্ষণ সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া সমস্ত কিছুই শুনিতেছিল। রামহরি বাহির হইয়া গেলে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, ব্যাপার কিন্তু খুব ভাল নয়। তুমি সাহিত্যিক হয়েও কেন যে এ সব দিকে নজর দাও না তা' ত' বুঝতে পারি না। সম্মানটা রক্ষা করবার চেষ্টা করা ত' উচিত, শেষকালে কি তোমার বাড়ীতে।—

তাহার কথা শেষ হইতে পাইল না, জোর করিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া সতীশ বলিল, তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি জগদীশ; কিন্তু আমি নিজেকে বিশ্বাস ক'রতে না পারলেও প্রতুলকে বিশ্বাস ক'রতে পারি। সে ভয় আমি করি না, কিন্তু ওদের এখানেই আসা উচিত ছিল, তোমার সঙ্গে অনায়াসে আলাপ করিয়ে দিতেও ত' পারতুম।

হাত নাড়িয়া জগদীশ বলিল, না তার জন্যে ভাবনা কি। আমি ত' আর পালিয়ে যাচ্ছি না—রোজই আমি আসতে পারব' এখন, এক সময় আলাপ করিয়ে দিলেই চ'লবে। আলাপ ত' হবেই উনি যখন এখানে থাকবেনই তখন অসুবিধে আর কি। আমরা ত' সব সময়েই আসি তুমি না থাকলেও যাতে বিপদে প'ড়তে না হয় তার ব্যবস্থা আমরাই ক'রে নেব অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল প্রতুল, আসিয়াই সে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, আরে ব্যাপার কি সতীশ সব খেতে পারনি বুঝি? তা তুমি পারবেও না জানতুম, অতগুলো দিতে বারণ করলুম তা কি মেয়েরা শোনে কখনও। আর আপনার কি হ'ল জগদীশবাবু? ও-হো বুঝেছি, আসছেন এক্ষুণি, আর একবার চা-খেতে ইচ্ছে হয়েছে কি না তাই একটু দেরী হ'চ্ছে—তা সব শুদ্ধু নিয়ে এসে প'ড়লেন ব'লে।

কথা শেষ করিয়াই জানলার সম্মুখে আগাইয়া গিয়া সে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, দিদি একটু শীগ্‌গির, এরা কিছুই খায়নি—নেহাৎ অভদ্রতা হ'য়েছে আমাদের। জগদীশবাবু নূতন লোক একটু অনুরোধ তাঁকে ক'রতে হবে বইকি। ও-সব না হয় থাক্‌ একবার এসে আগে অনুরোধ ক'রে যাও তারপর গিয়ে নিয়ে এলেই চ'লবে।

জগদীশ কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া প্লেট হইতে একটা লুচি তুলিয়া লইয়া সমস্তটা একসঙ্গে তাহার ক্ষীণ দেহের মধ্যে ভরিয়া দিবার জন্য মুখের ভিতর পুরিয়া দিয়া কত কি বলিবার জন্য হাত ও মুখ নাড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মুখে স্থানের নিতান্তই অভাব হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া কথা বাহির হইতে পারিল না, বাহির হইয়া আসিল একটা বিশ্রী শব্দ। তাহার অবস্থা দেখিয়া প্রতুল মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর হইতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, যা হ'ক আমার অনুরোধই যে রাখলেন তা' জানিনি, আমার নিজের সম্বন্ধে আজ থেকে একটা উঁচু ধারণা হ'ল।

কোন রকমে কিছুক্ষণ চেষ্টার পর মুখের জিনিষ ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া একটু জল খাইয়া জগদীশ বলিল মোটেই নয়, অনুরোধ করার কোন দরকারই হয় না আমায়, এই ত' খেয়ে

নিলুম অনুরোধ ক'রতে হ'ল কি? ও সব নিজেদের জন্যে তুলে রাখুন প্রতুলবাবু।

হাসি মুখে মাথা নাড়িয়া প্রতুল বলিল, ঠিক, এতটুকু অনুরোধ করতেও হয়নি আপনাকে, বুদ্ধিমান লোকেরা ঠিক আপনার মতই চট্‌পট্ হাত চালায়, কিন্তু দেখবেন অমনি ক'রে বেশীক্ষণ চালাবেন না যেন—ডাক্তার তাহলে আমাকেই ডেকে আনতে হবে, কিন্তু এখন আমার পক্ষে বেশী হাঁটা মুস্কিল। তারপর তোমার ব্যাপার কি সতীশ, জগদীশবাবুর মত বুদ্ধির দৌড় দেখাবে, না বোকা সেজেই শেষ পর্য্যন্ত বসে থাকবে?

সতীশ বলিল, না খাবার ইচ্ছে আমার নেই, শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না সকাল থেকেই আর বেশী অত্যাচার না করাই ভাল।

সহজভাবেই প্রতুল বলিল, হ্যাঁ, না খাওয়াই ভাল—বেশী অত্যাচার করা উচিত নয়। কিন্তু আমার পেটও যে ভরা। আর কথা না বাড়াইয়া প্লেটটা টানিয়া লইয়া একসঙ্গে দুইটা মিষ্টি মুখে পুরিয়া দিয়া সে বলিল, এ সব না খেয়ে এক কাপ চা বরং খেয়ে ফেল সব ঠিক হ'য়ে যাবে, একেবারে আমার মত চাঙ্গা আর জগদীশবাবুর মত বুদ্ধিমান হ'য়ে যাবে তাহলে।

সতীশ হাত নাড়িয়া বলিল, থাম প্রতুল, মানুষকে খোঁচা দিতেই শিখেছ শুধু। একটু সহজ মানুষের মত বুদ্ধিবৃত্তিকে খুলে ধ'রতে শেখনি?

অত্যন্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রতুল বলিল, খোঁচা দিচ্ছি? তুমি কি পাগল হ'য়েছ না কি? প্রশংসা করছি বল! আমাকে একটু কর না—চোখ বুজে পিট্ পিট্ ক'রে তাকাব তা'হলে তোমার দিকে আর বুকের মধ্যে আমার কি যে আনন্দ হবে—ও! সত্যি ব'লছি বুক আমার লাফাতে থাকবে। আনন্দের বন্যা ব'য়ে যাবে, প্রশংসা দে। আচ্ছা সত্যি বলুন ত' জগদীশবাবু আপনার বুক ফুলে উঠ্‌ছে না আমার কথায়?

তাহার মুখের দিকে তাচ্ছিল্য ভরে চাহিয়া জগদীশ বলিল, বুক ত' আর সবারই এক রকম নয়, আপনার যাতে ফোলে আমারও যে তাতে ফুলবে এর কোন মানে আছে কি?

ঘাড় নাড়িয়া প্রতুল বলিল, ঠিক এই কথা আমিও ব'লতে চাই। আমার বুক ওতে ফুলে উঠত' ঠিকই, আপনার কিন্তু দমে যাচ্ছে—সে আমি ঠিকই বুঝেছি।

নিতান্ত অন্যমনস্কের মতই প্লেটটা হাতে তুলিয়া লইয়া সে আরও কিছু মুখের ভিতর চালাইয়া দিল। সতীশ আর কোন কথাই না বলিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল, জগদীশও যেন কোন কিছু গ্রাহ্য করে নাই এমনি ভাব দেখাইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল।

হঠাৎ দরজার দিকে চাহিয়া প্রতুল বলিয়া উঠিল, আমার কিছুই দোষ নেই দিদি, ও খেতে চাইল না, কিছুতেই না—আমারও ত' পেট ভরা কিন্তু তাই বলে নষ্ট করা—

সতীশ মুখ ফিরাইয়া অলকাকে দেখিতে পাইল, তাহার চোখে মুখে একটা তিরস্কার ভাব তখনও লাগিয়াছিল—প্রতুলকে সে যে তিরস্কার করিতে চায় কিন্তু কেন তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

টেবিলের উপর প্লেটটা রাখিয়া বাকী জিনিষগুলির দিকে চাহিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণভাবে প্রতুল বলিল, থাকগে, আর খাব না—কিই বা এমন হয়েছে, ও সব খেয়ে কেই বা কবে—হ্যাঁ।

সতীশ হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু কোন কথাই বলিল না।

পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া জগদীশ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কি-ই বা করিবে সে তাহা ভাবিয়াও পাইল না।

এইবার প্রতুল হাসিয়া উঠিল, সে হাসি না শুনিলে বুঝিবার উপায় নাই কেমন করিয়া উহা এক মুহূর্ত্তেই মানুষের সমস্ত তিরস্কার, ক্রোধ গলাইয়া দিয়া তাহার মনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া নেয়। জগদীশের হাতের দিকে চাহিয়া সে বলিল, ওটা হাতেই র'য়ে গেল যে, একান্ত বুদ্ধিমানের মতই মুখে চালিয়ে দিয়ে গালটাকে একটু মিষ্টি ক'রে নিন জগদীশবাবু নইলে যা বেরোবে তা' মন থেকে মুছে ফেলতে আমারও হয়ত' দিন কতক লাগবে।

হাতের জিনিষটাকে প্লেটের উপর ফেলিয়া দিয়া গ্লাসের মধ্যে হাত ডুবাইতেই খানিকটা জল উপছাইয়া পড়িয়া গেল। রুমাল দিয়া সেই জল মুছিয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিবার কোন কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া নিতান্ত হতাশভাবেই সে আবার বসিয়া পড়িয়া সতীশের মুখের দিকে অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিল।

সহজভাবেই অলকা বলিল, আপনি বসুন, ব্যস্ত হতে হবে না আমি চা ঢেলে দিচ্ছি।

ঠোঁটে হাসি ফুটাইয়া জগদীশ বলিল, না ব্যস্ত নয়, তবে কি জানেন, এই কি যে বলব আমি ঠিক ভেবেই পাচ্ছি না বৌদি।

অলকার ললাট কুঞ্চিত হইল, কিন্তু কোন কথাই না বলিয়া সে চা ঢালিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

প্রতুল মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক ব'লেছেন জগদীশবাবু—মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কি যে বলা যায় তাই ঠিক ভেবে পাওয়া যায় না, বিশেষত যাদের একেবারেই অভ্যাস নেই তারা শুধু অপ্রস্তুতই হয়, কিন্তু আমি ওই ঠিক আপনার মতই বুদ্ধিমান। যারা অপরিচিত তারাই না আমাদের কাছে মেয়ে কিন্তু দিদি ত' আর সে-রকম মেয়ে হ'তে পারে না, সে ত দিদিই—মেয়ে হবে কেমন ক'রে। কি বলুন জগদীশবাবু। নিজের বুদ্ধির তারিফ করিয়া নিজে নিজেই সে হাসিয়া উঠিল।

অলকার দিকে বার বার চাহিয়া জগদীশ যেন আরও বেশী অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার বুকে কাহারা যেন তাণ্ডব সুরু করিয়া দিয়াছে, সে নৃত্য থামিবে কি না তাহা ভাবিয়া না পাইলেও সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিল যে, অলকার সম্মুখে থাকিয়া তাহারই স্বহস্তে ঢালা চায়ের পেয়ালা হাতে তুলিয়া লইবার সময় বুকের সে দোলা তাহার হাতের কাঁপনের কাছে একান্তই তুচ্ছ হইয়া যাইবে।—সকলে পেয়ালা তুলিয়া লইবার পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে তাই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কত কি ভাবিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

(শেষাংশ ৪৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতি

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ গৌরবময় জীবনের ৭৩ বৎসর অতিক্রম করিয়া বিগত ২২শে ভাদ্র মহা-সমাধি মগ্ন হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্তান দেখিবার যে সৌভাগ্য এতকাল লাভ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা হইতে চিরবঞ্চিত হইলাম। এ ক্ষতি কেবল ভক্তমণ্ডলীরই নহে, সমস্ত জগদ্বাসীর। তাঁহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কয়েকটি স্মৃতিকথা তদনুরাগী পাঠকগণকে উপহার দিতে চেষ্টা করিব।

১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ কিম্বা আষাঢ় মাস। স্বামী অভেদানন্দ কাশীতে আসিয়াছেন। এই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার সুযোগ পাইলাম। স্বামীজী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে যাইবেন শুনিয়া আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া ফিরিবার পথে আমরা সঙ্কটমোচন (তুলসীদাসের সাধনপীঠ) দর্শন করি। স্বামীজী সেখানে আসিয়া তুলসীদাসের দোঁহাবলী একটির পর একটি আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। দীর্ঘ ২৫ বৎসর পাশ্চাত্যবাসের পর, এই প্রৌঢ় বয়সে, বাল্যকালে অভ্যস্ত বিষয় নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করিতে দেখিয়া তাঁহার স্মৃতিশক্তিতে বিস্মিত হইলাম।

১৩৩০ সালের বৈশাখ মাস। স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য বেদান্ত সমিতিতে যাই। তখন ঐ সমিতি ইডেন হস্পিটাল রোডের উপর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল। এই সময়ে মাসিক বসুমতীতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তবরাজঃ' নামক স্বামীজীর রচিত এক স্তব প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাঁহার কাছে ঐ স্তবের মুদ্রিত ফাইল পাঠাইয়া দিয়াছিল। তিনি সেই ফাইলটি দেখিতেছিলেন, এমন সময় আমি ঘরে ঢুকিতেই নিতান্ত পরিচিত লোকের মত গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সংস্কৃত পড়তে পার কি?' আমি সঙ্কুচিতভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিতেই ফাইলটি আমার হাতে দিয়া পড়িতে বলিলেন। তারপরে একখানি পুরাতন ছোট খাতা বাহির করিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'যখন এই স্তবগুলি লিখি, তখন কত কম বয়েস দ্যাখ,—হাতের লেখা দেখলেই বুঝতে পারবে।' বড় বড় অক্ষরে কতকটা কাঁচা হাতের লেখা তাঁহার প্রথম বয়সে রচিত স্তবগুলিতে ভরা খাতাখানি টেবিলে উপুড় হইয়া দেখিতে লাগিলাম। এইভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটাইয়া যখন বাহিরে আসিলাম, এক অননুভূতপূর্ব্ব সাম্যভাবে মন ভরিয়া গিয়াছে! মনে হইতেছিল যেন এক সমবয়সী অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া এতক্ষণ আলাপ করিয়াছি। পরক্ষণেই তাঁহার বৃহৎ ব্যক্তিত্বের কথা মনে পড়িল ও তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই সাম্যভাবের অনুভূতি এতই গভীর হইয়াছিল যে, এতকাল পরেও উহার স্মৃতি একেবারে মুছিয়া যায় নাই। ইহা কি সাম্যমৈত্রীর দেশ, স্বাধীন আমেরিকায় সুদীর্ঘকাল বাসের প্রভাব? না অন্য কিছু?

এই সঙ্গে আর একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। স্বামীজী কয়েকদিন কাশীতে বাস করিতেছেন। সঙ্গে দুইজন সেবক তন্মধ্যে একজন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীটি অল্পবয়স্ক ও একটু কোপন স্বভাবের। একদিন অপরাহ্ণে দেখা গেল, ঐ সন্ন্যাসীর মাথা গরম হইয়াছে, আর কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া স্বামীজীকে উদ্দেশ করিয়া যা-তা বলিয়া যাইতেছে। আমি তখন কার্য্যানুরোধে ঐদিকে ছিলাম। ব্যাপার দেখিয়া বড়ই বিসদৃশ বোধ হইল। আর একজন প্রাচীন সাধুও সেখানে আসিয়াছিলেন, তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মহারাজ, আপনি ওর মুখে দুই থাপ্পড় বসিয়ে দিতে পারছেন না?' স্বামীজী প্রশান্তভাবে উত্তর দিলেন, 'তা কি করে হয় বল? আমি যেমন সন্ন্যাসী, সেও তেমনি সন্ন্যাসী।'

ঘটনাটি অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু এই পরাধীন দেশে, যাহারা জগদ্গুরুর অভিমানে উপদেশ বিক্রয় করিয়া খান, তাঁহাদের অনেকের সঙ্গে দীর্ঘকাল থাকিয়াও দ্বিতীয়বার এমনটি শুনিতে পাইলাম না। বরং ইহার বিপরীত আচরণ দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ করিয়া কেবল মর্ম্মাহতই হইয়াছি। অন্তরে মানুষের মনুষ্যত্বে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা, আর মুখে 'নর-নারায়ণ' বুলি—দাস মনোবৃত্তির চরম পরিণতি।

১৩৩১ সালের চৈত্র মাস। স্বামীজী ক্লাশে কিভাবে শাস্ত্র-শিক্ষা দেন দেখিবার জন্য বেদান্ত সমিতিতে যাই ও একরাত্রি বাস করি। তখন সাধারণের জন্য পাতঞ্জল যোগসূত্রের ক্লাশ হইত। তিনি আধ ঘণ্টায় কয়েকটি সূত্রের ব্যাখ্যা করিলেন—অন্বয় ও অনুবাদ করিয়া দিয়া, অল্প কথায় আশ্চর্য্যরকমে সূত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। তারপরে শ্রোতাদিগকে প্রশ্ন করিতে বলিয়া আধ ঘণ্টা তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দান করিলেন। ক্লাশে শিক্ষাদানের ভঙ্গী মনে একটা ছাপ রাখিয়া গেল।

পরদিন সকালে যখন চলিয়া যাইব, স্বামীজীর কাছে একখানি 'স্তোত্ররত্নাকর' পুস্তক চাহিলাম। যাহার কাছে বইয়ের আলমারীর চাবি ছিল, তিনি তখন বাহিরে গিয়াছিলেন। স্বামীজী ঠাকুরঘরে রক্ষিত বইখানি নিজে হাতে করিয়া আনিয়া দিলেন। দিন কয়েক ব্যবহারের ফলে বইখানি একটু ময়লা হইয়াছে দেখিয়া আমার পছন্দ হইল না। স্বামীজী আমার মুখের ভাবেই তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং যেন কি চিন্তা করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। খানিক পরেই একখানি নূতন বই হাতে করিয়া বাহির হইলেন ও আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'দ্যাখ দেখি এখানি পছন্দ হয় কিনা? এখানি আমার নিজের ছিল।'

শুনিয়াছি নিজের ব্যবহারের জন্য পুস্তক চাহিয়া তাঁহার কাছে কেহ বিমুখ হয় নাই। চাহিবামাত্র পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য সমগ্র গ্রন্থাবলী দান করিয়াছেন, যে সকল মূল্যবান পুস্তক আমেরিকায় প্রকাশিত সেইগুলি নিজ ব্যয়ে আমেরিকা হইতে আনাইয়া পাঠাইয়া দিতে শিষ্যদিগকে আদেশ করিয়াছেন। কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের লাইব্রেরী ইহার সাক্ষ্য দিবে।

কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ শতাব্দীজয়ন্তী। দুর্ভাগ্যক্রমে তখন কলিকাতায় না থাকিয়া বিক্রমপুরে ছিলাম, আর আজও বিক্রমপুর হইতেই সেই কথাটি লিখিতেছি। নিত্য আনন্দ বাজার পত্রিকায় ধর্ম্মমহাসভার বিবরণ পড়িবার জন্য উৎসুক

হইয়া থাকিতাম। বিভিন্ন দেশীয় সুধীগণ—ভদভাবে কন-সালগণ সমবেত হইয়াছিলেন আর সকলেই পরম সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলিতেছিলেন। কিন্তু যাঁহাকে লইয়া এই মহাসভা আহূত হইয়াছিল, সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সার কিছুও [illegible] বলা হইতেছিলেনা বলিয়া পত্রিকার রিপোর্ট হইতে জনসাধারণ তখন আমরা বুঝিতে পারি নাই। [illegible] সত্যতা ও নিত্যতা যাহা প্রতিপাদন করা শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার অন্যতম গভীর উদ্দেশ্য, তাহার উপর কটাক্ষ ও অশ্রদ্ধা প্রকাশে একদিনের সভাপতির আসন হইতে বর্ষিত হইয়াছিল। আর উপস্থিত সভ্যগণ করতালি ধ্বনির সাহায্যে সেই অশ্রদ্ধা পরিপাক করিয়া লইয়াছিলেন। কেবল-মাত্র স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের অভিভাষণের মধ্যে আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিতে পাইয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া উষ্ণীষধারী সন্ন্যাসী উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—বর্ত্তমান যুগের সকল গ্লানি দূর করিয়া মানব-সভ্যতার পুনরভ্যুদয়ের জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সরল সহজ কথাটি সরল সহজভাবে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের লোক বলিয়া পরিচিত বক্তা পর্যন্ত যেন সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। তখন আমাদের মনে হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকার একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানেরই আছে—অন্যের নাই।

[illegible] বৎসর পূর্ব্বে যখন [illegible] পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন সম্পাদকের তরফে কয়েকটি বিষয় জানিতে তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। শ্রীমাতা-ঠাকুরাণী সম্বন্ধে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ স্তবটির রচনাকাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তখন মঠ বরানগরে ছিল ও মা বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে ছিলেন।' ইহা হইতে ১৮৮৮ সালে ঐ স্তব রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর মাত্র। স্তবটি রচনা করিয়াই তিনি শ্রীশ্রীমাকে শুনাইতে গিয়াছিলেন ও মা প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, 'তোমার কণ্ঠে সরস্বতী বসবেন।' আমেরিকায় যখন তাঁহার খুব প্রতিপত্তি, পাদ্রীরা দল বাঁধিয়া তাঁহাকে জব্দ করিতে আসিয়া একটিমাত্র উত্তরে জব্দ হইয়া ফিরিতেছিল, তখন মার কাছে কেহ সেই বিষয় উত্থাপিত করিলে মা বলিয়াছিলেন, 'কালীর কণ্ঠে এখন সরস্বতী।' ঘটনাটি বহু বৎসর পূর্ব্বে কাশীতে প্রাচীন সাধুদের কাছে শুনিয়াছি।

তাঁহার রচিত স্তবগুলি পাঠ করিলেই তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অন্তরঙ্গ সহচর, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। এই সম্বন্ধে আর একটি কথাও আমরা শুনিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সুপরিচিতা যোগীন-মা নাকি বলিয়াছেন: ঠাকুর তাঁহাকে কালী-মহারাজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'একটি কালো ছেলে আমাকে হাত ধরে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়, আবার হাত ধরে বৈকুণ্ঠ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে।'

বিগত ২২শে শ্রাবণ তাঁহাকে শেষবার দর্শন ও প্রণাম করিয়া আসি। আর দেখা হয় নাই।

বন্ধন হীন গ্রন্থি

(৪৯০ পৃষ্ঠার পর)

অলকা বলিল, বসে আছেন কেন আপনি? চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এদিকে। প্রতুল হাসিয়া বলিল, ভারী মজা জগদীশ-বাবু, চা জিনিষটা একটু বেকায়দা ধরণের, ওই গরম চা রেখে দিন খানিকক্ষণ, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে, কিন্তু শুধু ঠাণ্ডাটা রেখে দিন গরম আর হবে না কিছুতেই। অতএব বুদ্ধির খেলা দেখান আর একবার, কিন্তু মনে রাখবেন একসঙ্গে সবটা চালাবেন না যেন। ঠোঁট আর জিভের একটা বেজায় দোষ আছে—গরম জিনিষ তারা সহ্য করিতে পারে না, একেবারে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে বসে।

সকলের অলক্ষ্যে অলকা একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—তাহার সমস্ত মুখ তখন প্রশান্ত হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া জগদীশ বলিল, আপনি যা জানেন আমি তার চেয়ে কম জানি না কিন্তু। বোঝাতে যদি হয় ত' ছোট ছেলেদের বোঝাবেন।

সহজভাবেই প্রতুল বলিল, আমার চেয়ে বেশী জানেন যে সেই ত' হয়। বলতে বলতে হয় বক্তা, জানতে জানতে হয়—থাক্‌গে আর ছোট ছেলে মনে করব না আপনাকে। চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া একবার হাসিয়াই প্রতুল গম্ভীর হইয়া গেল। সে যেন আর সেখানে নাই, সেই দলের মধ্যে থাকিয়াও সে যেন বহুদূরে সরিয়া গিয়া তাহাদের প্রতিটি কাজ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিতেছে। সে যাহা চাহিয়াছিল তাহা যেন করিবার চেষ্টা চলিয়াছে, ঠিক তাহার মনের মত করিয়া তাহা যেন কিছুতেই হইয়া উঠিতেছে না।

পেয়ালা খালি করিয়া জগদীশ বলিল, চল সতীশ, থিয়েটার দেখে আসা যাক্‌। ক'দিন ধ'রেই যাব ভাবছি, ভালই না কি হ'য়েছে—চল যাওয়া যাক্‌ আজই।

সতীশ খুশী হইয়া বলিল, সেই ভাল, সেখানে আমাদের কবিকেও ধ'রে নিয়ে যাওয়া যাবে—সে-ও অনেক দিন থেকেই ঝুঁকেছে ওটা দেখবার জন্যে, কবি কাছে থাকলে সমস্তই কিন্তু ভারী সরস হ'য়ে ওঠে। চল অলকা তুমিও চল আমাদের সঙ্গে।

সকলের দৃষ্টি বাঁচাইয়া অলকা প্রতুলকে ঠেলিয়া দিল।

প্রতুল যেন অকস্মাৎ মাটীর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিল, উঠিয়া পড়িয়া সমস্ত ঘরময় পায়চারী করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সে বলিল, সেই ভাল, তাই করা যাক্‌।

অলকার দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, যাও তুমি প্রস্তুত হ'য়ে নাও, আমরা ঠিকই আছি, বেশী দেরী ক'র না কিন্তু।

(ক্রমশ)

অতীত

(গল্প)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

নিতান্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় লইয়াও মেজোবৌর সঙ্গে আজকাল ঝগড়া বাধিয়া যায়। এবার রোগ হইতে উঠিবার পর মেজোবৌর মেজাজ যেন আরও বেশী খিট্-খিটে হইয়া পড়িয়াছে। শশীমুখী যতই এড়াইয়া চলিতে চায়, ভয়ে ভয়ে যতই দূরে দূরে থাকে মেজোবৌর সঙ্গে খিটীমিটি ততই যেন বেশী করিয়া বাধে। ঝগড়া বাধাইবার একটা না একটা কারণ খুঁজিয়া লইতে মেজোবৌর একটুও দেরী হয় না।

কাল বিকালে খই বাছিতে বাছিতে অন্ধকার হইয়া গেল। তবুও সব খই বাছা হইল না। রাত্রে শশীমুখী আজকাল প্রায় কিছুই দেখিতে পায় না। একটা চোখে ত তিন চার বছর যাবৎ ছানি পড়িয়া রহিয়াছে, দিনে কি রাত্রে সে চোখে কিছুই দেখা যায় না। আর যে চোখটা ভাল সে চোখেও রাত্রে ভয়ানক আব্‌ছা আব্‌ছা লাগে। সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিলে তাই শশী অ-বাছা খই আর বাছা খই দুইটা পৃথক হাঁড়িতে ঢালিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল।

সকালে মেজোবৌ 'মুড়কি' করিবার জন্য খই লইতে আসিয়া দেখে বাছা খই-এর হাঁড়িতে অ-বাছা খই ঢালিয়া বুড়ী কাজ বেশ আগাইয়া রাখিয়াছে।

মেজোবৌ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "করেছেন কি!"

"কেন কি করেছি?"

"কি করেছি!" মেজোবৌ জ্বলিয়া উঠিল, "চোখে দেখতে পারেন না, এসব কাজে না এলেই হয়, কে আসতে বলে আপনাকে?"

শশীও বিরক্ত হইয়া উঠিল, "কি মহা অপরাধটা করেছি, তাই আগে বল না বাপু!" অপরাধটা যে নিতান্ত সামান্য নয় তা' মেজোবৌ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিল। শশী মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেও বাহিরে তা' প্রকাশ করিবার পাত্রী সে নয়, বলিল, 'তা' বলে তুমি ধম্‌কাতে আসবে না কি? আর যেন শত্রুতা করেই খইগুলি আমি মিশিয়ে রেখেছি। তোমার সঙ্গে শত্রুতা ছাড়া আর ত কোন সম্পর্ক আমার নেই, বাপ্‌রে বাপ, কি গলা। ভদ্রলোকের মেয়ে যে এমন চেঁচাতে পারে তা' আমি জন্মেও দেখিনি। একটু পান থেকে চূণ খসবার উপায় নেই তেড়ে আসবে মারতে। তবু যদি মাসের মধ্যে পনের দিন শুয়েই কাটাতে না হ'ত। সারা জীবন রোগের সেবা করে করেই মরলাম। খেটে খেটে বুড় বয়সে মুখে রক্ত উঠে গেল, তবু একদিন একটু ভাল মুখের কথা শুনতে পেলাম না" —বলিয়া শশী আর সেখানে দাঁড়াইল না। মেজোবৌর জিহ্বাকে সে ভয় করে। জিহ্বা ত নয়, বিষ। এ বাড়ীতে কত বউ আসিল, কত বউ মরিল কিন্তু এমন বউ আর সে দেখে নাই। আর সেই প্রথম দিন হইতেই যে রোগ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে তার আর শেষ হইল না। ভাইপোও তেমন। একটু কিছু হইতে না হইতেই তিনজন ডাক্তার আসিয়া হাজির। তখন তার আর হাত-টানাটানি থাকে না। আর বউ-এর সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই অমনি বলিয়া বসিবে 'কিছু মনে ক'র না পিসীমা, রোগে ভুগে ভুগেই ওর মেজাজ অমন খারাপ হয়ে গেছে।"

তার সামনে বউ-এর পক্ষ হইয়া এমন করিয়া বলিতে ওর একটু লজ্জাও করে না। আশ্চর্য্য, এমন বেহায়াপনা কিন্তু তাদের সময়ে ছিল না। তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যত ভাল-বাসাই থাকুক না লোকের সামনে স্বামী দেখাইত স্ত্রী যেন তার চক্ষুশূল। বাপ মা-কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সামান্য ছলছুতা করিয়া রজনী কি তাকে কম মার মারিয়াছে। রজনী! কতদিন কত বছর পরে নামটা আজ তার মনে পড়িয়া গেল। সে সব দিন কি এ যুগের এ জন্মের। কত জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়া গিয়াছে তারপর। বিধবা হইয়া বাপের বাড়ী আসিয়া রহিয়াছেই ত শশী আজ পঞ্চাশ বছর। কতদিন পরে রজনীকে আজ আবার তার মনে পড়িতেছে, তবু মুখখানা যেন তেমন স্পষ্ট মনে পড়ে না। কোথায় আছে এখন রজনী! স্বর্গে? সে কি এখনও তার জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতেছে। কত লোক জন্মিল মরিল, কত সব কচি কচি বউ, কচি কচি ছেলেমেয়ে, যোগ্য ভাইপোরা কোথায় চলিয়া গেল, মরণ নাই শুধু তার। সে কি অমর বর লইয়া আসিয়াছে!

প্রথম প্রথম মরিবার জন্য সে কত চেষ্টাই না করিয়াছে। যে সব রোগ ছোঁয়াচে সেই সব রোগের কাছেই সে বেশী করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভাগ্যই এমন যে সব রোগ তাকে স্পর্শও করে নাই, যম তাকে চিরকালই ভুলিয়া রহিল।

পর পর জিতেন, নগেন, দেবেন যক্ষ্মা রোগে তিন চার বছর করিয়া ভুগিয়া ভুগিয়া তার হাতের উপরই ত শেষ হইয়া গেল, কিন্তু কোনদিনের জন্য তার একটু কাসি পর্য্যন্ত হইল না। অথচ এমন ছোঁয়াচে রোগ না কি আর নাই। রোগটা যে ছোঁয়াচে একথা রজনীই তাকে প্রথম বলিয়াছিল। পাঁচের থাকিতে সে এক জ্ঞাতি সম্পর্কে দেবরকে অসুস্থ শুনিয়া দেখিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিলে রজনীর সে কি রাগ। "কোন সাহসে গেলে তুমি যক্ষ্মা রোগীর কাছে! কি ভয়ানক সর্ব্বনেশে ছোঁয়াচে রোগ জান?"

শশী হাসিয়া বলিয়াছিল, "জানি, রোগ হয় আমার হবে। আমি মরব। তাতে তোমার কি ক্ষতি। পুরুষ মানুষ পর-দিনই হাসতে হাসতে আর একটা বিয়ে করে আনবে।"

মৃত্যুর কথায় রজনী ভারি ভয় পাইত। বিবর্ণ ম্লান হইয়া আসিত তার মুখ। বলিত, "শুধু মরব আর মরব। মরা ছাড়া কি আর তোর মুখে কোন কথা নেই বউ! তুই কি এখানে খুব কষ্টে আছিস্? মাঝে মাঝে মার ধর করি বলে তোর খুব দুঃখ হয়, না? ভাবিস্ তোকে আমি একটুও ভালবাসি না, না?

শশী কাছে সরিয়া আসিল! "দূর, তাই বুঝি?"

"তবে? আচ্ছা যখন মারি তখন কি তোর খুব লাগে, খুব?"

শশী হাসিয়া উঠিয়াছিল। "লাগে না? যখন মার আরম্ভ কর তখন মনে থাকে কিনা তোমার যে আমার লাগে

কি না লাগে। তখন শুধু মনে থাকে যত বেশী আমি মার খাব তোমার মা তত বেশী খুশী হবে। তাই, না?"

"তুই ভারি মুখরা। মার সঙ্গে অমন ঝগড়া করিস কেন মাঝে মাঝে?"

"হুঃ, শুধু আমি-ই ঝগড়া করি বুঝি! অমনিই মার পক্ষ টেনে টেনে কথা বলছে।"

আশ্চর্য! কোন কথাই ত সে ভুলিয়া যায় নাই। একটির পর একটি করিয়া সবই ত আজ তার আবার মনে পড়িয়া যাইতেছে। অথচ কতকাল সে এ সব কথা একেবারে ভুলিয়া রহিয়াছিল। ত্রিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে একটা কথাও তার মনে ওঠে নাই। সে ত একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল রজনীকে। আজ এতদিন পরে আবার সে-সব দিনের কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা সব স্পষ্ট মনে পড়িয়া যাইতেছে। যেন সে-দিনের কথা। কিন্তু রজনীর মুখ তেমন করিয়া মনে পড়িতেছে না কেন? তার মুখের কথা মনে করিতে গেলেই ব্রজেনের ছেলে বাচ্চুর মুখের কথা মনে পড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু না, বাচ্চুর মুখের মত অত লম্বা ত ছিল না তার মুখ। তবু মনে হয় বাচ্চুর মুখের সঙ্গে কোথাও খানিকটা মিল ছিল। ঠিক বাচ্চুর মত ছেলেমানুষের মুখ। [illegible] মত সে মুখেও সর্বদা হাসি লাগিয়াই থাকিত। [illegible] মধ্যে আবার কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না। [illegible] খানিকটা গালাগালি নাককান করিয়া আবার [illegible] আপোষ করিতে আসিত, ক্ষমা চাহিতে আসিত। সহজে কথা না বলিলে পা পর্যন্ত ধরিতে যাইত। লজ্জার ভয়ে শশী তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া পা ঢাকিয়া ফেলিত।

"ছি ছি কি যে কর। লজ্জাও করে না, বউর বুঝি পা ধরে?"

"কেন, ধরবো না? সেদিন মামার শ্বশুর না কুঞ্জ মামার পা ধরে ফেলে মান ভাঙালে। তাছাড়া তোর পা দুটি আমার সবচেয়ে সুন্দর মনে হয় বউ।"

শশী লজ্জায় ছি ছি [illegible]। ও ঘরে শ্বশুর ঠাকুর [illegible] কেন?" [illegible] ছাড়াই না [illegible] রজনী। শাশুড়ী বলিতেন, "কেলেঙ্কারি [illegible] করে ফেলেছে।"

তাই, [illegible] সে [illegible] কাজে নাই শশীকে একেক-দিন [illegible] রজনী তার মার কাছে প্রমাণ দিত। তারপর আবার ক্ষমা চাহিতে পা ধরিয়া মান ভাঙাইবার পালা। তাকে খুশী করিবার জন্য কোন কষ্ট করিতেই রজনী পিছাইত না। আর কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়ালই না তার একেক সময় মাথায় আসিত। একদিন শেষ রাতে রজনী তার ঘুম ভাঙাইয়া বলে কি "খেজুর রস খাবে! রহমৎ এসে গাছ কেটে গেছে বিকালে। যে শীত খুব ভাল রস পড়েছে আজ। চল, ওঠ।" শশী বলিল, "পাগল না কি? এই শীতের মধ্যে উঠবে বুঝি তুমি গাছে? রস ত আর দু-দণ্ড পরেই খেতে পারবে ভোরে।"

"রাতে যত মিষ্টি, ভোরে কি তত মিষ্টি থাকে? ভোর হলেই পানসে হয়ে যায়। ওঠ। উঠবে না? আচ্ছা।" রজনী শশীর গায়ের লেপ সরাইয়া টানিয়া শশীকে পাঁজা কোলা করিয়া উঠাইল। "এবার ফেলে দিলে যদি ওই এঁদো পুকুরে।" বলিয়া রজনী সত্য সত্যই খাট হইতে নামিয়া পড়িল। যে মানুষ কিছুই বিশ্বাস নাই। সব করিতে পারে।

শশী শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিল গলা। রজনী মুখ নীচু করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, শশী বাধা দিয়া রজনীকে স্মরণ করাইয়া দিল—"তাহ'লে এ তিন প'র রাতে আর খেজুর গাছতলায় ছুটতে হবে না ত।" কিন্তু খেজুর রসের তৃষ্ণা রজনীর তখনও প্রবল। তাই পরমুহূর্তেই তাকে নামাইয়া দিয়া বলিল —"ওই ছোট কলসিটা আর গামছাখানা নিয়ে আয় ত' আমার পিছনে।"

শশী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল,—কেন ডুবে মরবার জন্য বুঝি? কিন্তু আপাতত তেমন কিছু করিবার মত মতিগতি রজনীর দেখা না গেলেও, মুখে সে বলিতে ছাড়িল না,—"হ্যাঁ, ডুববই ত। রসের সাগরে ডুবে মরব আজ।"

ও-ঘরে শ্বশুর শাশুড়ী ঘুমাইতেছেন। দরজা খুলিয়া আস্তে আস্তে পা টিপিয়া তারা আগাইয়া চলিল। বাহির বাড়ীতে পুকুরের পাড় দিয়া সারি সারি খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধা রহিয়াছে ম্লান চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে গাছগুলির মাথার উপর জোৎস্না আর ছায়ায় কেমন যেন একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে অদ্ভুত। শীতের শেষ রাতে রসে আর শিশিরে খেজুর গাছগুলি একেবারে ভিজিয়া উঠিয়াছে। বাড়ীটার চেহারাই যেন বদ্লাইয়া গিয়াছে একেবারে।

শশী আস্তে আস্তে বলিল, "একটা ছোট গাছ দেখে ওঠ। বড় গাছে গিয়ে কাজ নেই। বাপ্রে বাপ্। রসের ওপর এমন লোভ। আমার কিন্তু রস মোটেই ভাল লাগে না।"

রজনী নিজের গায়ের আলোয়ানখানা খুলিয়া শশীর গায়ে সযত্নে জড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, "তা জানি, তুই নিতান্তই বে-রসিকা।" তারপর তরতর করিয়া রজনী সম্মুখের গাছটায় উঠিয়া পড়িল। হাঁড়ি খুলিয়া লইয়া নামিয়া আসিতেছে এমন সময় বাড়ীর মধ্য হইতে বজ্রকণ্ঠ ভাসিয়া আসিল, "কে-ও, কে গাছে, কে চুরি করে নেয় রস? সাহস ত কম নয়, পালেদের বাড়ী এসেছে রস চুরি করতে। ওরে রজনী, উঠে আয়ত কে যেন রস চুরি করতে এসেছে। এক ফোঁটা রস পাওয়ার উপায় নেই বেটাদের জ্বালায়।" শ্বশুরমশাই তাঁর পাকা বাঁশের লাঠিখানা লইয়া আগাইয়া আসিলেন, "আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন। দেখ্বে বাছাধন, কেমন রস চুরি করতে এসেছ। আরে একবেটা যে ভাল মানুষের মত নীচেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে। ভেবেছ বুঝি যাদু তোমাকে আমি দেখ্তে পাব না? নিজে চোখ্ বুজে থেকে, বুঝি ভাবছ পৃথিবী সুদ্দু লোক অন্ধ।" শ্বশুরমশাই তীর বেগে ছুটিয়া আসিলেন লাঠি উঁচু করিয়া। শশী শঙ্কিত হইয়া দুই পা ডাইনে সরিয়া গেল। লজ্জার চেয়ে ভয় হইতেছে বেশী। শেষ পর্যন্ত লাঠি মারিয়া বসিবেন না ত মাথায়? রজনীর কি, রজনী ত গাছের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। মাথা যদি যায় শশীরই যাইবে। ঘোমটার মধ্য হইতে শশী অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল, "আমি।"

শ্বশুরমশাই সহজে ভুলিবার পাত্র নয়, গর্জ্জিয়া উঠিলেন, আমিটি কে বাপু, স্পষ্ট করে বল। আবার মেয়ে মানুষের গলা নকল করে ভেঙচি কাটা হচ্ছে আমাকে;

দাঁড়াও ছোঁড়া কালই যদি তোমাকে পুলিশে না দি, কি বলছি। আরে সামনের গাছেই যে এক বেটা ঝুলে রয়েছে। বল কে তুই, কুণ্ডদের কানাইর মত মনে হচ্ছে যেন—"

রজনী অগত্যা নিরুপায় হইয়া বলিয়া উঠিল, "না বাবা, আমি, আমরা।"

"তুই রজনী? আর এ বোনা বুঝি? তাই বল। আচ্ছা মানুষ ত তোরা, এই শীতের মধ্যে—"

সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড, এ কথা লইয়া পরে শাশুড়ী কত খোঁটা দিয়াছেন তারপর "বাপের জন্মে রস ত আর কোনদিন খাওনি বাছা। আমি এই প্রথম শুনলোম যে বৌ-মানুষ শেষরাতে উঠে গাছে গিয়ে রস চুরি করে। ভদ্দর লোকের মেয়ে হ'লে কি আর—"

শাশুড়ীর আর এক দোষ ছিল, মা বাপ তুলিয়া গাল দেওয়া। কথায় কথায় শাশুড়ী তার বাবাকে খোঁটা দিত। শশীর সহ্য হইত না। তার বাবার মত অমন দেবতুল্য লোক, অমন শক্তিশালী পুরুষ তখনকার দিনে কেউ ছিল নাকি! শ্রীনাথ মিত্তিরের নাম শুনিলে গাঁয়ের সকলে থর থর করিয়া কাঁপিত। এমন লম্বা-চওড়া বিশাল পুরুষ শশী আর জীবনে দেখে নাই। সেই বাবা তার শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিতেন। শাশুড়ীর এমনই ছিল জিহ্বার ধার। সেবার দাদার বিয়ে উপলক্ষে তাকে আর রজনীকে নিতে আসিয়াছেন। আসিতে বড় নদী আড়িয়াল খাঁ পাড়ি দিতে হইত বলিয়া তিনি নিজেই দেওয়া নেওয়া করিতেন। আর কাউকে পাঠাইতে তাঁর ভরসা হইত না। মনে খুব স্ফূর্তি, তাই আসিবার সময় আর পাঁজিকা দেখিয়া আসিবার কথা মনে পড়ে নাই। তাই লইয়া শাশুড়ীর সে কি শ্লেষ। "মুসলমানদের গ্রামে মুসলমানদের মধ্যেই ত থাকেন বেয়াই, পাঁজিকার কথা মনে থাকবে কেন?"

শেষ পর্যন্ত অধিবাসের দিন ছাড়া আর ভাল দিন পাওয়া গেল না। কিন্তু বাবা ত আর অতদিন দেরী করিতে পারেন না। কাজকর্ম সবই পড়িয়া রহিয়াছে। এই ঠিক হইল, রজনীই তাকে অধিবাসের দিন লইয়া যাইবে। খুব বড় দেখিয়া তে-মাল্লাই নৌকা ঠিক করে একখানা। আর দিন থাকতে থাকতেই যেন গিয়া পৌঁছে। দিন-ক্ষণ সব ঠিক করিয়া দিয়া বাবা চলিয়া গেলেন। শ্বশুর-শাশুড়ীকেও বলিয়া গেলেন যাইতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা কেউ গেলেন না। শাশুড়ী বলিলেন, এমন ভাবে যাচিয়া তিনি বেয়াই বাড়ী যাইবেন না। অগত্যা রজনী একাই শশীকে লইয়া রওনা হইল। সেই দীর্ঘ নৌকা যাত্রা। সে দিন ভুলিবার নয়। তেমন ঝড় আর জীবনে শশী দেখে নাই। কিছুর মধ্যে কিছু না, রাজার চরের কাছাকাছি আসিয়াছে হঠাৎ একখণ্ড মেঘ দেখা দিল আকাশে। তারপর ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নামিতে লাগিল বৃষ্টি। মাঝিদের মধ্যে আজগরই প্রবীণ, একটু উদ্বেগের কণ্ঠেই বলিল, "বড়কর্তা, রাজার বাজারে কি নৌকা ভিড়িয়ে রাখব?"

রজনী শশীর মুখের দিকে চাহিল। শশী বলিল, "না, না, ভিড়িয়ে রাখবে কি, তাড়াতাড়ি বেয়ে গেলে রাত তিনচার দণ্ডের মধ্যে নিশ্চয়ই গিয়ে সদরদি পৌঁছতে পারব। আর ঝড় যদি ওঠেই উঠুক না এত ভয় কিসের? কত বড় নৌকা আমাদের। তা ছাড়া তুমিই ত রয়েছ। ঝড় আমার খুব ভাল লাগে দেখতে। নদীর মধ্যে নৌকায় কোনদিন ঝড় দেখিনি। আজ যদি ওঠেই ঝড় বেশ ভাল করে দেখা যাবে।"

খুব ছেলেবেলা হইতেই শশী ঝড় ভয়ানক ভালবাসে। বাপের বাড়ী যখন থাকে তখন আকাশে একটু মেঘ হইলেই কিংবা একটু জোরে বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলেই শশী চুপি চুপি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। বাবা বিশেষ বাধা দেন না, কিন্তু বুড়ী মাসী বড় চেঁচামেচি করে। তা' করুক গিয়ে। বৃষ্টিতে ভিজিতে, ঝড়ের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আম কুড়াইতে যে কি আরাম তা বুড়ো মানুষে কি বুঝিবে। সত্যই কি চমৎকার আনন্দ। একেকটা ঝাপটা আসে আর আঁচল খুলিয়া গিয়া নিশানের মত ফর্‌ফর্‌ করিয়া উড়িতে থাকে। মনে হয় শশীকেও যেন আকাশে উড়াইয়া লইয়া যাইবে। সে কিন্তু বেশ হয়, ঘুড়ীর মত আকাশে ভাসিয়া বেড়াইবে শশী। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আলুথালু করিয়া বাঁধা খোঁপাটা কখন খুলিয়া ভাঙিয়া পড়ে। মনে হয় কখণ্ড ভারি মেঘ আকাশ হইতে উড়াইয়া আনিয়া ঝড় তার পিঠের উপর ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ তাদের তে-মাল্লাই নৌকাখানা ডানদিকে বেশ খানিকটা কাত হইয়া পড়িল, আর রজনী হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল একেবারে শশীর গায়ের উপর। কি ব্যাপার! বাতাসের ঝাপ্‌টায় পাল মাস্তুলের দড়ি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। পাল আর এখন রাখা চলিবে না। আজগর পাল খসাইয়া গুটাইতে লাগিল, শশী খুশী হইয়া ছইয়ের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঝড় উঠিয়াছে তাহা হইলে।

হাঁ, ঝড় উঠিয়াছে! আর তা' দেখিয়া দেখিয়া শশীর মতই খুশী হইয়া উঠিয়াছে আড়িয়াল খাঁ। সেও আকাশে উড়িবার স্বপ্ন দেখিতেছে বুঝি। খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি ঝড়ের ঝাপ্‌টায় কোথায় সব নিরুদ্দেশ হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। ফাঁকে ফাঁকে দুই একটি বৃষ্টিতে ভেজা তারাও দেখা যাইতেছে এখন। আচ্ছা ঝড় কি তারাগুলিকে উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না?

করিম ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ছইয়ের ভিতরে যান মা ঠান। এখানে দাঁড়াবেন না। সোনার দুর্‌গো ঠাকরুণ বেসজ্জন হয়ে যাবে একেবারে।"

ছই শক্ত করিয়া ধরিয়া শশী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যায় যাবে, তাতে তোর কি!"

মোমিন বহু কষ্টে হালটা ঠিক রাখিতে রাখিতে বলিল, "আমাদের আর কি, বড় কর্তা কাঁদতে কাঁদতে পাগল হয়ে যাবেন।"

ভয়ে শঙ্কায় রজনী একরূপ পাগল হইবার উপক্রম হইয়াছে। হাত ধরিয়া টানিয়া শশীকে ছইয়ের মধ্যে নিতে নিতে বলিল, "সব কিছুরই সীমা আছে একটা! অত দুঃসাহস ভাল না। এমন ডাকাতে মেয়ে ত আমি আর কোনদিন দেখিনি। এস শীগ্‌গির ভিতরে। এমন ঝড় আর হয়নি

ক্রন্দসী

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

(১৩)

ঝি আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া গেল। ইন্দু লিখিয়াছে তাহার স্বামী একটু ভালোর দিকে আসিয়াছে, কিন্তু এখনও শয্যাগত। কোনরকমে দিন কাটিতেছে। ইভা কবে আসিবে। সে থাকিলে দুঃখের একটানা অন্ধকারের মাঝেও এক ঝলক আলো আসিয়া পড়ে। কিন্তু এখন দিন কাটান সত্যই বড় ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দুর চিঠিখানা হাতে লইয়া ইভা অন্যমনে চাহিয়াছিল। তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছিল, ইন্দুদের বাড়ীর অপরিসর প্রাঙ্গণে ধান মেলা আছে; ইন্দু একদিকে রান্না করিতেছে, এক একবার অবসর মত আসিয়া ধানগুলো দেখিয়া যাইতেছে—পাখীতে না খায়, গরুতে না ছড়ায়। উঠানের একদিকে গরুটি বাঁধা আছে, আরামে চোখ মুদিয়া বিচালি খাইতেছে, এখনও গোবৎসটির দিকে স্নেহভরে চাহিতেছে। তাহাকে বিচালি দেওয়া, খাই খোরাক সে সবও ইন্দুই করে। সন্ধ্যা হইলেই ভিজা ঘুঁটের ধোঁয়া গোয়ালে দিয়া তুলসী তলে ছোট মাটির প্রদীপটি দেখাইয়া সে নিত্য গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করে। তখন মনে মনে কি প্রার্থনা জানায়, রুগ্ন স্বামীর আরোগ্য কামনা করে কিম্বা এই সংসারের নিকট হইতে আর একটু সদ্ব্যবহার আর একটু সহৃদয়তা আশা করিয়া ভগবানের চরণে করুণ মিনতি জানায়। বাঙলা দেশের প্রকৃত পরিচয় কি এই ইন্দুর মধ্যে? সাধারণের মূক হৃদয়ভার বহন করিয়া নিঃশব্দে অস্তিত্ব মাত্র যাপন করিতেছে। আরও কতক্ষণ সে এমনই অন্যমনস্ক হইয়া থাকিত বলা যায় না। ঝি আসিয়া খবর দিল নীচে একটা মোটর গাড়ী কতক্ষণ হইতে অপেক্ষা করিয়া আছে। সোফার নামিয়া এই চিঠিখানা তাহার হাতে দিল দিবার জন্য। রেবা গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে যাইবার জন্য। একটু শীঘ্র যাইবার জন্য বারংবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছে। আজ যে তাহার জন্মতিথির নিমন্ত্রণ সেকথা ভুলিয়া গিয়াছিল ইভা। যাইবারও তেমন ইচ্ছা ছিল না। শশাঙ্ক চলিয়া গিয়াছে বলিয়া সে একা একা মনভার করিয়া বেড়াইতেছে এ কথা বলিয়া কেহ ঠাট্টা করিলে তাহার লজ্জা হয়। তাই তেমন ইচ্ছা না থাকিলেও সে উঠিল। জীবনের সর্বদিকের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। রেবা তাহার একক জীবন লইয়া সুখে না দুঃখে আছে তাহা জানিতেও তাহার কৌতূহল হইতেছিল। উঠিয়া রেলিং হইতে মুখ বাড়াইয়া মোটর চালককে কহিল, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে। সে যাইবে। নেহাৎ একা যাওয়া হয় না তাই ছোটদা সুবোধকে বলিয়া কহিয়া সঙ্গে লইল। রেবাদের বাড়ী মস্ত একটা চারতলা প্রাসাদোপম বাড়ীর সামনে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। ইভা বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিল, এত বড় বাড়ীতে রেবা থাকে! না তাহা নয়। রেবা থাকে চারতলার ফ্ল্যাটে। বাড়ীটায় বহু ভাড়াটে আছে। একজন হিন্দুস্থানী দাসী তাহাদের পথ দেখাইয়া চারতলায় লইয়া গেল। সুবোধ আর থাকিতে চাহিল না কিছুতেই। পৌঁছাইয়া দিয়া সেইখান হইতে বিদায় লইল। চারতলার দুটি তিন চার ঘর লইয়া রেবার গৃহস্থালী। ঘরগুলি সাজান। সিঁড়ির মুখের চাতাল [illegible] টব সাজান। রেবা তখনও ড্রেসিং রুমে ছিল। ছবির পর্দায় অভিনয় করিয়া করিয়া বেশভূষায় অতিমাত্রায় সতর্ক এবং সজ্জিত হওয়া তাহার অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইতেছিল ক্রমে। সাজসজ্জা শেষ করিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া সে ইভার পাশে বসিল। তখনও সে ঘরটায় আর কেহ আসিয়া পৌঁছায় নাই। মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া রেবা বলিল, 'অনেক গল্প করবার আছে, তাই একটু আগে গাড়ী পাঠিয়েছিলাম।'

ইভার মনে হইল সে হাসির মতন শুষ্ক হাসি জীবনে সে কখনও দেখে নাই। ফাল্গুন চৈত্র মাসে শুকনা পাতা উড়াইয়া যে ঝড় বয়—শুকনো, বালি উড়াইয়া হু হু করিয়া বহিয়া যায়, এক অনিবার্য হাহাকার এবং হাসি হাসি মুখ সত্ত্বেও রেবার চেহারা অনেকটা সেইরূপ।

রেবা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'আজ একটা জরুরী কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব ভাই, পরামর্শের মত চাইছি। মুখে যাই বলি তোমার বিচারবুদ্ধি ও স্থিরতার উপর আমার খুব বিশ্বাস আছে।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। রেবার ফ্ল্যাটের বাইরেই রাস্তা। মোটরের হর্ণ, ট্রামের শব্দ, দুই একটা ফিরিওয়ালার হাঁকিবার শব্দ অস্পষ্টভাবে ঘরের ভিতর আসিতেছে। তখনও আর কেহ আসে নাই। জোর করিয়া একটা সঙ্কোচ কাটাইয়া রেবা কহিল, 'আমার স্বামী কাল একখানা চিঠি লিখেছেন। তিনি লিখছেন, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এখন আমি যদি তাঁকে ক্ষমা করে ফিরে যাই তাহলে নতুন করে আবার জীবন আরম্ভ করা যায়।'

ইভা একটুখানি চুপ করিয়া ভাবিয়া কহিল, 'ক্ষমা কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেই অবশ্য ক্ষমা করা যায় না। আর তোমার স্বামীর সঙ্গে কি কারণের মনোমালিন্য হয়েছিল তাও আমি জানিনে। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার তাঁর কাছে ফিরে যাওয়াই ভাল। এখন না পার ভবিষ্যতে হয়ত সত্যই তাঁকে মনে প্রাণে ক্ষমা করতে পারবে।'

রেবা উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'ক্ষমা যদি না করতে পারি তাহলে আমি কক্ষণ ফিরে যাব না। ভণ্ডামি করে লাভ কি? তুমি ছেলেমানুষ নও, এটুকু নিশ্চয় বুঝতে পারছ, খুব গভীর অপরাধ না হলে আমি তাঁকে ছেড়ে আসতুম না। স্ত্রীর সম্ভ্রম এবং মর্য্যাদা যদি রাখতে না পারলুম তাহলে স্বামীর ঘর করে লাভ কি?'

তাহার এই স্পর্দ্ধিত উক্তির সম্মুখে সহসা ইভা কিছু বলিতে পারিল না। তাহার পর মৃদুস্বরে কহিল, 'কিন্তু বাইরের জগতটাকেও তুমি তুচ্ছ করতে পার না। তুমি যদি আবার ফিরে যাও, শান্তিপূর্ণ সংসার গড়ে তুলবার চেষ্টা কর, হয়ত সত্যই একদিন সুখী হবে। অনেককে সুখী করবে সেই সঙ্গে। এমনও হতে পারে মনের সঙ্গে একদিন তোমার স্বামীকে ক্ষমাও করতে পার। চেষ্টা করতে আরম্ভ করলে সংসারে কি অসম্ভব বলে কিছু থাকে?'

রেবা কহিল, 'আচ্ছা তোমাদের পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা এ বিষয়ে কি বলে? তুমি ত এক বছর প্রায় পাড়াগাঁয়ে কাটিয়ে

স্বাধীন চিন্তার অভাবে তারা কি রকম ভয়ার্ত্ত জীবন কাটায়। হাজার অন্যায় হোক তাদের উপর, এতটুকু প্রতিবাদ করবার উপায় নেই—শুধু মুখ বুজে মরণান্তিক দুঃখ সহ্য করে যাওয়া ছাড়া।

ইভা কহিল, 'অনেকটা তাই। কিন্তু তাদের সহ্যের আর একটা দিকও আছে। আমি কলকাতা আসবার ঠিক আগের দিন একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। মেয়েটি পাড়াগাঁয়ের। সেইখানেই তার শ্বশুরবাড়ী, সেইখানেই তার বাপের বাড়ী। ছোটবেলা থেকে ট্রেনে অবধি চড়েনি কখনও। তার স্বামী তার উপর যে ব্যবহার করেছে, তোমরা নিশ্চয়ই তাকে গভীর অপরাধ বলবে। কিন্তু রাগ করে ছেড়ে চলে আসা দূরে থাকুক, স্বামীর শক্ত অসুখ হয়েছিল বলে চোখের জল ফেলছে। কোন রকম করে সহ্য করা, অন্য উপায় নেই, এটা না হয় বুঝতে পারি। কিন্তু ঐ চোখের জলের মানে কি?'

রেবা আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অবসর মিলিল না। একটা আর্দ্দালি, রীতিমত উর্দ্দি-পরা ঘরে ঢুকিয়া সেলাম বাজাইয়া রেবাকে একখানা চিঠি দিল। রেবা পড়িয়া বলিল, 'আচ্ছা তুমি নীচে যাও, গাড়ী ঠিক কর আমি এখনই যাচ্ছি।'

ইভার দিকে ফিরিয়া কহিল, 'স্টুডিওর কাজে এখনই এখনই যেতে হবে। ডিরেক্টর ডেকে পাঠিয়েছেন।'

তখনই নীচে মোটর দাঁড়াইবার আওয়াজ পাওয়া গেল একজন সুবেশ যুবক ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিয়া কহিল 'মিসেস্ ব্যানার্জ্জি আপনাকে নিতে এসেছি। কদিন থেকে আমাদের স্যুটিংয়ের বড় গোলমাল হচ্ছে। বিরক্ত হয়ে অবনীবাবু আজ হঠাৎ কড়াকড়ি নিয়ম জারি করেছেন। আপনারও তলব পড়েছে।'

রেবা বিরক্তিসূচক কণ্ঠে কহিল, 'চলুন যাচ্ছি। কিন্তু আমি আগের থেকে বলে রেখেছিলুম যে আজ আমি ছুটি নেব। আজ আমার এখানে অনেকে আসবেন আমার যাওয়ার উপায় নেই। চলুন তবু, অবনীবাবুকে বুঝিয়ে বলেই আবার আমি চলে আসব।'

যুবকটি ইভার দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া কহিল 'আপনার এখানে কিসের উৎসব মিসেস ব্যানার্জ্জি? কই আমাকে ডাকেন নি?' তাহার গলার স্বরে এমন নির্লজ্জ গদ গদ ভাব যে ইভার সেখান হইতে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। যুবকটি আরও গাঢ়স্বরে পুনশ্চ কহিল, 'আমাকে ফোনে একটা হুকুম করে দিলেই পারতেন আমি অবনীবাবুকে বুঝিয়ে বলতাম। আপনাকে এতটুকু ট্রাবল্ পেতে হ'ত না।'

রেবা কহিল, 'বেশ ত সেই উপকারটুকু এখন করুন না। আমি একটা চিঠি দিচ্ছি নিয়ে গিয়ে অবনীবাবুকে দেবেন। আর বুঝিয়ে বলবেন একটু। অতিথিদের ফেলে আজ আমার যাওয়া সম্ভব নয়।'

যুবক আর একটা আবেগময় নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'দিন। আপনার কোন কাজে লাগলে নিজেকে ধন্য মনে করব।'

যাইবার সময় সে ইভাকে যথারীতি নমস্কার করিয়া গেল এবং বিনয়সূচক কি বলিয়া গেল যেন একটা।

ইহার পর আর কথা জমিল না। রেবা যেন নিজেকে একটু অপ্রস্তুত অপ্রতিভ মত বোধ করিতে লাগিল। আরও কয়েকটা প্রশ্ন তাহার নিরিবিলিতে করিবার ছিল, কিন্তু ইভা হঠাৎ বলিল, 'তোমাদের সমাজে বাইরেটা নিয়েই কারবার বেশী। বাইরের ঠাট বজায় রাখা চাই। তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে একটা মিটমাট করে নাও। সবদিকই রক্ষা পাবে। দেখতে শুনতেও ভাল হবে।'

হঠাৎ তাহার এমন মন্তব্যে রেবার মুখ লাল হইয়া উঠিল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিল, 'আমাদের সমাজ মানে কি...... যতই কেননা সমাজ সংস্কারকের পোজ নাও, তোমারও ত সমাজ এই। দুদিন বাদে নিজেও ফেরং স্বামীর ঘর করতে এই সমাজেরই আশ্রয় নেবে ত।'

রেবা কহিল, 'না, তার আর দরকার হবে না। অনেক সমাজের চেহারা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। সমাজই বল আর যাই বল সব এই মন নিয়ে। যাদের মন এক রকম তাদের গণ্ডীও এক রকম।'

আর কোন কথা বলার অবসর মিলিল না। দলে দলে নিমন্ত্রিত এবং নিমন্ত্রিতারা একে একে আসিতে সুরু করিলেন। রেবা তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িল, এমন অনর্গল গল্প করিতে লাগিল যে, তাহাকে দেখিয়া কে বলিবে ইহারই ভিতর এত আর্ত্ত প্রশ্ন পুঞ্জীভূত হইয়া আছে!

অনেক রাত্রি হইল ফিরিতে। দেরী দেখিয়া মা লোক পাঠাইয়াছিলেন। সুরেন আসিয়াছিল তাহাকে নিতে। বাড়ী ফিরিবার সময় সারা পথটা ইভা চুপ করিয়াছিল। নানা রকম প্রশ্ন তাহার মনে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাস্তার বিচিত্র জনস্রোত, আলোকমালা সজ্জিত প্রাসাদ সমস্তই ছায়াছবির মত মনে হইতেছিল। লোকগুলো কি মুখোস পরিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছে? তাইত মনে হয়। তাহার পর কর্ম্মের অন্তে মুখোস খুলিয়া যখন নিজের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইবে তখন কেমন দেখাইবে চেহারাটা! যে রেবা একান্তে বসিয়া তাহার জীবনের নানা অভিমানে জর্জ্জরিত ব্যথার তিক্ত প্রশ্নে তাহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, সে কী ত হাসিয়া রঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছে। অথবা কটাক্ষের বাণে কাহাকে তাহাকে বিঁধিবার প্রয়াস পাইতেছে। গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। নামিয়া ইভা একেবারে সোজা তাহার শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। মা ডাকিয়া সুধাইলেন; 'হ্যাঁরে কিছু খাবিনে?'

'না, খেয়ে এসেছি মা। আর কিছু খাবার ইচ্ছে নেই।' বলিয়া সে তাহার নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। রাত্রি প্রায় এগারোটা বাজে। ইভা কাপড় ছাড়িয়া ঠাণ্ডা এক গ্লাস জল কুঁজো হইতে গড়াইয়া খাইল। খোলা জানালাটি দিয়া বেশ বাতাস আসিতেছে। টেবিলের উপর শশাঙ্কর ফটো। কর্ম্ম-কোলাহল মুখর দিনের শেষে সন্ধ্যাতারার প্রশান্তি যেন ঐ

(শেষাংশ ৪৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিচিত্র ভারবাহী জানোয়ার

আমাদের দেশে সাধারণত ভার বহনে ঘোড়া, গাধা, মহিষই ব্যবহৃত হয়। গরুর গাড়ী, মহিষের গাড়ী যেমন এক অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, তেমনই অঞ্চলবিশেষে উটের গাড়ীও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দেশভেদে জন্তু-জানোয়ারের রেওয়াজের হেরফেরে কত বিচিত্র জানোয়ারই না মাল টানার কাজে নিযুক্ত হয়। বরফের দেশে শ্লেজ টানায় বল্গা হরিণ ও কুকুর ব্যবহৃত
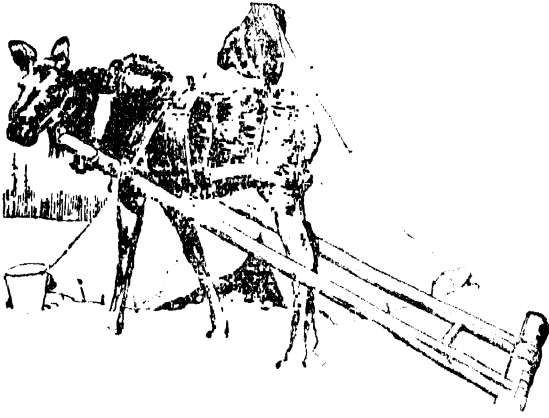
হয়। ইউরোপের কোন কোন দেশে আজও দুধের গাড়ী কুকুরে টানে। দক্ষিণ আমেরিকার এক অঞ্চলে 'লামা' নামক জন্তুটি (যাহাকে খুদে উট বলা যায়) ভারবহনের কার্য করে। জেব্রাকে অনেক অঞ্চলে পোষ মানাইবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সফল হওয়া যায় নাই। কানাডার 'মুজ' (Moose) নামীয় জন্তুটি আকারে প্রকারে কতকটা শৃঙ্গহীন বল্গা হরিণের মত হইলেও, ঘোড়ার মতই শিক্ষিত করিয়া ভারবহনের কাজে লাগান হইয়াছে। পাহাড়িয়া বন্য ছাগলকে অনেক অঞ্চলে ভার বহনে নিয়োজিত করা হয়। কিন্তু উত্তর কানাডার এই 'মুজ' শক্তিতে ঘোড়ার সমকক্ষ না হইলেও বন্য ছাগলাদি হইতে অনেকটাই মজবুত।

গানের বদলে নাক-ডাকান

কোনও বিখ্যাত অভিনেত্রীর সহিত এক দম্পতির বন্ধুত্ব ছিল। দম্পতি কোনও প্রয়োজনে একদিন তাহাদের দুই বৎসরের এক শিশু সন্তানটিকে ঐ অভিনেত্রীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দুই-তিন ঘণ্টার জন্য অন্যত্র যাইবার অভিলাষ করে। অভিনেত্রী তাহাতে সানন্দে স্বীকৃত হয়। শিশুর মাতা জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু খোকা কাঁদিলে কি করিবে?

—করব? কেন গান করব আমি। তা ছাড়া আরও কত শত ফিকির আমার রয়েছে ছোটদের মন ভুলাবার!

দম্পতি হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেল। যখন তাহারা ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিতে পাইল যে, শিশুটি তাহার দোলায় বসিয়া আছে আর মুগ্ধের মত চাহিয়া আছে সোফাটির দিকে। সোফায় অভিনেত্রীটি এলাইয়া পড়িয়া আছে, তাহার [illegible] নত হইয়া পড়িয়াছে ঢুলিয়া, মুখ খোলা, চোখ বোজা, কিন্তু নাক হইতে রীতিমত অবিরাম ছন্দে-সুরে বাহির হইতেছে এক বিচিত্র গর্জন।

দম্পতির আগমনে আপনিই অভিনেত্রীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। 'ইস্! এক নিমেষ থামিবার কি জো আছে,' অমনি কাঁদিয়া উঠিবে। আমি গান গাহিলাম, পুরো একখানা পালা আবৃত্তি করিলাম, নাচিলাম, মুখ ভেংচাইলাম; কিন্তু কিছুতেই উহার মন উঠিল না। অবশেষে নাক ডাকাইতে সুরু করি —প্রথম সুরপাতেই শিশুটি মুগ্ধ হইল।"

টেলিফোন তার চুরি

পর্তুগালের লিসবন শহর হইতে দক্ষিণে দীর্ঘ দূরত্বের টেলিফোন্ লাইন চলিয়া গিয়াছে। একদিন দেখা গেল সালেম, ইষ্ট-লিভারপুল ও ষ্টিউবেনভিল্ প্রভৃতি স্থান হইতে দীর্ঘ দূরত্বের টেলিফোনে কোনই সাড়া পাওয়া যায় না। অথচ ঐ সকল স্থানের আভ্যন্তরীণ ফোন্-এ যোগাযোগ বিনষ্ট হয় নাই—একেবারেই অটুটই রহিয়াছে। তদনুসারে অনুসন্ধান আরম্ভ হয় ইহার কারণ নিরূপণে। বহু তল্লাসের পর লিসবনের দক্ষিণস্থ অঞ্চলেই কিছু বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে টের পাওয়া যায়। তখন টেলিফোন্ লাইন পর্যবেক্ষণের ফলে বাহির হয় যে সালেম, ইষ্ট-লিভারপুল এবং ষ্টিউবেনভিলের মাঝে ৮৫০০ ফুট তামার তার কে বা কাহারা কাটিয়া চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। ঐ অঞ্চল জনবিরল এবং অনেক স্থানে বন-প্রান্তরের ভিতর দিয়া টেলিফোন্ লাইন নেওয়া হইয়াছে। টেলিফোন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই প্রকারের চুরি এই অঞ্চলে ইহাই প্রথম।

গল্ফ বলে কাঠবিড়ালী নিহত

সাধারণত গল্ফ খেলায় অনেক সময় বল হারাইয়া যায় বৃক্ষ কোটরে বা ঝোপে-ঝাড়ে। কখনও আবার লোকজনও বলের আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ডাঙ্কুডভারে সেদিন এক গল্ফ প্রতিযোগিতার মাঝখানে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর 'হিট্' করা বল এক প্রকাণ্ড 'ফার্' বৃক্ষে যাইয়া সংঘর্ষ বাধায়। উহার পর আর বল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও বিফল হইয়া এক চতুর 'ক্যাডি' (গল্ফ-ষ্টিক প্রভৃতি বাহক পরিচারক) ঐ [illegible] বৃক্ষে আরোহণ করে। যেখানে অর্থাৎ বৃক্ষের যে শাখা[illegible] বল ঘা খাইয়াছে বলিয়া অনুমান, সেখানে [illegible] অনুসন্ধানের পর দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ শাখার মূলে একটি কোটর রহিয়াছে এবং ঐ কোটরে বলটি ও একটি কাঠবিড়ালী রহিয়াছে। বলটি তুলিয়া আনিলেও কাঠবিড়ালী নড়িল না দেখিয়া পরিচারক উহাকেও বাহিরে আনিল। তখন বুঝা গেল কাঠবিড়ালী সদ্য মৃত—বলের আঘাতে যে উহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

চলতি পথে

(গল্প)

জুবায়েদ আলী

যৌবনের প্রথম রঙীন ঊষায় যাকে কেন্দ্র করে মনকে মাতাল করে কত আশা এসেছিল, যার চলার সহজ সুন্দর লীলায়িত ছন্দ, দেহের তরঙ্গায়িত ভঙ্গী আমার বুকে জাগাত নিবিড় শিহরণ, বাস্তবের নিষ্ঠুর সংঘাতে তার থেকে একদিন ছিটকে পড়লাম বহু যোজন দূরে। তারপর চলেছি জীবনের একটানা রুটিনকে প্রদক্ষিণ করে, তাতে নেই কোন ছন্দ, নেই কোন বৈচিত্র্য; পারিপার্শ্বিক জীবনের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে একেবারে নিঃসঙ্গ বেদুইনের মত চলেছি। দুনিয়ার সব কিছু বেসুরো লাগে—প্রকৃতির আহ্বানে বুকের মাঝে আর কোন সাড়া জাগে না। প্রাণের এ নির্জন প্রান্তে ঘুঘুর উদাস সুরের ন্যায় সমস্ত পারিপার্শ্বিকতার কল-কোলাহল মথিত করে যে সুর বেজে ওঠে তার নিঝুম নিস্তব্ধতায় শুধু প্রতিধ্বনি হায় হায় করে ফিরে। বিগত জীবনের সোনালী ঊষা রাতের স্বপনে ভেসে ওঠে, আবার দিনের রূঢ় আলোকে মিলিয়ে যায়।

এমন সময়ে আমার জীবনে যার আবির্ভাব ঘটলো তা যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত। হাঁ, সবিতার কথাই বলছি; সে আমার ক্লাসেই পড়ত। ইউনিভার্সিটিতে য়্যাডমিশান নিয়ে প্রথম যেদিন ক্লাসে ঢুকি তখন আমার প্রথমে যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে সবিতা রায়। তার ফিকে সবুজ রঙের শাড়ী ও ব্লাউজ, দেহের উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, বাঁকা তলোয়ারের মত গঠন, আষাঢ়ের বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় স্নিগ্ধ আয়ত চোখের সজল চাহনী আর টানা ভ্রূ ক্লাসে ঢুকবার সময় প্রথমেই আমার দৃষ্টি বন্দী করে; দেহের প্রতি লোমকূপের ভিতর দিয়ে কেমন যেন একটা মোহময় আবেশময় ভাবের বিদ্যুৎ খেলে গেল।

বৃহস্পতিবার। খুব তাড়াতাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি। পাঁচ মিনিট লেট্ হয়ে গেছে; ক্লাসে প্রফেসার এসে গেছেন কি না—মনে এই সংশয় ও উৎকণ্ঠা। মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এসে পড়েছি এমন সময়ে সবিতার সঙ্গে দেখা—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসছে। চোখের দুষ্টামী-ভরা চপল চাহনীতে জিজ্ঞাসার ইঙ্গিত নিয়ে আমার দিক্ তাকালে। আমি চোখা-চোখি হওয়ায় চোখ নামিয়ে কয়েক পা এগিয়ে চলেছি; পেছন থেকে সে "সিক্সটি ফাইব", "সিক্সটি ফাইব", বলে ডাক্‌লে। আমি তার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি?"

—"ক্লাসে প্রফেসার এসে গেছেন অনেক আগে। এখন আর যাচ্ছ হয়ে লাভ কি?" ঠোঁটের কোণে দুষ্টু হাসি খেলছে। একটু পরেই আমার দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে, "অত নার্ভাস হতে হবে না—আপনার পারসেন্টেজ্ নষ্ট হয় নি। আজ ইউনিভার্সিটি বন্ধ।" মন থেকে একটা উৎকণ্ঠার ভার অপসারিত হয়ে গেল।

সবিতা আমার পাশাপাশি চলেছে. ইউনিভার্সিটির কোন্ প্রফেসারের অধ্যাপনা তার কাছে ভাল লাগে, কোন্ প্রফেসারের অধ্যাপনা খারাপ লাগে ও আরও অনেক অসংলগ্ন বিষয়ের আলোচনা করে। আমি ভাসা-ভাসা ভাবে তার কথার উত্তর দিয়ে চলেছি—মাঝে মাঝে তার কথার সূত্র হারিয়ে ঠিক মত উত্তর দিতে না পারায় তার বিরক্তি লাগছে। হঠাৎ একবার রাগের ভাণ করে ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের ভাব দেখিয়ে বললে, "আচ্ছা, সুশান্তদা, আপনি কি মিট্‌মিটে ডান গোছের লোক বলুন তো? দেখতে বেশ শান্ত সুবোধ লাজুক ছেলের মত; আবার সুবিধা পেলে চুরি করে মেয়েদের মুখের দিক্ তাকান কেন বলুন তো? এ আপনার ভারী অন্যায় কিন্তু......।" হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে পেছন থেকে কেউ চাবুক মারলে মানুষ যেমন চম্‌কে ওঠে, তেমনি সবিতার এ রূঢ় ব্যঙ্গে চম্‌কে উঠলাম। তার চোখের কোণে রহস্য ঘনায়িত হয়ে উঠছে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে ও মৃদু মৃদু হাসছে। লজ্জা ও ক্ষোভে শুধু নিজকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। পথের মোড়ে এসে সে বল্‌লে, "আমাদের বাড়ী এদিকে সুশান্তদা; তুমি চল না আজ আমাদের ওখানে।"

—"না," বলে আমি সোজা ডাইনের পথে চল্‌লাম। মনের ভেতর নানা আলোড়ন চল্‌তে লাগ্‌লো। সবিতার এ প্রচ্ছন্ন হাসি-ঠাট্টার অন্তরালে তার সত্যিকারের সত্তাটুকু যে কি তা আজও আমার কাছে অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গেল। আজিকার এ তুমি বলাটাও আমার কাছে যেমন আকস্মিক তেমনি রহস্যময় মনে হতে লাগ্‌ল।

মানুষের অন্তর জিনিসটা নাকি অনন্ত। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার ও প্রবৃত্তি সুপ্ত আছে এ অনন্তের তলদেশে। কখন কোন্ মুহূর্ত্তে এর প্রচ্ছন্ন প্রচণ্ড শক্তির বেগ যে শত সহস্র আবরণ ছিন্ন করে বাইরে উৎসারিত হয়ে পড়ে এবং তার দুর্নিবার স্রোতো-মুখে কিরূপে মানুষের বহুদিনের ভূয়োদর্শন, দূরদর্শন ভেসে যায় সে তার খোঁজই রাখে না। কিছুদিন আগে নারীর সাহচর্য্যে যাওয়া কতই না ঘৃণার চোখে দেখ্‌তাম; আর আজ নারীর সংস্পর্শে যেতে বাইরে যতই অন্যায় ও ঘৃণার ভাণ করি না কেন ভেতরে ভেতরে সকল মন-প্রাণ সবিতাকে দেখার জন্য, তার সঙ্গে আলাপ করার জন্য সর্বদাই উন্মুখ। নিজকে যতই কেন ধিক্কার দি-ই না, মন নিরন্তর তারই পিছু পিছু ফিরে চলে। পরিদৃশ্যমান জগতে যা কিছু ঘট্‌ছে তা সবই যে সত্যি নয় অনেক সময় সত্য ঘটনা যে সত্যকে চেপে রাখে—এ তার জ্বলন্ত নিদর্শন।

আজ মনে পড়ছে নীহারবালার কথা। সেও একদিন এমনিভাবে আমার জীবনের মাঝ পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুপ্তির বুকে ঘুমিয়েছিল যে অস্ফুট কুঁড়ি, হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার ঠেলে যে বহিঃপ্রকাশের পথ হারিয়ে গিয়েছিল, সে একদিন তারই করাঘাতে শতদলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। নিয়তির কোন্ নিষ্ঠুর পরিহাসে আমার সে মানস-কুসুম বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ল বড় অবেলায়। আজ মনে পড়ছে অশ্রু-বিনিময়ের ভেতর দিয়ে বিদায়ের সেই তীব্র-মধুর ক্ষণটুকু। আর্ত্ত-আকুল কণ্ঠে সে বলেছিল, "সুশান্ত-দা, আমার জীবনের এ পূরবী যেন তোমার অনাগতের বিভাসকে সার্থক করে তুলে!"

তারপর দিনের পর দিন অতীত হয়ে গেল; জীবনের চতুর্দিকে একটা নিরেট নিস্পৃহতার আবেষ্টন সৃষ্টি করে চলেছি। বিগত জীবনের সেই স্মৃতির তীর হতে মাঝে মাঝে

একটা গভীর দীর্ঘ-শ্বাস ভেসে এসে আমার সমস্ত আকাশ-বাতাস ব্যথিয়ে দিয়ে যায়। হৃদয়ের মণি-কোঠায় যে পরশ-পাথরের ছোঁয়াচ লেগেছে সেখানে যে আর কাঁসা-পেতলের কষ লাগলে কোনও রঙ্ ধরবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। মানুষ মন আমার যতই দুর্ব্বল হোক না কেন, বাইরে তার এতটুকু প্রকাশ পেলে চল্‌বে না। অন্ততঃ সবিতা যেন বুঝতে না পারে সে আমার হৃদয়ের দেওয়ালে এতটুকু রেখাপাত করতে পেরেছে; আমি যে তার সংস্পর্শে যাই সে শুধু তার প্রতি আমার অনুগ্রহ।

সবিতাকে এখন যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি; সেও আমাকে যেন পাশ কাটিয়েই চলে যায়। অথচ উভয়ে উভয়ের দৃষ্টিপথে আসার নিরন্তর উপায় খুঁজে ফিরি। ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের এ মুখোস নিয়ে উভয় উভয়কে অন্তরালে রেখে চলায় মনের ভেতর একটা ক্ষুব্ধ অভিমান দিন দিন গুমরে উঠছে।

সেদিন ক্লাসের ছুটির পর বাসায় চলেছি, হঠাৎ সেই পরিচিত কণ্ঠের ডাক,—"সুশান্ত দা!" সে ডাক শুনবার জন্য দেহের প্রতি অণু-পরমাণু উন্মুখ হয়ে আছে, এমনি অপ্রত্যাশিতভাবে সে ডাক কানে আসায় মনে হ'ল যেন হৃদয়ের যে তন্ত্রীগুলি একতানে বাঁধা ছিল, তারা যেন একই সঙ্গে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল।

—"আচ্ছা, সুশান্ত-দা, আপনি কি লোক বলুন ত? মিছি-মিছি রাগ করে' আমায় শুধু কষ্ট দিচ্ছেন কেন বলুন—আমি কি অন্যায় করেছি। আপনি কি নির্ম্মম কসাইয়ের মত......................।" শেষের কথাগুলি বলতে তার গলাটা একটু ভারী হয়ে এল। ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে একটু বিষাদের ভাব দেখিয়ে বললাম, "না রাগ করব কিসের জন্য; রাগের ত কিছু দেখিনে।"

—"তবে কেন আমার সামনে এলে মুখভার করে পাশ কাটিয়ে চলে' যান; আমি কি কিছুই বুঝিনে? আপনি কি আমায় এমন বোকা পেয়েছেন?"

—"সবি, পাশ কাটিয়ে কি শুধু আমিই চলি, তুমিও ত পাশ কাটিয়ে চল?"

—"তার জন্য আমি হাজার বার ক্ষমা চাইছি। আপনি কি আমায় ক্ষমা করতে পারবেন না, সুশান্ত দা?"

আমি হেসে বললাম,—"সবি, তুমি যে কি পাগল ভেবে পাইনে।"

—"যাক্, আজ আপনি আমাদের বাড়ী যাবেন কিন্তু। অনেক কাজ আছে।"

—"সে ত হবে না, সবি; আমার আজ এতটুকু ফুরসৎ নেই। আমার এক বন্ধুকে আজ কথা দিয়েছি; সে হয়ত এতক্ষণ এসে পড়েছে।"

—"আচ্ছা, আপনার কখন ফুরসৎ হবে?"

—"দেখি, কাল-পরশু যদি সম্ভব হয়, চেষ্টা করে দেখব।"

সে একটা দিন। বেশ পরিষ্কার মনে আছে। বেলা যতই পড়ে আসতে লাগল, মনটা ততই অস্থির হয়ে উঠল। এতকাল পরে আজ সত্যই সবিতাদের বাড়ী যাব। কিভাবে কোন্ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বল্‌লে ভাল হয়; সে কবিতা লেখে—কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে তাকে দু'-একটি চোখা-চোখা কথা শুনিয়ে তার চমক লাগিয়ে দিলে কেমন হয়—মনের ভেতর নিরন্তর এই আলোচনা করে চলেছি!...........

—"ভেবেছিলাম, আপনি হয়তো আমাদের বাড়ী এত শীগ্‌গির আসবেন না; এখনও আপনার রাগ আছে।"

—"একদম পাগল তুমি। রাগ করলে বুঝি, সে রাগ ফলাতে আসতে হয় বাড়ী অবধি?"

কণ্ঠে তরল সোহাগ ঢেলে, গ্রীবা দুলিয়ে সবিতা বললে, "ওগো আমিও তো তাই বলি; তুমি কি আমার পরে রাগ করে বেশীক্ষণ থাকতে পার? আমি অন্যায় করলেও তোমার রাগ হয় না।" বলেই লজ্জায় তার সমস্ত মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল। কয়েক মিনিট পরে হঠাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা, সুশান্ত-দা, দেবদাসের ট্রেজেডী বড় না পার্ব্বতীর ট্রেজেডী বড়?"

আমি তাকে একটু আঘাত দেওয়ার জন্য বললাম, "মেয়ে মানুষ আবার ভালবাসতে জানে নাকি যে তাদের ট্রেজেডী বড় হবে। পার্ব্বতী কি সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল যে তার জীবন ট্রেজিক হবে; দেবদাসের পরে যে টানটুকু ছিল তা হয়ত একেবারে মুছে যেত যদি চৌধুরী মশাই দেবদাসের মত সুন্দর যুবক হতেন। আর দেবদাসের জীবন তো নিঃস্বার্থ ভালবাসার জন্যই দীন হল।"

সবিতা উত্তেজিত হয়ে বললে, "সুশান্ত-দা, দুঃখের ঢাক পিটিয়ে বেড়ালে যে দুঃখ বড় হয়ে উঠবে এমন তো কোন কথা নেই। মানুষের অন্তরে দিন দিন যে ব্যথা সঞ্চিত হয়ে ওঠে, সে ব্যথার ভারে নিপীড়িত মানব-সত্তার মুক্তির কোন পথ যদি না থাকে, সে হয় মস্ত ট্রেজেডী। সমস্ত ব্যথা নিঃশব্দে বুকে চেপে বাইরে সুখের ভাণ-করা, যাকে ভালবাসি না তার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করা—একি জীবনের কম পরিহাসের কথা, সুশান্ত-দা! ভুবন চৌধুরীকে পার্ব্বতী কখনও ভালবাসেনি—এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না; বাইরে সে ভুবন-বাবুর সঙ্গে যতই ভালবাসার ভাণ করুক না কেন, মনটি তার ছিল দেউলে; নিরন্তর দেবদাসকে প্রদক্ষিণ করে ফিরত—কখনও বা তার অস্থির, উদ্দেশ্যহীন মনটা ছট্ করে তালসোনাপুরের বাঁশ-ঝাড়, আমবাগান, পাঠশালা ঘর বাঁধের পাড়ে ঘুরে বেড়ায়, আবার কখনও বা এমন স্থানে লুকিয়ে পড়ে যে সে নিজেকে নিজেই খুঁজে পায় না। ব্যথার যে নিষ্ঠুর আঘাত তার মন ও প্রাণকে একেবারে নিরাশী করে ছেড়ে দিল, সে আঘাতের গুরুত্ব হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করে দিলেও বহিঃপ্রকাশের এতটুকু পথ ছিল না,—মানবজীবনে তার বড় ট্রেজেডী কি আর আছে, সুশান্ত-দা! দেবদাসের ব্যথার অনেকটা লাঘব হয়েছিল তার মাতলামীর ভেতর দিয়ে; তাছাড়া তার ব্যথা সে একাই বয়ে বেড়ায়নি; চন্দ্রমুখী তার অনেকটা অংশ নিয়েছিল—পার্ব্বতীর হৃদয়ও যে তার জন্য হাহাকার করে ফিরেছে—একি তার পক্ষে কম সান্ত্বনার কথা! আর পার্ব্বতীর অন্তর-নিরুদ্ধ ব্যথা সমাজ ও লোকাচারের পাষাণ-প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে শুধু অন্তরেই থেকে থেকে উত্তাল হয়ে উঠত। নারীচিত্তের এই নিবিড় ব্যথা প্রমূর্ত্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল ভালবাসারিনীর

জীবনে; তার গুরুভারে মন যখন নিতান্ত শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল, তখন দিশেহারা হয়ে হতভাগিনী অপঘাতের ভেতর দিয়ে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে বাধ্য হল"—বলেই যেন সে শ্রান্তির ভারে একটু নিশ্বাস নেওয়ার জন্য চুপ করে রইল। উত্তেজনায় তার সমস্ত মুখমণ্ডল আরক্তিম, নাসিকা স্ফীত হয়ে উঠেছে, চোখ দুটি যেন বুদ্ধির দীপ্তিতে জ্বল জ্বল করছে। মুখের স্নো ও ক্রীমের সুরভিবহ উষ্ণ নিশ্বাস আমার মুখে লেগে দেহ-মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল।

মেয়েদের কমনরুমে। নানা কলরোলের মৃদু-গুঞ্জন ও চাপা হাসির অস্ফুট ধ্বনি থেকে থেকে ভেসে আসছে। কেউ মাসিক সাপ্তাহিকের পাতা উল্‌টিয়ে শুধু ছবি দেখে যাচ্ছে, কেউ ইংরেজী মাসিকের পাতা উল্‌টিয়ে প্রসাধন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেখে চলেছে, আবার কেউ বা গ্রেটা গার্বো, নর্মা শিয়ারার, শার্লি টেম্পল্‌ থেকে আরম্ভ করে শোভনা, ভারত বিখ্যাত দেবিকারাণী আরও অনেক প্রথিতযশা অভিনেতৃদের অভিনয়-নৈপুণ্য আলোচনা করে চলেছে।

শুধু মিস্‌ সবিতা রায় এ সকল বিতর্ক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা আনমনার মত বসে আছে। পেছন থেকে হঠাৎ বেলারাণী এসে তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "কি লো সবি, সিক্সটি ফাইবের কথা ভাবছিস না কি?"

সবিতা চমকে ওঠে বললে, "যা, তোর যত সব বাজে কথা।"

পার্শ্ব থেকে আরেকটি মেয়ে বিস্ময়ের ভান করে বললে, "সিক্সটি ফাইব কিলো?"

—"কেন, আমাদের সেই সামনের বেঞ্চের উদাস ভাবুক গোছের মন-হারান কবিটিকে দেখিসনি; মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—আমাদের সবির ডিব্রেশেড্ বয়।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে বললে, "হুঁ।" মিস্ পারুল বলে উঠলো, "সবির আগে থেকেই তো ছিল একটা—"

—"দেখ, তোরা যদি এমনি আমায় জ্বালাতন করিস, তবে আর আমি তোদের সঙ্গে কথাই বইব না"—বলে সে অভিমান ভরে ঘর থেকে চঞ্চল পদবিক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যার আগমনী গান বেজে উঠেছে। দিনের আসন্ন-বিদায়ের ম্লানিমায় দিগ্‌বধূ যেন অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছে। দূর গগনে সন্ধ্যাতারার ভীরু হিয়ার মৃদু কম্পন; আর একটু পরে তাকেও এমনি করে মহাকালের পরোয়ানা মাথায় নিয়ে কোন অজানা দেশে ছুটতে হবে ধরণীর চির-আদরের সব কিছু পশ্চাতে ফেলে, হেথা নিঃসীম নীলাকাশে "তার লাগি পড়বে কানাকানি।"

সবিতা একমনে গেয়ে চলেছে,—

মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার করে আসে

প্রাণের কত অফুরন্ত ব্যথা ও দরদ ঢেলে দিয়ে সে গেয়ে চলেছে,—যেন সম্বিৎহারা! ব্যথাতুর সুরের আকুল মূর্চ্ছনা যেন সাথীহারা পাখীর ব্যাকুল ক্রন্দনের ন্যায় সমস্ত সন্ধ্যা প্রকৃতির আকাশ বাতাস বাথিয়ে তুলেছে। আমাকে দেখে হঠাৎ তার সুরের তরঙ্গ-প্রবাহ মাঝ পথে এসে থেমে গেল।

—"কি সুশান্তদা, এমন অপ্রত্যাশিত এসে পড়লেন যে...?" ক্ষান্ত-বর্ষণ আকাশের ন্যায় তার মুখখানি মেদুর...বড় বেদনাতুর। চোখের কোলে কালিমা, সমস্ত চেহারায় শুষ্ক রুদ্র বৈরাগ্যের ছায়া বড় গভীর, বড় করুণ!

—"সবি তোমার অসুখ করেনি তো"—বলেই তার ডান হাতখানি আমার হাতের মুঠোর ভেতর নিয়ে আস্তে আস্তে একটা চাপ দিলাম।

—"না।"

—"তবে অত রুক্ষ রুক্ষ দেখাচ্ছে কেন?"

—'ও এমনি,' বলেই ধরা গলায় মিনতিপূর্ণ চাহনী নিয়ে বললে,—"সুশান্ত-দা, কালই যাচ্ছেন তো?"

—"হাঁ, তাই তোমার কাছে বিদায় নিতে এলাম।" অশ্রু-স্নিগ্ধ আয়ত দুটি চোখ তুলে আমার মুখপানে একবার তাকালে,—সে দৃষ্টিতে কত ব্যথা, কত মিনতি! বুকের ভাষা কণ্ঠনালীতে এসে আকুলি-বিকুলি করছে—দুটি ঠোঁটের মৃদু কম্পনে প্রতিহত হয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। বাম বাহু দিয়ে তার গলা বেষ্টন করে আস্তে আস্তে মাথা চাপড়িয়ে বললাম, "সবি, ছি পাগল কাঁদতে নেই।" আমার উচ্ছ্রিত বাহুর ভেতর মুখ গুঁজে ব্যথায় একেবারে নুয়ে পড়ল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের উদ্দাম আবেগে থেকে থেকে তার সমস্ত দেহটা কম্পন দিয়ে উঠছিল। নিঃসঙ্গ আঁধারে দুটি প্রাণী—একজন মৌন মিনতির ভেতর দিয়ে তার ব্যথাতুর হৃদয়ের আকুল আবেদন জানাচ্ছে,—আরেকজন বুক দিয়ে তার পরশ অনুভব করছে মাঝে মাঝে উদাম হাওয়া দূর বনানীর বুকে মুহুর্মুহু কম্পন জাগিয়ে অশরীরী বিলাপের ন্যায় ভেসে আসছে।

কি আশ্চর্য মেয়ে! গিরি নির্ঝরিণীর মত জীবন যেন খরস্রোতে নেমে অরণ্য প্রান্তর ডিঙিয়ে মিশেছে অশ্রু-সায়রে। প্রাণের এত উচ্ছ্বাস, এত আবেগ অশান্ত তরঙ্গের বেগ আমার জীবনে হয়ত কোন সার্থকতা খুঁজেই পেত না—সব কিছু শুকিয়ে যেত আমার এ ঊষর হৃদয়ের প্রখর তাপে।

দিনের পরে দিন চলে যায়। সংসারের তরঙ্গাভিঘাতে ভেসে চলেছি স্রোতের শেওলার মত এক ঘাট হতে আরেক ঘাটে—মনহারা, সাথীহারা। সবিতার আর কোন খোঁজই রাখি না। মনে হয় এতদিন সে কোন না কোন বৃহত্তর সার্থকতার ভেতর দিয়ে তার জীবনের পথ খুঁজে নিয়েছে। তার স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ে শুকতারার ন্যায় দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে। কিন্তু সবি কি আমায় ভুলে গেছে? মাঝে মাঝে তার সন্ধান নেওয়ার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা মনের ভেতর উদগ্র হয়ে ওঠে, আবার ক্ষুব্ধ অভিমানে মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই মিলিয়ে যায়। যে কামনার পরপারে চলে গেছে, তাকে আর নিকটে টেনে লাভ কি! এতদিনকার এত হৃদ্যতা যে তাসের ঘরের ন্যায় ভেঙে চুরে দিয়ে এমনি করে চুপ করে বসে থাকতে পারে, তার খোঁজ নিয়ে বা কি হবে। চলার পথে একদিন আমার মন নিয়ে তার ছিনিমিনি খেলার আবশ্যক হয়েছিল, আমাকে সবলে টেনে নিয়েছিল; আবার খেলা শেষে পথের ধুলোবালির ন্যায় পথেই নিক্ষেপ করে দিয়ে গেছে। মনের ভেতর এমনি একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশ ও অভিমান নিয়ে তার

(শেষাংশ ৫৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুস্তক পরিচয়

নগ্নতার ইতিহাস :—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত মুখবন্ধ সম্বলিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা। প্রকাশক—ডি সি ভট্টাচার্য্য, বাতায়ন পাবলিশিং হাউস, ৮৫নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুস্তকখানার নাম দেখিয়া ভয় পাইবার কারণ আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তু ততটা বিভীষিকাপ্রদ নয়। লেখক তত্ত্বের দিক হইতে বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন। ইউরোপের নগ্নতাকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন; তবে তথ্যের দিকে অতটা না গিয়া তত্ত্বের দিক সুর যতটা উচ্চ রাখিতে হয়, লেখক আগা-গোড়া তাহা রাখিতে পারেন নাই, এই দিক হইতেই ত্রুটি মনে পড়ে; সৌন্দর্য্য তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া তিনি যে কথাটা বলিতে চাহিয়াছেন তাহার পুরাপুরি উপলব্ধি হয় আধ্যাত্মিকতার ভিতরে, আলোচনায় অধ্যাত্ম-তত্ত্বটা যতটা উজ্জ্বল হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। নূতন তথ্য অনেক আছে বটে; কিন্তু তত্ত্ব বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম অনুভূতি পরিস্ফুটতার অভাব তাহাতে চাপা পড়ে নাই।

নীল শাড়ী—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম-এ কর্ত্তৃক ১৭-এ, রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৵০ মাত্র।

সাময়িক পত্রের পাঠকগণ কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের রচনার সহিত সুপরিচিত। ইতিপূর্ব্বেই তিনি উপন্যাস ও গল্প লিখিয়া খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জ্জন করিয়াছেন। আলোচ্য বই তাঁহার সেই খ্যাতি আরও বর্দ্ধিত করিবে। এই বইয়ে কতকগুলি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম গল্প 'চলে নীল সাড়ী' ঘটনা-বিন্যাস ও রচনা-কৌশলে সত্যই উল্লেখযোগ্য। এই গল্পটিতে যে মূল সুরের অবতারণা করা হইয়াছে, পরবর্ত্তী রচনাগুলিতে তাহারই ব্যাপ্তি লক্ষিত হয়। এই জন্যই বোধ হয় গ্রন্থকার সমগ্রভাবে বইটির নামকরণে ইহারই অনুসরণ করিয়াছেন। আধুনিককালের গল্পে গল্পাংশ কম, বক্তব্য বেশী অর্থাৎ রস-সৃষ্টি অপেক্ষা তত্ত্বাবতারণাই এখন কথা-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। এমন দিনে 'নীল সাড়ীর' ন্যায় পরিচ্ছন্ন এবং সরস গল্প পড়িতে পাইয়া পাঠকগণ সত্যই আনন্দ লাভ করিবেন। এই বইয়ে গল্প বলিতে বসিয়া গল্প না-বলান এবং শিক্ষক বা প্রচারকের বেদী অধিকার করিয়া বসিবার চেষ্টা নাই—অনায়াস-স্নিগ্ধ বলিয়াই গল্পগুলি সুখপাঠ্য এবং সাহিত্য-লক্ষণাক্রান্ত। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

সাহিত্য-সংবাদ

আবৃত্তি, রচনা ও গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল

(সালিখা ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরী)

আবৃত্তি (সাধারণ বিভাগ)

প্রথম—শ্রীনিরঞ্জন গাঙ্গুলী, সালিখা। দ্বিতীয়—শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিবপুর।

আবৃত্তি (স্কুলের ছাত্র বিভাগ)

প্রথম—শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, সালিখা। দ্বিতীয়—শ্রীহরিপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, বালী।

আবৃত্তি (ছাত্রী বিভাগ)

প্রথম—কুমারী রেবারাণী চট্টোপাধ্যায়, সালিখা। দ্বিতীয়—কুমারী পুষ্পলতা দাশ, সালিখা।

আবৃত্তি (ইংরেজী)

প্রথম—রণেন রায়, কলিকাতা। দ্বিতীয়—এইচ রসাবী, কলিকাতা।

রচনা (সাধারণ বিভাগ)

প্রথম—প্রশুতোষ সান্যাল, কলিকাতা। দ্বিতীয়—প্রশান্তশঙ্কর মজুমদার, ঢাকা।

রচনা (মহিলা বিভাগ)

প্রথম—শ্রীমতী অরুণলতা লাহা, ডোমজুড়। দ্বিতীয়—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী, রংপুর।

গল্প

প্রথম—অমিয়া সেন, কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য—পুরস্কার বিতরণের তারিখ পরে জানান হইবে।

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক,

সালিখা, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী।

গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ২রা আষাঢ়, ৩১শ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় আমাদের 'বৈশাখী' মাসিক পত্রিকার মারফৎ যে 'চলচ্চিত্রের সহিত হাল-বাঙ্গলার তরুণের সম্বন্ধ' নামক প্রবন্ধ ও যে কোন ছোট গল্প প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) প্রবন্ধে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন,—শ্রীহৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, C/O, শ্রীযুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তৈলমাড়ুই রোড, বর্দ্ধমান। উল্লেখযোগ্য,—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীঘাট, কলিকাতা।

(২) গল্পে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন,—শ্রীমতী অপর্ণা মৈত্র, C/O শ্রীযুত সতীকুমার মৈত্র, সাব-ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনীপুর। গল্পের নাম, 'প্রতিদান'। উল্লেখযোগ্য—শ্রীপরিমলেন্দু রায় চৌধুরী, দুমকা। গল্পের নাম—'বেকারের একটা দিন'।

'বৈশাখী'র নামাঙ্কিত পদক পুরস্কারপ্রাপ্তগণের নিকট শীঘ্রই পাঠান যাইতেছে। ইতিমধ্যে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে অতি সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, 'বৈশাখী', তৈলমাড়ুই রোড, বর্দ্ধমান।

মিনার্ভায় "অভিযান"

দীর্ঘকাল বন্ধ থাকিবার পর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে পুনরায় অভিনয় সুরু হইয়াছে;—নূতনভাবে নূতন কর্তৃত্বাধীনে শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তের নাটক 'অভিযান' অভিনীত হইতেছে।

অভিযান" ঐতিহাসিক নাটক; তোগলোক বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি মহম্মদ বিন তোগলোকের জীবন কাহিনী ইহার আখ্যান বস্তু। মহম্মদ বিন তোগলোকের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের ঘটনা লইয়া নাটকখানি আরম্ভ এবং তাহার উত্তর প্রদেশ অভিযানের ঘটনা লইয়া ইহার পরিসমাপ্তি। মহম্মদ বিন তোগলোকই নাটকের মূল চরিত্র;—তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ইহার অন্যান্য বিষয় বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রজ্ঞা ও মুশলিম সংস্কৃতির প্রতীক করিয়া সম্রাটকে চিত্রিত করা হইয়াছে।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর জন্য নাটকখানির স্বাভাবিক আকর্ষণ ও আবেদন যাহাই থাকুক না কেন, অভিনয়ের দিক দিয়া ইহা বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহার অভিনয় আংশিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। দিল্লীর সম্রাটের জীবনের রহস্যঘন কাহিনী নাটকের বিষয়বস্তু বলিয়া নাটকখানি স্থানবিশেষে বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে; কিন্তু আবার নাটক রচয়িতার ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধানের অক্ষমতার জন্যই হউক, বা ইহার অভিনেতাদের অভিনয় ত্রুটির জন্যই হউক, ইহা স্থানে স্থানে খাপছাড়া গোছের হইয়া পড়িয়াছে। অভিনয়ের এই দিকটার অসাফল্যের জন্য শেষোক্ত কারণই দায়ী বলিয়া আমাদের মনে হয়। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনকে নাটকের বিষয়বস্তুর প্রতি কেন্দ্রীভূত বা একীভূত করিয়া রাখিবার জন্য যতটুকু রূপসৃষ্টির সফলতার প্রয়োজন, ইহাতে তাহা নাই।

যে সকল অভিনেতা ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ঐতিহাসিক রূপসৃষ্টি প্রতিভার খানিকটা পরিচয় দিয়াছেন। সম্রাট মহম্মদ বিন তোগলোকের মত বিভিন্ন বিপরীত গুণসমন্বিত অদ্ভুত চরিত্রের যে রূপ তিনি দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। সম্রাটের পালিতা কন্যা শিরীনের ভূমিকায় শ্রীমতী উমা মুখার্জ্জীর অভিনয়েও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষা ও পরিচালনার সুযোগ সুবিধা পাইলে রঙ্গমঞ্চের এই নূতন অভিনেত্রী ভবিষ্যতে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হইতে পারিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। মালেক খসুরুর ভূমিকায় কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়, ইব্রাহিমের ভূমিকায় অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও বাহাদুদ্দিনের ভূমিকায় শৈলেন চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ও মন্দ হয় নাই। গুলেনারের ভূমিকায় শ্রীমতী সুভাষিণীর পূর্ব্ব প্রতিভার কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়।

নাটকে রূপসজ্জা ও দৃশ্যপট পরিকল্পনা পৌরাণিক ঐতিহাসিক কাহিনীর উপযোগীই হইয়াছে।

ষ্টারে "জাহ্নবী"

ষ্টারে শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর অতি পৌরাণিক নাটক "জাহ্নবী" অভিনীত হইতেছে।

কল্পনার আতিশয্যে পৌরাণিক বিষয়বস্তু অধিকাংশ সময়েই বিকৃত হইয়া পড়ে এবং বাস্তবের সীমা ছাড়াইয়া গিয়া এইরূপ অত্যধিক অবাস্তব হইয়া পড়ে যে মরজগতের স্বাভাবিক মানুষের নিকট তাহা নেহাৎই দুর্ব্বোধ্য ও দুর্ভোগ্য হইয়া পড়ে। বুঝি, পৌরাণিক ঘটনা, বিশেষত দেবদেবী প্রভৃতি আধিদৈবিক জীবের কাহিনী সমন্বিত পৌরাণিক ঘটনা কল্পনার ছোঁয়াচে একটু অবাস্তব হইবেই; কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, নাটকের দর্শক অতিমানব নয়, স্বাভাবিক মানুষ! অতএব পৌরাণিক নাটককে রচনা ও অভিনয়ের দিক দিয়া যতটুকু সম্ভব স্বাভাবিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করাই উচিত।

পৌরাণিক কাহিনীর এই দোষত্রুটি আলোচ্য নাটকে বিশেষভাবেই রহিয়াছে। ইহার অভিনেতাদের অতিমানবিক রূপসৃষ্টির অদ্ভুত প্রয়াসের সঙ্গে দর্শক যেন বিশেষ চেষ্টা করিয়াও নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে না।

মরজগতের জীব জহ্নুকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বর্গের অধিবাসী মহাদেব ও গঙ্গার মধ্যে বিবাদ ও বৈরীভাব নাটকের গোড়ার বিষয়-বস্তু। হিংসাদ্বেষ, বিবাদ-বিসম্বাদ দেবতাদের মধ্যেও আছে, মানুষের মত তাঁহারাও বিভিন্ন রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া অনর্থ সৃষ্টি করেন—ইহাই নাটকে দেখান হইয়াছে।

ইহার বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন জীবন গাঙ্গুলী, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ রায়, শ্রীমতী লাইট, রাজলক্ষ্মী, দুর্গারাণী প্রভৃতি। ইহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব চরিত্র অঙ্কনে যথাসম্ভব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। জহ্নুর ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় ভালই হইয়াছে। জীবনের নানা প্রকার ঘাতপ্রতিঘাতে বিপর্যস্ত দুর্ব্বলপ্রাণা নারী চরিত্র তরলার ভূমিকায় সরযুবালার অভিনয় আমাদের মন্দ লাগে নাই। হাস্যরসের ভূমিকায় রঞ্জিৎ রায়ের অভিনয় অনেকস্থানে মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেও দর্শকদের বিশেষ হাসির খোরাক জোগাইয়াছে।

দৃশ্যপট পরিকল্পনা ও রূপসজ্জা ভূতপূর্ব্ব মিনার্ভা নাট্য সম্প্রদায়ের পূর্ব্বের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

নাচের পরিকল্পনা এবং অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের সঙ্গীত পরিকল্পনা বিশেষ প্রশংসনীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে। জহ্নুর দেহ হইতে গঙ্গার উৎপত্তির দৃশ্যটি সত্যই সুন্দর হইয়াছে। নাটকে সংলাপও নেহাৎ মন্দ হয় নাই।

* * *

শ্রীযুত যতীন মিত্রের তত্ত্বাবধানে ও শ্রীযুত দীনেশ দাসের পরিচালনায় এসোসিয়েটেড প্রডাকসানসের ছায়াচিত্র "আলো-ছায়া"র কাজ বেশ দ্রুতগতিতে চলিতেছে। এসোসিয়েটেড প্রডাকসানসের ইহাই প্রথম ছবি। তাই ইহার সাফল্যের উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিতেছে। ছবিখানির সঙ্গীত পরিচালনা করিবেন অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। ইহার একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় খ্যাতনামা সু-গায়ক পঙ্কজ মল্লিককে দেখা যাইবে।

* * *

শ্রীহেমচন্দ্রের পরিচালনাধীনে নিউ থিয়েটার্সের ষ্টুডিওতে নামবিহীনভাবে যে ছবিখানি এতদিন তোলা হইতেছিল, তাহার নামকরণ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার হিন্দী সংস্করণের নাম দেওয়াছে "জোয়ানী কি-রীত" এবং বাঙলা সংস্করণের নাম দেওয়া হইয়াছে "পরাজয়"।

গউস মহম্মদ কি ভারতের একমাত্র মুখোজ্জ্বলকারী খেলোয়াড় ?

এই বৎসর ইউরোপের বিভিন্ন টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় গউস মহম্মদ উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করায় ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্র গউস মহম্মদ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন সংবাদপত্র এই সূত্রে প্রচার করিয়াছেন যে গউস মহম্মদের সহিত যদি সোহানী থাকিতেন তবে ভারত এই বৎসর ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ইণ্টার জোন ফাইনালে যুগোশ্লাভিয়ার স্থান দখল করিতে পারিত। আবার কোন কোন সংবাদপত্র গউস মহম্মদের ক্রীড়াকৌশলের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "এই পর্য্যন্ত ইউরোপে যত ভারতীয় খেলোয়াড় খেলিতে গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে গউস মহম্মদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" সকলেরই নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে ইহা আমরা স্বীকার করি। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমরা স্বীকার করি যে, কোন সংবাদ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের উক্তি যদি যুক্তিহীন হয় তবে তাহার প্রতিবাদ হওয়া দরকার। সুতরাং উপরোক্ত সংবাদপত্রসমূহের প্রচারিত মতামত যখন আমাদের যুক্তিহীন বলিয়া মনে হইতেছে তখন তাহার প্রতিবাদ না করিয়া আমরা পারিলাম না।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা

ডেভিস কাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সোহানী ভারতীয় দলে থাকিলে প্রথম রাউণ্ডে ভারতীয় দল বেলজিয়ামকে পরাজিত করিতে পারিত। এমন কি দ্বিতীয় রাউণ্ডে সোহানীর সাহায্যে ভারতীয় দলের নিকট নরওয়ে পরাজিত হইত। কিন্তু ইহার পর যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত করিতে পারিত ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। তাহা ছাড়া জার্ম্মানী, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ভারতের দণ্ডায়মান হওয়া অসম্ভব ছিল। যুগোশ্লাভিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই সকল দেশের খেলোয়াড়গণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত শক্তি ভারতীয় দলের ছিল না। ইংল্যাণ্ডের অষ্টিন, জার্ম্মানীর হেঙ্কেলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গউস মহম্মদ বা সোহানী কিছুই করিতে পারিতেন না। যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত করাও ভারতীয় দলের পক্ষে অসম্ভব ছিল। যুগোশ্লাভিয়ার পুনসেবোর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে এইরূপ খেলোয়াড় ভারতে এখনও কেহ নাই। পুনসেবোর দৃঢ়তা, পুনসেবোর মারের তীব্রতা প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি অর্জ্জন করিতে ভারতীয় খেলোয়াড়গণকে এখনও অনেক দিন সাধনা করিতে হইবে। ভারতীয় খেলোয়াড়গণের প্রশংসা করিতে গিয়া আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে এখনও ভারতীয় টেনিস ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইউরোপীয় টেনিস ষ্ট্যাণ্ডার্ডের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরে।

গউস মহম্মদের কৃতিত্ব

গউস মহম্মদ কুইন্স ক্লাব প্রতিযোগিতায় ও উইম্বলডেন প্রতিযোগিতায় যেরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা প্রশংসনীয় হইলেও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের। তাহা ছাড়া তাঁহার খেলায় দৃঢ়তার বিশেষ অভাব বর্ত্তমান। তিনি উইম্বলডেন প্রতিযোগিতায় যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী জুনিয়ার প্রতিযোগিতায় তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আইরিশ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপে ডাবলিনে তিনি ডেলোযার্ড নামক একজন অখ্যাতনামা খেলোয়াড়ের নিকট পরাজিত হন। শেফিল্ড ও হ্যালামসায়ার টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি জে এইচ লো নামক একজন চৈনিক টেনিস খেলোয়াড়ের নিকট ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত হন। অষ্টেণ্ডের প্রতিযোগিতায় নেইয়ার্টের নিকট তিনি ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত হন। অথচ এই নেইয়ার্টকে গউস মহম্মদ ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিয়াছিলেন। গউস মহম্মদ একমাত্র ফ্লিণ্টনের প্রতিযোগিতায় প্রবীণ খেলোয়াড় ওলিফকে পরাজিত করিয়া চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের যতগুলি প্রতিযোগিতায় তিনি যোগদান করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এই ফ্লিণ্টনের প্রতিযোগিতায় তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া উইম্বলডেন প্রতিযোগিতায় গউস মহম্মদ কোয়ার্টার সেমি ফাইনালে উঠিয়াছিলেন বলিয়াই যে তিনি এই পর্য্যন্ত যত ভারতীয় খেলোয়াড় ইউরোপে খেলিয়াছেন তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইহা বলাও খুবই অন্যায় হইবে। কারণ এইরূপ উক্তির ফলে মহম্মদ শলীমের প্রতি অবিচার করা হয়। মহম্মদ শলীম উইম্বলডেন প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার সেমি ফাইনালে উঠিতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ প্রতিবারই তাঁহাকে প্রথম বা দ্বিতীয় রাউণ্ডে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলিতে হইয়াছে। গউস মহম্মদ যে কোয়ার্টার সেমি ফাইনালে উঠিয়াছিলেন তাহার কারণ তাঁহাকে মহম্মদ শলীমের ন্যায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। গত বৎসরের উইম্বলডেন প্রতিযোগিতায় সেজনার, ম্যাকফল, এলমার প্রভৃতি ইউরোপের দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড়গণ কোয়ার্টার সেমি ফাইনালে উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা গউস মহম্মদের ন্যায় সুবিধা পাইয়াছিলেন বলিয়াই সম্ভব হইয়াছিল, সুতরাং গউস মহম্মদকে যদি মহম্মদ শলীমের উপরে স্থান দেওয়া হয় তবে খুবই অবিচার করা হইবে।

মহম্মদ শলীমের কৃতিত্ব

মহম্মদ শলীম প্রথম ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড় যাঁহার ভাগ্যে কুইন্স ক্লাব সিঙ্গলসে ও উইম্বলডেনে অল ইংল্যাণ্ড প্লেট প্রতিযোগিতার সিঙ্গলসে বিজয়ী হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে প্যারী শহরে বিশ্ব অলিম্পিক টেনিস প্রতিযোগিতায় শলীম ফাইনালে ভিনসেণ্ট রিচার্ডসের নিকট পরাজিত হন। রিচার্ডস তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন। এই প্রতিযোগিতায় শলীম প্রতিপক্ষকে ৫টী সেট পর্য্যন্ত খেলিতে বাধ্য করেন। ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতের কোন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ই মহম্মদ শলীমের বিরুদ্ধে খেলিয়া স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন নাই। এখনও পর্য্যন্ত প্রবীণ মহম্মদ শলীমের বিরুদ্ধে খেলিতে ভারতের তরুণ বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। মহম্মদ শলীম বেস লাইনে দাঁড়াইয়া খেলেন কিন্তু তিনি বলের গতি সম্বন্ধে এত জ্ঞান রাখেন যে, যে কোন অবস্থায় বল আসিলে তাহা ফিরাইয়া দিতে পারেন। সুতরাং এইরূপ একজন কৃতী ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়ের পূর্ব্ব ইতিহাস বর্ত্তমান থাকিতে গউস মহম্মদকে ইংল্যাণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় খেলোয়াড়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা অর্থে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয় নাকি?
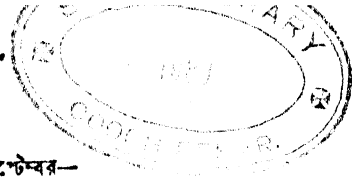
সমর-বার্ত্তা

১২ই সেপ্টেম্বর—

পোল্যাণ্ডে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। ওয়ারস এখনও পোলদের অধিকারে রহিয়াছে। ওয়ারসর কয়েক মাইল দূরে যুদ্ধ চলিতেছে।

ওয়ারস'র উপর এখনও ব্যাপকভাবে বোমাবর্ষণ চলিতেছে। ওয়ারস'র বৃটিশ দূতাবাসে বৃটিশ পাসপোর্ট নিয়ন্ত্রণ কর্মচারীর পত্নী বিমান আক্রমণের সময় নিহত হইয়াছেন। ওয়ারস'র উপর প্রবল বোমাবর্ষণের ফলে বহু বাড়ী ধ্বংস হইয়াছে। তন্মধ্যে পিলসুডস্কির বাড়ী বিখ্যাত বেলভেডিয়ার প্রাসাদ অন্যতম।

বার্লিনের খবরে প্রকাশ, ফীল্ড মার্শাল গোয়েরিং জার্মান বিমান বাহিনীর কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ হিসাবে সংগ্রাম পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছেন।

বৃটিশ সৈন্যদল ফ্রান্সে অবতরণ করিয়াছে।

ফরাসী সমর বিশেষজ্ঞ মঃ রোলা দোলেজ প্যারিস হইতে বেতারে ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ সৈন্যেরা এখন ফরাসীদের পাশাপাশি লড়াই করিতেছে।

প্যারিসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে ফরাসী বাহিনী অগ্রসর হইতেছে। জার্মানদের সীমান্ত রক্ষার্থে নির্মিত জিগফ্রীড দুর্গশ্রেণী হইতে ফরাসী বাহিনী আর মাত্র সাড়ে সাত মাইল দূরে অবস্থান করিতেছে।

ফ্রান্সে সর্বোচ্চ মন্ত্রিসভার এক বৈঠক হইয়াছে। বৃটেনের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ চেম্বারলেন ও লর্ড চ্যাটফিল্ড এবং ফ্রান্সের প্রতিনিধি হিসাবে মঃ দালাদিয়ের ও জেনারেল গামেলিন তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। বৃটেন ও ফ্রান্স সমস্ত শক্তি লইয়া যুদ্ধ চালাইবে এবং পোল্যাণ্ডকে সকল প্রকারে সাহায্য করিবে, বৈঠকে এই সঙ্কল্প সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়।

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রাটিশ্লাভা হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, একদল শ্লোভাক সৈন্য পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। ঐ সৈন্য দলকে নিরস্ত্র করিয়া ব্রাটিশ্লাভার ব্যারাকসমূহে আটক রাখা হইয়াছে।

জার্মান-বাহিনীর সহিত অবস্থানকারী জনৈক সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ যে, পোল্যাণ্ডে ১২ হইতে ১৫ হাজার জার্মান সৈনিক হতাহত হইয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর—

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ যে, ফরাসী সৈন্যগণ ওয়ার্ণ্ডট বন অধিকার করার পর আরও অগ্রসর হওয়ায় সারব্রুকেন "সুস্পষ্টভাবে বিপন্ন" হইয়াছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, রাইন ও মোজেলের মধ্যে ফরাসী সৈন্যগণ ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে। বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হইতেছে।

জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন যে, ফরাসী গোলন্দাজবাহিনী সারব্রুকেন বিমানঘাঁটির উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে।

জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, [illegible] করিবার জন্য এখন হইতে পোল্যাণ্ডে অরক্ষিত শহর, গ্রাম ও বাড়ী-ঘরের উপর বোমা নিক্ষেপ ও গোলাবর্ষণ করা হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্ব রণক্ষেত্রস্থ অফিস হইতে এই ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে, অগ্রগামী জার্মান-বাহিনী পোল্যাণ্ডের শিল্পপ্রধান শহর লাও-এ পৌঁছিয়াছে। তদুপরি এই দাবীও করা হইয়াছে যে, জার্মানরা লাও এবং পিমেসিলের মধ্যপথে অবস্থিত সান্ডোজারো অবরোধ করিয়াছে।

জুরিক হইতে হাভাস এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, পোলদের আক্রমণে জার্মান-বাহিনী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম রণাঙ্গনের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জার্মানরা সারব্রুকেনের প্রায় চারি মাইল দক্ষিণ-পূর্বে একটি সামরিক ঘাঁটি পুনরায় দখল করিয়াছে।

কোপেনহেগেনের সংবাদে প্রকাশ যে, 'বার্লিন্সকি টাইডেণ্ডি' পত্রিকার বার্লিনস্থ সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে, জার্মানরা বৃটিশ বন্দরসমূহের উপর বোমাবর্ষণ করিবার জন্য তিনশত বিমান প্রেরণ করিয়া বৃটেন কর্তৃক উত্তর সমুদ্র অবরোধের প্রত্যুত্তর দিবে।

ফ্রান্সের সমরকালীন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। মঃ দালাদিয়ের প্রধান মন্ত্রী, সমর-মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর—

ওয়ারসর উত্তর-পশ্চিমদিকে ১৫ মাইল দূরে নেপোলিয়ান নির্মিত মডলিন দুর্গের অধিকার লইয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। জার্মান বেতারঘাঁটি হইতে প্রচার করা হইয়াছে যে, মডলিন অধিকৃত হইয়াছে, কিন্তু পোলিশ ইস্তাহারে বলা হইতেছে যে, মডলিন আক্রমণের চেষ্টা প্রতিহত হইয়াছে।

প্যারিসের "ল জার্নাল" পত্রিকায় প্রকাশ যে, অষ্ট্রীয়ানগণ জার্মানদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য এক আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হওয়ায় স্বাধীন অষ্ট্রীয়ার ভূতপূর্ব্ব চ্যান্সেলার ডাঃ শুস্নিগকে নাৎসীরা গুলী করে।

ব্রুসেলসের সংবাদে প্রকাশ যে, পোল লজ পুনরধিকার করিয়াছে। ওয়ারস রক্ষার ব্যবস্থা দ্বিগুণতর উৎসাহে চলিতেছে। রণক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণকালে জার্মানদের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

বার্লিনের সরকারী নিউজ এজেন্সীর সংবাদে দাবী করা হইয়াছে যে, জার্মান-বাহিনী গিনিয়া বন্দরে প্রবেশ করিয়াছে।

ওয়ারসর খবরে প্রকাশ যে, জার্মান বিমান-বহর ওয়ারসর উপর ৭০ বার বোমাবর্ষণ করে। ৬০জন অ-সামরিক অধিবাসী নিহত হইয়াছে।

উইণ্ডসরের ডিউক আজ লণ্ডনে রাজা ৬ষ্ঠ জর্জের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রায় তিন বৎসরকাল পর অদ্য দুই সহোদরের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হইল।

ফ্রান্সে নূতন চেকোশ্লোভাকিয়া-বাহিনী গঠিত হইতেছে। ফ্রান্সের উচ্চতর অধিনায়কত্বে এই বাহিনী পরিচালিত হইবে এবং একটি অস্থায়ী চেকোশ্লোভাক গবর্ণমেণ্ট এই বাহিনীর রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হইবে। তাহার প্রধান মন্ত্রী হইবেন ডাঃ বেনেস।

১৫ই সেপ্টেম্বর—

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিম সীমান্তের অবস্থা সম্পর্কিত আধা-সরকারী বিবরণে বলা হইয়াছে যে, সিৰ্ক অঞ্চলের উত্তরে ফরাসী পদাতিক-বাহিনী জার্মান ঘাঁটিসমূহ দখল করিয়াছে। ব্রুসেল্‌স্‌-এর সংবাদে প্রকাশ, গত অপরাহ্ণে ফরাসী সৈন্যের ফরাসী-জার্মান সীমান্তের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত জোজেল অঞ্চলের পার্ল-এর নিকট আক্রমণ আরম্ভ করে; ফরাসীরা দারুণ গোলাবর্ষণ করিয়া, পরে ট্যাঙ্ক চালনা করে। জার্মান রক্ষিগণ হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

লন্ডনের খবরে প্রকাশ যে, ভিলনা রেডিও ষ্টেশন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জার্মানদের লাউ আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। পোলিশ-বাহিনী শত্রুপক্ষের দশটি ট্যাঙ্ক হস্তগত করিয়াছে এবং কয়েকটি বোমারু বিমানপোত ভূপাতিত করিয়াছে।

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ যে, লাউ হইতে বেতারযোগে নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন প্রচার করা হইয়াছে যে, হের হিটলার জার্মানীর অভিযানের পক্ষে অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত সব কিছুকে ধ্বংস করিবার আদেশ দিয়াছেন। এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইতেছে। ওয়ারসর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত সিওনসী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। লুবলিনে বৈমানিকের ধ্বংস লীলা চলিয়াছে। একটি দশমবর্ষীয়া কৃষক কন্যাকে জার্মানরা হত্যা করিয়াছে।

লন্ডনের খবরে প্রকাশ যে, ওয়ারসর ১৫ মাইল পূর্বে কালুজিনে উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। পূর্ব-প্রুশিয়ান সীমান্ত হইতে জার্মান-বাহিনী দক্ষিণ-পূর্বদিকে ব্রেষ্ট-লিটোভস্ক অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; দক্ষিণে জার্মান-বাহিনী লাউ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে লাউ এবং লুবলিনের মধ্যবর্তী স্থান দিয়া তোমাজাউ এবং রাওয়ারুস্কার দিকে আগাইয়া যাইতেছে।

বাগ, সান এবং ভিশ্চুলা এই তিনটি নদীর মধ্যবর্তী ত্রিভুজাকার ভূখন্ডকে ঘেরাও করিয়া অধিকাংশ পোলিশ সৈন্যকে বেড়াজালে আবদ্ধ করিয়া ফেলাই এখন জার্মানদের উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ।

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট সরকার পশ্চিম সীমান্তে পূর্ণ উদ্যমে সৈন্য চালনা আরম্ভ করিয়াছেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর—

সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটোভের সহিত জাপ রাজদূতের আলোচনার ফলে মঙ্গোল-মাঞ্চুকুও সীমান্তে জাপ-সোভিয়েট বিরোধের অবসানের জন্য একটা চুক্তি হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, সোভিয়েট-মঙ্গোল এবং জাপ-মাঞ্চুকুও সৈন্যগণ পরস্পরের সহিত আর সংঘর্ষে লিপ্ত হইবে না।

পশ্চিম সীমান্তের রণাঙ্গনে ফরাসী ট্যাঙ্ক ও বিমান-**বাহিনী সারারাত্রি** ব্যাপী অভিযান চালাইয়াছিল। ফরাসী সৈন্যেরা **মোসেলের** পূর্ব্বদিকে কতকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। জার্ম্মান গোলন্দাজ বাহিনীর প্রবল পাল্টা **আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে।**

শত্রুপক্ষের সাবমেরিনের আক্রমণে "দাভারা" নামক একটি বৃটিশ জেলে-জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। ইহা ছাড়া সাবমেরিনের আক্রমণে আরও কয়েকটি জাহাজও জলমগ্ন হইয়াছে।

১৭ই সেপ্টেম্বর—

সোভিয়েট রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী পূর্ব্ব পোল্যান্ড আক্রমণ করিয়াছে।

সোভিয়েটবাহিনী পোল্যান্ডের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পাঁচশত মাইল ব্যাপী অভিযান সুরু করিয়াছে। পোলিশ সৈন্যেরা সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণে বাধা দিতেছে। উভয় পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

গত রাত্রিতে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট মস্কোস্থিত পোলিশ রাষ্ট্রদূতকে জানান যে, সোভিয়েটের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং পোল্যান্ডে সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেত-রাশিয়ান ও ইউক্রেনিয়ান-দিগকে রক্ষার জন্য লাল ফৌজকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

পোলিশ রাষ্ট্রদূতকে মঃ মলোটোভ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত এক নোট দেওয়া হয়। উহাতে বলা হইয়াছে, "বর্ত্তমান যুদ্ধে সোভিয়েট যে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করা হইয়াছে, এই ব্যবস্থা অবলম্বনে তাহা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পোলিশ রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং পোলিশ গবর্ণমেণ্ট পলায়ন করিয়াছেন, এমন অবস্থায় পূর্ব্ব পোল্যান্ডে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার কেহ নাই। কাজেই সোভিয়েট তথায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে।

ফরাসীরা সারব্রুকেন রণাঙ্গনে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতেছে।

বার্লিনে জার্ম্মান বিমান বিভাগীয় দপ্তরখানার উপর বোমা বর্ষণের ফলে উহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে।

ওয়ারসর উপর জার্ম্মান বিমান বহর হইতে ইস্তাহার নিক্ষেপ করিয়া ওয়ারসকে আত্মসমর্পণ করার জন্য চরম-পত্র দেওয়া হইয়াছে।

শত্রু পক্ষ পোল্যান্ডের রণক্ষেত্র হইতে পদাতিক বাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রেরণ করিতেছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর—

সোভিয়েট ও জার্ম্মান বাহিনী ব্রেষ্ট-লিটোভস্ক-এ মিলিত হইয়াছে।

পোল্যান্ডের প্রেসিডেণ্ট মোস্কি রুমানিয়ায় চলিয়া গিয়াছেন। পোল গবর্ণমেণ্ট রুমানিয়া সীমান্তের পোলিশ এলাকায় কুটিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

মস্কোর খবরে প্রকাশ যে, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সাইলেসিয়া, ডানজিগ ও করিডর জার্ম্মানীকে দিয়া এবং পশ্চিম ইউক্রেন সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

জার্ম্মান বাহিনী লুবলিন অধিকার করিয়াছে এবং লাউ অবরোধ করিয়াছে।

"কারেজিয়স" নামক একটি বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ জার্ম্মান সাবমেরিনের আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১২ই সেপ্টেম্বর—

ছয় মাসের জন্য সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া বাঙলা গবর্ণমেণ্ট ভারত রক্ষা অর্ডিন্যান্স অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজের বিমান লাহোর হইতে করাচী যাইবার পথে বিধ্বস্ত হয়। উহার ভারতীয় পাইলট নিহত হইয়াছে।

যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতের ইতিকর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়। মুশ্লিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্নাকে এই বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কিন্তু দিল্লীতে তাঁহার অন্য কাজ আছে বলিয়া তিনি বৈঠকে যোগদান করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পোল্যাণ্ডের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া রাষ্ট্রীয় সমিতিতে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর—

বাঙলা গবর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া কলিকাতায় [illegible] পাইকারী মূল্য প্রতি ১ শত মণ ৭০, টাকা এবং খুচরা মূল্য প্রতি মণ [illegible] টাকা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্য, ঔষধাদি, চিকিৎসার উপকরণাদি এবং ভারতে প্রস্তুত স্বল্প মূল্যের সকল প্রকার দ্রব্যাদির ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে যে বাজার দর ছিল, তাহার উপর শতকরা ১০, টাকা হিসাবে মূল্য বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্সের ২৬নং ধারা অনুসারে শ্রমিক নেতা শ্রীযুত সুধীন্দ্র প্রামাণিককে আসাম হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে।

১৪ই সেপ্টেম্বর—

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে ভারতের ইতিকর্ত্তব্য সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং যুদ্ধ সম্পর্কীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে লইয়া একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। যুদ্ধ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি বর্ত্তমানে [illegible] যুদ্ধ সম্পর্কে উদ্ভূত [illegible] করিয়া [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন।

ওয়ার্কিং কমিটি [illegible] বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। ওয়ার্কিং কমিটি ইংলণ্ডের নিকট এই বিবৃতি প্রসঙ্গে জানিতে চাহিয়াছেন যে, তাহার বর্ত্তমান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য কি? বৃটিশ সরকার ভারতে গণতন্ত্রের নীতি কি ভাবে প্রয়োগ করিতে চাহেন, ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশ সরকারকে স্পষ্ট করিয়া তাহা ঘোষণা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বাঙলার ইলেকসন ট্রাইবুনাল নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুত সতীশ দাশগুপ্ত, ডাঃ প্রিয়রঞ্জন সেন ও অধ্যাপক কে পি চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া ট্রাইবুনাল গঠিত হইয়াছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর—

বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সহিত কংগ্রেসের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করিয়া মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করিলে ইংলণ্ডের নৈতিক লাভ অধিক হইবে, কেননা কংগ্রেসের হাতে কোন সৈন্য দল নাই। কংগ্রেস কেবলমাত্র অহিংস অস্ত্রের সাহায্যেই সংগ্রাম করিবে। এক্ষণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের আমূল পরিবর্ত্তন এবং গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহাদের আস্থাসূচক সুস্পষ্ট ঘোষণা করিবার সময় আসিয়াছে।"

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ডাঃ দেশমুখের হিন্দু নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব প্রেরণ করিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়াছে।

১৬ই সেপ্টেম্বর—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পদ হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে অপসারণের পর বি পি সি সি উক্ত সভাপতির পদ শূন্য রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অদ্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, সভাপতির পদ শূন্য রাখিলে চলিবে না, নূতন সভাপতি নির্ব্বাচিত করিতে হইবে।

মালদহে শ্রীযুক্ত সুরেন্দু ঝা প্রমুখ চারিজন কংগ্রেস কর্ম্মী ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে জামিন দেওয়া হয় নাই।

১৭ই সেপ্টেম্বর—

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র সুভাষচন্দ্র নাগ [illegible] হইয়াছে।

আগামী ৯ই অক্টোবর ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এবং ১০ই অক্টোবর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

ওয়ার্দ্ধায় নিখিল ভারত [illegible] ওয়ার্কিং কমিটিতে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বর্ত্তমান সংকটে [illegible] নির্দ্ধারণ বিবেচনা করিয়াছেন, প্রস্তাবে তাহার [illegible] যে, [illegible] কংগ্রেসের পররাষ্ট্র নীতি এবং যুদ্ধ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাতেই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর—

কলিকাতা কর্পোরেশন বিমান আক্রমণ আশঙ্কায় সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটির পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। কর্পোরেশনের প্রতি ওয়ার্ডে কাউন্সিলারগণ প্রধান ওয়ার্ডেনের কার্য্য গ্রহণ করিবেন; তাঁহাদের অধীনে অন্যান্য ওয়ার্ডেন এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ কার্য্য করিবেন। বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা হইলে নাগরিকগণকে যথাসময়ে সতর্ক করিয়া দেওয়া ও ঐ আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষামূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বন সম্বন্ধে নাগরিকগণকে সচেতন করিয়া দেওয়া, গ্যাস আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য নাগরিক-বৃন্দকে যথাসময়ে সতর্ক করিয়া দেওয়া ও গ্যাসের ক্রিয়া ধ্বংস করা, বিমান আক্রমণে আহত নাগরিকবৃন্দের প্রাথমিক সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা—এই সমস্ত কার্য্যের ভার কর্পোরেশন গ্রহণ করিবেন। কর্পোরেশন ঐ সকল ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার জন্য ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় টালার ও পলতার জলের ট্যাঙ্ক রক্ষার জন্য সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে কর্পোরেশনের ইতিমধ্যে ১৪ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

৬ষ্ঠ বর্ষ ; শনিবার ৩০শে ভাদ্র, ১৩৪৬ Saturday, 16th Sept. 1939 | ৪৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক—

ওয়ার্কিং কমিটির এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আর হয় নাই। সকলেই এ কথা স্বীকার করিতেছেন যে, বর্তমানের এই সমস্যায় ভারতের সকল দলের মধ্যে ঐক্য একান্ত প্রয়োজন। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি মুসলীম লীগের সভাপতি স্বরূপে মিঃ জিন্নাকে বৈঠকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ জিন্না অন্য কাজে ব্যাপৃত আছেন, এই যুক্তি দেখাইয়া অধিবেশনে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। মিঃ আসফআলী মোসলেম লীগের সঙ্গে যোগ রাখিয়া আলোচনা চালাইবার প্রস্তাবটা গ্রহণ করেন। ওয়ার্কিং কমিটি চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু মিঃ জিন্না যে কৈফিয়ৎ দেখান না কেন, বুঝা যাইতেছে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এই আলোচনায় তিনি যোগদান করিতে চাহেন না। ভারতের বিভিন্ন দলের মধ্যে মৈত্রীর গুরুত্বকে তিনি স্বীকার করেন না। সাম্প্রদায়িকতাই যাঁহারা সাধ্য-সাধনা স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এমন মতিগতিতে নূতনত্ব কিছুই নাই। দেশের বৃহত্তর রাষ্ট্রের আদর্শ তাঁহাদের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না, ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং মিঃ জিন্নার এই মতিগতিতে আমরা একটুও বিস্মিত হই নাই।

বড়লাটের বক্তৃতা—

ব্রিটিশ শক্তি আজ বলদর্পিত নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত, এই যুদ্ধে ভারতের সাহায্য আবশ্যক, ভারতের শাসনাধিকারীস্বরূপে বড়লাট কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য-দিগকে সম্বোধন করিয়া কি ঘোষণা করেন, তাহা জানিবার জন্য সমগ্র ভারত আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করিতেছিল। বড়লাট বাহাদুর এই উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের রাজনীতিক মহলে গভীর নৈরাশ্যের সঞ্চার হইবে। ভারত সম্পর্কিত নীতির পরিবর্তন সম্বন্ধে বড়লাটের বক্তৃতায় বিশেষ কোন কথাই নাই, কথার মধ্যে এক কথা এই যে, যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীর প্রবর্তন আপাততঃ চাপা থাকিল। যুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধে ভারতের রাজনীতিক বিভিন্ন দলের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ নাই। যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালী যেভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ভারতের কোন দলই তাহা সমর্থন করেন না। কংগ্রেস তো নহেই, হিন্দু মহাসভা ও মুসলীম লীগও নয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রণালী কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখাটা ভারতবাসী-দের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা নয়। যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীর সংশোধন এমনভাবে গণতন্ত্রসম্মত ভাবে সাধিত হয়, ভারতবাসীরা যেন তাহাতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার পায়, ইহাই চাহে। ব্রিটিশ-জাতি আজ গণতন্ত্র-বিরোধী নাৎসীদের দমন করিয়া জগতে মানব-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার মহান্ ব্রত লইয়াছেন। ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহাদের এই আদর্শ কার্য্যতঃ ভারতের উপরও প্রতিফলিত হইবে, বড়লাটের বক্তৃতা হইতে দেশের লোক তেমন নির্দ্দেশই আশা করিতেছিল। আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, বড়লাটের বক্তৃতার মধ্যে তেমন কোন আভাষ পাওয়া যায় নাই। ভারতের জনমতের বিরোধী যে যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালী তাহা স্থগিত রাখা হইল, জনমতানুকূল রাষ্ট্রতন্ত্র প্রবর্তনেরই প্রতিশ্রুতি বড়লাট তেমন স্পষ্ট বলেন নাই, সুতরাং স্থগিত রাখার ভিতরে কংগ্রেস বা ভারতের জনমতের দাবী প্রতি-পালনের আভাস পাওয়া যায় না। বর্তমান শাসনতন্ত্রে ভারতবাসীরা সন্তুষ্ট নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নামে ভারতবাসীদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, কার্য্যতঃ তাহা তেমন ক্ষমতাই নয়। এই শাসনতন্ত্র আমূল পরিবর্তন করিয়া জনমতানুকূল স্বাধীনতার নীতি ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে প্রবর্তন করা হইবে এমন ঘোষণা করা উচিত ছিল এবং তাহাতেই রাজনীতিক বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাইত।

বাঙালী পল্টন—

গত রবিবার কর্পোরেশনের সভাগৃহে মেয়র মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় দেশরক্ষার কার্য্যে বাঙালীরা যাহাতে যোগ দিতে পারে, তজ্জন্য সম্পূর্ণভাবে বাঙালী সেনা লইয়া দুইটি বাহিনী গঠনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনু-

রোধ করা হইয়াছে এবং আধুনিক যন্ত্রবলে সজ্জিত বিশেষ একটি বাহিনী গঠনের জন্যও প্রস্তাব করা হইয়াছে। ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধের সময় ৪৯তম বাঙালী বাহিনী যে সাহস ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল, কর্ত্তারাও তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। বাঙলার ঐতিহাসিক শৌর্য্য-বীর্য্যের দোহাই দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বর্ত্তমান যন্ত্রবলোপেত যুদ্ধে মস্তিষ্ক শক্তির স্থান খুবই বেশী এবং ভারতের মধ্যে বাঙালীর মস্তিষ্কের শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বাঙালী পল্টন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল কেন আমরা জানি না, যদি সেই পল্টন বজায় রাখা হইত, তাহা হইলে বাঙলা দেশে সমর-স্পৃহা অনেকটা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত এবং এই কয়েক বৎসরে দেশরক্ষার দিকে বাঙালী অধিকতর শিক্ষিত হইতে সমর্থ হইত। কয়েকদিন পূর্ব্বে ভারতের প্রধান সেনাপতি আমাদিগকে সতর্ক করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ভারতবর্ষ বহুদূরে থাকিলেও বিপদ-সীমার সে বাহিরে নয়, এরূপ সময় সকলেরই যথাসম্ভব প্রস্তুত হইয়া থাকা উচিত। এই প্রস্তুত থাকার অর্থ কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বোপলব্ধির নয়, প্রধানত আত্মরক্ষার যোগ্যতা অর্জ্জন এবং সামরিক শিক্ষা ব্যতীত সে যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায় না। দীর্ঘদিন সামরিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া বাঙালী যেরূপ নিজ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে প্রবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে আগাইয়া যাওয়া তো দূরের কথা, কুকুর-শিয়ালটা পর্য্যন্ত তাড়াইবার সাহস তাহার নাই. এই অসহায় অবস্থা দূর করিবার জন্য কার্য্যত সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন ছাড়া, অন্য যত উপদেশ-বাণী সবই অকেজো। আত্মরক্ষা প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে হইলে বাঙালীকে সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে এবং প্রস্তাবিত বাঙালী বাহিনী গঠনেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করিতে পারে।

সেনা বিভাগে ভারতবাসী—

বড়লাট বাহাদুর কেন্দ্রীয় আইন সভায় বক্তৃতাকালে চেটফেল্ড কমিটির রিপোর্টের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এই রিপোর্টের সুপারিশসমূহকে ভারতরক্ষার ইতিহাসে যুগান্তকারী ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নিজেরা নিজেদের দেশ রক্ষা করিবার যোগ্যতা ভারতবাসীরা চায়। ভারতবাসীদিগকে আত্মরক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিবার দিকে যতটা নজর দেওয়া উচিত ছিল, এপর্য্যন্ত তাহা দেওয়া নাই। যদি তাহা দেওয়া হইত আজ কেবল এক ভারতের সামরিক শক্তিই জনবলে এবং শৌর্য্যবলে বিশ্বের যে কোন শক্তির পক্ষে অপরাজেয় হইয়া উঠিত। চেটফিল্ড কমিটির সুপারিশিতে যে টাকা পাওয়া যাইবে যদি সেই অর্থ দ্বারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় সেনাদল গঠন করা হয়, তাহা হইলে এখনও এই দিক দিয়া অনেক কাজ হইতে পারে। সামরিক, অ-সামরিক—এই গণ্ডী দিয়া সমর-বিভাগে যে সমর-পদ্ধতির যুগে সেইরূপ অস্পৃশ্যতা বা গোঁড়ামীর কোন মূল্য নাই।

রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি—

সংবাদপত্রে প্রকাশ, সিমলায় বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর যখন আলোচনা হয়, তখন গান্ধীজী বড়লাটের নিকট রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে সত্বরই নাকি রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করা হইবে। রাজনীতিক বন্দীদের সংখ্যা বাঙলা দেশেই সব চেয়ে বেশী এবং বাঙলা দেশে এই সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই। বাঙলা সরকার যে হারে বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিতেছেন, তাহাতে বন্দীদের সকলের মুক্তিলাভের কতদিন বিলম্ব ঘটিবে বুঝিয়া উঠা যায় না। মহাত্মাজীর সঙ্গে বড়লাটের সাক্ষাতের ফলে যদি বাঙলার রাজনীতিক বন্দীদের সমস্যারও সমাধান হয়, অর্থাৎ সকল রাজনৈতিক বন্দী মুক্তিলাভ করেন, তাহা হইলে তাহাও একটা ভরসার কথা বলিতে হইবে।

দ্রব্য মূল্য-নিয়ন্ত্রণ—

গত সপ্তাহে আমরা দ্রব্য মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম; বাঙলা সরকার প্রধান প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য—চাউল, দাইল, আটা, ময়দা, গুড়, চিনি, মাছ, মাংস, তেল, ঘি-মাখন, মসলা, তরি-তরকারী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, সাধারণ লুঙ্গী, ধুতি, শাড়ী, গামছা, জামার কাপড় প্রভৃতি এবং ঔষধপত্র ইত্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই সব দ্রব্য মূল্যে নিয়ন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত একজন কন্ট্রোলার নিযুক্ত হইবেন। তাঁহার একটি পরামর্শদাতা সমিতি থাকিবে। ব্যাপারী সমাজ, দেশের জনসাধারণ এবং বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধি লইয়া এই সমিতি গঠিত হইবে। ইঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দর নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। এই সঙ্গে বাঙলা সরকার দোকানদার ও ব্যবসায়ীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া জানাইয়াছেন যে, যে সব দ্রব্য তালিকায় বর্ত্তমানে ধরা হয় নাই, যদি দেখা যায় যে, সেগুলি অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, তাহা হইলে সেই সব দ্রব্যের মূল্যে নিয়ন্ত্রণের সম্বন্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। যাহারা অন্যায়ভাবে লাভ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য গোপনে মজুত করিবে এবং উপযুক্ত পরিমাণে বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইবে, তাহারাও আইনত দণ্ডার্হ হইবে। বাঙলা সরকারের এই ব্যবস্থা সময়োপযোগী হইয়াছে। আমরা আশা করি, অবিলম্বে এই অনুসারে কাজ আরম্ভ হইবে এবং যাঁহারা জনসাধারণের বিশ্বস্ত এবং যোগ্য ব্যক্তি পরামর্শ-সমিতিতে

চীন সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল—

পণ্ডিত জওহরলাল চীন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন। জার্ম্মানীর সঙ্গে ইংরেজ ও ফরাসীর যুদ্ধ বাধিবার পর চীনের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে তিনি বলেন,—"আমার মনে হয়, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমরে যে সকল দেশ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সকলের চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে চীন। রুষ-জার্ম্মান চুক্তিতে জাপান বর্ত্তমানে বড় বিপদে পড়িয়াছে। সামরিক দিক হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়ের চেয়ে চীন এখন অধিকতর শক্তিশালী। চীনের জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক বা ভীতির চিহ্ন বিন্দুমাত্র নাই। তাহারা শেষ পর্য্যন্ত লড়িবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প।" জাপান যে রুষ-জার্ম্মান চুক্তির ফলে তাহার চীন সম্পর্কিত নীতির সম্বন্ধে সঙ্কটে পড়িয়াছে, ইহা নানা দিক হইতেই বুঝা যাইতেছে। রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করিবার মতলব জাপানের নাই, জাপ সরকারী মহল সুস্পষ্টভাবেই একথা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার ফল চীনের জাতীয়তাবাদেরই সহায়ক হইবে। কার্য্যত দেখা যাইতেছে যে, ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে চীনে জাপানীদের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়াছে। জাপ সেনানীদের তর্জ্জন-গর্জ্জন তেমন কিছুই আর শোনা যায় না। চীনের স্বাধীনতা স্বীকার করিবার শুভবুদ্ধি আজ যদি এই সময় জাপানীদের হয়, তবেই মঙ্গল, নহিলে তাহাদিগকে ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হইতে হইবে। ইংলণ্ডের সঙ্গে জাপানের যদি একটা আপোষ হয় এবং সেই আপোষের বলে জাপান চীন দখল করিবে, এই আশা অন্তরে পোষণ করে, তাহা হইলে সুদূর প্রাচীতে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইবে এবং সেই অনলের ধ্বংসলীলা হইতে জাপান নিজের সুবিধা বজায় রাখিয়া বাহির হইতে পারিবে না।

দর কষাকষি নয়—

গত ১২ই সেপ্টেম্বরের রাষ্ট্রীয় পরিষদের শারদীয় অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এই অধিবেশনে সরকার পক্ষ হইতে স্যার জগদীশপ্রসাদ যুদ্ধের সম্পর্কে কথা তুলিয়া বলিয়াছেন—"সংশয় ও সন্দিগ্ধ চিত্তেরা আজ প্রশ্ন তুলিয়াছেন আমরা কি বিনা সর্ত্তেই সাহায্য দান করিব? এই সংগ্রামের সময় আমাদের দেশবাসীর জন্য অধিকতর রাজনৈতিক সুবিধা লাভের সুযোগ গ্রহণ করিব না? এ সময়ে একটা রাজনৈতিক লাভালাভের সর্ত্তে যদি আমরা সাহায্য করি, তবে ব্রিটিশ জনসাধারণ আমাদের সে কার্য্যকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিবে? তাহাতে কি আমাদের নৈতিক মূল্যই হ্রাস পাইবে না? আমরা কোন পুরস্কার অথবা লাভের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যদি আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারি, তবে তাহাআমাদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি এবং আমাদের মুনি-ঋষি ও দার্শনিকদের সমুন্নত শিক্ষাসম্মতই হইবে।"

স্যার জগদীশপ্রসাদের ব্যাখ্যাত এই নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ভাব আদর্শের সহিত আমাদের মতদ্বৈধ নাই। দরাদরির কথাও এখানে নয়। পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে যে আদর্শ প্রতিপালন করিবার জন্য ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অন্তরে আজ প্রেরণা জাগিয়াছে, ভারতবর্ষের ব্যাপারেও সেই প্রেরণা প্রতিফলিত হইবে, ভারতবাসীরা ইহাই আশা করে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং মিঃ পি এন সপ্রু কথাটা খুলিয়া বলিয়াছেন। সপ্রু মহাশয় বলেন,—"পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য বৃটেন সংগ্রাম করিতেছে, অথচ ভারত সেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত।" পণ্ডিত কুঞ্জরু বলেন,—"কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের পুনর্গঠন ও উহার নীতি বিশেষভাবে ভারত রক্ষা বিষয়ক নীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। যে নীতির জন্য ইউরোপে আমরা সংগ্রাম করিতেছি, এই দেশের পক্ষেও সেই নীতি প্রযুক্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।" ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করা এবং স্বাধীন জাতির মর্য্যাদা প্রদান করা, ভারতের প্রতি মৈত্রীর দৃষ্টিসম্পন্ন বৃটেনের পক্ষে স্বাভাবিক। ভারতবর্ষ সেই মৈত্রীই চাহিতেছে। দরাদরির ব্যাপার ইহাতে নাই।

মাতৃভাষার মর্য্যাদা—

পণ্ডিত জওহরলাল চীন হইতে ঘুরিয়া আসিয়া চীন সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অনেকের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবে। তিনি বলেন, চীনারা সামাজিক অনুষ্ঠানে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করে না। পণ্ডিতজীর নিকট যে সব আমন্ত্রণ-পত্র আসিত, সবই চীনা ভাষায় লিখিত। পণ্ডিতজী বিদেশী এবং ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ লোকেরও অভাব চীনে নাই, তথাপি বিদেশী ভাষার ব্যবহার চীনা সমাজে নাই। চীনাদের স্বাজাত্য-বোধের পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায় এবং নিজেদের দৈন্য আমরা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারি। চিঠিপত্রে ইংরেজী না হইলে তো আমাদের ভদ্রতা, সৌজন্য এবং শিক্ষার মর্য্যাদাই বজায় থাকে না। নিজেদের দেশের লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে গেলে ইংরেজী বুলি কপচান আমাদের 'কালচার' হইয়া পড়িয়াছে। মাতৃভাষার প্রতি মর্য্যাদা বুদ্ধির এই ভাব আমাদের দাস মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। শিক্ষিত সমাজেও এই দাস মনোবৃত্তি আজও প্রশ্রয় পাইতেছে ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

পাটের বাজারে ফন্দীবাজী—

যুদ্ধ বাধিয়াছে এবং যুদ্ধ সহজে থামিবেও না। [illegible]

লড়াই চালানই কঠিন। পাটের থলেতে বালু ভর্ত্তি করিয়া আত্মরক্ষা করা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাহিরে পাটের এইরূপ চাহিদার কারণ সত্ত্বেও চটকলওয়ালারা পাট কেনা বন্ধ করিয়াছে। তাঁহারা হয়ত মনে করিয়াছে যে, তাহাদের হাতে যে পাট আছে তাহা দ্বারাই দুই তিন মাস তাহারা বাহিরের চাহিদা মিটাইবে এবং বাজারে টান না থাকিলে চাষীরা নামমাত্র দরে পাট বেচিতে বাধ্য হইবে। চাষীরা অভাবগ্রস্ত, পাটকলওয়ালাদের ফন্দী বুঝিয়া পাট ধরিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব—চটকলওয়ালারা ইহা জানে। এরূপ অবস্থায় বাঙলা সরকারের উচিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত হইতে কি পরিমাণ থলে ও চট কিনিবেন, অথবা কি পরিমাণ থলে বা চট বিদেশে রপ্তানি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি যাহাতে প্রকাশ করে ভারত সরকারের উপর সেজন্য চাপ দেওয়া। যদি চাষীরা বুঝিতে পারে যে, পাটের চাহিদা সুনিশ্চিত, তাহা হইলে চটকলওয়ালাদের কৃত্রিম উপায়ে পাটের দর কমাইবার এই কৌশল আর খাটিবে না।

পরলোকে ভিক্ষু উত্তম—

গত ২৩শে ভাদ্র শনিবার বৌদ্ধ ভিক্ষু উত্তম পরলোক গমন করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে ভিক্ষু উত্তমের স্মৃতি চিরদিন বিজড়িত থাকিবে। এই তেজস্বী সন্ন্যাসী ব্রহ্মদেশের অধিবাসী হইলেও ভারতের রাজনীতির সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুঞ্জয়ী সঙ্কল্পশক্তি, আদর্শে দৃঢ় নিষ্ঠা এবং বৈরাগ্যময় জীবন স্বাধীনতার সংগ্রামে শক্তির সঞ্চার করিত। তিনি জগতের বিভিন্ন প্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচারই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। ক্যাণ্টন শহরে ডাক্তার সান-ইয়াত-সেনের সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় ভিক্ষু উত্তম ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপে তাহাতে যোগদান করেন। ব্রহ্মের সহিত ভারতের বিচ্ছেদ আন্দোলনের তিনি বিরোধী ছিলেন, এবং ব্রহ্মদেশে সেই আন্দোলন পরিচালনায় তিনি অগ্রণীর অংশ গ্রহণ করেন। ভিক্ষু উত্তমের জীবন বহু নির্য্যাতিত স্বদেশপ্রেমিকের জীবন, দেশের মুক্তি সাধনার জন্য অচঞ্চল স্থৈর্য্যে এই সাধক সন্ন্যাসী দুঃখ কষ্টকে বরণ করিয়া লইতেন। অনলস কর্ম্ম সাধনার ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। আজ নির্ব্বাণের মধ্যে তিনি পরম শান্তি লাভ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

স্বামী অভেদানন্দের মহাসমাধি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের গুরু-ভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এবং আমেরিকায় বেদান্ত দর্শন এবং ভারতের বাণী প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা এবং চরিত্র-মাধুর্য্য-প্রভাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে ভারতবর্ষ একজন সুসন্তান হারাইয়া দরিদ্র হইল। ১৯২১ সালে স্বামিজী স্বদেশে আসিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রচারকার্য্যে রত হন। তিনি অধ্যাত্ম্য দর্শন সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সব গ্রন্থ পাশ্চাত্য দেশে বহুল প্রচারলাভ করিয়াছে। 'ভারত ও তাহার অধিবাসিবৃন্দ' বলিয়া তাঁহার লিখিত পুস্তকখানা একদিন সভ্য সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ পুস্তকের ভারত প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন; বহুকাল পরে সেই নিষেধ-বিধি প্রত্যাহৃত হইয়াছিল। যৌবনে স্বামী অভেদানন্দ কালী তপস্বী নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার সুকঠোর তপশ্চর্য্যা তাঁহার সতীর্থমণ্ডলীর মধ্যে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। পরিণত বয়সে সেই তপঃপ্রবৃদ্ধ মানসিক সম্পদ মানব-সেবাব্রতের মাধুর্য্যে তাঁহার জীবনে বিচিত্রভাবে বিকাশলাভ করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর মৃত্যু নাই —তিনি অনন্তের ব্যপ্তির মধ্যে নিজের আনন্দসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

পরলোকে কামাখ্যাচরণ নাগ—

বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত কামাখ্যাচরণ নাগ গত ৮ই সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন খাঁটি জাতীয়তাবাদী। ভারতের শিক্ষা এবং সভ্যতা আদর্শের প্রভাব সেবাব্রতের ভিতর দিয়া তাঁহার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কিছুদিন দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর অধ্যক্ষ ছিলেন, তাহার পর বাগেরহাট কলেজের ভার গ্রহণ করেন। এই দুই কলেজের উন্নতিবিধানে নাগ মহাশয়ের সাধননিষ্ঠ ঐকান্তিক অবদান রহিয়াছে। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙলা দেশ একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী এবং জাতীয় শিক্ষা, সভ্যতা ও আদর্শের একনিষ্ঠ অনুরাগী সাধককে হারাইল। এ স্থান সহজে পূর্ণ হইবে না।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

রাষ্ট্র হইবে কে?—গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী বিকাশ

কিন্তু এই স্তরে উপনীত হইতে হইলে তৎপূর্ব্বে আমাদিগকে এই গুরু প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে হইবে—রাষ্ট্র হইবে কে? সমাজের বুদ্ধি, ইচ্ছা ও বিবেকের মূর্ত্ত বিগ্রহ হইবে কি সপারিষদ রাজা অথবা যাজকীয় আভিজাতিক বা ধনতান্ত্রিক শাসক শ্রেণী অথবা এমন একটি মণ্ডলী যাহা সমগ্র সমাজের যথোচিত প্রতিনিধি বলিয়া অন্তত মনে হইবে, না, রাষ্ট্র হইবে ইহাদের কতকগুলির বা সবগুলিরই একটা সমন্বয়? নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাসের সমগ্র ধারা এই প্রশ্নটিকে ধরিয়াই চলিয়াছে, আর যত দূরে দেখিতে পাওয়া যায় নানাবিধ সম্ভাবনার মধ্যে অস্পষ্টভাবে কখনও একটির দিকে, কখনও অপরটির দিকে ঝুঁকিয়াছে; কিন্তু বস্তুত আমরা দেখিতে পাই যে, বরাবর একটা প্রয়োজনের চাপই কাজ করিয়াছে, সেটি অবশ্য রাজতান্ত্রিক, আভিজাতিক ও অন্যান্য স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে গণতান্ত্রিক (democratic) গবর্ণমেণ্টেই উপস্থিত হইতে হইয়াছে। রাজা রাষ্ট্র হইয়া উঠিবার প্রয়াসে (তাহার বিবর্ত্তনের ধারাতেই তাহাকে এই প্রয়াস করিতে হইয়াছে) অবশ্য আইনের উৎস ও কর্ত্তা হইতে চেষ্টা করিবেই; সে সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক ব্যাপারগুলির ন্যায়ই আইন-সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলিকেও অধিকার করিতে, সমাজের সক্ষম কর্ম্মাবলীর ন্যায় তাহার সক্ষম চিন্তাবলীকেও অধিকার করিতে চাহিবেই। কিন্তু এই প্রয়াসের ভিতর দিয়া সে কেবল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্যই পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে।

রাজা, তাহার সামরিক ও বে-সামরিক পরিষদ, পুরোহিত সম্প্রদায় এবং স্বাধীন ব্যক্তি-সকলের সভা (ইহা যুদ্ধের প্রয়োজনে নিজেকে সৈন্য দলে পরিণত করিত)—এই অঙ্গগুলি লইয়া সম্ভবত সর্ব্বত্র, অন্তত আর্য্য জাতিসমূহে সমাজের স্ব-চেতন বিকাশ আরম্ভ হইয়াছিল; স্বাধীন আদি-জাতির যে পূর্ব্বতন ও প্রাথমিক রূপ তাহাতে এইরূপই তিনটি বিভাগ ছিল এবং রাজা ছিলেন সমগ্র সৌধটির মধ্যপ্রস্তর স্বরূপ। রাজা পুরোহিত সম্প্রদায়ের শক্তি লোপ করিয়া দিতে পারেন, তিনি তাঁহার পরিষদকে তাঁহার ইচ্ছার যন্ত্রে পরিণত করিতে পারেন এবং তাহারা যে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিভূ তাহাকে নিজ কর্ম্মের রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থকরূপে পরিণত করিতে পারেন কিন্তু যতক্ষণ না তিনি সভাকে লুপ্ত করিতেছেন অথবা সেটিকে আহ্বান করিতে বাধ্য না থাকিতেছেন [যেমন ফরাসী রাজতন্ত্রে বহু শতাব্দীর মধ্যে ষ্টেটস-জেনারেল (States-General) বিশেষ দুরূহতার চাপে একবার কি দুইবার মাত্র আহূত হইয়াছিল] ততক্ষণ তিনি প্রধান হইতে পারেন না, আইন-বিষয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তা হওয়া ত দূরের কথা। এমনকি যদি তিনি ফরাসী পার্লামেণ্টের ন্যায় অ-রাজনৈতিক বিচার-বিধায়ক মণ্ডলীর হস্তে কার্য্যত আইন বিধিবদ্ধ করার অধিকারটি

সেটিকে আহ্বান করিবার বা না করিবার ক্ষমতা হইতেছে তাহার নিরঙ্কুশ শক্তির প্রকৃত চিহ্ন। কিন্তু যখন তিনি সামাজিক জীবনের অন্য শক্তিগুলিকে বিলুপ্ত বা নিজের অধীন করিয়াছেন, সেইখানে তাঁহার সাফল্যের সেই উচ্চতম সীমাতেই তাঁহার অসাফল্যের আরম্ভ; রাজতন্ত্র তখন সামাজিক বিবর্ত্তনে নিজ সাক্ষাৎ কার্য্যকারিতা সিদ্ধ করিয়াছে, তখন শুধু বাকি আছে যতক্ষণ না রাষ্ট্রটি নিজেকে রূপান্তরিত করিতেছে ততক্ষণ তাহাকে ধরিয়া রাখা অথবা উৎপীড়নের দ্বারা জনসাধারণের সার্ব্বভৌম শক্তি লাভের দিকে আন্দোলনকে জাগ্রত করিয়া তোলা।

ইহার কারণ হইতেছে এই যে, রাজতন্ত্র আইন-সম্বন্ধীয় শক্তিটি নিজের কুক্ষিগত করিয়া লইয়া তাহার সত্তার যথাযথ নীতিকে লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহার নিজ ধর্ম্মকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, সে এমন সব কার্য্যের ভার লইয়াছে যেগুলি সে যথাযথ ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে জাতির কেবল বাহ্য জীবন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, তাহার বিকশিত বা বিকাশমান সত্তার বাহ্যিক প্রক্রিয়াগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষা করা, আর রাজা বেশই এই সবের নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা হইতে পারেন। ভারতের রাজনীতিশাস্ত্র তাঁহার উপর যে কার্য্যভার অর্পণ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছে, ধর্ম্মের "রক্ষক", সে কাজ তিনি বেশই সম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু আইন প্রণয়ন, সামাজিক অভিবিকাশ, কৃষ্টি, ধর্ম্ম, এমনকি জাতির অর্থনৈতিক জীবনের নির্দ্ধারণও হইতেছে তাঁহার যথোচিত কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে; এইগুলি হইতেছে সমাজের, জীবনের, চিন্তার, অন্তরাত্মার অভিব্যক্তি, যদি তিনি যুগের ধর্ম্মের সহিত সংস্পর্শশীল শক্তিশালী ব্যক্তি হন, তাহা হইলে নিজ প্রভাবের দ্বারা তিনি এই সবেই সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু এ-সব নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। এইগুলিকে লইয়াই হইতেছে জাতীয় ধর্ম্ম,—ভারতের "ধর্ম্ম" কথাটির দ্বারাই এই সমগ্র তত্ত্বটি বেশ ব্যক্ত করা যায়; কারণ আমাদের ধর্ম্মের অর্থ হইতেছে আমাদের প্রকৃতির নীতি, আবার তাহার বিধিবদ্ধ অভিব্যক্তিও বটে। কেবলমাত্র সমাজ নিজেই তাহার নিজ ধর্ম্মের বিকাশ নির্দ্ধারণ করিতে পারে, অথবা তাহার অভিব্যক্তি বিধিবদ্ধ করিতে পারে; আর যদি ইহা পুরাতন প্রথা অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ ও অন্তর্বোধমূলক অভিবিকাশের দ্বারা না করিয়া সুব্যবস্থিত জাতীয় বিচারবুদ্ধি এবং সঙ্কল্পের ভিতর দিয়া স্ব-চেতন নিয়ন্ত্রণের দ্বারা করা হয়, তাহা হইলে এমন একটি শাসকমণ্ডলী সৃষ্টি করিতেই হইবে যাহা সম্পূর্ণভাবে না হউক অন্তত যথোচিত পরিমাণে সমাজের বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছার প্রতিনিধি হইবে। কোন শাসকশ্রেণী বা অভিজাতবর্গ বা বুদ্ধিশীল যাজক-সম্প্রদায় বস্তুত পক্ষে এইরূপ প্রতিনিধি না হইয়া জাতীয় বিচারবুদ্ধি ও সঙ্কল্পের কোন সতেজ বা সম্ভ্রান্ত অংশেরই

অবশ্য গণতন্ত্র এখন যেভাবে চলিতেছে এইটিই শেষ বা চরম স্তর নহে; কারণ অনেক ক্ষেত্রে ইহা কেবল বাহ্যতই গণতন্ত্র, আর যেখানে ইহা সব চেয়ে ভাল সেখানেও ইহার স্বরূপ হইতেছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, ইহা পার্টি গবর্ণমেণ্টের দুষ্ট প্রণালীতে কাজ করে,—অনেকটা এইসব দোষের ক্রমবর্দ্ধমান উপলব্ধির জন্যই বর্ত্তমানে লোকে পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে। আর গণতন্ত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও তাহাই যে সামাজিক অভিবিকাশের চরম স্তর হইবে এমনও কোন কথা নাই। তথাপি এইটিই হইতেছে প্রয়োজনীয় প্রশস্ত ভিত্তি, ইহার উপর ভর করিয়াই সমাজ-সত্তার আত্ম-চেতনা নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে*। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্ম-চেতনা যে পরিপক্ক ও পূর্ণ হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিতেছে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র হইতেছে তাহারই লক্ষণস্বরূপ।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, আইন ব্যবস্থা হইতেছে একটা বাহ্য জিনিষ, কেবল শাসন নির্ব্বাহেরই একটা দিক উহা অর্থনীতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা ও কৃষ্টির ন্যায় সমাজ জীবনের অন্তরঙ্গ জিনিষ নহে। এইরূপ মনে হয় কারণ ইউরোপীয় জাতিগণের প্রাচীন বিধানে প্রাচ্য আইন-ব্যবস্থা বা শাস্ত্রের ন্যায় উহা সর্ব্বতোমুখী ছিল না, পরন্তু সেদিন পর্য্যন্ত উহা সীমাবদ্ধ ছিল রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিধানে, শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের নীতি ও ধারার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধানের কেবল ততটুকুতে যতটুকু সম্পত্তির রক্ষা এবং সাধারণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয়। মনে হইতে পারে যে, এই সবই রাজার অধিকার ক্ষেত্রের মধ্যে বেশ আসিতে পারে এবং তাঁহার দ্বারা গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের ন্যায়ই সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু বস্তুত এইরূপ নহে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; আইনকর্ত্তা হিসাবে রাজা দক্ষ নহেন এবং অভিজাতবর্গও তাহা অপেক্ষা বেশী ভাল নহে। কারণ সমাজ তাহার জীবনের এবং তাহার ধর্ম্মের কাঠামোস্বরূপেই আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করে। যত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই হউক না কেন, সমাজ যখন এই সকলকে নিজ বুদ্ধি ও সংকল্পের স্ব-চেতন ক্রিয়া দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে আরম্ভ করে তখন সে সেই পথে পদার্পণ করিয়াছে। যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইতেছে তাহার সমগ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে স্ব-চেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াস; যেমন তাহার আত্ম-চেতনা বর্দ্ধিত হইবে, তেমনিই সে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের পরিকল্পিত আদর্শ সমাজের মত কিছু একটা সিদ্ধ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেই। কারণ সমাজের সমষ্টিগত মন কালক্রমে যে পথে অগ্রসর হইবে, আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা হইতেছে ব্যষ্টিগত মনে তাহারই পূর্ব্বাভাস।

যুক্তিমূলক স্ব-চেতন সমাজের বিবর্ত্তন নির্দ্ধারণে রাজতন্ত্রের অক্ষমতা

কিন্তু যেমন কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহার স্বৈর-বুদ্ধির দ্বারা যুক্তিমূলক স্ব-চেতন সমাজের বিবর্ত্তন চিন্তায় নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, তেমনিই কোন বিশেষ কার্য্যাধ্যক্ষ অথবা পর পর কতকগুলি কার্য্যাধ্যক্ষ তাহার বা তাহাদের স্বৈর-শক্তি দ্বারা কার্য্যত ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। ইহা সুস্পষ্ট যে, সে একটা জাতির সমগ্র সামাজিক জীবন নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, ইহা তাহার পক্ষে অতি বৃহৎ; কোন সমাজই তাহার সমগ্র সামাজিক জীবনের উপর কোন স্বৈরবৃত্ত ব্যক্তির গুরুভার হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিবে না। সে অর্থনৈতিক জীবনও নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, কারণ উহাও তাহার পক্ষে অতি-বৃহৎ; সে কেবল উহাকে লক্ষ্য করিতে পারে এবং এদিকে ওদিকে যেখানে সাহায্য প্রয়োজন সাহায্য করিতে পারে। সে ধর্ম্ম-জীবন নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, যদিও সে চেষ্টা করা হইয়াছে; ইহা তাহার পক্ষে অতি-গভীর; কারণ ধর্ম্ম হইতেছে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন, ভগবানের সহিত তাহার আত্মার সম্বন্ধ এবং অন্যান্য ব্যক্তির সহিত তাহার সংকল্প ও চরিত্রের অন্তরঙ্গ ব্যবহার; কোন রাজা বা শাসক-সম্প্রদায়, এমনকি কোন যাজকতন্ত্র বা পুরোহিততন্ত্র ব্যক্তির আত্মার বা জাতির আত্মার স্থান প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ করিতে পারে না। জাতীয় কৃষ্টিও সে নির্দ্ধারণ করিতে পারে না; সেই কৃষ্টির মহান বিকাশশীল যুগে তাহা নিজ প্রবৃত্তির শক্তি দ্বারা যেদিকে অগ্রসর হইতেছে সে কেবল তাহার রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা—সেই গতিটিকেই সুদৃঢ় করিয়া দিতে পারে। ইহার অধিক কিছু চেষ্টা করা হইতেছে অ-যৌক্তিক প্রয়াস, তাহার দ্বারা যুক্তিমূলক (rational) সমাজের বিকাশে সহায়তা করা হয় না। সেরূপ চেষ্টাকে সে কেবল স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারের দ্বারা চালাইতে পারে, শেষ পর্য্যন্ত তাহার পরিণতি হয় সমাজের দুর্ব্বলতা ও গতিরোধ; রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকার (divine right) আছে, অথবা রাজতন্ত্র হইতেছে একটি বিশেষভাবে ভাগবত প্রতিষ্ঠান এইরূপ কোন ধর্ম্মীয় মিথ্যার দ্বারাই সে উহার সমর্থন করিতে পারে। এমনকি শার্লেমান, অগষ্টাস, নেপোলিয়ন, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক বা আকবরের ন্যায় অসামান্য নেপোলিয়ন, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক বা আকবরের প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় করিয়া দেওয়া অথবা কোন সঙ্কটময় যুগে তাহার শ্রেষ্ঠ বা প্রবলতম প্রবৃত্তিগুলিকে সাহায্য করা—ইহার অধিক আর কিছুই করিতে পারেন না। যখন তাঁহারা বেশী কিছু করিতে যান, তখনই তাঁহারা অকৃতকার্য্য হন। আকবর তাঁহার প্রদীপ্ত বুদ্ধির দ্বারা ভারতীয় জাতির জন্য একটা নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবার যে প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহা হইয়াছিল একটি সমুজ্জ্বল ব্যর্থতা। অশোকের

---

* ইহা দ্বারা এমন বুঝায় না যে, সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধ ডিমোক্রেসি বা গণতন্ত্র এক দিন না একদিন প্রতিষ্ঠিত হইবেই। কারণ মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবেই হউক অথবা সমষ্টিগত-ভাবেই হউক পূর্ণ আত্মচেতনায় উপনীত হওয়া খুবই কঠিন সমস্যা। প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অকাল প্রয়াস আসিয়া সে প্রক্রিয়ায় বাধা দিতে

ভারতের ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অভিবিকাশ এক মহান জাতির অন্তরাত্মার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া অন্য এবং অনেক বেশী বিচিত্র ধারায় অগ্রসর হইয়াছে। কেবল অলোক-সামান্য ব্যক্তি মনু, অবতার বা নবী, যিনি হয়ত সহস্র বৎসরের মধ্যে একবার আসেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভগবদ্দত্ত অধিকারের কথা বলিতে পারেন, কারণ তাঁহার শক্তির নিগূঢ় রহস্য রাজনৈতিক নহে, আধ্যাত্মিক। কোন সাধারণ রাজনৈতিক শাসনকর্ত্তা অথবা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যে এরূপ দাবী করিয়াছে, সেটা হইতেছে মানবীয় মনের বহু নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্যে একটি সর্বাধিক বিস্ময়জনক।

তথাপি এইরূপ প্রয়াস মিথ্যার দ্বারা সমর্থিত এবং কার্যতঃ ব্যর্থ হইলেও সামাজিক বিবর্ত্তনে ইহা অবশ্যম্ভাবী, ফলপ্রদ এবং একটি প্রয়োজনীয় স্তর ছিল। ইহা অবশ্যম্ভাবী ছিল কারণ মানুষের বুদ্ধি ও সংকল্প যে সমষ্টি-জীবনকে ধরিয়া নিজ খুশী, শক্তি ও যৌক্তিক নির্দ্ধারণ অনুযায়ী গঠিত ও প্রণালীবদ্ধ করিতে চায়, ব্যক্তিগত মানুষের মধ্যে প্রকৃতিতে অংশতঃ নিয়ন্ত্রিত করিতে যেমন সে শিক্ষা করিয়াছে, সামূহিক মানব-জীবনেও সেইরূপ করিতে চায়, এই সাময়িক যন্ত্রটি ছিল তাহারই প্রাথমিক পরিকল্পনার প্রতিভূস্বরূপ। আর যেহেতু সমূহ হইতেছে অজ্ঞান এবং এইরূপ বুদ্ধিসঙ্গত ভাবে প্রয়াস করিতে অক্ষম, তাহার হইয়া এ কাজ কোন সক্ষম ব্যক্তি কিম্বা কতকগুলি বুদ্ধিমান ও সমর্থ ব্যক্তির মণ্ডলী ব্যতীত আর কে করিতে পারে? সকল স্বৈরতন্ত্র অভিজাততন্ত্র বা যাজকতন্ত্রের এইটিই হইতেছে সমগ্র হেতুবাদ। ইহার পরিকল্পনা হইতেছে মিথ্যা বা কেবল একটা অর্দ্ধ-সত্য অথবা সাময়িক সত্য, কারণ কোন অগ্রগামী সম্প্রদায় বা ব্যক্তির প্রকৃত কার্য্য হইতেছে সমগ্র জাতিকে নিজেই নিজ কার্য্য সজ্ঞানে পরিচালিত করিতে শিক্ষা দেওয়া, অভ্যস্ত করিয়া তোলা, চিরকাল তাহার জন্য সকল কাজ করিয়া দেওয়া নহে*। কিন্তু পরিকল্পনাটিকে আপন পথেই চলিতে হইয়াছিল এবং ইহার ভিতরের যে ইচ্ছা শক্তি (কারণ প্রত্যেক পরিকল্পনার মধ্যেই নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তুলিবার একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকে) তাহার পক্ষে নিজের চরমে উঠার চেষ্টা করা অবশ্যম্ভাবী ছিল। মুস্কিল ছিল এই যে, শাসনশীল ব্যক্তি বা সম্প্রদায়টি সমাজ-জীবনের অপেক্ষাকৃত যন্ত্রবৎ অংশটিকেই ধরিতে পারিত কিন্তু যাহা কিছু তাহার অন্তরঙ্গ সত্তার জিনিষ সে সবকে ধরিতে পারিত না; তাহারা তাহার অন্তরাত্মার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। অথচ যদি না তাহারা ইহা করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের প্রবৃত্তিতে অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। তাহাদের অধিকারও হয় অনিশ্চিত, কারণ যে কোন সময়ে অধিকতর উপযোগী শক্তি আসিয়া তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে এবং তাহাদের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইতে পারে, মানবজাতির মহত্তর মনীষা হইতে এইরূপ সব শক্তির অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী।

এইরূপ সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বলাভের প্রয়াসে দুইটি প্রধান উপায় উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং প্রযুক্ত হইয়াছে। একটি ছিল প্রধানতঃ নেতিমূলক, ইহা কাজ করিয়াছে সমাজের জীবনের উপর এবং অন্তরাত্মার উপর অত্যাচার করিয়া—চিন্তা, বক্তৃতা, সমিতি, ব্যক্তিগত ও সমবেত কর্ম্ম—এই সবের স্বাধীনতা অল্পাধিক পূর্ণতার সহিত দমন করিয়া (আর তাহার সহিত প্রায়ই যুক্ত হইয়াছে বিচার-প্রহসনের ঘৃণ্যতম পদ্ধতি এবং ব্যক্তিক ও সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের পূণ্যতম সম্বন্ধগুলির উপর হস্তক্ষেপ ও উৎপীড়ন), এবং কেবল এমন চিন্তা, সংস্কৃতি ও কর্ম্মধারাকে উৎসাহিত ও সমর্থিত করিয়া যে-গুলি স্বৈর-শাসনতন্ত্রকে স্বীকার করিয়াছে, তোষামোদ করিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে। অন্য পন্থাটি ছিল প্রত্যক্ষমূলক (positive); ইহাতে সমাজের ধর্ম্মকে (religion) আয়ত্তাধীন করিয়া লওয়া হইত এবং পুরোহিতকে রাজার আধ্যাত্মিক সাহায্যকর্ত্তা করিয়া দেওয়া হইত। কারণ স্বভাবজাত সমাজ-সকলে এবং যে সকল সমাজ অংশতঃ বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও আমাদের সত্তার স্বাভাবিক নীতিগুলিকে এখনও ধরিয়া আছে সেই সব সমাজে ধর্ম্ম যদি সমগ্র জীবনই না হয় তথাপি তাহা ব্যক্তি ও সমাজের সমগ্র জীবনের উপর লক্ষ্য রাখে এবং প্রবলভাবে তাহাকে প্রভাবিত ও সংগঠিত করে; সেদিন পর্য্যন্ত ভারতে এইরূপই হইয়াছে এবং এশিয়ার সকল দেশেই বহুল পরিমাণে এইরূপ হইয়াছে। রাষ্ট্রগত ধর্ম্ম (State religions) হইতেছে এই প্রয়াসেরই অভিব্যক্তি। কিন্তু রাষ্ট্রগত ধর্ম্ম হইতেছে একটা কৃত্রিম কিম্ভূত-কিমাকার বস্তু, যদিও জাতিগত ধর্ম্ম (national religion) বেশই একটা জীবন্ত সত্য হইতে পারে। তথাপি সেইটিকেও সহনশীল অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তনশীল, সামঞ্জস্যশীল হইতে হয়, সমাজের গভীরতর আত্মার দর্পণ স্বরূপ হইতে হয়, নতুবা তাহা ধর্ম্মভাবকে গতানুগতিক আকারে পরিণত করিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত নষ্ট করিবে অথবা আধ্যাত্মিক প্রসারণ রুদ্ধ করিয়া দিবে। এই দুই প্রকার পদ্ধতিই সাময়িকভাবে কৃতকার্য্য হইতেছে বলিয়া মনে হইলেও ব্যর্থ হইতে বাধ্য, উৎপীড়িত সমাজ-সত্তার বিদ্রোহের দ্বারা তাহারা ব্যর্থ হইবে অথবা সমাজের দুর্ব্বলতা এবং মৃত্যু বা জীবন্মৃতাবস্থা দ্বারা তাহারা ব্যর্থ হইবে। গতিহীনতা ও দুর্ব্বলতা—যেমন শেষ পর্য্যন্ত গ্রীস, রোম, মুসলমান জাতি সকল, চীন ও ভারতকে পাইয়া বসিয়াছিল—অথবা একটা রক্ষাকারী আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিপ্লব—এইগুলিই হইতেছে স্বৈরতন্ত্রের একমাত্র পরিণতি। তথাপি মানবীয় অভিবিকাশে এইটি ছিল একটি অপরিহার্য্য স্তর, এই পরীক্ষা না করিয়া উপায় ছিল না। ইহার ব্যর্থতা সত্ত্বেও এমন কি ঐ ব্যর্থতার জন্যই ইহা ফলপ্রদ হইয়াছে, কারণ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র এবং অভিজাতিক রাষ্ট্র

(শেষাংশ ৪৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

---

* ইহার অর্থ নহে যে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সমাজে রাজকীয় আভিজাতিক বা যাজকীয় অংশের কোন স্থানই থাকিবে না, কিন্তু তাহারা একটি সচেতন মণ্ডলীর মধ্যে নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্ম্ম অনুসরণ করিবে একটা অচেতন মণ্ডলীকে সেই অবস্থাতেই রাখিয়া ঠেলিয়া লইয়া চলিবে।

যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতি

জার্ম্মান সৈন্য পোল্যাণ্ডের মধ্যে খানিকটা অবশ্য আগাইয়া গিয়াছে, কিন্তু জার্ম্মান সমর বিভাগ সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পশ্চিম সীমান্তে ফরাসীদের আক্রমণের তীব্রতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পোল্যাণ্ডে জার্ম্মানীর অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ফরাসীর সঙ্গে যোগ দিয়া ব্রিটিশ বাহিনী এখন পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ করিতেছে। যুদ্ধটা হইতেছে জার্ম্মানীর হইয়াছে। জার্ম্মান সমর বিভাগ এখন এই যুক্তি খাড়া করিয়াছেন যে, পোল্যাণ্ড অধিকৃত অঞ্চলে জার্ম্মান শাসন পাকা করিয়া লইবার জন্য তাঁহারা এ পর্য্যন্ত যেমন তাড়াতাড়ি আগাইতেছিলেন, এখন আর তাহা সম্ভব হইবে না। জার্ম্মানীর রণনীতির চাতুর্য্যই ছিল, যত সত্বর সম্ভব পোল্যাণ্ড দখল করিয়া লওয়া, তাহা হইলে পশ্চিমদিকে সৈন্য পরিচালনা করিবার পক্ষে তাহার সুবিধা, ইহা ছাড়া
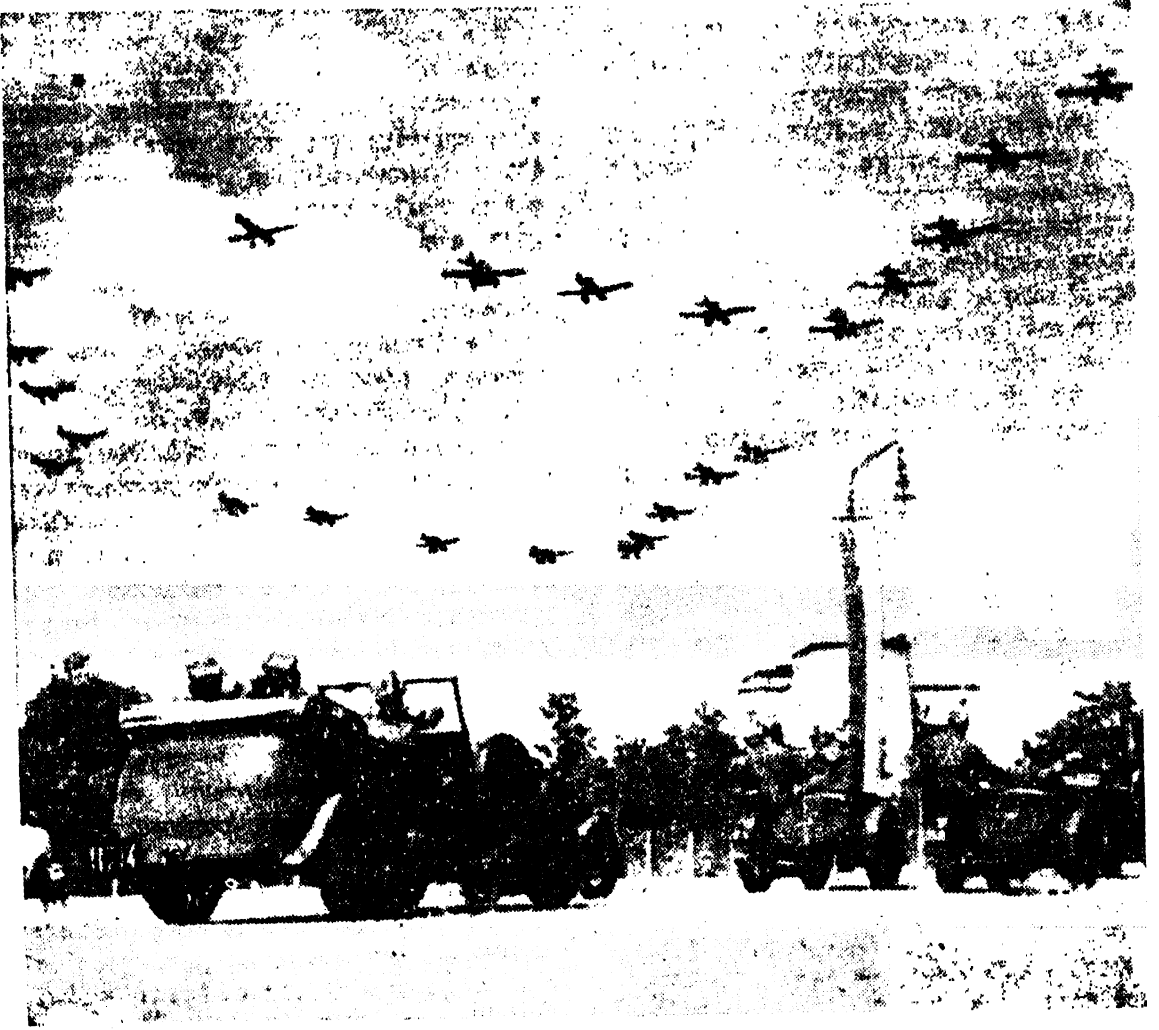
পোলিশ বিমানশ্রেণী মোটরাইজড্ বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিতেছে

রাইন অঞ্চলস্থ সারব্রুকেন শহর হইতে একটু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে—জার্ম্মানীর জিগফ্রিড লাইন এবং ফরাসীদের ম্যাজিনো লাইনের ভিতরে বে-ওয়ারিশ অঞ্চলে। এক দিকে ফরাসীদের ম্যাজিনো লাইন এবং অন্যদিকে জার্ম্মানীর জিগফ্রিড লাইন এই দুই লাইনের মাঝ দিয়া এইরূপ অঞ্চল কয়েক মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। দুই পক্ষের লাইনই ভীষণ রকম সুরক্ষিত; পাহাড়ও আছে। সার উপত্যকার অঞ্চল কিছু খোলা; প্রাকৃতিক বাধা কম, এইখানেই আক্রমণ আরম্ভ পোল্যাণ্ড তাড়াতাড়ি দখল করিয়া ফেলিতে পারিলে প্রতিপক্ষ হইতে মিটমাটের প্রস্তাবও আসিতে পারে, হিটলার এমন আশাও হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু মার্শাল গোয়েরিং সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনকে উদ্দেশ করিয়া যে উপদেশ বর্ষণ করেন, তাহার ভিতর দিয়াই সেই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা হিটলারকে এই দিক হইতে নিরাশ করিয়াছেন, তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, পোল্যাণ্ডের যুদ্ধের গতি যেমনই

হউক না কেন, তাঁহারা হিটলারী দর্প চূর্ণ না করিয়া ছাড়িবেন না। তাঁহারা তিন বৎসর যুদ্ধ পূর্ণ উদ্যমে চালাইবার জন্য তোড়জোড় বাঁধিয়াই দাঁড়াইয়াছেন, এই কথা জানাইয়া দিয়াছেন।

হের হিটলার নিজে এবার রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনি সাইলেশিয়ায় সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়াছেন। গোয়েরিং বিমান বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ লইয়া রণক্ষেত্রে গিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, পোল্যাণ্ডে অগ্রগতির নীতির উপর জার্ম্মানী এখনও বিশেষভাবেই জোর দিবার জন্য ব্যস্ত আছে এবং তাহার অগ্রগতির বেগ যদি কোন রকম শিথিল হয়, নিশ্চয়ই নীতি-চাতুর্য্যের জন্য তাহা ঘটিবে না, ঘটিবে অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া।

শ্লোভাকিয়ার দিক হইতে যে জার্ম্মান বাহিনী অগ্রসর হইতেছিল, পোল সেনা বাহিনী দেখা যাইতেছে, তাহাদিগকে

পোলবাহিনীর কুকুর চালিত শকট

বাধা দিবার জন্য প্রবল বেগে আক্রমণ করিতেছে। পশ্চিম সীমান্তে ফরাসী-ইংরেজের জোর বাড়িলে পোল্যাণ্ডের উপর এই আক্রমন জার্ম্মানী শিথিল করিতে বাধ্য হইবে এবং ইতি-মধ্যেই তাহা হইয়াছে।

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানীর অবস্থা যেমন সুদৃঢ় ছিল, হিটলার মুখে যতই গর্ব্ব করুন না কেন, জার্ম্মানী সে অবস্থা আর্থিক দিক হইতে এখনও লাভ করিতে পারে নাই। উপনিবেশগুলি তাহার হাত ছাড়া হইয়াছে, বাণিজ্যের আয়ও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। জার্ম্মানী আশা করিতেছে ত্বরিতগতিতে যুদ্ধ শেষ করিবার উপর এবং সে ইহাও জানে যে, দীর্ঘ দিনের লড়াইয়ে ইংরেজ, ফরাসী এবং পোল্যাণ্ড—এই তিন শক্তির সঙ্গে সে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। পোল্যাণ্ডে সে যদি সেনাশক্তির বিপুল সংখ্যাধিক্যে কিছু সুবিধা করেও তাহা সাময়িক হইবে। স্বাধীনতা-প্রিয় পোল জাতি—ইংরেজ ফরাসীর মিত্রতায় জোর পাইয়া, জঙ্গী বলে জার্ম্মানীর অধিকারে গেলেও জার্ম্মানিদিগকে কিছুতেই সোয়াস্তি দিবে না। দুই দিনেই তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। পোল জাতির কাছে অ[illegible] একবার এইরূপ আক্কেল পাইয়াছিল। জার্ম্মানী নিশ্চয়ই এই দুর্দ্ধর্ষ পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-প্রিয় সন্তানদের প্রকৃতি বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

জার্ম্মানী এই অবস্থায় বেশী দিন আঁটিয়া উঠিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা তাহার নাই। ফরাসীরা সার অঞ্চলের দিকে জার্ম্মানীর সুদৃঢ় জিগফ্রিড লাইন ভাঙ্গিয়া একবার যদি ভিতরে ঢুকিতে পারে, তবে তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা কঠিন হইবে। ইতিমধ্যেই ফরাসী বাহিনী এই দিক দিয়া আগাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পোল্যাণ্ডে লড়াই চালাইয়া দুই দিক সামলান জার্ম্মানদের পক্ষে কঠিন হইবে। জার্ম্মানদের লাইন সুরক্ষিত কম নয়; কিন্তু সুরক্ষিত সেই লাইনও ফরাসী সেনাদের ক্রমাগত আক্রমণ দীর্ঘ দিন সহ্য করিতে পারিবে না। জার্ম্মান সেনানায়কগণ ইহা বেশই জানেন যে, যুদ্ধ যত দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে, জার্ম্মানীর পক্ষে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অসুবিধা ততই বাড়িবে; পক্ষান্তরে যুদ্ধ যতই দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে ইংরেজ এবং ফরাসীর পক্ষে সুবিধা বাড়িবে ততই বেশী। ব্রিটিশ রণতরীর প্রতাপে জার্ম্মানী আজ ঘরবন্দী হইয়াছে। বাহির দরিয়ায় তাহার আর রণতরীর সাড়া নাই। ডুবো জাহাজের গতিবিধির পরিচয় দুই একটি স্থলে পাওয়া যাইতেছে মাত্র; কিন্তু বহির্জ্জগতের সঙ্গে তাহার যোগ রাখা সম্ভব হয় না, এবং বহির্জ্জগতে জার্ম্মানী সাহায্যই বা আশা করে আর কাহার নিকট হইতে? জাপানের সঙ্গে তাহার সদ্ভাব সুস্পষ্টভাবেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

এখন, রুষিয়া এবং ইটালী—এই দুই শক্তির মতিগতির কথা বিশেষ বিবেচ্য হইয়া পড়িয়াছে। রুষ-জার্ম্মান চুক্তির ফলে এই যুদ্ধে জার্ম্মানীর কিছু সাহায্য হইবে কি? হিটলার তাঁহার 'মেন ক্যাম্প' নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছিলেন—রুষে জার্ম্মানে যদি কোন দিন চুক্তি হয়, তাহার ফলে ইউরোপে লড়াই বাধিবে এবং জার্ম্মানীর অবসান ঘটিবে। এ কথা হিটলারেরই নিজের কথা। ঘটনাচক্রে রুষ-জার্ম্মান চুক্তি হইয়াছে, এখন হিটলারের ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ অংশ সার্থক হইবারই শুধু অপেক্ষা আছে, কে বলিবে তাহারই সূচনা আরম্ভ হইয়াছে কিনা।

জার্ম্মানী রুষিয়ার নিকট হইতে সামরিক সাহায্য না পাইতে পারে, কিন্তু কাঁচা মালে সাহায্য পাইলেও তাহার সাহায্য হইবে। কেহ কেহ রুষ-জার্ম্মান চুক্তিতে জার্ম্মানীর এই সুবিধার কথা তুলিতেছেন। জার্ম্মানীর কতকগুলি কাঁচা মালের বিশেষই অভাব রহিয়াছে। জার্ম্মানীর হাতে যে পেট্রোল আছে এবং যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে আজ কাল যাহার প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে বেশী, তাহাতে বড় জোর আর ৫ মাস চলিতে পারে। সেইরকম লোহা এবং তাম্রের অপ্রতুলতাও

তাহার রহিয়াছে। রুষিয়া হইতে জার্ম্মানী তেল পাইবে, এ সম্ভাবনাও তেমন বেশী নয়। কারণ মাল চালান দিবার মত পাকা ব্যবস্থা করা সহজ নয়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব রুষিয়া হইতে বাল্টিক সাগরের বন্দর পর্যান্ত মাল লইবার মত যথেষ্ট গাড়ীর অভাব রহিয়াছে। জার্ম্মানীর পক্ষে ঘরবন্দী অবস্থা মারাত্মক হইয়া পড়িবে।

ইহা ছাড়া, আসল জায়গায় গলদ রহিয়াছে। রুষ-জার্ম্মান মিতালী যেমনই হউক না কেন, সে কেবল উপরে উপরে। জার্ম্মানীতে রুষ সেনার আবির্ভাব কিংবা রুষিয়ায় জার্ম্মান সেনার আবির্ভাব—হিটলার এবং ষ্ট্যালিন পরস্পর সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখিবেন। রুষদের উপর জার্ম্মান জাতিকে হিটলার গত ৬ বৎসরকাল বিদ্বিষ্ট করিয়াই তুলিয়াছেন। রুষিয়া নিজের সীমানার বাহিরে সেনা পাঠাইতে রাজী হইবে ইহা মনে হয় না বরং পোল্যাণ্ডে জার্ম্মানীর অগ্রগতিতে সে আতঙ্কিতই হইবে। হের হিটলার হয়ত আশা করিয়াছিলেন যে, রুষিয়ার সঙ্গে তিনি কোন রকমে যদি একটা চুক্তি করিয়া ফেলিতে পারেন, তাহা হইলে ফরাসী এবং ইংরেজ পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করিবার নীতি পরিত্যাগ করিবে। রুষিয়ার সঙ্গে চুক্তি করিয়া তিনি হয়ত আশা করিয়াছিলেন যে, রাইন অঞ্চল, অষ্ট্রিয়া, স্পেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে তিনি যেমন কব্জীর মধ্যে আনিয়াছেন, পোল্যাণ্ডকেও তিনি সেইরূপ কব্জীর মধ্যে লইতে পারিবেন; কিন্তু এখন নিশ্চয়ই তাঁহার সে ভ্রান্তি অপনোদিত হইয়াছে।

ইটালীর সম্বন্ধে বলিতে গেলে এই কথা বলিতে হয় যে, ইটালীর জার্ম্মানীর পক্ষে আসিবার সম্ভাবনা খুবই সামান্য। অষ্ট্রিয়া জার্ম্মানীর দখলে যাইবার পর হইতে ইটালী জার্ম্মানীকে সন্দেহের চোখেই দেখে। তাহা ছাড়া, ফরাসী এবং ইংরেজের সমবেত নৌ-শক্তির আক্রমণে আবিসিনিয়া এবং আফ্রিকার লিবিয়া প্রভৃতি উপনিবেশকে বিপন্ন করিবার সাহসও ইটালীর সহসা হইবে না। ইটালী হয়ত গোপনে গোপনে যুদ্ধ হইতে তফাতে থাকিয়া জার্ম্মানীর পক্ষ লইয়া মধ্যস্থতা করিতে আগাইয়া যাইবে, এই আশায় আছে, কিন্তু এইরূপ চুক্তি বা মধ্যস্থতার মূলীভূত দৌর্ব্বল্য বিশ্বজগৎ উপলব্ধি করিয়া লইয়াছে। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকে বলি দিয়া তেমন মধ্যস্থতায় স্বীকৃত হওয়া ইংরেজ এবং ফরাসীর বিঘোষিত নীতির সম্পূর্ণই বিরোধী হইবে।

পুস্তক পরিচয়

Europe Asks: Who is Shree Krishna—Letters written to a Christian friend.—স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। নিউ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, কলিকাতা ৯।৭।সি প্যারীমোহন সুর লেন হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, আলোচ্য পুস্তকখানির প্রতি পৃষ্ঠা সেই পাণ্ডিত্যের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যে ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি হয় না, অনুভূতির প্রয়োজন হয়। স্বর্গীয় পাল মহাশয় সাধনার দিক হইতে এই অনুভূতি নিজের জীবনে কতখানি লাভ করিয়াছিলেন, পাঠকগণ এই পুস্তকে সে পরিচয়ও লাভ করিবেন। পাল মহাশয় অবতার-বাদ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভগবানত্বকে তত্ত্বের দিক হইতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি নির্ভেদ ব্রহ্মবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত সমর্থন করিয়া—'ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার', ব্রহ্ম শব্দে কহে—পূর্ণ স্বয়ং ভগবান স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ' এই তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 'অপাণিপাদ' শ্রুতি বর্জ্জে—প্রাকৃত পাণিচরণ তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার' পাল মহাশয়ের এই মত। ব্রহ্মসূত্রের যে ব্যাখ্যা মহাপ্রভু করিয়াছিলেন পাল মহাশয় তাহারই অনুসরণ করিয়া অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব এবং লীলাতত্ত্বের নিগূঢ় রস উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার দার্শনিকী প্রতিভাকে প্রস্ফুট করিয়াছেন। ভগবৎতত্ত্ব কি বস্তু এবং ষড়ৈশ্বর্য্য কাহাকে বুঝায় ও সেই ষড়ৈশ্বর্য্যের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্বন্ধ কি, দিব্য দেহের স্বরূপ কি—এই সব তত্ত্বকে তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট করিয়া জীবের সনাতনত্বকে বৃন্দাবন লীলার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই একখানি গ্রন্থের ভিতর ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ ঈশ্বরতত্ত্ব, গীতার ঈশ্বরবাদ এবং বৈষ্ণব কবির অখিল রসামৃতানুভূতির রসসারের পরিচয় অপূর্ব্ব প্রাঞ্জলতার সঙ্গে পাঠকদিগকে দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানা সমগ্র ভারতীয় দর্শনতত্ত্বের নিষ্কর্ষ বলা যাইতে পারে; লেখার বিশিষ্টতা হইল ইহার সরল সহজ বর্ণনাভঙ্গী এবং পারিভাষিক দুরূহতা এড়াইয়া তত্ত্ব-বস্তুকে সহজ বুদ্ধির পক্ষেও উপভোগ্য করিবার অপূর্ব্ব কৌশল। পাল মহাশয়ের এই পুস্তকখানি মানবের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অন্তর্নিহিত রসসাধনাকে বিশ্ব জগতের কাছে যেভাবে তিনি আলোচ্য পুস্তকের ভিতর দিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে বাঙালী শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার স্মৃতিকে স্মরণ করিবে। আধ্যাত্মরস-পিপাসুদের পক্ষে পুস্তকখানা পরম আদরণীয় বস্তুস্বরূপে পরিগণিত হইবে।

মরুর মাঝারে বারির ধারা—শ্রীমাণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য এক টাকা আট আনা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সহপাঠী, গুরুদক্ষিণা, নিয়তি, রেখার অনুভূতি, সাবিত্রীর প্রায়শ্চিত্ত—পুস্তকখানাতে এই কয়েকটি গল্প আছে। গল্প কয়েকটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

অন্তরালে

(বড় গল্প)

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

একে ত দামিনীর কতকগুলি অদ্ভুত আচরণে আমরা পূর্ব্ব হইতেই বিস্মিত হইয়াছিলাম; তাহার উপর সেদিন সে যখন প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা ব্যয় করিয়া গরীব-দুঃখীদিগকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইল, এবং তাহাদিগকে যথাসাধ্য বস্ত্র দানও করিল, তখন আমাদের বিস্ময়ের যেন আর সীমা রহিল না।

গৃহিণী বলিলেন,—মেয়েটার সবই অদ্ভুত!

'তা বটে।' —আমি গৃহিণীকে সমর্থনই করিলাম,—'কিন্তু এ-সবের মধ্যে যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য লুকিয়ে আছে, তাতে আর ভুল নেই।'

গৃহিণীও আমার কথা মানিয়া লইলেন; বলিলেন—কিন্তু জিজ্ঞেস করলে ত কোন কিছু বলতে চায় না বাপু! যতই অনুরোধ করি, চুপ করেই থাকে! আবার কখনো কখনো কেঁদেও ফেলে।

'আশ্চর্য্য!' —আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম,—'ওর জন্যে আমার মাঝে মাঝে ভারী কষ্ট হয়! কিন্তু কি করবো? স্বেচ্ছায় যদি কেউ দুঃখ ভোগ করে, তাহলে আর বলবার কিছুই নেই। এবার কিন্তু ওর ভেতরের ব্যাপারটুকু আমায় জানতেই হবে। আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না।'

'আমারও হয়েছে ঠিক তাই।' —গৃহিণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—'কিন্তু আমার অনুরোধ ত ও বার বার এড়িয়ে গেছে; এখন দেখ, তোমার অনুরোধে যদি কিছু বলে।'

দামিনী আমার বাড়ীর পাচিকা। মাত্র তিন চার মাস পূর্ব্বে সে এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। যেদিন প্রথম সে এখানে আসিয়াছে, সেইদিন হইতেই দেখিতেছি, সে দিবা-রাত্রির মধ্যে একবার মাত্র আহার করে, শুধু ভাত আর তাহার সহিত যা' হোক কিছু একটা মোটা নিরামিষ তরকারী। একটার বেশী তরকারী, ডাল কিম্বা দুধ-মিষ্টি, কিম্বা রুটি-লুচি ইত্যাদি সে কিছুই খাইতে চায় না এবং খায়ও না। ভাতও আবার সে কোন বাসনের উপরে না খাইয়া শাল কিম্বা কলাপাতার উপর খাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ব্রত-উপবাস ত তার লাগিয়াই আছে! তাহা বুঝি বা পঞ্জিকার তালিকাকেও ছাপাইয়া যায়! সম্প্রতি পৌষ মাস চলিতেছে, দারুণ শীত পড়িয়াছে! কিন্তু এত বেশী শীতের দিনেও সে একটিমাত্র চাটাই পাতিয়া শয়ন করে এবং একখানি দেশী কম্বল গাত্রাবরণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। তোষক, লেপ, এমন কি একটা বালিশ পর্য্যন্ত সে লইতে চায় না।

দামিনী অবশ্য বিধবা,—বামুনের মেয়ে। ব্রহ্মচর্য্য পালন সে করিতে পারে। কিন্তু তাহার ঐ স্বেচ্ছাকৃত কঠোর দুঃখ-কষ্ট ভোগের নাম কি ব্রহ্মচর্য্য পালন? খাওয়া-দাওয়া বা অন্য কোন কিছুর জন্য যদি তাহাকে নিজের পয়সা খরচ করিতে হইত, তবু না হয় বুঝিতাম, সে কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া অর্থ-সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেছে।...... কিন্তু আমার সংসার হইতেই যখন সে সমস্তই পায়, তখন তাহার ঐ দুঃখ বরণকে কৃচ্ছ্র-সাধন বলিয়া ত মনে হয় না! তাহা ছাড়া, অতি কষ্টে উপার্জ্জিত এবং সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া, 'দরিদ্রনারায়ণের' সেবা করিবার মত মহান্ প্রেরণাই বা সে কোথা হইতে লাভ করে? পাচিকাবৃত্তি যাহার জীবিকা, তাহার পক্ষে ঐ কার্য্য কি নিতান্তই অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব নয়?

—অধীর আগ্রহে আমি দামিনীকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

দুই তিন দিন পরের কথা; —বেলা তখন তিনটা কি সাড়ে তিনটা, হাতে কোন কাজ না থাকায় সেদিনকার খবরের কাগজটা লইয়া পড়িতে বসিলাম। সহসা, কি একটা প্রয়োজনে দামিনী সেখানে প্রবেশ করিল। অমনি সুযোগ বুঝিয়া কাগজটা পাশে সরাইয়া রাখিয়া ডাকিলাম, দামিনী, শোন!

দামিনী আমার সম্মুখে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—'কি বলছেন বাবা!'

'দেখ, দামিনী,' —আমি সস্নেহেই বলিলাম,—'তোমার ভাব-গতিক আমাদের কাছে ক্রমশই ভারী দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠছে! তোমার 'মা-ঠাকরুণ' তোমাকে সে সম্বন্ধে অনেকবার অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছেন, কিন্তু তুমি তাঁকে কিছুই বলনি। আর তিনিও তোমায় বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন নি। কিন্তু আমি তোমায় ছাড়বো না। জগতে প্রত্যেক কাজের মূলে একটা কিছু কারণ আছে; অ-কারণ কিছু হতে পারে না। তুমি যেভাবে তোমার জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে যাচ্ছ, তার পেছনেও নিশ্চয়ই কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। যা' হোক, আজ সেটুকু তোমায় খুলে বলতে হবে।'

ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দামিনী একবার আমার মুখের দিকে তাকাইল। দেখিলাম, ইতিমধ্যেই তাহার চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে! আমি আরও একটু উদ্বিগ্ন হইয়া আবার বলিলাম,—'বলো, কোন ইতস্তত করবার কারণ নেই। তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট এবং আমি তোমার মনিব; সুতরাং তুমি আমার মেয়ের সমান। বাপের কাছে লজ্জা কি? তুমি যে অনবরতই একটা গভীর ব্যথা বুকের মাঝে চেপে রেখেছ, এ আমি বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু কি সে ব্যথা?

দামিনীর মুখে এইবার কথা ফুটিল। করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া সে বলিল,—'বাবা, আপনার অনুমান ভুল নয়। আমি নিতান্তই হতভাগিনী! তবে আমার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আর আপনার শুনে কাজ নেই। সে অনেক কথা, আপনার—'

দামিনী আমাকেও এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে বুঝিয়া আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম,—'না, না কোনো ওজরই আমি শুনব না তোমার। আমার কৌতূহল এতই বেড়ে গেছে যে, যতক্ষণ তুমি তোমার জীবনের ইতিহাস আমায় না বলবে, ততক্ষণ আমি আর স্থির হতে পরব না। আমার মনের অবস্থা বুঝে কাজ কর।'

দামিনী কি যেন ভাবিতে লাগিল। বুঝিলাম,—গৃহিণীকে এড়াইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিলেও, আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে সে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে। তাহা

ছাড়া, আমি যেভাবে অনুরোধ করিয়াছি, তাহাতে নেহাত অপ্রকাশ্য না হইলে সে আমাকে এড়াইয়া যাইতে পারিবে না। আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দামিনী উত্তর দিল, —আচ্ছা, আমি মা-ঠাকরুণের কাছে সব কথা বলবো। তাঁর মুখ থেকে আপনি শুনবেন।

আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আমার কাছেই বলুক, আর গৃহিণীর কাছেই বলুক,—সমান কথা। হয়ত তাহার বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা পুরুষ মানুষের সম্মুখে বলিতে তাহার লজ্জা হয়। সুতরাং সে সম্বন্ধে তাহাকে পীড়াপীড়ি না করাই সমীচীন বুঝিয়া বলিলাম,—ভাল কথা, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আজই বলতে হবে।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া দামিনী মৃদুকণ্ঠে বলিল,—'আচ্ছা, তাই বলবো।' বলিয়াই সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অতঃপর নিজের জীবন সম্বন্ধে গৃহিণীর নিকট দামিনী যে বিশদ পরিচয় দান করিল, তাহা দামিনীর কথাতেই বলিতেছি :—

"আমি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা। বিবাহ আমার বেশ অবস্থাপন্ন ঘরেই হইয়াছিল। আমার শ্বশুরের তিন পুত্র। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রবধূ। তিন পুত্রকেই তিনি ভালরূপে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন।

শিক্ষা শেষ করিয়া জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম উভয়েই এক একটা চাকরীতে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং ভাল উপার্জ্জনও করিতে লাগিলেন। আমার স্বামী কিন্তু চাকরী করিতে চাহিলেন না।

তিনি পিতাকে বলিলেন, আমি পরের দাসত্ব করবো না। আমাকে কিছু মূলধন দিন, আমি ব্যবসা করবো।

বাঙালীর ঘরে ব্যবসায়ের কথা উঠিতেই সকলে যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন এবং এমন ভাব প্রকাশ করিলেন যে, আমার স্বামী যেন একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিতে চলিয়াছেন।

আমার শ্বশুর বলিলেন,—ও-সব বাজে কথা রাখ্। একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা দেখে ঢুকে পড়্। বাঙালীর ধাতে ও ব্যবসা-ট্যাবসা সইবে না।

'কেন সইবে না বাবা!'—আমার স্বামী দৃঢ়কণ্ঠেই প্রতিবাদ করিলেন, 'আর সকলেই যদি ব্যবসা করে লাভবান হতে পারে,—বাঙালীই বা পারবে না কেন? দাসত্ব জিনিষটা আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে বলেই আমরা ব্যবসার নাম শুনলে ভয় পাই। লোটা-কম্বল সার করে অন্য দেশের লোক এই বাঙলা মুলুকে এসে, অবশেষে বিরাট কারবার ফেঁদে বাঙালীকেই কেরাণী রাখছে।

আমার শ্বশুর উত্তর দিলেন,—ও-সব কথা সভা-সমিতিতেই চলে আসছে, কিন্তু কথামত কাজ করতে কাউকে বড় দেখা যায় না। তোর মত অনেক ছেলেকেই প্রথম প্রথম নানা জল্পনা-কল্পনা করতে দেখেছি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই চাকরীকেই তাদের সার করতে হয়েছে। তোর বেলায় কি আলাদা কিছু হবে? ও-সব মতলব ছেড়ে—যা' বলছি তাই কর।

আমার দুই ভাশুরই তখন কিসের একটা ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছিলেন। ছোট ভাইয়ের প্রস্তাব তাঁহাদেরও ভাল লাগিল না। পিতাকে সমর্থন করিয়াই তাঁহারা ভ্রাতাকে বলিলেন, ওহে, ব্যবসা করে আর ধনী হতে হবে না! বাবা যা' বলছেন,—তাই কর। অনর্থক কতকগুলো টাকা কেন বরবাদ করবে?

তাঁহাদের কথায় যে তীব্র বিদ্রূপ মিশ্রিত ছিল, তাহা আমার স্বামী বুঝিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না।

অগত্যা আমার শ্বশুর তাঁহাকে তাঁহার প্রস্তাবমত দুই হাজার টাকা মূলধন দিয়া বলিলেন,—'নগদ টাকা ঘর থেকে এমনভাবে বের করে দেবার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না। কিন্তু তুমি নাছোড়বান্দা! যা হোক, আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি, —ব্যবসায়ে লোকসান আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

আমার স্বামী আনন্দিতচিত্তেই টাকাগুলি গ্রহণ করিলেন এবং তিন চার দিন পরেই মানভুম অঞ্চলে গিয়া চাউলের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন প্রবেশ করিলেও তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইল না। যেহেতু পাঠ্যাবস্থায় তিনি নানাবিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞান এখন তাঁহার ব্যবসায়-পরিচালনে সাহায্য করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম তিনি বেশ সুফলও দেখাইতে লাগিলেন। দেখিয়া শুনিয়া আমার শ্বশুর সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু ভাশুরদের মন যেন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাঁহারা প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সহিত বলিলেন,—দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

কিন্তু জল যেখানে দাঁড়াইল, —তাহার জের আজিও চলিতেছে! অদৃষ্ট এমনই মন্দ যে, চার বৎসরের মধ্যেই ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ লোকসান দিয়া আমার স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! আমি ভাবিয়াই পাইলাম না যে, তাঁহার ন্যায় চতুর, হিসাবী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিরূপে এমনভাবে সমস্তই খোয়াইয়া বসিলেন! কিন্তু পরে তাহার কারণ বুঝিলাম।

মানভূমের যে অঞ্চলে তিনি ব্যবসায় করিতেন, সেই অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে হঠাৎ খুবই দুর্ভিক্ষ পড়িয়া যায়। দলে দলে ক্ষুধার্ত্ত নরনারী একমুষ্টি অন্নের জন্য হা-হা করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। দরিদ্র ও আর্ত্তের প্রতি আমার স্বামীর অন্তরে বরাবরই যথেষ্ট সহানুভূতি এবং সমবেদনা ছিল। অনাহারাক্লিষ্ট নরনারীর দুঃখে কাতর হইয়া তিনি তাঁহার চাউলের আড়ৎ হইতে অনেককেই চাউল দান করিতে আরম্ভ করেন। এমন কি, কিছুদিনের জন্য একটি ছোটখাটো অন্নছত্রও খুলিয়া দেন। সেখানে প্রতিদিন প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তি পেট ভরিয়া আহার করিয়া যাইত। অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, যাহারা অন্নাভাবে কষ্ট ভোগ করিতেছিল,—অথচ নিজেদের মর্যাদার দিকে চাহিয়া ভিক্ষায় বাহির হইতে পারে নাই, এবং কাহারও সাহায্য

গ্রহণ করিতেও যাহারা লজ্জিত, তাহাদিগকেও তিনি ধারে অনেক চাউল বিক্রয় করিয়াছিলেন। অবশ্য তাহার মূল্য বাবদ একটি পয়সাও তাঁহার হাতে আসে নাই।

—এই সব কারণে, তাঁহার ব্যবসায় ত দারুণভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার উপর—পর বৎসর এই অঞ্চলে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হওয়ায়, হঠাৎ চাউলের দরও খুব নামিয়া যায়। বেশী দরে কিনিয়া রাখা চাউল তাঁহাকে কম দরেই ছাড়িয়া দিতে হয়। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত খোয়াইয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে হয়।

আমার শ্বশুর কিন্তু নীরবে এত বড় একটা লোকসান সহ্য করিলেন না; এবং তাহা যে তিনি করিবেনই না, ইহা ত পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যথেচ্ছা অপমান ও তিরস্কার করিয়া পুত্রকে বলিলেন,—আমার বাড়ী থেকে এই দণ্ডেই তুমি বেরিয়ে যাও। আমি প্রথমেই তোমায় বার বার সাবধান করেছিলাম। যতদিন ঐ দু'হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ করতে না পারবে, আমার বাড়ীতে ততদিন তোমার স্থান নেই।

আমার স্বামী আর কি করিবেন? অন্তরের যে মহৎ প্রেরণার বশে ক্ষুধার্ত্তের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া তিনি ব্যবসায়ে লোকসান দিয়াছেন; পাই-পয়সার জন্যে যেখানে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, সেই সংসারে তাঁহার ঐ প্রেরণার মূল্য ত কেহ বুঝিবে না? তিনি নীরবে এবং নতমস্তকে পিতার সকল অপমান ও তিরস্কার সহ্য করিতে লাগিলেন।

আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অন্তরে পুত্রের জন্য একটু করুণার সঞ্চার হইল বটে; কিন্তু তাঁহার করিবার কিছুই ছিল না। যেহেতু সংসারের গৃহিণী বলিতে তাঁহাকে বুঝাইলেও—শ্বশুরের কঠোর শাসন-নীতির ফলে তিনি একজন তৃতীয় ব্যক্তির মতই গণ্য হইতেন; সুতরাং তাঁহার কথা বাদ দেওয়াই ভাল।

ইহার পর পূজার বন্ধে আমার দুই ভাশুর যখন বাড়ী আসিলেন, তখন আমার স্বামীর পক্ষে এবং সেই সঙ্গে আমার পক্ষেও গৃহে বাস করা যেন প্রমাদ হইয়া উঠিল! ভাশুরেরা পাইয়া বসিলেন আমার স্বামীকে এবং জায়েরা পাইয়া বসিলেন আমাকে। ওঃ, সে যে কি অপমান ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সুরু হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই! প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্তে উঠিতে-বসিতে, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহিয়া সহিয়া আমাদের উভয়েরই অন্তরে যেন ঘূণ ধরিয়া গেল!

মানুষের প্রাণে আর কত সয়?

আমার স্বামী ক্রমেই অধৈর্য্য ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। একদিন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তিনি আমায় বলিলেন,—'আমি আর এই অপমান আর গঞ্জনা সয়ে সয়ে এখানে থাকতে পারছি না। তাই মনস্থ করেছি, কালই বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। তারপর যতদিন ঐ টাকা দু'হাজার ফিরিয়ে দিতে না পারব—ততদিন আর বাড়ী ফিরব না।

প্রস্তাব শুনিয়া আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল! তবু তিনি বাড়ীতে থাকায় তাঁহার দিকে চাহিয়া অপার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যেও আমার দিন একরূপ কাটিতেছিল। আবার তিনি চলিয়া গেলে আমার কি দশা হইবে! অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম,—না, না, ও-রকম মতলব বাদ দাও। বাড়ীতে থেকে কাজ-কর্ম্মের চেষ্টাই দেখ। কি আর করবে? অদৃষ্ট বিরোধী হলে হাতীর মাথায়ও ভেকে লাথি মেরে যায়! আর যদি বাড়ীতে টি'কতে নাই পার,—আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। দু'জনে কোথাও কুঁড়ে বেঁধে থাকব। তাতেও এর চেয়ে ঢের শান্তি আছে। দুটো পেট একরকম করে চলে যাবে। লেখাপড়া শিখেছ,—ভাবনা কি?

স্বামী উত্তর দিলেন,—না, ভাবনা কিছু করছি না। জীবনে প্রথম কাজে নেমে ব্যর্থ হয়েছি বলেই যে, সারা জীবনটাই বিফল হবে, তার কি মানে আছে? আর এ ব্যর্থতা আমি ইচ্ছা করেই ডেকে এনেছি। তবু সান্ত্বনা যে, আমার ব্যর্থতা অনেক ক্ষুধার্ত্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছে। একে লোকসান না বলে প্রচুর লাভ বলাই সঙ্গত। কিন্তু সংসারের কেউ ত সে-দিক দিয়ে আমার কাজ বিচার করবে না। কাজেই লোকসান দিয়ে এসেছি, এইটাই মেনে নিতে হবে। তবে মানুষের ধৈর্য্যেরও ত একটা সীমা আছে? ক্ষতি করে ফেলেছি বলেই যদি সংসারের সব্বাই আমাদের এমন বিষ দৃষ্টিতে দেখে,—এমন কি, স্নেহ-প্রীতির মধুর সম্পর্কটুকুও ভুলে যায়, তবে যাতে করে সেই ক্ষতিপূরণ করতে পারি, তাই করা দরকার। কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে, সে-টা নিতান্তই অশোভন এবং কাপুরুষের কাজ হবে।

"কিন্তু আমি যে এই লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে তোমায় ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারব না।" —আমি বাষ্পাকুলকণ্ঠেই বলিলাম,—"আর যতদিন টাকা দু' হাজার ফিরিয়ে দিতে না পারবে, ততদিন বাড়ী ফিরবে না,—এই বা তোমার কেমন কথা?"

স্বামী সস্নেহে বলিলেন,—সেজন্যে ভেব না, লক্ষ্মী! ভগবান দিলে দু'হাজার টাকা হতে কতক্ষণ, সামান্য দু'হাজার টাকার জন্যে নিজে এই গঞ্জনা সহ্য করব তোমাকেও এই দারুণ অশান্তির মধ্যে ফেলে রাখব—এইটাই কি তোমার কাম্য? বড় জোর একবৎসরের মধ্যেই আমি বাড়ী ফিরে, সকলের মুখ বন্ধ করে দেব। এই একটি বছর একটু সয়ে রয়ে থেক, তুমি আমার কাজের সহায় হও।

আমার মন কিন্তু মানিল না। তাহার পরও আমি তাঁহাকে সংকল্প-চ্যুত করিতে অনেক চেষ্টাই করিলাম; কিন্তু পুরুষ মানুষ তিনি, অপমানের জ্বালা তাঁহাকে এতই জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি কিছুতেই আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। পুনরায় আদর করিয়া বলিলেন, "ভেব না, আমি যেখানেই থাকি, তোমাকে মাঝে মাঝে পত্র দেব। তবে বাড়ীর ঠিকানায় দেব না; তোমার নামে সন্তোষদা'র 'কেয়ারে' দেব। তুমি সন্তোষদার বাড়ী ত প্রায়ই যাও; সুতরাং পত্র পেতে তোমার কোন অসুবিধাই হবে না।"

সন্তোষদা' অর্থে পাড়ার সন্তোষকুমার রায় আমার স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি আমাকে সহোদরার মতই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। আমিও তাঁহাকে নিজের দাদার ন্যায়

ভক্তি করিতাম। এক কথায় তিনি আমাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই 'দাদা' ছিলেন। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে তিনি ছিলেন আমাদের প্রধান সহায়।

যাই হোক, স্বামী যখন কিছুতেই নিজের প্রতিজ্ঞা হইতে টলিলেন না; তখন চোখের জলে ভাসিয়া তাঁহাকে বিদায় দিতেই বাধ্য হইলাম। বিদায়ের সময় তিনিও অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার এক এক ফোঁটা অশ্রু যেন আমার বুকের এক একখানে পাঁজর দীর্ণ করিয়া দিল!

●

একদিন দুইদিন করিয়া পনের-ষোলটি দিন চলিয়া গেল, স্বামীর কোন সংবাদই পাইলাম না। আমি এতই ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম যে, দিনের মধ্যে তিনবার করিয়া সন্তোষদার বাড়ী ছুটিতে লাগিলাম। কিন্তু বিফল! যতবার যাই, সন্তোষদা' ক্ষুণ্ণমনে বলেন,—"না, কোন পত্র আসে নি।" সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনাও দেন, —'তা' অত ব্যাকুল হচ্ছিস কেন বোন্? একটা ঠাঁই-ঠিকানা করে নিয়ে, তবে ত চিঠি-পত্র লিখবে? ভাবিস না, সে ভালই আছে, আর দু'চারদিনের মধ্যে পত্রও এসে পড়বে।" সন্তোষদার স্ত্রী-ও আমাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করেন; বলেন,—পুরুষ মানুষ বাইরে গেছেন, তার জন্যে কি এতটা উতলা হয় বোন্? এই যে যখন মান-ভূমে ব্যবসা করতেন, তখন কি তাঁকে ছেড়ে থাকতিস না? মন স্থির কর, ভগবান মঙ্গলই করবেন।

আমার মন কিন্তু স্থির হইতে চাহিত না; বলিতাম,—দিদি, তাঁকে ছেড়ে যে কখনো থাকি নি, তা নয়; কিন্তু তখন মন আমার এত চঞ্চল হয়নি। এবার বিদায় দিয়ে অবধি প্রাণে যেন আগুন জ্বলে উঠছে! কি প্রতিজ্ঞা করে গেছেন, শুনেছ ত, দিদি? —বলিতে বলিতে আমি কাঁদিয়াই ফেলিতাম।

সন্তোষদার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া বলিতেন, —থাম, থাম, কাঁদিস না; সত্যিই ভারী ছেলেমানুষ তুই। প্রতিজ্ঞা করে গেছেন ত কি হয়েছে? পুরুষ মানুষের উপযুক্তই কাজ করেছেন; আর শীগ্‌গিরই তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তুই একটু সয়ে রয়ে থাক বোন!"

আমি আর কি করিব? চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম।

এমনইভাবেই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। স্বামীর কোন সংবাদই আসিল না। আশ্চর্য্যের বিষয়,—বাড়ীর কাহার মনে আমার স্বামীর জন্যে কোন প্রকার চিন্তা দেখিলাম না। তবে একথা স্বীকার না করিলে পাপ হইবে যে, আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী প্রায়ই পুত্রের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতেন। তাঁহার মাতৃপ্রাণ বোধ হয় কিছুতেই পুত্রের প্রতি বিরূপ হইতে পারিত না।

দেখিতে দেখিতে দুইটি মাস চলিয়া গেল। একদিন মনটা খুব চঞ্চল হইয়া উঠায় হাতের কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়াই সন্তোষদার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়াই সন্তোষদাদা ঈষৎ হাস্যে বলিলেন,—আয়, আয়, আজ 'ভায়ার' পত্র এসেছে, একখানা তোর নামে, একখানা আমার নামে।"—বলিয়াই তিনি আমার পত্রটি আমার দিকে ঠেলিয়া দিলেন।

যাহা পাইবার আশায় আজ দুই মাস প্রতি মুহূর্ত্তেই আকুল হইয়া উঠিয়াছি, তাহা হাতে পাইয়া আনন্দে ও উদ্বিগ্নতায় আমার বুকের স্পন্দন বাড়িয়া গেল। কম্পিত হস্তে তাড়াতাড়ি খামখানি কুড়াইয়া লইয়া, খামের মুখ ছিঁড়িয়া পত্রখানি বাহির করিয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলাম। কিন্তু পত্র পাইয়া যেমন আনন্দিত হইয়াছিলাম, তাহা পড়িয়া আবার তেমনি বিষণ্ণ হইতে হইল! স্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম,—"অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ। অনেক চেষ্টা করিয়াও এমন কিছু যোগাড় করিতে পারি নাই, যাহাতে দুই হাজার টাকা দুই এক বৎসরের মধ্যে সঞ্চয় করিতে পারি। যে দাসত্বকে একদিন বড়ই ঘৃণা করিয়াছিলাম, আজ একান্ত বাধ্য হইয়া তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। বেতন মাসিক ষাট টাকা করিয়া হইয়াছে। নিজে যথাসম্ভব কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকিয়াও যত শীঘ্র সম্ভব টাকাটা জমাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এইভাবে তিন বৎসরের মধ্যেও বুঝি-বা উদ্দেশ্য সফল হইবে না। যাহা হউক, চিন্তা করিও না। হঠাৎ কোন দিক দিয়া উন্নতি ঘটিয়াও যাইতে পারে। তোমাদের সংবাদ দিও; আমি ভাল আছি। বাবা ও মায়ের কুশল দিবে।"

আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। পত্রের উপরে লিখিত ঠিকানা হইতে বুঝিলাম, তিনি কটকে আছেন। উঃ, কোথায় বর্দ্ধমান, আর কোথায় কটক! সে কতদূর! ঐ দূর বিদেশে তিনি কত কষ্ট সহ্য করিয়াই না আছেন! আর এইভাবে এখনো তিন বৎসরেরও বেশী তাঁহাকে সেখানে থাকিতে হইবে। ইতিমধ্যে তিনি একবারও বাড়ী আসিবেন না! হায়, এত দীর্ঘ দিন তাঁহাকে না দেখিয়া কেমন করিয়া থাকিব? মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসিতেই বা দোষ কি?—ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ যেন হাহাকার করিয়া উঠিল! যাই হোক, তবু তিনি ভাল আছেন জানিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। এবং পরদিনই মনের সমস্ত কথা খুলিয়া লিখিয়া তাঁহার পত্রের উত্তর দিলাম। সন্তোষদাদাও তাঁহাকে পত্র লিখিলেন।

উত্তরের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন বিপুল উদ্বিগ্নতার মধ্যেই কাটিতে লাগিল। কিন্তু হায়, ক্রমে ক্রমে আবার তিনটি মাস চলিয়া গেল, —স্বামীর আর কোন পত্রই পাইলাম না। ইতিমধ্যে আমাদের সংসারে একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কয়েকদিন সন্দিজ্বরে ভুগিয়া মারা পড়িলেন। যতই হোক মা! স্বামীর নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়াও আমি শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মৃত্যু সংবাদ দিয়া তাঁহাকে পুনরায় একখানি পত্র লিখিলাম; এবং নানা কারণ দেখাইয়া তাঁহাকে বাড়ী আসিবার জন্যও বারবার অনুরোধ করিলাম।......

প্রায় এক মাস পরে সে পত্রের উত্তর আসিল। স্বামী লিখিয়াছেন,- "তোমার পত্র পাইলাম। ইতিপূর্ব্বেও তোমার

(শেষাংশ ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস

পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস আক্রান্ত হইয়াছে। পোল্যাণ্ড বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়েছে এবং নগরের উপকণ্ঠভাগ হইতে জার্ম্মানদিগকে হটাইয়া দিয়াছে। ফ্রান্স কিংবা জার্ম্মানীর সীমান্ত দেশ যেরূপ সুরক্ষিত, পোল্যাণ্ডের সীমান্ত দেশ তেমন সুরক্ষিত নয়, ইহা ছাড়া জার্ম্মান সৈন্যদের সংখ্যাবল পোলদের চেয়ে দল লম্বা লাইন ধরিয়া লড়াই চালাইতেছিল, এখন সে লাইন ছোট করিয়া লইয়া অনেকটা কেন্দ্রীভূতভাবে শক্তিপ্রয়োগ করিয়া জার্ম্মানীকে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছে। মার্শাল স্মীগলী রীজ পোলদের প্রধান সেনানায়ক। ইনি রণ-নিপুণ যোদ্ধা। গত মহাসমরের সময় ১৯২০ সালে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ইনি লড়াই করিয়াছিলেন। এই সময় ৬ শত মাইল
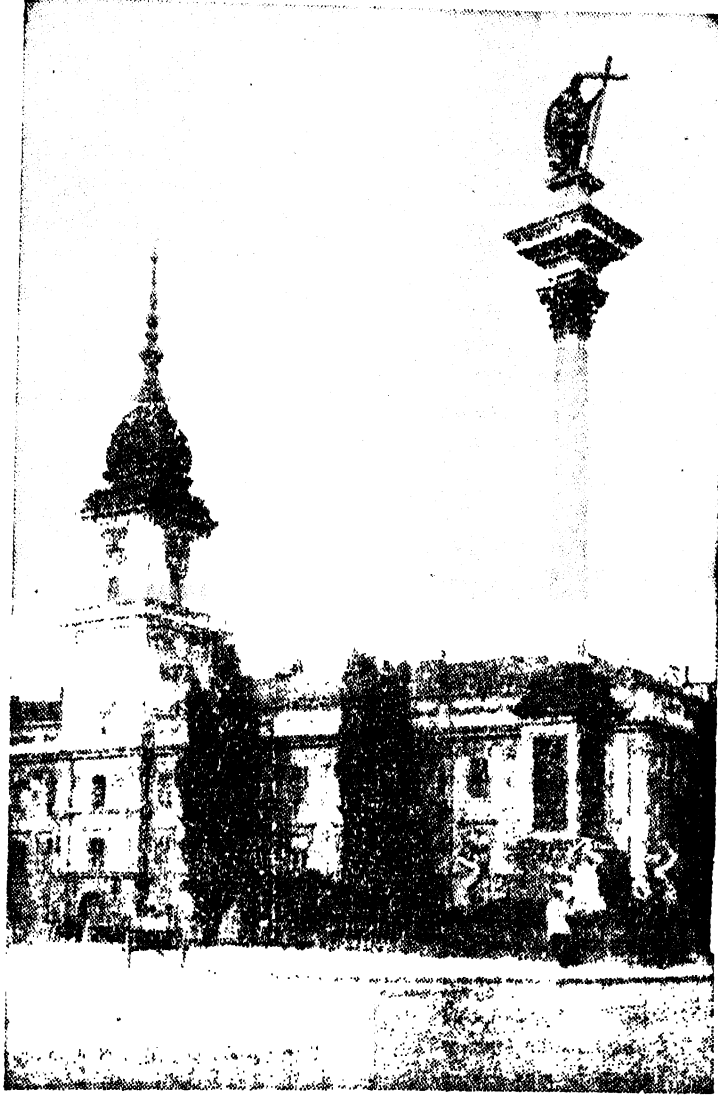
প্রাচীন পোল রাজাদের প্রাসাদ

অনেক গুণ বেশী। জার্ম্মানেরা ত্বরিত গতিতে যেমনভাবে পারে পোল্যাণ্ডের ভিতর ঢুকিয়া পড়িতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের ধারণা হইয়াছে এই যে, পশ্চিম সীমান্ত প্রবলভাবে ইংরেজ এবং ফরাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে যদি তাহারা পোল্যাণ্ড দখল করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে হয়ত সন্ধির একটা কথা উঠিবে। কিন্তু তাহাদের সে আশা সুফল হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পোল সৈন্য-পশ্চাদপসরণ করিবার পর তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পুনরাক্রমণ করেন এবং বিজয়ী হন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও পোল সৈন্যেরা সেইরূপ নীতি অবলম্বন করিতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। পশ্চিম সীমান্ত ফরাসী এবং ইংরেজ প্রবলভাবে আক্রমণ করিলে পোল্যাণ্ডের ভিতরে যে সব জার্ম্মান সেনা ঢুকিয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগের বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা বেশী রহিয়াছে। গত ৬ই সেপ্টেম্বর পোল গবর্ণমেণ্ট

ওয়ারস হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

ওয়ারস পোল্যাণ্ডের রাজধানী এবং ওয়ারস প্রদেশের প্রধান শহর। এই জেলার আয়তন ৪৬ বর্গ মাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা ১০০২,১৯৬। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন ইহুদী, অবশিষ্ট পোল। ওয়ারস শহর ভিশ্চুলা নদীর বাম তীরে অবস্থিত এবং রেলপথে এই শহর বার্লিন হইতে ৩৮৭ মাইল পূর্ব্বে এবং লেনিনগ্রাড হইতে ৬৯৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ওয়ারস এই শহরটি মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঠিক কোন সময় এই নগরীর প্রতিষ্ঠা হয় জানা যায় নাই। ঐতিহাসিক এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে মাজোভিয়ার ডিউক কোন্‌রাড নবম শতাব্দীতে এই স্থানে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ক্যাশিমির ১১ শতাব্দীতে এই স্থানটিকে সুরক্ষিত করেন; কিন্তু ১২২৪ সালের পূর্ব্বে ওয়ারস এই শহরটি তেমন উল্লেখযোগ্য খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওয়ারস মাজোভিয়ার ডিউকদের আবাসস্থান ছিল; কিন্তু পরে এই রাজবংশের পতন ঘটে এবং মাজোভিয়া পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার পর পোল্যাণ্ড এবং লিথুনিয়া যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং ওয়ারস রাজধানী হয়। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে সুইডেন এই শহরটি দখল করে; কিন্তু পোলেরা পর বৎসরই উহা পুনরাধিকার করিয়া লয়। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর সুইডেনের রাজা চার্লস শহরটি আবার দখল করেন, কিন্তু পর বৎসরই ওয়ারস পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পোলদের সঙ্গে সুইডেনের এইরূপে বিগ্রহ চলিতে থাকে। এই সুযোগে রুষিয়া পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে আসিয়া ঢুকে এবং ১৭৬৪ সালে রুষেরা ওয়ারস অধিকার করিয়া লয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রুষদের প্রতাপে পোল্যাণ্ডের অঙ্গ প্রথম ব্যবচ্ছেদ হয়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রুষদের সঙ্গে পোলদের আবার লড়াই বাধে এবং ভীষণ সংগ্রামের পর রুষেরা ওয়ারস দখল করে। ইহার পর তাহারা প্রুশিয়াকে শহরের দখল দেয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ানের সৈন্যদল ওয়ারস দখল করে এবং টিলসিটের সন্ধির পর ওয়ারসকে স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু ১৮০৯ সালের ২১শে এপ্রিল অষ্ট্রিয়ানেরা ওয়ারস অবরোধ করে এবং কিছু সময়ের জন্য অষ্ট্রিয়ানদের হাতে থাকিবার পর ওয়ারস পুনরায় স্বাধীন হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী রুষেরা এই শহর আবার দখল করে। ১৮৩০ সালে পোলেরা রুষদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। বৎসরাবধি কাল বিদ্রোহ চলিতে থাকে। ১৮৩১ সালে পোল স্বদেশপ্রেমিক সন্তানদের প্রচুর রক্তপাত করিয়া রুষেরা শহরটি পুনরায় অধিকার করে। ইহার পর কঠোর দমননীতি আরম্ভ হয়। বহু লোককে নির্ব্বাসন, কারাদণ্ড এবং প্রাণদণ্ড বিধান করা হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রুষদের এই নিষ্ঠুর পীড়ন নীতি চলিতে থাকে, রুষেরা জঙ্গী আইনের জোরে ওয়ারসতে নিজেদের দখল বজায় রাখে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পোলেরা প্রবল বিদ্রোহ অবলম্বন করে এবং স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালায়; ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ ব্যাপক হইয়া উঠে কিন্তু রুষদের আধিপত্য তাহাতেও ক্ষুন্ন হয় না। সহস্র সহস্র স্বদেশপ্রেমিক সন্তান প্রাণ দান করেন এবং অনেককে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয়। জমিদারদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইতে থাকে। পোল্যাণ্ডের যত বিদ্যালয় রুষেরা বন্ধ করিয়া দেয়, গীর্জ্জার সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীদিগকে কারারুদ্ধ করে বা প্রাণদণ্ড দেয়। শাসন বিভাগের সর্ব্বত্র রুষ কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করা হয় এবং শিক্ষা বিভাগ দখল করিয়া বসে রুষেরা। বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়সমূহে জোর করিয়া রুষ ভাষা চালান হইতে থাকে।

যুদ্ধরত দেশরক্ষায় পোল সৈন্যগণ

আইন আদালতের কাজ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে রুষ ভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়। পোল্যাণ্ডের নাম পর্য্যন্ত সরকারী কাগজপত্র হইতে তুলিয়া দেওয়া হয়; স্বদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রুষিয়ার বিচার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯০৫-৬ সালে ওয়ারসতে রাজপথ রুষিয়ান শোণিত স্রোতে সিক্ত করিয়া বিদ্রোহ চালনা করিয়াছিল।

১৯১৪ সালে ওয়ারস রুষদের সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহের একটি প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানেরা ওয়ারস দখল করে এবং তাহারা এই শহরটিকে পোল রাষ্ট্রের রাজধানী করে। ১৯১৮ সালে জার্ম্মানদের যুদ্ধে পরাজয়ের পর মিত্রশক্তি ভার্সাইয়ের সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে পোল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা দান করেন এবং তদবধি এই শহর স্বাধীন পোল্যাণ্ডের রাজধানী ছিল।

ওয়ারসর রাজপথগুলি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকার দ্বারা সুশোভিত—পোল অভিজাতবর্গের প্রাচীন ধরণের প্রাসাদ, বড় বড় গীর্জ্জা, মিউনিসিপ্যালিটির বাড়ীগুলি সুদৃশ্য। ওয়ারসতে কয়েকটি সুন্দর বাগিচা আছে, ইহা ছাড়া কয়েকটি স্মৃতিস্তম্ভের দ্বারাও শহরটি সুসজ্জিত। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ওয়ারসতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রুষেরা বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ করিয়া দেয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পুনরায় খোলা হয়, কিন্তু

তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোল ভাষা, সাহিত্য বা জাতীয় আদর্শের আর কোন স্থান ছিল না; উহা পুরোপুরি রকমে রুষ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বর্ত্তমানে ওয়ারসর বিশ্ববিদ্যালয় রুষ-প্রভাব বিনির্মুক্ত হইয়াছে। ওয়ারসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের খ্যাতি আছে। এই পুস্তকাগারে ৫ লক্ষ পুস্তক আছে, সুদৃশ্য-বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে এবং মানমন্দির আছে। ওয়ারসর মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষা বিশেষ উন্নত ধরণের। ইহা ছাড়া কৃষি, বর্নবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, সংগীত—এসব শিক্ষার ভাল ভাল বিদ্যালয় আছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। ওয়ারসর বৈজ্ঞানিক, এবং ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান সমিতির একদিন বিশেষ খ্যাতি ছিল, রুষেরা ঐ সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, পরে উহা পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছে। ওয়ারসর শহরতলী প্রাগা ভিশ্চুলার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত, এই স্থানের বাড়ী-ঘর বিশেষ উন্নত ধরণের। মাঝে মাঝেই এই স্থানটি জলপ্লাবিত হইয়া থাকে। রুষেরা ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থানটি ধ্বংস করিয়াছিল।

ওয়ারসর চারিদিকে পোল স্বদেশ-প্রেমিক সন্তানদের স্মৃতি বিজড়িত অনেক স্থান রহিয়াছে। রোকো নামক স্থানে ১৮৩১ সালে পোল সেনারা রুষদের হাতে পরাজিত হয়। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে প্রাগার দক্ষিণদিকে পোলেরা একটি যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ানদিগকে হারাইয়া দিয়াছিল। ভিশ্চুলার উজানে ৫০ মাইল দূরে ১৭৯৪ সালে পোল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ স্বদেশ-প্রেমিক কোসিয়াস্কো রুষদের হাতে জখম হন এবং রুষেরা তাঁহাকে বন্দী করে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি জন্ কীটস্ এই কোসিয়াস্কোর বন্দনা গান করিয়া তাঁহার কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

Good Kosciasko, thy great name alone, is a full harvest whence to reap high feeling.

কোসিয়াস্কো ধন্য তুমি, তুমিই মহান্, তোমার নাম সঞ্জীবনী শক্তির উৎসস্বরূপ।

১৯২০ সালে ভিশ্চুলা নদীর পূর্ব্ব তীরে রুষদিগকে প্রচণ্ড সংগ্রামে পরাস্ত করে।

ওয়ারস শহরটি ছয়টি ট্রাঙ্ক লাইনের দ্বারা ভিয়েনা, কিয়েভ, মস্কো, লেনিনগ্রাড, ডানজিগ এবং বার্লিনের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে। এই স্থানের ইস্পাতের ব্যবসার বিশেষ নাম আছে, রূপার পাত, জুতা, গেঞ্জী, মোজা, তামাক, চিনি প্রভৃতির কারবারও খুব জমকালো। বিগত মহাসমরের পর হইতে ওয়ারসয়ের লোকসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে পোল্যাণ্ডের আত্মদাতা সন্তান এণ্ডরু বোবলীর দেহাবশেষ বিদেশ হইতে আনয়ন করিয়া ওয়ারসতে সমাহিত করা হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে

ওয়ারস নগরীর একপ্রান্ত

ইনি আত্মদান করিয়াছিলেন। শহরের উপকণ্ঠবর্ত্তী একটি গীর্জ্জাতে তাঁহার দেহাবশেষ রক্ষিত করা হয়। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে শহর জনকোলাহলপূর্ণ ছিল, আজ পোল্যাণ্ডের এই ঐতিহাসিক স্মৃতি-সমৃদ্ধ, বহু স্বদেশ-প্রেমিক সন্তানের পদরজস্মৃত সুন্দর নগরী প্রবল শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত।

ক্রন্দসী

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

(১২)

কলিকাতায় তখন বর্ণহীন সমারোহহীন গম্ভীর সূর্যাস্ত হইতেছিল। আগেকার দিনে ইভা এ সবের দিকে মন দিত না বা তার মন এদিকে যাইত না। কিন্তু আজ কিসে যেন তাহাকে টান দিয়া ছাদের উপর লইয়া গেল। কলিকাতার বড় বড় বাড়ীগুলার আড়ালে ম্লান দীপ্তিহীন সূর্য অস্ত যাইতেছে, সেইদিকে চাহিয়া মনে পড়িয়া গেল, শ্বশুর বাড়ীতে বিকালের দিকে যখন বড় দীঘিতে গা ধুইতে যাইত, সামনের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠটায় জামগাছ গোটা কতক তেঁতুল গাছ ও অদূরবর্তী বাঁশ ঝাড়টায় সোনা মাখাইয়া সমস্ত আকাশে আরক্ত অপরূপ আভা ছড়াইয়া সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িত। সেখানে আকাশে বাতাসে জলে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার কি এক অনির্বচনীয় শান্তি ছড়াইয়া পড়িত। নিশ্বাসের সঙ্গে সে শান্তি মনের ভিতর আসন বিছাইত। অনেকদিন হইতে সন্ধ্যার সেই করুণ মধুর রূপ অনুভব করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাই আজও সন্ধ্যার সময় কে যেন তাহাকে জোর করিয়া ছাদের দিকে টানিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু এখানে ত কই সে শান্তির ভাব মনে আসে না। রাস্তায় অগণ্য আলো। পথে অবিশ্রান্ত জনকোলাহল। ট্রামের শব্দ, রিকসোর শব্দ, মোটর ছুটিতেছে তাহার শব্দ। পথচারী পথিকদের কত শব্দ। এখানে মন বিক্ষিপ্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে আরও। চোখ মুদিয়া সে যেন শুনিতে পাইল সন্ধ্যার অনাহত স্তব্ধতা ভেদ করিয়া এইবারে রাধাগোবিন্দের মন্দিরে আরাত্রিকের কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শাঁখের শব্দ উঠিতেছে ঘরে ঘরে। অথচ কলিকাতার এই বিচিত্র জনকোলাহল কর্মমুখর দিন যাপনই ত তাহার অভ্যস্ত ছিল চিরকাল। মাঝখানের এই কটা দিনই যা তাহা হইতে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আজ কিন্তু চির-পরিচিত সেই স্থানই সেই পারিপার্শ্বিকে তাহার মন বসিতেছে না। ছাদের সিঁড়িতে দ্রুত পদ শব্দ শোনা গেল। ইভার সমবয়সী দুতিনটি মেয়ে কলরব করিতে করিতে উপরে উঠিয়া আসিল। ইলা তাহার জাঠতুতো বোন, সে আসিয়াছে এবং ইভার দুজন বন্ধু অরুণা ও করুণা। ইলা রহস্যের সুরে কহিল, 'জামাইবাবুকে বোম্বেতে তুলে দিয়ে এসেই বুঝি বিরহের পালা সুরু হয়ে গেছে ভাই? একা সবাইকে এড়িয়ে ছাদে লুকিয়ে রয়েছিস। আমরা কতক্ষণ এসেছি। কাকীমা বললেন, খুঁজে দেখ, ইভা বোধ হয় ছাদে আছে। সত্যি খুব মন খারাপ লাগছে বুঝি?'

অরুণা প্রস্তাব করিল, 'তার চেয়ে নীচে চল ইভা, আজ রেডিওতে ভাল প্রোগ্রাম আছে, শোনা যাক।'

তাহাদের সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিয়া ইভা রেডিওর সুইচটা টিপিয়া দিল। একটা আধুনিক কাব্য সঙ্গীত হইতে-ছিল। তাহারই সঙ্গে নাকি সুরে সুর মিলাইয়া ইলা গাহিতে লাগিল, 'তোমার আসন পাতিব পথের মাঝে, ওগো তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে'.........গাহিতে গাহিতে একটু থামিয়া কহিল, 'এই গানটা ফলো করছি। ও রবিবার থেকে শিখতে সুরু করেছি। এখন দুএক জায়গায় খোঁচ ভাল ধরতে পারি নাই।'

অরুণা কহিল, 'ইলা এ মাসের রূপশ্রীতে জয়জয়ন্তী দেবীর 'আধুনিকা তরুণী' প্রবন্ধটা পড়েছিস?'

ইলা। "পড়িনি আবার। ভদ্রমহিলা একটি ইম্‌পার্টি-নেনট্ ফুল! কি লিখেছেন জানিস, লিখেছেন, 'আজকালকার মেয়েরা সায়া সেমিজ বডি ব্লাউজ শাড়ি ও নিত্য নানা ফ্যাশানের জুতা, ভ্যানিটি ব্যাগ, সাবান, স্নো, ক্রীমে এত পয়সা খরচ করে যে, তাহাদের বিবাহ করিয়া সেই হাতী পোষার খরচ চিরদিন চালাইতে পারিবে কি না সন্দেহে ছেলেরা বিবাহ করিতে পিছাইয়া যাইতেছে। মোটা পণ দিয়াও তাহাদের নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে'.........আমি ত পড়ে দস্তুর মত শকড্ হয়ে গেছিলাম। এর একটা প্রতিবাদ লেখা দরকার। ইভা লেখ না। তোর ত বরাবরই লেখার দিকে অল্পবিস্তর ঝোঁক আছে।'

ইভা অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, কহিল, 'কি লিখব? তাছাড়া মনে হয় যেন ওতে অনেকখানি সত্যি আছে। লেখিকা অনেক কথা ঠিকই বলেছেন।'......

তাহার কথার মাঝখানেই ইলা ও করুণা উত্তেজিত হইয়া একত্রে বলিয়া উঠিল, 'ও শেম! পাড়াগাঁয়ে বিয়ে হয়েছে সেখানে শ্বশুর বাড়ী করে এসে তুই শুধু এই অল্পদিনে এমন বদলে গেছিস? কি করে বললি এমন কথা! মানুষের সভ্যতার পরিধি যত বাড়বে তার স্টাইল অব লিভিংও সেই অনুপাতে বাড়বে। এটা ত দিবালোকের মত পরিস্কার তাই বলে সেই কথার সূত্র ধরে জয়জয়ন্তী দেবীর মত ইতর ভাষায় আধুনিক মেয়েদের গাল দেবার কোন জাস্টিফিকেসন নেই।'

ইভা বলিল, 'মানুষের সভ্যতার পরিধি বাড়ছে কি না আসলে সেইখানেই ত আমার সন্দেহ। ইলেকট্রিকের আলো পাচ্ছি সুইচ টিপলেই এবং রেডিওর মারফৎ মিহিসুরের গান শুনেছি তাই বলে যে সভ্যতার পথে আমরা অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেছি, একথা মনে করবার কোন কারণ নেই।'

ইলা এবং করুণা রাগ করিয়া আর কথা কহিল না। এমন সময় আর একটি তরুণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। উপস্থিত মত বিবাদ বিতর্ক ভুলিয়া ইলা আনন্দের সুরে বলিয়া উঠিল, 'রেবা যে! অনেকদিন পর দেখা। কোথা ছিলে এতদিন?'

রেবার নাম শুনিয়া ইভাও উৎসুক হইয়া তাহার পানে চাহিল। প্রায় বছরখানেক আগে স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় সে স্কুল মাষ্টারী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এইটুকু ছাড়া আর কোন খবর এতদিন রাখে নাই। কিন্তু রেবার দিকে এবার চাহিয়া সে যে, স্কুলে চাকরি করে এমন বোধ হইল না। এক হাতে তাহার রিস্টওয়াচ, অন্য হাতে কয়েক গাছা

উজ্জ্বল পালিশের সূক্ষ্ম কারুকার্য করা চুড়ি। ব্লাউজের এবং শাড়ির ফ্যাশান ও সৌন্দর্য অভিনব।

রেবা ইভাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিল, 'ভাই ইভা তুমি এসেছ শুনে তাড়াতাড়ি দেখা করতে এলাম ওরই মধ্যে একটু সময় করে। শুনতে পাই তুমি নাকি কলকাতার বাস একদম তুলে দিয়ে পাড়াগাঁয়ে রয়েছ। আর নাকি মস্ত বড় সমাজ-সংস্কারক হয়েছ। তোমার স্বামী বিলেত গেছেন, সেও না কি ঐ উদ্দেশ্যে। তাহলে ইউ আর এ গ্রেট পারসন! আমরাই শুধু পিছিয়ে রইলাম।

তাহার কথা বলিবার ধরণে মেয়েরা হাসিয়া উঠিল।

রেডিওতে তখন আধুনিক কাব্য সংগীত আর একটা সুর হইয়াছিল, ঘরের আবহাওয়া কবিত্বপূর্ণ। তাহারই সহিত সুর মিলাইয়া রেবা নিজের কাহিনী বলিতে সুরু করিলঃ মাস্টারী একটা পেলুম বটে, কিন্তু ভাল লাগল না। একটা ধরা বাঁধা রুটিন মাফিক কাজ। তাই আজ মাস কয়েক হ'ল সিনেমায় নেমেছি। বজ্রমূর্ভিটোনের 'সাগরিকা' ছবিখানায় আমাকে মেন্ পার্ট দিয়েছে। আমাদের দেশে প্রতিভার যদি কোথাও আদর থাকে এখনও তাহলে সে ঐ সিনেমায়। নইলে আর সব ক্ষেত্রে প্রতিভা বিকাশের কোন সুযোগই নেই। আচ্ছা ভাই ইভা তুমি ত ফার্স্ট হ্যাণ্ড অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছ, তুমি ঐ পাড়া গাঁয়ের কথা নিয়ে বেশ ছোটখাট একটা চলচ্চিত্রের উপযোগী গল্প গড়ে দাও না। বাদ সাদ দিয়ে না হয় কিছু সিনেরিও যোগ দিয়ে আমি সেটাকে চালিয়ে দেব। আজকাল পাড়াগেঁয়ে কাহিনীর ডিমাণ্ড্ বড় বেশী। মনে থাকবে ত অনুরোধ।' বিরক্তি চাপিয়া ইভা সংক্ষেপে কহিল, 'আচ্ছা চেষ্টা করে দেখব।' তেমন ইচ্ছা না থাকিলেও সে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না, 'আচ্ছা তুমি যে সিনেমায় চাকরী নিয়েছ, তোমার স্বামী বা আত্মীয়স্বজনেরা এতে বাধা দেন না? তাঁরা মত দিয়েছেন?' রেবা যেন আকাশ হইতে পড়িল, 'বাঃ শোননি আমি ত একরকম সেপারেট্ হয়ে থাকি। আমার কাজের জন্য প্রতিপদে কাহারও কাছে জবাবদিহি করতেও বাধ্য নই। আর আত্মীয়স্বজন বাধা দেবেন কেন, আমি যখন তাঁদের গলগ্রহ হয়ে থাকব না, তখন স্বাধীনভাবে যে কোন অনেস্ট প্রফেসনে আমি স্বচ্ছন্দে যোগ দিতে পারি।' যাইবার সময় রেবা ইভাকে ও আরও অন্যান্য মেয়েদের তাহার জন্মতিথিতে যাইবার জন্য বারবার করিয়া অনুরোধ করিয়া গেল। (ক্রমশ)

অন্তরালে

(৪৪৮ পৃষ্ঠার পর)

ও সন্তোষদাদার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু নানা কারণে উত্তর দিতে পারি নাই। তোমার এই পত্রখানি বড় বিলম্বেই এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ঠিকানা লেখায় একটু গোলমাল হইয়া যাওয়াই তাহার কারণ। মায়ের মৃত্যু-সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম! দুর্ভাগ্য আমার, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। আশা করি, তাঁহার শ্রাদ্ধাদি বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। আজ পাঁচ সাত দিন হইল, আমার খুব জ্বর; তাহার উপর বুকের দুই পাশেই ভীষণ বেদনা! তাহাতে নিশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট হইতেছে। অনেক কষ্টেই তোমাকে এই পত্রখানি লিখিলাম। সন্তোষদাদাকে আর লিখিয়া উঠিতে পারিলাম না। বাবার ও অন্যান্য সকলের কুশল দিবে।"

পত্রখানি পড়িয়া কিছুক্ষণের জন্য বজ্রাহতের মতই স্তব্ধ হইয়া গেলাম! চক্ষের সম্মুখে ব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিতে লাগিল! হায়, হায়, একে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবহীন দূর বিদেশে একা পড়িয়া আছেন,—তাহার উপর প্রবল জ্বর বুক বেদনা, রোগের যাতনায়, সেবা-শুশ্রূষার অভাবে না জানি— তাঁহার কত কষ্টই না হইতেছে! অভাগিনীর কপালে শেষ পর্য্যন্ত যে কি আছে,—আর ভাবিতে পারিলাম না। ব্যথার আবেগে আকুলভাবেই কাঁদিয়া ফেলিলাম।

সন্তোষদাদা অদূরেই বসিয়াছিলেন। আমাকে কাঁদিতে দেখিয়াই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল কি? কাঁদছিস কেন বোন্?

পত্রটি সন্তোষদাদার হাতে দিবার পক্ষে কোন বাধাই ছিল না। আমি কিছু বলিতে না পারিয়া তাঁহাকে পত্রখানি দিলাম। উহা পড়িতে পড়িতে তাঁহারও মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু আমাকে ভরসা দিবার জন্যই তিনি পর-মুহূর্ত্তেই সে ভাব সংবরণ করিয়া বলিলেন, ও, এই জন্যেই এত কাঁদছিস? কেন? অসুখ বিসুখ কার না হয়? ভাবিস না, সেরে যাবে।

আমি কাঁদিতে কাঁদিতেই উত্তর দিলাম,—দাদা, আমাকে আজই তাঁর কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। একে প্রবল জ্বর, তায় বুকের দুই পাশেই বেদনা! এ অবস্থায় তিনি একলা সেখানে পড়ে থাকবেন, আর এখানে কি আমি স্থির হয়ে থাকতে পারি! আমার গায়ে যা দু' একখানা সোনা-দানা আছে, তার থেকেই রাস্তা-খরচ যোগাড় হয়ে যাবে।

সন্তোষদাদাও বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন যে, আমার যাওয়াই দরকার। তাই কোন প্রকার দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি বলিলেন, তা যেতে পারলে ভালই হয়, তবে তোর শ্বশুরের অনুমতি নেওয়া দরকার। তাঁর মত হলে আমি তোকে নিয়ে আজই রাতের ট্রেনে কটক রওনা হব। রাহা-খরচের জন্যে তোর অলঙ্কারের দরকার হবে না। সে-টা তোর সন্তোষদাই যোগাড় করে নিতে পারবে।

আমি একটু লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম,—"না, না, সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করুন দাদা! আমি না বুঝে বলে ফেলেছি! যা হোক, আমি এক্ষুণি বাড়ীতে গিয়ে শ্বশুর মহাশয়ের অনুমতি নেবার ব্যবস্থা করছি।"—বলিয়াই বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া শ্বশুর মহাশয়ের নিকট সমস্ত কথাই নিবেদন করিলাম।

কি আশ্চর্য্য,—পুত্রের গুরুতর পীড়ার সংবাদ শুনিয়াও আমার শ্বশুরকে বিশেষ চঞ্চল হইতে দেখা গেল না। তবে আমাকে সন্তোষদাদার সহিত স্বামীর নিকট যাইতে তিনি অনুমতি দিলেন। (আগামীবারে সমাপ্য)

আসামের রূপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

সাধারণত খামতিদেরও আসামের অন্যান্য পার্ব্বত্য-জাতির এক পর্য্যায়েই ধরা হয়, আমিও আবর মিশমির মত আর একটি পাহাড়ী জাতি দেখিতে এখানে আসিয়াছিলাম কিন্তু ফাকিয়াল বস্তীতে বিশেষভাবে এই মঠে আসিয়া সে ধারণা বদলাইয়া গেল। মঠাধ্যক্ষ সেই ত্যাগী ভিক্ষু যুবকের সহিত কথা বলিতে বলিতে বার বারই আমার মনে হইতেছিল যেন আমি অতীতের অশোক-রাজত্বে কোন বৌদ্ধবিহারে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি।

পরদিন প্রাতে খামতিপল্লী দেখিতে বাহির হইলাম। মঠপুরোহিত মহাশয় আমার সঙ্গী। খামতিরা বড়ই অতিথি-বৎসল জাতি বলিয়া মনে হইল। খামতি গৃহস্থের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া কোন গৃহেই ক্ষণিকের জন্য হইলেও না বসিয়া আমরা বিদায় লইতে পারিতেছিলাম না, কোন কোন গৃহে আবার দুধ বা চা-পানেরও অনুরোধ আসিল।

ইহারাও দুই তিন ফুট উঁচু বাঁশ বা কাঠের মাচার উপরে গৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করে। খামতিদের গৃহনির্ম্মাণ পারিপাট্য এবং গৃহের আসবাব প্রভৃতি দেখিয়া ইহাদের সাধারণ অবস্থা সকলেরই বেশ স্বচ্ছল বলিয়া মনে হইল। কোন কোন সম্পন্ন গৃহস্থের কাঠের পাটাতনের উপর টিনের গৃহও দেখিলাম। প্রত্যেকের বাড়ীতেই এক-একটি ধানের গোলা ও গোশালা আছে এবং প্রায় বাড়ীরই বাসগৃহের মাচার নীচে ছাগ, মোরগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপাখী দেখা যায়।

কৃষি খামতিদের প্রধান উপজীবিকা এবং ধান্য তাহাদের প্রধান শস্য। খামতিরাজ্য পাহাড় এবং জঙ্গলময় হইলেও লোকালয় এবং কৃষির জমি অধিকাংশই সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত তাই খামতিরাও বাঙলা দেশের মত বর্ষার প্রারম্ভে ক্ষেত চাষ করিয়া বীজ বপন করে এবং অগ্রহায়ণ মাসে ফসল উঠাইয়া গোলাজাত করে। এখন সকলে একরূপ অবসর, কেহ কেহ অল্প অল্প চাষ আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। রীতিমত বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিলেই স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া চাষবাসের কাজে মাতিয়া উঠিবে।

ক্ষেতে শস্য বপনের কাজ শেষ করিয়া আবার নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে খামতিরা তাহাদের ছোট ছোট নৌকায় ধান বোঝাই করিয়া বাণিজ্যে বাহির হয়। প্রত্যেকের নিজের নিজের বৎসরের খোরাক ঘরে মজুত রাখিয়া অবশিষ্ট সমগ্র ফসলই ইহারা এভাবে নৌকা বোঝাই করিয়া বিদেশে অর্থাৎ সদিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। ধান্য ছাড়া মধু, মোম প্রভৃতি এ পাহাড়ের আরও কয়েকটি উৎপন্নদ্রব্য বাহিরে চালান হয় তবে ধান্যই প্রধান

সারা বর্ষা পুরুষেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে কাটায়, এদিকে মেয়েরা তখন তাহাদের গৃহশিল্প লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। বেত ও বাঁশের শিল্পে খামতি মেয়েরা খুব পটু, তাছাড়া প্রত্যেক পরিবারের সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি এই বর্ষার অবসরে মেয়েরা ঘরে বসিয়া প্রস্তুত করিয়া লয়।

বর্ষাশেষে হেমন্তে আবার সকলে মিলিয়া মাঠে নামিবে ক্ষেতের ফসল সংগ্রহ করিতে, তারপর আবার শীতে বাহির হইবে জঙ্গলে জঙ্গলে তুলা খুঁজিতে। এভাবে সারা বৎসরই তাহাদের একটার পর একটা কাজ লাগিয়া আছে, কোথাও এর ব্যতিক্রম নাই, কোথাও পরিবর্ত্তন নাই, মনে হয় এ'র পরিবর্ত্তন বা সংস্কার এ'রা চায়ও না। বস্তুত বর্ত্তমান যন্ত্র-জগতের সহিত অপরিচিত এই খামতি সমাজ তাহাদের চিরন্তন নিয়মে পরিচালিত হইয়াও আজ ভাতে-কাপড়ে যতটুকু সুখী বোধ হয় বর্ত্তমান যুগের বহু সভ্যতাভিমানী নিত্য নূতন সংস্কারপ্রিয় জাতি তাহার শতাংশের একাংশও নহে, অথচ শিক্ষা-সভ্যতায়ও খামতি জাতিকে নিতান্ত হেয় বলা যাইতে পারে না। ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাই ইহারা অতীব সরল এবং অনাড়ম্বর তাহাদের জীবন-যাপন প্রণালী। রাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত কাহারও আচার-ব্যবহারে বা পোষাক-পরিচ্ছদে কোথাও বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। ছোট বড় সকলেই তাহাদের জাতীয় পোষাক সাধারণ লুঙ্গি ও পাগড়ী পরিধান করে। স্ত্রী-পুরুষ সকলের একই পরিচ্ছদ তবে গায়ের জামায় সামান্য প্রভেদ আছে।

অধিকাংশ খামতি পুরুষই নিজভাষায় অল্পবিস্তর লেখাপড়া জানে। খামতিদের বিদ্যাভ্যাসের জন্য পৃথক কোন স্কুল নাই, কতকগুলি গ্রাম মিলিয়া এক একটি বৌদ্ধমঠ আছে, এই মঠেই খামতি বালকেরা অবসর সময়ে আসিয়া মঠাধ্যক্ষের নিকট বিদ্যাভ্যাস করে। পাঠ্যাবস্থায় বালকদের ব্রহ্মচারীবেশে কয়েক বৎসর মঠে বাস করিবার রীতিও আছে, তবে অতি অল্পসংখ্যক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের ছেলে যাহাদের সাংসারিক কর্ম্মে বা কৃষিকার্য্যে না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না তাহারাই মঠে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করে।

খামতিরা, ব্রহ্মদেশ তাহাদের আদিম বাসস্থান, তাহাদের ধর্ম্মপ্রীতি ও স্বাবলম্বন, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি দেখিয়া স্বতই মনে প্রাচীন ভারতের একটি মধুর চিত্র জাগিয়া উঠে।

খামতিরা ব্রহ্মদেশ তাহাদের আদিম বাসস্থান, তাহারা বর্ম্মীদের একশাখা এই বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে সত্য কিন্তু আমি তিনদিন খামতি পল্লীতে বাস করিয়া এবং খামতি স্ত্রী-পুরুষের সহিত মেলামেশা করিয়া যতটুকু দেখিয়াছি এবং বুঝিয়াছি তাহাতে আমার সুদীর্ঘ চারিমাসের পরিচিত বর্ম্মীসমাজের সহিত ইহাদের তুলনা করিয়া মনে হইল নৈতিক চরিত্র ও ধর্ম্মপ্রাণতার দিক দিয়া খামতি জাতির স্থান ব্রহ্মবাসী অপেক্ষা বহু উচ্চে।

অধিকাংশ খামতি পুরুষই ভাঙ্গা আসামী বলিতে পারে কারণ ব্যবসা উপলক্ষে সকলকেই বাহিরের লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়। অনেকের সহিতই আলাপ-পরিচয় হইল, তাহাদের সরল ব্যবহার ও অকপট কথাবার্ত্তায় সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়। কাহারও পারিবারিক একটু খবর জিজ্ঞাসা করিলেই নিতান্ত আপনজনের মত সংসারের কত খুঁটিনাটি বলিয়া

যায়, শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া উঠা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

খামতি পাহাড়ে আসিয়া সত্যই একটি নূতন জাতি দেখিলাম যাহার তুল্য আর আছে কি-না সন্দেহ। ইহারা অনুন্নত অথচ সুখী, পাহাড়ী অথচ শিক্ষিত ও ধর্ম্মপ্রাণ আর "গোলাভরা ধান ও গোয়ালভরা গরু" এই জংলী খামতিদেরই ঘরে ঘরে দেখিলাম যাহা আজ সুসভ্য বাঙলা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

তারপর ইহাদের বৌদ্ধমন্দিরের কথা, খামতিজাতির শিক্ষা-সভ্যতা, তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও গৌরবের পরিচয় এই বৌদ্ধমঠ। ব্রহ্মের মত এখানে পথেঘাটে সর্ব্বত্র মনোরম কারুকার্য্যময় গগনস্পর্শী স্বর্ণাভ চূড়া বিশিষ্ট পাকা মঠের ছড়াছড়ি নাই বটে, সুদৃশ্য বৌদ্ধবিহারও এখানে পল্লীতে পল্লীতে দেখা যায় না কিন্তু খামতিদের কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া সামান্য খড়ো বা টিনের গৃহরূপ বৌদ্ধমঠ ও বিহারে যে শান্তি, যে শৃংখলা বিরাজ করিতেছে তাহার তুলনা বিরল। এই মঠগুলি একাধারে তাহাদের একতা, শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্ম্মানুশীলনের কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক খামতিই তাহাদের এই সর্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানটিকে নিজস্ব সম্পদ বলিয়া মনে করে, মঠান্তর্গত কয়েকটি গ্রামের অধিবাসী সকলে মিলিয়া মঠ, মঠাধ্যক্ষ ও মঠবাসী ছাত্রদের যাবতীয় খরচ বহন করিয়া থাকে, প্রত্যেকেই ক্ষমতানুযায়ী নিজ নিজ ইচ্ছামত এই খরচের অংশ গ্রহণ করে। ইহাতে কোথাও বাধা-বাধকতার বালাই নাই, কোথাও হিংসাদ্বেষের স্থান নাই: অথচ চারিপার্শ্বের গ্রামগুলি হইতে প্রত্যহ অযাচিতভাবে যে খাদ্যসামগ্রী, যে পূজোপকরণ মঠে আসিতে থাকে তাহার অধিকাংশই প্রয়োজনাতিরিক্ত বলিয়া ফেরত দিতে হয়। এ দুই তিনদিন মঠের অতিথিকে উপলক্ষ করিয়াও যে খাদ্য পানীয় হাজির হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসে পাঁচ-সাতজন অতিথি সৎকার চলিতে পারে।

প্রত্যহই দেখিয়াছি কত খামতি গৃহিণী এক মাইল দেড় মাইল দূর হইতে পর্য্যন্ত কি আগ্রহ ও শ্রদ্ধাভরে ফুলের সাজির মত একপ্রকার বাঁশের ঝুড়িতে সযত্নে বাঁধিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি লইয়া হাজির হইয়াছে কিন্তু এ'র পূর্ব্বেই মঠে প্রয়োজনমত খাদ্য আসিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার নৈবেদ্যের পুঁটলী গ্রন্থিবদ্ধাবস্থায়ই আবার মাথায় তুলিয়া ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিতে হইয়াছে।

খামতি রাজ্যের মাত্র দুই তিনটি গ্রামের সুন্দর চিত্র দেখিয়া এই শান্তিময় দেশের সারাটা অঞ্চল বেড়াইয়া দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিতেছিল কিন্তু কতক রাস্তাঘাটের দুর্গমতা আর কতক আমাদের সরকার বাহাদুরের কড়া আইনের জন্য সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হইল না।

একদিন গোধূলিতে আসিয়া খামতিগ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলাম আর একদিন প্রভাতে আমার তিনদিনের সর্ব্বক্ষণের সাথী সহৃদয় ভিক্ষুপ্রবর ও তাহার সুন্দর পল্লীর নিকট বিদায় লইয়া আবার নৌকায় চড়িলাম। (ক্রমশ)

সাহিত্য-সংবাদ

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও চিত্র প্রতিযোগিতা

সাথী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিচালিত হস্তলিখিত পত্রিকা "সাথী"র উদ্যোগে দ্বিতীয়বার গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও চিত্র প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইতেছে। যে কেহ যে কোন বিষয় লইয়া রচনা লিখিতে পারেন। প্রত্যেক বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখককে একখানি করিয়া রৌপ্যপদক উপহার দেওয়া হইবে। পুরস্কৃত ও মনোনীত রচনাগুলি উক্ত পত্রিকার ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যায় অর্থাৎ পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। রঙিন চিত্রাঙ্কন যে কোন বিষয় লইয়া--সাইজ ৫×৭ ইঞ্চির বেশী যেন না হয়। গল্প ও প্রবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে এবং কবিতা ২ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করিতে হইবে। কোনরূপ প্রবেশ মূল্য নাই। যথাসময়ে ফলাফল এই পত্রিকায় বাহির হইবে। যে কেহ একের অধিক রচনা বা চিত্র পাঠাইতে পারেন, তবে একাধিক পুরস্কার পাইবেন না। উপযুক্ত টিকিট সঙ্গে দেওয়া থাকিলে যে কোন অনুসন্ধানের জবাব দেওয়া হইবে। এই সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। (সাহিত্য বিভাগ), সাথী সম্প্রদায়, ২৬।এ, আগামেহেদী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বঙ্গ সাহিত্য সমিতির পরিচালনায় শনিবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে তিন ঘটিকায় কলেজ হলে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় সভার পৌরোহিত্য করিবেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বহু প্রথিতযশা অধ্যাপক, খ্যাতনামা সাংবাদিক, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং প্রসিদ্ধ নাগরিক প্রভৃতি সভায় যোগদান করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিবেন। উৎসবের পরে সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় বনফুল রচিত বাঙলা নাটক "শ্রীমধুসূদন" কলেজ ইউনিয়নের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হইবে। উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী এবং অনুরাগী ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদের প্রবেশাধিকার আছে। শিক্ষিত সমাজের এবং বিশেষ করিয়া কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। সুব্রত রায় চৌধুরী, সম্পাদক, বঙ্গ সাহিত্য সমিতি, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেদিন সতীশ, অলকা ও প্রতুল উপরের ঘরে বসিয়া চা-পান করিতেছিল।

একথা সেকথার পর সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মামা মামীর কোন কথাই বলনি অলকা—তাঁদের সমস্ত কিছুই ত' তুমি জান।—তাঁদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা ত' করতে হবে তাই সমস্ত কিছুই আমাদের জানিয়ে দাও।—

অলকা বলিল, তাঁদের সম্বন্ধে জানাবার এমন কিছুই নেই, অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থ যেমন হয় তাঁরাও ঠিক তেমনি। তবে মামা ছিলেন খুবই পণ্ডিত, সংস্কৃতও যেমন জানতেন তেমনি জানতেন ইংরেজী। কোন ধর্ম্মে তাঁর বিশ্বাস ছিল কি না তা' কেউ কোন দিন বুঝতে পারেন নি, পড়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন—গাঁয়ের কয়েকটি ছেলেকে তিনি নিজের ইচ্ছায়ই পড়াতেন আর সেই সঙ্গেই পড়াতেন আমায়।—প্রথম প্রথম অনেকেই তাঁকে একঘরে করার চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ছেড়ে যেতে চাইত' না তাই সে-চেষ্টা সফল হয়নি। আমি ছিলাম তাঁর প্রিয় পাত্রী, অনেক সময় আমার কাছে তিনি যা বলতেন, তাতে মনে হ'ত বুঝি-বা ঈশ্বরও তিনি মানেন না, কিন্তু কি যে মানেন তিনি তাও ঠিক স্পষ্ট হ'ত না কোনদিন। মামী করতেন পূজা, যত রকম পূজা থাকতে পারে সবই ক'রতেন তিনি, তাঁকেও আমার সাহায্য ক'রতে হ'ত, আমি মামার মতই হয়ে উঠলুম, না মামীর মতটাই আমার কাছে বড় হয়ে উঠল, তা' ঠিক বুঝতেও পারতুম না, এখনও পারি না—মামা কিন্তু আমার কাজ দেখে হাসতেন, ব'লতেন, দু'নৌকোয় পা দিয়ে কতদূর আর যাওয়া যাবে! অর্থ তখন সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও আজ পারি কিন্তু এটা এখনও ভেবে পাইনি কোন নৌকো থেকে পা তুলে নিয়ে কোনটাতে উঠে বসব।

সতীশ চুপ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল, প্রতুল পেয়ালা খালি করিয়া আর একবার ভরিয়া দিবার জন্য সেটা অলকার দিকে আগাইয়া দিল।—

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ক' পেয়ালা হ'ল আজ সারাদিনে? আর ক'বারই বা হবে! সহজভাবেই হাসিয়া প্রতুল বলিল, এই ত' পাঁচবার হ'চ্ছে, আর বার দুই হ'তে পারে—বেশী নয়।

'কিন্তু পেটের ভেতরটা যে শেষ হ'য়ে যাবে।'

প্রতুল জবাব দিল, তা' যেতে পারে কিন্তু বছর কুড়ির আগে নয়, হয়ত' বছর পঁচিশও হ'তে পারে, এর বেশী বাঁচবার ইচ্ছে আমার নেই, মা হয়ত' আরও আগে টেনে নেবার ব্যবস্থাই ক'রছেন।

সতীশ বলিল, ও যা' ক'রতে চায় তার বিরুদ্ধতা ক'রতে নেই অলকা—বিরুদ্ধতা ক'রে আজও কেউ পারে নি, আর কোনদিনও কেউ পারবে না সে আমি জানি। সে একটা বন্যার খবর আমার জানা আছে, আমিও গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার জন্য।

প্রতুল বলিয়া উঠিল, কিন্তু বন্যার চেয়ে চা অনেক ভাল, সত্যি ভারী রাগ হ'চ্ছে দিদি শুধু চা-ই দিতে হয় বুঝি সে-সব জিনিষগুলি গেল কোথায়!

হাসিয়া ফেলিয়া অলকা বলিল, নিজের পেটটা একবার খুঁজে দেখলেই সে-সব পাবেন কিন্তু। 'আমার পেটে! তা' হবে, কিন্তু বাইরে কি আর কিছু নেই!'

সতীশ বলিল, তর্ক ক'রে লাভ নেই কিছু এনে দাও ওকে।

অলকা বলিল, না, এখন আমি উঠতে পারব না। বাজে কথায় চাপা দেবার চেষ্টা না ক'রে চুপ ক'রে থাকুন একটু, নীচে গিয়ে লুচি ভেজে দেব' তা'হলে।

আর কোন কিছু বলিবার সুবিধা না পাইয়া প্রতুল চুপ করিয়াই রহিল।

সতীশ বলিয়া চলিল, নৌকায় ক'রে ঘুরে বেড়াতুম আমরা, আমি, ও আর একটা ছেলে,—ওকে সে দাদা ব'লেই ডাকত' নাম ছিল তার সুরেশ। একদিন রাত্রে বোধ হয় তখন চারটে হবে হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল কিসের চীৎকারে। প্রথমটা কেউ কিছু বুঝতে পারলুম না। একটু চুপ ক'রে থেকে কথা কইলে প্রতুল, বললে, দূরে কোথাও উঁচু কোন জায়গা আছে নিশ্চয় আর তার ওপর নিশ্চয় মানুষ আছে, আজ ৭ দিন মাত্র জল বেড়ে গেছে বটে, কিন্তু এমনি উঁচু জায়গা থাকা আশ্চর্য্য নয়। আজই ওধারে যাওয়া দরকার কিন্তু তা ত' হবে না সুরেশ, কাল সকালেই যে আমাদের ওই চীৎকার যেদিক থেকে আসছে তার উল্টো দিকে যেতে হবে। কিন্তু এদিকেও যাওয়া দরকার একবার, হয়ত দু'তিনটে মানুষই আছে—তোমরা কাল সকালেই ওদিকে যেও আজ আমি চললুম ওদিকে। ওদিককার কাজ শেষ ক'রে তোমরা আমার খোঁজ ক'র। এই কথা ব'লে অষুধের বাক্স থেকে গোটা দুই শিশি তুলে ভাল করে বেঁধে পকেটে ফেলে একটা ফ্লাস্কে জল ভরে পিঠের সঙ্গে ভাল করে বেঁধে নিয়ে সে প্রস্তুত হয়ে নিল।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি সাঁতার কেটে যেতে চাও নাকি, ও উত্তর না দিয়ে শুধু হেসে উঠল। সুরেশ একবার বললো, কিন্তু প্রতুলদা। —ও তার দিকে একবার ফিরে চাইলে—সুরেশের মাথা নীচু হ'য়ে গেল। আমি অবাক হ'য়ে গেলুম, কি সে শক্তি যা এমন ক'রে মানুষের মাথা হেঁট করিয়ে দিতে পারে? আজও আমি ভেবে পাইনে এই প্রতুল আর সেই প্রতুল এক হয় কি ক'রে?"

আর থাকিতে না পারিয়া প্রতুল বলিয়া উঠিল, খুব ভাব সতীশ, প্রাণপণ ভাববার চেষ্টা কর আমি ওদিকে রামহরিকে খুঁজি, সেই আমার বন্ধু, পেটটা যেন একেবারেই খালি হ'য়ে গেছে।

প্রতুল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তাহার গমন পথের দিকে চুপ করিয়া অলকা চাহিয়া রহিল, সে বাহির হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দুই চক্ষু আপনা হইতেই একবার বুজিয়া আসিল, বুক কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল, চক্ষু ফিরাইয়া সতীশের দিকে চাহিয়া সে বলিল, তারপর?

সতীশ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, অনেকদিন আগেকার সেই বন্যার দৃশ্য যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে তখন ভাসিয়া উঠিতেছিল তাহার সমস্ত বীভৎসতা সমস্ত সৌন্দর্য্য লইয়া।

অধীর হইয়া অলকা বলিল, তারপর?

সতীশের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, অলকার মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত কিছুই যেন তাহার মনে পড়িয়া গেল, ধীরে ধীরে সে বলিতে লাগিল, আর কোন কথা না ব'লেই প্রতুল জলে লাফিয়ে পড়ল। পরের দিন আমাদের কাজ শেষ ক'রেই আমরা তার খোঁজ ক'রতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু তিন দিন তার কোন খোঁজই পেলুম না। সুরেশের সেই বিষাদমাখা মুখ, সেই করুণ চোখের দৃষ্টি আজও আমি ভুলতে পারি নি—তিনটি রাত তাকে আমি নিতান্ত ছোট ছেলের মতই কাঁদতে দেখেছি, বাপ মায়ের মৃত্যুর সময়েও বোধ হয় এমনি ক'রে কেউ কোনদিন কাঁদে নি। চার দিনের দিন তাকে আমরা পাই একটা বড় গাছের ওপর। গাছের ডালে নিজেকে ভাল করে বেঁধে সে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুম দিচ্ছিল, উৎফুল্ল সুরেশের চীৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল, একটু হেসে সে নেমে এল নৌকোর ওপর।

"সুরেশের সে কি আনন্দ, তাঁর চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি বা একটা রাজ্যই সে জয় ক'রে নিয়েছে। তারই প্রশ্নের উত্তরে প্রতুল ব'ললে, ঘণ্টা চারেক সাঁতার কেটে সে ভেসে আসা একটা বাড়ীর চালা দেখতে পায়, তারই ওপর শুয়ে ছিল দুটি লোক, অনাহারে তারা খুবই কাতর হ'য়ে প'ড়েছিল, বন্যার জল খেয়ে কলেরা ডেকে আনতেও দেরী করে নি তারা—অষুধে কি আর কিছু হয়, একটা ত' এমনিই শেষ হ'য়ে গেল। আর একটা ছিল বেঁচে কিন্তু তারও দিন শেষ হ'য়ে এসেছিল, দুদিন বাদে হঠাৎ চালাটা কেঁপে উঠেই ফেটে গেল, আস্তে আস্তে সেটা গেল ডুবে।—কতক্ষণ আর একটা লোককে নিয়ে সাঁতার কাটা চলে? তারপর ওই গাছটাই হ'ল আশ্রয়।"

"আমি বললুম, কিন্তু নৌকো নিয়ে গেলে হয়ত ওদের বাঁচান যেত'। সুরেশ কিন্তু ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, তা হয় না সতীশবাবু প্রতুলদার কাজে কোন গলদই থাকতে পারে না। হয়ত সুরেশের কথাই সত্যি, সেই বছর আঠারর ছেলেটার চোখে সে কি জ্বলন্ত বিশ্বাস সেদিন দেখেছিলুম কিন্তু অমনি বিশ্বাস যে কি ক'রে হয় তা আজও আমি ভেবে পাইনি।"—

অলকা অবাক বিস্ময়ে সতীশের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। বন্ধুর কথায় তাহার চক্ষের উজ্জ্বল দৃষ্টি তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। বিশ্বাসও ঠিক এমনি করিয়াই কোন এক অজ্ঞাতসারে আসিয়া মানুষকে অধিকার করিয়া বসে, আর একবার অধিকার করিতে পারিলে কোন কিছুর সাহায্যেই তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখা যায় না। সমস্ত যুক্তি-তর্কই ব্যর্থ হইয়া যায়। বিশ্বাসীর উজ্জ্বল মুখ তেমনি উজ্জ্বল হইয়াই জ্বলিতে থাকে, কিন্তু কেমন করিয়া যে এমন হইতে পারে, তাহাও কেহ ভাবিয়া পায় না। বন্ধুর প্রশংসায় সতীশের মুখে এই যে সুন্দর মোহাচ্ছন্ন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সে কি কোনদিনও বুঝিতে পারিবে? কেহই বুঝিতে পারে না, ইহারা এমনি অজ্ঞাতে মুখের উপর খেলা করিয়া যায় আপন খুশীমত

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। কোন এক অজ্ঞাত দেশের কি এক গভীর বিষয়ে তাহারা দুই-জনেই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিজেদের হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

আস্তে আস্তে কতকটা অন্যমনস্কভাবেই সতীশ বলিল, এমনি আমার বন্ধু, এমনি ওর সুন্দর মন। অপরকে আপনার করে নিতে এতটুকু দেরীও ওর হয় না, তাই কোন দিকে লক্ষ্য না করে অপরের জন্যে নিজের বিপদের কথা মনেও সে রাখতে পারে না, আর হয়ত ঠিক সে-কারণেই সুরেশ বিশ্বাস করে তার প্রতুলদা অভ্রান্ত—ভুল বলে কোন কিছুই যেন সে ভুলেও করতে পারে না।

অলকা মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রতুল বলিল, শেষ হয়েছে পরচর্চা? কি হে সাহিত্যিক, তোমাদের মতে না পাড়া-গাঁয়ের পুকুরঘাটই ওই কাজের জন্য প্রশস্ত, কিন্তু আমি দেখছি, শিক্ষিত সমাজের শোফায় শুয়েও তোফা ও কাজ চালান যায়, তা' যাক, এদিকে আমারও যে দায় ঠেকেছে—রামহরিকে খুঁজে ত পেলুমই না, আর ভাঁড়ার ঘরেও পাকা কিছু নেই। নূতন আদব-কায়দায় সবই বদলেছে দেখছি, কিন্তু আমার একটা ব্যবস্থা হ'ক।

অলকা তাহার মুখের দিকে চাহিল। এই সেই লোক যে মায়ের মৃত্যুকেও নিতান্ত সাধারণভাবে উড়াইয়া দেয়—আবার বহু দূর হইতে ভাসিয়া আসা কাতর ক্রন্দনে অস্থির হইয়া নিতান্ত পাগলের মতই জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ইহাদের তুলনা নাই, কোন বাঁধা-ধরা পথ দিয়াও ইহাদের চালিত করা যায় না। যে পথ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে পথেই ইহারা চলিল না কেন, ইহাই ভাবিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরাও চলে না।

তাহাকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রতুল বিস্মিত হইয়া উঠিল, একান্ত হতাশভাবেই বসিয়া পড়িয়া সে বলিল, কি মুস্কিল, মানুষে যে এত চটপট্ বোবা হ'তে পারে তাত জানতুম না। বেশ আমিও প্রশ্ন করছি, কিন্তু কিই বা করা যায়। কিছুক্ষণ চিন্তার পর হঠাৎ চক্ষু তুলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ, বিয়ে আপনার হয়েছে, কিন্তু কি ক'রে হ'ল?

এ প্রশ্নের কোন অর্থই অলকা খুঁজিয়া পাইল না।

সতীশ যেন প্রশ্নটা শুনিয়াই জাগিয়া উঠিল, বলিল, হ্যাঁ এটা জানা দরকার—তবে প্রশ্নটা ঠিকভাবে করা হয়নি। যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে অলকা সে তোমাদের দেশের লোক ত নয়ই, কাছাকাছিরও নয়—তার নামটাই শুধু জান, কিন্তু সে তোমাদের ওখানে গেলই বা কি ক'রে তা বুঝলুম না আর হঠাৎ বিয়েই বা হ'ল কি ক'রে তাও বুঝতে পারলুম না। ব্যাপারটা যতটা সম্ভব আমাদের জানা দরকার।

হাসিয়া প্রতুল বলিল, আরে আমার প্রশ্নও ত' তাই, কিন্তু কেমন এক কথায় সেরে দিয়েছিলুম বলত? তুমি সাহিত্যিক কিনা খানিকটা বাজে কথা বলা ত চাই, ইচ্ছে হয় আরও কয়েকটা বলতে পার কিন্তু আসলে সবই এক।

অলকা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর একটা গভীর নিশ্বাস চাপিয়া বলিল, আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকতেন নিবারণ-দা। কলকাতায় অনেকদিন তিনি পড়াশুনো করেছেন জানতুম, পড়াশুনো শেষ ক'রেই তিনি দেশে ফিরে যান। গাঁয়ের কোন লোকেরই তাঁর সম্বন্ধে ভাল ধারণা ছিল না। পড়তে এসে তিনি নাকি এমন অনেক কিছু করেছিলেন যা গাঁয়ের কোন ভদ্রলোকই ভাল চোখে দেখত না। মামা কিন্তু অতশত বুঝতেন না, কারও সঙ্গেই তাঁর বিবাদ ছিল না—সবারই মত তাঁর সঙ্গেও তিনি অবাধে মিশতেন। আমাদের বাড়ীতে তাঁর আসা-যাওয়াও সেই সূত্রে কম ছিল না। মামীমা কিন্তু সন্দেহ করতেন, আমাকে বারণ করতেন কাছে যেতে। আমি কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করতুম না, তাঁর চোখের কি একটা অদ্ভুত দৃষ্টি মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়ত, কিন্তু সে সব আমি দেখতুমও না ভাল ক'রে। নিবারণ-দা কলকাতায় পড়াশুনো করেছেন, কতদিন তাঁর কাছে সেসব গল্প শুনেছি, কলকাতার কথা শুনতে তখন খুবই ভাল লাগত আমার। সেই লোকই হঠাৎ কয়েকদিন আর আমাদের বাড়ীতে এলেন না। আমি সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম—মামীমা স্মরণ করিয়ে দিতেন আমার বয়সের কথা আর মামা দিতেন সবকিছু হেসে উড়িয়ে, বলতেন—ও-সব মনে রাখতে নেই, নিতান্ত ছোটর মতই এই পৃথিবীটাকে জানবার আগ্রহ রাখতে হয়, মন ত' ভাঙবেই, তাকে জোর ক'রে সেই ভাবনার দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে লাভ কি?

"আরও কয়েকদিন পর মামা এসে বললেন, নিবারণের খুব অসুখ হয়েছে দেখে এলুম, অন্ধকারে একলা পড়ে আছে বেচারা। এক বন্ধুকে আসতে লিখেছে, তার বিশেষ বন্ধু, হয়ত না আসতেও পারে। তবে কলেজের বন্ধুত্ব জীবনভোরও থাকে কিনা বলতে পারি না। তা তুমি একবার বিকেলের দিকে দেখে এস অলকা—আলো জ্বালবারও ওর কেউ নেই।"

"মামীমা বললেন, তাই বলে ওকেই আলো জ্বালতে যেতে হবে নাকি? সমস্ত গাঁ যাকে পছন্দ করে না তাকে ত বাড়ীতে নিয়ে এসে তুললে মাথায়, এবার পাঠাচ্ছ ওকে একলা সেখানে। এমনি বুদ্ধি নিয়ে যে মানুষ কি ক'রে থাকে!"

"মামা হেসে বললেন, ভয় তোমার কিছু নেই, বুদ্ধি তোমার কাঁচা সন্দেহ নেই, কিন্তু হালে ব'সেও নৌকো পাড়ে তুলবার ভরসা আজও তুমি দিতে পারলে না। তাই পাকা বুদ্ধি ছেড়ে একটু কাঁচাটাই চেখে দেখ। মানুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, নিবারণও সেই মানুষ—সে একেবারেই শয্যাশায়ী, শুধু তার ঘরের বাতি জেলে দিয়ে একটু খোঁজ খবর নিলে যদি মহাভারত অশুদ্ধই হয় ত' হ'ক না তা অশুদ্ধ। আমার কিন্তু মনে হয় মহাভারতের বিধান নিতে হলে তোমাকেই সরে দাঁড়াতে হবে। মামা আর কিছু না বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন—মামীমা গম্ভীর হ'য়ে বললেন, যা খুশী কর গিয়ে তোমরা, কেন যে তোমাদের ভালর জন্যে আমার এত মাথা ব্যথা তা বুঝতেও পারি না। মামীমা মুখ কালো ক'রে [illegible] যান, আমার কিন্তু বেশ লাগে তাঁদের বিবাদ।"

"সন্ধ্যার সময় নিবারণ-দার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হই। ঘরের ভিতর সে যে কি অন্ধকার তা বলে বোঝান যায় না। প্রথমটা চোখে কিছুই দেখতে পাইনি, পরে নিবারণ-দার শায়িত দেহটা আবছাভাবে দেখতে পাই। ঘরের কোণ থেকে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে জ্বালিয়ে ফেলি। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাবার শব্দে চৌকির ওপাশ থেকে কে একজন উঠে দাঁড়ান। আমি অবাক হ'য়ে সেদিকে চেয়েছিলুম। আরও একজন মানুষ যে এই ঘরের মধ্যেই আছেন অথবা থাকতে পারেন তা আমি প্রথমে ভাবতেও পারিনি। ভদ্রলোকটি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সহজভাবেই বললেন, আলোটা এদিকে নিয়ে আসুন, ওষুধটা খাইয়ে দিই।"

"অবাক হ'য়ে গিয়েছিলুম, অন্ধকারে বসে বসে মানুষে ওষুধ ঠিক ক'রে কেমন করে? একটু কষ্ট করলেই যদি প্রয়োজনীয় জিনিষ মেলে তবে সেই কষ্টটুকু এরা করতে চায় না কেন। কোন কথা না ব'লে তাঁর কথা মত আলোটা সামনে নিয়ে যাই। নিবারণ-দা আর মাত্র দুটি দিন বেঁচে ছিলেন। তাঁর কলেজ জীবনের প্রধানতম বন্ধুর সমস্ত সেবা, মামার ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ আমার একান্ত আগ্রহ নিতান্ত তুচ্ছ হ'য়ে গেল। গাঁয়ের লোকের অভি-সম্পাতের বোঝা মাথায় নিয়েই তাঁকে বিদায় নিতে হ'ল পৃথিবী থেকে। এবার নিবারণদার বন্ধু বিদায় চাইলেন, কিন্তু মামা তাঁকে থেকে যেতে ব'ললেন কিছুদিন—মামীমাও ছাড়তে রাজী হ'লেন না কিছুতেই। তারপর আর কিছুই বলবার দরকার নেই বোধ হয়?"

দুই বন্ধু এতক্ষণ স্থির হইয়াই সমস্ত কথা শুনিতেছিল। অলকা থামিবামাত্রই প্রতুল বলিয়া উঠিল, না আর কিই-বা ব'লবার থাকতে পারে? তারপর সেই নিবারণ-দার বন্ধুই, ওঃ সেখানে যদি থাকতুম এ সময়ে, পেটটা কিন্তু সত্যি ভরতে পারতুম। আচ্ছা এখন সমস্ত কথাই থাক, ওই যে কি একটা ভেজে দেবার কথা ছিল নীচে গিয়ে—তাই হ'ক এবার, আমি নীচে যেতে প্রস্তুত।

সতীশ বলিল, না ব'লবার আরও কিছু আছে। বিয়ের প্রস্তাব তোমার মামা করেছিলেন না করেছিলেন সেই ভদ্রলোকটি?

অলকা মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। এতক্ষণ অনেক কথাই সে বলিয়াছে, নিতান্ত বলিতে হইবে বলিয়াই বলিয়াছে হয়ত। কিন্তু নিজের বিবাহের কথা দুইটি পুরুষের সম্মুখে এমনি করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের মত কতক্ষণই বা বলা যায়? এ কথা বলিবার ইচ্ছা আর তাহার নাই—সে চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল।

প্রতুল বলিল, চট্‌পট্‌ উত্তর দিয়ে দিন দিদি—ওর বাজে কথা নইলে বেড়ে যাবে আর ওদিকে আমাদের দেরী হ'য়ে যাবে। তারপর সতীশের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, আর কোন প্রশ্নই কিন্তু তুমি ক'রতে পারবে না সতীশ, যদি কর ত' মজা টের পাবে। ক্ষিধের সময় বন্ধু বলেও কিছু সুবিধে পাবে না তা ব'লে দিচ্ছি।

(শেষাংশ ৪৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙলায় শনির দৃষ্টি

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলায় যেন চতুর্দ্দিকে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে—সর্ব্বত্রই আমরা পরাজিত, সংযত ও শোষিত হইতেছি, অথচ এই শোষণ রোধ করিবার জন্য কোনও চেষ্টাই কোথাও দেখা যায় না। দুই চারিজন কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেও সাধারণের তরফ হইতে সাহায্য ও সহানুভূতির অভাব হেতু তাঁহাদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতে হয়, এজন্য ব্যক্তিগত ক্ষতি অপেক্ষা ব্যাপক ক্ষতিই অধিক হইয়া থাকে। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য খাদ্য-দ্রব্যসমূহ ক্রমশ অবাঙালী ধনী ব্যবসায়ী ও দালালগণের হস্তে চলিয়া যাওয়ায় আমরা তাহাদের দ্বারা কি ভীষণভাবে শোষিত হইতেছি, তাহা নিত্য দেখিয়া ও ভুগিয়াও আমরা তাহা রোধ বা সংযত করিবার কোনও চেষ্টাই করি না; আমাদের অপরিহার্য্য খাদ্য-দ্রব্যের উপর যদি ফটকাবাজী বা মাল আটকাইয়া দর তুলিবার চেষ্টা অনবরত চলিতে থাকে, তাহা হইলে আমরা দাঁড়াই কোথায়? দেশের যাঁহারা গণমান্য এ সকল সমস্যাকে তাঁহারা আদৌ তাঁহাদের বিবেচ্য বিষয় বলিয়া মনে করেন না, অথচ দেশ তাঁহাদেরই মুখ চাহিয়া আছে। যতদিন বাঙালী সমাজের বিভিন্ন বণিক-শ্রেণীর হস্তে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যাদির ব্যবসা ছিল ততদিন এই জাতীয় এত গোলমাল ছিল না; কারণ সমাজের প্রধানগণই তাঁহাদিগকে শাসিত ও সংযত করিতে পারিত। তাহা ছাড়া, পাঁচজনে বসিয়া পঞ্চায়েৎ করিয়া অন্যায় কার্য্যের বিচার করা আমাদের যুগ-যুগাগত প্রথা। সমুদয় শাসনকার্য রাজ সাহায্যে হয় না এবং কতক বিষয়ে রাজ-আইনের অভাব; আবার অত্যন্ত ব্যয় ও সময় এবং সাক্ষী-সাপেক্ষ বিধায় রাজ-আইনের সাহায্য লওয়াও সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। উপস্থিত বাঙালী বণিক জাতির জাত-ব্যবসা তাঁহাদের হস্তচ্যুত হওয়ায়, আজ বাঙালী প্রত্যেকে নানারকমে বিদেশাগত এবং তদধীনস্থ ব্যবসায়ী এবং দোকানদার, ফড়িয়া ইত্যাদি কর্ত্তৃক শোষিত হইতেছে। ইহার প্রতীকার না করিলে বাঙালী শীঘ্রই জাতি-হিসাবে দেউলিয়া হইয়া যাইবে।

বাঙালী গন্ধ-বণিক জাতির হস্তে বেণেতী মশলা এবং অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য্য ও অপরিহার্য্য জিনিষসমূহের ব্যবসায় ন্যস্ত ছিল; সুপারি, খদির, লঙ্কা, হলুদ, ধনে, সরিষা, আলতা, মরিচ, জিরা, মিছরি, কেরোসিন তেল ইত্যাদি সমুদয় জিনিষই বাঙালীর অপরিহার্য খাদ্য ও ব্যবহারের দ্রব্য; এক সময়ে ইহা গন্ধ-বণিক জাতির একচেটিয়া ব্যবসা থাকিলেও, তাহারা এক দিনে দুই আনা সেরের মালকে দশ আনা, বার আনা সের দরে তুলিতে পারিত না; এই সকল জিনিষের ব্যবসা এখন অবাঙালী সম্প্রদায়ের হাতে চলিয়া যাওয়ায় এবং বিদেশী ও স্বাধীন (?) দেশীয় রাজাদের অর্থ ও ব্যাঙ্কের টাকার সাহায্যে আজ ঐ সকল ধনী ব্যবসায়ী এই সকল মাল লইয়া নিজেদের মধ্যে আপোষে কেনা-বেচা অর্থাৎ ফটকাবাজী করিয়া মালের দর ইচ্ছামত বাড়াইয়া দিতেছে। দোকানদারকে অসম্ভব দর বৃদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে, মালের আমদানী নাই বা উৎপাদক দেশে জলপ্লাবনে হইয়া মাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি। সংবাদপত্রে মাদ্রাজে জলপ্লাবনের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র দেখিবেন যে লঙ্কা, মরিচ ইত্যাদির দর দুই আনা হইতে আট আনা, তৎপরদিন তাহার সংবাদ আরও খারাপ হইলে দশ আনা, বার আনা সের দর উঠিয়া যায়; অথচ বাস্তবিক গুদামজাত মালের সহিত উক্ত জলপ্লাবনের সম্বন্ধ বিরল এবং জলপ্লাবনে বাস্তবিক ঐ মালের ক্ষতি হইয়াছে কি না, তাহাও কেহ বলিতে পারে না; অনেক সময়ে ধূর্ত্ত এবং অল্পশিক্ষিত বণিক-সমাজ হইতেই ঐ রকম তারের ও সংবাদদাতার পত্র প্রচারিত হয়। এ সকল বন্ধ করিবার উপায় আমাদিগকে করিতে হইবে।

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ বাঙলায় চাউল ব্যবসায়ীদের এক শ্রেণীর মধ্যে এই পাপ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইহারা কৃষক-দরদী সাজিয়া আজ তিন চার বৎসর যাবৎ বর্ম্মা চাউলের আমদানী বৃদ্ধির অজুহাত দেখাইয়া বাঙলায় চাউল চাষ রক্ষা করিবার জন্য মায়া-কান্না কাঁদিয়া আজ তিন চারি মাস হইল বর্ম্মা চাউলের উপর মণকরা বার আনা ডিউটী বসাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে দেশী চাউলের দরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংরেজী সংবাদপত্রে ইহা লইয়া কিছু আলোচনাও হইয়াছিল, কিন্তু যেখানে ক্রেতাদের কোনও সঙ্ঘ বা সমিতির অভাব, অথচ ব্যবসায়ীদের কতকগুলি ছোট, বড়, মাঝারি সমিতি বর্ত্তমান, এবং বেতনভোগী সংবাদসংগ্রাহক ও প্রচারক অনবরত ঐ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজেদের কথাই "দশ-কাহন" করিয়া বাড়াইয়া প্রমাণ করিতেছে, আবার যেখানে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা, সেখানে তাহাদের জয়-জয়কার অবধারিত। দুঃখের মধ্যে সুখের কথা এই যে, চাউলের ব্যবসাটা এখনও বাঙালী মহাজন, আড়তদার-গণের হাতে আছে, কিন্তু ইহাও যে বেশী দিন থাকিবে মনে হয় না; কারণ, বর্ম্মার চাউল-ব্যবসা ইংরেজ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। তাঁহাদের অর্থের জোর আছে, বাঙলার চাউল মনে করিলে বাঙালী মহাজন, আড়তদারদের সাহায্যেই হস্ত-গত করিতে পারে; তাঁহাদের পশ্চাতে রাজশক্তি রহিয়াছে এবং এ দেশের লোক যখন দরিদ্র, উদ্যমবিহীন এবং আত্মভোলা, তখন চাউলের ব্যবসা হস্তান্তর হওয়া ইংরেজ বণিকের ইচ্ছা ও সময় সাপেক্ষ।

বাঙলার উর্ব্বরাশক্তির কত অপহৃত হইয়াছে, তাহা কি আমরা দেখিতে পাইতেছি না? আলু হেন ফসল এখন বাঙলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মায় না; বর্ম্মা হইতে আলু এক জাহাজে না আসিলে, শহরে হাহাকার পড়িয়া যায়; এক আনা সেরের আলু এক বেলায় দুই তিন আনা সেরে উঠিয়া যায়। আলু এখন চাউলের ন্যায় বাঙালীর অপরিহার্য্য খাদ্য—অন্যান্য সবজীর চাষও এখন হয় না এবং লোকের রুচিরও এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, আলু ভিন্ন লোকের—কি শহর, কি মফঃস্বল—এক বেলা চলিবার উপায় নাই; অথচ এই আলুর জন্য আমাদিগকে বর্ম্মার মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়।

আলতা বাঙালী সধবা স্ত্রীলোকের অপরিহার্য্য প্রসাধন; এই আলতা পাতা তৈয়ারী করিয়া কত মুসলমান পরিবারের অন্নসংস্থান হইত, কারণ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বধ কার্য্যে হিন্দু অনিচ্ছুক বলিয়া এবং গালার কার্য্যে বংশনাশ হয় বলিয়া এই আলতা ও লাক্ষার কার্য্যে মুসলমানের একচেটিয়া শিল্প ছিল; বাঙালী হিন্দু ঐ সকল তৈয়ারী জিনিষের কারবার অর্থাৎ কেনা-বেচা করিত। এই কারবার গন্ধ-বণিক সমাজের একচেটিয়া কারবার ছিল; এজন্য দেশের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল। এখন জার্ম্মান রঙের সাহায্যে তরল আলতার সৃষ্টি হওয়ায় ব্যবসা গতায়ু বলিলেই হয়। বিবাহাদি ধর্ম্মসংগত কার্য্যে এখনও আলতা অপরিহার্য্য বিধান থাকায় কিছু কারবার এখনও আছে। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, তরল আলতা অপেক্ষা আলতা-পাতা কত সস্তা ও সুবিধাজনক। ইহার জন্য শিশিবোতল আবশ্যক হয় না; শিশি ভাঙ্গিয়া বাক্স পেঁটরার মধ্যেই জিনিষ রংগাক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই; ইহা এত হালকা যে, ইহা ইতস্ততঃ লইয়া যাইবার পক্ষে কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয় না। এত আর্থিক ও ব্যবহারিক সুবিধা সত্ত্বেও এবং এদেশের গরীব মুসলমানদের স্ত্রীলোকদের অবসর সময়ে অর্থ রোজগারের উপায়বিশেষ হইলেও, অদূরদর্শী এ দেশের গন্ধ-বণিক সমাজ এ ব্যবসাটির ক্রমোন্নতি না করিয়া, তাঁহারাই জার্ম্মান রঙ, শিশি এবং সুগন্ধি এসেন্স মিশ্রণের জন্য আমদানী করায় স্বীয় সমাজের ও দেশের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে।

উদাহরণস্বরূপ আরও অনেক জিনিষের উল্লেখ করা যাইতে পারে। হুঁকা-কলিকা ত্যাগ করিয়া সস্তায় ধুমপানের অজুহাতে আজ কলিকাতায় দুই কোটি টাকা কেবল বিড়ির পাতায় আমরা বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের ব্যবসায়ীদের হস্তে তুলিয়া দিতে কৃতসংকল্প বলিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতেছি। কিন্তু বিড়ির কারবারে মালের দরুন যাবতীয় অর্থ ও বিড়ি তৈয়ারীর লাভ যায় বোম্বাইওয়ালার পকেটেই বেশী, ইহা কেহ ভাবিয়া দেখি না। আমরা বাঙালী যখন শোষকের শীকার হইয়া নিজেদের অতি কষ্টার্জ্জিত অর্থ হইতে নানা উপায়ে বঞ্চিত হইতেছি, তখন আমাদের আত্মরক্ষার উপায় স্থির করা কি উচিত নহে? যাঁহারা মনে করেন যে, রাজানুকূল্য ব্যতীত কিছু করিবার উপায় নাই, তাঁহাদের ধারণা কত ভ্রান্ত, তাহা এক ট্রাম কোম্পানী ও পেট্রোল কোম্পানীদের সহিত এদেশের লোকের যুদ্ধ ও সাফল্য হইতেই প্রমাণ করা যায়। ট্রাম কোম্পানীকে নতজানু ও ভাড়া কমাইবার জন্য গবর্ণমেন্ট বা কর্পোরেশন কাহারও সাহায্য লইতে হয় নাই; মাত্র দুই চারিজন বাস মালিকের আন্তরিকতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, অর্থানুকূল্য এবং জনসাধারণের সহানুভূতি সাহায্যেই অঘটন ঘটান সম্ভবপর হইয়াছিল। সে কয়জন বাঙালী যদি বাস কারবারে থাকিত, তাহা হইলে কারবারটি আজ অ-বাঙালীর হাতে চলিয়া যাইত না; কয়জন লোভী স্বার্থান্ধের জন্যই আজ বাঙালী এই কারবার হইতে অন্তর্হিত। সেকথা যাক, এই যে ট্রাম কোম্পানীকে দাবান, ইহা দুই চারিজন বাঙালীর দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছিল; সেইরূপ উপরি কথিত ব্যবসায়ীদের সংযত ও শাসিত করা আদৌ দুরূহ নহে; যদি বাঙালী জনসাধারণ তাহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি বিতরণে কার্পণ্য না করে। ট্রামের বিরুদ্ধে যাহা সম্ভবপর হইয়াছিল, শোষক অ-বাঙালী ব্যবসায়ীকে শাসিত করিতে তদপেক্ষা অধিক আয়োজন করিতে হইবে না—চাই আন্তরিক চেষ্টা, সাহায্য, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সহানুভূতি। বাঙালী খরিদ্দার (খরিদ্দার নয় কে?) কি এ বিষয়ে অবহিত হইবেন? তাহা হইলে আর এক নূতন যুগের আরম্ভ করা যায়। ইহার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু মুখের কথায় কোনও কাজ হয় না—'কথার গোপাল' অনেক আছে, 'কাজের গোপালে'র সংখ্যা কম হইলেও দুর্লভ নহে।'

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(৪৫৮ পৃষ্ঠার পর)

অত লজ্জায়ও অলকা হাসিয়া ফেলিল, তাহার দিকে চাহিয়া চক্ষের দৃষ্টিতে নারীর অন্তরের সমস্ত স্নেহই উজাড় করিয়া দিয়া সে বলিল, মামীমাই প্রস্তাব করেন, তিনিও খুশী মনে বাড়ীতে চিঠি লিখে দেন, কিন্তু দিনকয়েক পরেই তাঁর চোখ মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করে, পরের দিনই তিনি আমাকে বিয়ে ক'রতে রাজী হন—তারপর আর কিছুই নেই। এবার আসুন আপনি নীচে। সমস্ত কথাই জোর করিয়া থামাইয়া দিয়া সে প্রতুলের দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িল।

প্রতুলও এতটুকু ইতস্তত না করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই ত' চাই, এই না হ'লে আর দিদি। তুমিও ব'সে থাক হে বন্ধু, ভাগ কিছু পাবেই। বাঙালী মেয়ে যখন তখন আর ইংরেজী মতে কাজ করতে পারবে না, এ ভরসা দিতে পারি। (ক্রমশ)

নদী মাতৃক

(ছোটগল্প)

শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

শীর্ণ স্রোতস্বতী।

স্রোতস্বতী কথায় নদীর প্রকৃতস্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না। কারণ সামান্যতম স্রোত থাকিলেও নদীটি বর্ত্তাইয়া যাইত। আসলে উহাকে দেখিলে খাল বলিয়াই ভ্রম হয়। শুধু ভ্রম হওয়াই নহে চারিপাশের গ্রামের লোকের মুখে অনেকদিন হইতে ঐ নামটিই চলিয়া আসিতেছে।

অপরাহ্নের নদী, পড়ন্ত রৌদ্রে একফালি ইস্পাতের মত। নদীটি কিছুদূর যাইয়াই যে বিস্তৃত বালুচরে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছে এ পর্যান্ত শতচেষ্টা করিয়াও পথ খুঁজিয়া পায় নাই, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এখানে দাঁড়াইয়া তুমি তাহা দেখিতে পাইবে না। দেখিতে পাইলে নদীর সহিত প্রথম পরিচয়েই তুমি উহাকে 'খাল' বলিয়া উপেক্ষা করিতে এবং গ্রামের লোকও যে এতটা সহ্য করিত এমন নহে। ফলে গল্পের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করিয়া অন্য প্রণালীতে পথ খুঁজিতে হইত। নদীর বাঁক পরবর্ত্তী নিঃশেষের কথা যে এ গ্রামের লোকের অজ্ঞাত ছিল তাহা নহে বরং তাহাদের বলিষ্ঠ আত্মচেতনায় নদীর এমন নিলর্জ্জ দারিদ্র্যের কথা অবিরাম আঘাত করিত। বিশেষ করিয়া যে নদীকে লইয়া সে গ্রামের লোক রীতিমত গর্ব্ব করিয়া আসিয়াছে একদিন। দুদশখানা গ্রামের ভিতর এই একটি মাত্র নদী। যে নদীকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ বুকের রক্ত দিতে পারিয়াছিল—তাহাকে বুকের দরদ দিয়া যদি ভালই না বাসিতে পারিল তাহা হইলে 'বংশধর' হইয়া জন্মিয়াছিল কি জন্য তাহারা? না, নদীকে তাহারা ভালবাসিয়াছিল, যেমন করিয়া মানুষ ভালবাসে প্রথম বয়সে তাহার স্ত্রীকে যাহাকে কেন্দ্র করিয়া চলে পুরানো দিনের অক্লান্ত প্রাত্যহিক পুনরাবৃত্তি। তবুও যে যুক্তিতে আমরা ঘরের ভিতর পর্দ্দা টাঙাইয়া অপরার্দ্ধের বিদ্যমানতার কথা সযত্নে ভুলিয়া থাকি—সেই একই যুক্তিতে তাহারা নদীর এই নগ্নদিকটা উপেক্ষা করিয়াই চলিত—হয়ত না চলিয়া উপায় ছিল না বলিয়াই। আজ যে নদীটি নিরীহ ভিজা বিড়ালের মত পড়িয়া রহিয়াছে—যাহার স্বল্প-গভীর জল ভেদ করিয়া মানুষের দৃষ্টি পাঁজরে যাইয়া বিঁধিতে কিছুমাত্র বাধা সৃষ্টি হয় না, যাহার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় রিক্ততার উলঙ্গ আত্মপ্রকাশ মানুষের মনে স্বভাবতঃই হতাশা-মিশ্রিত বিপদের সৃষ্টি করে—যাহার প্রতিপদক্ষেপে শ্বাস টানিয়া [illegible]র মন্থর ক্লান্তি—তাহার ভিতরও যে বর্ষান্তে একবার যৌবনের বান আসিয়া থাকে—শুধু আসা নয় বেশ ভাল করিয়াই আসে এবং ভাঙিগয়া চুরিয়া যে প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া তোলে নদীর সে সর্ব্বগ্রাসীরূপ কল্পনার হালকা ঊর্দ্ধাকাশে মেলিয়া ধরিয়াও তুমি কল্পনা করিতে পারিবে না। এখানকার বাসিন্দাদের সকলেই যে পারে এমন নহে। আজন্ম সন্তানের রুগ্ন পাণ্ডুর মুখ দেখিতেই যে জননী চিরাভ্যস্ত তাহার সহিষ্ণু কাতর দৃষ্টি সন্তানের মুখে ক্ষণিক হাসির অভাবনীয় রেখা ফুটিয়া উঠিলেও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি ইহার নাই। সমগ্র বৎসরের মরু-প্রদেশীয় আবহাওয়ার ভিতর বসন্তের এই অঙ্গসঞ্চালন এত ক্ষণিক এবং ইহার ক্ষণস্থায়িত্ব এমন বর্দ্ধিষ্ণু গতিতে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে যে, নদীর অদূর ভবিষ্যতের চিন্তাই তাহাদের পীড়া দেয় সব চাইতে বেশী। প্রায় নিয়ম হইয়া দাঁড়াইলেও নদীর জীবনের এই ক্ষণিক মহোৎসবের দিনে তাহারা হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে—স্রোতের স্বেচ্ছা-চারিতা রুদ্ধ করিতে কদাচিৎ অঙ্গুলি হেলন করে। স্রোতের টানে অনেকের বাড়ী-ঘর ভাঙিগয়া ভাসিয়া যায়, তবুও তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার কথা ভাবিতে পারে না। একবার নীড় লাঙিগলে একটু সরিয়া আবার নীড় বাঁধে। নদী তাহাদের ছাড়িতে চাহিলেও তাহারা নদীকে ছাড়িতে পারিবে না। তাহা ছাড়া তাহারা প্রায় দার্শনিক হইয়া ওঠে: পদে পদে লাভ-লোকসানের চুল-চেরা বিচার করিতে বসিলে জীবনের উপর অবিচার হইবার সম্ভাবনাই ত পুরোমাত্রায়! তাই প্রতিবৎসর বর্ষায় গ্রামের লোকের যা' ক্ষতি হয় তাহার পরিমাণও সামান্য নহে। তবুও ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারা ইহারই কথা ভাবে—ইহারই ধারে আসিয়া বসে। রুগ্ন সন্তানের জন্যই মায়ের মমতা সবচাইতে বেশী। দৈনন্দিন জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর সহিত যাহার অস্তিত্ব এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে, তাহাকে বাদ দিয়া কোন চিন্তাই তাহাদের মনে বাসা বাঁধিতে পারে না। তাই ইহারা মৃত পুত্রের অস্থি বিসর্জ্জন দিয়া শিশুর মত এই নদীরই শাপান্ত করে এবং পরমুহূর্ত্তে এই নদীরই পাড়ে বসিয়া মূক প্রকৃতির মুখে সান্ত্বনার ভাষা খোঁজে

এহেন মহানদীকে বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। চন্দনার সংস্কার-সাধনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঊদ্ধর্বতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিতেও তাহাদের ভুল হয় নাই—সরকারও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; কিন্তু অনিবার্য্য কারণে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ইহা স্থগিত রহিয়াছে। 'অনিবার্য্য কারণ' ও 'অনির্দ্দিষ্টকাল' গ্রামের যুবকেরা কেহ কেহ ইহার কদর্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, বলিয়াছে, বাজে কথা! কিন্তু কাহাকেও বিশ্বাস করাইতে পারে নাই। দূরাগত কালের মৃদু পদধ্বনি উপলব্ধি করিয়া তাহারই জন্য গুনিয়া গুনিয়া দিন কাটাইবার নিশ্চেষ্ট অভ্যাস ইহাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

হেমন্তের বিকাল। পূজার পর কালীপ্রতিমাকে আজ বিসর্জ্জন দেওয়া হইবে।

সারাগ্রামে এ[illegible]কটিমাত্র কালীপূজা। শুধু কালী-পূজা কেন উৎসব বলিতেও বৎসরের মধ্যে এই একটি। আগে অবশ্য দোল, দুর্গোৎসব কোনটাই বাদ যাইত না। আর পূজাপার্ব্বণের আনুষঙ্গিক আমোদ-প্রমোদের আয়োজনও যে একান্ত কম হইত অতি বড় নিন্দুকও একথা মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করিবে না। আমোদ-প্রমোদে গ্রাম হইতে যত টাকা বাহির হইয়া যাইত তাহার সংখ্যাও নেহাৎ নগণ্য হইত না। কিন্তু কি বলে, সে রামও নাই সে অযোধ্যাও—!

সেদিনের সে সব আয়োজনের ভগ্নাংশের একাংশ হিসাবে আজিকার এই প্রথাটিই এ পর্যন্ত টিকিয়া আছে। শীত-শীর্ণ গাছের শেষ পাতাটির মতই করুণ বিপর্যস্ত এই পূজাটি।

বৎসরের এই একটি দিনে চন্দনার তীরে দশখানা গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়ে। আজিকার দিনের প্রতিটি মুহূর্ত তাহারা নিঙরাইয়া উপভোগ করিবে। তাহাদের একঘেয়ে জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত অলস স্নায়ুকোষগুলি আজ যদি প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরিয়া উঠিতে পারে, উঠুক—জীবনে যদি কিছুমাত্র বৈচিত্র্য আসে ত আসুক। এমন দিনেও দূরে রাখিয়া নিজেকে তাহারা বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

এই উপলক্ষে নদীর তীরে একটি মেলাও বসিয়াছে। প্রতি বৎসরই বসিয়া থাকে।

বিচিত্র বেশভূষায় সাজিয়া দলে দলে ছেলে-মেয়ে ঘুরিয়া বেড়ায়—রঙের বৈচিত্র্যে এবং চঞ্চল অথচ লঘু পদবিক্ষেপের মাধুর্যে তাহারা কেবল প্রজাপতির সহিতই উপমিত হইবার যোগ্য।

ঐ একদিকে একটা বেদেনীকে ঘিরিয়া একদল লোক জটলা করিতেছে। আর বেদেনীটি নৃত্যকলার সকলগুলি কৌশল উজাড় করিয়া দর্শকের পকেট উজাড় করিবার আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যস্ত রহিয়াছে। তাহার প্রতিটি নৃত্যচ্ছন্দে যেন সুষমা ঝরিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে সে হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে। আবার ইহারই ভিতর অবসরমত দর্শকদের মুখের দিকে এমন সরলভাবে তাকাইতেছে যাহা দেখিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে ঘর ছাড়িয়া যাযাবরদের দলে মিশিয়া যাই। কিন্তু পরমুহূর্তেই নির্মাক যে একটি সিকি ছুড়িয়া দিয়াছিল, তাহার দিকে এমনভাবে তাকায় যে, বেচারা চোরের মত একান্তে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। সাপ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে নির্মকির স্বভাবও সাপধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছে হয়ত এবং ইহারই জোরে একা সে এতগুলি পুরুষকে নাজেহাল করিয়া ছাড়িতেছে। নির্মকি—সেই জাদুকরী যেন আজ!

একটু দূরে পুতুলনাচ হইতেছে। ইহাকে ঘিরিয়া খণ্ড একটি জনতা কলগুঞ্জন সুরু করিয়াছে। কেহ কেহ হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। আর একটু দূরে সাপ খেলা—আরও একটু দূরে ইরাণীদের দোকান। এখানে ভিড় অপেক্ষাকৃত কম। একটি ইরাণী মহিলা পুরুষের বেশে বসিয়া এটা-ওটা বেচিতেছে আর কৌতূহলী জনতা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। কাছে ঘেঁসিবার সাহস অনেকেরই নাই। জনৈক ভদ্রলোক একটি ছুরি কিনিতে যাইয়া পছন্দ হয় নাই বলিয়া ফেলিয়া আসিতে চাহিয়া কিভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন—ইহারা তাহাই উপভোগ করিতেছে। ভদ্রলোকের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া কেহ বা বিজ্ঞের মত হাসিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতেছে। এতদঞ্চলে ইরাণীরা 'গলাকাটা' বলিয়া পরিচিত।

আরও দূরে—মেলার মাঠের শেষপ্রান্তে একটা তাঁবু পড়িয়াছে। এখানে যিনি তাঁবু গাড়িয়াছেন তিনি অন্যের নিকট হইতে একটি বিকলাঙ্গ সন্তান কিনিয়া তাহারই সাহায্যে কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় আসিয়াছেন। এই তাঁবুর বাহিরে লোকসংখ্যা সবচাইতে বেশী। কিন্তু তাঁবুর ভিতর প্রবেশিকা দিয়া প্রবেশ করিবার সাহস অথবা সঙ্গতি না থাকায় তাহারা বাহির হইতে উঁকি-ঝুঁকি দিয়া ভিতরের জিনিষ দেখিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ক্রমাগত গলাধাক্কা খাইয়া ফিরিতেছে। এককথায় সমুদ্রে বুদ্বুদপুঞ্জের মত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত টুকরা টুকরা জনতা ভাসিয়া বেড়াই-তেছে—ফাটিয়া পড়িতেছে কখনও বা।

মেলা যখন ভাঙ্গিল রাত্রি তখন সবে কৈশোর অতিক্রম করিয়াছে। দূর হইতে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই চলিয়া গিয়াছে, কেহ-বা যাইবার যোগাড় করিতেছে। একমাত্র প্রৌঢ়দের মহলে তখন পর্য্যন্ত ভাঙনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। উপরন্তু তাঁহাদের ভিতর আলোচনা এখনই জমিয়া উঠিয়াছে। এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত একটি দিনকে এত সহজেই ছাড়িয়া দিতে তাঁহারা চাহেন না।

কথা হইতেছিল চন্দনা-সংস্কার সম্বন্ধেই।

—কিহে তোমাদের নদী কাটানোর কতদূর কি হল—নারীসম্পর্কিত আলোচনার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া দুহাতে সরাইয়া উদয়কে লক্ষ্য করিয়া মুরুব্বিচালে লালনবাবু প্রশ্ন করিলেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁহার বিরাগ এ অঞ্চলের সকলে এককথায় স্বীকার করে।

উদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট। তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যই এই যে, সে অনায়াসে সকলের সহিত মানাইয়া চলিতে পারে। শিশুদের ভিতর আজগুবি গল্প করিয়া, মেয়েদের ভিতর সাড়ি-ব্লাউজ-সিনেমাতারকা সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করিয়া, তরুণদের ভিতর চুলের ফ্যাশান হইতে সাহিত্য পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়া এবং বৃদ্ধদের ভিতর নীতি-বাক্য (?) শুনিয়া ও মাঝে মাঝে শুনাইয়া সে সর্ব্বত্র স্বল্পায়াসে আপন প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। অথচ—বিস্ময়কর মানুষের পরিবর্ত্তন! সেদিন পর্য্যন্ত গ্রামের কোথায়ও প্রাধান্য ত দূরের কথা, তাহাকে কেহ আমলই দিত না—উদয়ের সে যোগ্যতার অভাব ছিল। ডানদিক ও বাঁদিক—যা নাকি আমাদের দেশের গাভী নামক জন্তুটিও সহজেই বুঝিতে পারে—সে সম্বন্ধে অতর্কিত প্রশ্ন করিলে হাতের সহিত মুখের যোগাযোগ যাচাই না করিয়া যে উদয় কোনদিন উত্তর দিতে পারে নাই—যাহার পরণের কাপড় হাঁটুর নীচে নামিয়া আসিতে এ পর্যন্ত কেহ দেখে নাই—যাহার চুলের সামনে ও পিছনে কোন তফাৎ এ পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারিল না কোনদিন—সেই উদয় যখন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কয়েকমাস কলিকাতার কলেজে কাটাইয়া পূজার বন্ধে গ্রামে বেড়াইতে আসিল, তখন তাহার ধুতি গোড়ালিরও নীচে নামিয়া আসিয়াছে—অনাবশ্যক দাক্ষিণ্যে জামার গলা অনেক ফাঁক হইয়া গিয়াছে—ঘাড়ের গোড়ার চুল ধরিতে যাইয়া হাতের সহিত চামড়া উঠিয়া আসিয়াছে, আর কথায়বার্ত্তায় চালচলনে পুরাদস্তুর 'স্মার্ট'

হইয়া ফিরিয়াছে। কলিকাতার আবহাওয়া উদয়ের জীবনে ঔষধের কাজ করিয়াছে—ইহা ম্যালেরিয়ায় কুইনিনের মত অব্যর্থ—ক্ষয়রোগে গোপালপুর অন্-সি-এর, মত শুভ। গলাটা ঈষৎ মোলায়েম করিয়া সে কহিল—আপনারা থাকতে আমাদের মত ছেলে-ছোকরা—

লালনবাবু হাসেন। কৃতজ্ঞতার হাসি।

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া উদয় চুপ করিয়া থাকে।

—হাজার চেষ্টা করলেও কিছু হবে না হে। এসব দেব-দেবী নিয়ে কারবার—নৈবেদ্য চাই। প্রসঙ্গক্রমে দেবতার কথা আসিয়া পড়াতে লালনবাবু যুক্ত-করে দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। সকলের চক্ষু ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার উপর আসিয়া স্থির হইল।

একটু পরেঃ

দাম কিছু দিতে হবে বৈকি! এত বড় একটা সুবিধে তোমরা চাচ্ছ, অথচ সেজন্য কিছু দেবে না একি হয়? বড় একটা ত্যাগ স্বীকার করে দেখিয়ে দিতে হবে তোমাদের অভাবের তীব্রতা কত বেশী—আসল কথা ত্যাগ চাই। ত্যাগেই মুক্তি, ভোগে নয়ঃ লালনবাবু প্রায় দার্শনিক হইয়া ওঠেন। সময়ে অসময়ে দার্শনিক বুলি আওড়ান তাঁহার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এস্থলে লালনবাবুর অনধিকার-চর্চ্চার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেই ব্যাপারটি ফৌজদারী পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিত—তাই কেহ মুখ খুলিলেন না। তিনি আবার আরম্ভ করিলেনঃ—এ সব শক্তির উপাসনা, মন শক্ত করতে হবে। রক্ত চাই হে—লালনবাবু দৃপ্তভঙ্গীতে সকলের মুখের দিকে তাকান।

—কে যেন বলেছেনঃ ঢোক গিলিয়া তিনি সুরু করিলেন—কে যেন বলেছেন, 'শক্তির পায়ে জবার অর্ঘ্যই মানায়, গোলাপ শত সুন্দর হলেও'—অত্যন্ত খাঁটি কথা হে! যার যেমন তার তেমন হুঁ!.........দম লইয়া তিনি পুনরায় যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষিপ্ত করিলে এই দাঁড়ায় যে, চন্দনার উদ্ধারের জন্য রক্তের প্রয়োজন হইবে, মানুষের রক্ত। মহৎ জিনিষের জন্য মহৎ ত্যাগ না করিলে চলিয়াছে একথা তাহারা শুনিয়াছে নাকি কোনদিন?—সকলের উপর বিচারের ভার ছাড়িয়া দিয়া লালনবাবু শান্ত হইলেন।

বিচার না হয় পরেই হইত—কাহারও বাকস্ফূর্ত্তি পর্য্যন্ত হইল না।

কিছুক্ষণ পরেঃ

রাত্রি প্রায় বারটা। অসংখ্য নক্ষত্রের চাপে দিগন্ত-রেখায় আকাশ সামান্য নুইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র গ্রামখানির উপর চাপা নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছে। সারাদিনের ক্লান্তির পর যে যেখানে পারিয়াছে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কাল সকালে উঠিয়া গেলেই চলিবে। প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর বৃহদাকার কোন জন্তু যেমন করিয়া ঝিমায়, সারাদিনের উত্তেজনার পর বাড়ীগুলি তেমন করিয়া ঝিমাইতেছিল যেন। পাশের গ্রামের কলরব ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া মহাশূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। উদয় একা পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল।

কে বাবু! উদয়ের সামনে দাঁড়াইয়া নিমকি!

মেলায় উদয় নিমকির হাতে একটা সিকি ছুঁড়িয়া দিয়াছিল এবং তাহার কৃতজ্ঞতার বুকনি গলাধঃকরণ করিতে না পারিয়া সে-ই চোরের মতন সরিয়া পড়িয়াছিল। বাবুকে সে চিনিয়া রাখিয়াছে।

হাঁ, আমি। তুমি এত রাত্রে কোথায় চলেছ নিমকি? উদয়ের গলায় বিস্ময়, চোখে আগুন।

—কোথায় আর যাব বাবু—নিমকি হাসিবার চেষ্টা করে, সে হাসি-কান্নারই নামান্তর। যাবার জায়গা কি কোথায়ও আছে! যা গরম—

কার্ত্তিক মাসে কাহারও অসহ্য গরম বোধ হইলে উহা সম্ভবত মানসিক উত্তেজনাজনিত। উদয় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। নিমকির গলায়ও নিপীড়িতের কান্না শুনিল নাকি সে?

—তোমার পিঠের এ দাগগুলো কিসের নিমকি?—পাশাপাশি হাঁটিতে হাঁটিতে ধরা-গলায় উদয় প্রশ্ন করিল।

উত্তরে হি-হি করিয়া হাসিয়া রাতের আকাশ খান খান করিয়া ফেলিল নিমকি। মাথার উপরে ডানার ঝাপটা দিয়া একটা বাদুড় উড়িয়া গেল।

—আমাদের নৌকায় একবার যাবে বাবু! উদয়ের হাত ধরিয়া নিমকি অসহায়ভাবে চাহিল। দুপুরের আকৃতি তাহার চোখ হইতে মুছিয়া গিয়াছে—সেখানে নামিয়া আসিয়াছে স্তিমিত শীতল শান্তির অজস্র তমিস্রতা।

—তোমাদের নৌকো কতদূরে নিমকি?—শুধু প্রশ্নের জন্যই যেন উদয় এ প্রশ্ন করিল। তাহারা পা চালাইয়াছিল অনেক আগে।

—ও-ই যে—নিমকি তাহার সুডোল বাহু প্রসারিত করিয়া দূরের স্তিমিতপ্রায় আলোর দিকে ইসারা করিল।

—তুমি ওখানে একলা থাক নাকি?—ভয় করে না একটুও! উদয়ের স্নায়ুগুলি এতক্ষণে অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে।

নিমকি আবার হাসে—হি-হি-হি সেই অজস্র ফাটিয়া পড়া হাসি। একেলা থাকিবে কেন সে? তাহার মংলুই ত আছে? দুইজনে একদিকে থাকিলে আর রাজ্যের সব কিছু তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও তাহারা ভয় করে না।

হাসিলে নিমকিকে এত সুন্দর দেখায়—উদয় এই প্রথম আবিষ্কার করিল। নিমকিকে তাহার অপরূপ মনে হয়। লম্বা-নিটোল চেহারা—পাথরের মত মসৃণ, কোথায়ও এতটুকু ফাঁকি নাই, বাহুল্য নাই। সব কিছু অত্যাশ্চর্য্য রকম পরিমিত। অর্দ্ধাঙ্গকে ঘিরিয়া একটি ঘাগরা, বুকে পিঠে এক টুকরা কাপড়—তাহাও কৃপণ, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। পোষাক পরিবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত আঁটসাট—উদ্ধত। মুগ্ধ শ্রোতার মত তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া উদয় আত্মতৃপ্তিতে ম্লান করিয়া উঠে। যাযাবরীর আড়ম্বরহীন সরলতা সব চেয়ে স্বর্গীয় বলিয়া মনে হয় উদয়ের।

—মংলু নেশা করে—তুমি কর না নিমকি?

নিমকি সহসা গম্ভীর হইয়া পড়ে। হি-হি বাবু তাহাকে অতটা ছোট মনে করেন কেন?

—তুমি রাগ ক'র না নির্মকি। তোমাদের অনেকেই করে কিনা তাই—

নির্মকি ততক্ষণ নৌকায় যাইয়া বসিয়াছে।

—আচ্ছা, মেলায় তুমি ও রকম করে নাচ কেন বলত? নির্মকির আংগুলগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে উদয় জিজ্ঞাসা করে।

—না নেচে করি কি বল : নির্মকি সোজা হইয়া বসে : তোমাদের মত লোক ত আর সকলে নয়। নির্মকি প্রায় উত্তেজিত হইয়া পড়ে : আমি ওদের ঘৃণা করি বাবু! উপায় থাকলে আমি কি যেতাম নাকি—নির্মকি কাঁদিয়া ফেলে—মংলুর পা-টা সেবার কাটা গেল—ও ভাল থাকলে আমাকে কোন কাজ ক'রতে দিত নাকি ভেবেছ। পরিপূর্ণ প্রেমের আনন্দে গভীর হইয়া নির্মকি বলে : ও আমাকে বড্ড ভালবাসে বাবু! 'এ সব কথা আমাকে শুনাইয়া লাভ কি'—উদয় অস্বস্তি বোধ করে। 'ও যদি একবার শোনে তা'হলে না খেয়ে মরবে বাবু, তবু আমাকে বাইরে যেতে দেবে না—নির্মকি আবার হিংস্র হইয়া উঠে।

মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এমনভাবে কয়জন বলিতে পারিয়াছে? মুহূর্তে উদয় গুটাইয়া গেল শামুকের মত। অতল আকাশে তখন জোৎস্নার বান ডাকিয়াছে। নির্মকির নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয় রাস্তায় আসিয়া নামিল।

নৌকার উপর দুমদাম শব্দ উদয়ের কানে আসে। নির্মকি একাই আবার নাচিতে সুরু করিয়াছে হয়ত। এত প্রাণ-প্রাচুর্য্য লইয়া আসিয়াছে মেয়েটা!

পরদিন সকালে সকলে চন্দনার বুকে দুইটি মৃতদেহ ভাসিয়া থাকিতে দেখিয়াছে। বিকৃত শবদেহ দেখিয়াও উদয়ের নির্মকিকে চিনিতে বাধে নাই—অপরটি মংলু, ইহাও সে সহজেই অনুমান করিতে পারিয়াছিল। বিশেষ কিছু নহে—খানিকটা জল কিছুক্ষণ লালচে ও ঘোলাটে হইয়াছিল শুধু।

কয়েক বছর পরে—

চন্দনা পুনর্যৌবন লাভ করিয়াছে। যে বছর নির্মকির মৃত্যু হয়, তাহার পর বছরই সরকার হইতে নদীর মুখ কাটিয়া দেওয়া হয়। নির্মকির ফুটন্ত রক্তেই হয়ত সদাফল ফলিয়াছে। লালনবাবুর স্বপ্ন একেবারে মিথ্যা নয় হয়ত।

চন্দনায় এখন বারমাস নৌকা চলাচল করে। অনেক বেদে নৌকাও।

শত চেষ্টা করিয়াও উদয় দুই-চোখের পাতা এক করিতে পারে না। তাহার চোখ হইতে নিদ্রা নামক বস্তুটি কে যেন কাড়িয়া লইয়াছে এবং সেখানে রাখিয়া গিয়াছে অনিদ্রাজনিত আগুন। সে স্পষ্ট দেখিতে পায়—মংলু লাফাইয়া লাফাইয়া আসিতেছে।

—নির্মকি! মংলুর চোখে বাঘের হিংস্রতা : গলায় দৃপ্ত গাম্ভীর্য্য।—কে এসেছিল রে?—মংলু তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে।

—একজন বাবু—নির্লিপ্ত-গলায় নির্মকি বলে।

—ডেকে নিয়ে আসা হয়েছিল—বিকৃতকণ্ঠে মংলু চীৎকার করিয়া ওঠে।

'হ'য়েছিল'—নীচের ঠোঁট দাঁত দিয়া চাপিয়া নির্মকি শুধু বলে। (ও আজ এভাবে উত্তর দেয় কেন? দুপুর রাতে মংলুর সাথে ঝগড়া করিবে নাকি ও!)

—কেন হয়েছিল শুনতে পারি? মংলু পাল্টা প্রশ্ন করে। (ছি-ছি, মংলুর মন এত সন্দিগ্ধ! আর নির্মকি কিনা একবারও এ কথাটা জানান দরকার মনে করেনি?)

—আমার ইচ্ছে—(নির্মকির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিল নাকি শেষ পর্যন্ত!) তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিতে নির্মকি জবাব দিল। বিদ্রোহের অগ্নিকুণ্ডের অকম্পিত শিখাগুলি সারি বাঁধিয়া তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আঃ মংলু ওটা তুলে নেয় কেন?.........নির্মকি পঙ্গু হয়ে গেল নাকি?.........সে বাধা দিক.........**না হ'লে**........ ওই যে নির্মকির মুণ্ডটা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল........একি মংলু খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার দিকে ছুটে আসছে কেন?

কৈফিয়ৎ? সে কি কৈফিয়ৎ দেবে? এ্যা! উদয় তন্দ্রার ঘোরে চীৎকার ক'রে ওঠে। তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া মালতী বলে, ভয় কি এই যে আমি,

বিকলভাবে উদয় শুধু বলে—হ্যাঁ, তুমি।

নদীতে তখন জোয়ার আসিয়াছে।

গাথা

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই শান্ত তপোবনে আশ্রম ছায়ায়
ফাল্গুনের কোনো এক উতলা সন্ধ্যায়,
আপনার মনে তুমি একা একা বসি
রচেছিলে শ্লোক গাথা;—হে চির-তাপসী!
সম্মুখে তোমার আম্র পণসের সারি
আর দূরে দূরে ভয়-ব্যস্ত বনচারী
হরিণীর ত্রস্ত পলায়ন। নতমুখে
শ্লোকের গভীরে তুমি ব্যস্ত ছিলে সুখে
সাধনায়। তারপর কেটে গেছে দিন
আজ তুমি অতীতের ছায়ায় বিলীন
কর্ম-ব্যস্ত পৃথিবীর মোরা অনুচর,
আমাদের জীবনের প্রতিটি প্রহর
বড় মূল্যবান। তাই আজ তব নাম
ছাত্রের পাঠের মাঝে শুধু স্মরিলাম

দেবতার দান

(গল্প)

শ্রীসন্তোষকুমার সরকার

কালের গতি নদীর স্রোতের মত অবিশ্রাম গতিতে চলেছে। বছরের পর বছর কেটে যায়।.....

খোকা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। সুন্দরী খোকার আঙ্গুলে গুণে বলে—'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।' খোকা তার পাঁচ বছরে পড়েছে, সুন্দরী মনের আনন্দে দিনের কাজ করে যায়। সাঁঝের বেলায় খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে কালুর সঙ্গে সুন্দরী নেয় খোকার সম্বন্ধে গল্প ফেঁদে। সুন্দরী বলে—এমন রাজপুত্তুরের মত ছেলে। একে কিন্তু তোর সঙ্গে কাঠ কাটতে যেতে দেব না।' কালুর মনটা সেদিন মোটেই ভাল ছিল না। সে বলে—'তবে কি লেখাপড়া শিখিয়ে সাহেব-সুবো বানাবি। কুড়ান ছেলে তার আবার'—সুন্দরী তার মুখ টিপে ধরে। বলে—'চুপ্। খোকা যে শুনতে পাবে।' কালু আজ কোন বাধা মানে না। তার মনের কোণে আজ একখানা মেঘ জমাট বেঁধেছিল। তাই সেটাকে পরিষ্কার করবার জন্য সে বলে চলে—'যার ধন সে যদি এসে ওকে নিয়ে যায় সুন্দরী।' সুন্দরীর মুখ রাঙা হয়ে উঠে। সে চেঁচিয়ে বলে—'দেবতার ধন দেবতা দান করেছেন। দান করে কেমন করে তিনি ফিরিয়ে নেবেন।.....'

জঙ্গলে ঘেরা গারো পাহাড়। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে উঠেছে একখানা পাতার কুটীর। কুটীরে থাকে সুন্দরী আর তার স্বামী। সুন্দরী সারাটি দিন বসে বসে কুটীরখানাকে সাজাতে থাকে। আর তার স্বামী ভোর হতে সাঁঝ পর্য্যন্ত কাঠ কাটে। সাঁঝের বেলায় কর্ম্মক্লান্ত তনুখানি এলিয়ে দেয় বিশ্রামের কোলে। এমনি করে তাদের বিবাহিত জীবনের অনেক দিন যায় কেটে।........

বছর পাঁচেক পূর্ব্বের কথা।

সেদিন ভরদুপুরে কালু আসে বাড়ী ফিরে। সুন্দরী থায় অবাক হয়ে। বলে—'আজ যে এত শীগ্‌গির। অসু'........ কথাই যায় ডুবে, সামনে এগিয়ে যায় সুন্দরী কালুর কাঠ দেখতে। ঝুড়ীর মধ্যে দেখে এক শিশু। কোলে তুলে নিয়ে কালুর কাছে যেয়ে বলে—'কালু, এ পেলি কোথায়?' কালু হাসতে হাসতে বলে,—'এ দেবতার দান।' কতদিন রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে কত কথাই না বলত। তার মধ্যে ফুটে উঠত বেশী করে সন্তান-বিহীনতার কথা। সুন্দরী বলে যেত,—'আজ যদি একটা ছেলে থাকত, তাহলে সারাটা দুপুর তার সঙ্গে হেসে-খেলে কাটিয়ে বেড়াতাম।' কালু তার উত্তর দিত একটা ছোট্ট নিশ্বাস ছেড়ে—'দেবতা না দিলে হয় নারে সুন্দরী।' এমনি করে তারা দেবতার পানে চেয়ে কাটিয়ে দেয় দিন। হঠাৎ আজ যখন বনের ধারে একটা শিশুকে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পেল তখন তাকে দেবতার দান ছাড়া আর কিছু বলে মানতে চাইল না কালু। সুন্দরীও তাকে দেবতার দান বলে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরে বুকে।

কালু এখন প্রায়ই কাজে যায় না। যদিও যায় দুপুর হলেই বাড়ী ফিরে আসে। কালুর কাজে এই রকম অবহেলা দেখে সুন্দরী সেদিন জিজ্ঞেস করে—তোর কাজে মন লাগে না কেন? কালু তার উত্তরে বলে,—'আমার আর ভাল লাগে না। অসুখ করে।' সুন্দরী বুঝে কোন্‌খানে তার অসুখ। তাই সেও আর কিছু বলে না। আরও নিবিড় করে ছেলেটাকে আঁকড়ে ধরে স্বামী-স্ত্রীতে।

.....বনের মধ্যে নদীর ধারে এক সরাইখানা। সরাইখানার লাগোয়া একখানা পাকা বাড়ী। বাড়ীর মালিকও ঐ সরাই-ওয়ালা। সম্প্রতি সেই বাড়ীতে এক বাঙালী বাবু এসেছেন। সঙ্গে আছে তার স্ত্রী। সরাইওয়ালা বলে যে বাঙালী বাবু খুব বড়লোক। তবে নাকি স্ত্রীর অনুরোধে এই প্রান্তরে আসতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। পুত্র বিয়োগের পর থেকে বাবুটির স্ত্রীর শরীর খুব ভেঙে পড়েছিল। তাই স্ত্রীর অনুরোধে ও জলবায়ুর পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসা। বাবু ও তার স্ত্রী গারো পাহাড়ের দিকে রোজই যান বেড়াতে।

হঠাৎ ফিরতি পথে তারা একদিন দেখতে পেলেন একটা ফুটফুটে নধর-কান্তি বালক। সে এক রমণীকে বলছে,—'ঐ ফুলটা পেড়ে দেনা মা।' আর কি মিষ্টি স্বর! কি সুন্দরই না চেহারাখানা ছেলেটির!

পথে চলতে চলতে বাবুর স্ত্রী বলেন,—'কি সুন্দর ছেলেটি। ও যদি আমাদের ঘরে আসত।' বাবু যেন কি ভাবতে থাকেন। স্ত্রীর কথায় উত্তর দেন না। 'শুনতে পেলে গা?' বাবুর চমক ভেঙে যায়—ব্যস্ত হয়ে বলেন—হ্যাঁ। ভাবছি, অমন ছেলে ওদের ঘরে কি করে এল। আমাদের মতন লোকের ঘরে আসাই ত স্বাভাবিক।.....'

দিন চারেক পরের কথা

সন্ধ্যার আর বিশেষ দেরী নাই, কোথা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খোকা বলে,—'আমার বড় ঘুম পাচ্ছে মা।' কাজ ফেলে রেখে সুন্দরী তাড়াতাড়ি করে আসে খোকার কাছে। তাকে কোলে তুলে নিয়ে সুন্দরী ঘুম পাড়াতে থাকে। খোকা হঠাৎ মার মুখের দিকে চেয়ে বলে,—'বাবা কখন আসবে মা। আমার বড় ভয় করে।' অজানা আশঙ্কায় সুন্দরীর গায়ে উঠে কাঁটা দিয়ে। আরও জোর করে খোকাকে ধরে বুকে চেপে। চুমু খেয়ে বলে,—'ভয় কি, সে এখুনি আসবে।' এমনি করে সুন্দরীর কোলে খোকা এক সময় পড়ে ঘুমিয়ে।

........রাত দুপুরে ঘুমের ঘোরে খোকা কেঁদে কেঁদে বলে—'মা যাব, তুই দাঁড়া।' তার কানে ভেসে আসে সুন্দরীর ডাক—'খোকা, খোকা।' চোখ মেলে খোকা বলে,—'মা, মা।' 'এই যে খোকা ভয় কি।' খোকা দেখে এতো তার মা নয়। চারিদিকে একবার চেয়ে বলে,—'মা, মা কই।' রমণী খোকাকে চুমু দিয়ে বলে,—'এই তো আমি তোর মা।' খোকা বিশ্বাস করে না, অবাক হয়ে বলে,—'এ কার বাড়ী। এখানে আমায় নিয়ে এল কে?' একটু ধমকের সুরে রমণী বলে,—'এ তো তোর বাড়ী চুপ করে শুয়ে থাক পাজি ছেলে কোথাকার।' খোকা আর কথা বলে না। চুপ করে শুয়ে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে আবার ঘুমিয়ে পড়ে এক সময়।

ভোরের শুকতারাটি তখনও দপ্ দপ্ করে জ্বলছিল। দূরে শোনা যায় কোন রাতের পাখী গায় একাকী সঙ্গীবিহীন

অন্ধকারে।' একটা দমকা বাতাস এসে খোলা জানলা দিয়ে খোকার গায়ে দেয় শীতের শিহরণ জাগিয়ে। চোখ মেলে জানলা দিয়ে হঠাৎ খোকা দেখে মাথার উপরে শুকতারাটি মিটমিট করে তার দিকে চেয়ে কি যেন সঙ্কেত করছে। ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখে দরজা খোলা। খোকা আর থাকতে পারে না, আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে নামে। চৌকাঠের উপর এক পা দিয়ে দেখে ও-ঘরে কেউ জেগে আছে কি না। টিক টিক করে পা ফেলে মিনিট খানেকের মধ্যে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। তারপর বাড়ীর দিকে একবার পিছন ফিরে দেখে কেউ তাকে দেখেছে কি না। শেষে রাস্তায় যেয়ে দেয় ছুট্।......

এমনি করে কি চলে যেতে হয় বাবা। উঃ—খোকা।' সুন্দরীর মাতৃ-হৃদয় ব্যথার ঘায়ে মুসড়ে পড়ে। চোখের জল মুছে কালু বলে,—'খামকা তার দোষ দিস কেন সুন্দরী? ভাগ্যে সইল না তাই তারা এসে জোর করে টেনে নিয়ে গেল।' খানিক দম ধরে থেকে কালু আবার বলে,—'সব পাষাণ, সুন্দরী সব পাষাণ। পায়ে ধরে বললাম,—বাবু ও না হ'লে আমরা বাঁচব না—ও আমাদের জীবন। দয়া করে ফিরিয়ে দিয়ে যান। ওঃ, তারা শুনল না সুন্দরী, বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। উঃ ভগবান।' শোকে মুহ্যমান হয়ে কালু যায় আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে। শোকের বেগ খানিকটা সামলে নিয়ে সুন্দরী বলে—সরকারকে জানালে হয় না কালু' 'ওরে তারা কি আমাদের কথা শোনে। আমরা যে গরীব। গরীবের কথা তারা শুনবে কেন?' এমনি ভাবে সারা রাত্তির ধরে স্বামী-স্ত্রীতে হা-হুতাশ করতে থাকে। সুন্দরী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। আর সময় সময় চেঁচিয়ে বলে—'খোকা ফিরে আয় বাবা। খোকা, খোকা।'

'মা, মা দোর খোল।' সুন্দরী কান পেতে শোনে। বাহির থেকে আবার শব্দ আসে—'দোর খোলা না মা শীগ্গির।' সুন্দরী তাড়াতাড়ি যায় দোর খুলতে। কালু বলে—'কে এসেছেরে, কে?' আনন্দে অধীরা হয়ে সুন্দরী বলে—'খোকা, খোকা।'

তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। পাখীর কাকলীতে সারা ভুবন মুখরিত হয়ে উঠেছে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুন্দরী বলে,—'আমাদের কি চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই কালু।' কালু ব্যস্ত হয়ে বলে—'না রে সুন্দরী আর কোন উপায় নেই। দেবতার দান মাথায় করে চল আমরা আজ এ দেশ ছেড়ে চলে যাই।'

সুন্দরী দু পা যেতে যেতে বলে—'কোথা যাব?' দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসে এক পথিকের কণ্ঠস্বর—

'ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে।'

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

(৪৪১ পৃষ্ঠার পর)

হইয়াছে। নিরঙ্কুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আধুনিক পরিকল্পনার জন্মদাতা (এইটিই এখন জন্মগ্রহণ করিতেছে বলিয়া মনে হয়)। উহার সকল দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও উহা ছিল একটি আবশ্যকীয় ধাপ, কারণ কেবল এইভাবেই বুদ্ধির সহিত আত্ম-নিয়ন্ত্রণশীল সমাজের পরিকল্পনাটি সুদৃঢ়ভাবে বিকাশলাভ করিতে পারিয়াছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিকাশপ্রাপ্ত সমাজের সম্বন্ধ ঐক্য আনয়ন করিতে কতদূর সক্ষম

কারণ রাজা বা অভিজাতবর্গ—যাহা করিতে সক্ষম হয় নাই, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ত সাফল্যের অধিকতর সম্ভাবনা লইয়া এবং অধিকতর নিশ্চিন্ততার সহিত তাহা চেষ্টা করিতে পারে এবং সিদ্ধির নিকটতর হইতে পারে,—তাহা হইতেছে বিকাশপ্রাপ্ত সমাজের সচেতন ও সুব্যবস্থিত ঐক্য সমরূপ ও বুদ্ধিসম্মত নীতি অনুসারে সুপ্রণালীবদ্ধ দক্ষতা যুক্তিসম্মত শৃঙ্খলা এবং স্বনিয়ন্ত্রণশীল উৎকর্ষসাধন। এইটিই হইতেছে আধুনিক জীবনের আদর্শ ও প্রয়াস, সে প্রয়াস যতই অপূর্ণভাবে করা হউক আর এই প্রয়াসই হইয়াছে আধুনিক প্রগতির সমগ্র হেতুবাদ। ঐকিকতা এবং সমরূপতা হইতেছে ইহার প্রধান প্রবৃত্তি, কারণ অন্যথা আমরা যে বিশাল ও সুগভীর জিনিষকে জীবন বলিয়া অভিভূত করা যাইবে, নির্দ্ধারণীয়ও পরিচালনীয় করিয়া তোলা যাইবে? সমাজতন্ত্র হইতেছে এই আদর্শেরই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। সমষ্টি জীবন যে সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি ও প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাদের সমরূপতা এবং ইহার উপায় স্বরূপ সকলের মূলগত সাম্য এবং রাষ্ট্রের দ্বারাই সকল অংশে সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিচালন; বৈজ্ঞানিক ধারায় সুব্যবস্থিত রাষ্ট্র পরিচালিত শিক্ষা দ্বারা কৃষ্টির সমরূপতা, সমগ্রটিকে এমন ঐক্যবদ্ধ, সমরূপ এবং সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণভাবে সুব্যবস্থিত গবর্ণমেণ্ট ও শাসনতন্ত্ররূপে প্রণালীবদ্ধ ও রক্ষা করা যাহা সমগ্র সমাজ-সত্তার প্রতিনিধিস্বরূপ হইবে এবং তাহার হইয়া কাজ করিবে—এইটিই হইতেছে আধুনিক আদর্শ সমাজ-স্বপ্ন, আশা করা হইতেছে যে সকল বর্ত্তমান বাধা ও বিপরীত প্রবৃত্তিসমূহ সত্ত্বেও এইটি কোন না কোন আকারে জীবন্ত সত্যে পরিণত হইবে। মনে হইতেছে, মানবীয় বিজ্ঞান প্রকৃতির বৃহৎ ও অস্পষ্ট ক্রিয়াসমূহের স্থান গ্রহণ করিবে এবং সমষ্টিগত মানবজীবনে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা অন্তত সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণতার নিকটবর্ত্তী কিছু আনিয়া দিবে। *

[illegible]

* The Ideal of Human Unity হইতে শ্রীঅনিল-

মানুষের চামড়ায় মুখোস

কুশপুত্তলিকা তৈরী করা সকল দেশেই প্রচলিত। বিশেষ করিয়া ক্ষেতের ফসল রক্ষায়, বাগানের তরীতরকারি ফলমূলাদি রক্ষায় বিচিত্র বসন-ভূষণে কুশপুতুল সকল সম্প্রদায়ের চাষীই ব্যবহার করিয়া থাকে—ইহাতে সুসভ্য অসভ্য জাতি ভেদে কোন পার্থক্য নাই। ইউরোপে এই প্রকার কুশপুতুলকে (Scare crow) প্যাণ্টালুন প্রভৃতি পরিহিত করা হয়। আমাদের দেশে ধুতি কাপড় না পরাইলেও ছেঁড়া জামা পরান হয়, মাথায় কালো হাঁড়ি স্থাপন করিয়া। পশ্চিম আফ্রিকার বন্য জাতির ভিতর এই প্রকার কুশপুতুল স্থাপন করা হয় ক্ষেত্রাদি ছাড়া বাসগৃহেও। তাহাদের বিশ্বাস ভূতপ্রেতাদি ঐ পুতুলের ভয়ে ঐ বাড়ীতে আর হানা দিবে না। এবং ভূত বিতাড়নের জন্যই ঐ সকল কুশপুত্তলিকার মুখমণ্ডল মানুষের চামড়া দিয়া মুড়িয়া সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। তাহার উপর অবশ্য রঙ

ফলাইয়া মূর্তিটিকে বিভীষিকাময় করা হয়। অবস্থা বিশেষে মুণ্ডের উপর শৃঙ্গও গড়িয়া দেওয়া হয়। একেবারে গৃহের সম্মুখে, যাহাতে সদাসর্বদা সকলের নজরে পড়ে এমন প্রকাশ্য স্থানেই ঐ কুশপুতুলকে স্থাপন করা হয়। এই মূর্তি যত বিভীষিকাজ্ঞাপক হইবে, বন্যজাতীয়দের বিশ্বাস, উহা ভূতপ্রেতকে দূরে রাখিতে ততটাই সক্ষম হইবে। পশ্চিম আফ্রিকা, বিশেষ করিয়া সিয়েরা লিওন উপনিবেশের অন্তর্গত পল্লী অঞ্চলে এই মূর্তি দেখা যাইবে প্রতি গৃহের সম্মুখে; একটি মূর্তি কোন প্রকারে বিনষ্ট হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ উহার স্থানে নূতন একটি বসান হইবে। কখনও গৃহের সম্মুখ খালি থাকিবে না। কি জানি কোন ফাঁকে দুষ্ট ভূত আসিয়া গৃহে প্রবেশ করে। সর্বদা এইজন্য তাহাদের গৃহে মৃতের (মৃত মানুষের) চামড়া সঞ্চিত থাকে। মুণ্ডটি মাত্র চামড়ায় মোড়া থাকে অপরাপর অঙ্গ ঐ দেশবাসীর ন্যায় স্বল্প বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকে।

সর্পের বংশ বৃদ্ধি

সকলেই জানেন সাপ একসঙ্গে অনেকগুলি ডিম প্রসব করে। আমরা সচরাচর যে সকল সাপ আমাদের দেশে দেখিতে পাই, উহাদের অনেকগুলি ডিম হয় একবারে। ঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও আনুমানিক পঞ্চাশটির মত হইবে। অবশ্য ইহা অপেক্ষা বেশীও অনেক স্থলে হইয়া থাকে। কিন্তু মলয় দ্বীপপুঞ্জে এক জাতীয় অজগর সাপ রহিয়াছে, তাহা আকারে যেমন বিরাট, ডিমও পাড়ে একবারে তেমনি অনেক বেশী। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন যে,
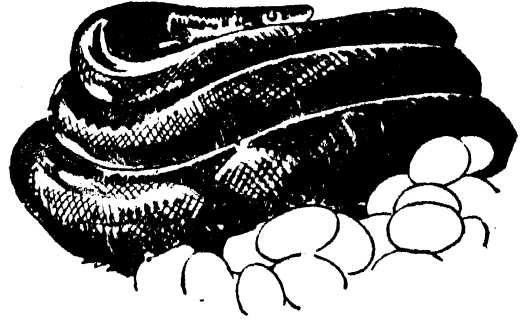
উহারা একবারে ১১০টি পর্যন্ত ডিম পাড়িতে পারে। ইহার সকলগুলি হইতেই যে বাচ্চা বাহির হয় অথবা সজীব থাকে শেষ পর্যন্ত, তাহা অবশ্য নয়। মাদী সাপ ডিম পাড়িবার পর তিন মাস পর্যন্ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ঐ ডিমের উপর তা দেয়। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইতে তিন মাস সময় লাগে। তাই তিন মাস ঠায়ে ডিমের উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া থাকে।

মৌমাছির অভিযান

ইষ্ট লিভারপুল ষ্টেশনে এক বাক্স মৌমাছি (উহাদের নীড় সহ) রেলওয়ে যোগে অন্যত্র প্রেরণ করিবার জন্য আনা হয়। পার্শেল অফিসে বাক্সটি রাখা হইলে পরেই মৌমাছি-দের গুন্ গুন্ গান আরম্ভ হয় এবং ঐ কক্ষের কর্মচারিগণ উহাতে বিষম বিরক্তি অনুভব করে। তথাপি তাহাদের কাজ বন্ধ করিলে চলে না। ক্ষুণ্ণ মনেই নিদারুণ বিরক্তির সহিত তাহারা কাজ করিয়া চলে। সহসা একটা উচ্চ শব্দ হইয়া বাক্সটির এক পাশের তক্তা ফাঁক হইয়া খুলিয়া যায়—আর ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি দ্বিগুণ রবে কক্ষ মুখরিত করিয়া কর্মচারীদের ছাঁকিয়া ধরে। তখন কোথায় থাকে তাহাদের কাজের প্রতি মনোযোগ—যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল। রেলওয়ে কোম্পানী মৌমাছি প্রেরকের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবী করিল। কিন্তু বেচারী প্রেরকের যে কতদূর ক্ষতি হইল মৌমাছি উড়িয়া গিয়া তাহার খেসারত মিলিল না। বরং অসতর্কভাবে মৌমাছি প্রেরণের অভিযোগে জরিমানাও হইল।

ছায়ায়—দেবযানী

মতিমহল থিয়েটার্সের নবতম পৌরাণিক ছবি "দেবযানী" গত ৯ই সেপ্টেম্বর শনিবার ছায়া চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিয়াছে। ছবিখানার পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত ফণী বর্ম্মা এবং ইহার বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, মৃণাল ঘোষ, মোহন ঘোষাল, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী ছায়া, মীরা দত্ত, রাধারাণী, কমলা (ঝরিয়া) প্রভৃতি।

মহাভারতের কচ ও দেবযানীর প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে ছবিখানির আখ্যানভাগ রচিত। দেবাসুরের যুদ্ধ, দেবাদিষ্ট হইয়া বৃহস্পতির পুত্র কচের মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে অসুরালয়ে আগমন ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ, কচ ও শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর চিত্তবিনিময়, দেবযানীর সহায়তায় দৈত্যদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও কচের উদ্দেশ্য সিদ্ধি, কচ কর্ত্তৃক দেবযানীর প্রেম প্রত্যাখ্যান ও দেবযানীর অভিশাপ—ইহাই ছবিখানির মূল বিষয়।

কচ ও দেবযানীর এই অমর প্রেমোপাখ্যান ছায়াচিত্রের পর্দ্দায় সত্য সত্যই উপভোগ্য হইয়া উঠিবে, আমরা তাহাই আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু ছবিখানি দেখিয়া যে সম্বন্ধে আমাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাশ হইতে হইয়াছে। পরিচালক ফণী বর্ম্মা হাতে পড়িয়া এইরূপ একটি পৌরাণিক উপাখ্যান যে 'মাঠে মারা' গোছের হইয়া যাইবে তাহা আমরা কখনও আশা করি নাই।

প্রথমত ছবিখানিতে যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় করিয়াছেন, আশানুরূপ পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা পাইলে, তাহাদের সকলের অভিনয়ই আরও ভাল হইত বলিয়া আমাদের ধারণা।

ছবির নায়িকা দেবযানীর ভূমিকায় ছায়ার অভিনয় স্থানে স্থানে খুবই ভাল হইয়াছে; কিন্তু আদ্যন্ত বিচার করিলে বলিতেই হইবে, তিনি সাধারণ শ্রেণীর অভিনয় করিয়াছেন। অবশ্য পরিচালকের অদৃশ্য অপটু হস্ত ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী বলিয়া আমাদের মনে হয়। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের এবং চন্দনের ভূমিকায় মৃণাল ঘোষের অভিনয় আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী মোহন ঘোষালের অভিনয় বিশেষত্ববর্জ্জিত। অন্যান্যের অভিনয়ের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই।

অবশ্য, ছবিখানির অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয়ের দোষ-ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করিয়াছে, ইহার কয়েকখানি

দেবযানীর ভূমিকায় শ্রীমতী ছায়া

গান। এই গান কয়খানিই এই ছবির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

গান কয়খানির কথা ও সুর সহজ, সরল ও অনিন্দনীয়। মৃণাল ঘোষ ও কমলার (ঝরিয়া) কণ্ঠে এই গান কয়খানি খানিকক্ষণের জন্য প্রেক্ষাগৃহ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। গান কয়খানির কথা কৃষ্ণধন দের এবং ইহাদের সুর দিয়াছেন কমল দাশগুপ্ত ও মৃণাল ঘোষ।

ছবিখানির দৃশ্যপট মন্দ হয় নাই। ইহার আলোক-চিত্র ও শব্দগ্রহণে যথেষ্ট ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

জলক্রীড়ায় প্রতিযোগী সাঁতারুর অভাব কেন?

সম্প্রতি কয়েকটি সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক জল-ক্রীড়ায় প্রতিযোগী সাঁতারুর বিশেষভাবে অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। এমন কি অনেকগুলি বিষয়ে মাত্র দুইজন সাঁতারুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যাঁহারা বাঙলার সাঁতারুগণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা পোষণ করিতেন, তাঁহারা হতাশ হইয়াছেন। গত বৎসরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় এইরূপ প্রতিযোগী সাঁতারুর অভাব অনুভূত হয় নাই। সুতরাং এই বৎসর হঠাৎ এইরূপ অবস্থার কেন সৃষ্টি হইল, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন না। অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, বাঙলায় সন্তরণে জনপ্রীতি কমিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিষ্ঠানে সভ্য-সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে এবং সেইজনাই প্রতিযোগিতায় সাঁতারুর অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এইরূপ যুক্তি যাঁহারা প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। কারণ সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের পক্ষে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৎসরের সভ্য-সংখ্যার হিসাব রাখা সম্ভব নয়। বাঙলায় যাঁহারা সন্তরণ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও সাধারণের অবগতির জন্য বাঙলার সন্তরণের বার্ষিক বিবরণীর মধ্যে এই সকল বিষয় উল্লেখ করেন না। তাহা ছাড়া এই সকল বিষয়ের উল্লেখের যে কোন প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা তাঁহাদের কল্পনাতীত। বিভিন্ন ক্লাব বা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক জলক্রীড়ার সময় বিচারকের কার্য্য করিয়াই তাঁহারা সকল দায়িত্ব পালন করিলেন বলিয়া মনে মনে আত্মপ্রসাদলাভ করিয়া থাকেন। অনুষ্ঠানের সময় সাঁতারুগণকে বিশ্ব-সন্তরণ পরিচালনা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিবার নির্দ্দেশ দেন। কোন সাঁতারুকে নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে দেখিলে প্রতিযোগিতা হইতে নাম বাতিল করিয়া দিতে তাঁহাদের কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিতে দেখা যায় না। বিশ্ব-সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী সম্বন্ধে সাঁতারুগণের কোন জ্ঞান আছে কি-না, না থাকিলে সেই বিষয় কিরূপে সাঁতারুগণকে শিক্ষা দিতে হইবে বা সেইজন্য সন্তরণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালকগণকে চাপ দিতে হইবে, ইহা তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে স্থান পায় না। বিশ্ব-সন্তরণ পরিচালনা প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলীর জ্ঞান তাঁহাদের এতই অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সন্তরণ পরিচালকমণ্ডলীর কার্য্যাবলীর সকল কিছু খুঁটিনাটি জানিবার বা সেই অনুযায়ী কার্য্য করিবার ইচ্ছাও তাঁহাদের জাগে না। অন্যান্য দেশের ন্যায় সন্তরণের বিভিন্ন বিষয়ের উৎসাহ দেশের মধ্যে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বা হ্রাস পাইয়াছে, তাহার বিশদ বার্ষিক বিবরণ বাঙলার সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের জানিবার উপায় নাই। উপায় না থাকায় সাধারণের ক্রমোন্নতির পথ প্রশস্ত করিবার বা অবনতির পথ রোধ করিবার জন্যও কেহই উৎসাহ পান না। উৎসাহ না পাওয়ার ফলে অবনতির কারণ বাহির করা বা প্রতিকারের ব্যবস্থা করাও সাধারণের পক্ষে সম্ভব হয় না। এইজন্যই তাঁহারা বর্ত্তমান প্রতিযোগী সাঁতারুর অভাব লক্ষ্য করিয়া ভিত্তিহীন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেছেন। যাঁহারা বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাঁহারা জানেন প্রতি বৎসরই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং জনপ্রিয়তা হ্রাসের যুক্তিও টিকে না।

পরিচালকগণের অবহেলা

বাঙলার সন্তরণ পরিচালকগণের অবহেলাই ইহার প্রধান কারণ। যে পরিস্থিতি বর্ত্তমানে আমরা দেখিতে পাইতেছি, ইহার সূত্রপাত চার-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর যে এই অবস্থা বিশেষভাবে অনুভূত হয় নাই, তাহার কারণ বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের প্রথম প্রতিষ্ঠার হুজুগ। বাঙলার সন্তরণ পরিচালনার সকল গণ্ডগোলের অবসানের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। কিন্তু এই বৎসরে সেইরূপ কোন উত্তেজনা-পূর্ণ অবস্থা বর্ত্তমান না থাকায়, ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিষ্ঠান পরিচালকগণের মনের মধ্যে যে হীন পুরস্কার লাভের মনোবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছিল, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রতিযোগিতার যে বিষয় নিশ্চিত পুরস্কার লাভের নহে, সেই প্রতিযোগিতায় পরিচালকগণ নিজ নিজ ক্লাবের সাঁতারুগণকে অবতীর্ণ হইতে দেন না। প্রতি-যোগিতার নিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ব্যতীত কোন সাঁতারু কোন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন না। সেইজন্য সাঁতারুগণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ক্লাবের পরিচালক-গণের অনুমোদন না লাভ করায় প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিতেছেন না। প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ এইরূপভাবে প্রতিযোগিতার বিষয় বাছাই করিয়া সাঁতারু-গণের যোগদানের ব্যবস্থা করায় প্রতিযোগী সাঁতারুর অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। গত চার-পাঁচ বৎসর হইতেই আমরা এই বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি এবং প্রতিকারের জন্য বাঙলার সন্তরণ পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তবে এ কথা আমরা খুব দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি যে, এই বৎসরও যদি এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয়, তবে আগামী বৎসরে অধিকাংশ সন্তরণ প্রতিষ্ঠানকেই বার্ষিক জলক্রীড়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাঁতারুগণের অভাবে সাধারণ প্রতিযোগিতার যে সকল বিষয় আছে, তাহা বাতিল করিয়া ক্লাব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠানের কর্ম্ম-তালিকার পুস্তকে একটি আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়া পরিচালকমণ্ডলীর উক্তি দেখিতে পাই। "Sports for Sports sake", কিন্তু এই আদর্শবাদ ধ্বংস করিতে যে চলিয়াছেন, ইহা কি একবারও তাঁহাদের মনে

সমর-বার্তা

৫ই সেপ্টেম্বর—

বৃটিশ বিমান-বহর কীল খালের প্রবেশমুখে উইলহেলমশাফেন ও ব্রুন্সবুটেল-এ জার্মান নৌ-বহরের উপর প্রবল বোমাবর্ষণ করে। ফলে কয়েকটি জার্মান যুদ্ধ জাহাজ খুব ঘায়েল হয়। জার্মান বিমান-বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে ও জার্মানরা বিমান-ধ্বংসী কামান চালাইয়া ৫খানি বৃটিশ বিমান ভূপাতিত করে।

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, 'ওলিণ্ডা' ও 'কার্লফিজেন' এই দুইখানি জার্মান জাহাজকে বৃটিশ বিমান-বাহিনীর আক্রমণে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'এথেনিয়া' নামক বৃটিশ জাহাজটি শত্রুপক্ষের আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে।

দক্ষিণ পোল্যাণ্ড ও সাইলেসিয়ায় যুদ্ধ চলিতেছে। পোলেরা দাবী করিতেছে যে, পোলিশ-বাহিনী বহু জার্মানকে বন্দী করিয়াছে। পোলিশ-বাহিনী জার্মানীর সীমান্তের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণ পোল্যাণ্ডে নিম্নবেদের নিকট জার্মান-বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে জয়লাভ করিয়া পোলিশ-বাহিনী বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক ও লরী দখল করিয়াছে।

এক জার্মান বেতার ঘোষণায় দাবী করা হইয়াছে যে, জার্মান সৈন্যগণ সাইলেসিয়ায় ১৫ হাজার পোল সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে। প্রকাশ, জার্মান সৈন্যগণ পলায়নপর পোলিশ সৈন্যগণের পশ্চাদনুসরণ করিয়া দ্রুত পূর্ব সাইলেসিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ফ্রান্সের সমর ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সমগ্র স্থল, জল ও বিমান-বাহিনীর আক্রমণ নিয়মিতভাবে চলিতেছে।

যুদ্ধের অজুহাতে কলিকাতার ব্যবসায়ীরা জিনিষ-পত্রের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া অত্যধিক লাভ করিতে থাকায় বাঙলা গবর্ণমেণ্ট তাহা নিবারণ করার উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ভারত রক্ষা অর্ডিন্যান্সের ১২৯ ধারা অনুসারে বাঙলা গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ জারী করিয়াছেন। বহু ব্যবসায়ীকে অত্যধিক লাভ করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শত্রুপক্ষীয় জাহাজ বৃটিশ ভারতের বন্দরে আটক রাখার জন্য বড়লাট এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

বাঙলার গবর্ণর কলিকাতা শহর ও শহরতলীর কতকগুলি অঞ্চলকে সংরক্ষিত ও নিষিদ্ধ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বেতারযোগে জার্মান সাধারণের নিকট ঘোষণা করেন যে, ইংলণ্ড জার্মানদের সহিত সংগ্রাম করিতেছে না, সংগ্রাম করিতেছে একটি অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

৬ই সেপ্টেম্বর—

ফ্রাঙ্কো-জার্মান সীমান্তে ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইন ও জার্মানীর সিগফ্রীড লাইনের মধ্যে উভয় পক্ষের গোলন্দাজ-বাহিনী প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাইয়াছে। মোজেল অঞ্চলে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া প্রবল বোমাবর্ষণ চলিতে থাকে।

পোল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ওয়ারস হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। জার্মানরা ক্রাকাউ শহর দখল করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে।

ইংলণ্ডের পূর্বকূলে শত্রুপক্ষের বিমান বহর হানা দেয়। লণ্ডন হইতে শিশু, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধদিগকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

তিনখানি পোলিশ বিমানপোত বার্লিনের উপর হানা দেয় এবং নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসে।

পোলেরা দাবী করিতেছে, ১৪টি জার্মান-পোত ওয়ারস শহরের উপর হানা দিলে, তাহাদের সব কয়টিকেই শহরের উপর ভূপাতিত করা হয়। ওয়ারস হইতে শিশুদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইতেছে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সরকারীভাবে নিরপেক্ষতা আইন জারী করিয়াছেন। যুদ্ধরত জাতিসমূহের নিকট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অস্ত্রশস্ত্র ও বিমানপোত রপ্তানী নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

যুদ্ধের অজুহাতে অতিরিক্ত লাভ করিবার অভিযোগে কলিকাতা পুলিশ গতকল্য ও অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে একশত ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে। গবর্ণমেণ্ট এইবারকার মত তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া মুক্তি দিয়াছেন। চিনি, দেশলাই, বিড়ি, সিগারেট, কনডেন্সড্ মিল্ক, ব্লেড, সরিষার তৈল, লবণ, কাগজ, ভূসি ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য বেশী দরে বিক্রয় করার অভিযোগেই অধিকাংশ লোক গ্রেপ্তার হয়।

৭ই সেপ্টেম্বর—

জার্মান সমরনায়ক ভন ব্রাউকিচ্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, জার্মান সৈন্য-বাহিনী পোলিশ করিডর দখল করিয়াছে; তজ্জন্য ডানজিগ ও পূর্ব-প্রুশিয়া জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ক্রাকাউ, ব্রোমবার্গ ও গ্রাউডেন্স জার্মান-বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে। পোলেরা ক্রাকাউ অধিকার অস্বীকার করিয়াছে।

জার্মান সরকারী বেতার বার্তায় ঘোষিত হইয়াছে যে, ডানজিগ বন্দরের প্রবেশ পথে অবস্থিত ওয়েষ্টারপ্লাট দ্বীপের পোলিশ-বাহিনী আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

ইরাক জার্মানীর সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে।

পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস হইতে লুবলিন শহরে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। জার্মান বিমান-বাহিনী কয়েকবার ওয়ারসের উপর বোমাবর্ষণ করে। পোলেরা দাবী করিতেছে যে, মঙ্গলবার বিমানসমূহের পনেরটি এবং গতকল্য সাতটি শত্রুপক্ষীয় বিমান ভূপাতিত হইয়াছে। পোলদের মাত্র ৬টি বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

এক ফরাসী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ফরাসী-বাহিনী পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

বৃটিশ নৌ-বহর বিভিন্ন স্থানে জার্মান সাব-মেরিনগুলিকে আক্রমণ করে।

প্যারিসের নিকট জার্মানীর বিমান উড়িতে দেখা যায়।

যুগোশ্লাভিয়ায় ব্যাপক সৈন্য চালনার আদেশ জারী হইয়াছে।

বুলগেরিয়া যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

মিশর ফ্রান্সকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

৮ই সেপ্টেম্বর—

প্যারিস হইতে প্রচারিত ফরাসী সমর-বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ফরাসী-বাহিনী পশ্চিম সীমান্তে সারব্রুকেনের নিকট সীমান্ত-ব্যূহ ভেদ করিয়া জার্মান এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা এখন সার অঞ্চলে অভিযান চালাইতেছে।

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, ফরাসীরা সিগফ্রীড লাইনের সম্মুখবর্তী জার্মান ঘাঁটিসমূহের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত অভিযান চালাইয়াছে।

জার্মান সরকারী সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্মান মেকানাইজড্-বাহিনী ওয়ারস শহরে প্রবেশ করিয়াছে; লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, এই দাবী এখনও সমর্থিত হয় নাই।

বৃটিশ বিমান-বহর উত্তর জার্মানীতে জার্মানদের উদ্দেশ্যে লিখিত আরও ৩৫ লক্ষ বৃটিশ ইস্তাহার নির্বিঘ্নে বিলি করিয়াছে।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে শত্রুপক্ষের টর্পেডোর আঘাতে দুইটি বৃটিশ জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

পোলিশ সাধারণতন্ত্রের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট ও বিশ্ববিখ্যাত পিয়ানো বাদক মঃ প্যাডেরেস্কি পোল্যাণ্ডের প্রতি ভারতের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য মহাত্মা গান্ধীর নিকট তারযোগে আবেদন জানান। মহাত্মা গান্ধী উক্ত তারের উত্তরে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামে পোলদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া এক বাণী পাঠাইয়াছেন।

•

৯ই সেপ্টেম্বর—

জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জার্মানরা বিনা বাধায় পোল্যাণ্ডের পোলজান প্রদেশ দখল করিয়াছে।

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ যে, গতকল্য রাত্রিতে জার্মানী হইতে ইস্তাহার বিলি করিয়া আসার পথে কতকগুলি বৃটিশ বিমানের সহিত অন্য দেশীয় বিমানের (বেলজিয়ান বলিয়া অনুমিত) সংঘর্ষ হয়। প্রকাশ যে, বৃটিশ বিমানগুলি অনবধানতাবশতঃ বেলজিয়ান এলাকার এক অংশ অতিক্রম করে। বিস্তৃত বিবরণ না পাওয়া পর্যন্ত বৃটেন বেলজিয়ামের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়াছে।

ডিউক এবং ডাচেস অব্ উইণ্ডসর কান হইতে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন।

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, বে-আইনী গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য জিব্রাল্টারে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং আলেকজেন্দ্রিয়ায়, কলম্বোতে ও ত্রিঙ্কোমালীতে সমস্ত জাহাজ পরীক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

ওয়ারস রক্ষার ভারপ্রাপ্ত পোলিশ সেনাপতি জেনারেল জুমা এক ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, শেষ পোলিশ সৈন্যটি বাঁচিয়া থাকা পর্যন্ত ওয়ারস রক্ষা করা হইবে।

মস্কোতে সোভিয়েট রিজার্ভ সৈন্যের কয়েকটি শ্রেণীকে বাহিনীতে যোগদানের জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

১০ই সেপ্টেম্বর—

ফরাসী সাঁজোয়া গাড়ীসমূহ এই প্রথমবার জার্মান এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে এবং জিগফ্রীড লাইনের বাহিরে জার্মান সৈন্যদলের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বৃটেনের নবগঠিত সমরকালীন মন্ত্রিসভা স্থির করিয়াছেন যে, যুদ্ধ তিন বৎসর বা ততোধিক কাল চলিবে, ইহা ধরিয়া লইয়া তাঁহারা স্বীয় নীতি নির্ধারণ করিবেন।

জার্মান সমর বিভাগ হইতে দাবী করা হইয়াছে যে, জার্মান বাহিনী ওয়ারসতে প্রবেশ করিয়াছে।

বার্লিনে প্রকাশিত একটি ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, জার্মান বাহিনী ভিস্তুলা উপত্যকার পূর্বদিকে পোল-বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ঐ অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে।

মস্কো হইতে প্রকাশিত একটি সরকারী ইস্তাহারে স্বীকার করা হইয়াছে যে, লেনিনগ্রাড এবং কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আংশিকভাবে সৈন্য চালনার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, জার্মান-পোলিশ সংগ্রাম ব্যাপক ও তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে এবং এই সম্পর্কে সৈন্য চালনার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন রক্ষার তোড়জোড় চলিতেছে।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল আবে ঘোষণা করেন যে, হের হিটলারের অপরিণামদর্শিতার জন্যই ইউরোপে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। তিনি দৃঢ়তা সহকারে ইহাও বলেন যে, জাপান এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। জেনারেল আবে বলেন যে, ভবিষ্যতে হয়ত সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

বার্লিনে প্রকাশিত একটি ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, জার্মান-বাহিনী ভিস্তুলা উপত্যকার পূর্বদিকে পোল-বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে। জার্মানরা ওয়ারসর উত্তর-পূর্বদিকে বার্গ নদীর একটি ঘাঁটি দখল করিয়াছে।

১১ই সেপ্টেম্বর

ওয়ারসতে জার্মানদের আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে। ওয়ারস এখন পোলিশদের অধিকারে রহিয়াছে। জার্মান সৈন্যগণ ইতিপূর্বে ওয়ারসর পার্শ্ববর্তী যে সব অঞ্চল অধিকার করিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। গতকল্য জার্মান বিমান-বহর ১৫ বার ওয়ারসর উপর হানা দেয়। শত্রুপক্ষের ১৫টি বিমান গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করা হয়। ওয়ারসর পাঁচ মাইল দূরে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে।

কানাডা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

বার্লিনের খবরে প্রকাশ যে, হের হিটলার সাইলেসিয়া রণক্ষেত্রে জার্মান সৈন্য-বাহিনীর সহিত যোগ দিয়াছেন।

বার্লিনের একটি সামরিক ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, জার্মানরা নিউস্টাড ও পুটজিগ শহর দখল করিয়াছে।

জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণে আর একটি বৃটিশ জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

ফরাসী সৈন্য বাহিনী পশ্চিম সীমান্তে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। প্যারিসের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ফরাসী-বাহিনী সার ও মোজেলেসের মধ্যবর্তী স্থানে অগ্রসর হইয়াছে।

একটি জার্মান সামরিক ইস্তাহারে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ফরাসী গোলন্দাজ-বাহিনী জার্মানদের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিতেছে।

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ যে, দুইটি জার্মান সামরিক বিমান হল্যাণ্ডের এলাকায় অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ বিমান দুইটি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন এবং বিমানের আরোহীদিগকে আটক করিয়াছেন।

জার্মান বেতার ষ্টেশন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে বহু পোলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পোল্যাণ্ডে জার্মানগণের গ্রেপ্তারের প্রতিশোধে পোলগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কোপেনহেগেনের সংবাদে প্রকাশ যে, গত শনিবার বৃটিশ বিমান-বহর হিণ্ডেনবুর্গ বাঁধের উপর আক্রমণ চালায়। এই বিমান আক্রমণের ফলে যে যুদ্ধ হয়, সেই সময় দুইটি বিমান সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়। বিমান দুইটি কোন পক্ষের জানা যায় নাই।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৬ই সেপ্টেম্বর—

বাংলার গবর্ণর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার নিম্নলিখিত তিনজন সদস্যকে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিয়াছেন:—মিঃ কে সাহাবুদ্দীন এম-এল-এ, নবাবজাদা কে নাসরুল্লা এম-এল-এ ও মিঃ মেসবাউদ্দীন আহ্‌মদ এম-এল-সি।

৭ই সেপ্টেম্বর—

কাশ্মীরের মহারাজার আদেশ জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য প্রণীত নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য বিষয় প্রস্তাবিত আইন-সভায় নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্য। প্রজা-সভার ৭৫জন সদস্যের মধ্যে ৪০জনই নির্বাচিত হইবেন।

৮ই সেপ্টেম্বর—

রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বাঙলার বিশিষ্ট হিন্দু নেতাগণ যুদ্ধ ও ভারতের কর্তব্য সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। উহাতে বর্তমান যুদ্ধে ভারতবাসীদের বৃটেনের পক্ষাবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ভারতের স্বাধীনতা দাবী করা হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবৃন্দ যুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

৯ই সেপ্টেম্বর—

'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর পাটনা গমন উপলক্ষে যে ঘটনা ঘটে, তৎসম্পর্কে 'অসংগত বিক্ষোভ' শিরোনামায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। গান্ধীজী লিখিয়াছেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির কাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা এবং জনমত গঠন করার সম্পূর্ণ অধিকার সুভাষবাবুর আছে। যে অসংগত বিক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে কংগ্রেসের সুনাম বৃদ্ধি পায় নাই—শোচনীয় অসহিষ্ণুতারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতি, বিশিষ্ট বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভিক্ষু উত্তম পরলোক গমন করিয়াছেন।

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ছয় ঘণ্টাব্যাপী অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত আনে, আচার্য নরেন্দ্র দেব ও শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ নিমন্ত্রিত হিসাবে বৈঠকে যোগদান করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত আনে বড়লাটের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার ও আলোচনার বিবরণ ওয়ার্কিং কমিটিকে জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত বিবৃতি সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটিতে সাধারণভাবে আলোচনা হইয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু চীন হইতে বিমানযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১০ই সেপ্টেম্বর—

বোম্বাইয়ে হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে ভারত ও যুদ্ধ সম্পর্কে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা কার্যকরী করার নিমিত্ত মহাসভা কেন্দ্রে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পুনর্বিবেচনা করিতে এবং হিন্দু জাতীয় সেনা-বাহিনী গঠন করার অনুরোধ করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে গণতান্ত্রিক স্বরাজ্যদলের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতে হইলে ভারতের স্বাধীনতা প্রশ্ন আগে সমাধান করিতে হইবে।

অদ্য ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উপস্থিত ছিলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর—

বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের এক যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানত মহাযুদ্ধ এবং তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের আলোচনা করেন। বড়লাট প্রথমত রাজা ৬ষ্ঠ জর্জের প্রেরিত একটি বাণী পাঠ করেন। তাহাতে রাজা বলিয়াছেন,—"ভারতের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের নিকট হইতে আমরা এ সময়ে সাহায্য ও সহানুভূতি পাইব, আমাদের এই বিশ্বাস আছে।" অতঃপর বড়লাট বলেন,—"আমরা যে জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি, তাহার উপর আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিতে হইলে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত উদ্যোগ আয়োজন আপাতত স্থগিত রাখা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নাই। তবে যুক্তরাষ্ট্রই আমাদের লক্ষ্যরূপে বর্তমান থাকিবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যুদ্ধ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

বাঙলা সরকার প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ, চিকিৎসার দ্রব্যাদি, লবণ, কেরোসিন তৈল এবং অল্প মূল্যের বস্ত্রাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৩৪৬ • Saturday, 9th September, 1939 [৪৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

জন্মাষ্টমী—

ইতিহাস নাই, কিন্তু আদর্শ আছে এবং সেই যে আদর্শ জাতির পক্ষে ইতিহাসের চেয়ে তাহা সত্য কম নয়। কারণ, জাতির ভাবধারাকে তাহা আজও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। মহামানব শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ, ভারতের সনাতন আদর্শ এবং সেই হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ সনাতন পুরুষ। ভারতের আত্মার তিনি অধিদেবতা। কালের প্রভাব ভারতের উপর কত বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ ভারত বিস্মৃত হইতে পারে নাই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দিক হইতে তাঁহার সেই আদর্শকে উপলব্ধি করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। আদর্শের উপলব্ধিতে এইভাবে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে এবং তাহা ঘটিবেই। ইতিহাসে ও আদর্শে এইখানে তফাৎ। ইতিহাস ঘটনার মধ্যে মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, আবদ্ধ রাখিতে চায়, আদর্শ মানবের অন্তর রসের অভিব্যক্তিতে সাহায্য করে। ঘটনা হইতে ভাবের রাজ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া এইভাবেই ইতিহাসের অন্তর্নিহিত সত্যটুকুই আদর্শে পরিণত হইয়া থাকে।

জগতে আজ স্বার্থে স্বার্থে সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষ অত্যুগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের পীড়ন, অসহায়ের উপর দানবীয় প্রবৃত্তির আস্ফালন, দুষ্ট রাজশক্তির দম্ভ, দর্প এবং অত্যাচার, এমনই একটা দিন আগেও আসিয়াছিল। সেই দিনে দুর্য্যোগময়ী ঘনান্ধকার রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন। অচিন্ত্য সে অবতার। আর্ত্ত এবং পীড়িত মানব-সমাজের বিগ্রহস্বরূপে তিনি অবতীর্ণ হইলেন। কারাগার ভিন্ন তাঁহার জন্মগ্রহণের উপযুক্ত স্থান আর কোথায়? বন্ধন, পীড়ন, দুঃখ এবং নির্য্যাতনের ভিতরেই তো যুগে যুগে দেবতার দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে! মানবের মহোচ্চ মহিমা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে অত্যাচারিতের আগার হইতেই। কারাগারে এই যে দেবশিশু সেদিন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, উত্তরকালে তাঁহারই দিব্য জীবনের মহিমা, দরিদ্র এবং অত্যাচারিতের অন্তরে অভয়ের প্রতিষ্ঠা করিল।

বৃন্দাবনের কুঞ্জকাননে যাঁহার মধুর বাঁশরীর ধ্বনিতে যমুনা উজান বহিয়াছিল, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তাঁহারই পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদে অত্যাচারীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। মরণের উর্ম্মিমালায় গর্জ্জনমুখর সেই রণাঙ্গনে তিনি মানব-সাম্যের মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—বলিলেন, অপরকে অন্যায়ভাবে শোষণ করিয়া যাহারা তুষ্ট হয়, পুষ্ট হয়, ধর্ম্মের কিম্বা নীতির দোহাই তাহারা যেমনই দিক না কেন, তাহারা তস্কর, তাহারা দস্যু। সাম্যের যে দৃষ্টি তাহাতেই মনুষ্যত্ব: আর শোষণের প্রবৃত্তি পশুতা। এই পশুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামেই রহিয়াছে পৌরুষ। যাহারা সে সংগ্রামে ভীত হয় কায়ক্লেশে বা স্বার্থহানির •দুর্ব্বলতায়, তাহারা মানুষ নামের অযোগ্য। মানুষকে তিনি ডাকিয়া বলিলেন, ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোল তোল শির, আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির। কয়েক সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু মহামানব শ্রীকৃষ্ণের সেই যে মহতী বাণী এবং তাহার মহিমা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সে বাণীর সত্যতা মানুষের পক্ষে উত্তরোত্তর অমোঘ এবং আত্যন্তিক হইয়া উঠিতেছে। আজিকার এই জগদ্ব্যাপী বিগ্রহ-বিরোধের কালানল-ধূম্র-ধূলি জালে আচ্ছন্ন আকাশ প্রতিধ্বনি করিয়া মহামানব শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণীই মেঘমন্দ্রে আমাদের কানে আসিয়া বাজিতেছে—'ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ! উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত!' ভারত তাঁহার সেই বাণীকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে কি?

যুদ্ধ বাধিল—

অবশেষে যুদ্ধ বাধিল। জার্ম্মানী পোল্যাণ্ডের উপর প্রবল বিক্রমে আক্রমণ চালাইতেছে, অন্যদিকে ইংরেজ এবং ফরাসীও জার্ম্মানীকে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজের উড়োজাহাজ জার্ম্মানদের রণতরীর উপর বোমা ফেলিয়াছে। যুদ্ধ এখনও ব্যাপক আকার ধারণ করে নাই,

থাকে, তাহা হইলে অন্তত আমাদের দিক হইতে আমরা নিরাপদ আছি। জাপানের সংগে জার্ম্মানীর মিতালী যদি পাকা থাকিত এবং জাপান জার্ম্মানীর পক্ষ হইয়া নামিবে এমন সম্ভাবনা থাকিত—আমাদের ভারতের দিক হইতে সে অবস্থায় যতটা ভয়ের কারণ থাকিত এখন ততটা নাই। হিটলার মুখে যত দম্ভই করুন না কেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার যত কিছু জারিজুরি শুধু ফাঁকার উপর দিয়াই গিয়াছে। তিনি সর্ব্বত্র চাতুর্য্য চালাইয়া কাজ হাসিল করিয়া লইয়াছেন। তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, হুমকির জোরে এক্ষেত্রেও তেমনই কাজ হইবে, ইংরেজ কিছুতেই যুদ্ধে নামিবে না। কিন্তু তিনি চালে ভুল করিয়াছেন। তারপর রুশ-জার্ম্মান চুক্তির ফলে ইংরেজ এখন জাপানের সংগে তাহার বন্ধুতাকে পাকা করিতে চেষ্টা করিবে। অপর পক্ষও কি নীরবে থাকিবে—হিটলার কি নিজের অবস্থা বুঝিতেছেন না? তিনি ইটালীকে যুদ্ধে নামাইতে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। কিন্তু ইটালীরও এদিক হইতে চিন্তা করিবার আছে। মধ্য-ইউরোপে জার্ম্মানীর অতি বৃদ্ধি ইটালী আশংকার চোখে দেখে। অষ্ট্রিয়া জার্ম্মানীর হাতে যাইবার পর হইতে জার্ম্মানীর ও ইটালীর সীমান্তে যোগ ঘটিয়াছে। জার্ম্মানীর জোর বাড়িলে ইটালীর আতংক এদিক হইতে আছে এবং অপরদিক হইতে বলকানেও সে আশংকা রহিয়াছে। ইটালী ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বদিকে নিজের প্রভুত্ব বাড়াইতে চায়; কারণ সেইদিকে তাহার সাম্রাজ্য-স্বার্থ। ইটালীর আলবেনিয়া দখল ইটালীর সেই ভীতিরই একটা অংগ; সুতরাং ইটালী যে সহজে এই যুদ্ধে জার্ম্মানীর পক্ষে ভিড়িবে, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। এখন বড় শক্তির মধ্যে থাকিল রুশিয়া। রুশিয়া যতদিন পর্য্যন্ত সম্ভব যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিতেই চেষ্টা করিবে, কিন্তু স্বার্থের দায়ে রুশিয়া এই ব্যাপারে জড়িত হইতে পারে—এ সম্ভাবনা যে নাই, এমন কথা বলা যায় না। পোল্যাণ্ডে রুশিয়ার স্বার্থ রহিয়াছে, রুশিয়ার স্বার্থ রহিয়াছে বাল্টিক অঞ্চলে; সুতরাং ঘটনার গতিতে সে যুদ্ধে নামিতেও পারে। জার্ম্মানী সেই চাল চালিতে চেষ্টা করিবে এবং রুশিয়া যদি যুদ্ধে নামে তাহা হইলে সমরানল পূর্ব্ব-পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িবে। তখন আমরা ভারতবাসীরা আমরাও এই ব্যাপারে নিছক দ্রষ্টা থাকিতে পারিব না।

ঐক্যের জন্য আহ্বান—

যুদ্ধের গতি কিভাবে কোন্‌দিকে দাঁড়ায়, এখনও বলা যাইতেছে না। যদি যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার মত দেখা দেয়, তাহা হইলে যে-সব দেশ এখন নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিয়াছে, সে-সব দেশও নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবে না। প্রতিক্রিয়া রাষ্ট্রনীতিক পথে এমনভাবে হইতে থাকিবে যে যাহারা দূরে থাকিতে চাহিতেছে, তাহাদিগকেও চক্রের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে হইবে। ইটালী আজ দূরে আছে, কিন্তু চাপ পড়িলে তাহাকেও আগাইতে হইবে, আর ইটালী রণাংগনে অবতীর্ণ হইবার সংগে অনেক কিছু ঘটিবে। জাপান আজ দূরে আছে, কিন্তু টানাটানি সুরু হইয়াছে—সেও দীর্ঘ দিন নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবে না। রুশিয়া ঘটনার গতি লক্ষ্য করিতেছে, সেও একদিকে ঝাঁপাইয়া পড়িবে? তখন আমরা কি করিব? মহাত্মাজীর সংগে বড়লাটের আলোচনা হইয়া গেল। আলোচনার ফল কি হইল এখনও জানা যায় নাই; শুনিতেছি মহাত্মাজী বড়লাটের দিককার সমস্ত বক্তব্য ওয়ার্কিং কমিটির নিকট উপস্থিত করিবেন—এইরূপ মতপ্রকাশ করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির মত বা সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন, আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, দক্ষিণী-দলের নেতারা এখন ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এবং আচার্য্য নরেন্দ্র দেব ও শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণকে ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। মহাত্মাজীর মত অনুসারেই এই ব্যবস্থা হইয়াছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং আমরা আশা করি, বিদ্রোহী বিতাড়নের বাতিক বন্ধ করিয়া দক্ষিণীদল এখন ঐক্যকেই বড় করিয়া দেখিবেন এবং নিজেদের দলের জোটবাঁধার ফিকির ছাড়িয়া দেশকে সংহতির পথে আনিতে প্রবৃত্ত হইবেন। আজ দেশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রয়োজন হইল ঐক্যের ভারতের বৃহত্তর স্বার্থে সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রতি কংগ্রেস-নেতৃবর্গ সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করুন, আমাদের ইহাই নিবেদন।

জিনিষপত্রের বাজারে ধাপ্পাবাজী—

যুদ্ধের সংগে বলিতে গেলে এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোন সম্পর্কই নাই; কিন্তু ব্যবসায়ী মহলে এখনই ধাপ্পাবাজী সুরু হইয়াছে। যুদ্ধ ঘোষিত হইবার সংগে সংগেই রাতারাতি 'লাল' হইবার লোভ দেখা দিয়াছে এবং সরিষার তেল দিয়াশলাই হইতে আরম্ভ করিয়া ধারাপাতের পর্য্যন্ত দর কোথায়ও দেড়গুণ কোথায়ও দুই গুণ চড়িয়া গিয়াছে। বেশী সেয়ানা যাঁহারা তাঁহারা অধিক লাভের আশায় মাল ছাড়িতেছেন না, সময় আসিলে মোটা লাভ করা যাইবে। মহাযুদ্ধের সময় জিনিষপত্রের দর চড়িয়া গিয়াছিল তাহার কারণ ছিল। তখন অধিকাংশ জিনিষই বিদেশ হইতে আসিত; কিন্তু এখন দেশের সে অবস্থা নাই। কাপড়ের জন্য বিদেশের দিকে নির্ভর না করিলেও চলে, ঔষধ, প্রসাধন দ্রব্য, এগুলির জন্য আমরা আর পরমুখাপেক্ষী নহি, যুদ্ধ বাধিয়াছে বলিয়া ঐ সব জিনিষের দর চড়িবার কোন যুক্তিসংগত কারণই নাই। তবু চড়িতেছে, তাহার কারণ দোকানদারদের বাস্তবিক অবস্থা সম্বন্ধে কাহারও কাহারও জ্ঞানের অভাব এবং কাহারও কাহারও অতি লোভের আশা। এই কয়েক দিনের মধ্যেই সরকার বিভিন্ন বিষয়ে পর পর কয়েকটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন.

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং বাজারে যাহাতে মূল্য বৃদ্ধির এই ধাপ্পা-বাজী না চলিতে পারে তজ্জন্য ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্সের ১২৯ ধারা কলিকাতায় প্রযুক্ত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে কৃত্রিম-ভাবে যাহারা যুদ্ধের ভয় জাগাইয়া জিনিষপত্রের দর বাড়াইবে তাহারা পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তারযোগ্য অপরাধে অপরাধী হইবে এবং সেই অপরাধের জন্য তাহাদের পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত জেল

বা জরিমানা হইতে পারিবে। যাহাতে এইভাবে কেহ বে-আইন কার্য্য না করিতে পারে সেজন্য কলিকাতার বাজারে বাজারে পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্য্যকর করিতে হইলে দর নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের দরকার। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ বাধিবার সংগে সঙ্গে ইংলণ্ডে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন, এখানেও কৃত্রিমভাবে দর বাড়ান যাহাতে সম্ভব না হয়, তেমনভাবে দর নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের উচিত এবং নিত্যব্যবহার্য্য প্রধান প্রধান জিনিষের বাজার দর সরকার হইতে বিজ্ঞপ্তি করা কর্ত্তব্য।

ইউরোপীয় সমরের প্রভাবে 'দেশ'-এ ব্যবহৃত কাগজের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বর্ধিত মূল্যেও প্রয়োজনীয় পরিমাণে কাগজ সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কারণে দুষ্প্রাপ্যতার সহিত জীবন-মরণ সংগ্রাম করিবার এই দুর্দিনে 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই আগামী সপ্তাহ (৪৪শ সংখ্যা) হইতে 'দেশ'-য়ের পৃষ্ঠা-সংখ্যা হ্রাস করিতে হইল। অবশ্য উপন্যাস-গল্পাদি যথারীতি প্রকাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

সম্পাদক—"দেশ।"

চেটফিল্ড কমিটির রিপোর্ট—

লর্ড চেটফিল্ডের নেতৃত্বে ভারতীয় সেনা বিভাগকে যন্ত্রবলোপেত করিবার ব্যবস্থা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটির সুপারিশসমূহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়াছে এবং সেগুলি সম্প্রতি সিমলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুপারিশে বড় বড় কথা আছে; কিন্তু ভারতের জাতীয়তাবাদীদের তাহাতে উৎসাহ বোধ করিবার কোন কারণ নাই। কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গ্রেট ব্রিটেনকে ভারতের সেনা বিভাগ উন্নত করিবার জন্য ৩৩৷৷০ কোটি টাকা ভারতকে দান করিতে হইবে এবং ৫ বৎসরের জন্য ১১৷০ কোটি টাকা বিনা সুদে ধার দিতে হইবে। এই টাকায় ভারতের সেনা দলকে আধুনিক [illegible]

গ্রেট ব্রিটেনের এই দয়া এবং দাক্ষিণ্যে ভারতবাসীদের নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির বিশেষ কিছু সাহায্য করিবে না। সেজন্য নিজেদের বুদ্ধি পরিচালনার উপযোগী স্বাধীনতা থাকা দরকার। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারতবাসীরা তাহা পাইবে না। নিজেরা যেভাবে নিজেদের দেশ-রক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার, তাহা করিতে তাহারা সক্ষম হইবে না। নিজের হাতে দায়িত্ব পাওয়া এক কথা, আর পরের হুকুমের তাঁবেদার হইয়া চলা অন্য কথা। একটিতে মানুষের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ ঘটে, অন্যটিতে মনোবৃত্তির বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। চেটফিল্ড কমিটি তাঁহাদের সুপারিশে বলিয়াছেন যে,—ভারতের এখন নিজের সেনাশক্তিকে আধুনিক রকমে যন্ত্রবলোপেত করা দরকার; কিন্তু কথা হইতেছে, কোথায় ভারত বা ভারতবাসীরা, তাহাদের হাতে এজন্য কোনদিন কি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং এখনই বা কি দেওয়া হইতেছে? ভারতবাসীরা নিজেরা যদি স্বাধীন থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে এমন অবস্থায় পড়িয়া থাকিত না। গ্রেট ব্রিটেনের মুরুব্বীরা ভারতে অভিভাবক হইয়া এ সব ক্ষেত্রে তাহাকে আগুলিয়া রাখিয়াছেন, এখনও রাখিবেন, ভারত শুধু হুকুমের তাঁবেদার মাত্র। সেনা বিভাগের উপর বাস্তবিক কর্ত্তৃত্ব যদি ভারতবাসীরা পাইত, তবে এ ক্ষেত্রে তাহাদের উৎসাহ বোধের কারণ থাকিত—কিন্ত দিল্লী সে দিক হইতে এখনও বহু দূরে!

গান্ধীজীর মনোবেদনা—

সিমলাতে বড়লাটের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইবার পর মহাত্মা গান্ধী একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, —বড়লাটের সহিত আমার সাক্ষাতের সময়ে কি ঘটিয়াছিল, তাহা জনসাধারণকে জানানো আমার কর্ত্তব্য। আমি জানিতাম যে, আমি এই সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির নিকট হইতে কোন নির্দ্দেশ পাই নাই। আমি জানি যে, পুরোপুরি অহিংসার মনোভাব লইয়া আমি জাতীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারি না, ঐরূপ চেষ্টা করিলে আমাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। আমি বড়লাটকে এই পর্য্যন্ত বলিয়াছি। সুতরাং বড়লাটের সহিত আমার কোন বোঝাপড়া বা মীমাংসার আলোচনার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আমি বড়লাটের প্রাসাদ হইতে শূন্য হস্তে এবং প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন বোঝাপড়া না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। যদি কোন বোঝাপড়া হয়, তবে উহা কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে হইবে।"

মহাত্মাজীর উক্তির একটি অংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বড়লাটকে তিনি কি জানাইয়াছেন, তাহার সার মর্ম্মটা তাহা হইতেই ধরা যাইবে। তিনি বলিয়াছেন—"আমার অদম্য এবং পুরাপুরি অহিংসার মনোভাব-সহ আমি জাতীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারি না, ঐরূপ করিবার চেষ্টা করিলে আমাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। আমি বড়লাটকে এই পর্য্যন্ত বলিয়াছি।" বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের জনমতের দাবী যদি রক্ষা করিয়া চলেন, তবেই বর্ত্তমানের সংকটকালে তাঁহারা

মহাত্মাজী বলিতেছেন—তিনি বড়লাটের প্রাসাদ হইতে শূন্য হস্তে ফিরিতেছেন; মহাত্মাজীর এই উক্তির ভিতর হইতে যে নৈরাশ্যের ভাব ব্যক্ত হইতেছে, তাহা হইতে কি বুঝা যায়। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মহাত্মাজী যে আশা অন্তরে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হয় নাই; মহাত্মাজী কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধে ধরা-ছোঁওয়া না দিলেও তাঁহার এই উক্তির ভিতর দিয়া কংগ্রেসের দাবী সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মতিগতির পরিচয়ের আঁচ যে একেবারে না আসে, এমন কথা মনে করা যায় না। মহাত্মাজী যে কথা বলিয়াছেন, আমাদেরও মনের কথাই তাহাই, বর্ত্তমানের এই সংগ্রামে ভারতের জনমত সম্পূর্ণভাবে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকামীদেরই পক্ষে। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ আজ সমস্বরে বলিতেছেন যে, মানব-স্বাধীনতার পক্ষে তাঁহারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতবাসীদের কথা এই যে, স্বাধীনতার সেই মর্য্যাদা-বুদ্ধি লইয়া তাঁহারা আজ ভারতকেও দেখুন, ভারতবাসীদিগকে মানুষের যাহা জন্মগত অধিকার, সেই অধিকার আগে প্রদান করা হউক, তখন ইংরেজদের আবেদনে ভারতবাসীরা আন্তরিকতা উপলব্ধি করিবে। ভারতের গণ-দেবতা জাগিয়া উঠিবেন। যে ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার দাবী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সত্য, শুধু ভারতবর্ষই কি তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে?

হিটলারের নিকট গান্ধীজীর চিঠি—

মহাত্মা গান্ধী হিটলারের নিকট সম্প্রতি একখানা চিঠি দিয়াছেন। চিঠিখানা এইরূপ—"ইহা সুস্পষ্ট যে, যে সংগ্রাম মনুষ্য সমাজকে বর্ব্বর অবস্থায় পরিণত করিতে পারে, বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে একমাত্র আপনিই সেই সংগ্রাম নিবারণ করিতে পারেন। আপনার নিকট কোন উদ্দেশ্যের মূল্য যাহাই হউক না কেন, আপনি কি সেই মূল্য দিবেন? যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া বিশেষ সাফল্যের সহিত যুদ্ধের পথ ত্যাগ করিয়াছে, আপনি কি তাহার আবেদনে কর্ণপাত করিবেন? যাহা হউক, আমি যদি আপনার নিকট চিঠি লিখিয়া ভুল করিয়া থাকি, তাহা হইলে আশা করি, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।" হিটলারের যে ক্ষমতা এবং ব্যক্তিত্বের কথা মহাত্মাজী বলিয়াছেন, সে ব্যক্তিত্ব এবং সে ক্ষমতা তিনি পাইয়াছেন হিংসারই আবহাওয়ার মধ্যে এবং হিংসাই তাহার মূলে। ইউরোপের সে আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত না হইলে অহিংসার কোন তত্ত্বই ইউরোপের উপলব্ধিতে আসিবে না, সুতরাং হিটলার মহাত্মাজীর উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না যে ইহা ঠিক। দোষ তাঁহার নিজের নয়—দোষ আসুরী যে প্রবৃত্তি ইউরোপে প্রবল হইয়াছে তাহার। অহিংসা বর্ত্তমান ইউরোপের পক্ষে পরধর্ম্ম।

কলিকাতা রক্ষার ব্যবস্থা—

কলিকাতা শহর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা এখন কিছু দেখা যাইতেছে না; কিন্ত ঘটনার গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; সুতরাং সাবধানের মার নাই। এজন কলিকাতা রক্ষা ব্যবস্থায় সাহায্য করিবার নিমিত্ত আবেদন কর হইতেছে। কিন্তু যাহারা এই কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হইবে তাহাদের কি করিতে হইবে, কলিকাতার পক্ষে কি কি প্রয়োজন সে সব কিছুই কেহ বলিতেছেন না। লণ্ডন, প্যারিস এব অন্যান্য শহরের কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে একটা কর্ম্মপ্রণালী স্থির করিয়া লইয়া পূর্ব্বে তাহা ঘোষণা করেন এবং তদনুযায় সাহায্য করিতে বলা হয়, কলিকাতাবাসীদিগকে কি করিতে হইবে এবং কি তাহাদের পক্ষে আবশ্যক, আগে জনসাধারণকে তৎসম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেওয়া উচিত।

বড়লাট ও মহাত্মা গান্ধী—

বড়লাটের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা যুদ্ধ বাধিবার পর, একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মহাত্মা গান্ধীর দূতস্বরূপে শ্রীযুত মহাদেব দেশাই কিছুদিন পূর্ব্বে যখন সিমলায় গমন করেন, তখনই আমরা অনুমান করিয়া ছিলাম যে, ভিতরে ভিতরে ব্যাপার কিছু চলিতেছে। মহাত্মাজীর সঙ্গে বড়লাটের এই আলোচনার ফলে কি দাঁড়ায় তাহার উপর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির যুদ্ধ সম্পর্কীয় নীতি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। পণ্ডিত জওহরলালজী চীন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ৮ই তারিখ ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান করিতেছেন। যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে কংগ্রেস কিরূপ মতিগতি অবলম্বন করিবেন, এবার কাজে তাহার পরিচয় মিলিবে, এতদিন পর্যান্ত শূন্যাশূন্যিই চলিতেছিল। অনেকেরই বিশ্বাস যে, ওয়ার্কিং কমিটি যুদ্ধ সম্বন্ধে ওয়ার্দ্ধাতে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, এবার তাহার হেরফের হইবে। যুদ্ধে কোনরকম সাহায্য মন্ত্রীরা করিবেন না এবং যদি সেই ব্যাপারে দরকার হয়, তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন—এই প্রস্তাব দক্ষিণীদলের মন্ত্রীদের মনঃপূত হইতেছে না। বোম্বাইএ কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বৈঠকেই তাঁহারা এই ধূয়া তুলিয়াছেন যে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করা ঠিক হইবে না, মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলে গান্ধীনীতির বিরোধীরা মন্ত্রিত্ব দখল করিয়া বসিবে এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যে সব মূল্যবান সংগঠনমূলক কার্য্য করিয়াছেন, সে সব পণ্ড হইবে। গান্ধী-লিনলিথগো আলোচনা এবং তাহার পরে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের অধিবেশন, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অনুকূলভাবে কংগ্রেসের নীতিকে পরিবর্ত্তিত করিবে কি না সত্বরই বুঝা যাইবে। দক্ষিণীদলের নেতৃবর্গ বর্ত্তমানের এই প্রয়োজনীয় মুহূর্ত্তে কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি আত্যন্তিক নিষ্ঠা যদি দেখাইতে না পারেন এবং সেই আদর্শ-নিষ্ঠার আনুষঙ্গিক ত্যাগ ও সাহস প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন, তাহা হইলে কংগ্রেসের সংহতি শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিবার পথই তাঁহারা প্রশস্ত করিবেন। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি আজ আদর্শ রক্ষার জন্য দৃঢ়তার সহিত এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দাঁড়ান, তাহা হইলে কংগ্রেসের মধ্যে আজ যাহা কিছু ভেদ-বিরোধের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে সব দূর হইবে। সমগ্র দেশ এক হইয়া আদর্শের পরিপূর্ত্তির পথে অগ্রসর হইবে।

কংগ্রেসসী নেতৃবর্গের মধ্যে আজ সেই আদর্শ-নিষ্ঠা এবং অকুতোভয়তার অভিব্যক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত উন্মুখ হইয়া রহিয়াছি।

দিবেন না। দেশের লোকের ধারণা তাঁহাদের সম্বন্ধে কেমন, যদি বুঝিতে চাহেন, একবার জনসাধারণের সামনে দাঁড়াইয়া দেখুন—যুক্তি-বুদ্ধির কেরামতি কতখানি বুঝা যাইবে তখন।

হিন্দু মন্ত্রীদের পক্ষে ওকালাত—

ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেদিন বাটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলনে হিন্দু মন্ত্রীদের তিরস্কার করিয়া কয়েকটি কথা বলেন। ডাক্তার মুখুজ্যে সত্য কথাই বলিয়াছেন এবং তাঁহার উক্তির ভিতর দিয়া বাঙলার হিন্দু জনমতেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে। মন্ত্রীদের বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ থাকিলে তাঁহারা মুখ বাড়াইয়া উত্তর দিতে আসিতেন না। অপর হিন্দু মন্ত্রীদের কথা আমরা বলিতে পারি না, তবে অর্থ-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের যে সে বালাই নাই, ইহা সকলেই জানেন। তিনি বড় মুখে কথা বলিতে আসিয়াছেন। অবশ্য জনসাধারণের সামনে আসিয়া নিজেদের কেরামতি জাহির করিবার সাহস যদি তাঁহার থাকিত, তবে আমরা তাঁহাকে বাহাদুর পুরুষই বলিতাম। কিন্তু অর্থ-সচিবের বুকের জোর ততখানি নাই, সংবাদপত্রে বিবৃতি বাহির করা পর্যন্তই তাঁহার দৌড়। অর্থ-সচিব এবং তাঁহার সতীর্থ হিন্দু মন্ত্রীর দলের জায়গায় যদি অন্য দল আসরে আসে বা থাকিত, তবে কি হইত সে কথা তোলা একেবারেই অবান্তর। তাঁহারা হিন্দু সমাজের স্বার্থ নিজেদের কেরামতিতে কতখানি বজায় রাখিয়াছেন, ইহাই হইতেছে কথা। তাঁহাদের মন্ত্রিপরিষারের মধ্যে মান-অভিমানের কাঁদুনী গাহিবার গর্ব্ব তাঁহারা করিতে পারেন, কিন্তু দেশের বা হিন্দু সমাজের তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা কি করিয়াছেন? হক-মন্ত্রিমণ্ডল এদেশে সাম্প্রদায়িকতামূলক যত কিছু কাজ করিয়াছেন, যত কিছু ব্যবস্থা করিয়াছেন, হিন্দু সমাজের স্বার্থের বিরোধী ভাবে অর্থ-সচিব এবং তাঁহার সতীর্থ হিন্দু মন্ত্রিবর্গ কার্য্যত তাহার প্রত্যেকটির পূর্ণাঙ্গ পরিণতির স্তরে সায়ই যোগাইয়াছেন। হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপে হিন্দু সমাজের স্বার্থের দোহাই দিয়া তাঁহারা মন্ত্রিত্ব লইয়াছিলেন, কার্য্যত সে কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহারা যে কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই আচরণে হিন্দু সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করা হইয়াছে। হিন্দু সমাজের স্বার্থের কোন অনুভূতি যদি তাঁহাদের থাকিত, যদি নৈতিক কোন আদর্শ সত্যই তাঁহাদের থাকিত, তাহা হইলে পদ, মান বা প্রতিষ্ঠার লোভে তাঁহারা বিবেককে বলি দেওয়ার চেয়ে মন্ত্রিগিরিতে জবাব দিয়া মানুষের মত বাহির হইয়া আসিতেন। বৃহৎ আদর্শের কাছে যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে বলি দিতে পারে না, তাহারা বড়াই করে, বাঙলার হিন্দু-স্বার্থ রক্ষার ইহাই আশ্চর্য্য। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ, জাতির বৃহত্তর আদর্শের অনুভূতি বিসর্জ্জন দিয়া যাঁহাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ স্বার্থের দিকে, তাঁহাদিগকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিবে বাঙালী হিন্দু, অর্থ-সচিব মনের কোণেও এমন ধারণাকে স্থান

বাঙলা সাহিত্যের গতি—

সম্প্রতি কলিকাতা শহরে বাঙলা সাহিত্যের সম্বন্ধে দুইটি আলোচনা সভা হইয়া গেল। একটি হইল কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলন, অপরটি বঙ্গীয় ছাত্র সাহিত্য সম্মেলন। এই উভয় সম্মেলনেই বঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ যোগদান করেন এবং বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ও গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। দুইটি সম্মেলনেই আমরা একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার জনসাধারণের অন্তরের ঘনিষ্ঠতার যোগ সাধনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি উভয় সম্মেলনেই জোর দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বরূপে শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"এই বিংশ শতাব্দীতে যে সব অতি আধুনিক লেখক কাব্য, উপন্যাস ও গল্পের ভিতর দিয়ে সাহিত্য রচনা করছেন, তাঁহাদের লেখায় আমরা শহরের আবেষ্টনীর একটা অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম প্রভাব বড়বেশী দেখতে পাই। বাঙলার প্রাণশক্তির সঙ্গে এই সাহিত্যের যোগ অতি কম। তাঁহারা বাঙালী জীবনের যে সব চিত্র আঁকেন, যে সব চরিত্র সৃষ্টি করেন, সেগুলি এদেশের কিনা ঘোর সন্দেহ হয়। যে ভাষায় এঁরা মনের ভাব ব্যক্ত করেন, সেও অনেক সময় খাঁটি বাঙলা ভাষা কিনা সংশয় জন্মে।"

কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া খান বাহাদুর আজিজুল হকও ঐরূপ কথাই তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—"দেশের লোকের অন্তরের বেদনা যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে তাহাই প্রকৃত সাহিত্য। উহা স্থায়ী হয়। ছাপাখানায় ছাপা হইলেই সাহিত্য হয় না। দেশের মাটির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হইলে তাহাই হইবে প্রকৃত সাহিত্য।" বঙ্গীয় ছাত্র সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি স্বরূপে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়টির উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। আমরা এইদিকে বরাবর সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছি এবং এই দিক হইতেই আমরা দেশাত্মবোধের সঙ্গে সাহিত্য সাধনার যোগ দেখিতে পাই। দেশের লোকের সুখ-দুঃখে যিনি নিজের প্রাণকে সিক্ত করিতে পারিবেন, নিজের বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারকে বিলীন করিয়া দিতে পারিবেন সেই এক অনুভূতির মধ্যে, তিনিই হইবেন প্রকৃত বাঙলা সাহিত্যের স্রষ্টা। বাঙলার ভাবধারার স্পর্শে না গেলে বাঙলা ভাষাও কলমের আগায় আসিবে না। এদেশে সম্প্রতি বাঙলা সাহিত্য বলিয়া বাজারে যেগুলি চলে, সেগুলির অধিকাংশের হরফ বাঙলা হইলেও ভাষা বাঙলা নয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস এবং বাঙলাদেশের [illegible]

অন্তরের রসধারার সঙ্গে সেগুলির কোন যোগই নাই। গণ-সাহিত্যের দোহাইতে যেগুলি চালান হয় অথচ যাহারা দেশের 'গণ' তাহারা সেগুলির এক অক্ষরও বুঝিতে পারে না। সাহিত্যকে এই পরধর্ম্মের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে বাঙলা ভাষা প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী হইতে পারিবে না।

হিন্দুত্বের বড়াই—

ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে মহাশয়ের জবাবে অর্থ-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার আর এক বিবৃতি ছাপাইয়াছেন। তিনি অনেক বড়াই করিয়াছেন; প্রথম বড়াই হইল তাঁহার হিন্দুত্বের বড়াই। তিনি বলিতেছেন যে, তিনিও হিন্দু সংগঠন চাহেন, তবে সে সংগঠনটা সঙ্গতপথে হওয়া চাই। হক মন্ত্রিমণ্ডলের পাছ-দোহারী করিয়া সরকার সাহেব যেভাবে দফায় দফায় হিন্দু স্বার্থ-রক্ষার নমুনা দেখাইতেছেন, তাহাই বোধ হয় হিন্দু সংগঠনের সোজা সিঁড়ি। অর্থ-সচিব বলিতেছেন—পরিষদের হিন্দু সদস্যেরা তাঁহাকে পদত্যাগ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছে.. ইহা মোটেই ঠিক কথা নয়। অর্থাৎ তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, তেমন অনুরোধ করিলেই তিনি পদত্যাগ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে এ সব কথাই অবান্তর. হিন্দু স্বার্থের জন্য দরদ যদি তাঁহার অন্তরে থাকিত, তাহা হইলে পর পর মন্ত্রিমণ্ডলের নীতির ফলে হিন্দু-স্বার্থ ধ্বংস হইতে দেখিয়াও তিনি বিবেক-বুদ্ধিকে অক্ষত রাখিয়া মন্ত্রি-মণ্ডলে থাকিতে পারিতেন না। হিন্দু স্বার্থের জন্য নয়—শুধু নিজে মন্ত্রী হইবার মতলবে মন্ত্রীদিগকে পদত্যাগ করিতে বলে, এই অভিযোগ অপরের ঘাড়ে চাপাইবার আগে অতি বুদ্ধিমান অর্থ-সচিবের বুঝিয়া দেখা উচিত ছিল যে, অপরের উপর যে অপরাধ তিনি আরোপ করিতেছেন মাত্র, সেই অপরাধে তিনি নিজে কৃতাপরাধ। অন্যের সম্বন্ধে যাহা অনুমান, তাঁহার ক্ষেত্রে তাহা জীবন্ত প্রমাণ। অর্থ-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় বলিতেছেন যে, জনসভার কোন মূল্যই নাই। বাঙলার জনসাধারণকে তিনি আজ গ্রাহ্যের মধ্যে আনিবেন না ইহা অস্বাভাবিক কিছু নয়, আমলাতান্ত্রিক আবহাওয়ারই উহা ফল। জনসাধারণের প্রতি এমন অবজ্ঞার ভাব অন্তরে যেখানে জাগে, সেখানে প্রতিক্রিয়া স্বরূপে জন-সাধারণের উপেক্ষাই পাইতে হয়। চুলচেরা তর্ক-যুক্তিতে সে উপেক্ষা এড়ান যায় না।

সাগর স্বপ্ন

(W. H. DAVIES)

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি

জানি না কেন বা তোমা পানে মন ধায়,
চঞ্চল তব বন্যায় ভাসি, —সাধ।
খুলে দেই তরী, শুনি তব কলরোল,
আমার মরণ-শয্যার তলে উঠুক তোমার নাদ।
তোমার লবণ কত যুগ ধরি' রক্তে মিশিয়া আছে,
তাই তোমা পানে ছুটিতে রক্ত নাচে।

দেখিয়াছি তব ভৈরব-নর্ত্তন,
ঢেউয়ের কশায় পোত সে জর্জ্জরিত,
আবার দেখেছি কান্ত-কোমল-রূপ,
শীশুর চরণ পরশে তাইতো হয়েছ শুচিস্মিত।
মৃদু-মন্থর তোমার শীতল-বায়,
সৈকত-গায়ে লাগিয়াছে বড় ভালো,
ঝঞ্ঝার সাথে পরম মিতালি তব,
চকিত-দিঠিতে নিভায়ে দিয়াছ বিশ্বের যত আলো।

তুমি জান ভাই, শান্ত করিতে শোক-জর্জ্জর হিয়া,
গর্ব্বোদ্ধত শির নত হয় তোমার ভ্রূকুটি হেরি',
মনে পড়ে সেই গর্ব্বোদ্ধত আরমাডা সুবিশাল,
গর্জ্জনে তব সে কি তর্জ্জন ধ্বংস আসিল ঘেরি'।
আবার দেখেছি ধীবর-তনয়,
কচি মুখ তার উজ্জ্বল আশা-রাগে,
'তোমার কোলের তুহিন পরশে, চিরতরে মুদি আঁখি,
তব সৈকতে রয়েছে শয়ান; বালু শুধু চোখে লাগে।

তবুও কেন বা তোমা পানে মন ধায়,
চঞ্চল তব বন্যায় ভাসি, —সাধ।
খুলে দেই তরী, শুনি তব কলরোল,
আমার মরণ-শয্যার তলে উঠুক তোমার নাদ।
তোমার লবণ কত যুগ ধরি' রক্তে মিশিয়া আছে,
তাই তোমা পানে ছুটিতে রক্ত নাচে।

দেঃ শের কথা—ভারতের পণ্য—

চা (TEA)

(২)

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ভারতীয় চা'র জয়যাত্রা—জলপথ

১৮৩৮ সালে রপ্তানি সুরু হইলেও ভারতীয় বাণিজ্যের খাতায় ১৮৬৪ সালে স্বতন্ত্রভাবে হিসাব রাখা প্রয়োজন বোধ হয় এবং ঐ সালে ইংলণ্ডে ২৮ লক্ষ পাউণ্ড চা যায়। ১৮৭৫-৭৬ সালে বিদেশে রপ্তানি ২ কোটি ৪৪ লক্ষ পাউণ্ডে পেণীছে, তখন ইহার দাম হইল ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। এই রপ্তানি ১৯০০-০১ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই আন্দাজ ১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ঐ সালে ১৯ কোটি পাউণ্ড চা সাড়ে ৯ কোটি টাকা মূল্য লইয়া আসে। তাহার পর বৎসরই হঠাৎ একেবারে ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকায় নামে; উহা আবার বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০৬-০৭ সালে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ মূল্য ৯ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকায় পেণীছে। কিন্তু ১৯০০-০১ সালের অনুপাতে চা'র পরিমাণ অত্যন্ত বেশী দিয়া, অর্থাৎ ২৩ কোটি ৩৬ লক্ষ পাউণ্ড পাঠাইয়া তবে ঐ পরিমাণ টাকা পাওয়া যায়। ১৯০৭-৮ সালে রপ্তানি ১০ কোটি টাকার সীমা পার হইয়া যায় এবং ১৯১৫-১৬ সালে ২০ কোটি টাকায় (১৯ কোটি ৯৮ লক্ষ) পেণীছে; ঐ বৎসর চা'র পরিমাণ ৩৩ কোটি ৮৪ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। যুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) রপ্তানি কিছু হ্রাস পায়, অন্যান্য কারণের সহিত যুদ্ধোপকরণ লইয়া যাইবার জন্য জাহাজের মালের উপর বিশেষ ভাড়া বসাইয়া এই রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯১৯ সালে এই নিষেধ উঠিয়া যায়; আর ১৯১৯-২০ সালে যত চা রপ্তানি হয় এত চা পূর্ব্বে বা পরে কখনও এক বৎসরে যায় নাই। পরিমাণ ৩৭ কোটি ৯১ লক্ষ হইয়া ২০ কোটি ৅৬ লক্ষ টাকা আনিয়া দেয়। এই কারণেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডে অধিক পরিমাণ চা জমিয়া যাওয়ায় পর বৎসর রপ্তানি পড়িয়া গিয়া পূর্ব্ব বৎসরের ৩৮ কোটি পাউণ্ডের স্থলে সাড়ে ২৮ কোটি এবং সাড়ে বিশ কোটি টাকার স্থলে ১২ কোটি টাকা মূল্যে নামিল। বিলাতের বাজারে দামও অসম্ভবরূপে হ্রাস পাইল। "শাপে বর হইল", ভারতীয় ব্যবসায়ীরা চা'র ভাল পাতা নির্ব্বাচনে মনোযোগী হইলেন এবং অপেক্ষাকৃত কম চা "ঘরে" আনিলেন। তাহার ফলে আবার চাহিদা বৃদ্ধি পাইল এবং দরও চড়িয়া গেল এবং ১৯২৩-২৪ ও ১৯২৪-২৫ সাল, বিশেষত ১৯২৫-২৬ সাল ভারতীয় চা ব্যবসায়ীদের "মাহেন্দ্রক্ষণ" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ৩৪ কোটি পাউণ্ড চা ৩৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইল। পরে ১৯২৭-২৮ সালে একবার ৩২½ কোটি টাকার চা রপ্তানি হইল; কিন্তু পরিমাণে অনেক বেশী বিক্রয় করিতে হইয়াছে। ১৯৩২-৩৩ সালে ৩৮ কোটি পাউণ্ড চা মাত্র ১৭ কোটি টাকা মূল্যে বিক্রীত হইল। রপ্তানির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া এখন ৩৫ কোটি পাউণ্ড চা ২৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় রপ্তানি হইয়াছে (১৯৩৮-৩৯)। এ সম্বন্ধে সমস্ত অঙ্ক পরিশিষ্ট (ঙ) হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

স্থলপথে বাণিজ্য

স্থলপথে ভারতবর্ষ হইতে কিছু চা ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়; তন্মধ্যে ভারতের একেবারে সন্নিকটবর্ত্তী দেশগুলির সহিত যে বাণিজ্য ব্যবহার আছে, তাহাকে বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে ধরা হয় না। সাধারণত আফগানিস্থান, সিকিম, নেপাল, ভোটরাজ্য ভারতের চা ব্যবহার করে এবং এই সকল দেশের জন্য যে চা রপ্তানি হয়, তাহার উপর কোনও বিধিনিষেধ নাই। স্থলপথে ইরাণের সহিত ভারতের কিছু যোগ আছে; তাহাতে যে পরিমাণে চা যায় তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে ১৯৩৫ সালের ১লা আগষ্টের ঘোষণা অনুযায়ী ইরাণে চা রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সমস্ত কথা পরে বলা হইতেছে। এখন (১৯৩৬-৩৭) স্থলপথে যত চা যায় তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৫৮ লক্ষ পাউণ্ড, তন্মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হিসাবে ধরিলে ১ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। পরিশিষ্ট (চ) হইতে গত কয়েক বৎসরের হিসাব পাওয়া যাইবে।

ভারতীয় চা'র ক্রেতা

বর্ত্তমানে ৩৪ কোটি ৯৯ লক্ষ পাউণ্ড চা জলপথে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে; ইহা ছাড়া ৮১ লক্ষ ৩৮ হাজার পাউণ্ড রদ্দি চা (waste tea) কেফিন (caffeine) প্রস্তুত করিবার জন্য বিদেশীরা লয়। ভারতীয় চা'র প্রধান ক্রেতা ইংরেজ মোটামুটি ৩৫ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে ৩০ কোটি ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড সে একা লইয়াছে। টাকার হিসাবে দেখা যায়, প্রতি একশত টাকার মালে তাহার অংশ ৮৭ টাকা ১১-১/৫ আনা (৮৭·৭%) অর্থাৎ ৮৭৷৷৵২·৪ পাই। অপর ক্রেতাদিগের মধ্যে কানাডা, ইরাণ, আমেরিকা, সিংহল, এরে (আয়র্লণ্ড), ব্রহ্ম, অষ্ট্রেলিয়া, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশও কিছু কিছু লইয়া থাকে। তন্মধ্যে কানাডার অংশ সমস্ত টাকার শতকরা ৪·১ আর ইরাণের ২। পরিশিষ্ট (ছ) দ্রষ্টব্য।

ইংরেজ যে চা আমদানী করে, তাহার মধ্যে অনেকটা আবার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করিয়া দেয়; তন্মধ্যে এরে (আয়র্লণ্ড) প্রধান, পরে জার্ম্মানী ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যের স্থান। ডেনমার্ক, নেদরলণ্ড, কানাডা আর্জ্জেণ্টাইন প্রভৃতি দেশে ইংলণ্ড হইতেই ভারতীয় চা অধিকমাত্রায় সরবরাহ করা হয়। সম্প্রতি কানাডা ও আমেরিকায় ভারতবর্ষ হইতে সরাসরিভাবে বহু পরিমাণ চা রপ্তানি হইতেছে।

চা রপ্তানি—প্রদেশের অংশ

বলা বাহুল্য রপ্তানি বাণিজ্যে বাঙলার স্থান প্রথম অর্থাৎ শতকরা ৭৮·৯ ভাগ এখান হইতে যায়; বাকী প্রায় সমস্তটাই (২১%) মদ্র সরবরাহ করে। বোম্বাই বন্দরের নাম পড়ে মাত্র; কিন্ত পরিমাণ কিছুই নহে; পরিশিষ্ট (জ) দ্রষ্টব্য।

আমদানী

ভারতের এত বড় রপ্তানি বাণিজ্য থাকলেও প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার চা (৪০ লক্ষ ৮২ হাজার পাউণ্ড) প্রতি বৎসর আমদানী হইয়া থাকে। এই সকল চা সাধারণত ভারতে তৈয়ারী হয় না, বা তৈয়ারী হইলেও বিশেষ গুণের জন্য আদৃত হয়। তাহা ছাড়া ইহা হইতে ভারতের সন্নিকটবর্ত্তী সীমান্ত প্রদেশসমূহে পুনরায় রপ্তানি হইয়া যায়। যে সকল চা আসে তাহার মধ্যে হরিৎ চা (green tea) প্রধান; এমনকি মোট আমদানীর

অর্দ্ধেকেরও বেশী; পরিশিষ্ট (ঝ) দ্রষ্টব্য। এ স্থলে জাপান, সিংহল ও চীন আমাদের বিক্রেতা।

রপ্তানি—রদ্দি (waste) চা

চা ছাড়াও কতক পরিমাণ রদ্দি চা রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহার পরিমাণের কোনও স্থিরতা নাই, তবে মোটামুটি এক লক্ষ টাকার অধিক থাকে। ১৯৩৮-৩৯ সালে কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা (৪,৩৬,৫৮৩ টাকা; ৮১ লক্ষ ৩৮ হাজার পাউন্ড পরিমাণ) দেশে আসিয়াছে। প্রধানত আমেরিকা, ও পরে কানাডা প্রভৃতি আমাদের ক্রেতা এবং সবটাই কেফিন (caffeine) প্রস্তুতের কাজে লাগে।

রপ্তানি—চা বীজ

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে চা বীজ রপ্তানি হইত, কিন্তু এখন আর হয় না। প্রধানত অপর দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে; দ্বিতীয়ত ১৯৩৩ সালের চুক্তি অনুযায়ী কেহ চা বীজ রপ্তানি করিতে পারে না। গত তিন বৎসরে ইহার ফলাফল বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে ৭৭ হাজার টাকা, ১৯৩৭-৩৮ সালে ২০ হাজার টাকা এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট ১৬০ টাকার বীজ রপ্তানি হইয়াছে। চা বীজ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে মৎলিখিত "ভারতের পণ্য" পাঠ করা প্রয়োজন।

ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী

ভারতবর্ষের চা অনেক দেশের এই জাতীয় পণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত করিয়াছে। চীন দেশীয় চা ইংলণ্ডে প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে, সেইখানে আজ ভারতীয় চা প্রধান; কোকো, কফি প্রভৃতি ফেলিয়া লোকে চা ধরিয়াছে। এখন জাভা ও সিংহল ভারতীয় চা'র বিপদ ঘটাইয়াছে। ১৯০৫-৬ সাল হইতে জাভার রপ্তানির হিসাব নাই। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় ঐ সাল হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত জাভার রপ্তানি শতকরা ৩৮০·৩ বৃদ্ধি পাইয়াছে; সিংহলের ২১·৫ % আর ভারতবর্ষের ৪৫·৪ %।

রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ (Tea control)

ভারত হইতে রপ্তানির মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। প্রথম, রপ্তানি সুরু হইয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ চা গিয়াছে ১৯৩২-৩৩ সালে (৩৭,৮৪,৩৬,৫৬৬ পাউন্ড); দামও সর্ব্বাপেক্ষা কম গিয়াছে,—প্রতি পাউন্ড মাত্র ।/২ হইতে ।৮৩; দ্বিতীয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা আসিয়াছে ১৯২৪-২৫ সালে (৩৩,৩৯,২৪,০০০ টাকা) কারণ ঐ সালে চায়ের দাম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল, অর্থাৎ প্রতি পাউন্ড ৸৶১১ হইতে ৸৶৯ পাই; এরূপ আর কখনও হয় নাই।

১৯৩২-৩৩ সালে যে মন্দা পড়িল, তাহাতে সকল দেশের নজর পড়িল, প্রকৃত ব্যবসায়ের দিকে। ১লা এপ্রিল ১৯৩৩ সালে সকলে মিলিয়া আপোষ করিয়া (International Tea agreement) চা'র মোট পরিমাণ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে সম্মত হইল। প্রথম অবস্থায় পাঁচ বৎসরের জন্য এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে, এইরূপ কথা হয়। প্রথম পাঁচ বৎসর গত হইবার পর আবার পাঁচ বৎসরের জন্য ঐ চুক্তি অনুমোদন করা হইয়াছে। ইহাতে যথেচ্ছা চা রপ্তানি করা, আবাদ ফলন বৃদ্ধি করা প্রভৃতি কতগুলি বিধিনিষেধ স্থাপিত হইল। যে বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চা রপ্তানি হইয়াছে, প্রতি দেশের সেই বৎসরকে মূল ধরিয়া প্রথম বৎসর তাহার রপ্তানির উপর শতকরা ৮৫ ভাগ রপ্তানি করিবার অধিকার দেওয়া হয়। এই সকল বিষয় লক্ষ্য রাখিবার জন্য এক কমিটি নির্ব্বাচিত আছে। (Indian Tea Licencing Committee).

প্রথম বৎসর ভারতবর্ষ হইতে সাড়ে বত্রিশ কোটি পাউন্ড চা পাঠাইবার অনুমতি দেওয়া হয়; তাহার পর কয়বৎসর প্রায় সমপরিমাণ চা পাঠাইয়াছে। পরিশিষ্ট (ঞ) হইতে কয়েক বৎসরের হিসাব পাওয়া যাইবে।

শুল্ক বা Cess

লোকের মধ্যে চায়ের নেশা ধরাইবার জন্য, চায়ের কাট্‌তি বৃদ্ধি করিবার জন্য, দেশে এবং বিদেশে লোক নিযুক্ত করিয়া চা বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। চা ব্যবসায়ীরা যে ভাবে চা'র বিজ্ঞাপন দেয়, ইহার জন্য যত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করে, আর কোনও পণ্যের জন্য এরূপ কচিৎ দৃষ্ট হয়। এই সকল কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং সকলে পরামর্শ করিয়া প্রতি পাউন্ড বিক্রীত চা'র উপর একটি শুল্ক স্থাপিত করে এবং ১৯০৩ সালে (Indian Tea Cess Act—IX of 1903) এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া প্রতি পাউণ্ডে সিকি পাই শুল্ক ধার্য্য করে। প্রয়োজনানুসারে এই শুল্ক বৃদ্ধি করা হয় এবং বর্ত্তমানে প্রতি একশত পাউন্ড চা'র উপর এক টাকা ছয় আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। পরিশিষ্ট (ট) হইতে বর্দ্ধিত হারের পরিমাণ জানিতে পারা যাইবে।

এই টাকা যে কেবল ভারতবর্ষে ব্যয়িত হয়, তাহা নহে ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও নিয়মিতভাবে এই প্রচারকার্য্য চালানো হয়। ভারতবর্ষের হাটে, মেলায়, পার্ব্বণে, ছুটির দিনে এই প্রচারকের দল বক্তৃতা দিয়া, গান গাহিয়া, চিত্র এবং চলচ্চিত্রের দ্বারা চা'র গুণগরিমা প্রচার করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে বিনা পয়সায় তৈয়ারী করা চা বিতরিত হয় এবং এক বৎসর তাহার সংখ্যা তিন কোটি পেয়ালার উপর উঠিয়াছিল। এক পয়সার প্যাকেট করিয়া নমুনা চা বিক্রয় করা হয়; বলা বাহুল্য এই চা গন্ধে, হয়ত বা গুণে, সাধারণত যে চা দরিদ্রে কিনিয়া ব্যবহার করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৎসরে এইরূপ এক কোটি প্যাকেট বিক্রীত হয়।

এই দলের নাম Tea market Expansion Board এবং ইঁহাদের কার্য্যতালিকা এবং এলাকা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, ভারতবাসী নিরক্ষর বলিয়া ইঁহারা বড়ই দুঃখিত, কারণ তাহারা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন পড়িয়া চা'র অদ্ভুত গুণাবলীর কথা বুঝিতে পারে না; তাহাদের মধ্যে প্রচারকার্য্য করিবার জন্য অনেক খরচ করিতে হয়। মহিলা মহলে, বাড়ীর অন্দরে চা প্রচারকারিণীরা গিয়া চা-পান মহাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে।

যখন ভারতবাসী নিরক্ষর থাকার দরুন ইঁহাদের এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়, তখন দয়া করিয়া সংগৃহীত অর্থের কতক পরিমাণ নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য ব্যয় করিলে হয়ত এই অপব্যয়ের কিছু সার্থকতা হইতে পারে। (ক্রমশ)

বিধির বিধান

(গল্প)

শ্রীসুললিতরঞ্জন সেন

'তার' পাইয়া ক্ষমা যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন প্রণবকে লইয়া নিয়তির সঙ্গে চলেছে ডাক্তারের অহরহ যুদ্ধ। ক'দিন হইতে তাহার অবস্থা সেই একরূপই রহিয়াছে, ডাক্তারের এত চেষ্টা সত্ত্বেও অবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না।

রোগীর সেবা করিতেই ক্ষমার সব সময় কাটিয়া যায়; হয়ত বা কখনও তাহার ক্লান্ত, শ্রান্ত শরীর একটু বিশ্রামের আশায় লুটাইয়া পড়ে রোগীর শয্যা-পার্শ্বে, পর মুহূর্ত্তেই তাহার চেতনা তাহার কানে কানে কি যেন বলিয়া দেয়, ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়ে, তাহার তন্দ্রালু চোখে পড়ে তাহার স্বামীর রোগক্লিষ্ট, রোগশীর্ণ মুখখানি। এইরূপেই কাটিয়া চলিয়াছে দিন, আশা-নিরাশার মাঝ দিয়া।

সেদিন রোগী দেখিয়া ডাক্তারবাবু যখন যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, দরজার পাশ হইতে আর্ত্তকণ্ঠের স্বর ভাসিয়া আসিল, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবুর মুখ গম্ভীর, কপালের চিন্তারেখা স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নার্স—নার্স? একটু বাইরে আসবেন ত?

ডাক্তারবাবু নার্সকে কি বলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, ক্ষমা তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলে ক্ষমা আবার স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। প্রণবের প্রতি নিশ্বাসের ভিতর সে অনুভব করে সেই দুঃসহ রোগযন্ত্রণা। চোখও তাহার বাগ মানে না; হয়ত বা কখন অন্যের অলক্ষ্যে তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়ে ফোঁটা ফোঁটা জল রোগীর পার্শ্বে। অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে সেখান হইতে, আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলে তাহার চোখ থেকে ঝরে পড়া সেই ক'ফোঁটা জল।

স্মৃতি—স্মৃতি—স্মৃতি! মানুষ ত শুধু স্মৃতি লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না! পারে না বলিয়াই সে চায় বাস্তব। ক্ষমার কাছে তাই অতীতের স্মৃতিগুলি এক একটি দুঃস্বপ্ন বিশেষ। তাই অতীতের স্মৃতিগুলিকে আর তাহার জীবনে বাঁচাইয়া তুলিতে চায় না।

ক্ষমার বাপ সম্ভ্রান্ত জমিদার। প্রণবকে তিনিই লেখাপড়া শিখাইয়া, পরে ক্ষমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রণব যখন নিজে উপার্জ্জনক্ষম হইল, তখন সে ক্ষমাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু পাছে সেই কষ্টের সংসারে ক্ষমার কোনরূপ কষ্ট বা দুঃখ ভোগ করিতে হয় সেই ভয়ে ক্ষমার বাপ তাহাকে লইয়া যাইবার অনুমতি দিলেন না। প্রণবও সেদিন রাতে নানা কথার মাঝে স্পষ্ট করিয়াই ক্ষমাকে বলিয়া ফেলিল,—ক্ষমা, মানুষ নিজের ভাল-মন্দর বিষয়ে নিজেই সকলের চেয়ে বেশী সজাগ। তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও কিনা জানিনে কিন্তু জেনে রেখ, শ্বশুরের নামের পরিচয় দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইনে আমি।

ক্ষমা সে সময় তাহার কথায় কোন উত্তর দেয় নাই। প্রণবের মনে কিসের একটা খট্‌কা লাগিল, ক্ষমাকে ভুল বুঝিল অভিমানে আর সেদিন কোন কথা বলে নাই সে।

পার্শ্ব-শূন্য। শেষ পরিণাম যে এইরূপ হইতে পারে সে তাহা মোটেই ভাবিতে পারে নাই। তাহার কানে যেন কেবলই প্রণবের কথাগুলি আসিয়া বাজিতে লাগিল,—ক্ষমা, তোমার ভাল-মন্দ..........শ্বশুরের নামে পরিচয় দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইনে। সে কিছুই ভাবিতে পারে না আর, অবোধ শিশুর মত বালিশ্ বুকে চাপিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে।

ক্ষমার বাবাও যে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা না করিয়াছিলেন তাহা নহে। প্রথমে তাহার কোন সন্ধানই মিলে নাই। শেষে কিছুদিন পর ক্ষমার নামে একখানি চিঠি আসিল ঃ—

ক্ষমা, অগ্নি-সাক্ষী করে বিয়ে হয় সকলের, কিন্তু প্রকৃত সাক্ষী সেখানকার তাদের মন। যেখানে দু'জনের মনের নেই মিল, সেখানে বুঝতে হবে তাদের বীণার তার গিয়েছে ছিঁড়ে। ধনীর কন্যা তুমি, আমাদের অভাবের সংসারে তোমার স্থান কোথায়? ভুল প্রথম থেকেই হয়ে আসছে—শুধরাবার সময় বা অবসরও পেলাম না তাই বাধ্য হয়ে এই পথই বেছে নিলাম। এখানে এসে নূতন একটা সংসার পাতলাম—আগেও বলেছি এখনও বলছি, তোমার ভাল-মন্দ তুমিই বেছে নিও। এই শেষ—ইতি হতভাগ্য প্রণব।

ঘড়ি সময়ের সঙ্গে পা ফেলিয়া ঠিকভাবেই নিজের কাজ করিয়া চলিয়াছে। এখনও ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া তাহাদের জানাইয়া দিল যে, তখন রাত দুইটা। নার্স আসিয়া ডাকিল, শুনছেন?

কি, আমাকে কিছু বলছেন? ক্ষমা নার্সের দিকে মুখ তুলিয়া কহিল।

হ্যাঁ, আপনাকেই! বলছি রাত দু'টো ত বেজে গেল, আমি ত রয়েছি, আপনি একটু বিশ্রাম নেন না। পর পর ক'দিনই তো আপনার রাত জাগা গেল!

ক্ষমা কোন কথা বলিল না মুখ নাবাইয়া লইল। তাহার চোখ অশ্রু-সিক্ত!

নার্স আবার কহিল, নিজের শরীর ঠিক থাকলে তবে ত রোগীর যত্ন করতে পারবেন। ভাবনার কি আছে, ভগবানকে ডাকুন সেরে উঠবেন ঠিকই তাঁর দয়ায়। নেন, উঠুন।

ক্ষমার ঠোঁট কাঁপিতে থাকে। নিজেকে আর সে ঠিক রাখিতে পারে না। কাঁদিয়া ফেলে, বলে, আপনি হয়ত জানেন না, নার্স—বুঝতেও পারবেন না, হারিয়ে ফেলায় কত আঘাত, তাও নিজের একটা ভুলে। যে ভুল একবার করে ফেলেছি, তা আর শুধরাবার নয়। আজ আর শরীরের উপর মায়া নেই, রাত জাগি কেন জানেন? ভয় হয় সদাই আবার বুঝি কখন ভুল করে বসি, আবার বুঝি হারিয়ে ফেলি আমার......। আর বলিতে পারে না, গলা গাঢ় হইয়া আসে, কাপড় দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলে।

যাক, এখন ত আর কেঁদে লাভ হবে না, যা হয়ে গেছে, তা আর নূতন করে ঘাঁটিয়ে লাভ কি? হারাবার আঘাত পেতে পারেন সত্যি, কিন্তু হারিয়ে পাওয়ার আনন্দের কথাটা

কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া আবার বলিতে থাকে ক্ষমা, হারিয়ে পাওয়ার আনন্দ আছে সত্যি, কিন্তু এই কি হারিয়ে পাওয়া? আপনি ত নারী, বুঝতে পারেন ত সব, ওঁর এত কষ্ট নিজের চোখে দেখা, এই কি আমার সেই হারিয়ে পাওয়ার আনন্দের সামগ্রী? ওঁর যখন নিশ্বাস টানতে কষ্ট হয়, আমার মনে হয় কি জানেন, মনে হয় বুঝি আমার এক একটি পাঁজরা ভেঙ্গে চলেছে কিসের কঠিন আঘাতে। আজ পথের ভিখারিণী হয়েও মরতে রাজী আছি শুধু ওঁর রোগ-মুক্তির বিনিময়ে। ঘন ঘন চোখের জল মুছিতে থাকে। জানেন, জানেন নার্স উনি ভাল হয়ে উঠলে তারকেশ্বরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসব দু'জনে কিন্তু, কিন্তু যদি......।

নার্স তাহার কথায় বাধা দিয়া বলে, কি বকছেন যা তা। নেন উঠুন, মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ঘুমিয়ে নেন গে দেখি। রোগীর কাছে কখনও কাঁদিতে আছে? আপনি স্ত্রী হয়ে যদি এত অধৈর্য্য হয়ে ওঠেন, তবে রোগীকে আমরা বাঁচাব কি করে? জ্ঞান ফিরে এলে যদি আপনাকে এ অবস্থায় দেখেন হয়ত হার্টফেল করতে পারেন। নার্স একটু চুপ করে।

আবার বলিতে থাকে, আমি টাকা নিচ্ছি রোগীর শুশ্রূষা করবার বিনিময়ে। আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে?

আপনার কর্ত্তব্য আপনি করে যান, বাধা দিচ্ছি না আপনাকে, কিন্তু আমাকে—আমাকে আমার নিজের মনের মত করে শুশ্রূষা করতে দিন। আপনি টাকার বিনিময়ে করছেন, কিন্তু আমি যার মূল্যের বিনিময়ে করছি, তার কাছে লক্ষ টাকার মূল্যও অতি তুচ্ছ। ক্ষমা চোখ মুছিতে থাকে, কান্না চাপিবার চেষ্টা করে।

পাশের খাট হইতে প্রণবের ছোট ছেলেটি কাঁদিয়া উঠে, মা!

ক্ষমা দৌড়াইয়া যায় তাহার কাছে, তাহার গালে আদরের চাপড় দিতে দিতে বলে, এই যে বাবা আমি রয়েছি তোমার কাছে। ভয় কি?

ছেলেটি মাকে কাছে পাওয়ায়, আনন্দের আতিশয্যে তাহার মুখে হাত দিয়া অভিমান সুরে বলে, তুমি যে বলেছিলে আমাকে ফেলে আর চলে যাবে না? আমাকে একলাটি ফেলে রেখে গেছ, আমার ভয় করে না বুঝি?

ক্ষমা বলে, না বাবা, তোমায় ফেলে আমি কখনও যেতে পারি? এই তো তোমার কাছেই রয়েছি! তাহার চোখ হইতে এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে খোকার গালের উপর।

জলবিন্দুটি তাহার গালে পড়ায় প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল, মায়ের চোখের দিকে চোখ পড়িতেই বলিয়া উঠিল, মা, তুমি কাঁদছ আমি বললুম বলে? কেন?

ক্ষমা কি বলিয়া এই শিশুটিকে বুঝাইবে, ভাবিয়া পাইল না। প্রণব যখন দ্বিতীয়বার সংসার পাতে নূতন স্ত্রীকে লইয়া, তখন তাহাদের প্রেমের পুরস্কার স্বরূপ এই শিশুটি প্রথম দেখে জগতের আলো। কিন্তু এই-ই প্রথম এবং এই-ই শেষ। ইহাকেই কয়েক মাসের রাখিয়া মাতা পরলোকে চলিয়া যান। ছেলেটি ক্ষমাকেই তাহার সেই মা বলিয়া জানে, তাই তাহাকে একটুও ছাড়িতে চায় না। এই কদিনের মধ্যে সে ক্ষমার খানিকটা মন অধিকার করিয়া লইয়া বসিয়াছে। ক্ষমাও কিন্তু এই মাতৃত্বের গর্ব্বেই গর্ব্বিত।

ছেলেটির বাকল-সুলভ প্রশ্নটি সত্যিই ক্ষমাকে একটু চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। না বাবা ও কিছু নয়, চোখে একটা কি গিয়েছিল কি না তাই! তুমি ঘুমোও হ্যাঁ?

—না, তুমিও ঘুমোও তবে?

আমার এখন ঘুম আসবে না, তুমি ঘুমোও আমি তোমার কাছে বসে আছি, কেমন?

না, আমারও এখন ঘুম আসবে না, বলিয়া ছেলেটি বিছানায় উঠিয়া বসিল।

ক্ষমাকেও অগত্যা শুইতে হইল!

বেশ, আমিও ঘুমোচ্ছি, তুমিও শোও! যতক্ষণ না আমার ঘুম আসে, ততক্ষণ তোমার গাল চাপড়াই? চোখ বোজ!

কিছুক্ষণ পরে ক্ষমা উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ছোট শিশুটি যেন তাহার ছোট হাত দুখানি দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে কঠিন বন্ধনে। ঘুমাইয়াছে পরীক্ষা করিবার জন্য ক্ষমা বলিল, খোকা, ঘুমিয়ে থাকলে হাত তোল!

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজিয়া একটি হাত উপরে তুলিল। ক্ষমা অত বিপদের মাঝেও হাসিয়া ফেলিল, তাহার গালে একটা চুমা খাইয়া কহিল, এই বুঝি তোমার ঘুমোন হয়েছে খোকা?

হ্যাঁ, আমি ত ঘুমিয়েছিলাম, চোখ বুজিয়াই কহিল, এই দেখ মা আমি এখনও তাকাই নি।

ক্ষমা গম্ভীর গলায় কহিল, ঘুমোলে ত হাত তুললে কি করে?

খোকা তাহার এই গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, ঘুমিয়ে—ঘুমিয়ে।

ক্ষমা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল, কহিল, বেশ এবার কিন্তু আর যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও হাত তুলতে না হয়।

কদিন হইতেই ক্ষমার চোখে ঘুম নাই—তাহার উপর আছে চিন্তা! ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে কখন যে নিজে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা বুঝিতে পারিল না।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ কিসের আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ক্ষমা। নার্স দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল, কহিল, কি হয়েছে আপনার, অত চীৎকার করে উঠলেন কেন?

ক্ষমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, নিদ্রালু চোখে চারিদিকে একবার চাহিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলাম। একটু চুপ করিল।

স্বপ্ন কি আর সত্যি হয়, নার্স হাসিয়া কহিল, আপনি কিছু ভাববেন না ওর জন্যে। মনের মধ্যে নানা দুশ্চিন্তা এসে জমা হয়েছে কি না, তাই।

ক্ষমা ছেলেটিকে পাশ ফিরাইয়া শোয়াইয়া দিল।

ভগবান না করেন যেন, কিন্তু নৌকার স্বপ্ন—বড় খারাপ স্বপ্ন! এ সব সত্যি নয়? ক্ষমা জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া থাকে নার্সের দিকে।

না-না, ও কিছু নয়! স্বপ্ন ত রোজই দেখা যায়। নার্স কহে।

কিন্তু এ যে নৌকার স্বপ্ন, ক্ষমা আবার বলে।

নার্স হাসিয়া উঠে, বলে, সব স্বপ্নই যদি......যাক, আমি রোগীর কাছে যাই, আপনি ভাববেন না, ভাবলেই চিন্তা বেড়েই চলে, বলিয়া নার্স রোগীর কাছে চলিয়া গেল।

ক্ষমা কিন্তু চিন্তার হাত হইতে রেহাই পাইল না—চিন্তা তাহার ক্রমশ বাড়িয়াই চলিল। সে খালি ভাবিতে লাগিল, কেন সে ঘুমাইয়া পড়িল, না ঘুমাইলে ত আর স্বপ্ন দেখিত না। মন তাহার কেবল এই লইয়া আলোড়িত হইতে লাগিল।

পরদিন সকালে ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল।

দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ক্ষমা ডাক্তারবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দেখুন, টাকার যখনই দরকার হবে বলবেন, কোনরকম 'কিন্তু' করবেন না। তাহার হাতের চুড়ির দিকে তাকাইয়া কহিল, হ্যাঁ, আমায় বলবেন, রোগীকে কিন্তু বাঁচান চাই-ই। সব কিছু দিয়েও রোগীকে কিন্তু এ যাত্রায় বাঁচাতে হবে।

হ্যাঁ, মা আজকে যে রকম দেখলাম, তাতে মনে হয় ভালর দিকেই যাচ্ছে। বড় শক্ত অসুখ আর কিছুদিন না গেলে কিছু বুঝতে পারছি না। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, আমি সবই জানি মা, কি আর বলব বল! খোকার মা মারা যাবার পর থেকে যেন শরীরের উপর অত্যাচারটা আরও বাড়িয়ে দিল। তার আগে থেকেই ওর অবশ্য শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল! যাক, সে সব কথা মা, সে সব কথায় দুঃখ আরও বেড়ে যাবে, তবে তুমি যদি কিছুদিন আগেও আসতে ত অতখানি গড়াতে পারত না। অসুখ হয়েও খালি খোকার কথা—বলত', দাদা, আমি আর পারলাম না, দিন আমার হয়ে এসেছে, যদি পারেন খোকাকে ক্ষমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। সে ছাড়া জগতের ওই অবোধ শিশুর ভার নেবে কে?

ক্ষমা দুই হাত দিয়া চোখ ঢাকে, চোখ তার জলে ভরা, গলা কাঁপিতে থাকে, বলে,—ডাক্তারবাবু,—ডাক্তারবাবু তার পেয়েই আমি চলে এলাম, কিন্তু আমি আসার পর ক'দিন কেটে গেল, জ্ঞান ত তবু ফিরে এল না। আমি এসেছি জানলে হয়ত ওর অনেক চিন্তা দূর হত।

হ্যাঁ মা, তুমি এসেছ জানলে ও হয়ত অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারত। যাক, ভয় কি মা সেরে যাবে সবই। ডাক্তারবাবু রোগীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহেন।

আপনি যদি বলেন, তবে আর ভয় কিসের। আপনাদের ভরসার উপর নির্ভর করেই ত এখনও চেপে রয়েছি। সবই নির্ভর করছে আপনার উপর, যত টাকা যায় যাক, রোগীকে আপনাকে কিন্তু ভাল করা চাই-ই। উনি সেরে উঠলে অনেক টাকাই পাওয়া যাবে......।

আমাদের উপর যতখানি নির্ভর করে, তা করতে কোন রকম পশ্চাৎপদ হব না মা, কিন্তু ডাক্তারের হাতে আর কতটুকু মা। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা লড়ি শুধু নিজেদের মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে, তাঁর খাতায় যা লেখা আছে, তা হবেই। যাক, এখন চলি মা, আমাদের যেটুকু করবার তা ঠিকই করব। নার্সকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলাম; ও বেলা এসে আর একবার দেখে যাবখন।

অবস্থার একটু উন্নতি হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইল। প্রণবের যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা তিনটা!

ক্ষমা মুখের কাছে মুখ নিয়া গিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বড্ড কষ্ট হচ্ছে তোমার, হ্যাঁ?

প্রণব যন্ত্রণা-কাতর চক্ষু তুলিয়া ক্ষমার দিকে চাহিয়া কি যেন বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা হইতে স্বর বাহির হইল না। তাহার চোখ হইতে মুক্তারাশির ন্যায় ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল ক'ফোঁটা জল।

ক্ষমাও নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। হয়ত আর কিছুক্ষণ থাকিলেই তাহার নিজের দুর্ব্বলতা ধরা পড়িত! ধরা পড়িলে কিছু আসে যায় না, পাশে রোগীর মনে তাহা কোন রেখাপাত করে, সেই ভয়ে দৌড়াইয়া গেল দরজার বাহিরে, চোখ ভাল করিয়া মুছিয়া ডাকিল, খোকা?

খোকা উঠানে খেলা করিতেছিল, মায়ের ডাকে খেলা ফেলিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া মায়ের কোলে উঠিয়া বসিল।

তাহাকে কোলে করিয়া ক্ষমা রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রণব খোকাকে ক্ষমার কোলে দেখিয়া অত যন্ত্রণার মাঝেও যেন তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আবার কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার শীর্ণ হাতখানি একটু তুলিবার চেষ্টা করিল, কিছু দূরে উঠিয়া তাহা আবার কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানার উপর পড়িয়া গেল।

বেলা চারটার সময় প্রণবের জ্বর হঠাৎ ছাড়িয়া গেল। তাহার গা কেবলই ঘামিতে লাগিল। প্রণব চোখ বুজিয়া তখন শুইয়াছিল, সকলে ভাবিল হয়ত বা ঘুমাইতেছে, তাই তাহাকে ডাকিয়া আর কেহ বিরক্ত করিল না!

ডাক্তারবাবু যখন রোগী দেখিতে আসিলেন, তখন বেলা প্রায় পাঁচটা হইবে। রোগী দেখিতে দেখিতে ডাক্তারবাবুর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। নার্স তাহার পাশে দাঁড়াইয়া কি যেন বলিতেছিল।

ক্ষমা দূর হইতে কহিল, যাক, এতদিন পরে ভগবান আজ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়েছেন। আপনাদেরও কম কষ্ট হয় নি এ ক'দিন। আপনাদের চেষ্টা যে সার্থক হয়েছে এই যথেষ্ট।

মা খিদে পেয়েছে বড্ড, দুধ দেবে না? খোকা দৌড়াইয়া আসিয়া মায়ের হাত ধরিয়া বলে।

খিদে পেয়েছে? চল তোমায় দুধ খাইয়ে আনি, বলিয়া ক্ষমা খোকাকে কোলে নিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু নার্সকে বলিলেন, অবস্থা বড় খারাপ, এটার কথাই কাল ভাবছিলাম। পালস পাচ্ছি না ত নার্স? যাক আপনি থাকুন, আমি এখুনি আসছি, ইনজেকশন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই এখন। দেখি তবু যদি......

(শেষাংশ ৪৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পোল্যাণ্ড রণাঙ্গনে

মার্শাল স্মিগলি-রিজ পোল্যাণ্ডের সেনাধ্যক্ষ। তিন বৎসর পূর্ব্বে পোল জাতির বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে একটি বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমাদের জন্মভূমি রক্ষার প্রশ্ন যে মুহূর্ত্তে দেখা দিবে, যাহা কিছু আবশ্যক, আমরা সব করিয়া লইতে পারিব, এ বিশ্বাস রাখি। আমাদের যত সমস্যা আছে, অর্থনৈতিক সমস্যা, বেকার সমস্যা সব তখন হইবে গৌণ, জাতির নৈতিক শক্তি সেই মুহূর্ত্তে অপ্রতিহত-ভাবে দৃঢ় হইয়া উঠিবে।"

আজ পোল্যাণ্ডের পক্ষে সেই প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। জার্ম্মানীর সঙ্গে সে আজ যুদ্ধে প্রবৃত্ত। ইউরোপের মধ্যে

পোল্যাণ্ডের ম্যাপ
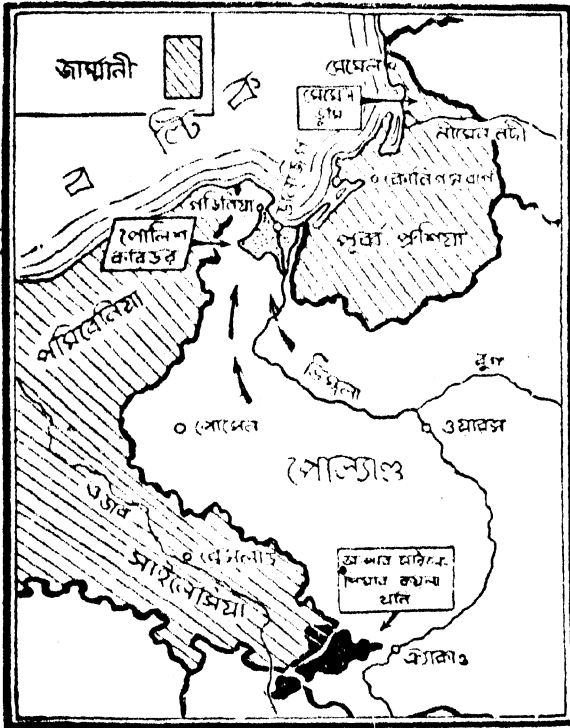
পোল্যাণ্ড বিদেশীর দ্বারা আক্রান্ত হইবার পক্ষে সবচেয়ে বেশী উন্মুক্ত। বার্লিন হইতে কুড়ি মিনিটের মধ্যে পোল্যাণ্ডের সীমান্তদেশে উড়ো জাহাজ পৌঁছিতে পারে। পোল্যাণ্ডের বলিতে গেলে ঘাড়ের উপরই জার্ম্মানী; ১৯২০ সাল হইতে এইরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া পোল্যাণ্ড যেভাবে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে তাহার রাজনীতিক চাতুর্য্যের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ডানজিগকে বর্ত্তমান বিগ্রহের মূল কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই ডানজিগের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রহিয়াছে। এই জন্যই পোল্যাণ্ডকে যদি নিজের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বজায় রাখিতে হয়, তবে সে ডানজিগ ছাড়িয়া দিতে পারে না। ১৯১৯ সালে শান্তি পরিষদের অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনে স্থির হয় যে, ডানজিগ পোল্যাণ্ডকে দেওয়া হইবে, কিন্তু শান্তি পরিষদের সদস্যদের সেই মত রক্ষিত হয় না। ডানজিগ স্বাধীন শহরে পরিণত করা হয়। ভৌগোলিক দিক হইতে ডানজিগ শহরটির গুরুত্ব অনেক। সাত শত বৎসর হইতে এই শহরটির সেই গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ডানজিগ সমুদ্রপথকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ডানজিগ জার্ম্মানীর হাতে গেলে পোল্যাণ্ডের একমাত্র সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরটিই পরের হাতে যায়। ডানজিগের পতন হইলে পোল্যাণ্ডের অপর বন্দর গিডনিয়াও নিরাপদ থাকে না। সকলেই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে প্রেগ শহরটি হিটলারের হাতে যাইবার পরই তিনি ডানজিগের দিকে ঝুঁকিবেন; পোল্যাণ্ড যদি দৃঢ়তা অবলম্বন না করিত, তাহা হইলে হুমকীর জোরে হিটলার ইতিপূর্ব্বেই সে কাজটা হাসিল করিয়া লইতেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। চেকোশ্লোভাকিয়া জার্ম্মানীর হাতে যাইবার পর হইতেই পোল্যাণ্ড সৈন্য-সজ্জা করিতে আরম্ভ করে। ডানজিগের জার্ম্মানদের আতঙ্ক এড়াইবার জন্য পোল সৈন্যেরা তিন দিক হইতে এই শহর পাহারা দিতে থাকে। ডানজিগ সম্বন্ধে জার্ম্মানদের দাবী এই যে, ডানজিগের লোকসংখ্যার বেশীর ভাগ যখন জার্ম্মান, তখন ডানজিগ ন্যায়ত জার্ম্মানদেরই দখলে। হিটলারী পররাজ্য অধিকারের নীতি প্রসারিত হইবার পর হইতেই নাৎসীদলের ভয় পোল্যাণ্ড করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজ ইংরেজ এবং ফরাসী নিতান্ত দায়ে পড়িয়া যেমন এই ব্যাপারে তাহাকে সাহায্য করিতে গিয়াছে, কোন দিনই তেমন যায় নাই; বরং পোল্যাণ্ডের দিক হইতে তেমন চেষ্টাকে তাহারা ক্রমাগত এড়াইয়া গিয়াছে। ফরাসীরা হিটলারকে বাধা দিবার কোন প্রস্তাব করিতে গেলেই ভয় পাইয়াছে এবং ইংরেজ হিটলারী নীতির সঙ্গে বন্ধুভাব প্রদর্শন করিয়াছে। ১৯৩৫ সালের মার্চ্চ মাসে জার্ম্মানী ভার্সাই চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে। এই বৎসরই ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে, ১৯৩৬ সালের বসন্তকালে জার্ম্মানরা রাইন অঞ্চল অধিকার করিয়া লয়। জার্ম্মানী কর্ত্তৃক রাইন অঞ্চল অধিকৃত হইবার সংবাদ পাইবামাত্র পোল্যাণ্ড ফরাসীকে জানায়—তোমরা যদি যুদ্ধ করিতে তৈয়ার থাক, আমরাও তৈয়ার আছি, কিন্তু যদি কাজে কিছু করিতে সাহস না পাও, তাহা হইলে আমাদিগকে আমাদের নিজেদের মতই চলিতে হইবে। স্পেনের পতনের পরও যখন ইংরেজ এবং ফরাসী—কাহারও মতিগতি জার্ম্মানীর সম্পর্কে কোনভাবে পরিবর্ত্তিত হইল না, তখন পোল্যাণ্ড একরূপ নিরাশ হইয়াই পড়ে।

পোল্যাণ্ড আজ যুদ্ধে নামিয়াছে। হিটলারের কাছে সে মাথা নত করে নাই। ইংরেজ এবং ফরাসী এবারও যে তাহার পক্ষে নামিবে, এমন বিশ্বাস বোধ হয়, পোলদের বড় বেশী ছিল না। হিটলারের ধারণাও তেমন ছিল বলিয়া মনে হয় না। পোল্যাণ্ডের পক্ষে ইংরেজ এবং ফরাসী নামাতে পোল্যাণ্ডে যে আশ্বস্তির ভাব দেখা দিবে ইহা স্বাভাবিক। এ পর্য্যন্ত যে খবর আসিয়াছে, তাহাতে ইংরেজ, ফরাসী এই দুই শক্তি সবেমাত্র জার্ম্মানদের উপর আক্রমণ সুরু করিয়াছে, জার্ম্মান সৈন্য এবং বিমান-বহর পোল্যাণ্ডে ধ্বংসলীলা বিস্তার করিতেছে। পোলরাও প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতেছে। ডানজিগ জার্ম্মানদের প্রাধান্যপূর্ণ স্বাধীন শহর। ডানজিগের জার্ম্মানদের নিজেদেরই একটা ছোটখাট বাহিনী আছে। কিন্তু

এসব সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত ভার্সাজিগের পতন ঘটে নাই। জার্ম্মান-সেনা পোল্যাণ্ডের রাজধানী হইতে এখনও বহু দূরে রহিয়াছে। ইংরেজ এবং ফরাসী আক্রমণের চাপ পশ্চিমদিক হইতে জার্ম্মানীর উপর পড়িবার পূর্ব্বে জার্ম্মানী যে পোল্যাণ্ডকে কাবু করিয়া ফেলিতে পারিবে, এমন মনে হয় না। জার্ম্মানীর চেয়ে পোলদের সামরিক তোড়জোড় কম, কিন্তু সঙ্কল্পশীল কম লোকও আধুনিক সামরিক তোড়জোড় লইয়া উন্নততর শত্রুর বিরুদ্ধে যে কিভাবে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে, স্পেনে সাধারণতন্ত্রীদের সংগ্রামেই সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ফ্রাঙ্কোর বাহিনী—ইউরোপের প্রধান দুই শক্তি ইটালী এবং জার্ম্মানী এই দুইয়ের সাহায্য পাইয়াও সাধারণতন্ত্রীদিগকে কাবু করিয়া সহজে মাদ্রিদ দখল করিতে পারে নাই। পোল্যাণ্ডের স্থায়ী সৈন্যের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬০ হাজার। ইহা ছাড়া নাগরিকবাহিনী আছে, এই বাহিনী প্রয়োজন হইলে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে। এই বাহিনীর লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ, দেশের সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের লোকদিগকে লইয়াই এই বাহিনী গঠিত হইয়া থাকে। পোল্যাণ্ডের বিমান বাহিনীতে ৮ হাজার লোক আছে, এবং তাহাদের ১৪ শতখানা উড়োজাহাজ আছে। এই-গুলির মধ্যে ছয় শত হইতে সাত শতখানা প্রথম শ্রেণীর সামরিক বিমান। এই কয়েক দিনের লড়াইতেই দেখা যাইতেছে যে, বিমানবাহিনী তাহার বেশই শক্তিশালী। পোল বিমান বীরদের কৃতিত্বের প্রশংসা শোনা যায় ইউরোপের সর্ব্বত্র। উড়োজাহাজ ধ্বংসী কামান চালনায় পোল-গোলন্দাজরা ভাল ওস্তাদ। কয়েক বৎসর ধরিয়া পোল্যাণ্ড উড়োজাহাজ হইতে আত্মরক্ষার দিকেই সব চেয়ে বেশী নজর দিয়া আসিতেছে। মেসিন-কামানের তোড়জোড়ের দিক হইতে পোল্যাণ্ড তেমন শক্তিশালী নয়, এই কথা বিশেষজ্ঞগণ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন; কিন্তু এসম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা তাহা সম্ভবত ততটা সত্য নয়। অশ্বারোহী সৈন্যদলের গর্ব্বে পোলজাতি গর্ব্বী। পোল্যাণ্ডের খোলা জমিতে তাহারা ভাল লড়াই চালাইতে পারে। পোল্যাণ্ডে নিম্নলিখিত কেল্লাগুলি আছে—পশ্চিম দিকে টোরুন এবং পোসন্যান; দক্ষিণ দিকে—ক্র্যাকো, প্রেমসিজাল; পূর্ব্ব দিকে—ব্রেষ্টঅন-বাগগ্রোডনো, ওসউইক এবং মধ্য দেশে—ওয়ার-সা, মোডালিন এবং ডেবিল। পোল্যাণ্ডের নৌবাহিনীতে চারখানা ডেষ্ট্রয়ার, তিনখানা ডুবোজাহাজ, দুইখানা গানবোট, চারখানা মাইন পাতার জাহাজ, পাঁচখানা টর্পেডো বোট এবং নদীপথে পাহারার উপযোগী কয়েকখানা গানবোট আছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পোল্যাণ্ড সামরিক যোগ্যতায়

পোল অশ্বারোহী দল

দিক হইতে ইউরোপে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে; সে কথার সত্য-মিথ্যা কয়েক দিনের মধ্যেই সহজে প্রতিপন্ন হইবে। তবে এই কথা সত্য যে,প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল প্রতিবেশীদের মধ্যে পড়িয়াও এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আত্মরক্ষায় যে শক্তি গড়িয়া তুলিয়াছে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

জার্ম্মানী মুখে ডানজিগের ধুয়া তুলিয়া যুদ্ধে নামিয়াছে। কিন্তু ডানজিগ জার্ম্মানীর রাষ্ট্রভুক্ত করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। পোলিশ করিডর দখল করা এবং প্রকৃতপক্ষে পোল্যাণ্ডের স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করাই তাহার উদ্দেশ্য।

জার্ম্মানীর সেনাদল পোলিশ সীমান্ত ব্যাপিয়া লড়াই চালাইতেছে। শ্লোভাকিয়া জার্ম্মানদের হাতে যাইবার পর এই দিক হইতে সে সুবিধা পাইয়াছে। পোল্যাণ্ডের উপর জার্ম্মানীর এই নজর নূতন কিছু নয়, পোল্যাণ্ডে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে হইতেই এই নীতি বিসমার্ক অবলম্বন করিয়াছিলেন। হিটলার সাময়িকভাবে পোল্যাণ্ডের সম্বন্ধে নীতির একটা পরিবর্ত্তন বরদাস্ত করিয়া লইয়াছিলেন মাত্র, কারণ তাহার লক্ষ্য ছিল অন্য দিকে। রাইন অঞ্চল দখল করিয়া অষ্ট্রিয়াকে কব্জার মধ্যে আনিয়া পরিশেষে চেকো-শ্লোভাকিয়াকে অধীন করিয়া পোল্যাণ্ডকে এখন তিনি গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। জার্ম্মানীর রাষ্ট্রনীতির মন্ত্রগুরু বিসমার্ক বহুদিন পূর্ব্বে প্রথম যে রাজনীতিক বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে জার্ম্মানীর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের কথা তুলিয়া বলেন,—পোল্যাণ্ড যদি স্বাধীন রাষ্ট্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সে যে প্রুশিয়ার চিরবৈরী হইয়া দাঁড়াইবে এসম্বন্ধে কাহারও মনে কোন রকম সন্দেহই থাকিতে পারে না। পোল্যাণ্ড স্বাধীনতালাভ করিলে ভিশ্চুলা নদীর মোহনা পর্য্যন্ত পোল-ভাষাভাষী অঞ্চল, পূর্ব্ব প্রুশিয়া, পোমারে-নিয়া এবং সাইলেসিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিবে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বিসমার্ক এই উক্তি করেন, তাহার পর হইতে জার্ম্মানী পোল্যাণ্ডের সম্বন্ধে এই একই মতিগতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। পোল স্বদেশপ্রেমিকরা নিজেদের স্বাধীনতার উপর যখনই জোর দিয়াছেন, তখনই জার্ম্মানী তাহাদিগকে অত্যাচারের দ্বারা দলন করিতে চেষ্টা করিয়াছে পশ্চিম প্রুশিয়াস্থ পোল-ভাষাভাষী অঞ্চলের পরিস্থিতির কথা প্রসঙ্গে বিসমার্ক তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"পোলদিগকে আঘাত কর, এমন আঘাত তাহাদিগকে দাও যে তাহারা আর মাথা তুলিতে সাহস না পায়। পোলেরা যে অবস্থায় পড়িয়াছে, তাহাতে আমার সহানুভূতি তাহাদের উপর আছে, কিন্তু আমাদিগকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহা-দিগকে উৎখাত করিতেই হইবে। নেকড়ে বাঘের হিংস্রতার জন্য দায়ী সে নয়, যিনি তাহাকে তেমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই স্রষ্টাই সেজন্য দায়ী।"

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রুষ অধিকৃত পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকামী সন্তানগণ বিদ্রোহ অবলম্বন করেন, রুষিয়া কঠোরহস্তে স্বাধীনতার সাধকদিগকে দলন করিতে প্রবৃত্ত হয়। ঐ সব পোল স্বদেশপ্রেমিকরা তৎকালে ইউরোপের সকল জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, জার্ম্মানীতেও অনেকে তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন। জার্ম্মানীর চারণ কবিগণ পোল-বীরদের বন্দনাগান করিতে থাকেন; কিন্তু বিসমার্কের মন এই সময় বার্লিনস্থ ব্রিটিশ রাজদূত বিসমার্ককে সাবধান করিয়া পোল স্বাধীনতাকামীদিগকে দলন করিবারই কৌশল খুঁজেন। এই সময় বার্লিনস্থ ব্রিটিশ রাজদূত বিসমার্ক সাবধান করিয়া দিয়া বলেন যে, পোল স্বাধীনতাকামীদিগকে দমন করিবার জন্য প্রুশিয়া যদি সৈন্য পাঠায়, তবে ইউরোপের কোন শক্তিই তাহা বরদাস্ত করিবে না। বিসমার্ক উত্তরে বলেন,—'ইউরোপ বলিতে আপনি কি বুঝাইতে চাহিতেছেন? ইউরোপের শক্তিরা কি সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থায় আছে, যাহাদের জন্য ভয়?' বাস্তবিক পোল্যাণ্ডকে রক্ষার উপযুক্ত ঐক্য ইউরোপের শক্তি-বর্গের মধ্যে তখন ছিল না।

পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকামিগণের সাধনা অনেক আগেই সিদ্ধ হইত, কিন্তু হয় নাই, বিসমার্ক এবং তাঁহার মন্ত্র-শিষ্যদের জন্য। ৫০ বৎসরকাল সে স্বাধীনতা পিছাইয়া যায়। কিন্তু পোল্যাণ্ডের সমস্যার কোন সমাধান হয় না। বিগত মহা-সমরের পর পোল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা প্রদান করা বিজেতৃগণ সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য মনে করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ডানজিগের কর্ত্তৃত্ব লাভ করাই হিটলারের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, পোল্যাণ্ড একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রস্বরূপে সমুদ্রের ধার জুড়িয়া থাকে, জার্ম্মানীর ইহা চক্ষুশূল। জার্ম্মানীর অভিভাবকত্বে সুবোধ শিশুর মত পোল্যাণ্ড পড়িয়া থাকে হিটলারের তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু বর্ত্তমান পোল্যাণ্ড তেমন পোল্যাণ্ড নয়, মার্শাল পিলসুডস্কির কঠোর সাধনায় যে পোল্যাণ্ড গঠিত হইয়াছে, সে পোল্যাণ্ড জার্ম্মানীর জবরদস্ত জাঁদরেল-নেতার গোলামগিরি করিবার মত পোল্যাণ্ড নয়। বর্ত্তমান পোল্যাণ্ড একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র—বাল্টিক সমুদ্রের ধারে তাহার সামরিক প্রভাব এবং সুগঠিত সৈন্যবাহিনীর দ্বারা সে সুরক্ষিত। জার্ম্মানীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক জুড়িয়া রহিয়াছে এই পোল্যাণ্ড—এই পোল্যাণ্ড জার্ম্মানীর প্রভুত্ব বিস্তারের অন্তরায়স্বরূপ; সুতরাং এই পোল্যাণ্ডকে ধ্বংস করিতেই হইবে, হিটলারের এই সঙ্কল্প; কিন্তু সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে কি? পোল-স্বাধীনতার উপাসকদের শোণিতোৎসর্গ কি ব্যর্থ হইবে? পোল্যাণ্ডের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণ ইহাই বুঝাপড়া করিতে দাঁড়াইয়াছে।

নিকৃষ্ট জীব

(বড় গল্প—শেষার্ধ)

শ্রীসরল মুখোপাধ্যায়

(৪)

মেয়েদের হোস্টেলে সেই ডিনারের পর সামান্য সর্দিতে ভুগিলেও কিন্তু দনুজের নিকট পরবর্তী ওই মাসটা মাসের নমুনা হিসাবে একেবারে রঙিনই মনে হইল। মাস তো আজ অবধি কম পার করিয়া ফেলে নাই, কিন্তু এমন হাওয়ায়-ভর-করা হাল্কা দিনগুলি কখনও তাহার চোখের সম্মুখে নৃত্য করিয়া করিয়া দিনের মালায় গ্রথিত হইয়া মাসে পরিণত হয় নাই। ইহার কারণ ছিল এক জোড়া।

ইহার একটি হইল স্থানীয় সংবাদ পত্রের কাটিং-সংগ্রহ অতি যত্নে একখানি য়্যালবামে আঁটা। লক্ষ্য করিলে তাহা হইতে উদ্ধার করা যাইবে যে দনুজের ক্যাপ্টেনগিরির অধীনে সাত-সাতটি ম্যাচ্ ওই কলেজ জিতিয়া ফেলিয়াছে। আর এমন সাফল্য এই কলেজের বরাতে পাঁচ বৎসরের ভিতর ঘটে নাই। সাকরেদদের তারিফে আর দর্শকদের হাততালিতে দনুজের যেন সর্বদাই শিস্ দিয়া সুর টানিতে ইচ্ছা হয়।

দ্বিতীয় কারণটি দনুজের কাছে মনে হয় যেন তাহার স্বপ্নেরই একটা পট-পরিবর্তন। খেলার পর প্রায় রোজই তাহার শুনিতে হয় রত্না দেবীর প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক বক্তৃতা। কোন দিন রত্না দেবী একাই আসে, কোনদিন আবার সঙ্গিনী অন্য একটি থাকে রত্নার সাথে। ফুটবল খেলোয়াড় যতই প্রস্তর যুগের অতিকায় সরীসৃপ হউক না কেন, রত্না দেবীও দর্শকের ভূমিকায় দীক্ষা গ্রহণে আজকাল কেমন একটা আগ্রহই প্রদর্শন করে—তবে সে উপস্থিতি, রত্না দেবীর মতে, ফুটবল বিরোধী সমালোচনার খোরাক সংগ্রহ করিতে।

এক রবিবারে মিসিস্ চাটার্জীর বিশেষ অনুমতি গ্রহণ করিয়া দনুজ আর রত্না দেবী বায়োস্কোপও দেখিয়া আসিয়াছে; কারণ সেদিন যে ছবি ছিল, রত্নার ধারণা, তাহাতে ফুটবলের নেশা ছাড়াইবার ঔষধ রহিয়াছে। দনুজ কিন্তু বায়োস্কোপে ফুটবল খেলা অপেক্ষা অনেক বেশীই উত্তেজনার তরঙ্গ অনুভব করিয়াছে; এবং কক্ষের আবছা অন্ধকারে পর্দার ছবির দিকে না তাকাইয়া শিল্পীর দৃষ্টিতে রত্না দেবীর মূর্তি উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছে প্রাণপণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সকলই চোখ দুটিতে আবাহন করিয়া।

আর এক ছুটির দিনে ১৫ মাইল দূরে এক কলেজের 'সাইকোলজি থার্টিওয়ান' বিষয়ের লেকচার শুনিতে তাহারা দুইজনে গেল ভাড়া-করা মোটর বাইকে। অবশ্য বাইকটির সাইডকার ছিল অতি সুন্দর। বক্তৃতায় এমন সব বিকলন-তত্ত্বের কচ্‌কচি বর্ষণ হইল যে, মরামানুষও কানে আঙ্গুল দেয়; কিন্তু দনুজ অসীম ধৈর্যে তাহাও শুনিয়াছিল আগা-গোড়া, কারণ রত্না দেবীকে দার্শনিক হইতেই হইবে, সুতরাং এই বক্তৃতা না শুনিয়া উপায় নাই। পরিশেষে এই কথা তো স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে তরুণীকে মনের গহনে মানসী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে (অবশ্য গোপনে আপন মনেই) তাহার মুখখানির দিকে অপলকে তাকাইয়া থাকিবার স্থান বক্তৃতায় ছাড়া অন্য কোথাও দুর্লভ।

আশায় আশায় দনুজের আকাশখানি নীলিমা রঞ্জিত হইলেও একটামাত্র কাঁটা রহিয়া গেল, যাহা সময়ে অসময়ে কেবলই খচ্‌খচ্ করিয়া বিঁধিত। সেই কাঁটাটি হইল দনুজের অনিদ্রা। অসাধ্য এই রোগের নিরাময় আশা দনুজ ছাড়িয়া দিয়াছে। বোধ হয় সেই জন্যই দনুজের বর্জিত সেই খেই হাত বাড়াইয়া ধরিয়াছে রত্না। কারণ দনুজের ফুটবল নেশা কাটাইতে হইলে, তাহার ফুটবল-স্বপ্ন, যাহা অনিদ্রার আকারে বেচারীকে হায়রান্ করে, সেটাকেও দূর করিতে হইবে। দনুজ আর রত্নার যে ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তার একদিকে মিল আছে বেজায় যে, দনুজ যা বলিবে ঠিক, রত্না তাকেই বলিবে বেঠিক। সুতরাং দনুজ যেখানে হাল ছাড়িল, রত্না সেখানে যে হাল ধরিবে, ইহাতে বিস্ময় নাই এতটুকু।

রাত্রিতে শয্যাগ্রহণের পূর্বে ঠাণ্ডা জলে স্নান যখন ব্যর্থ হইল, তখন রত্না কলেজ লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া বড় বড় পুঁথি-পত্র ঘাঁটিতে লাগিল। "নিদ্রা এবং মানসিক অবস্থা" "আধুনিক জীবনে অনিদ্রা"—এমনই সব প্রামাণ্য গ্রন্থ পড়িয়া কত অভিনব মতবাদ যে রত্না আয়ত্ত করিল, তাহার ঠিক ঠিকানা নাই।

প্রথম দিন দনুজকে গরম গরম দুধ খাইয়াই শুইয়া পড়িবার ব্যবস্থা দেওয়া হইল। নির্দেশ—ফুটন্ত দুধ। ফল হইল ঝলসানো জিহ্বা। তবে সুখের বিষয় রাত দুপ... ঠাণ্ডা জলে স্নানের সর্দির মত তা দিনের পর দিন কষ্ট... নাই—জিহ্বা তাহার আরাম হইয়া গিয়াছে পরদিন ? ...দনুজকে হতচ্ছাড়া

দ্বিতীয় দিন রত্নার বিজ্ঞ মতবাদ জাহির হইল ... গ্রহণের পর একেবারে নিঃসাড়ে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া হইবে, একটি মাংসপেশীও নড়ান যাইবে না এক...য়। স্বীকার থিওরির অনুসরণে দনুজের সর্ব শরীর এমন আ... যে, মেনকার যে পরদিন খেলার মাঠে বলে কিক্ করিতে তাগ... রত্নার খচ্‌খচ্ ক্ষিপ্রতাও রহিল না। ...স্থির করিতে

তৃতীয় চতুর্থ দিনের থিওরিও তেমনই বিফল তাহার উপর আবার ব্যথা-বেদনার উদ্ভব করিল না... দনুজের কিন্তু খেলোয়াড় দনুজ এমন ব্যথাকে গ্রাহ্যই করে না, বলিতে রত্না দেবীর নির্দেশ পালনের ব্যথা তো তাহার নিকট ... যদি নিমেষ; কিন্তু থিওরির পর থিওরির প্রয়োগে ফল হইল স্বস্তি যে, আগে যদি বা সপ্তাহে দুই রাত্রি কোন প্রকার ঘুমে... আমেজ দনুজকে সকল শ্রান্তি দূর করিতে সাহায্য করিত, এখন সেটুকুও অন্তর্হিত হইল। রত্না দেবীকে খুশী করিবার প্রয়াসে দনুজের মনের পরতে পরতে যে থিওরিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রবেশ করিল, তাহার উগ্রতা দনুজের দুই চক্ষু হইতে নিদ্রাকে নির্বাসিত করিল নির্মম হস্তে। রাতে শয্যায় ঘুম হয় না, কিন্তু সপ্তাহ ধরিয়া যেখানে সেখানে যখন তখন ঢুল আসিয়া তাহার দুই চক্ষু জুড়িয়া বসে। অথচ রত্না দেবী দনুজের অনিদ্রা দূর করিবেই। বিশেষত যখন রত্নার থিওরির ভাণ্ডার অফুরন্ত।

সেদিন আবার মস্ত বড় এক দার্শনিক প্রফেসরের বক্তৃতা। রত্না আর দনুজের সে বক্তৃতা না শুনিলেই নয়। ঠিক হইল মিসিস্ চাটার্জীর অনুমতি লইয়া রত্না অপেক্ষা করিবে 'দীপালী' সিনেমার বারান্দায় [illegible]

দনুজ ঠিক সময়ে সেখানে হাজির হইয়া রত্নাকে লইয়া যাইবে। দনুজ ভোর হইতেই উদগ্রীব হইয়া আছে কতক্ষণে শুভক্ষণটি আসিবে।

উপরি উপরি দুই সপ্তাহের অনিদ্রায় দনুজের মুখ-চোখ হইয়াছে কালো। চেহারাও হইয়াছে রোগা। ফুটবল খেলে বটে; কিন্তু কেমন যেন স্বপ্নের মায়ায় আবৃছা এক পারিপার্শ্বিককে। মুখ ফুটিয়া এ কথা রত্নাকে বলে না, পাছে সে প্রাণে আঘাত পায়, থিওরি বৃথা হইয়াছে বলিয়া।

কলেজ হইতে ফিরিয়া ভাল করিয়া হাতমুখ ধুইল। খাবার খাইল, চা পান করিল—তবু সে চারিটা আর বাজে না। অবশেষে ফরসা সুট কাপড় জামা পরিতে উদ্যত হইল। না হয় একটু আগেই তৈরী হইল। সে ঠিক করিয়াছে কাঁটায় কাঁটায় পৌনে পাঁচটার সময় সে দীপালীতে যাইয়া দেখে দিবে—এক মিনিটও আগে নয়। কিছুতে রত্নাকে ধারণা করিতে দেওয়া হইবে না যে, দনুজ এই 'য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট'-য়ের জন্য পাগল হইয়া রহিয়াছে।

জামার একটা হাতা গলাইয়া মনে হইল দনুজের আর্শিতে একবার দেখিয়া লয় মুখখানা। চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপরকার আয়নাখানির দিকে তাকাইল। না, মাত্র, —টা বেশ মানাইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য রত্নার প্রসাধন—যা করিয়া তাহাতেই তাহাকে দেখায় অপরূপ। কি ভাগ্য সেই শ্লোভাকি খেলার পর ফুলসফুলের সারির পিছন দিয়া গিয়াছিল করিতে উ হাড়িতে—বরাত তাহার ভালই বলিতে হইবে।......
বিসমার্ক ব
প্রদান করেন, বিরক্ত করিস্‌নে।
তুলিয়া বলেন,—বাবু, আপনাকে ডাকছেন যে!
হয়, তাহা হইলে আবার ডাকবে কোন্‌ হতভাগা! যা-যা!
এসম্বন্ধে কাহারও—, হতভাগা নয়। মেয়ে হোস্টেলের দিদিমণি
না। পোল্যান্ড
পর্য্যন্ত পো—দিদিমণি শুনিয়াই দনুজের টনক নড়িয়া উঠিল। এক
নিয়া এবং স—র ছাড়িয়া উঠিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইতেই চক্ষু-
করিবে। —সাড়ে পাঁচটা! সর্বনাশ!
পর হইতে ওরে ভবু, হতভাগা ঘড়িটা ঠিক চলছে?
অবলম্বন —হাঁ বাবু।
স্বাধীন —কি সর্বনাশ!
তাহা
পা চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে দনুজ ছুটিল। দুইটি করিয়া ধাপ এক-একবারে ডিঙাইয়া দোতলা হইতে নামিয়া আসিল। রাস্তায় পৌঁছিয়া দেখে—অদূরে সমুখের ফুটে রত্না দেবী অস্থির পদক্ষেপে পায়চারি করিতেছে—ধমনী তাহার যেন আকাশ ছুঁইতে চায় স্পর্ধায়—উষ্মায়।

দনুজের পা হইতে হাঁটু অবধি যেন অসাড় হইয়া যায়। তবু যাইতেই হইবে—অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে।

দূর হইতেই দনুজ ম্লানমুখে ডাকিল—রত্না দেবী, অপরাধ........

আর বলিতে হইল না। রত্না দেবীর ছুঁচালো জুতার স্বরে আর ছাতাটির খোঁচায় বাঁধান ফুটপাথ এক ঐক্যতান বাদনের সৃষ্টি করিল, যাহার সহিত যোগ্য সুরের যোগাযোগ করিল রত্নার কণ্ঠস্বর।

অপরাধ! আবার নির্লজ্জের মত কথা বলা হচ্ছে। তা হবেই তো। যাকে অপমান করতে বাধে না অপরিচিতা থাকাকালেও, তার সংগে য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখার ভদ্র ব্যবহার করার আবার দরকার থাকবে, এমন সুবুদ্ধি ফুটবল খেলোয়াড়ের হবে কেমন করে।

—মাফ করুন, ঘুমিয়ে পড়ে........

ঘ্রা তো হবেই। আমার সংগে য়্যাপয়েণ্টমেণ্টের নামে ঘুম পাবে বইকি! আমায় দেখে এখন আরও বেশী ঘুম পাচ্ছে নিশ্চয়।

নিজে মাটির সংগে মিলিয়ে যেতে চায়। আমি ক্ষমা চাইছি।

—ক্ষমা! তারও কি সীমা নেই?

—আমি তো ক্ষমা চেয়েছি রত্না দেবী। অন্য কেউ হলে আমি আরও এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে তবে নেমে আসতুম। আপনি বুঝছেন না—

—একটা জিনিষ আমি খুব বুঝেছি। আপনাকে গাছে তুলে দিলে, গাছে উঠতে উঠতে বেশ ঘুমিয়ে নিতে পারেন এক টিপ। আপনি আবার বলেন অনিদ্রা। সব ধাপ্পাবাজী—সব চালাকী—বলিতে বলিতে রত্না দেবী মত্ত হস্তীর মত পা ফেলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

দনুজ সেই ফুটপাতে দাঁড়াইয়া নিজেকে ধিক্কার দিয়া ভাবিতে লাগিল, এই কালঘুম তাহার মহানিদ্রায় পরিণত হইল না কেন। হঠাৎ নজর পড়িল হাতের দিকে, কি সর্বনাশ! জামার একটা হাতা পরা, আর বাকিটা ঝুলিতেছে পিঠে হায় হায়, শেষটায় সে সং সাজিয়া অনিদ্রার থিওরীর রাণীকে করিল অপমান! ক্ষমার অযোগ্যই বটে!

(৫)

এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু শতবার চেষ্টা করিয়াও দনুজ সাক্ষাৎ পায় নাই রত্না দেবীর, মেয়ে হোস্টেলে যাইয়া আকুতি জানাইয়াও। প্রতিবারেই মিসিস চাটার্জীর দৃঢ় আদেশ বাণী আসিয়াছে—সাক্ষাৎ অসম্ভব। কলেজে প্রবেশ ও প্রস্থান রত্না দেবী এমনই চতুরতার সহিত সঙ্গিনীদের সংগে বাক্যালাপে নিরত অবস্থায় সম্পন্ন করিয়াছে যে, দনুজ আর সুযোগ পায় নাই রত্নার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার। দনুজ হতাশায় মৃতপ্রায় হইয়া সকল উৎসাহ হারাইয়াছে—সাধের ফুটবল খেলাটিতেও তাহার শিথিলতা একটি ম্যাচে পরাজয় আনিয়াছে। পরাজয়ের গ্লানি, সহপাঠিগণের টিটকারী দনুজকে আরও সঙ্কুচিত করিয়াছে। সে আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে চাহে না। গুজব রটিয়াছে ক্যাপ্টেন দনুজ এ কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

দনুজের খেলার মাঠের বন্ধুগণ উৎকণ্ঠিত। প্রিয় শিষ্য ভদ্রেশ একেবারে উত্তেজনায় অপ্রকৃতিস্থ। সকলে মিলিয়া দনুজকে অনুরোধ করিল অন্তত এ বর্ষের ফুটবল মরসুমটা পার না করিয়া সে কলেজ যেন ছাড়ে না। কিন্তু দনুজ হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। সে যেন স্তব্ধ, সঞ্জীবতা

তাহার অন্তর্হিত হইয়াছে। কলেজের সম্মান যে দনুজের কাছে ছিল মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের মত, কলেজের সুনাম রক্ষায় যে দনুজ খেলোয়াড়দের পায়ে ধরিতেও রাজি ছিল—সেই দনুজ আজ কলেজের মান-অপমানের প্রতি উদাসীন।

কথাটা মেয়েদের হোস্টেলেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং কয়েকটি মেয়ে কথাটায় যেন বিস্মিতই হইল। যে কয়টি মেয়ের সঙ্গে রত্না বাজি ধরিয়াছিল 'থুতুনী-অভিযান' লইয়া তাহারা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিল না, আবার নূতন কি অধ্যায় আসিয়া পড়িল যাহাতে দনুজের এমন অবস্থা! নিশ্চয় তাহা হইলে রত্নাই ইহার জন্য দায়ী। ফুটবল তাহার চক্ষুশূল, সে হয়ত দনুজকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছে ও-খেলা ছাড়িয়া দিতে। মেয়েরা মতলব ঠাওরাইতে থাকে কিভাবে রত্নাকে বাগে আনা যায়।

রত্নার আজন্ম গোঁ, যে বিষয় সে একবার আঁকড়াইয়া ধরিবে তাহার শেষ না দেখিয়া সে ছাড়িবে না। অনিদ্রার থিওরি তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। বইয়ের পর বই পড়িয়া সে রাশি রাশি থিওরি গড়িয়া তুলিয়াছে। আর একখানি বাঁধানো খাতায় তাহা নম্বর দিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে। পরিশেষে এমন একটা থিওরি তাহার মনে ধরিয়াছে, যাহার সাফল্য সম্বন্ধে সে একেবারে নিশ্চিত। কিন্তু দনুজটা যে আসিতেছে না। হঠাৎ তাহার মনে হয়, রত্না-ই তো তাহার সাক্ষাতের সকল পথ স্বেচ্ছায় রুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু থিওরির বাস্তব পদ্ধতিটি যে রত্নার মাথার ভিতর গজগজ করিতেছে; উহাকে পরখ না করা পর্যন্ত রত্নার আর স্বস্তি কোথায়? এখন রোগীটিকে হাতের কাছে পাওয়া যায় কি উপায়ে? গায়ে পড়িয়া দনুজের পিছনে ছুটিয়া যাওয়া শোভন হয় না; কেন-না ডাক্তারী করিতে উদ্যত হইলেও সে হইল নারী। তরুণীর পক্ষে গরজ দেখানো নিতান্তই অসঙ্গত। কি করা যায়—কি করা যায়! কিন্তু দনুজকে আনিয়া ভিড়াইতেই হইবে কাছে।

রত্নার এমনই মানসিক সমস্যার আবহাওয়ায় আসিয়া দেখা দিল মেয়েরা কেতকীকে সমুখে রাখিয়া। কিন্তু মেয়েদের দেখা মাত্র রত্নার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল অনর্গল বক্তৃতা—অনিদ্রার প্রতিষেধকের গুণ বিচারে। মেয়েরা কেহ আর কথা বলিবার অবকাশ পায় না। দনুজকে এড়াইয়া চলায় রত্নার বক্তৃতা স্পৃহা বাড়িয়া গিয়াছে দ্বিগুণ। আর বক্তৃতার বিষয় সম্পদ তাহার কম নয়—সদ্য পড়া অনিদ্রার বৈজ্ঞানিক আলোচনা তাহার মুখস্থ। মেয়েরা তো অবাক! তাহারা জানে না দনুজ অনিদ্রা রোগী আর তাহার যোগ্য চিকিৎসক যে রত্না স্বয়ং। তাহারা ভাবিল বই পড়িতে পড়িতে অনিদ্রায় ভুগিয়া রত্না হইয়াছে উন্মাদিনী। কিন্তু একটি কালো মেয়ে—নাম তার মেনকা—সে কিছুটা আন্দাজ করিয়া লইয়াছে রত্না-দনুজের ব্যাপার। সে আঁধারেই ঢিল ফেলিয়া রত্নাকে সচকিত করিয়া দিল।

মেনকা বলিল—রত্না, তোর কাছে বলতে ভাই আমার কুণ্ঠা নেই। অনিদ্রার অষুধ আমারও চাই ভাই। কি আর বলবো, ভালবাসায় হাবুডুবু খেয়ে এখন অনিদ্রায় জেরবার হচ্ছি।

রত্না বলে—ভালবাসায় অনিদ্রা? অনিদ্রার অষুধ চাস?

—তবে আর বলছি কি।

—প্রণয়ী এখানে মানে এ শহরে থাকে?

—হ্যাঁ। তোরাও জানিস তাকে। নামটি ভাই বলবো না।

—নাম না-ই বললি, কি করে সে? বিশেষ ঝোঁক তার কোন্ দিকে?

মেনকা লজ্জার ভাণ করে। কতই যেন কুণ্ঠার সঙ্গে বলে—করে আর কি, কলেজে পড়ে। আর—আর—ঝোঁক? ঝোঁক হ'ল তার বেজায় ফুটবল খেলায়।

কথাটা শুনিয়াই রত্নার বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে। কিন্তু নিমেষে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ফুটবলের বিরুদ্ধে নিদারুণ যুক্তিতর্ক সুরু করে।

মেনকা লক্ষ্য করে রত্নার হাবভাবের পরিবর্তন। শুধু ফুটবলের নামেই এই, পোড়ারমুখী নিশ্চয় ফাঁদে পড়েছে। মনে ভাবে মেনকা।

এই সুযোগে কেতকী তাহাদের আগমনের কারণ জানাইয়া দেয়। শুনিতে শুনিতে রত্নার মুখে ছাপ পড়ে রকম রকম। বিস্ময়, ক্ষোভ, অনুশোচনা—ক্রমে খেলিয়া যায় রত্নার চোখমুখের উপর দিয়া। অবশেষে আসে উল্লাস। মেয়েরাও আশ্বস্ত হয়—সেই বাজী রাখার কথা স্মরণ করিয়া। কলেজের মান বজায় থাকিবে খেলার মাঠে। রত্না চেষ্টা করিবে দনুজকে বাকি ছয়টা মাস কলেজে রাখিতে—সে অবশ্য হতচ্ছাড়া ফুটবলের জয়জয়কারের জন্য নয়—ফুটবলটা বর্বরতম মাত্র, একথা প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত।

সে রাত্রিতে রত্নাকে পাইয়া বসিল অনিদ্রায়। স্বীকার করিতে হইল সঙ্গোপনে নিজের মনের কাছে যে, মেনকার ভালবাসার ইতিহাস শুনিয়া অবধি কোথায় যেন রত্নার খচ্‌খচ্ করিয়া বিঁধিতেছে। কিন্তু কিছুতেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না—কেন।

তবে একটা সুযোগ মিলিয়াছে চমৎকার। এখন দনুজের কাছে অযাচিতে গেলেও কেহ তাহাকে গায়ে-পড়া বলিতে পারিবে না সত্যই তো তাহার নূতন থিওরিটা যদি দনুজের উপর খাটাইয়া না দেখিতে পারে, তবে যে সে স্বস্তি পাইবে না। এ পরখ না করিতে পাইলে তাহার জীবনই যে দুর্বিষহ হইয়া পড়িবে। তথাপি দনুজকে ফুটবল খেলায় উৎসাহিত করিতে সে পারিবে না জীবন গেলেও। পরক্ষণেই তাহার মনে পড়ে এবারের পরখ তো সফল হইবেই—ব্যস্, ফুটবল আপনিই খসিয়া পড়িবে দনুজের মন হইতে।

(৬)

পরেরদিন খেলার পর সেই ফুরুস ফুলগাছের সারির পিছনে হঠাৎ দেখিল রত্না—সে আর দনুজ মুখোমুখী দাঁড়াইয়া। কেতকী, মেনকারা আগে হইতেই হুঁসিয়ার ছিল, তাহারা সেই ব্যবস্থাই করিল, যাহাতে উহাদের দুজনের নিরালা সাক্ষাৎ ঘটে।

বিস্ময়ে উত্তেজনায় পুলকস্পন্দনে দনুজের কণ্ঠরোধ হইল। কথা সুরু করিল রত্না মিষ্টি-মধুর হাসির লহরে

বাঁচালুম দনুজবাবু, তবু যা হোক দেখা পেলুম। দেখুন, কাকাবাবু এসেছেন, আপনি তাঁকে কাল শহরটা দেখাবেন। কাকা স্পোর্টস্‌ম্যান ছিলেন কিনা, আপনি না হলে যোগ্য সঙ্গী হবে না। তবে কাকা একটু একগুঁয়ে। আপনাকে কষ্ট করে তাঁর মন জুগিয়ে চলতে হবে। না, না অমন মুখ কালো করবেন না। এ না করলে আমার মান থাকে না কাকার কাছে।

শহর তো 'তুমিও'—আপনিও দেখাতে........

—অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন, এখন থেকে আমায় 'তুমিই' বলবেন।

—সেটা এক তরফা হয় না।

—বেশ তো, আমিও তোমায় দনুজ-দা বলবো। আর লক্ষ্মীটি আমার সাইকোলজির একটা পেপার কালের ভিতর তৈরী করতে হবে।

দনুজ মনে করিল শাপে বর। ঝড়-বাদলের পর এ রোদের চমকটুকু আশার কথা বটে। মুখে বলিল—বেশ, তোমার জন্যে আর তোমার কাকার জন্যে একটা দিন আর দিতে পারবো না।

—আমি জানতাম তুমি আমার কথা ফেলতে পারবে না, দনুজ-দা। ও দনুজ-দা! ইউ আর এ ডিয়ার! তা ছাড়া কাকাবাবুও এক সময়ে ফুটবল খেলোয়াড় ছিল। কত মেডেল, কত বল, কত কাপ রয়েছে আমাদের বাড়ীতে—সবই কাকাবাবু পেয়েছেন খেলায়। কাকাবাবুর ভারি সখ কালই শহরটা ঘুরে দেখবেন, পরশু আবার চলে যাবেন কিনা। তুমি খেলোয়াড় সঙ্গে থাকলে তাঁকে খুশী করতে পারবে—কলেজটা সম্বন্ধেও তাঁর ভাল ওপিনিয়ন হবে।

—কাল আবার লীগের শেষ ম্যাচটা রয়েছে। যাক্‌, কাল দুপুরে বারোটায় বেরোলেই হবে।

রত্নার কাকাকে শহর দেখানো যতটা সহজ ভেবেছিল দনুজ কার্যক্ষেত্রে ততটা সহজ হইল না সে ব্যাপার। কাকাবাবুটি যদিও মূল্যবান সিল্কের পোষাকে সজ্জিত, তবু কেমন যেন সেই পরিচ্ছদ তাঁহাকে আদপেই মানায় নাই। চেহারাটিও এমন যাহার দিগসীমায় ভদ্র সংস্কৃতির ছাপেরও একেবারেই অভাব। তাহার উপর চোখ দুটি একেবারে তাহার সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া কথা বলিবার যো নাই, অনবরত ধুতু বৃষ্টি হয় মুখ হইতে; সকলের উপরে মুখ হইতে যে অসহনীয় গন্ধ বহির্গত হয়, তাহা একমাত্র মদ্যপানের পরিণামেই উদ্ভূত হওয়া সম্ভব। পরিশেষে বাক্যটি কণ্ঠস্বরে যে বাক্য উচ্চারিত হইল, তাহাতে কাকাবাবুর রুচি সম্বন্ধে দনুজের ঘোরতর বিদ্বেষ ক্ষণে ক্ষণে বর্ধিত হইতে লাগিল।

আরও আশ্চর্য এই—দনুজ যে প্রস্তাবই করুক কাকাবাবু তাহার বিপরীত পরিণতির জন্যই জেদ ধরেন। কাজেই দনুজ পদে পদে লাঞ্ছিত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু রত্নার কাকাবাবু—মনের ঝাল তাহার মনেই মারিতে হইল। শুষ্ক আগ্নেয়গিরির মত রুদ্ধ ক্রোধ চাপিয়া দনুজকে এই খেয়ালী লোকটার সকল আবদার পালন করিতে হইল। কিন্তু সকল ছাপাইয়া গেল ইডেন গার্ডেনে নৌকা চালানোর সময়। দুখানি দাঁড়ই কাকাবাবুর হাত ফসকাইয়া জল মধ্যে ডুব দিল। শেষ দনুজকে হাত আর পা সম্বল করিয়া তাহা দ্বারাই জল টানিয়া নৌকা চালাইতে হইল। সেখানে আবার কাকাবাবু দনুজকে রেহাই দিয়া নিজে দনুজের স্থান জুড়িয়া বসিবার সময়, এমন বেসামাল হইলেন যে, তাঁহাকে নিমজ্জন হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া বেচারী দনুজ জলে পড়িয়া গেল। ইহার পর বেচারীর মনের অবস্থা যাহা হইতে পারে, ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝিবে!

এদিকে ম্যাচের সময় আগতপ্রায় দনুজের চাই বিশ্রাম। লীগের শেষ ম্যাচ—এ ম্যাচে পরাজয় হইলে দনুজের মান থাকিবে না। কোন প্রকারে অনুনয়-বিনয়ে কাকাবাবুকে তুষ্ট করিয়া যখন দনুজ হোস্টেলে ফিরিল—আর মাত্র ২৫ মিনিট বাকী খেলা সুরু হইবার। তাড়াতাড়ি পোষাক বদল করিয়া রওনা হইবে, বেয়ারা জানাইল টেলিফোনে কে ডাকিতেছে। দনুজ ভাবিল নিশ্চয় কলেজ টিমের কেউ। কিন্তু ফোন ধরিয়া বিতৃষ্ণায় তাহার মন ভরিয়া গেল।

—দনুজ-দা! কি করে যে তোমায় মুখ দেখাব, লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি। শুনলাম, কাকাবাবুর জন্যে যা নাকাল তোমায় হতে—

কিন্তু টেলিফোনের ভিতর দিয়াও যে ক্রুদ্ধ গর্জন রত্নার কানে বিদ্ধ হইল, তাহাতে রত্নাকে চমকে লাফাইয়া উঠিতে হইল—

ঝাঁজাল ভাঙা ভাঙা সুরে ফোন বলিল—"যাও, যাও ভাগো। আর কাউকে বেছে নাও তার স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে খোশ খেয়ালে।"

কম্পিত কণ্ঠে সংকোচের সহিত রত্না ফোনে বলে—ও দনুজ-দা, অবুঝ হও না। তোমার ভালর জন্যেই করেছিলাম। কাকাবাবু যে তোমায় এমন নাকাল করবে তা আমি কি করে জানবো?

ফোনের সাহায্যে সরোষ শ্লেষের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা সম্ভব নয় কখনো, কিন্তু দনুজ তাহাই করিল এবং শ্রোত্রী তাহা ষোল আনাই মালুম করিল কানে কানে।

—একটু যদি ঠাণ্ডা হয়ে শোন, আমি বুঝিয়ে বলছি। কাকাবাবু একটা বিষম সমস্যা। আমি ভাবলাম, দুঘণ্টা তার সঙ্গে কাটালেই ফুটবলের বাতিক তোমার কেটে গিয়ে 'রোইং'এর দিকে ঝুঁকবে, তাতেই ফুটবলের অনিদ্রা—

—তাহলে তুমি কি বলতে চাও যে, কাকাবাবুর সঙ্গে পাঠান তোমার ষড়যন্ত্র?

—হ্যাঁ। তবে—তবে—ভেবেছিলাম সে তোমার ফুটবল-নেশা টুটিয়ে দেবে—তোমার অনিদ্রা লোপ পাবে—সুন্দর ঘুম........

ঠিক এই সময়ে এমন তোড়ে এক বক্তৃতা পৌঁছিল রত্নার কানে, দনুজের মুখে যাহা কোনদিন শোনে নাই। ক্ষিপ্র সে কথার মালার ভিতর কয়টি শব্দই রত্নার মনে গাঁথা রহিল—'এঁচোড়ে পাকা,' 'ফাজিল মেয়ে,' 'চাবুক', অনধিকার চর্চা প্রভৃতি প্রভৃতি। এবং দনুজের জীবন কোন তরুণীর আদেশে পুতুল-নাচে পরিণত হবার জন্য নয়; আজ হইতে

দনুজ থাকিবে রত্নার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ও নির্লিপ্ত?

লেক্‌চার শেষ করিয়াই দনুজ ঠন্ করিয়া ফোন্ রাখিয়া দিল এবং মাঠের দিকে ছুটিল। সে যখন মাঠে পা দিল, অমনি ফুর্-র্-র্ করিয়া রেফারীর হুইসেল বাজিল। পিছনে তাকাইবার মত মন-মেজাজ যদি তাহার থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত একটি তরুণীও সেই মুহূর্ত্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দর্শকের আসনের দিকে যাইতেছে—মুখখানি তাহার একেবারে বিবর্ণ—চোখ দুটি ছল্-ছল্।

দনুজের আজিকার ম্যাচ্ জিতা চাই, অথচ আশা তাহার নাই বিন্দুমাত্র। গত সপ্তাহে অনিদ্রা ঘাড়িয়াছে, শরীর নিতান্ত অপটু, মনটা ততোধিক। ফুটবলে কিক্ করিতে যাইয়া হাওয়ায় অথবা ঘাসের চাপড়ায় পা-টি চালিত হয়—বলের সঙ্গে স্পর্শ হয় না। হতাশ দনুজ দুই হাতে নিজের মাথার চুল টানিতে থাকে।

সহসা মনে ফুটিয়া উঠে রত্নার মূর্ত্তি। সে বেয়াড়া আত্ম-সর্বস্ব মেয়েটা নিশ্চয়ই এখানে হাজির দনুজের পরাজয় লক্ষ্য করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে। না, ও-শয়তানটাকে দেখাইয়া দিতে হইবে দনুজ বীর—সে একটা কচি মেয়ের কারসাজিতে ভাঙিয়া পড়ে না। ইহাতে প্রাণ থাকে কি যায়। ব্যস্—অদম্য দৃঢ় সংকল্পে দনুজ ঝাড়িয়া ফেলিল অবসাদ। কোথা হইতে যেন অমানুষিক বল আসিল দেহে আর প্রাণে। রত্না যাহাকে নিকৃষ্ট জীব বলিয়া ঘৃণা করে, সে কি রকম বীর দেখুক।......

খেলার প্রথম দশ মিনিট কাটিবার পর অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে কলেজের ক্যাপ্তেন এমন খেলা খেলিল, যে প্রকার নিপুণতা এ বৎসর তাহার নিকট কেহ আশা করে নাই। কলেজ টিম তিন গোলে জিতিল। কলেজের ছেলেদের জয়োল্লাসে—দর্শকদের উচ্চ চীৎকারে মাঠের হাওয়া জমাট বাঁধিয়া গেল।

দনুজ কিন্তু তাহার অভ্যস্ত নিরালা রাস্তাটিতে একাকী চলিয়াছে। আজ যেন গন্ধহীন ফুরুস ফুলের সারি হইতেও মধুর গন্ধ নাচিয়া ফিরিতেছে।

কে যেন কি বলিতেছে। তা বলুক দনুজের কোন প্রয়োজন নাই ছলনাময় পৃথিবীর কারও কথায় কান দিবার। তবু কে যেন বলে,—

—হেভেনলি! দনুজ-দা, কি সুন্দর! আমার ইচ্ছা হয় এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এভাবে জীবনটা কাটিয়ে দি।

দাঁড়াইতে হইলে যেখানে খুশী দাঁড়াইতে পার—দনুজ মনে মনেই মন্তব্য করে। সহসা নজর পড়ে সমুখে দাঁড়ান রত্নার দিকে। দনুজের চোখে ফুটিয়া উঠে বাজের সে অপরাহ্নের কথা। অজানিতেই আবার সে তাকায় রত্নার দিকে। আজ যেন রত্নাকে আরও বেশী সুন্দর দেখাইতেছে। কত কথা রত্নাকে বলিতে দনুজের ঠোঁট নড়িয়া উঠিতে চায়—অতি কষ্টে চাপিয়া যায়—ষড়যন্ত্রকারিণী!

—দেখ দনুজ-দা! আমি ভেবে পাই না, আমরা দুজন কেন রাতদিন এমনভাবে লড়াই করে বেড়াব। সত্যি সত্যি তার তো কোন কারণই নেই।

অতি ধীরে দনুজ জবাব দেয়—হয়ত নেই।

আমাদের মজা এই, সামান্য খুঁটিনাটি নিয়েই মারামারি করি। আমি ফুটবল পছন্দ করি না। কিন্তু সেটা আদপেই এমন কিছু ইম্পর্ট্যান্ট নয়, কেননা, সত্যিকারের তুমি যা, তাকে তো, ও-খেলা স্পর্শ করতেই পারে না—অদলবদল করা দূরে থাক।

—দ্যাটস্ রাইট। আর হুবহু সেই একই কথা সে তরুণীর পক্ষেও যে তরুণীর জীবনের লক্ষ্য নৃতত্ত্বে পণ্ডিত হওয়া।

—নৃতত্ত্ব নয়, সাইকোলজি।

—না হয় সাইকোলজিই হ'ল। আমি যা বল্‌তে যাচ্ছিলাম, তা হ'ল এই যে মানুষের ঘাড়ে ফুটবলের অজুহাতে মেগালাসরাসের মত একটা জানোয়ার চাপান আহাম্মোকের কাজ।

—এক্‌জাক্টলি (exactly)। তাই আমরা আজ থেকে একটা কন্‌প্যাক্ট ক'রব যে, আমরা আর দুজনে ঝগড়া ক'রব না, যা-ই ঘটুক না কেন।

—আজকের ম্যাচটা কিন্তু তোমার জন্যেই জিতেছি রত্না দেবী। ম্যাচের আগে যে ফোনটা করেছিলে, তা না হলে, অপোজিট সাইডের ব্যাকগুলোকে—

—কি বলছো, কানে শুনতে পাইনে কিছু।

এক মুহূর্ত্তের নীরবতা। তারপরই দনুজের কণ্ঠ হইতে মুক্তি পাইল—'ডারলিং!'

—কি আশ্চর্য্য! এখন বেশ শুনতে পাচ্ছি ডিয়ারেষ্ট! অতি মৃদু প্রায় স্বগত প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল রত্নার তরফ হইতে।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

[illegible]তীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় আসিয়াই অলকাকে লইয়া সতীশ মহা বিপদে পড়িয়া গেল। [illegible] বাড়ীতে তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, হয়ত' বা কেহ[illegible] নাই, কিন্তু রামহরি এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে সে তাহাকে কি বলিয়া পরিচিত করিবে? এই যে এতগুলি দিন সে ওই অতি সুন্দর মেয়েটির সহিত একা কাটাইয়া দিল তাহাকে কেহই নয় বলিয়া বিশ্বাস কি ওই বৃদ্ধ রামহরিও করিবে? তাহার বন্ধুবান্ধব, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকেরা হয়ত' ইহাকে অন্যায় বলিয়াই মনে করিবে আর তাহার শত্রুপক্ষ যে এই চমৎকার ব্যাপারকে অধিকতর রহস্যময় করিয়া কাগজে কাগজে তাহাকে বিরাট পুরুষ বলিয়া প্রচার করিবে না তাহাও বুঝিতে তাহার এতটুকুও দেরী হইল না। কিন্তু পিছাইয়া পড়িবার মত মূর্খতা তাহার নাই, সরিয়া দাঁড়াইবার মত ভীরুও সে নহে।

ট্যাক্সিতে উঠিয়া অলকাকে লইয়া যখন সে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল তখন বেশ ভোর হইয়া গিয়াছিল। মহা-নগরীর বিরাট প্রাসাদগুলি হইতে নিদ্রাদেবী হয়ত' তখনও সরিয়া যান নাই কিন্তু তাই বলিয়া পথে লোকেরও বিশেষ অভাব ছিল না। নানা রাস্তা ঘুরিয়া ট্যাক্সি আসিয়া থামিল ছোটখাট সুন্দর একটি বাড়ীর সম্মুখে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় কে যেন একখানা ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে, কাছে আসিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, চমৎকার—এমনি শান্ত গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে না।

নামিতে নামিতে অলকা সতীশের মুখের দিকে চকিতে একবার চাহিয়া দেখিল। তাহার অন্তরের ভাষা পড়িবার সাধ্য তাহার ছিল না।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, এই আমার বাড়ী, কিন্তু তারপর?

অলকা মাথা নীচু করিয়া বলিল, পরের কথা এখন থাক, কাউকে ডাকুন, এখানেই কি দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি সব কিছু নিয়ে?

দূরে রামহরিকে দেখা গেল, তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া সে বলিল কোন খবর না দিয়েই যে খোকাবাবু? বুড়ো ব'লে গ্রাহ্য বুঝি আর হয় না, তা বেশ। অলকার দিকে ফিরিয়া সে কেবলি দেখিতে লাগিল, কে এ? খামখেয়ালী খোকা-বাবুকে সে জানে—হয়ত' বা বিবাহ করিয়াই আসিয়াছে, রামহরিকে গ্রাহ্য করিবার দিন ত' আর তাহার নাই। থাকিবেই যদি ত' তাহাকে ফেলিয়া সে যাইবে কেমন করিয়া? কিন্তু খোকাবাবুর পছন্দ আছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চমৎকার মেয়ে, বাড়ীর বধূ করিয়া সাজাইয়া রাখা চলে। রামহরির মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল, মনে মনে সে বলিল, এইবার দেখব' রাত জেগে কেমন লেখা পড়া চলে—নির্জ্জন ফাঁকা বাড়ীতে লক্ষ্মী এবার পায়ের ধুলো দিয়েছেন।

তাহাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অলকার দিকে বারে বারে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া সতীশ বলিয়া উঠিল, চমক ভাঙিগয়া যাওয়ায় রামহরি নিজের কান মলিয়া বলিল, তোমাদের আসতে দেখে যে অবাক হ'য়ে গেছি আমি, বুড়ো হ'য়েছি কি না—আনন্দ হ'লে অমন হয়। তোমরা এগোও আমি সব ঠিক ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—যাও আর দাঁড়িয়ে থেক'না রামহরির কাঁধে যথেষ্ট জোর আছে এখনও, তোমাকে কাঁধে নিয়ে অনেকদিন আগেই সে জোর ক'রে রেখেছি।

অলকাকে লইয়া সতীশ গৃহে প্রবেশ করিল—পাশের ঘরটা তাহাকে দেখাইয়া দিয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে সে বলিল, নীচে বাথরুমে গিয়ে স্নান সেরে এস, দেরী কর'না যাও। সারা রাত ত' আর কম কষ্ট হয়নি—আমিও ঠিক হ'য়ে নিচ্ছি। এ বাড়ীতে আর কেউ নেই, একটু অসুবিধে হ'তে পারে কিন্তু উপায় নেই অলকা, সব কিছু নিজেকেই দেখে নিতে হবে তোমার!

সতীশ বাহির হইয়া গেল।

অলকা চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল, ওই যে লোকটার এত স্নেহ মমতা তাহার কি কোন মূল্যই নাই? কেবল তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়াই কি উচিত। প্রায় সারা রাত রেলে সে জাগিয়া কাটাইয়াছে—ওই লোকটার ঘুমন্ত মুখের দিকে না চাহিয়া সে পারে নাই, তাহার শান্ত ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া, তাহার মুখের হাসি দেখিয়া তাহার মন যেন কিসের আকর্ষণে উহারই দিকে আগাইয়া গিয়াছে। আজ কোন কিছু করিবার মত শক্তিই তাহার নাই, সে স্থির হইয়া অন্যমনস্কের মত বসিয়া রহিল।

স্নান সারিয়া অলকাকে কোথায়ও খুঁজিয়া না পাইয়া সতীশ সেই ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া সে বলিল, এমনি ক'রে ব'সে থাকলেই চলবে নাকি? ভবিষ্যৎ যাক, বর্ত্তমানকে ফেলে রাখা কিন্তু উচিত নয়। আমি কথা দিচ্ছি অলকা সে যদি ক'লকাতায় এসে থাকে ত' যে কোন উপায়ে তাকে খুঁজে বার করবই। তুমি এমনি ক'রে থাকলে ত' চলবে না। ব'লেছি ত' এ বাড়ীকে নিজের ক'রে নিতে হবে তোমাকেই।

অলকা তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, দুই চক্ষু তাহার অশ্রুজলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল, নিজেকে গোপন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি সে অন্য দিকে ফিরিয়া চাহিল কোন কথাই বলিতে পারিল না।

অলকার ভাবান্তর সতীশের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, তাহলে আজ কি আর আমাদের চা খাওয়া হবে না—রামহরি কিন্তু সত্যি রাগ করবে, আর রাগ করবে সে আমারই ওপর।

কোন কথা না বলিয়া বাক্স হইতে একটা সাড়ী বাহির করিয়া লইয়া অলকা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—সতীশ তাহার গমনপথের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি তখন তাহাকে ছাড়িয়া হয়ত আরও দূরে চলিয়া গিয়াছিল।

চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, কার মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে এলে? আমাকে একবার জানাতে হয় ত।

বলে কি? সবারই কি একমত?—যুবকের কাছে যুবতী দেখিলে বিশেষ করিয়া সে যদি সুন্দরী হয় আর তাহার সিঁথিতে যদি সিন্দুর থাকে তাহা হইলেই তাহাকে ওই যুবকেরই স্ত্রী হইয়া যাইতে হইবে—ইহা যে পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়া অপরিচিতরা একযোগে কি করিয়া ধারণা করিয়া লয় তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারে না। কিন্তু ইহাই যে মানুষের ধারণাশক্তির একমাত্র পরিচয় সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ করিবার অবকাশও তাহার নাই।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রামহরি বলিল, কিন্তু বৌ বেশ ভালই হয়েছে—দু'দিনেই আমি তাকে সমস্ত শিখিয়ে দেব, কিন্তু এতটুকু কাজ করতেও তাকে দেব না মনে থাকে যেন। রামহরি জোরে জোরে মাথা নাড়িয়া তাহার মতের দৃঢ়তার কথা জানাইয়া দিল।

এতক্ষণে সতীশ যেন জ্ঞান ফিরিয়া পাইল, বলিল, বলছিস কি তুই? আমার বৌ ত' ও নয়। সে অনেক কথা—পরে শুনিস, এখন দেখে আয় ত' কত দেরী আছে ওর।

রামহরি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিল, যাহার কেহ নাই তাহারই সহিত তবে কাহার বৌ আসিয়া উপস্থিত হইল, খোকাবাবু কি সত্যিই ঠাট্টা করিতেছে না? বেশ সুন্দরী—খোকাবাবুকে এতটুকু দোষও ত সে দিবে না, তবে এ আবার কি কথা বলিতেছে সে?

দাঁত বাহির করিয়া সে বলিল, হাঁ ওসব তামাসার কথা ছেড়ে দাও, লজ্জারই বা কি আছে এতে

সতীশ বলিল, বিশ্বাস না করলে আমি তা করাতে চাইনে তোকে কিন্তু সে-সব কথা, তোকে যা বললাম তাই দেখে আয় আগে। আর চা দিস আমাদের আমার ঘরেই।

সদ্যস্নাত অলকা চুলের গোছা এলাইয়া দিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সতীশের দিকে নজর পড়িবামাত্র মাথার উপর সে কাপড় তুলিয়া দিল—তাহার এ লজ্জা রামহরির দৃষ্টি অতিক্রম করিল না, বাহির হইয়া যাইতে যাইতে কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল এ কেমন করিয়া সম্ভব হয় কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না যে?

সতীশকে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অলকা বলিল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কাজ যে কিছুই হবে না, আপনি যান ও ঘরে আমি আসছি—আর বেশী দেরী হবে না.

তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কি যেন বলিতে গিয়া সতীশ থামিয়া গেল তারপর কি ভাবিয়া বলিল, হ্যাঁ একটু শীগ্গির করে নাও আবার যেন তেমনি চুপ করে বসে থেক না।

পাশের ঘরে গিয়া সে সোফার উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অলকা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া গিয়া রামহরিকে বলিল, তুমি ত খুব ভাল রান্না করতে পার. আজ আমাকে ওই কাজটা দিয়ে দেখ দেখি আমি কি রকম পারি, যদি কোনটা খারাপ হয় ত তোমার কা[illegible] থেকে শিখে নিতে পারব।

ব্যস্ত হইয়া রামহরি বলিল, [illegible] না তা হয় না, আগুনের তাপ তোমায় লাগতে দিতে পারব [illegible]মা, শেষে ওই রং কালো হয়ে যাক আর কি, বাস্ রে সে [illegible] পারব না কিছুতেই।

হাসিয়া অলকা বলিল, আগুনের [illegible] লেগে লেগেই তোমার রং বুঝি কালো হয়ে গেছে রামহরি? জোরে হাসিয়া উঠিয়া রামহরি বলিল, নিশ্চয়ই[illegible] সাহেবদের চেয়েও ফর্সা ছিলাম আমি, কিন্তু কি করি মা, আমার হাতে খেতে যে খোকাবাবু ভালবাসে আর তাই ত আমার এ দশা।

অলকাও হাসিয়া বলিল, আমারও তাহলে ঠিক অমনি দশাই হবে দেখছি। কথাটা সে ভাবিয়া বলে নাই।—শেষ হওয়া মাত্রই লজ্জায় তাহার সারা মুখ লাল হইয়া উঠিল।

রামহরি অতশত বুঝিল না, বুঝিবার প্রয়োজনও তাহার ছিল না, বলিয়া উঠিল, সে হবে না, খোকাবাবুকে আমি সে কথা বলে রেখেছি।

তাড়াতাড়ি অলকা বলিল, আচ্ছা বয়েসটা কত তোমার খোকাবাবুর?

রামহরি ঠাট্টা বুঝিতে পারিল, বলিল, তা কি করব মা, অনেক মেয়ে পুরুষ এসে বাবুকে আমার কত প্রশংসা করে যায়, অনেক ভাল লেখাপড়া জানা হয়েছে কিনা সে, আমি কিন্তু মুখ্যু মানুষ সেসব কিছু বুঝি না— আমার কেবলই মনে হয় ওর মায়ের কথা। ও তখন খুব ছোট ওর বিধবা মা মারা যাবার সময় আমার হাতে ওকে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, ওকে দেখ রামহরি আর ত কেউ রইল না ওর, সেই থেকেই ত আমি ওকে নিয়ে আছি মা—ও খোকাবাবু নয়ত আমার মনিব নাকি?

তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল কিন্তু এই নূতন মেয়েটির কাছে সে পুরাতন কথা প্রকাশ করিয়া চক্ষের জল বাহির করিতে ত কিছুতেই পারে না—অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সে কোনমতে নিজেকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেয়েটিকে ফাঁকি দিবার কোন উপায়ই ছিল না। মুহূর্তেই সমস্ত কিছু বুঝিয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ও সমস্ত আর এক সময় শুনব আমি এখন চল চা নিয়ে যাই তোমার বাবু হয়ত অস্থির হয়ে উঠেছেন—কাল সারা রাত ত' খাওয়া হয়নি বললেও চলে।

খোকাবাবুর আহারের কথা মনে হইবামাত্রই রামহরি নিজেকে সামলাইয়া লইল। চায়ের কেট্‌লী ও কাপ তাহার হাতে দিয়া ট্রের মধ্যে দুধ, চিনি ও আনুষঙ্গিক খাবার লইয়া অলকা উপরে উঠিয়া আসিল।

অলকা ভাবিতেছিল ওই লোকটির কথা, রামহরির স্নেহ ও যত্ন ব্যতীত আর কিছুই সে পায় নাই—উহাতে তাহার মনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যে মিটে নাই তাহা সে নিশ্চয় করিয়াই বলিতে পারে, হয়ত ঠিক এই সব কারণেই তাহাকে স্নেহ করা চলে, তাহার জন্য চিন্তিত হওয়া এতটুকু দোষেরও হইতে পারে না—তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়া পৃথিবীর সমস্ত দুঃখের কথা তাহার মনের কোণ হইতে সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া রাখাই একান্ত উচিত।

যেন বাতাসের মত হাল্‌কা বোধ হইল।

রামহরি মনে মনে ভাবিতেছিল, ওই যে মেয়েটি তাহারই মত স্বচ্ছন্দ গতিতে তাহারই খোকাবাবুর জন্য ব্যস্ত হইয়া চলিয়াছে ইহার কি কোন মানেই হইতে পারে না? উহাকেই বাড়ীর বধূ করিয়া সমস্ত কিছুকে ভরাইয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহাও হইবার নহে, কেমন করিয়া কাহার স্ত্রী হইয়া যে সে দূরে সরিয়া গিয়াছে রামহরি তাহা ভাবিয়াও পায় না। উহাকে যেন এ-বাড়ীর জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছিল কিন্তু ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতাও তাহাকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু কেমনই বা তাহার স্বামী—কেমন করিয়া সে তাহাকে দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া দেখিয়া রামহরির আশা মিটে না, ভাবিয়া সে কোন কূল-কিনারা পায় না।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই অলকা বলিল, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? গাড়ীতে ত' কম ঘুমোন-নি।

চক্ষু মেলিয়া সতীশ বলিল, না ঘুমোইনি, ভাবছিলাম।

সমস্ত কিছু নামাইয়া দিয়া রামহরি বাহির হইয়া গেল।

পেয়ালায় চা ঢালিয়া দিয়া অলকা বলিল, কি ভাবছিলেন?

সম্মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সতীশ বলিল, ভাবছিলাম তোমার কথাই, কলকাতায় ত আসা গেল, এবার কি করা যায়, তাকে খুঁজে বার করবই বলেছি কিন্তু করি কি করে? কোন পথই ত' চোখে পড়ে না।

একটু ম্লানভাবে অলকা বলিল, সেটা ভাগ্যের কথা কিন্তু খুঁজে না পেলেও আপনাকে দোষ দিতে পারব না কিছুতেই—আপনি আমার যে উপকার করেছেন তা ভুলতে পারব না কোনদিন।

'কিন্তু সেকথা ভুলে যাওয়াই ভাল।' সতীশ বলিল।—

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অলকা বলিল, আমি কেবলই ভাবি আপনি যদি সেখানে ঠিক সেই সময়ে গিয়ে না পৌঁছুতেন ত' আমার উপায় কি হত? আজ আমাকে থাকতেই বা হত কোথায়? সেকথা মনে হওয়া মাত্রই সমস্ত শরীর আমার আজও কেঁপে ওঠে। ভগবানের আশীর্বাদের মতই সেদিন আপনি আমার সব চেয়ে প্রয়োজনীয় যা তাই করেছিলেন।

তাহারা দুইজনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

আস্তে আস্তে অলকা বলিল, থাক্‌ সে সব, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে আবার গরম করে নিয়ে আসতে পারব না কিন্তু।

ম্লান হাসি হাসিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া সতীশ বলিল, কাগজে ছাপিয়ে দিলে কেমন হয়, হয়ত তার চোখে পড়তেও পারে তাহলে।

অলকা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বলিল, না, কাগজে না ছাপিয়ে যদি পারেন ত' খোঁজ করুন। কাগজে প্রকাশ করার পক্ষপাতী আমি নই।

সতীশ মাথা নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। অলকা তাহার দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর সতীশ বলিল, যদি আমি ভাল করে খোঁজ না করতে পারি! আমার নিজের সমস্ত কাজই যে নষ্ট হতে বসেছে। আমি সবচেয়ে যা ভালবাসি অলকা, তা থেকে আমায় দূরে থাকতে বলবে না নিশ্চয়। কিন্তু কি করি?

সতীশ উঠিয়া পড়িল। সমস্ত ঘরময় পায়চারী করিতে লাগিল, তাহার মুখে চোখে একটা চিন্তার রেখা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। এমনি করিয়া আর ত চলে না অথচ অন্য কি উপায়ই বা অবলম্বন করা যায়?

রামহরি অলকার কাছে আসিয়া কি বলিল। তাহারা দুই-জনেই বাহির হইয়া গেল। সতীশের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না, সে আপন মনে সারা ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ থামিয়া পড়িয়া আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল, তা হয় না অলকা, আমি পারব না, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে একাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

অলকা যেখানে বসিয়াছিল সেদিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার যেন চমক ভাঙিয়া গেল। কখন যে সে চলিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতেই পারে নাই ত। হয়ত তাহার কথা সে শোনে নাই, হয়ত ভালই হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে জানাইয়া রাখাই ভাল। সে ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য আগাইয়া চলিল।

ঠিক এমন সময় ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল প্রতুল।

ঘরে আসিয়াই সে বলিল, কিহে সাহিত্যিক, তুমি আবার বৈমানিকদের মত হঠাৎ অদৃশ্য হতে আরম্ভ করেছ দেখছি। যাক্‌ তেমনি হঠাৎই যে ফিরেছ এই যথেষ্ট। আরে বস বস, এত অন্যমনস্ক হয়ে উঠছ কেন।

সে সতীশকে টানিয়া লইয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল। সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথাই বলিল না।

তাহার অবস্থা দেখিয়া প্রতুল হাসিয়া উঠিল, বলিল, ব্যাপার কি হে, সাহিত্যিকের মুখ কোন্ দ্রোণাচার্য্য বন্ধ করে দিয়েছে? কার পুজোয় তোমার কলমের সাহায্যে ব্যাঘাত ঘটাতে গিয়েছিলে?

সতীশ এতক্ষণে সহজ হইয়া বলিল, নিশ্চয় তেমনি কিছু ঘটেছে—শব্দভেদী বাণ কিনা তাই কে সেই তীরন্দাজ তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। বন্ধুবর যদি সহায় হন্‌—।

প্রতুল উঠিয়া পড়িল, ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বার দুই ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, না হে কোন বুদ্ধিই বার করতে পারছি না, না, আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে—পেটের সঙ্গে মগজের একটা ঘোরতর সম্বন্ধ আছে। অনেকদিন ছিলে না এখানে তাই অনেকদিনের খিদে জমে আছে—বস আসছি রামহরির কাছ থেকে কিছু আদায় করে।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, সতীশ কোন বাধাই দিতে পারিল না। ঠিক আগের দিনের মতই সহজভাবে সে রামহরির কাছে যাইবে কিন্তু ঠিক সেই অবস্থা ত তাহার নাই, রামহরি আজ একা নহে, হয়ত তাহারই কাছে বসিয়া অলকা গল্প করিতেছে—যাহা কিছু জানিবার তাহার সমস্তই হয়ত সে জানিয়া লইতেছে। এ-বাড়ীর অন্দরে কাহারও, বিশেষ করিয়া প্রতুলের গতিবিধির প্রশ্ন কোনদিনই উঠে নাই—অন্দর বলিয়া কোন কিছুই এ-বাড়ীতে এতদিন ছিল না, তাহার অনুপস্থিতিতেও প্রতুল স্বচ্ছন্দে এখানে আসিয়াছে, কোন কোন দিন হয়ত সমস্ত রাত কোন একটা ঘরে ঘুমাইয়া লইয়াছে। কোন প্রশ্ন উঠে নাই আজিও উঠিল না। কিন্তু আজই হয়ত সমস্ত

কিছু ওলট-পালট হইয়া যাইবে—হয়ত বাহিরের সমস্ত লোকই শিহরিয়া উঠিয়া আজ হইতেই ছি ছি করিতে থাকিবে। কিন্তু তাই বলিয়া ওই লোকটার সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে বাধা দিবার শক্তি তাহার নাই, তাহাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণও ছিল না।

রান্নাঘরের দরজার সম্মুখে বসিয়া রামহরি হাত মুখ নাড়িয়া কাহাকে কি যেন বুঝাইতেছিল। প্রতুল একটু বিস্মিত হইয়া উঠিল—আর কেই বা থাকিতে পারে, রামহরি বাঁচিয়া থাকিতে তাহারই খোকাবাবুর জন্য রান্না করিবার সাহসই বা অন্য কাহার হইতে পারে? প্রতুল ভাবিয়া পাইল না, ভাবিবার প্রয়োজনও সে বিশেষ অনুভব করিল না।

দরজার সম্মুখে আসিয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে অবাক হইয়া গেল। বাহিরে গিয়া সতীশ কি তবে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে নাকি? কিন্তু কই খবরটা ত আমিও যে পাই নাই। তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া আসিয়াছে সে, কিন্তু বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই অমন করিয়া প্রথম হইতেই কেহ ভাবিতে বসে না।

উহারা কেহই তাহার আগমন টের পায় নাই।

তেমনি উৎসাহের সহিতই রামহরি বলিতেছিল, খোকা-বাবু আমার ছোট হ'লে কি হবে ওইটুকু বয়েসেই সে যে কতবড় হয়ে উঠেছে তা তুমি ঠিক বুঝবে না মা, সে আমি বুড়ো হয়েও ঠিক বুঝতে পারি না যে—কত গাড়ী আসে, কত জায়গায় যেতে হয় তাকে, আমি ত অবাক হয়ে ভাবি। কত দাড়ীওয়ালা বুড়োও যে কি সব লেখা নেবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকে তা যদি দেখতে।

উনুন হইতে কড়াটা নামাইয়া কি বলিতে গিয়া চক্ষু তুলিতেই অলকার দৃষ্টি আসিয়া পড়িল প্রতুলের উপর। বিস্মিত জড়সড় হইয়া উঠিল। তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া রামহরি পশ্চাতে ফিরিয়া প্রতুলকে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, এই ত প্রতুলবাবু এসেছেন, উনি কত খবর জানেন আমার বাবুর। সমস্ত খবর তুমি ওঁর কাছেই পাবে মা। আমি মুখ্যু—কিই বা জানি।

লজ্জায় অলকার মাথা নীচু হইয়া আসিল। তাহারই খোকাবাবুর কথা সে শুনিতে চাহে সত্য, কিন্তু তাহা লোক-চক্ষুর সম্মুখে এমনি করিয়া ত নহে। ইহা শুনিবার কথা তাহার নয়, হয়ত অধিকারও নাই। কিন্তু আগ্রহ ত নিয়ম অথবা অধিকার মানিয়াই চলে না, তাই সমস্ত কিছু গোপন করিয়া নিজেকেও গোপন করিয়া সে শুনিতে চাহে, কিন্তু ওই সহজ সরল লোকটি যে এমনি করিয়া সাক্ষী ডাকিয়া নিজেকে মুর্খ বলিয়া দূরে সরিয়া গিয়া ওই সতীশেরই বন্ধুকে তাহার দিকে আগাইয়া দিবে তাহা সে ভাবিতেও পারে নাই।

কিন্তু এ-সবে প্রতুলের প্রয়োজন ছিল না—কাহারও প্রশংসা করিবার মত দুর্ব্বুদ্ধিও তাহার নাই। হাসিয়া ফেলিয়া সে বলিল, ও তুমিই ভাল পারবে রামহরি, আমার বুদ্ধি এমন কিছুই নয় যে, তোমার চেয়ে ভালভাবে বলতে পারব। সে-সব থাক, কেন এসেছি এখানে বুঝতে পারছ নিশ্চয়।

রামহরিও হাসিয়া উঠিল, বলিল, হ্যাঁ, এ ত খুবই সোজা কথা, আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার, কিন্তু শুকনো রুটি যে।

'বটে! শুকনো রুটি নি[illegible]য় এস দেখি কি রকম?' প্রতুল বলিল।

রামহরি রুটি লইয়া আসিল, [illegible]তিমধ্যে কোথা হইতে একটা প্লেট লইয়া আসিয়া প্রতু[illegible] দিন দেখি কি রেঁধেছেন—খুব ভাল হয়েছে সার্টিফিকেট দিচ্ছি। হ্যাঁ, তরকারী হলেই চলবে।

অলকা অবাক হইয়া গেল[illegible] কোন প্রশ্নই নাই, এতটুকু বিস্মিত দৃষ্টিও তাহার চোখে সে দেখে নাই—যেন বহুদিন হইতেই সে তাহাকে দেখিয়া আসিতেছে বহুদিন হইতেই যেন এমনি করিয়া সে চাহিয়া খাইয়াছে।

অলকার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই যে এতগুলি লোক যাহারা সতীশবাবুকে অভিনন্দন জানায়, যাহারা তাহার বন্ধু—তাহাকে দেখিয়া কি ভাবিবে, হয়ত সেই ভদ্রলোকটিকে পর্য্যন্ত তাহারা ধুলায় নামাইয়া আনিবে, এমনি অনেক কিছুই মনে করিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহাদেরই একজন অত্যন্ত সহজভাবে কোন প্রশ্নকেই সম্মুখে না আনিয়া কি করিয়া এমনি অনায়াসে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কথা কহিতে পারে, তাহা ভাবিয়া না পাইলেও শঙ্কা তাহার অনেকখানিই কমিয়া গেল।

হাসিমুখে সে বলিল, না খেয়েই সার্টিফিকেট? আমাদের কিন্তু আশ্চর্য্য মনে হয়।

প্রতুলও হাসিয়া বলিল, এ সব হ'চ্ছে অনুভূতি। কিন্তু কথা বলেই থামিয়ে রাখতে চান নাকি, দিন। রেঁধেছেন ত সাতজনের মত, লোক কিন্তু মোটে তিনজন। আপনি নিজেই জন পাঁচেক নাকি?

প্লেটে অনেকটা ঢালিয়া দিয়া অলকা বলিল, আমি একা পাঁচজন হলে আপনি কিন্তু যে পনেরর কম হবেন না—তা বোঝেন ত?

এক টুকরা রুটি মুখে দিয়া প্রতুল বলিল, না আরও কিছু বেশী হতে পারি। সত্যি রেঁধেছেন ভালই—আজ আমার এখানেই নিমন্ত্রণ রইল, বুঝলেন?

পিছন হইতে রামহরি বলিল, সেই ভাল, আপনি এখানে খেলে খোকনবাবুর খাওয়াও খুব ভাল হয়—আজ এখানেই খাবেন কিন্তু।

প্রতুল বলিল, থাম রামহরি তোমাকে বলতে হবে না। নিমন্ত্রণ করবার ভার আমি নিজেই নিতে পারি, হ্যাঁ, ভাতটা একটু বেশীই রাঁধবেন।

রামহরি হাসিয়া বলিল, সে আমি জানি বাবু।

'ভাল কথা, আপনিও জেনে রাখুন বেশ ক'রে।'

হাসিমুখে অলকা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। নারীর সমস্ত স্নেহ-মমতাই তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্রধারে যেন তাহারই উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া আসিতেছিল। এমনি করিয়া মুহূর্ত্তেই আপনার করিয়া লইতে সে কাহাকেও দেখে নাই, এমন যে হইতেও পারে, সে জানিত না, আর জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই ওই লোকটাকে দূরে রাখিবার কথাও যেন সে ভাবিতে পারিল না।

তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিয়া লইতে প্রতুলের এতটুকু দেরীও হইল না, কি একটু ভাবিয়া সে বলিল, কিন্তু একটা কিছু ঠিক ক'রে নেওয়া উচিত, যাতে ডাকার সুবিধে হয়, হাঁ বয়েসে ছোট হলেও আজ থেকে আমার দিদি হলেন আপনি। শুনেছি নিজের দিদি ছিল দু'টি, কিন্তু কবে যে [illegible] করে তারা পালিয়ে গেছে তা ঠিক জানিনা। মা-ও ব[illegible] ছেলের [illegible] মাথায় হাত রেখে কি সব বলতে বলতে তাদের দলে ভিড়ে পড়েছেন—এরা আছে ভাল, কি বলুন? ঠিক [illegible] কিন্তু সতীশের সঙ্গে আমার বেশী বন্ধুত্ব। বেচারী লেখে কি না, তাই সে সব মনে করে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়, আর আমি হতচ্ছাড়া,—বুকে জল আসা দূরের কথা শুকিয়েই ওঠে।

তাহার কথা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও অলকার চক্ষু ভিজিয়া উঠিল—ইহারও মা নাই, কেহ নাই। মনের দুঃখকে সে কেমন করিয়া না জানি চাপিয়া রাখিয়া মুখের হাসি ছড়াইয়া বেড়ায়। কিন্তু ইহার সম্মুখে চক্ষের জলও ফেলা যায় না, আস্তে আস্তে সে বলিল, আমি আপনার দিদি হতে রাজী আছি, কিন্তু তার বদলে আপনিও হলেন আমার দাদা। কান্না থামাইলেও নিজের মনের ভাব সে ওই লোকটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে লুকাইয়া রাখিতে পারিল না।

প্রতুল বলিল, তা দাদা হতে রাজী আছি আমি, কিন্তু তাঁরা সব মারা গেছেন বলে দুঃখ করবার কি আছে, এমনি সব দিদিদের সহজভাবে চিনে নেবার জন্যেই না তাঁরা আমাকে রেখে গেছেন। কিন্তু যাই, স্নান করে নি, আপনিও রান্না শেষ করতে থাকুন।

আর কোন কথা না বলিয়া সে উপরে উঠিয়া গেল। সে বাহির হইবামাত্র অলকা বুঝিতে পারিল, দুর্ভাগ্য তাহার চিরসঙ্গী, আর ঠিক তেমনি দুর্ভাগাদের কাছেই কে যেন তাহাকে বার বার টানিয়া আনিতেছে। তাহার সারা অন্তর মথিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

উপরে আসিয়াই প্রতুল তন্দ্রামগ্ন সতীশকে জোরে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, ওঠ হে, চিন্তা আর ঘুম বড্ড বেশী করে চুকেছ দেখছি—লেখা বুঝি আর আসে না। ওসব ফেলে দিয়ে একটা কাপড় দাও দেখি বার করে স্নানটা সেরে আসি। আজ এখানেই খাওয়া হবে কি না।

সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না বোধ হয়। অনেক প্রশ্নই সে আশা করিতেছিল এবং তাহাদেরই জবাব ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে টেরও পায় নাই। বন্ধুদের সমস্ত কথা জানাইয়া তাহাদের সাহায্য চাহিবে, ইহাই ঠিক করিয়া সতীশ বলিল, বস, নীচে একটি মেয়েকেও দেখে এসেছ নিশ্চয়।

'দেখে এসেছি? গল্প করে এলাম বল।' প্রতুল হাসিয়া উঠিল।

'সে কিন্তু আমার স্ত্রী নয়।' সতীশ বলিল।

প্রতুল উত্তর করিল, সে তোমার স্ত্রী কি না, একথাও আমি বলিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কাপড় কি তোমার সব ফুরিয়ে গেছে নাকি? কোন্ মেয়ে কার স্ত্রী নয়, আর কার স্ত্রী, তা' আমাকে জানাবার দরকার কি এমন হ'লরে বাপু?

'কিন্তু তোমার শোনা উচিত।'

'বেশ, বল, কিন্তু এখন থাক, খেয়ে দেয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়ার পর বললে মন দিয়ে শুনব'। না খেলে কি এসব দরকারী কাজে মন বসে? বিশেষ করে ওই তরকারীটা যা হয়েছে—এখনও যেন মুখে লেগে রয়েছে।' এই কথা বলিয়া একটা ঢোক গিলিয়া প্রতুল তাহার রসাস্বাদন করিবার ক্ষমতার সম্বন্ধে তাহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া দিল।

সতীশ কোন কথা বলিবার সুযোগ পাইল না।

আহারে বসিয়া প্রতুল বলিল, কইহে রামহরি, আমার জন্য বেশী ক'রে রান্না করনি নাকি, কি মুস্কিল শেষকালে কি আধপেটা থাকতে হবে? সতীশ তোমার মনিবটি ত' পয়সা বাঁচাতে শিখেছে কম নয়।

রামহরি কাছে আসিয়া দাঁত বাহির করিয়া বলিল, আজ্ঞে কি করি বলুন, মা ব'ললেন ভদ্রলোকের ছেলের বেশী খেতে নেই শরীর খারাপ হবে যে।

মাথা তুলিয়া প্রতুল বলিল, তবেই এ-বুড়ো বয়েসে মরেছ রামহরি, মা জুটিয়েছ, ব্যাস্, আর খাওয়া হবে না কোনদিন—অসুখের ভয় এবার বেড়ে যাবে। ও-সব বালাই আমি আগেই কাটিয়েছি—মা, দিদি এদের সবাইকে নোটিশ জারী ক'রে পৃথিবী ছাড়া ক'রেছি। হাঁ ভাল কথা, নূতন দিদিটি কোথায়, নিয়ে আসতে বল তার ভাগটাই তা'হলে।

রামহরি বলিল, মরবার পক্ষে বুড়ো বয়েসটাই ভাল বাবু, আর সে সময় মা যদি জুটেই যায় ত' ভগবানকে দু'হাত তুলে ধন্যবাদ জানাতে এতটুকু ইতস্ততঃও করব না সেই শেষের দিন।

প্রতুলের মুখে হাসি খেলিয়া গেল, পাশের দিকে চাহিয়া অলকাকে দেখিতে পাইয়া সে বলিল, এ বাড়ীতে আসাই এবার বিপজ্জনক হ'য়ে উঠবে দেখছি, সবাই যেন এক একটা কথা-সাহিত্যিক, দেখবেন দিদি আপনিও ওদের দলে ভিড়ে গিয়ে এ বেচারার পথ বন্ধ ক'রে দেবেন না যেন।

হাসিয়া অলকা বলিল, না আমরা পাঠকের দল, সবাই সাহিত্য ক'রলে পড়বে কে? দু'টো লিখেই অন্যান্য লেখকের চেয়ে নিজেকে বড় ব'লে মনে হয় কি না অনেকের—আর ঠিক এমনি ক'রেই পাঠক যায় কমে—কারণ যাঁরা লেখক তাঁরা পড়তে চান না আজকাল।

সহজ হাসি হাসিয়া প্রতুল বলিল, কিন্তু খোঁচা দিয়ে কথা বললে চ'লবে না, বন্ধুবর আমার হঠাৎ সাহিত্যিক নন। কি বলহে, কিন্তু ব'কবেই বা কি, রসাস্বাদনে যে রকম ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছ দেখছি আর কিছুই রাখবে না তুমি। আমাদের পর আরও দু'জন বাকী আছে কিন্তু।

সতীশও বোধ করি একটু খোঁচা দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল, আরে বল কেন এ ক'দিন খেয়েছি যা একেবারে বাজে, আজ রামহরির রান্নাটা সত্যিই চমৎকার লাগছে। তুমি ত' খাও পেটে আঁটে ব'লেই, আমার ত' আর তা নয়, ভাল যখন লাগছে তখন কথা বলার অবসর কই?

রামহরি মাথা নাড়িয়া বলিল, বলু কি খোকাবাবু, এ

কদিন বাজে রান্না করে খাইয়েছে কে? আমাকে একবার ডেকে নিয়ে গেলে না কেন, ঘাড় ধরে তাকে বার ক'রে দিয়ে আমার মাকে রেখে আসতাম সেখানে—আজকের রান্না খেয়েই বুঝতে পারছ ত' তার হাত কেমন?

সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই সতীশের চক্ষু অলকার মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। অলকা চক্ষু সরাইয়া অন্য দিকে ফিরিয়া চাহিয়া কি একটা লইয়া আসিবার জন্যই বোধ হয় তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

প্রতুল বলিল, পারলে না হারাতে সতীশ, নিজের আঘাত নিজের গায়েই ফিরে এল শেষ পর্যন্ত—যারা সত্যিকার গুণী তাদের গুণ নেই ব'লে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেই কি হয়?

তাহার শেষ কথাগুলি অলকার কানে আসিয়া পৌঁছিল। কিছুক্ষণ সে কোন কিছুই করিতে পারিল না, সমস্ত শক্তিই তাহার কে যেন নিঃশেষে হরণ করিয়া লইয়াছে, আগুনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কে যেন তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই তাহাকে ধীরে ধীরে একদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—এ পথ তাহার নয়, কিন্তু নয় বলিলেই কি সবাই শোনে, সেই অজ্ঞাত শক্তিও যেন তাহার কোন কথাই কানে না তুলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করিয়াই নিজের খেয়ালের খেলা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আহার শেষ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া সতীশ বলিল, এবার অলকার কথা শুনতে তোমার আপত্তি হবে না নিশ্চয়।

আরাম করিয়া শুইয়া পড়িয়া প্রতুল বলিল, পৃথিবীর কোন কিছুতেই আমার আপত্তি নেই, এই শুলাম—যা খুশী তোমার ব'লে যেতে পার, কেবল চেঁচিও না, কারণ চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভাল রকম আসে না।

সতীশ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, একটু পরে ঘুমিও, আমার কথা শেষ হতে খুব বেশী দেরী হবে না আর ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়, শোনা দরকার।

'বেশ বল, কিন্তু সহজ শাদা ভাবে বলা চাই।

সতীশ সমস্ত কিছুই বলিয়া গেল, কেমন করিয়া মাঝে মাঝে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিত আবার আপনা হইতেই সমস্ত কিছু দূরে সরাইয়া দিয়া, কেমন করিয়া সে তাহাকে আপনার করিয়া লইত—তাহার নিজের অসুখের কথা, ওই মেয়েটির অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা কিছুই বাদ দিল না।—বলিতে বলিতে সে যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিল, যেন কোন এক অতীতের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই সে বর্তমান হইতে সরিয়া গেল।

সে চুপ করিবামাত্র প্রতুল বলিল, আর কিছুই ব'লবার নেই ত'? এবার যদি আমি ঘুম দিতে চাই তোমার আপত্তি হবে না বোধ হয়? তোমার কথা শুনতে আমি আপত্তি করিনি সেকথা মনে থাকে যেন।

অবাকবিস্ময়ে সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ইহা সে আশা করে নাই—সমস্ত কিছু শুনিয়া কোন কিছু না বলিয়া অন্তত বার কতক ছি ছি না করিয়া যে সে এমনি করিয়াই ঘুমাইতে চাহিবে তাহা সে ভাবিয়াও পায় নাই।

প্রতুলকে সে জানিত, সে যে উপহাস করিবে না তাহাও নিশ্চয়রূপেই তাহার জানা ছিল, কিন্তু সে যে এমনও হইতে পারে তাহা সে কোনদিনও জানিত না।

তাহার বিস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া প্রতুল হাসিয়া বলিল, তুমি ব'সে ব'সে ভাবতে থাক কিন্তু [illegible]টের সময় আমাকে জাগিয়ে দিও। আজ আমার ছুটি, কিন্তু তাই ব'লে চা-টা বাদ দিতে চাই না—দিদিকে ব'লে রেখ'।

প্রতুল পাশ ফিরিয়া শুইল—সতীশ ঠিক তেমনিভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। তাহার কাছে আরও অনেকে আসে, তাহাদের [illegible]কে সে সত্য কথা জানাইবে, প্রতুলের মত হয়ত কেহ কেহ কোন প্রশ্নই না করিয়া সহজ হইয়া থাকিবে কেহ বা প্রশ্ন তুলিয়া চোখ মুখের নানা ভঙ্গী করিয়া জানাইয়া দিবে যে ইহা ভাল হয় নাই এমন তাহারা আশা করে নাই, আবার কেহ কেহ হয়ত' তাহাকে তিরস্কার করিয়া তাহার সমস্ত সংস্রবই কাটাইয়া যাইবে। কিন্তু কোন উপায়ই নাই—যাহা সত্য তাহা প্রকাশ করিতেই হইবে। যাহারা তাহাকে সমর্থন করিবে না তাহাদেরই বা কি বলিবার থাকিতে পারে, যুক্তির কোন মানেই ত' তাহাদের কাছে থাকিবে না, এতদিনকার সমস্ত বিশ্বাসই তাহারা মুহূর্তে হারাইয়া ফেলিবে আর একটি বিশ্বাসের কাছে। সতীশের মন নানা চিন্তায় ডুবিয়া গেল—তন্দ্রাচ্ছন্নের মত চক্ষু বুজিয়া সে পড়িয়া রহিল।

চারিটা বাজিবার মিনিট কয়েক পরেই কি একটা শব্দে প্রতুলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তেমনিভাবে পড়িয়া থাকিয়াই সে বলিয়া উঠিল, বাজ'ল ক'টা, থাক্‌গে দরকারই বা কি।

হাসিয়া ফেলিয়া অলকা বলিল, থাক্‌লে ত' চলবে না দাদা, চারটে বেজে গেছে।

এতটুকু না নড়িয়া প্রতুল বলিল, ঘড়িটা নিতান্তই খারাপ দেখছি—ঘণ্টাখানেক মাত্র ঘুমিয়েছি, ফেলে দিন ওটা, টাকা দেবেন কিনে দেব এখন একটা।

হাসিমুখে অলকা বলিল, টাকা আমার নেই আর দাদাকে টাকা দিয়ে অপমান করতেও নেই।—চা কিন্তু আমি এখনি নিয়ে আসব।

তাড়াতাড়ি প্রতুল উঠিয়া বসিয়া বলিল, খুব ভাল কথা, চারটে নিশ্চয় বেজেছে কিন্তু বন্ধুটি গেলেন কোথায়? একা একা চা খেলে আরাম হয় না।

অলকা বলিল, তিনি বেরিয়েছেন, সন্ধ্যের সময় ফিরবেন—কোথায় নাকি বিশেষ দরকার আছে।

বিছানা হইতে নামিয়া প্রতুল বলিল, চা নিয়ে আসুন আমিও একটু জল দিয়ে আসি মুখে চোখে—আচ্ছা থাক্‌, আমি নীচেই যাচ্ছি, রান্নাঘরে ব'সেই চা খাওয়া যাবে।

প্রতুল নীচে নামিয়া গেল, অলকা তাহার বাকী কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এক পেয়ালা চা শেষ করিয়া পেয়ালাটা আগাইয়া দিয়া প্রতুল বলিল, ঠিক এই জন্যেই রান্নাঘরে ব'সে চা খেতে ভালবাসি আমি, এক পেয়ালা ফুরুলেই আবার পাওয়া যায়।

'যদি না দিই?' অলকা বলিল।

(শেষাংশ ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বে-আইনী অর্থ বহিষ্কারের কৌশল

শ্রীকুসুমাকর রায়

চোরাই মালের বিলি-ব্যবস্থায় চোরেরা যে সেয়ানা কৌশল অবলম্বন করে, তাহা নিতান্তই বিস্ময়কর। কিন্তু তাহা হইতেও আশ্চর্যজনক হইল ধনীদের আপন আপন অর্থ রক্ষার বিচিত্র প্রণালী ও ফন্দি-ফিকির।

প্রায় নিত্যই সংবাদপত্রে পাঠ করা যায়, কি প্রকারে নর-নারী তাহাদের প্রচুর টাকাকড়ি জার্মানী, হাঙ্গেরী অথবা পোল্যাণ্ড হইতে আজও গোপনে বাহির করিয়া লইয়া আসিতেছে অন্য দেশে। ঐ সকল দেশে নিতান্তই বিদেশী মুদ্রার আদান-প্রদানের প্রচলন কমিয়া গিয়াছে এবং সেইজন্য ঐ দেশ হইতে দেশীয় মুদ্রা বা নোট বেশী পরিমাণে লইয়া অন্য দেশে যাইবার আদেশ নাই। কিন্তু ধনিকেরা গোপনে ঐ চেষ্টাই করে—অবশ্য ইহাতে দায়িত্ব গুরুতর, কারণ ধরা পড়িলে প্রাণ-দণ্ডও হইতে পারে। কিন্তু এমনই সেয়ানা কৌশল একের পর এক আবিষ্কৃত হইতেছে এই জাতীয় গোপনে অর্থ চালানকারীদের দ্বারা যে, কারেন্সি স্কোয়াড—যাহাদের উপর এই প্রকার গোপন টাকাকড়ি হীরা-জহরৎ প্রভৃতি অর্থ চালানের সন্ধান ও প্রতিরোধ কার্যটি ন্যস্ত, তাহারা এক একটি কৌশল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইবার পূর্বেই নূতন আর এক অদ্ভুতপূর্ব সমস্যা হেঁয়ালির মতই তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় জরুরী সমাধানের জন্য।

কিছুকাল পূর্বেও বিনাসন্দেহে কোনও নিষিদ্ধ দেশ হইতে টাকাকড়ি হীরা-জহরৎ প্রভৃতি লইয়া নিরাপদে সীমান্ত পার হওয়া যাইত—ডবল তলীওয়ালা ট্রাঙ্ক সাহায্যে, কিম্বা টুথ-পেষ্টের খালি টিনে ঐ সব পুরিয়া ঝালাই করিয়া আটকাইয়া অথবা ক্ষৌরীকার্যের সাবানের ভেতরে পুরিয়া। কিন্তু বর্তমানে এই সকল চাতুরী অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। সীমান্তের প্রত্যেক রক্ষী আজকাল এই সকল ধূর্ত কৌশলের খবর রাখে পুরোপুরি। এখন নিত্য নূতন ফন্দি-ফিকিরের সন্ধান তাহাদের রাখিতে হয়। তথাপি অনেক সময়েই ধড়িবাজ গোপন অর্থ-চালানকারী অনায়াসে রক্ষীদের চোখে ধূলি দিতে সমর্থ হয়।

আগেকার দিনে সেরা এক কৌশল ছিল বাইবেল ও ঐ জাতীয় পৌরাণিক পুঁথির কারসাজি। এই সকল পুঁথির থাকিত প্যাডওয়ালা পুরু মলাট; আর সেই মলাটের ভিতর কোকেন, হেরোইন প্রভৃতি পুরিয়া অনায়াসে বে-আইনী আবগারি দ্রব্যের গোপন-কারবারী তাহার ব্যবসা চালাইত—দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া।

হাঙ্গেরী হইতে এক ব্যক্তি এই প্রকার প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহকারী সাজিয়া কতকগুলি পুরাতন পুস্তকে ঐভাবে প্যাড মলাট লাগাইল। ভ্রমণকারীর বেশে ঐ সকল মলাটের প্যাডে ব্যাঙ্ক নোট ভরিয়া হাঙ্গেরী সীমান্ত অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সীমান্তরক্ষী এই চতুর কৌশলের খবর রাখিত। ঐ ব্যক্তি বমাল ধরা পড়িল। সেদিন হইতে এই ফিকির অচল হইয়া গেল।

ইহার পর কিছুকাল চলিল মোটর গাড়ীর ভিতরে অতি সীমান্ত-রক্ষীরা গাড়ীর সকল অংশই খুঁজিয়া দেখিত। কিন্তু মেরামত করিবার ছোটখাটো যন্ত্রগুলি থাকিত একটি ছোট বাক্সে। বাক্সের ডালা খুলিলেই চর্বিমাখান যন্ত্রগুলি নজরে পড়িত। রক্ষীরা আর তাহা ঘাঁটিয়া দেখিত না। উহার ভিতরে লুকাইয়া অনেকেই ঢের ঢের প্লাটিনাম প্রভৃতি লইয়া পলাইত। এক ব্যক্তি ঐ সকল যন্ত্রের নীচে প্লাটিনাম তৈরী যন্ত্র অয়েল পেপারে মুড়িয়া লইয়া সীমান্ত পার হইয়া গেল। শেষে অন্য এক ব্যক্তি ধরা পড়িয়া যাওয়ায় সেই কৌশল বর্জিত হইল।

হেগিয়েশালোম্—হাঙ্গেরী সীমান্তে একটা বড় ষ্টেশন কয়েক মাস মাত্র পূর্বে এক ব্যক্তি মোটর গাড়ী সহ সেই পথে সীমান্ত অতিক্রম করিতে আসিল। গাড়ীর কোণ-কানাচ তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল। চলিয়া যাইতে হুকুম দেওয়া হয় আর কি!

একটি রক্ষী গেল গাড়ীটির নম্বর টুকিয়া রাখিতে। নম্বরপ্লেটের স্ক্রুগুলি যেন ঢিলা মনে হইল। নেহাৎ খেয়ালের বশেই ঝুঁকিয়া নত হইয়া সে স্ক্রুগুলি আঁটিয়া দিতে আরম্ভ করিল। প্লেটটা যেন অসম্ভব ভারী ঠেকিল তাহার হাতে। প্রধান রক্ষীকে সেকথা সে জানাইল। অমনি কাষ্টম অফিসারের আহ্বান হইল। প্লেটটি খুলিয়া বাহিরে দেখা গেল উহার ভিতর পিঠে একখানা সোনার পাত ওজনে কমসে কম পাঁচ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আড়াই সের হইবে।

অন্য একদিন বুদাপেস্ত শহরের কারেন্সি স্কোয়াড গোপন সংবাদ পাইল যে কোনও ব্যবসায়ী হীরা-জহরৎ প্রভৃতি কৌশলে সঙ্গে লইয়া সীমান্ত অতিক্রম করিবার মতলব আঁটিয়াছে। রেলগাড়ীতে তাহাকে পাইয়া তাহার সর্বস্ব তল্লাস করিল। যে গোয়েন্দা এই তল্লাসী পরিচালনা করিতেছিল, সে ভাবিল নিশ্চয়ই মিথ্যা খবর দিয়া তাহাদিগকে ধাপ্পা দেওয়া হইয়াছে, কারণ তাহার নিকট মূল্যবান কিছুই পাওয়া গেল না। গায়ের জামা খুলিলে বেচারীর বাহুতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল কতকটা স্থান জুড়িয়া প্লাষ্টার দেওয়া। গোয়েন্দা কথায় কথায় সে ব্যাপার লইয়াই প্রশ্ন করিল

তোমার বাহুতে কি হয়েছে?

আঘাত পেয়েছি। কেমন যেন অস্বস্তির সহিত কথা কয়টি সে বলিল।

গোয়েন্দার তৎক্ষণাৎ হইল সন্দেহ। সে পুনরায় প্রশ্ন করিল—কোথায় এ ব্যাণ্ডেজ করিয়েছ?

বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিকে এক ডাক্তার করে দিয়েছে।

অগোণে ক্লিনিকে টেলিফোন করা হইল। তাহারা জবাব দিল, কোনও ব্যক্তির বাহুর চিকিৎসা এখানে হয় নাই এক মাসের ভিতরও। তখন পুলিশের ডাক্তারকে ডাকা হইল। সে অতি সন্তর্পণে প্লাষ্টার তুলিয়া ফেলিয়া দেখে বাহুতে কোনই আঘাত নাই। কিন্তু প্লাষ্টারটা ভাঙ্গিয়া দেখা গেল, তাহার ভিতর রহিয়াছে ২৩টি হীরা প্রতিটি ৩০ পাউণ্ড হইতে ৬০ পাউণ্ড পর্যন্ত মূল্যের।

কিন্তু দিন যায় আর অভিনব এক একটা সেয়ানা কৌশল

আবিষ্কৃত হয়। কারেন্সি স্কোয়াড্ প্রথম উহার কোনই পাত্তা পায় না, সন্দেহ করিবারও তার কিছুই থাকে না। এইভাবে কিছুদিন উহাদের অজ্ঞাত থাকিবার পর হয়ত দৈবাৎ কোনও ব্যক্তি ধরা পড়ে, আর কারেন্সি স্কোয়াড্ তখন সে কৌশলটি জানাইয়া দেয় সকল অঞ্চলের সীমান্ত রক্ষীদের।

একজন জার্মান ধনিক একেবারে স্বপ্নাতীত এক চতুর উপায় অবলম্বন করে। সে একদিন 'ফোলবিশের বেওবাখ-টার' নামক সংবাদপত্র অফিসে আসিয়া বিজ্ঞাপন দেয়, কর্ম-খালির; সে একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী রাখিবে। '...বক্স নং-য়ে অনুসন্ধান করুন' লেখা থাকে। কয়েকদিন পরে পুনরায় সেই অফিসে আসিয়া সে জানাইয়া যায়, তাহার যে সমস্ত চিঠি আসিবে (অর্থাৎ ঐ বক্স নং-য়ে) তাহা যেন জুরিকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, কারণ সে সুইজারল্যাণ্ডের ঐ শহরটিতে চলিয়া যাইতেছে কিছু দিনের জন্য। সংবাদপত্র অফিস হইতে সেই অনুসারে ঐ বক্স নম্বরের সকল চিঠি জুরিকে ঐ ব্যক্তির ঠিকানায় পাঠান হয়। সেই ব্যক্তি জুরিকে বসিয়া চিঠি খোলে আর গাদা গাদা ব্যাঙ্ক নোট পায়—কারণ উহা তাহার পুলিশকে প্রতারিত করিয়া জার্মানী হইতে অর্থ লইয়া আসিবার ফিকির মাত্র। এই উপায়ে সে ১০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ইংলিশ ও সুইস্ নোট (তাহার সঞ্চিত অর্থ) নিরাপদে সীমান্ত পার করিয়া আনিতে সমর্থ হয়। নিজের বিজ্ঞাপনের জবাব স্বরূপ নিজেই বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন ডাকঘর হইতে আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছে অকৃত্রিম এবং অধিকাংশের ভিতরেই পুরিয়া দিয়াছে ইংলিশ বা সুইস্ নোট।

আরেকটি একেবারে মৌলিক ফিকির-ফন্দি আবিষ্কৃত হয় এক জার্মান কারিগরের বেলা। সে একদিন বার্লিনের এক 'পাবলিক নোটারি'র (Public Notary) নিকট যাইয়া একটা বাণ্ডিল রাখিতে দেয় উহার ভিতর তাহার উইল্ রহিয়াছে বলিয়া। বাণ্ডিলের উপরে লিখিত ছিল—"আমার মৃত্যুর পর খুলিতে হইবে।" পাবলিক নোটারি ঐ বাণ্ডিলটিকে ষ্ট্রং রুমে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়।

কয়েক সপ্তাহ পরে ঐ কারিগর জুরিক নামক সুইস্ শহরের জার্মান কনসালের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে,—'আমার স্বাস্থ্য নিতান্তই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, কয়েক মাসের বেশী নিশ্চয়ই বাঁচিব না। আমার উইলটি পরিবর্তন করা দরকার। আমার বর্তমান স্বাস্থ্যে এতদূর ভ্রমণ করা অসাধ্য, কাজেই আপনি যদি পাবলিক নোটারির নিকট হইতে উইলটি আনাইয়া দেন, তবে বড়ই উপকার হয়।' কনসাল এই প্রস্তাবে রাজি হন।

একজন কনসাল অফিসের কর্মচারী সেই সময় বার্লিনে যাইতেছিল অফিস সংক্রান্ত কার্যে। কারিগর তখন ঐ অফিসারের হস্তে উইলটি আনিবার অধিকার-পত্র লিখিয়া দেয়। যথাসময়ে অফিসার ফিরিয়া আসিয়া সেই বাণ্ডিল কারিগরের নিকট প্রদান করে। কারিগর তখন ভাল করিয়া পরিদর্শন করিয়া দেখিল বাণ্ডিলটির গালার ছাপ অটুট রহিয়াছে—উহাতে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। উইলের প্যাকেটটির এই প্রকার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের কারণ কারিগরের পক্ষে আর কিছুই নয়—উহার ভিতর উইল ছিল না আদপেই, ছিল অর্ধমিলিয়ন অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ মার্কের বিদেশীয় নোট। বলা বাহুল্য এই নোট লইয়া জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করা অসম্ভব বলিয়াই, কারিগর এই প্রতারণার আশ্রয় লইয়াছে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ও নির্ভীক আচরণ করিয়াছিল একজন জার্মান-ইহুদী। তাহার ষড়যন্ত্র নিঃসন্দেহে পুরাপুরি সফল হইয়াছিল। এই প্রকার দুঃসাহসের পরিচয় আজ অবধি আর কেহ প্রদান করিতে সক্ষম হয় নাই। জার্মান গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা প্রচার করে, গোপন অর্থ-চালানকারীর দল যদি স্বীকার করে তাহারা কত অর্থ জার্মানী হইতে অপসারিত করিয়াছে এবং দুই মাস মধ্যে উক্ত টাকা জার্মানীতে ফিরাইয়া আনে, তাহা হইলে তাহাদের মাফ করা হইবে। কোনও ব্যাঙ্কার সেই ঘোষণা অনুসারে আসিয়া জানায় যে, সে প্রকৃতই অপরাধী, কারণ সে ৫০,০০০ মার্ক পরিমাণ অর্থ গোপনে জার্মানী হইতে বাহির করিয়া সুইজারল্যাণ্ডের জুরিক শহরের কোনও ব্যাঙ্কে জমা দিয়া রাখিয়াছে।

ভারপ্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট অফিসার বলিলেন,—'বেশ তো এক-খানা চিঠি লিখে দিন ঐ টাকা জুরিকের জার্মান কনসালের নিকট প্রদান করতে।'

ব্যাঙ্কার জবাব দিল,—তাহাতে কোন ফল হইবে না, কেন না উক্ত ব্যাঙ্কের উপর ঐ ব্যক্তির নির্দেশ রহিয়াছে যে, সে স্বয়ং উপস্থিত না হইলে অন্য কাহারও হাতে যেন টাকা তাহারা না দেয়। কাজেই যদি তাহাকে যাইতে বলা হয়, সে যাইয়া জুরিকের ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়া আসিতে পারে।

জার্মান গবর্ণমেণ্ট তখন স্থির করিল, ঐ ব্যাঙ্কারের সহিত কারেন্সি স্কোয়াডের একজন গোয়েন্দা যাইবে জুরিক পর্যন্ত এবং তথা হইতে টাকা লইয়া আসিবে। কয়দিন পরে ব্যাঙ্কার এবং গোয়েন্দাটি জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করিল। পথে কেহই তাহাদের আটক করিল না অথবা খানাতল্লাসীও করিল না; সীমান্ত-রক্ষীরা মোটরগাড়ীতে গোয়েন্দাটিকে দেখিয়া অমনিই গাড়ী পাশ করিয়া দিল বিনা সন্দেহে।

জুরিক শহরে উপস্থিত হইয়া দুইজনে একত্রই ব্যাঙ্কে গমন করে। সেখানে ব্যাঙ্কার তাহার হিসাবে কত টাকা জমা আছে জানিতে চাহে। কিন্তু ব্যাঙ্কের লোকজন বলিয়া দেয় যে তাহার নামে কোনও হিসাব এই ব্যাঙ্কে নাই।

মহা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া ব্যাঙ্কার তখন গোয়েন্দাটিকে বলে,—'ভয়ানক অবস্থায় পড়া গেল তো, তাহলে আর অন্য উপায় কি? এখানেই আমায় আবার নূতন করে একটা কিছু কাজ কারবার ফেঁদে বসবার ব্যবস্থা দেখতে হ'ল। আর আপনাকে বলতে কি, আমি এ শহরেই এখন থেকে বসবাস করবো স্থির করে ফেলেছি।

এই কথা বলিয়া একটু নীরব থাকিয়া আবার গোয়েন্দাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—'আর আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, আপনাকে বৃথা এতটা কষ্ট দিলাম, টাকাও পেলেন না কথামত। দয়া করে এই সামান্য কিছু টাকা আপনাকে নিতেই

(শেষাংশ ৪০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অমিত্রাক্ষর

(গল্প)

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

অমিতাভ তিন দিনের ছুটি লইয়াছে। কিন্তু টুশনির ছুটি নাই।

আর বাড়ী আসিয়াও রক্ষা নাই। স্কুলের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, দয়া করিয়া হেড [illegible] মহাশয় কতকগুলি খাতা অমিতাভকে দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। দারোয়ান বাড়ী বহিয়া দিয়া গিয়াছে। খাতার উপরে লাল কাগজে বড় বড় কালো অক্ষরে 'জরুরী' [illegible]ট শ্লিপ। প্রধান শিক্ষকই লিখিয়াছেন: বিনোদবাবু আর [illegible]মবাবু আসেন নাই। জ্বর। খাতাগুলি আজই দেখিয়া কাল নম্বরটা পাঠাইয়া দিতে পারিলে...

অমিতাভ চায়ের নামে এক কাপ গরম জল খাইয়া খাতা দেখিতে বসিল। তবু যে গরম জলটুকুন জুটিয়াছে! বলিতে গেলে তাহা লইয়া কথা কাটাকাটি বাধিয়া যাইবে। সে সব অমিতাভের আর ভাল লাগে না। সে নিরিবিলি থাকিতে চায়। হয়তো বা মনের প্রশান্তিই তার ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়াছে। জমিয়া জমিয়া উষ্ণ জলধারা যেমন নিরেট তুষার স্তূপে পরিণত হয়, হয়তো বা তাই।

হাতের লাল নীল পেন্সিলটা লইয়া অমিতাভ খাতা দেখিতে বসিল। লিখিয়াছে ছেলেটি মন্দ নয়। চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের মধ্যে যে সুপ্ত পুরস্কার সে নাকি পৃথিবীর সব আলো মুঠোর মধ্যে করিয়া বিশ্বজয়ী হইয়া উঠিতে পারে। বেশ লিখিয়াছে ত। ভাষা এবং ভাব এবং বলিবার ভংগীর উপর নির্ভর করিয়া ছেলেটি অনেক নম্বরই পাইবে—কিন্তু প্রয়োজনের দিনে সে পাশের মূল্য দিবে কে?

অমিতাভর হাসি পায়।

মনে মনে সে হাসিয়াই ফেলে। জীবনের শিশুকালে অমিতাভর মা মরিয়াছে। তারপর বাবাও একদিন তার মরিল। দুঃখ এবং বেদনার মধ্য দিয়া অমিতাভর জীবন আরম্ভ। সেই যে আরম্ভ হইয়াছে আজও তার শেষ হইল না। অমিতাভ ভাবিয়াই পায় না: চেষ্টা এবং অধ্যবসায় থাকিলেই যদি মানুষ সবই হইত তবে গ্রে'র সেই 'এলিজী' কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যে সবার উপরে কি করিয়াই বা আসন করিয়া লয়। অমিতাভও ত চাহিয়াছিল, যশ এবং প্রতিষ্ঠা। কিছুই ত সে পায় নাই। কেন পায় নাই তাহার কারণও ত তার কাছে অজ্ঞাত। জ্ঞাত জীবনের পরিধির মাঝে মাঝে তাকাইয়া সে শুধু দেখিয়াছে—আকাশের তারাকে কেন্দ্র করিয়া একটিই মাত্র জোছনার দেবী দুটি নয়!

হিসাবে সে ভুল করে নাই। জীবনের প্রতিটি পদ সঞ্চালনে সে সংযমী তবু বীরের মাল্য তাহার গলায় আসে নাই। হয়তো ফুলের মালা পরিয়া সবার মাঝে দাঁড়াইবার ভাগ্য সকলের থাকে না।

না। ভাবিতে বসিলে তাহার চলিবে না। খাতাগুলি দেখা তার চাই। কিন্তু অমিতাভর মন যেন আজ নিরুদ্দেশের যাত্রাপথে এলোমেলো বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে সে যেন নীচে নামিয়া যাইতেছে। কালো অন্ধকার গুহা-গহ্বরের সংগীন পথপ্রান্ত বুঝি তারই সমাধির জন্য সঞ্চিত। ব্যর্থতার মালা পরিয়াই পৃথিবীর ধূলি বাতাসের সংস্পর্শ হইতে বিদায় লইয়া একদিন বিলীন হইয়া যাইবে। কেহ হয়তো কাঁদিবে কেহ হয়তো কাঁদিবে না।

মাধবীর চোখ দুইটি...

মাধবীর কথা ক্ষণিকের জন্য অমিতাভর মনে পড়ে। মাধবীর চোখ দুইটি হয়তো সজল হইয়া উঠিবে। ক্ষীণ ক্ষণিকা বসন্ত: তবু সে সবার প্রিয়। হারাইয়া যাওয়া যে আপদ তারই মাঝে মানুষের টান! মাধবীকেই বা অমিতাভ ভোলে কি করিয়া।

দুটি গভীর চোখ, তাজা ফুলের মত কমনীয় লাবণ্যময়ী মাধবী, অমিতাভর চোখের সমুখে ভাসিয়া উঠে। সেই স্মৃতি ম্লান আলোয় অস্পষ্ট হইয়া গেছে তবু কতই-না মহিমময়।

মাধবী ত অমিতাভকেই কামনা করিয়াছিল—কিন্তু একে অন্যকে কেহ তাহারা পায় নাই। সমাজের সামাজিকতার রুদ্র পরিহাস দুজনকে দুইদিকে হটাইয়া দিয়াছে—বাঁচিবার পথ দেখায় নাই।

অমিতাভ ধীরে ধীরে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুতের আলোকে রাজপথ কুমারী মেয়ের মত লাজ-নম্র সজীব হইয়া আছে। আজ আর খাতা দেখিতে তার ভাল লাগে না। ইচ্ছা করে না কলম ধরিতে। দিনের পর দিন এমনি করিয়াই ত তার চলিয়াছে, একদিন না হয় একটু বিশ্রামই সে লইল।

ছাত্রজীবনে সে ত ভালই ছিল। অথচ বেশী পড়াও ত তার হইল না। আত্মীয়স্বজন দূরে সরিয়া গেলেন, যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা দিলেন উপদেশ। মহত্ত্বের জন্য মামাকে তার মনে পড়ে। মনেসেফী করিয়া লোকটা বিস্তর পয়সা রোজগার করিয়াছে—জীবনে দান করে নাই কাহাকেও; শুধু বাড়ীর পর বাড়ীই উঠাইয়াছে। মানুষের কাছে প্রশ্ন করিয়া মানুষের দুঃখ জানিতেই সে অভ্যস্ত। তাতেই তার আনন্দ। অমিতাভ বুঝিবা ভুল করিয়াই তাহার কাছে একদিন ছাত্রজীবনের একটি সুযোগের সন্ধান চাহিয়াছিল। পায় নাই তাও নয়। উপদেশ পাইয়াছে।

অমিতাভ হাসে।

হাসে আর ভাবে: মানুষই যদি মানুষের হাতে কিছু ধরিয়া দিতে পারিত তবে জন্ম-মুহূর্ত হইতে একজন কেন সম্রাটের সন্তান অন্য জন কেন ভিক্ষুক। পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসে আজও কেউ কাহাকেও কিছু দিতে পারে নাই। তবু সুযোগ এবং সুবিধা পাইয়াও যাহারা মহামানবের উপকারে আসে না, আগত ভবিষ্যতের ধূলি-ধূসরে তাহারাই কি টিকিয়া থাকে।

না। ফিলজফী লইয়া মাতিয়া থাকিলে চলিবে না। খাতাগুলি দেখা চাই। 'বয়েজ লাইব্রেরী' একটা নূতন বই লিখিবার অর্ডার দিয়া গিয়াছেন। বাইশে রাত্রে নিতে আসার কথা। তাইত আজই যে বাইশ তারিখ। তিন দিনের ছুটি.

লইয়া আনন্দে সব কিছু ভুলিয়া সে বসিয়া আছে। যাক আসুক। বই ত অমিতাভর তৈরীই আছে।

কিন্তু ক্ষণের মধ্যেই বয়েজ লাইব্রেরীর মালিক ধীরেনবাবু আসিলেন। বেশ হাসিখুশী ভদ্রলোক।

চেয়ার টানিয়া বসিলেনঃ কতদূরে হল বইটার ?

• চেয়ারে হাত-পা ছড়াইয়া অমিতাভ বললঃ কমপ্লিট—

ধীরেনবাবু কি ভাবিলেন। বলিলেনঃ আমাদের অনেক গুলি 'নোট'ই আপনি করে দিয়েছেন, আমি বলি এটার কপি রাইট আপনিই রাখুন।

অমিতাভ ভৌতিক হাসি হাসিল। সংসারে টাকা যে কত মহামূল্যে তাহার কাহিনী অমিতাভর অবিদিত নয়। যাঁরা বলেন অর্থই সব নয়—কাছে পাইলে অমিতাভ তাহাদের গলা টিপিয়া মারিতে পারে।

ধীরে ধীরে বলিলঃ আপনি আমার বন্ধু! প্রকৃত উপদেশই দিয়েছেন—কিন্তু জানেন না টাকার আমার কত প্রয়োজন—

ধীরেনবাবু বলিলেনঃ ব্যবসার দিক হতে না বলাই উচিত ছিল। কিন্তু এমনি করে নিজের ক্ষতি করছেন। যে কয়টা বই বিক্রি করে দিয়েছেন সেগুলো বের করতে বড় জোর শ পাঁচেক টাকা লাগত। বছরে টাকাটা উঠে আসে আর চিরকাল তা হতেই মাসে মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকাও আসতো।

অমিতাভ জানে। অমিতাভ বোঝে। কিন্তু প্রকৃতির একি কুৎসিত পরিহাস। সমস্ত জীবনে একটাও অবলম্বন সে ত পাইল না—যাহাকে ধরিয়া সে উঁচুতে উঠিতে পারে। অকারণেই তার মামার কথা মনে পড়িয়া যায়।

অমিতাভ গম্ভীর হইয়া ভাবে। প্রকৃতির পরিহাস একদিন তার মামার ঐশ্বর্য্যকে চুরমার করিয়া দিয়া কি যাইবে না! অপরের মঙ্গলাচরণে যাহার [illegible]নিময় নাই—মূল্য তার কি।

কিন্তু ধীরেনবাবু কাছে বসিয়া আছেন।

অমিতাভ হাসিল। হাসি[illegible] বলিলঃ কপি রাইটই আপনি নিন। শ'খানেক টাকায় কপি [illegible] কিনিয়া ধীরেনবাবু উঠিলেন।

একান্ত তুচ্ছ কাহিনী [illegible]। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনি কত প্রতিভাশালীর মৃত্যু ঘটে! তবু ত সে কিছু একটা পাইয়াছে।

টেবিলের উপর খাতাগুলি পড়িয়া আছে।

দেখিতেই হইবে

উপরের আকাশে তারকার ঘন মেলা বসিয়া গিয়াছে। অন্ধকার। খিদেও পাইয়াছে বেশ।

অমিতাভ ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

রান্নাঘর অন্ধকার। স্ত্রী মানময়ী বোধ হয় কাজ সারিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সত্যই তাই। হাতে একটা কি নভেল লইয়া মানময়ী অঘোরে ঘুমাইতেছে। সে ঘুমাক। অমিতাভর জাগাইতে ইচ্ছা করে না। খিদে তার আছে তবু তার খিদে নাই। মাধবী থাকিলে আর কিছুতেই অভুক্ত অমিতাভকে রাখিয়া ঘুমাইতে বোধ হয় পারিত না।

অমিতাভ জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

নীল আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া ঝাপসা হইয়া আছে।

বে-আইনী অর্থ-বহিষ্কারের কৌশল

(৪৯৯ পৃষ্ঠার পর)

হবে—অন্ততঃ আপনার জার্মানীতে ফিরে যাবার ভাড়াটা তো আপনি ন্যায্যভাবেই দাবী করতে পারেন।'

এই বলিয়া জামার ভিতর হইতে নোটকেস বাহির করিয়া তাহা হইতে একশত মার্কের নোট আলাদা করিয়া গোয়েন্দার হাতে দিল।

অতি বিনীতভাবে ব্যাঙ্কার অনুরোধ জানাইল,—"দয়া করে এ টাকাটা আপনার গ্রহণ করতে হচ্ছে। আমাকে আর [illegible] দিবেন না। এ টাকার ওপর আপনার সংগত অধিক[illegible] এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। মোটের ও[illegible] তো বলতেই হয় যে, আপনি সাথী হয়ে আমার [illegible] এসেছিলেন বলেই, এভাবে আমার যথাসর্বস্ব—[illegible] জীবনের সঞ্চয়—আমি সংগে নিয়ে আসতে পেরেছি, আমার পকেটে, গাড়ীর কোণে কানাচে। আপনার জন্যেই যে এত টাকা সীমান্ত পার করা সম্ভব হয়েছে, এতে তো আর ভুল নেই।

"আর আপনার কুণ্ঠিত হবারও কোন কারণ নেই এই ভেবে যে আমি কপর্দকহীন অবস্থায় নতুন দেশে কি করে বাস্তব্য করবো; কেননা, আমি সংগে করে নগদ ১০ লক্ষ মার্কের কম আনি নি, কাজেই এখানে নতুন করে জীবন সুরু করতে আমায় বেগ পেতে হবে না নিশ্চয়ই। আপনাকে ধন্যবাদ, আর জার্মান রাইখস্-ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্টকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাবেন। নমস্কার।*

---

* Adam Ashmole-এর 'The money smugglers risk death' অবলম্বনে

আসামের রূপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মিরিগৃহে

'মিরি' আসামের পাহাড়ী জাতিগুলির মধ্যে অন্যতম। আসামের দরং, নোওগা ও লক্ষ্মীমপুর জেলার নানাস্থানে ইহাদের আবাস দেখা যায়—তবে তাহাদের মূল বাসস্থান লক্ষ্মীমপুর জেলার পূর্ব্বাংশ ও সদিয়া সীমান্ত জেলার পশ্চিম সীমারেখায়। মিরিরা পার্ব্বত্য জাতি হইলেও এখন ইহারা সমতল ভূমিতে বাস করিতেই ভালবাসে। পূর্ব্বে অন্যান্য পাহাড়ী জাতির মত জুম চাষই তাহাদেরও একমাত্র চাষ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে অধিকাংশ মিরিরাই নদী-নালার নিকটবর্ত্তী চাষের উপযুক্ত সমতল প্রশস্ত জমি লইয়া বসবাস করিতে ও গরু মহিষ দ্বারা চাষ করিতে দেখা যায়, এজন্যই ইহারা আজ তাহাদের মূল বাসস্থান পাহাড়-পর্ব্বত ছাড়িয়া নিম্নভূমির নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সদিয়া শহর হইতে পশ্চিম ও উত্তর দিকে আট দশ মাইল দূরে দূরে এরূপ বহু মিরি পল্লী দেখা যায়। একদিন সদিয়ার জনৈক বন্ধুর সহিত সাইকেলারোহণে সদিয়া হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী একটি মিরি বস্তিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

মিরিরাও বাঁশের মাচার উপরে খড়ের গৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করে, তবে ইহাদের ঘরগুলি বেশ প্রশস্ত এবং প্রত্যেক পরিবারের জন্য পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট গৃহ থাকে, কোন কোন বৃহৎ এবং সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের দুইতিনটি পর্য্যন্ত গৃহও দেখিলাম। মিরিদের এক গ্রামের কুড়ি পঁচিশটি এমনকি পঞ্চাশ ষাটটি পর্য্যন্ত পরিবার পাশাপাশি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে।

আমরা যখন গ্রামে পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ গ্রামবাসীই জুমের কাজ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছে। পুরুষদের কেহ ঘরের সম্মুখে খোলা মাচার উপরে বিশ্রাম করিতে বসিয়াছে, কেহবা সন্তান-সন্ততি পরিবেষ্টিত হইয়া ভাতের হাঁড়ি খুলিয়া আহারের উদ্যোগে ব্যস্ত। কিন্তু মেয়েদের বেলা অন্যরূপ লক্ষ্য করিলাম, যদিও মেয়েরাই পরিশ্রম করে বেশী তবুও তাহাদের পুরুষদের মত হাত পা ছড়াইয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে বা ক্ষুধার তাড়নায় বাড়ী পৌঁছিয়াই ভাতের হাঁড়ী লইয়া বসিতে দেখিলাম না। প্রায় সকল রমণীই গৃহে পৌঁছিয়া জুমের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মিরি মেয়েদের চিরসাথী স্কন্ধে ঝোলান ছোট বাঁশের ঝুড়িটি নামাইয়া রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গেই জলের কলসী পিঠে ঝুলাইয়া মন্থর গতিতে নিকটবর্ত্তী ছোট নদীটিতে চলিয়াছে।

মেয়েদের যে ভগবান পুরুষ অপেক্ষা বহুগুণে বেশী ধৈর্য্যশীলা, শান্ত ও সংযমী করিয়া গড়িয়া থাকেন মিরি সমাজে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। কথাটি হয়ত অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহাদের স্ত্রী-পুরুষের স্বভাবে এত পার্থক্য চোখে পড়ে যে, মনে হয় যেন এসব নারী এ সমাজের নয়, ইহাদের স্থান আরো উচ্চে।

মিরিরা গ্রাম্য সর্দ্দারকে 'গাম' বলে, আমরা গামকে সঙ্গে লইয়া পল্লীতে বেড়াইতে বাহির হইলাম।

মিরি জাতির আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই বুঝা যায় এ অঞ্চলের অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি অপেক্ষা ইহারা সর্ব্ববিষয়েই উন্নত। সকল পাহাড়ী জাতিই স্বাবলম্বন-প্রিয়, কিন্তু মিরিদের স্বাবলম্বনে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহারা কোনরূপে তাহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইতে পারিলেই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করে না, তাহাদের সর্ব্বকার্য্যে সৌন্দর্য্য ও সুরুচি জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। মিরিদের সর্ব্বপ্রকার শিল্পকার্য্যের মধ্যে বয়ন-শিল্পই প্রধান, ইহাদের সমগ্র পরিবারের প্রয়োজনীয় বস্ত্র ঘরে ঘরে মেয়েরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। মিরি মেয়েদের হস্ত-প্রস্তুত কারুকার্য্য সমন্বিত বস্ত্রগুলি বাস্তবিকই দর্শনীয় জিনিষ। শুধু বস্ত্র-শিল্পেই বা কেন সর্ব্বপ্রয়োজনীয় শিল্প

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের পার্ব্বত্য জাতি মিরিদের বস্তিতে একটি মিরি পুরুষ—ডানদিকে জিনিষপত্র বহনের ঝোলা—বামদিকে অস্ত্র

এবং সর্ব্বপ্রকার ঘর-গৃহস্থালীর কার্য্যেই মিরি জাতির বিশেষ-ভাবে মিরি মেয়েদের সুশৃঙ্খলা ও কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহাদের শ্রমসহিষ্ণুতা এবং একতা প্রভৃতি গুণে সাধারণ জীবনযাপনেও বেশ সুখী বলিয়া মনে হইল:

খৃষ্টিয়ান মিশনারীদের চেষ্টায় আজকাল মিরিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার খুব বাড়িতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী চাকুরীর দিকেও ইহাদের অত্যন্ত ঝোঁক পড়িয়াছে। আচার-ব্যবহারে এবং পোষাক-পরিচ্ছদে অনুকরণ স্পৃহা এখন তাহাদের মধ্যে প্রবল দেখা যায়।

মিরি মেয়েরা আজকাল আসামীদের মত 'মেখলা' ও রিহা ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে এখন পর্য্যন্ত সবই ইহাদের

নিজ হস্ত-প্রস্তুত, পুরুষদেরও অনেকে জাতীয় নেংটি ছাড়িয়া ধুতি-কোট পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমরা অল্প বেলা থাকিতেই মিরি গৃহে পৌঁছিয়াছিলাম, ক্রমে দিবসের আলো নিস্তেজ হইয়া পড়িল, ইতিমধ্যে সমগ্র গ্রামে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্রামান্তে সকলেই আনন্দ কোলাহলে মুখর, বালক বালিকাগুলি খেলিয়া বেড়াইতেছে। মেয়েরা সারি বাঁধিয়া জলপূর্ণ কলসী পিঠে লইয়া গৃহে ফিরিতেছে, তাহাদের চেহারায় ও বেশ-পরিপাটে সদাস্নানের চিহ্ন বর্ত্তমান, পাহাড়ী জাতি হইলেও তাহাদের বেশবিন্যাসের রীতি সংযত রুচিরই পরিচয় দেয়। প্রত্যেকেই চুলের খোঁপায় এবং কানের বড় বড় ছিদ্রে নানাবিধ বন্য ফুল গুঁজিয়া লইয়াছে, গলায় রঙীন কাচের মালা, কাহারো কাহারো হাতে রৌপ্য বলয়, তবে অধিকাংশ মিরি মেয়ের হস্তই অলঙ্কার শূন্য।

আমরা গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ঘুরিয়া বেড়াইলাম, প্রত্যেকেই আমাদিগকে যথাসম্ভব আদর আপ্যায়ন করিয়া পান-সুপারি দিল এবং তাহাদের ঘরে বসিতে বলিল। ইহাদের সরল ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় বাস্তবিকই প্রীত হইতে হয়। ইচ্ছা থাকিলেও বেশীক্ষণ আমাদের কোথাও বসা হইল না। সূর্য্য প্রায় ডুবু ডুবু হইয়াছে। গ্রামবাসীদের নিকট বিদায় লইয়া আবার সদিয়ার পথে রওয়ানা হইলাম।

খামতি রাজ্যে

সদিয়া সীমান্ত জেলার পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে 'খামতি জাতি' বাস করে। বৃটিশ সরকারের অধীনে একজন খামতি রাজা এ অঞ্চলের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন, তবে খামতি রাজ্যের প্রকৃত শাসনভার সদিয়ার পলিটিকেল এজেণ্টের উপরই ন্যস্ত আছে।

আমার সীমান্ত জেলা ভ্রমণ একরূপ শেষ হইয়া গিয়াছিল, শুধু খামতি রাজ্যটিই দেখা হয় নাই। শুনিলাম এ রাজ্য সদিয়ার পলিটিকেল এজেণ্টের অধীনে হইলেও সদিয়া হইতে সে অঞ্চলে যাইবার ভাল কোন রাস্তা নাই, যাহা আছে তাহাতে শুধু পাহাড়ীরাই যাতায়াত করিতে পারে, অন্যদের পক্ষে এ রাস্তায় চলা অসম্ভব, বিশেষত তখন বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তাহাতে পাহাড়ী রাস্তায় অসংখ্য নালা-ঝরণার সৃষ্টি হইয়াছে, এগুলি নূতন লোকের পক্ষে অতিক্রম করা মোটেই সহজ নয়। খামতি পাহাড় ভ্রমণের আশা একরূপ ত্যাগ করিতে হইল।

সদিয়া শহরে খামতি রাজার একটি বাড়ী আছে, শুনিলাম রাজাও তখন শহরেই। সদিয়া হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। খবর পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই রাজা স্বয়ং বাহিরে আসিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং নিজেই একখানা চেয়ার আগাইয়া আমাকে বসিতে দিলেন। তাঁহার ভদ্র ও বিনয়নম্র আচার-ব্যবহারে সহৃদয়তারই পরিচয় পাইলাম।

আমার খামতি রাজ্যের পল্লীঅঞ্চল দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া তিনি খুশীই হইলেন—বলিলেন, তিনি নিজেও ভ্রমণ করিতে খুব ভালবাসেন, ভারতবর্ষের বহুস্থানে এবং তীর্থোপলক্ষে ব্রহ্মদেশেও একবার গিয়াছেন।

খামতি জাতি ব্রহ্মবাসীরই এক শাখা, ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী, ইহাদের আচার-ব্যবহার এবং পোষাক পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত বর্ম্মীদের অনুরূপ, তাই প্যাগোডার দেশ 'ব্রহ্ম' খামতিদের নিকট তীর্থক্ষেত্র।

খামতি রাজা উৎসাহের সহিত আমার সঙ্গে ব্রহ্মদেশ ও তাহার দেখা অন্যান্য স্থানের গল্প করিতে লাগিলেন।

আসামের অন্যতম পাহাড়িয়া জাতি খামতিদের রাজা ও রাণী—রাণীর কোলে শিশুপুত্র—পাহাড়িয়া জাতিদের ভিতর ইহারা কতটা সভ্যতার প্রভাবে আসিয়াছে, তাহা রাজা-রাণীর পরিচ্ছদাদি হইতেই বুঝিতে পারা যায়

আমার খামতি পাহাড়ে যাওয়ার রাস্তার অসুবিধার কথা বলিয়া তিনি বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিলেন, বলিলেন শীতকাল হইলে কোন কথাই ছিল না, তবে কতক নৌকায় এবং কতক হাতীতে গেলে এখনও খামতি পল্লীতে যাওয়া সম্ভব। এ পন্থা বড়ই ব্যয়সাপেক্ষ কাজেই শুনিয়াই তৃপ্ত হইতে হইল।

যাহা হউক, শেষে তিনি সদিয়া হইতে না গিয়া লক্ষ্মীমপুর জেলার মধ্য দিয়া খামতি রাজ্যে প্রবেশের অন্য একটি রাস্তা আমাকে বাতলাইয়া দিলেন এবং সে-প্রান্তের একটি গ্রামের মঠপুরোহিতের নিকট একখানা পরিচয়পত্রও আমার সঙ্গে দিলেন।

আসাম ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া সীমান্ত জেলারই সমগ্র অংশ দেখা হইল না বলিয়া মন বড়ই দমিয়া গিয়াছিল, হঠাৎ

এভাবে নূতন রাস্তার সন্ধান পাইয়া আবার পূর্ণ উদ্যমে বাক্স বিছানা বাঁধিতে লাগিয়া গেলাম।

নূতন দেশ দেখিবার ও নূতন মানুষের সহিত পরিচিত হইবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ দুর্দিনের পরিচিত এই সদিয়া শহর হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে মনের কোন গোপন কক্ষে যেন একটু ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম।

চৈত্র মাস শেষ হইতে তখনও কয়েকদিন বাকী আছে। আমার ডিব্রু-সদিয়া রেলওয়ের গাড়ীতে চাপিয়া লক্ষ্মীমপুর জেলার পূর্ব্ব সীমান্তমুখে রওয়ানা হইলাম।

সৈখোয়াঘাট হইতে দশ বারটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যখন মার্গারিটা ষ্টেশনে গিয়া অবতরণ করিলাম তখন বেলা প্রায় দুইটা। রাজা বাহদুরের কথামত একটু অনুসন্ধানেই একখানি নৌকা পাইলাম, এখানেও গাছ খোদাই করা দীর্ঘাকৃতির সরু নৌকা, ইহাতে চড়িয়া পার্ব্বত্য নদী 'ডিহিং'এর বুকের উপর দিয়া সাত আট মাইল গিয়া খামতি পল্লী 'ফাকিয়াল বস্তীতে' পেঁাছিতে হইবে।

দুই তীরে ঘন জংগল, নদীর পাহাড়ী বালি ধোয়া হরিদ্বর্ণের জল তীরভূমি হইতে বহু নিম্ন দিয়া তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। আমার ছইশূন্য ক্ষুদ্র নৌকাখানি উজানপথে অতি মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল, এদিকে চৈত্রের খর রৌদ্র যেন আমাকে গিলিয়া খাইবার উপক্রম করিয়াছে। আমি অপ্রশস্ত নৌকার খোলায় বসিয়া যেন যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইয়াই সূর্য্যদেবের দারুণ প্রকোপ সহ্য করিতে লাগিলাম। এ হেন সময়ে আবার আমার আসামী মাঝি উৎকট রাগিণীর সংগীতে দুই তীরের বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

সময় আর কাটিতে চায় না। নৌকায় উঠিয়া যখন মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—গন্তব্যস্থানে পেঁাছাইতে কত সময় লাগিবে? তখন সে হাসিমুখে জবাব দিয়াছিল—"চারি বজাত পাই যাম" (চারটার সময় পেঁাছে যাব)। কতক্ষণ পরে যখন উজান পথে বৈঠা ঠেলে সূর্য্যদেবের কৃপায় মাঝির সারা অংগ হইতে ঘর্ম্ম ঝরিতে লাগিল এবং আমিও হাঁটু দুইটিকে বক্ষসংলগ্ন করিয়া বসিয়া থাকিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি, তখন আর একবার জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কত দূরে হে? সে অবিচলিতকণ্ঠে এবার জবাব দিল—"গোধূলি এড়ি যাব।" (সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবে), আমি আশা করিয়াছিলাম, হয়ত শুনিতে পাইব—'এইত এসে গেছি।'

একইভাবে নিঃশব্দে বসিয়া গোধূলির অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে সূর্য্যোত্তাপ কমিয়া আসিল বটে, কিন্তু দেহের ব্যথা বাড়িয়াই চলিল। যদিও শুনিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে গন্তব্যস্থানে পেঁাছিবার সম্ভাবনা নাই, তবুও বার বারই মনে প্রশ্ন জাগিতেছিল—"আর কতদূরে", কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে আর ভরসা হইল না, আবার জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত শুনিতে পাইব "রাতি বার বাজি যাব।"

যাহা হউক, ভগবান-অনুগ্রহে সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বেই আমার ডিঙ্গাখানি 'ফাকিয়াল বস্তির' পার্শ্বে গিয়া ভিড়িল। লুংগি পরিহিতা খামতি মেয়েরা ঝকঝকে পরিষ্কার পিতলের কলসী মাথায় বসাইয়া নদীর ঘাটে দল বাঁধিয়া জল লইতে আসিয়াছে।

আমি আমার গন্তব্যস্থানের রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কাহারও কাছে কোন উত্তর পাইলাম না। কেহই আসামী ভাষা জানে না, তবে আমার কাজ হইল, বোধ হয় মঠ-পুরোহিতের নামটি তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। নিজেদের মধ্যে দুই একটি মেয়ে ঘাটেই তাহার কলসীটি নামাইয়া রাখিয়া হাতের ইসারায় আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। পাঁচ-সাত মিনিট হাঁটিয়াই আমরা গ্রামের একপ্রান্তে অবস্থিত একটি বড় টিনের ঘরের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহের ভিতর হইতে মস্তক মুণ্ডিত গৈরিকবসনধারী ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়স্ক একজন যুবককে ডাকিয়া তাহার কাছে আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া মেয়েটি প্রস্থান করিল। বুঝিলাম, ইনিই সেই মঠ-পুরোহিত যাহার কাছে আমি আসিয়াছি। খামতি রাজার দেওয়া পত্রখানি তাহার হাতে দিলাম, তিনি হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং পত্র পাঠ শেষ করিয়া আমার বিছানা-পত্র উঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ডাকাহাঁকিতে কয়েকটি গৈরিকধারী বালক কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল, সংগে সংগেই দুইটিকে আমার মাল-পত্র আনিবার জন্য নৌকায় পাঠাইয়া দিয়া তিনি আমাকে লইয়া ঘরে ঢুকিলেন।

উঁচু কাঠের মাচার উপরে গৃহ, সিঁড়ি বাহিয়া মধ্যমাকৃতির একটি হলঘরে প্রবেশ করিলাম, ঘরটি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, মেজের উপর সারা ঘরজোড়া কয়েকখানি বাঁশের চাটাই বিছান, এ ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাব নাই, হলের দুই পাশে কতকগুলি ছোট ছোট কুঠরী আছে, এগুলি নাকি মঠের ছাত্রদের বাসগৃহ। হল পার হইয়া সোজাসুজি যে ঘরটির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তাহাতে একখানি চৌকির উপরে বসান একটি কাঠের বুদ্ধমূর্ত্তি, চারিদিকে কয়েকটি চিনামাটির ফুলদানিতে ফুলের তোড়া তখনও সাজান রহিয়াছে। এই কুঠরীটির দুই পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত ছোট দুইটি কুঠরী আছে, একটিতে পুরোহিতের আস্তানা, অন্যটি কি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় জানি না, তবে সম্প্রতি আমার বাসের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইল। বাড়ীটি একাধারে বৌদ্ধ মঠ ও বিহার।

রাত্রির আহারাদির পর মঠাধ্যক্ষের সহিত বসিয়া বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল, তিনি আসামী ভালই বলিতে পারেন, বর্ম্মা ভাষায়ও অল্প অল্প জ্ঞান আছে বলিলেন। তাহাদের নিজস্ব খামতি ভাষারও একটি লেখ্যরূপ আছে, তবে ইহার নিজস্ব কোন অক্ষর নাই, বর্ম্মা হরফে লিখিত হইয়া থাকে।

(ক্রমশ)

ক্রন্দসী

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

(২০)

ফাল্গুনে পূর্ণিমার সন্ধ্যা। মন্দিরে খোল-করতালের সঙ্গে গীতস্বর ধ্বনিয়া উঠিয়াছে; "আজ কানাইয়া লালে লাল, হোলী খেলে মদনগোপাল।" ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে নর-নারী, শিশু-বালক, বৃদ্ধ-যুবা মিলিয়া বিরাট জনতা করিয়াছে। কয়েকটা খোলি মৃদুগম্ভীর নিনাদে বাজিতেছে। বিগ্রহকে আজ নববস্ত্রে ও ফুলের মালায় সুন্দররূপে সাজাইয়া বাহিরের প্রাঙ্গণে সিংহাসনোপরি রাখা হইয়াছে। হোলী-উৎসবে এখানে রাধাগোবিন্দের মন্দিরে খুব ধুম-ধাম হয়।

আকাশ প্লাবিয়া জ্যোৎস্নার স্রোত। ইভাও মেয়েদের সঙ্গে চিকের আড়ালে বসিয়া কীর্তন শুনিতেছিল। প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল সে এখানেই আছে। যাই যাই করিয়া আর কলিকাতায় যাওয়া হয় নাই। ক্রমশ এখানকার কি এক মায়া তাহাকে আদরের বন্ধনে চারিদিকে বাঁধিয়া ফেলিতেছিল। চারিপাশে অশিক্ষিত অমার্জ্জিত প্রতিবেশ। হিংসা, দ্বেষ, দলাদলি, পরশ্রীকাতরতা কিন্তু ইহারই মধ্যে যে কখন মৌসুমকে পল্লীপ্রকৃতি বর্ষার সজলতা গ্রীষ্মের স্নিগ্ধতা শরতের শান্ত-উদাস্ত-ভাব লইয়া অহরহ তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাটি-মায়ের তীব্র আকর্ষণ তাহার হৃৎস্পন্দনের অবিরাম অবিচ্ছেদ আহ্বান এই চিরকালের শহরে বাস-করা মেয়েটিকে কি জানি কি এক অদৃশ্য বন্ধনের ডোরে বাঁধিতেছিল। তাই যখনই সে মনে করে, আর নয়, এবারে দিনকতক কলিকাতায় গিয়া থাকা যাক, তখনই মনের সংকল্প মনেই থাকিতেছিল, আসলে যাইতে মন সরে নাই। কিন্তু কাল তাহাদের কলিকাতা যাত্রার সব ঠিক। যাইতেই হইবে। শশাঙ্কের ল' পরীক্ষার খবর বাহির হইয়াছে আজ পাঁচ ছয় মাস। সে বেশ ভাল করিয়াই পাশ করিয়াছে। কিন্তু এ পথ সে ত্যাগ করিয়াছে। আজ ক্রমাগত তিন-চার মাস আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া সে বাঙলা দেশের কয়েকটা বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করিয়াছে এবং স্থির করিয়াছে, ওদেশে যাইয়া কাচের কারখানায় কাজ শিখিয়া আসিয়া এখানে একটা স্বদেশী কাচের কারখানা তৈয়োরী করিবে। লণ্ঠনের চিমনি এবং আরও নানাপ্রকার অত্যাবশ্যক কাচের জিনিষপত্র তথায় প্রস্তুত হইবে। আর্থিক দিকটা সে উপেক্ষা করিতে চায় না। নিজের উপার্জ্জনের প্রতি তাহার এখন হইতেই লোভ ও আকাঙ্ক্ষার অবধি নাই, কিন্তু সে উপার্জ্জনের সহিত যেন দেশের উন্নতির একটা যোগ থাকে এই তাহার কামনা। এই সকল ব্যবস্থা শেষ করিতে দেরী হইয়া গিয়াছিল কিন্তু মার্চ্চের প্রথম সপ্তাহে যে জাহাজ ছাড়িবে এইবার তাহাতে ইউরোপ যাত্রা করিবার সকল বন্দোবস্ত সঠিক হইয়া গিয়াছে। সে বাড়ীতে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। কাল ইভাকে সঙ্গে লইয়া সে কলিকাতা যাইবে। ইভা তাহার সহিত বোম্বে পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিবে। কাল চলিয়া যাইবে বলিয়া আজ এই জ্যোৎস্না পরিপূরিত আকাশ, এই জনকোলাহল, এই মেঠো রাস্তা, এই খোল-কাঁসর-ঘণ্টার বাজনা, মন্দিরের আরতি সমস্তই ইভার কাছে আরও মধুর আরও আকর্ষণীয় বোধ হইতেছে।

ক্রমে কীর্ত্তনের রেশ থামিল, সকলে মুঠো মুঠো আবীর লইয়া বিগ্রহের পায়ে দিতে লাগিল। শেষে বিদায় হইবার আগে কীর্ত্তনীয়ারা আর একবার সমবেত হইয়া খোলে তালি দিয়া গাহিতে লাগিল,—

> আরে মোর আরে মোর গোরা দ্বিজমণি
> রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায়ে ধরণী
> রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে
> সুরধুনী-ধারা বহে অরুণ নয়নে......

শুনিতে শুনিতে ইভার মন কোন্ [illegible] দিকে চলিয়া গিয়াছিল, চোখের কোণে বুঝি ঈষৎ অশ্রুরও সঞ্চার হইয়াছিল। 'হরিবোল হরিবোল' ধ্বনির ভিতর দিয়া সভা ভাঙিল। কবে কত যুগ আগে চৈতন্য মহাপ্রভু এই ফাল্গুনে পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমের বন্যায় ভাবের বন্যায় বাঙলা দেশ ভাসিয়াছিল। আজও বুঝি এই ফাল্গুনে পূর্ণিমার রাত্রিতে সেই প্রেম-জোয়ারের অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। মেয়েরা চিকের আড়ালে বসিয়া নানা ধরণের গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। কেহ ছেলেকে স্তন্যপান করাইতেছে, কাহারও ছেলে তারস্বরে কাঁদিতেছে। তাহাদের দিকে চাহিয়া আজ ইভার রাগ হইল না। বরঞ্চ হঠাৎ সমস্ত মন কি একরকম অপূর্ব্ব করুণায় ভরিয়া গেল। আহা বেচারারা, জীবনের সমস্তটাই প্রায় একটানা অন্ধকারের মধ্যে কাটাইয়া আসিয়াছে। একদিনের জন্যও পায় নাই আলোর দেখা। এতদিন যাহাদের লইয়া অন্তরালে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছে এবং মনের ভিতর বহিয়া গেছে একটা একটানা ছি ছি রব, আজ তাহাদের কথা বড় মমতার সঙ্গে মনে উঠিতে লাগিল। সামনে একটি আঠার-উনিশ বছরের মেয়ে কোলের ছেলেটাকে চুপ করাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল, আর একটি এক বছরের ছেলে ও বছর পাঁচেকের মেয়ে পরস্পরের চুল ধরিয়া টানাটানি করিয়া ক্রন্দন কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিল। সব ছেলে-মেয়েগুলিই ঐ মেয়েটির। সে তাহাদের সমবেত চঞ্চলতায় অতিমাত্রায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু চড়চাপড় মারিয়া তাহাদের আরও কাঁদাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিতেছে না। একজন বর্ষীয়সী রুক্ষস্বরে কহিলেন, 'আঃ, ন-বৌমা ছেলেগুলোকে একটু চুপ করাও না গা। তোমাকে বাড়ীতে রেখে এলেও থাকবে না, যেখানে যাব হুজুগ করে যাবে আর জ্বালিয়ে মারবে।' প্রত্যুত্তরে ন-বৌমা কিছু বলিতে না পারিয়া হতভাগ্য ছেলেগুলাকে আরও জোরে মারিতে লাগিলেন।

ইভা ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, 'কাঁদে না ছি খুকুরাণি, কত লোক দেখছে, কেমন খোল বাজছে গান হচ্ছে কেমন।'

খুকুরাণী তাহার হাত হইতে সবলে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া নাকিসুরে বলিতে লাগিল, "ইয়াকে আমি রক্ত পড়ায়ে তবে ছাড়ব। দেখি কোন শালা ইয়াকে বাঁচায়। বাবার নাম ভুলাই দিব।"

ইভা তড়িতাহতের মত চকিত হইয়া মেয়েটির হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার চোখের সামনে তখন জ্যোৎস্না-প্লাবিত সুন্দর রাত্রি মসীকৃষ্ণ হইয়া গিয়াছে। বাহিরে কীর্ত্তনীয়ারা

তখনও কিন্তু করুণ মধুর সুরে গাহিয়া গাহিয়া প্রণাম করিতেছিল ঃ—

"মরমে লাগিল গোরা না যায় পাসরা।
নয়ানে অ[illegible]ন হৈয়া লাগি রৈল পারা॥
জলের [illegible]তর ডুবি সেথা দেখি গোরা।
ত্রিভুব[illegible] গোরাচাঁদ হৈল পারা॥"

(১১)

র[illegible] অনেক হইয়াছে। বাঁধা-ছাঁদা একরকম শেষ করিয়া ইভা শ্রান্ত হইয়া একটা চেয়ারে আসিয়া বসিল। বাইরে তখন চাঁদের আলো ফু[illegible]য়া আসিয়াছে। দূরে রাস্তা দিয়া একটা গরুর গাড়ী ধান বোঝাই লইয়া মন্থর গতিতে গ্রামান্তে চলিয়াছে। একটানা শব্দের সহিত গাড়োয়ানের মেঠো সুরের ভাঙ্গা গলার গান আসিয়া মিশিয়াছে। খোলা জানালা দিয়া ইভা চুপ করিয়া তাকাইয়াছিল। সামনেই মন্দির এবং তাহার সংলগ্ন নাটশালা দেখা যায়। আশেপাশে সেকালের আমলের ভাঙ্গা বাড়ীগুলো চাঁদের আলো ছায়াময় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোনটার ফাটলে অশত্থ গাছ গজাইয়াছে, কোনটার ইঁট খসিয়া পড়িতেছে। যে-সব মালিকেরা ঐ ভিটাতে থাকিত তাহারা কবেদিন হয় বাস তুলিয়া দিয়াছে। কেহ-বা দুই তিন পুরুষ হইতে বিদেশবাসী। বিদায়-বেলায় এই ভাঙ্গা বাড়ীর মায়া এত বড় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সে মনে মনে বিস্ময় বোধ করে। কতরাত্রি এই জানালায় বসিয়া চাঁদের আলোয় ভাঙ্গা বাড়ীর ছায়াময় রূপ দেখিয়াছে, কত অন্ধকার রাত্রিতে তারার আলো কাঁপিতেছে, ঐ শিকড় দোলান অশত্থ গাছটা মর্ম্মর শব্দ করিতেছে, তাহা উপভোগ করিয়াছে। শশাঙ্ক বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দুজনেই কিছুক্ষণ কথা না বলিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। তাহাদের দুজনের মনেই আসন্ন বিদায়ের করুণতা ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। শশাঙ্ক তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি আমাকে পৌঁছে দিয়ে কলকাতায় কিছুদিন থাকবে না সোজা এখানে আসবে আবার?'

ইভা কহিল, 'কলকাতায় মাসখানেক থাকব। অনেকদিন যাই নাই, মা বার বার লিখেছেন।'

শশাঙ্ক একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'থেক। তবে তার পরে এখানে এস। আমি ওখান থেকে ফিরে এলে কি হবে বলা যায় না। হয়ত বিলেত-ফেরত বলে তখন পল্লী-সমাজে স্থান নাও পেতে পারি। যতদিন না ফিরে আসি, ততদিন অবশ্য তুমি নিশ্চিন্তভাবে এখানে থাকতে পার। ফিরে না এলে নিশ্চিত করে ঘোঁট বাধবে না।'

ইভা একটুখানি উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'তুমি দেশের সেবা করবে দেশের উন্নতি করবে বলে এত করছ, অথচ সেই তোমারই স্থান হবে না এখানে! কেন হবে না? তুমি ত আর কিছু অন্যায় করতে যাচ্ছ না।'

শশাঙ্ক ঈষৎ হাসিয়া কহিল, 'ছেলেমানুষের মত কথা বলছ যে। কেন জান না কি, যারাই সাধারণ পথ ছেড়ে চিন্তা কার্য্য বা যে-কোনভাবেই হোক আপন আদর্শ অনুযায়ী চলতে চায় তাদের সহ্য করতে হয় অনেক।'

ইভা বলিল, 'থাক, এখন থেকেই আর তোমাকে নিরাশার কথা শোনাতে হবে না। আমি কলকাতায় দিন পনের বা বড়-জোর মাসখানেক থেকেই আবার এখানে চলে আসব। এখানে আমার কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। এঁদের সুখ-দুঃখ খুঁটি-নাটিতে এত জড়িয়ে গেছি যে মনে পড়লে নিজেরই এক এক সময় অবাক লাগে। কলকাতায় অল্পদিন থাকতেও বড় একটা ইচ্ছা করে না।'

বাইরে ঝি ডাকিতেছিল, 'বৌদি, একবার ও-বাড়ীর ইন্দু-দিদি আপনাকে ডেকেছেন। দেখা করবেন। আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন ভাই শুনে আমাকে বললেন, একবার ডেকে আন দেখা করি। তাঁর সোয়ামীর বড় ব্যায়রাম। তিনি ত আসতে পারবেন না।'

শশাঙ্ক বলিল, 'হ্যাঁ, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, ইন্দুর স্বামীর বড় অসুখ। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, নিউমোনিয়ায় দাঁড়িয়াছে। আজ শহর থেকে ডাক্তার এসে বলে গেছে। শুনে অবধি মনটা খারাপ আছে।'

ইভা যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'কই আমি ত জানতাম না। আজ সন্ধ্যেতেও কীর্ত্তনের জায়গায় সবাই বলাবলি করছিল, ইন্দুর স্বামীর একটু অসুখের মত হয়েছে তাই সে আসতে পারে নি, এর বেশী যে কিছু তা শুনতে পাই নাই।'

শশাঙ্ক বলিল, 'দেখে এস। তোমাকে দেখলে ইন্দু বেচারা বোধ হয় একটু ভরসা পাবে।'

ঝিয়ের সঙ্গে ইন্দুদের বাড়ীতে আসিয়া ইভা পাশের ঘরে বসিল। ইন্দু তাহার স্বামীকে মালিশ দিতেছিল। কিছু-কাল পর হাত ধুইয়া এ ঘরে আসিল। তাহার দীন চেহারা দেখিয়া ইভা দুঃখ পাইল।

ইন্দিরা তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'ভাই, শুনলাম নাকি তুমিও চলে যাচ্ছ। এদিকে আমার ত এই বিপদ। তুমি চলে যাবে শুনে অবধি আরও ভয় করছে।'

যেদিন হইতে রাঁধুনী হেমশশীর গল্প শুনিয়াছিল, সেদিন হইতে ইন্দিরার স্বামীর উপর ইভার অত্যন্ত একটা বিতৃষ্ণার সঞ্চার হইয়াছিল। যে ভদ্রলোক হীন লোকের মত সামান্য বেতন-ভোগী একটা রাঁধুনীর সহিত ইতরতা করিতে যায়, তাহার জন্য আজ তাহার স্ত্রীর দীনতা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ইন্দুর শুষ্ক মুখ এবং পাণ্ডুর চোখের দিকে চাহিয়া আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, 'ভয় কিসের, চিকিৎসার ভালো বন্দোবস্ত হ'লে অসুখ সারতে কতক্ষণই বা লাগে। ডাক্তার দেখে কি বলে গেলেন?'

এদিক ওদিক চাহিয়া কেহ শুনিতে পায় কি না দেখিয়া লইয়া ইন্দু ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, 'ডাক্তার বলে গেছেন চারিদিক খুলে দিতে, যেন একটুও বন্ধ না থাকে। খোলা হওয়ার নাকি খুবই দরকার। কিন্তু আমার শাশুড়ী ডাক্তারের সাতপুরুষের শ্রাদ্ধ করতে করতে চারিদিক এঁটে বন্ধ করে খুব কয়লার আগুন করছেন আর সেঁক দিচ্ছেন। কাঠ-কয়লার ধোঁয়াতে ঘর ভরে গেছে।'

ইভা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল ওঘরে যাই। আম

নিজের হাতে সমস্ত জানালা টান মেরে খুলে দেব। দেখি তোমার শাশুড়ী কি করতে পারেন।'

ইন্দু সভয়ে কহিল, 'না ভাই ওসব করতে যেওনা। উনি কাউকে খাতির করে কথা বলেন না, এখনই হয়তো তোমাকেও যা মুখে আসে শুনিয়ে দেবেন।'

'তা হোক, তাই বলে এ অবস্থায় চুপ করে থাকা যায় না।' —বলিয়া ইভা পাশের ঘরে গেল। রোগীর ঘরে কাঠ-কয়লার দুর্গন্ধ ছাড়িতেছিল। সমস্ত দুয়ার জানালা বন্ধ। সে আস্তে আস্তে সামনের দুয়ারটা বাদ দিয়া সমস্ত আশ-পাশের জানালাগুলি খুলিয়া দিল। ইন্দুর শাশুড়ী শিয়রের কাছে বসিয়াছিলেন, তিনি হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, 'ওকি কর বাছা! ঘনশ্যামের সর্দ্দি নিয়েই অসুখ। এতটুকু ঠাণ্ডা লেগেছে কি অমনি মুস্কিল। দোরের ফুটোগুলি অবধি আমি ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কম কষ্টে বন্ধ করিনি। তোমরা আজকালকার মেয়ে কিছুই মান না। ঘরে এসে অমনই দড়াম করে দোর, জানালা দিলে সব খুলে।'

ঘনশ্যাম,—ইন্দুর স্বামী শয্যা হইতে অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া উঠিলেন, ওগো, শুনছো তোমার বৌদিকে বলো জানালা বন্ধ করে দিতে। আমার ভারি শীত করছে উহুহু! কোত্থেকে এত ঠাণ্ডা বাতাস আসছে যে হাড়ের ভিতর শুদ্ধ কাঁপন ধরছে।'

পুত্রবৎসলা মাতা এবারে আর শুধু কথায় সময়ক্ষেপ না করিয়া নিজেই মিলিটারী ভঙ্গীতে উঠিয়া সশব্দে প্রত্যেকটি জানালা দরজা আঁটিয়া বন্ধ করিলেন এবং রূঢ় স্বরে কহিলেন, 'তোমরা ওঘরে যেয়ে বসগে বাছা। রোগীর ঘরে গণ্ডগোল কর না।'

ইভা আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, 'আপনি বৃথা ভয় পাচ্ছেন কেন, ডাক্তারের উপর চিকিৎসার ভার দিয়েছেন, তাঁর উপরেই নির্ভর করে থাকুন না কেন। তিনি যা বলেছেন সর্বদিক দিয়ে তাই মেনে চলুন।'

ক্ষণদাময়ী ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'ডাক্তারে দেখছে দেখুক, তাই বলে ডাক্তারের কথা শুনে ছেলেকে আমার মেরে ফেলব না কি!'

অযথা বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া ইভা সেখান হইতে চলিয়া আসিল। গৃহান্তরে আসিয়া ইন্দুর নিকট একটু একটু করিয়া রোগের কাহিনী চিকিৎসার বিবরণ জানিয়া লইয়া বলিল, যতটা সম্ভব সাবধান থেক ভাই। ওঁকে—তোমার ঐ শাশুড়ীকে যতটা পার ঠেকিও। আমার তো না গেলেই নয়। ওঁর জাহাজ এই সপ্তাহেই ছাড়বে। কাল না রওয়ানা হ'লে ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারা যাবে না।'

ইন্দু ছলছল চোখে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'তাও তো বটে, আমার জন্যে তুমি আর কত আটকা থাকবে। এই সারাদিন অবিশ্রান্ত খাটুনি, রান্না থেকে আরম্ভ করে সংসারের সমস্ত কাজ একা হাতে, তারপর রোগীর পথ্যি সেঁক-তাপ। মিনিটে মিনিটে গরম জল তৈরী, সারাদিন নিশ্বাস ফেলবারও অবসর থাকে না, কি[illegible] তবু যদি একটু ভরসা পেতাম। মুখের দিকে তাকাবা[illegible] নেই ভাই। সামান্য কিছু হ'লেই শাশুড়ী ছুটে গর্জ্জন করে আসছেন। আর উনিও অসুখে ভুগে ভুগে আরও খিটখিটে [illegible]জের হয়ে গেছেন। তার উপর মায়ে ছে[illegible] পরামর্শ করে আজ থেকে আবার হেমশশীকে ডাকিয়েছে। এবারে এসে সে রাঁধুনীর পদ আর নেয়নি, এবারে [illegible] বেড়েছে। বাবুকে সেঁক দিচ্ছে, মাথায় বাতাস দিচ্ছে। রোগীর ঘরেই চব্বিশ ঘণ্টা আছে। এখনও ছিল, এই তুমি আসবার কিছুক্ষণ আগে বুঝি কাপড় ছেড়ে মালা করতে গেছে।'

শুনিতে শুনিতে ইভার চোখমুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। শাশুড়ী ও বৌয়ের চিরাচরিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঝগড়া, কত বইয়ে কত গল্প উপন্যাসে পড়িয়াছে। নিজের চোখেও কিছু কিছু দেখিয়াছে কানে শুনিয়াছে। কিন্তু তাহার এই উলঙ্গ বীভৎস রূপে একেবারে চোখের সামনে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। বৌয়ের উপর বিদ্বেষবশত ক্ষণদাময়ী সেই ভ্রষ্টা মেয়েটাকে আবার আস্ত করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছেন। এত বড় সাংঘাতিক কথাটা তিনি নিজের কাছে বা পরের কাছে স্বীকার পান বা নাই পান তাঁর ভিতরের উদ্দেশ্যটা ইভার কাছে একেবারে জলের মত পরিষ্কার হইয়া দেখা দিল। সে এবারে কিন্তু তাহার চেয়েও আশ্চর্য্য হইল যখন ইন্দু জলভরা চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আকুল প্রার্থনার সুরে কহিল, 'যা ইচ্ছে করুন ভাই, এখন ভগবান একবার মুখ তুলে চেয়ে ওঁকে সারিয়ে দিন। আর আমার অন্য কামনা নাই।

হঠাৎ ইভার মনে পড়িয়া গেল রেবার কথা। রেবা একেবারে হেড্ মিস্ট্রেসের চাকরির জন্য দরখাস্ত মঞ্জুর খবর পাইয়া কলিকাতায় তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। এক বছর দেড় বছর কোর্টশীপ অন্তে তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তর সহে নাই। স্বামীর সহিত কি কারণে তাহার আইডিয়া মেলে নাই, মতভেদ হইয়াছিল। আত্মসম্ভ্রমে লাগিয়াছিল যা অমনি এই ব্যবস্থা। রেবাকে ভাল বলিবে না ইন্দুর এই অসাধারণ ক্ষমাকে ভাল বলিবে ইভা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ইন্দুকে এক সময় মহিমময়ী মনে হয়, আবার পর মুহূর্ত্তে মনে হয় একটা অনন্ধভয়ে যেন সে অন্যায়ের পদতলে নিজেকে সমর্পণ করিতেছে। ইহা যেন একই কালে তাহাকে অত্যন্ত বড় অথচ বড় হীন করিয়াছে। সেখান হইতে অনেকটা উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ইন্দুর কাছে বিদায় লইয়া সে চলিয়া আসিল। (ক্রমশ)

কথাসাহিত্য ও রাজনীতি

শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিস্থিতির বিষয় চিন্তা করিলে হয়ত অনেকের নিকট সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা অল্পবিস্তর অপ্রাসঙ্গিক মনে হইবে, সন্দেহ নাই; তবুও সংস্কৃতির তুলাদণ্ডে মানুষকে বিচার করিতে বসিয়া যখন তাহার জীবনের শেষ শিখাটি পর্য্যন্ত জ্ঞানের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত দেখিতে ইচ্ছা করি, তখন সাহিত্যকে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়গুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গালোচনায় নেহাৎই অবান্তর বলিয়া উপেক্ষা [illegible]কে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই সমীচীন আখ্যা দিতে পারেন না। কারণ সাহিত্য ও কলাশিল্প জাতীয় জীবনের সংস্কৃতির সাক্ষী—অতীতের গৌরবের রূপরশ্মিজাল—সম্ভা[illegible] মূর্ত্ত বিগ্রহ ও আশা— অনুপ্রেরণার কেন্দ্রগামিনী শক্তি।

কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, সাহিত্য শুধু "Art for Art's Sake" এবং যাঁহারা এই বাণীকে সাহিত্যের কষ্টিপাথর বলিয়া স্বীকার করেন না তাঁহাদের ভাষায় সাহিত্যের ভিত্তি মতবাদের উপর এবং মতবাদের মধ্য দিয়া সাহিত্য সুষ্ঠুভাব লইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে সাহিত্যে মতবাদ প্রকাশ কখনও চিরন্তন নয়; কারণ, আজ হয়ত সামাজিক দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে ধনী যাহারা—অর্থ আছে যাহাদের (এখন সুখে দিন যাপন করিতেছে দেখিয়া) আমরা যে সাহিত্যে, সেই রীতির ও নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইব বলিয়া সৃষ্টি করি, তাহা হয়ত মহাকালের গতিপথে আজ হোক কিংবা কাল হোক—একদিন সংহৃত হইয়া আসিবে। মানুষের জীবন গতিশীল। যেখানে মানুষের জীবনকে রূপায়িত করা হয়, তাহা কালের অনুশাসনে সুখ-দুঃখের প্রাবল্যে ক্রমশই পরিবর্ত্তনের দিকে অগ্রসর হয়। সেই পরিবর্ত্তন কখনও সম্মুখে এবং কখনও পশ্চাতে। সেই দিক দিয়া সাহিত্যে মতবাদের সঙ্গে 'সৌন্দর্য্য সৃষ্টির' কথাটাকে তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে, অর্থাৎ চিরন্তনের মাপকাঠিতে সাহিত্য বিচার করিলে 'সৌন্দর্য্য সৃষ্টির' কথাটাই প্রবল অনুভূত হয়। কারণ মানুষ চিরদিনই সৌন্দর্য্যের পূজারী। যাহা কিছু সুন্দর, মানুষের চোখে তাহা চিরন্তন। তাই কোথায় 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' এক বিরহী বেদনার পরিকল্পনায় কবি কালিদাস 'মেঘদূত'-এর অবতারণ করিয়াছেন, আর সেই হইতে আজ পর্য্যন্তও তাহা ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে যে বেদনাবিহ্বল শিহরণ জাগায়, তাহা সৌন্দর্য্যের দেবালয়ে আজও সত্য সত্যই অমর।

তাই বলিয়া সাহিত্যে 'সৌন্দর্য্য সৃষ্টি' ও 'মতবাদ' এই দুইটিকে ভিন্ন করিয়া দেখা যায় না। কারণ একটিকে বাদ দিলে অন্যটির অস্তিত্ব vague বা অবান্তর হইয়া যায়। মতবাদ ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সম্বন্ধ যেন নদী ও জলের সম্বন্ধ। কোনটির প্রয়োজন বেশী তাহা স্থান ও কাল বিশেষে বিবেচ্য। কারণ, যে নায়ক ও নায়িকাকে লইয়া ঘটনা সমন্বয়ে কথা সাহিত্য সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে তাহাদের জীবনরূপ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে মতবাদ হইতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি বড় জিনিষ কিংবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইতে মতবাদ বড়—এইরূপ যাহা কিছু একটা হয়ত হইতে পারে; কিন্তু একটিকে বাদ দিয়া অপরটির প্রকাশ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কারণ, কেবল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি বা কেবল মতবাদই সাহিত্য নয়। এক কথায় তাহাদের অভিন্নতাকে অস্বীকার করা যায় না এবং তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন আওতায় প্রকাশ দিতে চেষ্টা করিলে সাহিত্য পঙ্গু হইয়া যায়।

সেই মতবাদের দৃষ্টিতে সাহিত্যকে দেখিতে গেলে, সাহিত্য ও রাজনীতির সম্বন্ধ সম্পর্কে আলোচনার কথা উঠে। রাজনীতি ও সাহিত্যের সম্বন্ধ খুব নিকটতর না হইলেও একটি দ্বারা অন্যটি আকৃষ্ট হয়।

তাই আজকাল আমাদের দেশে ধুয়া উঠিয়াছে যে, 'প্রগতি সাহিত্য' চাই! প্রগতি সাহিত্য জিনষটা কি জিজ্ঞাসা করিলে যাহারা এই মতের পৃষ্ঠপোষক তাহারা বলিয়া থাকেন—"Progressive Literature" অর্থটি আরও কঠিন হইল। কারণ, Progressive কথাটা vague অথবা আরও সহজ করিয়া বলিতে গেলে 'relative'। আমি যাহা 'Progressive' বলিতেছি, তাহা হয়ত অনেকের নিকট 'regressive' ভাব লইয়া প্রকাশ পায়। তবু সাহিত্য ও রাজনীতির সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে জিনিষটার দোষ-গুণ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

পৃথিবী এক সময় একপ্রকার চিন্তা দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়। এককালে ছিল গণতন্ত্রের যুগ; এখন যে একেবারে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে তাহা বলিতেছি না। তবু সম্যক্ সত্যকে স্বীকার করিতে গেলে বলিতে হয়, যে পৃথিবী একদিন "To make the world safe for democracy" এ বাণী দ্বারা জাগ্রত হইয়া সভ্যতার বিরাট ধ্বংসস্তূপের শিথিল স্পর্শ অনুভব করিয়াছিল, সেই পৃথিবী হইতে আজ ফ্যাসিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচেষ্টায় সেই মতবাদ নির্ব্বাসন পাইতে বসিয়াছে এবং পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকাইলে একথা নেহাৎই অবান্তর ভাব পোষণ করে না যে, হয়ত এমন দিন আসিয়াছে যখন গণতন্ত্রের ভাব প্রতিষ্ঠা অনেকটা হইয়া গিয়াছে অলীক; তাহার অতীতের ক্ষীণ স্বপ্ন জর্জ্জরিত আবেশ এখনও পৃথিবী কাটাইতে পারে নাই। তাই আজও যেন মনে হয় "Amidst the olive branches bayonets still gleam; thorns greater than ever." সেই গণতন্ত্রের যুগে গণতন্ত্রের ছাপ সাহিত্যে অনেক সময় বেশ বাস্তব হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু আজ রুশিয়ার রীতিতে পরিপুষ্ট হইয়া সমাজতন্ত্রের ঢেউ কম বেশী পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই লাগিতেছে। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় দৈনিক পত্রিকাগুলিতে—প্রতিদিন প্রকাশিত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কারখানার কর্ম্মচারীদের বিক্ষোভপ্রসূত strike প্রভৃতি হইতে। এক কথায় KarlMarx নূতন জীবন লাভ করিয়া বিশ্বময় যেন সেই class struggle-এর বাণী ছড়াইয়া দিতেছে। সেই সমাজতন্ত্রের ঢেউ পরাধীন ভারতবর্ষের শৃঙ্খলিত বক্ষোপরেও আসিয়া লাগিয়াছে। সুতরাং তাহার সাহিত্যে সেই মতবাদ প্রকাশ পাইবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। কারণ, সাহিত্য অনেক সময় অনুপ্রেরণা পায় জাতীয় জীবনধারার চিন্তাধারা হইতে।

ভারতবর্ষে যে সকল প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য আছে তাহাদের মধ্যে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য শ্রেষ্ঠ। তাই বাঙলা ভাষায় এবং সাহিত্যেও সেই প্রভাব বিস্তারের জন্য একদল লোক ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মুখে ও লেখায় সেই একই ভাব প্রকাশ পাইতে চলিয়াছে যে 'প্রগতি সাহিত্য' চাই। এই কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে সাহিত্যে জনসাধারণের সুখ-দুঃখের ইতিহাস অপরাধের নহে। কারণ কেবল যদি ধনী মনোবৃত্তি হইতে প্রসূত হইয়া ধনীদিগের লীলা কমলে সাহিত্য নিয়তই প্রকাশ পায়, অথচ সমাজে যাহারা পদদলিত, অবজ্ঞাত অবহেলিত—যাহারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া, সংসারের বৃহৎ সুখ এবং বৃহৎ দুঃখ হইতে অনেক দূরে থাকিয়া, দুঃখের ভিতর জন্ম ও দুঃখের ভিতরই মৃত্যুর আহ্বানে চলিয়া যাইতেছে, সাহিত্যে তাহাদের এতটুকু সুখ-দুঃখ গাথা প্রকাশ পাইল না—বিশ্ব জানিল না, তাহা হইলে সাহিত্য এক শ্রেণীর লোকের নিকট আদর্শানুভূতিসম্পন্ন হইলেও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, পঙ্গু হইয়া যায়। ম্যাক্সিম্ গোর্কি এই জনসাধারণের সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রবুদ্ধ হইয়া আঁকিয়াছিলেন মাতৃচরিত্র এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জনসাধারণের এক বিরাট ইতিবৃত্ত।

কিন্তু কথা হইতেছে এইখানে যে, সাহিত্যকে কখনও জোর করিয়া সৃষ্টি করা যায় না। সাহিত্যে আছে একটি spontaneity—অবাধগতি। যেখানেই তাহাকে কোন কিছু একটা জোর করিয়া গড়িবার প্রয়াসে অনুপ্রাণিত করা হইতেছে, সেখানে সাহিত্যের মূলমন্ত্র ব্যাহত হইতেছে। সাহিত্য তখনই রাজনীতির আওতায় গড়িয়া উঠে, যখন কোন পরিপক্ক মতপ্রকাশ সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়া ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট ঐ জিনিষটার সত্যতা প্রকাশ করিয়া দিতেছে এবং সমগ্র দেশ ঐ প্রকার চিন্তাধারার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। কয়েকটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক। আমেরিকায় যে অন্তর্বিপ্লব হইয়াছিল তাহার পশ্চাতে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে একটি মাত্র পুস্তক; তাহার নাম 'Uncle Tom's Cabin.' ক্রীতদাসের দুঃখপূর্ণ জীবনকে সুন্দর করিবার জন্যই সেই আত্মাহুতির বিরাট অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। এমন কি অ্যারিশ মারিয়া রেমার্কের "All Quiet on the Western Front" ও "Road Back" পুস্তক দুইটি মানুষকে এক বীভৎস সত্যের নিকট আসিবার অবকাশ দিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর মানুষের দেহে ও মনে যে অবসাদ আসিয়াছিল, তাহার লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছিল এমন কিছুর দিকে যাহা তাহাকে শিখাইবার উপায় দিবে যুদ্ধের হৃদয়ভেদী হাহাকারের ফলাফল। তাই ঐ পুস্তক দুইটির উপর পৃথিবীর জনসাধারণের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

সেই দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে সাহিত্য ও রাজনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও আত্মীয়তাপূর্ণ। একটি ছাড়া অন্যটি সুষ্ঠু হইয়া প্রকাশ পাইতে অক্ষম। তবে, সাহিত্যে রাজনীতির ঢেউ যতটা না প্রবল আকার ধারণ করে, দেশীয় রাজনীতি সাহিত্যের influence তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। কারণ, সাহিত্য রাজনীতিকে বাদ দিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু দেশীয় রাজনীতিকে সর্ব্বদা জাগ্রত এবং প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে সাহিত্য অন্যতম।

তাই বলিতেছি যে, যাহারা আজ বাঙলা সাহিত্যে প্রগতি সাহিত্যের নাম দিয়া একটা . . কিছু করাকেই অত্যন্ত বড় রকমের কিছু করা ভাবে, তাহাদের ঠাট্টা করিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সাহিত্যে দ . . ষকের কাস্তে ও হাতুড়ীর রূপ প্রকাশ পা . . বুঁ জনসাধারণকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে শিক্ষিতগণ ব্যস্ত তৎপর হইয়া উঠুক, ইহাই কাম্য; কিন্তু তাই বলিয়া যেন 'হাতুড়ে' না হইয়া যায়।

কথাসাহিত্যে রাজনীতি ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাইয়া সমগ্র জাতিকে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' করিয়া তুলুক ইহাই কাম্য; কিন্তু আতিশয্যকে বড় করিতে গিয়া মূলমন্ত্র হইতে যেন বিচ্যুতি না ঘটে। শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যে যথেষ্ট মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেইগুলি মানব জীবন পরিকল্পনায় সুখ দুঃখের আনন্দরূপামৃতম্-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'পল্লীসমাজ' পুস্তকে পল্লী সংস্কারের যে মতবাদ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কম বড় রাজনীতি নয়।

এক কথায় সাহিত্যে যে রাজনৈতিক আবহাওয়ার বিকাশ লাভ করিবে তাহা যেন সংযমের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। যেমন তেমন একটা কিছুর 'সমাপ্তি' 'সৃষ্টি' (creation) নয়; বস্তুত সেই creative talent বা সৃষ্টির প্রতিভা থাকা চাই। তাহা না হইলে যে কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার দোষগুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে যে মতবাদ প্রকাশ পায় তাহা "Propaganda Literature" উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য নামে পরিগণিত হয়।

তাই বলি জোর করিয়া সাহিত্য গড়া চলে না। সাহিত্য গড়িতে হইলে creative genius বা সৃজনী প্রতিভা থাকা চাই। "Poets are born not made" তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কে কবি ও কে সাহিত্যিক তাহা কি ভাবে বিচার্য্য? এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, ভাষা ও সাহিত্যের বিধি ব্যবস্থা অনুকরণ করিয়া প্রত্যেক কবি ও সাহিত্যিকের নূতনকে গড়িবার প্রয়াসে সচেষ্ট থাকা উচিত। তাহা হইলে প্রতিভা বিচারের অসুবিধা নষ্ট হইয়া যায়। পুরাতনের ভিত্তিতে নূতনকে গড়িবার প্রয়াসই প্রকৃত সৃষ্টি।

তাই আজ বাঙলার নব জাগরণের দিনে তরুণদিগের অন্যতম হিসাবে এই আশা করিতে পারি যে, বাঙলা কথা-সাহিত্যের আওতায় দেশীয় রাজনীতি গড়িয়া উঠুক—মুক্তির অপূর্ব্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হোক সমগ্র ভারতবাসী; পুণ্যসলিলা মন্দাকিনীর ন্যায় সমস্ত স্খলনকে নূতন জীবন আলোক-সম্পাতে বঙ্গভূমিকে সত্যসত্যই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামল করিয়া তুলুক—ইহাই কাম্য, ইহাই প্রার্থনা।

মাতঙ্গিনীর মৃত্যুকামনা

(গল্প)

প্রফুল্ল দেব

গ্রামের একপ্রান্তে একখানা করগেটের একচালা; বাঁশঝোপের পাশ দিয়ে দেখা যায়; মাতঙ্গিনী বুড়ীর বাড়ী। তিনকুলে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই। বয়স ষাটের উপরে; কিন্তু বুড়ী নাম কিনিয়াছে সে আজ বিশ বচ্ছর। যে-কোন রূঢ় ভাষায় যতক্ষণই না কেন মাতঙ্গিনীকে তিরস্কার কর সে ... ফিরিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিবে না। কিন্তু "বুড়ী" বলিয়া একবার তাহাকে সম্বোধন করিলেই আর রক্ষা নাই। তাহার মুখের সামনে দাঁড়াইয়া কথা বলিবে কাহার সাধ্য ... বাছা বাছা গালভরা বুকনি যাহা সে জানে একটাও বাদ দেয় না। বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনর্গল বকিয়াও তাহার রাগ পড়ে না। শেষটায় অঙ্গভঙ্গী সহকারে এমন স্পর্দ্ধিত বক্তার নানাপ্রকারে ধরাধাম হইতে তিরোধানের ইঙ্গিত করিতে থাকে। রায়দের হাবুলের উপরই ছিল সে সব-চেয়ে বেশী চটা। থোকায় থোকায় পেয়ারাগুলি গাছে পাকিয়া থাকে, ইঁদুরে-বাঁদরে খাইয়া যায়, সহ্য হয় কি করিয়া! কিন্তু একটি ধরিতে গেলে বুড়ী রি রি করিয়া ছুটিয়া আসে। সেই জন্য উপায়হীন হাবুল যখন বৃক্ষের মালিকের তাড়ায় শূন্য হাতে ফিরিতে বাধ্য হয় তখন "বুড়ী তোর মুখে কুড় হোক! কুড় হোক!" ইত্যাদি বলিয়া দেয় ছুট। আর যায় কোথায়? ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার জের চলিতে থাকে। সেই পথ দিয়া যে একবার আসে তাহাকেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া একবার নালিশ শুনিতে হয়।

পাড়ায় মাতঙ্গিনীর আদরও ছিল। ধানভানা চিঁড়ে-কোটার সময় অযাচিতভাবে তাহার সাহায্য মিলিত। অবশ্য ফিরিবার সময় ক্ষুদ-কুঁড়াটা আঁচলে না বাঁধিয়া সে ফিরিত না। রোজ সন্ধ্যার পরে তেলের প্রদীপটি জ্বালিয়া সে অতিজীর্ণ একখানি রামায়ণ ভাঙ্গা-গলায় সুর করিয়া পড়িত। হয়ত বা কোনদিন একফোঁটা জল তাহার শুষ্ক গালের উপর গড়াইয়া পড়িয়া চিক্‌চিক্ করিতে থাকিত।

সেদিনকার কথা কেউ ভোলে নাই। হার্টফেল করিয়া স্বামীর মৃত্যু হইল। তখন মাতঙ্গিনীর বয়স ত্রিশের বেশী নয়। সে কি বিষম অবস্থা! একবার সে স্বামীর পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়ে, একবার জলে ঝাঁপ দিতে যায়, আবার আগুনে পুড়িয়া মরিতে চায়। অবশেষে সে স্থির করিল—সহমরণে যাইবে। গাঁয়ের সধবা স্ত্রীলোকগণ যাহারা মাতঙ্গিনীর উপস্থিত নিদারুণ সর্ব্বনাশে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছিল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পঞ্চমুখে তাহার প্রশংসা করিতেছিল; হঠাৎ তাহাদের অভিভাবকেরা তাহাদের উপর মারমুখো হইয়া পড়িল এবং যে যার বাড়ীর লোককে তাড়াইয়া গৃহে লইয়া আসিল। কেবল কতকগুলি দুষ্ট ছেলেমেয়ে কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ গা ঢাকা দিয়া থাকিয়া আবার আসিল এবং একটা নূতন দৃশ্য দেখিবার উদগ্র আগ্রহে সমস্তটা দুপুরের রৌদ্র মাথায় নিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল।

সদ্য বিধবার পার্শ্বে বসিয়া সান্ত্বনা দিতেছিল কেবলমাত্র ওপাড়ার সুরবালা। সাত বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছে সে, আজ বয়স চল্লিশের উপরে।

সে কহিল "সঙ্গে যেতে চাচ্ছিস্, তা যাবি। কিন্তু তার নরকের নিমিত্ত ত হতে পারিস্ না। তুই না থাকলে কে তাঁর পিণ্ড দেবে? শ্রাদ্ধাদি হয়ে যাক, তারপর যা হয় করিস্।"

সুরবালার যুক্তি একেবারে ফেলিবার নয়। ইহা মাতঙ্গিনীর মনে দ্রুত-ক্রিয়া সুরু করিল। মাতঙ্গিনী চিন্তা করিল "সত্যই ত! সুরোদি ঠিক কথাই বলেছে। তাঁর স্বর্গারোহণের একটা ব্যবস্থা না করে আমি ত যেতে পারিনে। আগে তাঁর আত্মার সদ্গতি করে নি তারপর তাঁর উদ্দেশ্যে রওনা হব। তা না হলে তিনি রাগ করবেন। নরকে বাস করতে তাঁর কষ্ট হবে যে! আমি-ই-বা নরকে থাকব কি করে!" বারবার সেই কথাগুলি সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চিন্তা করিল। এবং অবশেষে সুরবালার প্রস্তাবে রাজী হওয়া ছাড়া উপায় দেখিল না। তাহার হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল "যা' হয় কর দিদি! আমার এখন মাথা ঠিক নাই।"

প্রেতঃকৃত্য হইয়া গেল। হাবুলের চর একদিন ঘুরিয়া দেখিয়া গেল বুড়ী মরিয়াছে কিনা। তা হলে সেই বায়াসে আমগুলো—কিন্তু না! বছরটিকও শেষ হইয়া গেল। মাতঙ্গিনীর মৃত্যুর আয়োজনের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। এমন সময় একদিন তাহার হাতের উপর একটা ফোড়া হইল। অসহ্য যন্ত্রণা! মাতঙ্গিনীর চীৎকারে পাড়ায় কান পাতিবার জো' নাই। মেয়ে-পুরুষ সকলেই বলাবলি সুরু করিল—"এ ফোড়া নয়! ফোড়া নয়! ওর কাল! সেই পাঠিয়েছে। ওর সময় হয়ে গেছে।" মাতঙ্গিনী যাহাকে দেখে তাহাকেই কাকুতি মিনতি করে,—"বাবা! যেতে ত হবেই! তিনি গিয়াছেন! আমি কি থাকতে পারি! আমিও যাব! সে যাওয়া ত সুখের যাওয়া। কিন্তু কষ্ট পেয়ে যেয়ে কি লাভ! একটা ছুরি দিয়ে তোরা আমার ফোড়াটা একটু ছাড়িয়ে দে। আর কষ্ট সহ্য হয় না।" নিকুঞ্জ ডাক্তারকে মাতঙ্গিনী কিছুতেই ছাড়িল না। তিনি তাঁহার পুরাতন ছুরিখানি একখানা শ্লেটে ধার দিয়া অস্ত্রোপচার করিতে বাধ্য হইলেন। মাতঙ্গিনী ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিল। ডাক্তারবাবু পূর্ব্বেই জানিতেন এখানে কিছু মিলিবে না, তবু-ও তিনি চাহিলেন। মাতঙ্গিনী চোখের জল ছাড়িয়া দিল। কিছু দিবার সাধ্যও ছিল না মাতঙ্গিনীর। অবশ্য একসময় ছিল তখন তাহাদের অবস্থাই ছিল গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বর্দ্ধিষ্ণু! তাহার শ্বশুর মহাশয় দশ হাজার টাকার মহলের নায়েবী করিয়া দেদার টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। মাতঙ্গিনী যখন এই গৃহে পদার্পণ করে, তখন তাহার মর্য্যাদার স্রোতে ভাসিয়া কিছু অর্থ তাহার পিতার সিন্ধুকে যাইয়া উঠে। বিবাহের পর হইতে তাহার ঠাকুরমা তাহাকে ডাকিতেন "পাঁচহাজারী লক্ষ্মী" বলিয়া। তারপর নিজের জীবনে মাতঙ্গিনী পর পর পাঁচটি মেয়ের বিবাহ দিল। মৌলিকের মেয়ে! খরচ ত কিছু হইলই! বাকী যা' রহিল তাহা হইতেই চলিত সংসার খরচ।

অবশেষে স্বামীর যখন মৃত্যু হইল তখন সম্বল রহিল মাত্র একখানা টিনের একচালা। মেয়েদের একটিও আর ইহজগতে নাই।

বছরের পর বছর গড়াইয়া যায়। কাহারও মুখে মাতঙ্গিনী সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ পায় না। আর দশজনের মত মাতঙ্গিনীও নিত্য নিরামিষ খায়, রাত্রে মাছমাংসের ভূরিভোজের স্বপ্ন দেখে আর সকালবেলা ব্রাহ্মণকে "ভুজ্যি" দিয়া পাপ ক্ষালন করে। মাঝে মাঝে গাঁয়ে যখন কেহ মারা যায় অথবা ভিন্ন গ্রাম হইতে কাহারও মৃত্যু সংবাদ আসে, মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে,—"এইত আমারও সময় হয়ে এসেছে! আর কতদিন! তাঁকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি। আমারও দিন এল বলে। আর কতদিন!" তাহার চোখের কোণে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু দেখা দেয়। আরও দিন কাটে।

বিকেলবেলা বিশ্বাস বাড়ীতে তাহাদের মেজবৌ তালের বড়া ভাজিতেছিল। গন্ধে চারিদিক ভরপুর। মাতঙ্গিনী ঘরে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিল। গন্ধটা নাকে যাইতেই সে মাথা উঁচু করিয়া ঠাহর করিল মিষ্টি গন্ধটা কোনদিক হইতে আসিতেছে। তারপর আস্তে আস্তে কাঁথাখানা তুলিয়া রাখিল এবং ঘরের দরজা আঁটিয়া দিয়া সেই গন্ধ লক্ষ্য করিয়া পা বাড়াইল। এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সে অবশেষে বিশ্বাস বাড়ীর রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া থামিল এবং বলিতে সুরু করিল,—"তিনি চলে গেছেন! আর কি আমি থাকতে পারি! আমারও সময় হয়ে এসেছে! আর ক'দিন বা বাঁচব!—ওকি করছিস্ বৌ!" বলিয়াই সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল সেইদিকে। দেখিল সব, বুঝিলও কি হইতেছে সেখানে। তবু আবারও কহিল,—"কি করছিস্ বৌ! দেখি—" অগ্রসর হইয়া সে একেবারে পিষ্টকের থালাটি সম্মুখে নিয়া বসিল। কহিল "আর কি সেদিন আছে বৌ! এই হাতে কত পিঠে ভেজেছি। নিজে খেয়েছি, দশজনকে খাইয়েছি! কপাল থেকে সব মুছে গেছে বৌ। কপাল থেকে সব মুছে গেছে! এই তালেরবড়া যা আমি ভাল খেতাম।"

মুখ হইতে লালা গড়াইয়া খানিকটা থালার উপরও পড়িল। কথাগুলি বধূর প্রাণে বড় লাগিল। তাহার স্পষ্ট স্মরণ হইল বড় মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে মাতঙ্গিনীকে তাহার বাড়ী পাঠাইবার জন্য মাতঙ্গিনীর শাশুড়ী ঠাকরুণকে সে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিল। অবশেষে তিনি রাজীও হইয়াছিলেন কিন্তু মাতঙ্গিনী আসিল না। গাভার ঘোষ দস্তিদারের মেয়ে সে; বিশ্বাসদের মত নিকৃষ্ট কায়স্থের বাড়ী পা দিতে সে কিছুতেই সম্মত হইল না।

বধূ কহিল "পিসিমা! দিই দুটো বড়া! চেখে দেখুন। মাছের উনুন! তা গোবর দিয়ে নিয়েছি, দোষ নেই।"

মাতঙ্গিনী উত্তর করিল "না থাক! থাক!" কথাগুলি এমন সুরে বলিল যে শুনিয়াই বোঝা যায় যে বক্তার অমত তেমন নাই, তবে সহসা রাজী হইতেও লজ্জাবোধ করে। তাই লোক দেখান অস্বীকার করা।

বধূ একখানা থালায় করিয়া কতকগুলি পিঠা সাজাইয়া দিল। মাতঙ্গিনী একে একে সব নিঃশেষ করিল। তারপর আরও গণ্ডাতিনেক গলাধঃকরণ করিয়া সে ক্ষান্ত হইল। আচমন-অন্তে খয়ের সংযোগে একটু পান মুখে দিয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে মেজবধূর প্রশংসা ছড়াইতে ছড়াইতে বাড়ী ফিরিল।

রাতে মাতঙ্গিনীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল। বিষম পেটব্যথা! ভোরের দিকে পেটে অসুখ দেখা দিল। মাতঙ্গিনী সহজেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এবং উঠিবার শক্তি রহিত হইয়া গেল। বিছানায় শুইয়া শুইয়া সে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং পাড়াপ্রতিবাসীদিগকে কাকুতি-মিনতি করিতে সুরু করিল তাহাকে একটু সাহায্যের জন্য। এমন যে হরি ঘোষ সেও বুড়ীর কাৎরাণি শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিল। সেও কহিল "এবার নিস্তার নেই, মরবে।"

বুড়ীও মাথা নাড়িয়া সায় দিল; কোন মতে ককাইয়া কহিল, "মরতে ত হবেই দাদা। তিনি চলে গেছেন আমি কি আর থাকতে পারি! আমি আর বাঁচব না।" দরদর ধারায় তাহার দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে আরম্ভ করিল। সে আবার ক্ষীণকণ্ঠে কহিল "মরবই ত! তবু তোমরা পাঁচজনে একটু দেখ দাদা! রাতবেরাতে শেয়াল কুকুরে টেনেছিঁড়ে না খায়! শেষটায় অপমৃত্যু না মরতে হয়।"

কথাটা একেবারে যুক্তিহীন নয়। গ্রামের মুরুব্বীরা বহুবিধ আলোচনা গবেষণা করিয়া স্থির করিলেন মাতঙ্গিনীর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং তাহার পিত্রালয়ে অন্য সরিক যে দরিদ্র ভদ্রলোক—সেই অনাথবাবুকে সংবাদ দিয়া আনিতে হইবে শুশ্রূষার জন্য। যে পর্যন্ত মাতঙ্গিনী জীবিত থাকিবে সেই পর্যন্ত তাহাকে দেখাশোনা করিবেন তিনি। মৃত্যুর পর মাতঙ্গিনীর বিষয়-সম্পত্তি তাঁহারই হইবে। —এই মর্ম্মেই তাঁহাকে পত্র লেখা হইল।

একত্র হইয়া গ্রামবৃদ্ধেরা আসিয়া দাঁড়াইলেন মাতঙ্গিনীর ঘরের সম্মুখে। কৈলাস খুড়াই প্রথম অগ্রসর হইয়া প্রথম কথা কহিলেন "মাতু! ও-মাতু! দ্যাখ! চেয়ে দ্যাখ! আমরা এসেছি, আমি জনার্দ্দনদা, গণেশমামা আরও অনেকেই তোমাকে দেখতে এসেছেন, কেমন আছ এখন?" মাতঙ্গিনী সকলকেই চিনিল এবং সকলকেই অভ্যর্থনা করিল। গণেশ রায় অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "একটু ভাল বোধ হচ্ছে এখন?" মাতঙ্গিনী মাথা নাড়িয়া জানাইল 'না।' ব্যথাতুর দুইটি চোখ মেলিয়া সে উপস্থিত শুভকর্ম্মীদিগের প্রতি চাহিয়া রহিল। এখন কৈলাস দত্ত আসল কথাটা পাড়িল "মাতু! আমরা স্থির করেছি, তোমাকে একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আর—"

মাতঙ্গিনী প্রথম কথাটা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু বুঝিতেও বিলম্ব হইল না। অমনি কৈলাসের মুখের উপর দিয়া দুইটি রোষকষায়িত রক্তচক্ষু সে ঘুরাইয়া নিল এবং তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া শুইল। অনেক ডাকা-ডাকিতেও আর সে মুখ তুলিয়া চাহিল না এবং কাহারও সহিত একটা কথাও কহিল না। ব্যর্থ হইয়া বৃদ্ধগণ ফিরিয়া গেলেন।

অনাথবাবু আসিলেন। মাতঙ্গিনী তাহাকে দেখিয়া চিনিল। দুই একটা কুশল প্রশ্ন করিতেও সে ভুল করিল না। তাহার হাতের শুশ্রূ[illegible] মাতঙ্গিনী বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিতে লাগিল। [illegible]ন্তু অন্তরালে প্রস্তুত কোন খাদ্য সে মুখে দিতে চায় না[illegible] যাহাকিছু পথ্য তাহার চোখের সম্মুখে প্রস্তুত করিয়া [illegible]য়। এমন-কি বাহির হইতে জলটুকু আনিয়া দি[illegible]ও সে ফেলিয়া দেয়। অনাথবাবু যে কলসীর জল [illegible]বন মাতঙ্গিনী সেই কলসীর জল ছাড়া খায় না। অনাথবাবু ভাবি[illegible]ু আসন্ন, তাই মতিভ্রম দেখা দিয়াছে। মাতঙ্গিনী সর্ব[illegible] দুইটি সতর্ক চক্ষু মেলিয়া তাহার আত্মীয়ের গতিবিধির উপর নজর রাখে। এইটিও মৃত্যুর আর একটি লক্ষণ বলিয়া ভদ্রলোক ধরিয়া লইলেন।

মাতঙ্গিনী লক্ষ্য করিয়াছে তাহার শুশ্রূষাকারীর আফিম সেবন অভ্যাস আছে। সে কয়েকদিন যাবত তাই তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখিয়াছে, কিন্তু ঠিক করিতে পারে নাই অনাথ আফিমের কৌটাটি কোথায় রাখে। একদিন সে টের পাইয়া গেল; তাহারই শিয়রে একটা হাঁড়ির মধ্যে সেই অমূল্য বস্তুটি থাকে। সে প্রত্যহ অনাথবাবুর অনুপস্থিতিকালে একটু একটু আফিম চুরি করিয়া খাইতে সুরু করিল। কিছু-দিনের মধ্যেই মাতঙ্গিনীর পেটের অসুখ সারিয়া গেল। সে পুনরায় কি বারে কি খাইতে নাই ইত্যাদি বাছিয়া চলিতে লাগিল।

একদিন গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিয়া অনাথকে সে তাড়াইয়া দিল। ঝাঁটা দিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া কহিল,— 'এসেছিলি ত বিষের কৌটা সঙ্গে নিয়ে; পারলিনে খাওয়াতে তাই! সাধে কি তোর হাতের জলটুকু পর্যন্ত আমি পারত-পক্ষেও ছুঁইনি। কোন্ সময় ঝিমুলে দিবি কে জানে! সব নিবি, সেত জানিই! সব লুটেপুটে নিবি! আমি যে কটাদিন বেঁচে আছি সবুর কর! তারপরে নিস্! সব নিস্। আমি আর দেখতে আসব না! তিনিই যখন চলে গেলেন তখন কার বা কি!"

সন্ধ্যাবেলা সে সঞ্চিত ভাতের মাড়টুকু নিয়ে ঝোপের ধারে গিয়া বসিল। সেখানে বাস করে দুইটি শেয়াল। ফেনটুকু ঢালিয়া দিলেই তাহারা আসিয়া খাইয়া যায়। বিকাল হইলেই তাহারা খাদ্যের প্রতীক্ষায় নিকটে কোথাও অপেক্ষা করে। মাতঙ্গিনী একটির নাম দিয়াছে জঙ্গুলে আর একটির নাম মঙ্গুলে। ঝোপের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে ডাক দিলেই তাহারা অগ্রসর হইয়া আসে, তাহাকে ভয় করে না। ওদিনও খাবার ঢালিয়া দিতেই শেয়াল দুইটি আসিয়া চকচক্ করিয়া খাইতে সুরু করিল। মাতঙ্গিনী চাহিয়া রহিল। তাহার চোখে আর পলক পড়ে না। স্নেহার্দ্রকণ্ঠে সে কহিল 'খা!' খা!' ভালকরে খেয়ে নে! কতদিন তোদের কিছু খেতে দিতে পারি নি; অসুখে পড়েছিলুম। কতকষ্ট হয়েছে তোদের! খা! খা! খেয়ে কত সুখ! এমন সুখ কি আর কিছুতে আছেরে জঙ্গুলে মঙ্গুলে!" তাহার চোখের জল সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিতে লাগিল "আমায় সবাই বলে মরতে! আমি সকলের চক্ষুশূল! মরব কেন? আমি মরব কেন? মানুষ হয়ে জন্মে কত সুখ! কত সাধ! মানুষ জন্মের মত আর কি আছে। এমন জীবন আর কোথায় পাব! যার জন্য এমন যে স্বামী-শোক তাও ভুলে আছিরে জঙ্গুলে—তাও ভুলে আছি! আমি মরব না! তোরা আমায় মরতে দিসনে—মঙ্গুলে!" বলিয়া সে ডুকরিয়া ডুকরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাতঙ্গিনীর মৃত্যু হইয়াছিল আরও সাত আট বৎসর পরে। শেষ বয়সে একটা মৃত্যু-বিভীষিকার ছায়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। এই মরলাম! এই মরলাম! বলিয়া সব সময় তাহার মুখে চোখে আতঙ্ক ফুটিয়া থাকিত! তাহার দুই হাত এবং কটিদেশ তাবিজে কবচে ভর্ত্তি হইয়া গেল। এখন সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই সে পায়ের ধূলা লয় এবং গোপনে কি যেন বর প্রার্থনা করে। তাহার ভোজ্যবস্তুর পরিমাণ এবং রকম যেন হঠাৎ বাড়িয়া গেল। তারপর একদিন ভর সন্ধ্যাবেলা মাতঙ্গিনীকে নেহাৎ অনিচ্ছায়ই সকল মায়া কাটাইয়া পরপারের যাত্রী হইতে হইল।

সংবাদ পাইয়া অনাথবাবু আসিলেন। কিন্তু তিনি মুখাগ্নি করিতে কিছুতেই নদীর ঘাটে যাইতে রাজী নন। কারণ দীনু দে ইতিমধ্যেই সুর তুলিয়া দিয়াছে যে, সে মাতঙ্গিনীর জ্ঞাতি। দীননাথবাবুও শ্মশানে অতদূরে যাইতে চাহিলেন না। বরং মাতঙ্গিনীর বাড়ী-ঘর পাহারা দিতে সম্মত আছেন। বুড়ীর বিষয়ের মধ্যে ত কয়েকখানি টিন, কিছু হাঁড়ি-কুঁড়ি আর একটি টিনের বাক্স। এই সম্পত্তি নিয়াই পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ সংশয় চলিতে লাগিল। টিনের বাক্সটির উপরেই খুব কড়া নজর পড়িল—নিশ্চয়ই উহার মধ্যে বেশ কিছু আছে।

দীননাথবাবুর তদ্বির কার্য্যকরী হইল। স্থির হইল মাতঙ্গিনীর টাকাকড়ির উত্তরাধিকারী তিনি, কারণ পিণ্ড দিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে। ছোট ছেলেকে পাহারা রাখিয়া দীননাথ শব-বাহকদের সঙ্গে "হরিবোল" দিতে দিতে শ্মশানঘাটে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি আড়চোখে একবার চাহিয়া দেখিলেন অনাথ মন-মরা হইয়া একটা কাঁঠাল গাছতলায় বসিয়া আছে। তাহার ভাঙ্গা দাঁতের ফাঁক দিয়া একটু মুচকি হাসি খসিয়া পড়িল।

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। অনাথবাবু এক ফাঁকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অতি সন্তর্পণে বাক্সের তালাটি ভাঙিয়া ফেলিলেন। তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন কাঁপিতে-ছিল। দ্রুতহস্তে বাক্সের ডালা তিনি তুলিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে হইতেছিল ভাগ্যলক্ষ্মী মণিমুক্তা হীরা-জহরতের অলঙ্কার পরিধান করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন বলিয়া! তাঁহার পাকা হাতের কারসাজির জন্য তুষ্ট হইয়া দেবী বর দিবেন নাকি! যে যত ভাল চুরি করিতে পারে এই পুণ্যলোকের দেবী তাহার উপরই ধারায় কৃপা বর্ষণ করেন, ইহাই ত দেখা যায়। অবশ্য চুরিটা কাগজে-কলমে হইলেই ভদ্রতা বজায় থাকে।

বাক্সটির মধ্যে কতকগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়া! ইহাতে নিরাশ হওয়ার কিছুই নাই। নিশ্চয়ই ভিতরে সব ঠিক আছে। তিনি

(শেষাংশ ৪১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাখীর উড়ন্ত নীড়

শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য

পাখীদের যত বিস্ময়কর আচরণ সূক্ষ্ম পরিদর্শকের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার ভিতর উহাদের আবাস-স্থান নির্ণয়ের আশ্চর্য ও অভাবনীয় ব্যবস্থা একেবারে মানব-কল্পনাকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। বৃক্ষশাখায়, কোটরে, প্রাচীরের ফাটলে, অট্টালিকার কার্ণিশে, এমন কি কক্ষমধ্যস্থ কড়িকাঠের ফাঁকে, সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায় পাখীদের নীড়। কিন্তু এমন সব ধারণাতীত স্থানে সময়ে সময়ে উহাদিগকে নীড় নির্মাণ করিতে লক্ষ্য করা যায় যে, উহাদের কৌশল ও সকল শ্রেণীর দুষমনকে ধোঁকা দিবার নিখুঁত ফিকিরকে তারিফ না করিয়া থাকা যায় না। যে সকল স্থানে মানুষ কখনও আশা করিতে পারে না যে, পাখী উহার সুখের নীড় বাঁধিবে, সেই প্রকার অসম্ভব পরিস্থিতিতে সকল অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির অন্তরালে, অপার ধূর্ততার সহিতই উহারা নিরাপদ স্থান বাছিয়া লয় এবং সকল প্রকার শত্রুর আক্রোশ এড়াইয়া আপন মনে আস্তানা প্রস্তুত করিয়া ফেলে।

যে সকল পাখী হামেশা মানব-গৃহের আশে পাশে অতি উচ্চস্থানে আপন নীড় বাঁধিতে অভ্যস্ত, উহাকেই আবার দেখা যায় উচ্চ টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন তারের থামের মাথায় খড়কুটা, শুকনা পাতা প্রভৃতি দ্বারা অতি যত্ন ও নিপুণতায় পরিপাটি আবাসটি নির্মাণ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রুশিয়ায় ষ্টর্ক (Stork—সারস) পাখীর প্রাদুর্ভাব বেশী। উহারা সচরাচর গৃহ চূড়ায়—বিশেষ করিয়া চিমনি-শিরে বাসস্থান প্রস্তুত করে, মানুষের নাগালের বাহিরে। একবার প্রুশিয়ার কোনও অঞ্চলে উপরি উপরি কয়েক পাড়ায় আগুন লাগার ফলে, বহু ষ্টর্কের নীড় ভস্মসাৎ হয়। শুধুই আস্তানাটি বিনাশপ্রাপ্ত হইলে পাখীগুলির তেমন আতঙ্কের কারণ হইত না; কেননা, উহারা নীড় নির্মাণে পাকা, ঝটিকা-বিধ্বস্ত নীড়টিকে মেরামত করিয়া লইতে উহাদের এক দিনের বেশী সময় লাগে না, আর এই ব্যাপারে উহাদের আলস্য দেখা যায় না কোন দিন। কিন্তু আগুনে লাগায় উহাদের আবাসের সহিত ডিমগুলি, কোনও কোনও পাখীর অতি কচি ছানাগুলিও প্রাণ হারাইল। তাই এই প্রকার দৈব দুর্বিপাক হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে উহারা যাইয়া নীড় বাঁধিল টেলিগ্রাফ পোষ্টের মাথায় মাথায়। শীঘ্র আর মানব-গৃহের উচ্চ চিমনি-চূড়ায় আবাস নির্মাণে অগ্রসর হয় নাই।

ইংলণ্ডের পল্লীগ্রামে অন্য অসংখ্য নিরাপদ স্থান থাকিতেও এক জোড়া রবিন পাখী কৌশলে আড্ডা গাড়িল কোনও কৃষকের কুটীরের পশ্চাতে খড়ের গাদার উপর। খড়ের গাদা হেলান দিয়া রাখা হইয়াছিল বহিঃ-প্রাচীরের সঙ্গে। দুষ্ট ছেলেদের নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে ছানাগুলিকে বাঁচাইবার জন্য রবিন ঐ স্থানটিই পছন্দ করিয়া লইল।

টেলিগ্রাফ থাম কিম্বা খড়ের গাদা অবশ্য তেমন অস্বাভাবিক স্থান নয় পাখীর বাসা তৈরীতে। বিচিত্র একটি নীড় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার এডিলেড শহরস্থ রেল ষ্টেশনের কোনও নিরালা লাইনের মাঝখানে। এই রেল লাইনটিতে সকল সময় রেলগাড়ী চলাচল করে না

মাঝে মাত্র চার ইঞ্চি ফাঁক পাইয়া উহার ভিতর কাগজের ফালি, ন্যাকড়া ও খড় সংগ্রহ করিয়া নীড়টি তৈরী করে। শান্টিংয়ের সময় ইঞ্জিন ও গাড়ীর যাতায়াত ও শব্দে উহার ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। যথাসময়ে ডিম পাড়িয়া এবং উহাতে তা দিয়া বাচ্চা ফুটাইয়াছে। এবং ছানাগুলি বড় হইয়া উড়িতে না শিখা পর্য্যন্ত ঐ স্থানেই ধাড়ী পাখীটি সদা সতর্কতার সহিত বাস করিয়াছে।

ইংলণ্ডের নর্দাম্বারল্যাণ্ড [illegible] এল এন ই রেল লাইনের কোনও স্থানে ভৃঙ্গ-জাতীয় এক পাখী উহার নীড়

উড়োজাহাজের গুটান ডানার ফাঁকে পাখীর বাসা—যখন উড়োজাহাজের ডানা প্রসারিত হইয়া উহা সচল হয়, পাখীর নীড় একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে—পাখীটিও উড়িয়া আসিয়া কাছেই একটা থামে অপেক্ষা করে—উড়োজাহাজ ফিরিয়া আসিলে আবার পাখীটি নীড়ে কাচ্চাবাচ্চাদের কাছে চলিয়া আসে। ইংলণ্ডের ডেন্‌হ্যাম্‌ ঘাঁটিতে কোন উড়োজাহাজে এই নীড়টি

নির্মাণ করে একখানি কাঠের শিলপারের তলায়। এখানেও অতি দ্রুতগামী এক্সপ্রেসসমূহের যাতায়াতে যে কর্কশ গর্জন উত্থিত হইত, কিম্বা কাষ্ঠ শিলপারটি কম্পিত হইত; তাহাতে পাখীর প্রাণে শঙ্কার উদয় হয় নাই। এই প্রকার স্থানে যে সহসা কোন প্রাণী পাখীর নীড় খুঁজিতে আসিবে না, এই সেয়ানা বুদ্ধি পাখীটি কোথায় পাইল!

ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য ও কল্পনাতীত স্থানে নীড় প্রস্তুত করিতে দেখা গিয়াছে এক জোড়া বুলবুলি জাতীয় পাখীকে—কার্ডিফ শহরে। ব্রেক কসিবার যে যন্ত্র-ব্যবস্থা রেল-গাড়ীর চাকার উপর থাকে, উহারই ফাঁকে ঐ পাখী দুইটি

পরে ঠিক সেই গাড়ীরই অবিকল সেইস্থানে আবার একটি নীড় দেখা যায়। কিছুকাল নীড়টি থাকে। তাহার পর বোধ হয় ছানাগুলি সেয়ানা হইয়া উঠিবার পরে ঐ নীড় আর দেখা যায় না। আবার পর বৎসর ঠিক ঐ ঋতুতে সেই বুলবুলি জাতীয় পাখীরই আর একটি নীড় দেখা যায় অনুরূপ চাকা ও ব্রেক-প্লেটের ফাঁকে।

নিউ ওয়াটারলু [illegible] যখন তৈরী হইতে থাকে, সেই সময় চারিদিকে মিস্ত্রি ও মজুর কার্যরত থাকা সত্ত্বেও এক জোড়া বন্য [illegible] সেতুর অপেক্ষাকৃত নিরালা স্থানে জমায়েত কতকগুলি কাঠের [illegible] নীড় নির্মাণ করে। ঐ স্থানেই ডিমও পাড়ে। মিস্ত্রি ও মজুরেরা দেখিতে পাইয়াও পাখী দুইটিকে তাড়াইয়া দেয় নাই বা কোন প্রকারে বিরক্ত অথবা শঙ্কিত করে নাই। উহারাও যথাকালে ডিম ফুটাইয়া নির্ভীকভাবেই ছানাগুলির তত্ত্বাবধান করিতে থাকে

কাদাখোঁচা পাখীর নীড় রেললাইনের 'স্লিপারে'র তলায়—ট্রেনের যাতায়াতের গর্জনে পাখীরা ভীত হয় না

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিচিত্র বলিতে হইবে, 'উড়ন্ত নীড়' অর্থাৎ উড়োজাহাজের ডানায় নির্মিত পাখীর বাসা। ডেনহাম শহরের বিমানঘাঁটিতে কোনও একটি বিমানের ভাঁজ করিয়া গুটাইবার ব্যবস্থাসম্বলিত ডানাটির এক খাঁজে এক জোড়া রবিন উহাদের নীড় নির্মাণ করে। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর স্থানে পাখীর নীড় নির্মাণ বোধ হয় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই নীড়টি এবং উহার অভ্যন্তরস্থ ডিমগুলি অগণিত-বার মহাশূন্যে বিচরণ করিয়া আসিয়াছে—কারণ যে বিমানে ঐ নীড় রহিয়াছে, সেই বিমানটি অন্তত দিনে দুইবার ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া শূন্যে ঘুরপাক খাইয়াছে—কলকব্জা সচল রাখিবার জন্যে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যখনই বিমানটি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, অমনি ধাড়ী পাখীটা নীড় ছাড়িয়া বিমান ঘাঁটির স্তম্ভাদি আশ্রয় করিয়া নীরবে প্রতীক্ষা করিয়াছে। আর যে মুহূর্তে বিমানটি ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই মুহূর্তেই উহা ছুটিয়া আসিয়াছে নীড়ে।

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই পাখী দুইটির অপরিসীম ধৈর্য এবং চরম একগুঁয়েমি। রবিন-দম্পতি যখন এইস্থানে বিমানের গায়ে নীড়টি প্রস্তুত করিতে থাকে, তখন নীড় নির্মাণ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই বিমান-ঘাঁটির লোকেদের নজরে উহা পড়ে। তাহাদের নজরে পড়ামাত্র তাহারা বিমানের গুটান ডানার খাঁজে সঞ্চিত খড়কুটা দূরে নিক্ষেপ করে। কিন্তু কি আশ্চর্য প্রাতে যে খড়কুটা বিমানের অঙ্গ হইতে দূরীকৃত হইয়াছে, বিকাল বেলা বিমান ঘাঁটির লোকেরা আসিয়া দেখিয়াছে ছড়ান খড়কুটা আবার বিমানের গায়ে যথাস্থানে সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে। এই প্রকারে এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া প্রতিদিন চলে ভাঙাগড়ার অপূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যত বারই উহাদের নীড়-সমূহ উৎপাটিত হয়, রবিন-দম্পতি যেন বিপুল উদ্যমে তাহা আনিয়া যথাস্থানে গুছাইয়া রাখে। উহারা কিছুতেই দমিয়া যায় না। অবশেষে হয়রান হইয়া বিমান ঘাঁটির লোকগুলো আর রবিনের নীড়ে হস্তক্ষেপ করে না। প্রতিবার ফেলিয়া

গাড়ীর চাকার উপরে যে 'ব্রেক প্লেট' তাহার তলায় পাখীর বাসা—'শান্টিং'-য়ের জন্য গাড়ী চলাচলেও পাখীদের নীড়ের শান্তিভঙ্গ হয় না

দিয়াই ঘাঁটির লোকেরা ভাবিয়াছে, এইবার পাখী দুইটির যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, ভয়েও আর উহারা এমন বেমক্কা ঠাঁইটিতে বাসা বাঁধিতে আগাইয়া আসিবে না। কিন্তু তাহাদের সকল নিশ্চিন্ততা ভঙ্গ করিয়া এবং বার বার তাক্ লাগাইয়া যখন পাখী দুইটি অক্লান্ত অধ্যবসায়ের চরম নিদর্শন উপস্থিত করিতে লাগিল, তখন তাহারা পাখীর দৃঢ়সংকল্পের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল। শুধু তাহাই নয়, রবিনের অদম্য উৎসাহের পুরস্কার স্বরূপ ঐ নীড়টিকে ঘাঁটির লোকেরা শুভ প্রতীক বলিয়াই গ্রহণ করিল। বিমানচালকগণ স্থির করিয়া লয় যে, ধাড়ী যেরূপ সেয়ানা ইহাতে উহার কোনও রকম অনিষ্ট হইবে না বিমানটি চলাচল করিলেও। আর যে কৌশলে খাঁজের ভিতর নীড়টি দৃঢ়বদ্ধ, তাহাতে ডিম পাড়িলে, ঐগুলিরও কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে যদি বিমানটি অতি দূরের পথে চলিয়া যায়, তখন হয়ত বিহিত যত্নের অভাবে

ডিমগুলির অনিষ্ট হইতে পারে। বিশেষ করিয়া নীড়টি এঞ্জিনের এত কাছে যে, উহার উত্তাপ ডিমগুলিকে ফুটিতেই সাহায্য করিবে। আরও একটি আশ্চর্য যোগাযোগ এই যে, যখন ডানাগুলি গুটান অবস্থা হইতে প্রসারিত করা হয়, তখন নীড়টি একেবারে দৃষ্টির অন্তরালে যায়—যেন একটি সুন্দর বাক্সে উহা আবদ্ধ হইয়া পড়ে। কাজেই এমন অবস্থায় পাখী বা ডিমের কোন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা থাকিতেই পারে না। এই প্রকার জল্পনা করিয়াই বিমান ঘাঁটির লোকগুলি রবিনকে নির্বিবাদে ঐ নীড়ে বাস করিতে দেয়। রবিন-ধাড়ী ঐ নীড়ে চারিটি ক্ষুদে ডিম পাড়িয়াছে। আশাকরা যায় শীঘ্রই ডিম ফুটাইয়া অনায়াসে ধাড়ী উহার বাচ্চা লইয়া সুখে দিন পাত করিবে।

এই প্রকারে নিরাপদ ধারণা করিয়াই হউক আর খেয়ালের বশেই হউক পাখীরা আশ্চর্য নিপুণতা প্রদর্শন করে বিস্ময়কর স্থানে আবাস নির্মাণ করিবার প্রয়াসে। চলন্ত রেলগাড়ীতে কিম্বা শূন্যে বিচরণশীল বিমান হইতে যে উহাদের নীড়ের কোন প্রকার বিপদ নাই, এই সত্য মালুমে করিতে না লইলে পাখীদের পক্ষে সম্ভব হইত না, উহাদের এত আদরের ডিমগুলিকে এমন বিচিত্র স্থানে নির্মিত নীড়ে স্থাপন করা। সূক্ষ্ম বাস্তব পর্যবেক্ষণে উহাদের সন্তানের প্রকৃতি যে কি প্রকার প্রখর এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়।

মাতঙ্গিনীর মৃত্যুকামনা

(৪১২ পৃষ্ঠার পর)

তাড়াতাড়ি উহা ফেলিলেন তুলিয়া। সফলতার নিশ্চয়তা এবং অনিশ্চয়তার দোলায় তাহার মস্তিষ্ক দুলিতেছিল। তিনি অধিকতর ব্যগ্রভাবে আঁতিপাতি খুঁজিতে লাগিলেন বাক্সের মধ্যে। কোথাও কিছু নাই। শূন্য! একেবারে শূন্য! সহসা বাক্সের নীচ হইতে বাহির হইয়া আসিল একটি ছোট পুঁটুলি-অতি যত্নে কাগজে জড়ান। এই ত! এই ত! পাওয়া গিয়াছে। অনাথবাবুর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত বহিতে লাগিল। কম্পিতহস্তে তিনি পুঁটুলিটি খুলিয়া ফেলিলেন। ভাঁজকরা কয়েকখানি কাগজ! ভাল করিয়া চোখে দেখা যায় না। অনাথবাবু হাত দিয়া বারবার স্পর্শ করিয়া স্থির করিলেন, নোট, টাকা! তাঁহার বুকের মধ্যে দপ্ দপ্ করিয়া এমন শব্দ হইতে লাগিল যে, তাঁহার ভয় হইল পাছে বাহিরে কেহ টের পায়। নিজের ধারণা বদ্ধমূল করিবার জন্য তিনি একটি দিয়েশলাইয়ের কাঠি জ্বালিলেন।

একি! নোট নয়। একখানি চিঠি এবং একখানি কায়-কল্প চিকিৎসার বিজ্ঞাপন। যত্নসহকারে ভাঁজ করিয়া রাখা হইয়াছে। এই পত্রখানি মাতঙ্গিনী লিখিয়াছিল সেই হঠযোগীকে চিকিৎসার খরচ এবং অন্যান্য তথ্য অবগত হওয়ার জন্য।

কাগজ দুইখানি অনাথবাবুর হাত হইতে খসিয়া পড়িল এবং জ্বলন্ত কাঠির উপর পড়িয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

শুকতারা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসাক

আকাশের চন্দ্রাতপে শুকতারা রহে চক্ষু মেলি'
জীবনের বিকাশের আশে,
উদয় শিখর হোল জ্যোতিষ্মান—মরণেরে ঠেলি,
কুহেলিকা মিলাইল ত্রাসে।
নূতন জীবন পথে শ্রদ্ধাভরা আমার প্রণতি
আজ আমি পাঠাইব একান্তের শুকতারা প্রতি,
মৃত্যুর আঁধার হোতে জীবনের সে দিল সন্ধান—
গৌরবের দান॥

ধরণার বন্দনার প্রারম্ভিক দীপ তুমি জ্বাল
নীলাকাশে সাজি সন্ধ্যাতারা,
অচঞ্চল দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীরে বাসিয়াছ ভালো,
তার প্রেমে রহ আত্মহারা।
দিনান্তের সন্ধ্যাতারা, বিশ্বে তোল পূরবীর তান,
আমার কণ্ঠেতে তুমি পাঠাইলে অলকার গান,
দিবসের সূর্যালোকে রাখিয়াছ বারি সংগোপন—
আলোর স্বপন॥

লক্ষ যুগ যুগান্তের অমলিন তব দৃষ্টিখানি
দেখাইল কোথা পথ রেখা,
নভোসভাতলে মোর পাঠাইব মর্ত লোক বাণী
অমর্তের যেথা আঁক লেখা;
দেবতারা পারিজাতে গাঁথিয়াছে সাতনরী হার,
বিশ্বলোক পেল আলো, তুমি রহ মধ্যমণি তার,
আজ আমি গাহি গান, ওগো শুকতারা অলকার,
—তব বন্দনার॥

বিহগ কাকলি সাথে নূতনের যেথা জাগরণ
স্বাক্ষর সেথায় তব আছে,
অবসাদ পিছু ফেলি' প্রাপ্তিকের নব উদ্‌বোধন,
রূপান্তরে তব সাক্ষ্য বাঁচে।
উষারে পিছন ফেলি পথরেখা ক্লান্ত সন্ধ্যা পানে
মিলন কামনা নিয়ে নিতি তার বক্ষে মোরে টানে,
সেথা কি পাঠাবে তুমি মোর লাগি আলোকের সাড়া
—হোয়ে সন্ধ্যাতারা?

বাদলা দিনে

(চিত্র)

শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখিতে দেখিতে আবার আকাশের উত্তর কোণে মেঘ জমিল। আর একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম, কিন্তু না—বৃষ্টি ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। আসিবার সময় ছাতাটা পর্য্যন্ত আনি নাই। ছুটি ছিল ভাগ্যি, নতুবা এই আ[illegible] ভাংগা বৃষ্টি মাথায় করিয়া জল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বাড়ী যাই[illegible] হইত,—তা সে আমার যত কষ্টই হোক না। তাই মেঘ-গম্ভীর আকাশের বায়ুলেশহীন নিস্তব্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া দ্রুতবেগে পা চালাইয়াও যখন বাতাস ছাড়িল ও সংগে সংগে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল, তখন অগতির গতি নিকটের গাড়ীবারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম।

কিন্তু কতক্ষণ ঠায় দাঁড়াইয়া থাকা যায়? বৃষ্টি নামিল ত আর থামিতে চায় না। থাকিয়া থাকিয়া বাতাস ঝট্‌কা মারিয়া সারা গা ভিজাইয়া দেয়। বর্ষণের প্রবল প্রকোপ যেন একবার মন্দীভূত হইয়া আসে, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার যে বৃষ্টি সেই বৃষ্টি। সমস্ত আকাশ যেন ফুটা হইয়া সমান্তরাল ধারায় বারিপাত হইতে লাগিল। বড় মুস্কিল ত? বর্ষা একটু কম দেখিয়া যেই জামার হাতা গুটাইয়া বাহির হইতে প্রস্তুত হইলাম, অমনি আকাশ অন্ধকার করিয়া বজ্র ডাকে ও সংগে সংগে ধারায় ধারায় জল পড়িতে থাকে। বোধ করি বিশ মিনিট বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যেই পিচের রাস্তায় জল জমিয়া ক্রমে ক্রমে ফুটপাথ ছাপাইয়া উঠিতে লাগিল। কলিকাতার জনাকীর্ণ রাস্তার কলগুঞ্জন কিন্তু এই বারিপাতেও থামে নাই। ট্রাম ডোবা লাইনের উপর দিয়া চলিতে লাগিল, বাস, ট্যাক্সি অবরুদ্ধ স্রোতশীল জলের উপর দিয়া হুড় হুড় করিতে করিতে চলিল। কেবল মনুষ্য-পরিচালিত রিক্‌সগুলো ক্বচিৎ একটা-দুটা দেখা গেল। দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ টং টং, ঠং ঠং শব্দে সচেতন হইয়া চাহিতেই দেখিতে পাইলাম, পর পর তিনটা ফায়ার ব্রিগেড্ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। এই বৃষ্টিতে হয়ত কোথায় আগুন লাগিয়াছে, তাহাই নিভাইতে ইহারা চলিয়াছে। বুক কাঁপাইয়া অবিরাম সতর্ক শব্দ করিতে করিতে ইহারা হয়ত কোন অগ্নি-তাণ্ডব থামাইতে চলিয়াছে। দূরে কয়েকজন মেথর রাস্তার নর্দ্দমার সঞ্চিত আবর্জ্জনা সরাইয়া জল-নিকাশের সুবিধা করিয়া দিতেছে। এত বৃষ্টিতেও ইহাদের বিরাম নাই—জীর্ণ, বিধ্বস্ত খোলার ঘরে ধুমের মধ্যে বসিয়াও দুই দণ্ড স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে গল্প-গুজব করিতে পারিল না। পচা, দুর্গন্ধ, জঞ্জাল নাড়া লাগায় উৎকট গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মাথার ঘিলু পর্য্যন্ত নড়াইয়া দিল। দম্‌কা বাতাসে পাশের বাড়ীর জানালার সার্সীগুলি ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। যে গাড়ীবারান্দায় দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলাম, তাহারই সম্মুখে রাস্তার ঐ পার্শ্বে কেবল একটা নিমগাছের মাথার উপর দিয়া প্রকৃতির অবিশ্রান্ত দৌরাত্ম্য চলিতে লাগিল। এই মনুষ্য-রচিত মৃত্তিকা-বিবর্জ্জিত মহানগরীর ফুটপাথের কাঁকরের উপর কোনক্রমে এই একটামাত্র নাতিদীর্ঘ নিমগাছ ধূমে বিবশ্রী হইয়াও বাঁচিয়া ছিল—প্রবল ধারাপাতে ইহার বিশুষ্ক ধূল-মলিন পত্রগুলি একে একে সজীব হইয়া মেলিয়া পড়িল। বিস্তীর্ণ এই প্রান্তরে আর কাহাকেও না পাইয়া প্রকৃতির সমস্ত আক্রোশ যেন এই গাছটির উপর দিয়া চলিল; বাতাসের দাপটে এক একবার সরু ডালগুলো মোড়াইয়া গিয়া পুনরায় স্থির হয়,—আবার দুলিয়া হেলিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া আছাড় খাইতে থাকে। দূরে চাহিয়া এই অসহায় গাছটির জীবন-মরণ যুদ্ধ দেখিতেছিলাম, সহসা কাহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে ফিরিতেই একটি ভিখারী হাত পাতিয়া পয়সা চাহিল। এতক্ষণ লক্ষ্যই হয় নাই, এইবার বাহিরের দুর্য্যোগ হইতে চোখ ফিরাইয়া দেখিলাম, এক কোণে জটলা পাকাইয়া কয়েকটি ভিখারিণী বসিয়া বসিয়া তাহাদের স্ব স্ব ঝুলিমালা বাহির করিয়া পরস্পর দেখিতেছে। চাল-বাঁধা থলি খুলিয়া তাহারই এক প্রান্তের গ্রন্থি খুলিতে খুলিতে কয়েকটা আধলা ও পয়সা সশব্দে শানের উপর পড়িল। দুই হাত দূরে টুপি মাথায় এক ফকির একজন স্ত্রীলোককে কহিতেছে,—ক'পয়সা কামাই করলি রে টেঁপির মা? টেঁপির মা তামাকের গুঁড়া মাখানো তাম্বুলরঞ্জিত দন্ত কয়টি একেবারে উন্মুক্ত করিয়া একগাল হাসিয়া কহিল, তের পয়সা আর চারটে আধলা। ইহার উত্তরে বুড়া ফকির কি কহিল কর্ণপাত না করিয়া আর একদিকে শুনিলাম, একজন হিন্দুস্থানী হাতের তালুতে খৈনি ঘষিতে ঘষিতে স্বজাতি এক ভাইয়াকে কহিতেছে,—আরে ভাইয়া, দিনকা এইসা হাল যে চার আনা কামানেমে পসিনা ছুট্ যাতা হ্যায়। সত্য কথা বটে। দিন-মজুর ঐ হিন্দুস্থানীটা কোনক্রমে দৈনিক চারি আনা উপায় করিতে পারে, কিন্তু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত কত শত বাবুরা ইহাই পাইতেছে না। ঐ মুটেটাও বুঝিতে পারিয়াছে, দিনে চারি আনা পয়সা উপায় করিতে কি প্রাণপাত পরিশ্রমই না করিতে হয়। ইহাই ভাবিতেছি, আর বিচিত্র দৃশ্য দেখিতেছি। এই স্বল্পপরিসর গাড়ীবারান্দায় এই বর্ষার সময়ে কতজনে কতমনে বসিয়া, দাঁড়াইয়া কত বিচিত্র কার্য্য করিতেছে। একজন ভদ্রলোক চামড়ার একটা ব্যাগে পেটেণ্ট ঔষধ লইয়া, তাহা বিক্রয় করিতে কত গুণ-গানই না গাহিতেছে! তাহার মলম পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য বস্তু, ইহা মালিশ করিলে দাদ, পাঁচড়া যাবতীয় চর্ম্মরোগ ২৪ ঘণ্টায় নিরাময় হইয়া যায়। দুই চারিজন ভুক্তভোগী ফেরিওয়ালার মলম ঘষিয়া পরীক্ষা করিতেছে, কেহ-বা দৈনিক কয়বার কি প্রকারে প্রয়োগ করিতে হইবে, সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইতেছে। একটা কুলির মাথায় প্রকাণ্ড ঝুড়িতে নীল মলাটের নূতন বই থাকে থাকে সাজানো ছিল। বোধ হয় বইগুলি এইমাত্র প্রেস হইতে দোকানে লইয়া যাইতেছিল; বৃষ্টিতে এখানে আশ্রয় লইয়াছে। এই জল মাথায় করিয়া তখনও দুই একজন ভদ্রলোক জল ঠেলিতে ঠেলিতে জুতা হাতে কাক-পক্ষীর মত এই গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া জড় হইতেছিল। যাহারা একবার ঢুকিতেছে, তাহারা আর বাহির হইতে পারিতেছে না। বামদিকে

বাঁশীর শব্দে চাহিতেই দেখিলাম একটা সাপুড়ে সাপ খেলা দেখাইতেছে, আর তাহাই পঙ্গপালের মত সমস্ত লোক ঝুঁকিয়া মনোযোগ সহকারে দেখিতেছে। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে এক ভদ্রলোক চেঁচাইয়া উঠিলেন,—যাঃ গেল মশাই, পকেটটা কেটে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দর্শক উদ্‌গ্রীব হইয়া নিজেদের পকেটে হাত দিয়া একবার দেখিলেন, তারপর অনেকে ভদ্রলোককে সহানুভূতি দিতে লাগিলেন,—কেহ-বা অপরাধীকে ধরিতে ব্যস্ত হইলেন। সাপ খেলা বন্ধ হইল।

বাহিরে তেমনি দুর্য্যোগ, নিমগাছটা বাতাসের সঙ্গে ঘুঝিতেছে—ক্বচিৎ দু'একটা ট্রাম-বাস কাদা ছিটাইয়া জল ভাঙ্গিয়া ছুটিতেছে। আর ভিতরে এই গাড়ী-বারান্দায় আশ্রয় লইয়াও গুটিকতক লোক নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। কলিকাতার বিপুল জনারণ্যের নগণ্য একটি ক্ষুদ্র অংশ দৈব-দুর্ব্বিপাকে এই স্বল্পায়তন স্থানটায় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াও নীরব নিশ্চেষ্ট হইতে পারে নাই, সকলেই একটা কিছু লইয়া মাতিয়া আছে। কেনা-বেচা চলিতেছে, ভিক্ষা চাওয়া হইতেছে, পিক-পকেটও চলিয়াছে—অর্থলিপ্সু মনুষ্যের পলকের জন্যও বিশ্রাম নাই। রাস্তার উপর দিয়া কতকগুলি লোক হরি-ধ্বনি করিতে করিতে একটি শব লইয়া যাইতেছিল। বোধ করি অল্পবয়স্ক একটি শিশু মারা গিয়াছিল—গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে মৃতের অনাবৃত মুখখানি বিকশিত শুভ্র কুন্দকলির মত সুন্দর দেখাইতেছিল। এইমাত্র বৃষ্টি একটু কমিয়া আসিয়াছিল, তাই শ্মশানযাত্রীরা সুযোগ বুঝিয়া দৌড়াইয়া চলিয়াছে। আবার বাস-ট্রাম-রিক্স ঘন ঘন চলিতে লাগিল। দূরে নিকটে আশে পাশে আবার লোক-চলাচল আরম্ভ হইল। এই ঘণ্টাখানেকের নিজ্জীব স্থবির প্রাণ-স্পন্দন যেন আবার দ্রুততালে চলিতে লাগিল। নিজের দিকে চাহিয়া দেখিলাম একেবারে ভিজিয়া সপ্‌সপে হইয়া গিয়াছি, আঙ্গুলের নখ নীল হইয়া গিয়াছে—শীতে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছি। এই ঘণ্টাব্যাপী অবিরাম বারিপাতে গা যেন হিম হইয়া গেছে।

এতক্ষণ চোখেই পড়ে নাই—পাশে একটা চা'র দোকানে বেশ ভিড় জমিয়া গেছে। শীতার্ত্ত আয়াস-প্রিয় বাবুরা ধূমায়িত কাপে চক্ষু মুদিয়া চুমুক দিতেছেন, আবার পরক্ষণে চক্ষুদ্বয় মেলিয়া এমন স্পর্দ্ধিত গর্ব্বে চাহিতেছেন যেন এমন দিনে এই দোকানে বসিয়া কয়েকটা পয়সার বিনিময়ে ধূমায়িত দু'কাপ চা পান না করিলে জীবন ব্যর্থ। দোকানী দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া সকলকে সমাদরে আহ্বান করিতেছে; ইহাদের সমবেত উল্লাস-মুখর ক্ষুদ্র দোকান-ঘরে একবার চাহিতেই হাজার জোড়া চক্ষুর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। আর সাধ্য নাই ফিরিয়া যাই, তাই ধীরে ধীরে যাইয়া একটা চেয়ারে উপবিষ্ট হইলাম।

চা-পানান্তে যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছি, বৃষ্টি তখনও ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে। জামা-কাপড় ভিজিয়া চুপ্‌চুপে হইয়া গিয়াছে—চুলের ডগা বাহিয়া জল গড়াইতেছে। নিম গাছটার ধার দিয়া এ পার্শ্বের রাস্তায় চলিতে চলিতে সামনের বাড়ীর জানালায় সহসা চোখ পড়িল। বোধ হইল যেন দুইটি কিশোরী গরাদে ধরিয়া খিল্ খিল্ হাসিতেছে। আমার সিক্ত বেশ-ভূষা দেখিয়া হয়ত তাহারা ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া থাকিবে কিংবা তাহারা হয়ত আমাকে বৃষ্টির সময়ে বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দেখিয়া আমার চা-পান পর্য্যন্ত সমস্তই কৌতূহলবশে লক্ষ্য করিয়া এখন একবারে বিদায় বেলায় শেষ-বারের জন্য হাসিয়া লইতেছে। মনে মনে বিব্রত হইয়া আবার উপরে চাহিতেই চোখা-চোখি হইয়া গেল, কিশোরী দুইটি অদ্ভুত হাসিয়া মুখ লুকাইবার বৃথা চেষ্টা করিল। এবার সন্দেহ গেল, সত্যই ত আমিই তাহাদের হাসির পাত্র। কিন্তু কিছুতেই বোধ হইল না আমার ভিতরের এমন কোন্ বৈশিষ্ট্য তাহাদিগকে হাসাইতে পারিয়াছে। সলজ্জে মুখ নীচু করিয়া হন্ হন্ করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলাম। বৈঠকখানা বাজারের রাস্তা দিয়া বহু লোক ইলিশ হাতে গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। কতজনে বাজারের থলি লইয়া ট্রামে চাপিয়া বসিল, কতজনে লাঠি ভর দিতে দিতে হাঁটিয়া চলিল। রাস্তার জল হড় হড় শব্দে ছিদ্রপথে সরিয়া যাইতেছিল, চলিবার সময় কোঁচার খুঁট উপরে তুলিতে হইতেছিল।

পাশের একটা বাড়ীতে শুনিতে পাইলাম তিন চারিজন সমস্বরে সাগ্রহে বলিতেছে, বাদ্‌লা দিনে আজ খিচুড়ী হোক্ ঠাকুর। বোধ করি মেস বা বোর্ডিং হইবে, বর্ষাদিনে গরম আহার্য্যের তাই বায়না হইতেছে। আবার বুঝি আকাশে মেঘ করিয়া আসিতেছিল, নাঃ—বৃষ্টি আজ বুঝি আর ছাড়িবে না। বাড়ীর পথে সজোরে পা ফেলিয়া চলিয়াছি। একটা গলির মোড় ঘুরিতেই সামনের লাল রঙের ত্রিতল বাড়ী হইতে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর কানে আসিল। আঃ, গানটাও বর্ষার উপযোগী। ত্রিতলের ক্ষুদ্র কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়নে বসিয়া একটি মেয়ে অর্গ্যান বাজাইয়া গাহিতেছিল, মেঘমেদুর ম্লানালোকে সুরটি যেন প্রাণের অবরুদ্ধ বেদনা গলাইয়া জল করিয়া অতীতের সুখস্বপ্নের কথা জানাইতেছে, বিরহের সে কি মর্ম্মস্পর্শী ঝঙ্কার! মাথার উপর তখনও মৃদু মৃদু বর্ষা হইতেছিল, কিন্তু সব ভুলিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। আশ্চর্য্য বটে, বাদলা দিনে সকলের সঙ্গে যেন কেমন একটা সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। মেয়েটি গাহিতেছিল তার প্রাণের কথা সুরের ভাষায়, আর আশ্চর্য্য এই, তাহার কথা তাহার ব্যথা যেন আমারই রূপান্তর! আমার মনের কথা এ কেমন করিয়া জানিয়া এমন করুণ সুরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিতেছে?

মেঘ করিয়া আবার বর্ষা নামিল। বাসার আর দূর নাই, ফুটপাথ ধরিয়া দৌড়াইয়া চলিলাম। তিন ঘণ্টার উপর হইবে বর্ষায় ভিজিয়া ভিজিয়া বিচিত্র দৃশ্য উপভোগ করিয়াছি। গৃহের অন্দরে মূর্ত্তিমতী বিরহিণী গৃহিণীর বর্ষার অভিসার কিরূপ চলিতেছিল তাহাই জানিতে এক্ষণে দ্রুত পা চালাইলাম। বাড়ীর কাছে আসিতে ওধারের বাড়ীতে কে যেন 'চয়নিকার' একটা বর্ষা-সঙ্গীত সুর করিয়া পড়িতেছিল। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, কি জানি কোন্ সম্ভাষণে ঘরের মূর্ত্তিমতী গিন্নী আবির্ভূতা হন।

একান্ত সঙ্কোচে আড় চোখে সম্মুখের জানালার দিকে চাহিতে চাহিতে সদর দরজায় পা দিয়াছি, গৃহিণী ঝড়ের মত

কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া তারস্বরে কহিলেন, আর ঢং দেখাতে হবে না, যাও মাথা মুছে খেতে বস গে। সেই সক্কালে খিচুড়ী রেঁধে বসে আছি, জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

যাক্ বাঁচা গেল। বাহিরে বর্ষার বিবিধ বিচিত্র দৃশ্যপট একে একে দেখিয়াও যে গৃহিণীর শাসন-বাণীর বজ্রগম্ভীর অনর্গল অবিশ্রান্ত নিনাদ থাকিয়া থাকিয়া কর্ণরন্ধ্রে বাজিতেছিল আর যাহার নিরলস অদম্য বক্তৃতার সামনে নিজেকে অবনত না করিবার বিপুল আশ্বাসে যথাসময়ে পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সেই মহতী মহীয়সী ব্যক্তির এহেন তিক্তমধুর আপ্যায়নে কৃতকৃতার্থ হইয়া মানে মানে আহারে মনোনিবেশ করিলাম।

পশ্চিম আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ বিচ্ছিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইতেছিল। বহুদূরের কোন্ বিস্তৃত প্রান্তর হইতে প্রলয়ের চাপা রুদ্ধ আক্রোশ বাতাসে অস্ফুট গুঞ্জন তুলিতেছিল—আবার বুঝি আকাশ ফাটা বর্ষায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে।

আমার মনের আকাশের মেঘ কাটিয়া ততক্ষণে সেখানে কিন্তু সোনালী আলো ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ প্রকৃতির সে কি শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(৩৯৭ পৃষ্ঠার পর)

'এই মা-বাপ মরা ছেলেটিকে কি না দেওয়া উচিত?' প্রতুল হাসিয়া উঠিল।

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি একাই থাকেন?

প্রতুল বলিল, নিশ্চয়ই, একা চুপ ক'রে ব'সে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে।

'আপনাকে দেখে ত' তা বোঝা যায় না।' অলকা বলিল।

'বোঝা যেতে দেবই বা কেন আমি।' প্রতুল উত্তর করিল।

আর বিশেষ কোন কথাই হইল না, নিঃশব্দে চা-পান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতুল বলিল, চলি আজ, নিজের ছোট্ট ঘরটার কথা মনে হ'চ্ছে এখন।

'কাল আবার আসবেন কিন্তু।'

চমৎকার হাসি হাসিয়া প্রতুল বলিল, তা ত' বলতে পারিনে দিদি। আমার ছোট্ট ঘরটার বাইরে আছে একটা বিরাট পৃথিবী, একবার ঘর থেকে বের হ'লেই নানা পথ চোখে পড়ে তাই এ পথ যদি ভুলই করি ত' ভাববার বা দুঃখ করবার কিছু নেই।

আর কোন কথা না বলিয়া এবং অলকাকেও কথা বলিবার এতটুকু সুযোগ না দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অলকার কেবলি মনে হইতে লাগিল এই যে কথাগুলি ওই লোকটা বলিয়া গেল তাহার যেন অনেক অর্থই হয় এবং সহজ অর্থ বলিয়া যাহা মনে হয় তাহা উহার সত্যিকার অর্থের কাছে নিতান্তই বাজে, একান্তই তুচ্ছ বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া কিছুই যেন বোঝা গেল না, গভীরভাবে চিন্তা করিলেও এতটুকু আলোক দেখা যাইবে বলিয়াও তাহার বিশ্বাস হইল না।

রামহরি আসিয়া বলিল, এবেলার সমস্ত কাজই কিন্তু আমি করব মা, আর শুধু এবেলাই বা কেন, কোন বেলায়ই আর তোমাকে কাজ করতে দিতে পারব না আমি।

'কাল হয়ে গেলে আর আমাকে বুঝি মা ব'লে ডাকতে ইচ্ছে হবে না রামহরি?'

অপ্রস্তুত হইয়া রামহরি বলিল, কি যে বল তুমি, না, এই বুড়ো বয়েসে আমাকে কাশী যেতেই হবে দেখছি। খোকাবাবু, মা, সকলেই যেন এবার শত্রু হয়ে উঠছে আমার। তার চেয়ে এ বুড়োর দু' গালে দু'টো চড় কসিয়ে দাও না কেন।

হাসিয়া অলকা বলিল, বেশ তাই হবে রামহরি, আমি আর বিশেষ কোন কাজ না করে বসে থাকব। আর তোমায় হুকুম করব। তা তোমার খোকাবাবু বেরিয়েছেন, সন্ধ্যের সময় ফিরবেন, চা দিও যেন।

ক্রমশ

গান

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উতলা হাওয়ায় তুমি ডাকিলে যবে
ভাবিয়াছিলাম ফাঁকি নাহিকো এতে;
জ্যোৎস্না জড়ানো ঘনো ঘুমের বনে,
গাহিয়াছিলাম গান মোরা দুজনে,
নিথর সে নিঝঝুম নীরব রাতে
রেখেছিলে দুটি হাত আমারি হাতে,
তাইতো তোমারি লাগি দুয়ার ধারে
আবার ছিলাম জাগি আঁচল পেতে।

আজ দেখি আকাশেতে মেঘেরা কালো,
ঊষর মরুর পথে দিক হারালো,

আমার এ-জীবনের গানগুলি হায়,
দিবসের শেষে তাই এই অবেলায়,

এখন আবার কেন পিছনে ডাকা,
পুরানো ধূসর সেই পথে চলিতে?

জার্ম্মানী ও তাহার বিরোধী পক্ষ

ইংরেজের বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর প্রথম আক্রমণের খবর পাওয়া যায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর। ঐ দিবস তারযোগে এই খবর আসে যে, স্কটল্যাণ্ডের হেব্রাইডিস দ্বীপপুঞ্জের ২০০ মাইল পশ্চিমে জার্ম্মানরা টর্পেডোর আঘাতে ইংরেজের ডোনাল্ডসন কোম্পানীর 'এথেনিয়া' জাহাজটি ডুবাইয়া দিয়াছে। এই জাহাজে ১৪ শত যাত্রী ছিল। কতক নাবিক এবং যাত্রী নৌকা এবং বিভিন্ন জাহাজে উঠিয়া প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে। ঝটিকাগতিতে এইভাবে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া দেওয়াই হইল বর্ত্তমান রণনীতি। এই রণনীতিতে সামরিক, অ-সামরিকের বিচার নাই, নর, নারী, শিশুর বিচার নাই, শত্রুপক্ষের সৈন্যরাই শুধু শত্রু নয়। শত্রুর দেশের যত লোক, সকলেই শত্রু: কারণ তাহারা কোন না কোন ভাবে শত্রুর দেশে শাসন ব্যবস্থা সচল রাখিতে সাহায্য করিতেছে। সেনাদলের শক্তির পিছনে রহিয়াছে এই সব অ-সামরিকদের সাহায্য, সুতরাং তাহারাই সব চেয়ে বড় শত্রু, অতএব অবিচারে তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে, ইহাই হইল জার্ম্মানীর প্রসিদ্ধ সামরিক লুডেনডর্ফের ব্যাখ্যাত রণনীতি। আধুনিক ইউরোপ লুডেনডর্ফেরই মন্ত্রশিষ্য। আবিসিনিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া স্পেন পর্য্যন্ত এবং বর্ত্তমানে পোল্যাণ্ডেও এই রণনীতিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। জার্ম্মানরা এই পথ ধরিবে, ইহাতেই তাহাদের গর্ব্ব। কিছুদিন আগে হিটলার শক্তিবর্গকে শাসাইয়া বলিয়াছিলেন, আমি যে মুহূর্ত্তে হাত তুলিব, সেই মুহূর্ত্তে রাত্রির অন্ধকারে বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিবে। হিটলারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ জেনারেল গোয়েরিং জার্ম্মান বিমান বহরকে উদ্দেশ করিয়া কিছু দিন ...

জার্ম্মানীর বিমান বহর কেমন দুর্দ্ধর্ষ, তোমরা তাহা জান। হুকুম পাইলেই আমাদের শত্রুদের জন্য তাহারা নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিবে। শক্ত ঘা—এমন ঘা যে শত্রুরা একেবারে গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যাইবে। ত্বরিতবেগে আক্রমণ, আর বিজয় লাভ—জার্ম্মানদের ইহাই গর্ব্ব। এই উদ্দেশ্যে তাহারা উড়োজাহাজ, ট্যাঙ্ক এবং ডুবোজাহাজ লইয়া তৈয়ারী আছে। আমরা এমন কথাই তাহাদের জাঁদরেলদের মুখে ... শুনিয়া আসিতেছি। জার্ম্মানীর জাঁদরেলেরা হুকুম দিলেই পঙ্গপালের মত পক্ষ বিস্তার করিয়া জার্ম্মানদের উড়োজাহাজগুলি ইংরেজ ও ফরাসীদের উড়োজাহাজের ঘাঁটি চড়াও করিবে, ডুবোজাহাজগুলো ইংরেজ ও ফরাসীর জাহাজ ডুবাইয়া দিবে। জার্ম্মানেরা বোমা ফেলিয়া ইংরেজ ও ফরাসীর বিদ্যুতের কারখানা, গোলা-বারুদের গুদাম ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া দিবে এবং শহরগুলির জনসাধারণের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করিবে, এমন বিভীষিকার কারণ কম নয়।

কিন্তু কথা হইতেছে, বাস্তবিকপক্ষে কথায় যতটা শুনা যায়, কাজেও কি তাহাই সম্ভব? শুধু শূন্য হইতে বোমা ফেলিয়াই কি রণতরীগুলাকে অকেজো করা সম্ভব। উড়োজাহাজ বিধ্বংসী কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইংরেজের রণতরীগুলিতে সে সব বসান আছে, ঘা দিতে গেলে পতনের ভয়ও আছে। ইংরেজ ও ফরাসীর নৌ-বহর কম নয়, আকস্মিক আক্রমণে সেগুলি ধ্বংস করা সম্ভব নয়। রণতরীসমূহের প্রভাব যুদ্ধক্ষেত্রে এখনও দস্তুরমতই আছে। বিমান বাহিনীর দিক হইতে জার্ম্মানীর প্রাধান্য ইংরেজ ও ফরাসীর উপরে

ইংরেজ আইরিশ রক্ষী বাহিনী

শক্তিশালী, তাহাতেও জার্ম্মানীর যুদ্ধে জয়ী হইবার পক্ষে জোর বুঝা যায় না। উড়োজাহাজ আক্রমণের চরম পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে বার্সিলোনা অবরোধে। গত ১৯৩৮ সালের ১১ই মার্চ্চ ইটালীর শক্তিশালী বিমান-বহর মেজরকা দ্বীপের ঘাঁটি হইতে স্পেনের সাধারণতন্ত্রীদের বার্সিলোনা শহরের উপর বোমাবর্ষণ করিতে থাকে. তিন দিন. তিন রাত্রি অবিরত এই বোমা বর্ষণ চলে। উড়োজাহাজগুলি ভারী ভারী বোমা ফেলিয়াছিল। বার্সিলোনা শহরে ঐ সময় কুড়ি লক্ষ লোক ছিল এবং বার্সিলোনা এমন অরক্ষিত অবস্থায় ছিল যে, বিমানপথে আক্রমণকারীরা দিবালোকেই আক্রমণ চালাইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই আক্রমণের ফল কি হয়? তের-শত লোক নিহত হয়। বিদ্যুতের ঘাঁটিগুলির কাজ অবাধে চলে, রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়ার চলাচল বন্ধ হয় নাই, থিয়েটার-বায়স্কোপে আমোদ-প্রমোদ চলিতেছিল। বিমান আক্রমণে শহরের পতন হয় নাই। এক বৎসর কাল লড়াই চালাইয়া তবে ফ্রাঙ্কো শহর দখল করিতে পারেন। লণ্ডন এবং প্যারিস নিশ্চয়ই বার্সিলোনার চেয়ে সুরক্ষিত শহর। ফরাসী, বেল-জিয়ান এবং ওলন্দাজ দেশের সীমানার উপর উড়োজাহাজের শব্দ ধরিবার ঘাঁটি সমস্ত করা রহিয়াছে, শত্রুর জাহাজের আওয়াজ পাইবামাত্র, নিজেদের বিমান বাহিনীকে সতর্কতা-মূলক সংকেত দেওয়া হয়। উড়োজাহাজ-ধ্বংসী কামানের পাল্লা এখন অনেক বাড়ান সম্ভব হইয়াছে। আগে যেখানে চার-খানার মধ্যে তিনখানা উড়োজাহাজ নষ্ট হইত, এখন সেখানে উড়োজাহাজ-ধ্বংসী কামান ছুড়িয়া স্পেনের রণাঙ্গনে পাঁচ-খানার মধ্যে চারখানা উড়োজাহাজ ধ্বংস করা সম্ভব হইয়াছে।

ট্যাঙ্কযোগে দ্রুতবেগে আক্রমণ করিয়া জার্ম্মান বাহিনী পশ্চিম দিকে সুইজারল্যাণ্ডের পথে এইভাবে ফ্রান্সে হানা দিতে পারে, কিন্তু তাহা করিতে হইলে সুইজারল্যাণ্ড বা বেল-জিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ আগে করিতে হইবে। জার্ম্মান সামরিকগণ এই গর্ব্ব করিয়া থাকেন যে, যদি তাঁহারা ভাল রাস্তা পান এবং আবহাওয়া যদি ভাল থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ৯০ হইতে একশত মাইল পর্য্যন্ত একদিনে অতিক্রম করিতে পারেন। এ হিসাব কতটা পাকা বলা কঠিন। স্পেনের লড়াইতে ইটালীর যন্ত্রপেত বাহিনী গুয়াডালাজারা হইতে মাদ্রিদ পর্য্যন্ত পথ দিনে পঞ্চাশ মাইল হিসাবে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে। ফল এই হয় যে, ট্যাঙ্কগুলি অনেক আগে চলিয়া যায়, অনুগামী সেনারা ট্যাঙ্কের সঙ্গে গতি বজায় রাখিতে পারে না। তাহার ফলে, উড়োজাহাজের আক্রমণে সৈন্যদল বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর এই নীতি বদলাইয়া সাবেকী নীতি অনুসরণ করা হয় এবং ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনী সপ্তাহে কুড়ি মাইলের বেশী আগাইতে পারে নাই। অথচ তাহাদিগকে লড়াই করিতে হইয়াছিল ক্যাটালোনিয়ার কৃষক-দের সঙ্গে।

লণ্ডন রক্ষা ব্যবস্থায় বালুকাপূর্ণ থলিয়া

ট্যাঙ্ককে বাধা দিবার জন্য অনেক নূতন তোড়জোড় উদ্ভাবিত হইয়াছে। রাস্তায় গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেগুলি ঘাস দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। ট্যাঙ্ক গর্ত্তে পড়িয়া নষ্ট হয়। ইহা ছাড়া জায়গায় জায়গায় মাটির নীচে মাইন পুঁতিয়া রাখা হয়। উপরে চাপ পাইবামাত্র সেগুলি বিদীর্ণ হয়। কিম্বা তার দূরে

লুকাইয়া থাকিয়া মাইন ফাটান হয়। যে সব ট্যাঙ্ক এই সব বাধা অতিক্রম করে, সেগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে কামানের মুখে গিয়া পড়িতে হয়। নূতন ধরণের ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী বন্দুক আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার গুলিতে ট্যাঙ্ক ভাঙ্গিয়া যায়। স্পেনে দেখা গিয়াছে সাধারণতন্ত্রীদের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ট্যাঙ্ক পাঁচ হইতে দশ মাইলের বেশী দিনে আগাইতে পারে নাই। সুতরাং জার্ম্মান বাহিনী ট্যাঙ্কযোগে ফ্রান্স অভিদ্রুত করিবে, ইহা সহজ ব্যাপার নয়। হঠাৎ আক্রমণের চাতুর্য্য এইভাবে নষ্ট হইবে।

জার্ম্মানী তাহার ডুবো জাহাজ দিয়া ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সমুদ্র অবরোধ করিবে, এমন আশা নিশ্চয়ই করিতেছে। কিন্তু এ একটা হুমকী মাত্র। গত ১৯১৭ সালে যুদ্ধ ঘোষণার পর জার্ম্মানেরা ডুবো জাহাজে জোর লড়াই করিয়াছিল এবং ঐ সময়ের মধ্যে এক হাজারের অধিক জাহাজ তাহারা ডুবাইয়া দেয়; কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে দেখা যায় যে, ডুবো জাহাজে বড় কিছু সুবিধা হয় না। ডুবো জাহাজের তৎপরতা সত্ত্বেও ১৫ শত সওদাগরী জাহাজ ঐ সময় ইংলণ্ডে গিয়াছিল। মাত্র ১০ খানা টর্পেডোতে ডুবে। সমুদ্রে মাইন পাতিয়া ডুবো জাহাজকে যথেষ্ট কাবু রাখা যায়। মাইনের এই জালে উত্তর সমুদ্র এবং ইংলিশ চ্যানেলে জার্ম্মানকে বিশেষ কাবু থাকিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, উড়ো-জাহাজ ডুবো-জাহাজ প্রভৃতির কৌশলে ডুবো-জাহাজ নষ্ট করা যায়। এই সব কৌশল অবলম্বন করিয়া মিত্রশক্তি জার্ম্মানীর ১৯৯ খানা ডুবো-জাহাজ ধ্বংস করিয়াছিল।

তারপর আসে যুদ্ধের পরের কথা। ১৯১৪ সালে লড়াই বাঁধিবার আগে কনস্তান্তিনোপলের জার্ম্মান রাজদূত মার্কিন রাজদূতকে বলিয়াছিলেন—আমরা যদি ৪০ দিনের মধ্যে প্যারিসে না পৌঁছিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইবে। আজও এই কথা সত্য। চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করাতে জার্ম্মানীর বল কিছু অবশ্য বাড়িয়াছে; কিন্তু জার্ম্মানীর সৈন্য দল খুব সুশিক্ষিত নয়। আধা সেনাই শিক্ষা-নবিশ গোছের। তাড়াহুড়া করিয়া চলনসই গোছের শিখাইয়া লওয়া হইয়াছে। জার্ম্মান সামরিকগণের বিশ্বাস এই যে, গত যুদ্ধে তাহারা এক কোটি লোক নামাইতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহারা ৬০ লক্ষের অধিক সৈন্যকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তোড়জোড় দিয়া নামাইতে পারিবেন না।

ফ্রান্সের অবস্থা—ইটালী যুদ্ধে যোগ দিলে কিছু সঙ্কটাপন্ন হয় বটে, কিন্তু জার্ম্মানীকে অবিরত পূর্ব্ব রণাঙ্গনে নজর রাখিতে হইবে, ইহার ফলে সে তাহার খুব কম সৈন্যকেই পশ্চিমদিকে পাঠাইতে পারিবে। ফ্রান্সের পশ্চিমদিক যথেষ্ট সুরক্ষিত।

তারপর জার্ম্মানীর আর্থিক পরিস্থিতি। কয়েক বৎসর ধরিয়াই ...

লণ্ডন হাসপাতালে গ্যাস মুখোস ব্যবহার শিক্ষা

কল-কারখানার কাজের বিরাম কোনদিন ঘটে নাই। কাজের চাপে রেলপথের অনেক গাড়ী খারাপ হইয়া গিয়াছে। শতকরা একখানা গাড়ী মেরামত করা দরকার। 'ফ্রাঙ্কফার্টার জিটাং' পত্র বলিতেছেন, কল-কারখানার যন্ত্রপাতির এমন অবস্থা যে, সেগুলিকে না বদলাইলে কলে কাজ পাইবার উপায় নাই। অতিরিক্ত শ্রমের ফলে শ্রমিকদের সংখ্যাও কমিয়া [illegible]। আর খাটুনি চলে না। কাঁচা মালের দিক হইতেও মুস্কিল আছে। দেশের যেখানে যে মাল মজুত ছিল, সব খুঁটিয়া কাজে লাগান হইয়াছে। বার্লিন শহরের চারিদিকে যে লোহার বেড়া ছিল, তাহাকে পর্য্যন্ত গালাইয়া কাজে লাগান হইয়াছে। পরিবর্ত্তনস্বরূপে যত কিছু চালান যায়, দেখা হইয়াছে। এমন অবস্থায় ফরাসী, ইংরেজ, বৃটিশ উপনিবেশসমূহের ধনবলের, জনবলের সঙ্গে টেক্কর দেওয়া জার্ম্মানীর পক্ষে কঠিন। জার্ম্মানীর বড় বড় লৌহ খনিগুলি এখন ফরাসী সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সুইডেনের নিকট হইতে জার্ম্মানী লোহা কিনিতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য টাকার তো দরকার। জার্ম্মানীর স্বর্ণ-ভাণ্ডার এখন শূন্য সে ইহুদীদের ধন-রত্ন লুঠ করিয়াছে। যত সূত্রে যত অর্থ ছিল, সব নিঃশেষ করিয়াছে। সুইডেন যদি ইংরেজের কাছে জিনিষ বেচিতে পারে, তাহা হইলে জার্ম্মানীর কাছে বেচিবে কি? ভরসা একমাত্র রুশিয়া।

সর্ব্বাপেক্ষা সংকট হইতেছে ঘরোয়া ব্যাপারে। ১৯১৪ সালে জার্ম্মানীর যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা নাই। উৎসাহশীল যুবকেরা আছে বটে, কিন্তু বয়স্করা এখন উৎসাহ-উদ্যমবিহীন। অবিরত দুঃখ-দুর্দ্দশা, বিপর্য্যয় এবং উত্তেজনায় তাহারা শ্রান্ত। অনেকে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের অনুরাগী নয়, হিটলারী দলকে তাহারা বিদ্রোহী দল বলিয়া মনে করে। হিটলারের জনমত-দলন নীতির জন্যও দেশের অনেক লোকের বিরক্তি তাহার উপর আছে।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন

বিধির বিধান

(৩৮৩ পৃষ্ঠার পর)

আজ নার্সের চোখও যেন ছল ছল করিয়া উঠিল, এত আশা দিয়া শেষে... 'ডাক্তারবাবু,' তাহার গলা গাঢ়, 'দেখুন আমার মনে হয়, আর স্যালাইন দিয়ে লাভ নেই। যদি মরণের পথ থেকে ওকে না ফিরিয়ে আনতে পারেন ত শেষ সময়ে শান্তিতে মরতে দিন।' আর বলিতে পারে না।

ডাক্তারবাবু কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

নার্স একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে প্রণবের মুখের দিকে। একটু পরেই প্রণবের মুখ একটু বিকৃত হইয়া উঠে, তারপর শান্ত হয়ে যায় সব।

নার্স অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে প্রণবের মুখের দিকে।

ক্ষমাও চীৎকার করিয়া দৌড়াইয়া আসে, ওগো, জীবনে কোন সুখই ত দিলে না, শুধু কি একাদশীর উপোষ করবার জন্যে আমায় রেখে গেলে, ওগো! ওগো! আর বলিতে পারে না, চলিতেও পারে না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায় সেখানে।

খোকাও দৌড়াইয়া আসে, ক্ষমার মুখে হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকে,—মা, মা—মাগো।

বিষ প্রয়োগে হত্যা

শ্রীমতী অঞ্জলি দেবী

সুদূর অতীতকাল হইতেই বিষপ্রয়োগ রাজনীতির এক কূট কৌশল ছিল। কোনও অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসৃত করিতে, প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী নর-নারীকে হত্যা করিয়া পথের কণ্টক দূর করিতে, রাজ্যপাট বা বিভবসম্পদ আয়ত্ত করিতে বাস্তব উত্তরাধিকারীর প্রাণ বিনাশ প্রভৃতি কত কত ক্ষেত্রেই না গোপনে বিষপ্রয়োগ করা হইত। আহার্য, বিশেষ করিয়া পানীয়ের সহিত অতি সঙ্গোপনে বিষ মিশ্রিত করিয়া এই কার্য সাধন করা হইত।

প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় হীরকচূর্ণ, সর্পবিষ, অহিফেন, ধুস্তুর প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া কোন কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নিধন সাধন করা হইয়াছে। খাদ্য অপেক্ষা পানীয়ের সহিত এই সকল বিষ প্রয়োগ করা সহজ এবং বিষ-ক্রিয়া ব্যর্থ হইবার বা মারাত্মক না হইবার আশঙ্কা থাকে খুব কম। অনেক স্থলেই এই প্রকারে বিষপ্রয়োগকারীর কারসাজি ধরিয়া ফেলা শক্ত ব্যাপার হয়।

সংস্কৃত নাটকাদি হইতে জানিতে পারা যায় আহার্যের সহিত বিষপ্রদান না করিয়া অন্য নানা প্রকার কৌশলেও বিষ-ক্রিয়া উৎপাদন করা হইত—যেমন, বিষাক্ত পরিচ্ছদ, বিষকন্যা প্রভৃতি। আততায়ীর পক্ষে বিষাক্ত অস্ত্র ব্যবহার এবং তাহা দ্বারা কোন প্রকারে সামান্য একটু ক্ষত উৎপন্ন করিতে পারিলেই উদ্দেশ্য সফল হইত।

কিন্তু সেকালের রাজা-রাজড়াগণও এই বিষয়ে কম সতর্ক ছিলেন না। তাঁহারা পানীয়ে বিষমিশ্রণ ধরিয়া ফেলিবার জন্য, কথিত আছে, গণ্ডারের খড়্গের দ্বারা প্রস্তুত পানপাত্র ব্যবহার করিতেন। মদ্য, মধু অথবা যে সকল স্নিগ্ধ পানীয় নৃপতি ও আমির ওমরাহগণ শ্রান্তি অপনোদনের জন্য পান করিতেন, তাহা কখনই সাধারণ পাত্রে করিয়া গ্রহণ করিতেন না। উহা নির্দোষ কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য গণ্ডারের খড়্গ নির্মিত পাত্রে তাহা ঢালিয়া দিয়া লক্ষ্য করা হইত। যদি পানীয়ে বিষমিশ্রিত থাকিত, তাহা হইলে নাকি ঐ খড়্গ-নির্মিত পাত্র চৌচির হইয়া যাইত। এই কারণে সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গণ্ডারের খড়্গ-নির্মিত পানপাত্র সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন।

মিশরের টলেমি রাজবংশের শেষ রাণী ক্লিওপেট্রা সর্প-দংশনে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী রহিয়াছে। দিল্লীর বাদশাহদের হারেমে অনেক বেগম হীরকাঙ্গুরীয় চুম্বন করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে বলিয়াও শোনা যায়। ম্যাঙ্গোষ্টিনের সহিত অতিরিক্ত মাত্রায় চিনি মিলাইয়া যে মিশ্র পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাতেও নাকি প্রবল বিষ লক্ষণ উপস্থিত হয়, এই প্রকার ছিল মলয় অঞ্চলের সেকালের লোকেদের বিশ্বাস। আত্মহত্যা করিতে এখনও ঐ অঞ্চলে এই দ্রব্যটির মাঝে মাঝে ব্যবহার হয় বলিয়া শোনা যায়। ঠিক যেমন হলুদ রঙের কলকে ফুলের গাছে যে বীজফল উৎপন্ন হয়, উহার শাঁস বাটিয়া খাইয়া এককালে আমাদের দেশে অনেকে আত্ম-বিনাশ করিতে চেষ্টা করিত। ইংলণ্ডে আইভিলতা এই প্রকার বিষাক্ত বলিয়া কথিত হয়। একটি বালক ছুরির দ্বারা প্রাচীরের উপরকার আইভিলতা কাটিয়া ঐ ছুরির দ্বারা আপেল কাটিয়া খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আধুনিক কালে বিষপ্রয়োগে হত্যার প্রয়াস যে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে, এমন নয়। বরং পাশ্চাত্যে বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এমন সকল যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, যাহার ফলে বিষপ্রয়োগ যেন অনেকটা সহজসাধ্যই [illegible] দাঁড়াইয়াছে। সামান্য একটি পিনের খোঁচার মত ইনজেকশনই জীবন নাশের পক্ষে যথেষ্ট। অনেক সময় গহনাদির ভিতর এমন চতুরতায় ক্ষুদ্রাকারের হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ বিষ সহ লুক্কায়িত রাখা হয় এবং তাহা এমন সামান্য একটু চাপে স্বকার্য সাধন করে যে, সেই সকল ক্ষেত্রে বিষপ্রয়োগের ব্যবস্থাটির সন্ধান লাভই প্রায় অসম্ভব থাকিয়া যায়।

সাধারণত ভারতবর্ষ অবশ্য এই নির্মম পাশবিকতায় বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই পাশ্চাত্যের মত, তথাপি কয়েক বৎসর পূর্বেকার এতদঞ্চলের 'পাকুড় মামলা' বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। উহাতে প্লেগ বীজাণু ইনজেকশন করা হইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল।

বিষ প্রয়োগ ভারতেও তাই বিরল বলা যায় না। সন্দিগ্ধ স্বামী, লোভী উত্তরাধিকারী, আশাহত নরনারী, নিঃসন্দেহ হিতৈষীর বেশে নরঘাতক এবং সাধুবেশধারী তস্কর বা লুণ্ঠনকারী—ইহারা সাধারণত বিষ প্রয়োগ দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ যে সকল বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহার ভিতর ধুতুরাই সর্বাপেক্ষা বহুল ব্যবহৃত, যদিও আর্সেনিকই (দারমুজ বা সেঁকো বিষ) হইল সর্বাপেক্ষা মারাত্মক, তথাপি ধুতুরার পরই উহার ব্যবহার এই দেশে। ইহা ছাড়া আফিম, অ্যাকোনাইট, পারদ, ভাং, সুরাসার, মেথিলেটেড স্পিরিট, স্ট্রিকনিন্ এবং সায়েনাইডস্ প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়। ইহার ভিতর সায়েনাইডস ব্যতীত অন্যগুলি সংগ্রহ করা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়।

যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষকের ১৯৩৮ সালের বার্ষিক বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত ঘটনা-সমূহের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে:

বিজনোর হইতে একটি ঘটনার বিষয় জানিতে পারা যায় যে, এক রমণীর মৃতদেহ পাঁচ মাস পরে সন্দেহের দরুণ বিশেষ পরীক্ষা করা হয়। উহার অন্ত্রাভ্যন্তর হইতে প্রায় ২৪ গ্রেন আর্সেনিক ট্রাইওক্সাইড নিষ্কাশিত হয়।

যুক্তপ্রদেশ অঞ্চলে ভাংয়ের সরবৎ পান সাধারণ রীতি। উহাকে ঐ প্রদেশে বলা হয় 'ঠাণ্ডাই'। রামফল শিং নামক এক ব্যক্তির প্রেমচাঁদ নামক অপর এক ব্যক্তির সহিত ছিল বিরোধের ভাব। একদিন ঐ ব্যক্তির সহিত 'ঠাণ্ডাই' পান করিবার পর চারি ঘণ্টার ভিতর রামফল শিংয়ের মৃত্যু হয়। আত্মীয়স্বজনের সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায়, পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ কর্তৃক প্রেরিত এই মৃতদেহের নাড়ি-ভুঁড়ি হইতে সাড়ে উনচল্লিশ গ্রেন আর্সেনিক ট্রাইওকসাইড বাহির করা হয়।

আর একটি ঘটনায় প্রকাশ—বালা এবং মাধো একদিন ভুলির অনুরোধে তাহার সহিত চা-পান করে। চা-পান করিবার পর হইতেই তাহাদের পাকস্থলীতে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হয়, তাহারা বমি করিতে থাকে। কিন্তু কিছুকাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদের দুইজনেরই অন্ত্র হইতে আর্সেনিক বাহির করা হয়। চায়ের ভিতর এবং উহারা দুইজনে যে বমন করিয়াছে, তাহাতেও কিছুটা আর্সেনিক পাওয়া যায়।

নুরমহম্মদ এবং তাহার খুড়ো একদিন তাড়ি পান করে। ঐ তাড়ি নুরমহম্মদের ভৃত্য কোনও দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়া দেয়। তাড়ি পানের তিন চার ঘণ্টা পর হইতে উহাদের দুইজনের শরীরেই বিষক্রিয়া লক্ষিত হয়। কিন্তু খুড়া কোন-প্রকারে বাঁচিয়া যায়, নুরমহম্মদের মৃত্যু ঘটে। উহাদের যে বমন হয়, তাহাতে আর্সেনিক পাওয়া যায় এবং অবশিষ্ট তাড়িতেও বেশী পরিমাণ আর্সেনিক রহিয়াছে বলিয়া পরীক্ষায় নির্ণীত হয়।

সম্প্রতি পাটনা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, এই প্রকারে বিষপ্রয়োগ দ্বারা বেহুঁস করিয়া লুণ্ঠন করিবার কার্যে আজকাল নারীও ব্যাপৃত হইতেছে।

সারণের অন্তর্গত কোনও গ্রামে দুইটি রমণী উপস্থিত হয়। তাহাদের ভিতর বয়োজ্যেষ্ঠাটি মাতা ও কনিষ্ঠাটি তাহার কন্যা বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। সাধারণ চুড়ি বিক্রেতা হিসাবেই এই দুই রমণী গৃহে গৃহে গমন করে। স্ত্রীলোক বলিয়া সকল গৃহেরই অন্দরমহলে প্রবেশলাভ করিতে উহাদের বেগ পাইতে হয় নাই। উহারা গৃহের অধিবাসিনীদের সহিত আলাপ জমাইয়া ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। কয়েক বাড়ী ঘুরিয়া একটি গৃহে যাইয়া রমণী দুইটি সাদর আতিথেয়তা প্রাপ্ত হয়। প্রকাশ, সেই সময় যখন সকলে মিলিয়া আহার করিতে থাকে, ঐ দুই রমণী নাকি পরিবারের গিন্নি ও অন্যান্যদের আহার্যের ভিতর চেতনালোপকারী ঔষধ মিশাইয়া দেয়। আহারের কিছুক্ষণ পরেই পরিবারস্থ সকলে সংজ্ঞা হারাইয়া লুটাইয়া পড়ে। এই সুযোগে রমণীদ্বয় গৃহিণী ও অন্যান্যের গহনাপত্র এবং নানাবিধ তৈজস সামগ্রী ও পরিচ্ছদাদি সংগ্রহ করিয়া অনায়াসে সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পরিবারস্থ লোকেরা যখন চেতনা ফিরিয়া পাইল, তখন রমণীদ্বয়ের লুণ্ঠনের ব্যাপার তাহাদের আর জানিতে বাকী রহিল না। তৎক্ষণাৎ পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইল। পুলিশ এই দুই রমণীর সন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক প্রেরণ করিয়াছে। এই দুই রমণী নাকি ঐ অঞ্চলে কাহারও পরিচিত নয়। ঐ গৃহবাসিনীগণও উহাদের ইহার পূর্বে আর কখনও দেখে নাই।

জৌনপুর হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ভগবানদীনের স্ত্রী দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যাধিতে ভুগিতেছিল। এক সাধু আসিয়া একদিন বলিল যে, কোনও প্রেতযোনি তাহার দেহকে আশ্রয় করিয়াছে; দুইদিনের ভিতর সাধু তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিবে। সাধু তখন কতকগুলি 'পেড়া' মহাবীরজীর প্রসাদ বলিয়া ঐ রমণীকে দেয়। প্রসাদের আশ্চর্য গুণ সম্বন্ধে সাধু বলিয়া দেয়—যে ব্যক্তি এই প্রসাদ খাইবে, তাহার উপর আর কোন ভূত 'ভর' করিতে পারিবে না। রমণী ঐ পেড়া বাড়ীর সকলকে খাইতে দেয় এবং নিজেও গ্রহণ করে। ঐ মিষ্টান্ন খাইবার কিছুকাল পরেই বাড়ীর সকলেই সংজ্ঞা হারায়। এই সুযোগে সাধু উহাদের টাকাকড়ি, গহনাপত্র সব লইয়া সরিয়া পড়ে।

ইহা ছাড়া লাড্ডু, ডাল এবং সরবতের সহিত ধুতুরা প্রদানের বহু ঘটনা জানিতে পারা গিয়াছে। রেলগাড়ীতে কিম্বা ষ্টেশনের মুশাফিরখানায় পানের সহিত বিষপ্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া সর্বস্ব লুণ্ঠনের সংবাদও কয়েকস্থলে পাওয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে আধুনিক কালেও বিষপ্রয়োগের প্রায় সেই পুরাতন পদ্ধতিই অনুসরণ করা হইতেছে। তুলনায় যে প্রাচীন কাল হইতে বর্তমানে এই প্রকার চতুর গোপন প্রয়াস সংখ্যায় কমিয়া গিয়াছে, এমন বিশ্বাস করিবার কোন হেতুই নাই। কেবল প্রসিদ্ধ শহরাঞ্চল হইলে এই প্রকার বিষক্রিয়ার চিকিৎসাদি, প্রতিষেধক ব্যবস্থা প্রভৃতি তবুও করা যায়, কিন্তু পল্লীঅঞ্চল হইলে অধিকাংশ স্থলেই হাতুড়ে বাদ্যের হাতে অথবা ওঝা প্রভৃতির খর্পরে বাধ্য হইয়াই রোগীকে রাখিতে হয়। তবে ভরসার কথা এই যে, এখনও সুসভ্য পাশ্চাত্যে গোপনে যেপ্রকার চতুরতার সহিত নিপুণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার সাহায্য লইয়া নিতান্ত অজানিত উপায় সকল কাজে লাগান হয়, সেই সকল সেয়ানা ফন্দি-ফিকির এই দেশে প্রচলিত হইবার মত বিজ্ঞানে পারদর্শিতা এই দেশের দুষ্কৃতকারীদের এখনও জন্মে নাই।

২৫ বৎসর পরে

সুদূর ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতেছে আজিকার বিজ্ঞানাগারে। সম্প্রতি আমি ৫০ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রভাবান্বিত করিবে এরূপ কি কি কার্য্য আপনাদের বিজ্ঞানাগারে সৃষ্টি হইতেছে? তাঁহারা যে উত্তর দিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানাগারসমূহে এমন সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত হইতেছে যাহার ব্যবহারে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে অপরিসীম পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

যে সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহা যদি এখনই ব্যবহার করা আরম্ভ হইত তবে মনুষ্য সমাজ এক ধাপেই ২৫ বৎসর অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিত। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, বিজ্ঞানাগারে যে সমস্ত আবিষ্কার হয় তাহা জনসাধারণের মধ্যে চলতি হইতে প্রায় ৫০ বৎসর লাগে, উদাহরণ যথা—১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে টেলিভিশন উদ্ভাবিত হয় এবং ২৭ বৎসর পূর্ব্বে ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়। তাহা এত-কাল পরে লোক সমাজে গৃহীত হইয়াছে। তারপর গত ৩০ বৎসর যাবৎ বৈদ্যুতিক তরঙ্গমালার পরীক্ষা চলিতেছে। উহার ফলে দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক গৃহে জীবনযাত্রার প্রণালী পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এখন তৈল বা কয়লা না পুড়িয়াও ঘর গরম রাখা চলে। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ঘরের বাতাস গরম রাখে। এরূপ বৈদ্যুতিক আলোও উদ্ভাবিত হইয়াছে যাহার উষ্ণ রশ্মিমালা বরফ পরিবৃত পাত্রে রক্ষিত ডিমকে পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিতে পারে।

হিমাঙ্গ রোগীর দেহে এই আলোক সাহায্যে তাপসঞ্চার করা যাইতে পারে। বরফের মত ঠাণ্ডা ঘরে বসিয়া এই আলোক সাহায্যে লোককে আমি পরম আরামে কাজ করিতে দেখিয়াছি।

মনে মনে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের এক গৃহিণীকে কল্পনা করুন। শীতকাল, কয়লা হইতে প্রস্তুত মোজা এবং কাচের সূতায় প্রস্তুত বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি রন্ধনশালায় বসিয়া। জানালা খোলা। দার্জ্জিলিং-এর শীত। হু হু করিয়া বাতাস আসিতেছে। তিনি পরম আরামে বসিয়া বৈদ্যুতিক প্রদীপ সহায়ে জলের ক্ষেতে জন্মান টমেটোর চাটনী রান্না করিতেছেন। রান্না শেষ করিয়া তিনি টেলিভিশন যন্ত্র খাটাইয়া দিয়া দুনিয়ার কোথায় কি ঘটিতেছে দেখিতে লাগিলেন। ঘরবাড়ী ঝাড়ু দিবার দরকার নাই। সব বৈদ্যুতিক তরঙ্গের দ্বারা আপনা-আপনি চলিতেছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই ঝাড়ুদারের কার্য্য চলিতেছে তাহার নাম Electrostatic Precipitators (ইলেকট্রোষ্ট্যাটিক প্রেসি-পিটেটরস্)। এই যন্ত্র ব্যবহারে ঘরের কিছুই ময়লা হয় না।

এ গেল গরম ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা। তারপর ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থাও আছে। বহু হোটেলে এবং মাংস প্রভৃতির দোকানে অতি সামান্য ব্যয়ে আল্ট্রাভায়লেট প্রদীপ ব্যবহৃত হইতেছে।

রোগের বীজাণু বিনষ্ট করিবার জন্য বহু আরোগ্যশালায় এখন ঐ প্রদীপের রশ্মি ব্যবহৃত হইতেছে। এমন দিন আসিবে যখন কোনও জনপদধর্ষী ব্যাধি দেখা দিলে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীরা লোককে পৃথক পৃথক-ভাবে বিভিন্ন প্রকারের সাবধানতা অবলম্বন করিতে না বলিয়া একস্থানে সমবেত করিয়া সংক্রামক ব্যাধির জীবাণুনাশক আলোকের ঝরণা ধারায় স্নান করাইয়া দিবে—রোগ আর তাহাদের দেহে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে মানুষ সর্ব্বশক্তির আধার মহাদ্যুতি সূর্য্যের বিকীর্ণ অবাধ শক্তিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। গত শরৎকালে স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউটের ডাঃ সি. জি আবট একটি সৌরযন্ত্রের পেটেণ্ট লইয়াছেন। এই যন্ত্র সাহায্যে জলকে বাষ্পে পরিণত করা যায়, কয়লার দরকার হয় না, খরচও কয়লা অপেক্ষা অধিক নহে। য়্যালুমিনিয়ামের একখানি মালসার আকারের মুকুরে সূর্য্য-রশ্মি ধরা হয়। সে সমস্ত রশ্মি একটি কেন্দ্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রবল উত্তাপ সঞ্চার করে। সেই উত্তপ্ত রশ্মিগুলি একটি জলবাহী নালিকার মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র জল বাষ্পে পরিণত হয়।

ডাঃ আবটের যন্ত্র সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার রন্ধনকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। ভোরবেলায় বা রাত্রিতে সূর্য্য উঠে না, সুতরাং সে সময় এই যন্ত্র ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু যে সময় সূর্য্য-রশ্মি খুব প্রচুর সে সময় এই যন্ত্র সাহায্যে অন্যান্য জিনিষ উত্তপ্ত করিয়া তাহা তাপাবিকরণ নিরোধক প্রণালীতে উত্তাপকে আটক রাখা যায় এবং সেই তাপ প্রয়োজন মত ব্যবহার করা যায়। কালিফোর্নিয়ার অনেক অঞ্চলে সূর্য্যালোক প্রচুর। সে সমস্ত অঞ্চলে বহু লোক এই যন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছে।

এক মাসে সূর্য্য হইতে ভূমণ্ডলে যে শক্তি বর্ষিত হয়, পৃথিবীর সমস্ত কয়লা একসঙ্গে জ্বালাইলেও সে শক্তির সমান হইবে না। বর্ত্তমানে এক কেন্দ্র হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন বহু স্থানে সঞ্চারিত হয়, একদিন হয়ত সেরূপ-ভাবেই এক কেন্দ্রে উৎপাদিত এই তাপশক্তি বহু কেন্দ্রে সঞ্চারণের ব্যবস্থা হইবে।

সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ যে শক্তি সমগ্র নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া আছে সেই শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করিতে পারার যন্ত্রও উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই সমস্ত যন্ত্রের ক্রমে ক্রমে যে উন্নতি সাধিত হইতেছে যদি তাহা চলিতে থাকে তবে আমরা প্রত্যেক বাড়ীতে দিনরাত সূর্য্য হইতেই প্রয়োজন মত আলোক ও তাপ পাইব। বৈদ্যুতিক আলোর জন্য কোনও বিদ্যুৎ উৎপাদক কারখানা বা রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য দাহ্য পদার্থের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। পরিষ্কার দিনে একদিনে একটি সাধারণ বাড়ীর ছাদে যে বৈদ্যুতিক শক্তি বিচ্ছুরিত করে তাহাতে একটি পরিবারের এক বৎসরের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

অদ্যকার দিনে ইহা অবশ্যই পরীক্ষাধীন কল্পনা। আজ যাহা কল্পনা কাল তাহাই বাস্তবে পরিণত হয়। একদিন

শক্তিকে বন্দী করার চেষ্টা কেবল যে ব্যক্তিগতভাবে কোনও কোনও বিজ্ঞানী বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান করিতেছেন তাহাই নহে, এই চেষ্টার জন্য ম্যাসাচুসেট্স্ ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজি সম্প্রতি ৬ লক্ষ ডলার ব্যয়-বরাদ্দ করিয়াছেন। এই পরীক্ষা যদি সফল হয় তবে অদ্ভুত সমস্ত কার্য্য দেখা যাইবে। স্বল্প মূল্যে প্রচুর সৌরশক্তি সাহারা, আরব, প্যালেস্টাইনের মরভূমির বুকে হয়ত কুমুদ কহ্লার শোভিত উদ্যানবাটিকা ফুটাইয়া তুলিবে: প্রচুর আলোক এবং উত্তাপ পাইয়া সূর্য্যহীন দেশে হাসি ফুটিবে; অনুর্ব্বর ভূমি উর্ব্বর হইবে। সেদিন যদি কোনও অঞ্চলের জন্য যুদ্ধ হয়, তবে তাহা কয়লা বা তৈল সমৃদ্ধ অঞ্চল অধিকারের জন্য হইবে না—যুদ্ধ হইবে সূর্য্যালোকদীপ্ত মরুভূমিগুলির জন্য।

অধুনা আমাদের গৃহের আলোক ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্ত্তন হইতেছে। এতকাল বৈদ্যুতিক আলো বিকীর্ণ হইত উত্তপ্ত তার হইতে। এখন আলোক নালিকায় তার না দিয়া তাহা পারদ-বাষ্পে পূর্ণ করা হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ এই বাষ্পের ভিতর যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাহা একপ্রকার আলোক-তরঙ্গ, কিন্তু চক্ষে দেখা যায় না। আলোক নালিকার আভ্যন্তরীণ প্রাচীর এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থে মণ্ডিত থাকে। পারদ বাষ্পের অদৃশ্যতরঙ্গ এই রাসায়নিক পদার্থকে আঘাত করিলে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এই জাতীয় আলোকের বহুল প্রচলন হইয়াছে। এই আলো বিভিন্ন রং-এ পাওয়া যায়। সাধারণ একটি আলোকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ করিলে যে পরিমাণ আলোক পাওয়া যায় এই আলোকে সে পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ করিলে ৩০ হইতে ৫০ গুণ অধিক আলোক পাওয়া যায়।

ঘরের মধ্যে দেওয়ালগুলি এমন এক পদার্থ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে অদৃশ্য স্থান হইতে আলট্রাভায়লেট রশ্মি পতিত হইলে আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইবে। এরূপ করিলে ঘরের সর্ব্বত্র সমান আলো হইবে।

সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হইতে মানুষ তাহার আচ্ছাদনের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে বল্কল বা আঁশ, পশুর চর্ম্ম বা লোম হইতে। গত বৎসর এক বিজ্ঞানী এক প্রকার কৃত্রিম আঁশের পেটেণ্ট লইয়াছেন। উহার নাম দিয়াছেন নাইলন (Nylon). উহা কয়লা, হাওয়া এবং জল হইতে প্রস্তুত করা যায়। এই আঁশের সূতা মাকড়সার জালের ন্যায় সূক্ষ্ম, কিন্তু ইস্পাতের মত পোক্ত। নাইলনের উপর টেক্কা মারিয়াছে ভিনিয়ন (Vinyon)—ইহা পেট্রোলিয়াম জাত এক প্রকার পদার্থ হইতে উৎপন্ন করা যায়। ইহা খাপে না, আগুনে পোড়ে না, জলে ভিজে না, রেশম অপেক্ষাও কোমল। এই সমস্ত কৃত্রিম সূতা শুধু যে রেশমকেই বিতাড়িত করিবে তাহা নহে, বস্ত্রশিল্পে তুলা ও পশমকেও হার মানাইবে। তাহা হইলে জাপানের কৃত্রিম রেশম মারা যাইবে এবং জাপানের আর্থিক জগতে বিপর্যায় দেখা দিবে।

কাচের সূতায় কি কাপড় হয় না? হইতেছে। কাচ হইতে যে সূতা হয় তাহার আট গাছি এক সঙ্গে পাকাইলে মানুষের এক গাছি চুলের সমান মোটা হয়। এই সূক্ষ্ম কাচতন্তু পাকাইয়া সূতা করা হয়। তারপর সাধারণ তাঁতে উহা বয়ন করা চলে। কাচের সূতার কাপড় বেশ উজ্জ্বল, মোলায়েম এবং গরম হয়। কিন্তু দোষ এই যে, উহা অত্যন্ত ভারী হয়, আর এখন পর্য্যন্ত উহা সস্তা হয় নাই। বর্ত্তমানে উহা কেবল শিল্প কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। শীঘ্রই টুপি, ব্যাগ প্রভৃতিতে কাচের কাপড়ের পাটি দেখা যাইবে। ১৯৬৪ খৃঃ নাগাত কাচের সূতায় আমাদের অনেক রকম বস্ত্র হইবে।

কাচ চলিতেছে তূলাকে তাড়াইতে। এদিকে আবার সাধারণ কাচেরও এক নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী মাথা নাড়া দিয়া উঠিতেছে। তাহা হইতেছে কয়লা হইতে প্রস্তুত রজন। সাধারণ কাচ আলট্রাভায়লেট রশ্মি বিকিরণ করিতে পারে না, কিন্তু রজনের কাচ তাহা পারে। ইংল্যাণ্ডের ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ এই রজনের কাচ হইতে লেনস এবং চশমা প্রস্তুত করিতেছেন। সম্প্রতি এক প্রদর্শনীতে এই কাচকে হাতুড়ী পিটাইয়া দেখা গিয়াছে, কিছুই হয় না।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রো-কেমিষ্ট্রি বিভাগের প্রধান আচার্য্য ডাঃ কোলিন ফিঙ্ক বলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন সমস্ত রাসায়নিক উপকরণ প্রস্তুত হইবে যাহা কাচ ও কাঠের প্রয়োজনীয়তা দূর করিয়া দিবে। দরজা, জানালা সব ঐ জিনিষে তৈরী হইবে। উহা মাটীর মত, যেমন ছাঁচে ইচ্ছা ঢালাই করিয়া লওয়া যাইবে। ধাতুর পরিবর্ত্তে কলকব্জায় অনেক ক্ষেত্রে মাইকার্টা (Micarta) প্রভৃতি জিনিষ ব্যবহৃত হইতেছে। উহা ইস্পাত প্রভৃতি অপেক্ষা শক্ত অথচ উহাতে তৈল দিতে হয় না, জল দিলেই উহা পরিষ্কার চলে।

কৃষি-বিভাগে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, গত ২ হাজার বৎসরে কৃষির যে উন্নতি হয় নাই, আগামী ২৫ বৎসরে তদপেক্ষা অধিক উন্নতি হইবে। হাইড্রোপনিক্স্ (Hydro-ponics) বা ভূমিহীন কৃষিক্ষেত্র এখন অনেক স্থানে চলতি হইয়া গিয়াছে। নিউ ইয়র্কে কার্নেগি ইনষ্টিটিউটের ডাঃ ব্ল্যাকাস্লি এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা শস্য বীজের মধ্যে দিলে বীজের উৎপাদন শক্তি দ্বিগুণ হয়। তারপর বৃক্ষের বৃদ্ধির হারও দ্রুততর করার উপায় হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে খবরের কাগজ খুলিলে কেবল ডিকটেটর আর যুদ্ধের কথা বড় বড় অক্ষরে দেখা যায়। খবরের কাগজের প্রধান সংবাদের পৃষ্ঠা দেখিয়া যদি আমরা ভবিষ্যৎ জগতের কল্পনা করি তবে ভুল করিব। ভবিষ্যৎ জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে স্তব্ধ বিজ্ঞানাগারে, বিজ্ঞানী সেখানে ধীর স্থির-ভাবে বিজ্ঞান সাধনায় নিরত, তারই সাধনার ফল দুনিয়ার গতি ও মূর্ত্তি বদল করিয়া দিবে। তাই বলা চলে রাজনৈতিক বা ডিক্টেটরদের দ্বারা ১৯৬৪ সালের দুনিয়া গড়া হইতেছে না, ঐ দুনিয়া গড়িতেছেন বিজ্ঞানীরা। সেখানেই প্রকৃত বিপ্লব ঘটিতেছে।*

---

*নর্থ আমেরিকান রিভিউ পত্রিকায় ভি এডোয়ার্ড পেণ্ড্রে লিখিত একটি প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ।

ডাক-টিকিটের পরিকল্পনা

এই বর্ষের নিউ ইয়র্ক ও সান ফ্রানসিস্কো বিশ্ব মেলার (World Fair) জন্য ইকুয়েডর ষ্টেট যে ডাক টিকিটের প্রচলন করিয়াছে, তাহা সর্বপ্রকারেই অভিনব। বিশ্বমেলা আজ কি প্রকার গগন-চুম্বী স্মৃতি-স্তম্ভের মত বিরাট অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে তাহারই আভাস রহিয়াছে এই ডাক-টিকিটে।

শুধু শিল্পের দিকেই নয়, নানাদিকেই যে অভাবনীয় নূতনত্ব ও আবিষ্কারের প্রতীক এই বিশ্বমেলায় প্রদর্শিত হয় প্রতি বর্ষে, তাহাতে ইহাকে মেঘলোকে উন্নীত-শির নিদর্শনের সহিত তুলনা করা অসংগত হয় নাই। অন্য টিকিটখানিতে রহিয়াছে ব্যাপক সাম্যের একটি প্রতীক, যাহাতে পৃথিবীর জাতিগুলি এক এক প্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। নিজ প্রকোষ্ঠে জাতি স্বাধীন হইলেও সমগ্র প্রতীকের সার্থকতায় রহিয়াছে জাতি সকলের ভিতর যোগাযোগ—পরস্পরে সহানুভূতি ও সাহচর্য। বিশ্ব-মেলার এত সাম্য-মৈত্রী ও শান্তি স্থাপনের প্রয়াস সত্ত্বেও কিন্তু বিশ্বের শান্তি আজ নির্মমভাবেই উৎপীড়িত।

করাল-নখরা নারী

কালনাগিনী বলিয়া দুরন্তা নারী প্রসিদ্ধ, কিন্তু ওয়াশিংটনের লংভিউ হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে কালনাগিনী বলিলে তাহাকে যথেষ্ট বলা হয় না, সে করাল-নখরের অধিকারিণীও। অতিরিক্ত মদ্যপানে অপ্রকৃতিস্থা হইয়া দুরন্তপনা করিবার অপরাধে লংভিউর মিসিস্ সুখান ডেনেট ত্রিশ দিনের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়। তাহাকে অবরুদ্ধ রাখা হয় জেলখানার একটি সেলে, যাহার অভ্যন্তর প্যাড্ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু ঐ ত্রিশদিন দণ্ডকাল পার হইবার পূর্বেই একদিন দেখা গেল সেলটির ভিতরের প্যাড্ একেবারে চিরিয়া কাড়িয়া ফেলা হইয়াছে। অথচ প্যাড্ সরবরাহ কালে নিশ্চিত বাক্য দেওয়া হইয়াছিল যে, যেমন কঠোরভাবেই ব্যবহার করা হউক না কেন, প্যাডগুলির কোনই অনিষ্ট হইতে পারিবে না। সুতরাং ঐ রমণীর নখ যে দুর্দান্ত জন্তু জানোয়ারের নখর অপেক্ষাও করাল, এই কথা অস্বীকার করা যায় না। প্যাড্ চিরিয়া ফেলার অপরাধে ঐ নারীর আরও সাতদিনের অতিরিক্ত কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

কুকুরের পদক প্রাপ্তি

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে সুস্থ ব্যক্তির রক্তদ্বারা রুগ্নকে বাঁচাইয়া তোলার প্রণালীর প্রচলনে বহু দুঃসাধ্য ব্যাধির কবলিত মৃতপ্রায় ব্যক্তিও নব জীবন লাভ করিয়া থাকে। সোভিয়েট তো রকমওয়ারি মানব-রক্ত সংগ্রহ করিয়া সংরক্ষণ করা হইতেছে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য। সম্প্রতি প্যারিসে ইতরজীবের রুগ্নাবস্থায়ও এই প্রকার রক্ত সরবরাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। একটি রুগ্ন কুকুর এতটা দুর্বল হইয়া পড়ে যে, রক্ত ট্রানস্‌ফিউশন ব্যতীত উহার আর জীবনের আশা থাকে না। তখন সুস্থ তেজিয়ান্ একটা কুকুরের দেহ হইতে রক্ত গ্রহণ করিয়া ঐ রুগ্ন কুকুরের শিরায় অনুপ্রবিষ্ট করা হয়। ফলে কুকুরটি এখন আরোগ্যের পথে। ফরাসী এস্ পি সি এ এইজন্য রক্ত প্রদানকারী কুকুরটিকে একটি স্বর্ণপদক প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ফরাসী দেশে কুকুর হইতে রক্ত গ্রহণ ইহাই প্রথম বলিয়া, উহা রেকর্ড রূপে গৃহীত হইয়াছে।

মহামূল্য প্রস্তররূপে শিলীভূত কাষ্ঠদণ্ড

নিউ মেকসিকো অঞ্চলের আলবুকার্ক শহরের কোনও প্রসিদ্ধ কিউরিও ষ্টোর তাহার প্রবেশদ্বারে অতি বিচিত্র উপায়ে প্রাচীন হীরা প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রায় ২০,০০০ ডলার মূল্যের হরেক বর্ণের মহামূল্য প্রাচীন প্রস্তর খণ্ড দ্বারা প্রতিষ্ঠানের নামটি সম্পূর্ণ গ্রথিত হইয়াছে প্রবেশদ্বার পার্শ্বস্থ দেওয়ালে। একশত ডলার মূল্যের ২০০ শত মেকসিকান পেসো (রৌপ্য মুদ্রা) দ্বারা একটি বিজলী-পাখী (thunder bird) পরিকল্পনা গঠন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও রঙিন টেরাজিও ডিজাইন কতকগুলি রহিয়াছে। উহার একটিতে দেখান হইয়াছে—মর্মর প্রস্তরের ক্ষেত্রে একটি দেশীয় ব্যক্তির মূর্তি স্থাপন করা হইয়াছে। মূর্তিটিও প্রস্তরের কিন্তু যে ভিত্তির উপর উহা স্থাপিত তাহাতে যে টেরাজিও ডিজাইন রহিয়াছে—উহারই মূল্য হইবে অন্যূন ১০০০ ডলার। এই ডিজাইনে শিলীভূত কাষ্ঠ—জরদ, কালো, লাল প্রভৃতি নানা রঙের ব্যবহার করা হইয়াছে। এই জাতীয় মূল্যবান প্রাচীন প্রস্তর সচরাচর পাওয়া যায় না।

তামাক-পাতা চিবাইয়া জীবন ধারণ

সুদূর প্রাচ্যের প্রাচীনতম 'শো-ম্যান'——৮৩ বৎসর বয়স্ক মিঃ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ম্যাকে, সিঙ্গাপুরের 'হ্যাপি ওয়ার্লড্ অ্যামিউজমেণ্ট পার্ক'এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ৬৫ বৎসর যাবৎ সে তামাক-পাতা চিবাইয়া উহার রস গলাধঃকরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

আমেরিকায় জন্মপ্রাপ্ত মিঃ ম্যাকে সিঙ্গাপুরে যাইয়া চিবাইবার টোবেকো (tobacco) না পাইয়া কালো বর্মী চুরুটই চিবাইতে আরম্ভ করে। সে বাছিয়া যত কড়া চুরুট পায় তাহাই ক্রয় করে। চুরুট চিবাইতে সুরু করিয়া সে কখনও থুতু ফেলে না—চুরুটের রসটুকু সমস্তই গলাধঃকরণ...

সে বলিয়া থাকে—"লোকে যেমন মিছরির ড্যালা ভালবাসে অথবা সিগারেটের ধূমপানে আসক্ত, চুরুট চিবানও আমার নিকট সেইরূপই। এ অভ্যাস আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। ছাড়িবার জন্য একবার ধূমপান আরম্ভ করি, কিন্তু ধূমপান করিবামাত্র কাশির উদ্ভব হয় বেজায় এবং আমার মনে হয় যেন আমার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে।"

সে অতি প্রত্যূষে ঘুম হইতে উঠিয়াই তামাক চিবাইতে সুরু করে। একবার জাহাজে চলিবার কালে তাহাকে আড়াই ডলার মূল্য দিতে হইয়াছিল একবারের চিবাইবার উপযুক্ত টোবেকো সংগ্রহ করিতে। সে না-খাইয়া অবাধে দিন কাটাইতে পারে, কিন্তু তামাক না চিবাইয়া এক ঘণ্টাও কাটাইতে পারে না।

তাহার চক্ষুর অস্ত্রোপচারের পরে চিকিৎসককে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তামাক চিবাইতে পারিবে কিনা। ডাক্তার বলিয়াছিল—"আপনি যখন ৬০ বৎসর তামাক চিবাইয়া সুস্থ আছেন, তখন তামাক চিবাইতে থাকুন।"

সে মিশিগানের ডেট্রয়েট অঞ্চলে ১৮৫৬ সালে জন্ম গ্রহণ করে। সে যখন প্রথম সিঙ্গাপুরে আসে তখন সেখানে মাত্র ১৫৬ জন ইউরোপীয় ছিল।

মহাসমরের সময় যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হয় সিঙ্গাপুরে মিঃ ম্যাকেকেও বন্দুক হাতে দিয়া সৈনিকের কার্যে নিযুক্ত করা হয়। মিঃ ম্যাকে ৫০ বৎসর যাবৎ সিঙ্গাপুরে 'শো-ম্যান'-এর কাজ করিতেছে। তাহারও ১৫ বৎসর পূর্বে আমেরিকায় থাকাকালে তামাক চিবাইবার অভ্যাসে আসক্ত হইয়া পড়ে।

জলজ প্রাণী সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা

নিউ হ্যাম্পশায়ারের ডারহাম শহরের একটি স্কুলের ৪০ জন ছাত্রকে জলজ প্রাণী সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাদান করিবার জন্য উহাদিগকে স্কুল হইতে বিদায় দিয়া পাঠান হইয়াছে একটি দ্বীপে। দ্বীপটির নাম হইতেছে, য়্যাপল্-ডোর্—উহা যেমন অপরিসর তেমনই গাছপালা বিরহিত। দ্বীপের অধিকাংশ স্থলেই জোয়ারের সময় জলপ্লাবিত হয়। এই দ্বীপটি আবার নিউ হ্যাম্পশায়ারের তীর হইতে মাত্র ১০ মাইল দূরে। জনহীন দ্বীপ বলিয়া এই স্থানে বহু বিভিন্ন জাতীয় জলজ জীব অকুতোভয়ে ডাঙ্গায় উঠিয়া আসে। কোনও কোনও স্থানে জলপূর্ণ গর্তে ঢুকিয়া ডিম্বাদি প্রসবও করিয়া থাকে। সীল জাতীয় জীব তো প্রসবের পূর্বে দল বাঁধিয়া ডাঙ্গায় আসিয়া আড্ডা গাড়ে। সুতরাং ছাত্রদের শিক্ষার এমন উপযুক্ত ক্ষেত্র যেখানে জীবগুলি নির্ভয়ে বিচরণ করে—আর ঐ অঞ্চলে পাওয়া শক্ত। বিশেষ করিয়া জলজ-প্রাণীর স্বাভাবিক হালচাল লক্ষ্য করিবার এমন সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়। পরাধীন ভারতের নিকট এই বিচিত্র শিক্ষাদান প্রণালী স্বপ্নেরও অগোচর বলিতে গেলে!

ইটালীর অভাবনীয় পূর্তকার্য

ইটালীর অন্তর্গত পিডমণ্ট্ প্রদেশের পারটিউসো অঞ্চলে য়্যালেসেন্দ্রিয়ার নিকট তিনটি গ্রামকে জল-নিমজ্জিত করিয়া ফেলা হইবে। ইহা অবশ্য খাম-খেয়ালের বিলাস নয়—এই [illegible] নির্মাণ করা হইবে প্রথমতঃ নিম্নের- গুলির নিরাপদে অবস্থানের ঘাঁটি হইতে পারে। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের কেন্দ্র সৃষ্টি করা। উক্ত গ্রামবাসীদের জন্য অবশ্য বাসস্থান নির্দেশ করা হইবে। ঐ যে কৃত্রিম হ্রদ উহার তীরে মৃত্তিকা স্তূপের উপর গ্রাম তিনটির স্থান দান করা হইবে। বাসস্থান পরিবর্তনের সকল ব্যয় ইটালীয় সরকার বহন করিবে। কেবল পরিবর্তনের ভিতর গ্রাম তিনটি উহার নিম্নস্তর হইতে উচ্চ স্তরে উন্নীত হইবে। আমাদের দেশে ক্যানেল-করের নির্যাতনে ব্যতিব্যস্ত প্রজাকুল যদি উচ্চহারের বিরুদ্ধে জোট বাঁধে, তাহাদের তবে দোষ দেওয়া যায় কি প্রকারে?

অভিনব ছাগল

আমরা সাধারণত আমাদের দেশে যে ছাগল দেখিতে পাই, উহাদের দুইটি শিং ও বিরল দীর্ঘ শ্মশ্রু একেবারে প্রবাদের সামিল। দেশভেদে ছাগের আকৃতির কিছুটা পার্থক্য হইলেও, ইহার যে সাধারণ দেহ-গঠন তাহাতে অসাদৃশ্য নাই। হামেশ আমরা লক্ষ্য করি যে পার্বত্য অঞ্চলের ছাগগুলি নিম্নভূমির
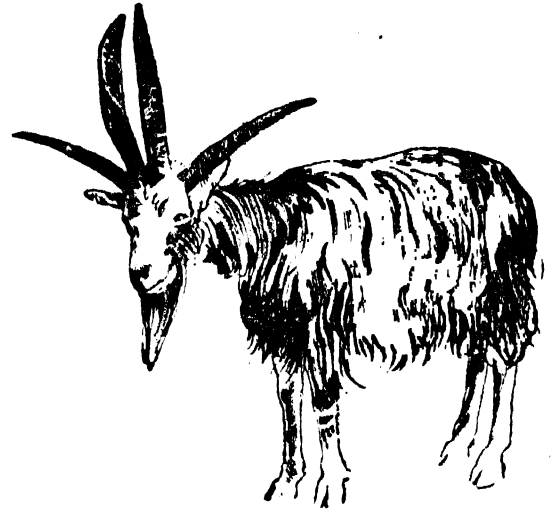
ছাগ অপেক্ষা বলিষ্ঠই হয়। কিন্তু ইটালীর করেলা অঞ্চলের (ইহাও পাহাড়িয়া প্রদেশ) বন্য ছাগ একটি আনিয়া চিড়িয়াখানায় রাখা হইয়াছে—উহার মাথায় শিং রহিয়াছে চারিটি—দুইটি ঠিক কপালের মধ্যস্থলে আর বাকি দুইটি উহারই দুই পাশে। ইটালীর করেলা হইতেই এই অদ্ভুত ছাগটি সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই প্রকারের চারি শৃঙ্গ বিশিষ্ট ছাগ অতি বিরল।

আমেরিকায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফল

আমেরিকায় উত্তরোত্তর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফলসমূহের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য মিয়ামি অঞ্চলের উর্বর ভূমিতে দেড় হাজার একর জমি নূতন প্রবর্তিত হইয়াছে ঐ ফলের চাষে। বিশেষ করিয়া পেঁপে, পেয়ারা, আম, ডালিম ও অন্যান্য ফলের চাষে এখানে আশাতীত সুফল পাওয়া গিয়াছে।

বাঙলার সন্তরণের ভবিষ্যৎ

বাঙলার এই বৎসরের সন্তরণ মরসুম শেষ হইতে চলিয়াছে। এক মাস পরে সন্তরণের সকল উৎসাহ ও উদ্দীপনার অবসান হইবে। বর্ত্তমানে সকল বিশিষ্ট সন্তরণ প্রতিষ্ঠান বার্ষিক জলক্রীড়ার অনুষ্ঠান লইয়া ব্যস্ত। প্রতি সপ্তাহেই কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক জলক্রীড়া বিশেষ আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের সাঁতারুগণ এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। গত ছয় মাস ধরিয়া সাঁতারুগণ যে সাধনায় লিপ্ত ছিলেন, তাহারই পরিচয় এই সকল অনুষ্ঠানে কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে। মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক জলক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এখনও কয়েকটি বাকী আছে। বাঙলা প্রদেশের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান অর্থাৎ বাঙলার সন্তরণ পরিচালকমণ্ডলী বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের বার্ষিক প্রতিযোগিতা এখনও বাকী আছে। অতএব বাঙলার সাঁতারুগণের এই বৎসরের মত উন্নততর কৃতিত্ব প্রদর্শনের সকল সুযোগের অবসান এখনও হয় নাই। সুতরাং গত তিনটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে বাঙালী সাঁতারুগণের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য তাঁহারা প্রদর্শন করিতে পারিবেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া খুব অন্যায় হইবে না। তবে এই সকল সাঁতারুগণের মধ্যে কেহ যে কল্পনাতীত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন না—এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। ছয় মাসের অনুশীলনে যাহা অর্জ্জন করা সম্ভব হয় নাই তাহা এক মাসের মধ্যে সাঁতারুগণের আয়ত্তাধীন হইবে—ইহা আমরা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ আমরা জানি অল্প সময়ের মধ্যে সাঁতারুগণের কল্পনাতীত উন্নতি প্রদর্শন করিবার জন্য যেরূপ সন্তরণ শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হইবে সেইরূপ সন্তরণ শিক্ষক বাঙলা দেশে নাই। সুতরাং এই পর্য্যন্ত যে সকল সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে সেই সকল প্রতিযোগিতার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমানের বাঙলার সন্তরণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিষয় যদি আলোচনা করা হয় তবে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হইবে না। মরসুমের শেষ অনুষ্ঠানের ফলাফল বর্ত্তমানের অনুষ্ঠিত ফলাফল অপেক্ষা বিশেষ উন্নততর হইবে না।

সন্তরণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিম্নগামী

উক্ত অনুষ্ঠিত সন্তরণ প্রতিযোগিতাসমূহের বিভিন্ন বিষয়ের ফলাফল লইয়া আলোচনা করিলে বাঙলার সন্তরণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে নিম্নগামী তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। বহু পূর্ব্বের ফলাফলের কথা ছাড়িয়া দিলেও গত বৎসরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফলাফল অপেক্ষাও নিম্নস্তরের হইয়াছে। ফ্রি ষ্টাইল, বুক-সাঁতার, চিৎ-সাঁতার, ডাইভিং প্রভৃতি কোন একটি বিষয়েই উন্নততর ফলাফল এই পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হয় নাই। শীঘ্র কেহ যে প্রদর্শন করিতে পারিবেন তাহারও সম্ভাবনা খুবই কম। ঝানু সাঁতারুগণ, অর্থাৎ গত ছয় সাত বৎসর ধরিয়া যাঁহারা সন্তরণের বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের নৈপুণ্য নিম্নস্তরের হইলেও এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের সন্তরণের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাধান্য অক্ষুন্ন রহিয়াছে। গত বৎসরের যে কয়েকজন নূতন উৎসাহী সাঁতারু কয়েকটি বিষয়ে উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বৎসরের অনুষ্ঠানে তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন নাই। সন্তরণ মরসুমের সূচনা হইতে এই পর্য্যন্ত গত বৎসর অপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইবার জন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা যে তাঁহারা করেন নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। যে সকল প্রতিষ্ঠানের ইঁহারা সভ্য সেই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণও ইঁহাদের উন্নতির জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করেন নাই, ইহাও নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। এই বৎসরে নূতন কোন উৎসাহী সাঁতারুকে এই পর্য্যন্ত উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে দেখা যায় নাই। তাহা হইলেও বলা চলিত যে, পরিচালকগণ এই সকল নূতন সাঁতারুগণকে বাঙলার ভবিষ্যৎ সুনাম অর্জ্জনকারী সাঁতারুগণের উন্নতিকল্পে ব্যস্ত থাকায় অপর সাঁতারুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে যদি বলা হয় যে, বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণের গতিগতি পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে, তাহা হইলে কোনই অন্যায় করা হইবে না। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও যদি বলা হয় যে, বাঙলার সন্তরণের ভবিষ্যৎ এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন, অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের কোনই সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলেও অবিবেচকের উক্তি হইবে না।

এম সি সি'র ভারত ভ্রমণ

আগামী অক্টোবর মাসে এম সি সি দলের ভারতে পদার্পণ করিবার কথা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান ইউরোপের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির জন্য এই ভ্রমণ বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদকের উক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, আগামী বৎসরে উক্ত দলের আসিবার সম্ভাবনা আছে। আগামী বৎসরেও যদি এই অবস্থা বর্ত্তমান থাকে, তবে এম সি সি দল ভারতে আসিতে পারিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৯শে আগষ্ট—

রংপুরে গবর্ণরের আগমন উপলক্ষে ড্রিল ও লাট সেলামের প্রতিবাদে ছাত্রগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের উপর লাঠি চার্জ করে ফলে ২৪জন আহত হইয়াছে।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ফরাসী-জার্মান সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

জার্মান সৈন্যদল শ্লোভাক অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে।

পোল্যাণ্ডের রিজার্ভ নৌ ও স্থলবাহিনীকে প্রধান প্রধান বন্দরে মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

ওয়ারসতে দুইজন জার্মানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। টারনার্ড রেল ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে একটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে একশতজন নিহত হইয়াছে।

বার্লিনস্থ বৃটিশ রাজদূত স্যার নেভিল হেণ্ডারসন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আনীত পত্র হের হিটলারকে দেন এবং তিনি নিজে উহার মৌখিক ব্যাখ্যা করেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সুরক্ষিত বন্দর করাচী, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের চারিদিকে নির্দিষ্ট স্থান বিমানের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং বিনা অনুমতিতে ভারতে রাত্রিতে বিমান চালনা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

৩০শে আগষ্ট—

পোল্যাণ্ডে ব্যাপক সৈন্য চালনার আদেশ জারী করা হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী পোলিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এক বাণী প্রেরণ প্রসঙ্গে পোল্যাণ্ডে যাঁহারা বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করিতেছেন; তাঁহাদিগকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

১৬ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজাদের আগামী ১৪ দিনের মধ্যে নাম রেজিষ্টার করিবার নির্দেশ দিয়া বড়লাট দুই নম্বর অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনায় জব্বলপুরের বন্দুকের কারখানায় পুরাউদ্যমে কাজ চলিতেছে।

সিমলায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের শরৎকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রেসিডেণ্ট পদ হইতে অপসারণ ও ২৬শে জুলাই তারিখে গঠিত কার্যকরী সমিতির নির্বাচন অসিদ্ধ ঘোষণা করা—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই দুইটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গত ২৫শে আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যকরী সমিতি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, অদ্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে।

৩১শে আগষ্ট—

হের হিটলার দেশরক্ষার জন্য একটি মন্ত্রি-পরিষদ গঠন করিয়াছেন। ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং এই মন্ত্রি-পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। হের হিটলারের সহকারী হের হেস সহ চারিজন এই মন্ত্রিসভায় থাকিবেন।

উইণ্ডসরের ডিউক ইতালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের নিকট ব্যক্তিগতভাবে এক বাণী প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

নিখিল ভারত বামপন্থী সমন্বয় কমিটির নির্দেশানুসারে অদ্য জাতীয় সংগ্রাম সপ্তাহের প্রথম দিবস প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ও হাওড়া টাউন হলে জনসভায় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয়।

১লা সেপ্টেম্বর—

জার্ম্মানী কোনরূপ চরমপত্র না দিয়া পোল্যাণ্ডের সমগ্র সীমান্তে আক্রমণ সুরু করিয়াছে। পূর্ব্ব প্রুশিয়া, সাইলেসিয়া ও শ্লোভাকিয়া—এই তিন দিক হইতে আক্রমণ চলিতেছে। পোল্যাণ্ডের ওয়ারস ক্র্যাকাউ এবং অন্যান্য কয়েকটি শহরের উপর জার্ম্মান সামরিক বিমান বহর বোমা বর্ষণ করে। প্রকাশ, বহু বে-সামরিক অধিবাসী হতাহত হইয়াছে।

বার্লিনস্থ পোলিশ রাষ্ট্রদূত জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, পোল্যাণ্ড শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া নিজের মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

হের হিটলার অদ্য রাইখষ্ট্যাগে বক্তৃতা করিতে গিয়া ঘোষণা করেন, "ডানজিগ ও করিডর সমস্যা সমাধানের জন্য এবং পোল্যাণ্ডের সহিত শান্তিপূর্ণ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জার্ম্মানী অভিযান সুরু করিয়াছে। আমি বিমান-বাহিনীকে শুধু সামরিক ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছি। বোমাবর্ষণ দ্বারা বোমাবর্ষণের এবং বিষ বাষ্প দ্বারা বিষ বাষ্প ব্যবহারের পাল্টা জবাব দেওয়া হইবে।"

হিটলার ঘোষণা করেন যে, তাঁহার যদি কোন কিছু হয়, তাহা হইলে মার্শাল গোয়েরিং তাঁহার স্থলবর্ত্তী হইবেন এবং তাঁহার পর হের হেস রাষ্ট্রনায়কের পদে অভিষিক্ত হইবেন। হের হেসের পর যোগ্যতম ও সাহসী ব্যক্তিকে রাষ্ট্রনায়কের পদে বৃত করিবার ভার তিনি সেনেটের উপর অর্পণ করিয়াছেন।

হের হিটলার ডানজিগকে পুনরায় রাইখের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি বিল উপস্থিত করেন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বিলটি পাশ হয়।

হের হিটলার জার্ম্মান সৈন্যবাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করেন যে, পোল্যাণ্ডের পাগলামির উচ্ছেদ করার জন্য শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর নাই।

জার্ম্মানীর উপর জার্ম্মান বিমানপোত ছাড়া আর সমস্ত বিমানপোতের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

জার্ম্মানীতে সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জার্ম্মান বেতার ঘাঁটি হইতে বাল্টিক সাগরের সমস্ত জাহাজকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গিদনিয়া বন্দরের প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কোন জাহাজ বন্দরে প্রবেশের কিংবা বন্দর হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিলে তাহা ধ্বংস করা হইবে।

বৃটিশ কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন

ঘোষণা করেন যে, জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সমস্ত আক্রমণাত্মক কার্য্য স্থগিত করিবার এবং অবিলম্বে পোলিশ রাজ্য হইতে তাঁহাদের সৈন্যদিগকে অপসারিত করিবার সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি না দিলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইতস্তত না করিয়া তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন।

ইতালীয় মন্ত্রিসভা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা অগ্রণী হইয়া যুদ্ধে যোগদান করিবেন না।

ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, নরওয়ে এবং সুইডেনের গবর্ণমেণ্ট যুগপৎ এক ঘোষণা করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবেন।

২রা সেপ্টেম্বর—

ওয়ারসর সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মানরা প্রধানত পূর্ব্ব-প্রুশিয়া হইতে আক্রমণ চালাইয়াছে। সর্ব্বত্র দিবারাত্রি যুদ্ধ চলিয়াছে। পোলরা এই দাবী করিতেছে যে, তাহরা গতকল্য কুড়িটি বিমান ভূপাতিত করে এবং এই লইয়া অদ্য পর্য্যন্ত ৩৩টি বিমান ভূপাতিত করিয়াছে এবং ১৬টি ট্যাঙ্ক বিকল করিয়া দিয়াছে এবং ৫০০ সৈন্য বন্দী করিয়াছে।

পোলিশ শহর ও গ্রামগুলির উপর এ পর্য্যন্ত প্রায় ৯৪ বার বিমান আক্রমণ হইয়াছে। তাহার ফলে বারজন সৈনিক সমেত প্রায় ১৩০ জন মারা গিয়াছে। নিহতদের মধ্যে অধি-কাংশ স্ত্রীলোক ও শিশু।

ওয়ারস ব্যতীত গিনিয়া ও অন্যান্য সতেরটি শহরের উপর বোমা বর্ষিত হয়। জার্ম্মান নৌ-বিমান বহর গিনিয়া বন্দরের উপর যুগপৎ আক্রমণ চালাইয়াছে। বার্লিনের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, অদ্য জার্ম্মান বাহিনী সর্ব্বত্র অপ্রতি-হতভাবে অগ্রসর হইতেছে।

পোল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র সামরিক আইন জারী হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট মসিকি এক আবেদন প্রচার করিয়া সমস্ত পোল জাতিকে স্বাধীনতা রক্ষায় অস্ত্রধারণ করিতে ও জার্ম্মান আক্রমণকারীকে সমুচিত প্রত্যুত্তর দিতে অনুরোধ করিয়া-ছেন। মার্সাল স্মিগলী রীজ সৈন্যবাহিনীর নিকট একটি তেজোদৃপ্ত ঘোষণা করিয়া বলেন যে, পোলিশ এলাকায় প্রবেশকারী শত্রুপক্ষীয়কে প্রতি পদক্ষেপ রক্ত-রেখায় রঞ্জিত করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সংগ্রাম যতই দীর্ঘকাল স্থায়ী হোক না কেন, যতই ত্যাগ স্বীকার করিতে হোক না কেন, জয়ের যশোমাল্য পোল্যাণ্ডবাসীরা লাভ করিবে।

ফ্রান্সে পূর্ণ সৈন্য সমাবেশের আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং সামরিক আইন জারী হইয়াছে। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ দালাদিয়ের বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "একটি মিত্র শক্তিকে ফ্রান্স ও ব্রিটেন বাধা না দিয়া কেবলমাত্র দাঁড়াইয়া ধ্বংস হইতে দেখিবে না।"

কলিকাতা আশুতোষ হলে সাহিত্য বাসরের উদ্যোগে কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক সম্মেলনের সভাপতি ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। খান বাহাদুর আজিজুল হক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

৩রা সেপ্টেম্বর-

ব্রিটেন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন মন্ত্রিসভার কক্ষ হইতে বেতারে উক্ত ঘোষণা করেন। পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করিবার ও অবিলম্বে পোলিশ এলাকা হইতে জার্ম্মান সৈন্য অপসারণের জন্য ব্রিটেন জার্ম্মানীর নিকট যে চরমপত্র দিয়াছিল, অদ্য বেলা এগারটার মধ্যে জার্ম্মানীর নিকট হইতে উক্ত চরমপত্রের কোন উত্তর না পাওয়ায়ই ব্রিটেন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ইহাও ঘোষণা করেন যে, ফ্রান্স ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। প্রকাশ, জাপ গবর্ণমেণ্টও নিরপেক্ষ থাকিবে বলিয়া ব্রিটেনকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে; কিন্তু জার্ম্মানী জাপানকে সোভিয়েটের সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে।

বেলজিয়াম তাহার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিয়াছে।

বৃটিশ যাত্রীবাহী জাহাজ 'এথেনিয়া' স্কটল্যাণ্ডের হেব্রাইড্স্ দ্বীপপুঞ্জের ২০০ মাইল পশ্চিমে এক জার্ম্মান টর্পেডোর আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া ১৪০০ যাত্রীসহ জলমগ্ন হইয়াছে।

পোল্যাণ্ডের খবরে প্রকাশ, এক ২রা সেপ্টেম্বর তারিখেই জার্ম্মান আক্রমণে ১৫০০ অ-সামরিক অধিবাসী নিহত হইয়াছে। তেইশটি শহরের উপর জার্ম্মানরা বোমা বর্ষণ করে। পোলিশ দাবী করিতেছে যে, তাহারা ৬৪টি বিমান ধ্বংস করিয়াছে, আর নিজেদের নষ্ট হইয়াছে এগারটি বিমান এবং তাহারা দুইটি শহর পুনরধিকার করিয়াছে; পক্ষান্তরে জার্ম্মানরা দাবী করিতেছে যে, তাঁহারা ১২০টি পোলিশ বিমান ধ্বংস করিয়াছে, আর তাহাদের হারাইতে হইয়াছে মাত্র দশটি বিমান। জার্ম্মানরা চেষ্টোকোয়া শহর দখল করিয়াছে।

নিম্নলিখিত মন্ত্রিগণকে লইয়া ব্রিটেনের সমরকালীন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছেঃ— মিঃ নেভিল চেম্বারলেন—প্রধান মন্ত্রী; স্যার জন সাইমন—অর্থসচিব; লর্ড হ্যালিফাক্স—পররাষ্ট্রসচিব; লর্ড চ্যাটফিল্ড—দেশরক্ষা-সচিব; মিঃ উইন-স্টন চার্চ্চিল—নৌ-সচিব; মিঃ হোর বেলিসা—সমরসচিব; স্যার চার্লস কিংশিলউড—বিমান সচিব; স্যার স্যামুয়েল হোর —লর্ড প্রিভিসিল; লর্ড স্যাঙ্কি—দপ্তরবিহীন সচিব।

সমরকালীন মন্ত্রিসভার বাহিরে নিম্নলিখিত মন্ত্রিগণ নিযুক্ত হইয়াছেনঃ—

মিঃ এন্টনি ইডেন—ডোমিনিয়ন সচিব। লর্ড ষ্ট্যানহোপ —কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেণ্ট, স্যার টমাস ইন্সকিপ—লর্ড চ্যান্সেলার, স্যার জন এণ্ডারসন—স্বরাষ্ট্রসচিব। ডোমিনিয়ন সমূহ এবং সমরকালীন মন্ত্রিসভার মধ্যে যাহাতে যোগাযোগ থাকে, তজ্জন্য মিঃ ইডেন সমরকালীন মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগদানের বিশেষ সুবিধা পাইবেন

জার্ম্মানী বৃটেন ও ফ্রান্স সরকারের চরমপত্র অগ্রাহ্য করিয়াছে।

যুদ্ধের সময় জনসাধারণের নিরাপত্তা ও ভারতে শত্রুপক্ষের কার্যকলাপ প্রতিরোধকল্পে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বড়লাট "ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স" নামক একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

করাচী, মাদ্রাজ ও কলিকাতার বন্দর রক্ষার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে বন্দরের ভারার্পণ করা হইয়াছে।

কলিকাতা পুলিশ ৮০জন জার্মানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কলিকাতার উত্তরে কাঁচরাপাড়া হইতে দক্ষিণে বিরলাপুর পর্যন্ত বিমান আক্রমণের মহড়া হইয়া গিয়াছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—

ফরাসীর স্থল, জল ও বিমানবাহিনী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে।

বৃটেনের রাজকীয় বিমানবাহিনীর চারিখানি বিমানপোত উত্তর ও পশ্চিম জার্মানীর উপর ঘুরিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। বিমানপোত হইতে জার্মান জাতির উদ্দেশ্যে ৬০ লক্ষ ইস্তাহার নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

লণ্ডন শহর হইতে অনুমান এক লক্ষ বয়স্ক নরনারী ও শিশুকে নিরাপদে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

জার্মানীরা দাবী করিতেছে যে, জার্মান বিমানবাহিনী গত শুক্রবার এবং শনিবারে মোট ১২০টি পোলিশ বিমানপোত ধ্বংস করিয়াছে। অপরপক্ষে পোলিশরা পাল্টা দাবী করিতেছে যে, গতকল্য ৬৪টি জার্মান বিমানপোত ধ্বংস হইয়াছে। সাইলেসিয়া রণক্ষেত্রে পোলিশ সৈন্যগণ কিছু পিছনে হটিয়া গিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

মিশর জার্মানীর সহিত তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে।

সোভিয়েট সরকার নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন এবং উভয় পক্ষের সমররত জাতিদিগকে জিনিসপত্র সরবরাহ করিতেছেন।

বুলগেরিয়া ও রুমানিয়া যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

লর্ড গর্ট বৃটেনের স্থলবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে, স্যার ওয়াল্টার আয়রন সাইড সেনাপতিমণ্ডলীর অধিনায়ক পদে এবং স্যার ওয়াল্টার কর্ক স্বরাষ্ট্রবাহিনীর নায়কের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সহযোগিতা করা এবং নিরপেক্ষতা—এই উভয় নীতি লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ত্রিসভায় মতভেদ ঘটিয়াছে।

জার্মানী যুদ্ধের বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করিতেছে।

সিমলায় গান্ধী-বড়লাট সাক্ষাৎকার হয়। মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎকারের পর বড়লাট মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অপরাপর নেতাদের সহিত বড়লাট সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আন্তর্জাতিক সংকট সম্পর্কে ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির যে জরুরী অধিবেশন হইবে তাহাতে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করিয়া সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের নিকট তার প্রেরণ করেন। শ্রীযুক্ত বসু ও শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদানে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য চুংকিং হইতে ভারতে রওনা হইয়াছেন।

বোম্বাইস্থ ৩০৮জন জার্মান অধিবাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া স্পেশ্যাল ট্রেনে দেউলী বন্দীনিবাসে প্রেরণ করা হইয়াছে। সিমলায় ৪জন জার্মানকে বৈদেশিক আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মাদ্রাজে জার্মান অধিবাসীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করা হইয়াছে। দার্জিলিং-এর ৬ জন জার্মান বাসিন্দাকে আটক করা হইয়াছে। সতর্কতা হিসাবে সমস্ত পুলের ট্যাঙ্কে পাহারা বসান হইয়াছে।

রঙ্গজগৎ

(৪৩০ পৃষ্ঠার পর)

মতিমহল পিকচার্সের নবতম পৌরাণিক চিত্র 'দেবযানী' শনিবার, ৯ই সেপ্টেম্বর ছায়াতে মুক্তিলাভ করিবে। ছবিখানির কাহিনী রচনা করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণধন দে এবং পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীফণি বর্ম্মা। শ্রীমতী ছায়া, মীরা দত্ত, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মৃণাল প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন।

* * *

নিউ থিয়েটার্সের 'জীবন মরণ'-এর কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীনীতীন বসু এই ছবির পরিচালক। ইহার সংগীত পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীপংকজ মল্লিক এবং প্রধান ভূমিকাগুলিতে লীলা দেশাই, নিভাননী, সাইগল, ভানু ব্যানার্জ্জি, ইন্দু মুখার্জ্জি প্রভৃতিকে দেখা যাইবে।

পরিচালক হেমচন্দ্রের নিউ থিয়েটার্সের পক্ষে নূতন বাঙলা ছবির কাজ যথারীতি চলিতেছে। শ্রীমতী কানন এই ছবির নায়িকা। চিত্রখানির সংগীত পরিচালনা করিতেছেন শ্রীরাইচাঁদ বড়াল এবং ক্যামেরা ও শব্দ-গ্রহণের কাজ যথাক্রমে ইউসুফ মুলজি এবং বাণী দত্ত করিতেছেন।

* * * * *

শ্রীযুত ধীরেন গাঙ্গুলীর পরিচালনায় দেবদত্ত ফিল্ম ষ্টুডিওতে উঁহাদের সামাজিক ছবি 'পথ ভুলে'র কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ১৬ই ভাদ্র, ১৩৪৬ Saturday, 2nd September, 1939 [৪২ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন-

কলিকাতায় বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গেল। এই সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি আণে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা দেশবাসী সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। কংগ্রেস এই দোহাই দিয়া আসিয়াছেন যে, জাতীয়তার ভাব পাছে ক্ষুণ্ণ হয়, এই জন্যই তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধতা অবলম্বন করেন নাই, 'না-গ্রহণ না-বর্জ্জন' নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। শরীরে বিষ ঢুকাইতে দিয়া এবং তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া সেই বিষের প্রতিক্রিয়া এড়াইবার কল্পনা যেমন যুক্তিহীন, কংগ্রেসের বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত এইরূপ মনোভাবও তেমনি অযুক্তিমূলক। এই কয়েক বৎসরে তাহা আর কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক, আমরা বাঙালীরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছি। বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই, এমন যুক্তি যাঁহারা দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের যুক্তিকে আমরা আরও মারাত্মক বলিয়া মনে করি। এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া সাম্রাজ্যবাদীরা যে জিনিষটি চাহিয়াছিল, আমরা সেই বস্তুটিই সিদ্ধ করিতেছি। আমরা ঘরোয়া ভেদ-বিরোধের দুষ্প্রবৃত্তিকেই নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধির সঙ্গে প্রশ্রয় দিতেছি। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আমরা এই অনিষ্টকর সিদ্ধান্তের ভিত্তিভূমিকে অবলম্বন করিয়া জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রতিষ্ঠার আদর্শ যদি সংগ্রামসূত্রে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতাম, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতার সাধনা এত-দিনে সিদ্ধির পথে নিশ্চয়ই অনেকটা অগ্রসর হইত। সাম্প্রদায়িক এই যে সিদ্ধান্ত ইহা ভারতের স্বার্থ চিন্তার জন্য পরিকল্পিত হয় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কূট-কৌশলে ভেদ-বিভেদকে চিরন্তন করিয়া ইহার সাহায্যে এখানে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখিতে চাহিতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই শত্রুতার আচরণে ও স্বদেশের বৃহত্তর আদর্শের প্রেরণা যাহাদের অন্তরে উত্তেজনার সৃষ্টি করে না, তাঁহারা জাতীয়তার কতটা সাধক, এ বিষয়ে অমাদের মনে স্বতই সন্দেহ হয় এবং সেকথা আমরা স্পষ্ট করিয়াই অনেক-বার বলিয়াছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই নীতির অনিষ্ট-কারিতাকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া আমরা প্রত্যক্ষভাবে এই বিশিষ্ট নীতির বিরুদ্ধতা না করিয়াও যদি জাতির সংহতির অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের বৃহত্তর আদর্শকে দৃঢ় রাখিতে পারিতাম এবং পূর্ণ স্বাধীনতার সাধনায় নিজেদের শক্তিকে দৃঢ়তর করিতে পারিতাম—প্রকৃষ্টতর পন্থা অবলম্বনে, তবে ঐ নীতি সম্পর্কে 'না-গ্রহণ না-বর্জ্জন' মনোভাব অবলম্বনের মূলে রাষ্ট্রনীতি চাতুর্য্যের দিক হইতে, রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞানের দিক হইতে না হয় একটা যুক্তি থাকিত; কিন্তু আমরা কি তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছি? আমাদিগকে নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমরা তেমন কিছু করিতে সমর্থ হই নাই—গণ-পরিষদের যত কথা এখন কার্য্যত শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীরা নিয়মতান্ত্রিকতার মদিরা পানে মহোৎসাহে রাজকার্য্য চালাইতেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে বৃহত্তর সংগ্রামের কোন কর্ম্মতালিকাই কংগ্রেসের এখন নাই, অধিকন্তু, কংগ্রেসের বর্ত্তমান দক্ষিণী দলের কর্ত্তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রদত্ত শাসনতন্ত্রের পরম প্রসাদকেই দিন দিন অধিক মাত্রায় উপলব্ধি করিতেছেন। গণ-সংগ্রাম যে সুদূর পরাহত ইহাই দক্ষিণী দলের কর্ত্তাদের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত। এরূপ অবস্থায় বাস্তবিক পক্ষে যাঁহারা ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতাবাদী—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কূট কৌশলের

অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে যাঁহারা একান্তভাবে অসংমূঢ়, সাম্রাজ্যবাদের অনুগ্রহের নির্ভরশীলতার অকল্যাণ সম্বন্ধে যাঁহারা অবহিত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি? বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তীব্রতর ভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করাই তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। জাতীয়তার বিরোধী, একান্ত অনিষ্টকর এই যে সিদ্ধান্ত—ভারতের স্বাধীনতার জন্য বেদনা জাগিয়াছে যাঁহাদের অন্তরে তাঁহারা এক মুহূর্ত্ত এই সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। এই সংগ্রাম কেবলমাত্র হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্য নহে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্যই এই সংগ্রামের আগে প্রয়োজন। কংগ্রেসের আদর্শ যে পূর্ণ স্বাধীনতা, সেই পূর্ণ স্বাধীনতার সাধনার জন্যই এ প্রয়োজন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের বেদীমূলে বাঙলার সন্তানগণ আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছে, তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদীদের এই কূট-কৌশলকে আর এক দণ্ডও স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নয়—বাঁটোয়ারা বিরোধী সম্মেলনে এই সত্যই প্রকট হইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থসিদ্ধি—

বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন,—"এক দল স্বদেশবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্মিলিত অভিযান নীতির অজুহাতে এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে মৌন সম্মতি দিয়া আসিতেছেন, ইহা লক্ষ্য করিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভারত-শাসন-ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক নীতি প্রবর্ত্তন করিবার পর হইতে জগতের চক্ষে ভারতকে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের বিবাদ-বিসম্বাদ, ঈর্ষা-দ্বেষের ছিদ্র রচনা করিবার যে চাতুরী অবলম্বন করিয়াছে, এই সমস্ত ব্যক্তি তাঁহাদের 'না-গ্রহণ না-বর্জ্জন' নীতি দ্বারা নিশ্চিতভাবে তাহারই সাহায্য ও সহযোগিতা করিতেছেন।" আচার্য্য রায় যে কথাটি বলিয়াছেন অনেকের নিকট তাহা অপ্রিয় মনে হইবে। কিন্তু অপ্রিয় হইলেও 'না-গ্রহণ না-বর্জ্জন' নীতির ফলে কার্য্যত ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে উহাই। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিস্বরূপে স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কথাটা আরও খুলিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—"যে জাতীয়তাবোধ সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ সৃষ্টির ভিতর দিয়া এক সম্প্রদায়ের জন্মগত অধিকার বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা করে তাহা প্রকৃত জাতীয়তাবোধসূচক নহে। এই সিদ্ধান্তে যে শুধু হিন্দু ও মুসলমানদের একেবারে পরস্পর হইতে পরস্পরকে বিচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে তাহা নহে, হিন্দুদের মধ্যেও অধিক ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে।" অনুমান নয়, ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বাঁটোয়ারা বৃক্ষের এই বিষময় ফলের গুণে ভারতের জাতীয়তার অনুভূতি একান্ত অভিভূত, পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ অধিকতর অস্পষ্ট। ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার সাধনা করিতে গেলে এমন অনিষ্টকর সিদ্ধান্তের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি সম্ভব নয়—ইহাকে একেবারে উৎখাত করা দরকার হয় আগে। বাঙলা দেশ হইতে সেই শক্তি সঞ্চারিত হউক, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নূতন নূতন শক্তি সঞ্চারের দ্বারা এতাবৎকাল সঞ্জীবিত রাখিয়াছে এই বাঙলা দেশ এবং সেই বাঙলা দেশই ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে অগ্রণী হইবে এই দিক হইতে, আমরা এমন আশাই করিতেছি।

যুদ্ধ ও ভারত—

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে পুনায় কংগ্রেসী মন্ত্রীদের এক বৈঠক হইয়া গেল। এই বৈঠকে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। ওয়ার্কিং কমিটির পূর্ব্বাপর সিদ্ধান্ত রহিয়াছে যে, যুদ্ধ বাধিলে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সাম্রাজ্যবাদীদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহার পর আর মন্ত্রীদের এ সম্বন্ধে আলোচনা-বিবেচনা করিবার বিশেষ কিছু থাকে না। ঠিক হইয়াছে যে, মন্ত্রীরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন না—কর্ত্তাদের সঙ্গে বিরোধ বাধিবার ফলে কর্ত্তারাই তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করাইবেন। কিন্তু কর্ত্তারা হুঁসিয়ার কম নহেন, মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া কাজ বাগাইবার কেরামতিতে তাঁহাদের খ্যাতি বিশ্বজনীন। দেশের লোকের মনকে ধোঁকাবাজীতে ভুলাইবার মত ব্যবস্থা বড়কর্ত্তারা নিশ্চয়ই বাহির করিতেছেন। শুনা যাইতেছে, অস্থায়ীভাবে নিখিল ভারত গবর্ণমেণ্ট একটা গঠন করা হইবে এবং সেজন্য বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীদের লইয়া সিমলাতে সত্বরই একটি সম্মেলন আহূত হইবে। কংগ্রেসী নেতাদিগকে পাকড়াইবারও ফাঁদ মন্দ নয়। কংগ্রেসের দক্ষিণী দল এ সম্বন্ধে কার্য্যত কি নীতি অবলম্বন করেন, তাহা দেখিবার জন্য দেশের লোক উদ্গ্রীব আছে; কারণ, এক্ষেত্রে কেন্দ্র-শক্তির সঙ্গে বিরোধের অর্থই সংগ্রামের অবতারণা। যাঁহারা দেশ প্রস্তুত নয়, প্রস্তুত নয় দিন-রাত্রি ইহাই হাঁকিতেছেন, তাঁহাদের যুক্তি-বিশ্বাস কিরূপে কর্ম্মপদ্ধতিতে পরিস্ফুট হইয়া ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তকে বাস্তব আকার দিবে ইহা দুর্জ্ঞেয় রহস্যস্বরূপই মনে হয়। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদ এই সমস্যার সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য দুই-এক দিনের মধ্যেই ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী বৈঠক আহ্বান করিতেছেন এবং মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা চলিতেছে। কার্য্যক্রম কি দাঁড়াইবে জানি না। তবে আমাদের নিজেদের কথা এই যে, কংগ্রেস স্থায়ী কি অস্থায়ী কোন রকমেই নিখিল ভারতীয় যুক্ত শাসনতন্ত্রকে স্বীকার করিতে পারে না, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার নীতিরই ব্যত্যয় হয়। ভারতবাসীরা আর কর্ত্তাদের পিঠ চাপড়ানীতে কিম্বা ফাঁকা প্রতিশ্রুতিতে ভুলিবে না। তাহারা এ ব্যাপারে অনেক ঠকিয়াছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড লিটন দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, ইংরেজ ভারতের সম্বন্ধে যত প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তাহার কোনটিই সে রক্ষা করে নাই;—ইহার পরও ভারতবাসীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিশ্রুতিতে ভুলিয়াছে এবং ভুলিয়া যে ভুল করিয়াছে, সেজন্য হাতে হাতে আক্কেলও যথেষ্ট পাইয়াছে। গণতন্ত্র-রক্ষার জন্য কর্ত্তাদের শুভেচ্ছাও ভারতবাসীদিগকে আবেগে

আর মাতাইবে না—নিজেদের দাসত্বের বোঝা ঘাড়ে লইয়া কর্ত্তাদের গণতন্ত্র বিলাসের মূল্য ভারতবাসীরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে। ভারতের সাহায্য যদি ইংরেজের আবশ্যক হয়, ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতাকে আগে তাহাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজের জোর আছে—সে শক্তিবল-বাহনসংবৃত; কিন্তু জোরের দ্বারা কোন জাতির সহযোগিতা পাওয়া যায় না। সহযোগিতার মূলে সংকল্পশক্তি কাজ করে। ভারতবাসীদের মধ্যে সংকল্পশক্তি এখন জাগিয়াছে। এমন অবস্থায় ভারতবাসীদের উপর জোর খাটাইতে গেলে সংকট আরও বাড়িবে'

ডাক্তার ঘোষের সাফাই—

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গত ২৩শে আগষ্ট মালিকান্দায় কাছে একটি জনসভায় ওয়ার্কিং কমিটির সাফাই গাহিয়া এক বক্তৃতা দিয়াছেন। এই বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্রের উপর ওয়ার্কিং কমিটি যে দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তিনি তাহার সমর্থন করেন—সমর্থনের যুক্তিতে নূতনত্ব কিছু নাই। এ সম্বন্ধে তিনি গান্ধী-ভাষ্যেরই ভাবুক। ওয়ার্কিং কমিটির বর্ত্তমান নীতির আলোচনা করিয়া ডাক্তার ঘোষ বলেন,—"দেশ কি সত্যই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত? আপনারাই বুঝতে পাচ্ছেন, অবস্থা তা নয়। তা বোলে দেশ কোন দিনই প্রস্তুত হবে না, এমন কথা আমি বোলছি না। দেশকে প্রস্তুত হ'তেই হবে—স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতেই হবে।" দেশকে স্বাধীনতা লাভ কোরতেই হবে, এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি নাই। মেকলে হইতে আরম্ভ করিয়া মণ্টেগু-চেমসফোর্ড-রেডিং-আরউইনহোর সকলেই জোর গলায় আমাদিগকে এই কথা শুনাইয়াছেন যে, ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা না দিয়া তাঁহারা ছাড়িবেন না। কত দিনে? প্রশ্ন তো এইখানে এবং কোন পথে? সুভাষচন্দ্রও স্বাধীনতা চান, ওয়ার্কিং কমিটির দক্ষিণী দলও স্বাধীনতা চান, তফাৎ শুধু এই যে, সুভাষচন্দ্র বলিতেছেন, স্বাধীনতা লাভ এখনই করিতে হইবে এবং দেশ এখনই প্রস্তুত, অন্ততপক্ষে যতটা প্রস্তুত, তাহার জোরেই বর্ত্তমান সুযোগে সে স্বাধীনতা আদায় করিয়া লইতে পারে; পক্ষান্তরে দক্ষিণী দল বলিতেছেন যে, দেশ প্রস্তুত নয়; সুতরাং সংগ্রামের কথা তুলিও না—ব্রিটিশ মুরুব্বীদের মহিমায় যে শাসনতন্ত্র পাইয়াছ, টুঁ শব্দটি না করিয়া, নিরুপদ্রবভাবে সেই শাসনতন্ত্র চালিতে দাও, তাহাতেই শান্তি, তাহাতেই শক্তি। শাসনতন্ত্র ভারতের দাসত্বকে সুদৃঢ় করিবার জন্য পরিকল্পিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে ধ্বংস করাই উচিত, এ সব কথা ভুলিয়া এখন সে শাসনতন্ত্র যাহাতে নিরুপদ্রবভাবে চলে, সেই ফিকিরই বড় হইয়াছে। ১৮ বৎসর ধরিয়া যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া লইয়া আসিয়াছেন, ব্যক্তি হিসাবে তাঁহাদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধার অভাব নাই; কিন্তু তাঁহাদের বর্ত্তমানের মতিগতি এবং পরিবর্ত্তিত নীতির উপরই দেশের লোকের অনাস্থা। ডাক্তার ঘোষ বলেন, কংগ্রেসের দক্ষিণী দল নিয়মতান্ত্রিকতার পথে পা দেন নাই,—তাঁহারা যদি সত্যই পা না দিতেন, তাহা হইলে দেশের লোককে এত করিয়া তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন হইত না। প্রতিরোধ-অসহিষ্ণু উদ্ধত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁহাদের সম্বন্ধে মতিগতি কিরূপ, তাহা হইতেই এত দিনের মধ্যে অভ্রান্তভাবে সে পরিচয় পাওয়া যাইত।

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত ও কংগ্রেস

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলনের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারীর নিকট একখানা পত্রের দ্বারা এই সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য উপস্থিত করেন। তিনি বলেন, "১৯৩৪ সালের অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন, ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহার প্রচারের পর হইতে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কংগ্রেস আর কখনও ন যযৌ ন তস্থৌ নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে না। বর্ত্তমানে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাটি যেভাবে রচিত হইয়াছে, তাহা সমগ্রভাবে আক্রমণ করিয়া সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানই আমাদের কর্ত্তব্য।" কংগ্রেসের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্ত্তন কাগজে পত্রে হইলেও আমরা কাজে তাহার কিছুই পরিচয় পাইতেছি না। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র গোটাভাবে নাকচ করিয়া দিতে পারিলে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সমস্যাও সে সঙ্গে চুকিয়া যায় ইহা আমরা বুঝি; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত নাকচের পথ না ধরিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফলোপধায়ক সেই যে গোটা শাসনতন্ত্র বাতিল করিবার পথ কংগ্রেসের তরফ হইতে সেই দিকেও আমরা কোন কাজ দেখিতেছি না। বরং শাসনতন্ত্র লইয়া কাজ করিবার দিকেই কংগ্রেসে কর্ত্তৃত্ব-প্রাপ্ত দক্ষিণী দল ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। ইহার ফলে শাসনতন্ত্র নাকচের কথাটা শুধু কথা মাত্রই থাকিয়া যাইতেছে; কিন্তু সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিষময় ফলে জাতির সংহতিশক্তি কার্য্যত নষ্ট হইতেছে, অবিচার, অন্যায়, অসঙ্গতভাবে অধিকার হরণ প্রশ্রয় পাইতেছে। যে শক্তি লইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালান হইবে কাজের দিক হইতে এই সিদ্ধান্ত দেশের মধ্যে ভেদ-বিভেদ ঘটাইয়া সে শক্তিকেই নষ্ট করিতেছে। ভবিষ্যতের ভরসায় এই কার্য্যকর অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে দেশের জাতীয়তা এবং স্বাধীনতাকামী কেহই উদাসীন থাকিতে পারেন না। কংগ্রেস যদি সমগ্রভাবে শাসনতন্ত্রকে নাকচ করিবার পথ কার্য্যত ধরিতেন এবং বুঝা যাইত যে সেইভাবে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছেন, তাহা হইলে বাঙলার জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে এ আন্দোলন চালাইবার প্রয়োজন হইত না। কংগ্রেস এ সম্বন্ধে আদর্শ-নিষ্ঠা বজায় না রাখাতেই তাহা প্রয়োজন হইয়াছে এবং এইভাবে জাতীয়দল কংগ্রেসের আদর্শ,—জাতীয়তার আদর্শকে দেশের সম্মুখে সুস্পষ্ট রাখিতেছেন।

প্রতিকারের পন্থা—

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলনের মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতে গিয়া বলেন,—"যে

সমস্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি একমত নয়, তাহার প্রত্যেকটির বেলাতেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সিদ্ধান্ত দিতে হইতেছে। ঐ সিদ্ধান্ত পার্লামেণ্টে গৃহীত এবং আইনে পরিণত হইয়াছে। আইনের অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে কেন যে অধিকতর অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মনে করা হয়, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অবশ্য আমি শ্রোতৃবর্গকে এই কথা বলিয়া বিভ্রান্ত করিতে চাই না যে, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত আইনটির পরিবর্ত্তন সাধন করা সহজ। আমি জানি, ইহা খুবই দুরূহ কাজ। কিন্তু পরিবর্ত্তন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব কিংবা আইনের সংশোধন করার চেয়ে ইহার সংশোধন করা অনেক কঠিন, একথা আমি কোনমতেই স্বীকার করি না।" সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি আণে পরিবর্ত্তন-সাধনের এই প্রয়াস কি ভাবে সর্ব্বাপেক্ষা সহজে সাফল্যলাভ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে বলেন,—'যে আটটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই আটটি প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডল যদি এই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দেন, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করা খুব যে কঠিন হইবে, আমি এরূপ মনে করি না।' কংগ্রেসকে এই কর্ত্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত করাটাই হইল প্রয়োজন বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের নীতি এবং সেই নীতিকে সার্থক করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় সংকট সৃষ্টি করা বর্ত্তমানে একান্ত প্রয়োজন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এখন যেমন সংকটে পড়িয়াছে, এমন আর কোনদিন ঘটে নাই—এই সুযোগ বড় সুযোগ। বাঁটোয়ারা-বিরুদ্ধতাকে সূত্র করিয়া আজ ভারতের স্বাধীনতাবাদিগণ এই সুযোগকে সার্থক করিতে পারেন; এজন্য দেশবাসীকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর মনোভাব—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সেদিন মুশ্লীম লীগ কাউন্সিলের দিল্লীর বৈঠকে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খাঁ যুদ্ধকালে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। লীগ কাউন্সিলে তাঁহার সেই মতের সঙ্গে ভারতের মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ ভারতের মুসলমানদের তেমন উক্তিতে সম্মতি নাই, এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী হক সাহেবের বক্তৃতা উক্ত প্রস্তাবটির সম্পর্কেই হইয়াছিল। এ সব ব্যাপারে ধরা-ছোঁয়া দেওয়া যে উচিত নহে, হক সাহেব সে বিষয়ে সম্পূর্ণই হুঁসিয়ার। তিনি ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারেন, তবু তাঁহার বক্তৃতা হইতে এটুকু বুঝা যাইতেছে যে, স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খানের প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন না। তিনি বলেন স্যার সেকেন্দর কেন এইরূপ বিবৃতি প্রদান করিলেন তাহা তিনি জানেন না। এরূপ বিবৃতি না দেওয়াই তাঁহার উচিত ছিল। এই সঙ্গে কথার কায়দায় নিজের স্বার্থের ঘাটি পাকা করিবার পটুতা প্রয়োগেরও কসুর করেন নাই। তিনি বলেন, মুসলমানেরা আজ বড়ই সংকটে পড়িয়াছে। একদিকে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস শক্তি অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং তাহার ফলে মুসলিম স্বার্থের ক্ষতি হইতেছে এবং অপরদিকে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ ও দাবী পূরণের কোন লক্ষণই দেখাইতেছেন না। এই অবস্থায় তিনি মনে করেন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ব্যর্থ হইয়াছে। হক সাহেবের মুখে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের গালাগালি নূতন কিছুই নয়; কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যর্থতা উপলব্ধির কথা, বাঙলার হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতার মুখে উপভোগ্য বটে।

তদপেক্ষা বিশেষ উপভোগ্য হইল এই যে, স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খানের যে বিবৃতি দেওয়া অন্যায় হইয়াছে বলিয়া হক সাহেব মনে করেন, সেই অন্যায় তিনি নিজেই করিয়াছেন। মোশ্লেম সম্প্রদায়কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে দাঁড়াইবার জন্য যে বিবৃতি তিনি প্রচার করিয়াছেন, তাহা শনিবারের 'ষ্টেটসম্যানে' প্রকাশিত হইয়াছে, সেই বিবৃতি হইতে স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খানের বিবৃতির পার্থক্য কিছুই নাই। হক সাহেব দিল্লীর মোশ্লেম লীগওয়ালাদের মধ্যে উত্তেজনা প্রকাশ করিয়াছেন, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধে। তিনি বলিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদের কোন দাবী শুনেন না, তাহাদের অভাব-অভিযোগ মানেন না। বাঙলা দেশে তিনি যে বিবৃতি দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, মুসলমানগণ, তোমাদের যতকিছু অভাব-অভিযোগ সব ভুলিয়া যাও, সে কথা আজ তুলিও না। মতের মিল এবং উক্তির সংগতির উদ্ভটতাই হক সাহেবের বিশিষ্টতা। যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদের দাবী এবং অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে কোন আশা-ভরসা দিতে নারাজ হক সাহেবের কর্ত্তৃত্ব পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডল সাম্প্রদায়িক বৈষম্যমূলক নীতির উপর জোর দিয়া জাতীয়তার শক্তিকে উচ্ছেদ করিবার ব্রত লইয়াছেন সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনস্কামনাকেই সিদ্ধ করিবার জন্য। এমন সব বশংবদ পুরুষ থাকিতে সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দ্ধারিত শাসনতন্ত্র অচল হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিয়া তদনুযায়ী নীতি নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্ঘর্ষ সূত্রেই শুধু এ শাসনতন্ত্র অচল হইতে পারে। সংকীর্ণ স্বার্থ-সেবার মোহ যতদিন মন্ত্রিগিরির মধ্যে রহিয়াছে, ততদিন তেমন সমস্যা দেখা দিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। বৃহত্তর আদর্শের প্রবল প্রেরণায় আদর্শ-নিষ্ঠা যেখানে এদেশে মিথ্যাচারের ঊর্দ্ধে মানুষকে তুলিবে সেইখানেই শাসনতন্ত্র অচল হইবে। নিতান্ত সুবিধাবাদী বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলে তেমন আদর্শনিষ্ঠ মানুষের যে ঠাঁই হইতে পারে, ইহা দেশের লোকের মন ও বুদ্ধির অগোচর।

যুদ্ধের ভয় ভাঙ্গানো—

জেগেছে চীন, জেগেছে জাপান—ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রয়? ভারতবন্ধু 'ষ্টেটস্ম্যান' অবিরত এই উত্তে-

জনাকর বাণী আওড়াইতেছেন। সব দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। জার্ম্মান জাহাজগুলো মাল-পত্র খালাস না করিয়াই কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইতেছে। পুণা, বোম্বাই, করাচী ও নয়াদিল্লী এ সব জায়গায় বিদ্যুতের কারখানা, জল-সরবরাহের কেন্দ্র প্রভৃতি স্থানে সশস্ত্র প্রহরী সংগীন উঁচাইয়া রহিয়াছে। কলিকাতা শহরেও উড়ো-জাহাজ-যোগে আধুনিক সমরের মহড়া দেওয়া হইতেছে। দেশের লোকের ভয় ভাঙ্গিবার জন্যই নাকি এ সব ব্যবস্থা ! কিন্তু সত্য সত্যই যদি যুদ্ধ বাধে, তবে দেশের লোকে এই মহড়ার মহিমায় শক্ত হইয়া থাকিতে পারিবে কি ? এ দেশের লোককে নানাভাবে নিস্তজীব করিয়া যাহারা একান্ত অসহায় করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের এমন সামরিক আখড়াই দেশের লোকের মনে সত্যকার বল দিতে পারে না। সুতরাং সেদিক হইতে এগুলি একেবারেই নিরর্থক। খেলার হিসাবে কিম্বা মজা দেখাইবার হিসাবে এগুলির কিছু মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু অবিরত যুদ্ধ বাধে বাধে এই কথা শুনিয়া মজা উপ-ভোগের মত মনের অবস্থা দেশের লোকের আর নাই—আজকার সমস্যা তাহাদের সত্যকার সমস্যা। এই সত্যকার সমস্যার ভারতের চাঞ্চল্যের কোন কারণ থাকিত না যদি ভারতের ৩৫ কোটি লোকের অন্তত দুই কোটিও সামরিক শিক্ষা লাভ করিত। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অবিশ্বাসের নীতি ভারতবাসীকে আজ সে দিক হইতে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। ভারতবাসীদিগকে এইভাবে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির যে নীতি সাম্রাজ্যবাদীরা এখানে চালাইয়াছে তাহার ফলে নিজেরাও তাহারা দুর্ব্বল হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের সেই দুর্ব্বলতার ভিতরে ভারতবাসীদের নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ যদি ভারতবাসী দেখে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই—মানবের মনস্তত্ত্বের ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি। অবিশ্বাসই অবিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

সুভাষচন্দ্রের উপর আক্রমণ

গত ২৭শে আগষ্ট বাঁকীপুরে ময়দানে সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দনের আয়োজন হয়। এই সভায় এক দল গুণ্ডা গোলমাল সৃষ্টি করে। তাহারা সুভাষচন্দ্র এবং তাঁহার সমর্থকদের উপর ইট-পাটকেল ছুঁড়িতে থাকে। কয়েকটা ঢিল সুভাষচন্দ্রের গায়ে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু আঘাত পান নাই। ২১ জন লোক জখম হয়, ইহাদের মধ্যে ১২ জনকে পাটনা জেনারেল হাসপাতালে আশ্রয় লইতে হয়; কিষাণ নেতা স্বামী সহজানন্দ মাথায় গুরুতর আঘাত পান। সুভাষচন্দ্র বিহার পরিদর্শনে যাইবেন, এই সংবাদ প্রকাশ হইবার পর হইতেই পাটনার 'সার্চ্চ লাইট' পত্র এই মত প্রচার করিতেছিল যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কলিকাতা অধিবেশনের সময় বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বাঙালীরা অপমান করিয়াছে, সুতরাং সেই কার্য্যের প্রতিশোধ তুলিবার জন্য পাল্টা হিসাবে সুভাষ-চন্দ্রকে কোনরকম সম্বর্দ্ধনা করা বিহারের লোকের কর্ত্তব্য হইবে না। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের সময় কলিকাতায় কংগ্রেস নেতাদের কয়েক জনের বিরুদ্ধে যে উত্তেজনা প্রকাশ পায়, আমরা তাহার নিন্দা করিয়াছি। বাঙলা দেশের কংগ্রেসের কার্য্যের সহিত সংশিলষ্ট কোন সংবাদপত্রই নেতাদের কাহারও সংবর্দ্ধনা বর্জ্জন করিবার পক্ষে প্রচারকার্য্য চালায় নাই। 'সার্চ্চ লাইট' বিহারের কংগ্রেসী দলের মুখপত্র হইয়াও সেই কাজ করিয়াছেন। কলিকাতায় যে উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার মূলে প্রাদেশিকতার কোন ভাব ছিল না। জনতা বাঙালী অ-বাঙালী এ বিচার করিয়া আক্রমণ করে নাই। শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই যেমন আক্রান্ত হন, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতি বাঙালীও তেমনই আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু 'সার্চ্চ লাইট' কলিকাতার সেই ব্যাপারটিকে অ-বাঙালী বিদ্বেষ বা বিহারী বিদ্বেষের ভাষ্য প্রদান করিয়া সুভাষচন্দ্র যখন বাঙালী তখন বিহারীদের তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা উচিত নয়, এই উস্কানী চালাইতে থাকেন। এই প্রচারকার্য্যের অবশ্য-ম্ভাবী ফল যাহা তাহাই ফলিয়াছে। 'সার্চ্চ লাইট' বিহার কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের পৃষ্ঠপোষিত কাগজ, শুধু তাহাই নহে, কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই সংবাদ-পত্রের একজন ডিরেক্টর এমনই আমরা শুনিয়াছি। আকস্মিক উত্তেজনার মুখে গুণ্ডামি, তাহার একটা কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে, রাজনৈতিক ব্যাপারে সব দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সে ধরণের গুণ্ডামি এবং উত্তেজনা প্রকাশ পায়; কিন্তু বিহারী অকৃত্রিম অহিংস কংগ্রেসওয়ালাদের ধ্বজা ধরিয়া এই যে বাঙালী বিদ্বেষ প্রচার ইহা কংগ্রেসের নীতি বা জাতীয়তাবাদের কতখানি নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে, আমরা ইহা ভাবিয়াই উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

বাঙলার তুলার চাষ-

বাঙলা দেশে তুলার চাষের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বঙ্গীয় মিল মালিক সঙ্ঘ বাঙলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আজ বাঙলার যে অবস্থা পূর্ব্বে এমন অবস্থা ছিল না, বাঙলা দেশে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইত। এক ঢাকা জেলাতেই মেঘনার তীরে ৪০ মাইল দীর্ঘ ও তিন মাইল প্রশস্ত স্থানে তুলা উৎপন্ন হইত। মেদিনীপুরে, বাঁকুড়া, নওগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও বহরমপুরে ৫০ বিঘা করিয়া জমি লইয়া ঐগুলিতে এক একটি পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে তুলার চাষ করিবার যে পরিকল্পনা বাঙলা সরকার করিয়া-ছেন, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বাঙলায় ২৮টি কাপড়ের কল বর্ত্তমানে চলিতেছে, প্রতি বৎসর বাঙলায় এক লক্ষ বেল তুলার প্রয়োজন, বাঙলা সরকার যদি ইচ্ছা করেন, তুলার চাষ বাড়াইবার ব্যবস্থাও তাঁহারা করিতে পারেন। বাঙলা দেশে যে কয়টি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত সেগুলিতে এখন উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম সূত্রের বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং এই দিক হইতে স্বাবলম্বী হইতে পারে, এমন সম্ভাবনাও রহিয়াছে। বাঙলা সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন ...

করিবার ফলে যে জমি উদ্বৃত্ত থাকিবে সেগুলিতে তুলার চাষ করা যাইতে পারে, অবশ্য কোন্ শ্রেণীর তুলার চাষ কোন্ জমিতে করিলে সুবিধা, এগুলি দেখা দরকার। বাঙলা সরকার ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি হইতে বিশেষজ্ঞ আনিয়া তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এ সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। কথা হইতেছে এই যে, এই সব জনকল্যাণমূলক কার্য্যে সরকারের শৈথিল্য স্বাভাবিক, বাঙলাদেশের জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার প্রেরণা তাঁহাদের সে শৈথিল্য দূর করিতে পারিবে কি?

চীনে পণ্ডিত জওহরলাল—

চীনে গমন করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল চীনের জাতীয়তাবাদী দলের দ্বারা সর্ব্বত্র সংবর্দ্ধিত হইতেছেন। তিনি রাজধানী চুংকিংয়ে পৌঁছিবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজধানীতে জাপানীদের বিমান আক্রমণ আরম্ভ হয়। জেনারেল চিয়াং-কাইশেক স্বয়ং এই সম্মানী অতিথির নির্ব্বিঘ্নতার জন্য উদ্বিগ্ন হন এবং তাঁহাকে পররাষ্ট্র বিভাগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূগর্ভস্থ আশ্রয়ে লইয়া যাওয়া হয়। স্পেনে গিয়া বিমান আক্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পণ্ডিতজীর যেমন হইয়াছিল, চীনেও তাহা হইয়াছে। জেনারেল চিয়াং-কাইশেকের সঙ্গেও পণ্ডিতজীর সাক্ষাৎ ও আলোচনা হইয়াছে। ইহার পর পণ্ডিতজী বিমানযোগে চেং-টুতে গিয়াছিলেন এবং তথায় গিয়া চীনাদের সামরিক ব্যবস্থা তিনি দেখিয়াছেন এবং গরিলা বাহিনীর কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। আগামী ২রা এবং ৩রা সেপ্টেম্বর রাঁচীতে ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী অধিবেশন আহূত হইয়াছে। পণ্ডিতজী যাহাতে এই অধিবেশনে যোগদান করিতে সক্ষম হন, তজ্জন্য রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়া তার করিয়াছেন। পণ্ডিতজী সম্ভবত ইতিমধ্যেই ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তাঁহার এই চীন পরিদর্শনের ফলে ভারতের স্বাধীনতাকামিগণের সঙ্গে চীনের জাতীয়তাবাদীদের যোগসূত্র ঘনিষ্ঠতর হইল।

বিশ্ব-শান্তি ও মহাত্মা—

বিশ্বে শান্তি রক্ষার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিয়া একজন ইংরেজ মহিলা মহাত্মা গান্ধীর নিকট সম্প্রতি একখানা চিঠি লিখেন। মহাত্মাজী সেই চিঠির উত্তরে জানাইয়াছেন—"যুদ্ধ বাধিবে কি শান্তি স্থাপিত হইবে, ইহার মীমাংসা যাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের উপর আমার বাণী কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। হিংসার দ্বারা অর্জ্জিত বস্তু হিংসাতেই লোপ পায়—এই প্রবাদবাক্যে আমার বিশ্বাস অটল। ভারত যদি আজ স্বাধীন থাকিত এবং আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব থাকিত, তাহা হইলে ভারতের যিনি জননায়ক, ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিকদের কাছে তাঁহার মতের মূল্য থাকিত, জগতের বর্ত্তমান রাজনীতিতে শুদ্ধ সাত্ত্বিক আদর্শের কোন স্থান নাই, তেমন সাত্ত্বিক আদর্শকে সামান্য কিছু প্রতিষ্ঠা দান করিতে হইলে মানবের ক্রমাভিব্যক্তির বর্ত্তমান এই স্তরে রাজসিক শক্তিরও একটা দিক থাকা চাই। শুদ্ধ সাত্ত্বিক অহিংসার আদর্শ মানবের পক্ষে উচ্চ আদর্শ হইতে পারে, হইতে পারে মানবোচিত সে ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম এ অবস্থায় শুধু উপদেশের সাহায্যে মানব সমাজে সক্রিয় করা সম্ভব নয়। ভারতের নিজের যতদিন রাষ্ট্রবল বা রাষ্ট্রীয় অধিকার নিজের হাতে না আসিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, তাহা অনেকটা দার্শনিক বিলাস মাত্রেই পর্য্যবসিত থাকিবে।

'শ্রাবণ-সখা পবন এসো এসো'

শ্রীনির্ম্মলকুমার মিত্র, বি-এ

শ্রাবণ-সখা পবন এসো এসো,
গগনে মম বারেক এসে হেসো!
জানালা দিয়ে তাকায়ে আছি পথে—
আসিবে কবে কাজল-মেঘ-রথে;
আসিবে কবে গভীরে গরজিয়া
পথিক বায়ু, বারতা মধু নিয়া!
যে-দেশে মম কাটিল বহু সাল,
বালক-বেলা, প্রথম যুব-কাল;
তাহারি কথা গগন-পথচারি!
কহগো কহ, ভালো তো সবি তারি?
আছে তো ভালো সেই সে দেশে লোক,
মিনতি করি, কুশল তব হোক?
আজিও বঁধু তেমনি ছড়া-গানে
বাদল-ধারে ডেকে কি কেহ আনে?
আজিও সেথা সাপের মত বেঁকে
পুকুরে গিয়ে পড়ে কি বারি হেঁকে?

কদম-রেণু বাতাসে ভেসে এসে,
পড়ে না আজো কাহারো কালো কেশে?
দাদুরী বলো তেমনি ডাকে কিনা
তালের-বনে আঁধার সেথা লীনা?
মেঘের কালো অলকে মাঝে মাঝে
ঝলক মেরে বিজুরী কিগো বাজে?
পুরনো কথা অনেক জমা ভাই!
প্রবাসী বুকে উঠিছে ভাষা নাই!
আসিলে যদি গগনে, এসো এসো,
আমার পাশে বারেক এসে বসো!
বলিতে যাহা নারিব মুখ-ভাষে,
চোখেরি জলে বলিব হাহাশ্বাসে।
শ্রাবণ-সখা পবন, বহুদিন
তোমারি আশে রয়েছি সুখহীন;
আসিলে যদি, পীরিতি মম লহ,
মিনতি শুধু, কুশল বাণী কহ।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(২১)

ব্যবস্থাপক ও সামাজিক কেন্দ্রীকরণ ও সমরূপতার দিকে অভিযান

সার্ব্বভৌম কর্ত্তার হাতে ফৌজদারী, দেওয়ানী ও বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা

সার্ব্বভৌম কর্ত্তার হস্তে শাসন সম্বন্ধীয় মূল শক্তিগুলির আহরণ তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন বিচারকার্য্য নির্ব্বাহে ঐকিকতা ও সমরূপতা স্থাপিত হয়, বিশেষত, ফৌজদারী বিভাগে; কারণ শৃঙ্খলা ও আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার সহিত এইটিরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ফৌজদারী বিভাগে বিচার-কর্ত্তৃত্ব শাসনকর্ত্তার পক্ষে নিজের হস্তে রাখা প্রয়োজন হয়, যেন তিনি ইহার প্রয়োগ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সকল প্রকার বিদ্রোহকে রাজদ্রোহিতা বলিয়া দমন করিতে পারেন এবং যতদূর সম্ভব সমালোচনা ও বিরুদ্ধতা নিরোধ করিতে পারেন এবং সেই স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কথাকে শাস্তি দিতে পারেন, যাহারা নিরন্তর অধিকতর উৎকৃষ্ট সামাজিক নীতির সন্ধান করিয়া এবং প্রগতিকে সূক্ষ্মভাবে অথবা প্রত্যক্ষভাবেই উৎসাহিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত শক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে এত বিপজ্জনক হইয়া উঠে, বিবর্ত্তনে উৎকৃষ্টতর বস্তুর দিকে অভিযান করিয়া বর্ত্তমানে যে বস্তুর প্রাধান্য রহিয়াছে, তাহাকে এত বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে। বিচারকার্য্যে অধিকারের ঐকিকতা, আদালত গঠন করিবার ক্ষমতা, বিচারকগণকে নিযুক্ত করিবার, বেতন দিবার, অপসারিত করিবার ক্ষমতা, অপরাধ ও তাহার শাস্তি নির্দ্ধারণের ক্ষমতা—এইগুলি হইতেছে ফৌজদারী বিভাগে সার্ব্বভৌম কর্ত্তার বিচার সম্বন্ধীয় ক্ষমতার সমগ্রতা। দেওয়ানী বিভাগেও তাহার ক্ষমতার সমগ্র স্বরূপটি হইতেছে বিচারকার্য্যে অধিকারের অনুরূপ ঐকিকতা, দেওয়ানী আইন প্রয়োগকারী আদালত গঠনের ক্ষমতা এবং সম্পত্তি, বিবাহ ও যে সকল সামাজিক বিষয়ের সহিত সমাজের সাধারণ শান্তি ও শৃঙ্খলার সম্বন্ধ আছে, এই সব সম্বন্ধে আইন পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিবার ক্ষমতা। কিন্তু রাষ্ট্র যখন নিজকে স্বাভাবিক ধারায় সঙ্ঘবদ্ধ সমাজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, তখন দেওয়ানী আইনের ঐকিকতা ও সমরূপতা তত গুরুত্বপূর্ণ ও আসন্ন প্রয়োজনীয় নহে; যন্ত্র-হিসাবে উহা তত প্রত্যক্ষভাবে অপরিহার্য্য নহে। অতএব প্রথমে ফৌজদারী অধিকারটিই অল্পাধিক পূর্ণতার সহিত হস্তগত করা হয়।

আদিতে এই সকল ক্ষমতাই স্বাভাবিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ সমাজের অধিকারে ছিল এবং সেগুলি প্রধানত শিথিল এবং সম্পূর্ণভাবে আচারমূলক বিবিধ স্বাভাবিক উপায়ের দ্বারা প্রযুক্ত হইত, যেমন ভারতের পঞ্চায়েৎ বা গ্রাম্য সালিশী সভা, শ্রেণী, গণ বা অন্যান্য স্বাভাবিক সঙ্ঘের বিচারাধিকার, বিবিধ রোমান কমিটিতে (Comitia) নাগরিকগণের সভা বা পরিষদের বিচার ক্ষমতা, অথবা যেমন রোম ও এথেন্সে ছিল লটারি বা অন্য উপায়ে নির্ব্বাচিত বহু লোক হইয়া গঠিত জুরীর দ্বারা বিচার, রাজা বা মুখ্যগণও তাঁহাদের শাসন-নির্ব্বাহক কর্ম্মধারায় বিচারকার্য্য করিতেন, কিন্তু তাহার পরিমাণ খুবই অল্প ছিল। অতএব মানবীয় সমাজগুলি তাহাদের প্রারম্ভিক বিকাশের অবস্থায় বহুকাল ধরিয়া তাহাদের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহে খুবই জটিলতার একটা দিক বজায় রাখিয়াছিল; এ বিষয়ে অধিকারের সমরূপতা অথবা বিচার ক্ষমতার উৎসের কেন্দ্রগত ঐকিকতা ছিল না এবং তাহাদের প্রয়োজনও অনুভূত হয় নাই। কিন্তু যেমন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা বিকাশ লাভ করিতে থাকে, এই ঐকিকতা ও সমরূপতা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। ইহা নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তোলে, প্রথমে এই সব বিবিধ অধিকারকে রাজার হস্তে সংগৃহীত করিয়া, তিনিই হন ইহাদের পিছনে শক্তির উৎস এবং আপীলের উচ্চতম আদালত, মূল বিচারের ক্ষমতাও তাঁহার হস্তে থাকে, কখনও কখনও তাহা রীতিমত বিচার প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রযুক্ত হয়। প্রাচীন ভারতে এইরূপই হইত; কিন্তু কখনও কখনও অধিকতর স্বৈরতন্ত্রে তাহা গবর্ণমেন্টের আদেশ-বাণী দ্বারাই প্রযুক্ত হয়,—বিশেষত ফৌজদারী বিভাগে দণ্ড দিবার জন্য, আরও বিশেষভাবে রাজার শরীরের বিরুদ্ধে অথবা রাষ্ট্রের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অপরাধীর দণ্ড দিবার জন্য। প্রাচ্যের বহু দেশের সমাজের ন্যায় যে সমাজ আইন ও আচারকে ধর্ম্মমূলক বলিয়া গণ্য করে, সেখানে ধর্ম্মভাব প্রায়ই একীকরণ ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বের দিকে এই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে এবং রাজা ও রাষ্ট্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, শাসনকর্ত্তাকে বিচারকার্য্য-নির্ব্বাহের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয়, কিন্তু তাঁহাকে আইনের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বাধ্য বলিয়াই গণ্য করা হয়, তিনি সেই আইনের উৎস নহেন, পরন্তু কেবলমাত্র প্রয়োগ কর্ত্তাই। কখনও কখনও এই ধর্ম্মভাব সমাজে একটি যাজকীয় বিভাগ সৃষ্টি করিয়া তোলে। —যেমন স্বতন্ত্র যাজকীয় কর্ত্তৃত্ব ও অধিকার-সহ চার্চ্চ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হস্তে ন্যস্ত শাস্ত্র, উলেমাদের উপর ন্যস্ত আইন অধিকার। যেখানে ধর্ম্মভাবের প্রাধান্য রক্ষিত হয়, সেখানে একটা মীমাংসা পাওয়া যায় রাজার সহিত এবং প্রত্যেক রাজকীয় আদালতে তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত বিচারকের সহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া এবং বিচারসংক্রান্ত সকল প্রশ্নে পণ্ডিত বা উলেমাগণের মতকেই চরম বলিয়া গণ্য করিয়া। আর ইউরোপের ন্যায় যেখানে রাজনৈতিক বোধ ধর্ম্মভাব হইতে অধিকতর বলশালী, সেখানে যাজকীয় অধিকার কালক্রমে রাষ্ট্রের অধীন হইয়া পড়ে এবং শেষ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আইনের কর্ত্তা এবং সাধারণ শৃঙ্খলার প্রতিভূস্বরূপ রাষ্ট্র

এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্র (অথবা রাজতন্ত্র, স্বভাব-সিদ্ধ সমাজ হইতে যুক্তিসিদ্ধ (rational) সমাজে পরিবর্ত্তনে রাজতন্ত্রই মহান যন্ত্রস্বরূপ) যেমন সাধারণ শৃঙ্খলা ও দক্ষতার প্রতিভূ তেমনিই আইনেরও কর্ত্তা হইয়া উঠে

যে কার্য্যনির্ব্বাহক (executive) শক্তির আদৌ কোন স্বৈর ও দায়িত্বহীন ক্ষমতা আছে, বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে তাহার অধীন করিয়া দেওয়ার বিপদগুলি খুবই সুস্পষ্ট; কিন্তু কেবলমাত্র ইংলণ্ডেই (এই একটি মাত্র দেশেই স্বাধীনতাকে সর্ব্বদা শৃঙ্খলার সহিত সমান মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে, অন্যান্য দেশের ন্যায় উহাকে কম মূল্যবান বা একেবারেই প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করা হয় নাই) রাষ্ট্রের বিচারবিষয়ক ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রাচীনকাল হইতেই সফলতার সহিত করা হইয়াছিল। ইহা করা হইয়াছিল অংশত বিচার-বিভাগের স্বাধীনতার দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত প্রথা দ্বারা, বিচারকগণ একবার নিযুক্ত হইলে তাহাদের পদ ও বেতনের উপর কোনরূপে হস্তক্ষেপ করা চলিত না; আর অংশত ইহা সম্পন্ন হইয়াছিল জুরী প্রথা দ্বারা। অত্যাচার ও অবিচারের অনেক ফাঁকই ছিল, মানুষের সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যেমন হইয়া থাকে, তথাপি উদ্দেশ্যটি মোটামুটি সিদ্ধ হইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অন্যান্য দেশও জুরী প্রথা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সে-সব দেশ শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার দিকে প্রবৃত্তির দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হওয়ায় বিচার বিভাগকে কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের অধীনেই রাখিয়া দিয়াছে। তবে কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগ যেখানে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণের অধীন নহে সেখানে এইটি যত দোষের, যেখানে উহা শুধুই সমাজের প্রতিনিধি নহে পরন্তু সমাজের দ্বারাই নিয়োজিত এবং নিয়ন্ত্রিত সেখানে ত্রুটি তত গুরুতর দোষের হয় না।

আইনের সমরূপতা যে ধারায় বিকশিত হয়, তাহা বিচারনির্ব্বাহের ঐকিকতা ও সমরূপতা হইতে বিভিন্ন। প্রারম্ভাবস্থায় আইন হইতেছে সকল সময়েই আচারমূলক, Customary, আর যেখানে ইহা অবাধে আচরণমূলক, অর্থাৎ, যেখানে ইহা জনসাধারণের সামাজিক রীতিগুলিকেই ব্যক্ত করে, সেখানে ইহা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ ভিন্ন অন্যত্র) স্বভাবতঃই আচারের সর্ব্বাধিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে অথবা তাহাতে প্রশ্রয় দেয়। ভারতে সমাজের সাধারণ আইন যে ধর্ম্মীয় এবং অন্যবিষয়ক আচার মানিতে একটা অস্পষ্ট সীমার মধ্যে বাধ্য ছিল, যে-কোন সম্প্রদায় বা যে-কোন কুল তাহার বিশিষ্ট পরিবর্ত্তনের বিকাশ করিতে পারিত, আর এই স্বাধীনতা এখনও হিন্দু আইনের নীতির অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, যদিও কার্য্যত এখন নূতন কোন পরিবর্ত্তন স্বীকার করান খুবই কঠিন। এই যে পরিবর্ত্তন সাধনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাধীনতা ইহা হইতেছে সমাজের পূর্ব্বতন স্বাভাবিক বা অর্গানিক (organic) জীবনের অবশিষ্ট চিহ্ন, ঐ জীবন বুদ্ধিসম্মত ব্যবস্থাবদ্ধ, যুক্তিসিদ্ধ বা যান্ত্রিক জীবনের বিপরীত। অর্গানিক সমাজ-জীবন তাহার সাধারণ ধারা ও বিশিষ্ট বৈচিত্র্যসমূহ জনমণ্ডলীর সাধারণ অনুভূতি ও সহজ প্রেরণা বা অন্তর্বোধের দ্বারাই নিরূপণ করিত, বুদ্ধির কড়াকড়ি নিয়মের দ্বারা নহে।

সমাজের যুক্তিমূলক বিবর্ত্তনের লক্ষণ—আইনের সমরূপত এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক কর্ত্তৃত্ব

যুক্তিমূলক বিবর্ত্তনের প্রথম সুস্পষ্ট চিহ্ন হইতেছে আচারের উপর বিধিবদ্ধ আইন ও নিয়মতন্ত্রকে প্রাধান্য দিবার প্রবৃত্তি। তথাপি সকল বিধিবিধান এক রকমের নহে। কারণ প্রথমত এমন সব বিধান আছে যেগুলি লিখিত নহে, অথবা কেবল আংশিকভাবেই লিখিত, সেগুলি ঠিক বিধিবদ্ধ শাস্ত্রের রূপ গ্রহণ করে না, পরন্তু তাহারা কতকগুলি নিয়ম, decreta, নজীরের ভাসমান সমষ্টি মাত্র এবং সেখানে শুধুই আচারমূলক আইনের অনেকখানি স্থান আছে। আবার এমন সব ব্যবস্থা আছে যেগুলি যথাযথভাবে বিধিবদ্ধ শাস্ত্রের রূপ গ্রহণ করে, যেমন হিন্দু শাস্ত্র, কিন্তু বস্তুত সেগুলি কেবল আচারেরই দৃঢ়ীভূত সমষ্টি, তাহারা সমাজের জীবনকে অচলায়তন করিয়া তোলে, তাহাকে যুক্তিসম্মতভাবে গঠিত করে না। শেষত হইতেছে যত্নপূর্ব্বক বিধিবদ্ধ আইন, তাহা হইতেছে বুদ্ধি ও যুক্তি অনুসারে সমাজকে ব্যবস্থিত করিবার প্রয়াস; একটি সার্ব্বভৌম শক্তি আইনের কাঠামোটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় এবং সময়ে সময়ে এমন সব পরিবর্ত্তন অনুমোদন করে যেগুলি হয় নূতন নূতন প্রয়োজনের সহিত যুক্তিযুক্ত সামঞ্জস্য সাধন। সে সব পরিবর্ত্তন ব্যবস্থাটির যুক্তিমূলক ঐক্য এবং যুক্তিসংগত দৃঢ়তাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া সংশোধিত ও বিকশিত করে। এই শেষোক্ত ব্যবস্থাটির পূর্ণতা লাভ হইতেছে সমাজে প্রশস্ততর কিন্তু অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও অধিকতর নিঃসহায় প্রাণগত সহজ প্রেরণার উপর সংকীর্ণতর কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্বচেতন এবং স্বাবলম্বী যৌক্তিক বুদ্ধির জয়ের নিদর্শন। সমাজ যখন এক দিকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সমরূপ নিয়মতন্ত্রের (constitution) দ্বারা এবং অন্যদিকে সমরূপ এবং যুক্তিযুক্তভাবে সুরচিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের দ্বারা তাহার জীবনের সম্পূর্ণভাবে স্বচেতন এবং সুব্যবস্থিতভাবে যুক্তিযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও বিন্যাসের এই বিজয়মণ্ডিত সাফল্যে উপনীত হইয়াছে, তখন সে তাহার অভিবিকাশের দ্বিতীয় স্তরের জন্য যোগ্য হইয়াছে। সমাজ তখন যৌক্তিক বুদ্ধির আলোকে তাহার সমগ্র জীবনের সচেতন সমরূপ বিন্যাস করিতে অগ্রসর হইতে পারে, এইটিই হইতেছে আধুনিক সমাজতন্ত্র বা সোস্যালিজিমেরমূল নীতি এবং এই দিকেই হইয়াছে চিন্তাবিলাসীদের সকল আদর্শ সমাজ পরিকল্পনার (utopia) প্রবৃত্তি। **(ক্রমশ)**

যুদ্ধ কি বাধিল?

যুদ্ধ বাধিতে বাকী কিছুই নাই—শুধু কামান দাগা ছাড়া। পূর্ব্বে পশ্চিমে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে, আসমুদ্র কন্যাকুমারী এবং ব্রহ্ম সীমান্ত পর্য্যন্ত চঞ্চল টলমল, কখন কোন পক্ষের উড়োজাহাজ আসিয়া পড়ে! রুশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর চুক্তির পর হইতেই জগতের রাষ্ট্রনীতির চক্র যেন বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, স্পষ্টভাবে ইহার প্রথম প্রভাব দেখা দিয়াছে জাপানের উপর। জাপানের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ

ডানজিগ ও সেনাবাস-সম্বলিত শহর এলবিং-য়ের মধ্যবর্তী স্রোতস্বতীর উপর নির্মিত নূতন পন্টুন সেতু—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে এই সেতু পথে গুরুভার ট্যাংকও পারাপার করা যাইবে

করিয়াছেন এবং জঙ্গীভাবাপন্ন জাঁদরেল দলকে লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব মন্ত্রিসভা জার্ম্মান-রুশ দলের চাপে পড়িয়া চীনের সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত আপোষমূলক মনোভাব সম্ভবত অবলম্বন করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু সামরিক দলের পক্ষে তাহা মনঃপূত হয় নাই। তাহারা জার্ম্মানীর চাপকে উপেক্ষা করিয়াই চীনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইতে চায়। জাপান এইভাবে যদি জার্ম্মানীর মৈত্রী সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহা হইলে ইউরোপের রাজনীতিতেও নূতন সমস্যা সৃষ্টি হইবে। ইটালী কিংবা রুশিয়া যে পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে জার্ম্মানীর পক্ষ লইয়া লড়িতে যাইবে, এমন মনে হয় না। ইটালী এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে যে, ইটালীর স্বার্থে যদি আঘাত পড়ে, তবেই সে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবে। অবশ্য কূটনীতির এসব খেলার ভিতরের মর্ম্ম এখনও বুঝা যাইতেছে না। শেষ যে সংবাদ ইটালী হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ইটালীর মনের ভাব এই যে, আগে ডানজিগ এবং করিডর জার্ম্মানীর হাতে ছাড়িয়া দাও, তবে অন্য সব কথা চলিতে পারে। হিটলারের দাবীও আপাতত ইহাই এবং এই দাবী মানিয়া না লইলে তিনি কিছুতেই রাজী হইবেন না। ইংরেজের পক্ষ হইতে হেণ্ডারসন বিশেষ প্রস্তাব লইয়া হিটলারের কাছে যান, হিটলারের সঙ্গে তাঁহার দেড় ঘণ্টাকাল আলোচনা হইয়াছিল। এই আলোচনার ফল এবং আলোচনান্তে হিটলারের যে মনোভাব ব্যক্ত হয়, তৎসম্বন্ধে [illegible]

এখন যুদ্ধ বাধা-না-বাধা নির্ভর করিতেছে। আমাদের দৃঢ়-বিশ্বাস এই যে, হিটলার ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রীর জবাবে যাহা শুনাইয়া দিয়াছেন, ইংরেজকেও তাহাই শুনাইবেন। হিটলারী নীতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলায় না—তিনি যাহা ধরেন তাহা করেন; সুতরাং আপাতত ডানজিগ ও পোলিশ করিডর তাহাকে দিতেই হইবে, তাহা না পাইলে তিনি সৈন্যসজ্জা হইতে বিরত থাকিয়া ইংরেজের মনরক্ষা করিবেন না। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজই আগাগোড়া হিটলারের মন যোগাইয়া চলিয়া

গোয়েরিং গ্রেট বৃটেন এবং ইংলণ্ড হইতে হাজার হাজার উড়ো-জাহাজের ইঞ্জিন আমদানী করিতে থাকেন। ইংলণ্ড হইতে যে-সব ইঞ্জিন জার্ম্মান লইয়াছিল, নিশ্চয়ই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতিতেই সে লইয়াছিল; কারণ ঐ সব জিনিষ ক্রয় করিতে হইলে লাইসেন্স লইতে হয় এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সে লাইসেন্স দিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে বৃটিশের পার্লামেণ্টে প্রশ্নও উঠে। প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীন বৃটিশের পররাষ্ট্র সচিব স্যার জন সাইমন বলেন যে, এই সব লাইসেন্স না দিবার পক্ষে

বুলগেরিয়া সীমান্তে তুরস্কের পদাতিক সেনার সমরের মহলা

আসিয়াছে, হিটলার কোনদিনই ইংরেজের মন যোগাইয়া চলেন নাই। ইংরেজ ইউরোপের এই রাষ্ট্র-ধুরন্ধরকে বাগে ফেলিবার জন্য যত চেষ্টা করিয়াছে, সব ব্যর্থ হইয়াছে এবং দুর্ব্বলতা দেখাইয়া হিটলারের জোরই সে বাড়াইয়া দিয়াছে। হিটলার আজ যে জবরদস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ইহার মূলে আর যাহাই থাকুক না কেন, ইংরেজের রাষ্ট্রনীতিক দুর্ব্বলতা এবং দূর-দর্শিতার অভাব যে রহিয়াছে—এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হিটলারী দল আজ যে বিমানবাহিনীর গর্ব্বে ইংরেজ এবং ফ্রান্সকে শাসাইতেছে, সেই বিমানবাহিনী গড়িয়া তুলিতে হিটলারকে সাহায্য করিয়াছে আর কেহ নহে—স্বয়ং ইংরেজ। গত ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪ সালে হিটলারের জবরদস্ত জাঁদরেল

গবর্ণমেণ্ট কোন কারণ দেখিতে পান না। ১৯৩৩ সালের ৭ই আগষ্ট হিটলার ঘোষণা করেন যে, অন্য দেশ আক্রমণ করিবার কোন ইচ্ছা জার্ম্মানীর নাই; জার্ম্মানী নিতান্ত সুবোধ শিশুর মত সব সন্ধির সর্ত্ত মানিয়া চলিবে; কিন্তু ১৯৩৫ সালেই সে সন্ধিসর্ত্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করে এবং যুদ্ধের জন্য সেনাদল গঠন করিতে থাকে। শক্তিবর্গ ইহাতে চঞ্চল হইয়া উঠেন, কিন্তু ইংরেজ তাড়াতাড়ি গিয়া সন্ধি-সর্ত্তের দিকে না তাকাইয়া জার্ম্মানীর সঙ্গে নৌ-চুক্তি করিয়া বসে। ইংরেজকে বোকা বানাইয়া জার্ম্মানী রুশিয়ার সঙ্গে কেমন করিয়া সন্ধি করিতে সক্ষম হইল, সম্প্রতি তাহার রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে।

রুশিয়ার পক্ষ হইতে এই সম্বন্ধে ভরোশিলভ বলেন যে, আমরা ইংরেজ এবং ফরাসীকে বলিয়াছিলাম যে, পোল্যাণ্ডকে জার্ম্মানীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে পোল্যাণ্ডে রুশ সেনা বাহিনীর প্রবেশ করা দরকার; কিন্তু ইংরেজ এবং ফরাসী কেহই এ প্রস্তাবে রাজী হয় নাই। পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করিবার জন্যও রুশ সেনাকে তাঁহারা পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করিতে দিবেন না, অতএব পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সাহায্যও সে পায় নাই; পক্ষান্তরে ইংরেজ আগাগোড়া এই ফ্যাসিষ্টপন্থীদিগকে সাহায্য করিয়াছে এবং দুর্ব্বল গণ-তন্ত্রীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। ইংরেজ যদি এইরূপ মনোভাব পোষণ না করিত, তাহা হইলে স্পেন সাধারণতন্ত্রের পতন ঘটিত না এবং ভূমধ্যসাগরের পথে জাহাজ চালান বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়া আজ ইংরেজ নিজের যে অসহায়ত্বের পরিচয় দিতেছে, এতটা অসহায় অবস্থায় সে

পোল্যাণ্ডের আইন-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভি কুস্‌কি ও পোল্যাণ্ডের লণ্ডন রাজদূত কাউণ্ট এডওয়ার্ড র‍্যাকীজন্‌সকি—
(ইংগ-পোলিশ চুক্তি সমাপন কালে)

রক্ষার জন্য কার্য্যতঃ কর্ত্তাদের কতখানি দরদ ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে। এহেন মিত্রদের উপর রুশিয়া যে বিশ্বাস করিতে পারে নাই এবং ইঁহাদের প্রতিশ্রুতিকে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত হয় নাই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বিগত মহাসমরের পর হইতে ক্রমাগত রুশিয়া ফ্যাসিষ্ট শক্তি-বর্গের বিরুদ্ধে ইংরেজ এবং ফরাসীর সাহায্য পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক হইতে আরম্ভ করিয়া আবিসিনিয়া রক্ষার অধ্যায় পর্য্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই ইংরেজের সাহায্য সে পায় নাই এবং ইংরেজের সাহায্য পায় নাই বলিয়াই, ইংরেজের একান্ত লেজুড়-ধরা ফরাসীদের পড়িত না। দুর্ব্বলকে প্রবলের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার কোন আদর্শ ইংরেজের নীতির মধ্যে নাই, পোল্যাণ্ডের জন্যও সেদিক হইতে সে ব্যস্ত নয়। এমন অবস্থায় বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডল পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যতই হুংকার ছাড়ুন না কেন, এ ক্ষেত্রেও হিটলারের মর্জ্জিই রক্ষিত হইবে আমাদের এইরূপই বিশ্বাস। নতুবা যে সমস্যার সম্মুখীন ইংরেজকে হইতে হইবে, ইংরেজ তত-দূর যাইতে চাহিবে বলিয়া মনে করা কঠিন। এ পর্য্যন্ত সে যেমন শান্তির ধুয়া ধরিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া আসি-

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার সময় ঘটনার গতি কিভাবে দাঁড়াইবে কিছু বলা যাইতেছে না; তবে মোটের উপর এই কথাটা বলা যায় যে, যুদ্ধ আজই বাধুক আর নাই বাধুক, রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির দিক হইতে ইংরেজ বড়ই বেঘোরে পড়িয়াছে—একমাত্র আশার আলোক, জাপানে নূতন মন্ত্রি-সভার গঠন এবং জার্ম্মান-বিরোধী মনোভাবের বিকাশ, এই দিক হইতে জার্ম্মান-ইটালী-জাপানের মিতালী যদি ঢিলা হইয়া যায়, তাহা হইলে এশিয়ার ব্যাপারে ইংরেজ তবু কতকটা আশ্বস্ত হইতে পারে; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বিপদ আছে, জাপানের অতিরিক্ত শক্তি বৃদ্ধির। জাপান যদি চীনে প্রবল হয়, তবে ইংরেজের ভয়ের কারণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী জার্ম্মানী ও ইটালীর সঙ্গে জাপানের মৈত্রী চটে, অথচ জাপানের শক্তি বৃদ্ধি না ঘটে, ইংরেজ—ইহাই চাহে—জাপানের জঙ্গী দল আজ যতই দম্ভ দেখাইতে চেষ্টা করুক না কেন, রুশ-জার্ম্মান চুক্তির ব্যাঘাতকভাবে কোন নীতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে তাহারা পারিবে, এমন মনে হয় না; সুতরাং চীনের সম্বন্ধে অচিরেই জাপানের মতিগতির পরিবর্ত্তন ঘটিবে, এমন আশা এখনও করা যাইতেছে।

ইন্দ্র-প্রশস্তি

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য

এস, এস, ইন্দ্রসখা, হে স্তুতি-বাহক,
এস এস ত্বরা।
সুপবিত্র যজ্ঞস্থল;—হেথা বসি গাহ
স্তুতি মধুক্ষরা।
গাও, ইন্দ্র, জয়,
পরম-পুরুষ যিনি, ধরার অভয়।

*

অভিষুত সোমসুধা;—হে ঋত্বিককুল
ভাঙ্গো নীরবতা।
সুবিপুল ধনে ধনী, শত্রুক্ষয়কারী
ইন্দ্র সে দেবতা,
গাহ তাঁরি জয়,
বিপুল ঐশ্বর্য বাহি', অব্যয়, অক্ষয়!

*

পূর্ণ হোক, তৃপ্ত হোক, রুদ্ধ মনোসাধ,
এস দেবরাজ!
চিন্তাতীত চিন্ময়ের হোক আবির্ভাব,
এস যাগে আজ।
জয়, ইন্দ্র জয়,
দাও ধন, অন্ন, বুদ্ধি অব্যয়, অক্ষয়!

*

যাঁর রথ-অশ্ব হেরি' ত্রস্ত অরিকুল
পলায় শঙ্কায়,
রশ্মি যাঁর নিরমল, তমোবিদারণ
পরম প্রভায়,
গাও, তাঁরি জয়
ইন্দ্র তৃপ্তি লাগি সোম হউক অক্ষয়।

*

উগ্র এই সোমসুধা স্নেহসিক্ত করি',
করি সুবাসিত।
সোমরসে সুরসিক ইন্দ্রের লাগিয়া
হ'ল নিবেদিত।
জয়, ইন্দ্র, জয়,
প্রীতি তাঁর লভি' সোম হউক অক্ষয়।

*

প্রজ্ঞার আধার দেব, চৈতন্য-আধার,
দেবশ্রেষ্ঠ বীর,
অনন্ত গুণের খনি, বরণীয়-জ্যোতিঃ
কল্যাণ শরীর!
—ইন্দ্র, গাহি জয়,
তব তৃপ্তি লাগি সোম হউক অক্ষয়।

*

বিভূতি-ভূষণ দেব, বহুপ্রজ্ঞ বীর,
দেবর্ষি পূজিত,
প্রাচীনের সামমন্ত্রে তব অধিষ্ঠান,
ব্রহ্মমন্ত্রে স্থিত,
মোরা গাহি জয়,
স্তুতি তব আলোকে হোক সর্ব্বধ্বান্ত লয়!

ধর্ম্মের রূপ

ধর্ম্মকে আমরা ভাতের হাঁড়ির মধ্যে পুরে ফেলেছি। কোনো মানুষ অসাধু কি পুণ্যাত্মা তার বিচার করি আমরা সে কি খায় আর না খায় তারই কষ্টিপাথরে। শুয়োর যদি খেলে তো মুসলমানের চোখে তুমি অনেকখানি নেমে গেলে। জেল-খানায় একজন শিক্ষিত স্বদেশভক্ত মুসলমান বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, ইংরেজ মহিলাদের মধ্যে সতীর সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। আমি কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, যারা শুয়োর খায় তারা কি কখনো সতী থাকতে পারে? একজন শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে কথাটা শুনে বিস্ময়ে সেদিন অভিভূত হয়েছিলাম। শুয়োর যে খায় সে যেমন মুসলমানের চোখে—গরু যে খায় সে তেমনি হিন্দুর চোখে। গো-খাদক হিন্দুর কাছে ঘৃণ্য জীব। শুধু কি ভাতের হাঁড়ির মধ্যে ধর্ম্মকে পুরে আমরা ক্ষান্ত থেকেছি? তাকে আমরা টিকির সঙ্গে আর দাড়ির সঙ্গে, মালার সঙ্গে আর ফোঁটার সঙ্গেও কি জড়িয়ে ফেলিনি? মুখে দাড়ি রেখে নমাজ পড়লেই তুমি ধার্ম্মিক হয়ে গেলে আর সেটা যদি না কর তবে তো তুমি এক-জন 'কাফের'। যেন দাড়ির দৈর্ঘ্যই কোন মুসলমানকে ধার্ম্মিক অথবা অধার্ম্মিক প্রতিপন্ন করবার শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি! সমাজের সেবাকার্য্যে কড়ে আঙুলটি নাড়াবার প্রয়োজন নেই! চাষীর কাছ থেকে সুদের টাকা আদায় করে দোল-দুর্গোৎসব কর! লোকের কাছ থেকে বাহবা পাবে—কারণ তুমি মাথায় টিকি গজিয়েছে এবং ললাটে তিলক কেটেছ, কারণ তুমি তিনবার কাশী এবং চারবার বৈদ্যনাথধাম গিয়েছ আর বছরে বছরে মায়ের পূজো করে আসছো!

ধর্ম্ম কাকে বলে—ধার্ম্মিকের বৈশিষ্ট্য কি—তার সম্পর্কে আমাদের মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এ বিষয়ে স্বামীজীর আর হ্যাভেলক এলিসের মতই অন্তরকে স্পর্শ করে। এলিস্ বলছেন, আমাদের সমস্ত চিত্ত আনন্দের মধ্যে যেখানে দিকে দিকে ব্যাপ্ত হ'য়ে যায় সেখানেই ধর্ম্ম। আমাদের আত্মা রয়েছে জগতের ঠিক মাঝখানটিতে। ক্ষণে ক্ষণে সেই আত্মার কাছে আসছে আবেদনের পর আবেদন। আমাদের প্রাণ যেন বীণার তন্ত্রী। সেই তন্ত্রীর উপরে ছড় চালানোর বিরাম নেই। প্রাণের তারের উপরে কত দিক থেকে কত ধাক্কাই লাগছে! ধাক্কা লেগে ক্ষণে ক্ষণে যে সুর উৎসারিত হচ্চে—তার মধ্যে মাধুর্য্য থাকে অল্পই। আমাদের হৃদয়বীণার সুরের মধ্যে কর্কশতাই বেশী। কিন্তু এমন দুর্লভ প্রাণও আছে যার তার কখনো বেসুরে বাজে না—যেখান থেকে যত রকমের আঘাতই আসুক না সেই তারের উপরে জাগায় একটা মিষ্টি কোমল সুর।

আমাদের অন্তরের মধ্যে রয়েছে অনন্তের জন্য ক্ষুধা। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে চাই ব্যাপ্ত হয়ে যেতে ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বিরাটের মধ্যে। যেখানেই আমাদের প্রাণের বিস্তার রয়েছে আনন্দের প্রাচুর্য্যের মধ্যে—সেখানেই আমরা ধর্ম্মের আস্বাদ পাই। এই যে প্রাণের আনন্দময় প্রসারণ—এই প্রসারণে আর্ট আমাদের সাহায্য করে অনেকখানি। ভুবনেশ্বরের আকাশ-ছোঁয়া বিরাট মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াই যখন, মনে হয় অনন্তের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের কর্ম্মব্যস্ত জীবনের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার কথা মনে থাকে না। তখন। ভুলে যাই আমাদের জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে। একটা অবর্ণনীয় আনন্দের প্লাবন এসে ভেঙে দেয় আমাদের গণ্ডী-গুলিকে—ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেই অকূলে যেখানে সীমা-হীনের সিংহাসন। বেটোফোনের সঙ্গীত যখন শুনি, তখনও সুরের তরঙ্গে আমাদের প্রাণ ভেসে চলে যায় এমন একটা রহস্যময় রাজ্যে, যেখানে স্নিগ্ধ অন্ধকারে পাই অনন্তের স্পর্শ। যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে সুরের পর সুর আর আমাদের প্রাণের গভীর রহস্য-গুলি অন্তরের অন্তঃপুর থেকে বাইরে এসে ভীড় করে দাঁড়ায়। যে বেদনার কোন ভাষা ছিল না, যে অনুভূতিকে কথায় প্রকাশ করা ছিল অসম্ভব—সুরের মধ্যে রূপ নিয়ে ভেসে ওঠে তারা।

আর্ট যেমন আমাদের জীবনকে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত ক'রে তাকে দাঁড় করিয়ে দেয় অসীমের পদপ্রান্তে—তেমনি মানুষের মধ্যে যাঁরা অতি-মানুষ তাঁদেরও সান্নিধ্যে এসে আমরা বৃহতের মধ্যে নব-জন্ম লাভ করি—আমাদের সামনে একটা নূতন জগৎ জেগে ওঠে এবং আমাদের চেতনা সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করি, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনী অবগত হই, শান্তিপুরে শচীমায়ের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের ছবি কল্পনার চোখে দেখতে পাই, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাণের মধ্যে জেগে ওঠে অসীমের সঙ্গে মিলিত হবার একটা দুর্ব্বার পিপাসা। প্রতাপ সিংহ আরাবল্লীর শিখরে শিখরে অনাহারে, অনিদ্রায় জীবন যাপন করছেন তবুও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে তিনি নারাজ—টডের রাজস্থানে যখন রাণাপ্রতাপের এই ছবি দেখি, জন্মভূমির পদপ্রান্তে জীবনকে উজার করে সঁপে দেবার একটা উন্মাদনা আসে প্রাণের মধ্যে। আমরা যা ছিলাম তার চেয়ে সহসা অনেকখানি বড়ো হয়ে যাই। লণ্ডনে মৃত কন্যার কফিন কেনার মতো পয়সা নেই যখন ঘরে, তখন সেই ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যের মধ্যেও কার্ল মার্কস লণ্ডন মিউজিয়মে বসে বই লেখার মাল-মসলা সংগ্রহে ব্যস্ত—একথা যখন পাঠ করি, তখন মানুষের প্রাণের দৃঢ়তা দেখে অন্তর নূতন প্রেরণা লাভ করে! মেরী ম্যাগডেলেনকে মারবার জন্য জনতা প্রস্তর নিক্ষেপ করতে উদ্যত, আর সেই ক্ষিপ্ত জনতাকে লক্ষ্য ক'রে খৃষ্ট বলছেন—জীবনে যে কখনো পাপ করেনি, সেই কেবল ঢিল ছুড়ুক। লজ্জিত জনতা ধীরে ধীরে চলে গেল—কারণ পাপ করেনি কে, সুতরাং মারবার অধিকার আছে কার? নিউ টেস্টামেণ্টে এ কাহিনী যখন পাঠ করি—ভাবের একটা নূতন জগৎ চোখের সামনে খুলে যায়, একটা অভিনব আনন্দের তরঙ্গ খেলে যায় শিরায় শিরায়। এ কি নূতন রাজ্যের তোরণ-দ্বারকে উদ্ঘাটিত করে দিলো নাজারেতের কপর্দ্দকশূন্য পরিব্রাজক সূত্রধর-পুত্র! এই নূতন রাজ্যে ঐশ্বর্য্যশালী নরপতির আগে দরিদ্র ক্রীতদাসের আসন,

বারবনিতা। যারা অন্তরে এই নূতন অনুভূতির মধ্যে খুঁজে পেলো অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সন্ধান—তারা নির্য্যাতনকে হাসিমুখে নিলো বরণ ক'রে, অগ্নিগর্ভে দিলো সানন্দে ঝাঁপ। এত বড়ো একটা সাম্যের আদর্শ—এই জ্যোতির্ম্ময় আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য মৃত্যুর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো অখ্যাত-নামা বীরের দল। সমাজের অতি নিম্নস্তর থেকে দলে দলে মানুষ এসে[illegible]ষ্টের জয়গান গাইতে গাইতে বন্য পশুর মুখে দিলো আত্মবিসর্জ্জন। ব্যক্তিত্বের এই যে মুক্তি—ভয় থেকে মুক্তি, লজ্জা থেকে মুক্তি—এ মুক্তি অসংখ্য মানুষের জীবনে নিয়ে এলেন খৃষ্ট।

অতি-মানুষ যাঁরা, তাঁরাই যে কেবল আমাদের ব্যক্তিত্বের গণ্ডীকে প্রসারিত করেন—তা নয়। এমন দুর্লভ মানুষেরও দেখা মেলে, যাঁদের কাছে ছোট-বড়ো সব মানুষই একটা বৃহত্তর সংস্কৃতির রাজ্যের বার্ত্তা বহন করে আনে। অতি সাধারণ নরনারী যারা, তাদের মধ্যেও এঁরা দেখতে পান একটা অবর্ণনীয় মহিমা। বাতায়ন হ'ক ক্ষুদ্রই হোক, সেই গবাক্ষপথে নীলাকাশের বিপুলতা তাঁদের সামনে প্রতিভাত হয়। ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতার চরম সৌন্দর্য্য হচ্ছে তার গণতান্ত্রিকতার মধ্যে। মানুষ মাত্রেই তাঁর চিত্তে বহন ক'রে এনেছে অনন্তের বার্ত্তাকে। অখ্যাতনামা অতি সাধারণদের কাছে তাই তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর সঙ্গীতের অর্ঘ্য। হুইটম্যানের দৃষ্টি-ভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্য আমরা শরৎ চাটুয্যের এবং রবিঠাকুরের মধ্যেও দেখতে পাই। যারা আমাদের চিত্তে ভাবের কোনো তরঙ্গই তোলে না, তারা কিন্তু শরৎ চাটুয্যের আর রবিঠাকুরের কাছে উপেক্ষিত হয় নি। কাবুলীওয়ালা তাই বঙ্গসাহিত্যে অমর হ'য়ে রইলো—বৃন্দাবন পণ্ডিত আর অন্নদা দিদিকেও সাহিত্য-পিপাসু গৌড়জন কোনোদিন বিস্মৃত হবে না। যে সাধারণ মানুষের জয়গান আমরা শুনতে পাই হুইটম্যানের কবিতায়, তাহাদেরই ধূলিমাখা নগ্নশিরে গৌরবের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের আর শরচ্চন্দ্রের প্রতিভা। এর জন্য দায়ী এঁদের দুর্লভ দৃষ্টি যা বাহিরের সমস্ত আবরণকে ভেদ ক'রে প্রবেশ করে মানুষের অন্তরলোকে এবং সেখানে দেখতে পায় মানবাত্মার অপার্থিব সৌন্দর্য্য।

কেবল মানুষের সান্নিধ্যেই যে মানুষ ব্যক্তিত্বের সীমা-গুলোকে প্রসারিত করতে সক্ষম হয়, তা নয়। প্রকৃতিও আমাদের চেতনাকে প্রাত্যহিক তুচ্ছতার বাহিরে যে সৌন্দর্য্যের এবং আনন্দের জগৎ আছে তার মধ্যে মুক্তি দেয়। বিপুল সমুদ্রের তীরে গিয়ে তার সীমাহীন নীলিমাকে যখন অব-লোকন করি—ভুলে যাই পাটের দর, সোনা-রূপার বাজার আর চা বাগানের শেয়ারের কথা। খুব উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে নীচের সমতল ভূমির দিকে চাইলে আমাদের মন কোথায় হারিয়ে যায়। শরৎকালের নক্ষত্রখচিত আকাশে ছায়াপথের পানে যখন চেয়ে থাকি—ঘরের কথা তখন কি মনে পড়ে? মন উড়ে চলে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সৌরজগতের সীমা কোথায় —তার সন্ধান পেতে। আমাদের রিক্ত, তপ্ত, ক্লান্ত চিত্তের উপরে নিশার আকাশ থেকে নেমে আসে একটা সুগভীর প্রশান্তি। কিন্তু ধর্ম্মভাবের চরম প্রকাশ হচ্ছে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে আপনার ঐক্যকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করার মধ্যে। সর্ব্বভূতের সঙ্গে আপনার এই ঐক্যকে সমস্ত চিত্ত দিয়ে উপলব্ধি করবার মধ্যেই যে জীবনের পরম আনন্দ—এই অমর বাণীই যুগে যুগে উৎসারিত হোলো ঋষি আর সাধকদের কণ্ঠ থেকে। তাঁরা বললেন, বাসনাকে পরিত্যাগ করবার কথা কারণ, বাসনা আমাদের চেতনাকে ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে—তাকে জগতের সকলের মধ্যে পরি-ব্যাপ্ত হ'তে দেয় না। তাঁরা ঘোষণা করলেন, সকল অহঙ্কারকে নিঃশেষে ধুয়ে মুছে ফেলে একটা বৃহত্তর ইচ্ছার কাছে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করবার কথা।

উপনিষদের ধর্ম্ম থেকে আরম্ভ করে সুফী ধর্ম্ম পর্য্যন্ত সব ধর্ম্মেরই বাণী হচ্ছে মিলন—ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির মিলন, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন। সব ধর্ম্মই ঘোষণা করেছে অহঙ্কারের গণ্ডী ভেঙে অনন্তের মধ্যে বাসা বাঁধবার কথা।

নিখিলের সঙ্গে আপনাকে এই যে মিলিয়ে দেওয়া, এরই নাম যোগ—অসীমের মধ্যে সসীমের যে বিলয়—এই বিলয়ই সকল সাধকের লক্ষ্য। সকল দেশের, সকল সাধকের কণ্ঠেই বেজে উঠেছে বৃহত্তর জীবনের মধ্যে মিলনের জয়গান। এই মিলনের মধ্যে মানবাত্মার চরম মুক্তি।

কেন যে আমরা পৃথিবীতে দুদিনের জন্য এসে এর ওর জীবনের ঘরে এসেছি আমরা ক'দিনের জন্য? যে ক'টা দিন সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে কলহ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি! এই আছি—পরস্পরের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করে আনন্দকে নষ্ট করা কেন? খেলা ফুরিয়ে গেলেই তো সবাই চলে যাবো নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণ একা একা। অনন্তের দিকে যেখানে আমাদের বাহু আমরা বাড়িয়ে দিই—সেখানেই আমাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব ফুটে ওঠে। ধর্ম্মই আমাদের মুক্ত করে ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে।

কোরিয়ার স্বাধীনতা লাভে নব-শক্তি

গত জুলাই মাসে কোরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে। কোরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন চালাইতেছে যে সব দল, সেগুলির মধ্যে যে দুইটি সব চেয়ে বড় সেই দুই দলের নেতারা চীন সাধারণতন্ত্রের বর্ত্তমান রাজধানী চুংকিয়াংয়ে সমবেত হন। নেতারা কয়েকটি বৈঠকের পর জাপানের হাত হইতে তাহাদের মাতৃভূমি উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত একটি কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করেন।

এই বৈঠকে দুই জন পুরুষের ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রথমে নাম করিতে হয় মিঃ কিম কিউয়ের। ইনি কোরিয়ার জাতীয় দলের নেতা। ইঁহার বয়স ৬৪ বৎসর। দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতেছেন মিঃ কিম

মার্শাল চিয়াং-কাইশেক

ইয়াকসান। ইনি কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় বিপ্লবী দলের নেতা। ইঁহার বয়স ৪২ বৎসর।

এই দুই দলের মধ্যে কোরিয়ার জাতীয় দলকে কম প্রগতিশীল বলা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, এই দলের সদস্যদের বেশীর ভাগই হইল কোরিয়ার স্বদেশ প্রেমিক তরুণ; ইহারা প্রগতিমূলক বৈপ্লবিক কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বনের জন্য কিছুদিন হইতেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ কিম কিউ এবং তাঁহার সঙ্গীদেরই সমর্থনে কোরিয়ায় অস্থায়ীভাবে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

অপর দলের নেতা মিঃ কিম ইয়াকসানকে বোমাওয়ালা নেতা বলা হইয়া থাকে। বোমা প্রভৃতি বিস্ফোরক প্রয়োগে বৈপ্লবিক কার্য্য সম্প্রসারণ-পটুতার জন্যই তিনি এই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বৎসর কুড়ি ধরিয়া জাপানী গোয়েন্দা এবং সেনাদল এই লোকটিকে ধরিবার জন্য নানা ফিকিরফন্দী পাতিয়াও সফলমনোরথ হইতে পারে নাই। ইনি কোরিয়ার বিদ্রোহী দলের প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। ১৯৩২ সালে কোরিয়ার পাঁচটি জাপ-বিরোধী দলের সম্মিলনে ঐ প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজনীতিক বুদ্ধিমত্তা এবং চাতুর্য্য প্রয়োগ করিয়া মিঃ কিম ইয়াকসান

ডাঃ সানইয়াৎ-সেন

কোরিয়ার বিভিন্ন জাপ-বিরোধী দল লইয়া কোরিয়ার গণ-সংসদ নামে বিভিন্ন দলের সংহতি সূত্রে একটি সম্মিলিত কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া চেষ্টাশীল দল গঠন করিতে সমর্থ হন।

চীনে জাপানে লড়াই বাঁধিবার পর কোরিয়ার বিপ্লবী দলের মধ্যে একটা নবীন চেতনা দেখা দেয়। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের এখন সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া একান্তই দরকার। মিঃ কিম ইয়াকসানের দলই সব চেয়ে বড় এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী দল, এই দল বিভিন্ন দলের সংহতির উপর জোর দিতে থাকে।

চুং-কিয়াংয়ের বৈঠকে এই দুই দলের মধ্যে মিলন ঘটে এবং স্থিরীকৃত হয় একজনের নেতৃত্বে একটি সম্মিলিত কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া এই দুই দল কাজ করিবে। অবশিষ্ট দলগুলির মধ্যে মিটমাট করিয়া সেগুলিকে এই কর্ম্মপদ্ধতি প্রয়োগে রাজী করান বিশেষ কঠিন হইবে না।

কোরিয়ার উগ্র দেশপ্রেমিক দলের নেতা মিঃ কিম ইয়াকসানের জীবন বৈচিত্র্যময়। ইনি জগতের একজন বড় বিপ্লববাদী নেতা। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তিনি কোরিয়াতে মৃত্যু-মন্ত্রে দীক্ষিত সন্তান দল বলিয়া একটি দল গঠন করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইয়াকসান চীন সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, প্রসিদ্ধ স্বদেশ-প্রেমিক ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে ক্যাণ্টন শহরে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। ইহার পর ইয়াকসান তাঁহার ৪০ জন সঙ্গী সহ জাপানীদের বিরুদ্ধে

সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে ক্যান্টনের নিকটবর্ত্তী হোয়ামপোয়ার সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। শিক্ষা লাভের পর ইঁহারা জেনারেল চিয়াংয়ের অধীনে উত্তর চীনের লড়াইয়ে যোগদান করিয়া ছিলেন।

তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মিঃ কিম ইয়াকসান কোরিয়াতে যান এবং ৮ বৎসর ধরিয়া কোরিয়ার সন্নিবিষ্ট জাপানী সেনাদের বিরুদ্ধে গরিলা লড়াই চালান। ১৯৩১ সালে জাপানী সেনা দল মুকদেন শহর দখল করে। ইহার কিছুকাল পরে কোরিয়ার এই স্বদেশ-প্রেমিক দল ইউলু নদী পার হইয়া মাঞ্চুরিয়ায় পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মাঞ্চুরিয়াতে থাকিয়াও মিঃ কিম ইয়াকসান জাপ-বিরোধী কর্ম্মতৎপরতা চালাইতে থাকেন। কয়েকবার নিজেদের স্বল্প-সংখ্যক সঙ্গীকে লইয়া কোরিয়ার ভিতর প্রবেশ করিয়া জাপানীদের সরকারী অফিস এবং মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার সীমানার উপর অবস্থিত জাপ সেনাদের শিবির আক্রমণ করিয়া ছিলেন।

অতঃপর ইনি নানকিঙে গমন করেন এবং তথায় গিয়া কোরিয়ায় বৈপ্লবিক কার্য্য চালাইবার উদ্দেশ্যে তিন শত কোরিয়াবাসীকে সেনানীর কার্য্যে শিক্ষিত করেন। তাঁহার এই সব সেনানীদিগের অধিকাংশকেই কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়াতে পাঠান হয় এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে জাপানী-দের দ্বারা বন্দী হইয়া সরাসরি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অনেকে এখনও জাপানীদের জেলে আবদ্ধ রহিয়াছে। মিঃ কিম বলেন, আজও ৪০ হাজার কোরিয়াবাসী মাঞ্চুরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে চীনা স্বেচ্ছাসেবক সেনাদের সঙ্গে থাকিয়া জাপানীদের সঙ্গে চোরা লড়াই চালাইতেছে। ইহা ছাড়া প্রায় তিন লক্ষ কোরিয়াবাসী কোরিয়ার উত্তর সীমানা অতিক্রম করিয়া সাইবিরিয়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল, এই দশ বৎসরে তাহাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও বাড়িয়াছে। সুদূর প্রাচী লাল-পল্টনে ৪০ হাজারের অধিক কোরিয়া-বাসীকে লইয়া চারিটি পল্টন গঠিত হইয়াছে। এই সেনা দল বেশ শিক্ষিত এবং সামরিক জোড়-জোড়ে সুসজ্জিত. কোরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজন হইবে তখন ইহারা খুবই কাজে আসিবে। মাঞ্চুরিয়া এবং চীনের অন্যান্য স্থানে বর্ত্তমানে কোরিয়ার বিপ্লববাদীদের যে সব বিভিন্ন দল রহিয়াছে, তাহারা সকলে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছে। মিঃ কিম ইয়াকসান দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা বলেন।

মিঃ ইয়াকসানের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, জাপান চিরকাল কোরিয়াকে অধীন করিয়া রাখিতে পারিবে না। বর্ত্তমান চীনা লড়াইয়ে কোরিয়ার বিপ্লববাদীদের নিজেদের একটা বড় সুযোগ আসিয়াছে, মনে করিতেছে। মিঃ কিমের বিশ্বাস এই যে, যে মুহূর্ত্তে জাপ সেনাদল পিছু হটিয়া কোরিয়া ঢুকিতে বাধ্য হইবে, সেই মুহূর্ত্তে বহু নির্য্যাতিত কোরিয়া-বাসী সমবেতভাবে অস্ত্রধারণ করিবে। গত বৎসরও রাজ-নৈতিক অপরাধে ১৬ হাজার কোরিয়াবাসী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিপ্লবের প্রচণ্ড বহ্নি এখনও কোরিয়াবাসীদের অন্তরে প্রবল রহিয়াছে।

বেঁচে থাকা

শ্রীশৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়

যদি তুমি চাও এই ধরণীর মাঝে
বাঁচিয়া থাকিতে সভ্য লোকের মত,
তবে ভুলে যেও তব প্রত্যেক কাজে
স্নেহ-মায়া-দয়া প্রেম প্রীতি আছে যত:
না খেয়ে খেয়ে যাহারা মরিয়া যায়,
মরুক তাহারা তোমার তাতে কি দায়
তুমি ব'সে ব'সে স্নিগ্ধ তরুর ছায়
বনের মাঝায় মাধুরী কোথায় খোঁজ:
ফুলের কাননে বসিয়া বিজনে তুমি
ঝরা-কুসুমের বেদনা কেমন বোঝ।

কাজ করে যারা করুক তাহারা কাজ
বোঝার উপর চাপাও বোঝার ভার,
চাবুক চালাতে করিও না কোন লাজ
নিশ্বাস নিতে সময় দিও না আর:
অসহায় শিশু যদি কাঁদে এসে দ্বারে
দেখিও না তুমি দূরে করে দিও তারে

তোমার ছেলেরা গাড়ী নিয়ে এলে ঘরে
ফুলের মতন সুন্দর ছেলে মেয়ে,
কাঙালের মত হ্যাঙলা ছেলেরা কেন
দাঁড়াবে সেথায় ছল ছল চোখে চেয়ে।

জগতের মাঝে ইহাই বাঁচার নিয়ম
সভ্য যুগের ইহাই জানিও রীতি,
পুস্তকে লিখো যত ন্যাকামির চরম
বক্তৃতাতেই দিও উপদেশ নীতি;

খুঁজে খুঁজে নিয়ে যেথায় স্বর্ণ ভূমি,
পর্ণ কুটীরে প্রেম করে যেও তুমি
যখন সেথায় সন্ধ্যা আসিবে নামি
তড়িৎ শিখায় কুটীরে প্রদীপ জেলো,
মহুয়া বনের মধু যদি নাই থাকে
মুক্ত পাত্রে স্বর্ণ মদিরা ঢেলো।

অবশেষে

(গল্প)

শ্রীঅজিতকুমার রায় চৌধুরী

সকাল বেলা রাগের মাথায় শচীপতিকে কতকগুলো কড়া কথা শোনান বেশী ভাল হয়নি তা' কনকলতা টের পেল দুপুর বেলা দিবানিদ্রা আয়োজনের সময়। কিন্তু না বলেই বা কনকলতা করে কি? স্বামীর রক্ত জলকরা টাকা পাঁচ ভূতে যে লুঠে নেবে তাইবা সে দেখবে কেমন করে? অপরকে দেওয়া ভাল, তাতে নাম আছে, আনন্দও আছে, সেটা কনকলতা মানে। কিন্তু বিলিয়ে দেবারও ত' একটা সীমা থাকা দরকার। লোকে দূরে থেকে আয়ের সংখ্যাটা দেখেই শিউরে ওঠে, তলিয়ে দেখে না খরচের তালিকা। সুশান্ত ঠাকুরপোর ডাক্তারী পড়া, প্রশান্ত ঠাকুরপোর এম-এ আর ল' পড়া, তারপর নিজের মেয়ে বীথি, ছেলে মহীপতির স্কুল-খরচা, এরপর যদি বড় ননদের ছেলে, ছোট জায়ের মেয়ের পড়া, তার ওপর অতিথ অভ্যাগত থাকে, তাহলে ফতুর হতে কতদিন বাকী? নিজের ছেলে-মেয়েদের দিকেও তাকাতে হবে ত? আর দু'বছর বাদেই মেয়ের বিয়ে, ছেলের কলেজের খরচ, কোলের মেয়েটার লেখাপড়া শিখান, সুতরাং এখন থেকে যদি সামলে না চলা যায় তাহলে পরে যে অন্ধকার দেখতে হবে। শ্রীপতি আর ভূপতি (শচীপতির পরেই দু'জনে টাকা আয় করছে বেশ, বউদের নামে ব্যাঙ্কের টাকার সংখ্যাটাও যে দিন দিন বেড়ে চলেছে সেটা কনকলতার অজানা নয়। সবাই যদি টাকা জমাতে পারে, তবে সেই-বা জমাবে না কেন?

তিনটে বাজল। মহীপতির স্কুল হয়ে গেল। সে বই-গুলোকে যতদূর সম্ভব পড়ার টেবিলের ওপর কোন রকমে রেখেই সিঁড়ি দিয়ে দুম্ দুম্ করে বাড়ীটা সচকিত করে দিয়ে খিদের প্রবল তাড়না জানাতে জানাতে ওপরে এল।

'মা, মা, বেশ যা হোক্! খিদের জ্বালায় হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে করছে, আর তুমি মজা করে শুয়ে আছ? মা, মা, খেতে দিয়ে যাও।'

"কাল শিবরাত্তির করেছ যে একদণ্ড সবুর করতে পারছ না। দিনরাত খাওয়া আর খাওয়া। আমাকে খেয়ে ফেল, তাহলে তোমরাও বাঁচ, আমারও হাড় জুড়োয়।"

কোলের মেয়ে নীলিমা প্রাণপণে মায়ের বক্ষসংলগ্ন হয়ে ঘুমিয়েছিল, কনকলতার উঠে বসাতে সে জেগে তারস্বরে নিজের অস্তিত্ব প্রচার করতে আরম্ভ করল। ফলে, তার পিঠে সামান্য কিছু কান্না নিবৃত্তি করবার অষুধ প্রয়োগ হল। অষুধে কান্নার নিবৃত্তি না হয়ে আরও শ্রীবৃদ্ধি হল এবং নীলিমা প্রায় মিনিটখানেক ব্যাপী বিশাল হাঁ করে আরও জোরে কেঁদে উঠ্ল।

"উঃ! হতচ্ছাড়ীর দেড় বছর বয়স হল তবু কান্না ঘুচল না। বাপরে বাপ। হাড়ে দুর্ব্বো গজিয়ে দিলে।"

মেয়েটাকে কোলে নিয়ে নীচে নেমে এল মহীকে খাবার দেবার জন্যে। মহী এবার তার মাকে সাহায্য করল। নীলিমাকে নামিয়ে রেখে কনকলতা মুখ ধুতে গেল: মহী তাড়াতাড়ি তরকারীর ধামা থেকে একটা পটল এনে নীলিমার হাতে দিল, নীলিমা সেটা মুখের মধ্যে চালনা করে দিল। মুখ ধুয়ে এসে কনকলতা জিজ্ঞেস করল, "বীথির ছুটী হয়েছে রে, মহী?" মহী সঠিক উত্তর দিতে পারল না।

রান্নাঘরের ভিতরে গিয়ে দেখে বীথি দুধের কড়ার ওপরের ধামা তুলে আধ ইঞ্চি পুরু সর খেতে আরম্ভ করেছে, মাকে দেখে বীথির খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠ্ল, হাতটা মুখের মধ্যেই রয়ে গেল, আর গাল বেয়ে দুধ পড়তে আরম্ভ করল।

শ্রীপতির স্ত্রী সুলতা তার ছোট ছেলে কিশোরের হাত ধরে নীচে নামল। রান্নাঘরে গিয়ে দুধের এবং বীথির অবস্থা দেখে নিঃশব্দে ছেলের হাত ধরে আবার উপরে চলে এল। যেতে যেতে মন্তব্য করল, 'এ সংসারের উন্নতি হবে কিসে? এত এক চোখোপনা করলে কি আর চলে?"

কনকলতা সুলতার মন্তব্য শুনে চুপ করে রইল, রাগ হ'ল মহী আর বীথির ওপর।

মহীপতি মায়ের মুখের হাব-ভাব দেখে আগেই খাওয়ার আশা ত্যাগ করে রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। কনকলতার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বীথির ওপর। বীথি প্রহারের অনুপাতে চীৎকার খুবই বেশী করল যার ফলে, বীথির ঠাকুরমা দোতলার বারান্দা থেকে বলে উঠ্লেন, কেন আবার মেয়েটাকে মারছ বৌমা? দুটো খাবার দিলেই ত চলে যায়। কি যে তোমাদের স্বভাব।

'দেখুন এসে, দুধের কড়ায়ের ধামা তুলে সব সর খেয়ে ফেলেছে।'

'আহা, থাক না, ছেলে মানুষ বই ত নয়। আর দু'দিন বাদেই পরের ঘরে চলে যাবে।'

ওপর থেকে সুলতা মন্তব্য করলে, 'মাথাটি মা আহ্লাদ দিয়েই খেলেন।' অবশ্য হাস্‌তে হাস্‌তে।

শচীপতি আফিস থেকে এল। আত্মভোলা, সদা হাস্যময়। সকাল বেলাকার ঝগড়া-ঝাঁটি মনে কোন রকম দাগ কেটে যায়নি। নিত্যকার মতন বাড়ীর সমস্ত ছেলে-মেয়ে এসে শচীপতিকে ঘিরে দাঁড়াল। প্রত্যেক দিনই এই সময়টা শচীপতি ছেলে-মেয়েদের জন্যে হয় কোন খাবার কিম্বা খেলনা আনত, সবাইকে সমানভাবে ভাগ করে দিলেও বীথির ভাগে লজেন্সের সংখ্যা এবং আকৃতি মনোমত না পড়াতে সে কাঁদতে কাঁদতে কনকলতার কাছে গিয়ে হাজির হল। কনকলতা শচীপতির কাছে এসে বল্‌ল, দেওনা বাপু মেয়েটা আর একটা চাইছে দিয়ে ফেললেই ত হয়।'

'আর কোথায় পাব? এই চারটে কিশোরের জন্য।'

'সবাইকে তিনটে করে দিলে, আর কিশোরের বেলায় চারটে কেন?'

'কাল একটা কম পেয়েছিল। তোকে কাল এনে দেব বীথি।'

'নিজের ছেলেমেয়ে দিয়ে আর কি করবে? এগুলো মরেও না।' উদ্গত অশ্রু চাপা দেবার জন্যেই বোধ হয় বীথির হাতটা ধরে [illegible]

নিয়ে গেল। শচীপতি চুপ করে গেল। এ নিত্যকার ঘটনা। সমুদ্রে শয়ন যার, শিশিরে তার ভয় কি?

রাত দশটার আগেই বাড়ীর সবার খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হয়, কারণ ঠাকুরটি রাত দশটার পরই বাড়ী চলে যায়। কনকলতা ছোট মেয়েটার দুধ আর বীথির জন্য দু'স্লাইস রুটি নিয়ে ওপরে এল। বীথির ঠিক গোটা দুয়েকের সময় ঘুম ভাঙ্গে আর সেই সময় কিছু খাওয়া চাই। কনকলতা বলে এটা বাপের অতিরিক্ত আদরের ফল। শচীপতির তরফের জবাব থাকে, আহা থাক না, দু'দিন বাদে ত পরের ঘরেই যাবে

ঘুমন্ত নীলিমাকে দুধ খাইয়ে আবার যথাস্থানে শুইয়ে রেখে কনকলতা প্রশ্ন করলে, "পিণ্টুকে (শ্রীপতির মেয়ে, ডাক নাম পিণ্টুরী) এ সময়ে তার মামারা এখানে পাঠাল কেন জান?'

'কি করে জানব বল? আমি তো আর জ্যোতিষী নয়?' খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে শচীপতি বল্‌লে।

'এ সামান্য কথাটুকু জানতে জ্যোতিষী শিখতে হয় না মশায়। আসল কথা হচ্ছে, বিয়ের ঝক্কি সামলান তাদের দ্বারা হবে না।'

'হবেই বা কেন? মেয়ে আমাদের, তাদের হচ্ছে ভাগ্নী, তার ওপর এ বাড়ীর বড় মেয়ে হচ্ছে, পিণ্টু।'

'তা বুঝলাম, কিন্তু সেবার যখন আনতে পাঠিয়ে ছিলে, তখন যে বড় মুখ করে তারা বলেছিল, মেয়ে যখন এখানে মানুষ হল তখন বিয়েটাও আমরা দিতে পারব। আর যেই দেখল, টাকা লাগছে এক কাঁড়ি, অমনি দাও বাপ-জেঠার কাছে পাঠিয়ে।'

'তোমার যে কি স্বভাব কনক, খালি টাকাটাই বড় করে দেখ।'

'তুমি তো আর ভবিষ্যৎ ভাবছ না, আমি ভাবছি। যাক, শ্রীপতি ঠাকুরপোকে সব জানিয়ে দিও, পিণ্টুর বিয়ের ভার যেন তোমার ঘাড়ে না চাপে। সেই যে বারীন বলে ছেলেটির সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল না, তারাই যা পণ চায় নি। কিন্তু বাপু বারীন ছেলেটি যেন কেমন মেয়েলী ঢঙের। উমানাথ ছেলেটি মন্দ নয়, কিন্তু ওদের হাঁকাই বড্ড বেশী। তার চাইতে—'

'বারোটা বাজল।' বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গোটা দুই-তিন হাই তুলে শচীপতি কনকলতার কথার স্রোত বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

'কোন সংসারী কথা বলতে গেলেই তোমার ঘুম পায়। তোমার মতন এমনটি আর নেই।'

'এইট্‌থ্‌ ওয়াণ্ডার অব দি ওয়ার্ল্ড।'

'বাঙলা বল বাপু, আমি তো আর ছোট বউ নই। ও-সব গোরা-পল্টনী ভাষা ছোট বউয়ের কাছে বল।'

ছোট বউ বেথুনে কলেজে ফার্স্ট ইয়ার অবধি পড়েছিল। কনকলতার বিদ্যের দৌড় ক্লাশ ফোর অবধি। শচীপতি কিম্বা তার ভায়েরা কোন ইংরেজী কথা বল্‌লেই কনক তাদের ছোট বউয়ের কথা মনে করিয়ে দিত। শচীপতি ছোট বউকে স্নেহের চক্ষে দেখ্‌ত। কনকলতার মতে, এর মধ্যে কোন গূঢ় অর্থ আছে।

বাবা মুকুল রায় ভাগ্নে শচীপতির ওপর স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যেই বোধ হয় ছেলেদের পড়ার অর্দ্ধেক খরচ ভাগ্নের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। সুশান্ত ও তার ভাইয়ের পড়াশুনোর প্রায় খরচই শচীপতি চালাত। শ্রীপতি আর ভূপতির মামাত ভাইয়ের ওপর টানটা যে একটু কম তা নিজ নিজ স্ত্রীর মারফৎ জানিয়ে ছিল। হঠাৎ একদিন সকালবেলা মুকুল রায়ের মৃত্যু সংবাদ এসে হাজির। সুশান্ত ও প্রশান্ত পড়াশুনা সেইখানেই ইতি করে নিজেদের দেশে চলে গেল। কনকলতা, মামা শ্বশুর মুকুলরায়ের অকস্মাৎ দেহান্তর গ্রহণের সুমতি দেখে সন্তুষ্ট হল। কারণ, কিছু টাকা, যেটা সুশান্ত আর প্রশান্তর পেছনে লাগত, সেটা বেঁচে গেল।

সুলতা আর ভূপতির স্ত্রী পূর্ণিমার সঙ্গে কনকলতার রোজই মনোমালিন্যর সৃষ্টি দেখা গেল। সুলতার গর্ব্ব ছিল বেশী, কারণ তার বাপ খুব বড় লোক। এদের সংসারে সে এসেই যেন ধন্য করেছে। পূর্ণিমার গর্ব্ব ছিল লেখাপড়ায় সে এ বাড়ীর বা বংশের সব মেয়েদের এমন কি দু'একজন পুরুষের চেয়েও বিদুষী, তবে তার বাপের বাড়ীর রৌপ্যের আধিক্য কিছু কম থাকাতে সে সুলতার মতন চালে চলতে পারত না। কনকলতার অবস্থা তার জায়েদের চেয়ে অনেক উচুতে। প্রথমত সে বাড়ীর বড় বৌ, তার উপর তার রূপ এবং বাপের বাড়ীর রূপো এ দুয়ের পরিমাণও বেশী।

সেদিন একটু ঘটা করেই ঝগড়াটা লাগল। মাসের শেষ, শচীপতির হাতখালি, অথচ টাকার বিশেষ দরকার। কানে সংবাদ এল, শ্রীপতির হাতে টাকা আছে। শ্রীপতির ঘরের সামনে গিয়ে শচীপতি পর্দ্দার পাশ থেকে দুবার কেশে উঠতেই কিশোর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'তোমার মা ঘরে আছেন, কিশোর?'

'হুঁ, বাবাও আছে।'

শ্রীপতির ঘরে যেতেই সুলতা অন্য দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল পর্দ্দার আড়ালে।

'শ্রীপতি, গোটা কয়েক টাকা দিতে পারিস? বিশেষ দরকার।'

'হাতে তো এখন নেই। মাইনে না পেলে হবে না দাদা।'

'তোর বউদি আবার লাইফ ইনসিওরেন্সের এক হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছে।'

'কি হল?'

'ধরে বেঁধে দশ হাজার টাকার এক লাইফ ইনসিওর করালে, আজ প্রিমিয়াম দেবার শেষ তারিখ।'

'আমার কাছে থাকলে......।' শ্রীপতি আম্‌তা আম্‌তা করল, কারণ পর্দ্দার পাশে চুড়ীর আওয়াজ কানে এল। পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে সুলতার মুখ দেখা গেল। শচীপতি বেরিয়ে গেল ও সুলতা ঘরে এসেই প্রশ্ন করল, 'কেমন, আমার কথা বিশ্বাস হ'ল? তোমার দাদাটিকে যত সোজা ভাব তত সোজা নন্। দিব্যি বউয়ের নামে টাকা জমাচ্ছেন। কই, এর কিছু খোঁজ রাখ্‌তে। ভাগ্যিস আমি আছি দেখে নইলে তোমার দাদা তোমায় পথে বসাত।'

শ্রীপতি বউকে সমীহ করত। কারণ, বউয়ের বাপের বাড়ীর থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তার ওপর বউয়ের

প্রখর বুদ্ধি। যে গরু দুধ দেয় তার লাথিও সহ্য হয়।

সুলতার কথাগুলো সমস্তই শচীপতির কানে গেল। প্রথম সে নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না—এটা সত্যই সুলতার কথা কি না। নিজের ঘরে এসে কনকলতাকে সমস্ত বল্‌ল। সমস্ত শুনে কনকলতা রেগে আগুন! বল্‌ল, আর তুমি চুপ করে হার মেনে চলে এলে।'

সেখানে কথা বল্‌তে যাওয়া মানে নিজের মান হারান নয় কি কনক? তাছাড়া, সব সময় হার-জিতের পাল্লা ধরে সংসার করতে গেলে হারের দিকই নীচের দিকে ঝুঁকে পড়বে! মেঝ বৌ ঘরের লোক, তার কাছে আবার আমার হার-জিতের কি আছে?'

'তোমার কিছু না আসতে পারে, কিন্তু আমি তা সহ্য করব কি করে? কেন তুমি আমায় জিজ্ঞেস না করে, ওদের কাছে টাকা চাইতে গেলে?' অভিমানে কনকলতা কেঁদে ফেল্‌ল। দুপুরে বেলা তিন ভাই যখন বেরিয়ে গেল তখন বাধল ঝগড়া। সুলতা আর কনকলতা ঝগড়া ক'রে না খেয়েই শুয়ে রইল। পূর্ণিমা বুদ্ধিমতী, ঝগড়া বাধিয়ে খাওয়া শেষ করে, নভেল নিয়ে শুয়ে পড়ল।

শ্রীপতি মুখে সেদিনকার ব্যাপারের জন্য সুলতাকে প্রশংসা করেছিল সত্য, কিন্তু মনের ভেতর কে যেন থেকে থেকে তাকে জানিয়ে দিচ্ছিল, তারই সামনে তার বড় ভায়ের পরাজয়, সে পরাজয় শুধু তার দাদার নয়, তারও। মাসের মুখেই যখন মাইনের টাকা নিয়ে শচীপতির কাছে দিতে গেল, তখন শচীপতি খুসী মনেই টাকাটা নিল দেখে শ্রীপতি আশ্বস্ত হ'ল।

'দাদা মেঝ বৌয়ের ব্যবহারের জন্যে তাকে মাপ করো।'

'তোকে তা বল্‌তে হবে না শ্রীপতি, সেই দিনেই তাকে মাপ করেছি, কারণ তাকে স্নেহ করি খুব বেশী। কিন্তু শ্রীপতি মা'র চোখের সামনেই যদি আমরা ভাগ হয়ে যাই শুধু বউদের পরামর্শে, তাহলে লোকে বল্‌বে কি?'

'কি করব দাদা, মেঝ বৌ-এর স্বভাব ত তোমার অজানা নয়। সে আমাকে হয়ত তার অযোগ্য মনে করে, হয়ত ঘৃণা করে।'

'সে তোমাকে অযোগ্য মনে করুক আর না করুক, তুমি তাকে অযোগ্য মনে কর কি সেটা দেখ।'

'দাদা, একটা কথা ছিল, বলছিলাম কি—' শ্রীপতি ইতস্ততঃ করতে লাগল।

'বল, কি কথা?'

'গোটা পঞ্চাশেক টাকা আমাকে এবার দিতে হবে।'

'বেশ, এমাসে না হয় আমি আর ভূপতি সংসার খরচ চালিয়ে নেব, তুই ও মাসে কিছু বেশী দিস।'

'বেশ, তাই দেব। মেঝ বৌকে নিয়ে ত আর পারা যায় না। কোথায় যেন নতুন পাড়ের শাড়ীর খবর পেয়েছেন, অমনি—' কথাটা শ্রীপতি অর্দ্ধেকটা বল্‌ল।

'শ্রীপতি, এত টাকা দিয়ে শাড়ী কেনার মতন অবস্থা ক'টা লোকের আছে? তাছাড়া, সেদিন কিশোর আলপাকার

শচীপতি আর কোন কথা না বলে শ্রীপতির দেওয়া টাকাগুলো আবার তারই হাতে দিয়ে দিল। আসল কথা হচ্ছে, সুলতা চালাক মেয়ে, সে কনকলতার টাকা জমানোর কথা শুনে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। মাসে মাসে বোকার মত মাইনের প্রায় অর্দ্ধেক টাকাটাই দেওয়া তার চক্ষে বিশেষ ভাল বোধ হ'ল না। নির্ব্বোধ শ্রীপতিকে এক রকম শিখিয়ে পড়িয়েই সে পাঠিয়েছিল। উদ্দেশ্য তার সফল হ'ল বটে কিন্তু ভাসুরের শেষের মন্তব্য শুনে তার গায়ে কে যেন লঙ্কা ঘষে দিয়ে গেল। কত রকম ভাবে মনকে প্রবোধ দিয়েও সে মনকে বোঝাতে পারল না। এক রকম অপমান আছে, যেগুলো প্রতিহিংসা নিলেও মনে হয়, পরাজয়ের গ্লানিটা বোধ হয় একেবারে ধুয়ে মুছে যায়নি।

সন্ধ্যে বেলা আফিস থেকে ফিরে এসে জল-খাবার খেয়ে যখন শচীপতির মাইনের টাকার কথা মনে পড়ল তখন জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখে মাইনের অর্দ্ধেক টাকাটা নেই। বাড়ী-শুদ্ধ খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। প্রত্যেককে ডেকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কেও জানে বা নিয়েছে কি না। প্রত্যেকেই অস্বীকার করল। সুলতা বহুদিন থেকেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এবং সুযোগ যে না পেয়েছিল তা নয়, কিন্তু যাই যাই করেও আলাদা হয়ে যাবার ফুরসুৎ তার হয়নি। এমন লোক অনেক আছে, যারা ঝগড়া বা মারামারির পর সেখান থেকে সরে যেতে চায় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করবে বা মার খাবে সেও বরং ভাল, কিন্তু তার অবর্ত্তমানে বিপক্ষ দলের আস্ফালন সে সহ্য করবে কি করে। সুলতারও সেই অবস্থা।

আজকে সে সুযোগ পেল। শচীপতি শ্রীপতিকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'শ্রীপতি টাকাটা কি হ'ল বল্‌ত?' সুলতা সেটার অন্য রকম মানে ধরল। শ্রীপতিকে যখন ব্যাখ্যা করল, তখন সেও সুলতার বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না।

আজ শচীপতি একরকম প্রকাশ্যেই শ্রীপতিকে চোর সাব্যস্ত করল। কথাটা, শ্রীপতির আগে মনে পড়ে নি, সুলতা ব্যাখ্যা করবার পর মনে হ'ল, তাই ত—সুলতা ঠিকই বলেছে।

সৌদামিনী দেবীও যখন সুলতার পক্ষে মত দিলেন তখন শ্রীপতি ভাবল আর নয় এখন থেকেই আলাদা হয়ে যাওয়া ভাল। কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে দাদার কাছে বলবার মতন সাহস তার কোন কালেই ছিল না। সুলতাকে কথাটা জানাতেই সে জোরে বলে উঠ্‌ল, তুমি না বল্‌তে পার, কিন্তু আমার মুখ আছে।

বারান্দা দিয়ে তখন কনকলতা যাচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়ে সুলতা কথাটা আরও জোর করে শুনিয়ে দিলে।

এমন সময় কিশোর কাঁদতে কাঁদতে ঘরে এল, কপালের এক পাশটা ফুলে গেছে। সুলতা সভয়ে জিজ্ঞেস করল, কে এমন করে মারলে রে, কিশোর?

বীথি ঠেলে ফেলে দিলে, মা।

যা তোর জেঠাইমাকে তার মেয়ের কীর্ত্তি দেখিয়ে আয়।

জেঠাইমা বলে, আর করবে না বীথি।

গরম তেলে যেন এক ফোঁটা জল পড়ল।

আসলে সব বাড়ীতে, পদে পদে এমনি অপমান কার সহ্য হয়? না হয় সোয়ামী দু'পয়সা রোজগার করে তা বলে এত অপমান!

দিন দশ-বার হ'ল শ্রীপতি আলাদা হয়ে গেছে। ভূপতি কলকাতায় নেই, হাজারিবাগে কি একটা কাজের জন্য গেছে। সৌদামিনী পারতপক্ষে সুলতাকে কনকলতা থেকে একটু আলাদা করে দেখতেন তিনিও শ্রীপতির সঙ্গেই রইলেন। কিন্তু দিন কয়েক পর তিনি সত্যই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। সুলতা তাঁকেও বিশেষ আমল দিত না। আলাদা হবার পর থেকেই যে আমরণ সৌদামিনী দেবী সুলতার সংসারে সুলতার ওপরের আসন দখল করে থাকবে, সেটা সুলতার কোন দিনই সইবে না।

সৌদামিনী দেবী সুলতার হাব-ভাব বিশেষ সুবিধের নয় লক্ষ্য করে দেশের বাড়ীতে চলে গেলেন।

রাস্তায় যদি কোনদিন শ্রীপতি শচীপতিকে দেখে, অমনি পাশ কাটিয়ে সরে পড়ে। শচীপতি লক্ষ্য করেও করে না এইভাবে চলে যায়। বাড়ীতে গিয়ে শ্রীপতি বড়দার সঙ্গে দেখা এবং বড়দার তাকে আবার একসঙ্গে থাকবার জন্যে কাতর প্রার্থনা ইত্যাদি বাজে কথাগুলো সুলতার কাছে বলে। কিন্তু, ক্রমাগত একটার পর একটা মিথ্যে সাজাতে সেও হাঁপিয়ে ওঠে এবং সুলতাও তার ভাসুরের মুখের একখানা করুণ প্রতিচ্ছবি যখন স্বামীর কথার ওপরে গড়ে তোলে, ঠিক সেই সময়ই দেখা যায়, মিথ্যে কথার যোগান দিতে দিতে শ্রীপতি শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, অনেক এলোমেলো কথা এসে যাচ্ছে। সুলতা বিরক্ত হয়, রেগেও যায়, বুড়ো বয়সে নেশাটেশা আরম্ভ করলে নাকি?

শ্রীপতির আজকাল প্রায়ই মনে হয়, দাদার মনে যে কষ্টগুলো সে স্ত্রীর কথায় দিল, এর জন্য কোনদিন যদি তাকে জবাব দিতে হয় কি তখন সে বলবে? রাস্তায় যেতে যেতে সে ভাবে, বাড়ী গিয়ে এমন কঠিন সে হবে, যাতে সুলতা তার ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নুইয়ে দেয়। কিন্তু তাই বা সে পারে কই? বাড়ীতে এলেই সে কেমন যেন হয়ে পড়ে, তার কথা বলবার সব শক্তি যেন কে জোর করে কেড়ে নেয়।

দেশের বাড়ী থেকে তিন ভায়ের নামেই চিঠি এল, সৌদামিনী দেবীর অসুখ। মায়ের অসুখ শুনে শ্রীপতিও বিচলিত হয়ে উঠল। সুলতা দেখল, অসুস্থ শরীর নিয়ে সৌদামিনী দেবী যদি এখানে এসে উপস্থিত হন, তা হলে হাঙ্গামার অন্ত থাকবে না। তার ওপর, তার যে স্বামী, কেননা এখানেই এনে হাজির করে। সে শ্রীপতিকে বলল, মার সমস্ত ঝক্কি ঘাড়ে নিতে চলেছ, এর ফল কি হবে, তা জান? ধর, যদি খারাপ কিছু হয়, তখন কি ভাবছ তোমার দাদা রটিয়ে বেড়াবে না মাকে বিনা চিকিৎসায় মারল? তার চাইতে মা গিয়ে বটঠাকুরের ওখানেই থাকুন, দুবেলা গিয়ে দেখে এলেই হবে।

গেল সামনের রবিবার তার একমাত্র মেয়ে আশালতার বিয়ে। অতএব শ্রীপতিকে গিয়ে সব দেখাশুনো করতে হবে, কারণ তাদের তরফে জামাই বলতে শ্রীপতিই, সুতরাং শ্রীপতি উপস্থিত না থাকলে......ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীপতি ম্লানমুখে জানাল, মার ভয়ানক অসুখ, আজ সন্ধ্যের ট্রেনে আসবেন, বাঁচেন কিনা বলতে পারি নে। চোখের পাতা দুটো জলে ভিজে এল। সুলতা স্বামীর ব্যবহারে অত্যন্ত রাগান্বিত হল।

সুশীল একটা সহানুভূতিসূচক কথা বলে চলে গেল। শ্রীপতি অসহায়ের মতন সুলতার সামনে বসে রইল।

বলি, এত মাতৃভক্তি শিখলে কোত্থেকে। মাকে দেখি গালাগালি করবার বেলা খুব মুখ চলে, আবার লোকের সামনে ঢং দেখানও চলে।

সুলতা, মাকে গালাগালি দিই আর যাই করি, তবু মা।

দেখ বড় বড় কথা বোল না। দাদা তোমার ব্যবহারে কতটা কষ্ট পেলেন ভেবে দেখেছ, কি? দাদার একমাত্র মেয়ে আশা বড় আমোদ করেই তার বিয়ে হবে, তুমি তাদের একমাত্র জামাই কোনমুখে তুমি যেতে পারবে না, জানাবে?

যেতে পারব না তা ত আমি বলিনি।

আবার কি করে বলতে হয়, শুনি?

সুলতা বাপের বাড়ী চলে গেল, সঙ্গে অবশ্য শ্রীপতি। শ্বশুর বাড়ী গিয়েই সে চলে আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। বিয়ের আর মাঝে একদিন বাকী, বৃহৎ ব্যাপার, এমন সময় যদি বাড়ীর একমাত্র জামাই না থাকে তবে চলবে কি করে?

সৌদামিনী দেবী সন্ধ্যেবেলা এলেন কিন্তু অবস্থা তাঁর বিশেষ খারাপ। হার্ট খুবই দুর্বল। শচীপতি মায়ের অবস্থা দেখে অধৈর্য হয়ে পড়ল। পরদিন সকালে শচীপতি আশা করেছিল, শ্রীপতি আজ নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু সেও যখন এল না তখন শচীপতি বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভূপতি সেই দিনই হাজারিবাগ থেকে সস্ত্রীক চলে এল। সৌদামিনী দেবীর তখন শেষ অবস্থা। শ্রীপতির সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল না ভোরবেলায় ভূপতি, শ্রীপতির বাড়ী গিয়ে দেখে বাড়ীতে কেও নেই। বাইরে তালা বন্ধ করে বাড়ীর চাকরটা তখন কোথায় যেন গেছল।

গোটা চারেকের সময় সৌদামিনী দেহরক্ষা করলেন। বাড়ীময় হাহাকার পড়ল। ভূপতি আবার শ্রীপতির বাড়ী গেল। চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে সে যখন সুলতার বাপের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'ল তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

শ্রীপতির মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে সুলতার বাপের বাড়ীর সবাই ব্যথিত হল। শ্রীপতি জোর করে বলল, সব শেষ হয়ে গেল, ভূপতি।

ভূপতির সামনে শ্রীপতি কোন মতেই দাঁড়াতে পারল না। ভূপতির সমস্ত শরীরে শোকের যে চিহ্ন আঁকা আছে তার সামনে শ্রীপতি দাঁড়ায় কি করে? রুক্ষ চুল, খালি

অহিংসা

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

অহিংসা"র আলোচনা আজকাল খুবই বেশী। পূর্ব্বে ইহা দর্শন ও যোগশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় ছিল, এখন রাজনীতি ও সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। 'অহিংসা' যতদিন স্বাধীনতা লাভের উপায় (Policy)রূপে ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যবহৃত হইতেছিল, ততদিন বিশেষ কোন আপত্তি উঠে নাই, আপত্তি উঠিয়াছে যখন হইতে ইহা কংগ্রেসের ক্রীড্‌রূপে পরিণত হইয়াছে। কংগ্রেসের ক্রীড্‌রূপে ইহাকে গ্রহণ করিতে যাঁহাদের আপত্তি আছে তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন কংগ্রেস-নেতা রাজনীতির দিক হইতেই ইহার আলোচনা করিয়াছেন, আমরা করিব অন্য দিক হইতে। আমরা ভারতীয় প্রাচীন দর্শন ও যোগশাস্ত্র হইতে দেখিবার চেষ্টা করিব 'অহিংসা' সেখানে কি উদ্দেশ্য-সাধনে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক যে উদ্দেশ্য সাধনে ইহা কংগ্রেস ক্রীড্‌রূপে গৃহীত হইয়াছে তাহা যথোপযুক্ত কিনা। শুধু তাহাই নহে, কংগ্রেস ক্রীড্‌রূপে গৃহীত হইলেও স্বাধীনতা-সংগ্রামে ইহা প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব কি না তাহাও এখানে আমরা দেখিবার চেষ্টা করিব।

চিকিৎসার পূর্ব্বে রোগনির্ণয় ও রোগের কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। এখানেও হিংসাব্যাধি দূরীকরণের পূর্ব্বে ইহার উৎপত্তির কারণ নিরাকরণ করা আবশ্যক। মনোবিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়,—স্বার্থ বাধাপ্রাপ্ত হইলে মনঃপ্রবাহে যে তরঙ্গ, যে বিক্ষোভ, যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হয় তাহাকেই হিংসা বলা চলে। হিংসা ত্যাগ করিতে হইলে তাহার মূল যে স্বার্থ-বোধ, তাহা প্রথমেই ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমরা স্বার্থত্যাগ করিব কেন? স্বামী বিবেকানন্দ এ প্রশ্ন করিয়াছেন এবং তিনিই ইহার মীমাংসা করিয়াছেন। স্বামীজী বলিয়াছেন, "আমি কেন স্বার্থশূন্য হইব? নিঃস্বার্থপর হইবার প্রয়োজনীয়তা কি? আমি যে নিঃস্বার্থপর হইব, তাহার কারণ দেখাও। অবশ্য নিঃস্বার্থপরতা কবিত্ব হিসাবে অতি সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব ত যুক্তি নহে। আমাকে যুক্তি দেখাও—আমি কেন নিঃস্বার্থপর হইব। আমি যে নিঃস্বার্থপর হইব, ইহাতে আমার হিত কোথায়? স্বার্থপর হইলেই আমার হিত হয়—'হিত' অর্থে যদি 'অধিক পরিমাণে সুখ' বুঝায়। আমি অপরকে প্রতারণা করিয়া ও অপরের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ লাভ করিতে পারি। হিতবাদিগণ ইহার কি উত্তর দিবেন? তাঁহারা ইহার কিছুই উত্তর দিতে পারেন না। ইহার প্রকৃত উত্তর এই যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটি অনন্ত সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ—একটি অনন্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।" স্বামী বিবেকানন্দের কথার তাৎপর্য্য এই যে, নিখিল বিশ্বের সহিত যদি ব্যষ্টি মানবের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তবেই স্বার্থত্যাগ করিবার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সে অবস্থায় ব্যষ্টি মানব বিশ্বের সমুদয় প্রাণিজগতের সহিতই আপনার একত্ব অনুভব করে, তখন সে দেখে যে, সকলের স্বার্থেই আমার স্বার্থ

তখনই সে বহুর স্বার্থে আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে পারে, তখনই সে অন্য সকলের সুখের জন্য হাসিমুখে নিজে দুঃখ বরণ করে। স্বামী বিবেকানন্দ যাহা দর্শনের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেই ভাবই তাঁহার অনবদ্য কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন,—

> "হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
> জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
> ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
> আসিছে প্রাণে মম, হাসিছে গলাগলি।
> ....
> ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি পরে,
> জেনেছি ভাই ব'লে জগৎ চরাচরে।"

ইহা অবস্থার কথা। খুব ভাগ্যবান্ কোন কোন ব্যক্তির মনে ইহা অকস্মাৎ আলোক-বন্যার মত আসে, কিন্তু অধিকাংশকেই এই অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য কঠোর সাধনা করিতে হয়। ভারতীয় দর্শন ও যোগশাস্ত্রের মতে এই অবস্থা একমাত্র নির্ব্বিকল্পসমাধিযুক্ত ব্রহ্মানুভূতি হইতেই আসিতে পারে। কারণ, তখন আর দুই থাকে না, হিংসা করিবার মত কিছু চোখে পড়ে না, হিংসা ও ক্রোধের কোন তরঙ্গই মনে উঠে না, তখন মন একত্বে লীন হইয়া যায়, তখন "ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তির বিলয় হেতু ব্রহ্মমাত্রই বর্ত্তমান থাকে", (অদ্বিতীয়বস্তুকারাকারিতচিত্তবৃত্তানব ভাসেনা। অদ্বিতীয়বস্তুমাত্রমেবাহবভাসতে।—ইতি বেদান্ত সারঃ)। এই ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিবার যে আটটি সাধন-অঙ্গ শাস্ত্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার প্রথম অঙ্গ হইতেছে—'যম', (অস্যাঙ্গানি যম-নিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধয়ঃ)। 'যম'—বলিতে কি বুঝায় তাহা পাতঞ্জল-যোগসূত্রে উল্লিখিত আছে—

"অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহা যমাঃ।" (৩০ সূত্র)—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এইগুলিকে 'যম' বলে। অতএব দেখা যাইতেছে—নির্ব্বিকল্প সমাধিযুক্ত ব্রহ্মানুভূতিতেই একাত্মবোধ, একাত্মবোধেই হিংসার সম্পূর্ণ বিলোপ, তজ্জন্য যে যোগ-সাধনার আবশ্যক তাহার প্রথম অঙ্গই হইতেছে অহিংসার অভ্যাস। ইহার অভ্যাস কিরূপে করিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া 'যোগসূত্র'-কার পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "প্রতিপক্ষ ভাবনা" অর্থাৎ হিংসার বিপরীত যে-অহিংসা তাহা ভাবনা অথবা অহিংসার বিপরীত যে-হিংসা তাহার দোষ-দর্শন বা কু-ফল চিন্তা করিতে হয়—"বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম্॥" (৩৩ সূত্র)। স্বামী বিবেকানন্দ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্মের (অহিংসা, অচৌর্য্য ইত্যাদি) কথা বলা হইল তাহাদের অভ্যাসের উপায়, মনে বিপরীত প্রকারের চিন্তা আনয়ন করা। যখন অন্তরে হিংসা বা চৌর্য্যের ভাব আসিবে, তখন অহিংসা ও অচৌর্য্যের চিন্তা করিতে হইবে। যখন দান গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইবে, তখন বিপরীত চিন্তা করিতে

"বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা
লোভক্রোধমোহপূর্ব্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা
দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥"
(৩৪ সূত্র)

সূত্রার্থ—পূর্ব্ব সূত্রে যে প্রতিপক্ষ ভাবনার কথা বলা হইয়াছে তাহার প্রণালী এইরূপ—বিতর্ক অর্থাৎ যোগ-সাধনার প্রতিবন্ধক হিংসা আদি; কৃত, কারিত, অথবা অনুমোদিত; উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ, অথবা মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহা অল্পই হউক, আর মধ্যম পরিমাণই হউক, অথবা অধিক পরিমাণই হউক; উহাদের ফল অনন্ত অজ্ঞান ও ক্লেশ; এইরূপে ভাবনাকেই প্রতিপক্ষ ভাবনা বলে।

এই সূত্রের স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত ব্যাখ্যা এইরূপ—"আমি নিজে কোন মিথ্যা কথা বলিলে, তাহাতে যে পাপ হয়, যদি আমি অপরকে মিথ্যা কথা কহিতে প্রবৃত্ত করি, অথবা অপরে মিথ্যা কহিলে তাহাতে অনুমোদন করি, তাহাতেও তুল্য পরিমাণে পাপ হয়। যদিও উহা সামান্য মিথ্যা হউক, তথাপি উহা যে মিথ্যা, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পর্ব্বত গুহায় বসিয়াও যদি তুমি কোন পাপ চিন্তা করিয়া থাক, যদি কাহারও প্রতি অন্তরে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহাও সঞ্চিত থাকিবে, কালে আবার তাহা তোমার উপরে গিয়া প্রতিঘাত করিবে, একদিন না একদিন কোন না কোন প্রকার দুঃখের আকারে উহা প্রবল বেগে তোমাকে আক্রমণ করিবে। তুমি যদি হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার ঈর্ষা (হিংসা) ও ঘৃণার ভাব পোষণ কর ও উহা তোমার হৃদয় হইতে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ কর, তবে উহা সুদ সমেত তোমার উপর গিয়া পড়িবে। জগতের কোন শক্তিই উহা নিবারণ করিতে পারিবে না। যখন তুমি একবার ঐ শক্তি প্রেরণ করিয়াছ, তখন অবশ্য তোমাকে উহার প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে।—এইটি স্মরণ থাকিলে, তোমাকে অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত রাখিবে।"

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সাধক অহিংস-সাধনায় সিদ্ধ হইলে কিরূপ ফললাভ করে তাহাও পাতঞ্জল-যোগ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে—"অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ॥" (৩৫ সূত্র)।—অন্তরে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার নিকট অপরে আপনাদের স্বাভাবিক বৈরতা পরিত্যাগ করে। স্বামী বিবেকানন্দ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—"যদি কোন ব্যক্তি অহিংসার চরমাবস্থা লাভ করেন, তবে তাঁহার সম্মুখে, যে সকল প্রাণী স্বভাবতঃই হিংস্র, তাহারাও শান্ত ভাব ধারণ করে। সেই যোগীর সম্মুখে ব্যাঘ্র, মেষ-শাবক একত্র ক্রীড়া করিবে, পরস্পরকে হিংসা করিবে না। এই অবস্থা লাভ হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমার অহিংসাব্রত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

উপরে 'বেদান্তসার' ও 'পাতঞ্জল-যোগসূত্র' হইতে যে কয়েকটি সূত্র উদ্ধৃত হইল তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে—অদ্বৈত ব্রহ্মানুভূতি হইলে, অর্থাৎ অন্তরে যখন "ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তির বিলয় হেতু ব্রহ্মমাত্রই বর্ত্তমান থাকে", সাধক প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হয়,—তাহার মন হইতে হিংসার ভাব একেবারে চলিয়া যায়। এই অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য যে সাধন-পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার প্রথম ধাপই হইতেছে অহিংসার সাধন। সুতরাং অহিংসা-সাধনার চরম লক্ষ্য ব্রহ্মানুভূতির দিকে সাধক যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই তাহার মনে সকলের সহিত একাত্মানুভব হইবে, এবং একাত্মানুভব যতই গভীর ও বিস্তৃত হইতে থাকিবে ততই তাহার মন হইতে স্বার্থবোধ চলিয়া যাইবে। এই স্বার্থবোধের যখন সম্পূর্ণরূপে উপশম হইবে, তখন সকলপ্রকার সংগ্রামও বিরাম লাভ করিবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, যে-অহিংসা-সাধনার চরম পরিণতি সকল প্রকার স্বার্থবোধ ও সংগ্রামের উপরতি, তাহা ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের বা জাতীয় কংগ্রেসের 'ক্রীড্' হইতে পারে কি-না। আমাদের মনে হয়—ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠা-কল্পেই যে-স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদ্ভব, শাসকের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভই যাহার উদ্দেশ্য, প্রতিপক্ষের সহিত অবিরত সংগ্রামই যাহার উপায়, তাহা এমন কোন 'ধর্ম্মকে' ('অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ') তাহার 'ক্রীড্' করিতে পারে না, যাহার লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং যাহার উপায় ও উদ্দেশ্য পরস্পর বিরোধী। হিংসা যেমন নিঃস্বার্থপরতা ও সংগ্রাম-বিরতির উপায় হইতে পারে না, তেমনি অহিংসাও জাতীয় স্বার্থ-প্রতিষ্ঠার ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের 'ক্রীড্' হইতে পারে না। কারণ, তাহা স্ববিরোধী।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—"অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগ"—এই যোগসূত্র যখন বলিতেছে যে, অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত যোগীর সম্মুখে হিংস্র প্রাণীরাও শান্ত ভাব ধারণ করে, তখন ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতা ও সাধারণ কর্ম্মিগণ অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইলে, যাহারা ইহার বিরোধী তাহারাও শান্ত ভাব ধারণ করিবে না কেন? মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস-অহিংসা-নীতির পক্ষে প্রায় এই যুক্তিই দেখান। যাঁহারা ঐরূপ কথা বলেন তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে—ঐ সূত্রে ব্যক্তিগত সিদ্ধ সাধকের বিষয়ই উল্লেখ করা হইয়াছে। গীতাকার বলিয়াছেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে—
যততাম অপি সহস্রাণাং কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।"

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে মাত্র কেহ কেহ সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য চেষ্টা করে এবং যাহারা চেষ্টা করে তাহাদের সহস্র-সহস্রের মধ্যে মাত্র কেহ কেহ সিদ্ধিলাভ করে। সিদ্ধপুরুষ রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"শ্যামা মা ওড়াচ্ছে ঘুড়ি,

'লক্ষের দু'একটি কাটে হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।"

—ইহা যোগের বিষয়, ধ্যান ও সমাধির বিষয়। ইচ্ছা করিলেই বা অন্য সমস্ত কাজ সারিয়া অবশিষ্ট সময় একটু-খানি অভ্যাস করিলেই ইহাতে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ইহার জন্য আজীবন কঠোর সাধনা আবশ্যক, যেমন—পাওহারী বাবা ও অন্যান্য দুই একজন সাধক করিয়াছিলেন। যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পাওহারী বাবা এতদূর অহিংস

প্রবেশ করিলে তিনি তাহাকে বাধা দেওয়া ত দূরের কথা, সে চলিয়া যাইবার সময় যাহা ফেলিয়া যাইতেছিল তাহা তিনি নিজেই পুটলি বাঁধিয়া মাথায় করিয়া তাহাকে দিয়া আসিয়াছিলেন। এই কার্য্য পাওহারী বাবার স্বতঃপ্রণোদিত। কারণ, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত আত্মানুভূতি হইতে তিনি দেখিয়াছিলেন—সেই চোর ও তাঁহার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, অভাব হইতে সে তাঁহার কুটীরে চুরি করিতে আসিয়াছে, যাহা সে লইয়া যাইতেছে তাহাতে অভাব সম্পূর্ণ মিটিবে না, তাই তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া চোরকে দিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিলেন। অন্য একজন সিদ্ধ পুরুষ ভগবানকে ভোগ দিবার জন্য রুটি তৈয়ার করিয়া যখন অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন তখন একটা কুকুর কয়েকখানা রুটি মুখে তুলিয়া পলাইতেছিল। তাহা দেখিয়া তিনি ঘিয়ের বাটি লইয়া কুকুরের পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে বলিতেছিলেন—'ঠাকুর! একটুখানি দাঁড়াও, রুটিতে ঘি মাখাইয়া দিই—শুক্‌না রুটি খাইতে তোমার কষ্ট হইবে।'—ইহাই অহিংসায় সিদ্ধ অবস্থা, ইহা আসে সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন হইতে, কিন্তু কয়জন সাধকই বা তাহা লাভ করিতে পারে? কয়জন ব্যক্তির জীবনে ইহা লাভ করিবার জন্য ঠিক্ ঠিক্ আগ্রহ আসাই বা সম্ভব? মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষে যে-পথে চলা, এবং বিরল ব্যক্তির পক্ষে যে-লক্ষ্যে উপনীত হওয়া হয়ত সম্ভব, সেই অহিংসা-সিদ্ধির পথে চলা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু মহাত্মাজী চাহিতেছেন—কংগ্রেসের প্রত্যেকটি কর্ম্মী কায়মনোবাক্যে পূর্ণ অহিংস হইবে। একই সময়ে দেশের কোটি কোটি নরনারী যে পূর্ণ অহিংস হইতে পারে না—ইহা তাঁহার বিবেচনায় আসিতেছে না। তাই তিনি কংগ্রেসে যাহা 'ক্রীড্' করিয়াছেন তাহা শুধু লেখার মধ্যেই থাকিয়া যাইতেছে, কাহারও দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে না।—এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। অধিকারী বিচার না করিয়া কোন একটি সুউচ্চ ও সুকঠিন আদর্শকে বাধ্যতামূলক সর্ব্বজনীন নীতিতে পরিণত করিলে তাহার পরিণাম এইরূপই হয়! এই জন্যই বিভিন্ন শাস্ত্রে অধিকারী নির্ণয়ের উপদেশ আছে—"তত্রানুবন্ধো নাম অধিকারিবিষয়সম্বন্ধপ্রয়োজনানি", (বেদান্তসারঃ, ৪ সূত্র),—অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন, এই চারিপ্রকার অনুবন্ধ প্রত্যেক শাস্ত্রেই আছে। কারণ, অধিকারী অর্থাৎ বুঝিতে ও করিতে সক্ষম, এরূপ ব্যক্তি যদি না থাকে, তবে বলা না-বলা সমান। মহাত্মা গান্ধী একটি উচ্চ আদর্শ পালন করিবার নির্দ্দেশ দিতেছেন, কিন্তু অধিকারী বিচার করিতেছেন না, তাই তাঁহার সকল নির্দ্দেশ—সকল উপদেশ অরণ্যে রোদনেরই সমান হইতেছে। এখনও যদি তাঁহার ব্যর্থতার কারণ তিনি না-বুঝেন, তবে তাঁহার নিজেরও মনোকষ্ট, এবং অন্য সকলেরও দুর্ভোগ। যতই দিন যাইবে ততই তাঁহার নিজের মনঃকষ্ট এবং দেশবাসীর দুর্ভোগ বাড়িয়াই চলিবে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা লাভ হইবে না।

মহাত্মা গান্ধী অধিকারী বিচার না করিয়া কংগ্রেসকর্ম্মীমাত্রকেই যে পূর্ণরূপে অহিংস হইবার নির্দ্দেশ দিতেছেন এবং বলিতেছেন—সকলে 'আন্তরিক অহিংস' না হইলে তিনি আর এখন সন্তুষ্ট হইবেন না, তাহার কারণ—আমাদের মনে হয়, তিনি নিজে অহিংসা সাধনার পথে ধীরে ধীরে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন বলিয়া এখন উহা সহজ মনে করিতেছেন, তাই ভাবিতেছেন, অন্য সকলের পক্ষেও বুঝি ইহা সহজ। অহিংসা সম্বন্ধে তাঁহার বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার ধারণা এবং এখনকার ধারণা—তাঁহার লেখা হইতে মিলাইয়া দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যায়—অহিংসা ধর্ম্ম তাঁহার মনোমধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে ক্রমশ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাইতেছে, এবং বুদ্ধি (intellect) হইতে অন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে। তাই তিনি তাঁহার পূর্ব্ব অহিংস-আচরণের মধ্যে বিচারপূর্ব্বক এখন হিংসার ভাব দেখিতে পাইতেছেন, সকলকে তাঁহারই মত 'আন্তরিক অহিংস' হইতে বলিতেছেন, অহিংসাকে কংগ্রেসের "পলিসি" হইতে "ক্রীডে" আনিয়া ফেলিয়াছেন, এবং এখনও "নূতন আলোক" পাইতেছেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে—অহিংসা-আচরণ সাধনার একটি অবস্থা (stage) বিশেষ, সাধকের মনে ইহা ক্রমশ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে রূপান্তরিত হয়, ইহা ক্রমেই তাহাকে অদ্বৈতানুভূতির দিকে লইয়া যায়, যতই সেদিকে মন যায় ততই সাধকের জীবনে ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ হ্রাস পাইতে থাকে, এবং সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য তাহার সংগ্রাম-স্পৃহা ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হইয়া আসে। সুতরাং, প্রথমত যাহা ব্যক্তিগত সাধনার জিনিষ তাহা কখনও সর্ব্বসাধারণের দ্বারা আচরিত হইতে পারে না, হওয়া উচিত নয়, হইলে প্রত্যবায় ঘটিবে, অর্থাৎ অহিংসার কপটাচার মাত্র বাড়িবে। এবং দ্বিতীয়ত যাহা আন্তরিক আচরিত হইলে ব্যক্তির মন হইতে রাষ্ট্রীয় স্বার্থবোধ ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে ও তাহার মনকে অতি অবশ্য সংগ্রাম-বিমুখী করিবে, তাহা কখনই জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের 'ক্রীড্'রূপে পরিগণিত হইতে পারে না, হইলে জাতীয় আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে—স্বাধীনতা-সংগ্রাম নিশ্চিত ব্যর্থ হইবে।—দর্শন, যোগশাস্ত্র ও যুক্তি হইতে আমরা এই দুই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। 'অহিংসা' বর্ত্তমানে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রযুক্ত হইলেও আসলে ইহা দর্শন ও যোগশাস্ত্রেরই অন্তর্গত, সেই দিক দিয়া আলোচনা না করিলে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে না বলিয়াই আমরা এইরূপ আলোচনার আবশ্যকতা বোধ করিয়াছি।

বেপরোয়া

(গল্প)

শ্রীগোপালচন্দ্র বাগচী

গাং চিলের ছানা—বাসার ভেতরে চুপ করে বসে আছে। ওর দু'ভাই আর এক বোন উড়তে শিখে কাল বাসা থেকে বেরিয়ে সেই যে নীচে চলে গেছে আর এ পর্য্যন্ত ফিরে আসেনি। একলা পড়ে থাকতে হবে এই ভয়ে ছানাটি কাল কয়েকবার উড়তে চেষ্টা করেছিল—কিন্তু কেমন যেন ভয় করে পারে না। বহুবার সে লাফাতে লাফাতে বাসার শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত চলে আসে, তারপর যখনি নীচে সমুদ্রের গুরু-গম্ভীর নীল জলের ওপর ওর নজর পড়ে তখনি ডানা মেলে ঝাঁপ দেবার সাহস মন থেকে উবে যায়—মাথা ঘুরে ওঠে। বাধ্য হয়ে বেচারী মনের দুঃখে ফিরে যায় নিজের পুরানো জায়গায়। ওর ভাইবোনদের ডানা ওর থেকে অনেক ছোট; তাহলে কি হবে, তারা মাত্র কয়েকবার মহলা দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল নীচে সাহস করে। সে সৎসাহসটুকু ও যে কিছুতেই মনে আনতে পারছিল না। বাবা, মা অনেকবার ধমকে দিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে যে, যদি ও উড়তে না শেখে তবে বাসায় একলা না খেয়ে মরতে হবে। অতটুকু ছানাটি কিন্তু নিজের জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কায় কিছুতেই উড়তে চায়নি।

কাল থেকে কেউ ওর সাথে কথা কয়নি, কাছেও আসেনি। কাল সারাদিন ধরে বাবা, মা ওর ভাইবোনদের জলে ভাসা, মাছ ধরা, এমনি আরও অনেক কিছু শেখাচ্ছিল। ছানাটি একলা বসে বসে তাই দেখছিল। বড় ভাই কি যেন একটা মাছ ধরে পাশে উঁচু পাথরের ওপর বসে খায়, আর বাবা মা তাকে ঘিরে হল্লা করে, বাহবা দেয়—তাও লক্ষ্য করেছিল। সামনে ঐ পাহাড়টা যেন ওর ভয় দেখে ঠাট্টা করবার জন্যে মুখ ভেংচে দাঁড়িয়েছিল। তারই নীচে ভাইবোনেরা সারা সকাল মনের আনন্দে খেলা করেছে। কতবার ও মনে মনে ইচ্ছে করেছে ওখানে গিয়ে দলে মিশতে।

সূর্য্য আকাশ বেয়ে উঁচুতে উঠে আসে—গরম হয়ে ওঠে গাং চিলের ছোট দক্ষিণমুখো বাসাখানি। এই গরমেই ছানাটি অস্থির হয়ে ওঠে—কাল থেকে যে কিছুই খাওয়া হয়নি ওর। বাইরে তাকিয়ে দেখে একটুকরো মাছের লেজ শুকিয়ে পড়ে আছে, আর কোনো খাবার কোথায়ও নেই। খড় আর মাটি দিয়ে একটি উঁচু বেদী করে নিয়ে ওদের তার ওপর তা' দেওয়া হয়েছিল। ছানাটি ঠোঁট দিয়ে উল্টে দেয় সেগুলো খাবারের খোঁজে। ভাঙ্গা ডিমের খোসাগুলোও ঠুকরে সরিয়ে ফেলে—শেষে আপনা-আপনি বাসার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করে—ভাবতে থাকে, না উড়ে কোনও উপায়ে বাবা মার কাছে যাওয়া যেতে পারে কিনা?

বাসার দু'ধারেই খাড়া পাহাড়—নীচে সমুদ্র পর্য্যন্ত নেমে গেছে। বাবা, মা, আর ওর মাঝখানে রয়েছে বিরাট গহ্বর। হ্যাঁ উত্তর দিকের পাহাড় ধরে এগিয়ে গেলেই ও ঠিক জায়গা মত পৌঁছুতে পারত। কিন্তু কিসের ওপর দিয়ে হাঁটবে ও?......না তাতেও কোনো সুবিধে হয় না। ওপরেও পাহাড়ের চূড়া দেখা যায় না। বাসা থেকে নীচে সমুদ্র যতদূর বোধ হয় তার থেকেও উঁচুতে ঐ চূড়া।

...ছানাটি এক পা' দু'পা করে বাসার শেষ প্রান্তে চলে এসে পালকে এক পা লুকিয়ে ফেলে—এক চোখ বন্ধ করে, তারপর ইচ্ছে করেই আরেক চোখও বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়বার ভাণ করে—তবুও কেউ তাকায় না ওর দিকে। ভাইবোনদের দেখতে পায় সমান জমির ওপর বসে ডানার ভেতর মুখ দিয়ে ঝিমোচ্ছে। ওর বাবা নিজের শাদা পালকগুলো ঠোঁট দিয়ে পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখছে। দূরে পাথরের ওপর ডানা মেলে বসে ওর মা পায়ের তলা থেকে মাছ টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে পাথরে ঠোঁট ঘসে নিচ্ছে। ওর ইচ্ছে করে মায়ের মত পাথরে ঠোঁট ধারালো করে ওমনি টুক্‌রো মাছ ছিঁড়ে খেতে। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ও ডানা মেলে ঘোরাঘুরি করতে থাকে আর ব্যস্ততার আওয়াজ করে। মা ওর দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়।

...গা—গা—গা—কিছু খাবারের আশায় ছানাটি মায়ের কাছে মিনতি জানায়। মা অবজ্ঞার সুরে চেঁচিয়ে ওঠে...ঐ যে মা উড়ে ওর দিকে আসছে একটুক্‌রো মাছ মুখে করে। ছানাটি আবদারের সুরে কাঁদতে থাকে—আনন্দে ডানা নাড়তে থাকে গলা উঁচু করে। তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে যায়—অধীর অপেক্ষা করতে থাকে মার জন্যে। মা উড়ে ওর ঠিক মুখোমুখি পৌঁছে থেমে পড়ে—ঠোঁটে যে মাছ এনেছিল তা একটু দূরে রেখে বাসার মুখে পা ঝুলিয়ে চুপ করে বসে থাকে। ছানাটি আশ্চর্য্য হয়ে যায়, মা কেন তারই জন্যে খাবার এনে তার মুখের কাছে এনে ধরছে না।—কিন্তু, আর সহ্য করা যায় না—ক্ষিদেয় পাগল হয়ে ও ছোঁ মারে মাছের ওপর..... ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে বাসার বাইরে চলে এসে...তারপর কেবল ফাঁকা আর ফাঁকা, দাঁড়াবার উপায় নেই; তাই শূন্যে নামতে থাকে সমান জায়গা পাবার জন্যে। মা কিন্তু চুপ করে থাকেনি তার ছানার এই সৎ চেষ্টা দেখে—সে ছানাটির ঠিক ওপরে উড়ে যাচ্ছিল। ও শুনতে পায় স্পষ্ট মার ডানার ঝট্‌পটানি... ভয়ে ও আড়ষ্ট হয়ে যায়, কানে তালা লাগে—একি? হঠাৎ চমকে উঠে দেখে ওর ছোট ডানা দুটি খুলে গেছে ওকে হাওয়ায় ভর করে রাখবার জন্যে। বুকের নীচে, পেটে ডানায় হাওয়ার চাপ অনুভব করছে। ছানাটি এখন বেশ বুঝতে পারে আর ওর প্রাণে ভয় নেই, কারণ ডানা দুটো হাওয়ায় অল্প অল্প নড়ছে। একটু করে এপাশে ওপাশে মাটির দিকে ও চলতে পারছে—আগেকার মত ভয় করছে না। এবারে ও বেশ জোরের সঙ্গে ডানা আছড়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকে—তাতে ওর কি আনন্দ—আনন্দে নিজেই চেঁচিয়ে উঠছে বার-বার। আবার ডানা আছড়ায়...বুক উঁচু করে হাত-পা ছেড়ে হাওয়ায় ভাসতে থাকে। গা-উল্-গা মা শোঁ করে ছানাটির পাশ দিয়ে উড়ে যায়; ও তার উত্তর দেয় খুশী হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওর বাবাও পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে। ওপর থেকে মাথা নীচু করে শোঁ করে নেমে চলে আসে ওর খুব

য়েছে। ছানাটি কিন্তু এখন ভুলে গেছে যে এতদিন ও উড়তে জানত না।

এতক্ষণে ছানাটি সমুদ্রের খুব কাছে চলে এসেছে। সোজা সমুদ্রের দিকে গিয়ে ও জল ছোঁয়া ছোঁয়া হয়ে উড়ে যায়—পাশে ঘাড় ফিরিয়ে সবাইকে আনন্দ জানায়। এর ভেতরেই বাবা মা সবাই সবুজ জলের ওপর নেমে পড়েছে। তারাও ওকে ডাকছে নামতে। ছানাটি আর নিজেকে বইতে পারছে না—ডানা দুটো ক্রমশ গুটিয়ে আসছে।...ওর পা জলে ডুবে গেল—ডুবে যাবার ভয়ে ডানা ঝাপটে উঠতে চেষ্টা করে—কিন্তু খিদেয় ও যে বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল—তাই জোর করেও উঠতে পারল না। জলে পা ডুবে গেল, বুকে জল ছুঁয়ে গেল...তারপর ও আর ডুবল না। বাবা মা ভাইবোনেরা চেঁচিয়ে ওকে খুব প্রশংসা করে আর পুরস্কার স্বরূপ ঠোঁটে করে মাছের টুকরো এনে এগিয়ে দেয় ওর দিকে। এমনি করেই ছানাটি প্রথম দিন উড়তে শেখে।*

* আইরিশ গল্প থেকে।

অবশেষে

(৩৩০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রমে এবং শুশ্রূষায়, আর শ্রীপতির দিব্যি বেশভূষা, শুধু মাঝে মাঝে হৃদপিণ্ডটা ধরে কে যেন মোচড় দিচ্ছিল। সুলতা শ্বাশুড়ীর মৃত্যুতে একটু বিচলিত যে না হল তা নয়। তার রাগও হল শচীপতির ওপর। কি দরকার ছিল এই শুভ মুহূর্ত্তে তাঁর মায়ের মৃত্যু সংবাদ এখানে এনে; যেখানে এক জোড়া তরুণ-যাত্রী চলেছে যাত্রা পথে পা বাড়াতে, সেখানে অন্য এক ক্লান্ত যাত্রীর যাত্রা-শেষের কথা শোনানো মানে, নব যাত্রীদ্বয়কে ভয় দেখান নয় কি?

শচীপতির বুকফাটা হাহাকার, কনকলতার অসহায় করুণ ক্রন্দনের সামনে শ্রীপতি নিজেকে উপহাস বলে মনে করল। তার মনে হল, এই কান্নার ভিতর দিয়ে তার স্বর্গ-গতা জননী প্রচ্ছন্নভাবে তাকে তিরস্কার করছেন।

সকাল আটটার সময় মৃতদেহ সৎকার করে তিন ভাই বাড়ী এল। শচীপতিকে না জানিয়েই শ্রীপতি বাড়ীর দিকে গেল। সুলতা নেই, বাড়ীর চাকরটা নিজের বুদ্ধি খরচ করে কিছু ফলটল কিনে নিয়ে এল।

রাত প্রায় দশটা বাজে। মেঝের ওপর শুয়ে আছে শ্রীপতি। কি যে সে ভাবছে তা সেই জানে। ঘুমের তন্দ্রা আসছে। হঠাৎ শুনল তার মা যেন তাকে ডাকছেন।

চোখ চেয়ে দেখে তাইত, ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন তার মা।

তখন শ্রীপতিদের বাড়ী মেরামত হচ্ছিল। দোতলার বারান্দার রেলিং ছিল না, সেটার বদলে নতুন রেলিং আসবার কথা হচ্ছিল। শ্রীপতি আস্তে আস্তে বারান্দায় যেখানে তার মা দাঁড়িয়ে সেখানে গেল।

হঠাৎ একটা কি ভারী জিনিষ পড়ার আওয়াজ শুনে বাড়ীর চাকর রামগতির ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে লাইট জ্বালাতেই দেখে শ্রীপতি নীচের উঠানে পড়ে আছে, অসাড় নিঃস্পন্দ, মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে তীর বেগে। রামগতির চীৎকারে পাশের বাড়ী থেকে লোকজন এসে শ্রীপতিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। রামগতি সুলতাকে খবর দিতে গেল।

প্রথম প্রথম সুলতা খবরটা বিশ্বাস করতে পারল না। ভাবল, হয়ত তাকে নেবার একটা ফন্দি। কিন্তু রামগতির হাবভাবে তার সে সন্দেহ দূর হল।

তিন দিনের দিন কথাটা শচীপতির কানে গেল। শচী-পতি ভাইকে দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠল। কনকলতা বলল, না, যে তোমাকে একদিন মুখের উপর অপমান করে গেছে, তাকে দেখতে যাবার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

তুমি বল কি কনক? সেদিন মা গেলেন, আজ যদি ......। শচীপতি কেঁপে উঠল।

যদি যাও, তবে আমার মরা মুখ দেখবে।

কনক, বউ গেলে বউ আসবে কিন্তু ভাই গেলে আর আসবে না। চীৎকার করে শচীপতি বলে উঠল।

সর্ব্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শ্রীপতি হাসপাতালে শুয়ে আছে। পায়ের গোড়ায় সুলতা বসে আছে। আগের সুলতার মধ্যেই আজ দেখা দিয়েছে সুলতার নতুন রূপ, যেটা দেখা যায় দুঃখের সংস্পর্শে।

চারিদিকে শ্রীপতির শ্বশুর বাড়ীর লোক, আত্মীয়-স্বজন ঘিরে আছে। শচীপতি কাছে গিয়ে ধরা গলায় ডাকল, শ্রীপতি, শ্রীপতি।

শ্রীপতি চোখ চেয়ে দাদাকে দেখল, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল দাদাকে দেখে। সুলতার দিকে একবার চেয়ে শ্রীপতি যেন নীরবে জানাল, কেঁদো না বৌ, দাদা এয়েছেন, এবার ভাল হয়ে যাব। সুলতা শচীপতির পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

শচীপতিরও চোখ শুকনো ছিল না। সে ভাবল, আজ এই মিলনের [illegible]

ক্রন্দসী

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

(৮)

রাত্রিবেলায় সমস্ত কাজ-কর্ম্ম সারা হইয়া গেলে যখন বাড়ীর সবাই সুপ্তিমগ্ন তখন দেখা মিলিল। ইভা একটু ম্লান হাসিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার দেখছি এখানে পদে পদে অপরাধ। কেমন করে যে কাটাব এতদিন ভাবতে গেলে ভয় লাগে।"

শিয়রের কাছের জানালাটা খুলিয়া দিয়া শশাঙ্ক কহিল, "তুমি এদের চেয়ে অনেক বড়। সেই জোরেই দিন কাটবে। সমস্ত ভয় আপনি ভেঙে যাবে। যাদের মধ্যে বাস করতে এসেছ তাদের প্রকাণ্ড একটা আদর্শবাদ দিয়ে মুড়ে রেখ না। এরা ভালও বাসে নিন্দাও করে। আবার তুচ্ছ কথা নিয়ে ঘোঁট পাকায়। কখনো তোমার এদের অসহায় দীনতা, অশিক্ষিত মনের অপরীক্ষিত নীচতা দেখে দয়া হবে, কখনও বা হয়তো এদের অকৃত্রিম সরলতায় মুগ্ধ হবে। আলো-ছায়ার দ্বন্দ্ব নিয়েই মানুষের জীবন। এই কথাটা মনে রেখ ইভা, তাহলে অযথা দুঃখ পাবে না।"

ইভা বলিল, "ওসব বড় বড় কথা আমিও ঢের জানি। ওতে এখানে কিছু ফল হয় না। তোমার ও আলো-ছায়ার দ্বন্দ্ব এখানে খাটে না। এখানে আলোই নেই তো আলো-ছায়ার খেলা আসবে কোথা থেকে। আছে শুধু একটানা অন্ধকার।"

শশাঙ্ক বিছানা হইতে নামিয়া একগ্লাস জল কুঁজা হইতে গড়াইয়া লইয়া কহিল, "থাকগে আর ওসব আলোচনা। রাত অনেক হয়েছে। এবার ঘুমাও। যেখানে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছ না সেখানে হয়তো একদিন আলোর রেখা দেখবে। দেখবে এর আগাগোড়াই নীরন্ধ্র অন্ধকার নয়। কিন্তু আমার বলায় কিছু হবে না। তোমার নিজের মনই একদিন বলে দেবে এ'কথা।" ইভা আর এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। বাতিটা আড়াল করিয়া দিয়া শয়নের উদ্যোগ করিল। একটুখানি ম্লানহাস্যে কহিল, "ঠিকই বলেছ, নিরর্থক আলোচনায় আর কোন লাভ নেই। তোমার ভোর রাত্রিতে রওয়ানা হওয়ার কথা, নইলে হয়তো পাঁচ মাইল রাস্তা পার হয়ে ষ্টেশনে আটটার ট্রেন ধরতে পারবে না। বেশী রাত জেগ না। ভোরে একটু চা খেয়ে যাবে।" শশাঙ্ক হাসিল, বলিল, 'কর্ত্তব্যপরায়ণা গৃহিণীর মত যে উপদেশ দিলে আজ তা কাজে খাটাতে পারব কি না জানি না। তোমাকে রেখে আমি একলা যাচ্ছি এ কথাটা মনে হলে ঘুম আসে না—রাত্রি যতই বেড়ে চলুক।" "আর আমার বুঝি খুব ঘুম আসে, নয়? আচ্ছা আবার কবে আসবে?" 'পরীক্ষা হয়ে গেলে সপ্তাহখানেকের জন্য হয়তো আসব। তারপরই অনেকদিনের মত ঘরবাড়ী ছেড়ে বিদেশ-যাত্রা। সে যাত্রার যোগাড়-যন্ত্র করতে হবে।'

"মন কেমন করে না?"

"করে, কিন্তু সেখানেই থেমে যেতে চাইনে। জীবনে মাঝে মাঝে এমন একটা অতৃপ্তি জেগে ওঠে যে জগতের কোন প্রেমই সে অতৃপ্তি মেটাতে পারে না। সে অতৃপ্তির উৎস কোথা, ভাবি। তখন মনে হয়, জগতে আমরা মানুষের পরিচয় দিয়ে বাস করবার অধিকার এখনও পাইনি। কবে পাব, যতদিন না পাই ততদিন শান্তি নেই।"

"উঃ, ভীষণ স্বদেশী যে! তবে মশায় আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন কেন? ওদেশে যাবার উদ্যোগই বা করছেন কেন?" শশাঙ্ক বিছানা হইতে নামিয়া চেয়ারে আসিয়া সোজা হইয়া বসিল। তাহার দুই চোখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "না, আমার সে ইচ্ছা নেই। কে বললে তোমাকে আমি আই-সি-এস পড়তে যাব। লোকে দেখে আমি ল' পড়ছি, বুঝি উকিল হব, ব্যারিষ্টার হব, হয়তো অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হলে বড় চাকরী করব কিন্তু তা নয়। বাইরের লোকে যা দেখে যা বোঝে তা অতিক্রম করেও আমার মনের আসল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সে সন্ধান কে রাখে?"

ইভা স্বামীর সে দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া একটু গর্ব্ব বোধ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে অনেকখানি আশা-ভঙ্গের বেদনাও মনে অনিবার্য হইয়া উঠে। শ্বশুরের সঙ্গে বড় বড় কথা লইয়া আলোচনা করিয়া মনে যত বড় আদর্শবাদ খাড়া করুক তাহার সঙ্গোপন কামনায় বড় উজ্জ্বল একখানা ছবি ছিল। একদিন এই অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লী ছাড়িয়া সে বড় চাকুরের গৃহিণী হইবে। স্বাধীন, স্বচ্ছল অজস্র প্রাচুর্য্যে ভরা সে সংসার। সবাই খাতির করিবে, সম্ভ্রম করিয়া কথা বলিবে। সকলেই অতি বিনীতভাবে আসিবে একটুখানি প্রসাদ-প্রার্থী হইয়া। সে ছবিখানায় কে যেন কালি ঢালিয়া দিল। শশাঙ্ক চুপ করিয়া একদৃষ্টে আলোর দিকে চাহিয়াছিল। স্তিমিত আলোর শিখাটার দিকে চাহিয়া কত-কি সে ভাবিতেছিল। এক সময় আপন মনেই বলিতে সুরু করিল, "এক এক সময় ভাবি, হয়তো বিয়ে করেছি তোমাকে, অসুখী হবে তুমি আমার হাতে পড়ে। কিন্তু তোমার চোখের দিকে চাইলে মনে হয় না, সাধারণ মেয়েদের মত কেবল সুখই তোমার একমাত্র কাম্য।......'

ইভা আবার আদর্শবাদের আশ্রয়ে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। গর্ব্বে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। কহিল, "তোমার স্বপ্নে তোমার আদর্শে ব্যাঘাত জন্মাবনা আমি। সেটুকু বিশ্বাস আমাকে তুমি করতে পার।" এমনই করিয়া রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসে গল্পে গল্পে!

এইটুকু মাত্র ঠিক হয় যে, শশাঙ্ক সমস্ত ইউরোপ ঘুরিয়া আসিবে ও-দেশের স্বাধীনতার এবং সভ্যতার স্বরূপ একবার নিজের চোখে দেখিয়া লইবে। আর আসিবার পূর্ব্বে কোন একটা ব্যবসায় কেন্দ্রে কিছুদিন হাতে-কলমে শিক্ষা করিয়া আসিয়া এদেশে আসিয়া বাঙালীর উদ্যমে এবং বাঙালীর সহায়তায় একটা ব্যবসায় ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিবে।

ইভা একবার একটু সন্দিহান হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তোমার বাবা কি রাজী হবেন? তিনি হয়তো এক ভেবে তোমাকে পাঠাচ্ছেন.....

শশাঙ্ক তাহার অজ্ঞতা দেখিয়া শেষে আসল কথাটা ভাঙিয়া বলিয়াছিল, "তুমি যা ভাবছ তা নয়। বাবা নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে আমাকে বিদেশ পাঠাচ্ছেন না। চাকরি করে সারা জীবন এমনই কি সঞ্চয় করেছেন। তার উপর প্রকাণ্ড এই সংসার। আমার এক দূর সম্পর্কের দাদামশায় যখন মারা যান তাঁর উত্তরাধিকারীহীন বিপুল বিত্ত তিনি বাবাকে দিয়ে যান। কিন্তু সে দানের মধ্যে একটি সর্ত্ত ছিল। টাকা নিয়ে বাবা শহরে বসবাস করে বাবুগিরি করে সে টাকা ওড়াতে পাবেন না। তাঁকে এই গ্রামে এই বাড়ীতে বাস করতে হবে। এই যে বাড়ীটায় আমরা বাস করছি এটাও সেই দাদামশায়ের। কাজেই তোমার অত ভাববার কিছু নেই। আমি চাকরি না করে ব্যবসা করলেও তাঁর অনুমোদন পাব। কিন্তু তুমি একটা কথা শুনলে অবাক হবে ইভা, আমার সে দাদামশায় চিরজীবন ইম্পীরিয়াল সার্ভিস করে এসেছেন। এমনকি তাঁর মত এত বড় চাকরি বাঙালীরা আজ অবধি কেউ করেনি। যিনি সারা জীবন অত বড় চাকরি করলেন, বরাবর অভিজাত সমাজে মিশলেন; বছরের মধ্যে প্রায়ই তিন চার মাস যাঁর বিলেতে কাটতো তিনি মরবার সময় নিজের অনাদৃত জন্মভূমির প্রতি এ কি মায়া দেখিয়ে গেলেন! সে কথাটা মাঝে মাঝে যখন ভাবি তখন আমার কি মনে হয় জান, যারা দেহে মনে সত্যিই বড়, তারা দেশের আসল অভাবটা যে কোথায় তা বুঝতে পারে। তারা ঠিকই বোঝে অবহেলার জিনিষ নয় এই বাঙলার পাড়া-গাঁ। সকলেই তাচ্ছিল্য করে, দু'দিন বাস করতে না করতে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে যায় অথচ এর উন্নতি না হলে আমাদের কোনকালে কিছু হবে না।"

ইভা সকৌতুক হাসির সহিত ঠাট্টার সুরে কহিল, "ওটা সেল প্রবন্ধের ভাষায় কথা বলা। সোজা সরল ভাষায় বল ত তোমার নিজের এই গাঁয়ে থাকতে কেমন লাগে?"

শশাঙ্ক একান্ত নিরীহের মত কহিল, "দুদিনের বেশী তিন দিন থাকলেই আমার মনে হয় কতক্ষণে পালাব। কলকাতায় পৌঁছে একবার হাঁফ ছাড়তে পারলে বাঁচি।"

ইভা হাসিয়া উঠিল। জানালা দিয়া ভোরের পাণ্ডুর আলো তখন দেখা যাইতেছে। শশাঙ্ক উঠিয়া বলিল, "ভোর তো প্রায় হয়ে এসেছে। আজ সারা রাত্রি গল্প করেই কাটলো। আরতো ঘুমোবার সময় নেই। যাও, তুমি একটু চায়ের ব্যবস্থা কর। স্টোভটা না হয় আমি ধরিয়ে দিই। আমার জন্যে তুমি বেচারা বড় কষ্ট পেলে। সারাটি রাত্রি লেকচার শুনতে হ'ল, আহা বেচারি!"

ইভা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আহা আমার দুঃখে তোমার ঘুম হচ্ছে না। বড্ড সহানুভূতি!"

ভোরের আলো ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে শশাঙ্ক চলিয়া গেল।

(৯)

পরের দিনটা সারাদিনই ইভার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগিতেছিল। যেন জীবনে কিছুই কাজ নাই, কোন কিছু করিবার নাই। সারা দিন ধু ধু করিতেছে। দুপুরবেলায় উমাকে সঙ্গে করিয়া শাশুড়ীর মত লইয়া সে ইন্দুদের বাড়ীতে গেল। স্তব্ধ দ্বিপ্রহর। বৈশাখের তপ্ত আকাশ যেন উদ্ধ নীলাম্বরে মৌন ধ্যান-গম্ভীররূপে তপস্যায় নিরত। কেবল কখন কখন দু'একটা চিল বহু দূর দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। ইন্দিরা ভাঁড়ারের রোয়াকে বসিয়া একরাশি তেঁতুল লইয়া তাহার বীজ ছাড়াইয়া গোলাকার করিয়া একটা তাল পাকাইয়া রাখিতেছিল। ইভাকে দেখিয়া সহাস্যে অভ্যর্থনা করিয়া একটা আসন পাতিয়া দিল। আসন উপেক্ষা করিয়া সেই তেঁতুলের রাশির মাঝে সরিয়া আসিয়া ইভা বসিল।

"ওকি ভাই। নতুন বৌ দামী কাপড় তোমার নষ্ট হয়ে যাবে। মাটিতে বসলে কেন?"

ইভা মাটিতেই বসিল। বসিয়া প্রশ্ন করিল, "বাড়ীতে তোমরা কে কে থাক? তোমার শাশুড়ী আছেন বলছিলে না? তিনি কোথা?"

"হায়রে, আমার শাশুড়ী বুঝি আবার ভাতদুটি মুখে দিয়ে এখানে থাকেন? তিনি সেই কোন সকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন। ব'স ভাই, উনুনে আগুন আছে, আমি একটু চায়ের জল চড়িয়ে দিই তোমার জন্যে।" উমা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, শুধাইল, "ইন্দুদিদি তোমার রাঁধুনী কোথা গেল? আজ সকালে আমি এসেছিলাম, দেখি তুমি রাঁধছ। খুব ব্যস্ত। কেন হেমশশী লোক ভাল ছিল, রান্নাও করতো চমৎকার। তাকে তাড়ালে কেন?"

ইন্দু একটু অর্থপূর্ণ হাসিয়া একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "শুধু রান্নাই নয়, তাছাড়া রাঁধুনীর অনেক গুণ। বলতে গেলে মহাভারত হয়। তোদের কাছে কত আর বলবো।"

উমা একটুখানি বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। বলিল, "বৌদি তোমাকে নিতে ঝিকে পাঠিয়ে দেব।"

ইন্দু কহিল, "একাহাতে রান্না-বান্না সব কাজ আর পেরে উঠিনা ভাই। এই কতক্ষণ হ'ল ভাত খেয়ে উঠেছি। উঠেই মনে পড়ে গেল, আজ তেঁতুলগুলো কেটে না রাখলে শাশুড়ীর কাছে বকুনি খেতে হবে। একটুকু না জিরিয়েই আবার বসেছি। কাল তোমাদের ওখান থেকে আসতে দেরী হয়ে গেল, শাশুড়ীমাগীর সে কি বকুনী। ইভা ঈষৎ শিহরিল। শাশুড়ীকে ইহারা কতইনা অবলীলাক্রমে মাগী বলিতেছে। মনে বা মুখে কোথাও কি এতটুকু বাধে না? ইন্দু আপন মনেই বলিয়া চলিতেছে, শাশুড়ীকে কি আমি ভয়-ডর করি, তবে এই গরমে এতগুলো লোকের রান্না সত্যি ভারি কষ্ট হয়।

ইভা কহিল, "রাঁধুনীকে তাহলে রাখলেই পারতে। তাড়ালে কেন?' এবারেও ইন্দিরা তেমনই অর্থপূর্ণ রহস্য-ব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলিল, "উমা ছেলেমানুষ। তার সামনে আর বললাম না। রাঁধুনীর অনেক গুণ। মেয়েমানুষ রাঁধুনী রাখা অনেক ফ্যাসাদ ভাই।

সেদিন বাবুকে ভাত দিতে গেছে আমি বাড়ী নেই। পাশের বাড়ীর বকুল ফুলের সেদিন ছেলে হয়েছে দেখতে গেছি। ফিরে এসে দেখি রাঁধুনী কাঁদছে। লোকদেখানো কান্না যদিও। আমাকে বললে, এবার থেকে মা আমি শুধু রেঁধে দিয়েই খালাস। দিতে থুতে আর আমি পারব না। আমাদের বাবু ঐ এক রকম। রাঁধুনীকে বুঝি কি বলেছিল ঢলানি মাগীগুলোর কাণ্ডই অমনি। বেটাছেলের ঘরে অমন সোমত্ত মেয়ে রাঁধুনী রাখা চলে না।'

ইভা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তেঁতুল কাটিতে কাটিতে ইন্দু তখন অজস্র অনর্গল গল্প করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইভার চোখের সামনে দ্বিপ্রহরের আলো যেন আঁধারে ঢাকিয়া আসিল। যে মেয়ে স্বচ্ছন্দে স্বামীর এতবড় চারিত্রিক দুর্ব্বলতার কথা গল্প করিতে পারে, সে না জানি কেমন! আর একবার ভাল করিয়া ইভা তাহার মুখের দিকে চাহিল। কই না, কোন ভাবান্তরই তো নাই। তেমনই হাসিমুখে ইন্দু তেঁতুল কাটিতেছে, আর পাঁচটা বিষয়ের গল্প করিতেছে। কিছুক্ষণ পর ইন্দু উঠিয়া চা আনিয়া দিল। ইভা চা খাইতে খাইতে বলিল, "মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী যেও।"

ইন্দু একটা আক্ষেপসূচক অব্যক্ত শব্দ করিয়া বলিল, "হায়রে, আমি কি তোমাদের মত স্বাধীন ভাই! শাশুড়ীকে যদিবা বাগে আনতে পারি বাবু একেবারেই তেমন নয় ভাই। কোথাও যাওয়া-আসা একেবারেই পছন্দ করে না। সেদিন জানালার সামনে একটু দাঁড়িয়েছিলাম, তাইতে কত অপমান করলে। বললে, একেবারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও না তার চেয়ে।"

"তুমি কিছু বল না? চুপ করে সহ্য কর এই সব কথা? —উত্তেজিত হইয়া ইভা প্রশ্ন করিল।

"কি করবার আছে? বেটাছেলের সঙ্গে সমানে চোপা নাড়বো অত সাহস কি আমাদের থাকে ভাই?"

ইভা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিল, "কেন থাকবে না শুনি? তুমি মুখ বুজে চিরকাল অন্যায় সহ্য করবে? জান আমাদের বিশ্বকবির একটা কবিতায় আছেঃ 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।' তুমি যে মুখটি বুজে চুপ করে অন্যায় সহ্য করছ এতে করে অন্যায়কে আরও প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।"

ইন্দুর মুখ দেখিয়া বোঝা গেল না যে, তাহার মনে এত কথায় কোন ভাবান্তর ঘটিয়াছে। সে যেমন নির্ব্বিকারচিত্তে তেঁতুল কাটিতেছিল তেমনই কাটিতে লাগিল। ক্রমে একটি দুটি করিয়া পাড়ার মেয়ে জুটিতে সুরু হইল। পঞ্চাননের মা চারটি সজিনার ডাঁটা হাতে ঢুকিলেন, 'কি করছ গো বৌ? তোমার শাশুড়ীর সেই গুলপোড়া খানিক আমায় দিওতো বাছা। দাঁতের ব্যথায় আজ ক'দিন থেকে বড় যাতনা পাচ্ছি।'

নিবারণের বৌদি আসিয়া বসিল। মালা হাতে ইন্দুর শাশুড়ীও আসিলেন। হাতের মালাটা ঘন ঘন সঞ্চালন করিতে করিতে কহিলেন, 'ঐ কটা তেঁতুল এখনও কাটা হল না বাছা? আজকাল মেয়েদের কাজে-কর্ম্মে যদি কিছু হাত-পা আছে। তা এইটি বুঝি তোমার নতুন ভাজ? বেশ ডাগর চোখদুটি। মুখখানির ছিরি আছে।' তখন বড় জাঁকিয়া সভা বসিল। নিবারণের বৌদি সুরু করিলেন। ইভাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হ্যাঁ গা ভাই কলকাতার মেয়েরা কেমন করে কাপড় পরে? সামনের দিকে নাকি খানিক কোঁচা থাকে? এতদিনে ছবিতে দেখতাম। এখন ভাই তোমার কাছে শিখব।'

ওপাশ হইতে কে আর একটি মেয়ে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। 'গঙ্গাজলের কথা শোন একবার। মাগো মা, হেসে বাঁচিনে। কোঁচা দিয়ে কাপড় পরবেন উনি! তাহলে বর আর কিছু বাকি রাখবে না।'

ইভার কান ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। প্রথমটা সে নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিতেছিল। কিন্তু তারপর সামলাইয়া লইয়া প্রশ্নকারিণীকে ঈষৎ পরিহাসের ভঙ্গীতে কহিল, "হ্যাঁ, শিখিয়ে দেব বই কি। তা শুধু কোঁচা দিয়ে কাপড় পরা কেন, শার্ট পরতে পাঞ্জাবী পরতে, হাতে রিষ্টওয়াচ বাঁধতে সবই শিখিয়ে দিতে পারি। শিখবেন।"

ইভার কথার নিহিত ব্যঙ্গ বুঝিতে না পারিয়া মেয়েটি কেবল হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার বড় ননদ একটু দূরে আসিয়া বসিয়াছিল। সে শাসনের সুরে বলিল, "কি হচ্ছে কি বৌ, বেহায়ার মত অত হাসি কিসের? বাড়ী গিয়ে মাকে আজ বলবো।" বামার মা তখন ইন্দুর শাশুড়ীর নিকট হইতে খানিকটা দোক্তা চাহিয়া লইয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধা পানটুকু দিয়া তাহা তৃপ্তির সহিত চর্ব্বন করিতে করিতে সব চেয়ে আকর্ষণীয় গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছিলঃ "তা আজ কি কি রান্না করলে মানুপিসী?" ইন্দুর শাশুড়ী মানদাময়ী হাতের মালাটা আরও ঘন ঘন সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, এই গরমে বেশী কি আর রান্না করবার যো আছে মা। ইচ্ছা থাকলেও ক্ষ্যামতা নেই। বৌমা নিজে এদিকে অঙ্গটি নাড়তে পারবেনা না, আবার তেজ করে বামনীর সঙ্গে গণ্ডগোল করে তাকে তাড়িয়েছেন। বামুনের মেয়ে লোক মন্দ ছিল না। বড্ড আত্তিসুয়ো পারা ছিল গো। হাতের কাছে পানটি জলটি দোক্তাটি এগিয়ে দিত। রাত্রিবেলায় পায়ে তেল না দিয়ে কোনদিন ঘর যেত না। তা কি আর বলবো বলো দুঃখের কথা, গুণের বৌ তাকে দিলে তাড়িয়ে। এখন এ বুড়ি মরে কি বাঁচে খবর রাখে কে। তা কি বলছিলাম, ঐ দেখ না মনের জ্বালায় মাথাটারও তেমন বেশ ঠিক নেই। কি কি রান্না হয়েছিল, তা নিরিমিষ রান্না মন্দ হয়নি। ইঁচড়ের তরকারি, মটরের বড়ার রসা। নিমছেঁচকি। একটা নিরিমিষ অম্বল। ঝিঙে-আলু আর বড়িভাজে দিয়ে একটা চচ্চড়ি। আলু-পোস্ত। তাছাড়া মাছ রান্না আলাদা হয়েছিল। বড় মাছ ছাড়াও আলাদা করে দু'পয়সার চুনোমাছ কিনেছিলাম। আজকালকার দিনে কাঁচা আম দিয়ে মাছের অম্বলটুকুর বড় স্বাদ হয়। পঞ্চানন ওরফে পাঁচুর মা সহানুভূতিতে গলিয়া গিয়া কহিল, "তা নাই-নাই করে অনেকগুলিই

(শেষাংশ ৩৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙলার মনসা পূজা

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি-টি

তালীবন রেখা ক্রমশ সুদূরে মিলাইয়া গেল। দিগন্তবিসারী জলস্রোত উচ্ছল আনন্দে শত তরঙ্গের করতালি দিতেছে। তাহারি সহিত হাসিতে হাসিতে চলিয়াছে বিপুল বাণিজ্য-বহর সুদূর সিংহলের উদ্দেশে। বাঙলার সেই গৌরব স্মৃতি-বিজড়িত এই মনসা পূজা। আজও পল্লীতে ভাসান গানের শেষে কত নব বধূর নীরব অশ্রু ঝরিয়া পড়ে বেহুলার দুঃখে। বৃষ্টিমুখর অপরাহ্ণে বৃদ্ধ পাঠকের আবৃত্তি কানে ভাসিয়া আসে।

চৌদ্দডিঙা বাইয়া যায়
দাঁড়ী সবে সাইর গায়
সাগর গোঙ্গরি।

বাহিরে চলে নৌকা বাইচ। জোয়ান ছেলের দল গাহিতেছে 'ভাল কইরা ধইর হাইল মা মনসা!' কে এই মনসা দেবী?

মেঘলা আকাশে আলো মিলাইয়া গিয়াছে। ছিপগুলি ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে। চণ্ডীমণ্ডপে সকলে প্রণাম করিতেছেন,—

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগ্নি বাসুকেস্তথা।
জরৎকারু মুনেঃ পত্নি মনসা দেবি নমোঽস্তুতে॥

মহাভারতের কাহিনী। মহামুনি কশ্যপের দুই পত্নী—কদ্রু ও বিনতা। কদ্রু নাগ মাতা কিন্তু তিনিই একদিন রুষ্ট হইয়া অভিশাপ দেন যে, রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে তাহারা বিনষ্ট হইবে। বিষম চিন্তিত নাগকুল অবশেষে জানিলেন যে, নাগরাজ বাসুকির ভগ্নী জরৎকারুর যদি ঐ নামীয় ঋষির সহিত বিবাহ হয় তবে তাঁহাদের পুত্র 'আস্তিক' এই বিপদ হইতে সকলকে রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু জরৎকারু মুনি এক যাযাবর ব্রাহ্মণ—কখন কোথায় থাকেন স্থিরতা নাই। তিনি আবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কাহারও পাণিপ্রার্থী হইবেন না, পত্নীকে ভরণপোষণ করিবেন না এমনকি কোনও প্রকারে অসন্তুষ্ট হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। তবুও বাসুকি উপযাচক হইয়া তাঁহাকে ভগ্নী দান করিলেন। কোপন-স্বভাব মুনিও অল্পদিন পরেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু যথাকালে আস্তিক জন্মগ্রহণ করিয়া জনমেজয়ের যজ্ঞে নাগকুল রক্ষা করেন। এই জরৎকারুই তবে মনসাদেবী। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে একটি শ্লোকেও আছে—"জরৎকারু জগৎগৌরী মনস সিদ্ধ যোগিনী।" কিন্তু মহাভারত কেন, অমরকোষ ও পাণিনিতেও "মনসা" নাম নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকার একটা ব্যাখ্যা করিলেন, "কন্যা সা চ ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী" তাই তাঁহার নাম মনসা। কিন্তু মহাভারতে কোথাও তাঁহার "মহাজ্ঞান" লাভের সংবাদ নাই। "নাগমাতা" প্রকৃত পক্ষে "কদ্রু"। মনসাদেবী ঐ উপাধিই বা পাইলেন কেমনে? কোন কোন অভিধানকার পরবর্ত্তীকালে কদ্রুর অপর নাম মনসা বলিলেন। কিন্তু তাহা হইলে তিনি আবার "জরৎকারু মুনেঃ পত্নী" বা "আস্তিকস্য মুনের্মাতা" হইতে পারেন না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যক্তি। তিনি সব কাহিনীর সমন্বয় করিতে চেষ্টা করেন। তাহার ফলে কোথাও মনসা শৈবী কোথাও বৈষ্ণবীরূপে ব্যাখ্যাত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও সঙ্গতি রক্ষা হয় নাই। সমস্ত কাহিনীটি পড়িলে সহজেই তাঁহার ব্যর্থ চেষ্টা ধরা পড়ে।

মনসাদেবীর ধ্যান সম্বন্ধেও ভীষণ মতানৈক্য। পুরোহিত ধ্যান করিতেছেন, "হংসারূঢ়াম্ উদারামরুণিত বসনাং।" প্রতিমায় কিন্তু হাঁসের সন্ধান নাই। বাঙলায় প্রায় সর্ব্বত্র প্রস্তর নির্ম্মিত, মনসা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই দেবী পদ্মাসনা; আসনের নীচে একটি কলসী হইতে দুইটী নাগ নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে একটি ধ্যানে আছে "নাগেন্দ্র-বাহিনীং।" আসামে শীলঘাট অঞ্চলে একখানি মূর্ত্তি আছে। তাহাতে দেবী গজেন্দ্র বাহিনী। ডাঃ ভট্টশালী মনে করেন যে, "নাগ" শব্দের অর্থ-বিভ্রাট হইতে এরূপ ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পূর্ব্ববঙ্গে যে সব মনসামূর্ত্তি সাধারণে পূজিত হয় তাহাতে শুধু আটটি বা বিয়াল্লিশটি নাগ থাকে। "বিষহরি" বলিয়া পরিচিত মূর্ত্তি পদ্মাসনা এবং কুড়িটি নাগের ছত্র তাহার পশ্চাতে শোভা পায়। কিন্তু "রয়ানী" বলিয়া পরিচিত মূর্ত্তিতে নাগ, পদ্ম ও হংস সবই আছে। কোনও অজ্ঞাত কারিগর বোধ হয় এইরূপে সব ধ্যানের সমন্বয় করিয়াছেন।

দেবীর অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়েও মতানৈক্যের অবধি নাই। কেহ বলিতেছেন "রত্নাভরণ ভূষিতাম্", কেহ বলেন "সর্পবিষ-ধরালঙ্কারশোভিতাম্," আবার কোনও ধ্যানে তিনি "নাগযজ্ঞো-পবীতিনীম্।" কোথাও দেবী "দধতীং প্রসাদমভয়ং নিত্যং করাভ্যাংমুদা" আবার কোথাও তিনি "হস্তাম্ভোজ যুগেন নাগ যুগলং সংবিভ্রতীম্"। প্রাচীন প্রস্তর মূর্ত্তিতে দেখা যায় "দেবীর দক্ষিণ হস্তে বরদামুদ্রা, বাম হস্তে একটি নাগ", আবার কোথাও তাঁহার ক্রোড়ে একটি শিশু। কোন মূর্ত্তি দ্বিভূজা, কোনটি চতুর্ভুজা। বাঙালীর মনে মনসাদেবীর যে মূর্ত্তি জাগে তাহা আরও অভিনব।

শঙ্খিনী চিত্রাণী নাগে শঙ্খ পেন্ধে হাতে।
কাশুড়িয়া নাগে দেবীর খোপা বান্ধে মাথে॥
কর্কটিয়া নাগে যে কর্ণের করে শলি।
ফণী-মণি জিনিয়া যে কাণ্ডলিয়া বলি॥
সিন্দুরিয়া নাগে দেবীর শিরের সিন্দুর।
খঞ্জনিয়া বোড়াএ দেবীর চরণে নূপুর॥
কজ্জলিয়া বোড়াএ দেবীর কজ্জল পদ্মাবতী।
গগনিয়া নাগের যে গলার গ্রীবা পাতি॥
তাড়ুয়া নাগে যে বিচিত্র চারিতাড়।
শিতলিয়া নাগে দেবীর সাতলরী হার॥
নাগ আভরণ পরি হরিষ অতুল।
অনন্ত বোড়াএ মাথে কৈল পঞ্চ ফুল॥

তিনি আবার রথারূঢ়া। "তক্ষক সারথি রথ বহে অষ্ট নাগে।"

এই সব মতানৈক্য দেখিয়া মনে হয়, হিন্দু দেবদেবীর পর্য্যায়ে মনসাদেবীর আগমন অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঘটনা। কিন্তু কেমনে এবং কোথা হইতে তিনি এই আসন অধিকার

করেন ?

অথর্ব্ববেদে এক কিরাত কন্যার উল্লেখ আছে। তিনি সর্পদংশনের ঔষধ জানিতেন। সরস্বতী দেবীরও এই গুণের উল্লেখ আছে। মহাজনপন্থী বৌদ্ধগণ এক দেবীর উপাসনা করিতেন। তিনি সবরকন্যা এবং নাম জাঙ্গুলী। তিনি সর্পবিষ নষ্ট করিতেন। উক্ত সরস্বতী দেবীও সবরকন্যা বলিয়া কথিত। ক্রমশ সরস্বতী ও জাঙ্গুলী এক হইয়া গেলেন কিন্তু সরস্বতীর হংস-বাহন রহিয়া গেল। বৌদ্ধ প্রভাবকালেই ইহা সংঘটিত হয়। তাহার পর দক্ষিণ-ভারত হইতে পুনঃপুনঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের অভিযানে বাঙলার ধর্ম্মজগতে পরিবর্ত্তন ঘটিল। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, দক্ষিণ-ভারতে আজও "মঞ্চাম্মা" বলিয়া এক নাগমাতার পূজা হয়। চাঁদ সওদাগরের কাহিনীর অনুরূপ গল্পও সেখানে প্রচলিত আছে। এই "মঞ্চাম্মা"ই বোধ হয় "মনসা মা"তে রূপান্তরিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ্যদেবী সরস্বতী ও বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলীর একীকরণের প্রমাণ তাঁহার হংস বাহন। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে একটি মূর্ত্তি আছে যাহার নাগছত্র না থাকিলে অনায়াসে সরস্বতী মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত। হংস বাহন ব্রহ্মার সহিত সংশ্লিষ্ট। শৈবী ও বৈষ্ণবী বলিয়া খ্যাত মনসার সে বাহন হইবার ইহাই বোধ হয় কারণ। বিষহরি মনসা ও বৌদ্ধ জাঙ্গুলী দেবীর একত্বের একটি সুন্দর প্রমাণ আছে প্রচলিত মনসার একটি ধ্যানে। সেখানে স্পষ্ট পরিচয় আছে "বন্দে শঙ্করপুত্রিকাং বিষহরিং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্॥" জনসাধারণে বিশেষ প্রচলিত "মনসা মঙ্গল" কাব্যে কোথাও উচ্চ বর্ণের হিন্দুর সহিত এই দেবীর পূজার কোন সংস্রবের উল্লেখ নাই। তাহাতে সর্ব্বত্রই বণিককুলের কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ইহাও বৌদ্ধ প্রভাবের সাক্ষ্য। দক্ষিণ-ভারত হইতে আগত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বিগণ নিজেদের "মঞ্চাম্মা" ও দেশীয় জনসাধারণে বিশেষ প্রভাবশালিনী বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলী উভয়কে অথর্ব্ববেদোক্ত সরস্বতীদেবীর সহিত মিলাইয়া মনসা দেবীর কাহিনী উদ্ভাবন করিলেন। কিন্তু হিন্দু দেবদেবীর ঘন সন্নিবিষ্ট পংক্তিতে নূতন আসন স্থাপন সহজ নহে। সামান্য সামান্য ত্রুটি রহিয়া গেল। বাঙালী কবি নিজের কল্পনা দ্বারা পূরণ করিয়া লইলেন; মঙ্গল কাব্যে ও ভাসান গানে দেবীর মহিমা কীর্ত্তিত হইল। দশম শতাব্দীতে সেন রাজগণের আগমনে বোধ হয় এই একীকরণ আরম্ভ হয়। প্রাচীন মূর্ত্তিগুলিও এই সময়ের বলিয়াই পণ্ডিতগণের ধারণা। তাহার পর এই হাজার বৎসরে সকল পার্থক্য দূর হইয়া গিয়াছে। মনসা দেবীর আসন আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে পূজার বিধান ছিল আষাঢ় সংক্রান্তিতে, এখন হয় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে। কিন্তু ঐ দিন দেবীর পূজা করিলেও "ধনবান্ পুত্রবাংশ্চৈব কীর্ত্তিমাংশ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্।"

ক্রন্দসী

(৩৩৮ পৃষ্ঠার পর)

গো হয়েছিল ভাই। তোমার সেই রাঁধুনী, হেমশশী না কি বাহারের নাম, তা-সে রাঁধতো কিন্তু ভাল।"

নিবারণের বৌদি একটু নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "রাঁধলে কি হবে তার ঢলানিপনা! কিন্তু বড় মাসীমা, ওকে নিয়ে কাণ্ডটা বুঝি শোনেন-নি?"

ইভার এক একবার মনে হইতেছিল উঠিয়া যায়, কিন্তু কি এক দুর্ব্বার আকর্ষণে সে উঠিতে পারিতেছিল না। মানুষের নিভৃত অন্তস্তল ভেদিয়া এত কুৎসা এত হীনতা যে কেমন করিয়া হাসিতে পরিহাসে গল্পে মথিত হইয়া উঠিতে পারে অবাক হইয়া তাহাই সে শুনিতেছিল। ইন্দু শাশুড়ীর কান বাঁচাইয়া ফিস ফিস করিয়া ইভাকে বলিতেছিল, "দেখেছ ভাই আমার শাশুড়ীর কাণ্ড, পাছে একটা কেলেঙ্কারি হয়, তাই এই এত গরমে নিজে রান্না-বান্নার ঝঞ্চাট সয়ে নিয়েও ঐ ঢলানি মেয়েটাকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলাম, কিন্তু উল্টে আমাকেই গাল দেওয়া হচ্ছে।'

হেমশশীর প্রসঙ্গটা বড় মুখরোচক। তাই সেদিনের মজলিসে ইভার মত শহুরে নূতন বৌ লইয়াও আর কেহ গবেষণা করিল না।

কিছুক্ষণ পর উমা ঝিয়ের সঙ্গে আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

(ক্রমশ)

আসামের রূপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মিশমি পাহাড়ে (২)

অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিয়াছি-বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আসল খবরটিই দেওয়া হয় নাই। প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমি এবার মিশমি পাহাড়ে রওয়ানা হইয়াছি। ডেনিং ক্যাম্পের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থান হইতেই পার্ব্বত্য-জাতি মিশমিদের বাসগৃহ আরম্ভ হইয়াছে, কাজেই বলা বাহুল্য যে, সুসভ্য জাতির সীমান্ত-ঘাঁটি ডেনিং ক্যাম্পে উপস্থিত হইলেও আমি অসভ্যজাতি মিশমিদের দেশেই পৌঁছিয়াছি।

এখানে আমার আশ্রয়দাতা শ্রীযুত গোপিকাবাবুই আমার ভ্রমণেরও সঙ্গী হইলেন, সেদিন বিকালবেলা তাঁহার সহিত ক্যাম্পের নিকটবর্ত্তী একটি মিশমি বস্তীর উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম। এবার ডেনিং-এর পরবর্ত্তী সরু রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ক্যাম্প হইতে বাহির হইয়া সর্পগতি রাস্তার একটি বাঁক অতিক্রম করিতেই বামদিকের উচ্চ পর্ব্বত হইতে সোজা নীচের দিকে প্রবাহিত অগভীর ও অপ্রশস্ত ডেনিং নদী পাইলাম। নদীতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তর-খণ্ডগুলির ফাঁকে ক্ষীণ জলস্রোত ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত নদীর যতটুকু অংশ দৃষ্টিগোচর হয় তাহার প্রস্তরময় উগ্র রূপটি দেখিলে এই ক্ষীণ স্রোতস্বতীর বর্ষাদিনের স্রোতের রূপটিও সহজেই অনুমান করা যায়, শুনিলাম কখন কখনও রাস্তার লোহ সেতুটি পর্য্যন্ত পর্ব্বততনয়ার গতিপথে মহাপ্রস্থান করিয়া থাকে।

নদী অতিক্রম করিয়া অল্পদূরে অগ্রসর হইতেই রাস্তার পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত একটু সমতল যায়গায় প্রস্তর নির্ম্মিত পুরাতন সৈন্যশিবিরের ভিত্তি ও প্রাচীর পাইলাম, সীমান্ত দ্বার রক্ষার ইহাই বোধ হয় উপযুক্ত স্থান ছিল, কারণ এখান হইতে রাস্তা একটিমাত্র গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড় অতিক্রম করিয়াছে, স্থানাভাব বশত শিবির সেস্থান হইতে সরাইয়া আনিয়া বর্ত্তমান ক্যাম্পের পার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে, শুধু শিবির প্রাচীর ও ভিত্তিটি এখন পর্য্যন্ত সেখানে দাঁড়াইয়া আছে।

চারিফুট প্রশস্ত পাহাড়কাটা রাস্তায় ডেনিং হইতে প্রায় দুই মাইল অগ্রসর হইয়া রাস্তার বামদিকে পাহাড়ের উপরে একটু দূরে চিদাং বস্তী গাঁওবুড়ার (গ্রাম্য সর্দ্দার) ঘর দেখা গেল। আমরা সরকারী রাস্তা ছাড়িয়া জঙ্গলময় পাহাড় বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম, বস্তীতে উঠিবার কোনো নির্দ্দিষ্ট রাস্তা নাই, কণ্টকাকীর্ণ লতাগুল্মাদির মধ্য দিয়া লোকজনের চলাচলের সামান্য চিহ্ন মাত্র দেখা যায়। কিছুদূরে অগ্রসর হইয়া জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে মিশমিদের কয়েকটি মিথুন চরিতে দেখিলাম, আমাদের সাড়া পাইয়া দুই-একটি লাফাইয়া দূরে সরিয়া গেল, একটি বৃদ্ধ মিথুনকে আবার আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিলাম। মিথুন দেখিতে অনেকটা মহিষের মত, এই মিথুনই এ অঞ্চলের পাহাড়ীদের প্রধান সম্পত্তি। যাহা হউক, রাস্তা হইতে মিশমি ঘরগুলি যেরূপ নিকটে মনে হইয়াছিল উঠিতে আরম্ভ করিয়া দেখিলাম তত নিকটে নয়, প্রায় কুড়ি মিনিট পাহাড় বাহিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাঁও-বুড়ার গৃহে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু পাড়াটি এমন নীরব যে, গৃহের আশেপাশেও কোন লোকজন আছে বলিয়া মনে হইল না। কয়েকবার ডাকাডাকি করাতে দীর্ঘাকৃতি ঘরের ভিতর হইতে বাঁশের নলে দুর্গন্ধময় মিশমি তামাকের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে গাঁওবুড়া নিঃশব্দে আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। লোকটি গোপিকাবাবুর পরিচিত, প্রতিবেশীও বলা যাইতে পারে, তিনি গাঁওবুড়ার নিকট আমার পরিচয় দিয়া দেশ হইতে বহু কষ্টে যে তাহাদের দেখিতে, তাহাদের সহিত পরিচয় করিতে গিয়াছি তাহা সবিস্তারে জানাইলেন। গাঁওবুড়া হাসিয়া বলিল—মিশমিরা নোংরা জাতি তাহাদের 'বাঙলা' ঘরও নাই সুন্দর কাপড়ও নাই অতএব এত কষ্ট করিয়া আমার এইসব দেখিতে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। কথাগুলি সে হাসিয়া বলিলেও আমি তাহার মুখে দৈন্যের ব্যথা পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম। গাঁওবুড়ারা সাধারণত সকলেই আসামী ভাষা জানে, কারণ তাহারা এক একটি গ্রামের কর্ত্তা, নানা ব্যাপারে গ্রামবাসীর প্রতিনিধি হইয়া ইহাদের সদিয়ায় পলিটিকেল অফিসারের নিকট যাইতে হয়, কাজেই আসামী-ভাষা না জানিলে তাহাদের চলে না, অবশ্য পাহাড়ের গভীর অন্তরালবাসী যাহারা সরকারের কোন তোয়াক্কা রাখে না তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। উল্লিখিত গাঁও-বুড়াও আসামী-ভাষা ভাল বলিতে পারে, তাহার কথায় বুঝিলাম সভ্যজগতের চালচলনও সে খুব ভালরূপেই লক্ষ্য করিয়াছে এবং নিজেদের সহিত তুলনা করিয়া দেখিয়াছে। তাহার যুক্তির বিপক্ষে বলিবার আমাদের কিছুই ছিল না, তবুও তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—"আমাদের যেসব সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য আসবাব দেখিয়াছ, তাহার প্রায় সমস্তই পরের নিকট হইতে ক্রীত, আর তোমাদের ব্যবহার্য্য জিনিষ দেখিতে খুব সুন্দর না হইলেও সবই তোমাদের নিজের হাতে প্রস্তুত, কাজেই তোমাদেরগুলিই ভাল।" আমার কথা শুনিয়া যে সে বিশেষ খুশী হইয়াছে তাহা মনে হইল না, তবে আমরা তাহার বাড়ী-ঘরের যাহা যাহা দেখিতে চাহিলাম সবই দেখাইল। আমরা যখন কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত ছিলাম, তখন একটি রুদ্ধদ্বারের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, কয়েকটি বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক মস্তক দ্বার ফাঁক করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে এবং নিঃশব্দে সন্ধানী চক্ষুগুলি প্রসারিত করিয়া আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে। আমরা কথা থামাইয়া সেদিকে অগ্রসর হইতেই সবগুলি মস্তক একসঙ্গে ভিতরে ঢুকিয়া গেল বাঁশের দ্বারটিও শক্ত হইয়া লাগিল, তখন যদিও ইহার কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম মিশমিদের দস্তুরই এই, তাহাদের সব জজু ঘরে, এমনি সাধারণত ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ সকলে

ঘাটে-মাঠে, জঙ্গলে-দুয়ে সর্ব্বত্র মুক্তভাবে বিচরণ করে, কিন্তু যেই ঘরে ঢুকিবে অমনি দরজা সব শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিবে, যেন বাহিরের আলোটি পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার উপর নূতন লোক বস্তীতে দেখিলে ত কথাই নাই। আর একটি ব্যাপার—বাহিরে ইহারা স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া হাসি ঠাট্টা কলরব যতই করুক না কেন, গৃহ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সবই অন্তর্হিত হইয়া যায়, পারতপক্ষে এখানে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করিতে চায় না।

মিশমিদের জুম অর্থাৎ পাহাড়ের ঢালু পার্শ্বে কৃষিক্ষেত্র

মিশমি জাতি বাস্তবিকই খানিকটা নোংরা, যেমন ঘর-দরজা এবং প্রাঙ্গণের যেখানে সেখানে ময়লা, আবর্জ্জনা ও জঙ্গল লাগিয়া আছে তেমনই দেহের বেলাও সমান ব্যবস্থা স্নান জিনিষটি তাহাদের নিকট অজ্ঞাতই, চুলকাটার রীতিও আছে বলিয়া মনে হয় না। মিশমিরা রান্না করিয়া খাইতে জানে না অধিকাংশ খাদ্যই পুড়াইয়া খায়, তাই তাহাদের হাতে, নখে এবং গালে আলু, কচু ও মাংসপোড়া ভক্ষণের চিহ্ন সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে। গাঁওবুড়ার সহিত তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দীর্ঘাকৃতি গৃহের ছোট ছোট দশ-বারটি কুঠরীর প্রায় প্রত্যেকটিতেই এক-একটি ধুঁই জ্বলিতেছে, এদিকে আবার চারিদিকের আলো বাতাস বন্ধ, এমন কি ঘরের বেড়ার উপর দিকে পর্য্যন্ত আলো প্রবেশের জন্য কণামাত্র ছিদ্র নাই। এই ২০।২২ হাত দীর্ঘ গৃহে নাকি আবার সময়ে সময়ে ৩০।৩৫ জন লোক পর্য্যন্ত বাস করে, কারণ মিশমিদের কয়েকটি পরিবার একত্রে এক ঘরে বাস করাই রীতি, এখন জুমের কাজে অনেকে অন্যত্র চলিয়া গেলেও ৮।১০ জন লোক গৃহে ছিল। অন্ধকার ও ধোঁয়ায় প্রথমে ঘরের ভিতরে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, কতক্ষণ পরে ছায়ার মত এক একটি জীবকে অগ্নি-কুণ্ডের পাশে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম।

গাঁওবুড়ী (গাঁওবুড়ার স্ত্রী) কোথায় জিজ্ঞাসা করায় এইরূপই একটি ছায়ামূর্ত্তি গাঁওবুড়া আমাকে দেখাইয়া দিল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করার পরে ধুঁই'এর আগুনের ক্ষীণ আলোতে দেখিতে পাইলাম সত্যই একটি নারী এই দিনের বেলা রুদ্ধদ্বার কুঠরীতে অগ্নিপার্শ্বে বসিয়া অঘোরে ঘামিতেছে। (ধুঁই—ধুনী, অগ্নিকাণ্ড। চাঙ্গ—মাচা।)

ঘরের ভিতরে মিশমিদের স্বহস্ত প্রস্তুত কয়েকখানা কালো বস্ত্র, ভাতের হাঁড়ি, ধুঁই'এর উপরে ঝুলান ছোট 'চাঙ্গে' আলু, কচু, শুকনা মাছ ও মাংস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এবং তৈজস-পত্রের মধ্যে মোটা সরু কতকগুলি বাঁশের চোঙ, পিঠে বহিবার উপযুক্ত লম্বাকৃতি পাতার টুকরী ও ভল্লুক-চর্ম্মের ঝোলা ছাড়া আর কোন আসবাব দেখিলাম না।

এই দারুণ অগ্নিকুণ্ডরূপ গৃহের ভিতরে বেশীক্ষণ থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। বাহিরে আসিয়া গাঁওবুড়াকে তাহার পরিবারের সকলকে একবার বাহিরে ডাকিয়া আনিবার জন্য বলিলাম। সে আমাদের অন্য আদেশ নির্ব্বিবাদে পালন করিয়া গেলেও ইহাতে আপত্তি করিল, শেষে জোর করিয়া ধরিলে উত্তর করিল—"তোমরা যদি ইহাদের ডাকিয়া বাহিরে আনিতে পার, তবে আমার আপত্তি নাই।" গোপিকাবাবু গাঁওবুড়ীকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, কতক্ষণ পরে সে নিঃশব্দে দ্বার অল্প উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কিছুতেই বাহিরে আসিতে রাজী হইল না, আমাদের ফটো তুলিবার ইচ্ছা জানাইলে সঙ্গে সঙ্গেই দ্বারটি সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল। গাঁওবুড়াও ফটো উঠাইতে দিবে না, তাহাকে কত বুঝান গেল। মিশমিরা সিগারেট খাইতে ভালবাসে, আমরা সঙ্গে করিয়া সিগারেট লইয়াছিলাম তাহা হইতে গাঁওবুড়াকে কয়েকটি দিলাম। জিনিষটি পাইয়া সে খুব খুশী হইল সত্য, কিন্তু তাহাকে আর যাহা করিতে বলা হয় তাহাই করিতে রাজী, শুধু ফটোটি উঠাইতে কিছুতেই দিবে না। ফটো তুলিতে তাহাদের আপত্তির কারণ বুঝিলাম না, তবে নিতান্ত জংলী জাতি হইলেও ফটো-তোলা জিনিষটিকে যে ইহারা ভালরূপেই চিনে তাহা বুঝিলাম!

ফটোর আশা ছাড়িয়া দিয়া গাঁওবুড়াকে সঙ্গে লইয়া পাড়ার অন্য বাড়ীগুলি দেখিতে চলিলাম। এ পাড়ায় এরূপ আর দুইটিমাত্র বাড়ী আছে তাহাদের একটি শূন্য, অন্যটিতে গোটাকয়েক প্রাণী দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। এ-সময়ে মিশমিদের জুমের জঙ্গল পরিষ্কার করিবার সময়। অধি-কাংশ মিশমিই গ্রাম হইতে দূরের জুমে অস্থায়ী চালা তুলিয়া বাস করে এজন্যই গ্রামগুলি প্রায় শূন্য। বেলা শেষ হইয়া গিয়াছিল, অন্য পাড়ায়ও আর যাওয়া হইল না। মিশমি গ্রামের

বিভিন্ন পাড়াগুলির দূরত্ব পাহাড়ীপথে কোথাও অর্দ্ধ মাইলের কম নহে।

বেলা পাঁচটায় আবার ক্যাম্পের পথে রওয়ানা হইলাম। সরকারী রাস্তায় নামিয়াই দুইটি মিশমী বালক-বালিকাকে ক্যাম্প হইতে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে দেখিলাম, গোপিকাবাবু আগাইয়া গিয়া দুইজনের হাতে দুইটি সিগারেট দিলেন, ইহারা আনন্দে একেবারে গলিয়া গিয়া একে অন্যের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, যেন আজ কি এক অপূর্ব্ব জিনিষ

পাহাড়িয়া সংকীর্ণ চড়াই পথে পাহাড়ী মিশমি—স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই হস্তে বলয়ের মত অলঙ্কার পরিধান করে, লক্ষ্য করিবার বিষয়

মিলিয়াছে, কিন্তু আমি ক্যামেরাটি বাহির করিতেই মুহূর্ত্তে ইহাদের মুখের চেহারা বদলাইয়া গেল, হঠাৎ সম্মুখে সাপ দেখিলে মানুষ যেরূপ আৎকাইয়া উঠে সেভাবে একবার তাকাইয়াই পিছনের দিকে প্রাণপণে দুইটিতে ছুটিতে লাগিল। শেষে অনেক ডাকাডাকিতে ফিরিল এবং বারবার ভীতদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাইতে তাকাইতে ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সূর্য্য প্রায় ডুবু ডুবু, শীতও বেশ পড়িয়া গিয়াছে। আমরা দ্রুতপদে ক্যাম্পের দিকে চলিতে লাগিলাম। পাহাড়ের আঁকা বাঁকা রাস্তা হইতে এক একবার সমগ্র ডেনিং ক্যাম্পটি চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল আবার ক্ষণপরে বাঁক ঘুরিলেই পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল, ক্যাম্পটি দৃষ্টিগোচর হইলেই মনে হয় বুঝি আর এক দুই ফার্লং মাত্র বাকী, কিন্তু বহু ফার্লং হাঁটিয়াও আর এই এক-দুই ফার্লং শেষ হইতেছিল না। শেষে যখন সত্য সত্যই রাস্তা শেষ হইয়া গেল এবং আমরা বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম, ইচ্ছা একটু বেশী দূর অগ্রসর হইব। পাহাড়ের গায়ে কাটা অপ্রশস্ত রাস্তা ধরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতে লাগিলাম। রাস্তার এক পার্শ্বে পর্ব্বত উপরের দিকে উঠিয়া গিয়া আকাশ স্পর্শ করিয়াছে অন্যদিকে সোজা নীচে চলিয়া গিয়াছে অন্ধকার গহ্বরে আর মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ রাস্তাটি যেন সসঙ্কোচে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

আমরা ক্রমে চিদাং বস্তীর মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম, উঁচু পর্ব্বতগাত্রে দূরে দূরে কোথাও একটি কোথাও বা দুই-তিনটি লম্বাকৃতির গৃহ প্রকৃতির এই বিশালরূপের মধ্যে খেলাঘরের মতই শোভা পাইতেছিল, আবার কোথাও রাস্তার বহু নিম্নে এরূপই এক একটি ঘরের শুধু খড়ো চালাটি নজরে পড়িতেছিল।

রাস্তার অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি প্রত্যেকটি বাঁক যেখানে শেষ হইয়া আবার নূতন বৃত্ত আরম্ভ হইয়াছে, সেখানেই পাহাড়ের উপর হইতে সশব্দে এক একটি জলধারা নামিয়া আসিয়া রাস্তা অতিক্রম করিয়া অপর পার্শ্বস্থ অতল অন্ধকার গহ্বরে ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির সৃষ্টি এই ঝরণাগুলির উপরে মানুষের তৈয়ারী রাস্তার ছোট ছোট কাষ্ঠসেতুগুলি সুন্দরই মানাইয়াছে।

বাঁকের পর বাঁক ঘুরিয়া ডেনিং হইতে প্রায় চারি মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া আমরা একটি অতি মনোরম দৃশ্যের সম্মুখীন হইলাম—আমাদের দক্ষিণপার্শ্বে সম্মুখ হইতে পশ্চাতে বহুদূরে বিস্তৃত উপত্যকার অতি নিম্নভূমি দিয়া ক্ষীণ অথচ ভীষণ বেগবতী তেজু নদী বহিয়া যাইতেছে, উপত্যকার অপর পার্শ্বস্থ আকাশস্পর্শী সবুজ পর্ব্বতমালা ও নদীর গতিপথে অসংখ্য ঢেউ-এর পর ঢেউ তুলিয়া ক্রমে সজ্জিত মেঘপুঞ্জের মত নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সম্মুখে যে স্থান হইতে পর্ব্বত দুভাগে বিভক্ত হইয়া উপত্যকা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সোজা উপরের দিকে আট মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশীর্ষে অবস্থিত ছোট ডেরাই ক্যাম্পটি লাল টিনের সুসজ্জিত বাড়ীগুলি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মনে হয় বিরাট দেওয়ালশীর্ষে একখানা ছোট্ট ছবিই শোভা পাইতেছে। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী নীল পর্ব্বত—তাহার উপর মানুষের কর্ম্মপ্রচেষ্টা মিলিয়া প্রকৃতি এখানে যে অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা কথায় প্রকাশ করিবার নহে শুধু মনে-প্রাণে উপভোগ করিবার।

এই মনোরম গম্ভীর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা উপত্যকারম্ভ স্থলাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু দূরে অগ্রসর হইয়া রাস্তার দক্ষিণপার্শ্বের নিম্নদিকে ধাবিত ভূমি অপেক্ষাকৃত সমতল মনে হইল। এখানে অল্প দূরে দূরে কয়েকটি মিশমি জুমও দেখিতে পাইলাম, কোনটিকে বীজ বপনের উপযোগী করিয়া রাখা হইয়াছে, ...

শুষ্ক গাছ-গাছড়ায় তখনও আগুন জ্বলিতেছে। এখানে রাস্তার বামপার্শ্বে উপরের অত্যন্ত ঢালু জমিতে—যেসব স্থানে পাহাড়ীরাই তৃণ, লতাপাতা ইত্যাদি আকর্ষণ না করিয়া আরোহণ করিতে পারে না এমন স্থানেও কয়েকটি ছোট ছোট জুম প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম। এরূপই একটি জুমে জঙ্গল কাটায় রত এক অশীতিপর বৃদ্ধাকে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। যদিও মিশমিদের সর্ব্ব কর্ম্মে মেয়েরাই অগ্রণী, তবু এমন বৃদ্ধাকে পাহাড়ী জমির জঙ্গল কাটিতে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই দক্ষিণ-পার্শ্বের নিম্নভূমি ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া চলিতে লাগিল এবং এই উর্ব্বর উপত্যকা ভূমিতে জুমের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিল। একটি প্রশস্ত জুমে ধান্য বপন হইতেছে দেখিলাম, ষোল সতের বৎসরের একটি মেয়ে বীজ বুনিতেছে। মিশমিদের জুমে ধান্য বপন এক অভিনব ব্যাপার—বাম স্কন্ধে একটি বীজের ঝুড়ি ঝুলাইয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে একটি কাটারী দ্বারা অল্প অল্প মাটী খুঁড়িতে থাকে এবং বাম হস্তে ঝুড়ি হইতে বীজ লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রহস্তে বপন করিয়া যায়।

আমরা রাস্তায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়া মেয়েটির ধান্য বপন দেখিলাম, তৎপর জুমে নামিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাদিগকে জুমে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মেয়েটি হাতের কাজ থামাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গোপিকাবাবু ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া ভাব করিয়া লইবার জন্য তাহার হাতে দুইটি সিগারেট দিলেন, ইহাতে সে খুশী হইল কিনা বুঝিতে পারিলাম না—নিঃশব্দে, সন্দিগ্ধ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল, আমি ভাষা জানি না। কাজেই কিছু বলিয়া অভয় দানের উপায় নাই, গোপিকাবাবু নানা কথায় তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতে বলিলেন। সে নিতান্ত অনিচ্ছায় আমাদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আস্তে আস্তে ধান বুনিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু আমি যেই ক্যামেরাটি বাহির করিলাম অমনি সে সব ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া জুমের পার্শ্বে একটি বৃহৎ পাথরের আড়ালে লুকাইল। ছুটিতে ছুটিতে রাগতস্বরে তাহার মাতৃভাষায় যাহা বলিয়া গেল তাহার মর্ম্মার্থ নাকি এই যে—প্রথমেই নাকি সে বুঝিয়াছিল আমাদের এরূপই কোন বদ উদ্দেশ্য আছে।

আমাদের অনেক ডাকাডাকিতেও সে আর বাহিরে আসিল না। কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে আরও কয়েকটি চুরুট জুমের পাশে রাখিয়া দিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ পরেই আমরা তেজু উপত্যকার দুই পার্শ্বস্থ পর্ব্বতমালার মিলন ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিন-দিকে পর্ব্বত ও একদিকে 'তেজু' নদীর প্রবাহ গতিমুখে উপত্যকাভূমি নামিয়া গিয়াছে—বড়ই মনোরম এই স্থানটি, ক্ষীণকায়া তেজুর জল অসংখ্য ছোট বড় পাথরের গায়ে ধাক্কা খাইয়া চারিদিকে শুভ্রবর্ণের ফুল ছিটাইয়া এখান হইতে নিম্ন-ভূমিতে নামিয়া যাইতেছে। দুই তিনটি গাছের তৈয়ারী একটি ক্ষুদ্র সাঁকো দ্বারা এখানে তেজুর দুই তীর সংলগ্ন করা হইয়াছে, শুনিলাম যত মজবুত করিয়াই সেতু প্রস্তুত করা হউক না কেন বৎসরে অন্তত কুড়ি-পঁচিশবার বর্ষাদিনের পাগলাস্রোত ইহাকে ধুইয়া মুছিয়া অদৃশ্য করিবেই, তাই এখানকার এই অস্থায়ী ব্যবস্থা।

তেজু নদী অতিক্রম করিয়া রাস্তা আরও সরু আরও দুর্গম হইয়া চলিয়াছে। কোথাও ভূপতিত বৃহৎ বৃক্ষের নীচের গর্ত্তপথে কোথাও পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিয়া ফিরিয়া রাস্তা পর্ব্বতের উপর উঠিয়া গিয়াছে। সে পথের আরম্ভটুকু চক্ষেই দেখিলাম, আরোহণ করার সৌভাগ্য আমার হইল না। ছাড়পত্রে তেজু নদী পর্য্যন্তই আমার গতির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমি নদী অতিক্রম করিয়া অপর তীরের পর্ব্বতমূলে একটি পাথরের উপর গিয়া বসিলাম। বিকালবেলার স্নিগ্ধ হাওয়া যেন একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সাড়া বহিয়া আনিতেছিল, আমি তন্ময়চিত্তে প্রকৃতি দেবীর এই নির্জ্জন ক্রোড়ে বসিয়া তাহারই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম কিন্তু বেশী সময় বসা হইল না, আবার আস্তানায় ফিরিতে হইবে। গোপিকাবাবুর আহ্বানে নিতান্ত অনিচ্ছায় এই শান্তির আলয়টি ছাড়িয়া গৃহের পানে চলিলাম।

উৎসাহ উদ্যমে এতক্ষণ পথের দূরত্ব মোটেই বুঝিতে পারি নাই, এবার ফিরিবার পথে মনে হইতেছিল যেন কত দেশ দেশান্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলাম, রাস্তা ফুরাইতে চাহে না। প্রতিবারই মনে হইতে লাগিল এই বাঁকটি শেষ হইলেই বুঝি ক্যাম্প দেখিতে পাইব, শেষে ক্যাম্প দেখা দিয়াও যখন বারবার 'লুকোচুরি' খেলিতে লাগিল তখন আমাদের অজ্ঞাতে একেবারে সন্ধ্যার আঁধার আসিয়া চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিল। তারপর দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করিয়া যখন গৃহে পৌঁছিলাম তখন বেশ রাত্রি হইয়া গিয়াছে।

পরদিন আবার মিশমি বস্তীর উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম। এই দিনটিই আমার শেষ দিন, আমি মিশমি পাহাড়ে মাত্র তিন দিন বাসের অনুমতি পাইয়াছিলাম। ভোরবেলাই বাহির হইলাম, এ বেলায় নাকি মিশমিদের অধিকাংশই গৃহে থাকে। ক্যাম্প হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে পাঁচখানি ঘরের একটি পাড়ায় গিয়া উঠিলাম, তখন ঘরের সম্মুখে প্রভাতের সূর্য্যালোকে বসিয়া কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষ রৌদ্র পোহাইতেছিল। আমাদিগকে দেখিয়া স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা ছুটিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিল, শুধু কয়েকটি বয়স্ক পুরুষ স্থানত্যাগ করিল না। ইহারাও গোপিকাবাবুর পরিচিত, তাঁহার সহিত মিশমিদের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শুনিলাম আমাকে সকলে না দেখিলেও চিদাং বস্তীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট এ খবরটি পৌঁছিয়া গিয়াছে যে, ভীষণ ফটো তোলার যন্ত্রসহ পাহাড়ে একটি নূতন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সে লোকটি যে আমি তাহা আমাকে দেখিয়াই সকলে বুঝিতে পারিয়াছে।

সেদিন ইচ্ছা করিয়াই ক্যামেরাটি সঙ্গে নেই নাই। তাহাদেরও খবরটি জানাইয়া বলিলাম—আজ তাহারা স্বচ্ছন্দে আমাদের সহিত মিশিতে পারে, কিন্তু ইহাতেও বিশেষ ফল

হইল না। অসীম সাহসী পুরুষ কয়েকটির সঙ্গেই আমাদের কথাবার্ত্তা চলিল। ফটো তোলায় তাহাদের আপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—মিশমিদের মতে জীবিত মানুষের অন্য একটি প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিলে মানবস্রষ্টা দেবতা রাগ করেন, তাই যাহার প্রতিকৃতি লওয়া হয় দেবতার কোপে পড়িয়া সত্বরই তাহাকে এ-জগৎ হইতে বিদায় লইতে হয়। যুক্তিটি যেমনই হউক, জগতের জীব মাত্রই যখন মৃত্যুভয়ে ভীত, তখন এই মিশমি জাতি ক্যামেরাকে ভয় করিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। শুনিলাম এই জংলী মানব সমাজটি সভ্য জগতের সব বিষয়ে অজ্ঞ হইলেও আসামের প্রমোদ ভ্রমণ বিলাসী সাহেব-মেমদের কল্যাণে ইহাদের শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলে ক্যামেরা জিনিষটিকে ভালরূপেই চিনে।

সমগ্র পাড়াটি আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম। আস্তে আস্তে পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ এবং বালক-বালিকাও দুই একটি আসিয়া জুটিল, তবে দুই একজন বৃদ্ধ ছাড়া অন্য কেহই কথাবার্ত্তা বড় একটা বলিল না। গ্রামের লোকগুলি আমাদের নিকট হইতে একটু ব্যবধানে থাকিয়া নিতান্ত আড়ষ্টভাবে চলাফিরা করিতে লাগিল। আমার মনে হইল, আমি পাহাড়ে বসিয়া পাহাড়ীদের যে মূর্ত্তি দেখিতে আসিয়াছিলাম তাহা বুঝি দেখা হইল না, এ যেন নিতান্ত কৃত্রিম, নিতান্ত প্রাণহীন। আমরা সঙ্গে সিগারেট লইয়াছিলাম সকলকেই দিলাম, ইহাতে ক্ষণিকের জন্য তাহাদের মুখে একটু আনন্দের রেখা দেখিতে পাইলাম মাত্র।

পরে অনুসন্ধানে অবশ্য জানিতে পারিলাম যে, এ জাতিটির প্রকৃতিই এইরূপ, বড়ই কোণঠেসা এবং পর্দ্দার বালাই না থাকিলেও মেয়েরা অত্যন্ত লাজুক ও ভীরু, পুরুষগুলি আবার অত্যন্ত অলস, মেয়েরাই পরিশ্রম করিয়া ক্ষেতের ফসল ও পরিধেয় কাপড় উৎপন্ন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করে, এমন কি স্বামীর আফিং-এর খরচ পর্য্যন্ত যোগাইয়া থাকে, আর পুরুষদের এক একজনে দুই তিনটি বিবাহ করিয়া স্ত্রীদের উপর সংসারের ভার ছাড়িয়া দেয়, নিজেরা আফিং-এর নেশায় মশগুল হইয়া অলসভাবে দিন গুজরান করিয়া যায়।

বেলা প্রায় বারটায় আমরা ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিলাম। বিকালবেলা আর বাহিরে যাওয়া হইল না, ডেনিং বাসের শেষ দিন—প্রবাসী তথা বনবাসী বাঙালী পরিবার দুইটির সহিত শেষ মেলামেশায়ই সারা বিকাল কাটিয়া গেল, এমন স্থানে চাকুরী উপলক্ষে যাহারা দীর্ঘদিন বাস করেন তাহাদের নিকট ক্বচিৎ দুই-একজন স্বজাতীয়ের আবির্ভাব যে কিরূপ আনন্দদায়ক হয় তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে অনুমান করিয়া উঠা কঠিন।

আমার মিশমি পাহাড় ভ্রমণের পরম সহায় অগ্রজতুল্য শ্রীযুত গোপিকারঞ্জন পুরকায়স্থ মহাশয় লোহিত ভেলি রাস্তা নির্ম্মাণের সূচনাদিন হইতে আজ কুড়ি একুশ বৎসর যাবৎ পি ডবলিউ ডি'র কাজে এই নির্জ্জন পথের বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ডেনিং ক্যাম্পেও নাকি প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ সপরিবারে আছেন, এর মধ্যে ক্যাম্পের অধিবাসী কয়েকজন ভিন্ন অন্য বাঙালীর চেহারা অতি অল্পই তাঁহাদের চোখে পড়িয়াছে, তাই মাত্র তিনদিন বাসেই এই ক্ষুদ্র বনবাসী পরিবারটির সহিত এতই জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম যে, মিশমি পাহাড়ে আরোহণের সময় মনে যেরূপ আনন্দ ও উৎসাহ ছিল বিদায়ের বেলা তাহার কণামাত্র খুঁজিয়া পাইলাম না, একটা ব্যথার বোঝা বহিয়া লইয়া চলিলাম।

পরদিন ভোরবেলায়ই ডেনিং ত্যাগ করিবার কথা ছিল, কিন্তু কাজের বেলা আর তাহা হইয়া উঠিল না। শয্যাত্যাগ করিলাম সকলেই খুব ভোরে সত্য কিন্তু ষোড়শ উপচারে প্রাতর্ভোজনের ঘটায় এবং বন্ধু-বান্ধবীদের নানা অজুহাতে বাহির হইতে অনেক দেরী হইয়া গেল।

বেলা প্রায় নয়টায় প্রকৃতি দেবীর এই মনোরম গোপন কক্ষটি ছাড়িয়া আবার সদিয়ার পথে রওয়ানা হইলাম। গোপিকাবাবু ও তাহার কন্যা দুইটি আমার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পের বাহিরে কিছুদূর পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইলেন। ঢালু রাস্তায় দ্রুতগতি সাইকেল বাঁকের মুখে মুহূর্ত্তেই আমাদের পরস্পরকে দৃষ্টির অন্তরালে লইয়া গেল।

এবার সাইকেল তীরবেগে ছুটিয়া অতি অল্প সময়েই দশ বার মাইল রাস্তা অতিক্রম করিল, এ রাস্তাটুকুর মধ্যে প্যাডেল ঘুরাইবার প্রয়োজন মোটেই হইল না, তবে প্রতি মুহূর্ত্তেই আঁকা-বাঁকা ঢালু রাস্তার পার্শ্বস্থ গভীর খাতে ছিট্‌কাইয়া পড়িবার জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছিল। পরবর্ত্তী রাস্তাও প্রায় সমস্তটাই ক্রমশ নামিয়া আসিয়াছে, এবার অনায়াসেই পাঁচ ঘণ্টা সাইকেল চালাইয়া বেলা দুইটায় সদিয়া আসিয়া পেঁৗছিলাম।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিয়া সুধীর অস্থির হইয়া উঠিল। এ তাহার কি হইল, কেনই বা হইল? কোথায় কিভাবে সে পড়িয়া আছে, তাহাও সে বুঝিতে পারিতেছিল না। মাথার কাছে কে একজন বসিয়া আছে মনে হওয়ায় আস্তে আস্তে সে বলিল, আমি কোথায়?

একটি মেয়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, হেথায় বাবু, আমাদের ঘরে।

'আমাদের ঘরে' বলিলে কিছুই বোঝা যায় না—সুধীরও বুঝিতে পারিল না। এতটুকু নড়িবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না, শুইয়া শুইয়াই যতদূর সম্ভব সে তাহার দৃষ্টি প্রসারিত করিল। কিন্তু কিছুই যেন পরিচিত নয়—ওই যে বাঁশের আলনার উপর শাড়ী প্রভৃতি টাঙান রহিয়াছে, কুলুঙ্গীর ভিতর ওই যে বাঁশী দুইটা সে কোনদিনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। অথচ জানিবার আগ্রহও তাহার কম নয়, কেমন করিয়া এমনি অপরিচিত স্থানে সে আসিয়া পড়িতে পারে।

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি? কাদের বাড়ী?

মেয়েটি তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, আমি বাবু, আমাদের বাড়ী।

তাহার কালো মুখের কালো চোখের দিকে চাহিয়া সুধীর কি যেন ভাবিবার চেষ্টা করিল। কে এ? ইহাকে কোথায় দেখিয়াছে কি? কালো পাথরে খোদাই করা ওই চমৎকার মুখের পানে বিস্মিত দৃষ্টি লইয়া সুধীর চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি কি যেন একটু ভাবিয়া বলিল, একটু খাবে বাবু?

সুধীর বলিল, না, কিন্তু কি করে আমি এখানে এসেছি।

মেয়েটির মুখে হাসি খেলিয়া গেল, বলিল, না খেলে সে সব শুনতে পাবে না।

সুধীরকে এক বাটী দুধ পান করিতেই হইল।

মেয়েটি বলিল, রাতে বাবুদের বাড়ী থেকে কাজ ক'রে ফেরবার সময় তোমাকে প'ড়ে থাকতে দেখি একটা ঝোপের মধ্যে—মাথা ফেটে রক্ত বেরচ্ছে। একলা নিয়ে যেতে পারব না দেখে মঙ্গরুকে ডেকে নিয়ে তোমাকে আমরা নিয়ে আসি, সে আজ দুদিনের কথা।—আচ্ছা খুব রস খেয়েছিলে বুঝি বাবু? মঙ্গরু বলে—পাহাড়ী রস বাবুদের হজম হয় না।

সুধীরের মাথা পরিষ্কার হইয়া গেল। ঠিক সমস্ত মনে পড়িতেছে এখন। কিন্তু অলকা? তাহার কি হইল—আজ দুইদিন তেমনিভাবে সে কি একলা পড়িয়া আছে? কিন্তু কোথায়ই বা আছে আর আছেই যদি তাহারই জন্য ব্যস্ত হইয়া তাহার অন্বেষণ করিতেছে কি? আর যদি—সে আর কিছু ভাবিতে পারে না, পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার তাহার চোখের উপর নামিয়া আসে—হয়ত বা আবার তাহাকে জ্ঞান হারাইতে হইবে।

এমনি সময় সুগঠিত দেহ বলিষ্ঠ একটি যুবক ঘরে প্রবেশ করিল। মেয়েটি বলিল, বাবুর ঘুম ভেঙ্গেছে মঙ্গরু।

লোকটা সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, সুন্দর চকচকে শাদা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, দুধ খাইয়ে দিয়েছিস ত?

'সে কথা কি বলতে হবে রে?' মেয়েটি সুন্দরভাবে হাসিয়া উঠিল।

কোন কথাই সুধীরের কানে আসিতেছিল না। এমনি সুগঠিত সুন্দর দেহ তাহার হইল না কেন? এমনি করিয়া সহজ-সরল হাসি তাহার মনের সমস্ত কিছুই ভাসাইয়া লইতে পারে না কি?

'কিন্তু কত রস খেয়েছিলে বাবু, মঙ্গরু বলে এক ভাঁড়।' মেয়েটি সুধীরের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল।—

'রস আমি খাইনি, কে যেন মেরেছিল আমার মাথায়।' অতিকষ্টে সুধীর উত্তর করিল। কালো পাথরে খোদা যুবকের সমস্ত শরীর ফুলিয়া উঠিল, বলিল, লাঠি? কার লাঠি বাবু, কারা তারা? ঘরের কোণ হইতে শক্ত একগাছা লাঠি লইয়া সে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

অতিকষ্টেও সুধীরের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। চোখের দৃষ্টি কোমল হইল, দুই-এক ফোঁটা জলও হয়ত গড়াইয়া পড়িল—কি বলিবার চেষ্টা করিয়াও সে বলিতে পারিল না, ঠোঁট কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।—

'তুই বস্ টুমনী, আমি চলি।' যুবক বাহির হইয়া গেল।

'কোথায় যাবে?' আস্তে আস্তে সুধীর জিজ্ঞাসা করিল।

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া যুবক বলিল, সেই যারা—!

তেমনি হাসি হাসিয়াই সুধীর বলিল, তাদের তুমিও চেন না, আমিও চিনি না। আর সে যে দুদিন আগেকার কথা।

যুবক কথাটা বুঝিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু তাই ব'লে অমন ক'রে মাথা ফাটিয়ে দেবে?

না হাসিয়া সুধীর কি করিতে পারে? মানুষ এত সরল অবুঝ হয় কেমন করিয়া? বলিল, কি ক'রতে পার তুমি?

'তাদের খুঁজে বার করতেই হবে।' মঙ্গরু জোর দিয়া বলিল।

সুধীর বলিল, তার চেয়ে আর একটা কাজ ক'রতে পার মঙ্গরু? একটি মেয়ের খোঁজ এনে দিতে পার? সে কোথায় আছে, এমন কি অন্য কারও বাড়ীতে?

মঙ্গরু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মেয়েটিও ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল।

সুধীর আস্তে আস্তে সমস্ত কিছুই বলিয়া চলিল।

ট্রেন হইতে নামিয়া স্ত্রীকে ষ্টেসনেই বসাইয়া রাখিয়া গাড়ীর খোঁজে বাহির হইয়া কিছুদূর আগাইয়া আসিয়া সে যখন একটা ঝোপের পাশ দিয়া চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ কেমন করিয়া যে কি ঘটিয়া গেল, তাহা সে ঠিক বুঝিতেও পারে নাই। মাথায় আঘাত লাগায় সে পড়িয়া যায়—কাহারা যেন তাহার হাত হইতে বাক্সটা টানিয়া লয়, কিন্তু আর কিছুই সে জানে না,—জানিবার শক্তিও তাহার ছিল না।

শুনিতে শুনিতে ক্রোধে মঙ্গরুর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কি যে করিবে, সে তাহা ভাবিতেও পারিল না। তাহার একটা হাত হাতের মধ্যে লইয়া সুধীর বলিল, শুধু রেগে উঠ্‌লেই ত' চ'লবে না মঙ্গরু এ কাজটা তোমায় ক'রতেই হবে।

মেয়েটি বলিল, আমিও খোঁজ ক'রব বাবু, যে বাবুদের বাড়ীতে কাজ করি, সে বাড়ীতে অনেকে বেড়াতে আসে। আমি ঠিক জান্‌তে পারব বাবু।

উহারা দুইজনেই খোঁজ করিবে ঠিক হইয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুধীর যেন কতকটা শান্ত হইল।

সন্ধ্যার সময় সাঁওতাল যুবক-যুবতী দরজার বাহিরে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বাঁশী বাজাইতে থাকে। সে তন্ময় হইয়া শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়ে। সে বাঁশী যেন তাহাদের দুইটি মনকে এক করিয়া বাঁধিয়া ফেলে, কোন কথা না কহিয়াও তাহারা যেন পরস্পরের সহিত মিশিয়া যায়—শুনিতে শুনিতে সুধীরের মন যেন কোথায় ঘুরিয়া মরে। কি যেন ছিল, কি যেন হারাইয়াছে—চক্ষু মেলিয়া দেখা যায়, চক্ষু বুজিয়া ভাবা যায়, কিন্তু হাত বাড়াইয়া ধরা যায় না। সুধীর অস্থির হইয়া ওঠে, বুকের উপর নিজের দুই হাত চাপিয়া কি যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে ঘুমাইয়া পড়ে। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে—কে যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে, সে ছুটিয়া চলে পিছু পিছু, কাছে-দূরে কোথাও সে নাই—হঠাৎ দেখা যায় তার মুখ—অলকা! ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, কোথাও কাহাকে দেখা যায় না, মঙ্গরুর বাঁশী তখনও যেন কাহাকে ডাকিয়া চলিয়াছে, আর তাহারই কোলে মাথা রাখিয়া সেই মেয়েটি অপলক-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে তাহার মুখের দিকে। তাহাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া যায়, তবুও না চাহিয়া সে পারে না।

এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। কোন খবরই আজ পর্য্যন্ত সে পায় নাই, আর পাইবে বলিয়া আশাও সে করে না। তাহার দুঃখে উহারা সহানুভূতি জানায়, হয়ত বা সকলেই জানাইবে, কিন্তু সময় তাহাকে গ্রাহ্য করে না। দিন বসিয়া থাকিতে পারে না, আগাইয়া চলে। কত যে দীর্ঘ-শ্বাস তাহার বুকের মধ্যে জমা হইয়া উঠিল, কত যে বাহির হইয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু নাই বলিয়াই যে সব কিছু মিলিয়া যাইবে, তাহাও ত হইতে পারে না। সুধীর অস্থির হইয়া পড়িল, কিন্তু কিছুই করিবার শক্তি তাহার ছিল না বলিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকা ছাড়া কোন উপায়ই তাহার রহিল না।

আরও দিন সাতেক কাটিয়া গেল। সে সুস্থ হইয়া উঠিল, কিন্তু স্বাস্থ্য তখনও ফিরিয়া পাইল না। আর দেরী করিতেও ইচ্ছা হইতেছিল না বলিয়া সে উহাদের কাছে বিদায় লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। মেয়েটি তাহাকে ছাড়িতে চাহে নাই, যুবকও ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত স্নেহ-বন্ধনই ছিন্ন করিয়া তাহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। নিজেই একটু খবর লইবে, হয়ত বা ভোরে যাহারা স্বাস্থ্যলাভের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদেরই মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে—কিন্তু আশা তাহার সফল হইল না। কোথাও তাহার দেখা মিলিল না, খবর মিলিবে বলিয়াও মনে হইল না। পথেই উপেনবাবুর সহিত তাহার আলাপ হইল—তাঁহারই বাড়ীতে আসিয়া দশটা টাকা ধার লইয়া সে কলিকাতার পথে রওনা হইয়া গেল।

হাওড়া ষ্টেসনে নামিয়াই তাহার চক্ষু যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঠিক ওই জায়গায়ই আজ কয়েকদিন আগে নব-বধূকে লইয়া সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ঠিক ওইখানে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা কহিয়াছিল হয়ত বা তাহাদের পায়ের ধূলো আজিও সেখানে পড়িয়া আছে—হয়ত বা আজিও তাহার স্পর্শ পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু আসল যা তাহা ত কোথাও নাই, নকল সব কিছুই আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে—চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া উঠিল, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সে আগাইয়া গেল।

দেশ হইতে কিছু টাকা আনাইয়া উপেনবাবুর ঋণ পরিশোধ করিয়া সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে, তাহার হাতে আর কোন কাজই নাই। কি যে করিবে, তাহা সে ভাবিয়াও পাইল না। চুপ-চাপ ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিয়া দিন যেন আর কাটে না, অথচ বাহিরে যাইয়া লোকের ভীড় দেখিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না।

মেসের জগদীশ বলিল, অমন মনমরা হ'য়ে আছেন কেন? আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই শুধু এই ভেবে যে জোয়ান বয়সে মানুষ এমনি ক'রে চুপ ক'রে থাকে কি ক'রে? কি হ'য়েছে কি আপনার?

কোন কিছুই সে বলিতে পারিল না, শুধু হতাশভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া জগদীশ বলিল, চলুন খানিক গান শুনে আসা যাক্। গান জিনিষটা মনের সমস্ত কিছু দুর্ব্বলতা সরিয়ে দেয়, তা জানেন ত?

'ও দুর্ব্বলতা আমার থাকলেই ভাল।' সুধীর তাহার চোখের দিকে চাহিয়া বলিল। এক টুক্‌রা হাসি দাঁতের পাশ দিয়া অতি সন্তর্পণে বাহির করিয়া জগদীশ বলিল, আচ্ছা তা সে দুর্ব্বলতা না হয় পরে আবার ঠিক ক'রে নেবেন, এখন উঠুন, শুনলে বুঝতে পারবেন সত্যিকার দাম তার কত।

কি ভাবিয়া সুধীর বলিল, কোথায় কতদূর যেতে হবে?

তেমনিভাবেই সে বলিল, সে ভাবনা আপনার কেন? আমি নিয়ে যাচ্ছি চলুন একবার না হয় আত্মসমর্পণই ক'রলেন, বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, আসুন।

সুধীর উঠিয়া বসিল মনের অবস্থা তাহার ভাল নয়, জামা হাতে লইয়া কি যেন সে ভাবিতে লাগিল।

জগদীশ তাড়া দিয়া বলিল, আপনি ত' কম নন, জামা হাতে নিয়েও ভাবতে পারেন দেখছি। যুবক হ'লেও সত্যিকার যুবক ব'লে মনে হয় না আপনাকে। কাজ ক'রতে আরম্ভ করবার আগেই এত চিন্তিত হওয়া যৌবনের ধর্ম্ম নয়। যদি অসুবিধা হয়, ভাল না লাগে চ'লে আসবেন, বাধা দেবে না কেউ।

আর এতটুকুও ইতস্তত না করিয়া সুধীর তাহার সহিত গাড়ীতে গিয়া উঠিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। কয়েকটা রাস্তা পার হইয়া একটা মাঝারি গোছের রাস্তা ধরিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। গ্যাসের আলোগুলি জ্বলিতেছিল আর তাহাদেরই আলোয় পথিপার্শ্বের বাড়ীগুলির দরজার সম্মুখে সজ্জিতা নারীদের দেখা যাইতেছিল, কেহ বা গল্প করিতেছে, কেহ বা গান গাহিতেছে, কেহ বা অকারণেই হাসিতেছে। দূরে কোন এক গৃহের কোন এক কক্ষ হইতে হারমোনিয়ামের আওয়াজের সাথে বেতালা গান শোনা যাইতেছিল। অন্যমনস্ক সুধীরের কান সেদিকে ছিল না, চক্ষুও বোধ করি কোন অদৃশ্য জিনিষ দেখিবার জন্য আকুল আগ্রহে কোন্ এক অদৃশ্য জগতে চলিয়া গিয়াছিল। তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া জগদীশ গাড়ী থামাইতে বলিল।

হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইয়া লইয়া সিঁড়ি বাহিয়া সে উপরে উঠিয়া আসিল। একটি ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল, আসুন ভেতরে, এ আমার ঘর ব'ললেও হয়, কোন কিছু দেখেই আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন না যেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে দেখিতে পাইল, সিগারেট হাতে একটি যুবতী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সোফার উপর শুইয়া আছে। তাহার চমক ভাঙিয়া গেল—অলকা ভাসিয়া আসিল চক্ষের সম্মুখে। বুঝিবার শক্তি তাহার যথেষ্টই আছে, এতক্ষণ যে কেন সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই, তাহা ভাবিয়াই তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। অলকা, তাহারই অলকা হয়ত আজিও তাহার জন্য চক্ষু চাহিয়া আছে, পথের দিকে চাহিয়া দিন গুনিয়াও হয়ত আজিও সে হতাশ হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু তাহার সম্মুখে ওই যে একজন বসিয়া সেও ত নারী, কিন্তু নারীর নারীত্ব কতটুকু তাহাতে আছে? হঠাৎ কে যেন তাহাকে সজোরে ধাক্কা দিল—কোন্ অদৃশ্য জগৎ হইতে একটা অগ্নিকণা ছিট্‌কাইয়া আসিয়া যেন তাহাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পিছনে ভাসিয়া আসিল কাহাদের তীব্র হাসি—তাহার চতুর্দ্দিকেই সে হাসির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইল। দুই হাতে কান চাপিয়া ধরিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

মেসে ফিরিয়া কাহারও সহিত তাহার দেখা হইল না, সে ইচ্ছাও তাহার ছিল না—সোজা বিছানার উপর নিজেকে এলাইয়া দিয়া সে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিল। পাশের চৌকির দিকে চাহিয়াই মন তাহার কাঁপিয়া উঠিল। হয়ত ঘণ্টা-কয়েক পরেই জগদীশ ফিরিয়া আসিবে, হয়ত তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিবে—সেই হাসির কথা মনে হইবামাত্র রক্ত তাহার জল হইয়া যাইতে চাহিল। আর কোন কিছুই না ভাবিয়া সেই রাত্রেই দেশে যাইবার জন্য সে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন বাবু এ সময়?

সুধীর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি একটু ভাবিয়া বলিল, একটু দেশে যাব রে, হয়ত আর আসব না, এই টাকা কটা নে—ছেলেকে খাওয়াস্ আর একটা গাড়ী ডেকে দে শীগ্‌গির, এখনি না বেরোলে দেরী হ'য়ে যাবে।

সেই দিনের ট্রেনেই সুধীর দেশে রওনা হইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। (ক্রমশ)

ভৈরব

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভৈরব, ঝড়ের রাতে ছাদ-নিম্ন হ'তে
বাতায়ন-কাচ-পথে দেখিয়াছিলাম
তোমার মহদ্ ভয় উদ্যত বিদ্যুতে,
উচ্চ শয্যা পরে লভিয়া বিশ্রাম,
নীচে ফেনোদ্‌বামী সিন্ধু ছিল গর্জ্জমান,
দিগন্তের অট্টহাস্যে পৈশাচ বিদ্রূপ
হেনেছিল নভোবক্ষে বান খরশান;
নরকের মসী ঢাকে অমৃতের রূপ।

আজকে নিয়েছ ছাদ—বিছানা কোথায়!
শিল্পের মসলা আর নহে সিন্ধু-ফেন

সকল অস্তিত্ব মম প্রমাথিয়া ধায়
রৌরব-পালানো কোন্ দৈত্যকুল যেন

হে রুদ্র, দক্ষিণ মুখ লুকায়ো না আর
অথবা, সময় আজো হয়নি আমার?

দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল ১৯১৩ সালে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ না হ'তেই এ জগৎ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। এই স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যে সরকারী চাকুরী ক'রে তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে যে ঐশ্বর্য্য দান ক'রে গিয়েছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। দ্বিজেন্দ্রলাল যদিচ বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে কালের বিচারে আজও সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছেন, তবুও কেহ কেহ বলেন যে, তাঁর নাটক জগতের শ্রেষ্ঠ নাটক ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে না, কিন্তু সম্প্রতি বিলাতে ও এডিনবরাতে মেবার পতনের ইংরেজী অনুবাদ করে দ্বিজেন্দ্রলালের জনকয়েক ভক্ত সাহেব মেমদের সাহায্য নিয়ে অভিনয় করাতে ও অদ্ভুত সাফল্যলাভের পর বিলাতী কাগজে যে সব মতামত প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু কিছু 'অমৃতবাজারে' প্রকাশিত হবার পর বোধ হয় তাঁদের সে ভুল অনেকটা গিয়েছে। বিলাতের সমালোচকরা বলেছেন, ভারতবর্ষে যে এত বড় নাট্যকার জন্মেছেন এই রবীন্দ্রনাথের যুগে তা এঁরা জানতেন না। শুধু তাই নয়, আরও বলেছেন যে, টেকনিকের দিক থেকে, চরিত্র বিকাশের দিক থেকে, ক্লাইমাক্স এ্যান্টি ক্লাইমাক্স-এর দিক থেকে, হিউমার, পেথস্-এর দিক থেকে ও গানের ঐশ্বর্য্যের দিক থেকে ইউরোপে এত পারফেক্ট নাটক তাঁরা দেখতে পান না—তাঁরা বিলাত থেকে দিলীপকুমারের কাছে চন্দ্রগুপ্ত ও সাজাহান চেয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু নাটক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য নিয়ে আলোচনা করব। দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা—একে শুধু কাব্য বললে ভুল করা হবে, এটা নাট্য কাব্য। দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে নাটকীয় প্রতিভা কবি প্রতিভার সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে মেশান ছিল যে, সীতা কাব্য হলেও তা অতি সাফল্যের সঙ্গে যে অভিনয় করা যায়, তা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে বেশ ভালভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। সীতা যে নাট্য-কাব্য, ঠিক পাষাণী বা তারাবাঈ-এর মতন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। নাটকের প্রধান গুণ (১) ঘটনার ঐক্য, (২) ঘটনার সার্থকতা, (৩) ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত গতি, (৪) কবিত্ব (৫) চরিত্র-চিত্রণ, (৬) স্বাভাবিকতা। এই সব গুণই সীতা নাটকে সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়েছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

এ নাট্য-কাব্যখানি প্রথমে দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতৃদ্বয় ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও মদীয় পিতৃদেব ৺হরেন্দ্রলাল রায়ের সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'নবপ্রভা'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। সেই সময় অনেক পত্রিকাতে এই নাট্য-কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল নীরব ছিলেন। কিন্তু প্রতিকূল সমালোচনা যা প্রকাশিত হয়েছিল, তার উত্তর কবি নিজেই যা দিয়েছিলেন তার খানিক উদ্ধৃত হোল—দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন,—"একজন সুধী সমালোচক কহিয়াছিলেন যে, আমি সীতা চরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া রামের চরিত্র মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছি—আমার বিশ্বাস, আমি তাহা করি নাই...মহর্ষি বাল্মীকির প্রতি আমার ভক্তি আছে। কিন্তু তাঁহার পরে পৃথিবীর সভ্যতা আরও অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্বে সব দেশেই স্ত্রী জাতির অবস্থা ও পদবী হীন ছিল। ভারতবর্ষে...স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হইলেও সম্পত্তি মাত্র রূপে গণ্য ছিল—তাই যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাশা খেলায় বাজী রাখিলেন। শ্রীরামচন্দ্র শুদ্ধ নির্ব্বাসনে নয়, সীতার উদ্ধার সাধন করিয়াই সীতাকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা প্রসঙ্গচ্ছলে উচ্চারণ করিতেও কষ্ট বোধ হয়...সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা সুন্দর, চমৎকার। আমি তাহা অক্ষুন্ন রাখিয়াছি আশা করি।

"আমি স্বীকার করি যে, রাম কর্ত্তৃক শূদ্রক রাজার শিরশ্ছেদ আমার কাব্যে একটি গর্হিত কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। আমি সে অংশ চিত্রিত করিয়া সে দোষ ক্ষালন করিতে বা তাহার কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করি নাই. ....

"কিন্তু আমি এ ব্যবহারের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে দোষী না করিয়া তাঁহার গুরুদেব বশিষ্ঠকে দোষী করিয়াছি এবং মহর্ষি বাল্মীকির কাছে বশিষ্ঠের পরাজয়ে বশিষ্ঠের মত ভ্রান্ত এই মাত্র কল্পনা করিয়াছি। তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য ও উদার হৃদয়কে ক্ষুন্ন করিতে চেষ্টা করি নাই।

"আমি বনবাস আখ্যান সম্বন্ধে ভবভূতির পদানুসরণ করিয়াছি। এইরূপ করায় আমার বিবেচনায় রামের চরিত্র বাল্মীকির চিত্রিত চরিত্র হইতে হীন না হইয়া মহৎই হইয়াছে"—

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার যে বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য ছিল তা তাঁর হাসির গান, জাতীয় সঙ্গীত, আষাঢ়ে, মন্দ্র ও নাটকাবলীতে বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা যায়। এই স্বাতন্ত্র্য কবিতাতে তিনি খুবই দেখিয়ে গিয়েছেন—রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্মে কবি সম্রাটের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর ওপর রেখাপাত করেনি। এক দেবেন্দ্রনাথ সেন ব্যতীত বোধ হয় সে যুগে অন্য কবির নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা কঠিন হবে। এ বৈশিষ্ট্যের ছাপ তাঁহার সৃষ্ট পৌরাণিক চরিত্রতেও পড়েছে। যে সব পৌরাণিক চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন, তাদের মহত্ত্ব তিনি অস্বীকার করেননি বটে, কিন্তু সে সমস্ত চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি যুক্তি বা কল্পনার সাহায্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করেছেন। সে সমস্ত চরিত্র সম্বন্ধে তিনি প্রচলিত মতামত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেননি। প্রত্যেক চরিত্রের মূল ভিত্তি কি, সে সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ থেকে অনুসন্ধান করে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে যেরূপ বুঝেছিলেন, কাব্য ও নাটকে সেই রকম ছবি এঁকেছেন।

শুধু সীতা নয়, পাষাণী নাটকে অহল্যার চরিত্র চিত্রণে এ ভাবটি সম্যক পরিস্ফুট হয়েছে। অহল্যার চরিত্র সম্বন্ধেও তিনি প্রচলিত মতামত বা বিশ্বাসের উপর কোন রকম নির্ভর না করে একেবারে মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণকে অনুসরণ করেছেন।

সীতা নাটকে রামচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কনেও দ্বিজেন্দ্রলাল এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। রামচন্দ্রের দেবত্ব ও মহত্ত্ব দ্বিজেন্দ্রলাল উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু বাল্মীকির রচনায় এ চরিত্রে কলঙ্কও স্থান পেয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই জন্য কলঙ্কের কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং বর্ত্তমান কালের

আদর্শে যতদূর সম্ভব সে কলঙ্ক দূর করতে যত্নবান হয়েছেন।

সীতা বিসর্জন রামচন্দ্রের এক মহাকলঙ্ক—কিন্তু প্রজানুরঞ্জন রাজার কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্যের অনুরোধে রামচন্দ্রকে কলঙ্ক স্বীকার করতে হয়েছে। সীতা নির্ব্বাসন ব্যাপারে বাল্মীকির রামচন্দ্র হৃদয়হীন নৃশংসরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই হৃদয়হীনতা আদর্শ চরিত্রের বিরোধী বলে মহাকবি ভবভূতিকে অনুসরণ করেছেন ও ভবভূতির ন্যায়ই রামচন্দ্রের অন্তর্বিরোধ, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি নাটকে দেখিয়েছেন—বস্তুত দ্বিজেন্দ্রলালের সীতাতে এই অন্তর্বিরোধ নিয়েই নাটকের আরম্ভ। রাম গভীর অন্তর্দাহে বলছেন, "পুণ্যময়ী, গৃহলক্ষ্মী পতিপ্রাণা রাণী রাজলক্ষ্মী; তারে এই বক্ষ হতে টানি ছিনিয়া লইতে চাসরে অযোধ্যাবাসী—অলক্ষ্মী, অসতী সীতা—হায় অবিশ্বাসী পৌরজন—কি তায় দূর করে দিব আজি তাদের ইচ্ছায়?" প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এই অন্তর্বিরোধ লক্ষ্য করা যায়—যে অন্তর্দ্বন্দ্ব স্নেহে ও বংশমর্য্যাদায়, কর্ত্তব্য পালনে ও প্রেমে, শাস্ত্র পালনে ও বিবেকে।

রামচন্দ্র কর্ত্তব্য পালন করলেন সত্য, কিন্তু তাঁকে এ কর্ত্তব্য পালন করতে যথেষ্ট ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তা দ্বিজেন্দ্রলাল অতি সুন্দরভাবেই রামচন্দ্রের উক্তিতে ব্যবহারে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ফুটিয়ে তুলেছেন। রামচন্দ্রকে মনুষ্যত্বের দিক থেকে কবি রক্ষা করেছেন, ফলে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে এক অপূর্ব্ব মহিমান্বিত চরিত্র সৃষ্টিতে। এ কালের আদর্শে পৌরাণিক আদর্শের যা নিন্দনীয় ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল কৌশলের সঙ্গে তা সংশোধন করেছেন।

সীতার অনাবিল সুন্দর আদর্শ চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলাল যেরূপ ভাবে চিত্রিত করেছেন তা সত্যই অভিনব চমৎকার। সীতার চরিত্র তিনি একটু নূতন করেই এঁকেছেন। সীতার চরিত্র বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে এ কালের চোখে কবির গুণপনার সুখ্যাতি করা ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নেই।

দ্বিজেন্দ্রলাল রামায়ণের ঘটনার অপলাপ না করে সীতার আদর্শ চরিত্রকে আধুনিক রুচি বিচারের দিক দিয়ে যতখানি সম্ভব উন্নত করেছেন।

পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্ট রাম চরিত্রের কথা বলা হয়েছে—সে সম্বন্ধে আলোচনার আগে বাল্মীকির মূল রামায়ণ থেকে কিছু উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

রামায়ণম্—ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীপঞ্চানন তর্করত্নেন সম্পাদিতম্—সীতা যখন রাবণ বধের পর রামচন্দ্রের নিকট আনীত তখন রামচন্দ্র সীতাকে বলিতেছেন—(ভাবার্থ) "তোমার লোকাতীত মনোহর রূপ দেখিয়া রাবণ যে তোমাকে ক্ষমা করিয়াছে এরূপ বোধ হয় না—যে কারণে আমি তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, তাহা সফল হইয়াছে—তোমাতে আমার আর প্রয়োজন নাই, এক্ষণে লক্ষণ ভরত বা শত্রুঘ্নের নিকটে থাকিতে ইচ্ছা কর তাহাই কর বা সুগ্রীব বিভীষণকেও আত্মসমর্পণ করিতে পার—"

রামচন্দ্র ভগবানের অবতার হয়ে যে কথা বলেছিলেন, আমরা দীন ভ্রান্ত মানব হয়ে সে কথা বলতে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হই।

(মূল রামায়ণ হইতে)

সীতা উত্তরে কি বলেছেন, "নাথ যাহা আমার অধীন সে হৃদয়কে কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। হৃদয় সমভাবে আপনাতেই অনুরাগী রহিয়াছে। কিন্তু গাত্র আমার বশীভূত নহে। অতএব রক্ষক না থাকায় রাবণ তাহা স্পর্শ করিয়াছে—তাহাতে আমার অপরাধ কি? আপনি ক্রোধান্বিত হইয়া সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় আমার কেবল স্ত্রীত্বই বিবেচনা করিলেন। আমি রাজর্ষি জনকের কন্যা—যজ্ঞভূমি হইতে উৎপন্ন ইহা বিস্মৃত হইলেন।"

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক কালিদাস ভবভূতিতে সীতার এই উক্তি লক্ষ্য ক'রে লিখেছেন, "একথা ত্রি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোন নারীর মুখে শুনিতে পাইব এরূপ আশা করি নাই। ভাবিতে শরীর পুলকিত হয়ে ওঠে, রক্ত উষ্ণ হয়, বক্ষ স্ফীত হয়ে ওঠে যে, আর্য্য যুগের আমাদের দেশের এক কবি সতীত্বের এই তেজের, এই আত্মাভিমানের, এই মহিমার কল্পনা করিয়াছিলেন। প্রেমের এই অশরীরিণী বিশুদ্ধি ঐশী আধ্যাত্মিকতা আর কেহ কোন কাব্যে কল্পনা করিয়াছেন কিনা জানি না—এখানে সীতার প্রভাবে রামকে পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র দেখায়।"

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল সীতার চরিত্র উন্নত ক'রেও রামচন্দ্রের চরিত্র ম্লান হ'তে দেন নি। ভবভূতির রামচন্দ্র কৌশলে তপোবন দর্শন বাসনা পূর্ণ ক'রবার ছলে, সীতার অজ্ঞাতসারে সীতাকে ত্যাগ করেন। বাল্মীকির রামচন্দ্র সীতার সঙ্গে সেরূপ প্রতারণা করেন নি বটে কিন্তু তিনি নিজের বংশের গৌরব রক্ষা ক'রতে প্রকাশ্যভাবে সীতাকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের অসামান্য প্রতিভার যাদুদণ্ডে রামচন্দ্রকে প্রতারণা ক'রতে হয় নি বা সীতার অনিচ্ছায় তাঁকে বনে পাঠিয়ে রামচন্দ্রকে পাপ ভোগ ক'রতে হয় নি। দ্বিজেন্দ্রলালের অগাধ পাণ্ডিত্য অসামান্য নাটকীয় প্রতিভা এই দৃশ্যে বেশ ফুটে উঠেছে।

এই দৃশ্যে যখন রামকে মাতা কৌশল্যা প্রার্থনা করে সীতার নির্ব্বাসন বন্ধ ক'রলেন তখন রাম চিন্তামগ্ন—রাম ব'লছেন—

রাম—কি করেছি আমি দেখি, বুঝে দেখি।
ভাঙ্গিয়াছি সত্য।—দেখি দেখি এ কি!
করিয়াছি ভঙ্গ স্বীয় অঙ্গীকার।
অচিরে একথা জানিবে সংসার
"সত্য ভাঙ্গিয়াছে রাম নরপতি!"
দূর ভবিষ্যতে অজাত সন্ততি
সূর্য্যবংশে—দিবে সহস্র ধিক্কার—
"ভেঙ্গেছিল রাম সত্য আপনার"
—যে সত্য রক্ষায় রাজা দশরথ
ত্যজিল জীবন—হাসিবে জগৎ।
স্বর্গে দেবগণ দেখি এই পণ্ড
লজ্জায় রক্তিম ফিরাইছে গণ্ড।

রক্ষা কর স্বর্গে দেবগণ সবে
সত্যভঙ্গকারী দুর্ভাগ্য রাঘবে।
(সীতার প্রবেশ)

সীতা—প্রাণেশ্বর—
রাম—প্রিয়তমে!
সীতা—একি? তুমি
পরিপাণ্ডু বিকম্পিত দেহ ভূমি-
বিলুণ্ঠিত প্রিয়তম! উঠ—
রাম—সতি—
স্পর্শ করিওনা—তুমি পুণ্যবতী—
আমি পাপী। নাহি এ পাপের সীমা।
আমি আনিয়াছি কলঙ্ক-কালিমা
ইক্ষ্বাকুর বংশে।
সীতা—শুনিয়াছি সব।
উঠ প্রাণেশ্বর! জীবনবল্লভ!
সর্ব্বস্ব আমার! সম্ভব কি তাও?
সীতার কারণে তুমি ব্যথা পাও,
প্রাণাধিক! উঠ তব যশ পুণ্য
রহিবে অটুট, রহিবে অক্ষুণ্ণ:
পিতৃ সত্য তুমি রেখেছিলে প্রভু;
আমিও রাখিব পতি সত্য। কভু
মলিন না হবে তব পুণ্য রশ্মি
সীতার কারণে। উঠ হে যশস্বী!
এই বক্ষ পাতি দিব হাসি মুখে
তুমি দলি তাহে চলে যাও সুখে
যশের মন্দিরে। তোমারে উদ্বিগ্ন
দেখিবে বসিয়া সীতা—সীতা বিঘ্ন
তোমার সুখের—চিন্তা কর দূরে;
ছেড়ে যাব আমি এ অযোধ্যাপুরে।

অবশ্য সীতার এইরূপ চরিত্র চিত্রণে এই আত্মত্যাগের উজ্জ্বল আলোকে রামচন্দ্রের চরিত্র খানিকটা নিষ্প্রভ হ'লেও রামের চরিত্রে কোনও কলঙ্ক স্পর্শ করে নি—বস্তুত রাম চরিত্র এরূপ অক্ষত রেখে সীতার চরিত্র এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা দ্বিজেন্দ্রলালের অসামান্য নাটকীয় প্রতিভা ও বিরাট পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

রামকে অক্ষত রেখে সীতার চরিত্র এমন সুন্দরভাবে চিত্রিত ক'রতে কালিদাস ভবভূতি থেকে আজ পর্য্যন্ত কেউ সাফল্যলাভ ক'রছেন বলে মনে হয় না। সীতার বনবাসে রাম চরিত্রের যে অংশ বাল্মীকি অপরিস্ফুট, কালিদাস অস্পষ্ট, ও ভবভূতি দূষিত ক'রে রেখে গিয়েছেন তা দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে পড়ে এমনই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যে, শুধু এই একটি চরিত্রের বিকাশেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা অতুলনীয় বললেও কোন ক্ষতি ছিল না।

দ্বিজেন্দ্রলাল কালিদাস ভবভূতি গ্রন্থে দুঃখ ক'রে লিখেছেন, "ভবভূতির রাম যেন স্ত্রৈণ বাঙালী—তাঁহার সীতা সেইরূপ সাধ্বী বঙ্গবধূ—রামের প্রেমের বিশেষত্ব সীতার চিরস্মরণী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ—"

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের রাম স্ত্রৈণ বাঙালী নহে—তাঁহার চরিত্রে স্নেহ, বংশমর্য্যাদা, কর্ত্তব্য জ্ঞান, ক্রোধ সংযম, অনুতাপ বিনয় মূর্ত্ত জাগ্রত—তাঁহার সীতা শুধু সাধ্বী বঙ্গবধূ নন—তাঁহার অপার্থিব সতীত্বে যথেষ্ট তেজ ও অভিমান রাজ্ঞীত্ব বর্ত্তমান।

বাল্মীকির আশ্রমে সীতা ব'লছেন, "হোন তিনি সম্রাট—আমি না সম্রাজ্ঞী তাঁহার—"। লব যখন যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়েছে রামচন্দ্রের বিপক্ষে তখন সীতা যে ক্ষত্রিয় রমণী তাহা সুন্দরভাবে কবি দেখাইয়াছেন।

সীতা চরিত্রের উপর দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কালিদাস ভবভূতি গ্রন্থে লিখেছেন,—"আর সীতা আকাশ-পবিত্র চরিতা, নক্ষত্রের মত ভাস্বরা, শেফালিকার মত সুন্দরী যূথিকার মত নম্রা, জগতে অতুলনীয়া সীতা, তাহার জন্য পশু-পক্ষী কাঁদে, কবি কাঁদিবে না? ইহার জন্য দেবোপম রামের উপর কবির একটা রোষ আসিয়া পড়ে—ভবভূতিরও আসিয়াছিল। সেই রোষ বাসন্তীর মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।"

সীতা বনবাসে গিয়াও ব'লছেন-

"কল্য সন্ধ্যা আসে;
জগৎ রঞ্জিত স্বর্ণ-বর্ণে; নীলাকাশে
মেঘখণ্ড নাই; স্তব্ধ মুগ্ধ অরণ্যানী
চাহে অনিমেষ নেত্রে, তুলি মুখখানি
আকাশের পানে; বিশ্ব নিষ্কম্প নীরব
মগ্ন অর্চ্চনায়—সেই সব সেই সব
যেরূপ সুন্দর পঞ্চবটী বন।
কোথা তুমি কোথা তুমি হৃদয়ের ধন,
প্রিয়তমে! কোথা তুমি? পারি না যে আর
নিরুদ্ধ করিতে অশ্রু নয়নে আমার।

রামের চরিত্র আঁকতে ভবভূতির রোষ এসেছিল—দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে একালের মাপকাঠিতে যে রামের চরিত্র অধিকতর খর্ব্ব দেখায়নি বা রাম চরিত্রের প্রতি রোষ আসেনি তাহা বলা কঠিন—কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে রামের চরিত্র এমন সুন্দরভাবে এঁকেছেন তাতে তাঁর আত্মসম্বরণ করবার ক্ষমতাকেও বিশেষ ধন্যবাদ দিতে হয়।

রাম বা সীতা ব্যতীত কবি বাল্মীকির চরিত্রও যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে এঁকেছেন এবং সেখানে কবি বাল্মীকির নিকটে বশিষ্ঠের পরাজয় ঘটিয়ে প্রেমকে কর্ত্তব্যের উপরে স্থাপন করেছেন, তাহা বাঙলার এক অপূর্ব্ব কাব্য সম্পদ—এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা উদ্ধৃত করা সম্ভব হ'ল না—লবের চরিত্র কবি কল্পনার জালে এমন সুন্দরভাবে বুনেছেন যে তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের এক অপূর্ব্ব অভিনব মহিমান্বিত সৃষ্টি বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

চট্টল চন্দ্র কবি শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন, এম-এ, বি-এল বঙ্গবাণী গ্রন্থে লিখেছেন, পাষাণীর কবি আর একটি মাত্র কাব্য লিখিয়াছিলেন সীতা—এই কাব্যম্বর দ্বিজেন্দ্রলালের নাম বঙ্গ সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে বলিয়াই আশা ... [illegible]

আমাদের মধ্যে দুর্লভ এবং দুর্বোধ্য হইয়া থাকিবে। আমরা এমন সঙ্গীত সাধনায় অবস্থিত—ছন্দের সাহায্যে নাটকীয় জীবন অথবা ভাব সাধনার শক্তিটুকু সুলভ হইয়া পড়িতে কিংবা উহার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতেও দীর্ঘপথ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে।" কবি শশাঙ্কমোহন বহু পূর্ব্বে এই উক্তি করেছিলেন। আজ আমরা সাহিত্যে অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছি—এখন দ্বিজেন্দ্রলালকে হাসির গানের রচয়িতা বা নাট্যকার জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা ব্যতীত তিনি যে একজন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন তাহা বোধ হয় উপলব্ধি করার সময় এসেছে। আমরা পাঠকবৃন্দকে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-কবিতা পাঠ ক'রতে বিশেষ অনুরোধ করি—উদ্যানের শোভা যেরূপ কয়েকটি সুন্দর পুষ্প উদ্যান থেকে সংগ্রহ করে দেখান সম্ভব নহে, উদ্যানে প্রবেশ করা প্রয়োজন সেইরূপ কবির কাব্যের সমালোচনা পাঠে কাব্যের শোভা উপলব্ধি করা কঠিন, মূল কাব্য পাঠের প্রয়োজন।

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" নিয়েই কেবল আলোচনা হ'ল কেন? তার উত্তরে এই বলা উচিত যে আধুনিক সাহিত্যিক, ছাত্র সম্প্রদায় দ্বিজেন্দ্রলাল যে কত বড় কবি ছিলেন তা জানেন না; সেই জন্যে সীতার আলোচনার প্রয়োজন কাব্য হিসাবে। এ বিষয়ে পাঠক সম্প্রদায়ের দোষ দেওয়াও কঠিন, এর জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে দোষী। কয়েক বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে খিদিরপুরে হাওয়া অফিসে অবস্থান করেন সেই সময়ে আমি ও দিলীপ রবীন্দ্রনাথের কাছে যাই—দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে কথা উঠলে কবি আমায় বলেন—"তোমার কাকা যে নিজে কত বড় কবি ছিলেন তা কিছু বুঝতেন না—।" তাতে আমি উত্তর দিই যে —দ্বিজেন্দ্রলাল বলতেন—"যে দেশে রবীন্দ্রনাথের মত কবি জন্মে গিয়েছেন সেখানে আর কবির দরকার নেই"—রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন—"মোটেই না—সম্পূর্ণ অন্যদিকে তাঁর প্রতিভা ছিল—বড়ই অবিচার করেছেন নিজের উপরে"—

আমাদের মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের প্রতি অবিচার করেছিলেন সত্য—কিন্তু তিনি সাহিত্যের মধ্যে, গানের মধ্যে, নাটকের মধ্যে বাঙালীর মনুষ্যত্ব বীর্য্য যাতে জাগ্রত হয় তার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেদিক থেকে কবি বিজয়লাল যখন দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শে দেশকে জাগ্রত হ'তে বলেন, তাতে আর্টিষ্ট-এর দৃষ্টিভঙ্গীতে হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু দেশ ও জাতির দিক থেকে বিজয়লালকে ধন্যবাদ দি—

রাজনৈতিক আন্দোলনে দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝেছিলেন—যেমন বঙ্কিমচন্দ্র বা শ্রীঅরবিন্দ বুঝেছিলেন—যে মনুষ্যত্ব ব্যতীত জাতি বাঁচতে পারে না—জাতি যদি না বাঁচে পঙ্গু জাতির মধ্যে সত্যিকারের আর্ট দেখা দিতে পারে না—জাতির মধ্যে মানুষ হবার প্রেরণা আর্টই যোগাবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল দেবকুমারবাবুকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার খানিকটা উদ্ধৃত করে ও কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ হবে। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখছেন—

"অবারিত উদাম, অদম্য ইচ্ছাশক্তি, উন্মুক্ত নির্ম্মল ও উদার মন, প্রাণময়ী চিন্তা ও জ্যোতির্ম্ময়ী কল্পনা, এ-সবের উপরে যদি কিছু থাকে ত আমার বিশ্বাস—সে হচ্ছে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য। এই এক ব্রহ্মচর্য্যের বলেই একদিন আমাদের স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি অতি সহজে এমন অনায়াসে, স্বাভাবিক শক্তিবলে এ বিশ্বসংসারে জগদ্‌গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। আর আজ যদিও সে পদানত, নিস্তর্জীব, অসহায় ও নিঃস্ব, তবু ঐ একটিমাত্র উপায় অবলম্বন করলে এখনও সে নিশ্চয়ই আবার সেই শূন্য সিংহাসনে গিয়ে ধীরে ধীরে উপবেশন কর্ত্তে পারবে। আমি সেই শুভদিনের জন্য প্রতীক্ষা ক'রে বসে আছি। আমি জানি, বিশ্বাস করি, বেশ দেখতে পাচ্ছি, যে যাই বলুক, যতই কেন আমাদের হেয়, নগণ্য ভেবে উপেক্ষা করুক না, আমরা আবার জাগব, উঠব, মানুষ হব। এ আঁধার চিরদিন কখনও আমাদের ছেয়ে থাকবে না, থাকতে পারে না। এ স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, অযথা প্রলাপ বা শূন্য অহঙ্কার নয়। "আসিবে সেদিন আসিবে।" আমি চাই শুধু ঐ বীর্য্যবল—ব্রহ্মচর্য্য; চাই শুধু ঐ সত্যনিষ্ঠা; চাই শুধু আসল, খাঁটি, ধ্রুব ও নিটোল ধর্ম্মবল, আর ঐ এক কথায়—মনুষ্যত্ব।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল

বাতায়নে

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিঝুম চৈত্রের রাতি, ব'সে আছো একা,
গঙ্গার উজ্জ্বল ধারা চলিয়াছে বহি,
সমুদ্রের পানে। দূরে চন্দ্রালোক লেখা,
কাঁপিতেছে স্রোতে—ওপারেতে রহি রহি
নিঝুম সে বনভূমি যেন ফেলে শ্বাস!
বাতাসে দুর্যোগ নাই—শুধু চারিদিকে
আলোর জোয়ার—আর নির্মল আকাশ
মাথার উপরে শুধু। তাই অনিমিষে

আজ মনে পড়ে বনে,
এমনি চৈত্রের কোনো উতলা নিশীথে,
শীতল অধর তার তোমারি ললাটে,
রেখেছিলে মধুর পরশ। সেই পথে
সেদিন তো আসে নাই দ্বিতীয় পথিক,
গেয়েছিলে কত গান মৃদুল বাতাসে
আজ হারায়েছো সুর—কিছু নাহি ঠিক,

পাশাপাশি

(গল্প)

শ্রীযতীন্দ্র সেন

গলির এপার, আর ওপার-

তেতলার দুটি ঘর,—একেবারে মুখোমুখী। দুটি বাড়ীর ব্যবধানও বেশী নয়, মাত্র হাত দুই। বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়াই দেওয়া-নেওয়া চলে।

গলির ওপারের বারান্দা হইতে মাধুরী ডাকে,—ও ভাই কেয়া, ঘুমিয়ে আছিস্ নাকি?

কেতকী শিথিল-পদে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়। দুটি চোখ তার লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, যেন এই মাত্র সে খুব খানিকটা কাঁদিয়া আসিল।

মাধুরী বলে—ও কি! কাঁদছিস্ না কি?

—কই? না।

বলিয়া কেতকী ম্লান হাসে।

—তবে তোর চোখ অত লাল, আর ফুলো-ফুলো কেন?

—এই এমনি।

—কি যে তোর ভাব, বুঝিও নে।

সমবেদনায় মাধুরীর স্বর করুণ হইয়া আসে। নত-দৃষ্টিতে অন্য মনে কেতকী নীচের দিকে চাহিয়া থাকে। সংকীর্ণ গলির বুকে তখন ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র সুরের হাঁক-ডাক সুরু হইয়াছে।

মাধুরী বলে—নে, চুল-টুল বাঁধ্‌বি নে? বেলা কি আর আছে?

কপাল হইতে রুক্ষ চুলের গুছিগুলি কানের পাশে সরাইয়া দিয়া কেতকী বলে,—এই যাই আর কি।

—ও-মা, চুলগুলোর কি দশা ক'রেছিস্! যেন পাখীর বাসা আর কি!

কতকটা কুণ্ঠিতভাবে কেতকী ঘোম্‌টা টানিয়া চুলগুলি টানিয়া ঢাকিয়া দেয়।

—বলি, মাথার কাপড় টান্‌লেই ত আর কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুল হ'য়ে উঠ্‌বে না। নিজের চুলের, শরীরের যত্ন নিস্ নে কেন?

—নিয়ে কি হবে?

পরম নির্লিপ্তভাবে কেতকী বলে।

—যৌবনে যোগিনী সেজেই বা কি হবে? মেয়েদের ঘষামাজা শুধু পুরুষদের জন্যেই নয়,—নিজেদের স্বাস্থ্যের জন্যও।

কেতকী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে

মাধুরী বলে—যাই ও'র আবার আসার সময় হ'য়েছে। লুচি বেলে ভাজার জন্য আলু-পটল কুটে একেবারে ঠিক ক'রে রেখেছি; উনি এলেই ষ্টোভ্‌টা জেব্‌লে গরম গরম ভেজে দেব।

ওপারে মাধুরীর ঘরে এখন কলগুঞ্জন সুরু হইয়াছে। হাল্‌কা হাসির রেশ, দু'একটা টুক্‌রো কথা কেতকীর কানে ভাসিয়া আসে।

কনক আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

[illegible]

চাহিয়া থাকে মাধুরীর ঘরের দিকে। সে উৎকর্ণ হইয়া শোনে—দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া, সমগ্র মনের চেতনা দিয়া ওদের প্রত্যেকটি কথা, হাসি, হাবভাব অনুভব করে।

মাধুরী বিজলী-পাখা খুলিয়া দিয়া কনকের জামার বোতাম খুলিতে আরম্ভ করে। কনক পকেট হইতে একটি সুদৃশ্য ভেল্‌ভেটের কেস্ বাহির করিয়া বলে—"এই দেখ মাধু, কি এনেছি তোমার জন্যে।"

আজ ইংরেজী মাসের পয়লা তারিখ,—কনক মাহিনা পাইয়াছে; তাই মাধুরীর জন্য আনিয়াছে উপহার। এমনি প্রতি মাসের পয়লা তারিখেই সে আনে। সে মাহিনা পাইয়াই একটা না একটা নূতন উপহার মাধুরীকে আনিয়া দেয়। গতমাসে সে দিয়াছে, টিয়াপাখীর রঙের ক্রেপ্ বেনারসী।

মাধুরীর চক্ষু দুইটি আনন্দে ঝক্-ঝক্ করিয়া উঠে,—পরম আগ্রহভরে হাত বাড়াইয়া বলে—কই, দেখি, লক্ষ্মীটি, কি এনেছ।

ভেল্‌ভেটের কেস্‌টা মাধুরী এক রকম ছিনাইয়া লয়,—ঢাক্‌নী খুলিতেই তাহার চোখে পড়ে, ঝুম্‌কোর আকারে সোনার নিরেট, চ্যাপ্টা, কারু-কাজ-করা দুল,—নীচে নানা রঙের পাথরের ঝালর লাগান।

মাধুরীর চোখের কানায় কানায় হাসির তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে,—প্রাণের নিবিড় আনন্দ সারা মুখময় উদ্বেল হইয়া উঠে।

মাধুরী বলে—কি চমৎকার! তোমার পছন্দ আছে সত্যি।

তাহার আনন্দ-মন্থর কণ্ঠস্বরে প্রাণের পরিপূর্ণ তৃপ্তি ঝরিয়া পড়ে।

কনক বলে—পছন্দ তো শিখিয়েছো আমাকে তুমি। আমি যে দিন-রাত তোমার ধ্যান করি; অহরহ আমার শুধু কল্পনা, কোন্ সাজে তোমাকে সাজালে আরও বেশী মানায়। আমি তোমার রূপ-সজ্জা করি আমার মনে মনে। প্যাটার্নটা নূতন কিনা,—সবে উঠেছে; তাই তোমার জন্য নিয়ে এলাম।

কনক মাধুরীর পুরাতন দুল দুটি খুলিয়া নূতন দুল জোড়া পরাইয়া দেয়,—পরম আদরে চিবুকে হাত দিয়া তাহার মুখখানি চোখের সামনে তুলিয়া ধরে।

কনক মাধুরীর মুখের দিকে অপলক চাহিয়া থাকে; বেলা দশটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ অদর্শনের পিপাসা যেন সে প্রাণ ভরিয়া মিটাইয়া লইতে চায়। মাধুরীর স্বচ্ছ তরল দুটি চোখের ভিতর দিয়া তাহার ছোট, কোমল হৃদয়ের অতল তলে যেন সে নিজেকে নিঃশেষে ডুবাইয়া দেয়।

কনক মাধুরীকে আরও একান্তে বুকের কাছে টানিয়া লয়; কি যেন মধুর আবেশে মাধুরীর চোখ দুটি মুদিয়া আসে।

জানালার ক্ষুদ্র ফাঁকটিতে কেতকী আর তাকাইয়া থাকিতে পারে না। তাহার ছোট বুকখানির ভিতর প্রচণ্ড

[illegible]

কেতকীর চমক ভাঙ্গে মাধুরীর কথায়।

—ছাড় লক্ষ্মীটি, ছি দুষ্টুমী করে না। তোমার খাবা করি।

কনকের বাহু দুটি আরও নিবিড়তর হইয়া উঠে,-বলে—তোমায় দেখলে কি আর ক্ষিদে-তেষ্টা থাকে মাধু?

—সেই কখন খেয়ে গেছো,—ছাড়ো সত্যি...

কনক হাতমুখ ধুইতে নীচে নামিয়া যায়। মাধুরী বারান্দায় আসিয়া বলে—ও কেয়া, শুনছিস্, ও ভাই কেয়া

কেতকী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায় বিশ্বের পুঞ্জীভূত বেদনার প্রতিমূর্ত্তির মত।

মাধুরী বলে—দেখ্ ভাই, আজ এই দুল জোড়া নিয়ে এসেছেন। নূতন প্যাটার্নের কিনা, সবে বাজারে বেরিয়েছে তাই দামটা একটু বেশীই।

কেতকীর মন যেন কোন্ সুদূর লোকে পড়িয়া থাকে,—নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে—কত?

—চল্লিশ টাকা। কেমন হয়েছে ভাই!

—চমৎকার। তুই সুন্দরী, যা পরিস্ তা-ই মানায়।

কেতকীর কণ্ঠে আন্তরিকতার বাষ্পও নাই। ওর কথাগুলো নিছক মন-রাখার মতই শোনায়।

মাধুরী বলে—সুন্দরী না ছাই। তোর কাছে আমি আবার কিসের সুন্দরী লা?

কেতকীর চোখে বর্ষার মেঘ ঘনাইয়া আসে, মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া শরাহত বনবিহগীর মত দুঃসহ বেদনায় ছটফট করে।

ছোট্ট গলিটি যেন একটি ছোট্ট নদী,—তার ওপারের তেতলার ওই ঘরটি যেন পুষ্পের সমারোহ আর সৌরভে আকুল, কলগুঞ্জিত একটি ছোট কুঞ্জবন,—আর কেতকীর এই ঘরটি যেন একটা রৌদ্রদগ্ধ, ঊষর ধূলি-ধূসর মরুভূমি।

আলো আর আঁধার যেন দুই পারে পাশাপাশি বাসা বাঁধিয়াছে।

কেতকীর জীবনটাই যেন একটা বিরাট প্রশ্ন। সে ভাবে কেন এমন হয়! তাহার স্বামী রজতও রূপবান্—কনকের চেয়েও; উপার্জ্জনও রজতেরই বেশী। তাহার কিসের অভাব? সব থাকিয়াও যেন তাহার কিছুই নাই,—বিশ্ব-সংসারের বাহিরে সে।

ষোল বছর বয়সে কেতকীর বিবাহ হইয়াছিল,—রজতের বয়স তখন বাইশ। ইহারই মধ্যে তাহাদের বিবাহিত জীবনের চৌদ্দ বছর কাটিয়া গেছে।

শুভদৃষ্টির সময় কেতকী সরম-আনত, পুলকস্পন্দিত চক্ষু দুইটি ঈষৎ তুলিয়া দেখিল তাহার সামনে দাঁড়াইয়া তাহার কৈশোরের কল্পনার রূপবান্ রাজপুত্র,—নব জাগ্রত যৌবনের সুখ-স্বপ্ন দিয়া এমনই একখানি মুখ মনে মনে সে অঙ্কিত করিয়াছিল।

কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রিতেই তাহার যৌবনের রঙ্গীন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কেতকী বুঝিল, রজতের ওই রূপের আড়ালে যাহা আছে, তাহা মধুভরা কুসুমের সুষমা আর

ফুলশয্যার রাত্রিতে দুইটা পর্যন্তও রজতের দেখা নাই। বিছানার ফুলগুলি সে রাত্রে তাহার কাছে জ্বলন্ত অঙ্গারের ... ...কিয়াছিল। কুসুমাস্তীর্ণ শয্যায় অপরাধিনীর মত সে বসিয়াছিল একা একা।

রাত্রি দুইটার পর যখন সকলে রজতকে ধরিয়া আনিল, রজত তখন অচেতন,—মদের নেশায় আর দুর্গন্ধে তাহার সর্ব্বাবয়ব বীভৎস, কুৎসিত।

ফুলশয্যার রাত্রি কেতকী কাঁদিয়া কাটাইল; সেই চোখের জল তাহার সারা জীবনেও শুকায় নাই।

শাশুড়ীর একমাত্র পুত্র রজত। শাশুড়ী ভাবিয়াছিলেন সুন্দরী স্ত্রী পাইলে উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের চরিত্র শোধ্রাইয়া যাইবে। তাই তিনি নিজে দেখিয়া পছন্দ করিয়া দরিদ্র-কন্যা কেতকীর সঙ্গে রজতের বিবাহ দিলেন।

কিন্তু শাশুড়ীর সে ভুল ভাঙ্গিতে বেশী বিলম্ব হইল না; তিনি বুঝিলেন, রজতের বিবাহ দিয়া একটি নিরীহ বালিকার আজীবন দগ্ধ হইবার ব্যবস্থাই করা হইল।

আশাভঙ্গজনিত দুঃখে, নিতান্ত আক্ষেপের সুরে, শাশুড়ী মাঝে মাঝে বলিতেন—সুন্দরী দেখে তোকে ঘরে আনলাম। বৃথাই মা রূপ তোর। বারমুখো স্বামীকে ঘরমুখো করতে পারলিনে!

কেতকী পরাজয়ের গ্লানিতে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিত।

রজত বিকালে আপিসের পর দুই একদিন হয়ত বাসায় ফেরে; রাত্রি একটা দুইটার আগে কোনদিন সে বাসায় আসে না। কোনদিন বা বাসায় মোটেই ফেরে না, পরদিন সকালে আপিসে যাওয়ার আগে আরক্ত চোখে, বিপর্য্যস্ত বেশে বাসায় আসে টলিতে টলিতে। কোন প্রকারে মাথায় দুই বালতি জল ঢালিয়া, নাকে-মুখে দুটি ভাত গুঁজিয়া ছোটে আপিসে।

ইহাই রজতের প্রতিদিনকার ইতিহাস।

এক মুহূর্ত্তের জন্যও কেতকী কোনদিন স্বামীর আদর পায় নাই। অবহেলার পাষাণ-স্তূপে তাহার সুপ্ত নারীত্ব চাপা পড়িয়াছে।

শাশুড়ী যে বধূর অন্তর বেদনা না বুঝিতেন এমন নহে। কোন রাত্রে হয়ত রজত বাসায় ফেরে নাই,—কেতকী বিনিদ্র চোখে রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইয়া দিতেছে,—শাশুড়ী কেতকীকে উঠাইয়া লইয়া নিজের বিছানায় তাহাকে দুই বাহুর মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া শুইতেন; কেতকী নিতান্ত বালিকার মত তাঁহার বুকের মধ্যে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিত। শাশুড়ী নিজের বুক দিয়া অনুভব করিতেন,—কি দুঃসহ বেদনায় বধূর বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিতেছে; তাঁহার নীরব অশ্রুধারায় কেতকীর কেশরাশি সিক্ত হইয়া যাইত।

কেতকীর বুকভরা বেদনার অংশভাগিনী শাশুড়ী পরলোকগত হইয়াছেন আজ পাঁচ বছর। পাঁচ বছর ধরিয়া সে পৃথিবীর নির্ম্মম, রূঢ় আঘাত সহ্য করিতেছে একা তাহার ক্ষুদ্র একখানি বুক দিয়া।

...মায়ের শাশুড়ীর স্নেহকরুণ মুখখানি

রাত্রি একটা বাজিয়া গেছে; রজত সেই যে আপিসে বাহির হইয়া গেছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।

দু'জনের মত খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া কেতকী চোখ বুজিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। সারারাত্রি হয়ত তাহার অনিদ্রায়, অনাহারে কাটিয়া যাইবে; এমন কত রাত্রিই তাহার কাটিয়া যায়।

উচ্চ হাসির ঝঙ্কারে ওপারে মাধুরীর ঘর ফাটিয়া যাইতেছে। নয়টার শো'তে বোধ করি ওরা সিনেমায় গিয়াছিল,—কিছুক্ষণ আগে দু'জনে রিক্সায় চাপিয়া বাসায় ফিরিয়াছে।

ছায়াচিত্রের নায়ক-নায়িকার প্রেম-নিবেদনের পুনরভিনয় করিতেছে ওরা। অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে হাসির তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

সে হাসির তরঙ্গ আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত রচনা করিয়া আঘাত করে কেতকীর বুকে। কেতকী বুকখানা দু' হাতে ধরিয়া অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া বলে—মাগো!

কেতকী বড় একা,—বড় নিঃসঙ্গ তা'র জীবন। শূন্যময় তাহার জগৎ। মহাশূন্যের মাঝে কক্ষভ্রষ্ট উল্কাপিণ্ডের মত জ্বলিয়া জ্বলিয়া দুর্ব্বার বেগে অপঘাত মৃত্যুর দিকে যেন সে ছুটিয়া চলিয়াছে। কোন আকর্ষণ নাই তাহার জীবনে।

আর মাধুরী? সে যেন একটা সৌরকেন্দ্র। তাহারই আকর্ষণে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কনক তাহার আপন গতিপথ রচনা করিয়া চলিয়াছে।

কেতকী আর ভাবিতে পারে না; তাহার মাথার ভিতর কেমন যেন সব এলোমেলো হইয়া যায়।

ওপারের ঘরটিতে চুড়ির ঠুন্ ঠুন্ শব্দ, আর একটানা কণ্ঠ-কুহরণ শোনা যাইতেছে। কনকের কণ্ঠস্বর মৃদু অথচ স্পষ্ট। আত্মনিবেদনের মায়ামন্ত্র সে আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে। কণ্ঠে কি আকুতি! নিজের রক্তমাংসের দেহের আড়াল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কনক যেন মাধুরীর সহিত তাহার সত্তা মিশাইয়া দিতে চায়।

কেতকীর বুকের রক্ত উদ্বেল হইয়া উঠে।

উঃ মাগো। কেতকী আর পারে না,—মস্তিষ্কের শিরা ছিঁড়িয়া এখনই বুঝি তাহার মৃত্যু হইবে।

ওপারে মাধুরীর ঘরে স্টোভের গর্জ্জন সুরু হইতেই কেতকী তাহার বিছানার উপর উঠিয়া বসে। এতক্ষণ সে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়াছিল। দুপুর গড়াইয়া কখন যে বিকাল সুরু হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই। নিদ্রাও নয়, জাগরণও নয়, কেমন যেন একটা মানসিক শূন্যতার অবচেতন অবস্থার মধ্য দিয়া এতটা সময় কাটিয়া গেছে।

ওপারের ঘরে কনক ফিরিয়াছে,—আজ শনিবার, একটু সকাল সকালেই ফিরিয়াছে।

মাধুরী গরম গরম লুচি ভাজিয়া কনকের পাতে দিতেছে; কনক লুচির আধখানা খাইয়া আর আধখানা মাধুরীর মুখে তুলিয়া দিতেছে।

ওদের চোখে পরিপূর্ণ প্রেমের কি মুগ্ধ দৃষ্টি! ওদের জীবনে কোথাও যেন একটু ফাঁক নাই। কেতকীর মত ওপারের ঘরটি যেন ছায়াচিত্রের রঙ্গমঞ্চ,—উন্মুক্ত জানালার পরদায় ফুটিয়া-ওঠা সবাক্ প্রেম-অভিনয়ের চিত্রের কেতকী একমাত্র নীরব দর্শক।

জামাকাপড় পরিয়া মাধুরী ও কনক বাহির হইয়া যায়। হয়ত ওরা তিনটার ম্যাটিনী শো'তে সিনেমায় চলিয়াছে,—নয়ত চলিয়াছে কাপড়-চোপড় কিংবা গহনার দোকানে; অথবা ওরা ট্রামে করিয়া বালিগঞ্জে যাইয়া এমনি খানিকটা লেকের ধারে ঘুরিয়া আসিবে।

মাধুরী আর কনক যায়,—কেতকী ওদের গতিভঙ্গীর দিকে চাহিয়া থাকে একদৃষ্টিতে। যাইতে যাইতে ওরা গল্প করে। কতই যে গল্প ওদের! গল্প যেন আর কিছুতেই ফুরায় না। প্রতিটি কথার সঙ্গে যেন ওরা হৃদয় নিঙড়াইয়া ঢালিয়া দেয়। ওরা একে অন্যের কথা শোনার জন্যে যেন থাকে উৎকর্ণ হইয়া।

গলির মোড়ে ওরা অদৃশ্য হইয়া যায়।

কেতকী ভাবে কি চমৎকার ওদের জীবন! দিগন্তের মত যেন ওরা প্রতিনিয়ত রহিয়াছে বাহু-বেষ্টন করিয়া। অবিচ্ছেদ্য ওদের মিলন।

আর কেতকী শুষ্ক সৈকত-সীমার মত রজতকে চায় ঘিরিয়া রাখিতে; রজত নিষ্ঠুর তরঙ্গের মত কেতকীর বুকে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া কেবলই দূরে সরিয়া যায়।

প্রেমের যাদুদণ্ড স্পর্শে কেতকীর যৌবন পুষ্পিত হইয়া উঠে নাই; তাহাকে আত্মহারা করিয়া দিয়া তাহাকে ঘিরিয়া রসমন্থর স্বপ্নলোক রচিত হয় নাই।

কেতকী ভাবে, আজ রজত আসিলে সে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবে জিজ্ঞাসা করিবে কি তাহার অপরাধ। তাহার সারাটা জীবন কেন সে এমন করিয়া ব্যর্থ করিয়া দিল?

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রজত বাসায় ফেরে। আপিস হইতে ফেরার পথে সে খানিকটা টানিয়া আসিয়াছে।

কেতকী বিজলী পাখাটা খুলিয়া দিয়া রজতের জামার বোতাম খুলিয়া দিতে যায়।

দারুণ বিরক্তিভরে কেতকীর হাত দুইটি ঠেলিয়া দিয়া রজত বলে—দেখ, তোমার ওই নাটুকেপনা আমি মোটেই পছন্দ করিনে।

মর্ম্মাহতা হইয়া কেতকী বলে—নাটুকেপনা আবার কি? একটু বিশ্রামও কি করবে না?

—অত দরদ আমার ভাল লাগে না।

—ছিঃ চিরকালই কি আমাকে দগ্ধে' মারবে? কোনদিনই কি আমার মুখের দিকে তাকাবে না?

—দেখ, তোমার ওই ঘ্যানর ঘ্যানরের জন্যেই একদণ্ডও বাসায় থাকিনে।

—না, আমি আর ঘ্যানর ঘ্যানর করব না। তুমি আর কোথাও কোনদিন যেও না লক্ষ্মীটি। এক ফোঁটা জলও তুমি আর আমার চোখে দেখবে না......

—দুত্তোর কাঁদুনীর মাথায় ঝাঁটা। যত সব ইয়ে...... বলিয়া রজত ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যায়।

সেই যে রজত বাহির হইয়া গেছে, আর দু'দিনের মধ্যে

আজ তৃতীয় দিনের সকাল বেলা রজত বাসায় ফিরিয়াছে। তাড়াতাড়ি চৌবাচ্চার ধারে হুস্‌হুস্‌ করিয়া দুই বাল্‌তি জল মাথায় ঢালিয়া রজত খাইতে বসে।

গরম ভাত জুড়াইয়া দিবার জন্য কেতকী পাখা লইয়া বাতাস করিতে থাকে।

রজত তীক্ষ্ণ শ্লেষভরে বলে—খুব যে ঢলানি শিখেছ! ঢের ঢের সতীপনা দেখেছি।

কেতকী বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে।

রজত বলে—নাও, ঢের হয়েছে, পাখা রাখ। অত সব আদিখ্যেতা ভাল লাগে না আমার!

কেতকী নীরবে পাখাখানি রাখিয়া দেয়।

একটু ইতস্তত করিয়া কেতকী বলে—দেখ, আমি তোমাকে আবারও বল্‌ছি, আমি একটুও তোমাকে জ্বালাব না, একটি কথাও তোমাকে বল্‌ব না, শুধু তুমি কোথাও যেও না—এমন করে ক্রমাগত আমাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিও না।

মুখ বিকৃত করিয়া রজত বলে,—না, যাবে না! কোথায় থাক্‌ব শুনি? বাসায় আমার থাক্‌তে ইচ্ছে করে না,—তা' কি করব?

—বাসায় তোমার কিসের কষ্ট? কিসের অসুবিধা? তুমি যেমনটি চাও, আমি তেমনটি হয়েই চল্‌ব,—কিছুতেই আপত্তি করব না।

—বলি, আপিসে বেরুবার মুখে দু'টো খেতে দেবে, কি না? আমার হাতের মুখের শত্তুর।

কোনমতে খাওয়া সারিয়া, জামাটা গায়ে ঢুকাইয়া গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে রজত বাহির হইয়া যায়।

কেতকীর জীবন দুর্ব্বহ,—কোথাও তাহার এতটুকুও অবলম্বন নাই। সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় সে মেঝের মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে।

তখন বেলা পড়িয়া গেছে। অলস দিবানিদ্রার পর ছোট গলিটির দু'ধারের বাড়ীগুলির জানালায় জানালায় আলাপ সুরু হইয়াছে।

মাধুরী ডাকে—ও ভাই কেয়া, শুন্‌ছিস্‌?

অসীম দুর্ব্বলতার ভারে দুলিতে দুলিতে আসিয়া বারান্দার রেলিঙে ভর করিয়া কেতকী দাঁড়ায়।

মাধুরী বলে—একা একা আর ভাল লাগে না ভাই।

—একা একা কেন?

—পরশুদিন গেছেন ঢাকায় কোম্পানীর কি একটা জরুরী কাজে। হপ্তাখানেক লাগ্‌বে।

কেতকী নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া থাকে।

মাধুরী বলিয়া চলে—এই দু' দিনেই একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। জানিনে এ কয়দিন কাট্‌বে কি করে? কোন দিন্‌ ত আমরা ছাড়াছাড়ি হইনি। বাপের বাড়ী,—সেও এই কলকাতায়। যদি কোনদিন সকালে যাই তো আপিস ফেরার মুখে উনি নিয়ে আসেন। যে কয় ঘণ্টা আপিসে থাকেন, সেই সময়টুকু কাট্‌তেই চায় না। সারাক্ষণ কেবল আমার চারপাশে ঘুরু ঘুরু—আর কত যে কাঙালপনা!

—যেয়ে চিঠি দেন নি?

—দিয়েছেন বই কি? রোজই একখানা করে চিঠি আসে, আমিও লিখি রোজই। আজও এসেছে। দেখ্‌বি? এই দেখ্‌। কত যে কথা,—কেবল আমারই কথা।

পুলকমিশ্রিত গর্ব্বে মাধুরীর স্বরটা ভারী হয়।

কেতকী চিঠিখানা লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িতে থাকে। ষোল পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ চিঠি। প্রথমেই পাঠ দিয়াছে "প্রিয়তমাষু"। "প্রিয়তমাষু"—এই একটি কথায় হৃদয়ের কত যে আবেগ, কত যে অগাধ প্রেম সঞ্চিত রহিয়াছে। চক্ষু মুদিয়া কেতকী তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা করে। কত কথাই কনক লিখিয়াছে! অদর্শনের অধীরতা, বিরহের আকুলি-বিকুলি অনিশ্চিত বিপৎপাতের জন্য উদ্বেগ, আত্ম-সমর্পণের ঐকান্তিক আবেদন যেন চিঠির ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেতকী আর পড়িতে পারে না, তাহার দুই চোখ দিয়া বর্ষার ধারা নামিয়া দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া যায়। চিঠিখানি মুঠির ভিতর চাপিয়া ধরিয়া কেতকী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে।

এমন একখানি চিঠি কেন, সামান্য দু'টি লাইনের অতি সংক্ষিপ্ত পত্রও রজত তাহাকে কোনদিনই লেখে নাই!

সহসা খট্‌ খট্‌ করিয়া শব্দ হয়,—জুতার শব্দ। টলিতে টলিতে রজত ঘরে ঢোকে; বিদ্রূপের সুরে বলে—বিরহিণী রাধা যে একেবারে শয্যা নিয়েছে। ও কি, ও কা'র চিঠি?

চিঠিখানি রজত এক রকম ছিনাইয়াই লয়।

রুদ্ধ নিশ্বাসে চিঠিখানি পড়িয়া ক্রুদ্ধস্বরে রজত বলে—বলি চিঠি লিখেছে কে?

চোখে তাহার কুৎসিত ইঙ্গিত।

কেতকী বলে,—ও বাড়ীর মাধুরীর চিঠি, তার স্বামী লিখেছে, দেখ্‌তে দিয়েছে।

—মাধুরীর চিঠি না আর কিছু। আমার চোখে ধুলো! বাসায় থাকি নে, কি মজাটাই না হয়েছে! দয়িতের পত্র পেয়ে বিরহে বুঝি শয্যা নিয়েছিলে! তাই তো বলি, সীতা-সাবিত্রী আবার এল কোত্থেকে। লাথি মারো অমন বদ্‌মাইস মেয়ে-মানুষের মুখে। ক্রোধে জ্ঞানহারা রজতের প্রচণ্ড লাথির আঘাতে খাটের উপর হইতে কেতকী নীচে ছিটকাইয়া পড়িয়া যায়, কপালের দুই কোণ কাটিয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছোটে।

ত্রস্তপদে রজত বাসার বাহির হইয়া পড়ে।

রাত্রি দু'টার পর রজত টলিতে টলিতে বাসায় ফেরে। কোথাও একটিও আলো জ্বালা নাই,—চারিদিকে জমাট অন্ধকার। সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া কেতকী গেল কোথায়?

স্খলিত পদে ঘরে ঢুকিতেই কি যেন একটা শক্ত বস্তু পায়ে ঠেকিতেই রজত মেঝের উপর পড়িয়া যায়। তাল সামলাইয়া লইয়া খানিক পরে উঠিয়া আলো জ্বালিতেই রজতের চোখে পড়ে,—কেতকীর নিষ্প্রাণ দেহ কাঠের মত শক্ত আর শীতল হইয়া মেঝের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে তাহার কপালের দুইপাশের কাটিয়া যাওয়া ক্ষত হইতে দু'টি রক্তধারা দুই গাল বাহিয়া নামিয়া আসিয়া শুকাইয়া কালো

মাছের কাঁটার বুরুশ

জার্মানীতে কাঁচা মালের অপ্রাচুর্যে নানাপ্রকার কৃত্রিম উপাদানের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার অনেক দৃষ্টান্ত এই অধ্যায়ে আমরা দিয়াছি কয়েক মাস পূর্বে। এ যাবৎ নানা জাতীয় পশম ও ছোবড়া হইতেই বুরুশ প্রস্তুত হইত। কিন্তু জার্মানীর সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকগণ সকলপ্রকার অকেজো ও বর্জিত পদার্থকেই কাজে লাগাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা দেখিতে পাইল মাছ হইতে চর্বি নিষ্কাশন ও আহারের জন্য মাছের ব্যবহার হয় সত্য, কিন্তু মাছের কাঁটা

কোন ব্যবহারেই আসে না। অনেক গবেষণার পর তাহারা মাছের কাঁটা বিশুদ্ধকরণ এবং তাহা হইতে বুরুশ তৈরীর কৌশল আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। একেবারে পরিত্যক্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিষ হইতে প্রস্তুত বলিয়া বুরুশগুলির মূল্য হইয়াছে পূর্বাপেক্ষা সস্তা, অথচ স্থায়িত্ব ইহার অনেক বেশী। কাঁটাগুলি অতিশয় পালিশ করা হয় বলিয়া উহাতে সহজে ময়লা জমায়েত হয় না এবং সেইজন্য বুরুশগুলি টেঁকসইও হইয়াছে পশমের বুরুশ অপেক্ষা বেশী।

নারীর দাড়ি-গোঁফ

মাদ্রাজ হাসপাতালে সম্প্রতি এক রোগিণী আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহার অস্বাভাবিক দাড়ি ও গোঁফ যথেষ্ট কৌতূহলের উদ্রেক করে। এই রুগ্না নারীর বয়স বেশী নয়, ২২ বৎসর হইবে। তাহার দুইটি সন্তানও জন্মিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে তাহার জরায়ুতে টিউমারের উদ্ভব হয় এবং চিকিৎসকগণ বলেন, ঐ রোগের প্রভাবেই তাহার গোঁফ এবং দাড়ি গজাইয়াছে। হাসপাতালে অস্ত্রোপচার দ্বারা টিউমার বিদূরিত করা হয়। এবং অস্ত্রোপচার এতটা সাফল্যমণ্ডিত হয় যে, টিউমার তো সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেই, অধিকন্তু উহার পরিণামে রমণীটির দাড়ি ও গোঁফ ক্রমশ ঝরিয়া পড়িয়াছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে এইপ্রকার [illegible] অস্বাভাবিক বিকারের কথা ব্যাখ্যা করা আছে বটে, কিন্তু বাস্তবে এই প্রকারের রোগিণী খুবই বিরল। অনেক সময় গুম্ফো নারী দেখা গেলেও দাড়ি ও গোঁফ দুই-ই জন্মিয়াছে এমন নারী বড় একটা সচরাচর দেখা যায় না।

আশ্চর্য আকারের ফুল

গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই 'অর্কিড্' উৎপন্ন হয় বেশীর ভাগ। 'অর্কিড্' ভূমি-চম্পক জাতীয় ফুল ভিন্ন আর কিছুই নয়। পাহাড় বা মাটি ফুঁড়িয়া ক্ষুদ্র চারা বা লতা বাহির হয় তাহাতে অপরূপ সুন্দর ফুল ফোটে। অনেক অর্কিডে অতি লোভনীয় সুগন্ধ থাকে। কোন কোন অর্কিড্ অপর কোনও বৃহৎ বৃক্ষের শাখায়ও উৎপন্ন হয়।

অন্য কোনও ফুলই অর্কিডের ন্যায় রমণীয় হয় না। এজন্য উহা অতি উচ্চ মূল্যে সৌখিন ধনিকগণের নিকট বিক্রীত হয়। ছবিতে একটি বৃহৎ অর্কিড্ ফুল দেখা যাইতেছে, মূলে গাছটি সহ। ফ্লোরিডা অঞ্চলের মিয়ামি শহরে কোনও সৌখিন ভদ্রলোকের গৃহে জন্মিয়াছে। শত শত তারকার মালা যেন অপূর্ব্ব ছটায় চক্ষু জুড়াইয়া দিতেছে। আমাদের দেশেও অর্কিড্ রহিয়াছে—বিশেষ করিয়া আসামের কাননে পর্বতে। আমাদের দেশের বনবনানীতে যে কত শত প্রকারের বিচিত্র ফুল ফুটিয়া শোভা বিস্তার করে, তাহার খোঁজ কেহ বড় একটা করে না। নহিলে ছবিতে প্রদর্শিত অর্কিড্ অপেক্ষা বিচিত্র অর্কিড্ও আমাদের দেশে বিরল নয় আদপেই।

আশ্চর্য প্রতিষেধক

কোনও রোগী আসিয়া তাহার চিকিৎসকের নিকট পরামর্শ চাহিল—আমাকে এমন উপায় বাৎলাইয়া দিন যাহাতে আমি রোগা হইতে পারি। দিন দিনই আমি মোটা হইয়া চলিয়াছি, ইহা যেমন অসুবিধাজনক, তেমনই বিপজ্জনক। এমন একটা প্রেস্ক্রিপ্শন্ করিয়া দিন যাহাতে অতি শীঘ্র আমি অপেক্ষাকৃত শীর্ণকায় হইতে পারি।

ডাক্তার বলিলেন, তাহার একটি মাত্র উপায় রহিয়াছে। আপনাকে একটি কসরৎ করিতে হইবে—আপনার মাথা ধীরে ধীরে নাড়িয়া। [illegible]

ডাইনে বাঁয়ে সমানভাবে মাথা দুলাইয়া এই কসরৎ করিতে হইবে।

রোগী তখন বলিল, কসরৎটা করিব কখন তাহাতো বলিলেন না।

চিকিৎসক উত্তর করিলেন—যখনই কোনও বন্ধু আপনাকে মদ্যপান করিতে অনুরোধ জানাইবে বা আহ্বান করিবে, তার প্রত্যেকবারই আপনাকে ঐ কসরৎ করিতে হইবে প্রত্যুত্তরে।

সাবাই ঘাসের বিশেষত্ব

সম্প্রতি সাঁওতাল পরগণার সাহেবগঞ্জ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সাবাই ঘাসের স্তূপ পোড়াইবার পর ঐ ভস্ম হইতে নাকি কাচের খণ্ড ড্যালার আকারে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে অবশ্য সাবাই ঘাসের তেমন কিছু বিশেষত্ব নাই। তবে উহার প্রকৃত বিশেষত্ব যে কাগজ প্রস্তুতের পাল্প

তৈরীর উপাদান হিসাবে, তাহা অনেকেরই জানা আছে। সাবাই ঘাস পূর্বে বিদেশে পাঠান হইত এবং তথা হইতে পাল্প প্রস্তুত হইয়া এদেশে আসিত এখানকার কলগুলিতে কাগজ প্রস্তুত হইবার জন্য। বর্তমানে কিছু কিছু পাল্প এদেশেও তৈরী হইতেছে। কাচ প্রস্তুতে সাবাই ঘাসের কারসাজি অসাধারণ কিছু নয়। উহার প্রকৃত বিশেষত্ব কাগজ প্রস্তুতের উপাদানরূপে।

'শেখ'য়ের আকৃতির সাদৃশ্য

নির্বাক যুগের সিনেমায় 'শেখ' চিত্রে 'শেখ'য়ের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া রুডলফ ভ্যালেণ্টাইন যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। উহা বর্তমানে বিচিত্ররূপে অপরাধী সনাক্তকরণে সাহায্য করিয়াছে। আমেরিকার মাসাচুসেটস্ প্রদেশের রেভেরা শহর—সাগরতীরের গ্রীষ্ম-নিবাস বলিয়া বিখ্যাত। ঐ স্থানের পুলিশের নিকট সংবাদ পেঁৗছে যে, একটি দস্যু-নেতা তাহার চারিজন সহকারীর সহিত এইস্থানে অজ্ঞাতবাসে আসিয়াছে। এই দল পর পর পঁচিশটি রাহাজানি ও ডাকাতির জন্য দায়ী বলিয়া পুলিশের বিশ্বাস। সনাক্তকরণের সুবিধার জন্য বলা হইয়াছে যে, দস্যু-নেতার আকৃতি ঠিক চিত্রের 'শেখ'য়ের মত হুবহু। এই খেই ধরিয়া পুলিশকে রেভেরার তিন লক্ষ লোকের ভিতর হইতে উক্ত অপরাধীকে বাহির করিতে হইবে। তাই পুলিশ সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আটক করিয়া থানায় আনিয়া ... ভ্যালেণ্টাইনের ফটোর সহিত তাহার সাদৃশ্য তুলনা করিয়া দেখিতেছে। এই প্রকারে বহু ব্যক্তিই সন্দেহ-জনক বলিয়া পুলিশ ষ্টেশনে আনীত হইতেছে; কিন্তু এযাবৎ প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান হয় নাই। পুরাতন ফটো মাত্র যেখানে একমাত্র খেই সাদৃশ্যের প্রভাবে, সেখানে প্রকৃত দোষীর সন্ধান সার্থক হওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

অতি প্রাচীন বাণ-রাজ্য

এশিয়া মাইনর যে কতকগুলি প্রাচীন সংস্কৃতির জননী এই বিষয়ে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আর মতদ্বৈধ নাই। বিগত কয়েক বৎসরের খননের ফলে দক্ষিণাঞ্চল হইতে স্তরে স্তরে ভূপ্রোথিত বহু প্রাচীন অট্টালিকা প্রভৃতি উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ থাকিতে পারে ঐ সম্বন্ধে রাজা সলোমনের অশ্বশালা ও স্নানাগার প্রভৃতির বিবরণ দেশ পত্রিকায় ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে পুনরায় হাবার্ড ও ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের প্রচেষ্টায় নূতন অভিযানকারী দল প্রেরিত হইতেছে উত্তর-পূর্ব তুরস্কে।

গত বৎসর যে খনন-সূচনা হইয়াছে, তাহাতে এমন সব শিলালিপি উদ্ধার করা হইয়াছে, যাহার ফলে অভিযানকারী দল আশা করিতেছে বাণ রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসের বহু সুস্পষ্ট প্রতীকই এইখানে পাওয়া যাইবে।

বাণ শহরটি এক সময়ে প্রাচীন এক সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য-পথে এই প্রকার উন্নত সাম্রাজ্য সেখানে অল্পই ছিল। উত্তর-পূর্ব তুরস্কে আঙ্কারা হইতে ৩৫০ মাইল ব্যবধানে এই বাণ শহরটি অবস্থিত ছিল। উহা আবার বাণ নামক হ্রদের তীরেই সেকালে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল।

গত বৎসর খননের যে সূত্রপাত হয়, তাহার পরিণামে একটি দুর্গ-নগরীর ধ্বংসাবশেষ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। উহা যে অন্ততঃ ২৫ শতাব্দী প্রাচীন এবং উহা যে বাণরাজগণের আমলের গঠন, ইহা অনুমান করা হয় কতকটা শিলালিপি হইতে এবং কতকটা ঐ স্থানে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির গঠন-বৈশিষ্ট্য হইতে। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে এই বাণ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং যে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা খুব সম্ভবত সারগণের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত দুর্গটিই। অধ্যাপক কেসি বলেন, ৭১৪ খৃষ্টপূর্ব সালে যে সারগণ এই অঞ্চল আক্রমণ করিয়া-ছিল, খুব সম্ভবত সেই অভিযানের প্রতিরোধকল্পে এই দুর্গ ব্যবহৃত হইয়াছিল।

এখনও ইহা নির্ণীত হয় নাই যে, মৃৎপাত্র প্রভৃতির শিল্প-কৌশল বাণ রাজ্যের মৌলিক আবিষ্কার কিম্বা অন্য কোনও সংস্কৃতির অনুকরণ। বাণ শহরের দেড় মাইল দূরে শামাইর‍্যাম আলতি নামক যে ঢিবি রহিয়াছে, উহা খনন করিলে অনেক ঐতিহাসিক দিক হইতে মূল্যবান নিদর্শন বাহির হইবে বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বিশ্বাস। ঐ স্থান হইতে ইতিমধ্যেই কতক মৃৎপাত্র ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, যাহা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় মিলেনিয়ামের বলিয়া পণ্ডিতগণের ধারণা। খননের ফলে এই ব্যাপারের মূল্যবান তথ্য প্রকাশিত হইবার কথা।

রাতের মহলা

শ্রীসুকুমার চৌধুরী

(২)

দেড় ঘণ্টা পরে। বিমান তখন ১৫,০০০ মাইল উঁচে উঠেছে। মিলন পাইলটের আসনে বসেই ঘড়ির আকারের রেগুলেটরগুলোতে সকল রকম অঙ্কই দেখতে পায়। কচ্ছ উপসাগর নীচে রয়েছে বিছান, কিন্তু আঁধারের ঘনত্বে জল-স্থল আনাড়ীর চোখে এক হয়ে গেলেও, অভিজ্ঞ পাইলট, ক্যাপ্তেন মিলন রায়ের চোখ ঠাউরে নেয় কোথা জল—কোথা সাগরতীরের শহরগুলো—ভারতের পশ্চিম-তীরের পাহাড়ে ঢাকা অঞ্চল। মাঝে বিপুল ব্যবধান রেখে যে আলো-গুচ্ছগুলো স্বতন্ত্রতায় জেগে উঠেছে, ওটি যে তীররেখা মিলনের তা বুঝে নিতে দেরি হয় না। হঠাৎ তাকালে জল আর স্থল একই রকম কালো দেখায় মনে হয় সমস্ত ঠাঁই যেন কালো জলে ভেসে গেছে—শুধু তার মাঝে আলো-গুচ্ছগুলো সাগরের 'বয়া' (buoys) গুলোর মত ভাসছে আর কাঁপছে।

অতিদূরে নীচে কোথা দেখা যায় জাহাজের সন্ধানী আলো দু-একটি—হুবহু দিগন্ত রেখায় সূর্যোদয়ের সকল ঐশ্বর্যে ভরপুর। কম্প্র অর্ধচন্দ্রে সন্ধানী আলো যেন সাগরের অন্ধকার বুকে এঁকে দেয় বিরাট গাণ্ডীব—অমানুষিক বীরবর কেহ যদি এসে তাতে পরাতে পারে যোগ্য ছিলে। জাহাজের সিটি অবশ্য পৌঁছায় না এতদূরে উঁচুতে, কিন্তু ক্ষীণ একটু রক্তাভ শিখাসহ শ্বেত-ধূম নির্গত হয় চিমনীর মুখ দিয়ে। এ যেন অজানা এক অন্ধকারের রাজ্যে রহস্যচকিত পারিপার্শ্বিকে মিলনকে বহন করে এনেছে তার মনোরথগতি বিমান

ক্যাপ্তেন এবারে নতুন কোর্স ধরে বাঁয়ে ঘোরে। অফিসারকে ইসারায় ডাকে মিলন পাইলটের আসন গ্রহণ করতে। জুনিয়ার এসে মিলনের আসন জুড়ে বসে। মিলন দাঁড়িয়ে থাকে দু'মিনিট, জুনিয়ার চার্ট মিলিয়ে পথের কোন্ অংশে আছে বুঝে নেয়। মিলন চলে যায় বিমানের পশ্চাৎ দিকে। মাঝে ওয়ারলেস্ অপারেটরের কাঁধের ওপর দিয়ে, তার লেখা 'লগ্' (log) দেখে নেয়—সুন্দর একখানি বাঁধান খাতা পাতায় পাতায় তার সময়ের অঙ্ক আর অদ্ভুত চেহারায় সংকেত-বাণীর ছবি, কোথাও বা দুটি তিনটি করে অক্ষর যেন জটলা পাকিয়ে দলে দলে জুটে রয়েছে। অপারেটর করপোরাল দাস সম্মুখে কি-বোর্ড নিয়ে ব্যস্ত, ঘাঁটি থেকে কখন কি জানতে চায়, বলা যায় না ত। ক্যাপ্তেন করপোরালের কাঁধে একটা টোকা মারে, সে মুখ তুলে চায় মাথার টুপীটা সরিয়ে।

ক্যাপ্তেন—পাঁচ মিনিট ছুটি নাও। চা আছে সঙ্গে?

—না, স্যর।

—তবে এস, আমার সঙ্গে আছে।

—ধন্যবাদ স্যর।

দুজনে বসে চা খায় আঁধারেই। কথা বলে মাইক্রো-ফোনের সাহায্যে। নইলে বিমানের তুমুল গর্জনে কথা শোনা যাবার জো নেই।

চা শেষ করে মিলন উঠে পড়ে। আঁধারের ভিতর হাতড়ে হাতড়ে আরও পেছনের দিকে যায়। বিমানের ঠিক মাঝামাঝি সম্মুখ-গানার (সে আবার ফিটারও), পেট্রল গেজের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একটা বোর্ডে পিন্ দিয়ে আঁটা রয়েছে মস্ত বড় চার্ট; তাতে লিখতে হবে বিমানের এ যাত্রাপথের যত কিছু সাংকেতিক বার্তা। ক্যাপ্তেন চার্টে লিপিবদ্ধ গানারকে থামিয়ে চার্টটা পরখ করে। খুশী হয়ে মাথা নেড়ে সেখান থেকে চলে যায় একেবারে বিমানের লেজে। ক্রমশ বেশী করে মাথা নুয়ে যেতে হয়; রাডার এবং এলিভেটরের পশ্চাতের কেবিনটিতে পৌঁছে যেন মিলনের নিরালা একাকিত্বের ভাব বেড়ে ওঠে, দুটো কথা বলবার জন্যে তার প্রাণ আনচান্ করে।

এখানে কেবিনটিতে বসে আছে পশ্চাতের গানার। সে তৈরী করছে তাদের এ শফরের অফিশিয়াল রিপোর্ট। এখানেও পেন্সিলে লেখা সাংকেতিক কোড্। ক্যাপ্তেন অখণ্ড মনোযোগে তা পড়ে।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলে বাপু?

—না স্যর।

—তবে তো বলতে হয় অনেক ব্যাপারই, এ শফরের তোমার রিপোর্টে লেখা হয়নি। এর পর থেকে আরও খুঁটিনাটি শুদ্ধ লিখতে চেষ্টা করবে। তোমার রিপোর্ট যা বলে, তার চেয়ে ঢের বেশী চঞ্চলতার ভিতর দিয়ে আমরা এসেছি।

—আমি ত সাধ্যমত ভাল করতে চেষ্টার ত্রুটি করিনি স্যর।

—তাহলে তোমার 'সাধ্য' ত তারিফের নয়। আর তোমার 'ভাল' চলন সইয়ের কোঠায়ও ঠিক পড়ে না। উন্নতি তোমার করতেই হবে।

ফিরে চললো মিলন। তার মনে হয় সম্মুখে বসে আছে যে জুনিয়ার অফিসার পাইলটের আসনে—সে যেন বহুদূরে—ও যেন রয়েছে অন্য এক রাজ্যে। সুড়ঙ্গপথে যেতে যেতে মিলন তাকায় কলকব্জার দিকে—অতি মৃদু লাল্‌চেপানা একটা আলো (dash lamp) রয়েছে ওপর হতে ঢাকা দেওয়া; তাতে চকচকে যন্ত্রগুলো জ্বলজ্বল করছে, কত রকমের জটিল সব যন্ত্র সুড়ঙ্গের দুপাশে সারবন্দী হয়ে রয়েছে। শব্দ প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা এখানে নেই, কাজেই সারাটা সুড়ঙ্গ যেন দানবীয় রবে নরকের সৃষ্টি করেছে। তার ওপর দুই হাজার অশ্বশক্তির প্রেরণায় সকল যন্ত্রই সচল হয়ে কর্তব্য করে যাচ্ছে কম্পমান দেহে।

আর একটু এগিয়ে পাশের খুদে একটা পোর্টহোল্ দিয়ে সে তাকাল বাইরে। অদূরে উত্তরদিকে দেখা যাচ্ছে একটা শহরের আলোকমালা—ঠিক যেন ভেটকি মাছের সমগ্র বিরাট কঙ্কালটি। তারপরেই ঘড়ি দেখলে (রেডিয়াম ডায়েলযুক্ত), মনে মনেই বললে—হুঁ, এটা নিশ্চয় পুণা শহর। পুণা শহরের নামটা মুখ থেকে বেরুতেই একটা

সলজ্জ আভা ফুটে ওঠে তার গাল দুটিতে। পুণা শহরের এক পল্লীতে বাস করেন মিলনের বাপ-মা। মিলনের বাপ সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে পুণায় বাড়ী তৈরী করেছেন। দেশে—বাঙলা মুলুকে তাদের যে বাড়ী ছিল, তা গেছে পদ্মানদীর গ্রাসে। তাই সুদূর প্রবাসেই ঘরবাড়ী গড়তে হয়েছে। আর একটু কারণ হল—মিলনের ছোট ভাই মনন পড়াশোনা বেশী করেনি। সে খুলেছে একখানা মনোহারী দোকান পুণা শহরের বড় বাজারটায়। কাজেই তাদের আস্তানা গাড়তে হয়েছে এ শহরটিতে।

মিলনের চোখের সমুখে ভেসে ওঠে সে সুখের নীড়টির ছবি। মা-বাবার এখনও খাওয়া হয় নি। ছোট বোনটি হয়তো মিলনের দেওয়া নকল উড়ো-জাহাজটি সুতো বেঁধে উড়িয়ে দিয়ে দেখছে কেমন ঘুরপাক খায় সেটি কক্ষের ভিতরে। হয়ত মিলুদা'র কথা ভাবছে সেই সঙ্গে। তারপরেই মিলনের স্নিগ্ধ-দৃষ্টি কোমলতর হয় একখানি মুখ মনে পড়ে—বিশেষ করে তার আয়ত চোখ দুটির স্বপ্নজড়িত মায়ায়। অজ্ঞানিতেই মিলনের অঙ্গে যেন একটা শিহরণ খেলে যায়। সে মুখখানির যে মালিক, সে ত বালিকা মাত্র—বয়েস ১৪।১৫ হবে। পুণার গার্লস হাই-স্কুলে পড়ে। আহা, নামটিও তার কি মধুর—অপলা। মিলনের বাবা চিঠি লিখেছেন, অপলার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছে। সামনের বছরে অপলার ম্যাট্রিক একজামিন, বিয়ে হবে সে একজামিনের পর। অপলার বাপ ভোনসলা ষ্টিমশিপ কোম্পানীর একজন ইন্সপেক্টর। তাদের তিন পুরুষের বাস পুণা-অঞ্চলে।

পিঠটা কুঁজো করে কনুই দুটো মেশিনের অচল দাণ্ডার ওপর ন্যস্ত করে দাঁড়িয়ে মিলন অপলার কথাই ভাবতে থাকে। মনের দেওয়ালে জীবন্ত হয়ে ওঠে অপলার অপরূপ চোখ দুটি, তার কুঞ্চিত কেশ, তার হাসির যাদুতে রাঙা ঠোঁট দুটির প্রাণ-কেড়ে নেওয়া উদাস ভাবের ভাণ। মিলনকে বিচলিত করে তোলে। অপলার ঠাকুমার শ্রাদ্ধের দিন, সকল বাঙালী পরিবারই ওদের ওখানে হাজির ছিল। সেদিন মিলনের ছোট বোন অমলা অপলাকে টেনে এনেছিল মিলনের সমুখে, আর লজ্জায় অপলা মুখে-চোখে রুমাল চেপে ধরে নত হয়েছিল। মিলন বলেছিল—ওর নাক নেই বুঝি তাই মুখ ঢেকেছে' তখন রুমালের ফাঁকে দেখা দিয়েছিল একজোড়া লজ্জারুণ রোষ-কষায়িত চোখ, যার বিদ্যুৎছটা আজও মিলন ভুলতে পারেনি। তারপর কত জায়গায় কত উৎসবে তাদের মিলেছে চোখের দেখা—কথা বিশেষ কিছুই হয়নি; কিন্তু চোখে চোখে যে নির্বাক-বাণী বাহিত হয়েছে, তাতে ছিল মধুর মাদকতা, তাতে ছিল মূক আকুতি, তাতে ছিল দরদের বিবশ-করা আত্ম-নিবেদন।

বিয়ে হলে আর সে বোমাবর্ষী বিমানে কাজ করবে না। আর কি! এক বছর কোন রকমে পার করতে পারলেই গবর্ণমেন্টের সঙ্গে চুক্তি শেষ। বিমান-চালন শিক্ষার পর তিন বছরের সরকারী কাজ তখন খতম হবে। তখন তাকে খুঁজে নিতে হবে বে-সামরিক বিভাগের চাকরী। প্রস্তাবও এসেছে ডাক-বাহী বিভাগ হতে। তবু কিন্তু মনটা যেন খুঁত খুঁত করে যে, যে কাজটির ওপর তার মন বসেছে, সেটা ছাড়তে হবে। কিন্তু ছাড়তে হবেই, পরিবারের কেউ এটা পছন্দ করে না। অপলা বলেছে অমলাকে—'ও বিদ্ঘুটে যন্ত্র দানবটা দেখলেই বুক আমার ঢিব্ ঢিব্ করে।' তবে আর অপলাকে হতাশ করে সে কি করে থাকবে সামরিক বিমানে। মিলন না হয় বিমান-চালন ছেড়ে মেকানিকের কাজ নেবে বিমানের কারখানায়।

সহসা মিলনের চিন্তা বাধা পায় এক আজব কল্পনায়। এটা কি অদ্ভুত নয় যে, নীচের ওই আলোর মালার বিশৃঙ্খল জটিল জালের ভিতর বসবাস করতে যাবে মানুষ; আর তারই ভিতর থাকবে এমন একটা সুশৃঙ্খল শান্ত জগৎ, যার বুকে স্থান পেতে পারে অপলার মত সুন্দরী! শুধু স্থান পাওয়া নয়—সে জগতের পরিপাটী এক সজ্জিত কক্ষে বসে অপলা তার পড়া তৈরী করবে, নয় সেলাইয়ের কাজে অর্জন করবে অতুলনীয় নিপুণতা! অপলা হয়ত মেঝেতে অর্ধশায়িত অবস্থায় বেরাল ছানাটিকে কোলের কাছে রেখে গল্পের বই পড়ছে বিমান-অভিযানের, আর একটি তরুণ বিমান পাইলটের মূর্তি মানস তুলিতে অন্তরের মণি কোঠায় রূপায়িত করে তুলছে। সেই কক্ষেরই ওপর দিয়ে বিমানে করে ছুটে চলেছে মিলন—এ কথা মনে পড়তেই পায়ের তলা তার শির শির করে ওঠে।

সে মুহূর্তে নজর পড়ে তার নেভিগেটেরের টেবিলের ওপর; ঢাকনওলা একটা টেবিল ল্যাম্পের আলোতে দেখা যাচ্ছে কতকগুলো ম্যাপ, দিক্ নির্ণয়ের যন্ত্রপাতি; সবার ওপরে 'লগে'র একটা শিট। এটাও পেনসিলে লেখা—পঙক্তির পর পঙক্তি সংখ্যা বসান আর তারই মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিণত বাক্য। নেভিগেটেরের টেবিল থেকে সে ফর্দখানা নিয়ে মিলন পড়ে যায় ওটার সাঙ্কেতিক ভাষা। ভুল বার করতে চেষ্টা করে, পায় না কোথাও। লগ্‌শীট রেখে ফিরে চলে যায় পাইলটের আসনের কাছে—যে স্থানে জুনিয়ার অফিসারকে কাজে নিরত করে রেখে গেছে সে। পাইলটের আসনের পিছনে দাঁড়িয়ে মিলন তাকায় বাম্বিং থার্মোমিটারের দিকে—শূন্য সেণ্টিগ্রেড-য়েরও কুড়ি ডিগ্রি নীচে রয়েছে দেখান তাতে।

পাইলটের আসনে থেকে জুনিয়ার অফিসার পেছনে ক্যাপ্তেনের পায়ে মারে ঠক্কর,ইসারায় সমুখের দৃশ্য দেখিয়ে। তাদের সম্মুখে পথ রুখে দাঁড়িয়ে আছে অসীম-অশেষ এক উচ্চ পুঞ্জ শাদা মেঘের; যেন একটা শ্বেতমর্মরে প্রস্তুত পাহাড়। বাস্তব কঠোর সে মেঘ-স্তূপ যেন আকাশ ছুঁয়েছে মাথা উঁচু করে। এর হিম-শীতল শুচিতা আতঙ্ককর অন্তরায় সৃষ্টি করেছে যেন; সে আতঙ্ক আরও বর্ধিত হয়েছে নীচের রহস্যজড়িত গভীর উপত্যকায় চন্দ্র-কিরণে শ্বেত-মেঘমালারও নিবিড়কৃষ্ণ ছায়ামায়া বিস্তৃত হয়ে। শাদা আর কালোর এ লুকোচুরি জুনিয়ার অফিসারকে করেছে কেমন একটু চঞ্চল। সে প্রতিমুহূর্তে আশা করছে ক্যাপ্তেনের কাছ থেকে আদেশ।

মিলন বুঝতে পারে জুনিয়ারের উদ্বেগ। সে টেলিফোন

প্লাগ বসিয়ে পরিচ্ছদের সঙ্গে যুক্ত মাইক্রোফোন্ যথাস্থানে উঠিয়ে নেয়, তারপর বলে-

'গো থ্রু (go through)......মেঘ ফুঁড়ে চলে যাও..... অন্ধের মত চোখ বুজে বিমান-চালনা অভ্যাস কর একটু।'

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলেও মাইক্রোফোন আর টেলিফোন্ ছাড়া কথা বলে শোনান যায় না।

বিষম তোড়ে ঝড় এসে পড়ে—আচমকা বিমানটা কেঁপে নেচে ওঠে, যেমন নাচে তরঙ্গের তালে তালে জলযানগুলো প্রবল বাত্যার মুখে। ঝটিকার এক একটা ঝাপটা যেন বিমানের গতি রুদ্ধ করে দিতে চায়—ভীষণ আলোড়িত হয়ে বিমান চলে পদে পদে সংগ্রাম করে। এবার মেঘ একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে বিমানটাকে—ডানে, বাঁয়ে, সমুখে, পশ্চাতে—সর্বত্র নিবিড় মেঘ, ডাঙার নিশানা আর পথের উচ্চতা যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। জানালা পথে দৃষ্টিহীন স্তব্ধতা, কেবিনের ক্ষুদ্র পরিসরের বাহিরে সব কিছুই যবনিকা-আবৃত। জুনিয়ার অফিসার শীতে কেঁপে ওঠে—শীতল বায়ু সরবরাহের যন্ত্র বন্ধ করে দেয়। সম্মুখে আর একটু ঝুঁকে সে এ পারিপার্শ্বিক কৃত্রিমতায় নজর বুলায়—সংক্ষিপ্ত তার দিগন্ত, সহায় মাত্র যন্ত্রের কাঁটা আর চার্ট।

শিলাবৃষ্টি সুরু হ'ল—জানালার ফাঁক দিয়েও এসে ঢুকছে—আছড়ে পড়ে চূর্ণ হচ্ছে এখানে ওখানে মেশিনের গায়ে। তারপর উইন্ড স্ক্রিনের উপর জড়ো হতে লাগল—পুঞ্জে পুঞ্জে শিল। কতক গলে পড়ে যায়—পাতলা কাগজের মত আকারে বাকিগুলো সংলগ্ন থাকে কাচের গায়ে। পাইলটের মাথায় (অর্থাৎ হেলমেটের ওপরে), স্কন্ধে পুঞ্জ পুঞ্জ তুষার তুলোর মত শোভা পায়। আসনের পাশে, মেশিনের যেখানে অবস্থানের মত প্রশস্ত ঠাঁই, সেখানেই জমায়েত হয় তুষাররূপী মেঘ। এবার স্পীড্ কাঁটা ক্রমে নির্দেশ করে নিম্নতাপ—অবশেষে শূন্যে ডিগ্রিতে স্থায়ী হয়।

ক্যাপ্তেন জুনিয়ারের কাঁধে ঝাঁকুনি দেয়, মাথা নেড়ে ইসারা করে ওঠবার; জুনিয়ার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। মিলন নিজে হুইল ধরে বসে। বসেই বিমানের মুখ আরও উঁচু দিকে তুলে ধরে ঊর্দ্ধে ওঠবার জন্যে। কয়েক মিনিটের ভিতর বিমান উঠে গেল মেঘলোক ছাড়িয়ে তারই ওপরকার স্তরে—যেখানে পরিষ্কার চাঁদের আলো, মেঘ-ঝঞ্জার নাম গন্ধও নেই। নীচে পড়ে রয়েছে পর্বতমালার সারি সারি উচ্চ-নীচ চূড়ার মত—মেঘরাজি আর তার বাহন সবল বায়ু-প্রবাহ। বিমানের তুষারাবৃত দেহ চন্দ্রালোকে জ্বল জ্বল করতে করতে চলেছে। তুষারভারে বিমান যেন ওজনে বেড়ে গেছে দ্বিগুণ প্রায়।

নেভিগেটরকে টেলিফোনে ডেকে মিলন বলে—বাকি পথটা এ ভাবে মেঘের মাথার ওপর দিয়েই যাব। তোমার সেক্সট্যান্ট ফিট্ করে নাও।

—ও কে স্যার।

ঘাঁটি থেকে বার হবার ঠিক সাড়ে ছ'ঘণ্টা পরে আবার তারা ফিরে এসেছে কাছাকাছি। মিলন এবার বিমানটিকে নাবিয়ে আনে। আবার সেই প্লনর হাওয়ার মাইনের উচ্চতায় পৌঁছে মিলন অনুভব করে ঘাঁটি আর দূরে নয়। পল্লীর কোথাও আর আলো নেই। আরও নীচে নেবে এলে দেখা যায় দূরে ক্যাম্পের আলো। তারপরে দেখা যায় হ্যাঙ্গারস্-য়ের আবছা ও-গুলোর খোলা দ্বার পথে। অবশেষে দেখা দেয়, সেই ক্রমনিম্ন আলোর সারি ঘাঁটির মাথায়, যে পথে তারা উঠে এসেছিল যাত্রার সুরুতে। কিন্তু এমন একটা আবছা কুয়াশার ভাব চারিদিকে যে ঘাঁটির প্রথম প্রবেশের মুখটি নির্ণয় করা সোজা নয়।

বিমানটিকে নিয়ে ক্যাপ্তেন চক্রাকারে ঘুরতে লাগল সেই ক্রমনিম্ন আলোর সারির ওপর দিয়ে। বার বার চক্র দেবার পর মিলনের চোখঅভ্যস্ত হল অতি নীচু দিয়ে বিমানটিকে চালাবার তরে। তখন সে বিমানের শিরে আলোর সঙ্কেত ফুটিয়ে তুলল—× বিমানের আত্মপরিচয়ে। মিলন পরিষ্কার দেখতে পেলে সিগ্নেলার মাটিতে রশ্মি ফেলে ল্যাম্পটা পরখ করে নিচ্ছে এবং সবুজ আলো ফুটে উঠলে তা তুলে ধরল শূন্যে বিমানকে অবতরণের লাইন ক্লিয়ার জানাতে।

মিলন তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়ল। আলো জেলে দিল। ধীরে ধীরে বিমান নেবে চললো। জুনিয়ার অফিসার, নেভিগেটর এসে দাঁড়াল ক্যাপ্তেনের পাশে এরিয়েল গুটান হয়েছে জানাল।

ইঞ্জিন গর্জন বন্ধ হলেও তাদের কানে তখনও চলেছে সে দানবীয় কলরোলের রেশ। কয়েক সেকেণ্ড গেলে তবে তারা শ্রবণ-শক্তি ফিরে পেলে। অভ্যস্ত যে সব শব্দ নাবার মুখে নিত্য মিলে—জানালায় হাওয়ার ঝাপটা, ডানায় বাতাসের শোঁ শোঁ, নিম্নের তারে তারে গুঞ্জন-রব,—সবই তখন তাদের কানে ভেসে আসতে লাগল।

এইবার মিলনের ভূমি স্পর্শ করবার পালা। এয়ার স্ক্রু, তেল-প্রণালীর শীতল বায়ু সরবরাহ বন্ধ করা হল। বেশ ৮০ মাইল গতিবেগে সে গাছগুলার মাথা ডিঙিয়ে প্রথম ফ্লেয়ার (আলো) সমুখস্থ ভিড়িবার স্থানে নিঃশব্দে ভূমি স্পর্শ করল।

জুনিয়ার অফিসার—সেই হাসিমাখা মুখের মালিক রেগে জিজ্ঞেস করে—আমার আর দরকার নেই, কেমন শকুন্ শাই?

—যেতে পার, কিন্তু আমি পৌঁছাবার আগে কিছু মুখে দিতে পারবে না মেসে।

জুনিয়ার অফিসার সহাস্যে লাফিয়ে পড়ে টারমেকাডাম মোড়া প্রাঙ্গণে

কয়েক মিনিট পরে মিলন বিমানটির আটঘাট বেঁধে রেখে 'লকার রুমে' প্রবেশ করে পরিচ্ছদ বদল করতে। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যায় স্কোয়াড্রন লিডারের অফিসে। লিডার তাকালো, তার ডানে বাঁয়ে কতকগুলো ওয়ারলেস সংবাদের কাগজ। মিলন অভিবাদন করতেই লিডার জিজ্ঞাসা করে—অল্ রাইট?

—হাঁ স্যার। সুন্দর ট্রিপ।

লিডার হেসে ফেলে এবং মশকারা করে বলে—যে সংবাদ

(শেষাংশ ৩৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিকৃষ্ট জীব

(গল্প)

শ্রীসুবল মুখোপাধ্যায়

রত্না ভাবিত ফুটবল খেলা একটা নিছক বর্বরতা, আর ফুটবল খেলোয়াড় এমন একটা জীব যা নাকি কেঁচো অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ইভোলিউশনের স্তরে। তার উপর যদি দনুজের মত একটি ভাল ছেলে ও খেলাটার মোহে অমানুষ হইয়া যায়, তবে সে যে ইভোলিউশনের একেবারে গোড়ার ধাপের উভচর মাত্র—ইহাতে সন্দেহ বিন্দুও নাই। তাই একটা কিছু রত্নার করিতেই হইবে.................

এক কলেজে পড়িলেও রত্নার সঙ্গে আলাপ নাই কোন 'কলেজ বয়'-এর। যা' কিছু পরিচয় চোখের দেখায়। তবে ছাত্রীমহলে রত্না একটি জীবন্ত ফোয়ারা। তর্কে তার সঙ্গে আঁটিয়া ওঠে না কেউ—অমন যে ষ্টাইপেন্ড-হোল্ডার কেতকী, সেও যুক্তির তোড়ে ভাসিয়া যায়।

খেলার মাঠে কলেজের টিম সেদিন খেলিতেছে—গুরুত্বপূর্ণ সে ম্যাচ। কলেজের ছাত্রীরাও সেদিন দেখিতে আসিয়াছে সহপাঠীদের বর্বর-ক্রীড়া, তবে সকল ছাত্রীই যে এ-খেলাটাকে 'অভদ্র' আখ্যা দেয় এমন নয়। কে যেন বলিল, 'দনুজের মত একটা স্কলার গোল্লায় যাচ্ছে—বড় দুঃখের বিষয়।'

অন্তরে উদ্দেশ্য তার যা-ই থাক, রত্না সে কথাটাকে লইয়া সকল বিরাগ মূর্ত করিয়া তোলে ফুটবল-খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে। ছাত্রীরাও সবাই জানে রত্নার মত বিদ্বেষ ফুটবলের উপর। কাজেই সুযোগ পাইলেই রত্নাকে সে বিষয়ে মুখরা করিয়া তুলিতে চেষ্টা পায় সামান্য একটু উস্কাইয়া দিয়া।

হঠাৎ কেতকী ধরিয়া বসিল বাজি। ফুটবল খেলোয়াড়কে, বিশেষ করিয়া দনুজকে যে মেয়ে মুরুব্বিয়ানা চালে থুত্নি ধরিয়া আদর করিয়া সকলের সমক্ষে হাস্যাস্পদ করিতে পারিবে, সে সাহসিকাকে পুরস্কার দেওয়া হবে—ভোজ।

দুঃসাহসের কল্পিতই হোক আর বাস্তবই হোক, একটা বিপুল বড়াই ছিল রত্নার কলেজ-জীবনের সম্বল—তার বক্তৃতা-স্রোতের প্রেরণা-উৎস। সে অমনি সাড়া দিল সে বাজির প্রস্তাবে।

মনে মনেই হাসিল রত্না। কারণ বাজি জিতিয়া বাহাদুরী নেওয়া হইল তার কাছে অভিনয়—বাহাদুরীর অন্তরালে রহিয়াছে একটা উদ্দেশ্য—যা সে মেয়েদের টিট্‌কারীর ভয়ে কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই এতদিন। নিতান্তই স্বার্থলেশহীন পরোপকার—অন্ধকারে নিমগ্নকে জ্ঞানের আলোক-দান। এইবার সুযোগ মিলিল এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার অর্থাৎ বাজি জয় এবং পরোপকারের আত্মপ্রসাদ।

খেলা সাঙ্গ হইয়াছে। কলেজ টিম এক গোলে জিতিয়াছে। অসভ্য কলেজ-ছাত্রগুলার সে কি উদ্দাম নৃত্য-বিলাস—সে কি চীৎকার আর হাসির হুল্লোড়! রত্নার মনে হইল, সত্যই আবার ইভোলিউশনের আবর্ত ফিরিয়া আসিয়াছে আদিম বর্বরতায়।

ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন হিসাবে দনুজের প্রাপ্য তারিফ ও মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু লাজুক এবং বিনয়ের অবতার দনুজ—সে ভাবপ্রবণতা বরদাস্ত করিতে একেবারেই অপারগ। সে-খেলা শেষ হইবামাত্র ভীরু পলাতকের মত দলছাড়া হইয়া কলেজ মাঠের পোষাক ছাড়িবার ঘরটির দিকে পা চালাইল ফুরুস ফুলগাছের সারির পিছন দিয়া। কি একটা অস্বস্তি যেন তাহাকে কুরিয়া খাইতেছে। সে অবশ্য লক্ষ্য করে নাই যে, সাঁঝের আঁধার ঘনাইয়া আসিতে এখনও ঢের দেরী। তাহার হুঁস নাই যে, মৃদুল বায়ু মঞ্জুল ছন্দে প্রাণে প্রাণে অমিয় ধারা বহিয়া আনিতেছে। তাহার কানে ভাসিয়া আসে না কলেজ কম্পাউণ্ডের বড় গাছগুলির মাথা হইতে বিহগ-কাকলী। দুর্ভাবনার কালো ছায়া তাহাকে পূর্ণ গ্রাস করিয়াছে। অনিদ্রা যদি সত্য সত্যই তাহার রোগে দাঁড়ায়, তবে ভাবিবার মত বিষয় বই কি। একবার না হয় স্পোর্টস্ প্রোফেসর মিঃ দাসকে বলিয়া উপদেশ চাহিবে। তিনি নিশ্চয় একটা ঔষধ অর্থাৎ অনিদ্রা দূর করিবার প্রণালী বলিয়া দিতে পারিবেন। নইলে মিনিটে ৫০ গজ স্পিড্ কেমন করিয়া রাখা যাইবে যদি......

সহসা দনুজ অবহিত হয় যে, এখানে ফুরুস ফুলের গাছের সারির পশ্চাতেও এক মূর্তি ঠিক তাহার বরাবরই আগাইয়া আসিতেছে। মূর্তি যেমন কাছে ঘনাইয়া আসিতে থাকে, দনুজ তাহার সকল দুশ্চিন্তাভার অগোণেই ঝাড়িয়া ফেলে। মূর্তিটি তেমনই আকার-প্রকারের। আর যে মুখখানিকে বহন করিয়া আনিতেছে সে মূরতি, তাও প্রকৃতই পাগল-করা। তরুণীটি যে-ই হোক না কেন, সেকেন্ড ইয়ার ক্লাশের সকল তরুণই যে রকম সৌন্দর্য-সেরা বলিয়া বিশ্বাস করে—হুবহু তেমনই মাধুরীর মালিক সে। টানা টানা স্বপ্ন-মাখা চোখ দুটি, ভ্রূ জোড়ার বঙ্কিম ভঙ্গী রহস্যাবৃত, ছোট্ট পরিপাটি থুত্নী দৃঢ়তায় টইটুম্বুর; মাথার চুল যেন পায়ের জুতার কালো রঙকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে।

কুণ্ঠা ও বিস্ময়ে দনুজের মুখভঙ্গী এমনই আকার ধারণ করিল যে, খেলার মাঠ হইলে সহকারীরা ছুটিয়া আসিত তাহাকে ধরিয়া ফেলিতে পাছে মূর্ছিত হইয়া সে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। দনুজের এ দুর্দশার কারণ আর কিছুই নয়, তরুণীটি শুধু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেই না, কি যেন বলিতেও চাহিতেছে তাহাকেই। আরও যখন কাছে পৌঁছিল তরুণী, তখন দেখা গেল তারও ভ্রূ-কুঞ্চিত। কেমন একটা বিবর্ণ বিহ্বলতা মুখোসের মত আবৃত করিয়াছে তরুণীর স্বাভাবিকতাকে। এইবার তরুণী ইতস্তত করিল। দনুজের পথ রুদ্ধ করিয়া পাষাণ-পুতুলের মত দাঁড়াইয়া গেল। তারপর হতাশভাবে পশ্চাতে ঘাড় বাঁকাইয়া, সঙ্গিনী পাঁচটির সমবেত গুচ্ছকে শুধাইল,—'must I ?'

—'Certainly !' দল হইতে একটি তরুণী রুক্ষভাবেই বলিয়া উঠিল।

দনুজের সম্মুখস্থ তরুণী তখন নিতান্তই রহস্যজনকভাবে তাহার কাছে আসিল। বলিল, 'মাফ্ করবেন, এ আমায় করতেই হবে।'

বলিয়াই বিজলীর মত ক্ষিপ্রবেগে ডান হাত তুলিয়া দনুজের থুত্নী ধরিয়া নাড়িয়া দিল। তরুণীদের দলের একটি জোরে জোরে গুনিতে লাগিল—এক, দুই, তিন...... পরক্ষণেই তরুণী ফিরিয়া যাইতেছিল তেমনই ক্ষিপ্রবেগে, কিন্তু কোথা হইতে যেন দৃঢ়হস্তের দুইটি সবল অঙ্গুলী আসিয়া তারও থুত্নী স্পর্শ করিয়া নড়াইয়া দিয়াই অপসৃত হইল।

—অসভ্য বর্বর কোথাকার! এতদূর আস্পর্ধা.....
তরুণী বোমার মত ফাটিয়া পড়ে।

দনুজ হতভম্ব। কিন্তু সেই উপায়হীনতার ভিতরেও একথা মনে ভাবিতে তাহার বাধা হইল না যে, তরুণীর প্রখর চোখ দুইটি মারাত্মক অস্ত্র বলিয়া গণ্য হইয়া প্রকাশ্য রাজপথে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে না কেন।

এতক্ষণে ফুটবল ক্যাপ্তেন যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল,—'দেখুন, আপনি যদি ভেবে থাকেন গোবেচারীর মত ফুলগাছের আড়ালে চলবার 'এতদূর আস্পর্ধা', আমার বাড়াবাড়ি, তাহলে আপনি ভুল করেছেন। তাছাড়া, নিরীহ ভালমানুষের ওপর কেউ যদি চড়াও হয়, তবে পাল্টা আত্মরক্ষার অধিকার তার নিশ্চয়ই থাকে।

ঠোঁট কামড়াইতে কামড়াইতে তরুণী বলিল,—আমি ভেবেছিলাম, খেলার মাঠ যখন এটা, তখন স্পোর্টস্‌ম্যান বা ভদ্রলোকেরই দেখা পাব এখানে। তা' পাব না আগে জানলে একটা চাবুক হাতে ক'রে নিয়ে আসতুম।

বলিতে বলিতে ক্ষুব্ধ পদক্ষেপে সে চলিয়া গেল সঙ্গিনীদের কাছে।

(২)

কে যেন ভীষণ নাক ডাকাইতেছে। আবার আরও একজন কোথায় যেন চীৎকার করিয়া আদেশ জানাইতেছে—'পাশ কর', 'সেণ্টার কর', 'এগিয়ে যাও', 'প্রতুল লেগে থাক পেছনে!'

দ্বিপ্রহর রজনীতেও হোস্টেলের আবহাওয়া একেবারে ফুটবল মাঠের ক্যাপ্তেনের উদ্দীপনাময় সরব নির্দেশে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও দনুজের নিজের মুখ হইতেই মুক্তি পাইতেছে খেলার উপদেশ-বাণীগুলো, তথাপি সে মাথা ঝাঁকিয়া সিদ্ধান্ত করিল,—গভীর রাত্রিতে এ কি বিরক্তিকর চেঁচামিচি সুরু করিয়াছে হোস্টেলের এক হতভাগা ছোকরা। সে নিজে যে এমন অশিষ্ট আচরণ করিতে পারে আধা-ঘুম, আধা-জাগরণে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর।

ইহার পর চীৎকার থামিল বটে, কিন্তু অন্য এক প্রকার শব্দ বাজিয়া চলিল খট্ খট্ খট্! ঠিক যেন পাশ বালিশটাকে ফুটবল-এ পরিণত করিয়া কেহ দেওয়ালের গায়ে পুনঃপুনঃ লাথি মারিয়া ফেলিতেছে।

সহসা দনুজের মনে হইল, কে যেন তাহারই নাম ধরিয়া ডাকিয়া কক্ষটিকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। তাচ্ছিল্যের সহিতই আস্তে আস্তে সে চক্ষু মেলিল। মনে মনে ঠাওরাইয়া লইল আহ্বানকারীকে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিবে কড়া রকমের। সে হতভাগা যে-ই হোক না কেন, তাহার জ্বালায় কি লোকে রাতের আরামের ঘুমটাও উপভোগ করিতে পারিবে না শান্তিতে।

কিন্তু ঝাঁজাল সুরের সে মন্তব্য আর উচ্চারিত হইল না। ইতিহাসের সুযোগ্য অধ্যাপক এবং হোস্টেলের সুপার—স্বয়ং ডক্টর ভুজঙ্গধর কাহিলী ভূপাতিত পাশ-বালিশটার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বড় বড় চোখে দনুজের দিকেই তাকাইয়া রহিয়াছেন অপলকে। অবশ্য সে দৃষ্টিভঙ্গীতে ভীষণদর্শন ক্রোধাগ্নির দীপ্তশিখা নাই—শুধু অত্যন্ত দুঃশোর পুনরাবৃত্তিতে লোকের মুখে যে ক্লান্তি ও অবসাদের ছায়া পড়ে, তাহারই অপ্রিয় আমেজ।

—"মাষ্টার দনুজ রায়, বিছানায় শুয়ে ফুটবল প্র্যাক্‌টিস্ তোমায় বন্ধ করতে হবে। আশপাশের কামরায় নইলে যে কেউ ঘুমাতে পারছে না।"

"ওঃ!" বলিয়া উঠিল দনুজ, মনের গহনে তাহার ফুটিয়া উঠিল পরের দিন ভোর না হইতেই কি ভাবে হোস্টেলের ছোঁড়াগুলো বিদ্রূপে মসকরায় তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া ফেলিবে।—"ভারী অন্যায় করে ফেলেছি স্যার।"

অধ্যাপক চলিয়া গেলেন আপন কক্ষে। কিন্তু দনুজকে ভাবিত করিয়া তুলিল তাহার এই নিদ্রাহীন নিদ্রা। অনিদ্রা তাহার আজকাল এক অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে। আরও আকুল করিয়াছে তাহাকে এইজন্য যে, কেবল ফুটবল সিজনেই এটা দেখা দেয়। অনিদ্রা লইয়া হা হুতাশ করা তাহার অভ্যাস, আর যখনই ফুরসৎ মিলে তখনই ঔষধ আবিষ্কার করিতে সে ধ্যান-ধারণা আরম্ভ করে। ইহারই ফলে দুশ্চিন্তা তাহাকে জাগ্রত রাখে রাতের পর রাত। ফুটবল টীমটির ত্রুটিবিচ্যুতি এমন জীবন্ত রূপ ধরিয়া আর কোন সময় তাহার চোখের সমুখে দাঁড়ায় না 'লেফ্‌ট্ আউট'টার এই দোষ, 'সেণ্টার হাফ্'টা বড্ড ঢিলা, 'গোল কিপার'টা বেজায় নার্ভাস; আর সে নিজে যদি কোন খেলায় আহত হয়, তখন টীমের দশা হইবে কি! পরিণতি হইয়াছে এই যে অনিদ্রার অবচেতন পারিপার্শ্বিকে সে টীমের দোষ-ত্রুটিগুলি শোধ্‌রাইতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যায়।

এই বৎসর আবার কেমন করিয়া অজানিতেই বাস্তব দৃষ্টান্তেই কায়দা শিখাইতে সুরু করিয়াছে শয্যা-সামগ্রী লইয়া, যেমন আজ অধ্যাপক কাহিলী চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন।

সে ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিয়াছে ইহার কারণ আর কিছুই নয়—এবার সে ক্যাপ্তেনের পদে মনোনীত আর এবারই তার খেলার শেষ বৎসর। তবে আজিকার কথা আলাদা—কলেজ ছাত্রীদের চোখের সমুখে নিপুণতা প্রদর্শনের আগ্রহাতিশয্য কিছুটা প্রতিক্রিয়া সাধন করিয়াছে বলিয়া সে সন্দেহ করে, যদিও সে নিশ্চিত নয় এই অভিমতে।

এবার কলেজ টীম তিনটি ম্যাচে জিতিয়াছে, যাহা সম্ভব হয় নাই গত দুই বৎসরে। আর দুইটা ম্যাচে জিতিলেই ইণ্টার-কলেজ ট্রফি তাহাদের প্রাপ্য হইবে। এবার টীমও ভাল—ক্যাপ্তেন বিচক্ষণ, সুতরাং আশাও রহিয়াছে যথেষ্ট। কিন্তু দনুজের অনিদ্রা—এটিই যা' কালো মেঘ অথবা আশঙ্কাকর 'মনসুন' বলা যাইতে পারে ফুটবল খেলার দিগন্তে।

কিন্তু আজ যেন দনুজের মনে কি একটা অবিরাম স্পন্দন চলিয়াছে, যাহা কিছুতেই নিদ্রাকে কাছে ঘেঁসিতে দেয় না। এক মুহূর্তে যদি সে-স্পন্দনের খেই হারায় সে, অমনি সচকিত হইয়া উঠে একটা বেয়াড়া শব্দে—খট্ খট্ খট্!

এইভাবে চক্ষু বুজিয়া সজাগ পাহারায় রাত কাটাইলেও ভোর বেলায় উঠি উঠি করিয়া সত্যিকার শয্যাত্যাগ করিতে তাহার বেলা সাড়ে সাতটা হইয়া গেল। তারপর হাত মুখ ধুইয়া যখন সে চায়ের বাটি লইয়া বসিল—তখন প্রথম মে

চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিল, তাহা পূর্ব সন্ধ্যায় অপরিচিতার হস্তে নাকাল।

সম্পূর্ণ অজানা তরুণীর হাতের নাড়া যদি থুতুনীতে পাওয়া যায় জীবনে প্রথমবারের জন্য, আর তারই পরিণাম যদি রুদ্ধ তিরস্কার আরোপ করে, তবে কলেজের পড়া তৈরী করিবার মত যে মনের অবস্থা থাকে না, একথা দনুজ এতক্ষণে বুঝিতে পারে। কাজেই সাইকোলজির বই বন্ধ করিয়া সে গবেষণায় ব্যাপৃত হইল গত দিনের সন্ধ্যা-রাণীকে লইয়া।

আল্ফা বিটা ওমেগা জেটা—এমনই সূত্র ধরিয়া হোস্টেলের বিমিশ্র সভ্যদের মস্করার মালা অনুসরণ করিয়া দনুজ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, সন্ধ্যারাণীর মাটির ধরায় নামকরণ হইয়াছে রত্না দেবী। নেহাৎ আনকোরা ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী নয়—তাহাদেরই সমপাঠিনী সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাশের। এসেছে সে পূর্ববঙ্গের এক ছোট্ট শহর হইতে এবং সকল রকম আইন-কানুনের বন্ধনের বিরুদ্ধে একবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ই যেন তরুণীর উচ্চাশা।

"কিন্তু" মাষ্টার ওমেগা ও মাষ্টার থিটা এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "আমায় হাজার টাকা দিলেও ও-তরুণীরত্নটির সঙ্গে ভাব করতে এগিয়ে যাব না, কেননা, ইনি ফুটবল খেলোয়াড়কে কেঁচোর চেয়েও হীন জীব বলে মনে ভাবেন।"

এই উপদেশটির সত্যতা পরখ করিতে দনুজের বেশী সময় লাগিল না। সে ছাত্রী-হোস্টেলে ফোন করিল, লেডী সুপার মিসিস চাটার্জী অনেক 'জেরা' করিবার পর রত্নাদেবীর কণ্ঠস্বর দনুজের কানে ভাসিয়া আসিল।

দনুজ তথাপি অজ্ঞতার ভাণ করিয়া বলিল,—"আমি রত্নাদেবীর সঙ্গে কথা কইতে চাই। তাঁকে বলুন কাল তিনি যে হতভাগার ওপর চড়াও হয়েছিলেন, সে বেচারী ক্ষমা প্রার্থনা ক'রতে চায়।"

এসরাজের গমকের মত সুরে জবাব পৌঁছিল—"মিস রত্না মজুমদার সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে নারাজ।" রিসিভার ঠকাস্ করিয়া রাখিবার শব্দ হইল।

সঙ্গে সঙ্গেই দনুজ চট্পট আবার ডাকিল—"হ্যালো!... আমি......"

—'শুনুন!' কথাগুলো উচ্চারিত হইল দাঁতে দাঁত চাপিয়া রুক্ষস্বরে।—"আমি ফোনের জবাব দিচ্ছি না, আমার মতে ফোনে ডাকা পাগলামি আর নিছক অভদ্রতা। তবে ব্যাপারটা হয়েছিল একটা পণরক্ষার বাধ্যতায়—বনে-জঙ্গলে গেলে যেমন দুরন্ত জানোয়ারগুলো ঘাড়ে পড়ে। গুড্‌বাই!"

দনুজ তৃতীয়বার আহ্বান জানায়—"আমি দুরন্ত জানোয়ার নই!"

এবারে নূতন ধরণের দিশাহারা কণ্ঠস্বর বলে—"এ কলেজের আণ্ডার-গ্রাজুয়েট আবার দুরন্ত জানোয়ার নয়! আজব খবর বটে!"

আবার অনুনয় করিয়া দনুজ আবেদন পেশ করে যে সে রত্নাদেবীর সঙ্গে কথা বলিতে চায়।

—"আপনি এমন হোপলেস্ নুইসেন্স কেন বলুন ত?"

—কারণ আমি ভয়ানক একটা বিশ্বেষ পোষণ করি আপনার প্রতি। অবশ্য আমার পক্ষে খাম্‌কা একটা 'রায়' দেওয়া ঠিক নয়—কিন্তু আমার সদিচ্ছা এই যে, আপনার সম্বন্ধে বিশ্বেষটা পাল্টাবার 'চান্স' আপনাকে একটা দিতে চাই।

—কেন? এতসব......

—সুতরাং ছটা পনেরয় আজ বিকেলে অথবা আপনি যদি চান ঠিক ছটায় আপনাদের হোস্টেলের কমন্-রুমে—

—নিশ্চয়ই না।

—শুনুন, রিসিভার রেখে দেবেন না। দু'আনা দু'আনা করে এত ক্ষেপ ফোন্ কলের দাম দিলে বিকেলে জলখাবারের পয়সা আমার সব শেষ হয়ে যাবে আজই। বাকি মাস আর জলখাবার জুটবে না বরাতে। তাহলে আমরা ছ'টাই ঠিক করি।

—নিশ্চয়ই না। উই সারটেন্‌ই শ্যাল্ নট্।

—গুড্! ঠিক ছটায় হাজির হব। ধন্যবাদ! এইবারে দনুজ সত্য সত্যই রিসিভার রাখিয়া দিল এবং আপন মনেই হাসিয়া উঠিল—হো হো শব্দে।

(৩)

মেয়েদের হোস্টেলের সাক্ষাৎ-কক্ষে দনুজ বসিয়া আছে আধ ঘণ্টা ধরিয়া রত্নাদেবীকে সংবাদ পাঠাইয়া। কিন্তু রত্না-দেবী তো ছ'টা পনের মিনিটের মর্যাদা রক্ষা করিল না। প্রথম কয়েক মিনিট দনুজ ভাবিল রত্নাদেবী প্রতিশোধ লইতেছে তাহার বাড়াবাড়ির জন্য। কিন্তু যখন আধ ঘণ্টা কাটিয়া পৌনে সাতটা বাজিল তখন সে সন্দিহান হইয়া পড়িল সত্যই রত্না আসিবে কি না। দনুজের হইল নির্জন কারাবাস মেয়েমহলের কমন-রুমে—মাছিটি পর্যন্ত তাহার সাহচর্য বরদাস্ত করিতে নারাজ। বিংশ শতাব্দীর আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্ভোগ আর কি হইতে পারে।

সাতটা বাজিল। দনুজের ব্যাকুলতাও দূরে হইল—রত্নাদেবীর জাঁকালো পোষাকে মোড়া কিন্নরী-মাধুরিমায় আবির্ভাবে। কিন্তু সে মুহূর্তের তরে—রত্নার মুখের বাণী দনুজকে একটু অজানা আতঙ্ক-মায়ায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। রত্নার ধার-করা সৌজন্যে যেন কোথায় রহিয়াছে শ্লেষের ছোঁয়া।

—বড্ড খুশী হলুম আপনি যে আসতে পেরেছেন দনুজবাবু। আর—আর মিসিস চাটার্জিও খুব তুষ্ট হয়েছেন সে কথাই বলতে আমায় পাঠালেন।

—আসতে পেরেছেন?

মিন্‌মিনে সুরে সন্দেহাকুল অন্তরে দনুজ বলিয়া ফেলিল। পরে মুখ তুলিয়া দেখিল রত্নাদেবীর চোখে-মুখে কেমন একটা সেয়ানা হাসির ছোঁয়াচ খেলিয়া বেড়াইতেছে।—"মিসিস চাটার্জি? তিনি আবার কে?"

—আমাদের হোস্টেলের মাসি-মা। এই ক'মিনিট আগেও তিনি বল্‌ছিলেন, একটি তরুণকে আমাদের মেয়েদের মাঝে পাওয়া কি সুন্দর। এমন সৌভাগ্য তো আমাদের হয় না।

—কিন্তু আমরা তো আর এখানে বসে থাক্‌ছি না মিসিস চাটার্জির সঙ্গে। আপনি তো আমার সঙ্গে চলে যাচ্ছেন! দনুজের দুই চক্ষু চমকে বিস্ফারিত।

—তা কি হয়! সে কথা ভাবতেও আমি পারি নে। মিসিস চাটার্জি কত কি খাবার তৈরী করিয়েছেন আপনি এসেছেন বলে। নিশ্চয়ই আপনি এখানে এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন, যা শীগ্গির ভুলতে পারবেন না।

রত্নার কথাই সত্য হইল। পরবর্তী এক ঘণ্টাকাল এমন নিদারুণ এক অস্বস্তির ভিতর দিয়া দনুজ কাটাইল যে, উহার তুলনায় তাহার কেবলই মনে হইতেছিল একটি রাতের স্বপ্নের কথা। সে রাতে স্বপ্নের দুঃসহ যাতনায় দনুজ চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, খেলার হাফ-টাইমের সময় কাহার যেন সিগারেটের আগুনে তাহার হাফ-প্যাণ্ট পুড়িয়া গেল এবং নগ্ন অবস্থায় হাজার হাজার দর্শকের সম্মুখ দিয়া তাহাকে ছুটিয়া যাইতে হইল তাঁবুতে। মেয়ে হোস্টেলের সে রাতের খাওয়া হইল তেমনই একটা ব্যাপার—নির্মম আর সূচ-বিঁধানো।

দনুজ ভীরু নয়। যে কোন সময়ে সে দুইটি কিম্বা তিনটি মেয়ের সঙ্গেও কথা চালাইতে পারে রীতিমত প্রশংসনীয় পন্থায় একসঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া। কিন্তু সাতাশটি মেয়ে যখন তাহদের দৃষ্টি ও মনোযোগ সমষ্টি যুগপৎ তাহার উপর বর্ষণ করিল, তাহার স্বাভাবিক নির্ভীকতা রণে ভঙ্গ দিল। এমন একটা কথাও সে আবিষ্কার করিতে পারিল না, যাহা এ-সময় বলা যাইতে পারে। যদি-বা অসম সাহসে দুই-একটা কথা বলিতে উদ্যত হয়, তখন সকল মেয়ে মিলিয়া এমন একটা নীরবতার সৃষ্টি করে যে, তাহার বাক্য যেন পাগলা-গারদের আসামীর প্রলাপে পরিণত হয়। তাহার মুখ হইতে মুক্তি পাওয়া মাত্র সে চায় মেয়েগুলোর স্মৃতি থেকে তাহা মুছিয়া যাক্—কিন্তু সে কাজটি অসম্ভব বুঝিয়া সে ঘামিয়া সারা হয়।

তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, যখন অবশেষে মেয়ে হোস্টেলের ফটকে পৌঁছাইয়া দিল রত্নাদেবী নিমন্ত্রিত দনুজকে। মাথার উপর তারায় ভরা আকাশ বিদ্রূপ করে চোখ মট্‌কাইয়া, মুক্ত বায়ু গুমরিয়া আনে বিদায়-বাণী—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ! দেবদারু গাছে-বসা পেঁচা একটা চেঁচাইয়া বলে—শোধ-বোধ, নিম্ নিম্ নিম্।

দনুজ আর চাপিয়া রাখিতে পারে না যে অবরুদ্ধ-নিগ্রহ তাহার বুক ঠেলিয়া উপরে উঠিতে চায়। উত্তেজনার সুরেই বলে,—"আমি যদি সত্যই কোন রকমের একটা মানুষ হই, তবে আমার উচিত আপনার থুতনি বাদ দিয়ে আর ওই পাথরের খোদা কানটা আপনার ধরে বেশ করে মলে দেওয়া।"

—'নন্‌সেনস্', বলিতে বলিতে রত্নাদেবী বিপুল হাসির তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়ে।—'আপনাকে ডিনার অবধি ধরে রাখবার কারণ আর কিছুই নয়, এবার শোধ-বোধ হয়ে গেল। এবার সমান সমান।'

—হাঁ, তার মানে আজকের বিকালটাই মাটি। আমার শোবার সময় হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার শোয়া মানে সারা রাত চোখ মেলে কড়িকাঠ গোনা বিছানায় পড়ে থেকে।

—কড়ি-কাঠ গোনা বুঝি আপনার 'হবি'?

এবার দনুজ সহানুভূতির আশায় ফুটবল সিজনে অনিদ্রার কথা খুলিয়া বলে।

বক্তৃতার ভঙ্গীতে রত্না বলে—ওঃ আপনি বুঝি 'সাইকোলজি থার্টি-ওয়ান' লেকচারটা অ্যাটেণ্ড করেন নি। তাতে প্রোফেসর সরকার সব বুঝিয়ে দিয়েছেন—কেমন করে ঘুমটা শুধু ইচ্ছা-শক্তির (will-power) কাজ।

—রেখে দিন উইল-পাওয়ার আর সাইকোলজি! আমি কত কত সিস্টেম্ ধরে চললাম, কিছুতেই কিছু হ'ল না। ভেড়া গোনার মত শক্ত ব্যাপারও আমি পরখ করে দেখেছি, শেষটায় ভেড়াগুলো আকাশে উড়ে বেড়ায়।

—ভেড়া আকাশে ওড়ে, ব্যাপার সাউন্ড্ তা হলে। আচ্ছা, শোবার আগে স্নান—

—সেটা পরখ করা হয় নি। আপনি যখন বলছেন একবার চেষ্টা করে দেখব। এটা নতুন বটে। ধন্যবাদ আপনি যে আমার জন্যে এতটা মাথা ঘামাচ্ছেন।

—হ্যাঁ, আমার একটু কৌতূহল আছে বই কি। আমি ভাবতাম যারা বেশী মস্তিষ্ক চালনা করে তারাই অনিদ্রায় ভোগে। কিন্তু ফুটবল খেলোয়াড়ের অনিদ্রা এ যে সৃষ্টিছাড়া!

—সৃষ্টিছাড়া?

—পায়ের মাসেল্ গোদা করা যে খেলার কারসাজি তাতে ব্রেন্ ক্লান্ত হয় না।

—ফুটবল খেলায়ও ব্রেন্—

—হাঁ, যখন মেয়েদের থুতনী ধরে অপমান করতে হয়। ক্ষমা করবেন শোধ-বোধের পর আবার উল্লেখ করলাম বলে। কথাটা কি হচ্ছে জানেন—প্রস্তর যুগে একটা জানোয়ার ছিল অতিকায়, 'মেগালোসরাস্' বলে। ওজনে ছিল তিন শ' মণ, কিন্তু ব্রেন্ তার ছিল না আদপেই। ফুটবল খেলোয়াড়গুলো ঠিক এই জানোয়ারটার মত হুবহু।

—তা বলে রত্নাদেবী, ও-কথা খাটে না সবার বেলা। 'জেনারালাইজ' করা চলে না। আপনার দোষই তো ওই—সহিষ্ণুতা জিনিষটি ভগবান আপনাকে দেন নি।

—জীবনের হুটোপাটি করা, হাত-পা ছোড়া ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে, এটা অনুভব করা যদি সহিষ্ণুতার অভাব হয়—তা হলে অবশ্য আমায় অসহিষ্ণু বলতে পারেন।

ফটকে দাঁড়াইয়াও দনুজের সে রাতে 'গুড-বাই' বলিতে ঢের ঢের বচসায় লিপ্ত হইতে হইল—যা নাকি সে পূর্বে কল্পনাও করিতে পারে নাই। তবে হোস্টেলে ফিরিয়া সেই রাত্রিতে ঠান্ডা জলে স্নান করিতে সে ভুলে নাই—কারণ সেটি হইল রত্নাদেবীর তরফ হইতে প্রথম প্রস্তাব দনুজের অনিদ্রা প্রতিরোধে।

তাহাতেও কিন্তু শয্যা গ্রহণ করিলে দনুজের অভ্যস্ত কড়ি-কাঠ গোনা বন্ধ হয় নাই। শুধু তফাৎ এইটুকু হইয়াছে যে, সে রাত্রিতে যে জাগ্রত-স্বপ্ন দনুজের চারিদিকে ভিড় করিয়া আসিয়াছে, তাহার সহিত ফুটবল খেলার কোনও সম্পর্ক ছিল না।

তথাপি কিন্তু অনভ্যাসের ফোঁটা—রাত্রি দ্বিপ্রহরে স্নানের পরিণামে মৃদু শক্তির সর্দির আক্রমণ আসিতে বাধা হয় নাই।

(ক্রমশ)

পুস্তক পরিচয়

বঙ্কিম দর্শনের দিগ্-দর্শন—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন এম-এ, কাব্যতীর্থশাস্ত্রী। প্রকাশক—শ্রীবারিদকান্তি বসু, ৫৮।১, প্যারীদাস রোড, ঢাকা। মূল্য দুই আনা। পাকা হাতের লেখা। ভাষার ভিতর দিয়া ভাবের ঘন বাঁধুনি এবং বিশ্লেষণভঙ্গী আমাদের কাছে খুবই ভাল লাগিয়াছে। লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মবাণীকে দেশবাসীর অন্তরে বাজাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। এ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বাঙলার ধর্ম্মগুরু (প্রথম খণ্ড)—শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য। ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত; মূল্য দুই টাকা।

'বাঙালীর বল' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা রায় সাহেব শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বাঙালী পাঠকের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার লিখিত এই নূতন গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া আমরা অপরিসীম প্রীতিলাভ করিয়াছি। 'বাঙলার ধর্ম্মগুরু'র প্রথম খণ্ডে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস ঠাকুর, প্রভু নিত্যানন্দ, সনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী, মহাপ্রভু, গোস্বামী লোকনাথ এবং নরোত্তম ঠাকুর রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীগোপাল ভট্ট, আচার্য্য শ্রীনিবাস, ঠাকুর নরহরি সরকার, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভোলা গিরি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামদাস কাঠিয়া বাবা, এবং সন্তদাস বাবাজীর সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ৪১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—বেশ বড় বই। শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরে লেখা, ভাষা সরস এবং হৃদয়গ্রাহী। এমন সৎ গ্রন্থের সমাদর সর্ব্বত্র হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। ছাপা, বাঁধাই তক্তকে, ঝক্ঝকে এবং সর্ব্বাংশে সুন্দর।

আতঙ্ক—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত এম এ। প্রকাশক—সত্যচরণ দাস, কমলা পাব্লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট। দাম বারো আনা।

সুধাংশুবাবু বাঙলার পাঠক সমাজে সুপরিচিত না হইলেও, আতঙ্কে তার শক্তির ও মৌলিকতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 'আতঙ্ক' কতকগুলি রোমাঞ্চকর এবং রহস্য-জনক গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি সুলিখিত। প্রথম গল্পটি ভৌতিক এবং এই গল্পের দুঃসাহসী নায়ক শঙ্করলালের শোচনীয় আত্মহত্যার একমাত্র কারণ যে, তার মনস্তাত্ত্বিক দুর্ব্বলতা, তাহা লেখক নিপুণভাবে অবতারণা করিয়াছেন। কল্পনা ও বাস্তবতার যোগাযোগে শেষের দুইটি গল্প মনোজ্ঞ। যাহারা রোমাঞ্চকর আখ্যান ভালবাসেন তাহাদের পক্ষে এই বইখানি উপাদেয়। ভাষা প্রাঞ্জল এবং লিখন-ভঙ্গি সাবলীল। প্রচ্ছদ পটে আতঙ্কের অভিব্যক্তি প্রশংসনীয়।

বাক্যরাও—(নাটক) গ্রন্থকার—শ্রীভোলানাথ ঘোষ। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু লইয়া নাটকখানি রচিত। অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত ঐতিহাসিক তথ্যের কিছুটা উদ্ঘাটন এই প্রকার প্রয়াসের দ্বারা সম্ভব। সেই হিসাবে হয়ত ইহার প্রয়োজনীয়তা কিছু আছে।

কিন্তু যে ভাষার লহরে ও পারিপার্শ্বিকে বক্তব্যের খুঁটিনাটিকে রূপদান করা হইয়াছে তাহা যে আধুনিক বাঙলার রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নয়, একথা নাট্যকারের স্মরণ রাখা উচিত ছিল। প্রথম প্রয়াস বলিয়া নাট্যকার ভূমিকায় অজুহাত জানাইলেও নাটক রচনার মূলে যে দৃষ্টিভঙ্গী, তাহাতে আধুনিকতার ছাপের প্রতি উদাসীনতা এমন বিদ্রোহই প্রচার করে, যাহা প্রগতির পদে নিগড় ভিন্ন আর কিছুই নয়।

সমাজে নারী সমস্যা—শ্রীহরিদয়াল মজুমদার প্রণীত। অমৃত পাব্লিশিং হাউস, ৬নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। শ্রীযুত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা। লেখক নারীরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা এই পুস্তকখানায় আন্তরিকতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় নারী-ধর্ষণকারীদিগকে সমুচিত দণ্ড বিধানের দ্বারা সায়েস্তা করিতে স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। নারী সমাজকে আহ্বান করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধর গো। পুস্তকখানার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

রাতের মহলা

(৩৬১ পৃষ্ঠার পর)

তোমায় অপারাটের পাঠিয়েছে, তাতে তো মনে হয় না, তোমার বোমাবৃষ্টি আমাদের আশানুরূপের চেয়ে বেশী কিছু হয়েছে। নিশ্চয়ই একটা কচু গাছও মরেনি তোমার বোমায়? কি বল? আচ্ছা, নেবে আস্তে ঘাঁটিতে তোমার এত সময় লাগল কেন?

—মেঘ আর ঝড়ের জন্যে বেশী উঁচুতে উঠতে হয়েছিল কি না? শেষটায় নীচুতে চোখ অভ্যস্ত করতে একটু সময় লাগল। তা ছাড়া হালকা গোছের কুয়াশা ছিল মন্দ নয়।

—বেশ, বেশ। দেখছি রাস্তায় মরে থাকলে তোমায় নিয়ে আমাদের এর চেয়ে বেশী মাথা ঘামাতে হত না। হা-হা-হা। ভাল কথা, নেভিগেটর তোমার কেমন শিখছে?

—সে বেশ শিখে নেবে স্যার।

—অল রাইট। গুড নাইট্!

—গুড্ নাইট স্যর।

সে অভিবাদন করে বাইরে বেরিয়ে এল। চারিদিকের আলো তাকে ধাঁধিয়ে দিল। কেউ কোথাও নেই। সে শুনতে পেল কোথায় যেন একটা মিস্ত্রি সুর টেনে কাজ করে যাচ্ছে। কোন বিমানটায় পেট্রল পোরা হচ্ছে, তারই গবগব্ আওয়াজ ভেসে আসছে। মেসের দিকে সে পা চালিয়ে দিল দ্রুত।

সর্ব্বশরীর যেন তার হিম। সে ক্লান্ত। সে ক্ষুধার্ত। আর সে মাত্র ২৩ বছর বয়সে পা দিয়েছে।

সাহিত্য-সংবাদ

রচনা প্রতিযোগিতা

ধানমণ্ডাই সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে একটি রচনা প্রতিযোগিতা হইবে। রচনার বিষয়—বর্ত্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতি ও ছাত্রছাত্রীদের কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবে। উপযুক্ত রচনা পাঠাগারের মুখপত্র হস্তলিখিত পত্রিকা "পথচারী"তে প্রকাশ করা হইবে। পুরস্কার একটি রৌপ্য-পদক দেওয়া হইবে। রচনা আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৌঁছান চাই।

শ্রীজয়শঙ্কর গুপ্ত,
সম্পাদক—"পথচারী",
ধানমণ্ডাই, পোঃ—রমণা, ঢাকা।

রচনা প্রতিযোগিতা

কোন্নগর সুহৃৎ সঙ্ঘের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

(১) প্রবন্ধঃ—নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি—

(ক) কোন পথে ভারত
(খ) গান্ধীবাদ ও দেশের ভবিষ্যত
(গ) অতীত ও বর্ত্তমানের ছাত্র সম্প্রদায়
(ঘ) আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরস
(ঙ) 'আজি হতে শত বর্ষ পরে'।

(২) কবিতা।

(৩) ছোটগল্প।

উপরোক্ত যে কোন বিষয়ে যে কেহ লেখা পাঠাইতে পারেন। প্রত্যেক বিষয়ের শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য একটি করিয়া রৌপ্য-পদক দেওয়া হইবে। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এর মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়,
সুহৃৎসঙ্ঘ, কোন্নগর (হুগলী)।

গল্প প্রতিযোগিতা

'সেল্ফ-কাল্‌চার এসোসিয়েশন' পরিচালিত হাতে-লেখা পত্রিকার জন্য একটি গল্প প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। যে কোন বিষয় লইয়া গল্প লেখা চলিবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বা লেখিকাকে একটি রৌপ্য-পদক উপহার দেওয়া হইবে। সর্ব্ব-বিষয়ে এই সমিতির সিদ্ধান্ত চরম বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ৩১শে আগষ্টের মধ্যে লেখা পাঠাইতে হইবে। (ঠিকানা—সম্পাদক, ২০৩এ বহুবাজার ষ্ট্রীট্) এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। লেখা ফেরৎ পাইতে বা চিঠির উত্তর পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট সঙ্গে থাকা দরকার। গল্পের সঙ্গে নিজ ঠিকানাও পাঠাইতে হইবে। এই সমিতির কোন সদস্যের কোন লেখা গ্রহণ করা হইবে না।

সেক্রেটারী,
সেল্ফ-কাল্‌চার এসোসিয়েশন।

রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতা

উলুবেড়িয়া "সবুজ সঙ্ঘের" উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদিগের জন্য 'রচনা ও চিত্র' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

বিষয়ঃ—রচনা—বাঙলা দেশে বন্যার প্রকোপ ও তাহার প্রতীকার (ফুলস্কেপ সাইজ আট পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়া আবশ্যক)। চিত্রাংকন—বেহারা (পাল্কীবাহক)।

উপরোক্ত প্রত্যেক প্রতিযোগিতার জন্য একটি করিয়া সুদৃশ্য রৌপ্যপদক (প্রথম পুরস্কার) দেওয়া হইবে। আগামী ২রা আশ্বিন (ইং ১৯শে সেপ্টেম্বর), মঙ্গলবারের মধ্যে সমগ্র রচনা ও চিত্র নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাইলে যে কোন অনুসন্ধানের জবাব দেওয়া হইবে এবং অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হইবে। প্রতিযোগিরা আপন আপন ঠিকানা দিতে ভুলিবেন না। খামের উপর 'প্রতিযোগিতা' লিখিবেন। 'সঙ্ঘের' বিচার চরম বলিয়া ধার্য হইবে।

ঠিকানা—শ্রীঅনিলকুমার মেউর, ৪নং ডাক্তার বাই লেন, তালতলা, কলিকাতা অথবা শ্রীপাঁচুগোপাল আঢ্য, C/O বাবু বিজয় কৃষ্ণ আঢ্য, উলুবেরিয়া, পোঃ—হাওড়া।

আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, সবুজ সমিতি, ইটালী

আবৃত্তিঃ—বিষয়—(১) বিদ্রোহী—কবি নজরুল ইস্‌লাম; (অগ্নিবীণা এবং সঞ্চয়িতায় প্রাপ্তব্য)। (২) অভিসার—বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ (চয়নিকা অথবা সঞ্চয়িতায় প্রাপ্তব্য)। প্রবন্ধঃ—বিষয়—ছাত্র ও স্বাস্থ্যচর্চ্চা।

এই প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র ছাত্র-ছাত্রীরাই যোগদান করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ফুলস্ক্যাপ্ কাগজের এক পৃষ্ঠায় বাঙলায় লিখিতে হইবে। তবে উহা যেন ১২ পৃষ্ঠার বেশী না হয়। নাম অথবা লেখা পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। নাম অথবা প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় ব্যক্তিগত ঠিকানা এবং বিদ্যালয়ের নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিতে হইবে। নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় নাম অথবা প্রবন্ধ প্রেরিতব্য এবং বিবরণাদি জ্ঞাতব্য।

(১) শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ৭৫-এ, দেব লেন; (২) অমর ভট্ট, ৫-আর, মিডিল রোড; (৩) প্রভাষ বর্দ্ধন, ৩১, শম্ভুবাবু লেন, ইটালী, কলিকাতা।

প্রবন্ধ গল্প কবিতা ও চিত্র প্রতিযোগিতা

আমাদের হস্তলিখিত 'তরুণ'-এর উদ্যোগে একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সকলেই অবিলম্বে যোগ দিন। সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ লেখা এবং চিত্রের জন্য নিম্নের ঘোষিত পুরস্কার দেওয়া হইবে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লেখা ও ছবি 'তরুণ'এ প্রকাশ করা হইবে। কোন প্রবেশ মূল্য নাই। পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৫শে ভাদ্র ১৩৪৬ সাল। উপযুক্ত ডাক টিকিট দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভবপর নয়। ফলাফল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে।

(১) প্রবন্ধ—"সিনেমার আকর্ষণে বর্ত্তমান ছাত্রসমাজ" ১টি রৌপ্যপদক। (২) আধুনিক গল্পঃ—যে কোন বিষয়ে (কেবল মহিলা এবং ছাত্রদের জন্য)—২টি রৌপ্যপদক। (৩) কবিতাঃ—যে কোন বিষয়ে—একটি রৌপ্যপদক। (৪) চিত্রঃ—(তুলি আঁকা বা ফটো)—'পল্লীর প্রাকৃতিক দৃশ্য।' ১টি সুদৃশ্য রৌপ্যপদক।

লেখা ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানাঃ—সম্পাদক 'তরুণ'

রূপবাণীতে রিক্তা

'রিক্তা'—ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রথম বাঙলা ছবি। কাহিনী—শ্রীযুত তুলসী লাহিড়ী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা শ্রীযুত সুশীল মজুমদার; প্রধান যন্ত্রী—শ্রীযুত মধু শীল; সংগীত পরিচালনা—শ্রীযুত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়; চিত্র-শিল্পী—শ্রীযুত অজিত সেনগুপ্ত; শব্দযন্ত্রী—শ্রীযুত রবীন চট্টোপাধ্যায়; দৃশ্য-পট পরিকল্পনা—শ্রীযুত অর্জ্জুন রায়; সম্পাদনা—শ্রীযুত বিনয় ব্যানার্জ্জি। চরিত্রলিপিঃ—বিকাশ—অহীন্দ্র চৌধুরী; অশোক—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়; বুলাকীপ্রসাদ—তুলসী লাহিড়ী; বিমল—সুশীল মজুমদার; দিপেন্দ্রনারায়ণ—মোহন ঘোষাল; ডাক্তার—সন্তোষসিংহ; করুণা—ছায়া; সরমা—দেববালা; রমলা—রমলা; ত্রিপুরা—রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। পরিবেশক—প্রাইমা ফিল্মস্। গত ১৯শে আগষ্ট হইতে রূপবাণী চিত্রগৃহে দেখান হইতেছে।

বাঙলাদেশের একটি সামাজিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া রিক্তা ছবিখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বুঝিবার ভুলে যে কতখানি অনর্থ ঘটিতে পারে তাহারই করুণ কাহিনী এই ছবিতে দেখান হইয়াছে। ইহা কোন একটা নূতন ব্যাপার নহে, বহু পরিবারে এই রকম ঘটিয়াছে এবং এই রকম কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইতিপূর্ব্বে ছবি বা নাটক দেখান হইয়াছে। সুতরাং এই কাহিনীর মধ্যে মৌলিকত্ব নাই। তারপর অনেক স্থানে সংলাপের মধ্যে এমন গুরু-গম্ভীর ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে যাহা সাহিত্যে হয়ত চলিতে পারে, কিন্তু চলচ্চিত্রে সেই ভাষা চলে না। নরনারী অথবা স্বামী-স্ত্রী কথাবার্ত্তার মধ্যে সাধারণত চলতি ভাষার ব্যবহারই করিয়া থাকে সাহিত্যের বড় বড় কথা বলে না।

আরম্ভ হইতে ছবির গতি নিতান্ত মন্থর। প্রথম হইতে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের ঘটনা পর্য্যন্ত ছবির কাহিনী ভালই বলিতে হইবে। তারপর স্ত্রীর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই অধ্যায়ে পরিচালক শ্রীযুত সুশীল মজুমদার মহাশয় সাধারণ দর্শকদের পরিতুষ্ট করার জন্য এমন কতকগুলি ব্যাপার করিয়াছেন, যাহা আমরা শ্রীযুত মজুমদারের নিকট হইতে আশা করি নাই। এই তরুণ পরিচালক সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বের দুইখানি ছবি দেখিয়া আমরা যে ধারণা করিয়াছিলাম বর্ত্তমান ছবি দেখিয়া তাহা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলাম। স্থূল হাস্যরস ও সুরুচির অভাব যদি দর্শকদের তৃপ্ত করার একমাত্র উপায় বলিয়া কেহ মনে করেন তবে তিনি নিতান্ত ভুল করিবেন। এক শ্রেণীর দর্শক আছেন, যাঁহারা হয়ত ইহা পছন্দ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারাই চিত্রজগতের সবখানি নহেন। এই অধ্যায়ের মধ্যে নানা প্রকার অবান্তর দৃশ্যের আমদানী করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে মূল কাহিনীটি অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে নানাপ্রকার অবান্তর দৃশ্যের অবতারণা করিয়া কাহিনীর গুরুত্ব একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে এবং যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ফলে, সমগ্র ছবি দেখার পর এই ছবি এবং তার কাহিনী মনের উপর কোন রেখাপাত করে না।

স্ত্রী করুণার ভূমিকায় শ্রীমতী ছায়া ও বুলাকীপ্রসাদের ভূমিকায় শ্রীযুত তুলসী লাহিড়ী চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। বিকাশের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, অশোকের ভূমিকায় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুত সুশীল মজুমদার বিমলের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। এই ভূমিকায় একমাত্র আদালতের দৃশ্য ছাড়া তাঁহার আর কোন দৃশ্য আমাদের ভাল লাগে নাই। প্রণয়ের যে দৃশ্যগুলি তিনি অভিনেতারূপে দেখাইয়াছেন, তাহা সুরুচির পরিচায়ক নহে। পরিচালকরূপে তিনি অভিনেতা সাজিয়া যে সুযোগ লইয়াছেন, তাহা অন্য কোন পরিচালকের অধীনে যে তিনি পাইতেন না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। শ্রীযুত সুশীল মজুমদারের এই ছবি ইহাই সপ্রমাণ করিয়াছে যে, সব পরিচালকের তাঁহাদের ছবিতে অভিনয় করা উচিত নহে। সরমার ভূমিকায় শ্রীমতী দেববালা সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার রূপসজ্জার পরিবর্ত্তন করা উচিত ছিল। রমলার ভূমিকায় শ্রীমতী রমলা খুব সুন্দর অভিনয় করিতে না পারিলেও, অকুণ্ঠ অভিনয় করিয়াছেন। ডাক্তারের ভূমিকায় সন্তোষ সিংহের অভিনয় ভাল হইয়াছে। দিপেন্দ্রনারায়ণের ভূমিকায় মোহন ঘোষালের অভিনয় আমাদের একেবারেই ভাল লাগে নাই।

ছবির চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। দৃশ্যপটগুলি অতি চমৎকার হইয়াছে। সংগীত পরিচালনা অনুল্লেখযোগ্য। সম্পাদনা ভাল হয় নাই।

সম্মিলিত ব্যায়ামের ভবিষ্যৎ

দশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙলা দেশে সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীর প্রচলন ছিল না। শত শত বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী সম্মিলিতভাবে একই তালে, একই ছন্দে, একের নির্দ্দেশে বিভিন্ন ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিবে এবং তাহা বাঙলা দেশে কোনদিন সম্ভব হইবে বলিয়া কেহ কল্পনা করিত না। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশের প্রচলিত সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনী যে বাঙলা দেশেও সম্ভব, ইহা ধীরে ধীরে সকলে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। হাওড়ায় অনুষ্ঠিত নববর্ষের প্রথম দিবসের অনুষ্ঠানই এই বিষয়ে প্রেরণা দিয়াছে। হাওড়া ফেডারেশনের একনিষ্ঠতার ফলস্বরূপ বাঙলার সর্ব্বত্র এই বিষয়ে উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। নববর্ষের প্রথম দিবসের অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া কলিকাতা ও বাঙলার বিভিন্ন জেলায় সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইতেছে। এই বৎসরে কলিকাতার কয়েকটি অঞ্চলে ও বাঙলার কয়েকটি জেলায় হাওড়ার অনুষ্ঠানের অনুকরণে সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সকল অনুষ্ঠানে শত শত বালক ও যুবককে যোগদান করিতে দেখা গিয়াছিল। এই বৎসরের এই সকল অনুষ্ঠান সারা বাঙলার ব্যায়াম-উৎসাহী যুবকগণকে এতই প্রেরণা দান করিয়াছে যে, আগামী বৎসরে কিরূপে সকল জেলাতেই এইরূপ সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনী হইতে পারে, তাহার জন্য এখন হইতেই প্রচেষ্টা চলিয়াছে। এই সকল উৎসাহীগণের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আগামী বৎসরে সারা বাঙলা দেশে নববর্ষের প্রথম দিবসে সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া যে দেখা যাইবে, সেই বিষয় আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

বাঙলা সরকারের স্বাস্থ্য ও শরীর-চর্চ্চা প্রচার বিভাগ এতদিন এই বিষয়ে নীরব ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশবাসীর এই দিকে উৎসাহ পরিলক্ষিত দেখিয়া নীরব থাকা সমীচীন হইবে না বিবেচনা করিয়া এই বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। ইহার ফলস্বরূপ এই বৎসর কলিকাতার গড়ের মাঠে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রগণকে লইয়া দুইটি প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। এই দুইটি অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, সেই অনুপাতে প্রদর্শনী যে খুব উচ্চশ্রেণীর হইয়াছিল, ইহা কোনরূপেই বলা যায় না। ইঁহাদের অনুষ্ঠান অপেক্ষা কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা-বিভাগ যে সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই নিখুঁত ও দর্শনযোগ্য হইয়াছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাহারা কোনদিনই আধুনিক ব্যায়াম কৌশলের "অ, আ" জানে না বা শুনে নাই, তাহারা ব্যায়াম শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর অধীনে একই তালে ও একই ছন্দে ব্যায়ামের বিভিন্ন কৌশল নিখুঁতভাবে প্রদর্শন করিবে, ইহা কেহই কল্পনাই করিতে পারে নাই। শিক্ষা দিবার পদ্ধতির গুণেই যে ইহা সম্ভব হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা-বিভাগ এইরূপে সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বৎসরের অনুষ্ঠানের মত এইরূপ বিরাট অনুষ্ঠান ইতিপূর্ব্বে কখনই হয় নাই। আগামী বৎসরে ইহা অপেক্ষাও বিরাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা উক্ত শিক্ষা-বিভাগ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ক্লাব ও স্কুল

এই বৎসরে এই সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনী অনেক ক্লাব ও স্কুলের বার্ষিক উৎসবের তালিকাভুক্ত হইয়াছে বলিয়া দেখা গিয়াছে। সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছাড়া উৎসব যে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না, ইহাই যেন তাঁহারা সকলে অনুভব করিতেছেন। এই সকল ক্লাব ও স্কুলের প্রদর্শনীর খবর অন্যান্য স্কুল ও ক্লাবের পরিচালকগণকে চঞ্চল করিয়াছে। তাঁহারাও এইরূপ অনুষ্ঠান বাৎসরিক উৎসবের সময় ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া চিন্তা করিতেছেন। সুতরাং দুই তিন বৎসর পরে যদি সারা বাঙলা দেশের সকল ক্লাব ও স্কুলের বার্ষিক উৎসবের সময় সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে বলিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই থাকিবে না। বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থাৎ কলেজসমূহে এই বিষয়ে কোনরূপ উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। অনেকের ধারণা এই সকল প্রতিষ্ঠান এইরূপ সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীতে কোনদিন সাড়া দিবে না। কিন্তু আমরা এইরূপ ধারণা সমর্থন করি না। কারণ, আমরা জানি, স্কুল, ক্লাব ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানেই একদিন বাঙলার সকলকে অর্থাৎ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে এই একই বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করিতে দেখা যাইবে। বর্ত্তমান পৃথিবীর সম্মিলিত ব্যায়ামের আদর্শস্থল হইতেছে জার্ম্মানী, রাশিয়া, ইটালী, ফ্রান্স ও জাপান প্রভৃতি দেশ। এই সকল দেশে জাতীয় সকল অনুষ্ঠানেই লক্ষ লক্ষ বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী সম্মিলিতভাবে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল দেশের ব্যায়াম চর্চ্চার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও এই সকল দেশে সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীর অবস্থা আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা কোন অংশে ভাল ছিল না। অথচ কুড়ি বৎসর পরে এই সকল দেশের সেই অবস্থা আর নাই। সেইরূপ আমাদের দেশের সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীর অবস্থা যে, কুড়ি বৎসর পরে এইরূপ থাকিবে না, ইহা বলা কোনরূপেই বাতুলের উক্তি হইবে না। সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনী জাতির সঙ্ঘবদ্ধতার ও কর্ম্মতৎপরতার প্রকৃত পরিচায়ক। সুতরাং এই বিষয়ে উৎসাহিত হওয়া অর্থে জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও কর্ম্মতৎপর করিবার জন্য অগ্রসর হওয়া। যাহারা এই বিষয়ে অগ্রণী, তাঁহারা যে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনে লিপ্ত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল সাধকদের একনিষ্ঠতার জন্য একদিন সম্মিলিত ব্যায়াম বাঙলার শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে প্রসার লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২২শে আগষ্ট—

বার্লিনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, জার্ম্মানী এবং সোভিয়েট রাশিয়া একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করিতে স্বীকৃত হইয়াছে এবং চুক্তির আলোচনা শেষ করার জন্য জার্ম্মান পররাষ্ট্র সচিব হের ভন রিবেনট্রপ মস্কো রওনা হইবেন। এই ঘোষণার ফলে বৃটেনে ও ফ্রান্সে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং উভয় মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে।

সীমান্ত প্রদেশের এবটাবাদের নিকটবর্ত্তী 'বাফা' নামক স্থানে মুসলিম লীগ দল ও কিষাণ দলের মধ্যে হাঙ্গামার ফলে পুলিশকে গুলী চালাইতে হয়। ফলে একজন নিহত ও একজন গুরুতর আহত হয়।

করাচী কর্পোরেশনের সভায় আসন সংরক্ষণসহ যুক্ত-নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মুসলিম লীগ দলের পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার সমর্থক প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

ই বি রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষ মাজদিয়া ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত পরলোকগত মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জির পরিবারকে ৩১ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

২৩শে আগষ্ট—

ওয়ার্কিং কমিটি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনিই প্রস্তাবের খসড়া রচনা করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কোন দোষ নাই। গান্ধীজীর মতে সুভাষচন্দ্রকে অত্যন্ত লঘু দণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

মস্কোতে সোভিয়েট-জার্ম্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি দশ বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে। চুক্তিতে সাত দফা সর্ত্ত আছে।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অসুস্থতার দরুণ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এক সভায় শ্রীযুক্ত কে এফ নরীম্যান এবং অপর ৭ জন কংগ্রেস-সেবীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাঁহারা দুই বৎসরের জন্য কংগ্রেসের কোন নির্ব্বাচনমূলক পদে কিম্বা কোন কর্ম্মকর্ত্তার পদে থাকিতে পারিবেন না।

ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রগণ অনশন সুরু করিয়াছেন। ঢাকায় ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির পরীক্ষা কেন্দ্র পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার প্রতিবাদে তাঁহারা এই অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। ২১ জন ছাত্রীও অনশনে যোগ দিয়াছেন।

২৪শে আগষ্ট—

বাঙলা গবর্ণমেন্ট ভারতীয় জরুরী প্রেস আইন অনুসারে আনন্দ প্রেসের ৫ হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্তের আদেশ দিয়াছেন। গত ২৬শে জুলাই তারিখের "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকায় অনশনকারী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির বিষয় আলোচনা করিয়া "হাউ লঙ" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ সম্পর্কেই বাজেয়াপ্তের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু চীনে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। গণতান্ত্রিক চীনের রাজধানী চুংকিংয়ে পৌঁছিবামাত্র কুয়োমিংটাংয়ের সেক্রেটারী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁহাকে মাল্যভূষিত করেন। জাপান কর্ত্তৃক চুংকিংয়ের উপর বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় মার্শাল চিয়াং কাইসেক নিজেই কুয়োমিংটাংয়ের সেক্রেটারীকে পণ্ডিত নেহরুর নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলেন। তদনুসারে পণ্ডিতজীকে এক সুরক্ষিত তরীতে লইয়া যাওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতির উত্তরে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "বর্ত্তমানে ভারতের পূর্ণ স্বরাজ-লাভের পক্ষে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, কংগ্রেস যদি তাহার সুযোগ লইতে রাজী হয়, তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটির সকল আদেশ আমরা সন্তুষ্টচিত্তে মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত আছি।'

সোভিয়েট-রুশ অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় ইউরোপে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। বৃটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মান, ইটালী সর্ব্বত্রই সমরায়োজন চলিতেছে। ইঙ্গ-ফ্রান্স-রুশ সামরিক আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় বৃটিশ ও ফরাসী সামরিক প্রতিনিধিরা মস্কো ত্যাগ করিয়াছে। বৃটিশ প্রজাদিগকে অবিলম্বে জার্ম্মানী ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। বৃটিশ কমন্স সভার জরুরী অধিবেশন বসিয়াছে'

২৫শে আগষ্ট—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সমিতির এক জরুরী অধিবেশন হয়, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রেসিডেণ্ট পদ হইতে অপসারিত করিয়া এবং গত ২৬শে জুলাই তারিখে গঠিত রাষ্ট্রীয় সমিতির ও ইলেকশন ট্রাইব্যুন্যালের নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া দিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ইতিপূর্ব্বে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে অধিবেশনে আলোচনার পর এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রেসিডেণ্ট পদ হইতে অপসারিত করিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, কার্য্যকরী সমিতি তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করেন। এই কাজ ন্যায়সঙ্গত নহে এবং ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক বলিয়া কার্য্যকরী সমিতি অভিমত প্রকাশ করেন। কার্য্যকরী সমিতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন এবং দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বাঙলা-দেশে সাফল্যের সহিত কংগ্রেসের কাজ চালাইতে হইলে শ্রীযুক্ত বসুর নেতৃত্ব অপরিহার্য্য। এই অবস্থায় কার্য্যকরী সমিতি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত দুইটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির চূড়ান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রেসিডেণ্টের পদ শূন্য রাখা হউক এবং রাষ্ট্রীয় সমিতির সমস্ত কাজ শ্রীযুক্ত বসুর সহিত পরামর্শক্রমে করা হউক। কার্য্যকরী সমিতি আশা করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের এই দুইটি সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া নাকচ করিবেন।

রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি এবং বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য হাওড়ার সালকিয়া জটাধারী পার্কে এক বিরাট জনসভা হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুত বসু বলেন যে, সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যদি রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি না পান, তবে অক্টোবর মাসের প্রারম্ভেই তুমুল সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে। সেজন্য প্রস্তুত হইতে এবং স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সংগ্রহ করিতে তিনি সকলকে আহবান করেন। শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে, বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ লইতে হইলে বামপন্থীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃত্বের আপোষরফামূলক মনোবৃত্তি দূর করিতে হইবে এবং সংগ্রামশীল পন্থা অবলম্বন করিয়া স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

বাঙলা সরকার চটের ফাট্‌কা বাজারের অর্ডিন্যান্স নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। এই অর্ডিন্যান্স চটের ফাট্‌কা বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে ৯নং পোর্টার চটের নিম্নতম মূল্য ৮৸৵০ ধার্য্য হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট রুজেভেল্ট শান্তিরক্ষার জন্য হের হিটলার ও পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট মোসিকির নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট উভয়ের নিকট যুদ্ধ এড়াইবার জন্য নিম্নলিখিত তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেনঃ— প্রথমত আপোষ আলোচনা, দ্বিতীয়ত নিরপেক্ষ ট্রাইবুন্যালের নিকট উভয়পক্ষের বক্তব্য পেশ, তৃতীয়ত সালিশীর পন্থা অনুসরণ।

পোলিশ সীমান্তে জার্ম্মান ও পোলিশ রক্ষীদের মধ্যে গুরুতর সংঘর্ষ হয়। কয়েকটি বোমাবর্ষী জার্ম্মান বিমানপোত পোলিশ সীমান্ত অতিক্রম করে। কিন্তু পোলিশ বিমানসমূহ তাহাদিগকে অবতরণ করিতে বাধ্য করে।

হের হিটলার অকস্মাৎ বার্কটেসগাডেন হইতে বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বৃটেন ও পোল্যান্ডের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের সর্ত্তে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তিতে কিরূপ অবস্থায় এক পক্ষ আর এক পক্ষকে সাহায্য করিতে বাধ্য তৎসম্পর্কে আট দফা সর্ত্ত রহিয়াছে।

২৬শে আগষ্ট—

পাটনার এক খবরে প্রকাশ যে, আসতকুমার মুখার্জ্জি নামক এক মুক্ত রাজবন্দী ই, আই রেলের মোকামা ও মুরি ষ্টেশনের মধ্যে ট্রেনের নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু পাটনায় বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। দক্ষিণপন্থী এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থকগণের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সহস্র সহস্র লোক ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত বসুকে সম্বর্দ্ধনা করে। মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থকগণ সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শনের আয়োজন করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হওয়ায় তাহাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ষ্টেশনে শ্রীযুত বসুর সম্বর্দ্ধনার সময় ভিড়ের চাপে পড়িয়া একজন বালক গুরুতর আহত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার দর্শনপ্রার্থী বিরাট জনতাকে সম্বোধন করিয়া এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "আমি চাই যে, ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করা হউক। এই সংগ্রামের জন্য যে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হইবে তাহা আমি করিতে প্রস্তুত আছি। আমি কোনও সম্মানজনক পদ অধিকার করিতে চাই না। কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিচালকগণ যদি সংগ্রাম সুরু করেন, তাহা হইলে আমি একজন সাধারণ সৈনিকের মত কাজ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকিব।"

যুদ্ধের আশঙ্কায় ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রথম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে স্বতন্ত্র এক সরবরাহ বিভাগ গঠন করিয়াছেন। শুল্ক বিভাগের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণে ব্যবহারযোগ্য ১৬ প্রকার পণ্য ভারত কিম্বা ব্রহ্মের বাহিরে রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ভারতীয় সৈন্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের বিদেশে যাওয়ার সমস্ত ছুটী বাতিল করা হইয়াছে এবং যাঁহারা বিদেশে আছেন, তাঁহাদিগকে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিদেশীদের গতিবিধি ও অবস্থা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সম্পর্কে কড়াকড়ি করিয়া বড়লাট এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

বার্লিনের খবরে প্রকাশ যে, জার্ম্মানীতে পূর্ণ উদ্যমে সামরিক তোড়জোড় চলিতেছে। বাহিরের যান-বাহন ও লোকজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া জার্ম্মানীতে সৈন্য চলাচল সম্পূর্ণ করা হইতেছে।

বার্লিনস্থ বৃটিশ রাজদূত স্যার নেভিল হেণ্ডারসন লণ্ডনে ফিরিয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট হের হিটলারের নিকট এক আবেদন জানাইয়াছেন।

রুমানিয়া হাঙ্গারীর নিকট অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু হাঙ্গারী তাহাতে রাজী হয় নাই।

পিপিংয়ের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বার্লিনস্থ জাপদূতের নিকট হের ফন রিবেনট্রপ এই প্রস্তাব করিয়াছেন, বৃটিশবিরোধী সর্ত্তে সোভিয়েটের সহিত জাপানের একটা চুক্তি করা আবশ্যক।

সাংহাইয়ের খবরে প্রকাশ যে, রুশ-জার্ম্মান মিতালীর পর হইতে ইংরাজদের প্রতি জাপানীদের মনোভাবের স্পষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে।

২৭শে আগষ্ট—

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি আণের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ৫০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত আণে তাঁহার অভিভাষণে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে যে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এবং অনতিকালের মধ্যে যে বিপর্য্যয় দেখা দিবে তৎসম্পর্কে বিবেচনা

করিবার জন্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি এবং মহাত্মা গান্ধীর নিকট আবেদন জানান। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখার্জ্জি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার এন এন সরকার প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার তীব্র নিন্দা করিয়া উহার অপকারিতা দেখান হয় এবং বলা হয় যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বলবৎ হওয়ার পর হইতে দেশের সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গালায় ও পাঞ্জাবে এমন সব সরকারী আদেশ ও আইন করা হইয়াছে যেগুলি নিছক সাম্প্রদায়িক।

এই সম্মেলনে আর একটি প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেস যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং কংগ্রেসকে এই বিষয়ে উহার নীতি পরিবর্ত্তন করিতে ও বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন।

ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ এই ত্রিশক্তি সামরিক আলোচনা ব্যর্থ হওয়া সম্পর্কে সোভিয়েট সমর সচিব মঃ ভরোশিলভ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে পোলিশ এলাকার মধ্য দিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইলে সোভিয়েট বৃটেন, ফ্রান্স এবং পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করিতে পারে—সোভিয়েটের এই দাবী বৃটিশ ও ফরাসী সামরিক প্রতিনিধি দল মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। পোল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েট সাহায্যের কোন প্রয়োজন তাঁহাদের নাই এবং তাঁহারা সোভিয়েটের নিকট হইতে কোন সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিবেন না। পূর্ব্বোক্ত কারণেই আলোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২৮শে আগষ্ট—

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী অধিবেশন হইবে। 'বোম্বাই ক্রনিকল' পত্রের পাটনার সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশনে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া মহাত্মা গান্ধীকে সর্ব্বময় ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

যুদ্ধ বাধিলে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করিবার আশ্বাস দিয়া পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া দিল্লীতে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধ সম্পর্কে স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার সহিত মুসলিম ভারতের অভিমতের কোন সামঞ্জস্য নাই।

যুদ্ধের আশঙ্কায় ভারতের নানাস্থানে তোড়জোড় চলিতেছে। বোম্বাই, করাচী, আমেদাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কলিকাতা বন্দর হইতে জার্ম্মান ও ইটালীয় জাহাজগুলি অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। করাচীতে জার্ম্মানদের স্থান ত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

গত রাত্রে ঢাকুরিয়া লেকে একখানি মোটর আরোহীসহ জলমগ্ন হয়। একজন আরোহী মোটরসহ গভীর জলে নিমজ্জিত হইয়া মারা গিয়াছে।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের হস্তক্ষেপের ফলে লক্ষ্ণৌয়ে সিয়া সম্প্রদায়ের তাব্বারা আন্দোলন স্থগিত রাখা হইয়াছে।

বৃটিশ নৌ-বিভাগ ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ জাহাজ চলাচল সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। নৌ-বিভাগ সমস্ত বৃটিশ জাহাজকে বাল্টিক সাগর ত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সমস্ত বৃটিশ জাহাজসমূহকে ইটালীয় বন্দর ত্যাগ করিতেও আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বার্লিনস্থ বৃটিশ রাজদূত স্যার নেভিল হেণ্ডারসন হের হিটলারের প্রস্তাব সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উত্তর লইয়া বার্লিন যাত্রা করিয়াছেন।

ফরাসী সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, গত ২৫শে আগষ্ট হের হিটলার ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে জানান যে, তিনি পোল্যাণ্ডের পরিস্থিতি আর সহ্য করিতে প্রস্তুত নন এবং ঐ অবস্থার প্রতিকারের জন্য তিনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তাহার ফলে যদি জার্ম্মান ও ফরাসীর রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয় তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উহা দুঃখেরই কারণ হইবে। অতঃপর মঃ দালাদিয়ের হের হিটলারের নিকট এক বাণী প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি ফ্রান্সের শান্তি, অনুরাগ, প্রতিশ্রুতি, নিষ্ঠা, সৌহার্দ্দপূর্ণ ফরাসী-জার্ম্মান সম্পর্কের জন্য তাঁহার আগ্রহ এবং আপোষ আলোচনার দ্বারা শান্তিপূর্ণ মিটমাটের জন্য পোল্যাণ্ডের ইচ্ছা উল্লেখ করেন।

হের হিটলার মঃ দালাদিয়েরের উক্ত প্রস্তাবের উত্তরে এক পত্র লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, তিনি মঃ দালাদিয়েরের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ। তিনি পরিষ্কার দাবী জানাইয়াছেন যে, ডানজিগ ও পোলিশ করিডর জার্ম্মানীকে ফেরৎ দিতে হইবেই। তিনি জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, ভের্সাই সন্ধির সংশোধন নিশ্চয়ই করিতে হইবে। হের হিটলার বৃটেনের উপর দোষারোপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, বৃটেন যদি পোল্যাণ্ডকে উস্কানি না দিত তাহা হইলে আরও ২৫ বৎসর ইউরোপে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকিত।

জাপানের হিরানুমো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৩৪৬ Saturday, 26th August, 1939 [৪১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহাজাতি সদন—

১৩৪৬ সালের ২রা ভাদ্র বাঙলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হইয়া থাকিবে। এই দিবস বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই শহরে একজন বঙ্গ সন্তানেরই নেতৃত্বাধীনে জাতির রাষ্ট্রীয় দাবী অভিষিক্ত হয়, তারপর দীর্ঘ দিন বৎসরের পর বৎসর ব্যাপিয়া সেই সাধনা চলিয়াছে এবং সেই সাধনার মুখ্যত পৌরোহিত্য করিয়াছে এই বাঙলাই। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাতীয়তার যে প্লাবন সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল, বঙ্গ, মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবে যে প্লাবনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহার উৎসস্বরূপে ছিল এই বাঙলাই। এই বাঙলার সাধক সন্তানগণই অগ্নিমন্ত্রের উদ্গাতা। অগ্নিবর্ণা মায়ের সাগ্নিকের সাধনায় তাঁহারাই সর্ব্বস্ব দুর্জ্জয় সংকল্প, অকুতোভয় তেজো বীর্য্য তাঁহাদেরই সাধনার মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমায় হিমাদ্রি হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে। ভাবাদর্শের ভূমি হইল এই বাঙলা। কিন্তু এই বাঙলার একটি অভাব বহুদিন হইতে ছিল, সে অভাব হইল কর্ম্মকেন্দ্রের। দুঃখব্রতে ব্রতী বাঙলার সন্তানদলের কোন একটা আশ্রয় এ পর্য্যন্ত ছিল না; তাহাদের ছিল না মাথা রাখিবার ঠাঁই; অবশ্য এই যে আশ্রয়, ধরা বাঁধা, এই যে ঠাঁই, যাঁহারা সাধক তাঁহাদের নির্ভর ইহার উপর খুব কমই থাকে; কারণ বাহিরের এই আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা যে কোন মুহূর্ত্তে রহিয়াছে এদেশে। বিদেশীর প্রভুত্ব যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে রাষ্ট্রকর্ম্মী স্বাধীনতার সাধকের একান্ত সত্য আশ্রয়, আদর্শ-সাধনার আত্যন্তিক আনন্দ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তথাপি জাতির দিক হইতে ঐ কর্ত্তব্য বাঙালী এতদিন প্রতিপালন করিতে পারে নাই। আজ এই যে মহান্ কর্ত্তব্য, তাহা প্রতিপালিত হইতে চলিল। সুভাষচন্দ্র এ কার্য্যে প্রধান উদ্যোক্তা এবং হোতা হইয়াছেন তিনি যাঁহার অপেক্ষা এ কার্য্যে যোগ্যতর পুরুষ ভূ-ভারতে নাই. বঙ্গ-জাতীয়তার বাণী-মূর্ত্তি, শুধু বাঙলার কেন, ভারতের যিনি বাণী-মূর্ত্তি স্বয়ং সেই রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ এই মাতৃপূজার পৌরোহিত্য করিতে গিয়া জাতিকে অভয় মন্ত্র শুনাইয়াছেন। তিনি জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ে উন্মুখ করিয়াছেন, দেখাইয়াছেন সেই বাঙলার রূপ, যে রূপকে তিনি একদিন ভাবনেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,—ডান হাতে তাঁর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ, সেই রূপের ভাবানুভূতিকে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন নূতন করিয়া। কবি জাতিকে ডাকিয়া বলিয়াছেন—"বাঙলা দেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নবযুগের নব প্রভাতের অভিমুখে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্দ্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে, সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্ত্তরূপ গ্রহণ করে বাঙালীকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক। বাঙলার যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলে ইতিহাসে বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি।"

কবির আশীর্ব্বাদ সর্ব্বাংশে সার্থক হইয়া উঠুক। বাঙালীর আজ বড় সংকটকাল দেখা দিয়াছে। যে দেশাত্মবোধ বাঙলার স্বভাবধর্ম্ম আজ সেই ধর্ম্ম দীপ্ত হইয়া উঠিয়া সমস্ত [illegible]

আকাঙ্ক্ষা সেগুলিকে ভস্ম করিয়া ফেলুক। যাঁহারা এই সব ইতর আসক্তির বেসাতী করিতেছে, জাতির শুভবুদ্ধি তাহাদের শয়তানী বৃত্তিকে সমূলে উৎখাত করিয়া দিক। সাহস শৌর্য্য এবং ত্যাগের মহিমা আজ প্রদীপ্ত হউক বাঙলার অন্তরে অন্তরে, বিস্তীর্ণ হউক সেই মহিমা শরতের স্বচ্ছ সৌরকরের মত। ভীরুতা এবং কাপুরুষতা যেন এখানে মাথা তুলিতে না পারে। আদর্শহীনতার সঙ্গে আপোষে উন্মুখ যে কার্পণ্যবুদ্ধি সে জিনিষ বাঙলায় যেন না টিকে। ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়, এবং সেই ত্যাগের আনন্দেই বাঙলার স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণ ইতর বাসনাকে অকুতোভয়তার সঙ্গে উপেক্ষা করিয়া ভারতে নবযুগ আনিয়াছে। সেই ত্যাগের সম্পদেই বাঙালী নিজেকে শক্তিমান করিয়া তুলুক। ঐক্যবদ্ধ হউক, মহাজাতি সদনের ভিতর দিয়া বাঙলার সেবা সংহতির শক্তি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সুভাষচন্দ্রের আবেদন—

মহাজাতি সদনের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সভায় সুভাষচন্দ্র বাঙালীকে তাঁহার মহান্ কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি বাঙলার অতীত সাধনার তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—"এই ভূমিতেই সেই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল যার দ্বারা আমাদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি সংস্কারের ভিতর দিয়ে পুনর্জ্জীবন লাভ করেছে। এই আন্দোলন প্রাদেশিকতার গণ্ডী মানে নি,—এমন কি, জাতীয়তার গণ্ডীও অতিক্রম করেছিল। রামমোহন ও রামকৃষ্ণ যে বাণী দিয়েছিলেন—তাহা কি বিশ্বমানবের বাণী নয়? তাঁদের ভিতর দিয়ে কি সুপ্তোত্থিত নব জাগ্রত ভারত আত্মপ্রকাশ করেনি?"

বাঙালী কোন দিনই প্রাদেশিকতাকে স্বীকার করে নাই এবং এখনও সে তাহা করে না, করে না বলিয়াই নিখিল ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তির বৃহত্তর আদর্শে বাঙলার অন্তর এখনও অচলনিষ্ঠ রহিয়াছে। প্রাদেশিক তথাকথিত স্বায়ত্ত-শাসনকে সে সম্বলস্বরূপে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া লইতে সমর্থ হইতেছে না—বাঙালীর অন্তরের এই অনুভূতিই আজ ভারতের রাষ্ট্র সাধনায় শক্তি সঞ্চারের নিমিত্ত উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলার স্বভাবধর্ম্ম যে অখণ্ড স্বাধীনতার দিকে আকর্ষণ। সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন করিয়াছেন—নিয়মতান্ত্রিকতার পথ আমরা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বর্জ্জন করিয়াছিলাম, পুনরায় কি সেই পথে ফিরে যাব? এ প্রশ্নের উত্তর তথাকথিত নেতাদের নিকট হইতে যাহাই আসুক না কেন, বাঙলার জনগণের অন্তরের উত্তর কিছুতেই সম্মতিসূচক হইতে পারে না। বাঙ্গলার বিদ্রোহী অন্তর পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে অচঞ্চলই থাকিবে। মহাজাতি সদনকে বাঙলার সেই ভাবাদর্শের কেন্দ্র স্থানে পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু এ দিকে দায়িত্ব জাতির অনেকখানি রহিয়াছে। কর্ত্তব্য উদ্‌যাপিত হয় নাই, সবে মাত্র হইয়াছে উদ্বোধন। সুভাষচন্দ্র জানাইয়াছেন, কর্ত্তব্য উদ্‌যাপন করিতে হইলে তিন লক্ষ টাকা প্রয়োজন। ইহার মধ্যে এ অর্থের সংস্থান না হইলে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবে না। কিন্তু মহাজাতি সদনের সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিষ্ঠার পক্ষে যে অর্থের অভাব ঘটিবে না এ বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঙালী ধনী নহে, বাঙালী দরিদ্র। কিন্তু দরিদ্র হইলেও বাঙালীর প্রাণ আছে। বাঙালীর সম্মুখে মহান্ কর্ত্তব্য যখনই উপস্থিত হইয়াছে অর্থের অভাব কোন দিন ঘটে নাই। যিনি ধনী তিনিও যেমন অর্থে সাহায্য করিয়াছেন, যিনি দরিদ্র তিনিও নিঃশেষে আপনার সর্ব্বস্ব দিয়াছেন। ব্রতের গুরুত্ব এবং আদর্শের মহোচ্চতার তুলনায় তিন লক্ষ টাকা কিছুই নহে। অত্যল্পকালের মধ্যে জাতি আবশ্যক অর্থের সংস্থান করিবে। প্রত্যেকে যথাশক্তি এই পবিত্র ব্রতে সাহায্য করিয়া জাতির সেবায় অর্থের সার্থকতায় আনন্দের অধিকারী হইবেন তবেই বাঙালীর সাধনা সফল হইবে।

সমরসজ্জা না সতর্কতা—

সিমলা হইতে সরকারী এক ইস্তাহার বাহির করা হইয়াছে। ভারত হইতে বিদেশে সৈন্য প্রেরণের প্রতিবাদে সম্প্রতি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ভারতীয় আইন সভার সদস্যদিগকে আগামী অধিবেশন বর্জ্জন করিবার নিমিত্ত যে নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন, বড়কর্ত্তাদের টনক যে নড়িয়াছে সেজন্যই, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। সিমলার কর্ত্তারা এই ইস্তাহারে বলিয়াছেন যে, জগতের অবস্থার এমনতর কোন পরিণতি ঘটে নাই, যাহাতে যুদ্ধ বাধিতে পারে এবং যুদ্ধের সম্পর্কে ভারত হইতে সেনা দল বিদেশে পাঠান হইতেছে না; ভারতের রক্ষা ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত রাখিবার উদ্দেশ্যে শুধু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। জগতের অবস্থা খারাপের দিকে যাইতেছে না, অর্থাৎ যুদ্ধ বাধিবার ভয় নাই, একথা সিমলার কর্ত্তাদের মুখে শুনিলেও আমাদের অন্তর তাহাতে সায় দিতে পারে না; কারণ, যদি আন্ত-র্জ্জাতিক পরিস্থিতি তেমন খারাপই না হইবে, তাহা হইলে হঠাৎ ভারত হইতে বাহিরে সেনা পাঠাইবার কি প্রয়োজন হইল। ভারতের আত্মরক্ষা করার নিমিত্ত মিশরে এবং মালয়ে সেনা পাঠাইবার প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে, এমন কথা আমরা নূতন শুনিলাম। ইহার পূর্ব্বেও ভারত হইতে বিদেশে সেনা দল পাঠান হইয়াছে, কিন্তু এহেন অপূর্ব্ব যুক্তি কখনও দেখান হয় নাই। যে কোন স্থানেই ঐ অজু-হাতে ভারত হইতে সেনা দল পাঠান যাইতে পারে, চাই কি আয়র্লণ্ডে পাঠাইলেও ঐ যুক্তি দেখান যায়! কথাহইতেছে এই যে, মালয় বা মিশরে সেনা দল পাঠানোর সঙ্গে ভারত রক্ষার কোন প্রশ্নের সম্পর্ক নাই, ব্রিটিশের সাম্রাজ্য স্বার্থকেই পরোক্ষভাবে ভারত রক্ষার সমস্যার অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হয়, এবং এই যে কৌশল ইহা আজ নূতন নহে। ভারত-বাসীরা এই তত্ত্বটি ষোল আনা বুঝিয়া লইয়াছে। ভারত-বাসীদের কথা এই যে, সাম্রাজ্য স্বার্থের জন্যই যেখানে সেনা প্রেরণ, সেখানে করভারও ভারতের উপর না চাপাইয়া সাম্রাজ্যের প্রভুদের কৃপা করিয়া বহন করা কর্ত্তব্য, ভারতের

গরীবদের উপর এই অহেতুক করুণা আর কতদিন এভাবে চলিবে? এই সম্পর্কে আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, মিশরে এবং মালয়ে সেনা দল পাঠাইবার আগে বড়লাট কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যদিগকে সেকথা জানাইয়াছিলেন। যাঁহারা সিমলাতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে সরাসরি চিঠি দিয়া জানান হয়, আর যাঁহারা দেশে ফিরিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রাদেশিক গবর্ণরদের মারফতে জানান হয়। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এইভাবে জানানো আর সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া—অন্য কথায় তাঁহাদের মত লইয়া সেনা প্রেরণ সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা—এ কি এক কথা? পরামর্শ প্রকাশ করিতে হইবে, এমন কথা আমরা বলি না; কিন্তু গোপনে তো ফলিতে পারে। কর্ত্তারা যদি নিজেদের মর্জ্জি মতই কাজ করেন, কাহারও মতামতকে বড় করিয়া না দেখেন, তাহা হইলে এমন জানানোর মূল্য কি আছে? ভারত সরকারের পক্ষ হইতে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল ইহাতে তাহা প্রতিপালন করা হয় নাই, বরং সদস্যদের মতামত-নিরপেক্ষভাবে কাজ করার নিশ্চয়তা লইয়াই যে কর্ত্তারা চলিতেছেন এই সত্যটি সুস্পষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবেই সমীচীন হইয়াছে এবং কর্ত্তারা দেশের লোকমতকে এ ব্যাপারে কার্যত মর্যাদা দানের মতিগতি যদি না দেখান তাহা হইলে কংগ্রেসকে এ ব্যাপারে আরও আগাইয়া যাইতে হইবে এবং আমাদের নিজের কথা বলিতে গেলে কর্ত্তাদের কথার কারসাজীতে না ভুলিয়া তাঁহাদের কাজের বিচারের দিক হইতে কংগ্রেসকেও এ কাজের পথেই আরও আগাইয়া যাওয়া উচিত।

যুক্ত-প্রদেশে বাঙলা ভাষা—

যুক্ত-প্রদেশে হিন্দী ও উর্দ্দুকে শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা গ্রহণের বাহনস্বরূপে গ্রহণ করার ফলে বাঙালী সমাজের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। সম্প্রতি যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে একটি ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন। এই ইস্তাহারে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কোন্ ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা উচিত, সে সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এখনও বিবেচনা করিতেছেন। যতদিন পর্যান্ত এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত না হয়, ততদিন পর্যান্ত বর্ত্তমান ব্যবস্থাই বলবৎ থাকিবে, অর্থাৎ বাঙালীর ছেলেরা ইংরেজী বা বাঙলায় প্রশ্ন-পত্রের উত্তর দিতে পারিবে। যুক্ত-প্রদেশের সরকারের এই সিদ্ধান্তে সমস্যার সাময়িকভাবে সমাধান হইল বটে, কিন্তু স্পষ্টই বুঝা গেল যে, বাঙলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন তাঁহারা বেশী রাখিতে চাহেন না। যুক্তপ্রদেশের সরকার তাঁহাদের ইস্তাহারে বাঙলা ভাষার খুব প্রশস্তি করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, "বাঙলা ভাষা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত এই প্রদেশে বাঙালী ছাত্রেরা যে সব সুবিধা ভোগ করিতেছে, সেগুলি তাহারা বরাবরই পাইবে। বাঙলা সাহিত্য ভারতের সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই গর্ব্বের বিষয়। কিন্তু সেই সঙ্গে যুক্ত-প্রদেশে যে সব বাঙালী বাসিন্দা আছে এই প্রদেশের ভাষাতেও তাহাদের কৃতবিদ্য হওয়া দরকার এবং তাহা করিতে গিয়া বাঙালীরা তাহাদের মাতৃ-ভাষার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবে না, ইংরেজী ভাষার প্রাধান্যের চাপই নষ্ট হইবে; এজন্য বাঙলার শিক্ষাব্রতিগণও সাফল্যের সহিত বীরোচিত সংগ্রাম চালাইতেছেন। অদূর ভবিষ্যতে 'হিন্দুস্থানী' সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার বাহন হইবে এবং অল্প দিনের মধ্যেই হিন্দুস্থানী ক্রম-বর্দ্ধমান প্রভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইংরেজী ভাষাকে স্থানচ্যুত করিবে।" 'হিন্দুস্থানী'কে ইংরেজী ভাষার উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার এই যে উদ্যম, ইহার সঙ্গে আমাদের মতের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু বাঙালীর উপর তাহার মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষাকে শিক্ষার বাহনস্বরূপে চাপাইবার প্রস্তাবের আমরা বিরোধী। যুক্ত-প্রদেশে যে সব বাঙালী বাস করেন, 'হিন্দুস্থানী' শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের পক্ষে আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনস্বরূপে লাভ করাতে হিন্দুস্থানী ছাত্রেরা যে সুবিধা পাইবে, বাঙালী ছাত্রদের উপর 'হিন্দুস্থানী' ভাষাকে শিক্ষার বাহনস্বরূপ চাপাইলে সে সুবিধা তাহারা কিছুতেই পাইবে না। এই দিক হইতে বাঙালী ছাত্রদের উপর সম্পূর্ণ অবিচার হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ-বাঙালী ছাত্রদের উপর বাঙলা ভাষা জোর করিয়া চাপান হয় নাই। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করার মধ্যে শিক্ষার দিক হইতে যে অবৈজ্ঞানিকতা এবং অসঙ্গতি রহিয়াছে, বাঙলার শিক্ষাব্রতীরা বিদেশী ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করিতে গিয়া প্রাদেশিকতার পরোক্ষ প্রভাবেও ইহা বিস্মৃত হন নাই। যুক্ত-প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তারা তাহা বিস্মৃত না হইলেই ভাল হয়।

অনশন ধর্ম্মঘট ও মহাত্মাজী—

'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী অনশন ধর্ম্মঘট সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বাঙলার রাজনীতিক বন্দীদের অনশনধর্ম্মঘট সম্পর্কে মহাত্মাজীর মনোভাবের সুস্পষ্ট না হইলেও অন্তত কিরূপ ধারণা তিনি পোষণ করিতেছেন, ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। মহাত্মাজী নিজে বলিয়াছেন যে, অনশন ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিবে, ভূ-ভারতে এমন কেহই নাই। গত কুড়ি বৎসর যিনি কয়েক দফায় অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছেন এবং অনশন ধর্ম্মঘটের নানারূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, আজ সেই গান্ধীজী অনশন ধর্ম্মঘটকারীদের উপর কেন যে এতটা খাপ্পা হইয়া উঠিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা সাধারণের পক্ষে দুষ্কর। সব অনশন ধর্ম্মঘট সমান নয়, মহাত্মাজীর এই মত। তাঁহার মতে সামান্য কারণে কিংবা কারাগার হইতে মুক্তি-

অনশন ধর্ম্মঘট একটা খেলাখেলি ব্যাপার নয়। ছেলের গোঁসা বা বায়নার ব্যাপার, সহানুভূতিশূন্য প্রতিকূল প্রভাবের মধ্যে চলে না। এমন অবস্থায়ও যাহারা অনশন করে, নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই করিতে বাধ্য হয়। 'জিদ জাহির করিবার জন্য' কিংবা শহীদ হইবার সখে জেলের মধ্যে মানুষে অনশন করিতে পারে না। মেয়র ম্যাকস্‌য়েনীর মত মনস্বী অনশন ধর্ম্মঘট করিয়া প্রাণ দেন নাই নিশ্চয়ই জিদের জন্য। এবং বাঙলার যতীন দাসও প্রাণদান করেন নাই শহীদ হইবার লোভে মানব-মর্য্যাদায় নির্ম্মমভাবে আঘাত পড়িলে চরম আত্মদানে সেই মর্য্যাদাকে অক্ষত রাখিবার মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তিরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে অনেক ক্ষেত্রে বন্দী-জীবনের এই অনশন ব্রতের মধ্যে। মহাত্মাজী সেই সংকল্প-শক্তিকে আজ উপেক্ষা করিতেছেন দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হইবেই। কারণ তিনিই এ ব্রতের ভারতের আধুনিক যুগের ধারক ও বাহক এবং বলিতে গেলে প্রবর্ত্তক ও প্রবর পুরুষ। কারাগারে অনশন করার নিন্দা তো মহাত্মাজী করিয়াছেনই—কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি সম্প্রতি যে ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন, তাহার চেয়েও তিনি তীব্র ভাষায় করিয়াছেন এবং ইহা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, অনশন যাহারা করিতে যায়, তাহাদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করাও ঘোরতর অন্যায়। তাহাদিগকে মরিতে দেওয়াই পরম প্রেম এবং পুণ্য। আমরা যে ভাষায় কথাটা বলিলাম, মহাত্মাজী অবশ্য ঠিক সে ভাষায় কথাটা বলেন নাই; অধ্যাত্ম-আলংকারিকতায় হইয়াছে তাঁহার অভিব্যক্তি। তিনি বলেন, "মানুষের দেহটি পবিত্র, জোর করিয়া খাওয়াইতে গেলে এই পবিত্রতা নষ্ট হয়। বন্দীদের শরীরের উপর রাষ্ট্রের দখল আছে অবশ্য, কিন্তু আত্মাকে নষ্ট করিবার অধিকার তাহার নাই। যদি কোন কয়েদী অনশনের সাহায্যে আত্মহত্যা করিবার সংকল্প করে, তাহা হইলে আমার মতে, তাহাকে মরিতেই দেওয়া উচিত।" অনশন ধর্ম্মঘট যদি অন্যায় কার্য্য হয়, তবে দার্শনিক ভাষায় বলিতেই হয় যে, তাহা অনাত্ম ব্যাপার। এমন অনাত্ম ব্যাপারে বাধা দিয়া মানুষকে বাঁচাইতে গেলে আত্মাকে নষ্ট করা হয় কোন্ হিসাবে, এ তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা যায় না। অনশন ধর্ম্মঘট করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বসিলে তাহাতে বাধা দিলে যদি আত্মাকে নষ্ট করা হয়—স্বাধীনতায় অযথাভাবে হস্তক্ষেপের দ্বারা, তাহা হইলে বিষ খাইয়া বা গলায় দড়ি দিয়া কেহ মরিতে বসিলে তাহাকে বাধা দিলেও তো সেই অপরাধ হইবে? বন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘটের সমস্যা বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনশন ধর্ম্মঘট না হইলে বা ধিক্কৃত বা নিন্দিত হইলে তাঁহারা বিব্রত কম হইবেন, ইহা বুঝি। গান্ধীজীর এই সব বিবৃতি সে পক্ষে সাহায্য করিবে কিন্তু যাহারা অনশন ধর্ম্মঘট করে, তাহারা কেন করে? তাহাদের ব্যথা ও বেদনার সম্বন্ধে অনশনবিশেষজ্ঞ মহাত্মাজীর এমন ঔদাসীনাই বিস্ময়ের বিষয়। অনশন ধর্ম্মঘট বাঞ্ছনীয় নহে, ইহা সকলেরই মত। কিন্তু এই একান্ত চরম উপায় অবলম্বনে বাধ্য হইবার মত অবস্থায় বন্দীরা যাহাতে পতিত না হয়, কর্ত্তৃপক্ষকে সে সম্বন্ধে যথেষ্টরূপে অবহিত করার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য দেশের লোকের রহিয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলালের নৈরাশ্য—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গত সোমবার কলিকাতায় দমদমের বিমান-ঘাঁটী হইতে 'ভিলে-ডি-ক্যালকাটা' নামক উড়ো-জাহাজে চীন যাত্রা করেন। পণ্ডিতজী তাঁহার চীন যাত্রার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া 'ন্যাশন্যাল হেরাল্ড' পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন,—"বৃহৎ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে আমি কংগ্রেসের ভিতরকার বিভেদ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার চেষ্টায় বিশেষ কেহ সন্তুষ্ট হন নাই বরং অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; সম্ভবত আমার ভুল হইয়াছিল। আমি যে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহের জন্য এই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা আসে নাই; যথেষ্ট সংখ্যক লোককে একটি নির্দ্দিষ্ট পন্থার রাজী করাইবার অসামর্থ্যই ইহারকারণ কংগ্রেসের ভিতরই সংঘবদ্ধ দলগুলি সক্রিয়ভাবে পরস্পর বিরোধী কার্য্য করিতে থাকে। ইহাতে আমার অস্বস্তি হয়। এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হয় এই যে, প্রত্যেক দল অন্য দলগুলির উপরে উঠিতে চাহে এবং অন্য দলগুলিকে পরাজিত করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে। দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের চিন্তা একেবারে যদি পড়িয়া যায়, এই অবস্থা আমার পক্ষে কোন সময়েই বিশেষ আনন্দদায়ক নহে, এমন রাজনীতি আমার পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। আমার মনে হইতেছে, যে কোন অবস্থায় রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে আমি বিশেষ ক্ষমতাশালী নহি এবং বর্ত্তমানে রাজনীতির বিভিন্ন ধারার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই। ইহাই আমার দুর্ব্বলতা। আমি যখন সার্থকভাবে কিছু করিতে পারি না, তখন নিজের মানসিক স্থৈর্য্য বজায় রাখিয়া সার্থকভাবে কাজ করিবার সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে চেষ্টা করি। ইহা বিশেষ অবস্থা নহে।"

পণ্ডিত জওহরলাল ভারতের একজন শক্তিশালী জননায়ক। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অকুতোভয়, অনলস সাধকস্বরূপে পণ্ডিত জওহরলালকে আমরা জানি। তাঁহার এই নৈরাশ্যব্যঞ্জক উক্তিতে অনেকেই মর্ম্মব্যথা উপলব্ধি করিবেন। পণ্ডিত জওহরলালজী বলিয়াছেন যে, তিনি কংগ্রেসের ভিতরকার ভেদ-বিরোধ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তিনি যে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই, ইহা আমরাও জানি। কিন্তু আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগে স্বভাবত এই যে, আপোষ-নিষ্পত্তি জাতির সংহতির দিক হইতে খুবই প্রয়োজনীয় সত্য; কিন্তু সেই আপোষ-নিষ্পত্তি যে কাজের জন্য, সেই লক্ষ্যই যেখানে আপোষ-নিষ্পত্তির ফলে ক্ষুণ্ণ হয়, তখন আপোষ-নিষ্পত্তির মূল্য কিছু থাকে না এবং আদর্শকে বিকাইয়া সেই যে আপোষ, তাহা জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে

অনিষ্টকরই হইয়া থাকে। পণ্ডিত জওহরলালের শক্তি আছে, ক্ষমতা আছে, দেশের জনগণের অন্তরের উপরে ত্যাগের মহিমায় তিনি প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। কংগ্রেসের বিভিন্ন দল—যিনি যে দলেই থাকুন না কেন, কেহ একথা অস্বীকার করিতে পারেন না। এই জন্যই পণ্ডিতজী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ পরিত্যাগ করিলেও তাঁহাকে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে এবং আমন্ত্রিত যখন হন, তখন ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তে তাঁহার যুক্তি-পরামর্শের প্রভাব যে কিঞ্চিদধিক থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পণ্ডিত জওহরলাল সংগ্রামশীল, সাম্রাজ্যবাদের তিনি আত্যন্তিক বিরোধ, ইহাই আমরা জানি। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি স্বমত কতটা প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, দেশের লোকের মনে এই বিষয়েই প্রশ্ন জাগে। দেশের লোকে সুস্পষ্টভাবেই দেখিতে পাইতেছে যে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটি সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির মনোভাব লইয়াই চলিতেছেন। সঙ্ঘাত, সঙ্ঘর্ষ, বিরোধ,, এমন কি সংগ্রামের সকল কথাতেই তাঁহাদের শঙ্কা। স্পষ্টভাবে কংগ্রেসের আদর্শের বিরোধী এই মনোভাব দূর করিতে হইলে যে মতস্বাতন্ত্র্য এবং দৃঢ়তা অবলম্বন করা দরকার পণ্ডিত জওহরলাল কতটা তাহা দেখাইতেছেন, ইহাই হইতেছে প্রশ্ন। আদর্শ সিদ্ধির জন্যই প্রয়োজন মিলনের; আদর্শকে নষ্ট করিয়া মিলনের কোন মূল্যই নাই। দেশের লোক দেখিতে চায়, কংগ্রেসের এই সঙ্কটকালে পণ্ডিত জওহরলাল অকুতোভয়তার সঙ্গে আদর্শকে অটল রাখিতে দণ্ডায়মান হন। কংগ্রেসের দক্ষিণী দলের আচরণের ফলে কংগ্রেসের আদর্শ সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে একটা বিভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে; এই বিভ্রমকে দূর করিতে হইবে। তেমন চেষ্টা কাহারও কাহারও পক্ষে অপ্রিয় হইতে পারে, কিন্তু জাতির পূর্ণ স্বাধীনতার ন্যায় বৃহত্তর আদর্শের কাছে ব্যক্তিত্বের বিচার অতি তুচ্ছ। ব্যক্তি-প্রভুত্বের মোহময় প্রভাব হইতে জাতিকে মুক্ত করিতে হইবে এবং জাগাইতে হইবে তাহাদের মধ্যে আদর্শের প্রেরণা। আদর্শে উদ্বুদ্ধ জনগণের শক্তিই নেতার শক্তি, সেই শক্তি গৌণ করিয়া ব্যক্তি বা দলের প্রভুত্বকে বড় করিবার চেষ্টা স্বাধীনতা-সংগ্রামের কোন কালেই সহায়ক হইতে পারে না। যে দল গণশক্তিকে স্বীকার করে না, অথচ স্বাধীনতার নাম লয়, বুঝিতে হইবে স্বাধীনতার আদর্শ হইতে তাহারা বিচ্যুত হইতে বসিয়াছে, জাতীয় সংগ্রামে তাহাদের স্থান নাই। দেশের সম্মুখে তাহাদের স্বরূপ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য কঠোর হইলেও অপ্রিয় হইলেও তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে, এমন আদর্শনিষ্ঠাই জাতীয়-শক্তির উদ্বোধন করিয়া থাকে।

বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন—

আগামী ২৭শে আগষ্ট, রবিবার কলিকাতায় বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। সভাপতিত্ব করিবেন ভারতের অন্যতম জননায়ক শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি আনে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করিবেন স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার সম্মেলনে যোগদান করিয়া মূল প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। গোল টেবিল বৈঠকে সাম্প্রদায়িক এই বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত যখন উপস্থিত করা হয়, তখন মহাত্মাজী উহার প্রতিবাদে যে কথা বলিয়াছিলেন, আমাদের এখনও তাহা স্মরণ আছে। তিনি সদস্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা যে ভাবে জাতীয় জীবনকে খণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার ফলে ভারতে জাতীয় শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইবে, ইহা জাতীয় শাসনতন্ত্র এবং জাতীয়তার ভাব এই দুই কেই ভারত হইতে উৎখাত করিবে।" আজ মহাত্মাজীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে। এই বাঁটোয়ারার কুফলে বাঙলা দেশ ভারতের জাতীয়তাবাদের জন্মভূমি হইয়াও সাম্প্রদায়িকতার ভেদ-নীতিতে দুর্ব্বল এবং পরকীয় প্রভুত্বের চাপে পীড়িত। পাঞ্জাবের অবস্থাও তদ্রূপ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যাহা চাহিয়াছিল, আজ তাহাই সিদ্ধ হইয়াছে; এই বাঁটোয়ারার কূট কৌশলে কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী কর্ম্মনীতি হইতে বাঙলা এবং পাঞ্জাব বিচ্ছিন্ন; ভারতের জাতীয়তার সঙ্গে স্বাভাবিক এবং সতেজ বিকাশের পথ এই এক কথায় রুদ্ধ করিয়া আজ কংগ্রেসী মন্ত্রীদের নিয়মতান্ত্রিক নীতির রস উপভোগ করিতেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। জাতিকে এই দুর্নীতি হইতে উদ্ধার করিতে হইলে কংগ্রেসপন্থীদের এখনও কর্ত্তব্য রহিল, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিলোপের উপর সর্ব্বতোভাবে চাপ দেওয়া। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি বাঙলা দেশ, বাঙলার কর্ম্মী-নায়কগণ এই পাপকে জাতির দেহ হইতে উৎখাত করিবার নিমিত্ত অবহিতভাবে আত্মনিয়োগ করুন। বাঙালী জাতির স্বার্থের দিক হইতে ইহাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সর্ব্ব-ভারতীয় সংহতিতে দৃঢ় করিবার দিক হইতে ইহাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইহাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ভারতকে চির দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার জন্য পরিকল্পিত এই যে বিধান, ভারতের স্বাধীনতার শত্রু, ছাড়া আর কে ইহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য আন্তরিক উত্তেজনা বোধ না করিবে? দেখিতে চাই বাঙলা দেশে সেই উত্তেজনা।

বাঙলার গ্রামের অবস্থা—

বর্ষার সঙ্গে বাঙলার গ্রামসমূহে নানা দুঃখ-কষ্ট দেখা দিয়াছে। প্লাবনের ফলে ইতিমধ্যেই বাঙলার বহু অঞ্চলে অন্নকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। সরকার হইতে যে সামান্য কৃষি-ঋণ দেওয়া হইতেছে, তাহা পর্য্যাপ্ত নয়; বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে যে, এই যে সমস্যা ইহাও কেবল এই বৎসরের জন্য নয়। বাৎসরিক ব্যাপার। সুতরাং এই ভাবে সমস্যার সমাধানের উপায় নাই। কিন্তু পাকাপাকি ভাবে সমস্যার সমাধানের দিকে সরকারের দৃষ্টি এখনও পড়ে নাই। মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশের

সরকার ১৯৩৭ সাল হইতে অর্থাৎ নূতন শাসনের পত্তনের সময় হইতেই পল্লী অঞ্চলসমূহে চিকিৎসার সুব্যবস্থা যাহাতে হয়, সেজন্য এম-বি শ্রেণীর ডাক্তারদিগকে বিশেষ ভাতা দিয়া গ্রামে থাকিবার সুযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টও এইরূপে একটি কার্য্যপ্রণালী লইয়া কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বাঙলার গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার অভাব কত বেশী, কিন্তু বাঙলা সরকারের এ-সব দিকে দৃষ্টি নাই। কয়েকদিন হইল দেখিতেছি, তাঁহারা বাঙলার পল্লী অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের জন্য কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন এমন ভরসা দিয়াছেন এবং দুই তিন বৎসরের মধ্যে কূয়া, পুকুর অথবা নলকূপ যেখানে যেমনভাবে সম্ভব তাঁহারা গ্রামবাসীদের জল-কষ্ট দূর করিবেন বলিয়া শুনিতেছি। জানি না, এই কার্য্য-প্রণালী কার্য্যে পরিণত হইবে কতটা; কারণ কার্য্য-প্রণালী তো কথায় শুনা যায় কতই, কিন্তু কাজে দাঁড়ায় না কিছুই, টাকার অভাব, দেশে অন্য সব কাজেই টাকা জোটে, দুঃখ কিছুরই নাই দেশের লোকের—শুধু যা' অন্ন-বস্ত্রের।

পাট অর্ডিনান্স—

বাঙলার গবর্ণমেণ্ট অর্ডিনান্স জারী করিয়া কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। অতঃপর প্রতি পাকা গাঁইটের দাম ৩৬৲ টাকার কম হইতে পারিবে না। পাট বাঙলা দেশের প্রধান সম্পদ; কিন্তু ইহার উপস্বত্ব শুষিয়া লয় বিদেশীরা। বাঙলার চাষীরা পাটের উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারে না; গবর্ণমেণ্ট এতকাল পর্য্যন্ত পাটের ব্যাপারে বিদেশী শোষকদেরই সাহায্য করিয়াছেন, কৃষকদের সাহায্যের জন্য কিছুই করেন নাই। পাটের সর্ব্ব-নিম্ন দর বাঁধিয়া দিয়া এবং আইন করিয়া পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য কর্ত্তাদের গরজের প্রথম সূচনা কিছু পাওয়া গেল মাত্র। এই দিক হইতে সকলেই এই চেষ্টাকে সমর্থন করিবেন; কিন্তু এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে কৃষকদের স্বার্থ যে ষোলআনা রক্ষিত হইলে এবং আর কিছু এদিকে করিবার থাকিল না, আমরা ইহা মনে করি না। আমাদের মতে সর্ব্বনিম্ন দর আরও বেশী চড়ান যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট ফাটকার বাজারের দাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া বাজারের নিম্নগতি রোধ করিয়াছেন। ফাটকার সর্ব্বনিম্ন দাম নির্দ্দিষ্ট থাকায় ক্রেতার দিক হইতে ঝুঁকি অনেকটা কমিয়া যাইবে, ইহাতে ফাটকার বাজারের তেজীর ভাব বজায় থাকিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু দরের এই উঠা ও নামা পাট চাষ বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কি-ভাবে করা হইবে, তাহার উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী কৃষকদিগকে এই ভরসা দিয়াছিলেন যে, প্রতি মণ পাটে সর্ব্বনিম্ন দাম তিনি দশ টাকা বাঁধিয়া দিবেন; সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার পথে অন্তরায় অনেক আছে, আমরা জানি; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, গবর্ণমেণ্ট শ্বেতাঙ্গ কলওয়ালা এবং ধনী দালালদের বিরুদ্ধতার ভয় না করিয়া যদি অগ্রসর হইতে পারেন, তাহা হইলে এই পাটের বাজার নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই তাঁহারা বাঙলা দেশের চাষীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অনেক লাঘব করিতে পারেন। শ্বেতাঙ্গ দলের হুমকিতে দমিয়া গিয়া সরকার যদি পাট-চাষীদের স্বার্থরক্ষায় এইভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হন, তাহা হইলে দলের হুমকিতে দমিয়া না গিয়া সরকার যদি পাট-চাষীদের মন্ত্রিমণ্ডলের যে অবস্থা তাহাতে তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সেই দৃঢ়তা বজায় রাখিতে পারিবেন কি, না অন্য কৌশলে তাঁহাদিগকে উল্টা পাক দিতে হইবে, ইহাই হইতেছে বিবেচ্য।

পৃথিবীর মাটি এখনও নরম আছে

শ্রীসুনীলবরণ রায়-চৌধুরী

পৃথিবীর মাটী এখনও নরম আছে—
    নব বিহগীর কণ্ঠে শুনেছি গান।
পাষাণের বুকে ঝরণার কলগীতি
    শুনিয়া যে সখী নাচিতেছে মন-প্রাণ।

পৃথিবীর মাটী এখনও নরম আছে—
    কুসুম শাখার গর্ভে যাতনা সুরে,
দেহে বাঁধা মন ঘরে ত' থাকিতে পারে
    তবু কি কারণ হ'ল সে যে উড়ু উড়ু।

রাতের আঁধারে রজনীগন্ধা ফোটে
    গন্ধ বিধুর উদাসী দখিন বায়ু।
কঠিন মরুতে থাকে যদি থাক সখি-
    শাওন ধারার ফুরায় নি পরমায়ু।

পৃথিবীর মাটী এখনও নরম আছে—
    আঙুর থোলোয় দু'হাত বুলায়ে দেখো,
মানুষেরই মন ইস্পাতে মোড়া সখি—
    ভুলে যেওনাক কথা ক'টি মনে রেখো।

পৃথিবীর মাটী এখনও নরম আছে—
    শৈল শিখরে ঝরণা গাহিল গীতি
তোমার মনের ইস্পাত তুলে দেখো
    পৃথিবীর মাটী নরম রয়েছে নিতি।

দেশের কথা—ভারতের পণ্য—

চা (TEA)

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

(২) চায়ের বিভিন্নতা—সবুজ চা

পূর্ব্ব প্রবন্ধে চায়ের নানা বিভাগের কথা বলা হইয়াছে; তাহা সমস্তই কালা-চা (Black Tea) সম্বন্ধে। অন্যান্য ক্ষুদ্র বিভাগের কথা ছাড়িয়া দিলেও হরিৎ চা (Green Tea) ও "ব্রিক্ টি" (Brick Tea) নামে আরও দুই প্রকার চা'র পরিচয় থাকা প্রয়োজন। তন্মধ্যে "গ্রীন্-টি" প্রধান। কালা-চা সহজে বিক্রয় হওয়ার জন্য সবুজ-চা ভারতবর্ষে বেশী তৈয়ারী হয় না; মোট পরিমাণ আন্দাজ ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। সবুজ-চা তৈয়ারী করিতে হইলে পাতার রস গাঁজাইয়া (fermentation) উঠিতে দেওয়া চলিবে না। সেই কারণে পাতাগুলি তুলিয়া আনিবার পর শুষ্ক বায়ুতে অবসন্ন (withering) হইবার সুযোগ না দিয়া একেবারে উত্তপ্ত বাষ্পদ্বারা শুকাইয়া লওয়া হয়। চা-পাতার পরিমাণ কম হইলে পাত্রে ছাঁকিয়া লওয়ার (panning) ব্যবস্থা আছে; নচেৎ যন্ত্রাদির সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার পর প্রয়োজনমত সামান্য পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া কৃষ্ণ-চা করিতে যে সকল প্রক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই পালিত হয়।

সবুজ-চা উত্তর ভারতের সম্পত্তি, কারণ মোট পরিমাণের চার ভাগের তিন ভাগ পঞ্চনদ (কাঙড়া উপত্যকা) এবং যুক্ত-প্রদেশে উৎপাদিত হয়; তন্মধ্যে কাঙড়ার স্থান সর্ব্বপ্রধান। বিহারের রাঁচি, আসামের নওগাঁ ও শ্রীহট্ট এবং বাংলার জলপাইগুড়িতে যে পরিমাণ সবুজ-চা উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

সবুজ-চা "Young Hyson", "Hyson No. I" ও "Hyson No. II" প্রভৃতি নামে প্রচলিত আছে। "Tawnkay" ও "Gunpowder" সবুজ চায়ের অপর দুই নাম এবং এই সকল নামেই বাজারে প্রচলিত।

কৃষ্ণ ও সবুজ চা'র যত বিভাগ আছে, তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে বোধগম্য নহে। যাঁহারা এই পার্থক্য বুঝিতে পারেন, এই ব্যবসায়ে তাহাদের খুবই কদর আছে।

"Brick" ও অন্যান্য চা

Brick Tea দার্জ্জিলিঙ ও কুমাউন প্রদেশে সামান্য পরিমাণ তৈয়ারী হইয়া তিব্বত ও ভোটরাজ্যে বিক্রীত হয়; ভারতের বাহিরে ইহার বিশেষ রপ্তানি নাই। কৃষ্ণ ও হরিৎ চা প্রস্তুত করিবার সম্মিলিত প্রক্রিয়া হইতে "ব্রিক্ টি" প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার সবিশেষ বিবরণ দিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

লেটপেট (Letpet Tea) ব্রহ্মে প্রস্তুত হয়, উলং (Oolong Tea) ফরমোসাতেই বেশী হয়; চীন জাপানেও ইহার বিশেষ প্রচলন। ভারতবর্ষে ইহা প্রচার করিবার চেষ্টা করা মন্দ নহে; কারণ জগতের বাজারে ইহার স্থান আছে।

ভারতের চাষ

দেশ বিদেশে চায়ের ব্যবহার ছড়াইয়া পড়িলেও চায়ের আবাদের প্রধান কেন্দ্র কয়েকটি দেশের মধ্যে নিবদ্ধ আছে। বলা বাহুল্য, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান প্রধান। অবশ্য কাহারও কাহারও মতে চীনের স্থান সর্ব্বোপরি; কিন্তু সেখানকার নিয়মমত কোনও হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা নাই, তাহা ছাড়া স্থানীয় লোকে অতিরিক্ত মাত্রায় চা পান করার জন্য বিদেশে রপ্তানির সুযোগ নাই। এই সকল কারণে ভারতের নাম প্রথমেই উল্লেখ করা হয়।

ভারতবর্ষে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ একর জমিতে চায়ের আবাদ হইয়া থাকে (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য); তন্মধ্যে আসামের স্থান সর্ব্বোচ্চ; তাহার পরই বাঙলা। ব্রিটিশ ভারতের অন্য প্রদেশের মধ্যে মদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। করদ রাজ্যের ত্রিবাঙ্কুর এবং ত্রিপুরাতেও চায়ের আবাদ হইয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুর ও মদ্রে জমির পরিমাণ সমান, প্রায় ৭৮ হাজার একর।

শুষ্ক চায়ের পাতা পাওয়া যায়, ৪৩ কোটি পাউণ্ড, তন্মধ্যে, ২৪ কোটি পাউণ্ড আসামে এবং ১১ কোটি পাউণ্ড পাওয়া যায় বাঙলায় (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য)। মদ্রে ও ত্রিবাঙ্কুরে জমির পরিমাণ সমান হইলেও মদ্রে ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ এবং ত্রিবাঙ্কুরে ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড চা পাওয়া যায়।

বিহার, কুর্গ, মহীশূর, কোচিন প্রভৃতি স্থানেও আবাদ আছে; কিন্তু আসাম, বাঙলা, মদ্র ও ত্রিবাঙ্কুরের সহিত কোনও তুলনা হয় না।

জেলার চাষ

আসামে আবাদী জমির পরিমাণ আন্দাজ ৪ লক্ষ ৪০ হাজার একর। তন্মধ্যে লক্ষ্মীপুর ও শিবসাগর জেলায় যথাক্রমে ১ লক্ষ ১০ হাজার ও ১ লক্ষ ৪ হাজার একর পড়ে। তাহার পর শ্রীহট্ট, দারাং ও কাছাড়ের স্থান। এই কয় জেলাতেই ৪ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে আবাদ হইয়া থাকে।

বাঙলার দুই লক্ষ একরের মধ্যে এক জলপাইগুড়িতেই আন্দাজ ১ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমি পড়ে। তাহার পরই দার্জ্জিলিঙ, কিন্তু জলপাইগুড়ির জমির অর্দ্ধেক ইহার অংশ। চট্টগ্রাম জেলাতে সামান্য আবাদ হয়।

মদ্রের মধ্যে নীলগিরি, কইম্বাটুর এবং মলবার, যুক্তপ্রদেশে দেরাদুন, গাড়োয়াল, আলমোরা এবং পঞ্চনদের মধ্যে কাঙড়া জেলাতেই আবাদ আছে।

ফলন

ভারতের মধ্যে সকল স্থানে সমান ফলন হয় না। আসামে যেমন অধিক পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে, সেখানে ফলনের পরিমাণও খুব বেশী। আসামের মধ্যে লক্ষ্মীপুরের স্থান সর্ব্বপ্রধান, প্রায় ৬৬৩ পাউণ্ড চা পাওয়া যায় প্রতি একরে। তাহার পরই গোয়ালপাড়ার স্থান। পরে পরে জলপাইগুড়ি (বাঙলা), দারাং ও শিবসাগর জেলা। এখন কইম্বাটুর ও নীলগিরির নাম করা প্রয়োজন। শ্রীহট্ট, নওগাঁ গেলেই আসে মলবার, কোচিন ও কুর্গ। কুর্গের পরেও ত্রিবাঙ্কুরের ফলন কম; আর করদরাজ্যের মধ্যে মহীশূর অনেক পিছনে, একরে মাত্র ২০৩ পাউণ্ড। পরিশিষ্ট (খ) দেখুন।

ভারতীয় আবাদের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা

১৮৩৯ সালে আসাম কোম্পানী (Assam Company) স্থাপিত হয় এবং ১৮৪০ সালে তাহারা সরকারী বাগানগুলি ক্রয় করিয়া বে-সরকারী আবাদ আরম্ভ করে,—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী ইতিহাস, অর্থাৎ ভারতের অন্যান্য স্থানেও আবাদের বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৮৭৫ সাল নাগাদ দেখা গেল ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জমিতে আবাদ আরম্ভ হইয়াছে এবং উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ আন্দাজ সাড়ে তিন কোটি পাউণ্ড। ১৯০০ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে ৫ লক্ষ একর জমিতে ১৯ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। ইহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া আজ সাড়ে ৮ কোটি একর জমি ও ৪৩ কোটি পাউণ্ড চা দাঁড়াইয়াছে। পরিশিষ্ট (গ) দ্রষ্টব্য। শেষ তিন বৎসরের জমি ও ফলনের পরিমাণ স্বতন্ত্র দেখানো হইল।

বর্ত্তমানে ছোট বড় পাঁচ হাজারের উপর বাগান আছে, মূলধনের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকার উপর এবং তাহাতে কম বেশী নয় লক্ষ লোক কাজ করে। তম্মধ্যে পৌনে ৮ লক্ষ লোক (৭,৭৬,৬৫৭) স্থায়ী মজুর এবং বাগানে বা তন্নিকট-বর্ত্তী স্থানেই বাস করে, প্রায় ৪৫ হাজার (৪৪,৭১২) লোক বাহির হইতে আসিলেও স্থায়ীভাবেই নিযুক্ত আছে। আর ৫২ হাজার লোক ঠিকা মজুর।

পৃথিবীতে চায়ের আবাদ

চীন ও ভারতে প্রথম স্থান লইয়া দ্বন্দ্ব আছে; বিশেষত চীনের পরিমাণ সম্বন্ধে অঙ্ক পাইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। কলিকাতায় চীন রাজদূতের আন্দাজ গ্রহণ করিলে চীনকে প্রথম স্থান দিতে হয়, অর্থাৎ পরিমাণ প্রায় ৭০ কোটি পাউণ্ড এবং ভারতের অঙ্ক ৪৩ কোটি। অনেকে মনে করেন চীনের এই অঙ্ক ঠিক নহে। পরেই সিংহলের স্থান এবং পূর্ব্ব ভারত দ্বীপপুঞ্জ, জাপান ইন্দোচীন, ফরমোসা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের নাম করিলেই তালিকা শেষ করা যাইতে পারে। এই কয়েকটি দেশ মিলিয়া প্রতি বৎসরে আন্দাজ ১৭৮ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং দেশ বিদেশের লোকে মহা-আনন্দে তাহার ক্বাথ পান করিয়া থাকে। পরিশিষ্ট (ঘ) দেখুন।

বাণিজ্য

চায়ের সন্ধান হইবার পর ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে আন্দাজ এক হন্দর চা ইংলণ্ডে আমদানী করা হয় এবং ঐ সময় হইতেই চা বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে (John Company) দেওয়া হয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে চীনের সহিত সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্যের ভার উক্ত ব্যবসায়ীদের হাতে ন্যস্ত হইয়াছিল। কেবল চীনা চা হইতে যে লাভ হইতেছিল, তাহাতেই কোম্পানীর পক্ষে যথেষ্ট মনে হওয়ায়, ভারতীয় চা আবাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন মোটেই ছিল না। সেই কারণে ভারতীয় চা'র জগতে পরিচয় লাভ করিতে অনেক বৎসর কাটিয়া যায়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে তারিখে ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে ৪৮৮ পাউণ্ড (কাহারও মতে ৩৫০ পাউণ্ড) চা ভারত হইতে রওনা হইয় যায় এবং ১০ই জানুয়ারী ১৮৩৯ সালে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইয়াছিল।

১৮৪১ সালে ৪,৬১৩ পাউণ্ড ভারতীয় চা কলিকাতায় নীলামে বিক্রীত হয়।

ভারতের চা বাণিজ্যের ইহাই সূত্রপাত।

বাণিজ্যে বিপত্তি

হয়ত ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে বর্ত্তমান প্রসঙ্গ খুব ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত নয়, তথাপি আমেরিকার সহিত চায়ের উপর শুল্ক লইয়া যে ঘটনা ঘটে, তাহার পরিচয় পাঠকের প্রয়োজন আছে। চায়ের উপর শুল্ক, আমেরিকা উপনিবেশকে স্বাধী-নতালাভে সচেতন করিয়াছে এবং ইহাকে লক্ষ্য করিয়া সমরানল জ্বলিয়া উঠে, আর আমেরিকা শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের উপ-নিবেশ মাত্র না থাকিয়া, স্বাধীন সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

১৭৬৫ সালে সকল গণ্ডগোলের সূত্রপাত হইল, কারণ তখনই আমেরিকায় রপ্তানি করা চায়ের উপর শুল্ক স্থাপিত হয়। ইহাতে আমেরিকাবাসী কেবল যে ঐ শুল্কের প্রতিবাদ করে, তাহাই নহে, তাহারা বলে যে, ঔপনিবেশিকদের জন্য কোনও আদেশ প্রণয়ন করিতে বা তাহাদের উপর কোনও কর ধার্য্য করিবার শক্তি ইংলণ্ডের নাই। ১৭৬৬ সালে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ঐ আইন প্রত্যাহৃত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলা হয় (Declaratory Act) যে ইংরেজ রাজ শক্তির উভয় ক্ষমতাই আছে। ১৭৬৭ সালে (Trade and Revenue Act) নূতন আইন মতে চা সর্ব্বপ্রকার তৈল, কাচ এবং সীসার উপর শুল্ক স্থাপিত হয়। ইহাতে আমেরিকায় দারুণ অশান্তি উপস্থিত হয় এবং ইংরেজের সমস্ত দ্রব্যাদি বয়কট বা বর্জ্জন সুরু হয়। এই আইনও প্রত্যাহৃত হয় কিন্তু চায়ের প্রতি পাউণ্ডের উপর তিন পেন্স ট্যাক্স থাকিয়া যায়।

১৭৭৩ সালে (Tea Act) যে আইন হয়, তাহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ঔপনিবেশিকদের সহিত সাক্ষাৎ বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা দান করে। ইহার দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেবলমাত্র প্রতি পাউণ্ড চায়ের উপর তিন পেন্স করিয়া শুল্ক ইংলণ্ডকে দিয়া ঔপনিবেশিকদের সহিত বাণিজ্যের আর সমস্ত মালের উপর শুল্ক ফেরৎ পাইত, অর্থাৎ আমদানী শুল্ক দিয়া ইংলণ্ডে আনীত মাল ঔপনিবেশিকদের নিকট রপ্তানি করিতে পারিলে তাহারা ঐ আমদানী শুল্ক ফেরৎ পাইত। আমে-রিকানরা ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহারা বলিতে থাকে এইরূপ গুপ্ত শুল্ক আদায় করিতে যাওয়াও ইংলণ্ডের ঘোরতর অন্যায়। তখন "স্বাধীনতার সেবক" ('Sons of Liberty') নাম দিয়া স্বেচ্ছাসেবকদল বাহির হইয়া পড়িল এবং দেশে দারুণ অশান্তি বিস্তার করিতে লাগিল, অত সমাদরের চা পরি-বর্জ্জনের জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিল। নারীমহলে মহাসোরগোল পড়িয়া গেল এবং তাহারাও দলে দলে যোগদান করিল। গ্রামে ব্যবসায়ীরা আসিয়া ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিল। জনসাধারণ বুঝিতে লাগিল যে মাত্র আমেরিকায় চা নামাইতে পারিলে লণ্ডনে তাহার শুল্ক সংগৃহীত হইয়া থাকে। তখন তাহারা স্থির করিল তাহাদের উপকূলে চা নামাইতে দেওয়া

হইবে না এবং তাহাদের প্রতিজ্ঞা সফল করিবার জন্য সামরিক আয়োজন করিতে লাগিল।

ফিলাডেলফিয়া এ বিষয়ে অগ্রণী হইল এবং দিকে দিকে অশান্তি প্রচার করিতে লাগিল। শিভোলা ("Left-handed" Scaevola) এক আবেদন প্রচার করিয়া সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ জানাইলেন। নিউ ইয়র্ক শহর এই আন্দোলনে যোগ দিল। সংবাদপত্রগুলি সমস্বরে প্রচার করিতে লাগিল ইংরেজ তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেছে, তাহাদের ক্রীতদাস করিতে চাহে। বোস্টন শহরে প্রচারিত হইল,—

"They would oppose with lives and fortunes, if need be, any attempt to land and sell the East India Tea".

১৭৭৩ সালে ১৭ই নবেম্বর তারিখে লণ্ডন হইতে আমেরিকা অভিমুখে চা রওনা হইবার সংবাদ পেঁছে। ৮৮ নবেম্বর তারিখে 'ডার্টমাউথ' (Dartmouth) জাহাজ বোস্টন বন্দরে লাগে। মাসাচুসেট্স্-এর বঙ্গীয় সেবক সামুয়েল আডামসের (Samuel Adams) আদেশে বন্দরে চা নামানো অসম্ভব হইল। অবস্থা বুঝিয়া চা সমেত জাহাজ লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিবার জন্য কাপ্টেন রথ (Capt. Roth) অভিপ্রায় জানাইলেন, কিন্তু জাহাজকে বন্দর ত্যাগ করিতে দেওয়া হইল না।

১৭৭৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে গ্রিফিন্স জাহাজঘাটে (Griffin's Wharf) রাত্রিকালে কয়েকজন আমেরিকাবাসী গুপ্তবেশে আসিয়া সমস্ত চা জলে ফেলিয়া দিল।

আজও ঐ জাহাজঘাটায় এইরূপ লেখা প্রস্তরফলক দেখিতে পাওয়া যায়—

"Here formerly stood
Griffin's wharf
at which lay moored on December 16, 1773, three British ships with cargoes of tea. To defeat King George's trivial but tyrannical tax of 3d. a pound, about ninety citizens of Boston partly disguised as Indians, boarded the ships, threw the cargoes, three hundred and forty two chests in all, into the sea, and made the world ring with patriotic exploit of the

Boston Tea Party

No! never was mingled such a draught
In palace, hall or arbor,
As freemen brewed and tyrants quaffed
That night in Boston Harbor!"

ইহার ফলে বোস্টন বন্দর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, মাসাচুসেট্স্কে তাহার গবর্ণর নির্বাচন ক্ষমতা লোপ করা হয় এবং গতানুগতিক ধারায় নানা প্রকার দমনের পন্থা অবলম্বিত হয়। কিন্তু আমেরিকাবাসী তাহাদের প্রতিবাদ সমানভাবেই চালাইতে থাকে। গ্রিফিন জাহাজঘাটার ঘটনা ২২শে ডিসেম্বর গ্রীনউইচ বন্দরে পুনরায় সংঘটিত হয়। ফিলাডেলফিয়া হইতে জাহাজ ফিরাইয়া লইতে দেওয়া হয়। নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি শহরেও চায়ের ধ্বংস সাধনের নানা উপায় অবলম্বিত হয়। আনাপোলিশ স্বেচ্ছাসেবকদের (Annapolis Tea Party) আদেশ অনুযায়ী কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট (Capt. Stewart) নিজ জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিয়া সমস্ত চা দগ্ধ করিবার পর ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পায়।

তাহার পরের ঘটনা আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জয়লাভ। ১৭৭৬ সালে তাহারা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে এবং ১৭৮৩ সালে ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে আমেরিকা স্বাধীন জাতি বলিয়া ইংরেজ মানিয়া লয়।

চা

পরিশিষ্ট ক

(১৯৩৭)

মোট জমি	৮,৩৪,৪০০	একর	
ব্রিটিশ ভারত	৭,৩৯,৮০০	"	৮৮·৭%
করদ রাজ্য	৯৪,৬০০	"	১১·৩%
মোট ফসল	৪৩,০২,৫০,০০০	পাউণ্ড	
ব্রিটিশ ভারত	৩৯,১৫,১৮,০০০	"	৯১·৪%
করদ রাজ্য	৩,৮৭,৩২,০০০	"	৮·৬%

	হাজার একর	শতকরা অংশ	লক্ষ পাউণ্ড	শতকরা অংশ
ব্রিটিশ ভারত—				
আসাম	৪৪০	৫২·৭	২৪,১৫	৫৬·১
বাঙলা	২০২	২৪·২	১০,৮৬	২৫·২
মদ্র	৭৮	৯·৪	৩,৫৪	৮·২
পঞ্চনদ	৯½	১·১	২৮	·৬
যুক্তপ্রদেশ	৬½	·৮	২০	—
বিহার	৪	—	১২	—
করদ রাজ্য—				
ত্রিবাঙ্কুর	৭৮	৯·৪	৩,৪৫	৮·২
ত্রিপুরা	১০½	১·২	২৮	·৬
মহীশূর	৪	—	৬	—
কোচিন	২	—	৭	—

পরিশিষ্ট (খ)

প্রতি একরে গড়ে ফলন (শুষ্ক পাতা ও গুঁড়া)

লক্ষ্মীপুর ...	৬৬৩
গোয়ালপাড়া ...	৫৯৫
জলপাইগুড়ি ...	৫৯৯
দারাং ...	৫৮৪
শিবসাগর ...	৫৪৩
কইম্বাটুর ...	৫৪২
নীলগিরি ...	৪৯৩
শ্রীহট্ট ...	৪৯০
নওগাঁ ...	৪৮৫
মালবার ...	৪৭৯
কোচিন ...	৪৫৬
কুর্গ ...	[illegible]

কাছাড়	...	৪৪৫
ত্রিবাঙ্কুর	...	৪১৮
দার্জ্জিলিঙ	...	৪১৫
ত্রিপুরা	...	৩০১
মাদুরা	...	২৮৮
মহীশূর	...	২৩৩

পরিশিষ্ট (গ)

চা আবাদের ক্রমোন্নতি

	হাজার একর	লক্ষ পাউণ্ড
১৮৭৫—৭৯ গড়ে	১৭৩	৩,৪০
১৮৮০—৮৪ „		
১৮৮৫—৮৯ „	৩০৭	৯,০০
১৯০০—০৪ „	৫,০০	১৯,৫০
১৯১০	৫,৩৩	২৪,৯০
১৯১৫	৫,৯৪	৩৫,২০
১৯২০	৬,৫৪	৩২,২০
১৯২৫	৬,৭২	৩৩,০০
১৯৩০	৮,০৩	৩৯,২০
১৯৩৫	৮,৩২	৩৯,৭২
১৯৩৬	৮,৩৪	৩৯,৪২
১৯৩৭	৮,৩৪	৪৩,০২

পরিশিষ্ট (ঘ)

পৃথিবীতে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ

(১৯৩৭)

		পাউণ্ড
ভারতবর্ষ	...	৪৩,০২,৫০,০০০
সিংহল	...	২১,২৬,৮৫,০০০
ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব্বভারত দ্বীপপুঞ্জে	...	১৬,৪৭,৮০,০০০
জাপান	...	১১,৮৬,০৯,০০০
ইন্দোচীন	...	২,৪৪,০০,০০০
ফরমোসা	...	২,৪০,০০,০০০
চীন হইতে রপ্তানি চায়ের পরিমাণ	...	৯,০০,০০,০০০

আবাদী জমির পরিমাণ ৫,৩০,০০০ একর বলিয়া জানা গিয়াছে; সুতরাং ভারতবর্ষ অপেক্ষা চা'র পরিমাণ কম হইবে বলিয়া অনুমান করি।

স্বপ্ন ভঙ্গ

শ্রীনির্ম্মলকুমার মিত্র বি-এ

জ্যোৎস্নাময়ী রাত।
বাতায়ন খুলি নারী নিভাইল বাতি।
তারপর ধীরে ধীরে পালংকেতে বসি'
নূপুরে মেলিয়া দিঠি মৃদুমন্দ শ্বসি',
শুনিতে লাগিল চুপে পাপিয়ার গান।
মুহূর্ত্তে ছুটিল কোন্ স্বপ্নলোকে প্রাণঃ
সাতটি সমুদ্র আর তেরো নদী-পার
যেথায় রূপসী কন্যা ঘুমে তন্দ্রাভোর,
শিয়রে রূপার কাঠি, পদতলে সোনা,
মনে হ'ল সে-নারী সে-কন্যা গল্পে শোনা।
তাহারি লাগিয়া আসে রাজার কুমার
পক্ষীরাজে অতিক্রমি সপ্ত পারাবার;
বক্ষের হৃৎপিণ্ড চাপি শংকাকুলা নারী
শুনিল পিতম তার এলো অশ্ব ছাড়ি'।
এলো, এলো শালপ্রাংশু, বৃষস্কন্ধ বীর
স্বপ্নের প্রেয়সী লাগি উন্মত্ত অধীর!
দুরু দুরু হিয়া কাঁপে, আসি মন্দ পায়
সোনার কাঠিটি দেয় প্রিয়ার মাথায়।
অকস্মাৎ বসন্তের পড়ে যায় সাড়া
নিদ্রিত প্রাসাদ হয় সর্ব্ব-দুখ-হারা।
স্বর্ণ দণ্ডে শুক গাহে, পিঞ্জরে সারিকা;
এতো দিনে কুমারীর অশ্রু সমাপিকা।
মধুর বসন্ত-বায়ে, জ্যোছনা-প্লাবনে,
মুখরিত দশ দিশা পাপিয়ার গানে।
কুমার উদ্বেল বক্ষে পাণি দু'টি ধরে
বলিতে আছিল সবে উচ্ছ্বসিত স্বরে—
'কতোকাল —কতোকাল পরে দুষ্ট বিধি,
তোমারে মিলালো মোর নয়নের নিধি!'
বলিতে—বলিতে কথা না-হইতে শেষ,
সহসা কাঁদিল শিশু, টুটে স্বপ্ন রেশ!
চমকি দেখিল চাহি: কোথা প্রিয় তার,
এযে সেই পুরাতন চিত্র নিত্যকার!
ঘুমন্ত নিস্তেজ শিশু দুরন্ত অসুখে
মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে, বৃদ্ধ স্বামী সুখে—
তৃতীয় পক্ষের পাশে ঘুমে অচেতন।
জ্যোছনা মলিন হ'ল, শিহরে নয়ন!
তেমনি অধীর গানে কাঁদিছে পাপিয়া;
বাতায়ন বন্ধ করি মুখখানি চাপিয়া,
কাঁদিতে লাগিল বালা মধুগন্ধী বাতে—
হিম ম্লান শয্যাতলে জ্যোৎস্নাময়ী রাতে।

ভারত কোন্ পথে

ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে দক্ষ-যজ্ঞ সুরু হবার উপক্রম হয়েছে। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত জগদ্ব্যাপী কুরুক্ষেত্রের স্মৃতি ভালো ক'রে মুছে যেতে না যেতে নতুন কুরুক্ষেত্র সৃষ্টির আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। শুকনো বারুদ স্তূপীকৃত হ'য়ে আছে—একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শে এই বারুদের স্তূপ যে কোনো মুহূর্তে সহস্র-শিখায় জ্বলে উঠে সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারে।

যুদ্ধ যদি বাধে, ভারতবর্ষ কি করবে? সে কি সাংখ্যের উদাসীন পুরুষের মতো দূরে থেকে নিরপেক্ষভাবে কুরুক্ষেত্রের রক্তারক্তি দেখবে, না ন্যায়ের পক্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে? সে কি ইংরেজের পিছনে পিছনে চলবে যেমন ক'রে গাধাবোট চলে ষ্টীমারের পিছু পিছু অথবা বৃটেন তাকে নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করতে চাইলে সে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ক্রীড়নক হ'তে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করবে।

ওয়ার্ধায় এবার যে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হ'য়ে গেল—এই অধিবেশনে কংগ্রেসের কর্ণধারগণ খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতবর্ষ সর্বান্তঃকরণে সেইসব জাতির পক্ষ সমর্থন করবে যাদের হাতে গণতন্ত্রের আর স্বাধীনতার জয়ধ্বজা। যারা ফ্যাসিষ্টবাদের জয়নিশান উড়িয়ে ইউরোপে চেকোশ্লোভেকিয়া আর স্পেনের গলায় দিয়েছে ছুরি, আফ্রিকায় আবিসিনিয়ার মেরুদণ্ড দিয়েছে ভেঙে, এশিয়ায় চীনের স্বাধীনতার বুকে অস্ত্রাঘাত তাদের কার্য্যকে ভারতবর্ষ যে একেবারেই সমর্থন করে না—একথা ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেস অকম্পিত কণ্ঠেই ঘোষণা করেছেন।

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুসারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বাধীনতার এবং গণতন্ত্রের পক্ষে একেবারেই নয় যে কোন মুহূর্ত্তে গণতন্ত্রের এবং মুক্তির আদর্শকে স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া বৃটেনের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। ওয়ার্কিং কমিটির এই মতের সঙ্গে আমাদের মতের কিছুমাত্র অনৈক্য নেই। দুয়ে দুয়ে চার যেমন সত্য সূর্য্য পূর্ব্বদিকে ওঠে এবং জল নীচু জায়গা থেকে এ যেমন সত্য—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরণীর হাল বৃটেনের পুঁজিপতিদের হাতে এও তেমনি সত্য। চেম্বারলেনের গবর্ণমেণ্ট বৃটেনের ধনীদের গবর্ণমেণ্ট। ইংলণ্ডের গরীবদের স্বার্থকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি বড় ক'রে দেখতো—আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তার রাষ্ট্রনীতি যে পথে চলছে সে পথে না চ'লে আজ ভিন্ন পথে চলত। বিলাতের রাজনীতির ক্ষেত্রে ধনীদের প্রভুত্বের পরিবর্তে শ্রমিকদের প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হ'লে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আবিসিনিয়াকে ইটালির কুক্ষিগত হ'তে দিত না, স্পেনের ব্যাপারে নিরপেক্ষনীতি (Non-intervention Pact) অবলম্বনের ভাঁওতা দেখিয়ে স্প্যানিশ গবর্ণমেণ্টকে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করবার অধিকারে বঞ্চিত করে রাখত না, মিউনিক প্যাক্ট তৈরী ক'রে চেকোশ্লোভাকিয়াকে হিটলারের পদতলে নিক্ষেপ ক'রত না। কেন বৃটেন জাপানকে, জার্ম্মানীকে, ইটালিকে খুশী রাখবার জন্য এত ব্যস্ত? কারণ জাপানকে খুশী রাখতে পারলে চীনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হ'লেও বৃটেনের ধনীদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে। ফ্যাসিস্ট্ জার্ম্মানী আর ফ্যাসিস্ট্ ইটালিকে খুশী রাখা মানে বিলাতের ধনীদের স্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখা। যদি, জার্ম্মানীর, জাপানের আর ইটালির উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধির ফলে ইংলণ্ডের মর্য্যাদার যথেষ্ট হানি হ'তে আরম্ভ করেছে, গৌরবের উচ্চতম শিখর থেকে ক্রমশই সে অবনতির ধাপে নামতে নামতে চলেছে—এমন কি এত বড় জগৎজোড়া সাম্রাজ্য হারাবারও যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। তবুও কেন জার্ম্মানীর, ইটালির আর জাপানের মন যুগিয়ে চলবার জন্য বৃটেনের এই অশোভন উৎসাহ? কারণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরণীর হালে যারা আছে তারা হচ্ছে ধনী আর তাদের জীবনের আকাশে ধ্রুবতারা হ'য়ে জেগে রয়েছে ঐশ্বর্য্যের কামনা। ফ্যাসিজম আর যাই করুক, কমিউনিজমের মত ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ তো কামনা করে না। ফ্যাসিস্ট্ ইটালি, ফ্যাসিস্ট্ স্পেন, ফ্যাসিস্ট্ জার্ম্মানী, ফ্যাসিস্ট্ জাপান ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরে কিছুতেই হস্তক্ষেপ করবে না। চেম্বারলেনের গবর্ণমেণ্ট তাই ফ্রাঙ্কোকে, হিটলারকে, মুসোলিনীকে সমর্থন ক'রে চলেছে এতখানি উৎসাহের সঙ্গে। সাম্রাজ্য যায় যাক—ধন-সম্পত্তি বজায় থাকলেই হ'ল। কিন্তু ফ্যাসিস্ট্রা জয়ী না হ'য়ে যদি কমিউনিষ্টরা জয়ী হয়, তাহ'লে হবে কি? সাম্রাজ্য তো যাবেই—সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির (Private property) উচ্ছেদও অনিবার্য্য। কমিউনিজ্‌ম একদিকে যেমন জাতির উপরে জাতির প্রভুত্বকে (imperialism) স্বীকার করে না, আর একদিকে তেমনি শ্রেণীর উপরে শ্রেণীর প্রভুত্বকেও (capitalism) স্বীকার করে না। উহা একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদকামী। চেম্বারলেনের গবর্ণমেণ্ট দেখছে—সাম্রাজ্য বাঁচাবার কোনো উপায়ই আর নেই। ফ্যাসিজ্‌ম্ আর কমিউনিজ্‌মের জগদ্ব্যাপী গজ-কচ্ছপের লড়ায়ে ফ্যাসিজ্‌ম্ জয়ী হ'লেও সাম্রাজ্য যাবে, কমিউনিজম জয়ী হ'লেও সাম্রাজ্য যাবে। রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীর উত্তরোত্তর ক্ষমতাবৃদ্ধি বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে একেবারেই অনুকূল নয়। হিটলারের অভ্যুদয়কে এবং জাপানের দিগ্বিজয়ের অভিযানকেও বৃটেন একেবারেই সুনজরে দেখে না। তা না দেখুক। চেম্বারলেনপন্থীরা এটুকু জানে, ষ্ট্যালিন জিতলে, কমিউনিস্ট রাশিয়ার সাধনা জয়যুক্ত হ'লে, মার্ক্সবাদের জয়ধ্বজা ইংলণ্ডের মাটীতে উড়তে থাকলে আমও যাবে, ছালাও যাবে—সাম্রাজ্যও যাবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিও যাবে—যাকে বলে ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন—তাই হবে। যে ডালে মানুষ ব'সে থাকে—সে ডাল কি কখনো সে ইচ্ছা ক'রে কাটতে পারে? ইংলণ্ডের ধনীরা এতো বোকা নয় যে ফ্যাসিজ্‌মের বিরোধিতা ক'রে কমিউনিজ্‌মের শক্তি বাড়িয়ে দেবে এবং স্বখাদ-সলিলে ডুবে মরবার ব্যবস্থা করবে। ইংলণ্ডে ধনীরা যতদিন রাষ্ট্ররথের সারথি থাকবে ততদিন

ফ্যাসিজমের সঙ্গে কমিউনিজমের লড়ায়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সাধ্যমত ফ্যাসিজমকেই সমর্থন করবে।

কিন্তু হিটলারের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ লাগা বিচিত্র নয়। ইটালির সঙ্গেও ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকা অত্যন্ত অস্বাভাবিক, কারণ সবাই তো দুনিয়া চুঁড়ে বেড়াচ্ছে স্বার্থসিদ্ধির জন্য। যে কোনো সময়ে লুটের মাল নিয়ে, কাঁচা মালের উপরে অধিকার নিয়ে একটা সাম্রাজ্যবাদী জাতের সঙ্গে আর একটা সাম্রাজ্যবাদী জাতের সংঘর্ষ বাধবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। ইউরোপে লড়াই যদি নিতান্তই বাধে আর সেই লড়ায়ে ইংলণ্ড যদি যোগ দেয় আমরা কি করবো? কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি নির্দ্দেশ দিচ্ছেন, যুদ্ধ যদি বাধে এবং ইংলণ্ড যদি ভারতবর্ষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে সেই যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনতে চায়, কংগ্রেস প্রাণপণে ইংলণ্ডের সেই চেষ্টাকে বাধা দেবে। ইতিমধ্যেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সিঙ্গাপুরে আর মিশরে ভারতীয় সেনা পাঠাতে আরম্ভ করেছেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ভারত গবর্ণমেণ্টের এই নীতিকে একেবারেই সমর্থন করেনি। কংগ্রেসও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে ভারতের বাহিরে প্রেরণ করবার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই গ্রহণ করেছে। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ কখনোই বিদেশে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারে না। ইহার প্রতিবাদ-স্বরূপে এ্যাসেম্‌ব্লির আগামী অধিবেশনে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোন কংগ্রেসী সদস্য যাতে উপস্থিত না হয়—এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব ওয়ার্দ্ধার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে। কমিটি আর একটি প্রস্তাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সমরায়োজনে কোনরূপ সাহায্য না করবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এই নীতির অনুসরণ করতে গিয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীকে যদি পদত্যাগ করতে হয়, ওয়ার্কিং কমিটি সেই পদত্যাগের অনুকূলে। আমরা ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করি।

গত মহাযুদ্ধে আমরা বৃটেনকে কতভাবেই না সাহায্য করেছি! আমাদের ভারতীয় সেনারা ফ্রান্স আর ফ্লাণ্ডার্সের সমরক্ষেত্রে আত্মদান করেছে ইংলণ্ডকে জার্ম্মানীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য "গণতন্ত্রকে নিরাপদ করবার জন্য।" কিন্তু গণতন্ত্র নিরাপদ হয় নি,—বরং সাম্রাজ্যবাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে, বহু দুর্ব্বল জাতির স্বাধীনতা লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয়বার আর কোন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে আমরা যোগ দেব না।

আমরা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হতে চাই, আমরা দেখতে চাই সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্রের আর স্বাধীনতার জয়-জয়কার। ভারতবর্ষ বেঁচে আছে—তার তপোবনের প্রেমের আর ঐক্যের মৃত্যুহীন বাণী দিয়ে এই ঈর্ষাদ্বেষে অভিশপ্ত জগতকে রূপান্তরিত করতে। বৃটেনের আদর্শ স্বাধীনতাও নয়, গণতন্ত্রও নয়। তার আদর্শ পৃথিবীর দুর্ব্বল জাতিগুলিকে পদানত রেখে, নিজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা। আমাদের আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক। কেন আমরা মূঢ়ের মত বৃটেনের হাতের ক্রীড়নক হ'য়ে তার জন্য যুদ্ধ করবো? কেন আমরা বিশ্বের মুক্তির প্রভাতকে সুদূরে পিছিয়ে দেবো?

বৃটেনের গৌরবের দিন ফুরিয়ে এসেছে—তাই তার সামনে আজ কোনো বড়ো আদর্শ নেই। তার সন্তানেরা সিসিল রোডস্ হয়ে আজ পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে কেবল টাকা রোজগার করবার উদ্দেশ্যে। এত ছোট ছোট কামান যেখানে—সেখানে বুঝতে হবে জাতির প্রাণশক্তি ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। ইংলণ্ডের মন আজ সোনার খনির আর তেলের খনির বাইরে কোন কিছুর কথা ভাবতে পারে না। গোটের আর বেটোফেনের জাতও আজ কামান পূজোর ধুম লাগিয়েছে। পশ্চিম আজ মরতে বসেছে। আমরাও কি বর্ব্বরতার পূজো ক'রে তাদের সঙ্গে সহমরণে যাবো? কখনো নয়। আমাদের চোখে নতুন স্বপ্ন—একটা নতুন বিশ্ব গড়বার স্বপ্ন। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়, জাতির সঙ্গে জাতি ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। সেখানে নর-নারীর দেহের চারিদিকে যেমন কারাপ্রাচীর নেই, মনের চারিদিকেও তেমনি কারাপ্রাচীর নেই। মানুষ সেখানে মুক্তিকে পেয়েছে, পূর্ণতাকে পেয়েছে। যুদ্ধের রণদামামা সেখানে থেমে গিয়েছে, বারুদের ধোঁয়া অদৃশ্য হয়েছে। এই নূতন জগতের স্বপ্নকে বাস্তবে মূর্ত্ত করে তুলবার জন্যই তো ভারতবর্ষ বোমার পথে না গিয়ে সত্যাগ্রহের পথকে তার মুক্তির পথ বলে গ্রহণ করেছে। সত্য আর অহিংসার সাধনাকে আমরা জাতির সাধনা ক'রে তুলবার তপস্যায় ব্রতী হয়েছি। আমাদের সাধনা যখন জয়ী হ'য়ে সাম্রাজ্যবাদের নিগড় থেকে আমাদিগকে মুক্ত করবে—স্বাধীন ভারতবর্ষ তখন জগতকে নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দেবে। আজ আমরা পরাধীন, তাই আমাদের কথা কেউ শুনছে না। স্বাধীন ভারতবর্ষের সাধনাকে উপেক্ষা করবার ঔদ্ধত্য থাকবে না কারও।

The vigour of civilised societies is preserved by the widespread sense that high aims are worthwhile. Vigorous societies harbour a certain extravagance of objectives, so that men wander beyond the safe provision of personal gratifications

পুরাণো আদর্শের জীর্ণ সঞ্চয় নিয়ে কাল কাটাবার দিন আমরা শেষ করেছি। সাগরের ওপারে যারা—তারা আজও কামান-বন্দুককেই আঁকড়ে আছে। তাদের জীবনকে আজও শাসন করছে লোভ আর হিংসা—সেই পুরাতন বর্ব্বরতা। আমরা দেখছি নতুন স্বপ্ন—প্রেম দিয়ে বিশ্বকে নতুন রূপ দেবার নতুন স্বপ্ন। আমরা কেন সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের প্রতিধ্বনি হতে যাবো? কেন তাদের পিছনে পিছনে বর্ব্বরতার পথে চলবো? আমাদের আদর্শ নতুন, আমাদের স্বপ্ন নতুন, আমাদের পথ নতুন, আমরা হ'তে চাই নতুন জগতের স্রষ্টা, নতুন প্রভাতের অগ্রদূত, নতুন ইতিহাসের রচয়িতা।

জনমত পরিমাপের অভিনব প্রচেষ্টা

খাঁটি গণতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানে ও রাষ্ট্রে কোনও বিষয়ে জনমত জানিবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। 'ডিমোক্র্যাসি' প্রবর্তিত হইবার পর হইতে এ পর্যন্ত জনমত আন্দাজ করিয়া লইয়াই লোকদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইত। ফলে, আন্দাজ ঠিক হইলে যেমন রাষ্ট্র প্রতিনিধিগণ পুনর্বার প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার সুযোগ লাভ করিতেন, তেমনি আন্দাজ ঠিক না হইলে প্রতিকূল জনমতের চাপে তাঁহাদের বহুক্ষেত্রে 'নাজেহাল' হইতে হইত। এমন কি, চিরদিনের মত অনেককে রাজনীতিক্ষেত্র হইতেও বিদায় লইতে হইত। আন্দাজে অন্ধকারে ঢিল না ছুঁড়িয়া কোন বিষয়ে জনমত কিরূপ তাহা সঠিকভাবে বুঝিয়া যদি কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে সবদিক দিয়াই যে সুবিধা হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গণতন্ত্রের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কিন্তু সত্যই এরূপ এক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা কোনও বিষয়ে জনমত কি হইতে পারে তৎসম্পর্কে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুস্পষ্ট-

ডাঃ জর্জ হোরেস্ গ্যালাপ

ভাবে বিশ্বাসযোগ্য অভিমত পূর্বাহ্নেই জানা যাইতে পারে।
এই বিশেষ প্রণালীর যিনি প্রবর্তক, তাঁহার নাম ডাঃ জর্জ হোরেস্ গ্যালাপ। গ্যালাপের বর্তমান বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর। তিনি আইওয়া (Iowa) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং 'আমেরিকান ইন্স্টিটিউট অব পাব্লিক ওপিনিয়ন্' বা আমেরিকার জনমত নির্ণয় পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। চারি বৎসর পূর্বে যখন তিনি সর্বপ্রথম ১২ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কিন অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র কয়েক সহস্র ব্যক্তির নিকট কোনও বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর হইতে সেই বিষয়ে সমগ্র জাতির মতামত জানিবার প্রয়াস পান, তখন অনেকেই কিন্তু তাঁহাকে পরিহাস করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ সকলের ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। আজ গ্যালাপের পর্যবেক্ষণের ফল হইতে জনমতের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে লোক বড় একটা অবিশ্বাস করে না। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এমন কি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তিনি জনমতের যে পূর্বাভাষ ব্যক্ত করেন তাহা বড় মিথ্যা হয় না।

জনমত পরিমাপের এই বিজ্ঞান গ্যালাপ একদিনে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তাঁহাকে বার্তাবিদ্যা শিক্ষা দিতে হইত, তখন তিনি সংবাদপত্রের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যে (features) লোকে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা জানিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি এজন্য পঞ্চাশ রকমের বিভিন্ন প্রণালী প্রচলন করিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং অবশেষে এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন, যাহা তাঁহার জীবনে অসামান্য সাফল্য নির্দেশ করিল। তিনি এ সম্পর্কে যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন তজ্জন্য আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টরেট্' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার নির্দিষ্ট প্রণালী আজ 'গ্যালাপ মেথড্' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কোন বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে জনমত জানিবার এই যে পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে 'প্র্যাকটিক্যাল ডিমোক্র্যাসি'তে এক নূতন যুগেরও প্রবর্তন হইয়াছে। বার্তাবিদ্যা শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি কোন বিষয়ে পাঠক সম্প্রদায়ের মতামত জানিবার নিমিত্ত যে সমস্ত গবেষণা করেন, তাহার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়াই তিনি পূর্বোক্ত 'জনমত নির্ণয় পরিষদ' স্থাপিত করেন।

সাধারণভাবে কোন রাজনীতিক বা সমাজনীতিক বিষয় সম্পর্কে জনমত জানিবার পক্ষে তাঁহার আবিষ্কৃত পদ্ধতি কার্যকরী হইবে কি না তাহা বুঝিতে না পারিয়া ডাঃ গ্যালাপ প্রথমত অতি সন্তর্পণে সে বিষয়ে লোকের মতামত জানিতে চাহিয়া নানাস্থানে পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। উত্তরও অবশ্য আসিতে লাগিল। কিন্তু ইহা হইতে যে মতামতের তিনি আভাষ পাইলেন, তাহাই যে ঠিক জনমত তাহা নির্ণয় করিবার কোন সুবিধা তিনি দেখিলেন না। তাই তিনি এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি যুক্ত-রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভোটার তালিকা সংগ্রহ করিয়া তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন করিলেন এবং ১৯৩৩ সালের শেষভাগে বাছিয়া বাছিয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট পরিমাণ কতক ভোটারের নিকট ১৯৩৪ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন ফল কি হইতে পারে তাহা জানিতে চাহিলেন। বিভিন্ন ভোটারের নিকট এইরূপে যে উত্তর তিনি লাভ করিলেন, তাহা হইতে তাঁহার নিজ পদ্ধতি দ্বারা পরিমাপ করিয়া তিনি ১৯৩৪ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে যে সুনির্দিষ্ট জনমত প্রকাশ পাইবে তাহার আভাষ পাইলেন। বস্তুত যখন সরকারীভাবে উক্ত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইল তখন দেখা গেল যে, তাঁহার পূর্বাভাষে শতকরা এক ভাগের বেশী ভুল হয় নাই।

১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে গ্যালাপ তাঁহার নিজ পদ্ধতিতে মার্কিন রাষ্ট্রে প্রবর্তিত 'নিউ ডিল' বা নূতন ব্যবস্থা সম্পর্কে জনমত সংগ্রহ করিয়া পঁয়ত্রিশখানি সংবাদপত্রে তাহা সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার পূর্বাভাষে জনমতের যে প্রতিধ্বনি করেন তাহাতে দেখা যায়, অধিকাংশ নির্বাচন-কেন্দ্রেই বেশীর ভাগ লোক নয়া ব্যবস্থার প্রতিকূলে মত প্রকাশ

করে। গ্যালাপের এই পূর্বাভাষ প্রকাশিত হইলে নয়া ব্যবস্থার সমর্থক দল ক্ষেপিয়া গিয়া গ্যালাপকে নানারূপ অপবাদ দিতে সুরু করিল। কেহ কেহ তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট বিরোধী দলের প্রচারক বলিয়া ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। কিন্তু গ্যালাপ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। 'নয়া ব্যবস্থা' সম্পর্কে জনমত যে বিশেষ অনুকূল নহে পরবর্তী ঘটনায় তাহা বিশেষভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। এসমস্ত সমালোচনায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ডাঃ গ্যালাপ তাঁহার নিজ পদ্ধতিতে ১৯৩৬ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের ফলাফল কি হইতে পারে তাহার সম্পর্কে জনমত পরিমাপ করিয়া নির্বাচনের পূর্বেই তাহা ঘোষণা করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

ডাঃ গ্যালাপ প্রতিষ্ঠিত 'আমেরিকান ইনষ্টিটিউট অব পাব্লিক ওপিনিয়ন্' ব্যতীত আরও দুইটি প্রতিষ্ঠানও ১৯৩৬ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার প্রয়াস পাইল। এই দুই প্রতিষ্ঠানের একটি সুবিখ্যাত পত্রিকা 'লিটারারি ডাইজেস্ট্' অপর 'ফরচুন্ ম্যাগাজিন্।' 'লিটারারি ডাইজেস্ট' পূর্বেও বহুবার তাহার পাঠকবর্গের মধ্য হইতে ভোট (Straw Vote) সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা অন্যান্যবারের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের ফলাফলের পূর্বাভাষ ঠিক ঠিক ভাবে ঘোষণা করিয়াছে। সাধারণত এই কাগজ বিশ লক্ষ লোকের নিকট প্রশ্নপত্র প্রেরণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে যে জবাব পায়, তাহা হইতেই এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকে। কিন্তু 'ফরচুন ম্যাগাজিন্' ও ডাঃ গ্যালাপের পদ্ধতি অন্যরূপ। 'ফরচুন ম্যাগাজিন্' প্রায় ডাঃ গ্যালাপের অনুসৃত পদ্ধতিতেই জনমত পরিমাপ করিয়া থাকে এবং ইহার অন্যতম কর্মী এল্মো রোপারের পরিচালনায় ইহা রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কিত বহুবিধ প্রশ্ন সম্পর্কে প্রতি বৎসর চারি মাস অন্তর অন্তর জনমত সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিবার ব্যবস্থা করে। জনমত সংগ্রহে গ্যালাপের স্থাপিত "জনমত নির্ণয় পরিষদ্" ও 'ফরচুন ম্যাগাজিন্' 'লিটারারি ডাইজেস্ট-এর মত শুধু 'ষ্ট্র' ভোটের উপর নির্ভর না করিয়া বিশেষভাবে শিক্ষা-প্রাপ্ত কর্মীদিগকে নানা কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া থাকে। ইঁহারা লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাদের মনোভাবের সহিত পরিচিত হন। এতদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভোটারদের তালিকা হইতে বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের মতামতও সংগ্রহ করেন। তারপর উভয়বিধ পর্যবেক্ষণের যুক্ত ফলের উপর নির্ভর করিয়া কোনও বিষয়ে জনমত সম্পর্কে ইঁহারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

১৯৩৬ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন সম্পর্কে 'লিটারারি ডাইজেস্ট' তাহাদের চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী ভোট গ্রহণ করিয়া জনমতের যে পূর্বাভাষ ব্যক্ত করে তাহাতে আমেরিকার রিপাব্লিকান দলই বিজয়ী হইবে বলিয়া তাহারা অভিমত প্রকাশ করে। রুজভেল্ট শতকরা একচল্লিশ ভোটের অধিক পাইবেন না বলিয়া এই কাগজে পূর্বাভাষ প্রকাশিত হয়। ডাঃ গ্যালাপ তখনই জনসাধারণকে জানাইয়া দেন যে, 'লিটারারি ডাইজেস্টের' এই পর্যবেক্ষণ ঠিক নহে। তিনি তাঁহার নিজ পদ্ধতিতে পরিমাপ করিয়া ইহাই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, নির্ব্বাচনে জনমত রুজভেল্টের প্রতিকূল হইবে না, বরং অনুকূলে যাইবে। 'লিটারারী ডাইজেস্টের' পরিমাপ শতকরা কতভাগ ভুল হইবে তাহা পর্যন্ত তিনি নির্দেশ করেন। 'লিটা-রারী ডাইজেস্ট' প্রকাশিত পূর্ব পূর্ববারের নির্বাচনের ফলা-ফলের পূর্বাভাষ যেভাবে ঠিক হইয়াছে তাহা জানিয়া সেইদিন অতি অল্প লোকই অবশ্য ডাঃ গ্যালাপের এই ঘোষণায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু যখন নির্বাচনপর্ব শেষ হইয়া গেল ও সরকারীভাবে ফলাফল ঘোষিত হইল, তখন দেখা গেল ডাঃ গ্যালাপ ও ফরচুন্ ম্যাগাজিনের ঘোষিত জন-মতের পূর্বাভাষই ঠিক হইয়াছে। এমন কি, ডাঃ গ্যালাপ 'লিটারারী ডাইজেস্টের পূর্বাভাষ যে পরিমাণ ভুল হইবে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, ফলও ঠিক তাহাই দেখা গেল। ডাঃ গ্যালাপ তাঁহার পূর্বাভাষে রুজভেল্টের পক্ষে যত ভোট হইবে বলিয়া পরিমাপ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রায় মিলিয়া গেল। বস্তুত তাঁহার পূর্বাভাষে ও সরকারী ঘোষণায় ভোট সংখ্যার পার্থক্য শতকরা একভাগেরও কম পরিলক্ষিত হইল।

ডাঃ গ্যালাপ তাঁহার পর্যবেক্ষণের দ্বারা সেইদিন অবি-শ্বাসীদের মনেও চমক লাগাইলেন। আজও গ্যালাপের প্রতিষ্ঠিত 'জনমত নির্ণয় পরিষদের' প্রতি কাহারও অবিশ্বাস নাই। উক্ত পরিষদ হইতে যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়, মার্কিন সংবাদপত্রে তাহা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিয়াছে। গত চারি বৎসরে এই পরিষদ হইতে রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রমিক ও সমাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন বহু রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে কমপক্ষে ছয়শত বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী-দের জনমত নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে।

ডাঃ গ্যালাপের গণতন্ত্রে অগাধ বিশ্বাস। থিয়োডোর রুজভেল্টের মত তিনিও মনে করেন যে, "একান্ত সাদাসিধে অধিকাংশ লোক যদি নিজদিগকে শাসন করার ভার নিজেরা গ্রহণ করে, তাহাতে তাহাদের অল্পই ভুল করার সম্ভাবনা। অল্প কয়েকজন ব্যক্তি বেশীরভাগ লোককে শাসন করিবার চেষ্টা করিতে গিয়াই বরং বেশী ভুল করিয়া থাকে।" ধীর স্থির মৃদুভাষী ও শান্তস্বভাব ডাঃ গ্যালাপ গণতন্ত্রের সুপরিচালনার্থ জনমত পরিমাপের চেষ্টা করিতেছেন। এই পরি-মাপ কিন্তু 'ষ্ট্যাটিষ্টিকস্' সংগ্রহ নহে। ষ্ট্যাটিষ্টিকসের সংখ্যা যে কোন লোক সহজেই নিজ নিজ মতের সমর্থনে ব্যবহার করিতে পারেন। জনমত সংগ্রহ অন্যরূপ। ডাঃ গ্যালাপ যে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নিখুঁত হইলে, এই পর্যবেক্ষণ ফলে গণতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। জনমত নির্ণয়ের এই প্রচেষ্টা লোককে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি ততই সুদৃঢ় হইবে সন্দেহ নাই।

বিশ্বাসঘাতক

(গল্প)

শ্রীতারিণীপ্রসাদ সরকার

রুমানিয়ার একটি ছোট্ট কাফেতে বসে জনকয়েক ছোক্‌রা হল্লা করছিল। গত কয়েকদিনের দুশ্চিন্তা, সাজ সাজ রব এবং স্বাধীনতা হারাবার তীব্র আশঙ্কা যেন সমস্ত দেশের হাসি চুরি করে নিয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে দিন কয়েক আগে সে অস্বাভাবিক উদগ্র ভবিষ্যৎ চিন্তার মেঘ সম্পূর্ণরূপে কেটে গিয়েছে, কেবল দূর দিগন্তে তারই সঞ্চরণশীল দু'এক খণ্ড ছাড়া সমস্ত আকাশ একেবারে পরিষ্কার। ভ্রূকুটি-কুটিল গাম্ভীর্য্যের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নির্ম্মল হাসি থেকে থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।

যুবকদের মধ্যে একজন সুপেয় ঈষৎ শোণিত-বর্ণাভ পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে পররাজ্যলোলুপ হিংস্র শত্রুপক্ষের বিস্তারিত কৌশলজাল কোনও এক অভাবনীয় উপায়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হলে তারা কিরূপ হতবুদ্ধি হয়েছিল অত্যন্ত সরস ভাষায় তারই বর্ণনা করিয়াছেন, আর শ্রোতৃগণ বিপক্ষীয় সর্ব্বময়কর্ত্তার মুখমণ্ডলে তাদের জন্মভূমি-গ্রাসের সু-অভিপ্রায়টি এক অচিন্তনীয় উপায়ে বিচূর্ণ হইলে হতাশা, ক্রোধ ও ব্যর্থ-প্রচেষ্টাজনিত দুঃখের সংমিশ্রিত অভিব্যক্তিতে কিরূপ অপূর্ব্ব ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল, তারই কল্পনা করে নিরতিশয় উৎফুল্ল হচ্ছিল। দূরে একজন সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ এই দৃশ্য সস্মিত-হাস্যে উপভোগ করছিলেন।

এক চুমুক পানীয় গ্রহণ করে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বক্তা বল্‌লেন, "ওহে, আর একটা সুখবর শুনেছ? বেটা বিশ্বাসঘাতক হের শিলার মরেছে।" চার-পাঁচটি কণ্ঠে একসঙ্গে ধ্বনিত হ'ল "কেন, কেন? তার আবার কি হয়েছিল?" "খবর পেলাম নাকি হার্ট-ফেল করে মরেছে! যাক্‌, হার্টটা যে ঠিক সময়েই ফেল করেছে, তার জন্য তাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কি বল? নইলে ও বেটা যদি বেঁচে থাকত, তাহলে কি এত সহজে আমরা নিষ্কৃতি পেতাম?" "নিশ্চয়, নিশ্চয়! ঐ ঘর-শত্রু বিভীষণের জন্যই ত এই অবস্থা হয়েছিল," প্রায় সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, "কি নেমকহারাম আর কি শয়তান ছিল লোকটা! তাদের চাকরী করিস্‌ বলে কি নিজের জন্মভূমিটাও তাদের হাতে তুলে দিতে হবে? যা হোক্‌, ভগবান যে আমাদের দেশের উপর অনুগ্রহ করে হতভাগাটাকে ঠিক সময়েই সরিয়ে নিয়েছেন, এর জন্য তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান উচিত।" পরিহাস রসিক বক্তা বল্‌লেন—"ঠিক, এস আমরা সভা করিয়া যথারীতি ঈশ্বরকে, আর যে বেয়াড়া হার্ট এতদিন তাকে বাঁচিয়ে রেখে ঠিক উপযুক্ত মুহূর্ত্তেই ফেল করেছে তাকে আমাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।" তারপর রঙ্গপ্রিয় যুবকগণ যথারীতি সভা ঘোষণা করে সর্ব্ববাদী-সম্মতিক্রমে বক্তাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করে ফেল্‌লেন; তামাসা দেখতে সমস্ত কাফের লোক এক জায়গায় জমিয়া গেল এবং সভাপতি সংক্ষেপে সভার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করলেন। ... জ্ঞাপন করলে একজন যুবক উঠে গম্ভীরভাবে নিম্ন-প্রস্তাবটি পাঠ করলেন—

"এই সভা পরম-কারুণিক জগদীশ্বর কর্ত্তৃক ঘনায়মান বিপদ-জাল হইতে আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির রক্ষণ ও বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী হের শিলারের নির্লজ্জ হৃদস্পন্দন যথাসময়ে স্তম্ভিত করানরূপ কার্য্যের যথোচিত প্রশংসা করিতেছে ও তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ের আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছে। অধিকন্তু উক্ত নির্লজ্জের হৃদয় যে এত দীর্ঘকাল পরে যথোপযুক্ত মুহূর্ত্তেই স্পন্দনরহিত হইতে পারিয়াছে, তন্নিবন্ধন তাহাকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।" করতালি ধ্বনির মধ্যে একজন উঠে বল্‌লেন, "আমি অন্তরের সহিত এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি।" এতক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি নিজের স্থান হ'তে এই সমস্ত লক্ষ্য করছিলেন, কিন্তু এইবার সকলকে ঠেলে সভাপতির পাশে উপস্থিত হয়ে তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠে বল্‌লেন, "আমি ঘৃণার সহিত এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। আপনারা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি প্রকৃত দেশ-প্রেমিক—যে সত্যই আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনে দেশের স্বাধীনতা বিনা রক্তপাতে রক্ষা করিল—যাহার নাম ভবিষ্যৎ বংশধরের নিকট চিরদিন প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, তাহারই নিন্দা-সূচক প্রস্তাব করিয়া নিজদিগকেই কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত করিতেছেন?" এই আকস্মিক রূঢ়তা সকলকেই যেন ক্ষণেকের জন্য মূক করে দিল। ক্ষণস্থায়ী অখণ্ড নিস্তব্ধতার পর বক্তা তাঁর বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে বল্‌লেন, "কিন্তু আমরা যা জানি, তা প্রত্যক্ষ ও প্রমাণসিদ্ধ, তাকে আপনি মিথ্যে বল্‌ছেন কোন সাহসে?" "এই সাহসে যে, আমি শুধু আপনাদের চেয়ে কেন, বোধ হয় জগতে সকলের চেয়ে যে বেশী জানি, কেনই বা সে প্রাণ দিল, আর কেনই বা তা সত্ত্বেও তার মাথায় দেশবাসী যে কলঙ্কের পশরা তুলে দিয়েছিল, তা এক-তিলও হাল্কা হ'ল না।" "তাহলে অনুগ্রহ করে সে কাহিনী আমাদিগকে বলুন," পাঁচ-সাতটি উৎসুক কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হল। বৃদ্ধ বলে চল্‌লেন—"আমি কে আর কি করেই বা এ সব খবর জানলাম, তা অবান্তর, সুতরাং বলব না। শিলার পল্লীর এক অখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। তার পিতা এক জার্ম্মান মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন বলে পল্লীবাসীর সহানুভূতি তিনি হারিয়েছিলেন। তাতে অবিশ্যি তাঁর কিছু এসে যেত না, কেননা সারাটি দিন তিনি যতক্ষণ জেগে থাকতেন, পানপাত্র থেকে দূরে থেকে তার একটি মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করতেন না। কোথায় যে তিনি এত টাকা পেতেন, তা অবিশ্যি ঠিক করে বলা যায় না, তবে তাঁর শত্রুপক্ষ দুর্নাম দিত যে গুপ্ত সংবাদ সরবরাহ করে তাঁর এই সমস্ত অর্থ আস্‌ত। তা সেটা সত্যি কি মিথ্যা জানি না, তবে বুড়ো স্কেট যে দালালী করে মাঝে মাঝে যথেষ্ট উপার্জ্জন করত, তাতে সন্দেহ ছিল না। শিলারের বয়স যখন দশ কিম্বা এগার, তখন হঠাৎ সে ... হয়ে গেল

মহাকালের সুপ্ত আদিম পাশব-বৃত্তি যেন প্রলয়ের সংহার-মূর্ত্তি ধরে জেগে উঠ্‌ল মানুষের মনে, আর এক নিমিষেই তার নির্ম্মম মুষ্টির চাপে করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলি শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে প্রাণ হারাল। মানুষ যে মানুষ—একথা যে সেদিনের দৃশ্য চোখে দেখেছে সে আর কিছুতেই বলবে না। সত্য, ন্যায়, ধর্ম্ম, নীতি, এ সবই যেন তার ছদ্মবেশ; যে কোন মুহূর্ত্তেই সে তা ত্যাগ করে, নিজের স্বাভাবিক দানব-রূপ পরিগ্রহ করে তার সংহার-লালসা তৃপ্ত করে। যুগে যুগে কত মহাত্মাই তাকে পান করাতে চেয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের ধারা—কিন্তু সে পশু, কিছুতেই ভুলতে পারেনি রক্তের লবণাক্ত স্বাদ। তাই সে সর্ব্বাগ্রে তাঁদেরই বক্ষ বিদীর্ণ করে ঈষদুষ্ণ শোণিতে নিজেকে তৃপ্ত করে, আর যুগ যুগ ধরে তাঁদের প্রচেষ্টাকে উপহাস করতে হিংস্র উল্লাসে অট্টহাসি হাসে।" বলতে বলতে বৃদ্ধের কণ্ঠ মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ তার পর আবার তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "বুড়ো স্কেটের উপর যে সন্দেহের মেঘ ঘনিয়ে আসছিল, তা সে বুঝতে পারবার আগেই তার মাথায় ভেঙ্গে পড়ল আকাশ সমগ্র শক্তি নিয়ে বজ্রের আকারে। বিশ্বাসঘাতক সন্দেহে দেশবাসী তাকে ধরে লট্‌কে দিল তারই ঘরের সামনে এক গাছের উপর, আর সেইদিন রাত্রেই তার স্ত্রী ঘরে মূল্যবান যা কিছু ছিল, যদিও তা অল্পই—তা নিয়ে প্রয়াণ করলে তার জন্মভূমি জার্ম্মানীর দিকে। হতভাগ্য ছেলেটার কি হবে, তা কেউ ভেবে দেখলে না। বছর দুয়েক অকথ্য দুর্দ্দশা ও দুঃখের মধ্য দিয়ে সকলের পদাঘাত ও লাঞ্ছনা সহ্য করে তার কেটে গেল। অধিকাংশ দিনই তাকে দেখতে পাওয়া যেত সরাইখানার সামনের আবর্জ্জনা স্তূপ থেকে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করছে পরম তৃপ্তির সহিত। কিন্তু এত দুঃখেও কেউ কোনও দিন তার মুখ মলিন দেখেনি। যখনই তার কথা ভাবতে যাই, তখনই মনে পড়ে একটি শতচ্ছিন্ন বিবর্ণ স্কারলেট রঙের পোষাক-পরা একটি বালক। অযত্নে ও অনাহারে তার বর্ণ হয়ে গেছে মলিন। যদৃচ্ছ-সংবৃদ্ধ রুক্ষ অলক তার নিষ্পাপ সুন্দর কপালটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তার সদা-প্রফুল্ল অমল মুখখানিতে দুঃখ একটি আঁচড়ও কাটতে পারেনি। তার নির্ম্মল, ডাগর গভীর নীল চোখের দৃষ্টিতে কি যাদু ছিল, তা জানি না, কিন্তু সে চোখ তুলে চাইলে অতিবড় নির্দ্দয়েরও উদ্যত হস্ত থেমে যেত, সে আর তাকে আঘাত করতে পারত না। তাই কেউ তাকে দেখতে না পারলেও দেশ ছেড়ে তাকে যেতে হয়নি—সে মায়াবী কাউকে কিছু খেতে চাইলে অমন দুর্ম্মূল্যের দিনেও তার পক্ষে ওকে প্রত্যাখ্যান করা সহজ হ'ত না। সমবয়সীরা জার্মান বলে কেউ তার সঙ্গে খেলতে চাইত না—সেইজন্য প্রায়ই তাকে দেখা যেত পাহাড়ের ধারে নির্জ্জন নদীতীরে হয়ত কোনও গাছের তলায় নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে—দেখলে মনে হ'ত বুঝি বা কোন্ অচীন দেশের রাজ্যহারা রাজপুত্র—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখছে পাতালপুরীর রাজকন্যা তাঁর রক্ত-কমলের তীরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে গাইছে, "জয় জয় জয় জয়, জন্মভূমির জয়—জয় জয় জয় জয়।" কিসের উৎসাহে জ্বলে উঠত তার চোখ, মুখে জেগে উঠ্‌ত একটা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার ভাব—আর তার কোমল শরীর নিমিষেই ইস্পাতের মত এমন কঠোর হয়ে উঠ্‌ত যে, দেখলে মনে হ'ত যেন একখানি ধারাল তরবারি! এ গান কিন্তু সে জন-সমাজে গাইতে পারত না, কারণ যেই শুনত, সেই তাকে ভীষণ প্রহার দিত—তার জন্মভূমিকে জার্ম্মানী মনে করবার ভুল ধারণা নিয়ে।

"তাদের গ্রামে এক পঞ্চাশ বছরের বিপত্নীক বুড়ো ছিল। দুটি ছেলে ছাড়া তার আর কেউ ছিল না—কিন্তু"—খানিক চুপ করে নিজেকে যেন সামলে নিয়ে বৃদ্ধ বলে চল্‌লেন "রক্তলোলুপ রণ-রাক্ষসী প্রথমেই তাদের দুটিকে বলিরূপে গ্রহণ করেছিল। বৃদ্ধও নিজেকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দেহটা পঞ্চাশ বছরের পুরানো—এই অজুহাতে সে রাক্ষসী ঘৃণার সহিত তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে।" বৃদ্ধ আবার খানিক চুপ করে গেলেন—তারপর বলে চল্‌লেন, "কিছুদিন থেকে বুড়োটি শিলারকে লক্ষ্য করছিলেন—তিনি ভাবছিলেন, তাকে তাঁর সুদুঃসহ নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী করা যায় কিনা। আবার মনে হচ্ছিল দুধ দিয়ে হয়ত কালসাপ পোষাই না হয়ে যায়! মনের এমনি ইতস্তত ভাবের সময় একদিন দেখলেন, নদীর ধারে শিলার চুপটি করে বসে কি যেন ভাবছে—মুখে তার দুশ্চিন্তার মেঘ—কপালে কয়েকটা নব-জাগ্রত রেখা। বুড়ো পাশটিতে বসে তার পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কি বাচ্চা চারণ! আজ তোমার গান বন্ধ কেন?" একটু পরে হঠাৎ তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বালক ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা বুড়ো বাবা! আমি কি এখনও যথেষ্ট বড় হইনি?" কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য এনে বুড়ো বললেন, "নিশ্চয়, তাতে কি কোনও সন্দেহ আছে?" অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে তখন সে বললে, "তবে কেন ওরা আমায় তাড়িয়ে দিল—সৈন্য দলে নিলে না, ছোট্ট বলে ঘৃণা করলে? আর বড় হয়ে কি হবে—আমি এখনই কিছুতেই ভয় পাই না।" বৃদ্ধ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি সৈন্যদলে নাম লেখাতে গিছলে নাকি?" "হাঁ—কিন্তু কেউ যে আমায় নিতে চাইলে না", বলেই বালক দুহাতে মুখ ঢেকে আকুল হয়ে কেঁদে ফেল্‌ল। বুড়ো তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে প্রবোধ দিয়ে বললেন—"এত ছোট বয়সে সৈন্য হয়ে তুমি কি করতে, ও খেয়াল আবার হ'ল কেন?" "মরতেও ত পারতাম; আমার দেশের এত বড় দুর্দ্দিন, আমি কেমন করে এত বড় ছেলে হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি? এ লজ্জা নিয়ে আমি কেমন করে বেঁচে থাকব? আর তা' ছাড়া বেঁচে থেকে আমার কি লাভ?" শেষের দিকে আবার তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

কোন রকমে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে বুড়ো তাকে সেদিন থেকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। তাঁরই কাছে থেকে সে লেখাপড়া শিখতে লাগল—কিন্তু তার পিতার দুরপনেয় কলঙ্ক আর বৃদ্ধের দুঃসহনীয় শোকের কাহিনী তার ছোট্ট বুকটিতে আগুনের অক্ষরে লেখা হয়ে রইল। সে প্রতিজ্ঞা করলে, জীবন

জোলুপতায় বৃদ্ধের শেষ বয়সের সম্বল, তার চোখের মণি দুটি ছেলেকে প্রাণ বলি দিতে হয়েছে তাদের ওপর সে প্রতিশোধ নেবেই।

"পরীক্ষায় পাশ করার পর কত জায়গাই না সে চাকরীর চেষ্টা করলে, কিন্তু তার জন্মের দুর্নিবার কলঙ্ক তাকে মুহূর্তের জন্যও ছেড়ে গেল না। যেখানেই যায় সেখানেই দূর দূর করে তাকে তাড়িয়ে দেয় তার ধমনীতে জার্ম্মান রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এই অজুহাতে। দেশে তার বন্ধু বান্ধব বলতে কেউ ছিল না—সবাই তাকে ঘৃণা করত—এমন কি পথ দিয়ে গেলেও ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার করত "ঐ হীন জার্ম্মানটা যাচ্ছে।" জীবন যখন তার পক্ষে প্রায় দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠেছে তখন সে হঠাৎ অষ্ট্রিয়ায় একটা চাকরী পেয়ে সেখানেই চলে গেল। সেখানে কিছুদিন কাজ করবার পর তার কর্ম্মকুশলতা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অক্লান্ত পরিশ্রম প্রভৃতি দেখে অষ্ট্রিয়ান গবর্ণমেণ্ট তাকে পররাষ্ট্র বিভাগের একটা উচ্চ পদে নিযুক্ত করলেন।

"কর্ম্মব্যস্ত দিনগুলির মধ্যে ছুটি পেলেই সে চলে আসত এখানে তার পালক পিতার নিকট, নানা সুখ দুঃখের কথায় হাসি কান্নার মধ্য দিয়ে স্বপ্নের মত তাদের দিনগুলি কেটে যেত। শিলারের অনুপস্থিতিতে প্রতিবেশী হেগ্‌লের কন্যা জোসেফিনা বৃদ্ধের তত্ত্বাবধান করত। সে ছিল যাকে বলে নিখুঁত সুন্দরী। সেই তন্বীর সোনালী কোঁকড়ান চুলের রাশি, গভীর আয়ত চোখ—অপরূপ মুখশ্রী আর অনবদ্য দেহলতা শীঘ্রই শিলারের কিশোর মনটি চুরি করে নিল। সে একটু ঘন ঘন বাড়ী আসতে আরম্ভ করল আর নানা ছল ছুতায় জোসেফিনার সঙ্গে কথাবার্ত্তার মাত্রা একটু বাড়িয়ে ফেলল। দীর্ঘ বিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ তার মুখে একটা চিরস্থায়ী বিষাদের ছায়াপাত করেছিল—ছেলে বেলায় যে সমস্ত লাঞ্ছনা ও অপমান সে হেসেই কাটিয়ে দিত, সাবালক অবস্থায় সে সমস্ত তাকে রীতিমতই পীড়া দিত। নিজের জন্মকে সে মনে করত চরম অভিশাপ স্বরূপ এবং এরপর তাকে খুব কম লোকেই হাসতে দেখতে পেত। ঠাট্টা করে লোকে তাকে বলত "ছোক্‌রা দার্শনিক।" কিন্তু যতক্ষণ জোসেফিনার কাছে থাকত কোথায় চলে যেত তার সেই অটুট গাম্ভীর্য্য। সমস্ত শরীর তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠত প্রেমের অপরূপ জ্যোতিতে—মুখে জেগে উঠত বহুকালের নিঃশেষিত সুনির্ম্মল হাসি। বৃদ্ধ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, কারণ তিনি জানতেন কী ভীষণ হেগ্‌ল পরিবারের জাত্যাভিমান। তাঁর সন্দেহ হ'ল জোসেফিনার বাবা এ বিবাহে কিছুতেই সম্মতি দেবেন না। তবে মেয়েটির ভাবগতিক দেখে তাঁর মনে হল যে সে হয়ত তাঁর ছেলেকে—হাঁ, তাঁর ছেলেই ত—ভালবাসে। সে নিশ্চয়ই তার মনে কোনও আঘাত দিতে পারবে না। সেদিন বোধ হয় শিলারের অদৃষ্ট দেবতা আড়ালে একটু মুচকি হেসেছিলেন।" এই পর্য্যন্ত বলেই বক্তা কোণের দিকে যে টেবিলে এক সুবেশা তরুণী একজন বৃদ্ধার সঙ্গে বসে তাঁর গল্প শুনছিল সেইদিকে তাঁর দৃষ্টি...

উঠল, সে তার চোখ নামিয়ে নিলে কিন্তু উঠে গেল না। বৃদ্ধ আবার বলতে সুরু করলেন—"হাঁ, সে বুড়োর কিন্তু সত্যিই ভুল হয়েছিল। বুড়ো মানুষ, বুঝতেই পারেনি যে আজকালকার মেয়েরা কি রকম লঘুচিত্ত আর আত্মাভিমানী। দুনিয়াটাকে তারা যে শুধু সামাজিক সম্মান আর অর্থের মাপকাঠিতেই বিচার করে থাকে, তা তার বোধগম্য হয়নি—মানুষের হৃদয় বলে কোনও বস্তুরই যে কিছুমাত্র মর্য্যাদাও তারা দেয় না বা দিতে চায় না—এ সত্য তখনও তিনি জানতে পারেন নি। তবে এখন? এখন হয়ত তাঁর সে ভুল ভেঙ্গেছে কিন্তু তার জন্যে যে দাম তাঁকে দিতে হয়েছে তা মনে হলেও......" বলতে বলতে বৃদ্ধ আবার যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললেন।

"কি বলছিলাম? ওঃ! কিছুদিন পরেই একদিন সন্ধ্যে বেলা হেগ্‌লের ওখানে কি একটা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে সে মাঝ রাত্রে ফিরে এল ঠিক যেন বদ্ধ মাতালের মত; টলতে টলতে কোন রকমে নিজের ঘরে ঢুকেই খিল লাগিয়ে দিল—হাজার ডাকাডাকিতেও আর খুললে না। ভোর বেলায় বুড়ো শুনতে পেলেন শিলার সুমিষ্ট গলায় তার ছেলেবেলাকার গানটি মৃদুস্বরে গাইছে "জয় জয় জয় জয়, জনম ভূমির জয়, জয় জয় জয় জয়।"—সকালে চায়ের টেবিলে তার মুখ দেখেই বৃদ্ধ বুঝলেন যে সারারাত্রি সে ঘুমোয় নি। কিছু বলবার আগেই সে বললে "বুড়ো বাবা! আজকেই আমি চলে যাব।" বুড়ো অবাক হয়ে বললেন, "কেন, ছুটি ত আর দিন কয়েক আছে বলেই মনে হচ্ছে।" "তা আছে বটে কিন্তু ভিয়েনাতে এমন জরুরী গোটা কয়েক কাজ আছে যে, আজ না গেলেই নয়।" শুনে বৃদ্ধ আর কিছু বললেন না; সেইদিনই তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে দুপুরের গাড়ীতে সে চলে গেল। বিকেল বেলা গ্রামের কাফেতে বৃদ্ধ যে অমানুষিকতা ও নির্য্যাতনের কথা শুনলেন তাতে তাঁর মনে হ'ল পৃথিবী বোধ হয় আর বেঁচে নেই—যা কিছু ঘটছে সমস্তই বুঝি মস্ত একটা দুঃস্বপ্ন। নইলে মানুষ যে, তার মনুষ্যত্ব থেকে এতখানি ভ্রষ্ট হতে পারে—জাত্যাভিমান যে তাকে এত ছোট করতে পারে তা তিনি কেমন করে বিশ্বাস করেন। তিনি শুনলেন শিলার নাকি ঐদিন সন্ধ্যায় নাচের বিশ্রাম সময়ে কোনও এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তার প্রেমের কথা জোসেফিনার কাছে স্বীকার করে ফেলে। মৃদু আলোকিত কুঞ্জে সে তার নাচের সঙ্গিনীকে শ্রম অপনোদনের জন্য নিয়ে গিছল; হঠাৎ কথায় কথায় বলে "কার মুখ দেখে আজ সকালে উঠে-ছিলাম, আজকের দিনটা আমার এমনভাবে কাটল যে আমার বুকে গাঁথা হয়ে থাকবে এর কথা চিরদিনের জন্য।" ঠাট্টার সুরে জোসেফিনা বলে "বোধ হয় আমার মুখ দেখেই কারণ খুব সকালেই ত' আপনাদের ওখানে গেছলাম।" শিলার বললে "না, তা নয়। তাহলে ত' বলতে পারতম—'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।'" সলজ্জ হাস্যে জোসেফিনা বলে "দূর অসভ্য! আমি কি আপনার

আমার বুকভরা প্রেম কি সবই ব্যর্থ হবে, সার্থক হয়ে উঠবে না তোমার প্রতিদানে?" রুমালটি আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে, প্রায় অস্ফুট স্বরে সে বললে "বাবাকে বল।" ব্যগ্র হয়ে সে জিজ্ঞেস করে "তোমার ত' অমত নেই, লক্ষ্মীটি বল, তাঁকে আমি অন্ততঃ এ কথাটা ত বলতে পারি?" উঠতে উঠতে জোসেফিনা বললে 'না অমত নেই। কিন্তু চল, আর দেরী নয় লোকে যা-তা মনে করতে পারে।"

এর পরই ভাগ্যদেবী তার সঙ্গে আর একটি নিদারুণ ও নিষ্ঠুর পরিহাস করলেন। ভ্রান্ত যুবক যখন নিজেকে মনে করছে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখী তখনই এক নির্ম্মম হস্তের আঘাত তার সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। তার বাবাকে বলতেই তিনি অত্যন্ত ঘৃণার সহিত তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যা বললেন তার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, যার ধমনীর অর্দ্ধেক শোণিত-স্রোত জার্ম্মান তার পক্ষে যে কোনও পবিত্র রুমানিয়ান তরুণীর পাণি প্রার্থনা শুধু দুরাশা নয়, ধৃষ্টতা। বিবর্ণ মুখে শিলার জোসেফিনাকে জিজ্ঞেস করে—সেও ঐ মত পোষণ করে কিনা সেই হৃদয়হীনা, চপলচিত্তা স্বদেশপ্রেমিকা তৎক্ষণাৎ তাকে জানিয়ে দেয় "নিশ্চয়, তাতে কি কোনও সন্দেহ আছে নাকি?" অধিকতর বিবর্ণমুখে শিলার আবার প্রশ্ন করলে যদি তার মা জার্ম্মান না হতেন তাহলেও কি রায় অপরিবর্তনীয় থাকত। অল্প খানিক চুপ করে থেকে সে তাকে জানায়—"না, তবে ভালবাসুক আর নাই বাসুক, স্বদেশদ্রোহীর বংশে সে বিয়ে করতে পারবে না—কোনও মতেই না।" তারপর—তারপর যা ঘটল সে কথা ভাবলেও আমার মানুষ মাত্রের ওপরেই ঘৃণা জন্মে যায়—নিজের মনুষ্য জন্মের ওপর আসে একটা দারুণ বিতৃষ্ণা। সরাইওলার দেশপ্রেমিক পুত্র—যে এই সমস্ত কথা তার কাফেতে বসে সগর্ব্বে বলছিল—সেও ছিল জোসেফিনার অন্যতম পাণিপ্রার্থী—জনকয়েক বন্ধু বান্ধব নিয়ে প্রহারে জর্জ্জরিত করে তাকে রাস্তায় টেনে ফেলে দিয়ে গেল, আর যাবার সময় তার মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করে বলে গেল, "জার্ম্মান কুক্কুরীর বাচ্চা এই মুখে পবিত্রা রুমানিয়ান তরুণীকে প্রেম নিবেদন করেছিলি?" উত্তেজনায় বৃদ্ধের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল, বোধ হয় সে একবার যে কোণটিতে তরুণী বসেছিল সে দিকে তাকাল। তরুণীর মুখ আবার পলকের তরে গাঢ় রক্তবর্ণ হয়ে পরক্ষণেই ভীষণ বিবর্ণ হয়ে গেল। বৃদ্ধ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন "এই ঘটনার কিছুদিন পরেই অষ্ট্রিয়া জার্ম্মান রাইখের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। শিলার মাতার রক্তের খাতিরে জার্ম্মান পররাষ্ট্র বিভাগে একটা চাকরী পেয়ে বার্লিন চলে গেল।" বৃদ্ধ আবার খানিক চুপ করে বলতে সুরু করলেন, "এইবার সকলেই তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে দৃঢ় বিশ্বাস করলে —তার পালক পিতাও তাকে ভুল বুঝলেন; তিনি ভাবলেন হয়ত তার জন্মের ঋণ এতদিন পরে তার দেহের ওপর শোধ নিতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তিনি ভুল করলেও এর জন্য তাকে দোষী করলেন না—দায়ী করলেন নিজেদের সমাজকে, তার মর্ম্মান্তিক হৃদয়হীন অত্যাচারকে—যার নিষ্পেষণে আজ

"তারপর ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে আবার হল ঘোর ঘনঘটার সমাবেশ—নাটকীয় পরিণতির মত অস্বাভাবিক দ্রুততার সহিত একটির পর একটি স্বাধীন রাজ্য মিশে গেল অতীতের অন্ধকারে। প্রবল অত্যাচারীর দুর্ব্বার রথচক্রের নিরঙ্কুশগতি নির্ম্মমভাবে চূর্ণ করে দিল কত জাতির উত্থান পতনের, আশা আকাঙ্ক্ষার, সুখ দুঃখের ইতিহাস। সমস্ত মহাদেশ বিনা প্রতিবাদে নিরীক্ষণ করলে সবলের হৃদয়হীন উৎপীড়নে দুর্ব্বলের মৃত্যু আর কানে শুনলে তার মরণ যন্ত্রণাকাতর অস্ফুট আর্ত্তনাদ। একটি অঙ্গুলিও উত্তোলিত হল না সে অত্যাচারের প্রতিবাদে। সশস্ত্র দুর্ম্মদের শক্তিমদমত্ত তীব্র ভ্রূকুটিতে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা প্রভৃতি তলিয়ে গেল অতলান্ত মহাসাগরের অতল তলে আর দিকে দিকে ঘোষিত হ'ল পশুবলের বিজয় গাথা।

"রুমানিয়ার ভাগ্যাকাশেও অলক্ষ্যে যে মেঘের সঞ্চার হচ্ছিল তার কোনও সন্ধানই সে পায়নি। পররাজ্যলোলুপ রাইখের সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টি যখন দিগন্ত হতে দিগন্ত পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়ে এক এক করে প্রায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি আত্মসাৎ করলে তখনও সে একান্ত নির্ভরশীল শিশুর মত মিত্র-শক্তির বাহুবলে স্থির বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত ছিল। তার কণ্ঠে সামান্য সতর্কতার বাণীও বিঘোষিত হয় নি, অতিরিক্ত একটি সৈন্যও সে সংগ্রহ করেনি, আধুনিক অস্ত্রসম্ভারের কিছুমাত্র আয়োজনও তার ছিল না। তারপর কেমন করে চেকোশ্লোভাকিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তারও মস্তকে উদ্যত হ'ল অত্যাচারীর সঙ্কোচহীন অশনি, আর কেমন অভাবনীয় রূপে সে রক্ষা পেল নিশ্চিত বিলুপ্তির চিরান্ধকারময় গহ্বর হতে সে কথা আজ সবাই জানে। কিন্তু কে জানে এর মূলে ছিল কতখানি আত্মবিসর্জ্জন, এর জন্য প্রয়োজন হয়েছিল কতখানি অবিচলিত সাহস আর অসাধারণ ক্ষিপ্রকারিতার। হায়রে, এমনি অদৃষ্টের পরিহাস যে যাদের জন্য সে অসঙ্কোচে নিজেকে বলি দিল তাদের চোখে সে যেমনি ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য তেমনি রয়ে গেল—ভাগ্যদেবতার দান কলঙ্কের অদেখা মসী-রেখা বিলুপ্ত করে দিল তার আত্মত্যাগের অম্লান যশ।" ভাবাতিশয্যে বৃদ্ধের কণ্ঠ আবার নীরব হয়ে গেল।

"তার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরেই রুমানিয়ার পররাষ্ট্র সচিবের দপ্তরে তার পালক পিতার ডাক পড়ে। সেখানে সে স্বয়ং কর্ত্তার মুখে শোনে সেই অপূর্ব্ব আত্মবিসর্জ্জনের কাহিনী যার সাহায্যে মরণশীল মানব যুগে যুগে মৃত্যুকে জয় করে মৃত্যুঞ্জয় হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার পতনের পরেই সে জানতে পারে তার নিরস্ত্র, নিশ্চিন্ত জন্মভূমিকে অতর্কিতে গ্রাস করবার কি ভীষণ কৌশলজাল বিস্তৃত হয়েছে। পাঁচ নম্বর সেনাদল যখন রুমানিয়ার ভেতর দিয়ে জুগোশ্লাভের দিকে যাত্রা করবে তখনই রাইখের পররাষ্ট্র বিভাগ তার স্বদেশের মন্ত্রিমণ্ডলীকে দেবে এক অচিন্তনীয় চরমপত্র এবং তাদের হতবুদ্ধি ভাবের সুযোগে নির্ব্বিঘ্নে গ্রাস করবে সমগ্র দেশটা। স্বাধীন রুমানিয়া তার পরদিনই হবে অতীতের ইতিহাস-সম্পদ। এ যুক্তিতে কোনও ভুল নাই, ভ্রান্তি নাই—

কৃষি ও বিজ্ঞান

শ্রীকানাইলাল মণ্ডল এম-এস-সি

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে উদ্ভিদেরও মানুষের ন্যায় খাদ্যের আবশ্যকতা আছে এই তত্ত্ব যখন আবিষ্কৃত হয় প্রায় সেই সময় হইতেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষিকার্য্যের সূত্রপাত হয়। ঐ খাদ্যের উপাদান এবং যে উপায়ে উহা উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত হয়, সে বিষয়ে কোন ধারণা অবশ্য প্রথমে গঠন করা যায় নাই। পর্য্যবেক্ষণে পূর্ব্বে জানা গিয়াছিল, যে জমিতে এক শস্য কয়েক বৎসর ফলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এক বৎসর ঐ জমি চাষ না করিয়া পতিত রাখিলে অথবা উহাতে বিভিন্ন প্রকার শস্য পর্য্যায়ক্রমে উৎপাদন করিলে উহার ফল-প্রসবের শক্তি ফিরিয়া আসে। অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও অবগত হওয়া গিয়াছিল, ফসল ফলাইয়া যে জমি ক্রমশ অনুর্ব্বর হইয়াছে, সার ব্যবহার করিলে তাহা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সারের ব্যবহারে উর্ব্বর ভূমিও বর্দ্ধিত হারে ফল প্রসব করে। বিজ্ঞান বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি সেরূপ কোন জ্ঞানের সহিত ঐ সকলের সম্বন্ধ ছিল না। জেনেভা বিদ্যালয়ে কয়েকজন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি-বিদ্যা চর্চ্চা প্রথম আরম্ভ করেন। স্যার হাম্‌ফ্রি ডেভীও প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি "কৃষির সহিত উদ্ভিদবিজ্ঞানের সম্বন্ধ" লইয়া বক্তৃতা দিতে থাকেন। ইহার পর ভূমির উপর কৃষিকার্য্যের কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরম্ভ হয়। বোসিনগো ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আল্‌সেসের ক্ষেত্রে একইরূপ পরীক্ষায় নিযুক্ত হন। তিনি সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, উদ্ভিদ বায়ু হইতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে, ভূমি হইতে নহে। বিখ্যাত জার্ম্মান রাসায়নিক লিবিগ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানের উন্নতির উদ্দেশ্যে স্থাপিত বৃটিশ এসোসিয়েশনের নিকট এক রিপোর্ট প্রেরণ করিয়া ঐ আবিষ্কারের উপর জোর দেন। লিবিগ পূর্ব্ববর্ত্তী সকল পরীক্ষার ফল আলোচনা করিয়া উদ্ভিদের পুষ্টি ও শস্যোৎপাদন সম্বন্ধে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। জন লয়িস ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে হার্টফোর্ডসায়ারের অন্তর্গত রথামষ্টেডে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়া কৃষির উন্নতি করিবার জন্য যে পরীক্ষাগার স্থাপন করেন তাহাই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কৃষি-গবেষণাগার। গিলবার্ট রথাম-ষ্টেডের শস্যক্ষেত্রের মধ্যে রসায়নাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। লয়িস ও গিলবার্ট পরীক্ষা করিয়া অল্পদিনে কৃত্রিম সার আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন। লিবিগও কৃত্রিম সারের ব্যবহারে উৎসাহী হন। বৃটেনের শস্যক্ষেত্রে ঐ সার এরূপ সুফল প্রসব করে যে, পৃথিবীর অনেক দেশে কৃষির উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরম্ভ হয়। গ্রেট বৃটেনের ন্যায় ভাল ফল সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ঐ সকল পরীক্ষা হইতে কৃষি-গবেষণার যে পথ উন্মুক্ত হয় তাহা শেষ পর্য্যন্ত বহুদূর প্রসারিত হইয়া পড়ে। আমেরিকায় সম্বন্ধীয় গবেষণা দ্রুত চলিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে ভূমির উপর বীজাইর ক্রিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উদ্ভিদের উৎপাদন, গাছের বৃদ্ধির উপর তাপ আলোকাদির প্রভাব, প্রয়োজনমত শস্যাদি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, বিনা মৃত্তিকায় আবাদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে গবেষণা পৃথিবীর বহুদেশে সূত্রপাত হইয়াছে। গবেষণাগারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই হল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে কৃষিকার্য্যে বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বিত হয়। যুদ্ধের পর দুই একটি রাজ্য ব্যতীত আমেরিকা ও ইউরোপের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র কর্ত্তৃক কৃষি-গবেষণা পরিচালিত হইতে থাকে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কৃত্রিম সারের প্রয়োগ উপযুক্ত অবস্থার মধ্যে কৃষিকার্য্য পরি-চালনা দ্বারা ঐ সকল দেশে কেবল ক্ষেত্রের ফসল বাড়িয়া যাইতেছে এমন নহে, কম পরিশ্রমে বিস্তৃততর ক্ষেত্রেও চাষের কাজ চলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে গাছের খাদ্য সম্পর্কে বর্ত্তমানে বহু কথা জানা গিয়াছে। উদ্ভিদের দেহকে একটি ক্ষুদ্র রসায়নাগার বলা চলে। বায়ু ও ভূমি হইতে গাছ যে সকল সরল প্রকৃতির দ্রব্য সংগ্রহ করে, অতি আশ্চর্য্য রকমের ক্রিয়ায় সেইগুলি উহার দেহের ভিতরদেশে চিনি, সুগন্ধি, ঔষধ, বিষ, রঞ্জক প্রভৃতি জটিল পদার্থসমূহে পরিণত হয়। ক্ষুদ্র উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ বৃক্ষ পর্য্যন্ত সকলেই সুনির্দ্দিষ্ট উপায়ে আপন আপন দেহের বিশিষ্ট উপাদান প্রস্তুত করিয়া থাকে। তবে গাছের শিকড় খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে এইরূপ দ্রব্য না হইলে ভূমি প্রাথমিক উপাদানে যতই সমৃদ্ধ হউক তাহা উদ্ভিদ দেহের পুষ্টিসাধন করিবে না। উদ্ভিদ-খাদ্যও রুচিকর এবং সুপাচ্য হওয়া আবশ্যক। গাছের বৃদ্ধির জন্য যে যে দ্রব্যের যে পরিমাণ প্রয়োজন রাসায়নিক বিশ্লেষণে তাহা স্থির করা যায়। জমিতে সার প্রয়োগের উদ্দেশ্যই উহার পূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হইবার পক্ষে যে অভাব তাহা পূরণ করা। পটাস ও ফস্‌ফরাস ঘটিত দ্রব্যের আবশ্যকতা এবং উহারা যে ফল প্রসব করিতে পারে তাহার বিষয় লিবিগের সময়ে অনুমান করা গিয়াছিল। কিন্তু নাইট্রোজেন সংযুক্ত দ্রব্য কিভাবে কার্য্য করে, দীর্ঘকাল তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করা যায় নাই। উহার ক্রিয়া লইয়া অনেক বিতর্কও চলিয়াছিল। নানা পরীক্ষায় শেষ পর্য্যন্ত ঐ সমস্যার সমাধান হইয়াছে।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রথামষ্টেডের ক্ষেত্রে পোটাসিয়াম, সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম সল্ট এই তিনটির মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, উদ্ভিদজীবনে পোটাসিয়ামের মূল্য বেশী। কৃষকেরা অবশ্য বহু বৎসর উহার ব্যবহার করে নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে স্যাকসনির ষ্টাস্‌ফোর্টে পোটাসিয়াম সল্টের বৃহৎ ডিপো সারের জন্য প্রথম ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ইংলণ্ডে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে উহার ব্যবহার হয় নাই। ঐ শিল্পের [illegible]

পোটাসিয়াম সারের অনুসন্ধান চলিতে থাকে। ষ্টাস্‌ফোর্টের খনি বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর পটাস সিণ্ডিকেটের অধীনে আছে। উদ্ভিদের উপর পোটাসিয়ামের চারটি পৃথক ক্রিয়া দেখা যায়ঃ— (১) উদ্ভিদের তেজ বৃদ্ধি ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি, (২) কার্ব্বোহাইড্রেট সিন্থিসিস ও দেহমধ্যে উহার পরিচালন বিষয়ে পাতার শক্তিবৃদ্ধি, (৩) শস্যদানা গঠন, (৪) কলাই জাতীয় গাছে কয়েকটি বিশেষ ক্রিয়া। পোটাসিয়ামের রৌদ্রের অভাব পূরণ করিবার আশ্চর্য্যরকম শক্তি আছে। সূর্য্যকিরণের অভাবে উদ্ভিদের যে পুষ্টিহীনতা হয় পোটাসিয়াম তাহা অদ্ভুত উপায়ে শোধরাইয়া লয়। রথামষ্টেডে যে সময়ে সূর্য্যের কিরণের অভাব ঘটিয়াছে সেই সময়ে পোটাসিয়াম ব্যবহার করিয়া ক্ষতি কমান গিয়াছে। রোগাক্রমণের হাত হইতে রক্ষা

ইংলণ্ডের রথাম্‌ষ্টেড ষ্টেশনের গম উৎপাদন পরীক্ষার ফল

করিবার কাজে উহার উপযোগিতা কম নহে। কেবলমাত্র নাইট্রোজেন ব্যবহার করিয়া এবং পোটাসিয়াম বাদ দিয়া যে ক্ষেত্রে রোগের আক্রমণ হইয়াছে—দুইটি একসঙ্গে ব্যবহার করায় সেরূপ স্থলে উদ্ভিদ অনেকদূর রোগমুক্ত হইয়াছে। আলু, বীট, শালগম প্রভৃতি যাহাদের বিশেষ মূল্য কার্ব্বোহাইড্রেট প্রস্তুত করার উপর নির্ভর করিতেছে পোটাসিয়ামের সাহায্যে তাহাদের পাতা বায়ুর কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করিয়া উহা হইতে সহজে চিনি শ্রেণীর দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। উদ্ভিদবিশেষের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করিয়া যে পরিমাণ চিনি পাওয়া যায়, উহার সহিত পোটাসিয়াম ব্যবহার করিলে, তাহা অপেক্ষা বেশী চিনি উৎপন্ন হয়। ফসলের কথা ছাড়িয়া দিয়া পাতার কথা ধরিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতকগুলি গাছের পাতা বিশেষভাবে ঋতুর শেষদিকে গাঢ় বর্ণের হয়, গুটাইয়া যায় এবং চারিদিকে ছড়াইয়া না পড়িয়া এক সঙ্গে জোট বাঁধে।

ফস্‌ফেট প্রথম অবস্থায় উদ্ভিদের শিকড়বৃদ্ধি এবং শেষের দিকে দ্রুত ফলপ্রসবে সহায়তা করে। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য—সুপার ফস্‌ফেটই প্রথম কৃত্রিম সাররূপে প্রযুক্ত হয়। ১৮৪২ সালে রক্ ফস্‌ফেটের উপর সালফিউরিক এসিডের ক্রিয়ায় উহা প্রস্তুত করা হয়। বৃটেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ উত্তর আফ্রিকার খনিজ ফস্‌ফেট এইজন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্য হইতেও উহার প্রচুর আমদানী হয়। আলু ও শালগমের ক্ষেত্রেই গ্রেট বৃটেন প্রধানত সুপার ফস্‌ফেট প্রয়োগ করে। গম প্রভৃতি শস্য উৎপাদনের জন্যও উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শালগম প্রভৃতি ফসল ফস্‌ফেটের অভাবে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একবারে না-ও জন্মাইতে পারে। বৃটেনের কৃষিকার্য্যে ঐ সকল ফসল বিশেষভাবে মূল্যবান। সেই নিমিত্তই উপরোক্ত কৃত্রিম সার প্রবর্ত্তিত হয় এবং ৮০ বৎসর পূর্ব্বে উহা বৃটিশ কৃষিজগতে বিপ্লব ঘটায়। উদ্ভিদের ফস্‌ফেট খাদ্যের অভাব ঘটিলে জীবজন্তুর পুষ্টি-সাধনের দিক হইতে, উৎপন্ন ফসলের মূল্য কমিয়া যায়। মানুষের খাদ্য হিসাবেও উহার বিশিষ্ট মূল্য নষ্ট হয়। পৃথিবীর বহুসংখ্যক চাষের জমিতেই ফসফেটের অভাব। ভারতবর্ষের জমিতে উহার অভাব আছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার কতক জমির প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ ঐ কারণেই গবাদির রোগ আনয়ন করে। অতিরিক্ত মাত্রায় ফসফেট ব্যবহার অবশ্য ক্ষতিকারক। কতক জমির অবস্থা বিশেষভাবে ফস্‌ফেটের দাবী করে। গত যুদ্ধের পর হইতে ব্যবহারিক রসায়নের যে প্রচুর উন্নতি ঘটিয়াছে তাহার ফলে সিন্থেটিক প্রণালীতে এমোনিয়াম ফস্‌ফেট নামক একটি নূতন সার উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। উহা জলে দ্রাব্য এবং সবিশেষ ফলপ্রসূ। ঐ সারে ফসফেটের ভাগ বেশী বলিয়া অর্থাৎ অল্প পরিমাণ সারে বেশী ফস্‌ফরাস থাকে এই জন্য উহার আমদানী-রপ্তানির সুবিধা হয়। ঐ সারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। প্রতিযোগিতায় হয়ত উহা একদিন সুপার ফস্‌ফেটকে দূরে সরাইয়া দিবে। তবে এমোনিয়াম ফস্‌ফেটে কেবল নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস আছে। সুপার ফসফেট সারে ক্যালসিয়াম ও সালফার এই দুইটি উপাদানও বর্ত্তমান। "বেসেমার স্ল্যাগ" এক সময় অনুর্ব্বর জমিতে ফসল ফলাইবার কাজে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। সুপার ফস্‌ফেট অপেক্ষাও ভাল ফল কখন কখন উহা হইতে পাওয়া যায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদেরা নাইট্রেট্ এবং সম্ভবত ক্যালসিয়াম নাইট্রেট হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ভূমিতে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাতে সোডিয়াম নাইট্রেট এবং পোটাসিয়াম নাইট্রেট উভয়েরই সমান ব্যবহার চলে। তাহা ছাড়া, জমির উপর এমোনিয়া দ্রুতভাবে নাইট্রেটে পরিণত হয়। সুতরাং সত্বর এমোনিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইতে ... এমোনিয়া সল্ট কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য হইতেও

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় এমোনিয়া সোজাসুজি উদ্ভিদ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় না। কতকগুলি আণুবীক্ষণিক জীব এতই ক্রিয়াশীল যে তাহারা উদ্ভিদে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই উহাকে নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে। নিম্নলিখিতগুলি নাইট্রোজেন সার। এমোনিয়াম সল্টঃ— সাধারণত এমোনিয়াম সালফেট ব্যবহৃত হয়। ফস্‌ফেটের প্রয়োগও ক্রমে বাড়িতেছে। কতকগুলি শস্যের ক্ষেত্রে ক্লোরাইডই মূল্যবান। যে সকল পদার্থ সহজে এমোনিয়ায় পরিবর্ত্তিত হয়ঃ—ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইউরিয়া ক্রমে ব্যবহারে আসিতেছে।

নাইট্রোজেনের অভাব ঘটিলে উদ্ভিদ খর্ব্বকায় হয় এবং উহার পাতা রোগাটে হরিদ্রা বর্ণের হইয়া থাকে। পটাসের অভাবঘটিত ক্রিয়া অন্যরূপ। তাহাতে অগ্রভাগ ও পার্শ্বদেশ হইতে পাতা মরিতে আরম্ভ করে। ভূমিতে নাইট্রোজেন পড়িবার পর উহার বর্ণ এবং বৃদ্ধি উভয় দিকের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়া থাকে। প্রচুর পরিমাণ নাইট্রেট পাইলে গাছের পাতা বৃহৎ এবং গাঢ় সবুজ বর্ণ হয়, কিন্তু উদ্ভিদের পরিপক্ক হইতে বিলম্ব ঘটে। ধান্যাদি শস্যে নাইট্রোজেনের প্রাচুর্য্য হইতে খড়
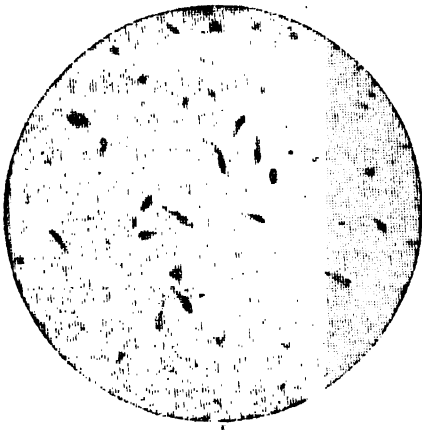
কলাই জাতীয় গাছের স্ফোটকে উৎপন্ন বীজাণুর মাইক্রোফটোগ্রাফ

উৎপাদনে আধিক্য ঘটে এবং উহা ভালভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে অসমর্থ হয়। আলু ও শালগমে মূলে অপেক্ষা পাতা বেশী হয়। বিলাতী বেগুনের ক্ষেত্রেও ঐরূপ ফল ফলে। পাতার বৃদ্ধি উদ্দেশ্য হইলে নাইট্রেটের ব্যবহার প্রশস্ত। যেমন, বাঁধা কপির ক্ষেত্রে বিবেচনা করিয়া নাইট্রেট্‌ প্রয়োগ করিতে পারিলে তাহা হইতে কোমলতা ও উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ আসে।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রধানত চিলীর খনি হইতে নাইট্রেট্‌ অব্‌ সোডা এবং কয়লা হইতে সালফেট্‌ অব এমোনিয়া পাওয়া যাইত। কৃত্রিম উপায়ে ঐ সময়ে অতি সামান্যই ক্ষেত্রের সার প্রস্তুত করা হইত। যুদ্ধের সময় মধ্য ইউরোপে এবং যুদ্ধের পর অন্যান্য দেশেও বায়ু হইতে নাইট্রেট ও এমোনিয়া প্রস্তুত করিবার বহু কারখানা স্থাপিত হয়। নরওয়ের জলশক্তির সাহায্যে ঐ দেশে আর্ক প্রণালীতে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট এবং জলশক্তি ও [illegible]

বিশেষ জনপ্রিয় হইতেছে। উহাতে যে এমোনিয়া প্রস্তুত হয় তাহা ক্লোরাইড, সালফেট, নাইট্রিক এসিড ও ইউরিয়ায় রূপান্তরিত করা যায়। ঐ সকল প্রচেষ্টা হইতে একদিকে যেমন এমোনিয়া ও ইউরিয়া এই দুইটি নূতন সার উৎপাদন করা সম্ভব হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি উৎপন্ন সারের পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯১২ সালে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেনের হিসাবে পৃথিবীর সারের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টন ছিল। ১৯২৬-২৭ সালে উহার পরিমাণ হয় ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টন। বর্ত্তমানে পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সোডিয়াম নাইট্রেট সারহিসাবে অতি দ্রুতভাবে কার্য্য করে অর্থাৎ জমিতে পড়িবামাত্র উদ্ভিদে উহা গ্রহণ করিতে পারে। দুই ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ হয়ঃ—(১) সংকটকালে—যে সময়ে চারা গাছ রোগ এবং শীতের আক্রমণে জর্জ্জরিত হয়, (২) সাধারণ অবস্থায়—অন্যান্য সার যেরূপ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। গ্রেট বৃটেনে সকল ক্ষেত্রেই উহা ফসল বাড়াইয়া থাকে। নাইট্রেট সার জমিতে বেশীদিন থাকে না। সুপার ফস্‌ফেট প্রভৃতি সামগ্রীতে এক ঋতুর বেশী কার্য্য চলে। কিন্তু নাইট্রেট সার সহজেই ধৌত হইয়া যায়। সেইজন্য যে পর্য্যন্ত না উহার আবশ্যক হয় সে অবধি ভূমিতে উহা প্রয়োগ করা অনুচিত। নাইট্রেট অব্‌ লাইম নরওয়ে ও জার্ম্মানী উভয় দেশে প্রস্তুত হয়। বৎসরে গড়ে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন উৎপন্ন হইলেও উহার সমস্তই প্রায় ইউরোপে ব্যবহৃত হয়, বাহিরে কিছুই চালান হয় না বলিলে চলে।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয়লা হইতেই সমস্ত এমোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত করা হইত। বর্ত্তমানে সিন্থেটিক প্রণালীতে প্রায় সমান পরিমাণ ঐ দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। পরে আরও বেশী পরিমাণে উহা উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। সিন্থেটিক দ্রব্যে পূর্ব্বে হানিকর এসিড থাকিত। এখন উহাকে এসিড-মুক্ত করা সম্ভব হইয়াছে। গ্রেট বৃটেনই প্রধানত উহা রপ্তানি করিয়া থাকে। গ্রেট বৃটেনের পরের স্থান আমেরিকার যুক্তরাজ্যের। স্পেন, জাপান, যব ও ফ্রান্সেই উহার বেশীর ভাগ আসিয়া থাকে। গ্রেট বৃটেন সমস্ত ফসল, বিশেষত আলু, ফ্রেঞ্চ বীট ও অন্যান্য ফসল, স্পেন লেবু এবং যব ইক্ষুর চাষে ঐ সারের ব্যবহার করে, কার্পাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেও উহা হইতে সুবিধা হইবে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। উৎপাদন বাড়িতে থাকার ঐ সারের মূল্য কমিতেছে। কাজেই উহার প্রচলনও ক্রমে বেশী হইতেছে। সালফেট অব এমোনিয়া জমিতে প্রয়োগ করিলে মাঝে মাঝে চূণ ব্যবহার করা প্রয়োজন। কারণ বেশীর ভাগ উদ্ভিদ এসিড সহ্য করিতে পারে না। ভূমিতে এসিড থাকিলে কোন গাছ একেবারেই জন্মে না। যে সকল স্থানে প্রবল বারিবর্ষণ হয় সেই সমুদয় স্থানের জমিতে এমোনিয়া ব্যবহার করার সুবিধা এই যে, উহা নাইট্রেট অব সোডার ন্যায় ধৌত হইয়া জমির বাহিরে চলিয়া যায় না।

ইউরিয়া বর্ত্তমানে সিন্থেটিক প্রণালীতে প্রস্তুত হইতেছে

অব এমোনিয়ার সওয়া দুই গুণ এবং নাইট্রেট অব সোডার তিন গুণ। জমিতে উহা অতি সহজে এমোনিয়াম কার্ব্বোনেটে পরিণত হয়। অক্সিজেন সংযোগে শেষোক্ত দ্রব্য পরে নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। সকল প্রকার ফসলের ক্ষেত্রেই উহা নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। এসিড উৎপাদন প্রভৃতি উৎপাত হইতেও ভূমি মুক্ত থাকে। অন্যান্য সারের জমির উপর যে সকল গৌণ ক্রিয়া আছে ইউরিয়ায় তাহার একান্ত অভাব দেখা যায়।

ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড—জলশক্তির সুবিধার জন্য সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ও ইটালীতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাপান এবং অন্যত্রও উহার কারখানা আছে। উহা হইতে সস্তায় ক্যালসিয়ামেরও যোগান হয়। খড় না বাড়াইয়া উহা শস্যদানার উৎপাদনে সাহায্য করে বলিয়া মনে হয়। রথামষ্টেডে এবং অন্যান্য স্থানে ক্যালসিয়াম সায়ানামাইডের ক্রিয়া লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে।

১৮৩০ হইতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত ভূমি উর্ব্বরা করিবার সমস্যা প্রধানত রসায়ন সংক্রান্ত বলিয়া ভাবা হইয়াছিল। তখন ধারণা করা হয় যে, প্রচুর পরিমাণ দ্রাব্য খনিজ পদার্থ জমিতে ছড়াইয়া দিলেই একই ক্ষেত্র হইতে বৎসর বৎসর ভাল ফল লাভ করা যাইবে। পরে জানা যায়, ভূমির উপর বীজাণু প্রভৃতির ক্রিয়াও তুচ্ছ নহে। তাহা হইতেই কৃষি-বিজ্ঞানে বীজাণুতত্ত্বের আবির্ভাব হয়। পাস্তুর দেখাইয়াছিলেন যে, ভূমির উপর অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র প্রাণী বাস করে উহাদের আকার এক মিলিমিটারের সহস্র ভাগের ভাগ অর্থাৎ এক ইঞ্চির ২৫ হাজার অংশের একাংশ। উপযুক্ত অবস্থায় তাহারা অতি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া থাকে। ৩৫ মিনিটের মধ্যে একটি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দুইটিতে পরিণত হয়। সুতরাং ১২ ঘণ্টার পরে একটি বীজাণু হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ বীজাণুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। এক ঘনইঞ্চি পরিমাণ জমিতে বহু কোটি বীজাণু বাস করিতে পারে। উহাদের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধনের শক্তি অসীম। ভূমির কতক পরিবর্ত্তন যত না রাসায়নিক তাহার বেশী বীজাণুঘটিত এই সন্দেহ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম জাগে। একথা জানা ছিল যে, নাইট্রেট হইতেই উদ্ভিদ সহজে নাইট্রেট গ্রহণ করিতে পারে এবং এমোনিয়াম নাইট্রেট অতি শীঘ্র নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং যখন দেখা গেল যে কৃত্রিম ভূমির উপর "নাইট্রীকরণ" ক্রিয়া সত্বর না ঘটিয়া বিশ দিন পরে আরম্ভ হয়, তখন অনুমান করা কঠিন হইল না—কোন রূপের জীবের উৎপত্তি ও সংখ্যাবৃদ্ধির উপর পরিবর্ত্তন নির্ভর করে। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ইংলন্ডের ওয়ারিংটন এবং রুশিয়ার উইনোগ্রাডস্কি স্বতন্ত্রভাবে অনুসন্ধান করিয়া পরিবর্ত্তন সাধনকারী জীবাণুর সন্ধান পান।

বশিষ্ট এক প্রকার বীজাণু প্রথমে এমোনিয়াকে নাইট্রাস এসিড এবং পরে নাইট্রাস এসিডকে নাইট্রিক এসিডে পরিণত করে। ঐ বীজাণু আবিষ্কারের দশ বৎসর পরে দ্বিতীয় এক প্রকার জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। উহারা কলাই জাতীয় গাছের শিকড়ে উৎপন্ন স্ফোটকে বাস করিয়া বায়ুর নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদখাদ্যে পরিণত করে। তৃতীয় এক প্রকার বীজাণু ... বিশ্লিষ্ট করিয়া নাইট্রোজেনকে

বায়ুর সহিত মিশিয়া যাইতে সাহায্য করে। গত ৩০ বৎসরে অন্য একপ্রকার রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, সকল প্রকার বীজাণু একসঙ্গে মিলিয়া কাজ করে না। উহাদের কতকগুলি অবশিষ্টগুলিকে বিনষ্ট করে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ফ্র্যাঙ্ক দেখান যে, ১৩০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত ভূমিকে উত্তপ্ত করিলে উহার ফল প্রসবের শক্তি কমিয়া যায় বটে, কিন্তু তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রীর উপর না উঠিলে উহার উর্ব্বরাশক্তি দ্বিগুণের বেশী হয় এবং জমির দ্রাব্য পদার্থের পরিমাণও বাড়িয়া যায়। পাঁচ বৎসর পরে হিল্টনার ও ষ্টার্মার প্রমাণ করেন যে, জমির উপর কার্ব্বন ডাইসালফাইডের ক্রিয়ার আণুবীক্ষণিক জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটে। জীবাণুর সংখ্যা শতকরা প্রথমে ৭৫ ভাগ হ্রাস পাইলেও পরে কার্ব্বন ডাইসালফাইড উড়িয়া যাইবার পর ঐ সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হয়। টলুইন ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবহার হইতে একইরূপ ফল ফলিতে দেখা যায়।

রথামষ্টেডের ডক্টর রাসেল ও হাচিংসন বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা অণুবীক্ষণের পরীক্ষায় দেখিতে পান যে, উত্তাপ দিবার এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ভূমির পক্ষে প্রয়োজনীয় কতকগুলি জীবাণু অনিষ্টকারী প্রোটেজোয়া কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় এবং পরে প্রোটেজোয়ার বিনাশ ঘটায় উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদনে সাহায্যকারী জীবাণুর সংখ্যা বাড়িয়া থাকে। সুতরাং ভূমিও বেশী উর্ব্বরা হয়।

জান্তব ও উদ্ভিদ আবর্জ্জনা হইতে ভূমির দুই প্রকারে উপকার হয়। আংশিকভাবে উহা কার্ব্বন ডাইঅকসাইড, এমোনিয়া, জল ও নাইট্রোজেন উৎপন্ন করে, অংশত জমিতে সঞ্চিত হইয়া উহার আর্দ্রতা রক্ষায় সাহায্য করে। এমোনিয়ার কতকভাগ জমির কর্দ্দমের সহিত মিশ্রিত হইয়া অজ্ঞাত প্রকৃতির সামগ্রী প্রস্তুত করে, অবশিষ্টাংশ জীবাণুর সাহায্যে নাইট্রিক এসিডে পরিণত হয়। কার্ব্বন ডাইঅকসাইডের কতকাংশ জমির উপর জীবাণু প্রভৃতি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। অন্যভাগ বায়ুমন্ডলে চলিয়া যায় এবং পুনর্ব্বার উদ্ভিদে উহা গ্রহণ করে। নাইট্রোজেন বীজাণু কর্ত্তৃক খাদ্যে পরিবর্ত্তিত হয় অথবা উপরে উঠিয়া যায়। ডক্টর রাসেল আণুবীক্ষণিক জীবকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) স্যাপ্রোফাইটিশ—উহারা জৈব পদার্থ ভক্ষণ করে এবং উহা বিশ্লিষ্ট করে, (২) ফ্যাগোসাইটিশ—ঐগুলি জীবাণু গ্রাস করে, (৩) অন্যান্য বৃহত্তর জীবাণু—উদ্ভিদের বৃদ্ধির উহারা প্রতিকূল। তাপ মাত্রার আধিক্যে অথবা কার্ব্বন ডাইসালফাইড প্রভৃতির প্রয়োগে শেষোক্ত দুই প্রকার জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং প্রথম প্রকার মাত্র সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উদ্ভিদের পুষ্টি সাধনের বেশী উপযোগী হয়।

পতিত জমিতে নাইট্রোজেন সংযুক্ত পদার্থ সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা বেশী। ভূমিকর্ষণ অথবা পরিষ্কার করিলে উহা বেশী পরিমাণ আলোক, বায়ু ও বৃষ্টি লাভ করে। কার্ব্বন ডাইঅকসাইড ও এমোনিয়া সহজে বাহিরে চলিয়া যায়। দ্রাব্য নাইট্রোজেন সামগ্রীও ধৌত হইয়া যায়।

জৈবপদার্থ বিশ্লিষ্ট হইলে গাছের পুষ্টির পক্ষে

ক্ষতিকর বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং ক্যালসিয়ম কার্ব্বোনেট ব্যবহারে এসিডের বিষক্রিয়া নষ্ট হইতে পারে—সে বিষয়েরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে।

ক্রমে ক্রমে জানা যায় যে, রসায়ন ও বীজাণুতত্ত্ব কৃষি-বিজ্ঞানের দুইটি দিক মাত্র। নানাপ্রকার ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুর অবস্থায় ফসলোৎপাদন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহাতে ধরা পড়ে—ঐ বিজ্ঞানের অন্যান্য দিকও আছে। যেমন, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাপমাত্রার বিশিষ্ট সীমায় উদ্ভিদের সংখ্যা যেমন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়, তেমনি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলের কমে গাছের পুষ্টিসাধনে ব্যাঘাত জন্মে। আরও দেখা যায় যে, জীবাণু কর্ত্তৃক উদ্ভিদ খাদ্যের উৎপাদন ,তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল এবং জলাভূমিতে জীবাণুরা ক্রিয়া করিতে অক্ষম। সুতরাং জমিতে তাপ ও জল রক্ষা, ভূমির জল নিস্কাষণ প্রভৃতির গবেষণায় বর্ত্তমানে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। সমস্যাটা জটিল। কারণ ভূমি-সংক্রান্ত অনেক ক্রিয়া কতকটা পদার্থবিদ্যা এবং আংশিকভাবে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের সীমানার অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষেপে উহা বিবৃত হইতেছে। আবাদী জমির মাটি একদিকে যেমন স্থল বালুকণায় গঠিত হয়, অন্যদিকে তেমনি দৃঢ়সংলগ্ন কর্দ্দমেও উহার গঠন হইতে পারে। শেষোক্ত প্রকার সকল কর্দ্দমে কলয়িড সামগ্রীর কম বেশী অংশ থাকে। ভূমির মাটির গঠন কৃষির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সকল প্রকার মাটির আর্দ্রতা রক্ষার শক্তি একরূপ নহে। অনেক জমিতে জল থাকিলেও উদ্ভিদ উহা আবশ্যক মত গ্রহণ করিতে পারে না এবং বহু ক্ষেত্রে জল বর্ত্তমান থাকিতেও উদ্ভিদ শুষ্ক হয়। বালু প্রধান মাটিতে অন্তত শতকরা দেড়, কর্দ্দমে দশ এবং চাপড়ায় চল্লিশ ভাগ জল থাকা আবশ্যক। ভূমিতে জল ও খনিজ পদার্থ রক্ষায় কলয়িড সামগ্রীর প্রভাব বিদ্যমান। সুতরাং ফসলোৎপাদনে জল-সার প্রভৃতির পরিমাণাদির সহিত জমির মাটির গঠনের কথাও সমান বিবেচ্য দেখা যাইতেছে।

মেণ্ডলের নিয়ম অনুসারে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া গাছের প্রয়োজনমত জন্ম দিবার চেষ্টার কথাও উল্লেখযোগ্য। এইরূপ প্রয়াসও সম্পূর্ণরূপ ব্যর্থ হইতেছে না। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের সংযোগে কতকগুলি বিশিষ্ট গুণের গাছ জন্মাইতে পারিলে তাহা হইতে অনেক ক্ষেত্রে যে সুবিধা হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। জল-কৃষির কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিনা মৃত্তিকায় ঐ কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ জমির উপর উদ্ভিদ না জন্মাইয়া নানা প্রকার পাত্রের জলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পোষণের উপযোগী সামগ্রী গুলিয়া তাহাতে গাছ উৎপাদন করা হয়, নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থগুলি ঐ নিমিত্ত আবশ্যক বলিয়া জানা যাইতেছেঃ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পোটাসিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, বোরন, ম্যাঙ্গানীজ, তামা ও দস্তা। মলিবডিনামও প্রয়োজন বলিয়া সম্প্রতি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পৃথিবীর কোন কোন কৃষি গবেষণার ষ্টেশনে বালু ও কঙ্করের উপরেও গাছ জন্মাইতেছে। বলাই বাহুল্য, বিভিন্নরূপ উদ্ভিদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পুষ্টিকর দ্রব্য বিভিন্ন পরিমাণে প্রযুক্ত থাকে।

পরিশেষে কৃষিসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কত বিভিন্ন দিকে পরিচালিত হইতেছে তাহা বৃটেনের কতকগুলি প্রতিষ্ঠানও যে সকল বিষয়ের চর্চ্চায় তাহারা নিযুক্ত সেগুলির উল্লেখ করিয়া দেখান হইতেছেঃ—

(১) জমির মাটি, উদ্ভিদের পুষ্টি ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান; (ক) রথামষ্টেড; (খ) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়।

(২) উদ্ভিদ বিজ্ঞান ঃ ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি, লণ্ডন।

(৩) উদ্ভিদ উৎপাদন ঃ (ক) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, (খ) এবারিস্‌ টুইথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ, (গ) এডিনবরা স্কটিশ প্ল্যাণ্ট ব্রীডিং ষ্টেশন।

(৪) ফলঃ (ক) ব্রিষ্টল, লং-এষ্টন, (খ) কেণ্ট ইষ্ট মলিং।

(৫) গ্লাস হাউস ইণ্ডাস্ট্রী ঃ চেষ্টনাষ্ট, হাটস।

(৬) কৃষি বীজাণু বিজ্ঞান ঃ লণ্ডন স্কুল অব হাইজিন এণ্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন।

(৭), কৃষি ধনবিজ্ঞান ঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

(৮) কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

বন্ধনহীন-গ্রন্থি

(উপন্যাস)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

পশ্চিমের একটি ছোট ষ্টেশনে সতীশ নামিয়া পড়িল। সাহিত্য জগতের সে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং ভবিষ্যৎ যে তাহার জন্য আরও উজ্জ্বল হইয়া আছে, তাহাও অবধারিত সত্যরূপেই সবাই জানিত। তাহার চেহারা ছিল ছিপছিপে লম্বা ধরণের, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু কোন কিছু গ্রাহ্য না করিয়া সে কলম আর কাগজ লইয়াই সময় কাটাইয়া দিত।

বন্ধুরা বাধা দিতে আসিলে বলিত, এই লেখাই যে আমি ভালবাসি, চোখ যদি যায়-ই ত' যা ভালবাসি তার জন্যই যাক্। হাসিয়া কথা বলিলেও বন্ধুদের তাহারই মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া যাইত।

এমনি সময় একদিন সকলের অজ্ঞাতে পশ্চিমের একটি শহরের একান্তে টিকিয়া থাকা ষ্টেশনে আসিয়া সে নামিয়া পড়িল।

বাংলো তাহার ঠিক করাই ছিল। সে শুধু একাই থাকিবে সেখানে, দূরের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া আশা মিটিবে না, কাগজের উপর কলম চালাইতে চালাইতেই তাহার সময় কাটিয়া যাইবে, আর সর্ব্বাপেক্ষা মজা হইবে রান্নার সময়। কি দিয়া যে কি রাঁধিবে এবং আহারে বসিয়া মুখের অবস্থা যে কেমন হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিতেই তাহার মন খুসিতে ভরিয়া ওঠে। সকল সময়ের সংগী রান্না করিতে ওস্তাদ পুরাতন ভৃত্য রামহরিকেও আজ সে বাদ দিয়া আসিয়াছে। নিজেকে লইয়াই সে কাটাইয়া দেখিতে চায় কেমন করিয়া দিন চলে।

সুটকেশ আর বিছানাটা নামাইতেই ঝমঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। কি-ই-বা করিবে সে? এই অন্ধকারে বিশেষ করিয়া এই অজানা দেশে কাহারও সাহায্য ব্যতীত তাহার বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করা প্রায় অসম্ভব ত' ছিলই এখন সে প্রায়েরও বিশেষ কিছু আশা রহিল কিনা তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। ছোট্ট ষ্টেশনের একপাশে ছাউনির মধ্যে কতকগুলি কুকুরের সংগেই স্থান ভাগ করিয়া তাহাকে কোন মতে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে হইল। ঘরটি অন্ধকার, হয়ত বা পূর্ব্বে আলো জ্বলিতেছিল বাতাসে নিভিয়া গিয়াছে এবং নিভিয়া যখন গিয়াছেই তখন জ্বালাইবার আর প্রয়োজনও কেহ বোধ করে নাই। অন্ধকারে সভয়ে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দড়ির মত একপ্রকার চলন্ত জীবের কথা মনে হইতেই সে শিহরিয়া উঠিল। টর্চ একটা সংগে আনিয়াছে বটে, কিন্তু সেও সুটকেশের কোন্ একধারে পড়িয়া আছে, বাহির করিতে হইলে সমস্ত কিছুই নামাইতে হইবে মনে হওয়ায় সে চুপ করিয়াই রহিল।

অকস্মাৎ অন্ধকার যেন কথা কহিয়া উঠিল, একটা আলো নিয়ে এলে না কেন? কতক্ষণ বসে আছি বলত'।

কিন্তু বাহিরেও কিছু চোখে পড়ে না, হয়ত' সমস্ত আলোই নিভিয়া গিয়াছে, হয়ত' মাষ্টার মহাশয় দুর্য্যোগ দেখিয়া কাজ-কর্ম্ম বন্ধ করিয়া নিজের বাসায় ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে নিশ্চিন্ত করিয়া পুত্র-কন্যাদের ভরসা দিতেছেন। হয়ত বা জানাইতেছেন অতীত জীবনের আরও বড় বড় ঝড়ের কথা; কিন্তু সতীশের তাহাতে কি আসে যায়! ঘর ও বাহির একাকার হইয়া গিয়াছে দেখিয়াই যেন সে তাহার লুপ্ত সাহস ফিরিয়া পাইল। ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কে কথা কইলেন? ভয় নেই, কি বলছিলেন বলুন।

সমস্ত শব্দই যেন নিঃশেষে মরিয়া গিয়াছে, কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না। ও অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, সাড়া দিন, আমার নিজের খুবই দরকার। এখানকারই কোন লোক এখানে আছেন কিনা তাই আমি জানতে চাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবার শব্দ শোনা গেল, কে যেন ধীরে ধীরে বলিল, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

সতীশ চমকিয়া উঠিল, ইহা যে বাঙালী মেয়ের গলা তাহা বুঝিতে তাহার মুহূর্ত্তমাত্রও দেরী হইল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, আপনি বাঙালী এবং মহিলা তা বেশ বুঝতে পারছি; কিন্তু এখানে এই অন্ধকারে কেন সেইটেই বুঝতে পারছিনে।

নিকটেই অনেক লোকের গলা শুনিতে পাওয়া গেল, বোধ হয় কাহারা ষ্টেশনে আসিতেছে। এই অন্ধকার ঘরের দুইটি মনুষ্যের বুকেই আশার স্পন্দন খেলিয়া গেল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, কতক্ষণ বসে আছেন আপনি?

জবাব আসিল, তা কয়েক ঘণ্টা হবে।

'একা কেন?' সতীশ প্রশ্ন করিল।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মেয়েটি জবাব দিল, উনি বেরিয়ে গেছেন কিন্তু এখনও যে ফিরলেন না কেন তাই বুঝতে পারছিনে।

গরুর গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। কাহারা যেন ষ্টেশনে আসিয়াছে। মুখ বাড়াইয়া সতীশ দেখিতে পাইল কয়েকটি লোক তিন চারিটা লণ্ঠন এবং একটা গরুর গাড়ী লইয়া আসিয়াছে—এই ঝড়-জলে কাহার যে কি প্রয়োজন হইতে পারে তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও মনে মনে সে আশান্বিত হইয়া উঠিল।

লোকগুলি এই অন্ধকার ঘরের মধ্যেই আসিয়া হাজির হইল। মেয়েটির মুখে আলো পড়ায় সতীশ সেই দিকে চাহিয়া দেখিল, সাহিত্য লইয়াই তাহার দিন কাটিয়াছে অনুভূতি তাহার কম নয়; কিন্তু সে মুখ দেখিয়া এই প্রথম সে বুঝিল যে নারীর রূপ শুধু মানুষকে মুগ্ধই করে না, অবশ করিয়াও দেয়, এবং সেই রূপের মধ্যে, চোখের দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে যাহা মানুষের মন কেবলমাত্র মানুষটিকে ছাড়াইয়া আরও বহু দূরে লইয়া যায়।

আগন্তুকরা অশিক্ষিত গেঁয়ো লোক, তাহারা ইহাদের

[illegible] আলোকিত করিয়া [illegible] একজন বলিল

কাঁহা যায়েগা বাবু? বর্ষা ত' বহুত মুস্কিল কিয়া।

উহাদের মনের ভাব সতীশ চক্ষের নিমেষে বুঝিয়া লইয়া বলিল, তোমাদের সঙ্গে ত' গাড়ী আছে, আমাদের পে'ছে দিয়ে একটু উপকার কর না বাপু।

অপর একজন উত্তর করিল, ও বাত ত' ঠিকই হায় বাবু, গাঁ-পর যায়কে আউর একটো গাড়ী ভেজ দেঙ্গে। হামলোক দোস্‌রা এক বাবুকো বাস্তে আয়া হায়।

মিনিট কয়েক পরেই একটি ট্রেন আসিয়া থামিল। লোকগুলি ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল, কিন্তু কেহই নামিল না দেখিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম ব্যক্তি বলিল, উ বাবু ত' নেহি আয়া, আপহি আইয়ে।

মেয়েটি সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন বলিতে গেল। সতীশ কিন্তু এ সুযোগ ছাড়িতে রাজী ছিল না, সে ইঙ্গিতে মেয়েটিকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিল।

সমস্ত মালপত্র গাড়ীতে তুলিয়া একটা লণ্ঠন সতীশের হাতে দিয়া একজন বলিল, দেখকে আইয়ে বাবু, নেইত' গীড় পড়েঙ্গে।

মেয়েটিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সতীশ এইবার চিন্তিত হইয়া পড়িল, বৃষ্টি তখনও থামে নাই, অথচ গাড়ীর ওই স্বল্প পরিসর স্থানে সে-ই বা কেমন করিয়া যায়! শেষ পর্যন্ত আর কোন উপায় না দেখিয়া সে হাঁটিতেই আরম্ভ করিল।

লোকগুলি যে যাহার টোকা মাথায় দিয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিল। সতীশকে লক্ষ্য করিয়া একজন বলিল, গাড়ীপর চড়িয়ে বাবু নেহি ত' ভিজ যায়েগা, আউর বেমারী ভি হো শেক্তা। রাস্তা ভি আচ্ছি নেহি হায়, মাজীকো ডর লাগেগা। সতীশ চমকাইয়া উঠিয়া গাড়ীর ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না। শাদা কাপড়ে আবৃত নারী মূর্ত্তিটিকে একদিকে সরিয়া যাইতে দেখা গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেহই কোন কথা বলিল না এবং আরও খানিকক্ষণ পরে সুমিষ্ট নারীকণ্ঠ ভাসিয়া আসিল, মিছি মিছি ভিজে লাভ কি, ভেতরে যথেষ্ট যায়গা আছে!

আর কোন কথার প্রয়োজন ছিল না। সতীশের সমস্ত কিছুই ভিজিয়া গিয়াছিল, আর বেশী ভিজিবার ভরসা তাহার ছিল না, বিশেষত বৃষ্টির জল পড়িয়া তাহার চশমাকে সম্পূর্ণ অকেজো করিয়া দেওয়ায় সে রীতিমত ভীত হইয়াই উঠিয়াছিল। শরীর তাহার মোটেই ভাল বলিয়া মনে হইতেছিল না। প্রথম হইতেই যে বিপদ সুরু হইয়াছে, তাহা ক্রমে বিরাট হইয়া দেখা দিবে বলিয়াই তাহার কানে কে যেন বারংবার ফিস ফিস করিয়া কি বলিতেছিল। আর কোন কথাই না বলিয়া সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গাড়োয়ানকে বাড়ীর কথা বলা হইয়াছে, সে চেনে, অতএব সেদিক হইতে আর কোন ভয় নাই। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে সতীশের চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল—স্পষ্টই সে বুঝিতে পারিল বসিয়া থাকা হয়ত' তাহার আর হইয়া উঠিবে না। প্রাণপণ চেষ্টায়

খানিকক্ষণ পর সে যেন স্বপ্নে দেখিতে পাইল কে যেন তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছে। এমনি যত্ন, এমনি স্নেহ সে যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল, অত্যন্ত তৃপ্তিতে সে আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

কোথা দিয়া এবং কেমন করিয়া কয়েকটা দিন যে কাটিয়া গেল তাহা সতীশ জানিতেও পারিল না। দুইটি সেবা-পরায়ণ হস্ত যে নিরন্তর তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, তাহা টের না পাইলেও অচেতন অবস্থায়ও সে বেশ নিশ্চিন্ত এবং শান্ত হইয়াই ছিল।

সেদিন গভীর রাত্রে চেতনা ফিরিয়া পাইয়া মিট্‌মিটে লণ্ঠনের আলোতেও সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল কে যেন তাহারই বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে এবং তাহারই মাথার লম্বা কয়েকগোছা চুল তাহার মুখের উপর পড়িয়া যেন কোন মায়ারাজ্যের সুমধুর গন্ধ বহিয়া আনিয়া সমস্ত দেহ মন অবশ করিয়া দিতেছে। ধীরে ধীরে একটা হাত তুলিয়া কয়েকগাছা চুল সে হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল, একবার ইচ্ছা হইল সযত্নে তাহাকে চেয়ার হইতে তুলিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেয়; কিন্তু পারিল না। পাশ ফিরিয়া তাহার চুলের মধ্যে মুখ রাখিয়া সে স্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিল।

আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। বারান্দায় সতীশেরই কাছে আর একটা চেয়ারে সেই মেয়েটি বসিয়াছিল

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, স্বামীর নাম ছাড়া আর কিছুই তুমি জান না? অলকা মাথা নীচু করিয়া রহিল।

সতীশ বলিয়া চলিল, তাঁর কে কে আছেন এবং কোথায় তাঁদের দেশ তাও তুমি জাননা বুঝলাম—কিন্তু তোমার মামা মামীর খবর জান নিশ্চয়ই, তাঁরাই ত' তোমার বিয়ে দিয়েছেন?

হ্যাঁ, তাঁরাই আমাকে মানুষ ক'রেছেন, আমার সবই ক'রেছেন তাঁরা, আমার বিয়ে দিয়ে আমাদেরই সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন তাঁরা ভাগ্য খুঁজে নিতে। অবস্থা তাঁদের ভাল নয়, তাই সেই ভাগ্য ঘর আর তাঁদের বেঁধে রাখতে পারে নি। চোখের জল চেপে আমার মাথায় হাত রেখে মামা বলেছিলেন, যদি কোন দিনও দাঁড়াতে পারি তবেই খবর দেব। তাই তাঁদের খবর আর আমার জানা নেই।' অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অলকা নিজেকে সংযত করিল। দুর্ভাগ্য তাহার চিরসঙ্গী, তাই আজও সে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই।

'তারপর?'

সম্মুখ দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অলকা বলিল, দেশে উনি যেতে চাইলেন না, টিকেট কেটে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন তারপর হঠাৎ নামতে ব'ললেন এখানে। নেমে পড়লাম, আমাকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়তে চাইলেন গাঁয়ের উদ্দেশ্যে—ভয় হ'ল কিন্তু উপায় নেই দেখে গয়নার বাক্সটা তাঁর হাত দিয়ে বললাম, 'এটা কাছে রাখবার সাহস আমার নেই'। আমার মুখের দিকে চেয়ে কি ভেবে সেট হাতে করে নিয়ে গেলেন; কিন্তু আর ফিরলেন না'। তারপর আর কিছুই নেই

'কিন্তু তারপর আর কিছু নেই' [illegible]

ঘত ভয়। এবার কি করা যায় সেইটেই ত' ভাববার বিষয়। সতীশ উত্তরের আশায় অলকার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

আর কোন কথাই হইল না, একটা অত্যাশ্চর্য্য নিস্তব্ধতা যেন তাহার গভীরতা প্রচার করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কাহার মুখে কথা নাই—প্রকৃতি দেবীই যেন সব। দূরের নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া কোন আশাই পাওয়া যায় না, অথচ না চাহিয়াও উপায় নাই। অলকার মনে হইল, এই যে লোকটি তাহার পাশে বসিয়া আছে তাহাকেও ওই দূরের নক্ষত্রের সহিত তুলনা করা যায় হয়ত'। দেখিলে আশা হয় অথচ ভরসা করিবার কিছুই নাই। একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া সে উঠিয়া গেল।

অলকা বাহির হইতে চায় না, সকাল, সন্ধ্যা সতীশ ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারই মত কলিকাতার সহস্র সুবিধা হইতে ছিট্‌কাইয়া আসা দুই চারিটি ভদ্র পরিবারের সহিত তাহার আলাপ হয়। হাতের কাছে সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল রত্নটিকে দেখিয়া কেহই অন্যদিকে মুখ ফিরাইতে পারে না। সতীশ ইহারই ফাঁকে ফাঁকে অলকার স্বামীর খোঁজ করিতে ছাড়ে না। কিন্তু তাহার কোন সংবাদই জানা যায় না। সতীশের দৃঢ় বিশ্বাস সেই লোকটি অলকাকে ফাঁকি দিয়াছে, তাহা না হইলে দেশে না লইয়া গিয়া এখানেই বা আসিবে কেন? হয়ত' গহনার বাক্সটি হাতে পাইয়া অলকাকে বসাইয়া রাখিয়াই অন্য দিক দিয়া সেই ট্রেনেই সরিয়া পড়িয়াছে। ইহা অসম্ভব নয়, কিন্তু কি করিয়া যে মানুষে ইহাকেই সম্ভব করিয়া তোলে তাহা ভাবিতেও তাহার মাথা ঘুরিয়া ওঠে। ইহা তাহার বিশ্বাস হইলেও খোঁজ না করিয়া সে কিছুতেই পারে না।

আরও দিন সাতেক এমনি করিয়াই কাটিয়া গেল। সাঁওতালদের কি একটা উৎসব উপলক্ষে আজ তাহাদের নাচ-গান হইবে। জোর করিয়া অলকাকে লইয়া সতীশ আজ বাহির হইয়া পড়িল। উৎসবের মাঝে গিয়া অলকা নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইতে পারিবে মনে করিয়াই সতীশ খুশী হইয়া উঠিল।

নাচ সুরু হইয়া গিয়াছে। সাঁওতাল রমণীরা একে অন্যের হাত ধরিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে একবার আগাইয়া একবার পিছাইয়া, কখনও বা ডাইনে কখনও বা বাঁয়ে সরিয়া নাচের সঙ্গে সঙ্গেই গান গাহিতেছে। পুরুষেরা মহুয়ার রসে মাতিয়া মাদল লইয়া তালে তালে বাজাইয়া নানারূপে অঙ্গভঙ্গী করিতেছে। ভীড়ের চাপে অলকা একেবারে সতীশের গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া এই বিচিত্র নৃত্য উপভোগ করিতেছিল।

কে যেন হঠাৎ পাশে আসিয়া বলিল, কি সতীশ বাবু, আপনারা দুজনেই যে এখানে আছেন তা' ত কই জানতাম না—সস্ত্রীক বেড়াতে আসা অবশ্য ভালই।

অলকা চম্‌কাইয়া উঠিল, তাহা টের পাইয়া মহা-অপ্রস্তুত হইয়া সতীশ বলিল, না, না কি বলেন, এই নাচ দেখতে এসেছিলাম একটু। কিন্তু আর নয়, অন্য কাজও ত' আছে—চল অলকা বাড়ী যাই।

[illegible]

উপেনবাবুর স্ত্রী বলিলেন, উনি ত' আর তোমার মত উকীল নন যে এমনি বাজে জায়গায় সময় নষ্ট করবেন, তার চেয়ে বরং—। বলিয়াই হঠাৎ অলকার মুখ তুলিয়া ধরিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন, লজ্জা কি বোন, স্বামীর কাছে লজ্জা ক'রলে চলে কি? কাল কিন্তু তোমার ওখানে যাব, তোমার সংসার দেখে আসব আর দেখে আসব কেমন তুমি গোছাতে পার অগোছাল সাহিত্যিককে—অতিথি যাবে মনে থাকে যেন।

অলকাকে লইয়া সতীশ ভীড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল। অনেক দূর আসিয়াও কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না।

রাস্তার পাশের অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা কাতর ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। তাহারা দুইজনেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রাস্তার পাশে আবর্জ্জনার উপর একটি সাঁওতাল বৃদ্ধ অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় শুইয়াছিল আর তাহারই মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া ছিল একটি বৃদ্ধা। মহুয়ার রসের মাহাত্ম্য—বুঝিতে সতীশের একটুও দেরী হইল না। আপনা আপনিই সে বলিয়া উঠিল, হতভাগ্য স্ত্রী, স্বামীকে ফেলে যাওয়াও অসম্ভব অথচ করেই বা কি? মাতাল—। সতীশ নিজেই আগাইয়া গিয়া বৃদ্ধার হাতে দুইটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, যাও, গাড়ী ডেকে ওকে বাড়ী নিয়ে যাও।

সতীশ বসিয়া পড়িয়া বৃদ্ধের মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। তাহাকে দেখিয়া তখন কেহই বিশ্বাস করিবে না যে এই সেই কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, অথচ পরের মনের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয় বলিয়াই না সে রসের সন্ধান পাইয়াছে।

অলকা নিকটে আসিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বৃদ্ধ আস্তে আস্তে বলিল, কে-রে বুড়িয়া? তুই বাড়ী যা না, আজ আমি আর যেতে পারব না রে, কিছুতেই পারব না।

সতীশ বৃদ্ধকে ভাল করিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, বুড়িয়া গাড়ী আনিতে গেছে বুড়ো, তুমি চুপ করে পড়ে থাক।

তাহারই মস্তক কোন বাবুর ক্রোড়ের উপর রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ যেন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না।

সতীশ বলিল, না, উঠে তোমার কাজ নেই, কিন্তু এত বুড়ো বয়সেও অত রস খেলে কি চলে বুড়ো। বুড়িয়ার কষ্টটা একবার ভেবে দেখ দেখি।

হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া সে বলিল, কি করব [illegible], তারই বা কি? আজ চার বছর আগে ঠিক এই উৎসবের দিনে মাদল বাজাতে এসেছিল ছেলেটা, একটা মেয়েকে সে খুব ভাল বাসত বাবু, সেও এসেছিল তার সঙ্গে। তারপর রস খেয়ে সবাই মিলে মাতামাতি সুরু করে দিল, আমাদেরই গাঁয়ের সবচেয়ে জোয়ান ছেলেটার সঙ্গে ছিল ভাব

[illegible]

মারামারি সুরু হয়, রক্তে জায়গাটা লাল হ'য়ে যায়—ওই কালো চেহারার ভেতরেও লাল রক্তই থাকে বাবু তারপর আমার সুখন—। বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকে। তাহারই চোখের জলে সতীশের কাপড় ভিজিয়া যায়।

অনেকক্ষণ সবাই চুপ করিয়া রহিল। বৃদ্ধ আবার বলিল, তারপর প্রত্যেক উৎসবেই বুড়িয়া এখানে আসিতে চায়, জোর কমে গেলেও না এসে ত' পারি না বাবু, ও লুটিয়ে কাঁদে আমার কিন্তু বাবু চোখ জ্বালা করে, চারদিক লাল হয়ে যায়—ছেলের রক্ত যেন আমায় পাগল ক'রে দেয়, খুব বেশী ক'রে রস খেয়ে চুপ করেই থাকি। আজ তিন বৎসর এ দিনটিতে এমনি করেই আমি পড়ে থাকি, আর বুড়িয়া বসে থাকে আমার মাথা কোলে নিয়ে কিছুতেই ফেলে যেতে পারে না। ও ও পাগল হ'য়ে যাবে বাবু। বৃদ্ধ যেন কোন্ এক বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া যায়। অলকার অজ্ঞাতসারেই তাহার অন্তর মথিত করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল—সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু গাছের ছায়ায় অন্ধকার গভীরতর হওয়ায় সে কিছুই দেখিতে পাইল না।

বাড়ী ফিরিয়াই অলকা বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। বৃদ্ধের শেষ কথাটা যেন কেবলই তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। স্ত্রী স্বামীকে ফেলিয়া যাইতে পারে না ইহা যে স্বতঃসিদ্ধ সত্য তাহা সে ত' ছেলে বেলা হইতেই আপনা আপনি শিখিয়াছে। অথচ এ কোথায় পড়িয়া সে কাহার ঘর গুছাইয়া রাখিতেছে? ওই যে লোকটা যে এতটুকু ইতস্তত না করিয়া বৃদ্ধের কাজে লাগিয়া গিয়াছিল, তাহার মন যে সত্যই বড় তাহা বুঝিতে পারিলেও তাহার নিজের সম্বন্ধে তাহাকে উদাসীন দেখিয়া সমস্ত মন তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তাহার নিজের সম্বন্ধে ওই লোকটা যেন ইচ্ছা করিয়াই কোন কথা বলে না, হয়ত' নিজের সমস্তরকম সুবিধার জন্যই তাহাকে সে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

কাছে আসিয়া সতীশ বলিল, চুপ ক'রে শুয়ে থাকলে ত' চ'লবে না অলকা, তোমার না পেলেও আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে—একটা কিছু ব্যবস্থা কর।

বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অলকা বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমাকে খেতে দিচ্ছেন কি সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্যেই? আমি পারব না, আমাকে দিয়ে কোন কাজই হবে না আর আপনার। মিথ্যে ভদ্রতার মুখোস প'রে না থেকে নিজেকে স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরলেই ত' হয়। যা' ভেবেছেন তা' হবে না, কিছুতেই না।

অতি বিস্ময়ে সতীশ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

অলকা বলিয়া চলিল, আপনাকে বিশ্বাস ক'রে এসেছিলাম আপনার সঙ্গে, কিন্তু মানুষে যে এত শঠ হতে পারে তা' তখন জানতাম না। আজ অপমান করবার জন্যে আমাকে সঙ্গে নেবার কি দরকার ছিল? কিন্তু মেয়ে মানুষের অশ্রু আর বাধা মানিল না—সে আবার বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। সতীশ এতক্ষণ একটা কথাও বলিতে পারে নাই। কে যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল। এইবার আস্তে আস্তে সে বলিল, কিন্তু কে তোমার মনে এসব কথা এনে দিয়েছে? আমি ত' তোমায় কোন অপমানই করিনি অলকা।

একবার কথা সুরু হইয়া গেলে আর তাহা থামে না।—সমস্ত বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়াই সে তখন আগাইয়া চলে।

আবার উঠিয়া বসিয়া অত্যন্ত কঠিনভাবে অলকা বলিল, কিন্তু আমার নাম ধ'রে ডাকবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে শুনি? আপনার মনের সমস্ত কিছুই স্পষ্ট হ'য়ে গেছে আমার কাছে—আপনার বন্ধুকে ব'লবেন কাল যেন তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসে না অপমানিত হন।

'সময় থাকলে তাই ক'রতাম, কিন্তু কাল খুব ভোরেই হয়ত' তাঁরা এসে প'ড়বেন। উপেনবাবুর কোন অপমানই হবে না আমার কাছে তবে তাঁর স্ত্রীর কথা—নিজের ইচ্ছায়ই তিনি যাঁর কাছে আসবেন তাঁর কাছ থেকেই তাঁর পাওনা নিয়ে যাবেন, আমি কোন কিছু বলতেই আসব না।—' সতীশ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা বিশ্রী রূপ ধরিয়া এইবার অলকাকে লজ্জিত করিয়া তুলিল। এক দিককার তীব্রতা আর এক দিককার শান্ত কথার কাছে যেন অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল। সতীশের অভুক্ত মুখের কথা মনে করিয়া অলকা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

পরদিন খুব ভোরে উঠিয়াই সতীশ কাজে লাগিয়া গেল। আজ সে নিজেই সমস্ত ব্যবস্থা করিবে। যাহা করিবে মনে করিয়াই অকস্মাৎ সকলের অজ্ঞাতে তাহার এই বিদেশযাত্রা তাহাই যে কাহার মধুর স্পর্শ পাইয়া লোপ পাইতে বসিয়াছিল, যেন আজ নূতন করিয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল।—কিন্তু উনুন্ জিনিষটা যে এত বে-কায়দা ধরণের, শত চেষ্টায়ও যে সেটা জ্বলিতে চাহে না তাহা সে জানিত না, জানিবার প্রয়োজনও কোনদিন অনুভব করে নাই। কেবলমাত্র কয়লা, কেরোসিন এবং আগুন হইলেই যে তাহা জ্বলিতে আরম্ভ করে না তাহা আজ মিনিট পাঁচেকের ফু' এবং বাতাস দিয়াই সে বুঝিতে পারিল। চাকরটা আজ আসে নাই, কিন্তু না আসিয়া যে এতটুকুও ভাল করে নাই তাহা সে বেশ ভালরকমই টের পাইল। নিতান্ত হতাশ হইয়াই সে নূতন কোন বুদ্ধি বাহির করিবার জন্য সেখানেই বসিয়া পড়িল।

পিছন হইতে অলকা বলিয়া উঠিল, স'রে যান, আপনি সত্যি মানুষ নন, এত অপমান ক'রেও কি আশা আপনার মেটেনি? মিনিট দশেক হ'ল পেছনে এসে দাঁড়িয়েছি অথচ এক মুহূর্ত্তও পেছন ফিরে তাকাবার দরকার হ'ল না আপনার, আশ্চর্য্য! সরুন, চাকরটা আসেনি, জল তুলে নিয়ে আসুন বরং—ও কূয়ো থেকে জল আনা আমার সাধ্য নয়।

অবাক বিস্ময়ে সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিষ্টি একটু হাসি হাসিয়া অলকা বলিল, অবাক হ'য়ে

ঘাড়ে চাপতেও ত' পারে, স'রে পড়ুন নইলে বিপদ হতে পারে।

উঠিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে সে বলিল, বাঁচা গেল, এসব অসম্ভব কাজ যে সম্ভব হয় কেমন ক'রে তা এর আগে বুঝতামও না, আজ কিন্তু একটু আলো দেখতে পাচ্ছি—যারা নিজেরাই অসম্ভব, তাদের কাছে অসম্ভব কিছু থাকতে পারে কি?

তাহার গমন পথের দিকে অলকা চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, অকস্মাৎ সমস্ত বুক তোলপাড় করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিতে চাহিল—সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল।

বাহিরের বারান্দায় চা-পান করিতে করিতে সতীশ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। অলকা টের পাইয়া বলিল, কি ভাবছেন বলুন ত?

ম্লান হাসি হাসিয়া সতীশ বলিল, ভাবছি, অলকা, আমার ভবিষ্যৎ জীবনের দুঃখের কথা। আমার সাহিত্যের সেদিন কি হবে! কি হবে আমার বেঁচে থেকেই বা? অথচ মৃত্যু কত কঠিন।

অলকার সমস্ত মুখে কে যেন কালী বুলাইয়া দিল। বলিল, কিন্তু মৃত্যুর কথা থাক। ভবিষ্যৎ দুঃখের কথাই বা কেন?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সতীশ বলিল, ডাক্তারদের কি মত জান অলকা? আমাকে অন্ধ হতেই হবে, পৃথিবীর এতটুকু আলোও আর সেদিন আমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে না—সমস্ত বৈচিত্র্যই এক নিমিষে যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে নিভে যাবে। জান, সেদিন মৃত্যু হবে আমার আরও লোভনীয়, আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। আচ্ছা অলকা, মরতে চাইলেই মরা যায় না কেন ব'লতে পার?

আর কিছুই অলকা শুনিতে চাহে না, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, ভুল, সমস্ত ডাক্তারদেরই ভুল হয়েছে—অন্ধ হ'তে কিছুতেই পারবেন না আপনি।

একটা হাসির বিদ্যুৎ সতীশের মুখের উপর খেলিয়া গেল, সে বলিল, আমি তাই শুধু লিখতে চাই, আমার সাহিত্যকে বড় ক'রে তুলতে চাই, ওরা কিন্তু বলে 'বেশী লিখলে অথবা প'ড়লে আরও তাড়াতাড়ি আমায় চোখ হারাতে হবে।' হয়ই যদি ত' হ'ক, কি বল তুমি?

অলকা কোন কথাই বলিতে পারিল না। মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়াই সে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সতীশ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, সামর্থ্য যেখানে আছে সেখানে ইচ্ছে থাকে না, আর ইচ্ছে থাকলে সামর্থ্যের অভাব কেন হয় ব'লতে পার? সৃষ্টির এ নিয়ম যে কেন তা' কেউ জানে কি?

অলকা তেমনিভাবেই পড়িয়া রহিল, কোন কিছু জবাব দিবার জন্য মাথা তুলিবার শক্তিও যেন আর তাহার নাই।—

উপেনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়া পড়িলেন।

মালতী দেবী বলিলেন, একেবারে চায়ের টেবিলে যে. আতিথ্যের ত্রুটি কিন্তু হ'তে দেব না বোন্।

উপেনবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, হ্যাঁ, ওই জন্যে চা-ও পাইনি আজ। সবই নাকি এখানে মিলবে। আমার অদৃষ্ট মন্দ বুঝলেন বৌদি, নিজের বাড়ীতে লক্ষ্মী থাকলে কি আর পরের বাড়ীতে ছুটতে হয়? কথাটা বলিয়াই তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে পলকের জন্য চাহিয়াই মুখের এমন একটা ভঙ্গী করিলেন যে, সতীশ পর্য্যন্ত সহজ সুন্দরভাবে হাসিয়া উঠিল।

অলকা চা ঢালিয়া তাঁহাদের দিকে আগাইয়া দিল।

হাসিয়া মালতী দেবী বলিলেন, কাল এই নিয়েই ঝগড়া হ'য়ে গেছে। বললাম ওখানে গিয়েই চা খাবে, সকালটা আমার ছুটি—কিন্তু তা' হবে না এ হাতের চা না খেলে—।

মালতী দেবী হাসিয়া উঠিলেন, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

এতটুকু অপ্রস্তুত না হইয়া উপেনবাবু বলিলেন, ঠিকই ত', দু'বার চা খেতে আর আপত্তি কি? আর ওই সতীশ ভায়াকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না ওই সুন্দর হাতের চা না খেয়ে কোন কাজেই তার মন বসে কি না, বসতেই পারে না যে—তার সাহিত্যও অসম্ভব তা-ও আমি জোর ক'রেই বলতে পারি।

অলকার সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিল। কেমন করিয়া যে এতবড় মিথ্যাটা সত্য বলিয়া আত্মপ্রকাশের সুবিধা পাইয়াছে, তাহা সে বুঝিতেও পারিল না অথচ তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া সত্যকে চাপা দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই যে নাই। ইহাকে গ্রহণ করাও চলে না অথচ সরাইয়া ফেলিবারও কোন উপায় নাই।

সতীশ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দূরের গাছগুলির দিকে চাহিয়া থাকে, উহাদেরই ফাঁক দিয়া একটা পাহাড় দেখা যায়। মনে হয় যেন গাছগুলি পাহাড়টাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু সে যে কতদূরে মিথ্যা তাহা সবাই জানে। কিন্তু এই যে মিথ্যা চক্ষের সম্মুখে ধীরে ধীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে তাহাকে প্রকাশ করিয়া সবাইকে জানাইবার লজ্জা ত' কম নয়। হয়ত' সত্যই লজ্জার কিছুই নাই, কিন্তু নাই যে তাহা বুঝিবে কয়জন?

মালতী দেবী অলকাকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। এই ভয়ই সতীশ এতক্ষণ করিতেছিল, কিন্তু বাধা দিবারও উপায় নাই। সকালবেলাকার ঘটনার পর উদ্বেগ তাহার কমিয়াছিল সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত সে হইতে পারে নাই। কোন্ কথায় কি করিয়া যে আবার সে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া আর একবার নাম ধরিয়া ডাকিতে নিষেধ করিয়া দিবে কে জানে? তথাপি সমস্ত কিছু চাপিয়া রাখিয়া বন্ধুর সহিত আলাপ করিতে হইল।

ভিতরে লইয়া গিয়াই মালতী বলিলেন, একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনি অলকা, সতীশবাবু এত বই লিখেছেন, কিন্তু কোন বই-ই ত' তোমার নামে উৎসর্গ করা হয়নি এ যে কি ক'রে হতে পারে, আমি কিন্তু অনেক ভেবেও বা'র করতে পারিনি।

এই প্রশ্নকারিণীর তীক্ষ্ন প্রশ্নবাণের সম্মুখে কতক্ষণ নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে, তাহাই ভাবিয়া না পাইয়া অলকা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সত্য কথা বলিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু প্রথম দিনের সেই ব্যবহারের পর সমস্তই যে তাহা হইলে একান্ত বিসদৃশ হইয়া উঠিবে তাহাই বুঝিতে পারিয়া সে নিরস্ত হইল। মুখে একটা হাসির ভাব ফুটাইয়া বলিল, একথা আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে বাইরে করলেই কিন্তু উত্তর মিলতো। আচ্ছা আপনারা এখানে আছেন কতদিন?

তাহার এই কথা ঘুরাইবার চেষ্টা দেখিয়া মালতী দেবী বিস্মিত হইলেন। হয়ত ইহাদের দাম্পত্য-জীবন তেমন সুখের নয়, হয়ত কোন একটা ব্যবধান আছে তাদের মাঝে। অথচ ইহাদের কেহই ত' মন্দ নহে। কিন্তু কোন প্রশ্নই না করিয়া তিনি বলিলেন, আছি আমরা এখানে মাসখানেকের ওপর। আর বেশীদিন থাকব না কিন্তু—একটু ভয়ও যে না হয়েছে তা' নয়, ষ্টেশন থেকে তোমাদের বাড়ীটাই একটু বেশী দূরে, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হ'লেও ভয়টা কিন্তু এদিকেই একটু বেশী হবার কথা।

অলকা বলিল, কিন্তু ভয় কিসের? ভয়ের কিছু আছে ব'লে ত' জানি না।

মৃদু হাসিয়া মালতী দেবী বলিলেন, আমরাও ত' জানতাম না। এই কিছুদিন আগে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে, ছেঁড়া জামা কাপড় পরা ভদ্রলোকটিকে দেখে সত্যিই আশ্চর্য্য হয়েছিলাম আমরা। তিনিই ত' ভয় দেখিয়ে দিয়েছেন।

অলকার বুকে কে যেন হাতুড়ীর ঘা মারিতেছিল, সে কোনমতে বলিল, তারপর?

'তারপর?' তিনি বলিলেন, 'রাত্রে একটা গাড়ীর খোঁজ ক'রতে বেরিয়ে ষ্টেশন থেকে গাঁয়ের দিকে আসিবার পথে তাঁর মাথায় কে যেন লাঠি মারে—তাঁর কাছে একটা ছোট হাত-বাক্স ছিল আর সেটাই নাকি ওই আঘাতের কারণ। জ্ঞান হ'লে তিনি নিজেকে এখানকার এক সাঁওতালের বাড়ীতে ছেঁড়া মাদুরের ওপর প'ড়ে থাকতে দেখতে পান। দিনকয়েক পর আমাদের এখানে এসে দশটা টাকা চেয়ে নিয়ে তিনি চ'লে যান —অবশ্য সে টাকা ফেরত পেয়েছি ক'লকাতা থেকে।

কথা শেষ করিয়াই তিনি সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, অলকার মুখের সমস্ত রক্ত কে যেন নিমেষের মধ্যে নিঃশেষে শোষণ করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া অলকাকে ধরিয়া ফেলিলেন—অলকাও তাহার হাতের মধ্যে ক্ষণকাল পড়িয়া থাকিয়া উঠিয়া বসিল। মালতী দেবী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কি করিয়া এবং কি হইলে যে এমন হইতে পারে তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। এ মেয়েটির চলিবার যেন কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা নাই, যেন কেহ কোন পথ তাহাকে বাঁধিয়া দেয় নাই। সতীশ-বাবুর কথা বলিলেও সে খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে না, অথচ অপরের আঘাতের কথা শুনিয়া চেতনা হারাইতে তাহার মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ও লাগে না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল এমন তিনি পূর্ব্বে দেখেন নাই, এমন যে হইতে পারে তাহাও শোনেন নাই।

তাঁহার চীৎকার শুনিয়া উপেনবাবু ও সতীশ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অলকার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, ভয় নেই বোন, একটুতেই ভয় পেলে কি সংসার করা চলে? তারপর সতীশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আপনিই সামলান এবার, যার জিনিষ তার হাতে ছেড়ে দেওয়াই মঙ্গল। আমরা চলি, রোদ উঠে যাচ্ছে।

তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন।

সতীশের দিকে চাহিয়া অলকা বলিল, আপনি কি শোনেন নি তিনি এখানে কি বিপদে পড়েছিলেন?

ঘাড় নাড়িয়া সতীশ বলিল, প্রথমে আমি তাঁর সম্বন্ধে খারাপ ধারণাই করেছিলাম কিন্তু উপেনবাবুর কাছে সমস্ত কিছু শুনে আমি সমস্তই বুঝতে পারি।

অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া অলকা বলিল, খারাপ লোকে খারাপ ধারণাই ক'রে থাকে চিরকাল, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই; কিন্তু তাঁর অত বড় বিপদের কথা জেনেও আমাকে তা' বলেন নি কেন?

ব'লে ত' লাভ কিছু হ'ত না। শুধু শুধু মন খারাপই হ'ত তোমার।'

'কিন্তু আমার ওপর অতটা সদয় না হ'লেই ভাল হয়। আমার লাভ হ'ত কি না হ'ত সে আমি বুঝতাম। আপনার মত লোকের যাতে লাভ—আমার তাতে ক্ষতি সে-কথা আপনি ভুললেও আমি কিন্তু ভুলিনি। ক'লকাতায় আমায় নিয়ে যেতে পারেন কি?'

'বেশ তাই হবে।' সতীশ বাহির হইয়া গেল।

অলকা তখনও শান্ত হইল না, ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

(ক্রমশ)

আসামের রূপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মিশ্‌মি পাহাড়ে

সদিয়া পোঁছিয়া দেখিলাম দাদা আমার মিশ্‌মি পাহাড় অভিযানের সব বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যদিও আগে হইতে বিশেষ খবরাখবর করিয়া কোথাও যাওয়া আমার মোটেই পছন্দ নয়, তবু এ-রাস্তায় চলিতে কিছু কিছু না করিলেও নাকি চলে না। সরকারের ছাড়পত্র লইতে পলিটিকেল অফিসারের সহিত নিজে সাক্ষাৎ করিয়া কারণ দর্শাইতে হয়, কিন্তু দেখিলাম দাদা এ কর্ম্মটিও আমার অনুপস্থিতিতেই সারিয়া রাখিয়াছেন।

পরদিনই ভোর ৭টায় সাইকেলারোহণে মিশমি পাহাড়ের উদ্দেশে ছুটিলাম। এবার 'লোহিৎ ভেলি রোড' ধরিয়া সোজা উত্তর-পূর্ব্বদিকে যাইতে হইবে। সদিয়া হইতে একটি টেলিফোন লাইন এই রাস্তায় ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী বৃটিশ রাজত্বের শেষ আস্তানা থিরলিয়াং পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, রাস্তার মধ্যে মধ্যে কয়েকটি ক্যাম্পে কতকগুলি নেপালী কুলী লইয়া এক একজন পি ডব্লিউ ডি'র কর্ম্মচারী বাস করিতেছেন, ইহা ছাড়া সারা রাস্তায় অন্য কোন জন-মানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, এমনকি শীতকাল ব্যতীত অন্য কোন সময়ে এক ডাকওয়ালা ছাড়া অন্য লোকের চলাচলও বড় একটা দেখা যায় না।

ফাল্গুন শেষ হইয়া সবে চৈত্র সুরু হইয়াছে। আমি শহর প্রান্তের ছোট কুণ্ডিল নদীটি নৌকায় অতিক্রম করিয়া প্রশস্ত ও সুউচ্চ রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। দুই পার্শ্বের বন বন এখানে রাস্তা হইতে প্রায় ২৫ ফুট দূর পর্য্যন্ত কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে। গাছের মাথায় প্রভাতের মিষ্টি রৌদ্র চিক মিক করিয়া উঠিয়াছে, ভোর বেলার পাখীর কাকলী তখনও শেষ হয় নাই। প্রভাতের এই নবীন রূপ ও আবহাওয়ার মধ্য দিয়া একটা পরম উৎসাহে সাইকেল চালাইয়া সদিয়া হইতে পনর মাইল দূরবর্ত্তী 'সুনপুরা' ক্যাম্পে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ক্যাম্পটি ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটি সুন্দর খোলা জায়গায় অবস্থিত। এতক্ষণ নির্জ্জন রাস্তায় সাইকেল চালাইয়া এখানে পৌঁছিয়াই ক্যাম্পের সম্মুখে রাস্তার উপরে দণ্ডায়মান কয়েকটি লোককে দেখিয়া আমি নামিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আসামী ওভারশিয়ারবাবু সহাস্যে হাতের ঘড়ির দিকে চাহিতে চাহিতে অফিস গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"আপনার এখানে পৌঁছাতে দেড় ঘণ্টা লাগল।" খুব আশ্চর্য্যই বটে, দর্শন মাত্র নিতান্ত অপরিচিত একজন ভদ্রলোক আমারই খবর আমাকে জানাইয়া দেয়। বুঝিলাম আমি রওয়ানা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাম্পগুলিতে সংবাদ প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। ওভারশিয়ারবাবু চা পানের অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু আমি রাস্তায় দেরী করিতে রাজী নই তাই দুই একটি কথায় পরিচয় প্রসঙ্গ সারিয়াই আবার রওয়ানা হইলাম।

সুনপুরা অতিক্রম করিয়া যে রাস্তা দিয়া চলিলাম তাহার মূর্ত্তি বড়ই ভয়াবহ মনে হইল, এখানে রাস্তার ঠিক পার্শ্ব হইতেই উঁচু এবং ঘন বন আরম্ভ হইয়াছে, হিংস্র জন্তু জানোয়ারের খাস রাজত্ব এখান হইতেই সুরু। চারিদিক নীরব, পাতাটি পর্য্যন্ত নড়িতেছে না, রাস্তার পাথর নুড়ীর উপর দিয়া চালিত সাইকেল টায়ারের একটানা 'পের্‌-র-র' শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে আসিতেছিল না। ক্রমে রৌদ্রের উত্তাপ বাড়িয়া চলিয়াছে, আমি বেগে সাইকেল চালাইতে লাগিলাম, প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিবার পর একদল মিশমি স্ত্রী-পুরুষকে পিঠে বোঝা লইয়া ঘরের পানে চলিয়াছে দেখিতে পাইলাম। এই নির্জ্জন বনে ইহাদের যেন পরম বন্ধুর মত মনে হইল, আমি সাইকেলের বেগ কমাইয়া দিলাম, প্রথমে গাড়ী দেখিয়া লোকগুলি এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল, শেষে আমার ইঙ্গিতে আমাকে রাস্তার এক পার্শ্বে ছাড়িয়া দিয়া সকলে অন্য পাশ দিয়া চলিতে লাগিল। মানুষ পাইলাম কিন্তু কথা বলিবার উপায় নাই, ভাষা জানি না তবুও আমার দুইদিন সদিয়া বাস কালে আয়ত্ত করা একটি মাত্র কথা 'হানু বয়া' (কোথায় যাইবে) দিয়াই আলাপ আরম্ভ করিয়া দিলাম, কি উত্তর দিল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, তবে অপরিচয়ের আগল ভাঙ্গিয়া দিয়াছি তাই তাহারাও আমাকে নানা প্রশ্ন করিল, কেহই কাহারও কথা বুঝি না, কাজেই কথাবার্ত্তায় তেমন সুবিধা হইল না, ইসারা ইঙ্গিতে যতটুকু সম্ভব ভাবের আদান-প্রদান চলিতে লাগিল। আমি আস্তে আস্তে সাইকেল চালাইয়া তাহাদের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কিন্তু এভাবে চলিলে আমার পোষাইবে না তাই সঙ্গীদের মায়া ছাড়িয়া আবার বেগে সাইকেল চালাইতে হইল। বেলা প্রায় দশটায় ক্লান্ত দেহে সুনপুরা হইতে বার মাইল দূরবর্ত্তী পায়া ক্যাম্পে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে আট দশ বিঘা আন্দাজ খোলা জায়গায় চারিপার্শ্বে সুসজ্জিত মেহেদি গাছের বেড়ার মধ্যে ইন্সপেকশন বাংলো ও অন্য কয়েকটি লাল টিনের সুন্দর পাকা বাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু কোথাও লোকজনের সাড়া শব্দ নাই, ঘোর বনে এই সুন্দর ক্যাম্পটিকে রূপকথার মায়াবী রাক্ষসীর পুরীর মতই মনে হইতে লাগিল। আমি ইন্সপেকশন বাংলোয় ঢুকিয়া পাশ্চাত্য রুচিসম্মত আসবাবে সজ্জিত উন্মুক্ত কুঠরীগুলি একে একে ঘুরিয়া দেখিলাম কিন্তু কোথাও সোনার কাঠি রূপার কাঠির মধ্যে নিদ্রিতা রাজকন্যার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে এঘর সেঘর খুঁজিয়া সরকারী গুদাম ঘরের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী একটি ছোট বাগানে তিনটি নেপালী মহিলাকে আবিষ্কার করিলাম, আমাকে দেখিয়াই মধ্যবয়সী একটি মেয়ে আগাইয়া আসিয়া নেপালী ভাষাকে যতদূর সম্ভব হিন্দীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিল—"আপনি এসেছেন! চলুন ঘরে," বুঝিলাম ইহারাও আমার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত, কতক্ষণ পর ক্যাম্পের চৌকিদারও আসিয়া জুটিল। এখানে একজন নেপালী কর্ম্মচারী কতকগুলি কুলী লইয়া আছেন, তিনি রাস্তার কাজে বাহির হইয়া গিয়াছেন, শুনিলাম বাসায় আমার চা পানের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন তাই বহু চেষ্টায়ও তাহাদের হাত এড়াইতে পারিলাম না। চা রুটির সদ্‌গতি করিয়া আবার রাস্তায় বাহির হইলাম, তখন সূর্য্যদেব তাহার পূর্ণ বিক্রম পৃথিবীর উপর জাহির করিতে লাগিয়া গিয়াছেন, এদিকে আবার পেট ভারি হইয়া গিয়াছিল এ-রোদে যেন আর

দিকে উঠিয়া চলিয়াছে, তাই আগের মত বেগে সাইকেল চালাইতে পারিতেছিলাম না।

পায়া হইতে দুই মাইল অগ্রসর হইয়া প্রশস্ত দিগারু নদী পাইলাম, নদীটির প্রায় অর্দ্ধমাইল পর্য্যন্ত বালিপূর্ণ, অপর তীরের গা ঘেঁসিয়া একটি ক্ষীণ জলস্রোত তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। শুনিলাম বর্ষায় কখন কখনও নাকি এই সমগ্র নদীটিতে প্রলয় কাণ্ড সুরু হয় আর তখন পাহাড়ের অসংখ্য মূলোৎপাটিত বিরাট বৃক্ষের সহিত বহু জংলী হাতীকেও ভাসিয়া

পথের বাঁকে—শ্যামলিমার মাঝে মৃদুকলনাদিনী ঝরণার রহস্যাবৃত মায়া

যাইতে দেখা যায় এই দিগারুর বুকের উপর দিয়া। পায়া ক্যাম্পের মোহরার বাবুর নির্দ্দেশ মত খেয়ার আসামী মাঝি আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বালিচড়ার এপাশে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, আমি অবতরণ করিতেই সে নিঃশব্দে আমার হাত হইতে সাইকেলটি লইয়া বালির উপর দিয়া ঠেলিয়া আগে আগে চলিল, আমি তাহার অনুসরণ করিয়া নৌকায় গিয়া উঠিলাম।

অপর তীরের জঙ্গলের দিকে দেখাইয়া মাঝিকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে বাঘের ভয় কেমন আছে?" সে হাসিয়া উত্তর দিল এখানে নাকি ঝুড়ি ঝুড়ি বাঘ পাওয়া যায়

সাবধান করিয়া দিল পরবর্ত্তী বনে হাতীর আড্ডা খুব বেশী, যেন আগে হইতে ডানে বামে একটু লক্ষ্য রাখিয়া চলি। বুঝিলাম না ডানে বামে যদি হাতী দেখাই দেয় তবে আগে হইতে লক্ষ্য রাখিলে কি ফল হইতে পারে।

মরুভূমিতে একবিন্দু জলের মত এই বনে আমার ক্ষণিকের সঙ্গীটিকে ছাড়িয়া আবার পথ চলিতে লাগিলাম। এবার কয়েক মাইল পর্য্যন্ত রাস্তার দুই পাশে অনবরত কদলী বন চলিয়াছে, অসংখ্য জংলী কলার গাছ তাহাদের লাল রঙে স্ফুটনোন্মুখ মোচাগুলি আকাশ পানে তুলিয়া দিয়া সারা বনময় একটা বিরাট সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে; প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না, একে এই কাঠফাটা রোদে অনবরত ঢালু রাস্তায় চলিয়াছি তাহার উপর হঠাৎ এক এক স্থানে রাস্তার উপরে সদ্য নিক্ষিপ্ত হাতীর বিষ্ঠা ও সদাভগ্ন কদলী বৃক্ষ যাহা হইতে তখনও টস্ টস্ করিয়া রস ঝরিতেছিল এসব দেখিয়া বার বার দেহ মন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই সম্মুখে না হয় দক্ষিণে বামে সদন্ত শুঁড় উচান একটি বিরাট হস্তী কল্পনা করিতে করিতে অবশেষে কদলী বন অতিক্রম করিয়া যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম; কিন্তু তখনও যে নিশ্চিত হওয়ার মত বিশেষ কোন কারণ ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। বামে হিমালয়ের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট জঙ্গলে কি যে আছে আর কি যে নাই তাহা কল্পনা করার চেষ্টাও বৃথা। তবে হস্তীলীলাভূমির সুস্পষ্ট স্থানটি অতিক্রম করিয়া সত্যই যেন একটা আরাম বোধ করিতে লাগিলাম এ বনের অন্য প্রাণীকেও যে ভয় করিয়া চলিতে হইবে তাহা বোধ হয় তখন ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। মানসিক চাঞ্চল্য দূর হইল বটে, কিন্তু দৈহিক ক্লান্তি আবার প্রবল হইয়া উঠিল, সাইকেলে আর বেগ দিতে পারিতেছিলাম না, অতি আস্তে আস্তে চালাইয়া সদিয়া হইতে ৩৭ মাইল দূরে অবস্থিত 'তেজু' ক্যাম্পে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সেখানকার সরকারী কর্ম্মচারী শ্রীযুত দুর্গানারায়ণ ভজু আমার পথপানে চাহিয়া আছেন, সাইকেল দেখিয়াই অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং প্রথম সম্ভাষণেই জানাইলেন, আমার যে সময়ে এখানে পেঁছো উচিত ছিল তাহা হইতে এক ঘণ্টা দেরী করিয়া ফেলিয়াছি।

এক সঙ্গে দুই গ্লাস শীতল জল পান করিয়া এবং একটু সময় বিশ্রাম করিয়াই আবার রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু ভজু মহাশয়ও আতিথি সৎকার না করিয়া ছাড়িবেন না; তিনি পূর্ব্ব হইতেই লুচি মাংসের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, জিনিষ দুইটিই আমার তখনকার শারীরিক অবস্থার পক্ষে উত্তম বটে। বেশ গুরু ভোজনই হইল তাই এখানে প্রায় দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম।

শ্রীযুত ভজু আমাকে পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তিনি নেপালী হইলেও আমার সহিত পরিষ্কার বাঙলায়ই কথাবার্ত্তা বলিলেন, তাঁহার বাঙলাভাষা-প্রীতির আরো পরিচয় পাইলাম সেল্ফে সাজান বহু ভাল ভাল বাঙলা বই দেখিয়া, তিনি তাঁহার এই নির্জ্জন ...

আলাপ আলোচনায় অতি দ্রুতই যেন আমার তেজ্‌বাসের দুইটি ঘণ্টা কাটিয়া গেল। বেলা একটায় আবার পথে বাহির হইলাম, এখানেও কিছু দূর পর্য্যন্ত জঙ্গলের রূপ দিগারু তীরের মত, বোধ হয় আরো ভয়ঙ্কর কারণ এখানে সাবধানে চলিবার বাণী সদিয়া হইতেই শুনিয়া আসিয়াছিলাম। প্রস্তরময় ঝরঝরে শুকনা তেজু নদীর তীর ধরিয়া প্রায় তিন মাইল পথ চলিবার পর রাস্তা পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল, এখানে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া সাইকেলের পেডেল ঘুরাইয়া চলিলাম, কোথাও একটু থামাইলেই একপার্শ্বে কাত হইয়া পড়িয়া না হয় পিছনের দিকে হটিয়া যাইতে হয়, কাজেই পেডেল অনবরত ঘুরাইয়াই

পাহাড়ী পথের নদীর উপর সেতু—নদীটি এখন শুষ্ক দেখা যাইতেছে, কিন্তু বর্ষণের পর অথবা তুষার বিগলনের পর অতি খরস্রোতো-ধারা নদী তীর পূর্ণ করিয়া ছাপাইয়া যায়।

চলিতে হইল, কিন্তু এভাবে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না, সাইকেলও অতি মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। এক ঘণ্টায় তেজু হইতে প্রায় ৪ মাইল রাস্তা গিয়াই সাইকেল ঠেলিয়া হাঁটিয়া চলিলাম, দারুণ রৌদ্রে এই বোঝা ঠেলিয়া পর্ব্বতারোহণ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, তবে এরূপ স্থানে সাইকেল বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য পরবর্ত্তী ক্যাম্প ডেনিং হইতে একটি কুলী পাঠাইবার ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্ণেই করা হইয়াছিল তাই প্রতি মুহূর্ত্তেই আমি সেই অজানা বন্ধুটির দর্শন আশা করিতে করিতে প্রাণপণ শক্তিতে সাইকেল ঠেলিয়া চলিলাম। কিন্তু এক মাইল রাস্তা এভাবে অগ্রসর হইয়াও কোন জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, অগত্যা সাইকেলটিকে রাস্তার পার্শ্বে একটি বৃহৎ বৃক্ষমূলে হেলান দিয়া রাখিয়া শুধু হাতেই হাঁটিয়া চলিলাম।

তখন সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছেন, রাস্তার নীরবতা যেন ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া চলিয়াছে, পাথুরে রাস্তায় নিজের পায়ের শব্দ নিজের কানেই অস্বাভাবিক ঠেকিতেছিল আর জঙ্গলের ভিতরে পাতাটি পড়ার শব্দ হইলেও আঁৎকাইয়া উঠিতেছিলাম। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তায় আরো এক মাইল চলিয়া একটি বাঁক অতিক্রম করিতেই প্রকৃতির এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে নেপালী কুলী সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, সে এতক্ষণ তাহার কুকুরটিকে পাহারায় নিযুক্ত রাখিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় আরামে নিদ্রা যাইতেছিল, কুকুরের ডাকে হঠাৎ চোখ মেলিয়াই একটি সেলাম ঠুকিয়া দিল বটে, কিন্তু আমাকে শুধু হাতে দেখিয়া একটু ইতস্ততঃ পড়িয়া গেল, শেষে আমি আরো এক মাইল পিছনে সাইকেল রাখিয়া আসিয়াছি বলিলে বুঝিতে পারিল সে যাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে আমি সেই। সঙ্গে সঙ্গেই সাইকেল আনিতে ছুটিয়া চলিল, প্রভুভক্ত কুকুরটিও প্রভুর অনুসরণ করিতে ভুলিল না। ঝরণার অপর তীরে রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় একটি তৃণাচ্ছাদিত পরিষ্কার সমতল জায়গা দেখিয়া আমি সেখানে বিশ্রাম করিতে বসিলাম। এই পথশ্রমে যে আমার চক্ষু দুইটিও বিশ্রাম চাহিতেছিল তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, যখন বুঝিলাম তখন আমার সাইকেল বাহকের কুকুরটি আবার ঘেউ ঘেউ রবে নিস্তব্ধ বনের নীরবতা ভঙ্গ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। ঘোর নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম সাইকেল সহ কুকুরের প্রভুও সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, সে অনুযোগের সহিত জানাইল আমার এখানে ঘুমাইয়া পড়া উচিত হয় নাই, ইচ্ছা হইতেছিল বলি তুমিও ত এতক্ষণ এখানে এ কর্ম্মটিই করিতেছিলে! কিন্তু তাহার বিশ্বাসী পাহারাদারটির কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় আর বলা হইল না, জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে বাঘের উৎপাত আছে নাকি?" সে আঙ্গুল দিয়া অদূরবর্ত্তী ঝরণাটি দেখাইয়া বলিল—"ভল্লুক মাঝে মাঝে জল পান করিতে আসে," পরে বলিল, বাঘ এখানে যথেষ্টই আছে তবে ইহারা মানুষকে কিছু করে না। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম, চেহারায় দৃঢ় বিশ্বাসের কি নির্ব্বিকার চিহ্ন।

অগ্রে সাইকেল ঠেলিয়া সঙ্গীটি চলিল, আমি নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম, শীতকালে এ-রাস্তায় মোটর চলাচল করে কাজেই রাস্তা বেশ প্রশস্ত, কিন্তু অত্যন্ত বক্রগতিতে পাহাড়ের গা বাহিয়া ক্রমশ উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। কতক্ষণ চলিয়া সঙ্গী পাহাড়ের খাড়া গায়ে পায়ে-হাঁটা একটি জংলী সরু পথ দেখাইয়া বলিল, এ-রাস্তায় গেলে তিন মাইল যাইয়াই 'ডেনিং' ক্যাম্প পাওয়া যাইবে, কিন্তু সরকারী রাস্তা ধরিয়া চলিলে অন্তত ছয় মাইল হাঁটিতে হইবে, আমি ইচ্ছা করিলে ফাঁড়ি রাস্তায় যাইতে পারি, তবে সে সরকারী রাস্তায়ই যাইবে কারণ সাইকেল লইয়া খাড়াই ভাঙ্গিয়া চলা অসম্ভব। সঙ্গীটিকে ছাড়িতে আমার মোটেই ইচ্ছা হইতেছিল না তবুও দীর্ঘ পথ চলার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ফাঁড়ি রাস্তাই ধরিলাম, বিশেষত বেলাও তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, যত সত্বর সম্ভব আস্তানায় পৌঁছিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম। আবার বনপথের একা পথিক হইয়া পড়িলাম, বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বে সঙ্গী আবার চীৎকার করিয়া উপদেশ দিয়া গেল—যেন টেলিফোন লাইনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলি, তবেই আর জঙ্গলে পথ হারাইবার ভয় থাকিবে না। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,

ফাঁড়ি রাস্তায় চলিয়াছে। কখনও চড়াই ভাঙ্গিয়া কখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন সমতল জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিয়া এবং বার-কয়েক সর্পগতি সরকারী রাস্তা ডিঙ্গাইয়া অবশেষে বর্ষাদিনের হঠাৎ মেঘমুক্ত সূর্য্যালোকের মত পাহাড়ের প্রকাণ্ড খোলা গায়ে সুসজ্জিত ডেনিং ক্যাম্পটি দৃষ্টিগোচর হইল, সূর্যদেব তখন দিবাশেষের শেষ আলো দান করিয়া বিদায় লইবার উপক্রম করিয়াছেন। আমি ক্যাম্প মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র সম্মুখবর্ত্তী একটি ঘরের বারান্দা হইতে যিনি হাসিমুখে আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন, তাঁহার সহিত অতীতে আর কোনদিন সাক্ষাৎ না হইলেও চিনিতে ভুল হইল না যে, ইনিই অগ্রজবন্ধু শ্রীযুত গোপিকাবাবু, 'ডেনিং'-এর দুইজন মাত্র বাঙালী অধিবাসীর মধ্যে ইনি অন্যতম।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই শুনিলাম টেলিফোনের মধ্য দিয়া সদিয়া তেজু ও ডেনিং-এ হুলুস্থুলু ব্যাপার বাধিয়া গিয়াছে, আমি নাকি নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে প্রায় দুই ঘণ্টা দেরী করিয়া ফেলিয়াছি। তেজু পর্য্যন্ত আমার উদ্দেশ মিলিয়াছে, বেলা একটায় তেজু ত্যাগ করিয়াছি তারপর প্রায় পাঁচ ঘণ্টা যাবৎ আমার আর কোন পাত্তা নাই, অথচ তেজু হইতে ডেনিং যাইতে তিন ঘণ্টার বেশী কিছুতেই লাগিবার কথা নয়, সকলেই চিন্তিত। গোপিকাবাবু রাস্তায় আরও লোকজন পাঠাইতে যাইবেন, অমনি নাকি আমার দর্শন মিলিল। সঙ্গে সঙ্গে সদিয়ায় সংবাদটি পাঠাইয়া দিয়া আমাকে লইয়া তিনি বাসায় ঢুকিলেন, তাঁহার অচেনা কাকাবাবু দর্শনপ্রার্থিনী কন্যা দুইটি ও তাহাদের জননী সারাদিন যাবৎই নাকি আমার পথপানে চাহিয়া আছেন। নির্জ্জন বনে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়া আসিয়া এই বাঙালী পরিবারের চিরপরিচিত স্নেহ সম্ভাষণে পথশ্রম ভুলিয়া গেলাম। পূর্ব্বে হইতেই আমার আহারাদি প্রস্তুত ছিল, এমন কি স্নানের জন্য গরম জলটি পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই, তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া সেদিনকার মত বিশ্রাম লইলাম।

পরদিন ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করিয়াই বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, নূতন রাজ্যে আসিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া থাকা মোটেই পছন্দ হইতেছিল না। এদিকে আবার এই চৈত্রমাসেও এখানে বেশ শীত বোধ হইতেছিল, বাহিরে কুয়াসাও পড়িতেছিল যথেষ্টই, একখানা চাদর গায়ে জড়াইয়া ক্যাম্পটি দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

ডেনিং-এ আসিয়া প্রথমেই নজরে পড়ে সম্মুখস্থ সুউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর দিকে। ভারত সীমান্তের উত্তর ও পূর্ব্বপ্রান্তে বিস্তৃত বিশাল পর্ব্বতমালা ডেনিংক্যাম্পের ঠিক উত্তর-পূর্ব্ব-দিকে একটি সুস্পষ্ট সমকোণ সৃষ্টি করিয়া বিভিন্নমুখে পাহাড়ের পর পাহাড় অসংখ্য ঢেউ তুলিয়া ক্রমে জমাট বাঁধা মেঘপুঞ্জের মত দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। সদিয়া হইতে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত এই ডেনিং-ক্যাম্পের ত্রিভুজাকৃতি স্থানটি প্রকৃতির এক অপরূপ সৃষ্টি বলিয়াই মনে হয়। এখানে দাঁড়াইলে, ভগবান কি অপূর্ব্ব কৌশলে পর্ব্বতপ্রাচীর দ্বারা ভারতের দুইটি দিক ঘিরিয়া রাখিয়াছেন তাহা সত্যই প্রত্যক্ষ করা যায়। উত্তর ও পূর্ব্বের দুই বিভিন্নমুখী পর্ব্বতমালার মিলনক্ষেত্রের নীচে পর্ব্বতের ঢালু গাত্রে ডেনিং-এর অবস্থিতি, এখান হইতেই পাহাড় প্রাচীরের মত সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়া দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছে, আর বিপরীতদিকে ভূমি ক্রমশ নিম্নে নামিয়া গিয়া বিশাল ভারতের সহিত মিশিয়াছে। একটি পাহাড়-কাটা সর্পগতি সরু রাস্তা সম্মুখের পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অপর-পার্শ্বস্থ নিম্ন উপত্যকার টিডিং নামক নদীর তীর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং এই রাস্তায় ও ডেনিং হইতে ১২ মাইল দূরে পর্ব্বতের শীর্ষদেশে 'হেরাই' এবং ২০ মাইল দূরে টিডিং তীরে 'থিরলিয়াং' এই দুইটি ছোট ক্যাম্প আছে, তবে ডেনিংকেই বৃটিশ ভারতের শেষ সীমা বলা যায়, এখানেই বৃটিশের শেষ সৈন্যশিবির, একজন সেনানায়কের অধীনে ৫০ জন গুর্খা সর্ব্বদা এখানে মোতায়েন আছে, শুধু খবরা-খবরের জন্য এবং বোধ হয় ভবিষ্যতের বৃহত্তর আশায় পরবর্ত্তী ২০ মাইল রাস্তা পর্ব্বতের উপর দিয়া টানিয়া নেওয়া হইয়াছে।

ডেনিং-কেম্পের মোট লোকসংখ্যা দুইশতের অধিক নহে, তবুও এ রাস্তার অন্যান্য ক্যাম্পের তুলনায় খুবই বেশী বলিতে হইবে। অধিকাংশই নেপালী, অন্য জাতির মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র বাঙালী পরিবার, একজন আসামী ডাক্তার এবং একমাত্র মারোয়াড়ী দোকানে দুই-তিনজন মারোয়াড়ী আছেন। এখানকার অধিবাসী সকলেই যেমন সরকারী কর্ম্মচারী তেমনি তাহাদের বাড়ীঘর হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব-প্রয়োজনই সরকারী ব্যবস্থায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ রাস্তার অধিবাসীদের খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রতিমাসে লোকসংখ্যা অনুপাতে সদিয়া হইতে প্রেরিত হয়, তবে ডেনিং-এ একটি মারোয়াড়ী গোলা থাকায় প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল সর্ব্বদাই এখানে মজুত থাকে, কিন্তু অন্যান্য ক্যাম্পে বিশেষভাবে ডেনিং-এর পরবর্ত্তী ক্যাম্প দুইটিতে কখনও অতিথি সৎকারের প্রয়োজন হইলে অধিবাসীদের নিজের খোরাক হইতে ভাগ করিয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই, কারণ সেখানে সপ্তাহে সপ্তাহে কুলীর পিঠে করিয়া প্রয়োজনমত রেশন নেওয়ার ব্যবস্থা, যে রাস্তায় শুধু শরীরটি লইয়া আরোহণ করাও সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে সেখানে প্রয়ো-জনাতিরিক্ত বোঝা বহিতে কেহই রাজী হয় না।

ডেনিং-কেম্পের নিকটে কোন নদী, ঝরণা ইত্যাদি নাই, তবে কেম্প হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী ঝরণা হইতে বাঁশের নলের সাহায্যে জল সরবরাহের যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ইহাতে ক্যাম্পে কখনও বিশুদ্ধ জলের অভাব হয় না। পাহাড়ী জাতি মাত্রেই এই উপায়ে জল সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া থাকে, এখানে দেখিলাম, আমাদের সুসভ্য সরকার বাহাদুরও পাহাড়ীদের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন।

বৃটিশ রাজত্বের শেষ সীমা এই দুর্গম পাহাড়ের নির্জ্জন কোলেও সভ্যজগতের দুইশত নর-নারী তাহাদের সমগ্র প্রয়োজনের খেই মিটাইয়া স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেছে, পারত-পক্ষে কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতির কণামাত্রও থাকিতে দিতে নারাজ। সর্ব্বোপরি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম অধিবাসীদের বারোয়ারী দুর্গাপূজা এ [illegible]

ধর্ম্মঘট

(গল্প)

শ্রীবিমলকান্তি সমাদ্দার

খোয়া-বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে খট্ খট্ শব্দ করে আমাদের গরুর গাড়ী চলেছিল, রাত তখন কত, ঠিক বলতে পারি না; তবে গ্রাম থেকে শহরের বাজারের দিকে চলমান দু'একটা তরকারীর গাড়ীর সঙ্গে ছাড়া আর কোন গাড়ী বা লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। অন্ধকার পথে শুধু গাড়ীর নীচের লণ্ঠনের ম্লান আলো, গরুর গলার ঘণ্টার ঠন্ ঠন্ শব্দ, খোয়ার রাস্তা কাঠের চাকার খট্‌খট্ শব্দ, আর কদাচিৎ বিপরীত দিক থেকে আগত গাড়োয়ানের—"বাঁয়ে, ভাই।"

কি করে ঘুম চোখে এল জানি না। কিন্তু আমি পড়েছিলাম ঘুমিয়ে, ঘুম ভাঙল চাপা গলার কথার আওয়াজে। বাবা বলছিলেন—কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা যদি বল, কাজ আমি অমনি ছাড়িনি, আমাদের অপমানের চূড়ান্ত হ'য়ে গেছে। পিঠের ওপর সাহেবের চাবুক পড়েনি বটে, কিন্তু সারা জীবনটা সে চাবুকের ঘায় ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে গেছে। দুর্ব্বল হ'লেও অন্তরাত্মা এত বড় অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে নারাজ।

মা কথা কইলেন না।

বাবার চাপা গলা আর এক পর্দ্দা উঠল। —ধর্ম্মঘট করার সময় প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল, দল ছেড়ে গিয়ে কখনও একা কাজে যোগ দেব না। বিজয় মণ্ডল, আর কালু মিঞার মত নেমকহারামি করে চাকুরী বজায় রাখা আর যার ধাতে সয়, স'ক্, আমার সইবে না।

—কিন্তু উপোস করে যখন মানুষের দরজায় দরজায় ফিরতে হবে—তখন সইবে।

—তখনও নয়। জোরালো গলায় বাবা জবাব দিলেন।

মিনিট পাঁচেক চুপ-চাপ। কোন কথাবার্ত্তা নেই।

—আমার ভাইয়ের অবস্থাও খুব সুবিধের নয়, জানো।

—জানি। তোমার ভাইয়ের কাছে চিরদিন খোরপোষের অভাবে তোমায় রাখতে যাচ্ছি না,—মাত্র দুটি মাস—

—দু' মাস পরেই যে কাজ হবে, তাই বা কে জানে?

—আর কিছু না হোক কুলিগিরি কেউ কেড়ে নেবে না।

আমার গায়ে একটা কাপড় ঢাকা দিয়ে মা ঈষৎ গম্ভীর ব্যাকুলভাবে বললেন—কিন্তু এর কোন দরকার ছিল না। পেটের ভাত, একটু মাথা গোঁজবার জায়গা, এই যখন জুটছে না, তখন অভিমান কোন কাজের নয়—আর মুখের একটা সামান্য কথাকে অত দাম দেওয়া কি আমাদের মত লোকের শোভা পায়?

বাবা উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন—না, নিজেকে অত ছোট-লোক কখনও মনে করি না। আচ্ছা, তুমি যে বলছ, এটা কি মানুষের কাজ? ওই বিজয় মণ্ডল, ওই কালু মিঞা,—আমার ঘরে কি ওদের চেয়ে বেশী চাল আছে? ভবিষ্যতের জন্যে বর্ত্তমানের কিছুটা অংশ আমাদের ছাড়তেই হবে। ইউনিয়ন ত আমাদেরই, সে ত আর আমাদের শত্রু নয়; এ ঠিক জানি, তার কথা শুনলে আমাদের পথে বসতে হবে না।—

—কিন্তু বসতে ত হল। —মা'র কণ্ঠ কিছু শুষ্ক,

—"হল কি সাধে!" —বাবা উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন,—"দলে দলে ভেড়ার পালের মত যোগ দিলে গিয়ে ইউনিয়নে, নাম সই করলে, চাঁদা দিলে, শেষে কলের মালিকের কাছে যখন ইউনিয়ন এসে খাতা ধরে বললে, 'বড়াই কর না বেশী, তোমার সব মজুর আমাদের দলে, এই দেখ তাদের সই, এই তাদের জমা দেওয়া চাঁদা' তখন ডিরেক্টারেরা একে একে তলব করে পাঠালেন, আর তখন স্রেফ অস্বীকার, 'কস্মিন্ কালেও এ দস্তখত আমার নয়, এ চাঁদা আমি কস্মিনকালেও দিই নি।' ব্যস্ ফুরিয়ে গেল, এই আমাদের ইউনিয়ন, এই আমাদের মজুর শ্রেণী, আর কাজে কাজেই এই আমাদের পরিণাম।"

—কিন্তু যা আছে তাই নিয়েই ত বিচার করতে হবে।

—না, এ অবস্থা ফিরবে। আমাদের যে কি দুর্দ্দশা, তা শুধু খবরের কাগজ পড়ে লোকের বোঝার উপায় নেই। আমরা যখন ধর্ম্মঘট করি, তখন আমাদের পেটের ভাত জোটে না, পরবার কাপড় মেলে না, আর ওদের দশ-বিশ-হাজার টাকা লোকসান হয়, ওদের তাতে কি যায় আসে? সে ধর্ম্মঘটও আবার আমরা পারি না বজায় রাখতে, সমস্ত দেশ থাকে উদাসীন, খবরের কাগজে—ইংরেজীতে বাঙলায় সহানুভূতি জানায়, আমাদের অশিক্ষার জন্যে তারা শুধু দুঃখ করে আর গাল দেয়। ব্যস্, তাদের কর্ত্তব্য ফুরিয়ে গেল।

কিছু কাল চুপ করে থেকে মা বললেন,—কিন্তু আমার ভাই যদি আমায় জায়গা না দেয়, তারপরে এত বড় আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?

—দেবে না? কিন্তু এত জান, আমার অবস্থাও বরাবর এমন ছিল না, দেশে ক্ষেত-খামার ছিল। আর তোমার এই ভাই,—সেদিন অবস্থা এমন ফেরেনি,—একদিন না খেতে পেয়ে আমার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাকে আমি শুধু হাতে ফিরিয়ে দিই নি। রক্তজল-করা পঞ্চাশটা টাকা বিনা সুদে একটা দস্তখতও না রেখে দিয়ে দিলাম।

ভোর বেলা এক মেঠো রাস্তার পাশে আম-সুপারি-কাঁঠাল বনের মধ্যে একটা টিনের সেড্‌ওয়ালা ঘরের সামনে গিয়ে গাড়ী থামল। বাড়ীর দাওয়ায় বসে মামা তামাক টানছিলেন। আমরা গাড়ী থেকে নামলাম, তিনি দেখলেন। কিন্তু এগিয়ে এলেন না, কি একটা কথাও কইলেন না। বাবা আর মা চোখা-চোখি করলেন, আমিও তাঁদের দিকে চাইলাম। অভ্যর্থনাটা যে কি রকম হবে বুঝতে বাকি রইল না।

মালপত্র আমাদের কি-ই বা আছে। যা হোক, সেগুলি নিয়ে গিয়ে বাড়ীর দাওয়ায় উঠলাম। মামা নিবিষ্ট মনে তামাক খাচ্ছেন, কোন কথা বললেন না। মামা নিশ্চয়ই আগেই জানতে পেরেছেন, আমরা আশ্রয়ের ভিখারী। বাবা প্রথমেই কাজের কথা পাড়লেন।

—দুটো মাস ওদের এখানে রেখে যাব ভেবেছি, যামিনী। আমার এখনই চলে যেতে হবে।

—"আমার যে আয় তাতে, ছেলে-পুলে নিয়ে নিজেরই চলে না।" তেমনি তামাক টানতে টানতে মামা উত্তর দিলেন।

বাবা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চাপলেন।

চাই না, টাকাটা দিয়ে দাও।

—দলিল আছে কোন?

বাবা অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে উঠলেন এবং মা তাঁকে ধরে থামালেন। যখন এসে পৌঁছেছিলাম, তার দশ-বার মিনিট পরে সেই গরুর গাড়ীতেই আবার এসে আমাদের চাপতে হল।

কথাবার্ত্তাগুলো আর একটু কম রূঢ়, আর একটু অস্পষ্ট হ'লে কোন পক্ষেরই ক্ষতি ছিল না, মামারও নয়, বাবারও নয়। পাটকলে চাকুরী নেবার পর থেকেই দেখেছি, বাবার মেজাজ বদলে গেছে। এ রকম অল্প কথায় চটাচটি, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে হ্যাঙ্গামা, এ যে তাঁকে দিয়ে কোনদিন সম্ভব হবে, এ আমাদের ছিল কল্পনার বাইরে।

গাড়ী আবার ফিরে চলল শহরের বস্তীতে। আগের সপ্তয়ে দু'দিন কোন রকমে কাটল। মা কোনদিন বাইরের কাজে যাননি। কলের কাজে ছোট বেলায় আমাকে মাঝে মাঝে যেতে হয়েছে বটে, কিন্তু বছর তিনের মধ্যে আমিও কখনো সদর দরজা খুলিনি। এবার এল বাইরের ডাক। কর্ম্মহীন পিতার দিনান্তে ঘর্ম্মক্লান্ত দেহ—নিঃস্ব ভাণ্ডার আর,—সর্ব্বোপরি ক্ষুধার তাড়না আমাদের পথে নামালো।

কারখানার মাইনে করা মজুরের পক্ষে রাস্তায় এসে মাথায় মোট টানা খুব বেশী অসম্মানকর নয় এবং অনভ্যস্ত হলেও অভ্যাস করে নিতেও বেশী সময় লাগে না; একই কাজ, —ঘরের মধ্যে, আর ঘরের বাইরে। যে কাজে শুধু গায়ে খাটতে হয় এবং মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পর্ক যে কাজে নেই, সেই কাজই সকলের চোখে ছোট অন্তত আমাদের দেশে। বাবা ছিলেন সাধারণ মিস্ত্রী-মজুর, তাই ঝাঁকা-টানা দিন-মজুর হ'তে মনটা কেমন কেমন লাগছিল, কিন্তু জীবন-মরণের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে শুধু 'কেমন লাগে' বলে হাত-পা গুটিয়ে থাকা চলল না।

আমাদের পরিবার অশিক্ষিত—বাবা কোনদিন লেখা-পড়ার ধার ধারেন নি, মা-ও তথৈবচ; কিন্তু বস্তীতে থেকে যতটুকু বাঙলা লেখাপড়া সম্ভব, আমি তা' পেয়েছিলাম। বাবা ও মা এত দুর্দ্দিনেও স্বপ্ন দেখতেন, এ মেঘ কেটে যাবে, এবং তাঁদের বরাতে যাই থাক না কেন, আমার অদৃষ্ট ফিরবে; আমি ভাল ঘরে পড়ব, আমার মত মেয়ের এত দারিদ্র্য, দুর্দ্দশা ভগবানের নাকি কখনো অভিপ্রেত হ'তে পারে না। আমাদের বংশ খুব অভিজাত ছিল না, কিন্তু আমাকে তাঁরা তাঁদের সঙ্গে এক শ্রেণীর মনে করতেন না; সাধারণ দিন-মজুরের মেয়ের মত রাস্তায় আমি কখনো বেরোতে পারিনি। আমার এটা খুব ভাল লাগত না, এবং আমার বিদ্রোহ প্রকাশের এই ছিল সময়। মনে হত, আভিজাত্যের অহংকার যদি না করতাম, তবে আমার মজুরীতেও সংসারের উপকার হতে পারত, এমন অনাহারে মরতে হত না।

সেদিন তখন সন্ধ্যাবেলা। মা কতকগুলো বাসন ফেরি করতে গিয়েছিলেন বিকেলে, সবেমাত্র ফিরে এলেন। বাসন-গুলি নামিয়ে রেখে জিরুচ্ছেন।

হয় সূর্য্যাস্তের ঘণ্টা দেড়েক আগে। তারপর সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মজুররা সব ফিরে আসে। জাত বিচারের সাধারণ গণ্ডী এখানে সবাই অনায়াসে ডিঙিয়ে চলে, তার জন্যে কোন প্রচারকার্য্য, কোন অনুরোধ-উপরোধের দরকার হয় না।

পশ্চিম দিকের বুড়ো রতন মণ্ডলের সঙ্গে মজুরদের সন্ধ্যা-কালীন চেঁচামেচি সুরু হয়ে গেছে। ওর বেগুনী-ফুলুরীর দোকান, ওর কাছে না ধারে এমন লোক এখানে কম। কাজ থেকে মজুররা সব ফিরে এলেই রোজ সন্ধ্যায় ও চেঁচিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেয় যে, বস্তীর সকলের কাছে ও পয়সা পায়; অস্বীকার কেউ করে না, তবুও ঝগড়া-ঝাঁটির পরে ধারে বিক্রী করে। সব পয়সা যদি ও আদায় করতে পারত, তবে আর এ বস্তীতে ওর থাকার দরকার হত না। অনেক পাপের ফল ছাড়া এই শুয়োর, মুরগী, ছাগল, মানুষ, গরু, মোষের সঙ্গে এক পরিবারভুক্ত হয়ে এমন ঠিকানা শূন্য জায়গায় থাকতে হয় না।

বংশী কাহারের তাড়ি খাওয়া গলার গান শুনতে পাচ্ছি, আর ওরই সঙ্গে ভেসে আসছে তুলসীদাসী রামায়ণের সীতা বনবাসের খবর হিন্দুস্থানীদের আড্ডা থেকে। হিন্দুস্থানী মেয়েদের হাতে যাঁতা ঘোরার শব্দ তাদের গানের ক্ষীণ আওয়াজকে ডুবিয়ে চলেছে

সন্ধ্যা হওয়া মাত্র প্রদীপ দেখিয়ে নিবিয়ে রেখেছি। অনাবশ্যক আলো ঘরে জ্বালা হয় না। কেরোসিনের ডিবেটা জ্বালা হবে বাবা ফিরে এলে, খাওয়ার সময়। আজকের রাতের খাবারের মধ্যে কিছু চাল ভাজা আর গুড়। সকাল বেলাও এই পথ্য খেয়ে বাবা কাজে বেরিয়েছিলেন।

বাবা ফিরে এলেন। তামাক সেজে দিলাম। বিশ্রাম করছেন তিনি। বাবাকে কোনদিন আর দশজনের সঙ্গে মিশতে দেখতে পেলাম না। তাঁর অশিক্ষা, তাঁর আভিজাত্যের অভাব, তাঁর শত ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁকে একটি সহজ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ওপরে খাড়া দেখেছি। কোন বিপদে আপদে নুয়ে পড়তে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু আজ দিনান্তের খাটুনির পর তামাকে টান দেবার সময় আগুনের আলোয় তাঁর মুখখানা অতি অস্পষ্টভাবে দেখা গেলেও, তখন সে মুখের চেহারাখানি আমি অনায়াসে ধারণা করতে পেরেছিলাম।

অন্ধকারের মধ্যে কার চেহারা দরজার সামনে দেখা গেল।

—"কে?" বাবা কল্কে থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে বললেন।

—আমি বিজয়, যোগীনদা

সেই বিজয় মণ্ডল। আমি অন্ধকারেও বেশ তার মুখের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিটি রেখা যেন দেখতে পেলাম।

—"বস, বিজয়।" বাবা কল্কেখানি তার হাতে তুলে দিলেন। দু-একটা মৃদু টান মেরে বিজয় হাত থেকে কল্কে রেখে দিল।

যোগীনদা, কথা শোন।

—বিজয়—

রাতের মহলা

(বিমানে সাড়ে ছয় ঘণ্টার শফর)

শ্রীসুকুমার চৌধুরী

সাঁঝের আঁধার নেমে আসছিল যখন মিলন তাদের বিমান-মেস্ থেকে বেরিয়ে এল। পশ্চিমের আকাশ নিখুঁত অস্তরবির মায়ায় স্বপ্ন-রঙিন্ হয়ে উঠেছে। মিলনের অবকাশ নেই সে অপরূপ মাধুরিমা দু-চোখে পান করবার। বিমান-ঘাঁটি থেকে পূবালী হাওয়ার স্নিগ্ধ-কোমল পরশ ভেসে আসছে মৃদুল ছন্দে। ওভারকোটের ওপরে বোতাম কটা খুলে দিয়ে সে অমিয় ধারায় ভরপুর করে নিতে চায় সারা দেহ। মঞ্জুল এ সন্ধ্যার আলোছায়ার লুকোচুরিতে ছোট ভাইবোন দুটি তাদের পড়ার ঘরে বসে হয়তো মানচিত্রে এ বিমান-ঘাঁটিরই স্থান-নির্দেশ করছে মিলু-দার কথা বলাবলি করে। ক্ষীণ একটা আগ্রহের রেশ মিলনের মনটিকে টেনে ধরে সুখের নীড়টির লোভনীয় হাতছানির দিকে।

রক্ষী-কক্ষের বাইরে সদাসতর্ক প্রহরী বন্দুকের বাঁটে হাতের চেটোর চাপড়ে 'থপ' করে একটা সম্মানজনক শব্দ তোলে, যন্ত্রচালিতের মতই মিলনের ডান হাতের তর্জনীটি প্রত্যাভিবাদন জানায়। নেহাৎ উপেক্ষাভরেই যেন উচ্চে আকাশের দিকে তাকায় একবার—মনে কিন্তু ভাবে, এমনি ধীর বাতাসই থাক স্থায়ী হয়ে আর আকাশটা মেঘলেশহীন নীল অঙ্গে তারার চুমকি পরে মিটমিট করুক সারা রাত। মিস্ত্রিদের কোয়ার্টার্সের পাশটা কি শান্ত—নীরব, কোথা হতে যেন একটা রেডিও সেটের তরল সুর দূরে রাস্তার মোটর-গাড়ীর ঘর্ঘরের ভিতর দিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে কানে এসে বাজছে থমকে থমকে। রঙিন আকাশ আর মিশকালো ঘাঁটির বক্র ছাদগুলির ফাঁকে বিরাট কুক্ষমূর্তি হাঙ্গারগুলি (Hangars) অস্তরশ্মিজালে আরও ঘোর বীভৎস মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে এক-একটা বিমানের উন্মুক্ত দ্বারপথে নিক্ষিপ্ত নিবিড় শ্বেত আলোর তীব্র জিহ্বা নিশা-বোমা-বর্ষী বিমানগুলির গাত্র মার্জন করছে যেন। শান-বাঁধান চত্বরের বুকে নিশা-বিমানগুলি তোড়জোড়ের তাগিদে অতি ধীরে হামাগুড়ি দিচ্ছে—আর অপর বিমান-দ্বার থেকে মুক্তি-পাওয়া আলো ওগুলোর ছায়াকে ক্রমলম্বমান করে তুলছে।

মিলনের বিমানটিকে ট্র্যাকটরের সাহায্যে টেনে বার করে আনা হচ্ছে—আশ্রয়-শেড থেকে; ট্র্যাকটর-চালক একবার ডানে, একবার বাঁয়ে মাথা হেলিয়ে লক্ষ্য করছে—বিমানের ডানা দুটির নীচে যে দুজন মিস্ত্রি দুপাশে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত করছে, তারা পিছু হটতে বলছে কি না; না—বিমানটি ঠিক নিরাপদে চলে আসছে সে বার্তাই সংকেতে ইসারায় জানাচ্ছে।

মিলন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল বিমানপোতাশ্রয়ের শূন্য মেঝের ওপর দিয়ে আর ফাঁপা মেঝের বক্ষে সে পাদক্ষেপ উচ্চ ছাদগুলিকে পর্যন্ত ঝঙ্কৃত করে তুললো; কোন স্থানে মেরামতের জন্য স্তব্ধ বিমানের পেট ফুঁড়ে চললো সে মাথা হেঁট করে। তার পর অভ্যস্ত নমস্কার জানিয়ে ঢুকে পড়লো ফ্লাইট কমাণ্ডারের অফিসে।

টেলিফোনের যন্ত্রটির পাশে বসে আছে জুনিয়র অফিসার একটি। সমুখের টেবিলে একগাদা ম্যাপ, সেকস্টাণ্ট, রুলার ও অন্যান্য বিমান পরিচালনের গতি নিয়ন্ত্রক যন্ত্র। তরুণ অফিসারটি, সুন্দর কচি মুখখানিতে সদা জাগরূক হাসিরেখা, চোখে দুষ্টামিভরা কৌতুকের ছাপ।

—কে হে, মিলন না কি?

—হাঁ হে সোনার চাঁদ।

—সব ঠিক করে রেখেছি। পথের নক্সা, দূরত্ব, পথের নিশানা। আর এই নাও আবহাওয়া-রিপোর্ট—বেশ ভালই আছে মনে হচ্ছে।

রিপোর্টের কাগজ হাতে তুলে নেয় মিলন। সেও অফিসারের কথায় সায় দেয় মাথা নেড়ে। তারপর কামরার দূর কোণে যে রয়েছে সারা মুলুকের মস্তবড় মানচিত্র, মিলন সেটার কাছে যায়। ছকে দেওয়া পথটি মিলিয়ে নেয়, ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে আসে আপনাআপনি। ম্যাপটির পাশের টেবিলে রয়েছে ছোট ছোট কতকগুলি নকল পতাকা। তা থেকে বেছে নিজের বিমানের মার্কা '×'-ওয়ালা পতাকাটি বার করে। ম্যাপে যেখানে এ বিমানঘাঁটি চিহ্নিত সেখানে পতাকাটি এঁটে দেয়। তারপর ফিরে আসে টেলিফোনের কাছে। রিসিভার তুলে নেয়।

রিসিভারে ভেসে আসে স্কোয়াড্রন্ লিডারের সংক্ষিপ্ত গম্ভীর আওয়াজ—বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় যা হয়েছে সুপক্ক আর দরাজ।

—'দয়াল সিং ওখানে?'

—না, মিলন স্যার। ১৮-৩০ (সাড়ে ছ'টা)-য়ের মহলায় যাবার জন্যে প্রস্তুত। আবহাওয়া রিপোর্ট দেখেছেন স্যার?

—হাঁ ঠিকই আছে, কেমন, না? সব বুঝে নিয়েছ?

—হাঁ, স্যার।

—বেশ বেরিয়ে পড়!

মিলন রিসিভার রেখে দেয়, জুনিয়র অফিসারকে বলে—চল, হুকুম এক্ষণি বেরিয়ে পড়বার। তোমার নাড়িভুঁড়ি বিমানে তুলে দাও।

—তা তুমি যখন বলছো নাড়িভুঁড়ি সঙ্গে নিয়েই যাই। নইলে ভেবেছিলাম রেখে...............

তা একদিন তোমায় হারাতে হবে ও অকেজো জিনিষটি আর তা এ হতভাগার জুতোর ঠক্করে।

ছুটে যায় তারা পরিচ্ছদ কক্ষে। ভেড়ার চামড়ার লাইনিং দেওয়া বুট, বিমান পোষাক, দুই জোড়া করে দস্তানা, ইয়ারফোন সংযুক্ত শিরস্ত্রাণ তৎসহ সংলগ্ন মাইক্রোফোন্, পেনসিল, ফ্লাশ-ল্যাম্প দুটো করে আর প্যারাশুটটি। ব্যস্ পোষাক আঁটা শেষ, কেবল প্যারাশুট্টা থাকে কাঁধের ওপর ফেলা।

জানালার সমুখে দাঁড়িয়ে একবার তাকায় বাইরে বোমা-বর্ষী মনোপ্লেনগুলির দিকে। বীভৎস, তার মনে হয়, এ যন্ত্রগুলোর ডানা দুটো যেন রাক্ষুসে হাত বাড়িয়ে আছে ক্ষুধা-কাতর মহাকালের মত সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে। ক্ষুধা ছাড়া এদের আর লক্ষ্য নেই দ্বিতীয়—এ ক্ষুধার তাড়নায় এরা ধ্বংস ছড়াবে সারা বিশ্বের দিকে দিকে। ভগবান করুন মিলনের যেন এ জাতীয় বিমানে স্থান পেতে না হয়—যার গহ্বরে থাকে শত শত মণ মৃত্যু-বীজ—যার একমাত্র কাজ হচ্ছে মৃত্যু বর্ষণ করা যেখানে পারে অন্ধকারে ঢাকা নগরে।

—সুমার! মিলনের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে যায় 'টারমাক্'-ঢাকা রাস্তার ওপর দিয়ে।

স্যার! অতি দূরে দিগন্ত হতে যেন সাড়া ভেসে আসে শূন্যেতে ভর ক'রে।

ঠিক কর সব।

—ভেরি গুড্ স্যার।

মিলন দোরের দিকে এগিয়ে যায়। যেতে যেতেই শুনতে পায় ফিটার সুমারের হাঁক—'কন্ট্যাক্ট ষ্টারবোর্ড'! অমনি হাজার অশ্বশক্তির মটরে স্পন্দন জাগে। সে স্পন্দনের প্রেরণায় সিলিণ্ডারে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ লাগে একে একে সমভাবে। অপর মটরটিও তারপর ধ্বক্ ধ্বক্ করে ওঠে—এক্‌ঝষ্টস্ (exhausts) দিয়ে ক্ষীণ শিখা উঁকি মারে জিভ বাড়িয়ে বাড়িয়ে।

এতক্ষণে মিলন বিমানটির লেজ ঘুরে হাজির হয় দ্বারে—মটরের একটানা শব্দ বক্ষে তার দেয় দোলা। অপেক্ষমান মিস্ত্রি বিমানের দ্বারটি খুলে ধরে সিঁড়ি নাবিয়ে দেয়। মিলন সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ে। প্যারাশুটটি বেল্ট দিয়ে এঁটে নেয় যথাস্থানে, তারপর একটু নুয়ে নুয়ে চলে পাইলটের আসনের দিকে ঘোর আঁধারে। নেভিগেটরের টেবিল ছাড়িয়ে ওয়ারলেস যন্ত্রের অপারেটরের গা ঘেঁসে চলে—অপারেটর তখন মর্স কোডে তাদের রওনা হবার বার্তা জানায় অফিসে। এক মুহূর্ত তাকিয়ে সে ব্যাপার দেখে মিলন পাইলটের আসনে পৌঁছে। সুমার যে আসনে বসে ছিল, ক্যাপ্টেনকে দেখে সে আসন ছেড়ে দেয় হুইলটি ধরে রেখে, যতক্ষণ না ক্যাপ্টেন ঠিক হয়ে বসে তাতে হাত দেয়। বেশ করে বাগিয়ে বসে রাডার পেডাল্ নিয়ন্ত্রণ করে নেয়, আসনটা সমুখে একটু এগিয়ে গাইরো সচল করে এবং টেলিফোন প্লাগ যথাস্থানে বসিয়ে দেয়। তারপর শোনদৃষ্টি কলকব্জার ওপর রেখে ইঞ্জিন চালিয়ে পরখ ক'রে নেয়। রিভলিউশন্, টেম্পারেচার, প্রেসার—যাচাই করতে সুরু করে আর একটা কঠোর শব্দ প্রস্তর স্তূপের মত উত্থিত হয়, সারা বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাদের, অপর সকল শব্দ ডুবিয়ে দিয়ে কান দুটি তার বধির করে ফেলে। সামান্য কিছুক্ষণ তার মন থাকে কোথায় খুঁত রয়ে গেছে এতটুকু তাই আবিষ্কার করতে—তাই সুইচ টিপতে থাকে আর বন্ধ করতে থাকে পর্যায়ক্রমে। মনটা তার শূন্য, সে ব'নে গেছে যন্ত্রেরই অংশ, কাজ করে চলেছে ভাবনাহীন নিপুণতায়। অবশেষে, সব ঠিক আছে বুঝে নিয়ে ফিটার সুমারকে মাথা নেড়ে ইসারায় আদেশ জানায়। অমনি সুমার ছুটে গিয়ে সিঁড়ি তুলে নেয়, দোর বন্ধ করে ধপাস করে। মিলন নিজের মাইক্রোফোন ঠিক করে নেয়, সুইচ টিপে, তারপর বলে—'পাইলট ডাকছে নেভিগেটরকে।'

জবাব আসে—'ও. কে. ক্যাপ্টেন! প্রথম কোর্স এক আট দুই ম্যাগনেটিক।'

—এক আট দুই ম্যাগনেটিক্। ধন্যবাদ। ওয়ারলেস অপারেটর?

—ও কে, স্যার।

তারপর [illegible]

জিজ্ঞেস করা হ'লে, সে সব কজনাকে জানিয়ে দিলে ঘড়িতে সময় কত এবং বলে দিলে, তাদের ঘড়িতে ও-সময়টার মিল করে নিতে। নীচে থেকে একটা আলোর সংকেতে মিলন বুঝলে ঘাঁটির সঙ্গে বন্ধন খুলে ফেলা হয়েছে, তখন সে-ও বিমানের ব্রেক আল্‌গা করে দেয় এবং থ্রটল্‌স খুলে দেয়। দশ টন এরোপ্লেন অতি ধীরে গতিশীল হয়, আশ্রয়স্থানের বাহিরের অন্ধকারে।

বাহিরে এরোড্রামের ওপরে সারি সারি আলো ক্রমোচ্চ হয়ে মহাশূন্যে মিলে গেছে। ভূমি স্পর্শ করে বিমানটিকে চালিয়ে নিতে নিতে বিমানের শিরে মিলন ফুটিয়ে তোলে তার পরিচায়ক নম্বর X আলোর সাহায্যে।

অমনি এরোড্রোমের ওপরকার আলোর সারির প্রথমটি গ্রিন রঙিন হয়ে যায়—ব্যস্, লাইন ক্লিয়ার সংকেত।

আবার বিমানটি গতি সঞ্চয় করে, আলোর সারির অঙ্কিত পথের নিম্নতম কেন্দ্র হতে বিমানের মস্তক উঁচু দিকে চালিত হয়, উর্দ্ধগতি নিয়ামক লিভার সচল হয়ে।

এখনও ধীর বেগেই বিমান চলে—আলোর সারি পিছিয়ে যায় পাশে পাশে, তারই জরদ আভা উইণ্ডস্ক্রিন ভেদ করে অভিব্যক্তিহীন মিলনের মুখে পড়ে। মিলনের স্থির বদনমণ্ডলে ছাপ নাই কোন চিন্তার। অখণ্ড মনোযোগে সে হুইল সমুখে ঠেলে দেয়—বিমানের লেজটা যথাযথভাবে উচ্চে তুলে আনতে। এবার বিমানের গতিবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, সারির শেষ আলোটি বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে যেন। বিমানের গমনভঙ্গীতে মনে হ'ল তার বিমানটি হাওয়ার টানেই প্রায় ছুটে চলেছে, এবার হুইলটি নিজের কোলের দিকে স্পর্শ করে নিলে। অমনি দুবার নেচে উঠে বিমান চললো আঁধার ফুঁড়ে উঁচু দিকে।

মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে মিলন চট্ করে একবার আকাশটা দেখে নিলে এবার তথা। আবার নজর দিয়ে চললো রিভলিউশন, হাওয়ার গতি জানতে রেগুলেটরের ওপর; তাতে করেই সে বুঝতে পারে, বিমানটা মাথা-লেজ সমস্তরে রেখে উঠে যাচ্ছে কি না।

তার মাথার ওপরকার যে আলোটা নেভিগেটরের দিকে সন্ধানী আভা ফেলে, সেটা দেখলে নেভিগেটরের মনোযোগ আকর্ষণ করে; তারপর বুড়ো আঙ্গুলটা আলোয় তুলে ধরে হাতটা বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে সংকেত করে। নেভিগেটর সে ইসারা ওয়ারলেস অপারেটরকে জানায়। অপারেটর মাথা নেড়ে সায় দেয়—দেড়শ ফুট ট্রেলিং এরিয়েল ছেড়ে দেয়।

দু' হাজার ফুট উচ্চে ওঠা হলে সে প্রথম কোর্স আরম্ভ করে। ঠিক সাড়ে ছ'টায় সে বিমান ঘাঁটি ছেড়েছে। আবার মিলন বুড়ো আঙ্গুলে দেখায় নেভিগেটরকে, সে ষ্টপ্-ওয়াচটি টিপে চালিয়ে চলে যায় তার টেবিলে, যেখানে ম্যাপ আর যন্ত্রপাতি রয়েছে দিক্ নির্ণয়ের।

ঐ নীচে—রসাতলে যেন পড়ে রয়েছে, স্বচ্ছন্দে আলোর গুচ্ছ, যা হ'ল বিমান ঘাঁটির প্রতীক, তার চারপাশের গ্রামগুলির প্রতীক। রাতের কালো গহ্বরে যতই এগিয়ে যায়,

আবছা প্রতিফলিত অগণিত আলো, যাকে বুঝতে হবে শহর বলে, তার চেয়ে তারাগুলোই যেন এখন বেশী বাস্তব; তেমনি নিজস্ব বাস্তবতায় স্বতন্ত্র এক ক্ষুদ্র বিশ্ব যেন এ বিমানটি —আকাশের নিবিড় কৃষ্ণ শূন্যতার মাঝে।

কিছুক্ষণের ভিতর তারা একটা সাগর তীরের বন্দরের ওপর দিয়ে চলে যায়। এ বন্দর তার জানা। দিনের আলোয় এর অপরিচ্ছন্ন জেটি, ধোঁয়ায় ঢাকা বস্তি, রং-জ্বলা দোতলা বাড়ীগুলি—চোখে যেন বাধে। কোন রকম একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ে যেন এঁকে গড়ে তোলা হয় নি। চারিপাশের পল্লীর রমণীয় শ্যামলিমার মাঝে এটা যেন অবাঞ্ছিত চক্ষুশূল। কিন্তু এখন রাতে তারা শহরটার মাথার ওপর দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেল—কি সুন্দর শৃঙ্খলায় রাস্তার আলোগুলি সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আবার তা থেকে সরু আলোর শাখা কাটাকাটি করে বেরিয়ে মনোহর নীল আর সবুজের ডোরা এঁকে দিয়েছে। সারা শহরটা আকারে যেমন বড়, তেমনি আশপাশের পল্লীর গাঢ় অন্ধকার থেকে আলোর মালায় গণ্ডী ঘেরা। জেটিগুলোর কাছে এসে হঠাৎ আলোর সারি সমাপ্ত হয়েছে—সেগুলোর প্রতিবিম্ব সাগরজলে যেন হাজার জোনাকি ছেড়ে দিয়েছে।

মটর দুটির একঘেয়ে স্থায়ী গর্জন কলরোলের এমন এক পটভূমি সৃষ্টি করলো, যার ভীষণতা শুধু মাঝে মাঝে তার অবচেতন শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রভাব বিস্তার করে; নতুবা সে অপার ঘর্ঘরও যেন তার কাছে অশ্রুতই থেকে যায় একঘেয়েমির জাদুতে। কয়েক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর তার দৃষ্টি একে একে সকলগুলি যন্ত্রের ওপরই পতিত হয়—প্রতিটি কম্পমান, জ্যোতিষ্মান্ সূচ অবধি যথাস্থানে রয়েছে কি না, লক্ষ্য করতে, অপর দিকে তার পদদ্বয় বিমানটির গতির ইন্ধন জুগিয়ে চলে সমানভাবে।

অসীম সাগরের বুকে ভাসমান জাহাজ হতে যেমন দেখা যায়, নীল জল ফুঁড়ে দেখা দেয়, এক এক ডেলা সি-উইড্, আর পর মুহূর্তে ত্বরিৎগতিতে পশ্চাতে চলে যায় জাহাজের এক পাশ দিয়ে। তেমনি নিরাকার অন্ধকারপুঞ্জের ওপর দিয়ে চলেছে বিমান, হঠাৎ দূরদিগন্তে একটা ক্ষুদ্র গুচ্ছ ফুটে ওঠে আলোর হয়তো সে একটা শহর বা সমৃদ্ধ পল্লী; পর মুহূর্তে বিমানের এক পাশের ডানার আড়ালে পড়ে মিলনের দৃষ্টির বাইরে লুকিয়ে যায়—যে অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল রেখায় মাথা উঁচিয়ে ধরেছিল আলোর গুচ্ছ, আবার সেই অন্ধকারেই যেন চাকতে গা-ঢাকা দেয়। শেষ গা-ঢাকা দিবার আগে মিলনের চোখের সমুখে স্বপ্নরাজ্যের দোকানের তীব্র আলোগুলি যেন আছড়ে পড়ে পথের ধুলায়—পাশে পাশে চৌকা, লম্বা ছায়া ফিল্মের কালির মত গড়ে তুলে। সে এক মুহূর্তে মাত্র। পরক্ষণেই যে স্নিগ্ধ আঁধার কালো পরিবেশে তাদের বিশ্ববিহীনতার মাঝে বয়ে নিয়ে চলেছিল, সে ঘোর কৃষ্ণ আবেষ্টনের গহ্বরে ফিরিয়ে আনে—মুহূর্তের জন্য আলোর চমকে নীচেকার মাটির ধরার বাস্তব মূর্তিটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে। (ক্রমশ)

ধর্ম্মঘট

(২৮৩ পৃষ্ঠার পর)

কাল শেষ তারিখ যোগীনদা। ওরা জানিয়েছে যে, ধর্ম্মঘট যারা করেছে, কাল পর্য্যন্ত যোগ দিলেও ওরা তাদের নেবে।

বাবা কথা কইলেন না।

—দ্যাখ যোগীনদা, এই যে ধর্ম্মঘট হল, এতে ওদের কি এসে যায়? বড় জোর দশ-বিশ-ত্রিশ হাজার ওদের লোকসান, এই ত? তা' ওরা টেরই পায় না। আর আমাদের যায় দশ-পনের টাকা, কিন্তু ওই দশ-পনের টাকার জন্যে আমাদের উপোস করতে হয়। বোঝই ত সব।

বিজয় বলতে লাগল। "তারপর ধর—হল ধর্ম্মঘট। দেশে কি আর লোকের অভাব যে, আমরা নইলেই ওদের গোকুল আঁধার হয়ে যাবে? তারপর এই যে আমি কালু, এরা কয়েকজন লোক নিয়ে কাজে রয়ে গেলাম, এ কিসের জন্যে? ইউনিয়নকে ভালবাসি না? নিজেদের জোর কোথায় বুঝি না? কি করি বল যোগীনদা, অতগুলি পুষ্যি নিয়ে উপোস করে মরব? দেখে শুনেও অন্ধ হয়ে আছি, জিভ থাকতেও বোবা হয়ে আছি। লেখাপড়া জানা বাবুরা ত শুধু সভা করে, আর কাগজে লেখে। আবার বলে আমরা ছোট জাত নয়, অভিযোগ নিজেদের চোখে দেখ্, চোখ বুজে থাকিস নে, তারপর তাই দেখে আমাদের বাঁচবার একটা রাস্তা করে দে, আগে প্রাণে বাঁচি, তা' নয় হাতের ছোঁয়া জল খাবেন বাবুরা! ওঃ! তবে ত আমরা ধন্য হয়ে গেলাম।

একশ্বাসে এতগুলো কথা বলে বিজয় মণ্ডল হাঁপাতে লাগল। তারপর কিছুকাল চুপ করে থেকে বললে।

—কি বল যোগীনদা। আর এদিক-ওদিক কর না, কাল আবার নেমে পড়। আমাদের অতটা অভিমান শোভা পায় না।

—কোন কিছু কথা কারো মুখে নেই।

নীচু গলায় অস্পষ্টভাবে বাবা বললেন,—"কখন যেতে হবে?"

—"দশটা থেকে বারোটার মধ্যে দেখা করতে হবে—" বিজয় মণ্ডল উত্তর করল।

"তাই হবে বিজয়। কাল যাব।" ভারী মোটা আওয়াজে শুক্নো কথা ক'টা বেরিয়ে এল।

দীর্ঘ দিনের দারিদ্র্য, অনশন, অনিদ্রা যাঁর চোখে মুখে নিজের বিজয়ের ছাপ আঁকতে পারে নি, মাত্র এই ক'টা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই চোখের জল রৌদ্রতাপ মুখের উপর

ক্রন্দসী

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

(৬)

ষ্টোভে চায়ের জল চড়ান ছিল। ইভা মাসখানেক হইল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। শশাঙ্ক মেসে থাকিয়া ল' পড়ে। আর মাস-দুই পর তাহার শেষ পরীক্ষা। এমন অসময়ে চায়ের জল চাপানোর কারণ আজ শনিবার। কলেজ সারিয়া বেলা আড়াইটা আন্দাজ তাহার এখানে আসিবার কথা। ইভা ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চাহিতেছিল। এমন সময় বাহিরে একটি প্রিয় পরিচিত জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল।

চা খাওয়া শেষ হইলে শশাঙ্ক কহিল, "বাবা বাড়ী যেতে লিখেছেন। তোমাকে শুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে।"

ইভা কহিল, "আমার কোন আপত্তি নেই।"—একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আপন মনে হাসিয়া উঠিল।

"সত্যি এত হাসি পায় সেখানকার কথা মনে পড়লে। আর এত মায়া হয় ওদের কথা ভেবে। শুধু খাওয়া আর ঘুমানো এবং প্রবল উৎসাহে পরচর্চ্চা করা, এ-ছাড়া আর তো কিছু নেই ওদের জীবনে। আমাকে নিয়ে যেতে চাও, চল। কিন্তু আমি শুধু এই মনে করে ধৈর্য্য ধরে থাকি, বেশিদিন তো আর থাকতে হবে না। মাস দুই পর ল'য়ের খবর বা'র হলেই তুমি ব্যারিষ্টারি পড়তে বিলেত যাবে। আমিও কলকাতা চলে আসব।"

শশাঙ্ক বলিল, "কিন্তু বাবার ইচ্ছা অন্যরকম। তিনি চান আমি যে সময়টা বিলেত থাকি সে সমস্ত সময়টা তুমি ওখানেই থাক। তাঁর বৌমাকে নিয়ে তিনি কি একটা করবেন মনে মনে ফন্দী আঁটছেন। নানারকম কল্পনা আছে তাঁর।"

ইভা হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে কহিল, "তাঁর যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। তাঁর এ সংস্কারের ঝোঁক কতদিন থাকে দেখা যাবে। একবার হাতে কলমে কাজে নেমেই দেখবেন, যা মজা। আমি দু'দিনেই টের পেয়েছি। কিন্তু তোমাদের ইন্দু মেয়েটি বড় ভাল। অল্প দিনেই আমার সঙ্গে এত ভাব হয়েছিল। তার অমন জায়গায় বিয়ে দিলে কেন? স্বামীটার তো দেখলাম অনেক বয়স। বাড়ীর অবস্থাও তেমন ভাল নয়। মুখের ভাব দেখলেই লোকটার উপর অশ্রদ্ধা হয়ে যায়।"

"কি জানি। মেয়েদের আপন আপন ভাগ্য। ইন্দুর বাবার অবস্থা ভাল নয়। কুলীন দেখে দিলেন, না কি ভাল মনে করলেন আমি ঠিক জানিনে। ওসব বাজে কথা রাখ। আজ বেশ খানিকটা অবসর পেয়েছি, লেকের ধারে একটু বেড়াতে যাবে?"

"চল। দাঁড়াও আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি।"—ইভা কাপড় ছাড়িতে যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, "দিদিমণি একজন কে মেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বললেন তোমার বন্ধু। এই কাগজে নিজের নাম লিখে দিয়েছেন।"

ইভা পড়িল, এক টুকরা কাগজে লেখা আছে, "রেবা মুখার্জ্জি।"

শশাঙ্ক নিরুৎসাহকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কে গো মেয়েটি? আজ দেখছি আমাদের বেড়ানটাই মাঠে মারা গেল।"

ইভা একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া মিনতির সুরে কহিল, "রেবা। আমার বিশেষ বন্ধু। আমি চট্ করে ওর সঙ্গে দেখা করে আসি। তুমি ততক্ষণ রবিবাবুর 'মানসী' বইখানা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া কর। আমি এখনই আসব। তারপরে বেড়াতে গেলেই হবে। এখনও ঢের বেলা আছে।"

ড্রইং রুমে একটি বাইশ তেইশ বছরের তরুণী একা বসিয়া উদ্বিগ্নভাবে এধার ওধার চাহিতেছিল, ইভাকে দেখিয়া কহিল, "ইভা, কাল চললাম। তাই বেরিয়েছি একবার সবার সঙ্গে দেখা করে নিতে।"

"কোথা যাচ্ছ? হঠাৎ এত তাড়া যে? মিষ্টার মুখার্জ্জি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছেন যে বড়। না তিনিও কোর্ট ফেলে তোমার সঙ্গ নেবেন?"

"কে মিষ্টার মুখার্জ্জি?"—রেবার তীক্ষ্ণ সুর বাজিয়া উঠিল, "তাঁর সঙ্গে আর আমার কোনই সম্পর্ক নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। আমরা পরস্পরের পক্ষে এখন অপরিচিত।"

ইভা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মাস ছয়েক আগে হাই-কোর্টের ব্যারিষ্টার নীরদমোহন মুখার্জ্জির সহিত রেবার যাহাকে বলে "লভ্ ম্যারেজ" অনেকটা তাহাই হইয়াছিল। এ বিবাহের কথা লইয়া তাহাদের কলেজের তরুণী মহলে অনেকখানি চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। বিবাহে রেবার পিতার তেমন মত ছিল না। কিন্তু প্রেম এবং সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কলেজের অগণিত তরুণের মুগ্ধ আঁখির সামনে বন্ধুদের বাহবা আদায় করিয়া রেবা ঐ মিষ্টার মুখার্জ্জিকেই বিবাহ করিয়াছিল শেষ পর্য্যন্ত। কোন বাধা মানে নাই।

ইভার স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া রেবা উদ্ধত সুরে কহিল, "এতে অবাক হবার এত কি রয়েছে ইভা? একদিন বিয়ে করেছি সানন্দে স্বেচ্ছায়। কিন্তু তাই বলে যে চিরজন্ম বাঁধা দিয়েছি তার তো কথা হয়নি। ক্রমশ টের পাচ্ছি আমাদের দু'জনের মতামত, আইডিয়াজ্ এত আলাদা যে, টেনেটুনেও দু'জনের একসঙ্গে থাকা অসম্ভব। দু'টো জীবনই এতে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আমি দেরাদুনে একটা স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর পদ খালি দেখে দরখাস্ত করেছিলাম। আজ উত্তর পেয়েছি, মঞ্জুর হয়েছে।"

ইভার অভিভূত ভাবটা তখনও কাটে নাই। সে বেদনা-বিদ্ধ স্বরে কহিল, "কি এমন হয়েছিল ভাই তোমাদের যে এমন করে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছ? একটুখানি যদি মতের অমিলই হয়ে থাকে দু'দিন বাদেই আবার মিটে যাবে। স্বামীর বাড়ী, মান, সম্ভ্রম, স্নেহ, আশ্রয় সব ছেড়ে দিয়ে তুমি অমনি ছুটলে কোন সুদূর বিদেশে একা চাকরি করতে?"

রেবা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে কহিল, "পাড়াগাঁয়ে বিয়ে হয়ে এই দু'মাসের মধ্যেই যেন কেমন বদলে গিয়েছ ইভা। ওসব

যা তুমি আর বুঝবে না। আজ আমি উঠি, এখনও অনেক দূর বাড়ী যেতে হবে। এইটুকু শুধু জেনে রাখ, আত্মমর্যাদা রাখতে যেয়ে যদি স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করতে হয় তাতে কিছু এসে যায় না। পৃথিবীতে কোন কিছুরই খাতিরে সম্ভ্রম ত্যাগ করা যায় না।"

রেবা যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিল ঝড়ের বাতাসের মত তেমনিই তাড়াতাড়ি হঠাৎ চলিয়া গেল।

ইহার পর ইভার মনটা কেমন বিকল হইয়া গেল। লেকে বেড়াইতে যাইবার উৎসাহ আর রহিল না। মনে হইতে লাগিল, তাহারও যদি অমনই হয়। আজ মুগ্ধ অভিভূত আবেশময় আনন্দে দুজনে একসঙ্গে লেকের ধারে বেড়াইতেছে; আবার এমন দিন হয়তো আসিবে, যেদিন পরস্পরের সঙ্গ অসহ্য হইয়া উঠিবে। এমন কি করিয়া হয়। রেবাদের প্রেম, রেবার বিবাহ, তাহাদের মধুচন্দ্রিকা যাপন এই তো সেদিনও কলেজের তরুণী মহলে কত আলোচনা কত ঈর্ষার বস্তু ছিল।.........

শশাঙ্ক তাহার দেরী দেখিয়া তাড়া দিয়া কহিল, "আজকের এমন বিকেলটা সত্যি কি তাহলে মাটি হবে? তোমার বান্ধবী যে অনেকক্ষণ বিদায় নিয়েছেন। এবার আমরা বেরিয়ে পড়ি চল।"

"চল।"—স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যেন সুপ্তোত্থিতের মত ইভা উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সারা সন্ধ্যা তাহার মনে ঐ একই প্রশ্ন আনাগোনা করিতে লাগিল, একদিন যে বস্তু প্রিয় হইতে প্রিয়তম থাকে আর একদিন তাহাই কেমন করিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠে।

শশাঙ্ক কহিল, "আজ তোমাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। কি ভাবছ? বাবাকে তা হলে লিখে দেব যে, শীগ্‌গির তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার কোন অমত নেই তো?"

"না অমত নেই। তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন। তাঁর ইচ্ছা আমি পালন ক'রবো যতদূর পারি।"

লেকের চারিধারে খানিকটা বেড়াইয়া অপেক্ষাকৃত একটু নির্জ্জন স্থানে ঘাসের উপর তাহারা বসিল। কত লোক, কত ধরণের দৃশ্য চারিদিকে। চানাচুরওয়ালা বিচিত্রসুরে চানাচুর বিক্রয় করিতেছে। কোন কলেজের ছেলে আবৃত্তির ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের বিদায় অভিশাপ কবিতা জোরে জোরে বলিতেছে। ইহারই মধ্যে আড়াল খুঁজিয়া প্রণয়ী যুগলের আবির্ভাব ঘটিতেছে। প্রায়ান্ধকারের অস্পষ্ট আলোকে সবুজ ঘাসের উপর একটি তরুণী বসিয়া আছে, তাহার অদূরে একজন যুবক বসিয়া মৃদু গুঞ্জনে কি বলিতেছে। একটু-খানি প্রণিধান করিলেই বোঝা যায় তাহারা দুজনে দুজনের মধ্যে মগ্ন। বিশ্বসংসারের আর কোনদিকে তাহাদের নজর নাই।

ইভা ভাবিতেছিল, সত্যই তাই হয় কি? আজ কলগুঞ্জনে যাহারা পরস্পরের মধ্যে মগ্ন, কাল সম্ভ্রম বাঁচাইবার জন্য তাহা- যেমন ক্ষণস্থায়ী, প্রেমও কি তাই? মানুষে মিছাই বলে প্রেম অবিনশ্বর।

কে একটি ছেলে আগাইয়া আসিয়া শশাঙ্কর কাঁধে হাত রাখিল; "শশাঙ্ক যে, চিনতে পার? আরে বৌদিও সঙ্গে যে!"

ছেলেটি নরেন। শশাঙ্কর সহাধ্যায়ী। ইভার সহিতও আলাপ হইল তাহার।

ইভা কহিল, "এবার উঠি। সন্ধ্যে হয়ে গেল।"

নরেন উঠিতে দিল না। বলিল, "উঠবেন কেন এত তাড়াতাড়ি। গ্রীষ্মকালের দিবস, পরিণাম রমণীয়। এর যত শেষ ততই সুন্দর। সন্ধ্যেটিই তো উপভোগ ক'রবার মত। বসুন।"

দুই বন্ধুতে মিলিয়া কত কথা হইতে লাগিল। নরেন কহিল, "শশাঙ্ক তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ হ'ল ভাল করে, কী চমৎকার মানুষ।"

"বাবার সঙ্গে কোথায় তোমার দেখা হ'ল?"

"বাঃ, জাননা নাকি, তোমার বিয়ের ঠিক করতে এসে উনি যে আমাদের বাড়ীতেই উঠেছিলেন। যেদিন প্রথম বৌদিকে দেখে এলেন সেদিন কত প্রশংসা করলেন আমাদের কাছে এসে।" এই বলিয়া নরেন ইভার দিকে চাহিয়া হাসিল। ইভা লজ্জিত হইয়া মুখ নামাইয়া কহিল, "আমায় তিনি প্রথম থেকেই বড় ভালবাসেন।"

নরেন পুনশ্চ কহিল, "তিনি একাল ও সেকালের সার্থক সমন্বয়। সেকালের অযথা কুসংস্কার নেই অথচ একালের গতিবেগ আছে। তিনি বলেন, 'শশাঙ্ককে শীগ্‌গির বিলেত পাঠাব।' সত্যি না কি?"

শশাঙ্ক কহিল, "হাঁ, ল'টা দিয়েই আমি যাব।"

নরেন রহস্য করিয়া কহিল, "বিয়ে করেছ নতুন, যেতে পারবে?"

"কেন পারব না? শরৎবাবুর পথনির্দ্দেশ থেকে উদ্ধৃত করে বলব নাকি—'তখনই বুঝতে পারবে কেন বিরহই প্রেমের প্রাণ'—

নরেন বাধা দিয়া কহিল, "থাক। ওকে আর উদ্ধৃত কর না। শরৎবাবুর বই এত ভালবাসি যে, ও থেকে কাটা ছেঁড়াভাবে উদ্ধৃত করা প্রাণে সয় না।"

ইভা মৃদুস্বরে কহিল, "তা নয়। ওদেশে কত নতুনত্ব। দেখবার কত আকাঙ্ক্ষা আমার কথা এমন কি......আমি এমন কি যে, আমার জন্য যেতে ইচ্ছে করবে না।"

শশাঙ্ক হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে বলিল, "এ হচ্ছে চিরন্তনী নারীর অভিমান-বাণী। কিন্তু ইভা একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, আজকের দিনে কোন পুরুষ নিছক প্রেম চর্চ্চা করে তৃপ্ত থাকতে পারে না। চারিদিকে কত সমস্যা, কত অশান্তি, পরাধীনতার কী ক্রন্দন! বাইরের জগতে বেরিয়ে আমি এই বিরাট আন্দোলনের একটুখানি ভাগ নেবার—এর স্বরূপ আরও একটু তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করবো নাকি?"

উদ্দেশ্য ? তাই যদি হয় কমপীটিটিভ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হতে যাচ্ছ কেন ?

"ওটাও প্রয়োজন। আকাশকুসুম যেমন স্থায়ী হয় না, তেমনই শুধু ভাববিলাস বা আদর্শ বিলাসের চর্চা মূলহীন। জীবনের বাস্তব ভূমিতে তার শিকড় থাকা চাই। তাছাড়া আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারে অর্থ জিনিষটার একান্ত দরকার। ওটা উপেক্ষা করবো কেমন করে।"

ইভা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "চল এবার ফিরি। কত-দূরে যেতে হবে, রাত হয়ে যাবে না?"

স্বামীর আসন্ন বিদেশ যাত্রার সংকল্প তাহার মনকে বিধুর করিয়া তুলিল। ইচ্ছা হইল সমস্ত জনকোলাহল ছাপাইয়া একান্ত নিজ্জর্নে এই দুর্লভ মুহূর্তগুলি নিঃশেষে করিয়া অনুভব করিতে। সময় যখন বেশি নাই তখন তাহাকে জনতার মাঝে বৃথা অপব্যয় কেন। এক রকম জোর করিয়াই তাই নরেনের কাছে বিদায় লইয়া ইভা বাড়ীর পথ ধরিল।

(৭)

মাসের প্রথম দিকে ইভা শ্বশুর বাড়ী আসিল। সেবারে তখন নতুন বিয়ের কনে ছিল, ভাল করিয়া কিছু জানা শোনা হয় নাই। কেবল ইন্দুর কাছে একটু আধটু যা পরিচয় পাইয়াছিল। এবারে সে অনেকদিনের মত আসিতেছে। শ্বশুরের চিঠির কথাগুলি বার বার পড়িয়া তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন ; "মা, গ্রাম সংস্কারকেরা কত বড় বড় কাজের স্কীম করে। কিন্তু মরুভূমিতে যেমন ফুল ফোটে না, তাদের প্ল্যান কাগজ কলমের রাজ্য ছেড়ে তেমনই কিছুতেই বাস্তব জীবনের এতটুকুও স্পর্শ করতে পারে না। কি করে এ কাজ সহজ হয় জান? লেশতম সংস্কারের গর্ব্বমাত্র মনে না রেখে অত্যন্ত সরল স্বাভাবিকভাবে এদের মধ্যে বাস করে যাওয়া। আমি জানি তা তুমি পারবে। তোমার মধ্যে সুধাময় সুষমাময় ছন্দপরিপূর্ণ জীবনের যে স্রোতোধারা আছে সেই স্রোতের গতি অনেক কাজ সফল করে তুলবে। কেবল এদের জানবার চেষ্টা কর, কিন্তু গায়ে পড়ে জানিও না যে তোমার খুব গুরু গম্ভীর একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যহীনভাবেই এদের ভালবাস। এদের সুখে দুঃখে এক হয়ে অনুভবের সামীপ্য পাবার চেষ্টা কর। তাহলে দেখবে অল্প সময়ের মধ্যেই কত হয়েছে।"

ইভা সেই চিঠির সুরে নিজের মনের সুর বাঁধিয়াছিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল, দুচোখ ভরিয়া দেখিবে। সদা জাগ্রত মন উন্মুক্ত করিয়া সমস্ত অনুভব করিবে। নিজের এতদিনকার শিক্ষা পরিবেশ বিস্মৃত হইয়া নবজীবনের আস্বাদ গ্রহণের চেষ্টা করিবে।

মাঘ মাসের সকাল বেলায় স্নিগ্ধ বাতাস দিতেছে। গ্রামান্তের দেবালয়ে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণব একতারা বাজাইতেছেন। তখনও রৌদ্র প্রখর হয় নাই, ইভাদের গাড়ী মেঠোপথে ধুলো উড়াইয়া গ্রামে ঢুকিল। বাড়ীতে পা দিয়া ট্রেনের কাপড় চোপড় ছাড়িয়া তসরের কাপড় পরিয়া গৃহ-সংলগ্ন রাধাগোবিন্দের মন্দিরে সে প্রণাম করিয়া আসিল। বলিলেন, দেখেছ, বৌমা আমাদের সব জানে। যেন চিরকাল এখানেই ঘর-বসত করে এসেছে। কে বলবে শহরের কলেজে পড়া মেয়ে।"

ইন্দু কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সে কানে কানে বলিল, "ভাই আমার বাড়ী যাবে না? আমার তো বেশীক্ষণ থাকবার হুকুম নেই। সেবারে তোমার বিয়ে বলে জ্যাঠাইমারা নিয়ে এসেছিল। আমার শাশুড়ী মাগী যা খিটখিটে। এসেছ তাই অনেক বলে ক'য়ে একবার দেখতে এসেছি। এখনই চলে যেতে হবে। কাছেই তো আমার শ্বশুরে বাড়ী। ঐ যে ফলসা গাছগুলোর ওধারে। এখান থেকেই একটু একটু দেখা যাচ্ছে।"

ইভা কহিল, "কাল যাব। আজ উনি রাত্রির ট্রেনে কলকাতা চলে যাবেন। আজকের দিনটা রিজার্ভ। বুঝেছ তো?" —বলিতে বলিতে মিষ্ট হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল।

সেইদিকে চাহিয়া ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ইন্দিরা কহিল, "আচ্ছা। কাল কিন্তু নিশ্চয় যেও ভাই। আমি এসে দুপুরে বেলায় তোমায় নিয়ে যাব।"

উঠানের একধারে ছোট ছোট পুকুরের মত কাটা রহিয়াছে, তাহার চারিদিকে ছোলার অঙ্কুর, যবের অঙ্কুর। পিটুলী গোলার আল্পনা।

ইভা সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, ওখানে কি হয়?

ইন্দুর এবার হাসিবার পালা। "ওমা, তাও জাননা। উমি আর শিবু যে ওখানে পুণ্যিপুকুর করে। ভাল বিয়ে হবে বলে মেয়ে মানুষের এখন থেকেই কত কচ্ছ্রসাধন। আমি আবার বিয়ের আগে বোশেখ মাসে একসঙ্গে পুণ্যিপুকুর, হরিচরণ, শিবপুজো সমস্তই করতাম। কিন্তু যতই যা করা যাক সবই ভাগ্য। এই উমা তোর বৌদির জন্যে শীগ্গির করে চা কর। রাস্তায় এসেছে না!"

দশ এগারো বছরের একটি সুশ্রী লাজুক মেয়ে চায়ের ডিশ কাপ ও কেৎলী লইয়া রান্না ঘরের দিকে যাইতেছিল। মুখ নামাইয়া একটু হাসিয়া কহিল, "আমি সব জোগাড় করে দিচ্ছি, বৌদি আপনি চা করে নেবেন। আমার চা হয় তো ভাল হবে না।"

খিড়কির দুয়ারে কে একজন বৈষ্ণবী ভিক্ষা লইতে আসিয়াছে ; "রাধারাণীর জয় হোক মা।" তাহার পরে সে খঞ্জনি বাজাইয়া কীর্ত্তনের সুরে গান ধরিল, "যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল......"

আকাশে বাতাসে যেন কি এক স্নিগ্ধ শান্তি। সমস্ত মন ডুবিয়া যায়। ইভা এই প্রশান্ত বাতাসে খুব দীর্ঘ করিয়া একটা নিশ্বাস লইল। তাহার সারা মন ভরিয়া উঠিল। এখানে কলিকাতার কথা স্বপ্নের মত অলীক মনে হয়। এত শীঘ্র যে কলিকাতা ছাড়িয়া আসিয়া এখানে তাহার ভাল লাগিবে এতটা নিজের কাছেও আশা করিতে পারে নাই।

পেয়ালায় চা ঢালিয়া স্বামীকে দিবার জন্য উমার হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, "তোমার দাদাকে দিয়ে এস, উনিও রাত জেগে ট্রেনে এসেছেন।"

উমার হাত হইতে চায়ের পেয়ালাটা লইয়া বলিল, "আচ্ছা আমি নিজেই দিয়ে আসি তাঁকে।"

ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় একটা তক্তপোষের উপর শশাঙ্কর মা বসিয়াছিল। নীচে আরও দুই চারিজন প্রতিবেশিনী বসিয়াছিল।

"মা"—বলিয়া ডাকিয়া শশাঙ্ক একেবারে তাহার মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। এমন সময় ইভা চায়ের পেয়ালা হাতে তথায় আসিয়া মৃদুস্মিত হাস্যে স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, "নাও। বোধ হয় এক পেয়ালা চায়ে তোমার পোষাবে না। সমস্ত রাত্তির জেগে ব'সে এলে। এত বললাম যে কাব্য না হয় পরে করবে, এখন একটু ঘুমিয়ে নাও"………

শশাঙ্কর মায়ের মুখ লজ্জায় ও বিরক্তিতে কালো হইয়া উঠিল। একজন বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী মুখে আঁচল দিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। অপ্রতিভ এবং ব্যস্ত হইয়া শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি তথা হইতে পলায়ন করিল। কি ঘটিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া পলায়নপর স্বামীর দিকে চাহিয়া ইভা স্তব্ধ হইল।

রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে সবেমাত্র নিজের চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়াছে শাশুড়ী আসিয়া কহিলেন, "বৌমা এদিকে একবার শুনে যাও।"

হঠাৎ কি হইয়াছে বুঝিতে না পারিয়া ইভা ভীতত্রস্ত হইয়া তাঁহার কাছে গেল। শাশুড়ী ক্রুদ্ধ গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন,—"বৌমা এত জান শোন আর এটুকু জান না যে, পাড়ার সব মেয়েরা বসে রয়েছে, আমি রয়েছি সেখানে শশাঙ্কর সঙ্গে তোমার অমন করে কথা বলা গল্প করাটা অশোভন। তোমাদের ক'লকাতাতে বুঝি এমনই করে?"

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেকার সুগভীর প্রশান্তি কোথায় মিলাইয়া গেল। ইভা তর্কের সুরে কহিল,—"করেইতো। যা অন্যায় নয়, তাতে লোকে কি মনে করবে ভাবা বিবেকবিরুদ্ধ। লোকে যদি কিছু মনে করে, করতে দিন। আমাদের তাতে কিছু এসে যাবে না।"

ইভার শাশুড়ী অত্যন্ত রাগিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

ছোট ননদ উমা বলিল,—"বৌদি ভাই, লোকে তোমাকে নিন্দে করবে যে তাহলে।" উত্তপ্ত হইয়া ইভা কহিল, "করুক। আমি গ্রাহ্য করিনে।"

উমা মেয়েটি বড় লাজুক বড় মিষ্ট স্বভাবের। সে ভীত হইয়া তাহার মহীয়সী বৌদির মুখের পানে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—"বৌদি ভাই, চায়ে চিনি হয়েছে? তোমাকে আর এক পেয়ালা দেব কি?"

ইভা তেমনই উদ্ধতস্বরে কহিল,—"দাও। হ্যাঁ, চিনি হয়েছে। কিন্তু তোমাদের আবার যা গাঁ, চিনি বেশী খেলেও হয়ত এখানে নিন্দে হতে পারে।"

এবারে উমা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

(ক্রমশ)

হিমালয়

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

ওগো হিমগিরি তুষার দেবতা
যুগ হ'তে কতো যুগান্তরে,
নীরবে কঠিন পাষাণ দেহেতে
দাঁড়ায়ে র'য়েছো এমনি ক'রে।
তুষার ধবল গিরির শৃঙ্গে
সূর্য্যের শত আলোক ঝলে
সকাল বেলার প্রখর আলোয়
কত কত অভিযাত্রী চলে।
মানুষের লোভ ভেঙে দিতে চায়
তোমার তুঙ্গ শিখর চূড়া
সন্ধ্যা বেলায় প'ড়ে থাকে হায়
তাদেরি দেহের হাড়ের গুঁড়া।
পাইনের বনে ওঠে হাহারব
তুমি শুধু হায় নীরবে হাসো
অভ্রভেদী সে অহংকারেরে

(২)

ও গো হিমালয় মহামহিমায়
আরো কতো যুগ দাঁড়ায়ে রবে,
কতো রাজ্যের ভাঙা গড়া আর
ধ্বংসের রূপ দেখিতে হবে।
তোমারি চরণ-শরণ-লগন
কপিলবাস্তু প্রাসাদ হ'তে
রাজার কুমার বাহিরিল ধীরে
সন্ন্যাসী বেশে একেলা পথে।
তোমারি সমুখে নৃপতি অশোক
দৈন্য বরণ করিল নিজে,
সে-গৌরবের মহান্ দৃশ্য
ইতিহাসে মোরা দেখিয়াছি যে।
হে বিরাট তুমি আমাদের মতো
নহতো কখনো মরণ-ভীত,
লোভী মানুষের লোভের উর্দ্ধে

ধর্ম্মরাজ পূজা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

আগুন খেলা বা ফুল খেলা

পূজার দিন—(পূর্ণিমার দিন) প্রভাতে উঠিয়াই শৌচাদির পর ভক্তগণ পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নিকুণ্ডে গিয়া পুরোহিতের অগ্নি পূজার পর এক একটি জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইয়া ধর্ম্মরাজের বেদীর নিকটে (মন্দিরের নিকটে রাখিলেও চলে) আনিয়া রাখিবে। পরে ধূপদানীতে প্রত্যেকেই এক একটি অঙ্গার হাত দিয়া তুলিয়া দিবে। এই ধূপদানীতে ধূপ দিয়া ধর্ম্মরাজের সম্মুখে রাখিতে হইবে। পরে অগ্নিপ্রদক্ষিণ। মূলদেয়াশী মন্ত্র বলিয়া প্রথমে গাজনের ধর্ম্মরাজ, ধামাতকর্ণ, কামিন্যা ও মুক্তির জয় দিবে। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণ জয় বাবা বুড়োরায় ধর্ম্মরাজ হে বলিয়া জয়ধ্বনি করিবে। পরে গ্রামের অপর ধর্ম্মরাজ ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের ও দূরবর্ত্তী প্রধান প্রধান ধর্ম্মরাজের জয় ও জয়ধ্বনি হইবে। মন্ত্রটি এইরূপ—

> ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন।
> ধবল পদ্মে বসি আছেন দেব নারায়ণ।
> দেব বন্দম, দেয়াশী বন্দম, খাট পাট
> লাঠি বন্দম আলিরি ভারতি বন্দম,
> সরস্বতী গঙ্গে, বামে বীর হনুমান—

গাজনে যে বাবা বুড়োরায় ধর্ম্মরাজ আছেন, তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পূর্ব্বে বুড়োরায় ধর্ম্মরাজের লক্ষণ বর্ণনায় সুরধুনী ও সরস্বতীর উল্লেখ দেখিয়াছি। এই মন্ত্রে "সরস্বতী গঙ্গে" এই নাম দুইটি বিশেষ লক্ষণীয়। এইরূপে অগ্নিপ্রদক্ষিণ ও মন্ত্রপাঠ ও বন্দনা শেষ হইলে সকলে মিলিয়া নাচিয়া নাচিয়া আগুন নিভাইয়া দিবে।

কাঁটা ঝাঁপ বা কাঁটা ভাঙ্গা

কতকগুলি বাবলা, কণ্টিকারী প্রভৃতি কাঁটার উপর বাসকের পাতা চাপাইয়া রাখিবে। এক একজন ভক্ত তাহার উপর পিঠ দিয়া ডিগবাজী দিবে। পুরোহিত তাহার পেটে বা বুকে পা দিয়া এদিক হইতে ওদিক যাইবে। এইরূপ প্রত্যেক ভক্তের বাজী দেওয়া শেষ হইলে একজনের বুকের উপর সেই কাঁটার ঝাঁপ রাখিয়া আর একজনকে তাহার উপর শোয়াইয়া দুইজনকে বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবে। পরে অন্য ভক্তেরা সেই দুইজনকে ঠেলিয়া খানিক দূরে গড়াইয়া দিবে। তাহার পর উঠাইয়া বাঁধন খুলিয়া কাঁটাগুলি অন্যত্র ফেলিয়া দিবে। ইচ্ছা হইলে অন্যান্য ভক্তেরাও এইরূপ বুকে কাঁটা লইয়া গড়াগড়ি দিবে।

পদসেবা

সকলভক্ত চিৎ হইয়া শুইবে, পুরোহিত তাহাদের বুকে পা দিয়া চলিয়া যাইবেন। পরে ভক্তেরা উপুড় হইয়া শুইবে, পুরোহিত পিঠে পা দিয়া চলিয়া যাইবেন। কেহ কেহ বাজী দিয়া চিৎ হইয়া পায়ে মাথায় ও হাতে ভর রাখিয়া বুকটা আলগোছে তুলিয়া রাখে, পুরোহিত তাহার বুকে পা দিয়া চলিয়া যান। পায়ের চাপেও তাহার পিঠ মাটিতে না ভক্তের কাঁধে বা হাতে পুরোহিত আপনার ভার রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

চক্র বা চরকী ঘুরা

মণ্ডলীবদ্ধভাবে পরস্পরের পায়ের উপর ভর রাখিয়া হাত ধরাধরি করিয়া বুক চেতাইয়া আড়ভাবে ঘুরিতে হইবে।

আরও অনেক রকম খেলা ছিল, এখন সেগুলি লোপ পাইয়াছে। মধ্যাহ্নে ধর্ম্মরাজের পূজা ও হোম হয়। হোমের শেষে পূর্ণাহুতি না দিয়া পাঁঠা উৎসর্গ করিয়া "ভাঁড়ারের" অপেক্ষা করিতে হয়। যখন "খেলা ভাঁটি" ছিল তখন ভাণ্ডগুলি মদেই পূর্ণ করিতে হইত। এখন এক ভাঁড় জলে খানিকটা মদ ঢালিয়া দেয়। গ্রামের বাহিরে কোন স্থানে অথবা শুঁড়ির দোকানে সারি দিয়া ভাঁড়ারের ভাঁড়গুলি পিঁড়ার উপর সাজাইয়া রাখিতে হয়। শিবদেয়াশী ধর্ম্ম-রাজের প্রসাদী সিন্দুর ও ফুল প্রত্যেকটি ভাঁড়ে দেয়। শুঁড়ি একটি ধূপদানীতে ধূপ দিয়া ভাঁড়গুলিকে প্রদক্ষিণ করে। অতঃপর ভক্তগণ আপন আপন ভাঁড় মাথায় করিয়া সারি দিয়া দাঁড়ায়, ঢাকীর দল ঢাক বাজায়, কেহ ধূপ দেয়, কেহ জয়ধ্বনি করে। একে একে ভাঁড়ার মাথায় ভক্ত নাচিয়া নাচিয়া সারি হইতে বাহির হইয়া আসে। এইভাবে সকলেই "নাড়িলে"পর ভক্তগণ এক সঙ্গে নাচিতে নাচিতে মন্দিরের পথে অগ্রসর হয়। মাঝে মাঝে আবার সারি দিয়া দাঁড়ায়, আবার ঢাক বাজাইয়া ধূপ দিয়া সকলকে নড়াইতে হয়। ভক্তগণ ভাঁড়ার লইয়া মন্দিরের নিকট আসিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করে ও ভাঁড়ারগুলি মন্দিরে পার্শ্বস্থিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে নামাইয়া দেয়।

মূলদেয়াশীর ভাঁড়ার লইতে নাই। যদি এই বংশে কেহ ভাঁড়ার মানসিক করে, সে দুধের ভাঁড়ার লইবে, মদের ভাঁড়ার লইতে পাইবে না। কিন্তু অন্যান্য তাঁতি, সদ্গোপ-আদি সৎশূদ্রও মদের ভাঁড়ার লইয়া থাকে।

ভাঁড়ারের পর বলিদান, বলিদানের পর পূর্ণাহুতি। উপস্থিত সকলেই শান্তিজল ও যজ্ঞশেষ তিলক লইবেন। কিন্তু ভক্তগণ কেহই এই দিন তিলক গ্রহণ করে না, পর দিনের জন্য রাখিয়া দেয়। ভক্তগণ এই দিন পূজা শেষে ধর্ম্মরাজের পুষ্পজল লইয়া পূর্ব্বস্থাপিত নিমের ডাল হইতে নিমপাতা লইয়া চিবায়, পূর্ব্বস্থাপিত ঘটের জল মুখে দিয়া বাড়ী যায়। ভক্তগণ এই দিন অম্লাহার করে।

পরদিন সকালে ঢাক সঙ্গে ভক্তগণ সকলে গ্রামের এবং পূর্ব্বোক্ত জানাবাজ গ্রামের লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া জয় দিয়া ও ভিক্ষা লইয়া আসে। রাত্রে সংগৃহীত চাউলাদি রাঁধিয়া সকলে খায়। কিন্তু ধর্ম্মরাজের ভোগ দেয় না। অনেক সময় মধ্যাহ্নে চিঁড়া ফলার করে। মধ্যাহ্নে বাণেশ্বর লইয়া সকলে মিলিয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীতে যান এবং স্নানের পর বাণেশ্বর পূজা করিয়া উত্তরীগুলি জলে ফেলিয়া দেয়। মন্দিরে ফিরিয়া পূর্ব্বদিনের রক্ষিত যজ্ঞশেষ তিলক গ্রহণ করে।

ধর্ম্মের গাজন বারমতী গৃহভরণ নামে পরিচিত।

জীবজন্তুর লম্বা ঠোঁট

ঠোঁট পাখীদিগেরই একচেটিয়া নয়। এমন জীবও দেখা যায় যাহার ঠোঁটটি সমগ্র দেহের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ দৈর্ঘ্যে। অবশ্য পাখীদের ভিতর এমন অদ্ভুতও পাওয়া যাইবে এক-একটি যাহার ঠোঁট আপন দেহের সমান। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের ভিতর সেইপ্রকার লম্বা ঠোঁটওয়ালা জীব খুব বেশী নাই। বিরাট জলজন্তু তিমি—আকারে প্রকারে আধুনিক জগতে উহার দোসর কোথাও মিলিবে না। উহার
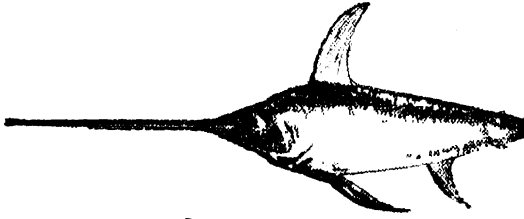
ঠোঁট অবশ্যই সেই অনুপাতে বৃহৎ, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার বিশাল বপুখানির তুলনায় ঠোঁট একেবারেই নগণ্য—এক-তৃতীয়াংশ হওয়া দূরের কথা। সোর্ড ফিশ নামে একটি মাছ আছে, যাহার ঠোঁট, বিশেষ করিয়া উপরোষ্ঠ উহার দেহের অনুপাতে অতিশয় দীর্ঘই বলিতে হইবে। কারণ উহার ওষ্ঠাগ্র হইতে লেজের ডগা পর্যন্ত পরিমাপ করিলে দেখা যাইবে—উহার ঠোঁট বা 'সোর্ড'টি প্রকৃত প্রস্তাবেই সারা দেহের তিন ভাগের এক ভাগ হইতেও লম্বা।

আশ্চর্যজনক মৃত্যু

ইংলণ্ডের এসেক্স শহরে সেইদিন ছিল বিমান-মহলার 'ব্লাক-আউট' বা দীপ নির্বাপিত রাখিবার রজনী। মিঃ ড্যানিয়েল ফ্রান্সেইস্ ৬৬ বৎসরের বৃদ্ধ; সে বাস করে ঐ শহরের 'গ্রেজ' নামক ভবনে। সে দিন ছিল শনিবার রাত্রি। রাত্রি প্রায় শেষ, কিন্তু চারিদিকে নিরন্ধ্র অন্ধকার। দীপ জ্বালাইবার আদেশ নাই, উপায় নাই। শয্যায় এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে বৃদ্ধ এক সময়ে খাট হইতে মেঝেয় পড়িয়া যায় গড়াইয়া। মেঝের যেস্থানে বৃদ্ধ পতিত হইল, সেখানে বৃদ্ধের অজ্ঞাতসারে তাহার নাতি রাখিয়া গিয়াছিল, উহার খেলনা নৌকাখানি (Yacht) এই নৌকায় আসল ইয়টের মতই মাস্তুলাদি সকলই সমাবিষ্ট ছিল। বৃদ্ধ যেমন পতিত হইল—অমনই নৌকার মাস্তুলটি তাহার চক্ষুতে বিদ্ধ হইয়া একেবারে মগজ পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইল। ফলে, সেই মুহূর্তেই বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে

অদৃষ্টবাদীরা কেহ এই প্রবাদটির সত্যতা অস্বীকার করিতে পারে না। তাই মোটর দুর্ঘটনার সঙ্গে উহার সকল রহস্য যখন সাধারণে প্রচারিত হইল ডাবলিন শহরে—সকল বিজ্ঞ নরনারীই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। সেয়ানা এক মোটর মোটর চুরি করিয়া বাড়ী লইয়া গেল। তাহার পর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা দুইটিকে সেই মোটরে চাপাইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। ইতিমধ্যে পুলিশ মোটর চোরের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া ঠিক ঠিক নম্বর পাইয়া চোরের গাড়ীর অনুসরণ করিল। চোর তাহার গাড়ী ক্ষিপ্রগতিতে চালাইতে যাইয়া সঙ্ঘর্ষ বাঁচাইবার জন্য অপর গাড়ী এড়াইয়া পাশ কাটাইতে একেবারে 'লিফে' নদীতে পড়িয়া গেল। ফলে চোর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইল। হাতে হাতে সাজা হইয়া গেল—মানুষের বিচারের আর প্রয়োজন হইল না।

স্বামী বর্তমানে পুনরায় বিবাহ

মগের মুল্লুক নয়—একেবারে সুসভ্য ইংরেজের দেশ। ভুল-ভ্রান্তিও নয়, নিরুদ্দেশের অজুহাতও নয়। বার্মিংহাম এসাইজেস আদালতে বিচারের জন্য প্রেরিত হয় তিনটি নরনারী। অভিযোগ গুরুতর—স্বামী শুধু সম্মতিই দেয় নাই, পত্নীর দ্বিতীয়বার বিবাহে সাক্ষীর স্থান পূরণ করিতেও স্বীকৃত হইয়াছে। আরও রহস্য এই যে, বিবাহের পর পত্নী নূতন স্বামী লইয়া যে আবাসে ঘরকন্না পাতিয়া বসে, এক নম্বর স্বামীটি সেই ভবনেই ভাড়াটিয়া হইয়া বাস করে—আহার ও বাসস্থান দুইয়েরই ভাড়া দিবার অঙ্গীকারে বিচারক কিন্তু এই তিন অভিযুক্ত ব্যক্তির কাহারও অপরাধ ও দায়িত্ব কম বলিয়া নির্ধারণ করেন নাই—ফলে, তিন-জনেরই কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। বিচারকের মতে উহারা তিনজনেই প্রচলিত বিধি-বিধানকে স্বেচ্ছায় বে-পরোয়া-ভাবে লঙ্ঘন করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে।

জীবন-সম্বলের বিনাশে ক্ষতিপূরণ

ইংরেজের দেশের কোনও হাইকোর্ট। ক্ষতিপূরণের মামলা। পুত্রের বিরুদ্ধে মাতার দাবী।

পিতা (৫০), মাতা (৪৬) এবং পুত্র (২১) একত্র বাহির হইল ভ্রমণে মোটরযানে আরোহণ করিয়া। চালক অবশ্য তরুণ পুত্রটি। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস—পথিমধ্যে অন্য মোটরের সহিত হইল ভীষণ সঙ্ঘর্ষ। পিতাটি সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ হারাইল, কিন্তু মাতা ও পুত্র সামান্য মাত্র আঘাত পাইয়া প্রাণে বাঁচিয়া গেল। অসতর্ক মোটর চালনে মাতা তাহার জীবনের সম্বল হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ক্ষতিপূরণ তাহাকে দেওয়া হউক উপযুক্ত প্রকার। বিচারক দেড় শত পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ দিলেন।

পুত্র বলিল,—আমার বিরুদ্ধে যে ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিতান্তই নগণ্য। আমার পিতার জীবনের মূল্য কি মাত্র ১৫০ পাউণ্ড, সেদিন এক ব্যক্তি মোটর সঙ্ঘর্ষে বাহু হারাইল, তাহাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইল পাঁচ হাজার পাউণ্ড! অথচ স্বামী হারাইবার ক্ষতির পূরণে মা পাইল কেবল ১৫০ পাউণ্ড! ইহা নেহাৎ অসঙ্গত

বিনা আগুনে রন্ধন

নিউ গিনিতে চেফ্ নামে একটি জাতি রহিয়াছে। আজিও কোনপ্রকার সভ্যতার ছোঁয়াচ উহাদের আদিম জীবনযাত্রাকে পরিবর্তিত করিতে পারে নাই। উহাদের রন্ধনের ব্যাপারে তাই উহারা যথেষ্ট মৌলিকতা প্রদর্শন করে রন্ধনের যোগ্য উত্তাপ উদ্ভাবনে। শুধু আজিই নয়, সেই স্মরণাতীত কাল হইতেই উহারা এই আদিম ও অকৃত্রিম উপায়ে উত্তাপের সৃষ্টি করিয়া রন্ধনকার্য সমাধা করে। আমরা জানি আজিকার দুনিয়ায় যে সকল বন্য জাতি রহিয়াছে, তাহারা চকমকি পাথরের সাহায্যে আগুন জ্বালাইয়া গাছের পাতা ডাল প্রভৃতি

প্রজ্বলিত করে। কিন্তু চেফ্ জাতি তাহা করে না। সারাদিন রৌদ্রে থাকিলে যে পাথর উত্তপ্ত কয়লার মত গরম হয়, সেই গরম পাথরের টুকরা সংগ্রহ করিয়া একটা গর্তে শুকনা পাতা বিছাইয়া তাহার উপর রাখে। গরম পাথরের উপর আবার এক পরত পাতা বিছায়। সেই পাতার উপর রান্নার সামগ্রী আলু প্রভৃতি রাখিয়া উপরে আবার পাতা ঢাকা দেয়। এই উপায়ে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, তাহাতেই তাহাদের রান্নার কাজ সমাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আগুন ব্যতীত রান্না চেফ্দের আবিষ্কার সেই আদিকাল হইতে।

জীবজন্তুর বিশিষ্টতা

জীবজগৎ সম্বন্ধে আমরা সাধারণত যে ধারণা পোষণ করি, তাহা এমনই অসম্পূর্ণ যে বাস্তব সত্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেও তাহা সহজে আমরা বিশ্বাস করিতে চাহি না, অথবা সূচনাতেই অলীক বলিয়া উপেক্ষার হাসি হাসিয়া থাকি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই প্রাণিতত্ত্বের আশ্চর্য ব্যাপার অগণিত এবং ব্যাপক প্রচার নাই বলিয়া সেই তত্ত্ব কখনও অবিশ্বাস্য হইতে পারে না।

আমরা জানি, উট দীর্ঘকাল জল পান না করিয়াও সুস্থ থাকে, কারণ উহার পাকস্থলীতে বিভিন্ন কয়েকটি প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে, যাহাতে জল-ভাণ্ডার দীর্ঘকাল জমাইয়া রাখিয়া তৃষ্ণা-নিবারণ করিবার ক্ষমতা উহার আছে। কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদের নিকট যখন শুনি ইঁদুরে উট অপেক্ষাও দীর্ঘকাল জলপান না করিয়া কাটাইতে পারে, তখন কেহ হাসিয়া উঠি, কেহ বা বিস্ময়-চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করি।

এই প্রকারে বিড়ালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির কথা আমরা সকলেই জানি, উহা রাত্রিকালেও পরিষ্কার দেখিতে পায়, বস্তুত রাত্রির অন্ধকারেই উহার দর্শনেন্দ্রিয় যেন প্রখর শক্তি-সম্পন্ন হয়। কিন্তু যখন জীবতত্ত্ব-পুস্তকে পাঠ করি যে, বিড়ালের দৃষ্টিশক্তি মানুষের অপেক্ষা অন্ধকারে ৩৯ গুণ অধিক তখন ঐ তত্ত্বের আবিষ্কারক প্রাণিতত্ত্ব পণ্ডিতটির প্রকৃতিস্থ অবস্থা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ি। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা গাণিতিক ফলাফলের মত যাহা নিঃসন্দেহে নির্ণীত, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবার পূর্বে আমাদের উচিত বিষয়টির প্রতি সুবিচার করিতে চেষ্টা করা।

কিছুদিন পূর্বে সংবাদ আসিল আফ্রিকার উগাণ্ডা প্রদেশের নিবিড় বনাঞ্চল হইতে। সংবাদটির মর্ম ছিল এই প্রকার যে, ঐ নিবিড় বনাঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ সুরু হইলে দুইটি মাত্র সিংহের অশেষ দাপটে নির্মাণ কার্য বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কারণ ঐ দুটি সিংহ অতি অল্পকাল মধ্যে পর পর ১৩৫টি মজুরকে হত্যা করিয়া পরম সুখে ভোজ লাগায়। আতঙ্কের ব্যাপার সন্দেহ নাই, আবার বিস্ময়করও কম নয়; কিন্তু তা বলিয়া অলৌকিক বা অভাবনীয় কাণ্ডও বলা যায় না। কারণ, ইহা একেবারেই অভূতপূর্ব ঘটনা নয় যে, দলবদ্ধ শত শত লোকের ভিতর হইতেও এই দুরন্ত পশুরাজ অকস্মাৎ চড়াও হইয়া একটিকে কামড়াইয়া ধরিয়া পিঠে ফেলিয়া নিমেষে [illegible] অন্তর্ধান হয়।

কাজেই প্রাণিজগতে বিশ্বাসাতীত বলিয়া কিছু নাই, কেননা বিচিত্রতাই উহার বাঁধাধরা নিয়ম।

কয়েদীর বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ

কোনও পেট্রল ফিলিং স্টেশনে সশস্ত্র ডাকাতি করিবার অপরাধে একটি লোকের ১০ বৎসর কারাদণ্ড হয়। তাহার স্ত্রী মারা যাইবার পূর্বে সে ছিল নিরীহ শহরবাসী। কোনও ব্যাঙ্কে পোদ্দারের কাজ করিত এবং অবকাশ সময়ে বাজাইত বেহালা। স্ত্রী মারা গেলে সে একেবারে বেপরোয়া দস্যুবৃত্তিতে মাতিয়া উঠে।

মিশিগান সিটিতে ইণ্ডিয়ানা স্টেট প্রিজনে তাহাকে রাখা হয়। খাতায় পত্রে নম্বরেই সে পরিচিত হইলেও, ঐ জেলখানার লোকেরা তাহাকে জিম বলিয়া ডাকিত। সে জেলখানায় একটি বাদ্যযন্ত্রের অভাব বিশেষ করিয়া অনুভব করিত।

একদিন ধর্মযাজক বলিলেন, এই জেলখানায় একটি অর্গ্যানের বিশেষ প্রয়োজন, অথচ স্টেট উহার খরচ বহন করিতে অসমর্থ।

কথাটা শুনিয়া অবধি জিম্ একটি অর্গ্যান প্রস্তুত করিতে মনস্থ করে। সে স্টেটের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত বিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত হইলেও, বাদ্যযন্ত্র জীবনে নির্মাণ করে নাই। সে তাহার মাতার নিকট চিঠি লিখিয়া দিল—অর্গ্যান প্রস্তুত প্রণালী-সম্বলিত একখানি বই পাঠাইয়া দিতে। বই জেলখানায় আসিয়া পৌঁছিলে জিম বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। জেলখানার চারিদিকে সে কাঠ খুঁজিয়াছিল [illegible]

হইতে উপযুক্ত কাষ্ঠখণ্ড সে সংগ্রহ করিল, তার খুঁজিয়া লইল। জেলখানার কারখানায় কাষ্ঠ খণ্ডগুলি ফাঁপা করিয়া পাইপ তৈরী হইল। এই সময়ে কে যেন পুস্তকখানি চুরি করিয়া লইয়া গেল। পুস্তকের অভাবেও জিম হতাশ হইল না। সে শুনিয়াছিল ইলিয়সের ইভ্যানষ্টনে ডাঃ বার্নেস নামে একজন নিপুণ অর্গ্যান-নির্মাতা রহিয়াছেন। জিম তাঁহাকেই চিঠি লিখিল। ডাঃ বার্নেস অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পাঠাইয়া দিলেন এবং পরে একদিন জেলখানায় আসিয়া জিমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার উপদেশ মত জিম অর্গ্যানটি তৈরী করিতে লাগিল। কারাকর্তৃপক্ষ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া অর্গ্যানের মূল্যবান অংশসমূহ খরিদ করিতে ২৫ ডলার প্রদান করিলেন। অর্গ্যানটি নির্মিত হইল। উহাতে ৫১৪টি পাইপ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল আট সারিতে এবং আকারে হইল 'ষ্টাণ্ডার্ড' টুয়ের মত।

সমগ্র আমেরিকার জেলখানাসমূহে এই দ্বিতীয়বার কয়েদী দ্বারা একটি অর্গ্যান তৈরী হইল। প্রথমবারের অর্গ্যান তৈরী হইয়াছিল সিংসিং জেলে। কিন্তু অর্গ্যানের নির্মাণ শেষ হইলে যে দিন নির্মাতা-কয়েদীর মুক্তির আদেশ হয়, সে ঐ অর্গ্যানটিকে ভাঙিয়া রাখিয়া যায়। সুতরাং ইহাই একমাত্র অর্গ্যান যাহা জেলখানার কোনও কয়েদী নির্মাণ করিয়াছে।

ধর্ম্মরাজ পূজা

(২৯১ পৃষ্ঠার পর)

গাজন বারদিন ধরিয়া হয়, বারজন ভক্ত মিলিয়া গাজন করিতে হয়। ধর্ম্মরাজ পূজা বিধানে অথবা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় সম্পাদিত ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গলের পরিশিষ্টে গাজনের যে ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার সঙ্গে আমাদের গ্রামের ধর্ম্মপূজার আচার নিয়মের সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু উল্টাপাল্টা হইলেও কয়েকটি অনুষ্ঠানই আমাদের গ্রামের ধর্ম্মরাজ পূজায় প্রতিপালিত হইতেছে। কামিন্যা স্থাপন ও মুক্তি আনয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান আমাদের এ অঞ্চলে কোথাও প্রতিপালিত হয় না। নিমজল খাওয়ার কথা কোন পুঁথিতেই পাইলাম না। শবদাহ করিয়া, কিম্বা অশৌচান্তের প্রথম দিনে ক্ষৌরকার্য্য সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া আমাদের অঞ্চলে লোকে নিমজল মুখে দেয়। আমার সন্দেহ হয়, এই ক্ষুদ্র পল্লীর এই নিমজল খাওয়ার অনুষ্ঠান কি বুদ্ধদেবের তিরোধান এবং তাঁহার দেহ সমাহিত করার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়? এই দিন যজ্ঞ-তিলক না লওয়ার কারণ কি অশৌচের স্মৃতি? আমাদের গ্রাম্য উৎসবে পূজা-পার্ব্বণে যে কতদিনের কত স্মৃতি জড়িত আছে, কত বাহিরের আচার অনুষ্ঠান মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে, আমরা কি তাহার সন্ধান লইব না।

বিশ্বাসঘাতক

(২৬৬ পৃষ্ঠার পর

এর বিধান যেমনি অমোঘ এর পরিণতিও তেমনি ধ্রুব। তৎক্ষণাৎ সে তার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলে; নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সে এক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রীক টেলিফোনে ও নিজে টেলিগ্রাফ করে তার দেশের রাষ্ট্রনায়কদের জানিয়ে দেয় এই অদূর ভবিষ্যতের নিশ্চিত বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী আর সেই অচিন্তনীয় চরমপত্রের মর্ম্ম। বিদ্যুতের মত সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত। এতদিন যারা নীরবে, বিনা প্রতিবাদে রাইখের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করছিল তাদের ধৈর্য্যের বাঁধ যেন সহসা ভেঙ্গে গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমগ্র ইউরোপ এক সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত হয়ে গেল এই নিরঙ্কুশ অন্যায়ের গতিরোধ করবার জন্য। রুমানিয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা সমরসাজে সজ্জিত হ'ল তাদের জন্মভূমিকে রক্ষা করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এই বিরাট বাহিনীর সঙ্গে ভাগ্য পরীক্ষা করা সেই দুর্ম্মদ অত্যাচারী যুক্তিসংগত মনে করল না: তার এই প্রথম সংকল্প বিচ্যুতি হ'ল, সহায় সম্বলহীন এক চৌত্রিশ বৎসরের যুবকের কৌশলে তার মুখের গ্রাস নিরাপদে আত্ম-রক্ষা করল। সে তখন প্রতিজ্ঞা করল যেমন করেই হোক যে কৌশলী ভেতরের কথা ফাঁস করে দিয়ে তাকে বিপর্য্যস্ত করেছে তার ঠিকানা সে বার করবেই এবং তার ধৃষ্টতার শাস্তি যেমন করেই হোক, সে দেবেই।

"দিন কয়েকের চেষ্টার ফলেই বলকানের গুপ্তচর বিভাগ তার সন্ধান পেয়ে গেল। তখনই তার ডাক পড়ল সেই রহস্যাবৃতা নারীর নিকট যে ছিল ঐ বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্রী। সে বুঝলে যে তার ঋণ শোধের ডাক এসেছে, এবার তাকে যেতে হবে। নির্ভাবনায়, সানন্দচিত্তে, হাসিমুখে সে বেরিয়ে পড়ল। যথাসময়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল সেই রহস্যময়ীর সান্নিধ্যে। কোনও কথা না বলে তিনি টেবিলের ওপর ন্যস্ত একটি রিভলবারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন। মৃদু হাসির সহিত সেটি তুলে নিয়ে তার চিরপ্রিয় গানটি গাইতে গাইতে মাথার খুলিতে নলটি লাগিয়ে ঘোড়া টেনে দিল।........আজীবন ভাগ্যদেবতার সঙ্গে অসম-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত সৈনিক আজ শেষ যুদ্ধে হ'ল জয়ী তাই মৃত্যুর পরেও তার মুখে তৃপ্তির হাসিটি অম্লান ছিল।" ঘরের কোণে তরুণীটি অকস্মাৎ অস্ফুট আর্ত্তনাদে সকলকে সচকিত করে দিয়ে সম্বিৎ হারালেন। চারিদিকে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল।

নিশির ডাক

(গল্প)

শ্রীনিত্যানন্দ দাশগুপ্ত

রাত্রিকে আমি ভালবাসি—ভালবাসি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একাগ্র আবেগ দিয়ে। যূথি শুভ্র ভোর আমার জন্য নয়, সে আমার কাছে মৃত্যুপাণ্ডুর, ফ্যাকাশে; গোধূলির গোলাপ-রাঙা আলোর খেলার আতিশয্য আমার ভাল লাগে না, ভাল লাগে না রৌদ্র-দগ্ধ ক্লান্ত দ্বিপ্রহর। আমি ভালবাসি রাত্রিকে।

সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যশোভা বা সুন্দরী নারীকে স্বভাবতই যেমন লোকে ভালবাসে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে, তেমনি অনায়াস বিচারতর্ক বিমুক্ত, রাত্রির জন্য আমার এ ভালবাসা। সে একটা পরিপূর্ণ রূপ ধরে, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়; আমি তাকে শুধুমাত্র দেখি না, আমি তাকে স্পর্শ করি, নিশ্বাসের সঙ্গে তাকে গ্রহণ করি, কান পেতে শুনি তার বুকের শব্দ। নীল আকাশের কোমল বুকে কবোষ্ণ বাতাসের ছায়ায়, সুকণ্ঠ পাখীদের গানের সুরে কবিরা উৎফুল্ল হোক্ আপত্তি নেই; কিন্তু আমি ভালবাসি নিঃশব্দ রাতের বুকে পেচকের তীক্ষ্ম আর্তনাদ, রজনীগন্ধার মাতাল গন্ধে ভারী বাতাসের বুকে অশরীরীর পদবিক্ষেপের মত, তার পাখ ঝাপ্টানির নরম শব্দ।

দিন আমাকে ক্লান্ত করে, বিতৃষ্ণায় ভরে তোলে আমার দেহ মন। শেলীর মত আমার অন্তরাত্মা রাত্রির প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে ওঠে। দিনের আলোর অশ্লীলতা, তার নগ্ন বাস্তবতা আমায় পীড়া দেয়, আর পীড়া দেয় তার রুক্ষতা, তার বিশ্রী কলকোলাহল। সন্ধ্যা বেলায় সূর্য যখন অস্ত যায় আমার সমস্ত সত্তা পরিপ্লুত হয় অধীর আনন্দে, আমি লাভ করি নবজন্ম। গোধূলির অন্তিম ধূসরতা মিলিয়ে যায় যখন ঘনায়-মান রাত্রির অন্ধকারে, যখন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয় তার ছায়া, আমি বিস্মিত আনন্দে চেয়ে থাকি। আমার বিগত যৌবন আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে—আমার প্রতি শিরায় শিরায় রক্ত কণিকার অন্তরে।

কোন এক রহস্যাবৃত মায়ায় রাত্রির অতল তলে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, আমি এক হয়ে যাই রাত্রির সঙ্গে। রাত্রির ফুটন্ত নাম-না-জানা ফুলের বুকে আমি অনুভব করি আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।

একা, রাত্রির নির্জন অন্ধকার বনানীর ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করা আমার একটা বিলাস। উত্তেজনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে আমার মন, কলোম্বাসের মত এ যেন একটা নূতন দেশ আবিষ্কারের অভিযান।

কাল ছিল অমাবস্যার রাত্রি—পিচ্‌কালো অন্ধকার রাত্রি। ঘন মেঘের প্রলেপে তারার আলোও নিশ্চিহ্নে মুছে গিয়েছিল। তার দুর্দমনীয় আকর্ষণে আমি বাইরে গেলাম, বনবীথি দিয়ে অগ্রসর হলাম সীন নদীর দিকে। রাত্রি তখন সামান্যই, পথে পথে, ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে আলো, দিনের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষীণ প্রচেষ্টা।

কাফে থেকে বাতাসে ভেসে আস্‌ছিল পানরত জনতার কলগুঞ্জন। কয়েক মিনিটের জন্য ঢুকলাম একটা থিয়েটারে, কিন্তু সেখানকার আলোর প্রাচুর্য আমায় আঘাত করল, আবার বেরিয়ে পড়লাম পথে। তারপর বনের মধ্যে ঢুকলাম; কিন্তু তার মধ্যেও বাস্তব সভ্যতার কঠিন কবল থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না। পথের আলোর শিখা অসীম ঔদ্ধত্যে উঁকি মেরেছে বনের শ্যামল বুনটের ফাঁকে ফাঁকে, আর রুদ্ধ অন্ধকার হিংস্র জন্তুর মত তাকে চারিদিক থেকে পিষিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে। কি ভীষণ নিঃশব্দ সংগ্রাম।

বনের ভিতর ঢুকে প্যারীর রাজপথের কাছ থেকে শেষ-বিদায় নেবার জন্যই যেন একবার তাকালাম তার দিকে। বনের সুস্নিগ্ধ অন্ধকারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মনে হল একটা আলোর নদীর মত প্যারীর বুকের উপর দিয়ে উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে আর্ক দী ট্রিয়াম্পি। বনের প্রান্তে আর রাস্তার সীমায় অতীত এবং বর্তমান হাতধরাধরি করে দাঁড়িয়েছে যেন।

বনের ভিতর কাটিয়ে দিলাম অনেকক্ষণ। আমি ছিলাম তখন স্বপ্নাবিষ্টের মত কোন কিছু ধারণা করার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি না উন্মত্ত না প্রকৃতিস্থ—কি একটা অজানিত আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হচ্ছিল। কোন কিছু অবিশ্বাস করার শক্তি ছিলনা আমার, কোন কিছুই সেদিন আমাকে বিস্মিত করতে পারত না।

বনের থেকে যখন আমি আবার আর্ক দী ট্রিয়াম্পিতে এলাম, তখন সময় সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাও আমার ছিল না। মস্ত বড় শহরটা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, আর তার মাথার উপর প্রলয়ের ইঙ্গিত নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে কালো, কুঞ্চিত, কুটিল পুঞ্জীভূত মেঘ।

সহসা আমি অনুভব করলাম অস্বাভাবিক, নূতন একটা কিছু ঘটবে। মনে হল বাতাস উঠেছে ভারী হয়ে, মৃত্যুর তুহিন-শীতলতা চেপে বসেছে পৃথিবীর বুকে। আর আমার প্রিয়তমা রাত্রির চোখে মুখে যেন আমাকে গ্রাস করার লোলুপতা।

চারিদিক নির্জন। পথ জনশূন্য। কিসের আকর্ষণে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি অগ্রসর হলাম সীনের দিকে। হঠাৎ কি মনে করে রাস্তার আলোয় পকেট থেকে বার করে ঘড়িটা দেখলাম। তখন দুটো বেজে গেছে।

পথ চলার একটা দুর্দমনীয় স্পৃহা আমাকে পেয়ে বসল। এর পূর্বে এত রুক্ষ রাত্রির স্পর্শ আমি লাভ করি নি। আমার রাত্রির অভিজ্ঞতা আজ আরোহণ করেছে তার চরম সীমায়। আকাশের দিকে তাকালাম, দেখলাম তারাগুলিকে হত্যা করে মেঘ নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে।

তখন আমি একা। আত্মবিস্মৃতভাবে পথ চল্‌তে চল্‌তে চেতু দী ইউতে একটা মাতালের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। লোকটা অর্ধস্ফুট ভাষায় কি খানিকটা বল্‌তে বল্‌তে, টল্‌তে টল্‌তে চলে গেল। কিছু সময়ের জন্য ফুটপাত তার ছন্দহীন চলা চাপে ক্ষীণ আর্তনাদ করে উঠল। আবার সব চুপচাপ্।...একটা গাড়ী চলার শব্দ। আমি চীৎকার করে ডাকলাম ড্রাইভারকে.. কোন সাড়া নেই। কি উদ্দেশ্যে এত রাত্রে ও চলেছে?.....কি

আছে ঐ গাড়ীর ভিতর?...রু ড্রোমটের কাছে একজন ক্ষুধার্ত, ব্যর্থকাম দেহপণ্যা নারী হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকল। তার শীর্ণ প্রসারিত বাহু এড়িয়ে আমি চলে গেলাম। আরও কিছু দূরে এগিয়ে দেখলাম একটা লোক মাছ ধরছে ঝরণার কাছে, পাশে তার লণ্ঠনটা জ্বলছে একটা রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডের মত।

তাকে পিছে ফেলে আমি এগিয়ে গেলাম। চলার নেশা আজ আমাকে মাতাল করে তুলেছে। কিন্তু নিস্তব্ধতা আজ যেন আমার কণ্ঠরোধ করবার উপক্রম করেছে। কোথায় গেল সব নর-নারীর দল, যারা ভয়ংকর জীবাণুর মত বিষাক্ত করে তুলেছে প্যারীর প্রত্যেক অংগ-প্রত্যংগ?

সহসা, অকারণে ভয়ে শিউরে উঠলাম। আশার শেষ [illegible] পথের আলোগুলিও গেল নিভে। ভীষণ অন্ধকার সমুদ্রে আমি একা। কালির মত কালো অন্ধকার, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আমাকে সন্দিগ্ধ করে তুললো।

ভয়ে আমার সর্বাংগ শিথিল হয়ে এল—মাতালের মত টলতে টলতে আমি অগ্রসর হলাম। আমার এ ভয়ের কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। হত্যার ভয় বা অপহৃত হবার ভয় আমার ছিল না, যদিও সে অন্ধকারে নিশ্বাস [illegible] মত অনায়াসেই তা ঘটে যেতে পারে। অস্বাভাবিক নির্জনতা না [illegible], শ্বাসরুদ্ধকারী নৈশব্দ্য অন্ধকারই আমাকে [illegible] পাগল করে তুলেছিল।

"আলো! আলো!" [illegible]

[illegible]

কোন প্রত্যুত্তর এল না।

[illegible] আঘাত করলাম দুয়ারে। কিন্তু কোন সাড়া এল না। এ যেন মৃত্যু [illegible]—[illegible] ক্ষীণতম স্পন্দন নেই এখানে। ভয়ে আমার [illegible] কেঁপে উঠল। [illegible] সমস্ত নগরী কি পাথর হয়ে গেল? [illegible] লাগলাম, পাথরের [illegible] আঘাতে [illegible] হল আমার ক্ষত-বিক্ষত কিন্তু তবু পেলাম না বিন্দুমাত্র সাড়া। আমার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হল, দুঃসহ নির্জনতায় পড়ল না বিন্দুমাত্র ছেদ।

পকেট থেকে আবার ঘড়িটা বার করলাম 'টিক, টিক' শব্দ শোনার জন্য।

সেটা বন্ধ।

আমার সর্বশেষ বন্ধুও আমায় পরিত্যাগ করল।

ভয়ে চীৎকার করতে লাগলাম। এ চীৎকার কাউকে না কাউকে শোনাতেই হবে, লোক জড়ো করতেই হবে আমার চারিদিকে। জীবন্ত মানুষের স্পর্শ না পেলে আমি বাঁচব কি করে?

"রক্ষা কর, রক্ষা কর", আমি প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগলাম। বাথায় কণ্ঠনালীর শিরা উপশিরা টনটন করে উঠল। তবু আমি চীৎকার করতে লাগলাম, "রক্ষা কর আমায় রক্ষা কর!"

কিন্তু কেউ এলনা আমায় রক্ষা করতে। আমার অসহায় অবস্থাকে ব্যংগ করে আমার চীৎকার মিলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল দিগন্তে। সহসা আমার চোখে এসে লাগল কলো হাওয়ার একটা ঝাপটা। বুঝলাম সীনের অতি নিকটে আমি এসে পড়েছি।

সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করে শ্রবণশক্তিতে আমি শুনতে পেলাম জলের ক্ষীণ [illegible] শব্দ।

"[illegible] সীনের কাছে এলাম," [illegible] আমি চীৎকার করে উঠলাম। [illegible] না শহরের [illegible] কিছু [illegible]?"

[illegible] আমি তীর বেয়ে নামতে লাগলাম, সীনের কোলের কাছে। হাঁ, ঐ তো তীরে জলের ধাক্কা লাগার শব্দ—সীনের [illegible] থেমে যায়নি—সীনই যে বয়ে চলেছে [illegible] মত। আনন্দে অধীর হয়ে আমি জলে হাত দিলাম। আঃ, কি ঠাণ্ডা জল, মায়ের কোলের মত ঠাণ্ডা আর কিছুক্ষণ পরেই দিনের আলোকে হেসে উঠবে সীন নদী, আর সেই হাসির সংগে আসবে আমার মুক্তি—রাত্রির কম্পন থেকে আমার মুক্তি।

কিন্তু, কিন্তু! এ কোথায় নেমে এসেছি আমি! গভীর জল—আর উঠে যাবার শক্তি আমার নেই। আজ আমার মৃত্যু—রাত্রি, আমার প্রিয়তমা রাত্রি আমাকে মৃত্যুর পথে আকর্ষণ করে এনেছে—দুঃসহ অভিমানে বিষিয়ে উঠল আমার বুক। মৃত্যু আশপাশারের মত রাত্রি আর মৃত্যু।

---

* মোপাসাঁর A Nightmare গল্পের অনুসরণে।

জার্ম্মান-রুষ সন্ধিতে ইংরেজ

পূর্ব্বে পশ্চিমে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা কয়েকদিন হইল বিশেষ রকমেই ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গত সোমবারদিন ছুটি হইতে ফিরিয়া পররাষ্ট্র সচিব প্রমুখ মন্ত্রীদিগকে লইয়া বৈঠক করিয়াছেন। সব দিক হইতে কেবল এই কথা শুনা যাইতেছে যে, সমস্যা জটিল। পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস-এর বৃটিশ রাজদূত পোল্যাণ্ডে যে সব বৃটিশ অধিবাসী আছে, তাহাদিগকে পোল্যাণ্ড ত্যাগ

হিট্‌লার

ষ্ট্যালিন

করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। পশ্চিমে উত্তেজনার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়াছে ডানজিগ। জার্ম্মানী কি জোর করিয়া ডানজিগ দখল করিয়া লইবে এবং সেজন্য তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস বিনা যুদ্ধে রাজ্য-বিস্তারের যে কৌশল হের হিটলার এ পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন, ডানজিগের পক্ষেও তাহাই সফল হইবে অর্থাৎ পোল্যাণ্ডকেই লক্ষ্মীছেলের মত হের হিটলারের দাবী মানিয়া লইতে হইবে। রুশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর মিতালির পর পোল্যাণ্ডের পক্ষে ইহা ছাড়া অন্য উপায় আর নাই। জার্ম্মানী ইংরেজকে বুড়ো

বোকা বানাইয়া ছাড়িয়াছে, এই চুক্তিই তাহার প্রমাণ। রুশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর বাণিজ্য চুক্তির কথা যখন আমরা প্রথমে শুনিয়াছিলাম, তখনই অনুমান করিয়াছিলাম কোন্ বৃক্ষের কি ফল। ইংরেজ রুশিয়াকে ফ্রান্স-ইংরেজ চক্রের মধ্যে আনিবার জন্য যতটা চেষ্টা করিয়াছিল সব ব্যর্থ হইল, মোটের উপর জার্ম্মানীর এই চালে ইংরেজের পররাষ্ট্র নীতি একেবারে বানচাল হইয়া গেল। জার্ম্মানীর সঙ্গে রুশিয়ার রাজনীতিক

মৈত্রী চুক্তি পাকা হইতে দিন কয়েক মাত্র বাকী; এই চুক্তির প্রভাব শুধু পোল্যাণ্ডের রাজনীতিক অবস্থার উপরই যে পড়িবে ইহা নহে, বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ এবং সমগ্র ইউরোপের রাজনীতিক অবস্থার উপর স্পষ্টভাবে ইহার ফল ফলিবে। ফন প্যাপেন রাষ্ট্রনীতিক কূট-কৌশলে একজন ওস্তাদ লোক। অষ্ট্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা সে পরিচয় পাইয়াছি, এক্ষেত্রেও মস্কোতে গিয়া অঘটন তিনি ঘটাইলেন। জার্ম্মানীর সঙ্গে রুশিয়ার মিলন—যাহারা একে অপরের অবিসংবাদিত শত্রু বলিয়া গণ্য হইত এবং যে দুই শক্তির চিরন্তন শত্রুতাকে সম্বল

করিয়া ইউরোপের তথাকথিত শান্তিবাদী ইংরেজ-ফরাসী বুকে বল পাইতেন, আজ হইল তাহাদেরই মধ্যে মিল। ইংরেজের নেহাৎ-ই দুর্দ্দিন পড়িয়াছে বলিতে হইবে।

রুশিয়ার সংগে জার্ম্মানীর এই চুক্তির ফল স্পেন এবং জাপানের উপর কেমন হইবে, ইহাই হইতেছে বিবেচ্য বিষয়; সম্ভবত ইংরেজ-ফরাসী কিছুদিন সেইদিক দিয়া কূটনীতির কৌশল কোনরকমে খাটান যায় কি না সেই চেষ্টায় থাকিবে; কিন্তু বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। জার্ম্মানীর এই চাল যে মুসোলিনী কিংবা জাপানের প্রধান মন্ত্রীর অগোচর ছিল, এরূপ মনে করিবার কোন কারণই নাই। ডানজিগের ব্যাপারে ইটালী আগাগোড়া জার্ম্মানীকে সমর্থন

জার্ম্মাণীর সমরাস্ত্র কারখানায় প্রধান সেনাপতি ফন্ ব্রাউচিৎস্

করিয়াছে; ফ্রাঙ্কোর অধীনে স্পেনের নূতন গবর্ণমেণ্টের এমন ক্ষমতা নাই যে, হিটলার-জার্ম্মানী এবং সেই সংগে রুশিয়ার জোটকে সে উপেক্ষা করিবে। মধ্য ইউরোপে হিটলারী কর্তৃত্ব ইহার ফলে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভূমধ্য-সাগরের তীরে জাঁকিয়া বসিবে ইটালী। কয়েকদিনের মধ্যে সে তিউনিসের দাবী করিয়াও বসিতে পারে। বেচারা ফ্রান্সের অবস্থা দাঁড়াইবে ঘর-বন্দীর মত; তাহার কোন আটঘাটই কাজে আসিবে না।

এই ত গেল ইউরোপে ইংরেজের অবস্থা। এশিয়ার পূর্ব্ব-দিকেও তাহার অবস্থা আরও কাহিল। টোকিওতে জাপানের সংগে ইংরেজের মিটমাটের যে কথা চলিতেছিল তাহা ফাঁসিয়া গিয়াছে। জাপানীরা স্পষ্ট কথাতেই এখন জানাইয়া দিয়াছে যে, জাপানীরা টিয়েনসিন প্রভৃতি স্থানের চীনা মুদ্রা তাহাদের হাতে দিবার যে দাবী তুলিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ইংরেজের প্রশ্ন করিবার কোন অধিকারই তাহারা স্বীকার করে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইংরেজকে জাপান চীনের ব্যাপারে কোনরকম গুরুত্ব দিতেই প্রস্তুত নয়, ইংরেজ চাই তাহার সংগে মিতালি করুক আর না করুক। টিয়েনসিনে জাপানীদের প্রভাব ইংরেজের উপর তো এতখানি দাঁড়াইয়াছে; এতদিন পরে আবার হংকংএর পালাও আরম্ভ হইয়াছে। জাপানীরা সমুদ্রপথে সেনা নামাইয়া চারিদিক হইতে হংকং বন্দরকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে পুরোপুরি অবরোধ এখনও আরম্ভ না হইলেও জাপানীদের মর্জ্জি হইলেই যে কোন মুহূর্ত্তে আরম্ভ হইবে। জাপানীদের ইংরেজের কাছে কার্য্যত দাবী এই যে, চীন সাধারণতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার যে সুমহান্ শান্তিব্রতে তাহারা ব্রতী হইয়াছে, সেই ব্রতে ইংরেজকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে হইবে; ইংরেজ অবশ্য এ পর্য্যন্ত এই দিক হইতে জাপানের মন কম যোগায় নাই। চীনে জাপানের আক্রমণ যে সংগ্রাম নয়, শান্তিরক্ষার তাহা সামিল, একথা সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে; কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই; জাপানের কাজে তাহাকে অধিকতর প্রত্যক্ষ সাহায্য করিতে হইবে, জাপান ইহাই চায়। ইউ-রোপের ব্যাপারে ইংরেজের এই নীতি-বিপর্য্যয় ইংরেজকে এশিয়ায় অদ্ভুত অবস্থায় ফেলিবে। সেদিক হইতে তাহার নড়িবার চড়িবার কোন শক্তিই আর থাকিবে না। জাপানের সংগে রুশিয়ার বিরোধের যে সম্ভাবনা এতদিন সে নিজের পক্ষের অনুকূল বলিয়া গণ্য করিত, জার্ম্মানীর সংগে রুশিয়ার মৈত্রীতে ইউরোপে সেদিক হইতে সে যেমন দুর্ব্বল হইল, এশিয়াতেও কার্য্যত তাহাকে তেমনই দুর্ব্বল হইয়া থাকিতে হইবে; কারণ, জাপান যে জার্ম্মানীর সংগে মৈত্রীবদ্ধ রুশিয়ার শত্রুতার সম্মুখীন হইতে সাহস পাইবে, ইহা

কিছুতেই মনে হয় না। চীনের অবস্থা দাঁড়াইবে কি, ইহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয় হইয়া পড়িল। চীন রুশিয়ার নিকট হইতে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইবার জন্য এতদিন যে সাহায্য পাইতেছিল, ভবিষ্যতেও তাহা পাইবে কি? আমাদের মনে হয়, এই ব্যাপারের পর চীনের সঙ্গে জাপানের সন্ধির দিন কাছাইয়া আসিবে এবং যে সন্ধি হইবে, তাহাতে চীনে এবং প্রকৃতপক্ষে এশিয়ার পূর্ব্ব সীমান্তে ইংরেজের আর কোন প্রভাব থাকিবে না। এই সন্ধির প্রতিবন্ধকতা করিতে হইলে চীনে ইংরেজের পররাষ্ট্র নীতি যতটা দৃঢ়তার সঙ্গে চালানো দরকার, ইউরোপের ধূমায়িত আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার মধ্যে চীন সাধারণতন্ত্রের অখণ্ড অধিকারের পক্ষে ততটা করিবার

রিবেনট্রপ

শক্তি ইংরেজের নাই। যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে কি চীন, কি জাপান উভয় শক্তিকেই এখন মীমাংসার পথে আসিতেই হইবে। চীনে জাপানের যে প্রভুত্ব রুশিয়ার পক্ষে শংকাজনক হইতে পারে, জাপানের পশ্চিমা মিত্র ইটালী কিংবা জার্ম্মান সন্ধির সর্ত্তসমূহ পুরাপুরি প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত অনুকূল নীতি জাপানকে বাধ্য হইয়া অবলম্বন করিতে হইবে; পক্ষান্তরে চীনের পক্ষেও দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালান সম্ভব হইবে না—ইংরেজের তো তাহাকে সাহায্য করিবার ফুরসুৎ-ই নাই; যে রুশিয়ার সাহায্য চীন এতদিন পাইতেছিল, সেই রুশিয়ার দিক হইতে নানা কারণে তেমন সাহায্য সে পাইবে না। সুতরাং নিজের অখণ্ড অধিকার কিছু ক্ষুণ্ণ করিয়াই চীনকে মিটমাটের মধ্যে আসিতে হইবে। আপাতত পরিস্থিতির সম্বন্ধে মোটা-মুটি এই কয়েকটি কথা বলা যাইতে পারে মাত্র। রুষ-জার্ম্মানী সন্ধির সর্ত্তসমূহ পুরাপুরি প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার অধিক বেশী কিছু বলা সম্ভব নহে। মোটের উপর কথাটা এই যে ইংরেজের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার যে দৈন্য বর্ত্তমানের এই পরিস্থিতিতে প্রকটিত হইল, জগতের ইতিহাসে রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে ইংরেজের এমন দৈন্য আর কোন দিনই দেখা যায় নাই।

১৯৩০ সালের ১৩ই অক্টোবর হের হিটলার সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন, আমি আফ্রিকা ইটালীকে দিব এবং ভারতবর্ষ দিব রুশিয়াকে। এই ঘোষণা করিবার সময় হিটলার জার্ম্মানীর হর্তাকর্তা-বিধাতা হন নাই। বিলাতের 'নিউজ রিভিউ' পত্রের ১৯৩৯ সালের ১১ই মে সংখ্যাতে একটি চিত্রে দেখান হয় যে, হিটলার সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রুষিয়াকে ভারতবর্ষ দান করিবার ঘোষণা করিতেছেন এবং ষ্ট্যালিন ভক্তি—বিনম্রচিত্তে সেজন্য ইউরোপের এই শক্তিধর পুরুষের নিকট নতি জানাইতেছেন। রুষ-জার্ম্মান এই মিতালীতে আজ হিটলারের সেই প্রতিশ্রুতির কথা অনেকের মনে উদিত হইবে। বুঝা যাইবে যে, নয় বৎসর পূর্ব্বে হিটলারের মনে যে ধারণাটা কাজ করিয়াছিল, আজও তাহার মনের অবচেতন স্তরে তাহা উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। এই চুক্তির ফলে পূর্ব্বদিকে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবার সুযোগ রুষিয়া পাইলে এবং হিটলারও পশ্চিম দিকে হাত বাড়াইবার সুযোগ পাইবেন। সুতরাং এই চুক্তি ইংরেজ ও ফরাসী এই দুই শক্তির উদ্বেগের কারণ যে ঘটাইবে, ইহা নিশ্চিত। কয়েক মাস হইল জাপানীদের ভয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমানার দিকে নজর দিয়াছেন; কিন্তু এখন সে ভয় চাপা পড়িয়া প্রাক্‌কাজর্নী যুগের রুষিয়ার জুজুর ভয় ভারতের কর্ত্তাদের কাছে নূতন আকারে দেখা দিবে।

রুষ-জার্ম্মান চুক্তির ফলে ভারতের পক্ষে চিন্তার সত্যই কোন কারণ ঘটিয়াছে কি? এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। আমাদের বিশ্বাস, আপাতত তাহা নাই; পক্ষান্তরে ইউরোপের শক্তিসমূহের আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধের এই যে বিপর্য্যয়, ভারতের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের পক্ষে তাহা অনুকূলই হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের মদান্ধতা যত কমে, ভারতের স্বার্থের দিক হইতে ততই সুবিধা। রুষ-জার্ম্মান সন্ধিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি দুর্ব্বল হইয়াই পড়িবে এবং ভারত যদি আত্মশক্তি লইয়া এই অবসরে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়ায়, তাহা হইলে ইংরেজ ভারতের দাবী অস্বীকার করিতে সাহস পাইবে না। এই যে সুযোগ আসিয়াছে, তাহাকে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূলে লাগাইয়া লওয়া এখন ভারতের স্বাধীনতা-কামীদের বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে; কংগ্রেসের দক্ষিণী দল দূরদর্শিতার সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক এই পরিস্থিতির সুযোগ যদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, ভারতের দাবী রোধ করিয়া রাখিবে, ইংরেজের এমন শক্তি নাই। প্রয়োজন দূরের স্বার্থের অনুভূতি এবং ত্যাগমূলক কর্ম্মপদ্ধতি প্রয়োগের মত কিঞ্চিৎ সাহস। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি কি সে পথে যাইবেন?

চার অঙ্ক

(গল্প)

শ্রীনীহারবিন্দু বসু

রবিবারের ছুটী।
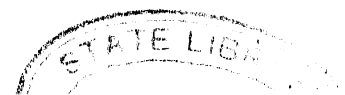
জীর্ণ শীর্ণ ঘুণে খাওয়া টেবিলটার উপর একখানি "করকোষ্ঠী বিচার" আর হাতবিহীন ছারপোকার রক্তে চিত্রিত চেয়ারটায় বসে বিভূতি একাগ্রমনে বইটির দিকে তাকিয়ে আছে।

কয়েকখানা হাতের ছবি, একটির পর একটি উল্টিয়ে চলেছে বিভূতি, আর মধ্যে মধ্যে বাজপাখীর মত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে নিজের ডান হাতের সঙ্গে তাদের কোন একটির যোগাযোগ সম্বন্ধ টেনে বার করছে। হ্যাঁ এই যে দীর্ঘরেখা তার হাতের তালু ভেদ করে বিজয়ী বীরের মত ঊর্দ্ধে উঠে গেছে এইত ভাগ্যরেখা, ঐ-ত তার ভবিষ্যৎ সুখের পূর্ণ লক্ষণ, কিন্তু সেত শনিক্ষেত্র পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায় নি, তা না হ'ক তবুও ওটা তার ভাগ্যরেখা তার ভবিষ্যৎ জীবনের আনন্দ। কে যেন তীক্ষ্ণ কুঠারের একটি আঘাতে মাঝ পথে রেখাটি কেটে দিয়েছে।

ওঃ কী স্পষ্ট তার ভাগ্যরেখা, ভবিষ্যৎ ওর উজ্জ্বল, অতুল ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, হ'ক না মাঝ-পথে ফাঁক, হতে পারে তা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তবু বিভূতি জানে, সেদিন আর বেশী দূরে নয়, যেদিন তার সৌভাগ্যশশী পূর্ণ জ্যোৎস্না নিয়ে তার ভাগ্যাকাশে উদিত হবে।

ঐ যে ক্রশ চিহ্নটি বৃহস্পতিক্ষেত্রে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ঐ ত বলে দেয় বিবাহে ঐশ্বর্য্য, সুখ ও শান্তি। কিন্তু বেচারী কি পেয়েছে বিবাহে; অর্থ, যা সে-ত অনর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর পথে। ভালবাসা শান্তি আজ না হ'ক দু'দিন পরে সে নিশ্চয় তা পাবে। রেখার ভাষা মিথ্যা হতে পারে না, হয় না। বিভূতি একমনে তার ভবিষ্যতের রঙিন কল্পনার জাল বুনে।

"ওগো শুনছ, খোকাকে একবার দেখসে, ও যেন ক্রমেই নেতিয়ে পড়ছে" স্প্রীং-এর মত বিভূতি লাফিয়ে ওঠে। ওর নেশা যায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে, কল্পনা ছুটে পালায় বহুদূরের পেছনে। "হাঁ তা ডাক্তার ডাক্তারের বাড়ী যেতে হবে ত? কিন্তু মলিনা তুমি দেখে নিও, আমি বলছি তুমি দেখবে, দু'দিন বাদে আমাদের আর এ কষ্ট থাকবে না। ওসব ডাক্তার বেটারা ভিড় করে আমাদের বাড়ী আসবে। কাউকে আর খোসামোদ করতে হবে না। আচ্ছা দেখি লক্ষ্মীটি তোমার হাত—হ্যাঁ বাম হাত—"

মলিনা জোর করে হাত ছাড়িয়ে নেয়, রুদ্ধ অশ্রু গোপন করার জন্য ফিরে দাঁড়ায়। বিভূতির মনটা মুহূর্ত্তের জন্য বর্ত্তমানে ফিরে আসে, কে যেন অলক্ষিতে তীব্র কশাঘাতে তাকে চকিত করে দেয়। আধ-ময়লা, ছেঁড়া পাঞ্জাবীর ভেতর মাথা লুকিয়ে, তালি দেওয়া ব্রাউন কেডস্-জোড়াটি পায়ে ঢুকাতে ঢুকাতে সে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু ফিরে আসতেই হয় তাকে, কারণ ডাক্তারের ভিজিট সে দিতে পারে নি, নিজের দারিদ্র্যতার উপর বিদ্রূপ আসে। ওরা মানুষে না আর কিছু, এক ফোঁটা ঔষধ একটু পথ্যের জন্য আজ তারা পরের কৃপা-দৃষ্টির দিকে সজল চোখে তাকিয়ে আছে, আর আর বাহিরের বুকে—না থাক—

ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ও খোকার বিছানার পাশে। শীর্ণ হাতখানি নিজের দু'হাতের মধ্যে তুলে নেয় আত সাবধানে। ছেঁড়া, ময়লা বিছানার দুর্গন্ধে ওর প্রতি রক্ত-বিন্দুটি পর্যন্ত যেন বিষিয়ে ওঠে—দীর্ঘনিশ্বাস, বুকের পুঞ্জিত কান্না চেপে স্ত্রীকে বলে, "দু' ফোঁটা শিউলি পাতার রস—"

পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবার অধিকার পর্যন্ত নাই ওর, বুক-ভরা পুঞ্জিত কান্না বুকেই চেপে রাখতে হয়। দীর্ঘনিশ্বাস বিভূতির পাঁজরগুলো যেন ভেঙে দিয়ে হু হু করে বেরিয়ে আসে। খোকার জীবন্ত কঙ্কালটির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর "করকোষ্ঠীর" মোহে পা পা এগিয়ে চলে চোরের মত।......

ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসটি হাতের উপর রেখে বিভূতি কি যেন দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, কি যেন বিড় বিড় করে বলে। আবার নিজেই তার মীমাংসা করে। নিজের মনে হাসে, ওর মুখের বিচিত্র ভাব-ভঙ্গী দেখে ওর ভিতরটা যেন বুঝা যায়।......

ঝড়ের বেগে মলিনা ঘরে ঢোকে, এক মুহূর্ত্ত বিভূতির মুখের উপর তীব্র দৃষ্টিতে তাকায়, তারপর বিভূতির হাতে গুঁজে দেয় বহুদিনের সঞ্চিত সিন্দুর রঙে রঞ্জিত লক্ষ্মীর টাকাটি, যা অনেক বড় বড় বিপদেও সে বার করতে পারেনি। হায়রে দারিদ্র!

টাকাটি পকেটে রেখে গম্ভীরভাবে বিভূতি বেরিয়ে পড়ে। মলিনার দিকে একবার তাকায়, হয়ত ভাবে, ওর হাতটি একবার দেখতে পারলে হ'ত। কিন্তু ওর কান্না-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বিভূতির করুণা হয়, ভাবে মলিনা আর কিছুটা দিন কেন সবুর করতে পারে না।

ঔষধ ও পথ্য কোনরকমে যোগাড় হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোকাকে কিছুতেই ঔষধ খাওয়ান যায় না। ঐটুকু ছেলের গায়ে যেন মত্ত হস্তীর বল আসে। জোর করে ঠেলে দেয় মায়ের হাত। অস্ফুট কি বলে বুঝা যায় না। মলিনা খোকার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ব্যাকুল হয়ে।

একটু একটু করে সেকেণ্ড, মিনিট, একটির পর একটি করে ঘণ্টার কাঁটাও এগিয়ে যায় সামনে কয়েক দাগ। খোকা একবার চোখ মেলে চায়, "মা" বলে ক্ষীণ ডাকে। মলিনা পাগলের মত ওর মুখে চুমা দেয়, বার বার ডাকে, কিন্তু খোকা কি হাবা মোটেই আর সাড়া দেয় না।

স্থির হয়ে মলিনা ছেলের রক্তহীন পাংশু মুখের দিকে তাকায়, তার দু' গণ্ড বয়ে শ্রাবণধারার মত অশ্রু নেমে পড়ে, বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস, অস্ফুট কাতরতা, তারপর মৃত্যুমলিন ছেলেকে বুকে নিয়ে বুভুক্ষু পীড়িতা মাতা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে ছেলের পাশে।......

"মলিনা, লক্ষ্মীটি দেখি এবার তোমার হাতটি—আর ভুল নাই—সব ঠিক" বলতে বলতে বিভূতি ঘরে ঢুকে। এক মুহূর্ত্ত বিভূতি স্তব্ধ হয়ে মূর্চ্ছিতা নারী ও ছেলেকে তাকিয়ে দেখে। খোকার নাকের কাছে ওর উত্তপ্ত হাতটি টেনে নিয়ে বিভূতি অশ্রুসজল চোখে বেরিয়ে পড়ে, ওদের দিকে চাইতেও ওর ভয় হয় এবার।

মাদক দ্রব্যের সমর্থনে মুসলিম লীগ

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

কংগ্রেস যেদিন মাদকতা বর্জ্জন নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, সেইদিনই অকাট্যভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে, কংগ্রেস ইসলাম-বিরোধী নহে। ইসলামের ধর্ম্ম ইসলামের পয়গম্বর পুনঃপুনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সকল প্রকার মাদকতা নিষিদ্ধ। ইসলামের পরবর্ত্তী ব্যবস্থাদাতাগণ মাদকতার বিরুদ্ধে বিধান-গুলি আরও কঠিন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের বিধান এই যে, শরীরের চামড়ায় মদ লাগিলে জায়গা চাঁছিয়া ফেলিতে হইবে। সুতরাং এই মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইসলামের বিধান অমান্য করিয়া বহু মুসলমান বর্ত্তমান সভ্যতার প্রভাবে পড়িয়া মদ ধরিয়াছে এবং মদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনকে তাহারা প্রীতির চক্ষে দেখে না। ব্যক্তিগতভাবে কোন লোক মদ খাইতে পারে এবং মদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক আন্দোলনকে নিন্দা করিতে পারে। কিন্তু সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রতি-নিধি বলিয়া যাহারা দাবী করে, তাহারা কোন্ লজ্জায় মদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে? এবং যাহারা মদ্যপান নিবারণ করিতে চাহিতেছে তাহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে? মিঃ জিন্না পরিচালিত মুসলিম লীগ এতাবৎ বহু ইসলাম বিরোধী কাজ করিয়াছেন। কিন্তু এবার লীগ বোম্বাই নগরে মদ্যপান নিবারণের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া ইসলামের এতদিনের সাধনা ও শিক্ষার মাথায় পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইল না। একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, বড় বড় শহরের বহু মুসলমান মদ্যপান করে। কলের শ্রমিক, কুলী মুটে-মজুর ও কৃষিজীবীদের অনেকেই মদ খায়। এমন কি অনেক শিক্ষিত লোক ও বড় বড় নেতাও মদ একেবারেই ছাড়িতে পারেন নাই। কেহ আকণ্ঠ পান করেন, আবার কেহ মাত্রাজ্ঞান রাখিয়া মদ পান করেন। সেইরূপ বহু অ-মুসলমানও মদ পান করেন। মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা করার অর্থই হইতেছে এইসব মদ্যাসক্ত ব্যক্তিদেরকে মদ্যের প্রভাব হইতে মুক্ত করা। মদ্যের কারণে মানুষের কিরূপ মানসিক নৈতিক ও আর্থিক ক্ষতি হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। যাঁহারা দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা কখনই মদ্যপান নিবারণের বিরুদ্ধে যাইবেন না বরং সমস্ত শক্তি দিয়া সেই প্রকার আন্দোলনকে সাহায্য করিবেন। এ-দেশের নানাস্থানে বহু মদ্যপান নিবারণী সভা আছে। এ পর্যন্ত তাহারা বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। মুসলমানদের মধ্যে মদ্যপান নিবারণের জন্য কখনও ব্যাপকভাবে চেষ্টা করা হয় নাই এবং উপরোক্ত মদ্যপান নিবারণী সমিতিকে মুসলমান সমাজের নেতারা সাহায্য করেন নাই। এরূপ উদাসীনতার ভাব দেখাইবার যে কি কারণ থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। যে কাজ মুসলমানদের নিজেদেরই করা উচিত ছিল তাহা তাঁহারা ত করিলেন না বরং অপরে করিতে গেলে কখনও থাকিলেন উদাসীন, আবার কখনও প্রকাশ্যভাবে দিলেন বাধা। অথচ দাবী করেন যে মুসলিম স্বার্থের ইঁহারাই ন্যাসরক্ষক।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বহুদিন পূর্ব্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেস মদ্যপানের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চালাইয়াছিল। দেশ হইতে মদ্যপান নিবারণ করা তাহার কর্ম্মপদ্ধতির প্রধান অবলম্বন ছিল। কত শত স্বেচ্ছাদেশসেবক ও সেবিকা কেবল মদের দোকানে পিকেটিং করিয়া কারাগার বরণ করিয়াছে, কত শত ছেলেদের মাথায় এইজন্য পুলিশের লাঠি চলিয়াছে। কিন্তু তবুও মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই। কিন্তু লজ্জার বিষয় এই যে, সে সময় লীগপন্থী মুসলিম নেতারা মদ্যের বিরুদ্ধে এই প্রকার আন্দোলনে যোগদান করেন নাই বরং তাঁহারা তৎকালীন সরকারকে এইসব আন্দোলন দমন করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং এইভাবেই তাঁহারা ইসলামের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন! কংগ্রেসের মদ্যপান নিবারণ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি প্রকৃতপক্ষে ইসলামেরই প্রস্তাব; মুসলমান অপারগ হইতেছে দেখিয়া অপরে যদি সেই কাজ করিতে যায়, তবে তাহাতে কি মুসলমানের কল্যাণ হইবে না? কিন্তু যেহেতু কংগ্রেস এই কাজে হাত দিয়াছে অতএব তাহাতে বাধা দিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ অমন একটা ইসলামসম্মত কাজেও বাধা দিতেছে শুধু তাই নয় সমস্ত শক্তি দিয়া সেই কাজকে পণ্ড করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। মুসলিম লীগের এই প্রকার হীন আচরণ হইতে বুঝা যাইবে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান অধিকতর আগ্রহের সহিত ইসলামের ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছে। কংগ্রেস করিতে চাহিতেছে মদ্যপান নিবারণ। আর মুসলিম লীগ করিতে চাহিতেছে মদ্যপানের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা।

কংগ্রেস এতদিন মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলনই করিতে-ছিল। কিন্তু মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর স্থির করিল যে, মদ্যপান নিবারণের জন্য শুধু আন্দোলন করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না। আইনের সাহায্যে মদ্যপান নিবারণ করিবে। একথা সত্য যে, নূতন শাসনসংস্কারে দেশবাসীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে আশানুযায়ী ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু যতটুকু ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার করিবার সুবিধা পাইয়া কংগ্রেস নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং কংগ্রেস ক্ষমতা হাতে পাইয়াই স্থির করিল মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের জন্য সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিবে। মাদ্রাজে, যুক্তপ্রদেশে, বিহারে এজন্য কিছু কিছু কাজ হইয়াছে। মাদকদ্রব্য দেশের স্বাস্থ্য ও মানসিকতার এরূপ ক্ষতি করিতেছে যে, তাহা বর্জ্জনের প্রস্তাব উঠামাত্রই সকলেরই আগ্রহের সহিত সমর্থন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছিষ্টপুষ্ট ব্যক্তিগণ ইহাতে আঁতকাইয়া উঠিলেন এবং কংগ্রেসের এই মহান ব্রতে বাধা দিতে লাগিলেন। অন্যান্য প্রদেশের দেখাদেখি সম্প্রতি বোম্বাই সরকার স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারাও মদ্যের বিরুদ্ধে আইন পাস করিবেন এবং প্রথম বোম্বাই শহর হইতে ও পরে সমগ্র প্রদেশ হইতে মদ্য রহিত করিয়া দিবেন। এই প্রস্তাব এত দূর যুক্তিসঙ্গত, বিবেকসম্মত ও ন্যায়সম্মত

যে, কাহারও ইহার বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নহে। কারণ মদ দেশ হইতে উঠিয়া গেলে তাহাতে দেশবাসীর লাভ। বিশেষত কল ফ্যাক্টরী অঞ্চল হইতে উঠিয়া গেলে শ্রমিক ও মজুরদের আর্থিক লাভ বেশী হইবে। তাহারা আয়ের অধিকাংশ টাকা মদে ব্যয় করে। ভাল খাইতে পায় না, পরিতে পায় না, স্ত্রী, পুত্র কন্যাদের ভরণপোষণ করিতে পারে না, কিন্তু তবুও মদ তাহাদের চাই-ই চাই। আইন করিয়া ইহাদের মধ্য হইতে মদ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বোম্বাই সরকার এইসব দিক বিবেচনা করিয়া এমন একটা পরিকল্পনা করিয়াছেন যাহার প্রভাবে তাহারাই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হইবে যাহারা মদ্যের দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু এমন একটা ইসলামসংগত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ আন্দোলন চালাইতে ত্রুটি করিল না। মুসলিম লীগ প্রায়ই দাবী করে যে, উহা ইসলামের মর্য্যাদা রক্ষক ও মুসলমানের স্বার্থরক্ষক। কিন্তু মদ্য নিবারণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া তাঁহারা ইসলামের কোন আদর্শ প্রতিপালন করিতেছেন? এবং মুসলমানের কোন স্বার্থ রক্ষা করিতেছেন? মোটের উপর মদ্য বর্জ্জনের প্রতি মুসলিম লীগের আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়াছে। ইহার পর মিষ্টার জিন্নার মুসলমান সমাজে মুখ দেখান উচিত নয়:

যে যে প্রদেশে মুসলিম লীগ শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, সেখানে তাঁহারা মদ্যের বিরুদ্ধে কিছুই করেন নাই বরং তাঁহাদেরই আওতায় মদ্যের প্রসার আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে আবগারী বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দের বিরুদ্ধে যেসব ছাঁটাই প্রস্তাব আনয়ন করা হয় লীগ মন্ত্রিগণ ইসলামের নামে সেগুলির বিরোধিতা করেন এবং লীগ সদস্যগণ বুক ফুলাইয়া ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া প্রস্তাব আনয়নকারী কৃষক প্রজাদলকে ইসলামের শত্রু বলিয়া গালাগালি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মদ্যের বিরুদ্ধে কোন পরিকল্পনা করিবার ক্ষমতা ইঁহাদের নাই। পাঞ্জাবেও এই অবস্থা। মুসলিম লীগ সাম্রাজ্যবাদেরই বাহন। সুতরাং যাহাতে সাম্রাজ্যবাদের মর্য্যাদা বিনষ্ট হয় তেমন কাজ তাঁহারা করিবেন না জানি। কিন্তু মদ্য নিবারণে তাঁহাদের কেন এত আপত্তি তাহা আমরা বুঝি না। যতদূর মনে হয়, তাহাতে বলিতে পারি, তাঁহারা ইহা দেখিতে পারেন না যে, কংগ্রেস দেশের ভাল করিবে, কংগ্রেসের নাম হইবে, আর তাঁহারা অপদার্থের মত ক্রমেই লোক লোচনের বহির্ভূত হইয়া যাইতে থাকিবেন। তাই নিজের ভাল করিতে না পারিলেও অপরের মন্দ করিতে কেন কাতর হইবেন? সেইজন্য তাঁহারা কংগ্রেসী প্রদেশের মদ্যপান নিবারণী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বোম্বাই-এ মুসলিম লীগের আচরণ সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে!

ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, মদ্য ব্যবসায় হইতে সরকারী তহবিলে প্রচুর টাকা আমদানী হয়। মদ্য ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইলে এই টাকা হইতে সরকার বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং এখানে দুইটি সমস্যা দাঁড়াইতেছে:—মদ্য ব্যবসায় বন্ধ করা যাইতে পারে কিনা, এবং বন্ধ করিলে সরকারী তহবিলের ঘাটতি কি ভাবে পূরণ করা সম্ভব হইবে। আগেই বলিয়াছি, মদ্য ব্যবসায় উঠিয়া গেলে তাহাতে দেশের লাভ হইবে। এটা ধর্ম্মের দেশ হইলেও, এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক মদ্যাসক্ত। ইহাদের কল্যাণ করিতে হইলে ইহাদেরকে মদ্যের প্রভাব হইতে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে। ইহার জন্য যত ক্ষতি স্বীকার হয় তাহা করিয়াও মদ্যের ব্যবসায় বন্ধ করা দরকার। দেশের উপকার করিব, জনকল্যাণ করিব অথচ অবাধে মদ্য বিক্রয় হইতে দিব, এই দুইটি বিষয় পরস্পর বিরোধী। মদ্যের প্রসার বন্ধ না হইলে ইহাদেরকে অধঃপতনের হাত হইতে উদ্ধার করা কোনক্রমেই সম্ভব হইবে না। অবশ্য ইহার জন্য সরকারের তহবিলে কিছু ঘাটতি হইবে। সেই ঘাটতি অতিরিক্ত কর দ্বারা আদায় করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমানে অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু একটা কথা ভাবিতে হইবে, দেশের লোক মদ খাওয়া ছাড়িয়া দিলে তাহাদের অর্থ নানাভাবে বাঁচিয়া যাইবে অথবা এমন সব কাজে ব্যয় হইবে যাহার জন্য তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে, ঘর দুয়ার ভাল হইবে, ভাল পরিতে পাইবে এবং অবস্থাও কিছু স্বচ্ছল হইবে। আর এই সব হইলে পরোক্ষভাবে কর বাবদ সরকারী তহবিলে অনেক টাকা আসিবে। তখন প্রত্যক্ষ করের হার কমিয়া যাইবে। এবং সর্ব্বশেষ ফল এই হইবে যে সাধারণ লোকের নৈতিক চরিত্রের সহিত দৈহিক স্বাস্থ্য সুন্দর, সুস্থ ও পবিত্র হইবে। এইজন্য বোম্বাই সরকার মদ্যের ব্যবসায় বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এবং ঘাটতি পূরণের জন্য অতিরিক্ত কর আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। ইহার বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগ প্রথম হইতেই মদ্য পানের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনটিকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেছিলেন না। জিন্না সাহেব তাঁহার স্বাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যবর্ত্তিতায় এই লইয়া নানাবিধ গণ্ডগোল পাকাইতেছিলেন। প্রকাশ্য ভাবে ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে গেলে প্রধান অসুবিধা এই হইল যে, হয়ত তাহাতে মুসলমান সমাজ চটিয়া যাইবে। তাহারা মনে করিবে যে, জিন্না সাহেব মদ্যের সমর্থক। তাই ধুরন্ধর ও সুচতুর নেতা জিন্না সাহেব কুটিল পথ অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ নিখিল ভারত লীগ পরিষদগণকে এ বিষয়ে নীরব হইয়া থাকিতে উপদেশ দিলেন; এবং লীগ-প্রধান প্রদেশের মন্ত্রীদেরকে বলিয়া দিলেন, তাঁহারা যেন মদ্যের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন না করেন। তারপর যখন সত্য সত্যই কংগ্রেসী প্রদেশের আইন সভায় মদ্য নিবারণের জন্য প্রস্তাব আসিল তখন লীগ নেতারা দুমুখো নীতি অবলম্বন করিলেন। প্রত্যেক লীগ সদস্য এই বলিলেন যে, নীতি হিসাবে তাঁহারা এই প্রস্তাবের নিন্দা করেন না, কিন্তু যেভাবে ইহা করা হইতেছে তাঁহারা তাহা সমর্থন করেন না। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহারা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। এই-ভাবে সাধারণ মুসলমানকে বুঝান হইল এক কথা, আর বাস্তবক্ষেত্রে তাঁহারা করিলেন একেবারেই উল্টা কাজ। বোম্বাই শহরে যখন মাদকদ্রব্য নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব আসিল, তখন মুসলিম লীগ ঠিক এইরূপে আচরণ করিল। প্রস্তাবের

বিরুদ্ধে তাঁহারা বিশেষ কিছু বলিলেন না। কিন্তু অতিরিক্ত করের বিরুদ্ধে তাঁহারা সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। অতিরিক্ত কর আদায় না হইলে মদ্য ব্যবসায় বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অর্থই হইতেছে মদ্য ব্যবসায় অব্যাহত রাখিতে উত্তেজিত করা। লীগপন্থীরা এইভাবে মদ্য পান নিবারণের বিরুদ্ধে আদাজল খাইয়া লাগিয়া গেলেন। বোম্বাইয়ের আইন সভায় যখন মদ্যসংক্রান্ত প্রস্তাব আসিল তখন অনেকেই চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাহা সমর্থন করিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত করের প্রস্তাবকে তাঁহারা উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। অর্থাৎ মদ্য সংক্রান্ত প্রস্তাবকে অচল করিয়া রাখিবার জন্য অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রস্তাব টিঁকিল না। অতিরিক্ত করের প্রস্তাবও পাশ হইয়া গেল। কিন্তু মহাসমারোহে যখন মদ্য নিবারণের প্রস্তাবটিকে কার্যকরী করিবার জন্য সমগ্র শহরে আন্দোলন হইতে লাগিল, তখন মুসলিম লীগ এমন একটা জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিল যাহার জন্য কেহই তাহাকে ক্ষমা করিবে না। এক দিকে শহরের সর্ব্বত্র মদ্য নিবারণের জন্য শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হইতেছে আর অন্য দিকে লীগের তত্ত্বাবধানে স্যার করীমভাই দশ সহস্র মুসলমানের দল লইয়া সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা করিতে বাহির হইলেন। অর্থাৎ যেখানে অ-মুসলমানগণ মদ্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেখানে মুসলিম নেতারা মদ চালাইবার জন্য মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। জয় ইসলামের! জয় মুসলিম লীগের! জয় মিঃ জিন্নার!

অতিরিক্ত করের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রধান অভিযোগ এই যে, মুসলমান মদ খায় না, সুতরাং মদ নিবারণ আইন তাহাদের উপর বর্ত্তিবে না। অতএব অতিরিক্ত কর হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি দিতে হইবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বলিব, তাঁহাদের এই দুই যুক্তি ভিত্তিহীন ও বিদ্বেষপ্রসূত। কে বলিল যে, মুসলমান মদ খায় না। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, হাওড়া প্রভৃতি কল, ফ্যাক্টরী অঞ্চলে মদের দোকানগুলি একবার ঘুরিয়া আইস, তাহা হইলে দেখিবে, মুসলমান মদ খায় কিনা। তারপর গাঁজা, আফিং, তাড়ী, চরস, ভাং এ সব নেশাতে আসক্ত মুসলমানের সংখ্যা কম নহে। এ ত গেল মুটে মজুরদের কথা। বড় বড় লোকদের বাটীর Boyদেরকে একবার জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে, মুসলমান মদ খায় কিনা। অপর সম্প্রদায় হইতে তাহার সংখ্যা কম হইতে পারে, কিন্তু মুসলমান মদ খায়—রীতিমতভাবে প্রত্যহ মদ খায়, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সুতরাং মদ্য-সংক্রান্ত আইনের যদি কিছু উপকারিতা থাকে, তবে তাহার অংশ মুসলমান নিশ্চয় পাইবে। আর উপকার যদি পাইবে তবে কেন সে কর দিবে না? এ বিষয়ে আমার দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, কর আদায়ের নীতি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে হইতে পারে না। কর দিলে কোন সম্প্রদায় বেশী উপকৃত হইবে তাহা দেখিলে চলিবে না। যাহার যেমন সমর্থ্য তাহাকে সেই পরিমাণ কর দিতে হইবে। জাতি অবিভাজ্য, রাষ্ট্র অবিভাজ্য। সাধারণ উপকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর আদায় করিতে হয়। সাধারণ শ্রমিক মজুর রাষ্ট্রকে যত কর দেয় তাহারা রাষ্ট্র হইতে তাহার অধিক সুবিধা পায়। আবার ধনিগণ যত কর দেয় তাহারা সেইরূপে সুবিধা পায় না। যে যত কর দেয় তাহাকে সেই অনুরূপে সুবিধা দিতে হইলে রাষ্ট্রের কাজ অচল হয়, রাষ্ট্র এক দণ্ড টিঁকিতে পারে না। বাঙলার কথা ধরা যাক। এখানে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার হইলে তাহাতে মুসলমানেরই বেশী উপকার হইবে। কিন্তু যেভাবে শিক্ষাকর আদায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে অ-মুসলমান, হিন্দু জমিদার, বণিক ও মধ্যবিত্তকেই অধিক কর দিতে হইবে। জমিদারদের ছেলেরা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষালয়ে কোনদিনই পড়িবে না। অথচ তাহাদিগকে শিক্ষাকর দিতে হইবে। বাঙলার হিন্দুদের আপত্তি যদি মুসলিম লীগ না শ্রবণ করে, তবে বোম্বাইয়ে অতিরিক্ত কর দিবার বিরুদ্ধে তাহার বলিবার কিছুই নাই। মদের কথা চাপা দিয়া অতিরিক্ত করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাটা লীগের একটা ধাপ্পাবাজীর চাল। তাহাদের আসল উদ্দেশ্য মদ্য বিক্রয় বলবৎ করা। কিন্তু সোজাভাবে সেরূপ করিতে সাহস পান নাই, তাই অন্য-ভাবে করের নামে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহার একটু বিবেক আছে তাহাকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, মুসলিম লীগ এইপ্রকার আচরণ দ্বারা ইসলামের আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করিল। আজ একটা বিষয় প্রমাণিত হইল যে, মুসলিম লীগ তথা মিঃ জিন্না ইসলামের স্বার্থ দেখেন না। তাঁহারা দেখেন সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থ। তাঁহারা জানেন যে, মদ্য নিবারণের এই উদ্যম সফল হইলে কংগ্রেসের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। আর কংগ্রেসের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইলে সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় ভিত্তি টলিয়া যাইবে। তাই আজ চারিদিকে কংগ্রেসের মর্য্যাদা বিনষ্ট করিবার জন্য আন্দোলন হইতেছে। কংগ্রেসের মধ্যে যে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহারও গোড়ায় এই মর্য্যাদানাশের ষড়যন্ত্র আছে। আর মুসলিম লীগ যে কংগ্রেসের অমন নির্দ্দোষ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছে তাহারও প্রধান কারণ কংগ্রেসকে লোকচক্ষুর নিকট খেলো প্রমাণিত করা। অন্য কোন নামে এরূপ করিলে আমাদের বলিবার কিছুই থাকিত না। কিন্তু ইসলামের নামে এইপ্রকার জঘন্য ষড়যন্ত্র দেখিয়া মনে বড় আঘাত লাগে। ইসলাম অত ছোট নয় যে, জিন্না সাহেবের মরজিমাফিক উহার আইন-কানুন নিয়ন্ত্রিত হইবে। মদ্য নিবারণের জন্য যে কোন আন্দোলন মুসলমান সমর্থন করিতে বাধ্য। সেই জন্য আমরা বোম্বাই সরকারকে অভিনন্দন জানাইতেছি যে, তাঁহারা ইসলামের ব্রত পালন করিতেছেন। মদ্য নিবারণের এই ব্রত সার্থক হউক। মুসলিম লীগের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া ভারতে জাতীয়তা ও মানবতার জয়যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হউক!

পুস্তক পরিচয়

বাজিকর—(বালক-বালিকাদের জন্য) গ্রন্থকার—শ্রীললিত-মোহন নন্দী। প্রকাশক—বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স, ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

দেশী-বিদেশী পাঁচটি গল্প এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। প্রথম গল্পের শিরোনামা হইতেই পুস্তকের নামকরণ। পৌরাণিক কাহিনীর বিচিত্রতা সহজেই ছেলেমেয়েদের প্রাণ স্পর্শ করে। বিদেশী উপকথায় তাহাদের কৌতূহল আরও বর্ধিত হইবে। বড় বড় ছবি, সুন্দর ছাপা, রঙিন মলাট, ছোটদের হাতে দিবার পরিপাটি পুস্তক।

রূপান্তরিতা—ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বসচক্র সাহিত্য সংসদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ২১১, মূল্য দুই টাকা।

ব্যোমকেশবাবুর উপন্যাসখানি আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া মানুষের জীবনের উপর যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহাকে কতখানি রূপান্তরিত করিতে পারে তাহা ব্যোমকেশবাবু ভাল করিয়াই দেখাইয়াছেন।

পবন ও অংশুমান একটির মধ্যে অসামাজ্য, স্বার্থপরতা প্রভৃতি ক্ষতিকারক গুণ কিরূপে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে সেই চেষ্টায় ব্যস্ত; অপরটির মধ্যে সরল সাধুতা আমাদের গ্রাণ করিবার জন্য ব্যগ্র। এই দুইটি বিরুদ্ধ স্বভাবের সংস্পর্শে আসিয়া দুইটি নারীর জীবনে কিরূপে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল তাহা ব্যোমকেশবাবু চিত্তাকর্ষকভাবেই দেখাইয়াছেন।

ডিটেকটিভ উপন্যাস নহে; তথাপি ইহার পাতায় পাতায় রোমাঞ্চ এবং উত্তেজনা, আমাদের ইহা আদ্যোপান্ত রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে পাঠ করিতে বাধ্য করে। এইরূপ কৃতিত্ব অর্জ্জন করা সহজ নহে। ব্যোমকেশবাবু ইহা আয়ত্ত করিয়াছেন।

পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

ব্রহ্ম বিজ্ঞান—স্বামী অভেদানন্দ। মূল্য আট আনা মাত্র। প্রকাশক দেবী মহাবিদ্যা, শ্রীশ্রীদোলগোবিন্দ আশ্রম। পোষ্ট-অফিস জগৎসী, জেলা শ্রীহট্ট।

গ্রন্থকার ঠাকুর দয়ানন্দ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জগৎসী আশ্রমের একজন সাধক। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ। আধ্যাত্ম জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই এই পুস্তক পাঠে আনন্দ পাইবেন।

সাহিত্য-সংবাদ

আনন্দমোহন বসু
রচনা প্রতিযোগিতা
(সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ)
(ছাত্র-ছাত্রীদিগের জন্য)

এই বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে উক্ত প্রতিযোগিতায় ২৫্ টাকা করিয়া তিনটি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। রচনার বিষয়ঃ—

১। আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জীবনের বৈশিষ্ট্য। (বাঙলায়)
[কেবল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য]

২। শিক্ষা বিস্তারে আনন্দমোহন বসু। (ইংরেজীতে)

৩। জাতি গঠনে আনন্দমোহন বসু। (বাঙলায়)

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। ২১১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রচনা প্রতিযোগিতা

কোন্নগর মহৎ সঙ্ঘের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

১। প্রবন্ধ (নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি)।

(ক) কোন পথে ভারত
(খ) অতীত ও বর্ত্তমানের ছাত্র-সমাজ
(গ) গান্ধীবাদ ও দেশের ভবিষ্যৎ
(ঘ) আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরস
(ঙ) আজ হইতে একশত বৎসর পরে

২। ছোট গল্প।

৩। কবিতা।

উপরোক্ত যে কোন বিষয়ে যে কেহ লেখা পাঠাইতে পারেন। প্রত্যেক বিষয়ের শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য একটি করিয়া রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯এর মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীঅধরকুমার মুখোপাধ্যায়,
মহৎ সঙ্ঘ—কোন্নগর (হুগলী)।

গল্প প্রতিযোগিতা

(১) প্রথম হইয়াছেন শ্রীসতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯৭, হরগঞ্জ রোড। সালকিয়া, হাওড়া। গল্পের নামঃ—'বুধবার বেলা ১টা'।

(২) দ্বিতীয় হইয়াছেনঃ—শ্রীজ্যোৎস্না দেবী। ৩০।১ মহানির্ব্বাণ রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। গল্পের নামঃ—'জন্মদিন'।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় কেহই প্রথম পুরস্কার পান নাই। তবে শ্রীমণি বন্দ্যোপাধ্যায় (C/o পোষ্ট মাষ্টার, সালকিয়া পোষ্ট অফিস) দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন। প্রবন্ধের নামঃ—'বঙ্কিম সাহিত্যে নারী'।

পুরস্কার খুব শীঘ্রই পাঠান হইবে।

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য্য,
সম্পাদক।

রবীন্দ্র রচনাবলী

'বিশ্বভারতী'র প্রচার বিভাগের সম্পাদক আমাদিগকে জানাইতেছেন ঃ—

শৈশব হইতেই রবীন্দ্রনাথের রচনার ধারা স্বভাবতই তাঁহার জীবনের ধারার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে এবং নূতন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা নব নব রূপে নানা বাঁকে মোড় ফিরিয়াছে। অল্প পরিসরের মধ্যে বালক কবির সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা পর্ব্বের মধ্যে দিয়া তাঁহার কবি-জীবনের অভিব্যক্তি ও তার পরিণতির সম্পূর্ণ রূপটি জানিতে পারিলেই কবির রচনার আদর্শ প্রস্ফুট হইয়া উঠে এবং তাঁহার জীবনের মূল সত্যটিকে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অনেকখানি সহজ হয়। কবির সমস্ত রচনার সঙ্গে পরিচয় দিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।

এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিশ্বভারতীর গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতির অধ্যক্ষেরা, রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনক্রমে তাঁহার সমগ্র বাঙলা রচনাবলী একত্র করিয়া ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়া ছাপাইবার সংকল্প করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন অনুসারেই এই রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়েছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর একটি সাধারণ ও একটি শোভন সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডে চারিটি ভাগ থাকিবে, যথা ঃ—(১) কবিতা ও গান, (২) উপন্যাস ও গল্প, (৩) নাটক ও প্রহসন, (৪) বিবিধ প্রবন্ধ।

রচনাগুলি মোটামুটি গ্রন্থাকারের প্রথম প্রকাশের কালানুক্রম অনুসারে মুদ্রিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত প্রথম খণ্ড আগামী আশ্বিন মাসের প্রথমেই প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে এবং প্রতি দুইমাস অথবা তিনমাস অন্তর একটি করিয়া খণ্ড প্রকাশিত হইবে। এইরূপে প্রায় পঁচিশটি খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাঙলা রচনা একত্রে গ্রথিত হইবে। প্রতি খণ্ডে ৬২০ হইতে ৬৬০ পৃষ্ঠা থাকিবে এবং কাগজ ও বাঁধাই-এর তারতম্য অনুসারে মূল্য হইবে ৪॥০, ৫॥০ ও ৬॥০ ; রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত ও শোভন কাগজে মুদ্রিত পরিমিত সংখ্যক চামড়ার বাঁধাই প্রতি খণ্ডের দাম হইবে ১০৲ টাকা।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর একটি বিশেষ আকর্ষণ হইবে ইহার আঙ্গিক সৌষ্ঠব এবং চিত্র-সম্ভার। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব নানা ফটোগ্রাফ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি কর্ত্তৃক অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ও পুস্তক-চিত্র। 'রবীন্দ্রনাথের রচনার পাণ্ডুলিপি এবং কবির অঙ্কিত চিত্রও থাকিবে।'

বিশ্বভারতীর উদ্যমকে আমরা আনন্দের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার অভিব্যক্তি এবং তাহার পরিণতির দিক হইতে তাঁহার কবি-জীবনের রস-সাধনা অখণ্ডভাবে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত দেশবাসী যে আগ্রহসহকারে অপেক্ষা করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নীড়ভ্রষ্ট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম-এ

আহা তাই ছিল ভালো মোর—
ছিল বুঝি ভালো রে,—
সেই পল্লীর আঙিনাটি—
প্রদীপের আলো রে!
এই কোলাহল মাঝে
হেথা কি পরাণ বাঁচে?
কারাগৃহ সম এই
পুরী জমকালো রে!

হেথা উধাও চলিছে সবে
রাজপথে দুধার-ই,
আর যন্ত্র-দানব ছুটে
ধূম-ধূলি উগারি'।

এ শহর সেরা
হেথায় রয়েছে সব,—
তবু কেন কাঁদে হিয়া-
প্রাণ রয় ভুখারী?

তার চাহি না এ আলেয়ার
পিছে শুধু ছুটিতে,
চাই খলসে নদীর তটে
গিয়ে আজ জুটিতে।
যে মাটিরে ঘৃণা করি',
করি এই মুসাফিরী—
তারি 'পর আজ মোর
তনু চায় লুটিতে!

চিত্রা ও নিউ সিনেমায় রজতজয়ন্তী

গত ১২ই আগষ্ট হইতে চিত্রা ও নিউ সিনেমায়—নিউ থিয়েটার্সের নূতন ছবি "রজত-জয়ন্তী" দেখান হইতেছে। শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। *বিভিন্ন ভূমিকায়—প্রমথেশ বড়ুয়া, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, দীনেশ-রঞ্জন দাস, ইন্দু মুখার্জ্জি, শোর, সত্য মুখার্জ্জি, মলিনা, মেনকা প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।*

"রজত-জয়ন্তী" ছবিখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। বাঙলা দেশে তথা সমগ্র ভারতের মধ্যে এই ধরণের কোন ছবি আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। শুধু নূতনত্বের দিক দিয়া নহে, এই ছবিখানি ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রসমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

বাঙলা দেশের চিত্রশিল্প বোম্বাই প্রদেশ অপেক্ষা অনেকখানি পশ্চাৎপদ থাকিলেও একথা অস্বীকার বোধ হয় কেহই করিতে পারেন না যে, চিত্রশিল্পের উৎকর্ষের দিক দিয়া বাঙলা যতখানি অগ্রসর হইয়াছে ভারতের আর কোন প্রদেশ ততখানি অগ্রসর হইতে পারে নাই। বাঙলা ও বোম্বাই প্রদেশের জনসাধারণের রুচি, শিক্ষা, দীক্ষাই অবশ্য তাহার কারণ। একথা আমরা বলিতে চাই না যে, বাঙলা দেশে যে-সমস্ত ছবি তোলা হয় তাহার প্রত্যেকখানি বাঙালীর মর্ম্মগত রুচি ও কৃষ্টির পরিচায়ক। আমাদের দেশের অনেক ছবির মধ্যে যে বোম্বাই প্রদেশের ও অন্যান্য প্রদেশের ছবির ছাপ আসিয়া পড়িয়াছে তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এমন দুই একখানি ছবি প্রতি বৎসরেই বাঙলা দেশে তোলা হয়—যেগুলি বাঙালীর মার্জ্জিত রুচি ও কৃষ্টির সম্যক পরিচয় দেয় এবং যাহা ভারতের চিত্রজগতের ইতিহাসে নূতন কীর্ত্তি স্থাপন করে। "রজত-জয়ন্তী" ছবিখানি এরূপ একটি ছবি এবং এই ছবিখানিকে ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছবি বলিয়া আখ্যা দিতে দ্বিধা বোধ করি না। এইরূপ একখানি অপূর্ব্ব ছবি তোলার জন্য আমরা নিউ থিয়েটার্সকে এবং পরিচালক শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়াকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ছবিখানি হাস্যরসমুখর। হাসির ছবি সাধারণত বড় করিলে একঘেয়ে হইয়া পড়ে। কিন্তু এই ছবিখানি প্রায় ১৪ হাজার ফুটের হইলেও ইহার মধ্যে এমন একটি দৃশ্যও নাই যেখানে দর্শকদের ছবিখানি একটুও একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়। ছবিখানি যে শুধু একটি লঘু হাস্যরসপূর্ণ কাহিনী লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নহে; শেষের দিকে ছবিখানির

কালী ফিল্মসের "চাণক্য" চিত্রে মুরা ও বাচালের ভূমিকায় রাজলক্ষ্মী ও অরুণ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরিচালনা করিতেছেন

কাহিনীর সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ও গভীর নাটকীয় রূপ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া নায়ক রজতের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এবং এই নূতন চরিত্রে তিনি অতি বিস্ময়কর সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীযুত পাহাড়ী সান্যাল বিশ্বনাথের ভূমিকায় অতি চমৎকার

(শেষাংশ ৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় সন্তরণ পরিচালনা সমস্যা

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান আগত প্রায়। আগামী বৎসরে ঠিক এই সময়েই ফিনল্যাণ্ডের হেলসিঙ্কী শহরে এই অনুষ্ঠান হইবে। পৃথিবীর সকল দেশেই সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। এ্যাথলীট, সন্তরণকারী, জিমন্যাষ্ট, মল্লবীর, নৌকাবাহী, অশ্বচালক প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য প্রাণপণ অনুশীলন করিতেছেন। ভারতবর্ষও সেই বিষয়ে অন্যান্য দেশের পশ্চাতে থাকিবে না। সেই জন্য ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিষ্ঠানও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পরিচালকমণ্ডলীকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়াছেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে পুণা শহরে সর্ব-ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে যে সকল এ্যাথলীট, সাঁতারু, মল্লবীর, জিমন্যাষ্ট, খেলোয়াড় অতি উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন, তাঁহাদের ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে হেলসিঙ্কীর বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে প্রেরণ করা হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিষ্ঠানে গৃহীত হইয়াছে। বাঙলা প্রদেশের এ্যাথলীট, সাঁতারু, মল্লবীর প্রভৃতি সর্ব-ভারতীয় পুণা অনুষ্ঠানে যাহাতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারেন, তাহার জন্য নিয়মিতভাবে অনুশীলন করিতেছেন। এ্যাথলেটিক্স, মল্লযুদ্ধ, ভারোত্তোলন প্রভৃতি বিষয়ের ভারতবর্ষে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব করিবার অধিকার আছে এই বিষয় লইয়া এই পর্যন্ত কোন গণ্ডগোল হয় নাই এবং হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পুণা অনুষ্ঠানের পর ভারতীয় অলিম্পিক পরিচালকমণ্ডলী যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ও যাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন, তাহারা বিনা বাধায় বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিবেন। কিন্তু সন্তরণ বিষয়ে ভারতীয় অলিম্পিক পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচিত সাঁতারুগণের বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদানের অধিকার সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ রহিয়াছে। কলিকাতার ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন, যাঁহারা ১৯৩৬ সালে বিশ্ব সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ফি দিয়া ভারতের সন্তরণ পরিচালনার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই অধিকার এখনও পর্যন্ত ভারতীয় অলিম্পিক পরিচালকমণ্ডলীর হস্তে অর্পণ করেন নাই বলিয়া জানা গেল। এমন কি সম্প্রতি ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকমণ্ডলীর এক সভায় উক্ত অধিকার ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হইবে না বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়াছেন বলিয়াও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সকল সংবাদ যদি সত্য হয় তবে পুণা সর্ব-ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বাঙলার সাঁতারুগণ ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার যে কল্পনা করিতেছেন, তাহা কল্পনার মধ্যেই শেষ হইবার আশঙ্কা আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় বাঙলার সাঁতারুগণের প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের নিকট দাবী জানান উচিত। কারণ গত দুই বৎসর হইতে বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন এই সংবাদই প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, তাঁহারাই বাঙলার সন্তরণ পরিচালনার একমাত্র ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এই অধিকার ভারতীয় সন্তরণ পরিচালনা প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের দিয়াছেন। এই ভারতীয় সন্তরণ পরিচালনা প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন ও ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের মিলিত অনুমোদনের ফলেই গঠিত হইয়াছে। ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন বিশ্ব সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ভারতের সন্তরণ পরিচালনার যে অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহা এই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এই ভারতীয় সন্তরণ প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন, ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সন্তরণ এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ সকল সংবাদ বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন প্রচার করিবার পর বাঙলার সকল সাঁতারু নিশ্চিন্ত হইল এই ভাবিয়া যে, ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার পক্ষে আর কোনই বাধা রহিল না। ভারতীয় সন্তরণ পরিচালনার অধিকার সম্বন্ধীয় সকল গণ্ডগোলের অবসানের সংবাদ বাঙলার সাঁতারুগণকে এতই আনন্দ দান করিয়াছিল যে, তাঁহারা এই প্রচারিত সংবাদের সকল অন্তর্নিহিত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। গত দুই বৎসরের মধ্যে ভারতীয় সন্তরণ পরিচালনা প্রতিষ্ঠানের যে সকল সভা হইয়া গিয়াছে সেই সকল সভার সংবাদ প্রচারিত করা হয় নাই। ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশন ভারতীয় সন্তরণ পরিচালনা প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে সকল ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহাও কেহই জানিতে পারেন নাই। এমন কি গত এপ্রিল মাসে দিল্লীতে যে ভারতীয় সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের সভা হইয়া গিয়াছে সেই সভার সংবাদও প্রকাশিত করা হয় নাই। এই সকল সংবাদ কেন প্রকাশিত করা হয় নাই ইহা পূর্বে কেহ জানিতে চাহেন নাই কিন্তু বর্তমানের প্রচারিত সংবাদসমূহের পর জানিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিতেছেন। অনেকের ধারণা যে এই সকল সভার সংবাদ প্রকাশ লাভ করিলেই প্রচারিত সংবাদের কতটুকু সত্য তাহা জানিতে পারিবেন। বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি কেহ না কেহ এই সকল সভার খবর জানেন সুতরাং তাঁহার কর্তব্য এই সকল বিষয় দেশবাসীকে জানাইয়া দেওয়া। কাহার দোষে এই গণ্ডগোল পুনরায় দেখা দিয়াছে ইহা জানা দেশবাসীর বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এইরূপভাবে বৎসরের পর বৎসর দেশের উৎসাহী সাঁতারুগণের সকল প্রচেষ্টা ও উৎসাহকে নষ্ট করিবার অধিকার কোন ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠানের নাই! এই গণ্ডগোলের অবসান যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৫ই আগষ্ট—

কলিকাতায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বাস-ভবনে বামপন্থী সমন্বয় কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির শাস্তিবিধান সম্পর্কিত প্রস্তাবের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, কমিটি তাহা আলোচনা করেন এবং গত ৯ই জুলাই-এর বিক্ষোভ প্রদর্শনে যে সকল কংগ্রেসসেবী যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা কোনরূপে শৃঙ্খলাভঙ্গ করেন নাই, কমিটি এই সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়া এক প্রস্তাব পাশ করেন। প্রস্তাবে বলা হয় যে, যাহাতে প্রবল আন্দোলন ও জনমত গঠন করিয়া ওয়ার্কিং কমিটিকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করান যায় এবং বামপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযান রোধ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক বিধান অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে কলিকাতায় নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটিতে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কমিটি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক বিধান অবলম্বন করা হইয়াছে, দক্ষিণপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি এবং বামপন্থীদের দমনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু উহা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আপোষ চেষ্টারই অংশ বলিয়া অনুমান হয়। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত বসুর বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা পুনর্বিবেচনা এবং নাকচ করিবার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে সম্মত করিবার উদ্দেশ্যে অবিরাম তুমুল আন্দোলন চালান হইবে এবং এই উপলক্ষে জাতীয় সংগ্রাম সপ্তাহের অনুষ্ঠান করা হইবে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার জন্মদিবস উপলক্ষে পণ্ডিচেরী আশ্রমে ৪০০ জনকে দর্শন দান করেন। দর্শনার্থীদের মধ্যে হায়দরাবাদের প্রধানমন্ত্রী স্যার আকবর হায়দরী, আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসনের কন্যা মিস উইলসন প্রভৃতি ছিলেন।

লাহোরে এক জনসভায় লীগওয়ালাদের গুণ্ডামীর ফলে পাঞ্জাব পরিষদের সরকার-বিরোধী দলের নেতা ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব প্রমুখ কয়েকজন সাংঘাতিক আহত হইয়াছেন।

শ্রী জে সি কুমারাপ্পা জাতীয় শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে বাঙলা সরকারের মনোভাবের প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সেন কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার পদত্যাগ করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় তাঁহার পদত্যাগপত্র গৃহীত হইয়াছে।

গত ১৯ই জুলাই হাথুয়ার রাণীকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলী করা হয়। এই সম্পর্কে লক্ষ্ণৌর গোয়েন্দা পুলিশ হাথুয়ার রাজাকে এবং রাজমাতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

খাসি জয়ন্তিয়া হিলসের ডেপুটী কমিশনার মিঃ কে ফ্যাণ্টলী এসেসরদের সর্ব্বসম্মত অভিমত গ্রহণ করিয়া সি জনসন নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গের প্রতি ৩০ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে মিসেস জনসনের জন্য আয়া আবশ্যক, এই মিথ্যা অজুহাতে কায়ভেলিন নাম্নী একটি খাসিয়া বালিকাকে অপহরণ করিয়া জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিবার অভিযোগে ৩৬৬ ধারার অভিযোগ আনা হইয়াছিল। এই ব্যাপারে আসামে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

তিয়েনৎসিনে ফরাসী মহল্লায় প্রবেশকালে ফ্রান্সিস মেরী নাম্নী এক মার্কিন মহিলাকে জনৈক জাপ-সান্ত্রী চপেটাঘাত করে। এজন্য জাপ-ভাইস কন্সাল উক্ত মহিলার নিকট এবং মার্কিন কন্সালের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ডানজিগে শুল্ক বিভাগের দুইজন পোলিশ কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পোলিশরা আবার চিউতে দুইজন জার্ম্মানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

১৬ই আগষ্ট—

কলিকাতায় ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, "ফরোয়ার্ড ব্লক" নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি "ব্লকের" নিখিল ভারতীয় মুখপত্রস্বরূপ হইবে এবং ব্লকের সমস্ত সদস্য ও উহার প্রতি সহানুভূতিশীল ভারতের সকল ব্যক্তিকেই উক্ত পত্রিকাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীকে এখন হইতেই সাম্রাজ্যবাদীদের সমরায়োজনে দৃঢ়তার সহিত বাধাদান করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। আর তৃতীয় প্রস্তাবটিতে দেশীয় রাজ্যের প্রজাবৃন্দকে এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, দেশীয় রাজ্যের প্রজা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি প্রধান অংশে পরিণত করাই ফরোয়ার্ড ব্লকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

কলিকাতা সিমলা লেনের কোন বাড়ী হইতে সরলাবালা দেবী ও জ্যোৎস্নাবালা দেবী নাম্নী বিবাহিতা দুই ভগ্নীকে তাহাদের মাতার রক্ষণাবেক্ষণ হইতে অপহরণের অভিযোগে বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, যুগলকিশোর ক্ষেত্রী, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও বিজয়কৃষ্ণ লাহাকে অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রায়-বাহাদুর আই এস মুখার্জ্জির এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী বীরেনকে এক বৎসর এবং আসামী যুগল ও নগেন্দ্রকে নয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামী বিজয় লাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বিহার গবর্ণমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া মিছিল সহকারে ছোটেলালের রথ বাহির করিয়া সত্যাগ্রহ করায় ভাগলপুরে একজন মহিলা ও দশজন হিন্দু যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনাস্থলে এক বিরাট জনতা সমবেত হইয়াছিল। পুলিশ লাঠি চালাইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

গবর্ণমেণ্ট কিষাণ বন্দীদিগকে রাজনৈতিক বন্দী বলিয়া স্বীকার না করার প্রতিবাদে মুঙ্গেরের কিষাণ-নেতা শ্রীযুক্ত অনিল মিত্র হাজারীবাগ জেলে গত ৪৫ দিন যাবৎ অনশনে ছিলেন। অদ্য তাঁহাকে স্বাস্থ্যের জন্য মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

আমোয়ারী সত্যাগ্রহে দণ্ডিত কৃষক নেতা শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীযোগেন্দ্র প্রসাদ আজ ৮৫ দিন যাবৎ ছাপরা জেলে অনশন করিতেছেন। কৃষক কর্ম্মীদের রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে শ্রেণী বিভাগের দাবী করিয়া ইঁহারা অনশন চালাইতেছেন।

জাপানী সৈন্যরা প্রবল বোমাবর্ষণের পর চীনের সামচুয়ান অধিকার করিয়াছে এবং হংকংএর সীমানায় অভিযান সুরু করিয়াছে।

১৭ই আগষ্ট—

কলিকাতা ও শহরতলীতে নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরোধী-দিবস প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে, দক্ষিণ কলিকাতা আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে ও বিডন স্কোয়ারে জনসভার অনুষ্ঠান হয়। প্রত্যেক সভায়ই নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ—"সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবিরোধী এবং বিশেষভাবে বাঙলার হিন্দু-সম্প্রদায়কে পঙ্গু করিবার জন্য উহা করা হইয়াছে; এই সভা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার তীব্র নিন্দা করিতেছে। আইন বহি হইতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ধারাগুলি না উঠান পর্য্যন্ত উহার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাইবার সংকল্প এই সভা করিতেছে; সভা এই জাতীয় সংগ্রামে যোগ দিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোককে আহ্বান করিতেছে।"

ইউনিভার্সিটি হলের সভায় শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুত দত্ত বলেন যে, বাঙলার সকল অকল্যাণের উৎস হইতেছে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। একবাক্যে উহার প্রতিবাদ করা উচিত।

নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠনের জন্য গত ২৬শে জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাহা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৩০শে জুলাই তারিখের কার্য্যাবলী এবং উক্ত সভা কর্ত্তৃক ইলেকশন ট্রাইব্যুনাল গঠনও রাষ্ট্রপতি নাকচ করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ২৬শে জুলাইয়ের অধিবেশন বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করার কারণ এই যে, বিধান অনুযায়ী সদস্যদিগকে যথারীতি অধিবেশনের কথা জানান হয় নাই।

নাৎসী ঝটিকাবাহিনীর সৈন্যগণ এবং পোলিশ অফিসারগণের মধ্যে এক গুরুতর হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ঝটিকাবাহিনীর সৈন্যগণ পোলিশদিগকে আক্রমণ করে এবং সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পোলিশ এলাকায় প্রবেশ করে। ফলে উভয়পক্ষে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। কয়েকজন জখম হইয়াছে।

উত্তর সাইলেসিয়ার ইয়ং জার্ম্মাণ পার্টির নেতা এবং উক্ত পার্টির অপর ৬০ জন সদস্য এবং কয়েকজন জার্ম্মাণ নাগরিককে গুপ্তচর-বৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নিজাম-বাহাদুর তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে এক ফরমাণ জারী করিয়া আর্য্য-সমাজ ও হিন্দু-মহাসভা কর্ত্তৃক পরিচালিত হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহ সম্পর্কিত সমস্ত বন্দীর মুক্তি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণানুযায়ী হায়দরাবাদের বিভিন্ন জেল হইতে সহস্রাধিক সত্যাগ্রহী বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

১৮ই আগষ্ট—

মিশরের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছে। রাজা ফারুকের নির্দ্দেশে আলিসাহের পাসা মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। আলি সাহের পাসা স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র-সচিব এবং প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জাপ-গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, শুধু ইংলণ্ড ও জাপানের দিক হইতে চীনা রৌপ্য ও মুদ্রা-নীতি সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা চালাইলে তাহাতে কোন ফল হইবে না এবং এইসব অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা চালাইতে হইলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য শক্তিসমূহের প্রস্তাবসমূহও আলোচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হাঙ্গারীর সীমান্তে এক সঙ্ঘর্ষের ফলে একজন রুমানীয় সৈন্য নিহত ও একজন আহত হইয়াছে এবং অপর একজন নিখোঁজ হইয়াছে। এই সঙ্ঘর্ষের বিবরণে প্রকাশ যে, পাঁচজন রুমানীয় রক্ষী সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হাঙ্গারীতে প্রবেশ করে এবং হাঙ্গারীর রক্ষী দলকে আক্রমণ করে; হাঙ্গারীর রক্ষী দল তখন দুইজন রুমানীয়কে গুলী করিয়া হত্যা করে এবং একজনকে বন্দী করে।

১৯শে আগষ্ট—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ১৬৬নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে বঙ্গীয় কংগ্রেসের ভবন "মহাজাতি-সদনে"র ভিত্তি স্থাপন করেন। মহাজাতি সদনটি প্রায় দুই বিঘা জমির উপর নির্ম্মিত হইবে। উহা চারিতলা করা হইবে; উহাতে আড়াই হাজার লোকের স্থান সংকুলান হইবে এইরূপ একটি লেকচার হল থাকিবে। এতদ্ব্যতীত উহাতে লাইব্রেরী ও পাঠাগার, অফিস ঘর ইত্যাদি থাকিবে। উহা নির্ম্মাণ করিতে ৩ লক্ষ টাকার মত লাগিবে। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র নর-নারী উহার ভিত্তি-স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কবি রবীন্দ্রনাথ এক সারগর্ভ অভিভাষণ দেন।

অদ্যকার "হরিজন পত্রিকা"য় মহাত্মা গান্ধী 'অনশন ধর্ম্মঘট' সম্পর্কে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অনশন ধর্ম্মঘট যেন এক সংক্রামক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাত্মাজীর মতে বলপূর্ব্বক খাওয়ান বর্ব্বরতার প্রতীক; তিনি উহার নিন্দা করিতেছেন। তিনি এই প্রথা পরিত্যাগের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং বিনা নির্দ্দেশে রাজনৈতিক বা অন্য কারণে অনশন অবলম্বন করিলে তাহাতে শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইবে, এইরূপ বিধান করার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে বলিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নূতন কার্য্যনির্ব্বাহকমণ্ডলী এবং ইলেকশন

ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তৎসম্পর্কে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত এক তরফা। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ওয়ার্দ্ধাতে গিয়া তাঁহাকে যাহা জানাইয়াছেন, তাহা শুনিয়া তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অনুপস্থিতিতে ও তাঁহাদের বক্তব্য না শুনিয়াই উক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া উহা অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে।

বোম্বাই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক অধিবেশনে মিঃ কে এফ নরীম্যান, শ্রীযুক্ত রাজারাম পাণ্ডে, জে অধিকারী, সি কে নারায়ণস্বামী প্রমুখ ৮ জন কংগ্রেসকর্ম্মীর বিরুদ্ধে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিবাদে গত ৯ই জুলাইয়ের বিক্ষোভ প্রকাশে যোগদানের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

দিল্লীর কংগ্রেসনেত্রী শ্রীমতী সত্যবতী ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হন। পরে তিনি এক হাজার টাকার জামীনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

মেঘনার জল অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া নোয়াখালি শহরটি জলপ্লাবিত হইয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিমানযোগে চীন যাত্রার পথে দমদম বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করেন। কলিকাতা পৌঁছার পর পণ্ডিতজী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে গিয়া তাঁহার সহিত নিভৃত আলোচনা করেন। চীন কন্সাল জেনারেল ও চীনা সম্প্রদায় পণ্ডিতজীর সম্মানার্থ এক ভোজের আয়োজন করেন। পণ্ডিতজীকে প্রায় দুইশত চীনা সমিতির পক্ষ হইতে আমন্ত্রণ করা হয়।

কাণপুরে পিটুনী পুলিশ ফাঁড়ির হেড কনেষ্টবল নাবে খাঁকে তাঁহার রক্ষী হেডপাল সিং নামক অপর এক কনেষ্টবল গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে।

২০শে আগষ্ট—

পিকিং হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, উত্তর চীনের প্রধান জাপ-সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল সুগিয়ামা অন্যান্য সেনানায়কগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ইঙ্গ-জাপ আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, জাপান তিয়েনৎসিনে মজুদ চীনা রৌপ্য সমর্পণ করিবার জন্য এবং চীনা ডলারের প্রচার বন্ধ করিবার জন্য যেসব দাবী উপস্থিত করিয়াছে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার উত্তর দিবার জন্য তিয়েনৎসিনের জাপ-কর্ত্তৃপক্ষ পিকিং-এর তাঁবেদার গবর্ণমেণ্টের মারফৎ বৃটেনের নিকট চরমপত্র প্রেরণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

বার্লিনে সোভিয়েট-জার্ম্মান বাণিজ্য ও ঋণ লেন-দেন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

২১শে আগষ্ট—

অদ্য কলিকাতা গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় ১৯৩৯ সালের পাট অর্ডিন্যান্স নামে একটি অর্ডিন্যান্স প্রকাশিত হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্সের বিধান অনুসারে কেহ বেল প্রতি ৩৬৲ টাকার কম মূল্যে কাঁচা পাট ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করিতে পারিবে না; করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে। বাঙলার গবর্ণর এই অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কলিকাতা হইতে বিমানযোগে চীন যাত্রা করিয়াছেন।

সিমলায় বড়লাট ও দেশীয় রাজ্যের নরেন্দ্রমণ্ডলের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে এক ঘরোয়া বৈঠক হয়। এই বৈঠকে দেশীয় রাজ্যসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সর্ত্তাবলী ও রাজন্যবর্গের নিকট বড়লাটের পত্র সম্পর্কে আলোচনা হয়। সিমলার ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই যে, এই সপ্তাহের খোলাখুলি আলোচনার ফলে এই মাসের শেষ দিকে রাজন্যবর্গ বড়লাটের চিঠির যে জবাব দিবেন, তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলেই মত প্রকাশিত হইবে।

শ্রমিক নেতা আব্দুল হালিম রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দিবার অপরাধে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ইউরোপের পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। হিটলার নাকি কাউণ্ট সিয়ানোকে বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি ডানজিগ সম্পর্কে কোন আপোষ প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না এবং তিনি মনে করেন যে, জার্ম্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে সরাসরি আলোচনার দ্বারাই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। এদিকে পোল-ডানজিগ আলোচনায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বার্লিনের ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস যে, আগামী ২রা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বেই একটা কিছু ঘটিবে।

ডানজিগের সঙ্কট সম্পর্কে রোমে ক্রমেই অধিকতর নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইতেছে। কারণ যদিও ইটালী চতুঃশক্তি বৈঠকের পক্ষপাতী তথাপি হের হিটলার পোল্যাণ্ডের সহিত কোনরূপ আপোষ রফায় রাজী হইতেছেন না।

রঙ্গ-জগৎ

(৩০৬ পৃষ্ঠার পর)

অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীযুত পাহাড়ী সান্যালের চলচ্চিত্রে ইহাই শ্রেষ্ঠ অভিনয় এবং তিনি যে এত সুন্দর অভিনয় করিতে পারেন তাহা আমাদের জানা ছিল না। বগলাচরণের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী, হরনাথের ভূমিকায় দীনেশরঞ্জন দাশ, সমীরকান্তির ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নটরাজের ভূমিকায় ইন্দু মুখার্জ্জি সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। নায়িকা জয়ন্তীর ভূমিকায় শ্রীমতী মেনকার অভিনয় সুন্দর হইলেও খুব স্বাভাবিক হয় নাই। শ্রীমতী মলিনার অভিনয় প্রথম দিকে আমাদের ভাল লাগে নাই কিন্তু শেষের দিকে তাঁহার অভিনয় সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার নৌকা বিহারের গানখানি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে।
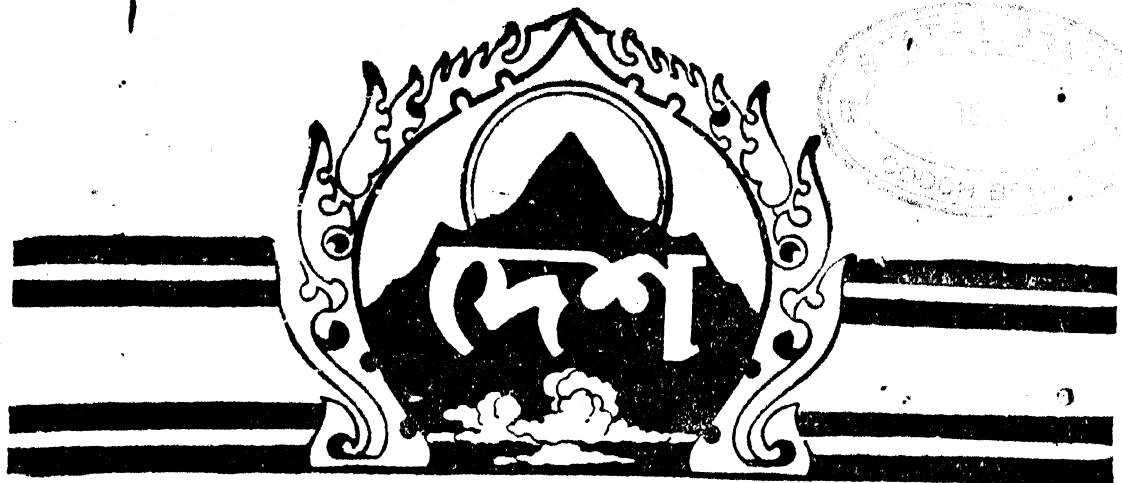
৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ২রা ভাদ্র, ১৩৪৬ Saturday, 19th August, 1939 [৪০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙলা কি করিবে—

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়া গেল এবং যাহা অনুমান করা গিয়াছিল তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। দক্ষিণ-মার্গী বল্লভ-পন্থীর দল নিয়মতান্ত্রিকতার অভিমুখে তাঁহাদের গতিকে নিষ্কণ্টক করিবার নিমিত্ত যে কলকাঠি ঘুরাইতেছিলেন, ত্রিপুরীর অধিবেশনেই আমরা তাহার ব্যক্ত রূপ দেখিতে পাইয়াছি এবং তাহারই ক্রমাভিব্যক্তি প্রকটিত হইল সেদিন ওয়ার্দ্ধাতে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসকে নিয়মতান্ত্রিকতার অভিমুখীন গতি হইতে ঘুরাইয়া লইবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন, সুতরাং সুভাষচন্দ্রকে পিষ্ট করিতেই হইবে, এই মতলব লইয়াই দক্ষিণপন্থী দল চলিতেছিলেন, তাঁহাদের সেই নিষ্ঠুর আক্রোশেরই পরম পরিণতি পাওয়া গেল ওয়ার্দ্ধাতে। দক্ষিণপন্থী দল সুভাষচন্দ্রকে তিন বৎসরের জন্য অযোগ্যতার অপবাদে দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে অপসারিত করিলেন। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি ইহাতেই সিদ্ধ হইবে? আমরা সেরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখি না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল ব্রিটিশসাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আদর্শের ভাবধারার উৎসস্বরূপ এই বাঙলা দেশ হইতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ধারাকে বিচ্ছিন্ন করিবার কূট কৌশল লইয়া যেভাবে শাসনতন্ত্রের বাঁটোয়ারার ভিতর দিয়া মতলব ফাঁদিয়াছিল, বল্লভচারীর দল সেই মতলবকেই তাঁহাদের অবিবেচিত সিদ্ধান্তের দ্বারা সুদৃঢ় করিলেন। সাম্রাজ্যবাদীদের বাহবা তাঁহারা পাইবেন একাজে নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বাধীনতা—সংগ্রামের ভাব-সম্পুট যোগাইয়াছে যে বাঙলা, সেই বাঙলা দেশ কি এই সিদ্ধান্ত মাথা পাতিয়া লইবে? কোনদিনই তো লয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্রের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষকেও নিয়মতন্ত্রানুরক্তির জন্য যে বাঙলা দেশ একদিন উপেক্ষা করিয়াছে, সেই বাঙলা বল্লভাচারী দলের স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতাগত দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া স্ব-ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিবে—অস্বীকার করিবে তাহার যুগাগত সাধনাকে, স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণের আত্মোৎসর্গের মর্য্যাদাকে, আমরা একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের কথা এ সম্বন্ধে একেবারে চাঁছা-ছোলা। আমাদের কথা এই যে, এরূপ সমস্যায় কোনরূপ আপোষ নাই, নিষ্পত্তি নাই। তেলে জলে মিশ কখনই খায় না। যে নীতির পরিণতি হইল সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থসিদ্ধি, কথার বোল-চালের পার্থক্য যাহাই থাকুক না কেন, সাম্রাজ্যবাদীরা যে মতলব লইয়া বসিয়াছিল কার্য্যতঃ কংগ্রেসের দোহাই দিয়া তাহাই করাইতে যাইতেছেন যাঁহারা, তাঁহাদের সঙ্গে প্রকৃত স্বাধীনতার উপাসক বাঙলার অন্তরের যোগ কিছুতেই থাকিতে পারে না। মিথ্যাচার এই কয়েক বৎসর—কংগ্রেস মন্ত্রিগিরি লইবার পর ঢের দেখা গেল; বাঙলার স্বদেশ-প্রেমিক সন্তানগণ এই মিথ্যাচারকে আর বরদাস্ত করিবে না। স্বাধীনতা আজই পাই না পাই, বাঙালীর কাছে ইহা বড় নয়—বাঙালীর কাছে বড় হইল, স্বাধীনতার আদর্শ। বাঙালী বাস্তব বিচারের যুক্তিতে সেই আদর্শকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। আদর্শের অপরিম্লান দীপশিখা সে শিবরাত্রির সলিতার মত বুক দিয়া আগুলিয়া রাখিবে এবং এ পথে যদি তাহাকে একলাও চলিতে হয়, তবে সে একলাই চলিবে। কিন্তু একলা তাহাকে চলিতে হইবে না। আমরা জানি, স্বাধীনতার স্পৃহা দেশের মধ্যে আজ দুর্দ্দম হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র ভারতের অন্তরের অন্তস্থলে একান্তভাবে রহিয়াছে সেই পিপাসা, শুধু রূপ তাহার ফুটিতে পাইতেছে না দক্ষিণপন্থী-বল্লভাচারী দলের কার্পণ্যক্লিষ্ট নীতির চাপে। সুভাষচন্দ্র দক্ষিণপন্থী দলের আক্রোশপূর্ণ লাঞ্ছনা এবং অবমাননার ভিতর দিয়া আজ স্বাধীনতা সাধনার যে দারুণ দীপ জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন, সমগ্র ভারত তাহা হইতে জ্বালা-মালা সংগ্রহ করিবে এবং দেখিতে দেখিতে স্বাধীনতার প্রবল পিপাসা সমগ্র ভারতকে পাগল করিয়া তুলিবে। সেই প্রবল পিপাসার প্রচণ্ড তাড়নে সাম্রাজ্যবাদীদের সব বুজরুকী যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িবে, সেইরূপ কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব-কেন্দ্র হইতেই অনুদার কার্পণ্য এবং দৈন্য নিঃশেষে দূরীভূত হইবে। বাঙলার কংগ্রেসকর্ম্মীদের উপর আজ এই কর্ত্তব্যের

ভার আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা আশা করি, অবিকম্পিতচিত্তে তাঁহারা এই কঠোর কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবেন।

বিশ্বাসঘাতকতার ভয়—

দমিবে না বাঙলা, ইহা আমরা জানি। বাঙলার অপমানের প্রশ্নই শুধু ইহা নয়, আদর্শহীনতারও প্রশ্ন। স্বাধীনতা সাধনার দোহাই দিয়া নিদারুণ মিথ্যাচারে দাসত্বকে উপাসনার অভিমুখেই এই পাপ প্রবৃত্তির গতি। ইহাকেই রুদ্ধ করিতে হইবে, কর্ত্তব্য কঠোর যতই হউক না কেন, নিৰ্ম্মম যমনই হউক না কেন। ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব হইতে অপসারিত করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা আরও কিছু করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, বাঙলার কংগ্রেস হইতে সুভাষচন্দ্রের যাঁহারা সমর্থক, তাঁহাদিগকে সরাইতে হইবে, নতুবা মনস্কামনা তাঁহাদের সিদ্ধ হইবে না। ভরসা এইদিকে তাঁহারা পাইয়াছেন কোথা হইতে আমরা তাহা জানি। কার্য্যকরী সমিতিতে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহাদিগকে এ কাজে সমর্থন নিশ্চয়ই করিয়া ফিরিয়াছেন। সে দলের নাটের গুরু স্বরূপে শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় পূর্ব্বে হইতেই কংগ্রেস সভাপতির কাছে গিয়া ধন্না দিয়াছিলেন, তিনিও কার্যক্রম বাংলাইয়া দক্ষিণী দলকে বল দিয়াছিলেন। সে কার্যক্রমের স্থূল রূপ আমরা ওয়ার্দ্ধা সিদ্ধান্তের ভিতর দেখিতেছি, তাহার সূক্ষ্ম রূপ পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল; এইসব পরামর্শদাতাদের প্রভাবে সুভাষচন্দ্রকে অপসারণ করা হইয়াছে এবং তাহারই আনুষঙ্গিক অত্যাবশ্যক অংশ হিসাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ২৬শে জুলাইয়ে গঠিত কার্য্যকরী সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ কার্য্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ইলেকসন ট্রাইবিউনালকে বাতিল করা হইয়াছে। ইহার ফলে পুরাতন করী সমিতিই বহাল রহিল। কিন্তু পুরাতন কার্য্যকরী সমিতি ৯ই জুলাইয়ের প্রতিবাদ সমর্থন করিয়াছেন, সেজন্য খুব সম্ভব তাঁহাদিগকে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে, নতুবা তাঁহাদিগকেও অপসারিত করা হইবে। এখন বাঙলার কর্ত্তব্য কি? বাঙলার বল্লভপন্থী নিয়মতন্ত্রানুরক্তগণ এইবার সুভাষচন্দ্রের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কংগ্রেসদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং কথায় কথায় তাঁহারাই যে অকৃত্রিম অহিংসানিষ্ঠ কংগ্রেসী এই আধ্যাত্মিকতা ফলাইবেন। বাঙলা দেশ কি তাঁহাদের সেই রায়কে মাথা পাতিয়া লইবে? আমাদের আশা আছে, এই সব ভণ্ডামিতে বাঙলার স্বদেশ-প্রেমিকগণ বিভ্রান্ত হইবেন না। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসদ্রোহী—এবং বাঙলার স্বাধীনতার সাধক সন্তানগণ কংগ্রেসের বিরোধী, এমন কথা বলিতে আসিবেন যাঁহারা, আমরা জানি ভাল রকমেই যে, তাঁহাদিগকে সে স্পর্দ্ধার জন্য আক্কেল পাইতে বিলম্ব ঘটিবে না। কংগ্রেসের আদর্শকে যাঁহারা আজ ধ্বংস করিতে বসিয়াছেন, যাঁহারা নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আজ সমগ্র দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে বিখণ্ডিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সাম্রাজ্যবাদীদের পাছ-দোহারীই যাঁহারা করিতেছেন, বাঙলা দেশে তাঁহাদের বুজরুকীর স্থান হইবে না এ বিশ্বাস আমাদের আছে। সুভাষচন্দ্র আজ পূর্ণ স্বাধীনতার যে আদর্শকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছেন বাঙালী সে আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যাঁহারা সদস্য তাঁহারা প্রত্যেকে সুভাষচন্দ্রকেই সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়া বাঙলার অন্তর-সাধনার মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। নিয়মতান্ত্রিকতার মোহ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে বাঙলার স্বদেশ-প্রেমিকদের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন হইল এইটি—এবং এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে সকল ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বিদেশে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ—

কথায় আছে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়। ইউরোপে লড়াই বাধে বাধে হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা প্রতিদিনই শুনিতেছি। শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই সেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই ইউরোপে লড়াই বাধিবে। ইউরোপের রণ-পণ্ডিতেরা আট ঘাট বাঁধিতেছেন, এবং সকলেই তলোয়ার শাণাইতেছেন, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি ইউরোপের স্বার্থ-পুষ্ট দলের এই সব সর্দ্দারীতে আমাদের লাফালাফি করিবার কোন কারণই নাই। বিগত মহাযুদ্ধে আমাদের আক্কেল যথেষ্টই হইয়াছে; সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ধাপ্পাবাজীতে আমরা বিড়ম্বিত হইব না। ওয়ার্কিং কমিটি স্পষ্ট ভাষায় এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারত সাম্রাজ্যবাদীদের কোন যুদ্ধে যোগ দিবে না। ওয়ার্কিং কমিটি এবার শুধু সিদ্ধান্তই করেন নাই, সিদ্ধান্তানুযায়ী ব্যবস্থাও গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা এই সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির প্রতিবাদস্বরূপে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদিগকে এই দুই সভার আগামী অধিবেশনে যোগদান না করিতে নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এই ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় আইন সভার সিদ্ধান্তকে এ ব্যাপারে কোন দিনই আমল দেন নাই এবং তাঁহারা আমল দিবেনও না। কংগ্রেসী সদস্যগণ আইন সভায় উপস্থিত না হইলে একটা প্রতিবাদ মাত্র হইবে, কিন্তু শুধু প্রতিবাদের কর্ম্ম নয়—কাজ দরকার এবং আমাদের মনে হয়, অবিলম্বে সেই কাজের পথই ধরা উচিত। কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীস্বরূপে আচার্য্য কৃপালনী সেদিন একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের বড় কর্ত্তারা এই সম্পর্কে অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন অর্থাৎ দরকার হইলে এই ব্যাপার লইয়া রাষ্ট্র-নীতির সংকট সৃষ্টি করিতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ নহেন। এবং সেই রাষ্ট্রীয় সংকট সৃষ্টির ফলে কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগকে হয়ত পদত্যাগও করিতে হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট যখন এ সম্বন্ধে কংগ্রেসী দলের সিদ্ধান্তকে গ্রাহ্যের মধ্যেই

আসিতেছেন না এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে কোন পরামর্শ করা বিবেচনাসঙ্গত মনে না করিয়াই নিজেরা খুসীমত মালয়ে, মিশরে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন, অপর পক্ষে এইভাবে যখন কার্য্যত দেশের জনমতকে এ ব্যাপারে উপেক্ষা করা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তখন এ পক্ষ হইতেও জনমতের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত, এখনই কাজ আরম্ভ করা উচিত। জগতের লোকদিগকে এখন হইতেই বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, ভারতবাসীরা সাম্রাজ্যবাদীদের এই ব্যবসারের পক্ষে নাই।

রাজনীতিক বন্দী ও ওয়ার্কিং কমিটি—

কংগ্রেস যে শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার জন্য ব্রত লইয়াছে এবং বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র ধ্বংসের সেই দুশ্চর ব্রতেরই সাধনা করিতেছেন একান্ত অহেতুকভাবে কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ 'সুশৃঙ্খল গবর্ণমেণ্টের' জন্য সেই কংগ্রেসের উদ্বেগ দেখিলে সত্যই কৌতূহল সৃষ্টি হয়। রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে ওয়ার্দ্ধার অধিবেশনে যে নিতান্ত নিস্‌জীব গোছের প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, তাহার আদ্যন্ত এই নিয়মতন্ত্রানুরক্তির ছোপ রহিয়াছে। রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন করা অন্যায় অতি ঘোর অন্যায়—কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যখন জেলের মধ্যে অনশন করেন তখন তাহা অন্যায় হয় না। তাহার মূলে তখন থাকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা বা দেববাণী, এই তত্ত্ব আমাদের অল্প বুদ্ধির পক্ষে দুরবগাহ হইলেও, একেবারে বোধের অতীত বস্তু নয়। কংগ্রেসের দক্ষিণীদল নিয়মতান্ত্রিক শাসনকে সকল দিক হইতে সুরক্ষিত করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং প্রাদেশিক নিয়মতান্ত্রিক শাসনই এই দলের কর্ত্তারা নিজেদের শক্তির সকল আধার ও সাধ্য এবং সাধনাস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা গন্ধী কিছুদিন পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যে বিবৃতি দান করেন, ওয়ার্দ্ধার প্রস্তাব সেই বিবৃতিরই অনুকৃতি। মহাত্মাজী সেই বিবৃতিতে রাজনীতিক বন্দীদিগের অনশন-ব্রতকে যেমন নিন্দা করিয়াছিলেন, এই প্রস্তাবেও রাজনীতিক বন্দীদের প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া সরকারী নীতিরই সাফাই গাওয়া হইয়াছে। স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিমুদ্দিন যে কথা বলিতেছেন, রাজনীতিক বন্দীদের কার্য্যের নিন্দার দিক হইতেও ওয়ার্কিং কমিটি তাহার কম কিছু বলেন নাই। ওয়ার্কিং কমিটির এতৎ সম্পর্কিত প্রস্তাবের মুখ্য কথা হইল —বাঙলা সরকার, পাঞ্জাব সরকার এবং ভারত সরকারের নিকট নিবেদন, তাঁহাদের ঔদার্য্যের একান্ত ভিক্ষা। বাঙলা-দেশে রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে যে ত্যাগ-প্রেরণা-প্রদীপ্ত আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে সে সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। কর্ত্তারা বোধ হয়, এই আন্দোলনকে সুশৃঙ্খল শাসনের পক্ষে আতঙ্ককর বলিয়াই মনে করিতেছেন। সুতরাং আপাতত নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করিয়াছেন। নিয়মতান্ত্রিক মনোবৃত্তি কি ভাবে কংগ্রেসী দক্ষিণ-পন্থী বীরবর্গকে ঠাণ্ডা করিয়া আনিয়াছে, ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবই সে পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই প্রস্তাবের মধ্যে স্বেচ্ছাচারীদের কাছে একান্তভাবে আত্মনিবেদন। এই মনোবৃত্তি স্বাধীনচিত্ততাসম্পন্ন সকল স্বদেশ-প্রেমিকের চিত্তেই বিক্ষোভের সৃষ্টি করিবে।

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা—

ভারতের বিখ্যাত জননায়ক শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি আণের সভাপতিত্বে কলিকাতা শহরে সাম্প্রদায়িক বিরোধী সম্মেলনের অধিবেশনের আয়োজন হইতেছে। গত ১৭ই আগষ্ট বাঙলা-দেশের নানাস্থানে সভা-সমিতি করিয়া এই অনিষ্টকর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন জাগাইয়া তোলা হইয়াছে, ইহা আশার কথা। বাস্তব সত্যকে আমাদিগকে স্থিরদৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, শুধু আবেগের বশে চলিলে কাজ হইবে না। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের কুফল যে কতটা মারাত্মক আমরা হাড়ে হাড়ে তাহা উপলব্ধি করিয়া লইয়াছি। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের কূটকৌশলে বাঙলার জাতীয়তার শক্তিকে যদি দুর্ব্বল করিয়া ফেলা না হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের ন্যায় প্রগতি-বিরোধী মন্ত্রিমণ্ডল বাঙলার ঘাড়ে চাপিতে পারিত না এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিধি, সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতে সরকারী চাকুরীর বণ্টন—এই সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারিত না, বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল রাজনীতিক বন্দীদের সম্বন্ধে যেমন একগুঁয়েমি মতিগতি লইয়া চলিতেছেন সেভাবেও তাঁহারা চলিতে সমর্থ হইতেন না। হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন আমরা বড় করিয়া দেখি না, আমরা বড় করিয়া দেখি—বাঙলার জাতীয় সংহতি বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন করিবার যে বিষ এই সিদ্ধান্তের ভিতর রহিয়াছে সেই বিষকে এবং যতদিন পর্য্যন্ত বাঙলার শাসনতন্ত্র হইতে সেই বিষ উৎখাত না হইবে, ততদিন বাঙলা-দেশে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাতও সম্ভব নহে; ততদিন পর্য্যন্ত বাঙালীকে দাসত্বের শিকলেই বাঁধা থাকিতে হইবে এবং বিদেশীর শোষণের ক্ষেত্র হইয়া থাকিবে এই বাঙলা। বাঙালীর যে সমস্যা—সবচেয়ে বড় সমস্যা সেই অন্ন-বস্ত্রের সমস্যাও মিটিবে না। বাঙালীকে নিজের অন্ন পরের হাতে তুলিয়া দিয়া বুভুক্ষার জ্বালা ভোগ করিতে হইবে। এই কয়েক বৎসরেই বাঙালীর স্বার্থের দিক হইতে এই সিদ্ধান্তের বিষময় ফলকে আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি—আইনসভায় ভোটের জোর বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে স্বার্থপর-তন্ত্র মন্ত্রীরা কি ভাবে দেশের স্বার্থকে শ্বেতাঙ্গদের কাছে বিকাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। চোখের উপর এই যে প্রত্যক্ষ সত্য, ইহাকে বিস্মৃত হইয়া বড় বড় কথা বলার কোন মূল্য নাই। সংহতভাবে জাতীয়তার শক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য বাঙালীকে সর্ব্বতোভাবে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, জাতীয়তার এই যে সংহতি ইহাই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সবচেয়ে বড় শক্তি। সুতরাং কংগ্রেসের স্বাধীনতার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে প্রকৃত কংগ্রেসকর্ম্মীর কর্ত্তব্য হইল সর্ব্বাগ্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই যে কূটনীতি, ইহাকে ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হওয়া। গাছের

স্বদেশী গ্রহণের সংকল্প—

৭ই আগষ্ট স্বদেশী ব্রত গ্রহণের দিবস, এই দিবসের সংকল্প গ্রহণের ভিতর দিয়া বাঙলা দেশে নূতন শক্তির উদ্বোধন হয়। আমরা সে দিবসের স্মৃতি একরূপে ভুলিয়া গিয়াছি বলিলেই চলে, আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, নিখিল ভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্য্যকরী সমিতি ৭ই আগষ্টের সেই আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশবাসীকে স্বদেশী গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়া বলিয়াছেন যে, বৃটিশ পণ্যের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প এবং অন্যান্য শিল্প মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এই সব দেশীয় শিল্পের কারখানার কাজের উপর বহুসংখ্যক ভারতীয়ের জীবিকা নির্ভর করিতেছে, ঐ সব শিল্পের প্রসারের অর্থ হইল তাহাদের উপজীবিকার সংস্থান, বিদেশীর ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতির অর্থই হইল ভারতের অর্থনৈতিক দাসত্ব। ইহা ছাড়া, সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধসজ্জার বিরুদ্ধতাস্বরূপেও স্বদেশী গ্রহণের উপর জোর দিলে রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করা হইবে; সুতরাং দেশবাসীরা নিষ্ঠার সহিত স্বদেশী ব্রত অবলম্বন করুন। পূজা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, এই সময় স্বদেশী ব্রত গ্রহণের এই আন্দোলন আরম্ভ করা খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। আমরা আশা করি, ফরোয়ার্ড ব্লকের এই সিদ্ধান্ত শুধু সঙ্কল্প মাত্রেই থাকিবে না, তাঁহারা এই সঙ্কল্পকে সার্থক করিবার জন্য কার্য্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং ভারতের গ্রামে গ্রামে কর্ম্মীরা স্বদেশী ব্রতের সাফল্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবেন এবং সেজন্য দুঃখকষ্ট হয়ত বরণ করিয়া লইতে হইবে; কিন্তু সেদিকে তাঁহারা ভ্রুক্ষেপ করিবেন না। জাতির মধ্যে আজ একটা অবসাদ আসিয়াছে এবং আত্মপ্রত্যয়হীনতার ভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে, উদ্দীপনামূলক কর্ম্মপদ্ধতির ভিতর দিয়া সেই অবসাদকে দূর করিতে হইবে এবং আত্মপ্রত্যয়কে ফিরাইয়া আনিতে হইবে, এইটিই আগে দরকার এবং গণ-সংগ্রামের গোড়াকার কথাটা হইল ইহাই।

পাটের দর নিয়ন্ত্রণ—

বাঙলার মন্ত্রীমণ্ডল পাট নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স জারী করিবার সময় বড়াই করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ দাওয়াইতে কৃষক, কলওয়ালা ও কলের শ্রমিক, এই ত্রিবর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার সমগ্র আর্থিক ব্যাধির উপশম হইয়া যাইবে। সে উক্তি যে শুধু ধাপ্পাবাজী এবং শ্বেতাঙ্গদের ভোট যোগাড় করিবার উদ্দেশ্যে শ্বেতাঙ্গদের স্বার্থসিদ্ধ করাই উক্ত অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য ছিল, পাট চাষীদের অপকার ছাড়া উপকার ঐ অর্ডিন্যান্সে হইবে না, একথা আমরা তখনই বলিয়াছিলাম; এখন বাস্তব সত্য আমাদের উক্তির যৌক্তিকতাকেই উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। অর্ডিন্যান্সের প্রতিক্রিয়া পাটের বাজারকে এখনও প্রভাবিত রাখিয়াছে। পাটের দর যেখানে চড়া উচিত ছিল সকল দিক হইতে, সেখানে দর চড়ে নাই। শ্রমিক-সমস্যাও জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। এখন মন্ত্রীমণ্ডল অবস্থার চাপে পড়িয়া বলিতেছেন, হাঁ, পাটের সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া না দিলে আর চলিতেছে না এবং আইন করিয়া পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করাও দরকার হইয়া পড়িয়াছে; ধাপ্পাবাজীতে আর কুলাইতেছে না, বাঙলার চাষীরা অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে নূতন নির্ব্বাচনও ঘনাইয়া আসিল; সুতরাং বাঙলা সরকার সুর ঘুরাইয়া লইয়াছেন। যাহা হউক, কথা অনুযায়ী কাজ যদি হয়, তবে মন্দের ভাল বলিতে হইবে। প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক নির্ব্বাচনের সময় কৃষকদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা পাটের সর্ব্বনিম্ন দর দশ টাকা বাঁধিয়া দিবেন, সে কথা কাজে পরিণত এ পর্য্যন্ত হয় নাই; এইবার হইবে কি না, তাহা দেখিবার বিষয়। বাঙলার শ্রমিক সচিব সরকারী ইস্তাহারের ভাষ্য-মুখে বলিয়াছেন যে, ফাটকা বাজারে পাটের দর প্রতি পাকা গাঁইট তাঁহারা ৩৬্ টাকা করিয়া বাঁধিয়া দিবেন। মিঃ সুরাবর্দ্দীর হিসাব মত কাজ হইলে, পাটের দর মণকরা সাত টাকার কিছু উপরে পড়িবে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, পাটের দর স্বচ্ছন্দেই দশ টাকা বাঁধিয়া দেওয়া যায়। মন্ত্রীদের যদি গরজ থাকে এবং বাহিরের কলওয়ালাদের প্রভাব তাঁহারা গ্রাহ্য না করিয়া কাজ করিতে পারেন। সেই কাজ কতটা তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব হইবে, ইহাই হইতেছে সন্দেহের বিষয়। কলওয়ালাদের পক্ষ হইতে ইতিমধ্যেই বাঙলা সরকারের ইস্তাহারের প্রতিবাদে সুর উঠিয়াছে। জুট মিল্‌ এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বার্ণস সাহেব বলিতেছেন যে, বিহার এবং আসাম সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙলা সরকারের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে রাজী হইবেন না। উহার কারণ দেখান নাই। পাটের দর বাঁধিয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি এই মামুলী যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, চাহিদা অনুসারেই বাজারের তেজী-মন্দা ঘটিয়া থাকে, কৃত্রিম ভাবে দর বজায় রাখা অনিষ্টকরই হয়। বাণিজ্যনীতির এই সাধারণ সূত্রটি দেশের লোকের না জানা আছে এমন নয়। গবর্ণমেণ্ট চাহিদা অনুসারেই দর বাঁধিয়া দিবেন এবং চাহিদা কোন্ বৎসর কতটা, তাহা জানিতেও গবর্ণমেণ্টকে কোন বেগ পাইতে হয় না। চাহিদার অনুপাতে বাজারের স্বাভাবিক দর যদি বজায় রাখা যায়, তাহা হইলে বাঙলার কৃষকদের আক্ষেপের কারণ থাকে না—ভিতরে পড়িয়া কৌশলে মোটা লাভ তুলিবার জন্য কলওয়ালা এবং ফাটকা বাজারের দালালদের যে ধাপ্পাবাজী চলে, তাহা ভাঙিয়া দিতে পারিলেই হয়। আমরা জানি, শুধু কথায় না বলিয়া, এই কাজটা করা বাঙলা সরকারের পক্ষে কেমন কঠিন; সুতরাং শ্বেতাঙ্গদের ভোটের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তাঁহারা ইস্তাহার অনুযায়ী কাজ কতটা করিতে সম্ভব হইবেন, এ বিষয়ে আমাদের এখনও সন্দেহ রহিয়াছে।

জওহরলালের চীন-যাত্রা—

আগামী ২০শে অথবা ২৭শে আগষ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিমানপথে চীন যাত্রা করিবেন। পণ্ডিতজী সম্প্রতি কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্বরূপে সিংহলে গমন করিয়া-

ছিলেন, তাঁহার সিংহল গমনের ফল আশানুরূপ হইয়াছে এমন কথা অবশ্য বলা যায় না; কিন্তু তাহার ফলে যে ভারতীয়দের সম্পর্কে সিংহল সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এটুকু স্বীকার করিতেই হয় এবং আশা করা যায় এইভাবে সিংহল ও ভারতের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর হইবে। চীনা সরকার আজ রাষ্ট্রীয় সঙ্কট সান্ধিক্ষণে পতিত। ভারতবর্ষ এই সংকটে যথাসাধ্য চীনের জাতীয়তাবাদীদিগকে সাহায্য করিতেছে। ভারতীয় সেবকবাহিনী চীনে এখনও কার্য্য করিতেছেন। পণ্ডিত জওহরলালজী চীনের প্রায় দুই শত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আমন্ত্রণ পাইয়াছেন। তাঁহার চীন যাত্রার ফলে আর্থিক বল বা লোকবলের দিক হইতে সাহায্য না পাইলেও চীনের স্বাধীনতার সাধকগণ ভারতের নৈতিক সমর্থনে শক্তিলাভ করিবেন এবং সেই শক্তিও সামান্য নয়। আদর্শের বলবত্তার ঐকান্তিক উপলব্ধি মানুষকে যেমনভাবে দুর্দ্ধর্ষ এবং অপরাজেয় করিয়া তোলে, অন্য পথে তাহা হয় না। জাতির স্বাধীনতার সাধনায় এই শক্তির প্রয়োজন আছে।

ইংরেজের আত্মসমর্পণ—

জাপান ইংরেজকে যেভাবে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতেছে, সে দৃশ্য দেখিয়া নিতান্ত কঠিন প্রাণও দুঃখিত হইয়া পড়িবে। তিয়েনসিনের সর্ব্বত্র জাপানীরা ইংরেজ-বিদ্বেষী আন্দোলন চালাইতেছে। ইংরেজ অধিকৃত অন্যান্য দেশেও ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার চেষ্টা হইতেছে। বৃটিশ দূতেরা টোকিওর এদিকে ওদিকে জাপান মন্ত্রীদের পিছনে পিছনে ফেউ ফেউ করিয়া ফিরিতেছে, কিন্তু জাপ সামরিক কর্ম্মচারীরা তাহাদের কোন কথাই বলিতে গেলে কানে তুলিয়া লইতেছে না। রাজনীতিক আশ্রয়প্রার্থীদিগকে রক্ষা করা স্মরণাতীত কাল হইতে সভ্য জাতির ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম রক্ষায় ইংরেজের একদিন নাম ছিল। যে ইংরেজ একদিন ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্‌ডী, ক্রোপটকিন, লেনিন, ডাক্তার সান-ইয়াৎ-সেন, ইঁহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিল, আজ সেই ইংরেজ জাপানী কর্ত্তাদের হুকুম তামিল করিয়া তিয়েনসিনের বৃটিশ অধিকারের মধ্যে আশ্রয়প্রাপ্ত চারজন জাপ-বিরোধী বলিয়া সন্দেহভাজন চীনাকে জাপানের হাতে নরবলির জন্য ছাড়িয়া দিতেছে। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। তিয়েনসিনে যত চীনা রৌপ্য মুদ্রা আছে, তাহা জাপ কর্ত্তাদের হাতে সঁপিয়া দিতে হইবে এবং পুলিশের কাজ সম্পর্কে কিছু কর্ত্তৃত্বও জাপানীদের হাতে দিতে হইবে, জাপানীদের এই দাবী। এই দাবী ইংরেজ যাহাতে কার্য্যে পরিণত করিতে বাধ্য হয়, তাহা করিবার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। তিয়েনসিনের কয়েকজন জাপ সামরিক কর্ম্মচারী ইংরেজের সঙ্গে মিটমাটের আলোচনা সম্পর্কে টোকিওতে গিয়াছিলেন। টোকিওর মিটমাটের আলোচনা আপাতত চাপা পড়িল। সামরিক কর্ম্মচারীরা তিয়েনসিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন,—পুলিশের কর্ত্তৃত্ব সম্পর্কিত সমস্যা এবং মুদ্রা সম্পর্কিত সমস্যা এই দুইটিই অবিভাজ্য, জাপান এই সম্পর্কে তাহার দাবীর কোনটিই ছাড়িবে না। একদিকে জার্ম্মানী, অপরদিকে জাপান, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আজ দুইদিককার চাপে নাজেহাল—একেই বলে জাতি কল। ইংরেজ এমন জাতি কলের মধ্যে কোনদিন পড়ে নাই। বৃহত্তর আদর্শের যে প্রেরণা জাতির অন্তরে শক্তি দেয়, সাম্রাজ্য-স্বার্থের হিসাব-নিকাশে ইংরেজ-অন্তরে আজ সে শক্তি নাই। অতি ঘোর স্বার্থপরতা এইরূপভাবে নিজেদের কর্ম্মেই জাতির অধঃপাতের কারণ ঘটাইয়া থাকে। জগতের ইতিহাসে সেই অভিজ্ঞতারই নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত হইতেছে। স্বার্থ, স্বার্থ-সজ্জা সাধনায় জাতি কেমন করিয়া ডুবে এবং বিষয়-সম্পদের বাহুল্য তাহার শক্তির কারণ না হইয়া কেমন করিয়া দুর্ব্বলই করিয়া ফেলে—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংকটে জগৎ এই শিক্ষাই লাভ করিতেছে।

করুণার ছিটে-ফোঁটা—

বন্যা আর দুর্ভিক্ষ—এই দুইটি জিনিষ বাঙলার বাৎসরিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং বাঙলাদেশের সকল সমস্যার মধ্যে এই দুইটিকে প্রধান সমস্যা বলা যাইতে পারে। এদেশের গবর্ণমেণ্টের যদি এদিকে দৃষ্টি থাকিত, তবে এ সমস্যার সমাধান না হইত, এমন নহে; কিন্তু সমস্যার সমাধান হওয়া দূরের কথা, ইহা যে একটা সমস্যার মত সমস্যা এমন বিবেচনা লইয়া এ পর্যন্ত এদেশের গবর্ণমেণ্ট কোন কর্ম্মপ্রণালীই অবলম্বন করেন নাই। এখন যে গরীবের দরদে একান্ত দরদী মন্ত্রীদের শাসন চলিতেছে বাঙলাদেশে তাহাতেও এই সমস্যা সমাধানের জন্য গঠনমূলক কোন কর্ম্মপন্থা লইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যতঃ অগ্রসর হইবার কোন গরজই দেখা যায় না। বাঙলার মন্ত্রীদিগকে যখনই সাহসের সঙ্গে কোন একটা বড় রকমের কর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করিতে বলা হয়, তখনই তাঁহারা সেকথা ধামা চাপা দিতেই চেষ্টা করেন। বাঙলাদেশের সর্ব্বত্র সম্প্রতি বন্যায় যে দুঃখ-কষ্ট দেখা দিয়াছে, বাঙলার প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর তাহার একটি বিবৃতি বাহির করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সদাশয় মন্ত্রিমণ্ডলের উদারতার মহিমারও কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাঙলার এই সব বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য সরকার হইতে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা জানিয়া আমরা স্থির বুঝিয়াছি যে, আসুক বন্যা, আসুক ঝড়, এমন মহিমময় মন্ত্রীরা থাকিতে বাঙলার লোকদের কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য? মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, যশোহর এই কয়েকটি জেলায় বন্যায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের আমনের ফসল সব নষ্ট হইয়াছে, ধান সব জলের তলে। মেদিনীপুরের ঘাটাল এবং দাসপুর থানার অবস্থাও তদনুরূপ। অথচ এই যশোহর, মুর্শিদাবাদ এবং মেদিনীপুর এই তিন জেলার সাহায্যের জন্য সরকার হইতে সাকুল্যে ১৭ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। হাওড়া জেলার বহু স্থানেই বন্যায় লোকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত, হুগলী জেলার আরামবাগ, খানাকুল, গড়েরপাড়া এই সব অঞ্চলের লোকের

দুর্দ্দশার অন্ত নাই। ইতিমধ্যেই বহু নর-নারী ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়াছে এবং ভিক্ষান্নের দ্বারা জীবন-ধারণ করিতেছে। কিন্তু তামাম হুগলী জেলার জন্য সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে ২৫০০, টাকা এবং হাওড়ার ভাগ্যে জুটিয়াছে তিন হাজার তঙ্কা মাত্র।

বন্যার ফলে কিরূপ ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা হইতেই তাহা কিছু পরিমাণে বুঝা যাইবে যে, মেদিনীপুর জেলার ৭০ বর্গমাইল জমির ফসল ইহাতে নষ্ট হইয়াছে। যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার লোহাগড়া থানার আউশ ধান অর্দ্ধেক জলে ডুবিয়া গিয়াছে, আমনের অবস্থাও ভাল নয়। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার ১২৮ বর্গমাইল জমি রূপনারায়ণের বানে জলমগ্ন হইয়াছে, ১২টি ইউনিয়নের বহু ঘর-বাড়ী ধ্বংস হইয়াছে। ত্রিপুরা জেলায় শতাধিক বর্গ-মাইল জমির ধান নষ্ট হইয়াছে। এই ভরসা দেওয়া হইয়াছে যে, আবশ্যক হইলে আরও টাকা মঞ্জুর করা হইবে,—সে হইল কর্ত্তাদের ইচ্ছায় কর্ম্ম। সে আশ্বাসের মূল্য কি এবং সে আশ্বাসের ফল ভোগ করিতে হইলে লোককে ফ্যাসাদ কত পোহাইতে হয়, আমাদের কিঞ্চিৎ জানা আছে। যাহা হউক, কর্ত্তাদের কাছে আমাদের নিবেদন এই যে, বড় বড় বোল-চাল ছাড়িয়া তাঁহারা বাঙলার এই সব বিপন্নদের দুঃখ-কষ্টের যাহাতে কিছু লাঘব হয়, সেজন্য চেষ্টা করুন। সাহায্যকার্য্য যাহাতে যথোচিতভাবে পরিচালিত হয় এবং সাহে ভূতের ব্যাপার না হইয়া দাঁড়ায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখুন।

শ্রীঅরবিন্দ—

শ্রীঅরবিন্দের ৬৭তম জন্মদিবসে আমরা তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের বেদীমূলে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। তিনি কবি, তিনি দার্শনিক, তিনি স্বাধীনতামন্ত্রের উদ্গাতা, তিনি নূতন মুক্তিপাগল ভারতবর্ষের অন্যতম স্রষ্টা। আজ তিনি আমাদের এই কোলাহলময় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থান করিলেও তাঁহার চিন্তাধারা আমাদিগকে অনুক্ষণ প্রেরণা দিতেছে। তাঁহার গীতার ভাষ্য নব্য ভারতবর্ষকে নূতনভাবে ভাবাইয়াছে। বিজ্ঞানশাসিত এই জড়বাদের আধিপত্যের দিনে তিনি আমাদের চিত্তকে একটা বিপুলতর সত্যের মধ্যে মুক্তি দিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মকে মিলাইয়াছেন। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের একসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকারের গোঁড়ামি হইতে মুক্ত করিয়া যে পথ সত্যের পানে আমাদিগকে লইয়া যায়, সেই পথকে আমাদের সম্মুখে তিনি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। সত্যকে খণ্ড করিয়া দেখিতে গিয়াই আমরা সত্যকে হারাইয়া ফেলি। সত্যের বিচিত্র দিককে স্বীকার করিয়াই আমরা অবিদ্যার হাত হইতে মুক্ত হই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সত্যের বিভিন্নমুখী ধারাগুলিকে এক মহাসত্যের মাঝে মিলাইয়া দিয়া আমাদের চিত্তকে যেমন উদার করিয়াছেন, অরবিন্দও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের উত্তর-সাধক। তিনি শতায়ু হইয়া তাঁহার তপস্যার নব নব সম্পদে জাতিকে এবং মানবসভ্যতাকে ঐশ্বর্য্যশালী করুন।

ইউরোপের রণসজ্জা—

যুদ্ধ এখনও বাধে নাই, কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও নৌ বিভাগ এবং বিমান বিভাগ ছাড়া শুধু এক স্থল-সৈন্যই ইউরোপে ৮৫ লক্ষ সজ্জিত অবস্থায় আছে। ইউরোপের শক্তিসমূহকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—গণতান্ত্রিক দল এবং ফ্যাসিষ্টপন্থী দল। প্রথমোক্ত দলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, তুরস্ক, রুমেনিয়া এবং গ্রীস আছে। ইহাদের মধ্যে ফ্রান্সের সজ্জিত স্থল সৈন্যের সংখ্যা ১০ লক্ষ, ইংলণ্ডের ৬০ হাজার, পোল্যাণ্ডের ৫০ হাজার, তুরস্কের ৩ লক্ষ, রুমেনিয়ার ২ লক্ষ ৭৫ হাজার এবং গ্রীসের ২ লক্ষ স্থল সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে। অপরপক্ষে আছেন—জার্ম্মানী, ইটালী এবং হাঙ্গেরী। ইহাদের মধ্যে জার্ম্মানীর আছে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য প্রস্তুত; ইটালীর আছে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার এবং হাঙ্গেরীর আছে ২ লক্ষ সৈন্য।

উপরের হিসাব অনুসারে জার্ম্মান-ইটালীর পক্ষে প্রস্তুত সৈন্যের পরিমাণ ধরা যায় ২৯ লক্ষ এবং স্পেনের ১ লক্ষ ৫০ হাজারকেও ঐ সঙ্গে ধরা যাইতে পারে। অন্য পক্ষে তথা-কথিত গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অর্থাৎ ইংলণ্ড প্রভৃতি দলের আছে ২৮ লক্ষ ৭৫ হাজার সৈন্য।

যুগোশ্লাভিয়া ছোট দেশ হইলেও তাহাকে ৩ লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত রাখিতে হইতেছে। নিরপেক্ষ যে কয়েকটি দেশকে এখনও বলা যাইতে পারে, তন্মধ্যে বুলগেরিয়ার প্রস্তুত আছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্য, বেলজিয়ামের ১ লক্ষ, বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহের ৬০ হাজার এবং হল্যাণ্ড, পর্ত্তুগাল ও সুইজার-ল্যাণ্ডের প্রত্যেকের প্রস্তুত স্থল-সৈন্যের সংখ্যা ৩০ হাজার করিয়া। ভাটিকানকে পৌর-রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে, এই পৌর-রাষ্ট্রের ১০ হাজার সেনা প্রস্তুত আছে, ইহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক পোপের সৈন্য আছে। অন্য সব জার্ম্মানী। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সজ্জিত স্থল সৈন্যের সংখ্যা ২০ লক্ষ; সুতরাং রুশিয়া যে পক্ষে যোগ দিবে, সেই পক্ষই প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা বুঝিয়াই রুশিয়াকে দলে টানিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা চলিতেছে।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(২০)

অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণের দিকে অভিযান

জাতীয় অর্গানিজেশনে বিচার বিভাগ ও ব্যবস্থাপক বিভাগ

আদিজাতিক ঐক্য যখন এক অদ্বিতীয় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং তাহার রাজনৈতিক, সামরিক এবং প্রকৃত শাসননির্ব্বাহক কার্য্যাবলীতে ঐকিকতা ও সমরূপতায় উপনীত হইয়াছে তখনও তাহার বাহ্য অর্গানিজেশন সম্পূর্ণ হয় নাই। তাহার সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের আর একটা দিক রহিয়াছে আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং তাহারই আনুষঙ্গিক বিচার বিভাগ এবং ইহাও সমান গুরুত্ববিশিষ্ট; আইন প্রণয়নের ক্ষমতাই সার্ব্বভৌম শক্তির বিশিষ্ট লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়। যদিও সর্ব্বদা এইরূপ ছিল না। ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে, কোন সমাজের প্রথম কাজই হইতেছে তাহার নিজ জীবনধারার নিয়মগুলি সজ্ঞানে ও সুব্যবস্থিতভাবে নির্ণয় করা, এইগুলি হইতেই আর সব কিছুর উদ্ভব হইবে এবং এইগুলির উপরেই তাহারা নির্ভর করিবে, অতএব স্বভাবত এইগুলি প্রথমেই বিকশিত হইবে। কিন্তু জীবন তাহার নিজস্ব নিয়ম অনুসারে এবং শক্তি সকলের চাপের বশে বিকাশ লাভ করে, স্ব-চেতন মনের নিয়ম ও ন্যায়-শাস্ত্র অনুসারে নহে; তাহার প্রথম গতি নির্দ্ধারিত হয় অবচেতনের দ্বারা এবং কেবল পরে ও গৌণভাবেই তাহা স্ব-চেতনের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। মানব সমাজের বিকাশে এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রমই হয় নাই; কারণ যদিও মানুষ তাহার প্রকৃতির মূলতত্ত্বে মনোময় সত্তা, তথাপি সে কার্য্যত আরম্ভ করিয়াছে চেতন প্রাণময় সত্তারূপে। প্রকৃতির মানবীয় প্রাণী-রূপে অনেকাংশে যন্ত্রবৎ মনোবৃত্তি লইয়া, এবং কেবল পশ্চাতেই সে স্ব-চেতন প্রাণী, আত্ম-উন্নতি সাধক মন, হইতে পারে। ব্যষ্টিকে এই ধারা অনুসরণ করিতে হইয়াছে এবং সমষ্টিগত মনুষ্য ব্যষ্টির পথ ধরিয়াই চলে এবং সকল সময়েই উৎক্রমে ব্যষ্টিগত বিকাশের অনেক দূর পিছনে পড়িয়া থাকে। অতএব সমাজের পক্ষে নিজ প্রয়োজনের জন্য সজ্ঞানে এবং সম্পূর্ণভাবে আইন প্রণয়নে ব্রতী জীবন্ত প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠা তর্ক বুদ্ধির সঙ্গতি অনুসারে প্রথম আবশ্যকীয় স্তর হইলেও, বস্তুত জীবনের সঙ্গতিতে উহা আইসে শেষে এবং চূড়ান্ত পরিণতিরূপে। ইহা সমাজকে অবশেষে সজ্ঞানে রাষ্ট্রের সাহায্যে তাহার সামরিক, রাজনৈতিক, শাসন-নির্ব্বাহক, অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সমগ্র অর্গানিজে-শনকে সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধ করিয়া তুলিতে সমর্থ করে। এই প্রক্রিয়ার পূর্ণতা নির্ভর করে সেই অভিবিকাশের পূর্ণতার উপর যাহা দ্বারা রাষ্ট্র ও সমাজ যতদূর সম্ভব একার্থবাচক হইয়া উঠে। ঐটিই হইতেছে গণতন্ত্রের সার্থকতা; ঐটি সমাজতন্ত্রেরও সার্থকতা। উহাদের দ্বারাই উপলক্ষিত হয় যে, সমাজ সম্পূর্ণ-রূপে স্ব-চেতন (self-consicous) হইবার জন্য এবং সেইহেতু মুক্তভাবে এবং সজ্ঞানে স্ব-নিয়ন্ত্রণশীল হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে।* কিন্তু এখানে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য যে, আধুনিক গণতন্ত্র এবং আধুনিক সমাজতন্ত্র সেই চরম পরিণতি লাভের কেবল প্রথম স্থূল এবং ভ্রান্তিপূর্ণ প্রয়াস, একটা অপটু আভাস মাত্র, পরন্তু মুক্তভাবে বুদ্ধিসম্মত সিদ্ধি নহে।

সমাজ ও আইনের প্রারম্ভকালীন অবস্থা

প্রথমে, সমাজের প্রারম্ভ অবস্থায় আইন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, রোমান lex, সে রকম কিছুই ছিল না; তখন ছিল শুধু কতকগুলি অবশ্য পালনীয় রীতি, nomoi, moves, আচার, ধর্ম্ম, সেগুলি সমষ্টিগত মানবের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির দ্বারা এবং সেই প্রকৃতির উপর তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার শক্তি ও প্রয়োজনসমূহের ক্রিয়ার অনুসরণে নির্দ্ধারিত হইত। তাহারাই institute হইয়া উঠে।

নির্দ্দিষ্ট বৈধী পদমর্য্যাদা লাভ করে এবং এইভাবে দানা বাঁধিয়া আইনে পরিণত হয়। তাহা ছাড়া, সেগুলি সমাজের সমগ্র জীবনে ব্যাপক হয়; রাজনৈতিক ও শাসননির্ব্বাহক আইন, সামাজিক আইন এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আইন—এরূপ কোন প্রভেদই থাকে না। এইগুলি সব যে একই ব্যবস্থায় মিলিত হয় শুধু তাহাই নহে পরন্তু অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত হয় এবং পরস্পরের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। প্রাচীন ইহুদী আইন এবং হিন্দু শাস্ত্রও এই ধরণের ছিল এবং মানব জাতির বিশ্লেষণাত্মক ও ব্যবহারিক বুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশের ফলে অন্যত্র যে সব বিশিষ্টীকরণ ও পৃথককরণের প্রবৃত্তি জয়ী হইয়াছে সে সব সত্ত্বেও হিন্দু শাস্ত্র আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সমাজের সেই পূর্ব্বতন নীতি বজায় রাখিয়াছিল। এই বহু-মুখী আচারমূলক শাস্ত্র অবশ্য ক্রমবিবর্ত্তনে গড়িয়া উঠিয়াছিল, পরন্তু ইহা হইয়াছিল পরিবর্ত্তনশীল ভাবধারা ও উত্তরোত্তর জটিলতর প্রয়োজন সকলের অনুসরণে সামাজিক রীতিনীতি-সমূহের স্বাভাবিক বিকাশের দ্বারা। এমন কোন একমাত্র এবং নির্দ্দিষ্ট আইন প্রণয়নকারী কর্ত্তৃপক্ষ ছিল না যে, সজ্ঞান রচনা ও নির্ব্বাচনের দ্বারা অথবা জনসাধারণের সম্মতি পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়া অথবা প্রয়োজন ও অভিমতের সাধারণ ঐক্য সাক্ষাৎভাবে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া সে সব নির্ণয় করিবে। রাজা, নবী, ঋষী এবং ব্রাহ্মণ স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণ নিজ নিজ শক্তি ও প্রভাব অনুসারে এইরূপ কার্য্য করিতে পারিতেন, কিন্তু কেহই প্রতিষ্ঠিত আইন প্রণয়নকারী সার্ব্বভৌম কর্ত্তা ছিলেন না; ভারতে রাজা ছিলেন ধর্ম্মের প্রয়োগ-কর্ত্তা, কিন্তু তিনি আদৌ আইন প্রবর্ত্তক ছিলেন না। অথবা কেবল কদাচিৎ বিশিষ্ট ক্ষেত্রে এবং নগণ্য পরিমাণেই তাহা করিতে পারিতেন।

মনু, মোজেস (Moses) ও লাইকারগাস্ (Lycurgus)

অবশ্য ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই আচারমূলক আইনকে অনেক সময়েই এক আদি ব্যবস্থাপক, এক মনু, মুশা বা

---

* ফ্যাসিজম্ এবং ন্যাশনাল্ সোস্যালিজম্ এই সূত্র হইতে "মুক্ত ভাবে" কথাটি কাটিয়া দিয়াছে এবং তাহারা প্রচণ্ড প্রণালীবদ্ধতার দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ স্ব-নিয়ন্ত্রণশীল চৈতন্য সৃষ্টি করিবার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে।

লাইকারগাসের উপর আরোপ করা হইয়াছিল; কিন্তু আধুনিক গবেষণার দ্বারা এরূপ কিম্বদন্তীর ঐতিহাসিক সত্যতা অগ্রাহ্য হইয়াছে, আর যদি বাস্তব প্রাপ্য তথ্য সকল এবং মানব মন ও তাহার বিকাশের সাধারণ ধারা বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে ইহা ঠিকই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বস্তুত যদি আমরা ভারতের গভীর পৌরাণিক ঐতিহ্য অনুধাবন করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, মনু সম্বন্ধে ভারতের ধারণা একটা প্রতীক ভিন্ন আর বেশী কিছু নহে। তাহার নামের অর্থ হইতেছে মনুষ্য, মনোময় জীব। তিনি দিব্য শাস্ত্র-প্রণেতা, মানুষের মধ্যে মনোময় দেবতা, মানব জাতি বা লোকসমূহকে তাহাদের বিবর্ত্তন যে সব ধারায় নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে তিনিই তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। পুরাণে বলা হইয়াছে যে, তিনি অথবা তাঁহার পুত্রগণ সূক্ষ্ম পৃথিবী বা লোকসমূহে রাজত্ব করেন। অথবা, আমরা যেমন বলিতে পারি, যে বৃহত্তর মনোবৃত্তি আমাদের কাছে অবচেতন রহিয়াছে তাঁহারা সেইখানেই রাজত্ব করেন, এবং সেখান হইতে মানুষের সচেতন জীবনের বিকাশের ধারাগুলি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার শাস্ত্র হইতেছে মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র, মনোময় বা মানবীয় জীবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের বিজ্ঞান। আর এই অর্থে আমরা যে কোন মানব সমাজের বিধিবিধানকে বলিতে পারি যে, উহার মনু, উহার জন্য যে আদেশ ও ধারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন উহা হইতেছে তাহারই সচেতন বিবর্ত্তন। যদি কোন দেহধারী মনু আসেন, কোন জীবন্ত মুশা বা মহম্মদ আসেন, তিনি কেবল অগ্নি এবং মেঘের আড়ালে লুক্কায়িত ভগবানের নবী বা মুখপাত্র হন, যেমন মুশা সিনাই পর্ব্বতের উপর জিহোবার আদেশ শুনিয়াছিলেন। আল্লা তাঁহার স্বর্গদূতগণের ভিতর দিয়া কথা বলিয়াছিলেন। আমরা জানি, মহম্মদ কেবল আরব জাতির প্রচলিত সামাজিক, ধর্ম্মীয় ও শাসননির্ব্বাহক আচার ব্যবহারগুলিকে বিকশিত করিয়া একটি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ঐ ব্যবস্থাটি প্রায়ই তাঁহার সমাধির অবস্থায় ভগবান তাঁহার নিগূঢ় অন্তর্দ্দৃষ্টিমূলক মনের নিকট বিবৃত করিতেন। সে অবস্থায় তিনি তাঁহার সচেতন সত্তা হইতে অতিচেতন সত্তার মধ্যে চলিয়া যাইতেন। এই সবই অতি-যৌক্তিক (super-rational) হইতে পারে, অথবা বলিতে পার অ-যৌক্তিক (irrational). কিন্তু মানবীয় বিকাশের এই স্তর হইতেছে যৌক্তিক ও ব্যবহারিক মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজ হইতে বিভিন্ন বস্তু; ঐ মন জীবনের পরিবর্ত্তনশীল প্রয়োজনসমূহ এবং স্থায়ী আবশ্যকতা সকলের সংস্পর্শে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাপক কর্ত্তৃত্বের দ্বারা, সমাজের সংঘবদ্ধ মস্তিষ্ক ও কেন্দ্রের দ্বারা রচিত এবং লিপিবদ্ধ আইন দাবী করে।

রাজতন্ত্রের উদ্ভব এবং কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্বের আরম্ভ

এই যে যুক্তিমূলক অভিবিকাশ, আমরা দেখিয়াছি ইহার স্বরূপ হইতেছে একটি কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্বের সৃষ্টি (সেটি প্রথমে হয় একটি পৃথক্ কেন্দ্রীয় শক্তি; কিন্তু পরে সেটি উত্তরোত্তর সমাজের সহবর্ত্তী হয়, অথবা সাক্ষাৎভাবেই তাহার প্রতিনিধি হয়), তাহা ক্রমশ সামাজিক কর্ম্মধারার বিশেষ বিশেষ এবং পৃথগ্ভূত অংশগুলিকে হস্তে গ্রহণ করে। প্রথম প্রথম এইরূপ কর্ত্তা হন রাজা, তিনি নির্ব্বাচিতই হউন অথবা বংশানুক্রমিকই হউন; তাঁহার আদিম স্বরূপে রাজা হইতেছেন যুদ্ধের নেতা এবং দেশের ভিতরের কার্য্যে তিনি কেবল অগ্রণী, মুখ এবং শক্তিশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রধান এবং জাতি ও সৈন্য দলের আহ্বান কর্ত্তা। জাতির কর্ম্মধারার কেন্দ্রস্বরূপ, কিন্তু প্রধান নিয়ন্তৃশক্তি নহেন; কেবল যুদ্ধের ব্যাপারে, যেখানে ফলপ্রদ কার্য্যের জন্য প্রথম প্রয়োজন হইতেছে কেন্দ্রীয়তা, সেইখানেই তিনি ছিলেন সর্ব্বেসর্ব্বা। সেনানায়ক (strategos) রূপে তিনি চরম হুকুম দিবার মালিক (imperator) ছিলেন। এই যে নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের সংযোগ এইটিকে যখন তিনি বাহিরের ব্যাপার হইতে ভিতরের দিকে প্রসারিত করিলেন, তখন তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক শক্তি হইয়া উঠিতে লাগিলেন, কেবল সামাজিক কার্য্যনির্ব্বাহের প্রধান যন্ত্র নহে পরন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

এইভাবে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্র অপেক্ষা বাহিরের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়া স্বভাবতই তাঁহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এখনও ইউরোপের গবর্ণমেণ্টসমূহকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জনসাধারণের ইচ্ছা অনুসরণ করিতে অথবা জাতিকে বুঝাইয়া সুজাইয়া নিজেদের মতে আনিতে হইলেও বৈদেশিক ব্যাপারে তাহারা সম্পূর্ণভাবে অথবা অনেকাংশেই নিজেদের মত অনুসারে কাজ করিতে পারে; কারণ তাহাদিগকে গুপ্ত কূটনীতির দ্বারা তাহাদের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে দেওয়া হয় সে নীতিতে জনসাধারণের কোন কথাই চলে না এবং জাতির প্রতিনিধিগণ কেবল সাধারণভাবে সেই নীতির ফলাফল সমালোচনা বা অনুমোদন করিতে পারে। আর যেগুলি পূর্ব্বাহ্নে সাধারণের গোচর করা হয় সেগুলি হইতে তাহারা তাহাদের অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারিলেও তাহাতে আশঙ্কা থাকে যে, জাতির বৈদেশিক কার্য্যধারার নিশ্চয়তা ও নিরবচ্ছিন্নতা, প্রয়োজনীয় সমরূপতা নষ্ট হইতে পারে এবং এইভাবে পররাষ্ট্রসমূহের সেই বিশ্বাস নষ্ট হইতে পারে যাহা না থাকিলে কথাবার্ত্তা চালান সম্ভব হয় না অথবা স্থায়ী সন্ধি ও সংযোগ সৃষ্টি করা যায় না। আর যুদ্ধের জন্যই হউক বা শান্তির জন্যই হউক, কোন সন্ধিক্ষণে তাহারা তাহাদের অনুমোদন বস্তুত প্রত্যাহার করিতেও পারে না; কেবল ঐ সন্ধিক্ষণেই, শেষ ঘণ্টায় বা শেষ মুহূর্ত্তেই তাহাদের পরামর্শ কার্য্যকরীভাবে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তখন উহা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। প্রাচীন রাজতন্ত্রগুলিতে এইরূপ অবস্থা আরও অনেক বেশী পরিমাণেই ছিল, তখন রাজাই ছিলেন যুদ্ধ ও শান্তির কর্ত্তা এবং জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে নিজের ব্যক্তিগত ধারণা অনুসারেই তিনি বৈদেশিক ব্যাপারসমূহ নিয়ন্ত্রিত করিতেন, তাঁহার সেই ধারণা তাঁহার নিজের কাম ক্রোধ, অভিরুচি এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারগত স্বার্থের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইত। কিন্তু আনুষঙ্গিক অসুবিধাগুলি যাহাই হউক না কেন, অন্তত যুদ্ধ ও শান্তি ও বৈদেশিক নীতির পরিচালন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালন রাজকীয় কর্ত্তৃত্বে কেন্দ্রীভূত, একীভূত হইয়াছিল। বৈদেশিক নীতির প্রকৃত পার্লামেণ্টারী নিয়ন্ত্রণের জন্য দাবী, এমন কি খোলাখুলি বৈদেশিক নীতির (আমাদের বর্ত্তমান ধ্যান

ধারণায় ইহা কঠিন ব্যাপার বলিয়া মনে হইলেও এক সময়ে ইহা কার্য্যত অনুসৃত হইয়াছিল এবং ইহার অনুসরণ সম্পূর্ণভাবেই সম্ভব) দাবী হইতেছে রাজতান্ত্রিক ও মুখ্য-তান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরের দিকে আর এক পদ অগ্রসর হওয়ার নিদর্শন *,—প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল উচ্চতম কার্য্যগুলি একমাত্র উচ্চতম শাসন-কর্ত্তা অথবা কয়েকজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার (executive men) হস্ত হইতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সঙ্ঘবদ্ধ সমগ্র সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে।

জাতীয় অর্গানিজেশনের শাসন-নির্ব্বাহক বিভাগ—কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব ও অর্থনৈতিক শক্তি

আভ্যন্তরীণ কার্য্যগুলি হস্তগত করা কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে অপেক্ষাকৃত কঠিন, কারণ সেগুলি আয়ত্ত করিতে অথবা তাহাদের উপর প্রধান কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে তাহাকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ও স্বার্থসমূহের এবং প্রতিষ্ঠিত ও অনেক সময়ে সমাদৃত জাতীয় রীতিনীতি এবং প্রচলিত অধিকার-সমূহের সম্মুখীন হইতে হয় এবং তাহারা তাহার প্রভুত্বকে অনেক সময়েই পরিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যে সকল ক্রিয়া স্বরূপত কার্য্যনির্ব্বাহক এবং শাসননির্ব্বাহক সেইগুলির উপর সে কোনরকম একীভূত আধিপত্য লাভ করিবেই। জাতীয় অর্গানিজেশনের এই যে শাসননির্ব্বাহক দিক, ইহার আছে তিনটি প্রধান বিভাগ—অর্থনৈতিক, প্রকৃত শাসননির্ব্বাহক এবং বিচারবিষয়ক। অর্থনৈতিক শক্তিটির সহিত রহিয়াছে সাধারণ ধনভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় প্রয়োজনসমূহের জন্য সমাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ, আর ইহা সুস্পষ্ট যে, যে কোন কর্ত্তৃত্ব সমাজের সম্মিলিত কর্ম্মধারাকে সঙ্ঘবদ্ধ ও দক্ষভাবে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে, ইহা তাহারই হস্তে থাকিবে। কিন্তু ঐরূপ কর্ত্তা অবিভক্ত ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যের দিকে, শক্তিসমূহের একীকরণের দিকে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে নিজের অবাধ ইচ্ছা অনুসারে শুধু যে ব্যয় নির্দ্ধারণ করিতে চাহে তাহাই নহে, পরন্তু সমাজ সাধারণ ভাণ্ডারে কি প্রদান করিবে, তাহার পরিমাণ কি হইবে এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ও শ্রেণী সকলের মধ্যে কে কি পরিমাণ দিবে তাহাও নির্দ্ধারণ করিতে চায়। রাজতন্ত্র স্বৈর কেন্দ্রীয়তার দিকে তাহার প্রবৃত্তির বশে সকল সময়েই এই শক্তিটিকে অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং নিজের হস্তে রাখিতে সংগ্রাম করিয়াছে, কারণ জাতীয় ধনভাণ্ডারের উপর আধিপত্যই হইতেছে প্রকৃত সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্বের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এবং সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী অংশ, ইহা বোধ হয় দেহ ও প্রাণের উপর আধিপত্য অপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজনীয়। সর্ব্বাপেক্ষা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে আধিপত্যটি হয় নিরঙ্কুশ এবং তাহা বিচার-প্রক্রিয়া ব্যতীত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা বা কাড়িয়া লওয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। অন্য পক্ষে যে শাসনকর্ত্তাকে প্রজাদের সহিত তাহাদের দেয় সম্বন্ধে এবং ট্যাক্স নির্দ্ধারণের প্রণালী সম্বন্ধে দর কষাকষি করিতে হয় তাহার কর্ত্তৃত্ব তখনই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, বস্তুত সে একমাত্র ও সম্পূর্ণ সার্ব্বভৌম কর্ত্তা থাকিতে পারে না। একটি মূল প্রয়োজনীয় শক্তি রাষ্ট্রের একটি নিম্নতর অংশের হস্তে থাকে এবং তাহার নিকট হইতে সার্ব্বভৌম শক্তি ঐ অংশে হস্তান্তরিত করিবার সংগ্রামে উহা তাহার বিরুদ্ধে সাংঘাতিকভাবেই প্রযুক্ত হইতে পারে। এই কারণেই ইংরেজ জাতির শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক সহজবোধ রাজতন্ত্রের সহিত সংগ্রামে ধনভাণ্ডারের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় জিনিষ হিসাবে ট্যাক্স-নির্দ্ধারণের এই প্রশ্নটির উপরেই বিশেষভাবে জোর দিয়াছিল। স্টুয়ার্টদের পরাজয়ে একবার যখন তাহা পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইল তাহার পর রাজতান্ত্রিক কর্ত্তৃত্ব হইতে গণতান্ত্রিক কর্ত্তৃত্বে রূপান্তর অথবা আরও ঠিকভাবে বলিতে হইলে, সমগ্র শাসন-কর্ত্তৃত্বটি সিংহাসন হইতে অভিজাতবর্গে অপসরণ এবং যেখান হইতে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীতে, পরে আবার সমগ্র জনমণ্ডলীতে অপসরণ* ছিল কেবল সময়ের প্রশ্ন। ফ্রান্সে এই আধিপত্যটি সাফল্যের সহিত কার্য্যত অধিকার করিয়া লওয়াতেই ছিল রাজতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি; সুবিচার ও মিতব্যয়িতার সহিত সাধারণ ধনভাণ্ডার খরচ করিবার অক্ষমতা, অভিজাতবর্গ ও যাজক শ্রেণীর বিপুল ধনরাশির উপর ট্যাক্স বসাইতে তাহার অনিচ্ছা অথচ জনসাধারণের উপর দুর্ব্বহ ট্যাক্স-ভার চাপাইয়া দেওয়া এবং সেইজন্য পুনরায় জাতির মত লইতে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা—ইহাই মহাবিপ্লবের সুযোগটি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। অগ্রগামী আধুনিক দেশগুলিতে যে কর্ত্তৃত্বশক্তি শাসন করিতেছে তাহা অল্পাধিক পূর্ণতার সহিত সমস্ত জাতির প্রতিনিধিত্ব অন্তত দাবী করে; ব্যক্তি ও শ্রেণীগুলিকে বশ্যতা স্বীকার করিতেই হয় কারণ সমগ্র সমাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপীল চলে না। তথাপি ট্যাক্স নির্দ্ধারণের প্রশ্ন নহে পরন্তু সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের যথাযথ অর্গানিজেশন ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নই ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করিতেছে।*

* আধুনিক গণতন্ত্রের আস্ফালন সত্ত্বেও এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হইতে এখনও অনেক দূরে।

* শেষ দুইটি ধাপ হইয়াছে গত ৮০ বৎসরের দ্রুত বিবর্ত্তন, একটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

* The Ideal of Human Unity হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

সমস্যার মূলে

আজ আমরা ঘরে বসিয়া বিশ্বের খবর রাখি; জগতের দূর দূরান্তে কাল যেসব ঘটনা ঘটিয়াছে আজ আমরা তাহা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পড়িতে পাই। পড়িয়া কখনও বা পুলকিত হই, কখনও বা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়ি। আজ একটি ক্ষেত্রে সবল এবং দুর্ব্বল, স্বাধীন এবং পরাধীন সকল জাতি সমভাবাপন্ন। বাঁচিতে সকলেই চাহে। আত্ম-রক্ষার আয়োজন মানুষের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। সেই আয়োজনে মানুষ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। আমরা বিশাল ভারতবর্ষের অধিবাসী। পরাধীন হইলেও আত্মরক্ষার চিন্তা আমাদিগকে একেবারে না হউক কিছুটাও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। হয়ত বা আমরা গড্ডলিকা প্রবাহের মত কোথাও ছুটিয়া চলিয়াছি, কিন্তু প্রতি পদ বিক্ষেপে আত্মরক্ষার কথাও আমাদের মনে উদিত হইতেছে। আজ দিকে দিকে যে মারণ যন্ত্রের প্রচুর আয়োজন তাহার মূলেও আত্মরক্ষার এষণা লক্ষ্য করি। এক কথায় যদি বর্ত্তমান জগতের সমস্যার কথা বলিতে হয় তাহা হইলে আত্মরক্ষার সমস্যাই সকলের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে বলিতে হইবে।

এই সমস্যা আজ এত বেশী করিয়া দেখা দিতেছে কেন তাহার মূল সন্ধান আমাদিগকে করিতে হইবে। মানুষ ক্ষমতাপ্রিয়। মনুষ্য সাধারণ লইয়াই জাতি। জাতি হিসাবেও মানুষ ক্ষমতা লাভের ঐকান্তিক প্রয়াসী। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে--আজ এক জাতি সবল; অন্য যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের কবলিত করিতে নিরতিশয় ব্যগ্র। কাল হয়ত সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে অন্যেরা সবল হইয়া তাহাকে হয় ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবে, না হয় অংশবিশেষ করায়ত্ত করিয়া নিজেরা বড় হইবে। রোমের মত বিশাল সাম্রাজ্য, অসভ্য গথ জাতি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহারা নূতন সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। রোমের পতনের পর মধ্য ইউরোপে Holy Empire-এর সৃষ্টি হয়। কালে এই সাম্রাজ্যও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

ক্রমে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হলান্ড, স্পেন, পর্ত্তুগাল স্ব স্ব প্রধান বহু রাষ্ট্র সৃষ্টি হইল। এই কার্য্য কয়েক শত বৎসর ধরিয়াই চলে। ইহারা একে একে সকলেই শক্তির উপাসক হইল। ইউরোপে স্বল্প পরিসর জায়গায় শক্তি বিস্তার সম্ভব নয়। তাহারা যে নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছে তাহা আত্মপ্রকাশ করিল নূতন দেশ আবিষ্কারে ও নূতন রাজ্য অধিকারে। আপনারা সকলেই জানেন স্পেন কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর ইউরোপে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। বিরাট সাম্রাজ্যেরও অধিকারী হইয়াছিল সে। এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা এই তিনটি মহাদেশে ইউরোপের স্পেনিয়ার্ড, পোর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজ ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করে এবং প্রত্যেকেই এক একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া বসে। ইহার পরে আসিল ইউরোপের Industrial Revolution বা শিল্প বিপ্লব। ওয়াট ও ষ্টিভেন্সনের Steam বা বাষ্পীয় শক্তি

ইটালীয় সৈন্যগণ মহড়ার সময় লক্ষ্য স্থির করিতেছে

আবিষ্কার এই শিল্প বিপ্লবের পথ খুলিয়া দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাষ্পীয় শক্তির মহিমা ইউরোপের বিভিন্ন জাতি উপলব্ধি করিতে থাকে। এই সময় বা ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই Feudalism বা সামন্ততন্ত্রের পরিবর্ত্তে ইউরোপে পূর্ব্বোল্লিখিত রাষ্ট্রগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি ছোট বড় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ইটালী ও জার্ম্মানী স্বতন্ত্র সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয় এই সময়ে। এই সব দেশেও শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। বিজ্ঞানের নব নব অবদান তাহারা সাগ্রহে বরণ করিয়া লইল এবং কোন কোন বিষয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের চেয়েও উন্নতি লাভ করিল। শিল্পোৎপাদনে জার্ম্মানীর খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া করিয়া লইবেই। বিগত মহাসমরের মূলে রহিয়াছে জার্ম্মানীর এই শক্তি স্ফুরণের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা এবং ব্রিটেনের এই শক্তি-স্ফূর্ত্তিতে বাধা দিবার ঐকান্তিক প্রয়াস।

যুদ্ধের পরে যে ভের্সাই সন্ধি হয়, তাহাতে এই সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তখন বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি তাড়াতাড়ি কোন রকমে একটা ব্যবস্থা করিয়া জার্ম্মানীকে দাবাইয়া রাখিবারই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সমস্যা যাহা তাহা রহিয়াই গেল। মহাযুদ্ধের পর বিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ ক্ষান্তি হয় নাই। প্রথম দশ বৎসর তাহারা মহাযুদ্ধের ক্লান্তি অপনোদনে কাটায়। তাহার পর আবার পূর্ব্বের মতই যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা

যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষায় চীনের নারীগণ

দেয়। বিজিত রাষ্ট্র জার্ম্মানী এবং বিজয়ী কিন্তু ক্ষুব্ধ ইটালী পুনরায় তাহাদের হাত-পা ছড়াইতে আরম্ভ করে। উভয়েরই কথা কিন্তু নূতন স্থল চাই, অর্থাৎ সেই আগেকার সমস্যা। নূতন রাজ্য লাভ করিব, তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া, কাঁচা মাল কিনিয়া এবং শিল্প-জাত দ্রব্য বেচিয়া নিজে শক্তিমান হইব। ইটালীর আবিসিনিয়া ও আলবেনিয়া অধিকার, জার্ম্মানীর অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া লাভ, বাহ্য কারণ যাহাই থাকুক, ঐ মূল সমস্যারই কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

পড়িতে লাগিল। কিন্তু এই সময়ে আর এক সমস্যা বিশেষ-ভাবে দেখা দেয়।

প্রথমোক্ত রাষ্ট্রগুলি আগে সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছে। নিজ দেশে এই সাম্রাজ্যের কাঁচা মাল আমদানী করিয়া তাহা হইতে নিত্য নূতন জিনিস তৈরী করিতে লাগিল এবং এই সব বিক্রয়ের বাজারও তাহারা সহজেই পাইল ঐ পরাধীন অঞ্চলগুলিতে। জার্ম্মানী বা ইটালী যাহারা শেষে আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের এ সুবিধা বড় রহিল না, তাহারা ভুক্তাবশিষ্ট যে সামান্য অঞ্চলগুলি আফ্রিকা ও এশিয়ায় পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। কিন্তু শক্তির দুর্দ্দম গতি, সে স্ফূর্ত্তিলাভের পথ

আপনারা একটা বিষয় বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন, আমি জাপানের কথা এখন পর্য্যন্ত উল্লেখ করি নাই। গত যুগের

ইটালী ও জার্ম্মানীর ইতিহাস আপনারা যদি তুলনামূলক-ভাবে পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে জাপানের বর্ত্তমান উন্নতি এবং শক্তিমত্তার ইঙ্গিতও অনেকটা লাভ করিতে পারিবেন। কেননা, ঐ দুইটি রাষ্ট্রের মতই মাত্র গত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে জাপানের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও পুষ্টি লাভ হইতে থাকে। চীন তাহার নিকট প্রতিবেশী। তাহার শক্তি স্ফুরণের পক্ষে চীনই উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু যখন সে দেখিল, ইউরোপের ব্রিটিশ, ফরাসী, রুশ, আমেরিকান এমন কি, জার্ম্মানও তাহার ঘাঁটিগুলি আগলাইয়া তাহাকে শোষণ করিতে লাগিয়া গিয়াছে, অথচ জাপানের স্থান সেখানে মোটেই হইতেছে না, তখন পাশ্চাত্য নীতিই হুবহু অনুকরণ এবং অনুসরণ করিতে লাগিয়া গেল। শিল্পে, বাণিজ্যে, রাজ্য শাসনে, সামরিক নীতিতে—যুদ্ধ-বিদ্যা ও নৌ-বিদ্যা শিক্ষায় এবং নৌ-বাহিনী ও স্থল-বাহিনী গঠনে পাশ্চাত্য ধারা প্রবর্ত্তিত হইল। মহাযুদ্ধে মিত্র শক্তির পক্ষে থাকিয়া জাপানের শক্তি বিকাশের বিশেষ সুবিধা হয়। ইতিপূর্ব্বেই ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইয়া তাহার পরোক্ষ সাহায্যে এবং প্রত্যক্ষ সহানুভূতিতে চীনে খানিকটা স্থান করিয়া লইয়াছিল। কোরিয়া অধিকার জাপানের চীন জয়ের প্রথম ধাপ। যুদ্ধের পরে তাহার শক্তিতে ছেদ টানিবার জন্য ওয়াশিংটনে বিশেষ চেষ্টা হয়। ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত জাপান তাহার রাজ্য জয়ের কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকে, কিন্তু পর বৎসর হইতেই ইহা পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয়। ১৯৩১ সাল হইতে বর্ত্তমান ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত জাপানের চীন-বিজয় কার্য্য একইভাবে চলিয়াছে। চীনে যাহাদের স্বার্থ, তাহারা স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্যই ব্যস্ত। চীনের স্বাধীনতা থাকুক বা না থাকুক, সেজন্য তাহারা বড় একটা মাথা ঘামায় না। আপনারা এখন বলিতে পারেন, তিয়েনসিনের ব্যাপার লইয়া তবে এত গণ্ডগোল কেন? তিয়েনসিন একটি ছোট শহর, পিকিংয়ের ৭০ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। মাত্র ৪ লক্ষ লোকের বাস সেখানে। ইহা লইয়া ব্রিটিশের এত মাথা-ব্যথা কেন? তিয়েনসিন ব্রিটিশের একটি লব্ধঅঞ্চল (Concession)। এতটুকু জায়গা ছাড়িয়া দিলে তাহার বিশেষ কিছু ক্ষতি হইত না, যদি না ইহার সঙ্গে তাহার বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত থাকিত। জাপানের উদ্দেশ্য চীনকে একাকীই ভোগ করে। সে এখন আর অন্য ভাগীদার সহ্য করিতে চাহিতেছে না। তিয়েনসিনকে অছিলা করিয়া তাহার এই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিতে ব্যস্ত। ইংরেজের পক্ষে কিন্তু ইহা ভীষণ কথা। চীন হইতে নিজ স্বার্থ চলিয়া গেলে, বহু স্বার্থই তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। চীনে জাপানের আধিপত্য পুরাপুরি বিস্তৃত হইলে ব্রিটিশের প্রাচ্য সাম্রাজ্য বিনাশেরও আশঙ্কা। এইখানেই যত গণ্ডগোল।

নূতন ধরণের সুসজ্জিত কামান

আজ জাপান, জার্ম্মানী, ইটালী যে কারণে মিলিত হইয়াছে, আপনারা এখন তাহা অনেকটা অনুধাবন করিতে পারিতেছেন। রাজ্যলাভই ইহাদের মূল লক্ষ্য। ইহার পথে যেসব বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হইতে পারে, তাহা নিরাকৃত করিতেই ইহারা অতিশয় তৎপর ডানজিগ একটি ছোট স্ব-শাসিত শহর। ইহাও ঠিক তিয়েনসিনের

মত—কি আয়তনে, কি লোকসংখ্যায়। ইহার লোকসংখ্যাও চার লক্ষের কিছু উপর। ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই জার্ম্মান। তাহা হইলেও এতটুকু ছোট জায়গা জার্ম্মানী-ভুক্ত করিবার প্রধান লক্ষ্য হইল উহাই—অর্থাৎ নিজ শক্তিবৃদ্ধি করিয়া ভবিষ্যতের অভিসন্ধি পূরণের চেষ্টা। আজ প্রাচীতে তিয়েনসিন লইয়াও যে সমস্যা, পাশ্চাত্যে ডানজিগ লইয়াও ঐ একই সমস্যা। সমস্যা এক হইলেও চেহারায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের দরুণই ধনতন্ত্রী ব্রিটেন ও সাম্যবাদী রুশিয়ার মধ্যে মিলন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। জার্ম্মানীর শক্তি ইতি-পূর্ব্বেই টের পাওয়া গিয়াছে। ইটালীর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ-যোগ সাধন, স্পেনকে স্বমতে আনয়ন, এই শক্তিকে অতি দ্রুত দুর্দ্দমনীয় করিয়া তুলিতেছে। তাই ইউরোপে জার্ম্মানীর শক্তিবৃদ্ধিতে যেমন ব্রিটেনের শঙ্কা বাড়িয়াছে, সোভিয়েট রুশিয়াও তেমনি শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। আত্ম-রক্ষার কথাও তাহাদিগকে ভাবিতে হইতেছে। নহিলে যে সাম্রাজ্যবাদকে সম্মুখে রাখিয়া ব্রিটেন ও জার্ম্মানী পরস্পর বিরোধিতায় লিপ্ত, তাহার মধ্যে সোভিয়েট রুশিয়া আসিয়া পড়িবে কেন?

এখন দেখা যাইতেছে, সাম্রাজ্যবাদই পূর্ব্বের মত বর্ত্তমানেও যত রকম অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতির সাম্রাজ্য আছে, জার্ম্মানী, ইটালী, জাপান প্রভৃতির সাম্রাজ্য নাই, অথবা যৎসামান্য যাহা আছে, তাহা ততখানি লাভজনক নহে। এই উভয় দলের মধ্যে যে দলই যখন জয়-লাভ করুক, অন্য দলকে তাহারা দাবাইয়া রাখিতে চাহিবে, নিজেদের স্বার্থপথে যাহাতে কেহ বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে, তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিবে। ভের্সাই সন্ধির অনুরূপ বহু সন্ধি আগেও হইয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থা বলবৎ থাকিলে অনুরূপ সন্ধি পরেও হইবে, কিন্তু মূল সমস্যার শেষ কোথায়? জার্ম্মানী আজ তাহার হৃত উপনিবেশগুলি চাহিতেছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি যাহাদের অধীন, সেগুলি আছে, তাহারা এখন ছাড়িতে রাজী নয়। ভয় পাছে জার্ম্মানী আবার পূর্ব্বের মত শক্তিমান হইয়া উঠে। ইংরেজ অন্য রকম ব্যবস্থার আভাস দিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, জগতে কাঁচা মাল লইয়াই ত যত বিসম্বাদ। অধীন দেশগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি রেখা টানিয়া দেওয়া হউক, যাহার মধ্যকার অঞ্চলগুলির কাঁচা মাল নির্দ্দিষ্ট কোন কোন রাষ্ট্র পাইবে, রাজনীতির দিক দিয়া তাহা যাহারই অধীন থাকুক না কেন। ইহাতে কিন্তু জার্ম্মানী বা বুভুক্ষু রাষ্ট্রগুলি সম্মত নহে। তাহারা ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পর্ত্তুগাল প্রভৃতির মতই সাম্রাজ্যের দাবী করে। এই দাবীর জবাবে আর একটি মহাসমর আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আজ দেশে দেশে সমর-সজ্জা আশ্চর্য্য রকম বাড়ানো হইতেছে। রাষ্ট্র-গুলির পক্ষে মাখনের চাইতে বন্দুকই অধিকতর কাম্য হইয়া পড়িতেছে। ইটালী, জার্ম্মানী, জাপান, রুশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, এমন কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাহাদের রণ-সম্ভার যেন পাল্লা দিয়া বাড়াইয়া চলিয়াছে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, যে কোন তুচ্ছ কারণেই পৃথিবীর যেখানে সেখানে একটা আত্মঘাতী মহাসমর আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে। কুরুক্ষেত্রের উদ্যোগ পর্ব্ব! নানাস্থানে স্থল-বাহিনী ও নৌ-বাহিনী জড় করা হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতেও বহু সহস্র সৈন্য মালয়ে ও মিশরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বিশ্বব্যাপী মহাসমর এক সময়ে ঘটিয়াছিল, এখন আবার আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরেও আবার যে এই রকম না হইবে তাহা বলা যায় না। খণ্ড যুদ্ধ ত অহরহই এবং যত্র তত্রই লাগিয়া আছে। আমরা স্বাধীন নহি, সবল জাতিও নহি। জাতি এবং রাষ্ট্র এক বলিয়া ভাবিতেও আমরা অপারগ। রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের কর্ত্তব্য বিস্তর থাকিলেও দায়িত্বভার আমাদের উপর নাই, তথাপি যখনই সাম্রাজ্যবাদী মহাসমর আরম্ভ হইয়াছে তখনই প্রভুজাতি বৃটিশের পক্ষে আমাদিগকে লড়িতে বাধ্য করানো হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী মহা-সমরে সাম্রাজ্যভোগীদের সাহায্য করিয়া সাম্রাজ্যবাদেরই পুষ্টি-সাধন করিতে হইয়াছে। আমাদের ভিতর এখন ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। আমরাও সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া পড়িতে আর চাহিতেছি না, কিন্তু আমাদের এই প্রতিজ্ঞা কার্য্যে ফলাইতে হইলে বৃহত্তর সমস্যার সমাধান আবশ্যক। এখানে সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্যার কথা বলিতেছি না। যাহারা সত্যকার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, যাহারা সবল হইলেও অন্যের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে কুণ্ঠিত নয়, যাহারা দুর্ব্বল, অথচ স্বাধীন—এই সকলকে একই আদর্শে এ কার্য্য করিতে হইবে এবং দুর্ব্বল ও পরাধীন রাষ্ট্রগুলির সবল এবং স্বাধীন হইতে হইবে। আজ পৃথিবীর অংশবিশেষ দুর্ব্বল এবং পরাধীন জাতির অধ্যুষিত বলিয়াই তাহার উপর সবল জাতিদের লোভ পড়িয়াছে এবং এই সব লইয়া সবলদের ভিতরে কাড়াকাড়ি লাগিয়া গিয়াছে। ফলে, সবল এবং দুর্ব্বলের পতন একই রকম হইতে বাধ্য। আজকাল যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য একটা নৈতিক নিরস্ত্রীকরণের কথা খুবই শুনা যায়। যতদিন দুর্ব্বল জাতিগুলি সবল জাতিদের শিকার হইয়া থাকিবে ততদিন এই সব চেষ্টা ক্ষতের উপরে প্রলেপের মতই হইবে। আমার স্বার্থ ষোল আনা বজায় রাখিব এবং সঙ্গে সঙ্গে লম্বা চওড়া বুলি আওড়াইব, ইহা কোন কাজেরই হয় না। আমরা সুতরাং দেখিতেছি বর্ত্তমান এই বিষম অবস্থার মূলে রহিয়াছে সবল জাতিগুলির দুর্দ্দমনীয় লোভ। তাহাদের লোভ দূর করিতে হইলেও প্রত্যেক জাতিকে সবল ও স্বাধীন হইতে হইবে। আমাদের ভারতবাসীদের পক্ষে বৃটেন, ফ্রান্স, কি জার্ম্মানী, জাপান যাহার শক্তি বাড়ুক না কেন, তাহাই ভয়ের কারণ। প্রথমে যাহা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি, সেই আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টিত হওয়াই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বাঘে মহিষে লড়াই বাধিবার উপক্রম হইলে নল খাগড়ার প্রথম হইতেই সতর্ক হওয়া উচিত।

১৩ই আগষ্ট, ১৯৩৯।

মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে গবেষণা

পৃথিবী ব্যতীত সৌর জগতের অন্যান্য গ্রহ বা উপগ্রহে প্রাণীর বসবাস সম্ভবপর কি না, এ সম্পর্কে আধুনিক যুগের জ্যোতির্বিদগণ বহু গবেষণা করিয়াছেন। এ সমস্ত গবেষণার ফলে যে তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে জীবনধারণের অনুকূল আবহাওয়া পৃথিবী ব্যতীত অপরাপর কোন গ্রহে বা উপগ্রহে পরিলক্ষিত হয় না। তবে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে বিজ্ঞানিগণ অনুরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন।

ঐ গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব একেবারে অসম্ভব নহে বলিয়াই আধুনিক যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণের অভিমত। বস্তুত, সৌর জগতের গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে মঙ্গলগ্রহটি এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা সূর্য হইতে চৌদ্দ কোটি দশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্যের নিকট হইতে আলো ও উত্তাপ লাভ করিবার পক্ষে এই দূরত্ব খুব বেশী বলা যায় না। ইহার দিনমান ২৪ ঘণ্টার কিছু উপরে হইবে। ইহার বায়ুমণ্ডলও রহিয়াছে। পৃথিবী হইতে উহার উপরি ভাগের যে অবস্থা পরিলক্ষিত হয় তাহাতে এই গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব একেবারে অসম্ভব বিবেচিত হয় না।

চন্দ্র এবং বুধ গ্রহ লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে, উহারা বায়ুমণ্ডলহীন এক একটি নির্জীব জগৎ। উহাদের উপরিভাগে কোন কালে কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। শুক্র এবং বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনিয়াস ও নেপচুন কয়টি সুবৃহৎ গ্রহের বায়ুমণ্ডল থাকিলেও উহা সর্বদাই যেন কিরূপ মেঘমালায় আচ্ছন্ন থাকে। ফলে, উহাদের উপরিভাগের অবস্থা ভালরূপে পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভবপর হয় না।

মঙ্গলগ্রহের মেরু অঞ্চলের তুষারপার্বত্য প্রদেশের রাত্রিকালীন কাল্পনিক দৃশ্য

বুধগ্রহ সূর্যের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। উহাতে বায়ুমণ্ডল নাই। সূর্যরশ্মির তীব্র তেজ ওখানে এরূপ ভয়ঙ্কর যে, বিজ্ঞানিগণ মনে করেন কোনও জীবনের অস্তিত্ব সেখানে অসম্ভব।

শুক্রগ্রহ সূর্য হইতে ৬৭ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার ব্যাস ৭,৫৮০ মাইল; পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা সামান্য কম মাত্র। ইহার বায়ুমণ্ডলও রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় এই গ্রহে জীবের বাস একেবারে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না বটে; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া উহার উপরিভাগ ভালরূপে লক্ষ্য করা সম্ভবপর হয় নাই, বিজ্ঞানিগণ ইহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও দিনমানের সত্যিকার পরিমাণও সঠিক স্থির করিতে পারেন নাই। তবে কয়েক বৎসর পূর্বে মাউণ্ট উইলসন মান-মন্দিরের ডাঃ ওয়ালটার এস্ য়্যাডামস ও ডাঃ থিয়োডোর ডানহাম্ শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডল কার্বন ডায়োক্সাইড-এ পূর্ণ বলিয়া আবিষ্কার করেন। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের যতটা ওজন, শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলে ততটা ওজনের কার্বন ডায়োক্সাইড-ই বিরাজ করিতেছে। এরূপ গ্যাসে জীবনধারণ সম্ভবপর নহে এবং অবস্থা যদি ইহাই হয়, তবে শুক্রগ্রহে কোনরূপ উদ্ভিদ বা প্রাণীর বাস অসম্ভব বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনিয়াস, নেপচুন প্রভৃতি সুবৃহৎ গ্রহগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভালরূপে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর না হইলেও, সূর্য হইতে যেরূপ দূরে ইহারা অবস্থান করে, তাহাতে উহারা যে তেমন উত্তাপ পায় না, তাহা

অনায়াসেই অনুমান করা যায়। বৃহস্পতি-গ্রহ সূর্য হইতে আটচল্লিশ কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। নেপচুনের দূরত্ব দুইশত উন-আশী কোটি মাইল। এরূপ অবস্থায় এই কয়টি গ্রহে যেরূপ চরম শৈত্য বিরাজ করে তাহাতে ইহাদের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলগুলি জমাট বাঁধিয়া যাওয়াও আশ্চর্য নহে। এই কয়টি গ্রহ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, ইহাদের শিলীভূত কঠিন স্তরের উপরিভাগে হাজার হাজার মাইল সুগভীর তুষার-সমুদ্র জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। সেই তুষার মহাসাগরের উপরিভাগে 'এমোনিয়া,' 'মিথেন', 'হাইড্রোজেন' ও 'হিলিয়াম গ্যাসের বায়ুমণ্ডল বিরাজ করিতেছে। এই সুবৃহৎ গ্রহগুলিতে যদি কখনও বর্ষণ হয়, তাহাতে জলধারার লেশমাত্র থাকে না। বৃহস্পতি-গ্রহে তাপ শূন্যের নীচেও ফারেনহিট পরিমাপের ১৮৭ ডিগ্রী বিরাজ করে। সেখানে বারি বর্ষণ সম্ভবপর নহে,—'এমোনিয়া' বর্ষণ হয় মাত্র। শনি-গ্রহে বিজ্ঞানীরা তাই একবারও নষ্ট করেন না। বর্তমানে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উহার বর্তমান দূরত্ব তিন কোটি ষাট লক্ষ মাইল। ১৯২৪ সালের পরে ইহা আর এত নিকটে লক্ষিত হয় নাই। ১৯৫৬ সালের পূর্বেও আর উহা এত নিকটবর্তী হইবে না বলিয়া বিজ্ঞানিগণ মনে করেন। বর্তমানে উহা আস্তে আস্তে দূরে সরিতেছে এবং আগষ্ট মাস শেষ হইতে না হইতেই উহা প্রায় চারি কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে সরিয়া যাইবে।

পৃথিবীর ও মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ যেভাবে অবস্থিত, তাহাতে দেখা যায়, মঙ্গলগ্রহ যখনই পৃথিবীর অতিশয় নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ হইতে উহাকে ভালরূপে পর্যবেক্ষণের সুবিধা হয় না। পৃথিবীর কক্ষপথ ও মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথের অবস্থান এইরূপ যে, উহাদের সর্বাপেক্ষা কম দূরত্বের সময় উহাকে পৃথিবীর বিষুব রেখার দক্ষিণ দিক হইতেই লক্ষ্য করার অনুকূল

মঙ্গলগ্রহে ঋতু-পরিবর্তন। তুষার স্তূপগুলি বসন্ত সমাগমে গলিতে সুরু করে। বসন্তের অবসানে আবার সেগুলি আস্তে আস্তে জমাট বাঁধে। উপরের ছবিতে কাল দাগগুলি বিভিন্ন সময়ে মঙ্গলগ্রহের নিরক্ষ অঞ্চলের তুষারস্তূপ নির্দেশ করিতেছে

বায়ুমণ্ডল হইতে এরূপ পরিমাণ 'এমোনিয়া' বহির্গত হইয়া গিয়াছে যে, বর্তমানে উহার বায়ুমণ্ডলে 'মিথেন' গ্যাসই অত্যধিক রহিয়াছে বলিয়া বিজ্ঞানিগণ মনে করেন। সুদূরবর্তী ইউরেনিয়স্ ও নেপচুন্ গ্রহের এমোনিয়া ঝটিকা-বেগে প্রবাহিত হইয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। সেখানে দিগন্তব্যাপী জমাট তুষার সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নাই। বিজ্ঞানিগণ সুদূরের এই গ্রহগুলি সম্পর্কে যে সামান্য তথ্য উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব।

প্রত্যেকটি গ্রহের পারিপার্শ্বিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিচার করিয়া বিজ্ঞানীরা একমাত্র মঙ্গলগ্রহের মধ্যেই জীবনের অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ফলে, এই গ্রহ সম্পর্কে জানিবার আগ্রহ সকলের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানীরাও একান্ত আগ্রহ ভরে ইহাকে নিয়া নানা গবেষণায় নিরত রহিয়াছেন।

এই রক্তিম গ্রহটিকে ভালরূপে লক্ষ্য করিবার সুযোগ অবস্থার সৃষ্টি হয়। মঙ্গলগ্রহকে ভালরূপে পর্যবেক্ষণের এই সুযোগ জ্যোতির্বিদগণ এবারও ছাড়েন নাই। আরিজনার লাউয়েল মান-মন্দিরের অধ্যক্ষ সুবিখ্যাত মার্কিন জ্যোতি-বিজ্ঞানবিদ ডাঃ ভি এম স্লিফার তাই দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত ব্লুমফর্নটিন হইতে এই গ্রহটি দেখিবার আয়োজন করেন। ডাঃ স্লিফারই ১৯০৮ সালে সর্বপ্রথম মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঘোষণা করিয়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। বর্তমান পর্যবেক্ষণ দ্বারা নূতন কোন যুগান্তকারী বিষয় যে আবিষ্কৃত হইবে, তাহা তিনি মনে করেন না। মঙ্গল-গ্রহ সম্পর্কে বহু রহস্য ইতিপূর্বেই তাঁহার ও অন্যান্য বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণের চেষ্টায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তবে ইহার প্রাকৃতিক অবস্থার কি রূপ পরিবর্তন ঘটে, বিভিন্ন স্থানে ইহার তাপ পরিমাণ কত, মঙ্গলগ্রহের বায়ু-মণ্ডলের উপাদান কিরূপ, তৎসম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগৃহীত হইলে, তাহা দ্বারা গ্রহটির স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারা সম্ভবপর হইবে বলিয়া আজও বিজ্ঞানিগণ তাঁহাদের গবেষণা পরিচালনা করিতেছেন।

মঙ্গল গ্রহটি অতিরিক্ত পরিমাণ লাল বলিয়া প্রতিভাত হয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক হেন্‌রী নোরিস্‌ রাসেল যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা প্রায় মানিয়া লইয়াছেন। সাহারার বালুকণার হরিতাভা, সমুদ্রতলদেশের ইষ্টকবরণ—এ সমস্ত অক্সিজেনের সংযোগে হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, মঙ্গলগ্রহের অক্সিজেনগুলিও এইভাবে রাসায়নিকভাবে অন্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। যদি সত্যিকারের উচ্চতর জীব সেখানে বসবাস করিয়া থাকে, তবে তাহারা শিলাস্তর বা কর্দম হইতে ঐ অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া লইবার কৌশল হয় ইতিমধ্যে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে, নতুবা ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুযায়ী তাহারা ক্রমে পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। মঙ্গলগ্রহে যে জলীয় বাষ্প রহিয়াছে এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের কোন সন্দেহ নাই। শুধু যে উহার বায়ুমণ্ডলেই বিজ্ঞানিগণ জলীয় বাষ্প লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা নহে, উহার মেরু প্রদেশস্থ তুষার স্তূপেও উহা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। পৃথিবীর মেরুপ্রদেশের ন্যায় মঙ্গলগ্রহের মেরু-প্রদেশেও বসন্ত-সমাগমের সঙ্গে উহার তুষারস্তূপ গলিতে আরম্ভ করে, আবার শীতের সময় উহা জমাট বাঁধে। কিন্তু তাই বলিয়া জলের পরিমাণ মঙ্গলগ্রহে খুব বেশী নহে। অধ্যাপক চার্লস্‌ স্পিকারিং পরিমাণ করিয়া বলিয়াছেন, মঙ্গলগ্রহের মেরুপ্রদেশে ২০ ফুট পরিমাণ যে বরফ পড়ে, তাহা আমাদের পৃথিবীর একমাস সময় মধ্যে গলিলে তাহা হইতে পৃথিবীর ক্ষুদ্রাকৃতির একটি হ্রদে যে জল ধরে তাহাও হইবে কি না সন্দেহ।

যাহা হউক মঙ্গলগ্রহের মেরুপ্রদেশের বরফস্তূপ যখন গলিতে সুরু করে, তখন দেখা যায় উহার বিষুবরেখার ও আশেপাশের গেরুয়া (russet brown) আভাযুক্ত স্থানগুলির রং পরিবর্তিত হইয়া সবুজে পরিণত হয়। ইহা হইতে বিজ্ঞানিগণ মনে করেন, পৃথিবীর মেরুপ্রদেশে যেমন শীতের অন্তে শেওলা প্রভৃতি জন্মে, এ তাহারই অনুরূপ। মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আজ অবশ্য বিজ্ঞানিগণ একমত, কিন্তু উচ্চতরের জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় নাই।

ডাঃ স্লিফার একাগ্রভাবে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করিতেছেন, ব্লুমফন্‌টিন্‌ হইতে তিনি তাঁহার এইবারের পর্যবেক্ষণের যে ফলাফল টেলিফোনযোগে 'নিউজ ক্রনিকল' সংবাদপত্রে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতেও তিনি বলিয়াছেন,—

"মঙ্গলগ্রহে উচ্চতর প্রাণীর বসবাস সম্পর্কে এখনও আমরা কোন অতিরিক্ত প্রমাণ পাই নাই, এজন্য অবশ্য এবার কোন চেষ্টাও করা হয় নাই।"

এবারের পর্যবেক্ষণের তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন, "মঙ্গলগ্রহের যে যে স্থানে উদ্ভিদ জন্মায়, তথায় লক্ষ্য করার মত কোন পরিবর্তন দেখিতেছি না। মঙ্গলগ্রহের একরাত্রি হইতে অন্য রাত্রিরও কোন বিশেষ তফাৎ নাই। এক রাত্রি অন্য রাত্রির অনেকটা অনুরূপ। তবে লক্ষ্য করিলে ইহার মধ্যেও পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়।

"দৃষ্টান্তস্বরূপ এক্ষণে উল্লেখ করিতে পারি যে, কয়েক রাত্রি পূর্বে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, মঙ্গলগ্রহের একটি স্থানে খুব তুষারপাত হইতেছে। যে স্থানে এই তুষারপাত হইল সে স্থানটি খুব সাদা; তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী পট-ভূমিতে লাল কিম্বা কমলালেবুর রং দেখা গেল। এই স্থানটি এতই উজ্জ্বল যে, এই উজ্জ্বলতাই যেন অন্যান্য অংশের সহিত স্থানটির একটি সীমারেখা টানিয়া দিয়াছিল।

"বসন্তকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ মেরুর তুষার দ্রুত গলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

"উত্তর মেরুতে কিন্তু নূতন করিয়া জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঋতু পরিবর্তনের জন্যই এইসব পরিবর্তন দেখা যায় সত্য; কিন্তু যেরূপ দ্রুত তুষার গলে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

"মঙ্গলগ্রহের বিষুবরেখার ২০ ডিগ্রী নিকটে একটি অস্বাভাবিক রকমের শাদা দাগ দেখিতে পাইলাম। আমরা ইহার কারণ এখনও পর্যন্ত নির্ণয় করিতে পারি নাই।

"এখন মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল; সুতরাং ঋতুর কোন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না।

"তুষার গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিন চার সপ্তাহ পর মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠে সামান্য পরিবর্তন দেখা যাইতে পারে।"

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে উপরোক্ত তথ্য হইতে উহার আবহাওয়া অনেকটা আন্দাজ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলের উপাদান কি, অক্সিজেন ও কার্বন ডায়োক্সাইড্‌ উহাতে কি পরিমাণ আছে—এ-সব এখনও নির্ণীত হয় নাই। উচ্চতর প্রাণী মঙ্গলগ্রহে সত্যিই বসবাস করিতেছে কি না তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ লাভ করা সম্ভবপর নহে; তবে উহার আবহাওয়া সম্পর্কে সর্ববিধ তথ্য আবিষ্কৃত হইলেই আমরা এ বিষয়ে একদিন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা করিতে পারি

দুই দিক

(গল্প)

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(১)

সুকুমারের সঙ্গে সরোজের দেখা হইয়া গেল দৈবক্রমে। ছন্নছাড়া বন্ধনহীন জীবনের লক্ষ্যহীন চলার পথে এক দিনের জন্য লক্ষ্মৌ শহরে নামিয়া সরোজ তাহার জীর্ণ সুটকেশ ও ততোধিক জীর্ণ শয্যাটা রাত্রি পর্যন্ত নিরাপদে রাখিবার জন্য কোনরকমের একটি আশ্রয়স্থানের সন্ধান করিতেছিল, অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে সে একেবারে যাহার গায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল, সেই ব্যক্তিই সুকুমার। সন্ত্রস্ত লজ্জায় ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গিয়া সরোজের মুখ হইতে বাহির হইল, "আরে—সুকুমার!"

সুকুমারের ঘুষিবাগান বলিষ্ঠ হাতখানি নির্জীবের মত ঝুলিয়া পড়িল, তাহারও বিস্মিতকণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "কে সরোজ! তুমি এখানে?"

কলেজে সুকুমারের সঙ্গে সরোজ চার বৎসর একসঙ্গে পড়িয়াছিল, বহুদিন এক হোষ্টেলে একত্র বাসও করিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মিয়াছিল, পরস্পর পরস্পরকে অন্তরংগভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিল, যৌবনের প্রারম্ভে উভয়ের মধ্যে সেই যে ভালবাসা জন্মিয়াছিল, বহুদিনের ছাড়াছাড়িতেও উহার ভিত্তি যে অটুট থাকিয়া গিয়াছে তাহা দেখা হইতেই দুইজনেই বুঝিতে পারিল। সুকুমার সরোজকে টানিয়া নিজের বাসায় লইয়া গেল।

শহরের বাহিরে অপেক্ষাকৃত জনবিরল অঞ্চলে সুকুমারের বাংলো। ছোট হইলেও সুদৃশ্য। নূতন তক্‌তকে বাড়ীখানি, চারিদিকে একটা নির্মল শুভ্র শুচিতা। আড়ম্বরহীন গৃহসজ্জার মধ্যেও সৌন্দর্য ও রুচিজ্ঞানের জাজ্বল্যমান নিদর্শন। চারখানি ঘরের মধ্যে একখানি শুইবার, একখানি অফিস, একখানি লাইব্রেরী আর একখানি ড্রয়িং-রুম। সস্তা দামের বেতের আসবাবের উপর হাতের তৈয়ারী রঙ-বেরঙের গদি ও চাদর, চুনারের সস্তা মাটির জিনিষ দিয়া সজ্জিত হইলেও রুচির দিক দিয়া দামী চীনামাটির সরঞ্জাম দিয়া সজ্জিত বড়লোকের ড্রয়িং--রুমের চাইতে এ ঘরখানি কোন অংশেই হীন নয়। ফুলদানির টাট্‌কা ফুল হইতে একটা মিষ্টি গন্ধ উঠিয়া ঘরখানিকে ভরিয়া রাখিয়াছিল। দেখিয়া সরোজ মুগ্ধকণ্ঠে কহিল, "বাঃ—এ যেন একটা জীবন্ত কবিতা—অন্তত আমার মত একটা ভবঘুরের কাছে!"

"দাঁড়াও, আসল জীবন্ত কবিতাখানিকে আগে তোমাকে দেখাই", বলিয়া সুকুমার হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল।

ফিরিয়া যখন আসিল, তখন তাহার সঙ্গে এক রূপসী যুবতী। খুব যে ফর্সা তাহা নহে, বস্ত্র ও অলঙ্কারে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর মোটেই নাই। তথাপি সে অপূর্ব সুন্দরী। জ্যোৎস্নালোকিতা ধরণীর মত মোহময়ী, অথচ শিশিরস্নাতা উষসীর মত অকুণ্ঠিতা। সরোজ শিষ্টতা ভুলিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে মহিলাটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুকুমার কহিল, "ইনি আমার কবিতা, আমার ছাত্রজীবনের মানসী—রেখা দেবী।" রেখার দিকে চাহিয়া সে কহিল, "এ আমার প্রথম ভালবাসা—সরোজ।"

সরোজের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে কথা বলিতে পারিল না, একটা নমস্কার পর্যন্ত করিতে তাহার হাত উঠিল না।

রেখার ব্যবহারে কিন্তু বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা প্রকাশ পাইল না। স্বামীর রহস্য শুনিয়া তাহার আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু দুইটির কোণে বিদ্যুৎ ফুটিয়া উঠিল, আর তাহারই যেন প্রতিবিম্ব গিয়া পড়িল তাহার কানের দুলের উপর। একসঙ্গেই চক্ষু, দুল ও ললাটের উপরের কেশগুচ্ছ কয়টি নাচাইয়া সে কহিল, "কি ভাগ্য আমাদের নিজের বাড়ীতেই আপনার দেখা পেলাম! আপনার কথা ওঁর কাছে কতবার যে শুনেছি।"

স্বামীর দিকে চাহিয়া সে কহিল, "তা বস তোমরা, আমি চায়ের ব্যবস্থা করছি।"

সুকুমারের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সরোজ একবার দ্বারের দিকে চাহিয়াই গভীর বিস্ময়ে একটা কথার মাঝখানেই নির্বাক হইয়া গেল।

প্রজাপতির মত মেয়েটি। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে পদ্মফুলের মত কোমল, সুন্দর মুখখানি রেখার মুখের অদল। টানা ভুরুর নীচে নীল, আয়ত দুইটি চক্ষু আর উহাতে বন হইতে সদ্য ধরিয়া আনা হরিণীর চোখের মত দৃষ্টি—সশঙ্ক কিন্তু কৌতূহলে উজ্জ্বল। ঐ দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিতেই সরোজ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

সে কহিল, "এস খুকী,—এদিকে এস।"

কিন্তু সে আসিল না। একবার সে ভীরু দৃষ্টিতে সুকুমারের মুখের দিকে চাহিল, আবার সরোজের দিকে চাহিল, তারপর ফিক্ করিয়া হাসিয়া ছুটিয়া পালাইয়া গেল।

বসন্তের এক ঝলক দমকা হাওয়া যেন এক বাতায়নপথে গৃহে প্রবেশ করিয়া অন্য বাতায়নপথে বাহির হইয়া গেল।

সরোজ সুকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে?—তোমার মেয়ে?"

সুকুমার ঈষৎ একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া কতকটা যেন অপরাধীর মত কহিল, "হাঁ ভাই—বিয়ের অবশ্যম্ভাবী—"

সরোজ ধমক দিয়া কহিল, "যাঃ।"

সুকুমার কিন্তু কৈফিয়ৎ দিয়াই বলিল, "সত্যি বলছি, অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংগ্রামে মানুষের পরাজয়ের জীবন্ত সাক্ষ্য।"

"পরাজয় কেন?" সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "সন্তান চাও না?"

সুকুমার কবিত্ব করিয়া উত্তর দিল, "চাই কি না চাই, ভেবে না পাই, মন কেমন করে—'।"

জলযোগের নামে ভূরিভোজনের সঙ্গে সঙ্গেও সেই আলোচনাই চলিল। স্বামীর যুক্তিকে সমর্থন করিয়া অকুণ্ঠিতা রেখা দিব্যি সপ্রতিভ কণ্ঠে সরোজকে শুনাইয়া দিল, "মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব সৃষ্টির আদি কথা, হয়ত বা শেষ-কথাও তাই

প্রকৃতি চিরকাল মানুষের আনন্দের বিহঙ্গীর পাখায় ভারী পাথর বেঁধে দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে রাখতে চাইছে,—সন্তান সেই পাথর।"

সরোজ বিহ্বলের মত কহিল, "এ কি বলছেন আপনি? সন্তান যে আনন্দের খোরাক,—নর ও নারীর ভালবাসার মূর্ত্তরূপ—"

বাধা দিল রেখা কহিল, "কবিরা কিন্তু ঠিক তা বলেন না—তাঁরা বলেন, সন্তান স্বামী ও স্ত্রীর ভালবাসার রেশমী ডোরের মধ্যে এক একটি গ্রন্থি—মানে বন্ধন।" বলিয়াই রেখা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—তবু এ দেবশিশুগুলি যে আনন্দের ফোয়ারা এ কথা অস্বীকার করতে পারেন না রেখা দেবী!

সুকুমার সুর করিয়া কহিল, "আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান।"

সরোজ কহিল, "তার ওপর বড় কথা—সমাজ, জাতির ভবিষ্যৎ—এ সব সম্পর্কে নরনারীর কিছুই কি কর্তব্য নেই?"

সুকুমার গম্ভীর হইয়া কহিল, "ঠিক বলেছ, নিশ্চয় আছে। তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আমি এক মত। তবে মনে রাখা দরকার যে কর্তব্য আনন্দের প্রতিশব্দ নয়।"

ঠিক এই সময়ে ভৃত্য ভজুয়া আসিয়া জানাইল, খুকুমণির স্নানের সময় হইয়াছে।

রেখা সন্ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, সরোজকে লক্ষ্য করিয়া কতকটা ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কহিল, "আপনারা বসুন, আমি একটু পরেই আসছি।"

বসিয়া বসিয়া সরোজ সুকুমারের এই কয় বৎসরের জীবনের কাহিনী শুনিল। সে কাহিনী সংক্ষিপ্ত, কিন্তু চিত্তাকর্ষক,—অনেকটা উপন্যাসের মত। রেখার সঙ্গে প্রেমে পড়িয়া তবে তাহার বিবাহ হইয়াছে। ঐ বিবাহের ফলে তাহারা দুইজনেই তাহাদের বিবাহপূর্ব জীবনের সব কয়টি স্বজনকে হারাইয়াছে, কিন্তু ঐ হারানোর ক্ষতি তাহাদের পরস্পরকে পাইবার লাভের পরিমাণের সঙ্গে কাটা-কাটিতে পুরাপুরিরও বেশী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রেখা সুকুমারের জীবনে আসিয়াছে তাহার আবাল্যের মানসীর বাস্তবরূপে, সে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে তৃপ্তিহীন আনন্দ, অন্তহীন সংগীত আর ছলাহীন কলা। আর রেখার পশ্চাতে আসিয়াছে কর্ম ও দায়িত্বহীন মোটা বেতনের চাকরী। সুতরাং তাহাদের জীবন চলিয়াছে কবিতার এক অফুরন্ত স্রোতের মত। সুকুমার তাহার কাহিনী শেষ করিয়া গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে কহিল, "কৈশোরে স্বপ্ন দেখবার অভ্যাস ছিল, কিন্তু সে স্বপ্ন যে জীবনে এতখানি সত্য হবে তা কোনদিন আশা করিনি।"

সরোজ ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "যাক্, সংসারে এতদিন কেবল দুঃখই দেখেছি, আজ ছায়ালেশহীন সুখের অস্তিত্ব দেখে সুখী হলাম।"

ভৃত্য ভজুয়া আসিয়া স্নান করিবার নোটিশ দিয়া গেল।

স্নানের ঘরে যাইবার পথে সরোজ আবার সেই মেয়েটিকে দেখিতে পাইল, সে দ্বারের ফাঁক দিয়া দুই ডাগর চোখের কৌতুক করিয়া মেয়েটিকে ধরিয়া ফেলিল, তাহাকে টানিয়া বাহিরে আনিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নামটি কি মা?"

মেয়েটি প্রথমে যেন শিহরিয়া উঠিল, তারপর বিহ্বলের মত কহিল, "আমি ত মা নই, মা ঐ ঘরে রয়েছে।" সে চোখের সঙ্কেতে রান্নাঘর দেখাইয়া দিল।

সরোজ হাসিয়া কহিল, "তা মা না হয় নাই হলে। কিন্তু তোমার একটি নাম আছে ত? সেইটি কি বল দেখি।"

মেয়েটি সরোজের হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিল। সেখানে কি সে দেখিতে পাইল সেই জানে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের কোণেও বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিল। সহসা হাসিতে ফাটিয়া পড়িবার মত হইয়া সে মিথ্যা যন্ত্রণার ভাণে কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ছাড়ুন ছাড়ুন—লাগছে যে!"

থতমত খাইয়া সরোজ তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। মেয়েটি পালাইবার মত করিয়া ছুটিয়া গেল, কিন্তু একটু গিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড়ের সঙ্গে সমান তালে মাথার চুল ও চোখের তারা নাচাইতে নাচাইতে হাসিমুখে কহিতে লাগিল, "বলব না—বলব না—"

"ভারী দুষ্টু তুমি," বলিয়া সরোজ কৌতুকোজ্জ্বল সহাস্য দৃষ্টি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি গিয়া পড়িল মেয়েটির পিছনের আর একজোড়া চক্ষুর উপর। সে দেখিল রান্নাঘরের চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে তাহার মা, রেখা। তাহার গম্ভীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট অঙ্কিত।

সরোজের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিতেই সে কিন্তু হাসিয়া কহিল, "সত্যি ভারী দুষ্টু, ভারী অসভ্য মেয়েটা।"

মেয়েটি সঙ্কুচিত হইয়া কোথায় যে গেল সরোজ তাহা ঠাহর করিতে পারিল না।

স্নান ও প্রসাধন শেষ করিয়া সরোজ বাহিরের ঘরে আসিয়া স্থির হইয়া বসিতে না বসিতেই সুকুমার মেয়েটির হাত ধরিয়া ঘরের ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল। খুশী হইয়া সরোজ কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার পূর্বেই সুকুমার মেয়েটিকে উদ্দেশ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "ছিঃ বুলু—কাকাবাবুর সঙ্গে অশিষ্ট আচরণ করেছ, তারজন্য মাপ চেয়ে নাও।"

"সে কি হে? কি পাগল তুমি?" সরোজ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল।

কথা কহিল মেয়েটি। সে মৃদু কিন্তু সুস্পষ্ট কণ্ঠে কহিল, "আমার অন্যায় হয়েছে কাকাবাবু, আমায় মাপ করুন।"

"কি পাগল!" বলিয়া সরোজ দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার বলত, তোমার নামটি কি?"

সে উত্তর দিল, "বেলারাণী ব্যানার্জ্জি।"

মেয়েটিকে জড়াইয়া সরোজের যে বাহুবন্ধন রচিত হইয়াছিল তাহা আপনা হইতেই কেমন যেন শিথিল হইয়া গেল।

সুকুমার মেয়েটিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "এখন যাও বুলু, তোমার শোবার সময় হয়েছে।"

মেয়েটি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সুকুমার আপন মনেই কতকটা যেন কৈফিয়তের সুরে কহিল, "শিষ্টাচার শিশু-কাল থেকেই শেখা চাই—নইলে—"

সরোজ অন্যমনস্কভাবে কহিল, "হুঁ।"

পাশাপাশি কোন একটা ঘর হইতে যেন রেখার চাপাকণ্ঠের গানের একটি কলি হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়া তাহার কানে প্রবেশ করিল—"আমার মনভুলায় রে—গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ—।

(২)

সুকুমারের বাসায় সরোজের প্রায় দিন সাতেক কাটিয়া গেল,—যাই যাই করিয়াও তাহার যাওয়া হইল না। পথশ্রান্ত দেহের অস্ফুট মিনতির সঙ্গে সুকুমারের জবরদস্ত অনুরোধ মিলিয়া চলিয়া যাইবার পথে যে বাধা সৃষ্টি করিল সরোজ তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারিল না।

দিন ভালই কাটিতে লাগিল। কপোত-কপোতীর মত সুকুমার ও রেখার নিজের হাতের গড়া সুখনীড়। নিশ্চিন্ত জীবন—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অগাধ ভালবাসা। রেখা সুকুমারের গৃহিনী, সচিব, সখী, শিষ্যা, কলাবতী হ্লাদিনী-শক্তি—একের মধ্যে সব। উভয়ের দেহাতীত মনের মিলনে তৃপ্তি ও আনন্দের যে উচ্ছল রস তাহা উভয়ের হৃদয়ের পাত্র ছাপাইয়া হাসি, গান, কবিতা হইয়া সমগ্র প্রতিবেশটিকে সরস, মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং ঐ সুখনীড়ের গুপ্ততম প্রকোষ্ঠে সরোজের প্রবেশাধিকার না থাকিলেও বাহির হইতেই সে উহা নিতান্ত কম উপভোগ করিল না। তাহার আবাল্যের কৃচ্ছ্রসাধনায় শুষ্ক অন্তর রেখা ও সুকুমারের সাহচর্যে কয়-দিনের মধ্যেই যেন এক অনাস্বাদিত রসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু সাত দিন এক বাড়ীতে থাকিয়াও বুলুর সঙ্গে সরোজ কিছুতেই ভাব করিতে পারিল না। শামুকের মত শিষ্টাচারের খোলসের মধ্যে আপনাকে সে এতই সযত্নে ঢাকিয়া রাখিতে লাগিল যে, সরোজ চেষ্টা করিয়াও ঐ সুদৃঢ় আবেষ্টনী ভাঙিয়া তাহার আসল ব্যক্তিত্বের কোমল সংস্পর্শ লাভ করিতে পারিল না।

সুকুমারের আবৃত্তি, রেখার সুরসাধনা, রেডিওর গান—এ সব শুনিয়া শুনিয়া সরোজের কান ঝালাপালা হইয়া গেল, কিন্তু মেয়েটির গান দূরে থাকুক, তাহার হাসি, কান্না বা আবদারের একটা সুরও কোন সময়েই সরোজের কানে আসিয়া প্রবেশ করিল না।

শেষের দিকে মেয়েটি যে ঐ বাড়ীতে আছে সে কথা সরোজ যেন এক রকম ভুলিয়াই গেল।

সেদিন শনিবার। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরেই সরোজ একাকী শহর দেখিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। বাড়ীতে কাহারও সাড়া-শব্দ না পাইয়া প্রথম দিকে সে একটু বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনই তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, সকালের দিকে সুকুমার বায়স্কোপ যাওয়া সম্বন্ধে কি একটা প্রস্তাব করিয়াছিল, শহর দেখিবার উন্মাদনায় এতক্ষণ সে কথা তাহার মোটেই স্মরণই ছিল না। তাহার সাড়া পাইয়া ভৃত্য ছাতের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল যে, তাহার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পরে তাহার বাবু ও মাইজী ছবি দেখিতে গিয়াছেন।

সরোজ তেমন ক্ষুণ্ণ হইল না। একখানা টাট্‌কা বাঙলা উপন্যাস কয়দিন হইতে অর্ধেক পড়া হইয়া পড়িয়াছিল, এই অবসরে উহা শেষ করা যাইবে মনে করিয়া সে বরং মনে মনে একটু খুশীই হইল।

বাবু ও মাইজী বাড়ীতে নাই বলিয়া অন্যদিকেও তাহার কোন অসুবিধা হইল না। সে কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইয়া আসিতে না আসিতেই ভৃত্য এক পট চা ও প্রচুর জলখাবার আনিয়া উপস্থিত করিল।

দুখানা লুচি শেষ করিবার পর সে যখন নত হইয়া বাটিতে চা ঢালিতেছিল, তখন দ্বারের পাশে খুট করিয়া মৃদু একটু শব্দ হইল, তারপর চুড়ির মিষ্ট মৃদু একটু রুনুঝুনু শব্দ। সরোজ চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার চোখে পড়িল—বুলুর ফুলের মত শুভ্র, সুন্দর কচি মুখখানি।

সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি, তুমি বায়স্কোপ যাও নি?"

বুলু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে যায় নাই। কৈফিয়ৎ দিল ভৃত্য। কহিল, "দিদিমণির সিনেমায় যাওয়া বারণ।"

"ও," বলিয়া সরোজ ফিরিয়া মেয়েটির দিকে চাহিল, তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমার কাছে এস ত মা, এস।"

মেয়েটি হাসিল, কিন্তু কাছে আসিল না।

সরোজ উঠিয়া গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিল। সন্দেশটি তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল, "খাও।"

সে লোলুপদৃষ্টিতে সন্দেশের দিকে চাহিল, কিন্তু মুখে কহিল, "না।"

সরোজ অধিকতর স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "না কেন? খাও।"

মেয়েটি ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে মৃদুস্বরে কহিল, না, মা বলেছে অসময়ে খেতে নেই।"

সরোজ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "ও তাই খেতে চাও না! তা এখন ত তোমার মা এখানে নেই, এখন খেলে তিনি দেখতে পাবেন না।"

"আপনি বলে দেবেন না?" মেয়েটি সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

সরোজ কহিল, "না।"

"আর ও?" মেয়েটি ভ্রূভঙ্গী করিয়া চাকরটিকে দেখাইয়া দিল। সরোজ আশ্বাস দিয়া কহিল, চাকরও তাহার নিয়ম-ভঙ্গের কথা আদালতে প্রকাশ করিয়া দিবে না।

অতঃপর সে খাইল। প্রথমে সন্দেশ, তারপর লুচি, তার-পর ক্ষীর, তারপর চা। খাওয়া শেষ হইলে সরোজ সহাস্য-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে যে বলছিলে তোমার ক্ষিদে নেই?"

লজ্জিত হাসিমুখে সে উত্তর দিল, "মা বলেছে খিদে থাকলেও সব সময় খেতে নেই। বাবাও বলেন, যখন যা মনে আসে তা করলে ভাল মেয়ে হওয়া যায় না। আচ্ছা, এ কথা

সরোজ ঢোক গিলিয়া অন্যদিকে চাহিয়া কহিল, "তা ঠিক।"

আচমনের পর মেয়েটিকে লইয়া সে ছাতে গিয়া বসিল।

সেদিন ছিল পূর্ণিমার কাছাকাছি কি একটা তিথি। আকাশে ছিল প্রায় পূর্ণচন্দ্র, আর নীচে ধরণীর বুকে শুভ্র জ্যোৎস্নার সূক্ষ্ম মসলীনের ওড়না। শহরের জনকোলাহলের বাহিরে নির্জন পল্লীটিতে বিরাজ করিতেছিল পরিপূর্ণ শান্তি। কাছাকাছি কোথা হইতে যেন হাসনাহানার উগ্র গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

সরোজ মেয়েটিকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বায়স্কোপে গেলে না যে?

মেয়েটি উত্তর দিল, "মা নিয়ে গেলে আর কি করে যাব?"

"কিন্তু নিয়ে গেল না কেন?" সরোজ জিজ্ঞাসা করিল।

"অমনি," মেয়েটি ঠোঁট ফুলাইয়া উত্তর দিল, "ঐ ওঁদের ধরণ। একদিনও ওঁরা আমায় বায়স্কোপে নিয়ে যান না, কোথাও না।"

"তুমি নিশ্চয়ই দুষ্টুমি কর, তাই নিয়ে যান না," সরোজ কহিল।

"না না,—কখখনো না," বুলু সবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আমি বেশ ভাল মেয়ে হয়ে থাকি।" একটু থামিয়া সে কহিল, "তবে কি জানেন?—কোথাও বুঝতে না পারলে মাকে জিজ্ঞেস করি। তাতে মা, বাবা দুজনেই চটে যান—বলেন, বুলুর চেঁচামেচিতে ছবি আর তাদের দেখা হয় না। বেড়াতে যাবার বেলাও তাই। আমি সঙ্গে থাকলে কেবলই নাকি ওদের বিরক্ত করি,—আমার কথার জবাব দিয়ে দিয়ে ওরা নিজেরা কথা বলবার নাকি মোটে সময়ই পান না।"

সরোজ মৃদুস্বরে কহিল, "তাই হবে, তুমি নিশ্চয়ই খুব বক্ বক্ কর।"

"না, কখখনো না," বুলু আবার প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "আমি মোটেই বক্ বক্ করি না। ওরা আমাকে মোটে কথা বলতেই দেন না; কেবল বলেন,—বই পড় গে', ছবি দেখ গে', তোমার পুতুল নিয়ে খেলা কর গে', এই সব।"

সরোজ বুলুর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, এইবার মুখ ফিরাইয়া লইল। গম্ভীর স্বরে কহিল, "বেশ ত বলেন, ছেলে বেলায় লেখাপড়া করতে হয় বই কি।"

"ছাই হয়," বুলু ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, "ওরা তবে লেখাপড়া করে না কেন? ওরা নিজেরা দিনরাত খেলতে পারে, হাসতে পারে, বেড়াতে পারে,—আর আমার বেলাই বুঝি যত দোষ!"

সরোজ ফিরিয়া আবার বুলুর মুখের দিকে চাহিল, হাসিয়া দুই হাতে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া তুলিয়া কহিল, "তোমাকে বায়স্কোপ নিয়ে যায় নি বলে তোমার খুব দুঃখ হয়েছে, না?"

"হাঁ,—না," বুলু টানিয়া টানিয়া উত্তর দিল, "অন্য দিন হয়, আজ হচ্ছে না।"

"কেন?" সরোজ জিজ্ঞাসা করিল।

বুলু চট করিয়া তাহার ছোট কোমল বাহু দুইটি দিয়া সরোজের গলা জড়াইয়া ধরিল, হাসিমুখে বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আপনি রয়েছেন যে—বায়স্কোপে গেলে ত আর আপনার সঙ্গে গল্প করা হত না!"

"বল কি!" বলিয়া সরোজ তাহার মাথাটা খুব জোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

"ছাড়ুন, ছাড়ুন—ও—লাগছে,—" বুলু তাহার বাঁশীর মত মিহি সুর প্রায় সপ্তমে তুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—সেই প্রথম দিনের মত। কিন্তু চমকিত সরোজ তাহার বাহুবন্ধন শিথিল করিতেই সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সরোজের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "বেশ হয়েছে,—ঠকিয়েছি ত—কেমন!"

সরোজ হাসিয়া উত্তর দিল, "এবার থেকে সাবধান হব, আর ঠকাতে পারবে না।"

"বাগান দেখবেন?—বাগান? ঐ কোণ থেকে দেখা যায়," বলিয়া বুলু সরোজের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই হাত ধরিয়া তাহাকে একরকম টানিয়া ছাতের কোণে লইয়া গেল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে সরোজ দেখিতে পাইল, সত্যই নীচে ছোট সুবিন্যস্ত একখানি বাগান। শাদা ফুলগুলি জ্যোৎস্নালোকেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। হাসনাহানার গন্ধ আরও উগ্র হইয়া তাহার নাসিকায় প্রবেশ করিল। সে মুগ্ধকণ্ঠে কহিল, "বাঃ—বেশ বাগান।"

বুলু কিন্তু বাগানও দেখিল না, সরোজের কথাও শুনিল না। বাগানের পিছনের সুদৃশ্য একতলা বাড়ীখানি অঙ্গুলী সঙ্কেতে নির্দেশ করিয়া সে কহিল, "জানেন?—ঐ বাড়ীতে অনেক ছেলেমেয়ে আছে,—সবাই প্রায় আমার মত!"

"ও,"—সরোজ ছোট্ট করিয়া কহিল।

"তাদের নাম জানেন আপনি?" বুলু বলিয়া চলিল; "জানেন না। আমি জানি—মণ্টু, বেলা, উষা আর ভুতো,"—শেষের দিকে তাহার কণ্ঠের ভাষা কৌতুকের চাপা হাসিতে কাঁপিয়া উঠিল।

"ওরা বুঝি তোমার বন্ধু?" সরোজ জিজ্ঞাসা করিল।

"উঁ হুঁ," বলিয়া বুলু সরোজের মুখের দিকে চাহিল। গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ওরা আমাদের বাড়ীতে আসে না ত—কেউ না।"

"তুমি যাও না কেন?" সরোজ জিজ্ঞাসা করিল।

"মা বারণ করেন যে," বুলু উত্তর দিল, "বলেন যে, ওরা যখন আমাদের বাড়ীতে আসে না, তখন তুমিও তাদের বাড়ীতে যাবে না। তাই আমিও যাই না। মা বারণ করলে কি আর যাওয়া যায়?—যায় না,—না?"

সরোজ গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "হুঁ।"

বুলু সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছেন আপনি?"

"কিছু না ত," বলিয়া সরোজ বুলুর একখানি হাত নিজের হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল। কহিল, "গল্প করতে তোমার ইচ্ছা হয়?"

"খু—ব," বুলু উত্তর দিল, "একা একা আমার মোটে ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে আমার ভারি কান্না পায়। কিন্তু গল্প করব কার সঙ্গে? কেউ নেই যে ছাই।"

সরোজ উত্তর দিল না, বুলুর হাত ধরিয়া পায়চারি

(শেষাংশ ২০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাচীন ভারতের রঞ্জন শিল্প

শ্রীশিশিরকুমার বসাক সাহিত্যভূষণ

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য দেশসমূহে রঞ্জন শিল্প-বিষয়ে যদিও বহু গবেষণা চলিতেছে, তথাপি রঞ্জন শিল্প যে ভারতবাসীর কাছে একটা নূতন কিছু, তাহা কোন মতেই বলা চলে না। রঞ্জন শিল্পের জন্মস্থান পাশ্চাত্য দেশে নয়, ভারতবর্ষই উহার আদি জন্মস্থান। খৃষ্ট জন্মের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে, যখন তথাকথিত আধুনিক সভ্য জাতিরা অসভ্যতার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখনও এই ভারতবর্ষ রঞ্জন শিল্পে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। একথা পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিতগণও একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর মিঃ এ বেবর (Mr. A. Weber) তাঁহার 'The History of Indian Literature' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

The skill of the Indians in the production of delicate woven fabrics in the mixing of colours, the working of metals and precious stones, the preparation of essences and in all manner of technical arts, has from early times enjoyed a world-wide celebrity.

মেগাস্থেনিস, ফাহিয়ান, হিউয়েনসাং প্রভৃতি বিদেশী পর্য্যটকগণও প্রাচীন ভারতের বস্ত্র শিল্প ও রঞ্জন শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। গ্রীকেরা সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসীর নিকট হইতে কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার অবগত হয়, Mr. Manning's 'Ancient and Mediaeval India' নামক পুস্তক পাঠে তাহা অনেকটা জানা যায়।

প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা কার্পাস, উল, সিল্ক ও পাট-বস্ত্রের ব্যবহার জানিত। সুতরাং, 'বল্কল' শব্দের উল্লেখ যদিও আমরা বহু পুস্তকে দেখিতে পাই তথাপি 'বল্কল' শব্দের প্রকৃত অর্থ গাছের ছাল নয়—বৃক্ষের ছালের অংশ হইতে (made of Bast fibres) যে বস্ত্র উৎপন্ন হইত, উহাই 'বল্কল' বলিয়া অভিহিত হইত।

বৈদিক সংস্কৃতে 'রজয়িত্রী' শব্দের ও লৌকিক সংস্কৃতে 'রজক' শব্দের উল্লেখ আছে। 'রজয়িত্রী' শব্দ রং ধাতু হইতে এবং 'রজক' শব্দ রন্‌জ্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উভয় ধাতুর অর্থই 'রং-করা।' প্রাচীনকালে যে কাপড় রং করা হইত, এই দুইটি শব্দ হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। তবে বৈদিক যুগে নারীগণ কাপড়ে রং করিত এবং পৌরাণিক যুগে পুরুষেরা কাপড়ে রং করিত।

বস্ত্র বিচিত্র বর্ণে শোভিত করিবার জন্য তখন লাল, নীল, পীত ও হরিদ্রা প্রভৃতি রং ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন ভারতে রক্ত-বর্ণ ও রক্ত-বস্ত্রের বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়। কুঙ্কুম (জাফরাণ), মঞ্জিষ্ঠা (Madder), লাক্ষা, হরিদ্রা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে রঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত হইত। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রকারের ফল, ফুল ও বৃক্ষের বল্কল বা ছাল রঞ্জন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, তন্মধ্যে কুসুম ফুল (Saf-flower) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানা রং-এর মাটিও রঞ্জন কার্য্যে লাগিত। সেকালে গোরোচনা (a bright yellow pigment prepared from the bile of or found in the head of the cow) দিয়াও কাপড় রঙানো হইত। গোরোচনা দ্বারা কাপড়ে ও কাপড়ের পাড়ে নানাপ্রকার ফুলপাতা, পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সুচারুরূপে চিত্রিত করা হইত। তন্মধ্যে হংস-মিথুন পাড়ের কাপড় যুবক-যুবতীগণের নিকট পরম আদরের বস্তু ছিল। উহা তাহারা অধিকাংশ সময়ে পরিধান করিত। তৎকালে নীল গাছও রঞ্জন শিল্পের একটা প্রধান উপাদান ছিল বলিয়া জানা যায়। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমানের ন্যায় তখনও নানাবিধ ধাতুরাগ (mineral colour) রঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত হইত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থে রক্তাম্বর ও কাষায় বস্ত্রের উল্লেখ আছে এবং বৌদ্ধেরা উহা পরিধান করিতেন। তাঁহাদের নিকট উহা অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। জৈনদের মধ্যে যাঁহারা কাপড় ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা কেবলই শাদা কাপড় ব্যবহার করিতেন এবং সেইজন্য তাঁহাদিগকে 'শ্বেতাম্বর' বলা হইত।

রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে ভারতবাসীরা নানা রংয়ের কাপড় পরিধান করিত। তবে রাজা ও মন্ত্রী ব্যক্তিরা সাধারণতঃ কেবলই শাদা চিকণ কাপড় পরিধান করিতেন। প্রাচীন ভারতেও বিশেষতঃ রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ হইতে শাটী বা শাড়ী কাপড়ের প্রচলন ছিল। বর্ত্তমানকালে শাড়ী কাপড় একমাত্র যেরূপ স্ত্রীলোকেরাই পরিধান করিয়া থাকে, সেইরূপ তৎকালে স্ত্রী-পুরুষেরা সকলেই উহা পরিধান করিত। সবচেয়ে তাহাদের নিকট আপত্তিজনক বস্তু ছিল, কাল রংয়ের কাপড়। কেহকেহই তাহারা উহা পরিধান করিতে চাহিত না। কাল রংয়ের কাপড় অশুভ বলিয়া তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে রঞ্জন শিল্পের তেমন উন্নতি দেখা যায় না। কারণ সেই সময় রঞ্জন শিল্পীদের অনেক বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছিল। বৈদিক যুগে রজয়িত্রীদিগকে সময় সময় পুরুষ-মেধ যজ্ঞে বলি দেওয়া হইত। মৌর্য্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সামান্য অপরাধে রঞ্জন শিল্পীদের অর্থদণ্ড হইত; চাণক্যের অর্থ-শাস্ত্র হইতে এইরূপ জানা যায়। উপরি উক্ত কারণ সমূহের জন্য রঞ্জন শিল্পীদের সংখ্যা তখন অতি অল্প ছিল এবং উহার উন্নতির জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হইত না। গুপ্তদের সময় হইতে ভারতে রঞ্জন শিল্প ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। গুপ্ত রাজগণ রঞ্জন শিল্পীদের নানা উপায়ে উৎসাহিত করিতেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সময় এই শিল্প উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার সময় রঞ্জন শিল্প-বিষয়ে বহু গবেষণা চলিয়াছিল। অনেক রং রৌদ্র লাগিলে মলিন হইয়া যায়, সেই জন্য ঐ সমস্ত রং-এ রঞ্জিত বস্ত্র রৌদ্রে না শুকাইয়া ছায়ায় শুকান হইত। আধুনিক রঞ্জন শিল্পেও অনেক সময় এইরূপ প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন রঞ্জন শিল্পীদের অত্যন্ত সম্মান করিতেন। কোন রঞ্জন শিল্পী বস্ত্র রং করিবার জন্য রাজপ্রাসাদে আসিলে, তথাকার বৃদ্ধ স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা করিতেন।

আমাদের নিজস্ব শিল্প-সম্পদ বলিয়া গর্ব্ব করিবার মত যাহা কিছু ছিল, বহুকালের অনুশীলন ও চর্চ্চার অভাবে আজ তাহা আমরা হারাইয়া নিঃস্ব হইয়া বসিয়াছি। যাহা

হউক, নিঃস্ব হইয়া থাকিলেও একেবারে নিরাশ হইলে চলিবে না। আধুনিক নূতন নূতন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদের রঞ্জন কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। রঞ্জন শিল্পকে অবহেলা করিলে চলিবে না; কারণ, প্রতি বৎসর রঞ্জিত সূতা ও কাপড়ের জন্য বহু কোটি টাকা আমরা বিদেশে পাঠাইতেছি, ইহাতে একদিকে যেমন আমাদের দেশের অর্থবল কমিয়া যাইতেছে, অন্যদিকে তেমনি আমাদের দেশীয় বেকারদের হাহাকার দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং, সরকার এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যদি এদিকে একটু দৃক্‌পাত করেন, তাহা হইলে হয়ত ভারতের এই লুপ্ত শিল্পের কতকটা পুনরুদ্ধার হইতে পারে। যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রঞ্জন শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত—যে দেশের লতায়-পাতায়, ফল ও ফুলে রঞ্জন শিল্পের উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, সেই দেশের অধিবাসীরা যে রঞ্জন শিল্প-বিষয়ে আজও অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে, তাহা কোনমতেই যুক্তিসংগত নয়।

দুই দিক

২০৬ পৃষ্ঠার পর)

সুরু করিয়া দিল। বুলু কিন্তু বলিয়া চলিল, "আচ্ছা, আমার বাবার মত আপনিও আপনার বউকে নিয়ে একা একা বেড়াতে যান? —একা তারই সংগে খেলেন? তারই সংগে হাসি-গল্প করেন?"

সরোজ হাসিমুখে বুলুর মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল মাত্র।

"তবে?" বুলুর কণ্ঠে আগ্রহ ও উৎসাহ ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিল, "আপনার মেয়েকে আপনি সাথে নিয়ে যান? —সব সময়? সব জায়গায়?"

সরোজ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না।"

বুলু সংশয়ের দৃষ্টিতে সরোজের মুখের দিকে চাহিয়া দক্ষিণ হস্তে ঝাঁকড়া চুলের রাশি মুখের উপর হইতে সরাইতে সরাইতে কহিল, "যান, আপনি মিছে কথা বলছেন।"

সরোজ দুই হাতে তাহার দুই গাল টিপিয়া দিয়া কহিল, "না মা, মিছে কথা নয়, সত্য কথা।"

বুলু কহিল, "এটাও করেন না, ওটাও করেন না—তবে কি করেন আপনি?"

সরোজ এবার তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল, "কিছুই না, কারণ আমার বউও নেই, মেয়েও নেই।"

বুলু বিহ্বলের মত সরোজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রসংগটি পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে সরোজ কহিল, "বুলু, ঘোড়া ঘোড়া খেলবে? আমি হব ঘোড়া, আর তুমি হবে আমার পিঠে সওয়ার। কেমন?"

বুলু উৎসাহে যেন একেবারে নাচিয়া উঠিল। কহিল, "ঠিক ঠিক। বেশ হবে। ভারী মজা হবে। আমি আপনার পিঠে চেপে বলব, 'চল ঘোড়া চল, —হট্ হট্—চল'"—সে জিহ্বা ও তালুর সংযোগে বার কয়েক হট্ হট্ ধ্বনি সৃষ্টি করিল।

সরোজ কহিল, "আর আমি বলব—চিহিঁহিঁহিঁ।"

বুলু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সরোজ তৎক্ষণাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কহিল, "এই আমি ঘোড়া হয়েছি। এইবার আমার পিঠে চাপ দেখি।"

পিঠের উপর পা তুলিতে যাইতেছিল, কিন্তু থামিয়া সংশয়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বাবা এলে আপনি বলে দেবেন না ত?"

সরোজ উত্তর দিল, "না মা, না।"

বুলুর সংশয় তথাপি দূর হইল না। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি বলছেন?"

সরোজ কহিল, "সত্যি, সত্যি, সত্যি,—একেবারে, তিন সত্যি। এখন হল ত!"

বুলু আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "আচ্ছা, এইবার তবে ঘোড়া হন।"

হুকুম মানিয়া সরোজ আবার ঘোড়া হইতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই নীচে আসল জীবন্ত ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শোনা গেল, তারপর গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দ এবং সংগে সংগেই সুকুমারের কণ্ঠস্বর, "ভজুয়া!"

বুলু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ঐ বাবা এসেছে, আমি যাই" এবং বলিয়াই সে ঝড়ের মত বেগে নীচে নামিয়া গেল।

একটু পরে সুকুমারের আহ্বান সরোজের কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, "সরোজ—ও সরোজ—ছাতের উপর একা একা কি করছ? —কবিত্ব নাকি?"

সরোজ উত্তর দিল না, কিন্তু নীচে নামিয়া গেল। ড্রয়িং-রুমের সম্মুখে সুকুমার ও রেখাকে একসংগেই সে দেখিতে পাইল—বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকে উভয়েরই প্রসন্নদীপ্ত মুখমণ্ডল—রেখার পরণের জর্জেট শাড়ী ও কানে রক্তের মত রাঙা পাথর বসান সোনার দুলের মতই উজ্জ্বল।

সুকুমার সোৎসাহকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি বেয়াড়া হে তুমি? কোথায় ছিলে বৈকালে? এমন ট্রিট্‌টা মিস্ করলে? সত্যি, আজ কাননবালার যা অভিনয় দেখলাম—যা গান, যা আর্ট—স্প্লেণ্ডিড্—"

সরোজ একটু হাসিল মাত্র। বামদিকের লাইব্রেরী ঘরে বুলুর মিষ্টি মিহিসুর একটানা বাজিয়া যাইতে লাগিল—

টিকি বনাম প্রেম

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

(১৮)

না, না, এ ব্যাপার নিয়ে মামলা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

উদয়রাম বলিল, তিনি ত' করবেন বলেই স্থির করেছেন।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, তা হলে মাথায় একটু ছিট্ আছে বল।

উদয়রাম কহিল, ভারী জেদী মানুষ, তারপর হাকিমী করেছেন অনেক দিন। কথায় কথায় বলেন পুলিশে খবর দাও, মামলা কর।

দাক্ষায়ণীর মুখে দুশ্চিন্তার একটা ছাপ পড়িল। তিনি বলিলেন, কি করা যায় বলত?

উদয়রাম কোন উত্তর করিল না।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, পুলিশ এসে বাড়ী সার্চ্চ করবে, সব জিনিষ তছনছ করে ফেলবে।

খানাতল্লাসীর সময় ওরা কোন শিষ্টতার ধার ধারে না।

দাক্ষায়ণী কহিলেন, কাগজে বেরুবে।

সম্ভব।

সম্ভব কি বলছ? নিশ্চয় বেরুবে—

জমিদার তরণতারণবাবুর (যার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত) জামাই, হাইকোর্টের একজন এড্‌ভোকেট বই চুরির মামলায় পড়েছেন।

উদয়রাম সহানুভূতিসূচক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, হাজারো লোক পড়বে।

উদয়রাম বলিল, কোন কাগজ শুনেছি লাখ লাখ লোক পড়ে।

আমার বন্ধুরা হাসবে।

না সামনে কেউ সাহস করবে না।

পরোক্ষে হাসবে ত', আর তা' ছাড়া আমার চাকর নকর, পাইক, প্রজা, বরকন্দাজ থেকে জমিদারীর মুহুরী, নায়েব, ম্যানেজার পর্যন্ত সবাই ভাববে কি? বলিয়াই দাক্ষায়ণী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

উদয়রামও তার সঙ্গে সঙ্গে যেন হতাশ হইয়া পড়িল এবং ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল বাহিরে আকাশের দিকে।

দাক্ষায়ণী একটু পরে বলিলেন, আমার জীবনটা হচ্ছে দুঃখের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস।

উদয়রাম ধীরে ধীরে বলিল, হ্যাঁ।

কত আশা ছিল, কত আকাঙ্ক্ষা—আর আজ কিনা— যাক্ কোন উপায় কি নেই যাতে তোমার গদাধরচন্দ্র মামলা না করেন।

আছে একটা উপায়।

কি উপায়?

কিন্তু—

বলে ফেল।

প্রকাশের সঙ্গে প্রতিমার—

বল কি? তরণতারণবাবুর নাতনির বিয়ে প্রকাশ মাষ্টারের সঙ্গে?

উদয়রাম কহিল, খুবই দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু মেটাবার পথ শুধু ঐ একটা।

চেয়েছিলাম আমি বিলেত ফেরত জামাই, দেখলে আমার অদৃষ্ট, কে আমার এ অবস্থা করলে বল দেখি?

চুপ করে রইলে যে, করেছে ঐ সাহিত্য।

উদয়রামের আশঙ্কা ছিল যে স্বামী স্ত্রীতে এই প্রসঙ্গে আলোচনা উঠিলে দেবেনবাবু হয়ত তার নাম বলিয়া দিবেন। তিনি নিজে তাকে ক্ষমা করিয়াছেন, হলধরবাবুও করিবেন আশা করা যায়। কিন্তু এদের সকলের চেয়েই সে দাক্ষায়ণীকে বেশী ভয় করিত।

সে বলিল, সাহিত্যই দায়ী কিন্তু আপনি এজন্য জামাইবাবুকে কিছু বলবেন না যেন।

কেন বলব না শুনি?

তিনি এমনিই যথেষ্ট লজ্জা পেয়েছেন।

লজ্জা,—হেঃ হেঃ।

বললে তিনি হয়ত'—

হয়ত' কি?

অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাবেন।

পাওয়া তাঁর উচিত।

তিনি বলেছেন, বড্ড ঝামেলা সহ্য করেছি উদয়। উনি যদি কিছু বলেন তা হ'লে আর জীবন রাখবো না। বলেছেন অবশ্য গোপনে।

বলছ কি, জীবন রাখবো না মানে?

আমায় যা বলেছেন তাই আপনাকে জানালাম।

অসম্ভব! এই সামান্য কারণে কেউ জীবন মরণের প্রশ্ন তোলে না। আমার মনে হয় লিখে লিখে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

উদয়রাম চুপ করিয়া রহিল।

এই সব অপ্রীতিকর ব্যাপারের জন্য স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়া মনের বেদনা একটু লাঘব করিবারও উপায় রহিল না। কিন্তু তার চেয়েও দাক্ষায়ণীকে বিব্রত করিয়া তুলিল উদয়রামের প্রদত্ত গোপনীয় সংবাদ। তিনি বলিলেন, মামলা হলে হয়ত উনি খুব মুষড়ে পড়বেন।

নিশ্চয়ই পড়বেন।

দাক্ষায়ণী একটুক্ষণ কি যেন ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা প্রকাশের অবস্থা কেমন?

ভাল—

কি রকম ভাল?

নিজের ভাগে কলকাতায় পৈতৃক পাঁচখানা বাড়ী আছে, মাতামহের কাছ থেকেও পাবে খানকয়েক বাড়ী, কোম্পানীর কাগজ।

প্রতিমার সঙ্গে বিয়ে হলে ওকে বিলেত পাঠানো যাবে?

আপনার জামাই হলে আপনার কথা নিশ্চয়ই মান্য

হউক, নিঃস্ব হইয়া থাকিলেও একেবারে নিরাশ হইলে চলিবে না। আধুনিক নূতন নূতন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদের রঞ্জন কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। রঞ্জন শিল্পকে অবহেলা করিলে চলিবে না; কারণ, প্রতি বৎসর রঞ্জিত সূতা ও কাপড়ের জন্য বহু কোটি টাকা আমরা বিদেশে পাঠাইতেছি, ইহাতে একদিকে যেমন আমাদের দেশের অর্থবল কমিয়া যাইতেছে, অন্যদিকে তেমনি আমাদের দেশীয় বেকারদের হাহাকার দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং, সরকার এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যদি এদিকে একটু দৃক্‌পাত করেন, তাহা হইলে হয়ত ভারতের এই লুপ্ত শিল্পের কতকটা পুনরুদ্ধার হইতে পারে। যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রঞ্জন শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত—যে দেশের লতায়-পাতায়, ফল ও ফুলে রঞ্জন শিল্পের উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, সেই দেশের অধিবাসীরা যে রঞ্জন শিল্প-বিষয়ে আজও অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে, তাহা কোনমতেই যুক্তিসংগত নয়।

দুই দিক

(২০৬ পৃষ্ঠার পর)

সরু করিয়া দিল। বুলু কিন্তু বলিয়া চলিল, "আচ্ছা, আমার বাবার মত আপনিও আপনার বউকে নিয়ে একা একা বেড়াতে যান? —একা তারই সঙ্গে খেলেন? তারই সঙ্গে হাসি-গল্প করেন?"

সরোজ হাসিমুখে বুলুর মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল মাত্র।

"তবে?" বুলুর কণ্ঠে আগ্রহ ও উৎসাহ ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিল, "আপনার মেয়েকে আপনি সাথে নিয়ে যান? —সব সময়? সব জায়গায়?"

সরোজ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না।"

বুলু সংশয়ের দৃষ্টিতে সরোজের মুখের দিকে চাহিয়া দক্ষিণ হস্তে ঝাঁকড়া চুলের রাশি মুখের উপর হইতে সরাইতে সরাইতে কহিল, "যান, আপনি মিছে কথা বলছেন।"

সরোজ দুই হাতে তাহার দুই গাল টিপিয়া দিয়া কহিল, "না মা, মিছে কথা নয়, সত্য কথা।"

বুলু কহিল, "এটাও করেন না, ওটাও করেন না—তবে কি করেন আপনি?"

সরোজ এবার তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল, "কিছুই না, কারণ আমার বউও নেই, মেয়েও নেই।"

বুলু বিহ্বলের মত সরোজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রসঙ্গটি পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে সরোজ কহিল, "বুলু, ঘোড়া ঘোড়া খেলবে? আমি হব ঘোড়া, আর তুমি হবে আমার পিঠে সওয়ার। কেমন?"

বুলু উৎসাহে যেন একেবারে নাচিয়া উঠিল। কহিল, "ঠিক ঠিক। বেশ হবে। ভারী মজা হবে। আমি আপনার পিঠে চেপে বলব, 'চল ঘোড়া চল, —হট্ হট্—চল'"—সে জিহ্বা ও তালুর সংযোগে বার কয়েক হট্ হট্ ধ্বনি সৃষ্টি করিল।

সরোজ কহিল, "আর আমি বলব—চিহিঁহিঁহিঁ।"

বুলু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সরোজ তৎক্ষণাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কহিল, "এই আমি [illegible]। এইবার আমার পিঠে চাপ দেখি।"

পিঠের উপর পা তুলিতে যাইতেছিল, কিন্তু থামিয়া সংশয়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বাবা এলে আপনি বলে দেবেন না ত?"

সরোজ উত্তর দিল, "না মা, না।"

বুলুর সংশয় তথাপি দূর হইল না। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি বলছেন?"

সরোজ কহিল, "সত্যি, সত্যি, সত্যি,—একেবারে, তিন সত্যি। এখন হল ত!"

বুলু আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "আচ্ছা, এইবার তবে ঘোড়া হন।"

হুকুম মানিয়া সরোজ আবার ঘোড়া হইতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই নীচে আসল জীবন্ত ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শোনা গেল, তারপর গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গেই সুকুমারের কণ্ঠস্বর, "ভজুয়া!"

বুলু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ঐ বাবা এসেছে, আমি যাই" এবং বলিয়াই সে ঝড়ের মত বেগে নীচে নামিয়া গেল।

একটু পরে সুকুমারের আহ্বান সরোজের কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, "সরোজ—ও সরোজ—ছাতের উপর একা একা কি করছ? —কবিত্ব নাকি?"

সরোজ উত্তর দিল না, কিন্তু নীচে নামিয়া গেল। ড্রয়িং-রুমের সম্মুখে সুকুমার ও রেখাকে একসঙ্গেই সে দেখিতে পাইল—বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকে উভয়েরই প্রসন্নদীপ্ত মুখমণ্ডল—রেখার পরণের জর্জেট শাড়ী ও কানে রক্তের মত রাঙা পাথর বসান সোনার দুলের মতই উজ্জ্বল।

সুকুমার সোৎসাহকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি বেয়াড়া হে তুমি? কোথায় ছিলে বৈকালে? এমন প্লিটটা মিস্ করলে? সত্যি, আজ কাননবালার যা অভিনয় দেখলাম—যা গান, যা আর্ট—স্প্লেণ্ডিড্—"

সরোজ একটু হাসিল মাত্র। বামদিকের লাইব্রেরী ঘরে বুলুর মিষ্টি মিহিসুর একটানা বাজিয়া যাইতে লাগিল— [illegible]

টিকি বনাম প্রেম

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

(১৮)

না, না, এ ব্যাপার নিয়ে মামলা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

উদয়রাম বলিল, তিনি ত' করবেন বলেই স্থির করেছেন।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, তা হলে মাথায় একটু ছিট্ আছে বল।

উদয়রাম কহিল, ভারী জেদী মানুষ, তারপর হাকিমী করেছেন অনেক দিন। কথায় কথায় বলেন পুলিশে খবর দাও, মামলা কর।

দাক্ষায়ণীর মুখে দুশ্চিন্তার একটা ছাপ পড়িল। তিনি বলিলেন, কি করা যায় বলত?

উদয়রাম কোন উত্তর করিল না।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, পুলিশ এসে বাড়ী সার্চ্চ করবে, সব জিনিষ তছনছ করে ফেলবে।

খানাতল্লাসীর সময় ওরা কোন শিষ্টতার ধার ধারে না।

দাক্ষায়ণী কহিলেন, কাগজে বেরুবে।

সম্ভব।

সম্ভব কি বলছ? নিশ্চয় বেরুবে—

জমিদার তরণতারণবাবুর (যার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত) জামাই, হাইকোর্টের একজন এড্ভোকেট বই চুরির মামলায় পড়েছেন।

উদয়রাম সহানুভূতিসূচক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, হাজারো লোক পড়বে।

উদয়রাম বলিল, কোন কাগজ শুনেছি লাখ লাখ লোক পড়ে।

আমার বন্ধুরা হাসবে।

না সামনে কেউ সাহস করবে না।

পরোক্ষে হাসবে ত', আর তা' ছাড়া আমার চাকর নাকর, পাইক, প্রজা, বরকন্দাজ থেকে জমিদারীর মুহুরী, নায়েব, ম্যানেজার পর্য্যন্ত সবাই ভাববে কি? বলিয়াই দাক্ষায়ণী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

উদয়রামও তার সঙ্গে সঙ্গে যেন হতাশ হইয়া পড়িল এবং ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল বাহিরে আকাশের দিকে।

দাক্ষায়ণী একটু পরে বলিলেন, আমার জীবনটা হচ্ছে দুঃখের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস।

উদয়রাম ধীরে ধীরে বলিল, হ্যাঁ।

কত আশা ছিল, কত আকাঙ্ক্ষা—আর আজ কিনা—যাক্ কোন উপায় কি নেই যাতে তোমার গদাধরচন্দ্র মামলা না করেন।

আছে একটা উপায়।

কি উপায়?

কিন্তু—

বলে ফেল।

প্রকাশের সঙ্গে প্রতিমার—

বল কি? তরণতারণবাবুর নাতনির বিয়ে প্রকাশ মাষ্টারের সঙ্গে?

উদয়রাম কহিল, খুবই দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু মেটাবার পথ শুধু ঐ একটা।

চেয়েছিলাম আমি বিলেত ফেরত জামাই, দেখলে আমার অদৃষ্ট, কে আমার এ অবস্থা করলে বল দেখি?

চুপ করে রইলে যে, করেছে ঐ সাহিত্য।

উদয়রামের আশঙ্কা ছিল যে স্বামী স্ত্রীতে এই প্রসঙ্গে আলোচনা উঠিলে দেবেনবাবু হয়ত তার নাম বলিয়া দিবেন। তিনি নিজে তাকে ক্ষমা করিয়াছেন, হলধরবাবুও করিবেন আশা করা যায়। কিন্তু এদের সকলের চেয়েই সে দাক্ষায়ণীকে বেশী ভয় করিত।

সে বলিল, সাহিত্যই দায়ী—কিন্তু আপনি এজন্য জামাইবাবুকে কিছু বলবেন না যেন।

কেন বলব না শুনি?

তিনি এমনিই যথেষ্ট লজ্জা পেয়েছেন।

লজ্জা,—হেঃ হেঃ।

বললে তিনি হয়ত'—

হয়ত' কি?

অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাবেন।

পাওয়া তাঁর উচিত।

তিনি বলেছেন, বড্ড ঝামেলা সহ্য করেছি উদয়। উনি যদি কিছু বলেন তা হলে আর জীবন রাখবো না। বলেছেন অবশ্য গোপনে।

বলছ কি, জীবন রাখবো না মানে?

আমায় যা বলেছেন তাই আপনাকে জানালাম।

অসম্ভব! এই সামান্য কারণে কেউ জীবন মরণের প্রশ্ন তোলে না। আমার মনে হয় লিখে লিখে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

উদয়রাম চুপ করিয়া রহিল।

এই সব অপ্রীতিকর ব্যাপারের জন্য স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়া মনের বেদনা একটু লাঘব করিবারও উপায় রহিল না। কিন্তু তার চেয়েও দাক্ষায়ণীকে বিব্রত করিয়া তুলিল উদয়-রামের প্রদত্ত গোপনীয় সংবাদ। তিনি বলিলেন, মামলা হলে হয়ত উনি খুব মুষড়ে পড়বেন।

নিশ্চয়ই পড়বেন।

দাক্ষায়ণী একটুক্ষণ কি যেন ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা প্রকাশের অবস্থা কেমন?

ভাল—

কি রকম ভাল?

নিজের ভাগে কলকাতায় পৈতৃক পাঁচখানা বাড়ী আছে, মাতামহের কাছ থেকেও পাবে খানকয়েক বাড়ী, কোম্পানীর কাগজ।

প্রতিমার সঙ্গে বিয়ে হলে ওকে বিলেত পাঠানো যাবে?

আপনার জামাই হলে আপনার কথা নিশ্চয়ই মান্য

দেখলে ওঁর ব্যাপার, প্রকাশকে পছন্দ করেন অথচ এতদিন আমায় বলেন নি যে প্রকাশ দস্তুরমত বড় মানুষ। অবস্থা ভাল, পড়াশুনোয় ভাল, চেহারাও সুন্দর তবে কিনা —সাহিত্য করে।

ওটা আপনার ভুল ধারণা—

দাক্ষায়ণীর মাথার উপর হইতে যেন এক বোঝা নামিয়া গেল। তিনি বলিলেন, ওঃ, সাহিত্য করে না, কিন্তু অতক্ষণ একটানা ওঁর লেখা শোনে কি করে?

প্রেমিকার পিতার লেখা শোনা অপেক্ষাও অনেক কষ্টসাধ্য কাজ প্রেমিক খুব আনন্দের সহিতই করিতে পারে এই সহজ সত্যটা দাক্ষায়ণী ও উদয়রাম উভয়েই উপলব্ধি করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁদের যে সম্পর্ক তাতে ইহার আলোচনা করা চলে না।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, আচ্ছা তোমার হলধরবাবুকে বল যে তার নাতির সঙ্গে প্রতিমার বিয়ে দিতে রাজী আছি। অবশ্য যদি তিনি মামলা না করেন।

উদয়রাম বলিল, সেত' বটেই।

এই সর্ত্তে রাজী বুঝলে ত?

হ্যাঁ।

ওঃ ভাল কথা, ওর টিকিটা সম্বন্ধে, টিকিধারী জামাই—আমার বন্ধু-বান্ধবেরা ভাববে কি?

তার জন্য আটকাবে না।

তা হলে তুমি আমার নাম করে রায় বাহাদুরকে বল।

সর্ব্বপ্রকারে সফলকাম হইয়া উদয়রাম হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিল এবং ফিরিয়াই প্রথমে খাইল এক গেলাস—সাঁতরজ।

(১৯)

কেহ ঘুমায় হাঁ করিয়া, ঘুমন্ত অবস্থায় কারও চোখ থাকে অর্দ্ধনিমীলিত, কেহ হাত দুখানা বিপরীত দিকে ছড়াইয়া রাখে। কেহ নাক ডাকায়; কেহ বা ঘুমের মধ্যে কথা বলে। মোটের উপর মানুষের এই সময়কার বিচিত্র-ভঙ্গীর তালিকা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

ঘুমন্ত অবস্থায় নিজের চেহারা দেখিলে রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর জীবেরা ত' দূরের কথা সাধারণ লোকেও নিরতিশয় লজ্জাবোধ করিবে।

উচ্চপদ, দীর্ঘপদবী, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং প্রগাঢ়তর সাহিত্য-প্রীতি থাকা সত্ত্বেও হলধরবাবুর ঘুমের সময়কার অবস্থা ছিল একান্ত হাস্যোদ্দীপক।

চোখ বুজিবার একটু পরেই তাঁর মাথা বালিশ হইতে পড়িয়া যায়। একখানা হাত খাটের বাহিরে ঝুলিতে থাকে—মাথা পূব হইতে উত্তর, উত্তর হইতে পশ্চিমে ঘুরিয়া যায়। তিনি ঘুমান মুখ ব্যাদান করিয়া। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিনই এই গহ্বরটি আকারে বৃহত্তর হইতেছে।

রায় বাহাদুর সেদিন রাত্রেও এইভাবে ঘুমাইতেছিলেন। এক একবার মুখের উপর মাছি আসিয়া পড়ে; ঘুমন্ত অবস্থায়ই হাত দিয়া মাছি তাড়ান।

মাছি বিতাড়নের এইরূপ এক মুহূর্ত্তে তাঁর মনে হইল কে যেন গলায় হাত দিয়াছে।

অল রট্ বলিয়া নিজের গলায়ই তিনি একটা চড় মারিলেন তারপর চোখ খুলিয়া কিছু দেখিতে না পাইয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

খানিকটাপরেই কণ্ঠদেশে সেই স্পর্শ।

হলধর ভাবিলেন অলরট বলিয়া ত' জিনিষটাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সত্যই কে যেন এবার গলায় হাত দিয়াছিল, শুধু হাতই দেয় নাই, বোধ হয় একটু জোরে টিপিয়াও ধরিয়াছিল।

'চোর' 'চোর' বলিয়া চেঁচাইবারও আর সময় নাই। ডাকার সঙ্গে আততায়ী তাঁকে সাবাড় করিয়া ফেলিবে।

বলং বলং বাহুবলং।

হলধর নিজের হাতের গুলি টিপিয়া বাহুর বল পরীক্ষা করিলেন। বয়স হইয়াছে বটে, কিন্তু যৌবনের ব্যায়াম একেবারে বৃথা যায় নাই।

পরীক্ষার জন্যই হোক বা আততায়ীকে শিক্ষা দিবার জন্যই হোক তিনি হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া শিয়রের দিকে একটা ঘুষি ছুড়িলেন, ঘুষিটা যাইয়া পড়িল খাটের পায়ার উপর। রায় বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন, উঃ অল রট।

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চোখ পড়িল আততায়ীর উপর লোকটা একেবারে মাথার কাছে দাঁড়াইয়া।

ঘুষি বসাইবার সঙ্কল্প তখন আর ছিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তিনি এক লাফে আততায়ীর গলা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন।

তবে রে শা—

রায় বাহাদুরের মুখের উগ্র গন্ধে লোকটি জোরে জোরে নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিল। হলধরের মনে হইল লোকটা বিপুলকায়। যাক্ একবার যখন বাগে পাইয়াছেন, তখন আর বদমাসকে ছাড়িয়া দিবেন না।

আততায়ীর গলে এইরূপ বিলম্বিত অবস্থায় প্রায় দুই মিনিট কাটিয়া গেল। হলধরের মনে হইল ব্যাপারটা বিস্ময়কর, লোকটা মোটেই তাকে আঘাত করিবার চেষ্টা করে না, কোন রকমে নিজেকে মুক্ত করার জন্যই সে সচেষ্ট।

কিন্তু ছাড়া হইবে না, হলধর আরও জোরে তাকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিলেন, প্রকাশ উট্রাম, খুন, ডাকাত!

তাঁর গলার স্বর এতই নীচু হইয়া গিয়াছিল যে, প্রকাশ কিংবা উট্রাম ঘরের মধ্যে থাকিলেও শুনিতে পাইত কি না সন্দেহ।

রায় বাহাদুর গলা চড়াইয়া আবার ডাকিলেন, দরোয়ান প্রকাশ, দশরথ, রাম, অল্‌বস্।

চুপ, দাদু।

দাদু কোন শা—বিপদে পড়লে সবাই অমন দাদু ডাকে।

আততায়ী কহিল, আমি প্রকাশ।

প্রকাশ? রায় বাহাদুর আততায়ীকে ছাড়িয়া সুইচ টিপিয়া দিলেন।

সত্যই ত—এ যে প্রকাশ।

অল্‌বস্‌ তুমি?

ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য শিয়রের পাশে রক্ষিত টেবিলের উপর হইতে এক চুমুক মদ গলাধঃকরণ করিয়া রায় বাহাদুর প্রকাশের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর —বলিলেন, অল্‌ রট্‌, প্রকাশ।

দাদু।

তুমি আমার গলা টিপে—

দাদু।

টাকা পয়সা বাড়ী-ঘর সবই ত তোমার।

প্রকাশ বলিল, তুমি আমায় অবিশ্বাস কর?

এখনই তোমার নামে সব লিখে দিচ্ছি। তুমি আমার রাগের ছেলে, বলিয়া হলধর সশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রকাশ কহিল, করছ কি, চাকর-বাকরয়া কি ভাববে?

তুমি আমার sentiment জান না প্রকাশ।

তুমিও আমার sentimentএর খবর রাখ না।

রায় বাহাদুর দৌহিত্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, কাগজ বার কর ঐ ড্রয়ার থেকে। এখনই উইল করব।

কাল কর।

অল্‌বস্‌, তোমার হাতে ওটা কি?

মাদুলী।

গভীর রাত্রে মাদুলী? ছুড়ে ফেলে দাও।

সোনার মাদুলী।

কি হবে মাদুলী দিয়ে?

তোমার গলায় পরাবার জন্য—

আমার গলায়?

I am in love.

সে ত' জানি। তার সংগে আমার গলার সম্বন্ধ—। আছে—

তোমাকে মাদুলী পরালে—।

তুমি প্রেমে জয়ী হবে, হেঃ হেঃ, অল্‌ রট্‌ হেঃ, অল্‌ রট্‌।

অনেকটা তাই।

রাত্রে আরব্য উপন্যাস পড়েছ বুঝি, কিন্তু আমি ত তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হব না।

প্রকাশ কহিল, জ্যোতিষী বলেছেন—

জ্যোতিষী! এই সব করেই তোমার টাকা পয়সাগুলো যাচ্ছে বুঝি?

রামাবাঞ্ছা ভৃগুলাঞ্ছন বলেন—

কাল সকালে তাকে জেলে পাঠাব।

এটা মন্ত্রঃপূত।

তুমিও একটা মন্ত্রঃপূত পুতুল। এসব শুনলে প্রতিমা কি ভাববে বল দেখি?

প্রকাশ বলিল, প্রতিমা দেবেনবাবুর মেয়ে।

সে ত জানি।

তিনিই ঘটকর্পর।

ঘটকর্পর ও দেবেন এক লোক! দেবেন তাহ'লে সাহিত্য তস্কর?

তিনি ভদ্রলোক।

বই চুরি করে হলেন ভদ্রলোক। তোমার ভদ্রতার definition ভাল।

চুরি করেন নি, দাদু।

তুমি আমায় এতদিন গোপন করেছ যে ঘটকর্পর আর দেবেন—

সাহস হয়নি। এই মাদুলীর ব্যবস্থা করেছি সেই জন্য যাতে তোমার মত হয়।

প্রতিমা দেবেনবাবুর মেয়ে। এই প্রতিমাই বায়স্কোপের সেই সুন্দরী—?

হ্যাঁ।

কিন্তু ঘটকর্পর...বলিয়া রায় বাহাদুর পদচারণা আরম্ভ করিলেন।

একটু পরে বলিলেন, আমিও প্রেমে পড়েছিলাম, প্রকাশ—

দিদিমার সংগে।

তাকে না পেলে কি হত জান? হয়ত' একটা Rotten উকীল নয় সওদাগরী অফিসের বাবু। আর আজ আমি—

আবার পদচারণা আরম্ভ হইল, দুইবার রায় বাহাদুর বলিলেন, কিন্তু ঘটকর্পর—

প্রকাশ মাতামহের দিকে চাহিয়া রহিল।

এইভাবে কিছু সময় কাটিয়া গেল, হঠাৎ একবার থামিয়া হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রতিমাকে না পেলে তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, কি বল?

নিশ্চয়।

হ্যাঁ, তোমার দিদিমাকে না পেলে আমারও হ'ত। যদি তাকে পাও?

প্রকাশের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে বলিল, পেলে জীবনে খুবই উন্নতি করতে পারব।

বেশ, আমি মত দিলাম।

দাদু, তুমি সত্যি মহৎ।

কাব্য ছেড়ে দাও। এই মাদুলী পরাটা ঘটকর্পর শিখিয়ে দেয়নি ত'?

তিনি ভদ্রলোক।

তাহলে তুমি স্বীকার করছ যে মাদুলীটা ভদ্রোচিত নয়?

এর মধ্যে তিনি থাকলে একটু দৃষ্টিকটু হত বৈকি?

তিনি নেই, তা হলে ত' দেখছি লোকটা একেবারে Rotten নয়।

তিনি তোমারই মতন ভদ্র, উদার ও মহৎ।

চল, কালই প্রতিমাকে আশীর্ব্বাদ করে আসি।

তার বাপ-মার মত হোক।

অল্‌ বস্‌। তাদের আবার মতামত কি! আমার নাতি তুমি, ইউনিভার্সিটির জুয়েল, তোমাকে মেয়ে দিতে আপত্তি?

তার মার হয়ত আপত্তি আছে।

তার বুঝি বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই? কি ধৃষ্টতা, চল

সে পরে হবে।

শুভস্য শীঘ্রং, চেক্ দিয়ে প্রতিমাকে কালই আশীর্ব্বাদ করব।

চেক্ কেন? তোমার পায়ের ধুলোই যথেষ্ট।

ধুলো হচ্ছে airy nothing. চেকে তোমার মত না হ'লে গয়নার নাম কর। আউট্ উইথ ইট্।

বাহিরে তখন রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া যাইতেছিল।

(২০)

বেলা ন'টা। জানালা দিয়া একরাশ সোনালী আলো আসিয়া ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাহিরে প্রকৃতির উজ্জ্বল রূপ দেখিলে মন আনন্দে ভরিয়া যায়।

ঘরের মধ্যে বসিয়া দেবেনবাবু সানন্দে শশা খাইতেছেন আর ভাবিতেছেন একটা গভীর সাহিত্যিক তথ্যের কথা।

এই সময় দরজার পাশ হইতে প্রকাশ বলিল, দাদাবাবু, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

প্রকাশ ঘরে প্রবেশ করিল, তার পিছনে গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি এক বৃদ্ধ, সর্ব্বপশ্চাৎ উদয়রাম।

দেবেনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, নমস্কার, বসুন।

হলধর কহিলেন, অল্ রট্, আপনাকে বিরক্ত করলাম ক্ষমা করবেন।

তারপর আসন পরিগ্রহ করিয়া আবার বলিলেন, আপনি একজন গবেষক, পণ্ডিতলোক।

দেবেনবাবু নীচের ঠোঁট আঙুল দিয়া নাড়িতে লাগিলেন।

সদা-সহৃদয়, সাহিত্যে পরম উৎসাহী দেবেনবাবুর এই গাম্ভীর্য্যে প্রকাশ দমিয়া গেল। উদয়রামও ভাবিল, ব্যাপার কি?

হলধর কহিলেন, আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ প্রকাশ আপনার পরম স্নেহভাজন।

দেবেনবাবু বলিলেন, হুঁ। আপনি কি চা খান?

ওর ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।

দেবেনবাবু ভাবিলেন, চার ব্যবস্থা করে এসেছে, ভদ্রলোক বলে কি?

রায় বাহাদুর কহিলেন, বিস্মিত হচ্ছেন বুঝি? আপনি একজন গবেষক। দেখুন দেখি গবেষণা করে।

এ আমার শক্তির অতীত।

ফোন্ করে আসছি, মিসেস্ চক্রবর্ত্তী চা পাঠিয়ে দিলো বলে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। হলধর আসিতেছেন ফোন করিয়া এবং দাক্ষায়ণী তার জন্য চা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছেন।

হলধর কহিলেন, আপনার নাম শুনেছি। আজ আলাপ হ'য়ে বড় আনন্দিত হলুম।

দেবেনবাবু বলিলেন, সাহিত্যিক হিসেবে আপনার—

অল্ রট্। সাহিত্য পরশু থেকে ছেড়ে দিয়েছি।

এই সময় চা আসিল, সঙ্গে রেকাব ভর্ত্তি খাবার এবং পিছনে স্বয়ং দাক্ষায়ণী।

তাঁকে দেখিয়া হলধর, প্রকাশ, উদ্রাম তিনজনেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দাক্ষায়ণী সহাস্যমুখে হলধরকে বলিলেন, বসুন রায় বাহাদুর। আপনি পায়ের ধুলো দেওয়ায় আমরা কৃতার্থ হয়েছি।

হলধর কহিলেন, আমিও নিজেকে আজ ধন্য মনে করছি।

দেবেনবাবুর মনে হইল, ঘূর্ণমান রঙ্গমঞ্চের উপর নাটক অভিনীত হইতেছে।

দাক্ষায়ণী স্বামীকে বলিলেন, রায় বাহাদুর খুব সদাশয় লোক, জান বোধহয়?

দেবেনবাবু নিরুত্তর।

দাক্ষায়ণী কহিলেন, চা খান, রায় বাহাদুর। প্রকাশ, ডিসটা এগিয়ে নাও। তুমি বসে রইলে যে উদ্রাম, আরম্ভ কর।

হলধর বলিলেন, নিশ্চয়ই খাব। এর পর ত ঘন ঘন খেতে হবে।

দেবেনবাবু এবার মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন।

একখানা সিঙাড়া ভাঙিতে ভাঙিতে হলধর কহিলেন, আপনার স্ত্রীর মত হয়েছে। এখন আপনার সম্মতি পেলেই—

দেবেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্মতি কিসের?

হলধর বলিলেন, শ্রীমান প্রকাশের সঙ্গে শ্রীমতী প্রতিমার বিবাহ।

দেবেনবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মত দিয়েছ?

হাঁ ফোনেই জানিয়েছি।

আমার মত নেই।

দাক্ষায়ণীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি বলিলেন, দেখলেন ওঁর কাণ্ডটা? এর আগে অন্ততঃ দশ দিন বলেছেন এই সম্বন্ধ করতে।

হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ অমত করছেন কেন, দেবেনবাবু?

মত এক সময় ছিল বটে, কিন্তু আমি তা বদলেছি।

প্রকাশের মুখখানা একেবারে কালো হইয়া গেল।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, প্রকাশের মতন ছেলে পাবে কোথায়? এতদিন ত চেষ্টা করলে।

প্রকাশ ছেলে ভাল। কিন্তু—

হলধর বলিলেন, কিন্তু কি?

আপনি আমার বিরুদ্ধে গুপ্তচর লাগিয়েছেন, এইমাত্র দুদিন আগে—

গুপ্তচর? অল্ রট্ দেখছি। কে লাগিয়েছে?

আপনি—

আমি?

আপনার ধারণা আমি আপনার বই জেনে শুনে সরিয়েছি। আমি প্রকাশের মারফৎ ক্ষমা প্রার্থনা করায়ও আপনি খুশী হননি। আমার স্ত্রী এসব জানেন না।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, সবই জানি।

তুমি কি ক'রে জানলে?

দাক্ষায়ণী বলিলেন, সেকথার এখন দরকার নেই।

দেবেনবাবু হলধরকে বলিলেন, প্রকাশের সংগে আমার সম্প্রীতির কথা জেনে পূর্ব্বেই আপনার ক্ষমা করা উচিত ছিল।

তা একশ' বার বলতে পারেন। আমি সেজন্য লজ্জিত।

তাহ'লে আবার আমাকে পরীক্ষার জন্য জবুলদচ্চির্ সম্পাদককে পাঠালেন কেন?

কে তরুণ চৌধুরী?

হ্যাঁ, সাহিত্যিক, গবেষক।

হলধর বলিলেন, এবং একটি রাস্কেল, সে এসেছিল এখানে?

আপনি তাহ'লে কিছুই জানেন না?

রটন মোষ্ট; নেভার।

দেবেনবাবু বলিলেন, সে এসেছিল বই বেচতে'

হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরানো পুঁথি?

হ্যাঁ—

ঐ ওর ব্যবসা। সেকেলে ধাঁজে বই লিখে প্রাচীন সাহিত্য বলে চালায়। আমাকে ঐভাবে ঠকিয়েছে অন্তত দু' হাজার টাকা। তা' ছাড়া গবেষক সেজে সমাজে হাস্যাস্পদ হয়েছি।

দেবেনবাবু বলিলেন, তা' হলে লোকটা ভীষণ জোচ্চোর।

আপনি বই কেনেন নি' ত? হংসেশ্বরের নাম করে তরুণ লোককে ঠকায়।

দেবেনবাবু বলিলেন, আমায় মাপ করবেন রায় বাহাদুর। আমি ভুল বুঝে আপনার মতন মহাশয় লোকের প্রতি অবিচার করেছি।

আনন্দে প্রকাশের বুকখানা ধক্ ধক্ করিতে লাগিল।

হলধর বলিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে সাহিত্য চর্চ্চা ছেড়ে দিয়েছি। নিজে ঠকে একটা fools' paradise সৃষ্টি করার কোন মানে হয় না।

দাক্ষায়ণী স্বামীর উদ্দেশে বলিলেন, তোমারও সাহিত্য ছাড়া উচিত।

হলধর কহিলেন, আমার কথার এখনও জবাব পাইনি, চক্কোত্তি মশায়।

দেবেনবাবু বলিলেন, এর আর জবাব কি? আপনাকে একটু চা দিক। ও কাপ ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে।

হলধর বলিলেন, এবার আমাদের সংগে আপনাদেরও খেতে হবে। প্রতিমাকে ডাকুন।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, সে বড় লাজুক মেয়ে। বোধহয় আসবে না।

আবার চা আসিল।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, একটা অনুরোধ রায় বাহাদুর। প্রকাশের ঐ টিকিটা—

হলধর বলিলেন, জিনিষটা আমিও পছন্দ করি না। তবে প্রকাশের—ও একটু স্বতন্ত্র ব্যাপার। যাক ওর টিকি বেশী ক'রে বাধবে প্রতিমাকে। তাকে ডাকুন। সব খুলে বলছি। সে যা রায় দেবে তাই মেনে নেব আমরা সবাই।

স্প্রিংয়ের দরজার আড়াল হইতে প্রতিমা সবই শুনিতেছিল।

দাক্ষায়ণী ডাকিতে গেলে সে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

দাক্ষায়ণী তাকে লইয়া ঘরে ঢুকিলে হলধর বলিয়া উঠিলেন, বাঃ খাসা মেয়ে—এ যে দেখছি লক্ষ্মী, রম্ভা তিলোত্তমা, তোমাকে congratulations, প্রকাশ।

প্রতিমা মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর প্রকাশ সকলের অলক্ষ্যে তাকে একবার দেখিয়া লইল।

হলধর বলিলেন, তোমাকেও কংগ্র্যাচুলেশন্স্ প্রতিমা, দেখত চেয়ে একবার প্রকাশের দিকে। একটু ফ্যাট বেশী বটে কিন্তু তার জন্য ওর কসরতের অন্ত নেই। দড়ি ধরে ঝোলা, ডাম্বেল, বারবেল, হাইজাম্প্—

তাঁর বলার ভংগীতে প্রতিমা হাসিয়া ফেলিল।

হলধর বলিলেন, টিকিতে তোমার আপত্তি নেই ত?

প্রতিমা পায়ের বুড়ো আংগুল দিয়া মেজের উপর জ্যামিতির একটা প্রতিজ্ঞা আঁকিতে লাগিল।

হলধর কহিলেন, টিকি আমারও পছন্দ নয়। তবে ওর টিকির একটা ইতিহাস আছে। বলত উদয়রাম।

উদয়রাম বলিল, প্রকাশের মা'র ইচ্ছা ছিল ছেলেকে খাঁটি হিন্দু, খাঁটি বামুনের ছেলের মতন মানুষ ক'রে তুলবার। টিকিটা তারই স্মৃতি।

রায় বাহাদুর কহিলেন, ওর মাতামহীরও ইচ্ছা ছিল উদয়রাম।

উদয় বলিল, হ্যাঁ তাঁরও।

প্রতিমা বলিল, থাক্ না টিকিটা। তাঁরা যখন—

লজ্জায় তার মুখখানা রাঙা হইয়া গেল।

—শেষ—

ঝটিকার বিচিত্র পরিহাস

প্রবল ঝটিকায় অনেক সময় অভাবনীয় ব্যাপার ঘটাইয়া ফেলে। কয়েক বৎসর পূর্বে বাঙলায় একবার যে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হয় শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্বে, শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কোনও পল্লীবাসীর বাগানের সুপারি-গাছ ভাঙ্গিয়া উহারই একাংশ ক্রুশবৎ বিদ্ধ হয় একটি নারিকেল গাছে। •

ঘূর্ণিবাত্যায় ইহা অপেক্ষাও অতি আশ্চর্য দুর্বিপাক আনয়ন করে। আমেরিকার এলাবামা অঞ্চলে একবার ১৯৩৮ সালে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা উপস্থিত হয়। তাহাতে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের ঘর-বাড়ী ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলই, অধিকন্তু এক অভিনব হাস্যকর দৃশ্যের উদ্ভাবন হইল একটি লোহার হাঁড়িকে কেন্দ্র করিয়া। লোহার হাঁড়িটি পড়িয়াছিল বোধ
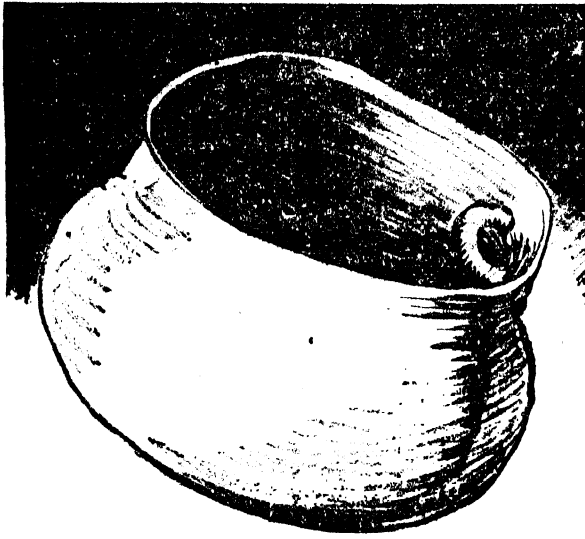
হয় বাত্যার প্রখরতম প্রভাবক্ষেত্রে—তাই হাওয়ার তোড়ে উহা উল্টাইয়া যায়; শুধু উল্টাইয়া যায় বলিলে ব্যাপারটা বুঝা যায় না—ঝড়ের মুখে খোলা ছাতা যেমন বিপরীত দিকে বাঁকিয়া লোহার ডাঁশাগুলো উপরে আসে, আর কাপড়টা থাকে ঐগুলির তলায়, ঠিক তেমনই লোহার হাঁড়ির ভিতর হইল বাহির, আর বাহির হইল ভিতর। ছবিতে দেখা যাইতেছে, এক পাশের বাহিরের পিঠের ধরিবার কড়া, উল্টাইবার ফলে ভিতরের পিঠে চলিয়া গিয়াছে! বাত্যার কারসাজিতেও রঙ্গ-রসের অবতারণা একেবারে মৌলিক! অথচ আশ্চর্য বলিতে হইবে এই যে, হাঁড়িটির কোথাও ভাঙ্গিয়া যায় নাই, অথবা কোনও স্থানে দুমড়িয়াও যায় নাই! যেমন হাঁড়িটির আকার ছিল, ঠিক সেই বিশেষ ডৌলটি পর্যন্ত রহিয়াছে অটুট অথচ উহার ভিতর পিঠ উল্টাইয়া গিয়া বাহির পিঠে পর্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। মানুষে শত চেষ্টা করিয়াও এইভাবে হাঁড়িটিকে অদল-বদল করিতে পারিত না—কোথাও একটু না ভাঙিয়া-চুরিয়া। কিন্তু ঘূর্ণিবাত্যা উহার এক নিশ্বাসে এই অঘটন ঘটাইয়া ফেলিল অবলীলাক্রমে।

অন্ধ দোকানদারের বোবা খরিদ্দার

ওয়েষ্ট-ইয়র্কের হুইলিং শহরের এক রেস্তোরাঁ ষ্টাণ্ডে যে বিক্রেতা, সে ছিল অন্ধ, নাম তাহার ক্রিষ্টোফার কারোন্। একদিন এক খরিদ্দার তাহার ষ্টাণ্ডে আসিয়া কাচের বড় বাক্সটি—যাহা বিক্রয় টেবিলরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহার উপর একটা নিকেলের পেনি ধীরে ধীরে ঠুকিতে লাগিল। কারোন্ অপেক্ষা করে খরিদ্দারটির আদেশ বাণী শুনিবার জন্য, যেমন অন্য সকলের বেলা করিয়া থাকে। কিন্তু খরিদ্দারটি কথা বলে না। সে যে বোবা, অন্ধ কারোন্ জানিবে কি প্রকারে? আবার দোকানদার যে অন্ধ, তাহাও আবার বোবা খরিদ্দার প্রথমটা বুঝিতে পারে না। কিছুক্ষণ নিকেল দ্বারা ঠক্ ঠক্ করিয়াও কোন ফায়দা হইল না দেখিয়া বোবা আগাইয়া আসিয়া কারোনের হাত ধরিল এবং তাহার হাতের চেটোয় নিজের আঙুল দিয়া তাহার প্রার্থিত জিনিষটির নাম লিখিয়া জানাইল—যে মূকভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু কারোন্ বোবা খরিদ্দারের ঐ 'আঙুল-বাণী' বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু এইটুকু ঠাওরাইয়া লইতে পারিল যে, ঐ ব্যক্তি কোন জিনিষ খরিদ করিতে চাহে এবং ঐ জিনিষটির নাম মুখে আনিতে পারিতেছে না। অন্ধ দেখিল, ব্যাপার সঙিন্—মুখে যদি বলে সে অন্ধ, বোবা খরিদ্দার তাহা শুনিতে পাইবে না। সুতরাং সে খরিদ্দারের কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল শো-কেসের কাছে, তারপর বোবার হাত ঠেকাইতে লাগিল একটি একটি পাত্রে। একটা জারের গায়ে হাত ঠেকাইলে বোবা আর সেখান হইতে তাহার হাত তুলিতে দেয় না। অন্ধ দোকানী বুঝিল—উহাই বোবা খরিদ্দারের কিনিবার জিনিষ। দোকানী তখন বাহির করিয়া দিল মিছরির বার্ (candy bar)। তখন দোকানী ও খরিদ্দার উভয়ের মুখেই হাসি ফুটিল। কিন্তু কেহই কাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে পারিল না—শুধু করমর্দন-দ্বারা কৃতজ্ঞতা জানাইল।

খেলাধূলার হাল্কা দিক

খেলাধূলায় কৃতিত্ব অর্জন করিয়া অনেকে বিশ্ববিখ্যাত হয়। অনেকে আবার ঠিক খেলায় ততটা নিপুণতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ না হইলেও খেলার সরঞ্জাম লইয়া এমন চতুর কৌশল প্রদর্শন করিতে পারে যে, শুধু সেই জন্যই তাহারা নাম কিনিতে পারে। বিলিয়ার্ড খেলায় যশলাভ করার সৌভাগ্য তাহার না হইলেও, মোণ্টানা অঞ্চলের সেণ্ট লুই শহরের চার্লস পিটার্সন সকলকে চমৎকৃত করিতে সক্ষম হইয়াছে এক অদ্ভুত কৃতিত্ব দ্বারা। সে একটি বিলিয়ার্ড বলের উপরে অন্য একটি বিলিয়ার্ড বল অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকেই

স্থিতিশীল করিয়া রাখিতে পারে। ইহার ভিতর জাদুর খেলা নাই, কারচুপিও নাই কিছু। আবার ফ্লোরিডা অঞ্চলের লেকল্যাণ্ডের গলফ খেলোয়াড় চার্লস মার্টিন গলফ বলে আঘাত করিয়া উহাকে দুইশত গজ দূরস্থ কোনও গ্রেপফ্রুট বৃক্ষে দোদুল্যমান একটি গ্রেপফ্রুটের ভিতরে গাঁথিয়া ফেলে। ফলটি বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যায় না—নিজ অঙ্গে গলফ বলটিকে প্রায় অদৃশ্য করিয়া লইয়া শাখায়ই ঝুলিতে থাকে। আর ঐ পথে যাতায়াতকারিগণ উহার প্রতি বিস্ময়াকুল দৃষ্টি-পাত করে।

পাহাড়-খোদা মূর্তি

প্রাচীনকাল হইতেই পাহাড়-পর্বতকে কাটিয়া খুদিয়া মানবমুণ্ডে পরিণত করা মানবজাতির এক সেরা কীর্তি। মিশরে স্ফিনকস্ (Sphinx) ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বর্তমানেও
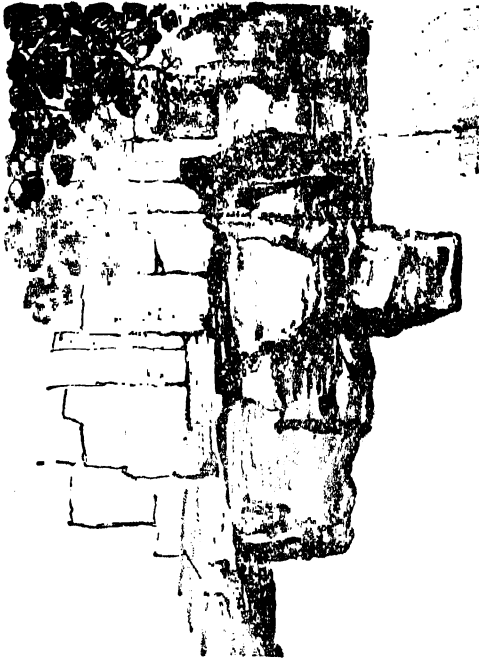
যে এইপ্রকারে স্মৃতিরক্ষা অচল হইয়াছে, এমন নয়। কিছুদিন পূর্বে এই অধ্যায়েই আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'গণতন্ত্র-তীর্থ' বিষয়ক বার্তায় চিত্র-সহ দেখাইয়াছি, কি প্রকারে সেই দেশে প্রেসিডেণ্টগণের বদনমণ্ডল গঠন করা হইয়াছে গোটা এক একটি পাহাড় কাটিয়া। কিন্তু মানব-হস্তের কারসাজি ব্যতীতও যে প্রকৃতি দেবীর খেয়ালে পাহাড়-গাত্র মনুষ্য-মুণ্ডের আকৃতি ধারণ করে, ইহা নিতান্ত বিরল বলিতে হইবে। আমেরিকায় মিনেসোটা অঞ্চলের পাইপস্টোনে একটি পাহাড়ের গাত্র স্বাভাবিক ভাঙা-গড়ার বিচিত্রতায় মনুষ্য বদনমণ্ডলে পরিণত হইয়াছে। নাক, চোখ, কপাল, থুতনি ফুটিয়া উঠিয়াছে হুবহু একটি বিরাট মানুষের মুখের মত। আবহাওয়ার প্রকোপে বিশেষ করিয়া বৃষ্টিপাত ও জলধারা গড়াইয়া পড়িবার প্রতিক্রিয়ায় নানা স্থানের পাহাড়ের গাত্র নানা অদ্ভুত আকার ধারণ করে। ফরাসী দেশের ফন্তেনেব্লো নামক স্থানে একটি চেতো (অর্থাৎ বাগানবাড়ী)-তে বাগানের গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে রহিয়াছে কতকগুলি চূণ-পাথরের ঢিবি। রৌদ্র-বৃষ্টির নিদারুণ দাপটে উহার আকার-আকৃতিতে আসিয়াছে আশ্চর্য অদলবদল। উহার একটি ঢিবি ছিল পূর্বে গোলাকার—কয়েক বর্ষের বিভিন্ন ঋতুর প্রভাবে উহা এখন কচ্ছপের রূপ ধরিয়া দর্শকগণের দৃষ্টি বিভ্রম জন্মাইতেছে। আর একটি ঢিবির ছুঁচালো অগ্রভাগ পরিণত হইয়া গিয়াছে হাউণ্ড কুকুরের মুখে। এই প্রকারে উহার অনেকগুলি ঢিবিই বিচিত্র আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এই কারণেই চেতোটির নাম-ডাক ছড়াইয়া পড়িয়াছে ঐ অঞ্চলের পল্লীতে পল্লীতে। তবে চূণপাথর অতি নরম। আরও কয়েক বৎসর এইভাবে আবহাওয়ার আক্রোশ সহ্য করিয়া পরে আবার নূতন কি রূপায়নে অভিষিক্ত হয়, তাহার স্থিরতা নাই। ইহা ছাড়াও আমেরিকার কলোরেডো অঞ্চলে স্তম্ভ, সুড়ঙ্গ, প্রভৃতি নানা আকারে পরিণত হইয়া আছে পাহাড়—মানব-হস্তের কারসাজি ছাড়াই। উহারই ভিতর একটি নেড়া পাহাড়ের চূড়া টুপির আকারে পরিণত এবং উহার অব্যবহিত নিম্নে নাকের মত একটা ছুঁচালো পয়েণ্ট বাহির হইয়া আছে আড়াআড়ি। রেড ইণ্ডিয়ানগণ উহাকে নাম দিয়াছিল 'সেকালের বৃদ্ধ' এবং উহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেও ভুলিত না।

জাল-মুদ্রার ঘোষণা

কলাম্বিয়া প্রদেশের বোগটা শহরের পার্শ্বে 'বজ্' নদী প্রবাহিত। একদিন সংবাদ রটিয়া গেল যে, হাজার হাজার ডলারের নোট ঐ নদী বক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে। অমনি সাহসিক অধিবাসীরা খরস্রোত হইতে নোট উদ্ধারের জন্য প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়াও ঝাঁপাইয়া পড়িল অগণিত সংখ্যায়। প্রাণপণ চেষ্টায় কতকগুলি ডানপিটে সত্য সত্যই নোট সংগ্রহ করিয়া আনিল নদী হইতে। প্রায় সমস্ত নোটই (একুনে চল্লিশ হাজার ডলার মূল্যের) পুলিশের নিকট হাজির করা হইল। কিন্তু পুলিশ উদ্ধারকারীদের বলিয়া দিল যে, নোটগুলি জাল; সুতরাং নোটগুলি পুলিশের হেফাজতে রাখিয়া উদ্ধারকারীদের হতাশ হইয়া শূন্য হস্তেই বাড়ী ফিরিতে হইল। জীবন বিপন্ন করা তাহাদের নিরর্থক হইল।

পুলিশ যখন দেখিল যে, নদী হইতে যে সমস্ত নোট উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই তাঁহাদের হাতে আসিয়াছে এবং বাকি যাহা রহিয়াছে, তাহা আর পাইবার আশা নাই; তখন তাঁহারা তাঁহাদের চতুরতা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। তাঁহারা জানাইয়া দিল, নোটগুলি 'জাল' নয়—ঐগুলি নিতান্তই খাঁটি। কোনও দস্যু দলকে পুলিশ তাড়া করিলে, উহারা আর উপায়ান্তর না দেখিয়া নোটগুলি নদীর জলে ফেলিয়া দেয়। পুলিশ যে পূর্বে নোটগুলিকে কৃত্রিম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—মেকি বলিয়া ধারণা হইলে, যাহারা ঐ নোট উদ্ধার করিবে, তাহারা নিজের ব্যবহারের জন্য উহা রাখিতে ভরসা পাইবে না—সকলগুলি নোটই এই প্রকারে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইবে। অন্য উপায়ে সমস্ত নোট ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া পুলিশ এই প্রকার

মেঘ

(গল্প)

শ্রীহরি দাশগুপ্ত

সুনন্দার বিয়ে :

সুনন্দা, যাকে সবাই চেনে, জানে, গুণ গায়,—রূপেগুণে যে সবার সেরা,—যাকে 'জীবনের সাথী' ক'রে নেবার আগ্রহ তার সঙ্গে যার মুহূর্তের জন্যও দেখা, তার মনেও জেগে আছে—সেই সুনন্দার বিয়ে।

শহরময় একটা জাগরণ, সাড়া পড়ে গেছে।

চারদিক সরগরম হ'য়ে উঠেছে। সবার মুখে শুধু এক কথা—সুনন্দার ত বিয়ে হ'য়ে যাচ্ছে। কেউ ফেলে দীর্ঘশ্বাস, কেউ-বা ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকায়—সুশোভন—সুনন্দার ভাবী-স্বামী সুশোভনের দিকে।

দিন ঘনিয়ে আসে, সুখের দিনের শেষ আছে—দুঃখের দিনেরও হয় অবসান।

সুনন্দার বিবাহের আর চারটি দিন বাকী!

সত্যিই ত, এবার সুনন্দা তার চিরদিনের বাসভূমি ছেড়ে শহরের অন্যপ্রান্তে চলে যাবে—বধূবেশে অথবা তার স্বামীর সঙ্গে অন্য কোন দেশে—সে-অঞ্চলকে কাঁদিয়ে—মার আঁচল ভিজিয়ে চোখের জলে—আলোর রাজ্যে আঁধারের প্রদীপ জ্বালিয়ে অনির্বাণ।

পথচারী চেয়ে দেখবে বাতায়নের পানে। পর্দাখানি উড়বে বাতাসে—ফুরফুরে হাওয়ায়; গন্ধবহ আনবে না আর তার চুলের মৃদু গন্ধ, সুন্দর, সুখস্পর্শ!

তার বান্ধবীর দল হাসি-কৌতুকে মুখর করে তুলবে না তার ঘরখানি—পড়বার ঘর—থাকবার ঘর—বসবার ঘর—গাইবার ঘর।

নবযুগের শকুন্তলা সুনন্দা! তার সাথীদের কাঁদিয়ে বেদনার নীরে ভাসিয়ে সে চলে যাবে—বাঁশির তানে—গানে গানে, অথবা তার মৌন সঙ্গীত-সাথে—তার পরিচয়ের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু রেখে।

দীর্ঘশ্বাস, ঈর্ষা, ভালবাসা, প্রেম—সত্যের কাছে সবারই ত পরাজয়।......

সুনন্দার বিয়ে হয়ে গেল—সমারোহের সঙ্গে। সবার আনন্দ কোলাহলের নীচে কত দীর্ঘশ্বাস গেল তলিয়ে। কেউ আত্মহত্যা করে নি শোকে এই ত যথেষ্ট। কত প্রাণ তাকে চেয়েছিল!.....

: নন্দা।

স্বামীর ডাকে সুনন্দা হেসে চোখ ফিরায়। কি তৃপ্ত ওঠে ভেসে তার চোখে-মুখে—কি গভীর শান্তিতে তার বুক-খানি স্ফীত হয় ওঠে।

সুশোভন চেয়ে দেখে সুন্দর, সত্যই সুনন্দার গড়ন অনির্বচনীয় সুন্দর। তার চেহারায় নেই খুঁত; তিলোত্তমা আর গ্যালেসিয়া দু'জনেরই রূপ যেন ফুটে উঠেছে তার মধ্যে—পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে সগর্বে।

হঠাৎ একখানি কালো মেঘ ভেসে ওঠে তার মনে, মনের গগন আঁধারে যায় ভরে; কি যেন মনে পড়তে চায় আবার পড়ে না।.....

: নন্দা, তুমি কি আর কাউকে ভালবাস নি?

: না।

: আমি শুনেছি দেবাংশুকে তুমি ভালবাসতে, তাকে বিয়ে করতে তুমি রাজী ছিলে, কিন্তু তোমার মা-বাবা......

: না, আমিও তাকে বিয়ে করতে চাই নি; সে সত্যিই আমায় ভালবাসতো—বড় ভালবাসতো।

: তুমিও তাহ'লে নিশ্চয়।

: আমি তাকে ভালবাসি নি কোনদিন, আমি ভালবেসেছি শুধু তোমায়। মনে মনে গেঁথেছি মালা তোমারই উদ্দেশ্যে, তোমার নাগাল পাই নি, তোমায় পরাতে পারি নি, আজ জীবনের তরে তোমায় পেয়েছি।

: জীবনের খেলার পুতুলরূপে আমায় পেয়েছ বটে, কিন্তু মন তোমার তার চারপাশে ঘুরে বেড়াবে—দীর্ঘশ্বাস পেঁ'ছাবে তারই কাছে।

: আমায় ভুল ক'র না; আমি আর কাউকে ভালবাসি নি। তুমি শুধু তুমিই আমার জীবনের আরাধ্য দেবতা, স্বপ্নের, ধ্যানের মূর্তি।......

বিলীয়মান আঁধারের বুকে ডেকে উঠল একসঙ্গে মুক্তি পিয়াসী পাখী।

সুশোভন বললে, আমি কি চাই জান?

: কি?

: আমি চাই বাঁধন—অন্তরে-বাইরে; নয়ত মুক্তি— চির মুক্তি!

সুনন্দা শিউরে উঠল—বাঁধন আর মুক্তি। একথার কোন অর্থই সে খুঁজে পেল না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল সুশোভনের দিকে।.....

সুশোভন বলে যেতে লাগল : আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছে বলে তুমি চাও বাইরের লোকের কাছে দেখাতে—তুমি আমায় পেয়ে সুখী হয়েছ, কিন্তু তোমার অন্তর ত চিরদিনই আগুনের তাপে জ্বলে যাবে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে। তোমায় সে দুঃখ আমি দিতে চাই না। আমি চাই—যে আমায় ভাল-বাসে অন্তরে-বাইরে, সে আমারই থাক; সে বাঁধন যদি সম্ভব না হয়, তা'হলে আমি থাকি চিরমুক্ত—স্বাধীন, ঐ পাখীরই মত সকল বেদনা ও দুশ্চিন্তার বাইরে।......

......ভাষা নেই সুনন্দার। সে মূক নয়; তবু সে আজ নির্বাক্। কি সে বলবে সুশোভনকে, কি-ই বা আছে তার উত্তর, কেমন করে সে তাকে বোঝাবে, সে সত্যিই তাকে ভাল-বাসে সমস্ত প্রাণ দিয়ে?

......সুশোভন কেমন যেন বিমনা হয়ে থাকে। সে যেন কি ভাবে। সারাদিন চেয়ে থাকে আকাশের পানে।......

......একটি চিঠি।

সুশোভনেরই চিঠি, তার নিজের হাতের লেখা!......

মানসী! সুনন্দা কোনদিন এ নাম শোনে নি। এ-ই হয়ত তার প্রণয়িনী, এরই জন্য হয়ত সে পারে না তাকে ভালবাসতে।

সুশোভন লিখেছে:—

গ্যালেসিয়া পেয়েছিল তার জীবন Pygmalion-এর একাগ্রতার ফলে। আমার চিরদিনের চিরজীবনের স্বপ্ন সাধনা কোনদিন কি সফলতার আনন্দে ভরে উঠবে না? তুমি আস চঞ্চল নীরব নিশীথে—জোছনার হাসির সঙ্গে অথবা ঝড়ের রাতে, বাদল সাথে, অথবা শীতের কুয়াসার আস্তরণের ভিতর দিয়ে; কথা কও, হাস, পাশে বসে গান গাও—গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, স্থির দৃষ্টিতে মেঘের দিকে চেয়ে থাক। একান্ত-ভাবে আমার হ'য়ে তুমি আসতে পার না? তোমার কি সে সাধ নেই? তা'হলে তুমি আমায় ভালবাস কেন? আমিও বা তোমায় কেন চাই?......

*　　*　　*　　*

ভালবাসা!

তার স্বামী মানসীকে ভালবাসে। মানসী! সত্যিই সে সুখী। তার সকল সুখ হরণ করে নিয়ে মানসী সুখী! আর সে? সে থাকবে বেঁচে—পাবে না স্বামীর ভালবাসা—দেখবে না তার মুখে হাসি! উঃ, এ তার অসহ্য!

মানসীকে সে যদি একবার দেখত, তাহলে সে তাকে মেরে ফেলত নয়ত, তারই সামনে আত্মঘাতিনী হ'ত। তার স্বামী এরই জন্যই ত তাকে ভালবাসে না—বাসতে পারে না।...

তার দু'চোখে ডাকল অশ্রুর বান!

জীবনভর সে দেখছে আঁধার—হতাশায় মনখানি উঠেছে কেঁদে, থেকে থেকে—বার বার—আবার!.....

দিন চলে।......

সুশোভনের সঙ্গে সুনন্দার বিশেষ কোন সম্বন্ধই নেই। শুধু দু'একটি প্রয়োজনীয় কথা—অনাড়ম্বর।

সুনন্দা বললে ঃ তোমার চিঠি দেখলাম আজ।

ঃ চিঠি, আমার? কার কাছে লিখেছি? কে দিয়েছে?

ঃ তোমার মানসীর কাছে তুমি লিখেছ। আচ্ছা, তোমার মানসী কি তোমায় চিঠি দেয় না? আমায় একবার তার একখানি চিঠি দেখতে দাও না।

ঃ আমি তাকে লিখি, সে উত্তর দেয় না। তার উত্তর সে চিঠিতে দেয় না, সে আসে—কাছে এসে কানে কানে বলে যায় তার উত্তর। সত্যিই মানসী—মানসী!......

সুনন্দা চেয়ে থাকে একদৃষ্টিতে—অতর্কিতে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস তারই সঙ্গে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু।...

মানুষ কি চায়? সে চায় তৃপ্তি, শান্তি, সুখের মোহনীয় মধুর কমনীয় স্পর্শ। সুনন্দা কি তা পেয়েছে? পায় নি। কেন? কি তার দোষ? তার স্বামী তাকে সন্দেহ করে—আর একজনকে ভালবাসে। জীবন—ক'টি দিনের জীবন সে ত একটি দিনও সুখী হতে পারল না।

সে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে।......

দেবাংশু সত্যই তাকে ভালবাসতো, কিন্তু সে তাকে ভালবাসতে পারে নি, তার স্বামীকে সে ত একথা বলেছে।

তবু স্বামী তাকে সন্দেহ করে—আর সবাইও হয়ত তাই করে। কিন্তু সে কি সত্যিই অপরাধিনী? না, তা নয়; তবু কেউ তা বিশ্বাস করবে না। সে যে নারী!

জীবনে তার তৃপ্তি নেই, সুখ নেই আশা নেই, যৌবনশ্রী বিগতপ্রায়। বেঁচে থেকে তার কি লাভ? কিসের জন্য সে বাঁচবে? মৃত্যু? আত্মহত্যা? তাও যে সে করতে পারে না। তার দম বন্ধ হ'বার যো হচ্ছিল।

দেবাংশু আজও বেঁচে আছে। সে যদি তারই কাছে ছুটে যায়—সমাজ ছেড়ে—লোকলজ্জা ত্যাগ করে—তা'হলে সে নিশ্চয় তাকে গ্রহণ করবে।

হাঁ, সে যাবে। এ ঘর ছেড়ে সে চলে যাবে—ঐ রাস্তায় ফুটপাথে ঘুরবে, যদি দেবাংশুর দেখা পায়! কিন্তু তাতে যে বিপদের আশংকা রয়েছে অনেক, সে নারী—বাঙলা দেশে তার জন্ম।

চিঠি।

দেবাংশুর কাছে সে চিঠি লিখল।.....

"তুমি আমায় ভালবাসতে, কিন্তু তোমার ডাকে আমি সাড়া দিই নি। বড় দুর্ভাগিনী আমি। সুখের আশায় ঘর বেঁধেছিলাম—আমার সে সুখ নেই। আমি কলঙ্কিনী। আমার মত অবস্থায় পড়ে মানুষ উন্মাদ হয়, মরে যায়। আমি উন্মাদ হই নি, মরতে পারি নি......।"

সুশোভন এসে দাঁড়াল সুনন্দার কাছে।

ঃ নন্দা, আজ আমার ভুল ভেঙে গেছে। সত্যই, তুমি পবিত্র।

সুনন্দা অবাক্ হয়ে তার মুখের পানে তাকাল। সে যথার্থই পবিত্র—কে তাকে একথা বললে?

সুশোভন বলে যেতে লাগল ঃ দেবাংশুর কাছে আজ সব কথা শুনে এলাম। সে আজ মৃত্যুশয্যায়। এতক্ষণে হয়ত তার সব শেষ হয়ে গেছে। সে আমায় বলে গেছে—তুমি নিষ্পাপ। আমি আজ বুঝতে পেরেছি সে সত্য কথাই বলেছে। আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলাম। আজ আমার ভুলের মোহ, আমার সন্দেহের মেঘ কেটে গেছে।......

ঃ কিন্তু—

ঃ কিন্তু কি?

ঃ মানসী?

ঃ মানসী—আমার কল্পনা—আমার মনের সুনন্দা।

ঃ তা'হলে মানসী তোমার কল্পনা—

সুশোভন সুনন্দার হাতখানি টেনে নিলে।

সুনন্দা বললে ঃ দেব-দাকে কি দেখতে পাব না—আমাদের এ আনন্দের দিনে?

ঃ কি জানি—এতক্ষণে সে হয়ত—

একটা আর্তনাদ কানে এসে বাজল রাতের নীরবতা ভেদ করে।

সুনন্দা বললে ঃ দেব-দা আর নেই, ঐ শোন—তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। সুশোভনের চোখ দুটাও ব্যথায় সমবেদনায় সজল হ'য়ে উঠল।

আসামের-রূপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আবরদের দেশে

সদিয়া বা উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত জেলার সমগ্র উত্তর পশ্চিম অংশ জুড়িয়া আবর জাতি বাস করে। আবর পাহাড় বর্ত্তমানে সীমান্ত জেলার পাশিঘাট নামক সব-ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত। এই পাশিঘাট যদিও সদিয়া হইতে খুব বেশী দূরে নহে তবুও সেখানে যাওয়া এক ভীষণ ব্যাপার, তবে শুনিলাম আমার ভাগ্য নাকি সুপ্রসন্ন তাই কিছুদিন যাবৎ মোটরে ডাক চলিতেছে।

একদিন ভোর সাতটায় সদিয়া হইতে পাশিঘাটের উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম। আবার সেই গাছ খোদাই নৌকায় ব্রহ্মপুত্র পার হইতে হইল, স্রোতের অনুকূলে বলিয়া অপর তীরে পৌঁছিতে এবার আর বেশী দেরী হইল না, সংগে আরও কয়েকজন যাত্রী ছিলেন, অধিকাংশই মাড়োয়ারী; মোটর প্রস্তুতই ছিল, সকলে আরোহণ করিতে ছুটিল। প্রথমে গাড়ী ষ্টেশনের রাস্তা ধরিয়া সৈখোয়া ঘাট ষ্টেশনেই গিয়া উপস্থিত হইল, এখানে আরও দুই একজন যাত্রী উঠা নামা করিলে আবার গাড়ী ছুটিয়া চলিল। এবার সমতল রাস্তা ধরিয়া গভীর জংগলের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম, কোথাও জন-মানবের চিহ্নটি পর্য্যন্ত নাই। প্রায় সাত আট মাইল পরে এই জংগলের ভিতরেই রাস্তার পাশে একটি বেশ বড় টিনের ঘর দেখিলাম, এখানে আমাদের গাড়ী হইতে পুটলাপুটলী লইয়া একজন বিরাট বপু মাড়োয়ারী নামিয়া গেলেন, ইহাতে প্রথমে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলাম—মাড়োয়ারী ভাই এখানে হাতী ভল্লুকের সহিতও ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন নাকি! পরে ভুল ভাঙ্গিল, গোলা হইতে অল্পদূরে কতকগুলি গরু চরিতে দেখিলাম, শুনিলাম কাছেই নাকি একটি ছোট নেপালী বস্তী আছে, গোলার মালিক পূর্ব্বোল্লিখিত বিরাট বপু মাড়োয়ারী ভায়া এই বস্তীবাসীদের "মা-বাপ"।

এরূপ 'মা-বাপে'র এখানে একটু পরিচয় দেই—আসামের দুর্গম জংগলে যেসব নিরীহ দরিদ্র পার্ব্বত্য জাতি নেপালী বা আসামীরা বাস করে সেসব স্থানে অন্তত একটি হইলেও মাড়োয়ারী গোলা দেখা যায়। যখন অধিবাসীদের পেটে ভাত নাই পরণে কাপড় নাই আর চালে খড় নাই, শুধু নিজের দেহটিই তাহাদের একমাত্র সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায় তখনই মাভৈ বাণী লইয়া মাড়োয়ারী ভাইরা তাহাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হন। জংগলে চাষের জমির অভাব নাই, তাহাদের কৃষিকর্ম্মে মনোযোগ দিবার উপদেশ দিয়া ইহাদের পেটের ভার নিজেরা গ্রহণ করেন, সর্ব্বস্বান্তরাও নিজের পেটের চিন্তা অপরের উপর চাপাইয়া দিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া কৃষিকর্ম্মে মন দেয় আর তাহাদের 'মা-বাপ' মাড়োয়ারী ভাইরা প্রাত্যহিক রেসন অর্থাৎ চাউল, লবণ ইত্যাদি মোটা মোটা প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি সরবরাহ করিতে থাকেন। এদিকে শস্য আহরণের সংগে সংগেই চাষীদের সমস্ত ফসল মাড়োয়ারীর ঘরে চলিয়া আসে কিন্তু যত শস্যই আসুক না কেন খাতায় বাৎসরিক রেসনের অর্দ্ধেকও ফসলের মূল্যে থেকে উঠে না, কাজেই বৎসরের পর বৎসর সন্তানদের নামে খরচের সংখ্যা বাড়িয়াই চলে, ইহাতে 'মা-বাপ'দের ঘরে 'সন্তান'দের সন্তানও বংশানুক্রমে চলিতে থাকে। আমার পূর্ব্বোল্লিখিত মাড়োয়ারী ভাইও এ শ্রেণীরই 'মা-বাপ,' মাল আমদানী রপ্তানির কাজে সদিয়া গিয়াছিলেন আবার আস্তানায় ফিরিলেন।

সৈখোয়া ঘাট হইতে প্রায় ১৩ মাইল সমান জংগলের ভিতর দিয়া চলিয়া সদিয়া হইতে ২০ মাইল দূরে একটু খোলা যায়গায় নদীর ঘাটে আসিয়া আমাদিগকে নামিতে হইল। এতক্ষণ ব্রহ্মপুত্রের বাম তীর ধরিয়া সোজা পশ্চিম মুখে চলিয়াছিলাম, এবার নদী অতিক্রম করিয়া ডান তীরে যাইতে

আবর রমণী—আবর পাহাড়, উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত

হইবে। এখানে ব্রহ্মপুত্র দুইটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত কাজেই দুইবার পার হইতে হয়; মধ্যকার প্রায় দুই মাইল প্রশস্ত বালুচড়া হাঁটিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। প্রথম নদীটি পার হইয়া চড়ায় পি, ডব্লিউ, ডি'র রাস্তার কাজে ব্যস্ত নেপালী কুলির পিঠে মোটঘাট চাপাইলাম, ইহাদের না পাইলে এই জনহীন প্রান্তরে বড়ই বিপদে পড়িতে হইত, কিন্তু ইহাতেই বিপদ কাটিল না। আমাদের সংগী ডাকওয়ালা চড়ায় নামিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল, আমি মোটেই চলিতে পারিতেছিলাম না, বারবার বালির মধ্যে পা ঢুকিয়া যাইতেছে, আমার কুলি তাগাদা দিতে লাগিল—ডাকওয়ালা পরবর্ত্তী ঘাটে পৌঁছিলেই নৌকা ছাড়িয়া দিবে আর এ নৌকা ধরিতে না পারিলে অপর পারে গিয়া পাশিঘাটের মোটরও পাইব না, তাই প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম, অবশেষে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া যখন এই ক্ষুদে মরুভূমিটি অতিক্রম করিলাম তাহার বহু পূর্ব্বেই নৌকা ঘাট ছাড়িয়া গিয়াছে। যাহা হউক, খর স্রোতের নদী

বলিয়া নদীর পাঁড় ঘেঁসিয়া স্রোতের বিপরীত মুখে কিছুদূরে গিয়া নৌকা ছাড়িতে হয় তাই নির্দ্দিষ্ট স্থানে ধরিতে না পারিলেও উজান পথে এক ফার্লং আন্দাজ হাঁটিয়া গিয়া নৌকা পাইলাম।

অপর তীরের নাম 'কবু', এখানে একটি পোষ্ট অফিস আছে, কয়েকজন কুলি লইয়া একজন পি, ডব্লিউ, ডি'র কর্ম্মচারীও এখানে বাস করেন। আবর পাহাড় অধিকার কালে আমাদের সরকার বাহাদুর এখানে একটি সৈন্য ঘাঁটি করিয়াছিলেন। আজ আর সে ঘাঁটি নাই কয়েকখানি জীর্ণ গৃহ মাত্র পড়িয়া আছে। 'কবু'তেও মোটর প্রস্তুতই ছিল, আবার জঙ্গলময় সমতল রাস্তায় উত্তরমুখে একুশ মাইল ছুটিয়া বেলা একটায় পাশিঘাট পেঁাছিলাম।
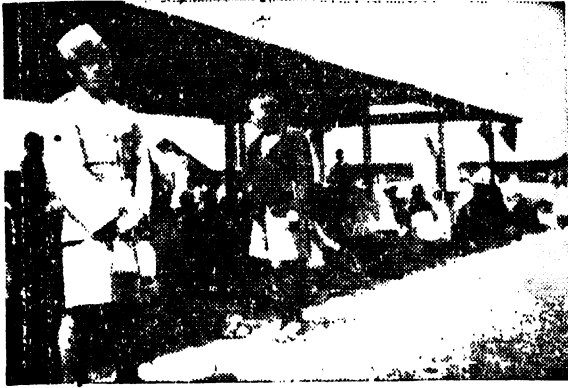
পাশিঘাট আবরদের বাজার

পাশিঘাট তিব্বত হইতে প্রবাহিত ডিহিং নামক হিমসলিলা নদীর তীরে একটি অতি ছোট শহর। একজন এসিষ্ট্যান্ট পলিটিক্যাল অফিসার, দুইশত গুর্খা সৈন্যসহ একজন সেনাধ্যক্ষ এবং কয়েকজন কেরাণী, ওভার্সিয়ার ও ডাক্তারই এই শহরের অধিবাসী। কর্ম্মচারীদের মধ্যে তিনজন বাঙালীও আছেন, ওভারসিয়ারবাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন, আমি তাঁহার বাসায়ই আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। বিকাল বেলা ডাক্তারবাবু ও আমার আবর পাহাড় এবং আবর জাতি দর্শনের প্রধান সহায় প্রবাসী বন্ধু শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ধর মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইল। প্রবাসে, বিশেষভাবে পাশিঘাট প্রবাসীদের মত নির্ব্বাসনে যাঁহারা দিন কাটাইতেছেন তাঁহাদের নিকট গেলে নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিও কিরূপ আপনার হইয়া উঠে তাহা এখানে আসিয়াই প্রথম বুঝিলাম।

বিকালবেলা শহরে বেড়াইতে বাহির হইলাম। অতি অল্পসংখ্যক রাস্তা কয়েকটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শহরে বাড়ীঘর যাহা আছে সবই সরকারী, বাড়ীগুলি বেশ দূরে দূরে সুন্দর এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে, কোথাও ঘেঁসাঘেঁসি নাই, প্রত্যেক বাড়ীর চারিপাশেই প্রশস্ত সবুজ প্রাঙ্গণ। স্বচ্ছ ও শীতল সলিলা ডিহিং নদী শহরের পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া দক্ষিণমুখে বহিয়া যাইতেছে। দক্ষিণ পার্শ্বে বাজার, বাজারের ঘরগুলিও সরকারী ব্যয়েই নির্ম্মিত; ব্যবসায়ী যে কয়জন আছে সকলেই মাড়োয়ারী। রাস্তায় দুই একটি আবর স্ত্রী-পুরুষও ক্বচিৎ দুই একটি সিপাই ছাড়া অন্য কোন জনপ্রাণী দেখিলাম না। অস্তমান সূর্য্যালোকে নীরব শহরটিকে রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরীর মতই মনে হইতে লাগিল।

রাস্তাঘাট এরূপ জনশূন্য হইবার প্রধান কারণ—এদেশের হাড়কাঁপান শীতল বাতাস। পাশিঘাটে পেঁৗছিয়াই লক্ষ্য করিলাম—উত্তর দিক হইতে শোঁ শোঁ শব্দে একটি শীতল বাতাস শহরের উপর দিয়া অনবরত বহিয়া যাইতেছে, আমি যে কয়দিন সেখানে ছিলাম দিবারাত্রির মধ্যে এক নিমেষও ইহার বিরাম হইতে দেখিলাম না, তবে সকাল সন্ধ্যা এবং রাত্রিতেই এ বাতাসের প্রাদুর্ভাব সহ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে। শুনিলাম বৎসরের ছয়টি মাস জুড়িয়াই নাকি এখানে এরূপ মাতাল বায়ু বহিয়া থাকে।

শহরের চারিপার্শ্বে দুই তিন মাইল দূর হইতেই আবর গ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তবে শহরের চারি পাঁচ মাইল উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া তিব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুউচ্চ পর্ব্বতমালা আবরদের মূল বাসস্থান। পাশিঘাট শহর হইতে এই গগনচুম্বী নীলাভ পর্ব্বতমালার দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখায়।

আবর জাতি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এবং এই সমতল ভূভাগে ও ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীর 'কবু' পর্য্যন্ত ইহারা স্বাধীনভাবেই বিচরণ করিত কিন্তু কালের প্রভাবে এই হিংস্র প্রকৃতির জংলী মানব সমাজটিকেও একদিন সুসভ্য ইংরেজের হাতে ধরা দিতে হইল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে, সদিয়ায় সবে বৃটিশের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছে, তখনও ডিব্রুগড় হইতে সৈন্যনিবাস সদিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয় নাই, একদিন পলিটিক্যাল অফিসার সাহেব বন্ধু ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় প্রমোদ ভ্রমণে বাহির হইলেন, সঙ্গে চলিল তাঁবেদার, বয়, বেয়ারা ইত্যাদি। সোজা ব্রহ্মপুত্র দিয়া কিছুদূরে গিয়া ইঁহারা অন্য একটি উপনদী ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে লাগিলেন, ক্রমে পাশিঘাট শহর হইতেও ত্রিশ মাইল উপরে গিয়া পাইলেন এই সবল সুস্থকায় আবর জাতিটিকে। আবররাও সাদরে অভ্যর্থনা করিল নূতন অতিথিকে। পলিটিক্যাল অফিসার জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন আর আবর বন্ধুদেরে দিতে লাগিলেন নিত্য নূতন উপহার। কিন্তু একদিন কিরূপে এই বর্ব্বর জাতিটি আবিষ্কার করিল সাহেবের উদ্দেশ্য খুব মহৎ নহে, তাই অবিলম্বে একদিন নামঘরে (বারোয়ারী গৃহ) আবরদের নৃত্যোৎসবের আয়োজন করিয়া সাহেব দুইজন ও তাহাদের সংগীদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেল, পূর্ব্ব হইতেই সকলে প্রস্তুত ছিল, গৃহ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই আবররা অতিথিদের বাঁধিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহির করিল তাহাদের বিষমাখান ভীষণ অস্ত্র। পাহাড়ীদের লক্ষ্য ছিল সাহেবদের উপরই বেশী, কাজেই তাহাদের কোন অসাবধান মুহূর্ত্তে সাঙ্গোপাঙ্গদের দুইজন লোক কৌশলে আবরদের চোখে ধূলি দিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং নদীর তীর ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ডিব্রুগড়ের

নিকটবর্ত্তী কোন "স" মিলের ম্যানেজার সাহেব নৌকায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি হঠাৎ এইভীষণ বনে দুইটি লোককে ছুটিতে দেখিয়া নৌকা ভিড়াইলেন ও সঙ্গে সঙ্গে লোক দুই-টিকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন কিন্তু তখন তাহাদের সংজ্ঞা লুপ্ত। শুশ্রূষায় লোক দুইটির চেতনা ফিরিয়া আসিলে সাহেব তাহাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আস্তানায় ফিরিয়া ডিব্রুগড়ে সংবাদ পাঠাইলেন। সুসজ্জিত বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল, সদিয়ায় প্রধান ঘাঁটি করিয়া আবর পাহাড়ে সরকারের অভিযান সুরু হইল। এদিকে আবররাও হটিবার পাত্র নহে, তাহাদের মধ্যেও তোড়-জোড় চলিতে লাগিল। বৃটিশ সৈন্যরা পাহাড়ের উপত্যকা-পথ দিয়া মার্চ্চ করিয়া চলিয়াছে, হঠাৎ গুরু গুরু রবে পর্ব্বতের উপর হইতে বিরাট প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া পড়িয়া একসঙ্গে এক একদল সৈন্যকে ধ্বংস করিয়া দিতে লাগিল। যখন পাহাড়ের উপর দিয়া অভিযান সুরু হইল তখন কোথা হইতে এক একটি বিষাক্ত তীর ছুটিয়া আসিয়া বৃটিশবাহিনীর এক একজন রাইফেলধারীর জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া দিতে লাগিল কেহই তাহার হদিস পাইল না। প্রায় ছয় মাসকাল এরূপ যুদ্ধ চালাইয়া জংলীরা একদিন সত্যই হার মানিল, সর্দ্দারদের অনেকে গভীর জঙ্গলে পালাইয়া গেল আর কতক বৃটিশ সৈন্যের হাতে বন্দী হইল এবং রাইফেলের গুলীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সাহেব হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিল।

সেদিন হইতেই আবর পাহাড়ে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারলাভ করিতেছে, কিন্তু শুনিলাম এখনও নাকি সমগ্র আবর পাহাড় অধীনতা স্বীকার করিতে রাজি নয়। যাহারা পাহাড়ের সুগম স্থানে এবং সমতল ক্ষেত্রে বাস করিতেছে কেবল-মাত্র তাহারাই সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের অধীনতা মানিয়া লইয়াছে, ইহারা এখন সরকারকে রীতিমত করও দিয়া থাকে, তবে এখানে জমির কোন খাজানা নাই, শুধু প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষকে 'গা'-খাজানা (Pole Tax) নামে বৎসরে তিন টাকা করিয়া দিতে হয়, জমি যে যতটুকু পারে দখলে লইয়া চাষবাস করিতে পারে।

আবর পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সত্যকারের জাতীয়-জীবনটি প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছা প্রবল থাকিলেও সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় বেশী উপরে যাইতে পারিলাম না। শহরের নিকটবর্ত্তী একটি বস্তীতে যাইতে হইল। একদিন সকালবেলা একজন মিরি-জাতীয় লোককে সঙ্গী লইয়া পাশিঘাট হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত একটি আবর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। সঙ্গীটি একাধারে আমার দো-ভাষী ও পথপ্রদর্শকের কাজ করিবে; সে আবর এবং আসামী এই দুই ভাষায়ই অভিজ্ঞ।

সরকারী প্রশস্ত রাস্তায় দুই ঘণ্টা চলিয়া বেলা প্রায় ৯টায় আমরা আবর গ্রামের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম কিন্তু রাস্তার দুই দিকের ঘন জঙ্গলে কাছে কোথাও গ্রামের চিহ্ন আছে বলিয়া ধারণাও করা যায় না, তবে মাঝে মাঝে কুকুর ও মোরগের কর্কশ চীৎকারে লোকালয়ের আভাষ পাওয়া যাইতেছিল। সরকারী রাস্তা হইতে নামিয়া পায়ে হাঁটা সরু জংলী পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম, রাস্তা এত সরু যে দুই পাশের পাতা-লতা শরীরে লাগিতেছিল। জঙ্গলে কিছুদূর প্রবেশ করিয়াই রাস্তার দুই পার্শ্বে কয়েকটি শস্যক্ষেত্র নজরে পড়িল পাহাড়ী কথায় এসব ক্ষেত্রকে 'জুম' বলা হয়। জুমে তখনও বীজ বপন করা হয় নাই, কোনটির জঙ্গল ও আবর্জ্জনা সরাইয়া জমি বপনোপযোগী করিয়া রাখা হইয়াছে, কোনটির অর্দ্ধ দগ্ধ কাঠ ও বন ইত্যাদি কাটিয়া সরান হইতেছে মাত্র। জুমের ঠিক মধ্যস্থলে রাত্রে শস্য পাহারা দিবার জন্য উঁচু মাচার উপরে ছোট ছোট ছাউনি তুলা হইয়াছে, এখানে চোরের উপদ্রব নাই, বন্য পশু-পক্ষীর হাত হইতে রোপিত বীজ ও শস্য রক্ষার জনাই এই ব্যবস্থা। জুম অতিক্রম করিয়া আবার জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। তখন দুই একটি করিয়া আবর রমণী তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র জুমের পানে রওয়ানা হইয়াছে, প্রত্যেকের পিঠে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বোঝাই এক একটি লম্বাকৃতি ঝুড়ি ঝোলান, কাহারো বা পিঠে দুগ্ধপোষ্য শিশু। সকলেই হাতে ঘুড়ীর লাটাই-এর মত বড় বড় বাঁশের তকলীতে একমনে মোটা সুতা কাটিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ আমাদের সামনা-সামনি হইতেই সকলের হাত থামিয়া গেল, পা'ও মন্থরগতিতে চলিতে লাগিল আর তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুগুলির ভীরু-দৃষ্টি আমাদের উপর ন্যস্ত হইল, আমরা কাছে গেলে তাহারা পথিপার্শ্বের জঙ্গলে সরিয়া গিয়া আমাদিগকে রাস্তা করিয়া দিতে লাগিল। এভাবে একে একে কয়েকটি দলকেই আমাদের পাশ দিয়া জুমে চলিয়া যাইতে দেখিলাম। আমরা যখন গ্রামে পৌঁছিলাম তখন গ্রামের অধিকাংশ লোকই বাহির হইয়া গিয়াছে, যাহারা গৃহে রহিয়াছে তাহাদেরও সকলে কাজে ব্যস্ত, মেয়েদের কেহ কেহ কাপড় বুনিতেছে, কেহবা মোটা মোটা বাঁশের চোঙ পিঠে বাঁধিয়া ঝরণায় জল আনিতে চলিয়াছে, পুরুষদের অনেকে শিকারে গিয়াছে, এক স্থানে দেখিলাম কয়েকটি যুবক তীর ছোড়া অভ্যাস করিতেছে। আমরা খুঁজিয়া পাতিয়া 'গাঁও বুড়ার' (গ্রাম্য-সর্দ্দার) গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের মাচার উপরে চট পাতিয়া বসিতে দিল। গাঁও বুড়ো কিছু কিছু আসামী বলিতে পারে দেখিয়া আমি সোজাসুজি তাহার সহিতই কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম, মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গী মিরিটি দুইজনকেই সাহায্য করিতে লাগিল। গাঁও বুড়ার কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম বর্ত্তমানে (ইংরেজ রাজত্বে) তাহারা বেশ সুখেই আছে। গাঁও বুড়াকে তাহাদের জাতীয় রীতি-নীতি ও সমাজ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করায় সেও আমাকে অনুরূপ কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া আমাদের ঘরের অনেক খবর লইল। তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে চাহিলে সে সহজেই রাজি হইল, তবে তাহার গৃহের দৈন্যের কথা বলিয়া সৌজন্য প্রকাশ করিতে ছাড়িল না। গাঁও বুড়ার ঘরে তাহাদের নিজস্ব জাতীয় আসবাব ছাড়া আধুনিক সভ্য জগতেরও কয়েকটি জিনিষ দেখিলাম, ইহাদের মধ্যে একটি লণ্ঠন ও একজোড়া রবারের জুতা উল্লেখযোগ্য। ক্রমশ রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া মনে হয়। আমার কাগজপত্র রাখিবার চামড়ার ব্যাগটি গাঁও বুড়া বার বার নাড়া-চাড়া করিয়া দেখিতে লাগিল, এক-

বার ইহার মূল্য এবং কোথায় পাওয়া যায় তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া লইল, বোধ হয় জিনিষটি তাহার পছন্দ হইয়া গিয়াছিল।

কতক্ষণ পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া গ্রামটি দেখিতে বাহির হইলাম, গাঁও বুড়াও সঙ্গে চলিল। এখানে আসিয়া একটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম—গ্রামবাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কৌতূহলী দৃষ্টি লইয়া দূর হইতে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, ইহাদের নিজে হইতে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক কেহ আমাদের কাছটিতে পর্যন্ত আসিতেছিল না, আমাদের পক্ষ হইতেও নানা প্রশ্ন করিয়া ইহাদের নিকট হইতে বড় একটা উত্তর পাইলাম না, সকলেই সহাস্যে ঘাড় নত করিয়া না হয় একটু দূরে সরিয়া গিয়া যেন আমার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিল। ফটো তুলিবার জন্য ক্যামেরাটি বাহির করিতেই কেহ ছুটিয়া পালাইল, কেহ-বা ভিতর হইতে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল আবর পল্লীতে বেড়াইয়া আবার আস্তানার পথে ফিরিয়া চলিলাম। তখন পথিপার্শ্বস্থ জুমে অর্দ্ধশতাধিক আবর নারী নিজের নিজের ক্ষেতে নিঃশব্দে কাজ করিয়া যাইতেছে, কেহই বসিয়া নাই, বাজে কথায় বা কলরবেও কেহ সময় কাটাইতেছে না। আমরা জুমে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নীরব কর্ম্মসাধনায় যেন ক্ষণিকের জন্য একটা বিঘ্ন সৃষ্টি করিলাম, তাহারা হাতের কাজ থামাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য একবার আগন্তুকদিগকে দেখিয়া লইয়া আবার কাজে মন দিল। জুমে একটিও পুরুষ দেখিলাম না, এ সময়ে আবর পুরুষেরা নাকি শুধু বনে শিকার করিয়াই বেড়ায়, বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিলে তাহারা আসিয়া কৃষিকর্ম্মে মন দিবে, ইহার পূর্ব্বে পর্যন্ত জুমের কাজ মেয়েদের একচেটিয়া।

গাঁও বুড়া আমাদিগকে সরকারী রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া মিলিটারী কায়দায় একটি লম্বা সেলাম জানাইয়া ফিরিয়া চলিল। বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, সৈন্যনিবাসের সিপাহীরাই এখন তাহাদের নিকট সভ্যতার আদর্শ।

বেলা প্রায় ১টায় পাশিঘাটে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম ওভার্শিয়ারবাবু এবং ডাক্তারবাবু তাঁহাদের দুই বাসায়ই আমার মধ্যাহ্নের আহার্য্য প্রস্তুত। প্রথমে ভাবিলাম আমার ত্রুটিতেই এরূপ ঘটিয়াছে কিন্তু পরে দেখিলাম প্রায় রোজই এমনটি হইতেছে, ইহার কারণ—সকলেই আমার উপর সমান দাবী খাটাইতেছিলেন, কাহারও ইচ্ছা নয় যে অপরের বাড়ীতে আহার করি। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া তিন বাসায়ই আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিলাম, তবে ওভার্শিয়ারবাবুর বাড়ীতেই হইল বেশী, কারণ আমি তাঁহারই খাস অতিথি।

পরদিন হাটবার। বাজার দেখিতে যাইব, কিন্তু হাট বসিতে নাকি একটু বেলা হইয়া যায়, তাই সকাল বেলা ডাক্তারবাবুর সহিত তাঁহার হাসপাতাল দেখিতে গেলাম। প্রথমেই 'ইনডোর' রোগীদের ঘরে ঢুকিলাম, রোগীর সংখ্যা অতি অল্প এবং সকলেই আবর। ডাক্তারবাবু গৃহে প্রবেশ করিতেই ঘরের প্রায় সকল রোগী একসঙ্গে নানা কথা বলিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু ডাক্তারবাবু আবর ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কয়েক মাস মাত্র তিনি এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছেন। রোগীদের প্রথম উচ্ছ্বাস থামিলে হাসপাতালের দোভাষীর সাহায্যে তাহাদের নানা অভাব অভিযোগ কাহারও-বা রোগের যন্ত্রণার কথা এবং কবে তাহার অসুখ সম্পূর্ণ সারিয়া যাইবে ইত্যাদি প্রশ্ন তিনি শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। একটি যুবক রাগে চক্ষু লাল করিয়া হাত পা ছুড়িয়া জানাইল—ছোট ডাক্তারবাবু (কম্পাউণ্ডারবাবু) তাহার সহিত শত্রুতা করিয়া তাহাকে তিতা ঔষধ খাওয়াইতেছেন। ডাক্তারবাবু যখন বলিলেন, আপাতত তাহাকে এ ঔষধই খাইতে হইবে, তখন সে আরও রাগিয়া বলিল—তিনিও যদি এরূপ শত্রুতা আরম্ভ করেন, তবে আর সে এখানে থাকিবে না এবং বড় সাহেবের কাছে গিয়া নালিশ করিবে। সে আরও বলিল—পাশের বিছানার রোগীকে মিঠা ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে এরূপ তিতা দেওয়ার কারণ কি? অসীম ধৈর্য্যের সহিত দোভাষীর সাহায্যে ডাক্তারবাবু একে একে রোগীদের শান্ত করিলেন।

এবার আউটডোরের পালা, সেখানে আরও বীভৎস কাণ্ড—কেহ দুই দিনের ঔষধ একবারেই নিঃশেষ করিয়াছে, কেহ ঘায়ের মলম সেবন করিয়াছে।

আমার কয়েকখানি ফটো লইবার ইচ্ছা ছিল, ডাক্তারবাবুর সাহায্যে তাহা সহজেই সম্পন্ন হইল, তবে একটু গোলমাল হইয়াছিল এক আবর দম্পতির ফটো তুলিতে গিয়া—একটি যুবককে বলিতেই তাহার স্ত্রীও শিশু পুত্রকে লইয়া হাজির হইল, ফটোখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য ডাক্তারবাবু শিশুটিকে যথারীতি তাহার মায়ের পিঠে বাঁধিয়া লইতে বলিলেন, কিন্তু যেই বলা অমনি শিশুটিকে তুলিয়া লইয়া জননী ভীতদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া লম্বা ছুট দিল, আর যুবকটি রাগে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কি বলিয়া যাইতে লাগিল। বুঝিলাম না তাহাদের কি ধারণা হইয়াছিল। ডাক্তারবাবু কতক্ষণ অভয় দিতে নিষ্ফল চেষ্টা করিলেন।

হাসপাতাল হইতে যখন বাহির হইলাম, তখন বেলা প্রায় ১০টা বাজিয়া গিয়াছে; সূর্য্যদেব পূর্ণ বিক্রমে পৃথিবীর উপর উত্তাপ ছড়াইতেছেন। আমি সোজা বাজারের দিকে রওয়ানা হইলাম। শাকসব্জী ইত্যাদি পাহাড়ী পণ্যের বোঝা পিঠে লইয়া দলে দলে আবর রমণীরা রাস্তা দিয়া চলিয়াছে শুনিলাম ইহারা ৮।১০ মাইল এমনকি কেহ কেহ কুড়ি মাইল পর্যন্ত দূরের গ্রাম হইতে আসিতেছে। পিঠে এই গুরুভার তাহার উপর দারুণ রৌদ্র, পশারিণীদের সারা দেহ হইতে অবিরল ধারে ঘাম ঝরিতেছিল, তাহাদের শুভ্রদেহ পথশ্রমে ও সূর্য্যতাপে লাল বর্ণ ধারণ করিয়াছে; মনে হয় যুবতীদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহের সুগোল বাহু ও নিটোল গণ্ডগুলি যেন রক্তভারে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু কোথাও তাহাদের চঞ্চলতা বা অধৈর্য্যের চিহ্নমাত্র নাই, ধীরপদবিক্ষেপে একে একে বাজারে প্রবেশ করিতেছে।

বাজারে লোকসংখ্যা খুব বেশী দেখিলাম না, কতকগুলি সিপাহী ও শহরের মুষ্টিমেয় আসামী বাঙালী অধিবাসীরাই

ক্রেতা এবং আবর স্ত্রীলোকরা বিক্রেত্রী, তবে দুই একজন পুরুষ দোকানদারও যে ছিল না এমন নহে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিক্রেয় দ্রব্য সম্মুখে সাজাইয়া বসিয়া আছে, কেহই বিক্রী করিতেছে না বা ক্রেতারাও ক্রয় করিতেছে না, একপাশে একটি গাছের নীচু ডালে কয়েকটি পাহাড়ী মাছ ঝুলান দেখিলাম, অধিকাংশ ক্রেতারাই এদিকে ভিড় করিতেছেন, কিন্তু এখানেও ক্রয়-বিক্রয়ের নাম গন্ধ নাই। প্রায় এক ঘণ্টাকাল বাজারের এরূপ নিশ্চল অবস্থার মধ্যে পায়চারি করিবার পর বেলা ১১টায় একপার্শ্বে দণ্ডায়মান সিপাহী একটি হুইসেল বাজাইল। সঙ্গে সঙ্গে গাছে ঝুলান মাছগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল, ক্রেতাদের যে যেটি সম্মুখে পাইলেন সেটিই ছিনাইয়া লইলেন, তৎপর দর-দস্তুর চলিল তবে বিক্রেতার কথার বিশেষ নড়চড় হইতে দেখিলাম না, কারণ ক্রেতার অনুপাতে মৎস্যের পরিমাণ অতি অল্পই ছিল।

দুট মিনিটেই মৎস্য বিক্রী শেষ হইয়া গেল কিন্তু অন্যদিকে তখনও একই অবস্থা। কাঁটায় কাঁটায় যখন ১২টা বাজিল তখন আর একটি হুইসেলের সঙ্গে সমগ্র বাজারে রীতিমত বেচাকেনা আরম্ভ হইল। এই জংলী মানব সমাজটিকে শৃঙ্খলা (Discipline) শিখাইবার জন্যই নাকি বাজারের উঠা-বসা, ক্রয়-বিক্রয় হুইসেলের সাহিত নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। বাজারে শাকসব্জী ফল ইত্যাদি প্রচুরই দেখিলাম, এখানে আস্তে ধীরেই বেচা-কেনা চলিল, দর-দস্তুরের বালাই কোথাও বড় নাই, কারণ আবররা হিসাবপত্র বিশেষ বুঝে না, প্রত্যেকে বিক্রেয় জিনিষের এক পয়সা বা একআনার এক একটি পৃথক ভাগ বাজারে আসিয়াই সাজাইয়া রাখিয়াছে।

'বাজারের হট্টগোল' কথাটি * সর্ব্বজন বিদিত কিন্তু 'আবর দেশের' এই বাজারটিতে আসিয়া দেখিলাম ক্ষেত্র বিশেষে ইহার সম্পূর্ণ উল্টারূপও সম্ভব। কোন অন্ধকে যদি এ বাজারে আনিয়া উপস্থিত করা হয় তবে বোধ হয় সে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না যে একটি জমায়েত হাটে,না কোন নির্জ্জন প্রান্তরে আসিয়া সে হাজির হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ ক্রেতা-বিক্রেতার ভাষা এক নহে, হাতমুখের ইসারায়ই কাজ চালাইতে হয়, তাহা ছাড়া আবররা সাধারণত নীরব ও শান্ত প্রকৃতির, শুধু তাহাদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিলেই যা কিছু বিপদ।

ক্রমে আমার বিদায়ের দিন আসিল। যাই যাই করিয়াও রওয়ানা হইতে নির্দ্দিষ্ট দিন হইতে দুই, তিন দিন দেরী হইয়া গেল। এই জনবিরল পার্ব্বত্য শহরটির প্রতি কয়দিনেই যেন একটা মায়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা ছাড়া এখানকার বাঙালী বন্ধুদের দাবী এড়ানও আমার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। মাত্র সাত আট দিন বাসেই এই অপরিচিত প্রবাসী পরিবারগুলির শিশুদের নিকট পর্য্যন্ত নিতান্ত আপনার জন হইয়া উঠিলাম, কাজেই তাহাদের স্নেহের অত্যাচার নীরবেই সহ্য করিতে হইল। আর শুধু কি তাহাদের সহিত আমার 'বনবাসের' মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত? একদিন সান্ধ্য মজলিসে সুরেন্দ্রবাবুর গৃহে ছেলে-মেয়েরা আমাকে গান গাহিবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। বহুকষ্টে এ বিদ্যায় আমার অজ্ঞতার কথা বুঝাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রেহাই পাইলাম, কিন্তু জীবনে আর কোনদিন যেজন্য একটু ভাবাও দরকার মনে করি নাই সেদিন আমার এই পরম আগ্রহান্বিত শ্রোতাদের নিরাশ করিতে গিয়া সেই সঙ্গীত না জানার জন্য সত্যই বড় অনুতাপ হইতে লাগিল, অবশ্য পরদিন হইতে হারমোনিয়ম লইয়া সা, রে, গা, মা, সাধিবার সংকল্পও মনে জাগে নাই, আর নিজে গাহিতে না পারিলেও ভারতের এই সীমান্তে বসিয়া বাঙালী মেয়ের কণ্ঠে বাঙলা সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য পরম তৃপ্তিতেই সেদিন উপভোগ করিয়াছিলাম।

সপ্তাহাধিক কাল আবর পাহাড়ে কাটাইয়া একদিন বেলা ৯টায় আবার মোটরে চাপিয়া সদিয়ার পথে রওয়ানা হইলাম আবার সেই পরিচিত রাস্তা, বন-জঙ্গল, নদী, বালুচড়া একটির পর একটি চলিয়া যাইতে লাগিল, আমি ড্রাইভারের পাশে বসিয়া প্রকৃতির এই সর্ব্বজনীন শোভাযাত্রা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আর বার বার মনের কোণে জাগিতেছিল পিছনে ফেলিয়া আসা আবর পাহাড় ও পাশিঘাট প্রবাসী বন্ধুদের কথা।

---

* ইতিপূর্ব্বে 'দেশ'-এ 'আবর জাতি' শীর্ষক প্রবন্ধে আবর জাতির বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

বিপুলের পতন

(গল্প)

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

বিপুলের শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে মহা চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। এমন যে একটা অঘটন ঘটিতে পারে তাহা কেহ কল্পনা করে নাই। বিপুল দলের নেতা ও নিয়ন্তা। না, তবু ঠিক বলা হইল না,—সেই দলের স্রষ্টা। সে গড়িয়াছে। তাই বলিয়া দল বলিতে দলাদলির দল নয়। এ একটা মন্ডলী।

কি করিয়া সৃষ্টি করিল? একটা দৃষ্টান্ত,—শিশির বড়লোকের ছেলে। ছুটিতে ভাবিতেছিল, অর্থাৎ বন্ধু-মহলে আলোচনা চলিতেছিল কোথায় যায়,—দার্জ্জিলিং না সিমলা, ওয়ালটেয়ার না মুসৌরী, মক্কা না মদিনা! বিপুল তার বিপুল হস্তের সমস্ত ওজনটা শিশিরের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বলিল "হতভাগা! লেখাপড়া শিখেছ, দায়িত্ববোধ জাগে নি? যারা নিরক্ষর রইল পড়ে তোমার দেশের গ্রামে, তাদের ওপর তোমার কর্ত্তব্য নেই? যাও তুমি সেখানে গিয়ে একটা স্কুল খুলে দাও। তোমার মাতুলের যে টাকা উড়াতে যাচ্ছ দিগ্‌ভ্রমণে একবার কাজের কাজে তা লাগাও ত!"

কথাগুলি আর কাহারও মুখ হইতে বাহির হইলে "হিতোপদেশের" বার্ত্তা বলিয়া বর্জ্জন করা চলিত বা অ্যাড্‌ভাইস্ গ্র্যাটিস্ বলিয়া কৌতুকেই সঞ্চার করিত, কিন্তু বিপুলের কথা বলার ধরণে এমন একটা দরদ, যে অগ্রাহ্য করা চলে না। কোথায় অনাথ আশ্রম, কোথায় শিল্পনিবাস, কোথায় চিকিৎসাখানা, বিপুলের ইঙ্গিতে গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

এমনি করিয়া বন্ধুদের ও ভক্তদের দলে দলে নানাবিধ কাজে লাগাইয়া দিল। সে নিজে কেন্দ্রস্বরূপ। সকলে জুটিত আসিয়া প্রতিদিন তাহার কাছে কাজের হিসাব নিকাশ দিতে। সে মাসিকে, সাপ্তাহিকে ও দৈনিকে প্রবন্ধ লিখিয়া সকলকে প্রেরণা দিত, অলসকে কর্ম্মী, কৃপণকে দাতা করিয়া তুলিত।

হাঁ, লিখিবার ক্ষমতা তার ছিল। সকলে বলিত, এই ক্ষমতাটাকে সে সত্যই সৎপথে চালিত করিয়াছে। অন্য দশজনে লিখিবার ক্ষমতা লইয়া যত বাজে লেখায় অপব্যয় বা দুর্ব্ব্যবহার করে; যেমন গল্প, নাটক, নভেল বা প্রেমের কবিতা! ছি! অবিমৃষ্যকারী ধনীর সন্তান যেমন অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া উড়াইয়া দেয়। তীরের ধারালো ফলা ও ধনুকের জোরালো ছিলা লইয়া অন্ধ সন্ধানী যেমন অনর্থপাতই করে।

বন্ধুরা আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে বিপুলের পান্ডুলিপির ফাইলটা লইয়া পড়িত। আসন্ন ভবিষ্যতে তাহার যে লেখাটি মুদ্রিত হইয়া শহরের দশদিক চমৎকৃত করিয়া দিবে সেইটির সঙ্গে পূর্ব্বেই পরিচয় হওয়াটা গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। একটা অদম্য কৌতূহল। যে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ভবিষ্যদ্বক্তা গণৎকারের সামনে 'আমরা হাত মেলিয়া দিয়া থাকি।

(২)

হাঁ, এহেন বিপুলের পতনের কথাটা এইবার পাড়া যাক, যে জন্য সকলে স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছে। ফাইলের বাঁড়শীতে গাঁথা যে জিনিষটি সেদিন তাহারা টানিয়া আবিষ্কার করিল তাহা নিতান্তই সুদৃশ্য ও সুস্বাদু মৎস্য-বিশেষ নহে, তাহা ভীষণদর্শন কালভুজঙ্গিনী! বস্তুত যৌবনকালেও কোনদিন সে যাহা লেখে নাই বলিয়া তাহার পক্ষে প্রশংসার ব্যাপার ছিল সেই বিপুল আজ এই প্রৌঢ় বয়সে কিনা কবিতা লিখিয়া বসিল—একেবারে প্রেমের কবিতা! একটি নয় দুইটি নয়—গুচ্ছ গুচ্ছ, যাকে বলে কবিতা-গুচ্ছ। এই আবিষ্কারই আজ সকলকে বিকল করিয়া তুলিয়াছে।

তরুণী শিষ্যাও বিপুলের কিছু কম ছিল না। তাহারা অবাক এবং শঙ্কিত হইল। কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কবিতা-গুলি লেখা কে জানে! সর্ব্বনাশ এ কি কান্ড! গুরুর মর্য্যাদা বুঝি বিসর্জ্জন যায়!

তরুণের দলের বিশিষ্ট পর্য্যায়ভুক্ত কেহ কেহ বিবিধ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া মনে মনে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল।

কবিতার ফাইল আবিষ্কারের মাসখানেক পূর্ব্বে কোথা হইতে হঠাৎ একটি চিঠি পাইয়া বিপুল কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে গিয়াছিল। দিন পনের হইল সেখান হইতে ফিরিয়াছে এবং অনেকেই এখন বলিতে লাগিল যে তাহার প্রত্যাগমনের পর হইতেই তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছি। যাহা হউক, অনেকের মত যখন ভোটাধিক্যের জোরে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল তখন অন্তত শিষ্যাগণ আশ্বস্ত হইলেন যে বিপুলের প্রণয়িনী তবে স্থানান্তরের, তাহাদের মধ্য হইতে কেহ নহে।

কিন্তু এ কি পতন! সকলেরই অসন্তোষের কারণ হইল। যে লোকটা দেশের কাজকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়া জীবন প্রায় কাটাইয়া দিল, লোকসেবার প্রেরণা লইয়া যাহার লেখনী হইতে অমৃত নিঃসৃত হইল এতকাল, তাহার অন্তরে আজ এ কি ভাবান্তর!

কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কবিতা-চর্চ্চার দরুন তাহার কর্ম্মপ্রবাহ কিছুমাত্র ব্যাহত না হইয়া বরং দশ-গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহার জীবনে যেন দিকে দিকে নূতন স্ফুরণ জাগিয়াছে! এইদিকটা লক্ষ্য করিলে ভক্ত-শিষ্যদের ক্ষোভের মাত্রা কিছু কমিতে পারে। কিন্তু ক্ষোভটা থাকিয়াই যায়—প্রেমের কবিতা! কেন?

(৩)

ইতিহাসটা তবে একটু নাড়া যাক্। তখন ছাত্রাবস্থা। সমগ্র মনটাকে যখন বিপুল পড়ার মধ্যে ডুবাইয়া দিত তখন পাশের বাড়ী হইতে ইলা আসিয়া অবুঝের মতন বিরক্ত করিত।

"অত কি পড়ছ রাতদিন, বিপুল দা?"

বিপুল মাথা গুঁজিয়া থাকে, কথার জবাব দেয় না। জবাব না পাইয়া কতকটা অভিমানের সুরে যেন আপন মনেই ইলা বলিতে থাকে "বই-এর সবই পড়ার জন্যে লেখা হয় নি। সেদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম—অত বড় খবরের কাগজ এরি মধ্যে সব পড়ে ফেললে? বাবা হেসে বললেন "সবই কি পড়তে হয়!"

বিপুল মুখ তুলিয়া সহাস্যে বলে, "খবরের কাগজ আর বই কি সমান? বইয়ের সবই পড়তে হয়।"

"এত বড় বই সব পড়বে তুমি?"

"হ্যাঁ, সব।"

ইলা অবাক ও প্রশংসমান দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইয়া থাকে কিছুক্ষণ, পরে ধীরে ধীরে বলে "পড়, বিপুলদা"।

বিপুল পড়িতে থাকে। কিন্তু ইলা আবার বলিয়া বসে, 'কতক্ষণ পড়বে তুমি?"

বিপুল বিরক্ত হইয়া বলে, "আঃ! তুমি বাড়ী যাও ত এখন।"

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইয়া ইলা চলিয়া যায়। কিন্তু মিনিট পনের পরেই আবার আসিয়া হঠাৎ বেপরোয়ার মত বলে, 'যাব না বাড়ী, কি করবে তুমি?"

বিপুল হাসিয়া বলে, "এক গেলাস জল আন ত ইলা।"

ইলা আনিয়া দিল এক গেলাস সরবৎ। বিপুল বইয়ের অক্ষরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাহা পান করিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। একটু পরেই যখন দৃষ্টি ফিরাইতে গেল ইলার দিকে তখন সে সেখানে নাই।

পরদিন বিপুল কহিল, "এক গেলাস সরবৎ আন ত ইলা।"

"বয়ে গেছে আমার" বলিয়া ইলা ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং একটু পরেই ঝড়ের মত ফিরিয়া লইয়া আসিল শুধু জল।

একদিন ইলা আসিয়া সংবাদ দিল, "জান বিপুলদা, আমার জন্য পাত্র দেখা হচ্ছে।

বইয়ের ইংরেজী বুলি আওড়াইবার ফাঁকে বিপুল কহিল, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, আমাকেও নাকি দেখতে আসবে একদিন, আর আমাকে সং সাজিয়ে দেবে সবাই মিলে। মা গো! আমি কিছুতেই সাজব না।"

"কেন বেশ ত দেখতে হবে", সজ্জিতা ইলাকে মনে মনে কল্পনা করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া বলে বিপুল।

"ছাই দেখতে হবে।" ঝাঁজের সঙ্গে ইলা বলে।

বিপুল হাসিতে থাকে।

"কিছুদিন পরে আবার ইলা আসিয়া খবর দিল, "আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, জান?"

বিপুল উৎসাহিত হইয়া বলিল, "বাঃ! কবে লুচি খাব? দাঁড়াও, একটু সবুর করে বিয়েটা কর—আমার পরীক্ষাটা হয়ে যাক্—খুব ধুম করা যাবে 'খন।"

এই ত মামুলী ব্যাপার, তুচ্ছ কথাবার্ত্তা। তারপর ইলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং বিপুল অধ্যয়নের সাধনার পরেই কর্ম্মসাধনায় ডুবিয়াছে। ইলা কি সব বকিয়া যাইত, সে-সব কথার কোন অর্থ বা আন্তরিকতা ছিল, কি ছিল না, অত ভাবিবার অবকাশ বা প্রয়োজন হয় নাই বিপুলের।

(৪)

কিন্তু তরুণ বৃক্ষের কোমল-গাত্রে লিখিত সূক্ষ্ম রেখাক্ষর যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত ও সুস্পষ্ট হইতে থাকে, বিপুলের বর্দ্ধমান চিত্তে ইলার স্মৃতির গাঁথনি তেমনি দিনে দিনে সুদৃঢ় হইতে লাগিল। কিন্তু যতই সে স্মৃতি বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল ততই তাহা অতি সন্তর্পণে অন্তরের অন্তঃপুরে সে গোপন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল এবং ততই কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করিয়া দিল।

এইভাবে তাহার জীবনের যেটা প্রকাশ, যে কর্ম্মপ্রেরণার বিকাশ বাহিরে তাহার ব্যক্ত হইয়াছে তাহার কেন্দ্রশক্তি যে একটি স্নেহপদার্থের নিষ্পিষ্ট বাষ্পভাণ্ড হইতে উত্থিত, তাহা অপরে ত জানিতই না, এমন কি নিজের কাছ হইতেও যেন তাহা গোপন করিয়া রাখিবার চেষ্টা চলিত। ইলা যে পরস্ত্রী! তাহাকে মনন অপরাধের কথা। তবুও মন বলিত ইলা তাহার পড়ার সময় ব্যাঘাত ঘটাইলেও পড়ায় সে উৎসাহ দিত; যখন বিপুল ভবিষ্যজীবনের নানা কর্ম্মকল্পনার কথা পাড়িত, তখন ইলা অবাক হইয়া কেমন এক বিহ্বলভাবে তাকাইয়া থাকিত যেন সে চোখের সামনে বিপুলের পরিস্ফুট ভবিষ্যৎ দেখিয়া মহা পুলকিত হইয়া উঠিত। বিপুলের নৈসর্গিক নিজস্ব কর্ম্মপ্রীতির উপর ইলার এই সব স্মৃতি তাহাকে প্রেরণা দান করিত। কিন্তু তবুও সে-প্রেরণাকে এযাবৎ নিজের মনেও অস্বীকার করিয়াই আসিয়াছে। না, না; সে ইলার কোন সাহায্য বা মননের সাহচর্য গ্রহণ করে না। এ তার কোন ভ্রান্তির মুহূর্ত্তে স্মৃতি আসিয়া পড়ে! ঝড়ে কোন উৎপাটিত বৃক্ষশাখা তাহার পথ আগলাইয়া পায়ের সামনে আসিয়া পড়িয়া তার জীবন পথের ব্যাঘাত ঘটায়! ঝড় হইতে প্রবলতর শক্তিতে ঐ শাখাকে পুনরায় দূরে অপসারিত করিয়া সে তার পথ চলিবে। যে ডুবারী মুক্তা লইয়া তাহার পাশে আসিয়া মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছে তাহাকে পরমুহূর্ত্তেই দৃঢ় হস্তের সঞ্চাপে পুনরায় জলের তলেই নিমজ্জিত করিয়া দেয়। তাহার হৃদয়তলে ইলার স্মৃতির আঁচড় স্থায়ী হইতে দেয় নাই এবং তাই তার লেখনীর আঁচড়ও এযাবৎ ইলার কথা কাগজে ফুটাইতে যায় নাই।

(৫)

এমনি করিয়া ত্রিশটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এমন সময় এই সেদিন হঠাৎ একটা চিঠি আসিল ইলার স্বামী নরেশের নিকট হইতে। লিখিয়াছে ইলা মৃত্যু শয্যায়,—বিপুলকে দেখিতে চায় একবার।

বিপুল গিয়া রোগিণীর বিছানার উপর ঝুঁকিয়া ইলার একখানি শীর্ণ তপ্ত হস্ত নিজের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ ইলা?"

মৃত্যুশয্যায় শায়িতা সে, আজ কোন সঙ্কোচ নাই। যন্ত্রণার কালিমা ভেদ করিয়া ইলার চোখে মুখে এক অপূর্ব্ব আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। যেন কৃষ্ণ-সবুজ পত্রের ভিতর হইতে

রঙীন্ পুষ্পের স্ফূর্ত্তি! বলিল, "ভালই আছি বিপুলদা?"

একটু থামিয়া আবার বলিল, "তোমার দেশজোড়া কাজ। তোমায় ডেকে এনে কাজের ক্ষতি করলাম। বেশীদিন ধরে রাখব না। আমার ছুটি হলেই তোমারও ছুটি।" একটু ম্লান হাসি।

'ভালই' যে নাই সে, তাহার প্রমাণ পাইতে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। একটু পরেই যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে লাগিল। চোখের জল সামলাইতে বিপুল পাশের ঘরে উঠিয়া গেল। সেখানে নরেশের বাহুপাশে আবদ্ধ হইতেই ত্রিশ বৎসরের অবরুদ্ধ অশ্রু আজ অবাধে ঝরাইয়া দিতে লাগিল। যে ছিল এতকাল বাধা, আজ সম ব্যথার আঘাতে হইল দরদী বন্ধু।

* * * *

শোকের তীর্থ হইতে স্মৃতিরূপে তীর্থসলিলটুকু লইয়া ফিরিয়াছে। প্রতিদিন তাহারই পুণ্যস্পর্শে প্রেমিক-চিত্ত হইতে নব নব কবিতার আবির্ভাব। এ কবিতা বিদায় বাণীর নহে,—আগমনীর আনন্দে ভরা। আজ আর সে নিঃস্ব নয়, এখন সে বহুমূল্য রত্নের অধিকারী। ইলাকে মনন আর অন্যায় নয়। বাধা নাই আর কিছু। ইলা এখন অশরীরী আত্মা—ধ্যানের সম্পদ। তার কর্ম্মের নব-প্রেরণা ইলারই স্মৃতি।

দেশমাতৃকা সন্তানের নিকট হইতে বিচিত্ররূপে, কখনও নিঃস্বকে দিয়া, কখনও সম্পদীকে দিয়া সেবা আদায় করিয়া থাকেন। বটবৃক্ষের যে শাখার ভার পড়িয়াছিল বিপুলের হস্তে তাহার শিকড় এতকাল শূন্যে ঝুলিয়া ভূমি হাতড়াইয়াছে। এখন স্নিগ্ধ মৃত্তিকার ভিতি পাইয়া স্থিতি-লাভ করিয়াছে। তাই কবিত্বের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের নব প্রেরণা। এতকাল বিপুলের কর্ম্ম প্রবৃত্তি রিক্ততা হইতে উদ্ভূত ছিল বলিয়া উদ্দেশ্যবিহীনতার একটা উদ্দামতা ছিল, আজ পরিপূর্ত্তির উৎস হইতে কর্ম্মের প্রবাহ মঙ্গলের পথে ছুটিল। তাই কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে মাঙ্গলিক তানের মত প্রেমের কবিতার গুঞ্জন।

শিষ্যেরা কি তবে এ পতনের জন্য ক্ষমা করিবে না।

প্রভাতফেরী

সমীর ঘোষ

আকাশ প্রান্তে ধূসর কুয়াশা লেগে
নিভেছে দিনের বাতি;
পিচকালো পথে কাদা ধূলো ওঠে জেগে
—কে জানে কেটেছে রাতি!

না থাকুক তারা—আজোও যায় না দেখা,
দিগন্ত কোথা—মুছে গেছে দিগ-রেখা—
সরু গলি ঘিরে কাঁদিছে আবছা দিন
শহরেরো কোন প্রাণ নাই মনে হয়
—মানুষে সে হায় করেছে অন্তরীণ।

জানালার দুটো কপাট হয়নি খোলা,
খুলে লাভ নেই আজ;
বাইরে বাতাসে জীবনের নেই দোলা
ওড়েনি শিকারী বাজ!
শহরের পারে হয়তো ঝাউ-এর বন
হিমেল প্রবাহে পাতা হারা অনুক্ষণ
বিলের ধারের সবুজ ঘাসের রোঁয়া
নিষ্প্রভ হোল শীতের কঠিন দিনে
লাগিতে হলুদ রংয়ের শীতল-ছোঁয়া

হলুদ্‌দিয়া ছোঁয়া লেগেছে সজীব-বুকে
মনে হয় আজ ভোরে—
রাত কেটে গেল—এলো কি প্রভাত মুখে
—আঁধার গেল কি সরে?

ম্লানিমায় ঢাকা পড়েছে মনের সীমা
কুয়াশার মতো সেথা জাগে ধূসরিমা;
পেশল হাতের চঞ্চল উদাম
মরে গেছে আজ স্বাদ-হারা এই ভোরে
- পড়েছে, না হয় প্রাণ শক্তি সে কম!

মানুষের গড়া সুখের শহর কেন
গায় দুঃখের গান?
কল-মালিকের বাঁশী বাজে ভোরে হেন—
বোঝে না কঠিন প্রাণ
—অবশ স্নায়ুরা ফিরিছে মুক্তি চেয়ে
নতুন আলোকে আকাশ যাক্ না ছেয়ে
সে আলোর লেখা পড়ুক শহর বুকে:
সীমানা শীর্ণ কাদা-মাখা কালো পথে
নিরুদ্দেশের সহজ সকৌতুকে!

মনের আকাশে ফুটুক মুক্তি লেখা
কুয়াশার অপসারে;
ঘর দিয়ে বাঁধা শহরের সীমা রেখা
স্ফূর্ত্তির জয়ভারে
জানাক মানুষ মরেনি শহর করে
নিজে হাতে সে যে তুলেছে ইহারে গড়ে;
কঠিন অধ্যবসায়ে শীতের গান
আজো ঢেকে দেবে সে দিনের মতো
যেদিন প্রথম শহরে জাগালো প্রাণ!

উড়োজাহাজের গোড়ার কথা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায় এম-এস-সি

মানুষের ওড়ার সখ আজকার নয়, সেই সখ থেকেই প্রথমত বেলুন তৈরী হ'ল ওড়ার জন্য। বেলুনে ওড়ার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য আমাদের এই প্রবন্ধ নয়। তবে জেনে রাখা ভাল বেলুনে ওড়ার অনেক অসুবিধা এবং তার প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, বেলুনে চড়ে তাকে ঠিকমত চালান গেল না। সে [illegible]জ খুশীমত হাওয়ার ভারে চলতে লাগল, তা'ছাড়া তাকে ভূতলে নিরাপদে ঠিক যায়গায় নিয়ে আসাও সহজসাধ্য হ'ল না। কাজেই সেদিক দিয়ে মানুষের ওড়ার চেষ্টা ফলবতী হবার আশা দেখা গেল না, তবুও এ-নিয়ে চেষ্টা চলতেই থাকল, কত লোক মারা গেল, কত বেলুন আগুনে লেগে পুড়ে গেল, কত রকমই না বিপদাপদ ঘটল, কিন্তু মানুষকে দমান গেল না। দেখা যায় যত বড় কঠিন কাজই হউক না কেন, প্রাণপণে চেষ্টা করলে মানুষ তাতে সাফল্যলাভ করেই। তাই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে যখন 'অটো লিলিএন্থেল' নামক একজন প্রসিদ্ধ বেলুনারোহী মারা গেলেন, তখন Wright বংশের দুই ভাই অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কি ক'রে আকাশে ওড়ার ব্যবস্থা করা যায়; সে ব্যাপার নিয়ে উঠে-পড়ে লাগলেন।

এই ঘটনার পূর্ব্বে অবশ্য ইঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। ঐ ব্যাপারের পরই আকাশে ওড়া সম্বন্ধে যত রকম বই আছে তাঁরা দু' ভাই পড়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও বেলুনারোহীদের মতামত অনুসরণ করে উড়ো জাহাজ প্রস্তুত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তারা একভাবে কাজ আরম্ভ করেন, পরে তার অনুপযোগিতা লক্ষ্য করে সেই চেষ্টা পরিহার করেন। এইভাবে প্রায় ৭ বৎসর ধরে তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চলতে থাকে, বড় ভাই Wilbur নিজে বলেছেন যে, কত সময় এমন মনে হয়েছে যে আমাদের জীবনে এ বুঝি ঘটে উঠল না। বুঝতাম মানুষ একদিন উড়তে শিখবেই, কিন্তু আমাদের জীবনকালে হবে কি না ঘোরতর সন্দেহ জাগত। এইরূপ মনের অবস্থায় কত সময় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি, কত সময় আমাদের প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেবার ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু পারিনি। কি একটা শক্তি যেন আমাদের শত প্রকার নৈরাশ্যের মধ্যেও ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেল। কালক্রমে Wright-দের ভাই দুইটি সমস্ত জগতের বিস্ময় উৎপাদন করে প্রথম উড়ো জাহাজ তৈয়ারীর সৌভাগ্য অর্জ্জন করে গেলেন।

Wright brothers আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ওহিও প্রদেশের অধিবাসী। ছোট ভাই Orville ১৮৭১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। বড় ভাই Wilbur তার চাইতে বছর চারেকের বড়। অতি অল্প বয়স থেকেই ছোট ভাই West Side News নামক চারি পৃষ্ঠার সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। এই পরিচালনা ব্যাপারে তিনিই ছিলেন একাধারে সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক। কিন্তু এতো আর একজন মানুষের কাজ নয়। সুতরাং তিনি তাঁর বড় ভাইকে কাজের সাহায্যার্থ ডেকে আনেন, তখন Wilbur হ'লেন সম্পাদক এবং Orville হ'লেন মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

এই সময় সাইকেল খুবই লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে। পত্রিকা পরিচালনার কার্য্য বিশেষ লাভজনক না হওয়ায় দু'ভাই তখন সেই কার্য্য বন্ধ করে Wright Cycle কোম্পানী বলে এক কোম্পানী গঠন করলেন। এই কার্য্যে তাঁদের যে লাভ হ'ত তা' দিয়ে নিজেদের ভরণপোষণ ক'রে যা উদ্বৃত্ত থাকত তাঁরা উড়ো জাহাজ তৈয়ারীর কার্য্যে ব্যয় করতেন। এই কাজে তাঁরা এতটা উৎসাহী হ'য়ে পড়েছিলেন যে, সময়ে বিবাহ করার কথাও তাদের মনে হয়নি। তা'ছাড়া বিবাহ করে উদ্বৃত্ত অর্থ সংসারে ব্যয় করার পক্ষপাতী তাঁরা ছিলেন না। সাইকেল কারখানা একদিকে চল্‌তে থাকল, অন্যদিকে দু'ভাই নির্জ্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে দিনের পর দিন নিজেদের সাধনার পথে অগ্রসর হ'য়ে চললেন। বেশী লোক জানাজানির পক্ষপাতী তাঁরা ছিলেন না। কারণ, প্রথমত বেশী লোক জানাজানি হলে কাজের ব্যাঘাত ছাড়া সুবিধা হবার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, অ-ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার কথা লোককে জানাবার কিছুই নেই।

যাই হোক্, ১৯০৩ খৃঃ ১৭ই ডিসেম্বর ছোট ভাই উড়ো জাহাজ চালাবার প্রথম চেষ্টা করেন এবং সেই দিনই প্রথম একখানা উড়ো জাহাজ পৃথিবীর বুকের মায়া ত্যাগ ক'রে আকাশের কোলে গিয়ে প'ড়তে সক্ষম হ'ল, কিন্তু পৃথিবীর বুকের মায়া ত কম নয় তাই আকাশের হাতছানি সত্ত্বেও বার সেকেণ্ডে ১২০ ফুট চলবার পর ধরিত্রী আবার তাকে বুকে টেনে নিল। সেইদিনই আর তিনবার ওড়ার চেষ্টা হয়, সর্ব্বশেষবারে ৫৯ সেকেণ্ডে ৮৫০' ফুট যেতে Orville সক্ষম হ'ল।

এই সংবাদ যখন বিলাতে পৌঁছিল, তখন লোকে সহজে বিশ্বাস করতে পারেনি। বেশীর ভাগ লোকই একে একটা আজগুবি রচনা ব'লে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। যাই হোক, ইংলণ্ডের লোক এ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে অবিশ্বাসী ছিল ব'লেই এ সম্বন্ধে তারা কোন চেষ্টা-চরিত্র বা উচ্চবাচ্য করেনি।

ওড়ার প্রচেষ্টায় সর্ব্বপ্রথম কৃতকার্য্য হবার পর প্রায় দু' বছর ধরে Wrightরা তাঁদের জাহাজের উন্নতি বিষয়ে মনোনিবেশ করলেন। তখন তাঁদের মনে কি উৎসাহ। কি উদ্দীপনা! নূতন জিনিষ আবিষ্কারের উদ্দীপনা যে মানুষের মনে কি উদ্যম এনে দেয়, মানুষকে যে কি অসীম বলে বলীয়ান করে, মানুষকে যে কি অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে হাল্‌কা ক'রে তোলে তার খবর অপরে দেবে কি করে? কিন্তু তখনও তাঁরা নির্জ্জনে কাজ করে চলেছেন, এমন কি পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী পর্য্যন্ত জানে না তাঁরা কি কার্য্যে নিযুক্ত। এইভাবে দু' বছর চলার পর তাঁরা প্রথম প্রকাশ্যভাবে ১৯০৫ খৃঃ ৫ই অক্টোবর ঘণ্টায় ৩৮ মাইল বেগে চলে ২৪½ মাইল স্থান অতিক্রম করেন।

কিন্তু এর পরেও অনেক লোক এই কার্য্যের কৃতিত্ব এদের দিতে চাননি। তাঁরা বলতে চেয়েছেন এই কার্য্যে Wright brothers নানা বৈজ্ঞানিকের মতানুসারে চালিত হয়েছেন মাত্র। কাজেই কৃতিত্ব তাঁদেরই বেশী, যাঁরা এদের পথ নির্দ্দেশ করেছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে Wilbur-এর নিজের কথা তুলে দিলে বোধ হয় ভাল হয়। তিনি একস্থানে লিখেছেন,—

'আমরা দেখলাম যে, এ পর্য্যন্ত যে ভাবে উড়ো জাহাজ তৈরীর প্রয়াস হয়েছে তা সবই ভুল পথে চালিত হয়েছে এবং তখনও সকলেই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। প্রথমে যখন আমরা কাজ আরম্ভ করি, তখন পূর্ব্ববর্ত্তীদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু দুই বৎসর কাজ করার পর সেই সব তথ্যের অনুপযোগিতা লক্ষ্য ক'রে আমরা বাধ্য হ'য়ে সেই গতানুগতিক রাস্তা পরিত্যাগ ক'রে সম্পূর্ণ নিজস্ব পথে অগ্রসর হ'তে থাকি। সেই সব পুরাতন তথ্যের মধ্যে সত্য ও ভুল এমনভাবে মিশিয়েছিল যে, তা থেকে ঠিক জিনিষটাকে বার করে নেওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল।

যদিও এই সাফল্যের কথা জনসাধারণকে তাঁরা জানাতে চাননি, তবুও এই ঘটনা অগোচর রইল না। তারা যখন আবার তাদের কাজ আরম্ভ করলেন, তখন জনসাধারণ এমনভাবে ভীড় করে আসতে লাগল যে, তাঁরা বাধ্য হয়ে তাঁদের কার্য্য স্থগিত রেখে বাড়ী চলে গেলেন। পরে আবার একস্থানে বসে গোপনে তাঁদের কার্য্য আরম্ভ করলেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের এই নূতন আবিষ্কার বিক্রয়ের জন্য চিঠিপত্র লেখালেখি করতে লাগলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে Wright brothers White Flir নামক সর্ব্বশেষ নির্ম্মিত জাহাজখানি নিয়ে ফরাসী দেশে উপস্থিত হন এবং সেখানে একেবারে ৭৭½ মাইল উড়িতে সমর্থ হন। এর পরে ইউরোপের অবিশ্বাসীদের আর বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম উড়ো-জাহাজ চালাবার সম্মান অবশ্য Wright-দের প্রাপ্য নয়, কেননা এরও পূর্ব্বে ১৯০৬ খৃঃ একজন ধনী ব্রেজিলবাসী—নাম তাঁর Alberto Santos Dumont—২১-১/৫ সেকেণ্ডে ৭২০ ফুট যেতে সমর্থ হন। এই ভদ্রলোক ১৮৯১ খৃঃ থেকে উড়ো জাহাজ সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী হন এবং সেই বছরই ফরাসী দেশে গিয়ে তিনি সেখানকার বেলুন প্রভৃতি ভালভাবে পরীক্ষা করেন। তিনি হাওয়ার চাইতে হাল্‌কা (Lighter-than-air) জাহাজ চালাতে খুবই পারদর্শী হন এবং স্বভাবতই হাওয়ার-চাইতে-ভারী (Heavier-than-air) উড়ো-জাহাজ কখনও উড়তে পারে ব'লে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু Wright-দের সাফল্যের পর তাঁর অবিশ্বাস দূর হয়। তাঁর সর্ব্বপ্রথম জাহাজ তৈরী হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কিন্তু তখন তিনি অকৃতকার্য্য হন, তাঁর দ্বিতীয় জাহাজেই তিনি সর্ব্বপ্রথম উড়িতে সক্ষম হন।

পূর্ব্বেই বলেছি, Dumont হাল্‌কা জাহাজ চালাতে খুবই ওস্তাদ ছিলেন। Demoiselle নামক তার যে চতুর্থ জাহাজখানি তিনি ওড়ান তার ওজন মোটে ২৫৯ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় তিন মণ দশ সের। তাঁর নিজের ওজন ছিল ১১০ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় এক মণ পনের সের। এর চাইতে হাল্‌কা উড়ো-জাহাজ আর হয়নি বলেই বিশ্বাস, এই জাহাজখানা মাটির ওপর ৬০ ফুট দৌড়েই আকাশে উঠে পড়ে ৬০ মাইল বেগে উড়তে পারত।

Wright-দের প্রথম ওড়ার প্রায় পাঁচ বছর পরে ইংলণ্ডে প্রথম ভারী উড়ো-জাহাজ ওড়ান হয়। কারণ এ বিষয়ে ইংলণ্ডবাসীরা যেন আমেরিকা ও ফরাসীদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চাইছিল না। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম উড়ো-জাহাজ চলে, এর পরেই লর্ড নর্থ ক্লিফ্ উড়ো-জাহাজে ইংলিশ প্রণালী অতিক্রমকারীকে এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবেন ঘোষণা করলেন। লর্ড নর্থ ক্লিফ্ বহুদিন যাবৎ এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন, তাই ইংরেজ যুবকদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য প্রধানত তিনি এই পুরস্কার ঘোষণা করেন।

লর্ড নর্থ ক্লিফের এই পুরস্কার লাভের আশায় হিউবার্ট লাথাম নামক একজন ফরাসী যুবক সর্ব্বপ্রথম ইংলিশ প্রণালী পার হবার চেষ্টা করেন। যদিও তিনি কৃতকার্য্য হতে পারেননি, তবুও তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর চালক—তার প্রমাণ তিনি ভালভাবেই দিয়াছেন। ঘটনাটা হয়েছিল এইরূপঃ—এই যুবক ফরাসী দেশের 'ক্যালে' বন্দরের অদূরে Sangatte নামক স্থান হইতে Antoinette নামক একটি উড়ো-জাহাজে চড়ে ১৯০৯ খৃঃ ১৯শে জুলাই বেলা প্রায় সাড়ে ছয়টার সময় রওনা হন। পথের বিপদের আশঙ্কায় 'হারপেন' নামক একটা টর্পেডো জাহাজও সমুদ্রপথে যাত্রা করে। কিছুদূর যাবার পরই লাথামের উড়ো-জাহাজ অদৃশ্য হয়ে যায়—মেঘের বা কুয়াশার আড়ালে। কিন্তু আবার কিছুক্ষণ বাদে তাকে দেখা যায়, কিন্তু তারপরেই মনে হ'ল লাথামের জাহাজখানা যেন সমুদ্রের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই ব্যাপারে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর 'হারপন' ক্যালে হ'তে প্রায় ৭ মাইল দূরে তাকে উদ্ধার করে। শোনা যায়, 'হারপন' গিয়ে যখন তাকে ধরল, তখন 'লাথাম' তার উড়ো-জাহাজে স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগারেট টানছিলেন। একটা অকূল সমুদ্রের মধ্যে প'ড়েও চুপচাপ বসে সিগারেট খাওয়ায় যে কি পরিমাণ মানসিক বলের দরকার তা সহজেই অনুমেয়। মাইল সাতেক যাবার পরই লাথামের উড়ো-জাহাজের কল বিগড়ে যায় তখন আর কোন উপায়ান্তর না দেখে লাথাম ভয় না পেয়ে এমনভাবে উড়ো-জাহাজ নিয়ে সমুদ্রের ওপর এসে পড়েন যে তাতে তিনি কিম্বা তাঁর উড়ো-জাহাজ কারুরেই কোন ক্ষতি হ'ল না।

কিন্তু কি দুঃসাহস! লাথাম এতে মোটেই নিরুৎসাহ হলেন না। তিনি আর একখানা উড়ো-জাহাজ যোগাড় ক'রে আবার একবার যাত্রার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি ছাড়াও অন্য লোক এই কঠিন কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। Sangatte থেকে কয়েক মাইল দূরে Boraques নামক স্থানে Louis Bleriot নামক এক ব্যক্তিও যাত্রার সুযোগ অন্বেষণ করছিলেন। তাঁর উড়ো জাহাজে তিনি কিছুদিন যাবৎ মহড়া দিচ্ছিলেন—অবশ্য স্থলপথেই। সেই সব ওড়ার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, এতে তাঁর প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত না হবার কোনই কারণ নেই যদি না তাঁর উড়ো-জাহাজের কল বিগড়ে যায়। কিছুদিন যাবৎ তাই তিনি কল বিগড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে কি না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ক'রে দেখছিলেন। তারপর একদিন এক শুভ মুহূর্ত্তে তাঁর যাত্রা সুরু হ'ল জুলাই মাসেরই ২৫শে তারিখে।

যাত্রার পূর্ব্বে একবার তিনি একটুখানি ঘুরে এলেন, তার ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বেই ডোভারের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

কি ভয়াবহ এই যাত্রা! এই যাত্রাই হয়ত তাঁর শেষ যাত্রা হতে পারে। কিন্তু মানুষের কি অদম্য সাহস! কি তার দুর্দ্দমনীয় আশা! প্রাণের মায়াও তার কাছে খুব বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এই তেজ আজ সব ইউরোপের লোকের আছে বলেই না ওরা জগৎবরেণ্য জগতের সেরা জাতি! তাই না আজ ওরা সমস্ত জগতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে!

Bleriot-এর উড়ো-জাহাজে না ছিল কোন যন্ত্রপাতি—যা দিয়ে দিক নির্ণয় করা যেতে পারে,—না ছিল কোন সঙ্গী-সাথী। জলপথে চলেছে Escopette নামক যুদ্ধ-জাহাজ (destroyer) বায়ুপথে Bleriot-এর ক্ষুদ্র উড়ো-জাহাজ। অল্প দূর যাওয়ার পরই Escopette অদৃশ্য হয়ে গেল।

উপরে অসীম নীলাকাশ নিম্নে অকূল সমুদ্র। এ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, জল ও আকাশ ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না, Blerio ভাবলেন Escopetteকে শেষ যেখানে তিনি যে মুখে যেতে দেখেছেন সেই দিক লক্ষ্য ক'রে গেলেই তিনি 'ডোভারে' পৌঁছুতে পারবেন। এই সময়টাই এই যাত্রার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাল। দিক ভুল হ'লে নিশ্চয়ই অকূল সমুদ্রে গিয়ে প্রাণ হারাতে হবে। Bleriot প্রচণ্ডবেগে জাহাজ চালিয়ে দিলেন। জাহাজের ইঞ্জিন অতি সুন্দরভাবে চলতে লাগল। ভয় আর কিছুই নয়—ভয় শুধু বিপথে গিয়ে না পড়েন। এইভাবে দশ মিনিট কেটে গেল, কিন্তু এ-ত দশ মিনিট নয়—এ যেন দীর্ঘ দশটি যুগ। কিন্তু ঐ সময় কেটে যাবার পর অবশেষে দূরে—বহুদূরে স্থল দৃষ্টিগোচর হ'ল। ধীরে ধীরে প্রশস্ত সমুদ্রতীর নজরে এল, কিন্তু আরও কিছু পরে Bleriot বুঝতে পারলেন যে, ডোভারের দিকে না গিয়ে তিনি Deal-এর দিকে চলে এসেছেন। কিন্তু তাঁর যাবার সঙ্কল্প ডোভারে, তাই তিনি ঘুরে ডোভারের দিকে চললেন। এইভাবে যাত্রারম্ভের প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ডোভারের দুর্গের পশ্চাতে 'নর্থ ফল মিডো'তে তিনি অবতরণ করলেন।

এই খবর যখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের লোকে জানল, তখন সমস্ত দেশে একটা হৈ-চৈ রৈ-রৈ পড়ে গেল। দেশের লোক যেন উত্তেজনায় পাগল হয়ে উঠল। ওঠার কথা বৈকি! সকলের মুখেই শুধু Bleriot-এর কথা, এই ব্যাপারে Lathamও তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে খবর পাঠালেন। লাথাম অবশ্য এর পরে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন না, পুরস্কারের আশায়ই যে তিনি এত বড় দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তা নয়, এর দুদিন পরেই তিনি আবার ডোভারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এবারও তিনি অকৃতকার্য্য হলেন সেই ইঞ্জিনের গোলমালে। তবে এবার তিনি ডোভারের খুব কাছাকাছি প্রায় দেড় মাইল দূরে থাকতে অবতরণ করতে বাধ্য হন।

এর এক বছর পরে ইংলণ্ডের কোন খবরের কাগজওয়ালা ঘোষণা করলেন যে, যে ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উড়ো-জাহাজে করে লণ্ডন থেকে ম্যাঞ্চেষ্টারে যেতে পারবে তাকে দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। ঘোষণার সর্ত্ত শুনে সাধারণে মনে করল এ বুঝি ঠাট্টা। কেননা সাধারণ মানুষ তখন কল্পনা করতেও পারেনি যে এই ১৮৩ মাইল পথ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেউ কোনদিন যেতে পারবে। তাই লোকে বলাবলি করতে লাগল যে, এ যেন ভগবানকে প্রলোভন দেখান। কিন্তু সকলেই বিস্মিত হ'ল যখন এই প্রতিযোগিতার জন্যও লোকের অভাব হ'ল না। ইংলণ্ড থেকে প্রতিযোগিতায় এই প্রথম অবতীর্ণ হলেন Claude-Grahame-White এবং ফরাসী দেশ থেকে এলেন Louis Paulhan.

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল Grahame একখানা 'বাইপ্লেন' নিয়ে ভোর ৫টার সময় রওনা হলেন। দু' ঘণ্টায় ৮৫ মাইল যাবার পর তিনি 'রাগবি'তে অবতরণ করেন। সেখানে এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হন। কিন্তু সেখান থেকে তিনি যেখানে যাবার মনন ক'রে রওনা হয়েছিলেন ইঞ্জিনের গণ্ডগোলের জন্য তিনি সেখানে না গিয়ে একশ সতের মাইল দূরে Lichfield-এ নামতে বাধ্য হন। সেই সময় আবহাওয়ার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। Lichfield-এ নামার পরও আবহাওয়ার কোন প্রকার উন্নতি দেখা গেল না। কাজেই ২৪ ঘণ্টায় সর্ত্ত পূরণ করার আশা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হ'ল। এর ওপর আবার আরও বিপত্তি ঘটল এই যে, ভূতলে অবস্থানকালেই অসাবধানতার জন্য জাহাজখানাও ঝড়ে বিনষ্ট হয়ে গেল। ভাঙা জাহাজখানা নিয়েই তিনি লণ্ডনে ছুটে চললেন। আশা যে মেরামত ক'রে আবার তিনি একবার চেষ্টা করেন।

ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল, Paulhan নামক এক ভদ্রলোকও ফরাসী দেশ থেকে এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার জন্য তাঁর বায়ুযান নিয়ে লণ্ডনে আসছেন। প্রতিযোগিতাটি আন্তর্জাতিক হবার ফলে লোকের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল, দলে দলে লোক ওড়ার পথে ভিড় করে দাঁড়াল। একখানা Speial train একটা শাদা পতাকা দিয়ে পথ দেখিয়ে চলল এবং Paulhan ২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় যাত্রা সুরু করলেন। কোন জায়গায় না থেমে তিনি একেবারে Lich-field-এ এসে উপস্থিত হলেন। তখনো গন্তব্যস্থলে থেকে তার দূরত্ব প্রায় ৬৫ মাইল, কিন্তু আগের রাস্তাটুকু অতিক্রম করতে তাঁর দুর্ভোগ কম হয়নি এবং একবার তিনি বিপদ থেকে ভাগ্যবলে অতি অল্পের জন্য রক্ষা পান। এই পথটুকু যেতে তাঁকে প্রতি মুহূর্ত্তে যুদ্ধ করে—হাঁ যুদ্ধ করেই—অগ্রসর হ'তে হয়েছে। ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, উপরের আকাশে প্রচণ্ড ঝড় বইছে, কিরূপ স্তরে পৌঁছুতে পারলে যে হাওয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, তা নির্দ্ধারণ করবার জন্য Paulhan-কে বহুবার ওঠা-নামা করতে হয়েছে, কিন্তু সুবিধাজনক স্তর কোথাও তিনি পান নি। এ যেন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের তেজের পরীক্ষা চলছে, সেই প্রচণ্ড শীতল হাওয়া সজোরে তাঁর চোখে-মুখে লেগে তাঁর সমস্ত শক্তি যেন জমাট করে দিতে চাইছিল। এই-ভাবে প্রায় বিশ মিনিটকাল ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হয়ে শর্ব্বরীর অন্ধকার নেমে আসতে

লাগল। এই অন্ধকারের মধ্যে Paulhan এক ভীষণ দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেলেন। 'লিচফিল্ডে' যাবার পূর্ব্বেই যখন অন্ধকার নেমে এল, তখনও দূর থেকে শহরের আলোগুলি দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু শহরে না গিয়ে নিকটেই কোন মাঠে অবতরণ করাই Paulhan মনস্থ করেন, এই উদ্দেশ্যে নামবার তে উপযুক্ত স্থান দেখে নেবার আশায় তিনি ভূতল থেকে ১৫০' ফুটের মধ্যে নেমে আসেন। অদূরেই একটা কারখানার চিমনী দেখা যাচ্ছিল, এমন সময় হায় হায় পেট্রোল ফুরিয়ে যাওয়ার জন্য Engine বন্ধ হয়ে গেল এবং জাহাজখানা পাকা ফলটির মত নীচে পড়তে লাগল। পশ্চাতেই অসংখ্য টেলিগ্রাফের তার চলে গেছে। তার নিজের কথায় বলতে হয়, "কি করব, সে কথা ভাববার অবসর কই ? মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি কর্ত্তব্য স্থির করে ঐ টেলিগ্রাফের তারকে অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করলাম এবং এমনভাবে দ্রুতগতিতে আমার জাহাজখানাকে ঘুরিয়ে দিলাম যে, সৌভাগ্যক্রমে সেই তারের জালে আমি ধরা পড়ে গেলাম।"

এদিকে গ্রাহামও সেইদিনই লণ্ডন থেকে অগ্রসর হচ্ছেন। দুর্ভাগ্যবশত Paulhan যখন 'লিচে' অবতরণ করেন, তার প্রায় পনর মিনিট পূর্ব্বেই তাঁকে London থেকে সাতান্ন মাইল দূরে Roade নামক স্থানে অবতরণ করতে হয়, কিন্তু গ্রাহামের জয়ী হবার এরূপ প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, তিনি তার পরদিন ভোর না হতেই রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় অন্ধকারেই আবার যাত্রা করলেন। অন্ধকারে এরোপ্লেন এ পর্য্যন্ত আর কেউ কখনো চালায় নি, কিন্তু পথ চিনবার আর কিছুই ছিল না। দূরের ষ্টেশনের আলো লক্ষ্য করে তিনি চালিয়ে যেতে লাগলেন। 'বাগবীর' নিকটে ভাগ্যক্রমে তিনি একখানা পার্শ্বেল ট্রেন দেখতে পান এবং তারই সাহায্যে ভোর না হওয়া পর্য্যন্ত দিকস্থির করেন, কিন্তু ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভাগ্যের পরিসমাপ্তি হল না, তখন আরম্ভ হল প্রবল বাতাস, কাজেই প্রত্যূষে প্রায় সাড়ে চারিটার সময় তিনি Polesworth নামক স্থানে অবতরণ করতে বাধ্য হন। এই সময় যদি গ্রাহাম জানতেন যে Paulhan একটু-আধটু কল-কব্জার দোষ শুধরে নিয়ে পাঁচ মিনিট মাত্র আগে রওনা হয়ে তার চাইতে বার মাইল অগ্রবর্ত্তী হয়ে আছেন, তা হলে বোধ হয়, তিনি এখানে নামতে চাইতেন না।

২৮শে এপ্রিল সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় Paulhan ম্যাঞ্চেষ্টার পৌঁছান, এই ১৮৩ মাইল যেতে তিনি আকাশে ছিলেন মোট চার ঘণ্টা দুই মিনিট। আর যদি যাত্রার সময় থেকে পৌঁছুবার সময় ধরা যায়, তবে ঠিক বার ঘণ্টায় তিনি এই পথ অতিক্রম করেন।

গ্রাহাম হারলেন, Paulhan জিতলেন। এই হারের জন্য ইংলণ্ডের লোক অত্যন্ত দুঃখিত হল সত্য, কিন্তু এতে তাদের মধ্যে যে উৎসাহের সৃষ্টি হল, তার মূল্যও নিতান্ত কম নয়। Paulhan জয়লাভের উপযুক্ত ছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই বিজয়বার্ত্তা যখন গ্রাহামের নিকট পৌঁছিল, তিনি সমবেত নরনারীকে সম্বোধন করে বললেন, "যে ব্যক্তি আজ এই পুরস্কার লাভ করলেন, তিনিই জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চালক, তাতে কোনই সন্দেহ নেই, তাঁর কাছে আমি শিক্ষানবীশ ছাড়া কিছুই নয়। জয় Paulhan-এর জয়।"

উড়ো-জাহাজের বিজয়-যাত্রার এই হল প্রাথমিক ইতিহাস।

এস আজ

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বের বুকে নিঃস্বরা কাঁদে আজ,
এখনো সুদূরে বসি' রবে মহারাজ!
ঘন আঁধিয়ারে ঢেকেছে পৃথিবী,
মেঘের আড়ালে লুকায়েছে রবি,
অট্ট-রবেতে গর্জ্জন করে বাজ।

কলকোলাহলে জেগেছে বুভুক্ষিতা,
ধূমায়িত আজ দৈন্যের শত চিতা;
ধিকি ধিকি জ্বলে শিখা লেলিহান,
এসেছে ছাপিয়া প্রলয়ের বান,
দীপ্ত আলোকে রাত্রি দীপান্বিতা।

আজ এস তুমি মৃত্যু-মহোৎসবে,
এস তুমি প্রভু সর্ব্বহারা এ ভবে;
কণ্ঠে তুলিয়া তোমার বিষাণ,
ফুকারিয়া দাও ভয়াল সে তান,
যে গান শুনিয়া বিশ্ব-জগৎ মৌন
হইয়া রবে।

ক্রমশঃ সী

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

(৬)

বিবাহের পরদিন।

তোরণদ্বারে মঙ্গল-কলস রক্ষিত। সকাল হইতে করুণ সুরে শানাই বাজিতেছে। ইভা তাহার আজন্ম পরিচিত সংসার, প্রিয়তম আত্মীয়স্বজন সকলকে ছাড়িয়া নূতন গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহার খুড়তুতো বোন রমলা ও কলেজের কয়েকটি বান্ধবী তাহাকে সাজাইবার ভার লইয়াছে। তাহারা একালের মেয়ে, মাথার খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া দীর্ঘ বেণী দুইদিকে দুলাইয়া দিল। বেনারসী পরাইতে কিছুতেই সম্মত হইল না তাহারা। ঘন নীল রঙের পাতলা সিল্কের শাড়ী পরাইল। বাছিয়া বাছিয়া খানকতক গয়না হাল্কা ধরণের পরাইয়া দিল। মাথার চুলে ঘোর রক্ত রঙের একটি গোলাপ পরাইয়া চোখে সুর্মা এবং কপালে টিপ দিতে সাজ শেষ হইল। ইভার মামী, মাসী, দিদিমা সকলেই বিবাহে আসিয়াছিলেন। দিদিমা সাজ দেখিয়া গালে হাত দিয়া কহিলেন, "এ কি কাণ্ড! এই বেঁকা সিঁথে আর এই লম্বা বিণুনী নিয়ে বিয়ের কনে যাবে শ্বশুরবাড়ী? তাহলে আর কিছু বাকী থাকবে না, তা কিন্তু এখন থেকে বলে রাখছি।" ইভা কিছু বলিল না, কিন্তু মুখ টিপিয়া হাসিল। ইহারা মনে করিয়াছে, তাহার পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী, না জানি কত অনুশাসন কত বাঁধা-বাঁধির ভিতর তাহাকে থাকিতে হইবে। কিন্তু মনে পড়িয়া যায় কাল রাত্রি-বেলার কথা। বাসরঘরের হুড়োহুড়ি গোলমাল চুকিয়া গেলে বেশী রাত্রে যখন সবাই চলিয়া গেল, তখন তিনি প্রথম পরিচয়ের লজ্জা-স্পন্দিত দুরু দুরু বক্ষের ভীতচকিত ভাবের মধ্যে কত কথা বলিলেন। কত গল্প করিলেন। একটি রাত্রির মধ্যে ইভা যেন তাঁহার কত আপন হইয়া গেছে। বছরখানেকের মধ্যেই তিনি সুদূর বিদেশে যাইবেন, সে সঙ্কল্পের কথাও বলিলেন। জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। যে মানুষের মন এত উদার তাহারই ঘর করিতে যাইতে বাঁকা সিঁথি কাটা চলিবে না, বেণী বাঁধা চলিবে না। বিশেষ একটা রঙের কাপড় পরিতেই হইবে, এমন সব কথা শুনিলে কাহার না হাসি পায়? ইভারও পাইল। রমলা তাহার হইয়া জবাব দিল। কহিল, "তুমি মিথ্যে কেন ভয় পাচ্ছ দিদিমা। তোমার নতুন কুটুম্বরা লোক খুব ভাল আর পাড়াগাঁয়ে বাড়ী হলেও খুব আজকালকার ধরণের। তারা খুব খুশী হবে। কিছু বলবে না।" দিদিমা বকিতে বকিতে চলিয়া গেলেন। সমাগত নারী-মণ্ডলীর মধ্যে কেহ ইভাকে দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাহার প্রসাধনের যাহারা এমন আর্টিষ্টিকভাবে পরিকল্পনা করিয়াছে তাহাদের সুখ্যাতি করিলেন অজস্র। অপর কেহ কেহ আবার নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, বিয়ের কনের এমন অপরূপ সাজ তাঁহারা কস্মিনকালেও দেখেন নাই। মাগো, এখনকার মেয়েগুলো কি বেহায়া কি ঢলানে। কালে কালে কতই না দেখিতে হইবে। ইভার শ্বশুরকে যাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাহার সাজানো দেখাইবার জন্য ডাকিয়া আনা হইল। তিনি আসিয়া কহিলেন, "বাঃ, এ যে চমৎকার! ঠিক যেন রাই-বিনোদিনী। তেমনই সোনার মত রং, তেমনই নীল শাড়ী তেমনই কালো ভুজঙ্গিনীর মত দুই বেণী। চোখে জল আর মুখে হাসি। আমাদের রাধা-গোবিন্দের মন্দিরে ঝুলনের সময় যে কীর্ত্তন হচ্ছিল তাতে যে রাধিকার রূপ-বর্ণনা ছিল, সে যে আমার চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে।" ইভা লজ্জিত হইল। রমলা আপন কৃতিত্বে যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করিল। কলেজের বন্ধু এলা আর রুবি খুশী হইলেও একটুখানি নাক সিঁটকাইয়া ভাবিল, বুড়ো বড় সেকেলে। রাই বিনোদিনী আবার কি উপমা! আর কিছু পেলেন না, তুললেন কীর্ত্তনের কথা!

ক্রমশ যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। এইরূপ নানা বিরুদ্ধ মত আলোচনা সমালোচনা কোলাহল বাদ্যভাণ্ডের মাঝে ইভা মোটরে চড়িয়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মনে মাঝে মাঝে একটুখানি ক্ষণিক ক্ষোভ জাগিতেছিল, তাহার শ্বশুর-বাড়ী যদি কলিকাতার কোন প্রাসাদোপম বাড়ীতে হইত, যদি কণিকা কিম্বা ইলার মত লক্ষ্ণৌ বা পাটনা হইত। তাহাকে এখন কোন একটা অখ্যাতনামা ষ্টেশনে নামিয়া আবার ঘোড়ারগাড়ী বা পাল্কী চড়িয়া ক'ক্রোশ যাইতে হইবে। দুর্ভোগ আর কি। সেখানকার লোকজনরা না জানি আবার কেমন। কিন্তু আবার পার্শ্বোপবিষ্ট স্বামীর কথা মনে পড়িতে তাঁহার সান্নিধ্যের প্রভাবে মনটা আনন্দে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল। জায়গা যেমনই হোক, সে জায়গার লোক কিন্তু খুব ভাল; অন্তত ইভার মতে। যে মোটরে তাহারা দুজনে যাইতেছিল সে গাড়ীতে চালক ছাড়া আর কেহ ছিল না। ইভার স্বামী শশাঙ্ক মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "কেমন লাগছে?"

ইভা কহিল, "তোমার?

"আমার তো এত ভাল লাগছে যে, চোখ ফেরাতে পারছিনে।

ইভা কহিল, "আমারও। এই এখনই কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে মনে হতে এই সব কতদিনকার দৃশ্য চেনা ঘর-বাড়ী রাস্তাও অদ্ভুত সুন্দর লাগছে।"

শশাঙ্ক কহিল, "আমার কিন্তু উল্টো। আমি যার পাশে বসবার সৌভাগ্য পেয়েছি তাকে কোনদিনই ছেড়ে দিতে পারবো না জেনেও তাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে।"

ইভা অস্ফুট স্বরে কহিল, "কেন ছেড়ে যাবে না। এই তো কাল রাত্রে বললে, বছরখানেকের মধ্যে বিলেত যাচ্ছ।"

ইতিমধ্যে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছে। বিপুল বিচিত্র জনতা, ট্রেনের তীক্ষ্ণ বাঁশী, কুলীদের দৌড়াদৌড়ি এ সমস্তই একটা সুন্দর অখণ্ড ছবির অংশ বলিয়া বোধ হইতেছিল ইভার কাছে। একজন ভিখারী ছিন্ন গাত্রবাস লইয়া করুণ সুরে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে, তাহাকেও আজ বিশেষ হতভাগ্য বা দয়ার পাত্র বলিয়া বোধ হইল না তাহার কাছে। সেও যেন এই নর্ণময় সুষমাময় ছবির একটা অংশ। তাহার জীবনের দুঃখ এমন কিছু বৃহৎ নয়, যাহাতে এই বিশ্ব-ব্যাপারের ছন্দভঙ্গ হইয়া যায়। শশাঙ্ক একটু দূরে ছিল, তাহার কাছে গিয়া সে কহিল, "ঐ ভিখারীটাকে কিছু দাওনা। আমার টাকা পয়সা তো সব বাক্সে আছে।"

শশাঙ্ক তাহার ব্যাগ খুলিয়া একটা টাকা বাহির করিয়া ভিখারীকে দিল। অপ্রত্যাশিত দান পাইয়া ভিখারীটার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শশাঙ্ক তাহার টাকার ব্যাগটা ইভার হাতে দিয়া কহিল, "এই নাও। তোমার টাকা আর আমার টাকা তো আলাদা নয়। আজ এই ষ্টেশনে এত লোকজনের মাঝে আর কিছু বললাম না। কিন্তু এ-কথাটাও তোমাকে বলে বোঝাতে হ'ল বলে আমি দুঃখিত।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেন আসিয়া পড়িল। ট্রেন কলিকাতা ছাড়িয়া কত মাঠ, কত নদী, কত প্রান্তর, অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। রাঙামাটির রাস্তা, ছোট ছোট খড়ের চালের বাড়ী, পদ্মপাতায় আস্তীর্ণ বিল, বাঙলাদেশের সুস্নিগ্ধ দৃশ্যপটের উপর কে যেন মায়ার অঞ্জন বুলাইয়া দিয়াছে। সে মায়া ফাল্গুনের উষ্ণ বাতাসে, সে মায়া নীল আকাশের অসীমতায়। ইভার সারা মন এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের রসে মায়াময় হইয়া উঠিয়াছে। কালো চোখের গভীর দৃষ্টিতে সেই মায়া আসন বিছাইয়াছে।

(৫)

প্রায় সন্ধ্যার দিকে ইভা শ্বশুরবাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল। পথশ্রমে ক্লান্ত সে। সেকালের জমিদারদের প্রথামত দোতলা বেশ বড় চক-মিলান বাড়ী। ইঁদারা, স্নানের ঘর, পূজার ঘর কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার সহিত এ বাড়ী তৈয়ারীর লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। কোন ঘরে রোদ যায় না। হাওয়া তেমন খেলে না। সেখানেও উৎসবের আয়োজন পূরামাত্রায় হইয়াছে। ইভার বাঁকা সিঁথি ও বিণুনী ঝুলাই-বার বহর দেখিয়া মেয়েরা হাসিয়া খুন। এখন তাহাদের এক মাসের মত আলোচনা চালাইবার সুযোগ জুটিল। শ্বশুর ও স্বামীর মুখে বড় বড় আদর্শবাদের কথা শুনিয়া ইভা সমস্ত দুঃখ ভুলিয়াছিল, কিন্তু এখন আবার তাহার সে দুঃখ চাড়া দিয়া উঠিল। কথায় আদর্শবাদ খাড়া করা এক জিনিষ আর পল্লীগ্রামের অন্তঃপুরে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের বস্তু। শশাঙ্ক ও কুমুদনাথ তাহাকে অন্তঃপুরের সীমান্ত অবধি আগাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন। তারপর সে একা যে দিকে চায় সেইদিকেই তাহার বিভীষিকা লাগে। একটি প্রৌঢ়া রমণী আগাইয়া আসিয়া খন্‌খনে আওয়াজে কহিলেন, "তোমার ঐ সেপ্টিপিন না কি বলে বাছা ওগুলো একবার খোল দিকি। খুলে মাথার কাপড়টা আরও টেনে দাও। ভাসুর সম্পর্কের কত লোক আসছে-যাচ্ছে। তাদের সামনে মাথার শান টেনে দিতে হবে।"

আর একজন বর্ষীয়সী মহিলা, মুখখানি বেশ স্নেহ-কোমল, নিকটে আসিয়া কহিলেন, "তার আর কি হয়েছে নিরু-ঠাকুরঝি, বিয়ের কনে। এই সময়েই তো সবাই একবার দেখবে শুনবে। এখন অত মাথায় ঘোমটা নাইবা হল। নিস্তারিণী ঠাকুরঝি কোলের ছেলেটাকে অনাবশ্যক একটা চড় বসাইয়া দিয়া ঝংকার দিলেন, "বাবা, বাবা ছেলেটো মরে না তো। পাঁচসিকের হরির-নুট দিই তাহলে। মুখপোড়া তখন থেকে জ্বালিয়ে খেলে।"

ছেলেটো তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে এক ঠেলা মারিয়া সরাইয়া দিয়া নিস্তারিণী কহিলেন, "তা তোমার বৌ সে তুমি বুঝবে বৌদি, কিসে ভাল হয় কিসে মন্দ হয়। কিন্তু তাও বলি বেঁকা সিঁথে কাটলে যে সোয়ামীর অকল্যাণ হয় সেটাও কি শিখিয়ে দিতে হবে?"

বর্ষীয়সী মহিলাটি নিকটস্থ একজন তরুণী ডাকিয়া কহিলেন, "যাওতো মা ইন্দু, নতুন বৌদিকে তোমাদের ভাল করে চুলটা বেঁধে দিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে এস।"

ইন্দুনাম্নী মেয়েটি উঠিয়া ইভার একখানা হাত ধরিয়া কহিল, "এস ভাই।" দ্বিতলের একখানি ঘরে লইয়া গিয়া সে তাহার মাথার কাপড় খুলিয়া দিয়া বেণী বাঁধিবার কলানৈপুণ্য দেখিতে লাগিল।

"চমৎকার বেঁধেছ-ভাই, কিন্তু এখানে ওসব চলবে না।"

ইভা চারিদিকে চাহিয়া নবাগত স্থান দেখিতেছিল। ইন্দু ওরফে ইন্দিরার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নেহাৎ মন্দ লাগিল না। বেশ সরল ও সপ্রতিভ মুখ। বয়সে তাহার চেয়ে দু'এক বছরের ছোটই হইবে বোধ করি। ইন্দিরার প্রশ্নে সে কহিল, "কি চলবে না?" "এই এমনই করে চুলবাঁধা। নিরু-পিসীমা দিদি-ঠাকুমা তখন থেকে কি না বকে বেড়াচ্ছে। অথচ দেখতে তো কিছু খারাপ নয়, তোমাকে তো বেশ লাগছে ভাই।"

ইভা বিরক্তি সত্ত্বেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "তা এখন আমাকে কি করতে হবে? সিঁথেটা বদলিয়ে ফেলে সোজা সিঁথে কেটে টেনেটুনে একটা খোঁপা বাঁধতে হবে। এই তো? না আর কিছু?"

"আর একটা বেশ ঘোরালো লালরঙের কাপড় পর। পায়ে তোড়া........"

ইভা উত্যক্ত অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, "আর যাই বল ঐ মল পরে ঝম্ ঝম্ করে আমি সঙ্ সাজতে পারব না। কি সব কাপড়-টাপড় ধার করে আনবে আন।—" এই বলিয়া একটানে সে নিজের দীর্ঘ বেণী খুলিয়া ফেলিয়া নির্ম্মম নির্দ্দয় হাতে চুলগুলো জোরে জোরে আঁচড়াইতে লাগিল।

ইন্দিরার নির্দ্দেশ মত সজ্জা শেষ করিলে ইন্দিরা তাহার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তোমাকে আধুনিক সাজেও যেমন মানায় সেকেলে সাজেও তেমনই ভাল লাগে। ওদের রাগারাগি করা মিছে ভাই। যারা সুন্দর তারা সকল সাজে সব অবস্থাতেই সুন্দর।"

ইভা কহিল, "এই গাঁয়ে রাত্রিদিন বাস করেও তোমার মন যে এখনও দার্শনিক রয়েছে তাতে এত আশ্চর্য্য হচ্ছি। যাক্ এবার কি করতে হবে বল?"

ইন্দিরা বলিল, "এখানে এবারে তোমাকেও তো রাত্রিদিন থাকতে হবে ভাই। দার্শনিক মন কাকে বলে ওসব জানি না। যা মনে হয় রেখে ঢেকে বলতে পারিনে। মুখের উপর বলে ফেলি। কিছু মনে ক'র না যেন। চল এবার নীচে যাই। এখনও দুধে-আলতা বাকী, দুধের ঘরে দুধ উথলে উঠবে সেখানেও তোমাকে চাই। দেরী হয়ে গেলে আবার কত কথা উঠতে পারে। কাল যা কান্ডটা হয়ে গেল।" ইভা নিকটস্থ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "যাব এখনই এত ব্যস্ত কি। কি কান্ড হয়ে গেল না ভাই!"

ইন্দিরা বলিতে লাগিল, "কাল সধবাদের চিঁড়ে খাওয়ানো ছিল।"

"সে আবার কি?"......

তাহার এই বিষম অজ্ঞতায় ইন্দু হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "জাননা?. বিয়ের দিনে গাঁয়ের সমস্ত সধবাদের ডেকে এনে মাথায় সিঁদুর ঠেকিয়ে দিতে হয়, আর তাদের নানা রকম ফল মিষ্টি চিঁড়ে দই খাওয়াতে হয়। এখন হয়েছে কি, ও-পাড়ার বোসেদের বড় মেয়ে মান্নার সঙ্গে রায়েদের মেয়ে তিনুর খুব ঝগড়া হয়ে গেছে। সে কি ঝগড়া, হাতাহাতি হবার যোগাড়। মান্না ইচ্ছে করেই বোধ হয় তিনুকে সিঁদুর ঠেকিয়ে দেয়নি। যাক্ সে তখন চুকে-বুকে গেল। তারপরে যেই মেয়েদের পাতা পড়েছে। পরিবেশন সুরু হয়েছে। মেয়েরা একজন দুজন করে বসতে আরম্ভ করেছে অমনই রায়েদের পিসীমা রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে এসে পড়লেন, তিনুকে সিঁদুর ঠেকিয়ে দেয় নাই, এতে নাকি ওর স্বামীর অমঙ্গল হতে পারে। এমন কাজ যারা করে তাদের আবার আদর করে ডেকে এনে নেমন্তন্ন খাওয়ানো। এ শুধু তাঁদের অপমান করবার একটা নতুন ফন্দী। পিসীমা কোঁদল করতে পাকা। মান্নার মা আবার তাঁর চেয়েও এককাঠি সরেস। এমন ঝগড়া চেঁচামেচি গালি-গালাজ সুরু হল যে আমি তো ভয়ে কাঠ। শেষে জ্যেঠাইমা মানে তোমার শাশুড়ী হাতে পায়ে ধরে সবাইকে ঠাণ্ডা করলেন কোনক্রমে।"

ইভা কহিল, "সে আমি জানি। বইয়ে পড়েছি পাড়াগাঁয়ে রাতদিন এমনই তুচ্ছ কারণে ঝগড়া-ঝাঁটি, কোঁদল লেগেই রয়েছে। ওরা জানে বিশ্বসংসারের মধ্যে শুধু খেতে আর ঝগড়া করতে। কিন্তু তুমি কে ভাই? তোমার পরিচয় তো এখনও পেলাম না। যাই হোক, তোমার সঙ্গে ভাব হয়ে তাও দুটো কথা বলে বাঁচা গেল। নইলে চারিদিকে ভীমরুলের চাকের মত যা সব মুখ।"

ইন্দু হাসিয়া উঠিল তাহার বলিবার ধরণে। কহিল, "শুধু বইয়ে পড়েছ বলেই জান, তা বললে আর তো চলবে না মশায়। এবারে নিজের চোখে সব দেখতে হবে জানতে হবে। আমি কে তা জাননা বুঝি এখনও? আমি তোমার ননদ হই ভাই। যাকে বলে, ননদিনী রায়-বাঘিনী! শশাঙ্কদা আমার জ্যেঠতুত দাদা। আমার আবার এই গাঁয়েই শ্বশুরবাড়ী হয়েছে। এজন্মে আর কখনো ট্রেনের মুখ দেখতে পেলাম না ভাই।"

ইভা অবাক হইয়া এই সরলা পল্লীবালার মুখের দিকে চাহিল, "সত্যি তুমি কখনো ট্রেন দেখনি?"

"বারে, কখন আবার দেখলাম! সেই ওবছর রাস-পূর্ণিমার সময় একবার নবদ্বীপ যাওয়ার কথা হয়েছিল বটে কিন্তু শেষ অবধি যাওয়া ঘটে উঠলো না। আমারও আর রেলে চড়া হল না।"

একজন ঝি দুয়ারের কাছে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "ওমা, এখানে বসে দুজনে গল্প করতে লেগেছ! এদিকে নীচে যা হবার তা হইছে। হেই দিদিমণি এ তোমাদের কেমন ধারা আক্কেল গো! চল চল। মা-ঠাকরুণ অবধি বকতে লেগেছেন।" ইন্দু ইভাকে লইয়া ত্বরিতপদে নীচে নামিয়া চলিল।

নীচে ওধারের দালানে তখন অত্যন্ত একটা সোরগোল উঠিয়াছে। গ্যাসের বাতি জ্বলিতেছে, স্থানটা আলোকময়। নিমন্ত্রিতা মেয়েদের পাতা পড়িয়াছে। মেয়েরা আসনে বসিয়াছে মাত্র, কিন্তু সবাই মজা দেখিতেছে। একটি বছর পঞ্চাশেকের মহিলা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে হাত পা নাড়িয়া কি বুঝাইতে-ছেন। তাঁহার পাশে আর একটি আটাশ উনত্রিশ বছরের মেয়ে দাঁড়াইয়া। তাহার পরণে ঘোর সবুজ রঙের জরির পাড় বসানো অত্যন্ত মূল্যবান এক শাড়ী। সারা গায়ে গহনা ধরে না। ইভা চুপি চুপি কহিল, "ব্যাপার কি ভাই ইন্দু? অত গোল কিসের? আমার বাঁকা সিঁথের কাহিনী কি এখানেও রাষ্ট্র হয়ে গেছে নাকি?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল "তা নয়। কিন্তু কি একটা হয়েছে। দাঁড়াও আমি দেখে আসি। তুমি ততক্ষণ ঐ সামনের বড় ঘরটায় বস।"

বড় ঘরের মেজেতে মখমলের বহুমূল্য গালিচা বিছানো। উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ আগে এখানেই মেয়েদের আসর বসিয়াছিল। খাওয়ানোর ঠাঁই হওয়ায় সকলেই চলিয়া গিয়াছে। এখন আর সেখানে কেহ নাই। একলা বসিয়া ইভার কি রকম অদ্ভুত লাগিতেছিল। এইতো মাত্র কয়েক ঘণ্টা এখানে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে অজানা জগতের কত অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়িতেছে। না জানি এখানকার জীবনধারা কেমন করিয়া বহিয়া চলে।

সামনের বারান্দাটা অন্ধকার ছিল, কে একজন তথায় উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল। এখন কাছে আসিয়া বসিল। একটি বারো-তের বছরের মেয়ে। মাথার চুলগুলি তুলিয়া সামনেটা আঁট করিয়া পিছনে ভীমরুলের চাকের মত প্রকাণ্ড এক খোঁপা তাহাতে গোটা ত্রিশ চল্লিশ নানা রঙের ও নানা আকারের কাঁটা ও বেল কুঁড়ি গোঁজা রহিয়াছে। জরির ফিতা দিয়া চুল জড়ানো। একটা ঘোর রঙের বেনারসী কোমরে বেল্ট আঁটিয়া পরিয়াছে। মেয়েটি কাছে আসিয়া ইভার কানের দুল, হাতের চুড়ি নাড়িয়া নাড়িয়া দেখিতে লাগিল। সহসা প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁগো, তুমি নাকি মেমসাহেবদের ইস্কুলে পড়তে? তাদের মত ইংরিজী করে কথা বলতে পার?" ইভার অত্যন্ত হাসি পাইল। কিন্তু হাসিয়া ফেলিবার পূর্ব্বেই ইন্দিরা আসিয়া হাজির। সে আসিয়া তাড়া দিয়া বলিল, "চল ভাই ইভা। তোমাকে আজ সবারই সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেতে হয়। তোমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করে আছেন।"

ইভা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কি জন্যে অত গোলমাল হচ্ছিল? ঝগড়া মিটলো?"

"হ্যাঁ, মিটেছে একরকম। ঐ যে যিনি চীৎকার করছিলেন, তাঁর মেয়েকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল কিন্তু ডাকতে যেতে দেরী হয়। তাই তিনি বকাবকি করছিলেন। নাও, এখন চল।"

ইভা অস্ফুট স্বরে যাইতে যাইতে কহিল, "এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত গোলমাল হচ্ছিল? আশ্চর্য্য!"

জরির ফিতা দেওয়া প্রকাণ্ড খোঁপা বাঁধা মেয়েটিও পিছনে পিছনে চলিল। ইভা তাহাদেরই মত দিব্য সহজ সরল বাঙলায় কথা কহিল দেখিয়া সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। ইহার চেয়ে বড় রকম একটা কিছু সে আশা করিয়াছিল।

(ক্রমশ)

চিরন্তন

(কথিকা)

কুমারী রাণী দাশগুপ্তা

শহরের সীমারেখা ছাড়িয়ে ছোট্ট পল্লীখানি। বর্ষার প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে—যতদূর নজরে পড়ে কেবল সবুজ আর সবুজ। পল্লীশ্রী সেখানে সবুজ আঁচলখানি বিছিয়ে ধরেছে যেন কঠোর বাস্তবতায় সকল পঙ্কিলতা আচ্ছাদিত করে দিতে। সধবার সীমন্তের সিঁদুর রেখার মত সেই নিবিড় শ্যামলিমার বুক চিরে এক ফালি মেঠো পথ এঁকেবেঁকে গিয়ে মিলেছে একটু দূরে ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা একটি পুকুরে।

পুকুরের যাতায়াতের বন-বনানীতে ঢাকা রাস্তাটির ধারে ধারে কয়েকটি বড় বড় বট অশ্বত্থ, পলাশ ইত্যাদি গাছ। সেই মেঠো পথ বেয়ে কলসী কাঁখে কেমন আনমনাভাবে আসছে একটি কিশোরী। পিঠ ছেয়ে এলিয়ে পড়েছে তার সমস্ত কোঁকড়া চুল গোছায় গোছায়। কয়েক গুচ্ছ অবিনাস্ত হ'য়ে এসে পড়েছে তার টোল খাওয়া কপোলের উপর। এই মাত্র সে স্নান করে ফিরছে। কাঁধের উপর রাখা রয়েছে নিংড়ানো গামছা, কাপড়।

সবে সূর্য্যদেব দিগন্ত রেখার উপরে দেখা দিয়েছেন। গাছের মাথায় মাথায় হাল্কা সোনালী রোদ পড়ে শিশির-সিক্ত পাতাগুলো চিক্‌চিক্ করছে। চারিদিকে আলো-ছায়ার লুকোচুরি। গাছের তলা দিয়ে আসবার সময় কিশোরীর মুখের উপর মাঝে মাঝে আচমকা এসে পড়ছে এক এক ঝলক রোদ। আর তার সুন্দর মুখখানিকে করে তুলছে আরও সুন্দর।

কিশোরীর চোখে-মুখে কৌতূহলের ছাপ। যেন কাকে খুঁজছে। এরই মাঝে অজানিতে কখন বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে—হুঁস ফিরে এসে মুখখানা যেন একটু ম্লান হ'য়ে গেল।

মাটির ঘর-বাড়ী, কিন্তু বেশ বড়। উঠানের মাঝে ধানের মরাই। বাইরে থেকে দেখলে, অবস্থা বেশ স্বচ্ছল বলেই মনে হয়।

কিশোরী একটি ঘরে ঢুকে কাঁখের কলসীটি নামিয়ে রাখতেই পাশের ঘর থেকে একজন প্রৌঢ়া বললেন—"আরতি একটু আগে প্রণব এসেছিলরে, এখুনি চলে গেল।"

আরতি চুপ ক'রে রইল। অভিমানে ওর মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। চোখ দুটি অকারণে ছলছল ক'রে উঠল।

প্রণব এই গ্রামেরই একজন মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহস্থের একমাত্র পুত্র। কিছুদিন হ'ল কলকাতার কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে। ছুটিতে নিজ শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত গ্রামখানিতে ফিরে এসেছে আকুল এক আগ্রহ নিয়ে—নগ্ন পল্লীশোভার অনাড়ম্বর প্রশান্তিতে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে।

প্রণবের শৈশব কেটেছে আরতির সাহচর্য্যে খেলায়, পড়ায়, হুটোপাটিতে। সারা বাল্যকাল ওদের কেটেছে পরস্পরের মোহময় ছায়ায়।

প্রণব কলকাতা থেকে ফিরে এসেছে সেদিন। রাত্রিতে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার উপর এলিয়ে দিয়েছে সমস্ত দিনের ক্লান্ত দেহখানি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। শুনতে পেল, মা বাবাকে বলছে, "প্রণবের সঙ্গে আরতির বিয়ে দিলে দুটিতে বেশ মানাবে। ছোট বেলা থেকে একসঙ্গে খেলেছে।" বাবাও সে কথায় সায় দিলেন। খুশীতে প্রণবের মনটা ভরে উঠল।

বাবা বললেন,—"এই ছুটিতেই হোক্, আবার দে[illegible] কেন? শুভকাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়াই ভাল। কাল সক[illegible] ওদের বাড়ী খবর পাঠাও। মেয়ে ত আমাদের দেখা-ই।"

সকাল বেলা আরতি যখন জল আনতে গেল প্রণবদে[illegible] বাড়ীর পথে, তখন আরতি এই খবরটুকু শুনতে পেয়েছিল এবং প্রণবকে কথাটুকু জানাবার জন্যেই বুক ভরা আশা নিয়ে ছুটে গিয়েছিল।

আরতি জানতো কাল প্রণব এসেছে। তাই ও আশা করে ছিল যে, আজ নিশ্চয় পুকুর পাড়ের ওদের প্রিয় বকুল-গাছটির তলায় দেখতে পাবে প্রণব ওর জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে; কিন্তু যখন দেখতে পেল না প্রণবকে, তখন অভি-মানে ওর বুকের ভেতরটা গুমরে উঠলো।

বিকেল বেলা। আরতি আবার পুকুর ঘাটে গিয়েছে জল আনতে। দূরে থেকেই দেখতে পেল, প্রণব চুপ করে পুকুরের জলের দিকে অপলকে চোখ মেলে ধরে বসে আছে। একবার মুখ তুলেও তাকালে না প্রণব তার দিকে। আরতি ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মুখখানি কালো করে গিয়ে নিঃশব্দে কাঁখের ঘড়াটা ডুবিয়ে জল তুলেই আবার তেমনি নির্ব্বাক গোঁ ধরে ফিরে যাচ্ছিল বাড়ী। হঠাৎ পায়ে একটা পাথরে হোঁচট খেতেই আরতি উঃ বলে একটা করুণ অস্ফুট আর্ত্তনাদ করলো।

প্রণব ফিরে চেয়ে আরতির দুর্দ্দশা দেখে একটু মুচকি হেসে বললো, "আমায় না জানিয়ে চলে যাচ্ছিলি কিনা, তাই ভগবান তোকে এই ব্যথাটুকু দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, এ বান্দাও নেহাৎ তুচ্ছ নয়।"

ওঃ—বলেই আরতি আবার অতি কষ্টে উদ্‌গত হাসি চেপে গর্ব্বের ভাণে চলে যাচ্ছিল। প্রণব উঠে এসেই ওর ডান হাত-খানি চেপে ধরলো। বললো—"অত রাগ করতে নেই, শোন! একটা সুখবর বলি।"

আরতি মনে মনে হাসলো, সুখবরটা তার আর জানতে বাকি নেই, সে কথা মনে পড়তেই আরতি লজ্জায় রাঙ্গা হ'য়ে উঠলো। তবু এড়াবার জন্যে বললো—"যাও, হাত ছাড়। আমি জানি।"

প্রণব বললো,—ওঃ, তুই শুনেছিস্? যাক্, তবে আর আমায় কষ্ট করে বলতে হ'ল না। যাক্ শোন্—আজ থেকে তোকে আর 'তুই' বলবো না, 'তুমি' বলবো—কি বলিস্? চল্ তোকে একটু এগিয়ে দিই।' বলেই তেমনি হাত ধরাধরি করেই তারা দুজনে বাড়ীর পথে অগ্রসর হ'ল। সূর্য্যদেব তখন পশ্চিমের কোলে ঢলে পড়েছেন। পশ্চিম কোলে তখন চলেছে ফাগের খেলা। সূর্য্যের স্তিমিত রশ্মি দেবতার আশিস্ বয়ে এনে পুলকস্পন্দিত দুটি কিশোর-কিশোরীর শিরে বর্ষণ করতে লাগলো।

তস্কর

(গল্প)

শ্রীসুনীল ঘোষ

শীতের রাত। তারই প্রকোপে সারা শহর নিঝুম, নিস্তব্ধ। কুণ্ডলী পাকানো কুয়াশা রাস্তায় জমে আছে,—তারই আঘাতে পথের দুধারের আলোর সারি ঝাপসা হ'য়ে গেছে। একটু দূরের লোককে ভাল ক'রে দেখা যায় না।

কার্জন পার্কের বেঞ্চিগুলো প্রায় খালি। ফুলগাছের চারা আর ঝোপ-ঝাড়ের মাথায় শীতের কুয়াশা ঝুরঝুর ক'রে ঝরছে, বাতাস যেন বরফে ভেজা। দেহের অনাবৃত অংশে তা [illegible] মানুষকে হিম-শীতল ক'রে দিচ্ছে।

[illegible]রেকটি বেঞ্চি থেকে কেউ উঠে গুটি গুটি রাস্তার পথ ধ'রেছেন, কেউ বা উঠি উঠি ক'রেও উঠতে পারছেন না কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরস্পরের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের উঠতে হয়। লোক চলাচল ক'মে এসেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ; শুধু ট্রাম ও বাসের একঘেয়ে শব্দ দূর থেকে অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

দুটো একটা পাগল নিজের খেয়ালে পার্কের মধ্যে ঢুকে প'ড়েছে। তাদের নগ্নদেহ দেখলে বোঝা যায় শীতের প্রকোপেও তাদের মাথার গোলমাল মেটেনি। অযথা চীৎকার ক'রে কেউ বা হেসে ওঠে—কেউ বা ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ায়, পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আবার খুশীমত কিছুপরে উল্টো দিকে ফেরে।

একটা বেঞ্চে তখনও দুজন নিশ্চিন্তে এবং পরম আরামে বিশ্রাম করছিলেন। দুজনেই প্রৌঢ়—বড় জোর কয়েক বছরের তফাৎ হতে পারে দুজনের মধ্যে। একজন কড়া চুরুট ধরিয়ে নীরবে ধূমপান করছেন অপরজন নির্ব্বিকারের মত সামনের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। দুজনেই বসেছেন পাশাপাশি তবু কত পর!

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর দ্বিতীয় প্রৌঢ় গুন্‌গুন্‌ ক'রে একখানা রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত ধরলেন। প্রথম প্রৌঢ় চুরুট টানতে ভুলে যান। চোখ বুজে বড় সমঝদারের মত হাঁটুর উপর বাঁ হাতে মৃদু তাল দিতে থাকেন।

গান শেষ হ'তে প্রথম প্রৌঢ় উঠে দাঁড়ালেন এবং কম্ফটার বেশ ক'রে গলায় এঁটে শালখানি গায়ের ওপর টেনে দিলেন এবং ষ্টেশনারী দোকান থেকে কেনা জিনিষগুলো পকেটে পুরে গুটি গুটি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'লেন।

কিছুক্ষণ এইভাবে গেল। একটি যুবক প্রৌঢ়ের সামনে এসে দাঁড়াল এবং ইতস্তত ক'রে প্রৌঢ়টির পাশে গিয়ে ব'সল। তার গায়ে ছিটের একটা ময়লা হাফ-সার্ট এবং তার ওপর একটা শত ছিন্ন কোট। পরণে অপরিচ্ছন্ন একটা ছেঁড়া কাপড়,—খালি পা। চুলগুলো রুক্ষ। কিন্তু মুখে তার কোমল কমনীয়তা। একটু পরে যুবক ধীরে ধীরে বললে, আমায় দু আনা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন?

প্রৌঢ় মুখ তুলে তার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বললেন, কেন?

যুবক কম্পিতস্বরে বললে, পার্ক সার্কাসের ওধারে আমি থাকি। একটা সাবান কিনবার পর দেখি আমার কাছে মোটে গোটা দুই পয়সা রয়েছে। রাত্রে খাবার পয়সা বা সেখানে ফেরবার পয়সা এতে হচ্ছে না সেইজন্যে কিছু সাহায্য চাইছি।

প্রৌঢ় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে সেখান থেকে তার দারিদ্র্যের চিহ্নটুকু আবিষ্কার করবার চেষ্টা করলেন। কিছু পরে তিনি হঠাৎ বললেন, কই দেখি কেমন সাবান কিনেছ! যুবক যেন তাঁর এই কথায় বেশ ভয় পেল এবং কিছুক্ষণ ছেঁড়া জামার পকেটগুলো তল্লাস ক'রে মুখ নীচু ক'রে রইল এবং ধীরে ধীরে মুখ চূণ ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেল।

প্রৌঢ় মনে মনে প্রথমটা হাসলেন পরে ভাবলেন, আজকালকার ভিখারীগুলো ভিক্ষে করবার জন্যে মাথা খাটিয়ে কত রকম মতলবই না বার করছে! উঃ এই সব শয়তান ভিখারী থাকতে দেশের উন্নতি নেই, সমাজের উন্নতি নেই। এখুনি পয়সা পেলে হয়ত ছুটে গিয়ে গাঁজার ক'লকে নিয়ে বস্‌ত!

সমাজের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির কথা ভাবতে ভাবতে প্রৌঢ় উঠে দাঁড়ালেন এবং জুতা পরতে গিয়ে পায়ে কি একটা ঠেক্‌ল। নীচু হ'য়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ভাল ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন সেটা একটা কাপড় কাচা সাবানের মোড়ক। মনে ভাবলেন, এইমাত্র ভিখারীটা সাবানটা এইখানেই হারিয়ে ফেলে কি বিপদেই না পড়েছে, সেই সঙ্গে আমার কাছে একটা মিথ্যাবাদী ব'নে গেছে। যাই হোক্‌ ছোক্‌রা বোধহয় বেশী দূর এগোয়নি। প্রৌঢ় ঘুরে দাঁড়ালেন এবং অদূরে তারই অলস মূর্ত্তি দেখে তাকে চেঁচিয়ে ডাকলেন। যুবক ঘুরে দাঁড়াল এবং অবশেষে প্রৌঢ়ের কাছে এল। দোষীর মত প্রৌঢ় বললেন, ওহে, তোমার সাবানটা এইখানেই পড়েছিল। কোনও রকমে হয়ত পকেট থেকে প'ড়ে গিয়ে থাকবে। কথা কয়টি বলে প্রৌঢ় সাবানটা তার হাতে দিলেন এবং পকেট থেকে একটা দোয়ানি বের ক'রে তার হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও দোয়ানি—আজকের মত তোমার খাওয়া চল্‌বে।

যুবক হাত বাড়াল। সাবান ও দোয়ানিটা নেবার সময় তার হাত যেন অল্প কেঁপে উঠল। কোনও রকমে সাবানটা পকেটে পুরে যুবক হন্‌হন্‌ ক'রে এগিয়ে চলল এবং একসময় তার মূর্ত্তি কুয়াশার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দু'এক পা এগোতেই আগেকার প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি হন্তদন্ত হ'য়ে সেখানে এলেন এবং বেঞ্চির আশে পাশে কি খুঁজতে লাগলেন। জিনিষটা খুঁজে না পাওয়ায় তিনি প্রৌঢ়কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো এখানে ছিলেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ ছিলাম।

আমার একটা সাবান এখানে প'ড়ে গেছে, দেখেছেন কি?

সাবান? বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে প্রৌঢ় বললেন, হ্যাঁ দেখেছি।

ভদ্রলোক আর একবার ভাল ক'রে খোঁজ ক'রে বললেন, কই দেখছি না তো!

প্রৌঢ় বললেন, সে আর পাবেন না। এইমাত্র একটা চোর সেটা নিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আমার একটা দোয়ানিও!

ধর্ম্মরাজ পূজা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

(২)

আমাদের গ্রামে তিনটি ধর্ম্মরাজপূজো পাইতেন। একটির নাম বুদ্ধ রায় বা বুড়ো রায়, অন্যটি সুন্দর রায় বা সিন্দু রায়। আর একটির নাম কালুবীর। কালুবীর ডোমদের ঠাকুর, একজন ধরমপণ্ডিত তাঁহার দেয়াশী ছিলেন। কালুবীর আছেন, কিন্তু পণ্ডিতের বংশধর না থাকায় পূজো লোপ পাইয়াছে। সুন্দর রায়ের দেয়াশী জাতিতে কলু। শুঁড়ি জাতি প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। বুড়ো রায় ধর্ম্মরাজের একটা ইতিহাস আছে।

গ্রামের ভট্টাচার্য্য বংশ বহুদিনের পুরাতন। বাড়ীতে চতুষ্পাঠী ছিল, বহু পণ্ডিত এই বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইঁহারা পৌরোহিত্য করিতেন। শাক্ত এবং বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণই ইঁহাদের যজমান ছিলেন। যজমান বাড়ীতে ইঁহারা দুর্গোৎসবে মন্ত্র পড়াইতেন, সুতরাং বলিদানে আপত্তি ছিল না। কিন্তু ইঁহারা শ্রীশ্রীরাধা মদনগোপাল বিগ্রহের উপাসক। চারি মূর্ত্তি শালগ্রামসহ এই যুগল বিগ্রহ আজিও ইঁহাদের বংশধরগণের নিকট পূজো পাইতেছেন। সাধারণত দেখিতে পাই অদ্বৈত বংশীয়গণ অথবা অদ্বৈত পরিবারভুক্ত শিষ্যস্থানীয় ব্রাহ্মণগণই রাধামদনগোপাল বিগ্রহের পূজো করেন। ভট্টাচার্য্যগণ কিন্তু কাশীশ্বর পরিবারভুক্ত। শ্রীচৈতন্য পার্শ্বদ কাশীশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য-পরম্পরা কাশীশ্বর পরিবার নামে পরিচিত। আশ্চর্য্যের বিষয় গ্রামের বুড়ো রায় ধর্ম্মরাজ এই ভট্টাচার্য্য বংশের প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ আছে—প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই ভট্টাচার্য্য বংশের কোন প্রবীণ পণ্ডিত গ্রামের অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণস্থিত কোপাই নদীর তীর হইতে প্রতিদিন প্রভাতে তৃণ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। কোপাই-এর তীরবর্ত্তী একটি স্থানের নাম বিশালপুর। বহু পূর্ব্বে সেখানে গ্রাম ছিল এবং এখন হইতে দুইশত বৎসর পূর্ব্বেই সেস্থান বসতিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। বিশালপুরের একাংশের নাম ক্ষুদ্র বেলতলা। ভট্টাচার্য্য তৃণ সংগ্রহ করিয়া এই বেলতলায় বিশ্রাম করিতেন এবং মাঝে মাঝে ঘুমাইয়া পড়িতেন। একদিন বার্দ্ধক্যবশত "ঘাসের বোঝা" মাথায় তুলিতে না পারিয়া এদিক্ ওদিক্ লোক খুঁজিতেছেন, এমন সময় তাঁহারই সমবয়স্ক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বোঝাটি তাঁহার মাথায় তুলিয়া দিলেন। ভট্টাচার্য্য বাড়ী ফিরিয়া ঘাসের বোঝা নামাইয়াই বিশ্রাম করিতে গিয়া তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিলেন, সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিতেছেন,—"আমি বুড়ো রায় ধর্ম্মরাজ। আমি তোমার ঘাসের ঝুড়িতে রহিয়াছি। বিশালপুরে বহুদিন আমার পূজো হয় নাই, তুমি আমার পূজো কর।" ভট্টাচার্য্য উঠিয়া ঝুড়ি হইতে ঘাসগুলি সরাইয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে ধর্ম্মরাজ রহিয়াছেন। ধর্ম্মরাজকে তিনি নিজ বাসগৃহের নিকটস্থিত এক তমালতলার ঝোপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং মদনগোপাল বিগ্রহ পূজোর সঙ্গে নিত্য পূজোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ভট্টাচার্য্য পরিবারে যাঁহার যেদিন মদনগোপাল পূজোর পালা পড়িত, তিনি সেই সঙ্গে ধর্ম্মরাজ পূজোর পালাও গ্রহণ করিতেন। আতপ তণ্ডুল এবং মিষ্টান্ন দিয়া নিত্য পূজো হয়, কিন্তু মদনগোপাল বিগ্রহের মত ধর্ম্মরাজের মধ্যাহ্নভোগ বা শীতল ভোগের কোন ব্যবস্থা নাই। আজিও ভট্টাচার্য্য পরিবারের উত্তরাধিকারিগণ বুড়ো রায়ের পূজো করেন।

ভট্টাচার্য্যগণ বুড়ো রায়ের নিত্য পূজো করিতেন, কিন্তু বাৎসরিক পূজোর কয়দিন একজন শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণের উপর ধর্ম্মরাজের পূজোর ভার অর্পিত থাকিত। ভক্তদের গলায় উত্তরী দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য তিনিই করিতেন। পূজোর দিন গ্রামবাসিগণ যে চাউল বা পয়সা বা মিষ্টান্ন ধর্ম্মরাজের উদ্দেশ্যে দিয়া যাইত, সে সমস্তই তিনিই লইয়া যাইতেন। পূজো উপলক্ষে গ্রামবাসী এবং ভক্তদের নিকট হইতে তাঁহার প্রাপ্য বড় কম হইত না। এই প্রাপ্য অপরকে দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি লাভে বা কিসের লোভে ধর্ম্মরাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন জানি না। সারা বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন নিজের বাড়ী হইতে এক মুষ্টি আতপ ও একটু গুড় বা দুইখানি বাতাসা জোগান দেওয়াও ত কম কথা নহে। আজিও সেই প্রথা চলিয়া আসিতেছে; বাৎসরিক পূজোর প্রাপ্য অপরে পায়। নিত্য পূজো ভট্টাচার্য্য বংশীয়গণ করেন। আমার মনে হয় গ্রামে জনসাধারণের কোন গ্রাম-দেবতা ছিল না। মদন-গোপাল বিগ্রহ দিয়া তিনি হাড়ি ডোম মুচি বাগদীদের হৃদয় জয় করিতে পারেন নাই, তাহাদের মনে স্থান করিয়া লইতে পারেন নাই। তাই বিশালপুরে ধর্ম্মশিলা পাইয়া গ্রামের আপামর সাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপনের জন্যই তিনি অত ঝঞ্ঝাট সহিয়াও সেই শিলাকে গ্রামদেবতারূপে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ময়ূরভট্ট বুড়ো রায় ধর্ম্মরাজের লক্ষণ বলিতেছেন—

> বুদ্ধরায় ধর্ম্ম চিহ্ন শুন বাছাধন।
> সুরধুনী সরস্বতী আছয়ে স্থাপন॥
> কমঠ আকৃতি তার বাম ভাগে নাগ।
> সপ্তদল পদ্মাসন অঙ্গ চারি ভাগ॥

বুড়োরায়ের নাগটি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। একটি ঘোড়া আছে, তাহারও পা এবং মাথা নাই। কেহ কেহ মনে করেন এই ঘোড়ার উপরেই নাগটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুরধুনী ও সরস্বতীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক প্রাচীন লোকের মুখেই শুনিয়াছি, পদ্মাসন, ধর্ম্মরাজ ও ঘোড়াটি মাত্র বিশালপুর হইতে পাওয়া গিয়াছিল। পদ্মাসনটি এখনো আছে। ধর্ম্মরাজের আকৃতি এইরূপ—

উপরি উপরি তিনটি চতুর্ভুজ বেদীর আকার। ইহার মধ্যে 'অঙ্গ চারিভাগ' কি অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে বুঝিতে পারি না। মূর্ত্তিটি সিন্দুরে এমন ভাবে ঢাকা পড়িয়াছে যে, দলগুলি ভালরূপে দেখা যায় না। পদ্মাসনটি বোধ হয় পাথরের তৈরী, কিন্তু ধর্ম্মরাজ পাথর কাটিয়া, অথবা পোড়া-মাটিতে গড়া চিনিবার উপায় নাই। ধর্ম্মরাজের মূর্ত্তির মধ্যে কোন কুলঙ্গী নাই। ইহাকে কমঠ আকার বলা চলে।

কিনা সন্দেহ। বাণেশ্বরের আকার এইরূপ—কাঠের উপর লোহার গজাল দেওয়া।

মূল দেয়াশী তাঁতি, ইহারাই পুরুষানুক্রমে দেয়াশীর কাজ করিতেছে। বর্ত্তমান দেয়াশীর নাম শ্রীনিতাই দাস। শিব দেয়াশী একজন বাগদী, শিব-দেয়াশী সমস্ত গ্রামের প্রতিনিধি, অর্থাৎ গ্রামের সকলের হইয়া শি[illegible]েয়াশী উপবাস করে। ইহারাও পুরুষানুক্রমে শিব দে[illegible]র কাজ করিতেছে এবং তজ্জন্য গ্রামবাসীদের [illegible]ট হইতে দশ আনা পয়সা পায়। সকল জাতির লোকেরই [illegible] হইবার অধিকার আছে। গ্রামের মুচি, হাড়ি, ডোম, বাগদী, কলু, শুঁড়ি, তাঁতি প্রতি বৎসর সকল জাতির লোকেই ভক্ত হয়।

উল্টারথের দিন হইতে (সাধারণত রথের আট দিনের দিন) প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্ম্মরাজের নিকট একটি ঢাক বাজাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। বোধ হয় পূর্ব্বে এই দিন গাজন আরম্ভ হইত। মূলদেয়াশী ও শিবদেয়াশী পূজার চারি দিন পূর্ব্বে ক্ষৌর করিয়া সংযমী হইবে। প্রথম দিন ক্ষৌর কার্য্য ও স্নানের পর নূতন মালসায় রাঁধিয়া এক বেলা নিরামিশ আহার করিবে। রাত্রে ফল, দুধ, মিষ্টি। তৎপর-দিন অন্য ভক্তগণ ক্ষৌর করিবে এবং সংযমী হইয়া এক বেলা নিরামিশ আহার করিবে। এই দিন মূলদেয়াশী ও শিব-দেয়াশী সারাদিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যায় বাণেশ্বর ও অপরাপর ভক্তগণকে লইয়া একটি নির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীতে গিয়া বাণেশ্বরকে স্নান করাইবে। পূজক বাণেশ্বরের পূজো করিয়া মূলদেয়াশী ও শিবদেয়াশীর গলায় উত্তরী (নূতন সূতো পাকাইয়া মালার মত গাঁইট দেওয়া) পরাইয়া দিবেন। আরও কতকগুলি উত্তরী বাণেশ্বরের গজালে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। পরদিন অন্যান্য ভক্ত তাঁহার গলায় পরিবে। এই বাণেশ্বর পূজোর নাম বানামো বা বাণমুখ। মূলদেয়াশী বাণেশ্বর পূজোর পর বাড়ী ফিরিয়া রাত্রে মসিনার ডাঁটার আড়াই নুড়ো জ্বালে হবিষ্য রাঁধিবে। আহারের সময় কোন শব্দ কানে গেলে আর আহার করিতে পাইবে না। আহারের পর স্নান করিতে হইবে।

তৃতীয় দিন সকল ভক্তেরই সমস্ত দিন উপবাস। সন্ধ্যার সময় একটি ছোট্ট চারিপায়ার উপরে শাদা চামর বাঁধিয়া খাটিয়াটিকে পট্টবস্ত্রে ঢাকিয়া তাহার মধ্যে ধর্ম্মরাজকে রাখিতে হইবে। খাটিয়ার চারিটি খুরার নীচে দুইটি ছোট বাঁশের 'সাঙ্গ' (ডাঁটা) বাঁধিয়া দিবে। তৎপূর্ব্বে চারিধারে ঢাক বাজিবে, পূজক শুদ্ধচিত্তে যুক্তকরে ধর্ম্মরাজের মাথায় ফুল চাপাইয়া ধর্মরাজকে বাহির করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিবে। ভক্তগণ জোড়হাতে দাঁড়াইয়া "জয় বাবা বুড়োরায় ধর্ম্মরাজ হে" হাঁকিবে, ফুল পড়িয়া গেলে বুঝিতে হইবে অনুমতি পাওয়া গেল। ফুল যদি মাথায় চাপিয়া বসিয়া যায়, তবে তাহা শুভ লক্ষণ নহে। অনুমতি পাওয়া গেলে পূজক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মরাজকে খাটিয়া মধ্যে রাখিয়া ভক্তদের গঙ্গাজল ও আশীর্ব্বাদী পুষ্প দিয়া খাটিয়াটি মূলদেয়াশী ও অন্য একজন সৎশূদ্র ভক্তের কাঁধে তুলিয়া দিবেন। সম্মুখে প্রচুর ধূপধুনা দিতে হইবে, চারিপাশে ঢাক বাজিবে, ভক্তগণ সমস্বরে জয়ধ্বনি করিবে, কিছুক্ষণ পর দেয়াশী মাথা দোলাইয়া নাচিয়া উঠিবে। নাচিতে নাচিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া অপর ধর্ম্মরাজের 'আটনে গিয়া উপস্থিত হইবে। পরে সেই ধর্ম্মরাজকে সঙ্গে লইয়া কোপাই নদীর ঘাটে গিয়া ধর্ম্মরাজকে স্নান করাইবে। এইখানে পূর্ব্বে ভক্তগণের জিহ্বায় "বাণ ফোঁড়া" হইত। কর্ম্মকার একটি ধারালো ছুঁচ লইয়া জিভের এপার ওপার ফুঁড়িয়া দিত, ভক্তগণ বেল-পাতা চিবাইয়া রক্ত বন্ধ করিত। এখান হইতে ধর্ম্মরাজকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত বিশালপুরের সেই ক্ষুদ্র বেলতলায় যাইতে হয়। সেখানে ধর্ম্মরাজের পূজা হয়। পূর্ব্বে ভক্তগণ সেখানে নানারূপ নাচ ও খেলা দেখাইত। মূলদেয়াশী এখান হইতেই অন্যের কাঁধে ধর্ম্মরাজকে তুলিয়া দিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসে। এইবার ডোম, হাড়ি, মুচি, বাগদী যে কেহ ধর্মরাজকে কাঁধে লইয়া নাচিতে নাচিতে জানাবাজ নামক অন্য একখানি গ্রামের মধ্য দিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসে এবং বুড়োরায় সুন্দররায়ের স্থান ঘুরিয়া আপন আপন আটনে ফিরিয়া আসেন। পরদিন পঞ্চগব্যে অভিষেক করিয়া পূজক ব্রাহ্মণ পূজা করেন। এইদিন রাত্রে ধর্ম্মরাজকে আটনে তুলিয়া মূলদেয়াশী একজন ঢাকী সঙ্গে একটি নিমের ডাল এবং বাণেশ্বর স্নানের পুষ্করিণী হইতে এক ঘটি জল আনিয়া রাখে। বলিতে ভুলিয়াছি এই দিন রাত্রে ধর্ম্মরাজকে আটনে তুলিবার পূর্ব্বে ভক্তগণকে হিন্দোল সেবা করিতে হয়। একটি নির্দ্দিষ্ট বেদীর সম্মুখে দুইটি খুঁটা পোঁতা থাকে, খুঁটার উপর একটি বাঁশ লাগাইয়া রাখিতে হয়। বেদীর উপর ধর্ম্মরাজকে নামাইয়া সম্মুখে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বালাইবে এবং ভক্তগণ একে একে খুঁটার উপরিস্থিত বাঁশে পা দুইটি লাগাইয়া ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে জোড় হাতে অঞ্জলি ভরিয়া ফুল বা বেলপাতা লইয়া ধর্ম্মরাজের নামে অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিবে। প্রথমে মূলদেয়াশী, তারপর অন্যান্য ভক্তগণ এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। হিন্দোল সেবার পর রাত্রেই এই অগ্নিকুণ্ড হইতে আগুন লইয়া অন্যত্র আর একটি অগ্নি-কুণ্ড জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। ধর্ম্মরাজকে আটনে তুলিয়া মূলদেয়াশী ও শিবদেয়াশী কিছু ঘৃতপক্ক দ্রব্য খাইয়া থাকেন। অন্য ভক্তগণেরও অন্নাহার নিষিদ্ধ!

(ক্রমশ)

ইংলণ্ডে আইরিশ সাধারণতন্ত্রীদের সংগ্রাম

আইরিশ সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর যে সব কর্ম্মচারী আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে অবস্থান করেন, তাঁহারা সম্প্রতি ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহরে বোমাযোগে যে সংগ্রাম চালাইতেছেন তাহার ফলের সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন, এই সংগ্রাম অবিরতভাবে চালান হইতেছে এবং আমাদের এই সব আক্রমণের ফলে ডি ভেলেরার রাজনীতিক শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে।

আইরিশ সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর চারজন সেনানী এই বিবৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি গোপন বৈঠক করেন। এই বৈঠকে তাঁহারা ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র কি ভাবে ব্যাপক রকমে বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হইবে তাহা বুঝাইয়া বলেন। তাঁহারা বলেন, সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, বোমা সম্পর্কিত মামলায় যে সব কর্ম্মী ইংলণ্ডে ধৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও প্রতি যদি মৃত্যুদণ্ড বিধান করা হয়, তাহা হইলে সাধারণতন্ত্রী বাহিনী ইংরেজদের জীবন লইতে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

সাধারণতন্ত্রীদের মুখপাত্র বলেন, ইংরেজেরা একবার সেই পথ ধরুক, তখন দেখিবে যে, চাবুকের গাট্টা পিঠে কেমন পড়ে!

সাধারণতন্ত্রী বাহিনী হইতে আয়র্লণ্ডে বোমা-উপদ্রব চালাইবার কোন হুকুম দেওয়ার কথা তিনি অস্বীকার করিয়া বলেন, কেবল একটি ক্ষেত্রে ঐরূপ হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনের পুত্র ফ্রাঙ্ক চেম্বারলেন যে হোটেলে ছিলেন, সেই হোটেলের কাছে আয়র্লণ্ডের কেরী জেলায় কিছুদিন পূর্ব্বে যে বোমা ফাটে সেই বোমা-বিস্ফোরণের সংগে সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর কোনরূপ সম্পর্কের কথা তিনি অস্বীকার করেন।

খাস আয়র্লণ্ডে একটি মাত্র জায়গায় সাধারণতন্ত্রী বাহিনী কর্ত্তৃক বোমা-বিস্ফোরণ ঘটান হয়, ঐ স্থানটি হইল উত্তর আয়র্লণ্ড এবং ফ্রী ষ্টেটের সীমানার উপর। এই ব্যাপার ঘটে গত বৎসর নবেম্বর মাসে। এই সময় সাধারণতন্ত্রী বাহিনী ইংলণ্ড আক্রমণ সম্পর্কিত তাহাদের কর্ম্ম প্রণালীতে অনেকটা আগাইয়া গিয়াছিল। মিঃ ডি ভেলেরা ঐ সময় আয়র্লণ্ডের ব্যবচ্ছেদ নীতির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন যে, এই ব্যবচ্ছেদ রহিত করিতে হইবে।

ডি ভেলেরা একটি বক্তৃতায় পুনরায় সাধারণতন্ত্রী দলের কাজকে স্বীকার করেন না, তিনি বড় গলা করিয়া বলিয়াছেন যে, উত্তর আয়র্লণ্ড এবং দক্ষিণ আয়র্লণ্ডের ব্যবচ্ছেদ নীতি বন্ধ করিতে হইবে। চৌহদ্দির নিশানা নষ্ট করিতে হইবে। নিশানা ধ্বংস হইয়াছিল বটে, কিন্তু ডি ভেলেরা যেভাবে নষ্ট হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন সেভাবে হয় নাই, হইয়াছিল অন্য ভাবে। আমরা উহা উড়াইয়া দেই। সীমানার উপর যে চুঙ্গী অফিস ছিল, আমরা সে-সব উড়াইয়া দিয়াছিলাম। সাধারণতন্ত্রী বাহিনী পক্ষের বক্তা এই স্থলে গম্ভীরভাবে হাস্য করিয়া বলিলেন, শুধু তাহাই নহে, ইংরেজ কর্ম্মচারীরাই ঐ সময় বোমা সীমানার উপর স্থাপন করিয়া আমাদের কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছিল। এ কথা দ্বারা তিনি ইহাই বুঝাইতে চাহিলেন যে, ডাক বিভাগের ইংরেজ কেরাণীরাই বোমার পুলিন্দাগুলি ঐস্থানে পৌঁছাইতে সাহায্য করিয়াছিল।

গত বৎসর নবেম্বর মাসে এই ব্যাপার ঘটে, ইহার পূর্ব্বে সাধারণতন্ত্রীবাহিনীর পক্ষ হইতে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হালিফক্সের নিকট চরমপত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল। চুঙ্গী বিভাগের কর্ম্মচারীরা কেহ যাহাতে জখম না হ[illegible] সেজন্য আমরা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম। তাহারা বাড়ীতে গেলে আমরা বোমাগুলি বসাই এবং বোমা বিস্ফোরণের একঘণ্টা পূর্ব্বে আমরা বেলফাষ্টের বেতার অফিসে টেলিফ[illegible]

ডি ভ্যালের.

যোগে জানাই যে, তাঁহারা যেন আমাদের এই সতর্কবাণী বেতারযোগে প্রচার করিয়া সকল লোককে চুঙ্গী অফিসগুলি হইতে দূরে থাকিতে হুঁসিয়ার করিয়া দেন। সময়টি যেই আসিল, অমনই বোমাগুলি সব ফাটে, অথচ জনপ্রাণীও কোন আঘাত পায় নাই। আমরা এই কার্য্যের দ্বারা আইরিশদিগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিই যে, শুধু বক্তৃতার দ্বারা আয়র্লণ্ডের জন্য কিছু পাওয়া যায় নাই, গায়ের জোরেই সব কাজ হইয়াছে, এবং আবার সেইভাবেই জয় হইবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে যে চরমপত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সময়ের মেয়াদ ঠিক উত্তীর্ণ হইবার সংগে সংগে ইংলণ্ডে বোমা বিস্ফোরণ আরম্ভ হয়; প্রথম দফায় তিনটি ক্ষেত্রে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে; ইহার পর হইতে বোমা অথবা গ্যাস অথবা অন্য কোন আগ্নেয় উপাদানের সাহায্যে অগ্নিকাণ্ড নিয়মিতভাবে চালান হইতেছে। এ পর্য্যন্ত এই আক্রমণ যত স্থানে চালান হইয়াছে, তন্মধ্যে পিকাডলী সার্কাশের অঞ্চলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষয় ঘটে। দুই মাইল পর্য্যন্ত স্থানে বোমাগুলি বিস্ফোরণের ঝাঁকুনি উপলব্ধি হইয়াছিল এবং ইহাতে গোটা শহরে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হয় যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে টেরিটোরিয়াল সৈন্যবাহিনীকে তলব করিতে হয়।

গত ১০ই জুন ১০ হাজার চিঠি নষ্ট করা হয়, এবং [illegible] ডাক [illegible]

যায়। এই সময় কয়েক ঝুড়ি আগুনে-বোমা রাত্রির ডাক ব্যাগগুলির ভিতর পুরিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টার সংবাদপত্রের কয়েকটি কাটা অংশ হইতে কয়েকটি ঘটনার বিবরণ পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আইরিশ সাধারণতন্ত্রী বাহিনী কি এইগুলির জন্য দায়ী?

ও-পক্ষে [illegible]াত্র বলিলেন,—হাঁ, এই সব কাজের সম্পর্কে যে সব কর্ম্মী [illegible]ত হইয়াছে, আমরা তাহাদের জন্য গর্ব্বিত। তাহ[illegible] জন্য গর্ব্ববোধ করিবার অধিকার আমাদের আছে। এই [illegible]দীরা মুক্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের [illegible]ান্তি স্থাপিত হইবে না।

সাধারণতন্ত্রী দলের অপর একজন সদস্য তারপর বলিলেন,—ইংলণ্ডে আমাদের দলের হুকুম সব কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইল বোমা তৈয়ারীর ব্যাপারে। সেখানে বোমা খরিদ করিবার কোন উপায় নাই, যদিও আমরা ইংলণ্ডের কয়েকটি সেনা দলের সামরিক তোড়জোড় সরবরাহের গুদাম হইতে ঐগুলির কিছু ধার করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই সম্পর্কে আমাদের কিছু মুস্কিল পোহাইতে হইয়াছে; কিন্তু এখন আমরা এই সমস্যার একটা সুরাহা করিয়া লইয়াছি।

সংবাদপত্রের রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনাদের ট্রেনিং স্কুলগুলির কাজ কি এখনও চলিতেছে?

—হাঁ, চলিতেছে বৈ কি। যত লোক দরকার হইতেছে, তত পরিমাণ লোকই ইংলণ্ডে পাঠান হইতেছে। কার্য্যক্ষেত্রে বর্ত্তমানে কতজন কর্ম্মী আছে, এখন তাহার ঠিক সংখ্যা দেওয়া কঠিন, কারণ সব সময়ই সংখ্যার উনিশ বিশ ঘটিতেছে। অনেকে ফিরিয়া আসিতেছে, আবার অনেকে যাইতেছে।

নৌকাযোগে ইংলণ্ড হইতে আসা তাহাদের পক্ষে খুবই সোজা। প্রকৃতপক্ষে অনেকে বোমা পাতিয়া সেগুলি ফাটিবার পূর্ব্বেই আয়র্লণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

সাধারণতন্ত্রী দলের মুখপাত্র অতঃপর কতকগুলি ক্ষেত্রে বোমা প্রয়োগের বর্ণনা প্রদান করেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে আমাদের এই সব কার্য্যে ইংলণ্ডে যে কতটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে, আপনারা ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত সংবাদসমূহে তাহা বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহার এই উক্তির যুক্তি প্রদর্শনার্থ তিনি ইংলণ্ডের সংবাদসমূহে প্রকাশে কিরূপে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, তাহা বর্ণনা করেন।

"আমাদের সেনাবাহিনী বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বহু টাকা ব[illegible] করাইয়াছে, আমাদের কর্ম্মতালিকার উহা হইল একটি অঙ্গ। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে হাজার হাজার গোয়েন্দা নিযুক্ত করিতে হইতেছে এবং দিবারাত্র তাহাদিগকে কাজে মোতায়েন রাখিতে হইতেছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উইণ্ডসরে বিশেষ প্রহরী মোতায়েন রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং আমাদের খোঁজে সর্ব্বত্র তাহাদিগকে খানাতল্লাসী চালাইতে হইতেছে। বিগত মহা-সমরের পর ইংরেজ সেনাবাহিনীর এমন সন্নিবেশের ঘটা আর [illegible] নাই। এই [illegible] জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিতে [illegible] হার না মানিতেছে, সে-পর্য্যন্ত আরও অনেক টাকা খরচ করিতে হইবে। আমাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে ফতুর হইতে হইবে।"

সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর একজন সেনানী অতঃপর ইংলণ্ডে এই সব কার্য্য যাহারা চালাইতেছে, তাহারা কিরূপ পদমর্য্যাদার লোক ঐ সম্পর্কে আলোচনা তুলেন। সংবাদপত্রের রিপোর্টার একখানি কাগজ দেখান, সেই কাগজে আইরিশ সাধারণতন্ত্রী দলের নাম ছিল এবং তাহাদের সাধারণ সভার ঠিকানা দেওয়া হইয়াছিল ১২৫, লং ষ্ট্রীট। ঐ কাগজের একস্থানে দলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, "ইংলণ্ডের জল, আলো প্রভৃতির কাজ বিগড়াইয়া দেওয়া, গুলী বারুদের কারখানাগুলি নষ্ট করা এবং শত্রুর দেশের নাগরিক জীবন বিপর্য্যস্ত করাই হইল আইরিশ সাধারণতন্ত্রী দলের স্বীকৃত ন্যায়সংগত সামরিক কর্ম্মতৎপরতা।"

ঐ কাগজে আরও বলা হইয়াছে যে, আইরিশ সাধারণতন্ত্রী বাহিনী স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলশের স্বতন্ত্র জাতীয়তা স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং ঐ দুইটি স্থানের ক্রমবর্দ্ধমান হোমরুল আন্দোলনের গুরুত্বকে তাহারা স্বীকার করে, এইজন্য সাধারণ-তন্ত্রী-বাহিনীর কর্ম্মতৎপরতা কেবলমাত্র ইংলণ্ডের সীমানার মধ্যেই চালান হইবে। স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলশের পূর্ব্ব নিরপেক্ষতা বজায় রাখার উপরই অবশ্য এই সর্ত্ত প্রতিপালন করা না করা নির্ভর করে।

বিবৃতির শেষ অংশে বলা হইয়াছে,—"আইরিশ সাধারণ-তন্ত্রী বাহিনীর কার্য্য পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য যে সব কাগজপত্র দলের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, লোকের প্রাণহানি যাহাতে না ঘটে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার ফলে অনেক স্থানে কার্য্য পূর্ণাঙ্গ করিতে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। দলের এই সিদ্ধান্ত অবশ্য নির্ভর করিতেছে ইংরেজের কার্য্যের উপর। তাহারা যদি আমাদের সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ সামরিক মর্য্যাদা প্রদান করে তবে, নতুবা এই সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন ঘটান যাইতে পারিবে।"

"আপনাদের এই বিবৃতি কখন বাহির করা হইয়াছিল এবং প্রচার করাই বা হইয়াছিল কোথায়?"

এই বিবৃতি আয়র্লণ্ডের ইষ্টার বিদ্রোহ স্মৃতি কমিটির সামরিক বিভাগের সদর অফিস হইতে বাহির করা হয় এবং আইরিশ সাধারণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উহা প্রচার করা হইয়াছিল।

এই বিবৃতিকে কি নাম দেওয়া হইয়াছিল,—এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণতন্ত্রী-বাহিনীর পক্ষ হইতে বলা হয় যে, এই বিবৃতির নাম হইল—"ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর কর্ম্ম-তৎপরতার অগ্রগতির সম্পর্কে সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর সদর অফিস হইতে প্রচারিত প্রথম সরকারী ইস্তাহার।"

আপনাদের এই কর্ম্মতৎপরতার প্রভাব আয়র্লণ্ডের উপর কিরূপ হইতেছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণতন্ত্রীদের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ডাবলিনে সম্প্রতি যে নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, তাহাই সে-পক্ষে বড় প্রমাণ। ডি ভেলেরা আমাদের কর্ম্মতৎপরতা

খল করিবার উদ্দেশ্যে এবং আমাদের প্রচারপত্রগুলি বন্ধ করিবার জন্য কতকগুলি পিটুনী ব্যবস্থা আইনসভায় উপস্থিত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে বিষম ঘা খাইতে হইয়াছে, সম্ভবত আইনসভা সম্পর্কিত কাজে তিনি এত বড় আঘাত আর কোন দিন পান নাই। 'ফায়না ফেল' দলের প্রতিনিধির পক্ষে গত বৎসরের চেয়ে এবার শতকরা ৩৪টি ভোট কম হয়। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিশেষ বিষয়টি হইল এই যে, এবারকার নির্ব্বাচনে শতকরা ৪৫ জন ভোটদাতা ভোট দেয়। অথচ ডি ভেলেরা এই নির্ব্বাচনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন, এমন কি, প্রকাশ্যে স্বপক্ষের সদস্যের পক্ষে ঢাকও পিটাইয়াছিলেন যথেষ্ট। অন্য কথায়, আইরিশ সাধারণতন্ত্রীদল নির্ব্বাচন বর্জ্জন করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট যে আবেদন করে, তাহা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়। আইরিশ সাধারণতন্ত্রীরা আয়র্লণ্ডের উভয় রাজনীতিক দলের নির্ব্বাচন সম্পর্কিত ব্যাপারই বর্জ্জন করিতে লোককে বলিয়াছিল; কারণ ঐ দুই দলই ইংলণ্ডের রাজাকে স্বীকার করে। শতকরা ৫৫ জন ভোটদাতা নির্ব্বাচন বর্জ্জন করিয়াছিল। আমাদের দলের জোরের প্রমাণই হইল ইহা একটি। কসগ্রেভের বেলাতেও ঠিক এমনটিই ঘটে; লোকে ভোট দানের ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের পক্ষের জোর দেখায়। ডি ভেলেরা দলের এই যে ভয়ানক রকমের বল হ্রাস, ইহা অপ্রত্যাশিত ছিল না; কারণ আইরিশ সাধারণতন্ত্রী বাহিনীকে কার্য্যত দলন করিয়া তাঁহার মুখে সাধারণতন্ত্রবাদের বড়াইকে লোকে আর মনে প্রাণে গুরুত্ব দিতে পারিতেছে না।"

ডি ভেলেরার দলের বড় নেতাদের মধ্যে কে তাঁহার দল ছাড়িয়াছেন, অতঃপর তাহার জোর দেখাইতে বলা হয় এবং সেজন্য 'উল্‌ফটোন উইক্লি' পত্রের কাগজের গাদা হইতে একটি দলিল বাহির করা হয়। ঐ পত্রের ১২ই এপ্রিলের সংখ্যায় জন গিল মার্টিনের লিখিত একটি প্রবন্ধ ছিল। গিল মার্টিন ডি ভেলেরার দলের একজন বড় নেতা। প্রবন্ধটির নাম ছিল—"আমি 'ফায়না ফেল' দলের একজন অনুগামী হইলাম।"

মিঃ গিল মার্টিন ঐ প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন,—মি ডি ভেলেরা তাঁহার নূতন শাসনতন্ত্রে আয়র্লণ্ডের ২৬টি জেলার আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চাহিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি পররাষ্ট্র ব্যাপারে ইংরেজের প্রভুত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ইহাতে জগতের লোকদের নিকট আইরিশ স্বাধীনতার এরূপ একটি নিদারুণ স্ব-বিরোধী আদর্শ উপস্থিত করা হইয়াছে—যাহাকে কিছুতেই নীতি হিসাবে মান্য করিয়া চলা যায় না। নীতি হিসাবে উহার আর সাময়িক তূর্য নাই, একদিন ঐভাবে আমরা তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। ডি ভেলেরার পক্ষে আপোষ-নিষ্পত্তি এখন আর উপায়স্বরূপ না থাকিয়া তাহাই শেষ লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে।"

এই প্রবন্ধটি যখন টুকিয়া লওয়া হইতেছিল, তখন সাধারণতন্ত্রী দলের মুখপাত্র বলিলেন,—"ঐরূপ মতের জোর দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। ফায়না ফেল দলের যে জোর এখন আছে, কিছুদিন পরে সেটুকু জোরও থাকিবে না।"

ইংলণ্ডে বোমা ফাটান প্রভৃতি কর্ম্মতৎপরতা চালান সাধারণতন্ত্রীদিগকে ডি ভেলেরার গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য ত্যাগ করিতে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,—হাঁ, ইংলণ্ডের এই সংগ্রাম আয়র্লণ্ডের জনসাধারণকে ইহাই দেখাইয়াছে যে, আইরিশ সাধারণতন্ত্রী বাহিনীই হইল একমাত্র শক্তিশালী দল, যে দল সাধারণতন্ত্র ধ্বংসের বিরুদ্ধতাকে দলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কারণ সাধারণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলার কোন কথা এখন আর উঠিতে পারে না। ১৯১৯ সালের ২১শে জানুয়ারীতেই আয়র্লণ্ডের সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবং আমাদের স্বাধীনতা জগতের লোককে জানাইয়া দেওয়া হয়। সাধারণতন্ত্র তদবধি প্রতিষ্ঠিত আছেই—এখন সব সময়ই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

প্রায় আট ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই আলোচনা চলিয়াছিল এবং সাধারণতন্ত্রীদের পক্ষের মুখপাত্র যিনি, তিনি ইহাতে অনেকটা পরিশ্রান্ত হইয়াই পড়েন, রাত্রিশেষে ঊষার আলোক তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মুখপাত্র মহাশয় উপসংহারে বলেন,—

১৯১৬ সালে অস্ত্রবলে আইরিশ সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হয় এবং ১৯০৩ সালের নির্ব্বাচনে উহা দৃঢ় করা হয়। ঐ নির্ব্বাচন চলিয়াছিল এই প্রশ্নের উপর। জনসাধারণ বিপুল সংখ্যাধিক্যে সাধারণতন্ত্রের পক্ষে ভোট দেয়। ১৯১৯ সালের ২১শে জানুয়ারী আইরিশ ডেল বা রাষ্ট্রসভার প্রথম অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে জগতের সব গবর্ণমেণ্টকে সরকারীভাবে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, আইরিশ জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পরিচালনা করিতেছে এবং এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্যই বিগত মহাসংগ্রাম চলিয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়া থাকে। আইরিশ জাতি স্বাধীন আইরিশ সাধারণতন্ত্রের পক্ষে স্বাধীনভাবে ভোট দিয়াছে। বৃটিশ সেনাদল সাধারণতন্ত্রের উপর আক্রমণ চালায়। ১৯২২ সালে একটি বিদ্রোহের দ্বারা ইংরেজেরা আইরিশ ফ্রী ষ্টেট প্রতিষ্ঠিত করে; কিন্তু আমরা বরাবরই সাধারণতন্ত্রের আনুগত্য মানিয়া চলিতেছি। দেশের লোক সে সাধারণতন্ত্রের পক্ষেই ভোট দিয়াছে।

সাধারণতন্ত্র সব সময়ই ছিল, ইংরেজ সেনাদের দ্বারা ঐ সাধারণতন্ত্রের ক্ষমতা চাপা পড়িলেও আয়র্লণ্ডের একমাত্র বিধিবিহিত গবর্ণমেণ্টস্বরূপে আজও উহা চলিতেছে। সাধারণতন্ত্রের কাজ চালাইতে দিতে ইংরেজদিগকে আমরা বাধ্য করিতে পারিব, এমন বিশ্বাস আমরা রাখি।

সর্ব্বশেষে তিনি একটু চাপা সুরে অথচ অধিকতর গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলেন,—"ভগবান আয়র্লণ্ডকে রক্ষা করুন।" অন্যান্য সকলেও তাঁহার সঙ্গে ঐ কথা আবৃত্তি করেন।

পুস্তক পরিচয়

মুক্তিপাগল বঙ্কিমচন্দ্র—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—মূল্য এক টাকা। ৪৬-এ বোসপাড়া লেন, কলিকাতা হইতে নবজীবন সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

বঙ্কিম স্মৃতি-বার্ষিকীর পর বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা এবং তাঁহার অবদান সম্বন্ধে আলোচনামূলক কয়েকখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বিজয়লালের 'মুক্তিপাগল বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক [illegible]লোচ্য পুস্তকখানি তন্মধ্যে আধুনিকতম। সুসাহি[illegible] এবং কবি হিসাবে বিজয়লাল বাঙলা দেশে [illegible]থিত[illegible] আমরা তাঁহার 'মুক্তিপাগল বঙ্কিমচন্দ্র' আগ্রহ [illegible]কারে পাঠ করিয়াছি। 'মুক্তিপাগল বঙ্কিমচন্দ্র', [illegible]স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র', 'সাম্যবাদী বঙ্কিম', 'যুগপ্রবর্ত্তক বঙ্কিমচ[illegible]', 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' এই কয়েকটি অধ্যায়ে পুস্তকখানি বিভক্ত এই পাঁচটি অধ্যায়ের ভিতর দিয়া বিজয়লাল বঙ্কিমচন্দ্রের সাধ্য এবং সাধনার বৈশিষ্ট্যকে অপূর্ব্ব দক্ষতার সঙ্গে বাণীমূর্ত্তি দান করিয়াছেন। বিজয়লাল অগ্নিময়ী ভাষায় ঝঙ্কার তুলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরকে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বিজয়লাল ডাক্তার স্টেকেলের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,—'প্রতিভার কাজ হচ্ছে যে-আদর্শ সম্পূর্ণ নূতন, তাকে জনসাধারণের চিত্তভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করা অথবা যে-আদর্শ অনেক কাল ধ'রে মানুষের কাছ থেকে পূজো পেয়ে এসেছে তাকে জনসাধারণের হৃদয়-সিংহাসন থেকে ধূলোয় ফেলে দেওয়া।'

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মূলে 'মুখ্য রসাশ্রয়' ছিল কোন্ বস্তুটি—বিজয়লাল শ্রীঅরবিন্দের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। সে উক্তিটি হইল এই—The religion of patriotism—This is the master idea of Bankim's writings—দেশপ্রীতিই জীবনের পরম ধর্ম্ম, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই স্বদেশপ্রেমের ধর্ম্মেরই উদ্গাতা এবং ব্যাখ্যাতা, শুধু তাহাই নহে, এই পরম সাধনার তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা।

স্বদেশ-প্রেম, জাতির মুক্তিসাধনার অনুধ্যানের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যরসের এই যে আশ্রয়টি পাইয়াছিলেন, পাইয়াছিলেন অবলম্বন এবং শক্তি, সেই শক্তিই তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া অনুস্যূত হইয়াছে এবং তাহা জাতির মর্ম্ম-বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়াছে। জাতির চিন্তাধারায় সমগ্রভাবে একটা সাড়া জাগাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই দিক হইতে নবীন ভারতের স্রষ্টা, ভারতের ভাব-জগতে শক্তির সঞ্চারক; তিনি নব ভারতের পথ প্রদর্শক এবং গুরু।

ব্যাপক রসানুভূতির মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া দেওয়ার অর্থই প্রেম, এই প্রেমের দৃষ্টি যিনি লাভ করেন, তাঁহার নিকট অনাগতও অনেকখানি আত্মপ্রকাশ করে। 'সাম্যবাদী বঙ্কিমে' আমরা এই শক্তির পরিচয় পাই। যাঁহারা মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্র দেশের কেবল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন, বিজয়লালের 'সাম্যবাদী বঙ্কিমে' সেই ভ্রান্তি অপসারিত করিবে। এদেশের দরিদ্র, কৃষক এবং শোষণক্লিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বেদনা কতটা উগ্র ছিল, বিজয়লাল তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। যে প্রেমের মূলে কাজ করে প্রচণ্ড শক্তি—সেই প্রেমধর্ম্মে জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সাধনা করিয়া গিয়াছেন। এই প্রেমধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র', তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব' এবং শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ভাষ্যে এবং 'দেবী চৌধুরাণী'তে ও 'আনন্দ মঠের' সন্তানদের সাধনা ও সংগ্রামের ভিতর দিয়া রূপ দিয়াছেন। প্রেমের এই যে বীর্য্যময় রূপ এবং এই যে মৃত্যুঞ্জয় রূপ, সেই রূপের সৌন্দর্য্য এবং মহিমার বিকাশ আমরা দেখিতে পাইয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্য রসাশ্রয়স্বরূপে তাঁহার সমগ্র সাধনার মধ্যে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনি দেখাইলেন সেই যে মৃত্যুঞ্জয় প্রেম-মহিমা তাহারই মূর্ত্ত বিগ্রহস্বরূপে এবং জাতিকে তিনি অন্তরের সমস্ত আকুতি দিয়া ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণানুশীলন এ-সব কথা যে বল, তাহা তোমাদের মুখে শোভা পায় না। তিনি যে প্রেমের ঠাকুর! প্রেম কখনো দুর্ব্বল হয় না, প্রেম কার্পণ্যকে স্বীকার করে না। সে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আগুনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে, মৃত্যুকে আগাইয়া গিয়া আলিঙ্গন করে। সে প্রেম শুধু সৌম্য নহে, অতি-সৌম্য বলিয়াই তাহা অতি রুদ্র এবং সকল সুন্দর সন্নিবেশ বলিয়াই সে-প্রেমে রুদ্রতা থাকে, জ্বালা থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হিসাবেই 'সকল সুন্দর সন্নিবেশঃ'। তাঁহার লীলাতত্ত্ব প্রকৃত প্রেমিকের অন্তর লইয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর, যেদিন তাহা পারিবে, সেদিন আর দিনে দশবার মরণের ভয়ে কাঁপিবে না—সেদিন প্রকৃত বৈষ্ণবের মত তোমার মুখেও উচ্চারিত হইবে এই মহাবাণী—

> 'যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা মতিশ্চ পদ-পঙ্কজে
> বিষমে দুর্গমে দৈব কা চিন্তা মরণে রণে।'

মুক্তিপাগল বঙ্কিমচন্দ্রের' ভিতর দিয়া বিজয়লাল বঙ্কিমচন্দ্রের এই সাধক-রূপ দেশবাসীকে দেখাইয়াছেন এবং পরাধীন এই পতিত জাতির পক্ষে সেই সাধনার অনুপ্রেরণা লাভের প্রয়োজনীয়তা আজ একান্তভাবেই আসিয়াছে। 'মুক্তিপাগল বঙ্কিমচন্দ্র' সে প্রয়োজন পূর্ণ করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। এমন পুস্তকেরও যদি বহুল প্রচার না হয়, তবে জাতির দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই এবং কাগজ অতি সুন্দর হইয়াছে।

রাজতরঙ্গিণীর গল্প—(ছোটদের জন্য) গ্রন্থকার—শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় বি-এ, প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

প্রাচীন কবি কহ্লাণের মূল রাজতরঙ্গিণী হইতে কয়েকটি আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম গল্পাকারে প্রাঞ্জল বাঙলা ভাষায় বর্ণিত। অতীত ভারতের সেকালের রীতিনীতি ও মোটামুটি দেশের অবস্থার একটা ইঙ্গিত ইহা হইতে বালক-বালিকারা উদ্ধার করিতে পারিবে। সিংহের সঙ্গে মুখামুখী লড়াই, রাজার ভিখারী হইয়া দুরবস্থা, অপরাধ নির্ণয়ে দৈবাদেশ প্রভৃতি কল্পনার অপরিসীম বিস্তার চিত্তে আলোড়ন তুলিবে। লেখকের বর্ণনাভঙ্গী মধুর।

সাহিত্য-সংবাদ

রচনা প্রতিযোগিতা

তরুণ সংসদ (হাওড়া) হইতে এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিষয়ঃ—

১। সমালোচনা—"শরৎচন্দ্রের পথের দাবী" (কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য), পুঃ—শরৎ স্মৃতি কাপ।

২। "আজিকার নারী শিক্ষা সমস্যা" (কলেজের ও স্কুলের ছাত্রীদের), পুঃ—সুধীরবালা স্মৃতি কাপ।

৩। "বিজ্ঞান ও দর্শনের মহামিলন" (কলেজ ও স্কুলের ছাত্র), পুঃ—স্যার জগদীশ স্মৃতি কাপ।

প্রত্যেক রচনাই ফুলস্‌ক্যাপ সাইজ কাগজের দশ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করিতে হইবে ও কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। রচনা ১০ই সেপ্টেম্বরের ভিতর সম্পাদকের নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। প্রতিযোগিরা আপন আপন ঠিকানা দিতে ভুলিবেন না। খামের উপর "প্রতিযোগিতা" লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত হরিভূষণ মিত্র বি-এল, সম্পাদক, ৩।৪ শ্রীবাস দত্ত লেন, হাওড়া।

প্রবাহ সাহিত্য চক্র

বহরমপুর প্রবাহ সাহিত্য চক্রের পক্ষ হইতে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। বাঙলা দেশের যে কোন স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে "সনৎ রাহা, খাগড়া পোঃ, জেঃ মুর্শিদাবাদ" অথবা "গৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য, খাগড়া পোঃ, জেঃ মুর্শিদাবাদ" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের আকার সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট বিধান নাই। প্রবন্ধের বিষয়ঃ—

১। "বাঙ্গলায় শিশু-সাহিত্য", পুরস্কার—একটি রৌপ্য পদক।

২। "সভ্যতা—নূতন ও পুরাতন", পুরস্কার - ছাত্রদের জন্য "দবনাথ" রৌপ্য পদক, ছাত্রীদের জন্য "মৃত্যুঞ্জয়" রৌপ্য পদক।

প্রবন্ধের সংখ্যা বেশী হইলে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

শ্রীগৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যভূষণ, সম্পাদক, প্রতিযোগিতা বিভাগ।

"দীপিকা"র চিত্র প্রতিযোগিতা

চট্টগ্রামের ছাত্র পরিচালিত হস্তলিখিত "দীপিকা" পত্রিকার উদ্যোগে বাঙলার স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এক চিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইতেছে। যাঁহারা উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে ইচ্ছুক তাঁহারা নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী চিত্র পাঠাইবেন।

নিয়মাবলীঃ—

(১) বাঙলার স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকিবে, কোন প্রবেশ-মূল্য নাই, (২) ছবির সাইজ ১০"×৬" এবং ৬"×৪½" ইঞ্চি মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, ছবি রঙ্গীন হইলেও আপত্তি নাই। (৩) প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাকে রৌপ্য-নির্ম্মিত "সুবোধ-স্মৃতি কাপ" দেওয়া হইবে এবং যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাকে "সুবোধ-স্মৃতি রৌপ্যপদক" দেওয়া হইবে। (৪) ছবি পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০শে আগষ্ট, প্রতিযোগিগণকে স্কুল বা কলেজের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। (৫) অঙ্কনের বিষয়ঃ Indoor Picture. (৬) মনোনীত ছবিগুলি "দীপিকা" পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। (৭) ছবি পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীপ্রিয়ব্রত দত্ত c/o [illegible] দত্ত বি-এল, ফিরিঙ্গীবাজার রোড, চট্টগ্রাম। যথাসম্ভব [illegible] পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

রচনা প্রতিযোগিতা

হস্তলিখিত "প্রভাত" পত্রিকার উদ্বোধন উপলক্ষে উক্ত পত্রিকার সভ্যগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি গল্প ও একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইবে। এই প্রতিযোগিতায় সমগ্র বঙ্গের যে কোন স্কুলের ছাত্র, ছাত্রী কোনরূপ প্রবেশমূল্য না দিয়া যোগদান করিতে পারিবেন। যে কোন বিষয় লইয়া প্রবন্ধ ও গল্প লেখা যাইবে। প্রত্যেক বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখককে একটি করিয়া সুদৃশ্য রৌপ্য পদক উপহার দেওয়া যাইবে। মনোনীত ও পুরস্কৃত রচনাগুলি উক্ত মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইবে। সর্ব্ববিষয়ে এই সঙ্ঘের সিদ্ধান্তই চরম। উপযুক্ত টিকিট সঙ্গে থাকিলে যে কোন অনুসন্ধানের জবাব দেওয়া হইবে এবং অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হইবে। লেখকগণ তাহাদের স্কুলের নাম ও বাড়ীর ঠিকানা সহ **১৪ই ভাদ্র, ইং ৩১শে আগষ্টের** মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাঁহাদের স্বরচিত রচনাদি পাঠাইবেন।

বিঃ দ্রঃ—যে কেহ একের অধিক নাম দিতে পারিবেন (তবে একাধিক পুরস্কারের অধিকারী হইবেন না)।

(১) শ্রীযতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, পোঃ বেলুড়মঠ, বেলুড়, হাওড়া।

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, "প্রভাত"।

তারিখ পরিবর্ত্তন

তরুণ সঙ্ঘ পরিচালিত নিখিল বঙ্গ রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ ২০শে আগষ্ট রবিবারের স্থলে ৩রা সেপ্টেম্বর রবিবার ঘোষণা করা হইতেছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝোড়হাট, আন্দুলমৌড়ী পোষ্ট; হাওড়া।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

'মিলন-তীর্থ'-র সাহিত্য-শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

পুরুষদিগের জন্য যে প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মাত্র 'দধীচি মৈত্রেয়'র নিকট হইতে একটি রচনা পাওয়ায় পুরস্কার প্রদান বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছি।

মহিলাদিগের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন—কুমারী হাসি ঘোষ (বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা)। 'ঈশ্বরদী'র কুমারী মিলনরাণী সেনগুপ্তা ও কাশীপুরের কুমারী শান্তি ঘোষের রচনা উল্লেখযোগ্য। পুরস্কার শীঘ্রই পাঠান হইবে।

খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, তারাশঙ্কর [illegible]

উত্তরায় পরশমণি

'পরশমণি'—শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের ছবি; পরিচালনা—প্রফুল্ল রায়; কাহিনী—যামিনী মিত্র; কাহিনীর চিত্ররূপ—শচীন সেনগুপ্ত; গীতিকার—শৈলেন রায়; প্রধান যন্ত্র-শিল্পী—চার্লস্ [illegible] আলোক চিত্র-শিল্পী—বিভূতি দাস; শিল্প নির্দ্দেশক [illegible] শু চৌধুরী; সঙ্গীত পরিচালক—হিমাংশু দ[illegible] আ[illegible]গীত—পরিতোষ শীল; নৃত্য পরিকল্পনা—স[illegible]য়; চিত্র সম্পাদক—শ্যাম দাস। ভূমিকায়—দুর্গাদাস বন্দ্যো[illegible]রায়, তুলসী লাহিড়ী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রবি রায়,

নিউথিয়েটার্সের "রজত-জয়ন্তী" চিত্রে মলিনা ও পাহাড়ী সান্যাল। গত ১২ই আগষ্ট হইতে চিত্রা ও নিউসিনেমায় দেখান হইতেছে।

সন্তোষ সিংহ, সত্য মুখার্জ্জি, জীবেন বসু, প্রফুল্ল দাস, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি, কালী ঘোষ, সত্যেন চক্রবর্ত্তী, নৃপেন চক্রবর্ত্তী, জ্যোৎস্না, রাণীবালা, বীণা বাগচি, অরুণা, প্রভা, দেববালা, রাজলক্ষ্মী, লক্ষ্মী প্রভৃতি। গত ৫ই আগষ্ট হইতে উত্তরা চিত্রগৃহে দেখান হইতেছে।

মোহিত রায় সুপুরুষ, অর্থবান, অবিবাহিত যুবক। কলিকাতার উগ্র আধুনিক কলেজের মেয়েরা তাহার অর্থ ও রূপ দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করার জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছিল এবং সেই সুযোগে মোহিত রায় একটির পর একটি মেয়ের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাদের পথে বসাইতেছিল। সেই সময় মোহিত রায় তাহার পিতৃবন্ধুর কন্যা সীতাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। সে সীতার পিতার নিকট সীতাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করে এবং সীতার পিতা যে তাহার নিকট অনেক অনেক টাকার ঋণী ছিলেন তাহা ছাড়িয়া দিতে চায়। সীতার পিতা মোহিতের কীর্ত্তির কথা জানিতেন এবং তিনি এই বিবাহ দিতে অস্বীকার করেন। সীতার বাবার মৃত্যু হইলে মোহিত সীতার সহিত মিশিবার সুযোগ পায়। কিছুদিন পরে সে সীতাকে বিবাহ করে। বিবাহের পর সে জীবনে প্রথম তাহার নিজের অন্তরের কতকটা পরিচয় পায় এবং সেই সময় হইতেই তাহার বাহিরের ও অন্তরের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। অনেক ঘটনা বিপর্য্যয়ের পর মোহিত সীতার আত্মত্যাগে কিভাবে নিজেকে চিনিতে পারিল তাহা এই ছবিতে দেখান হইয়াছে।

ছবিখানির মধ্যে প্রকৃত ভাল জিনিষ অনেক কিছু আছে; কিন্তু তথাপি ছবিখানিকে আমরা বাঙলা দেশের প্রথম শ্রেণীর ছবি বলিতে পারি না। তাহার প্রথম কারণ ছবির কাহিনী। মূল কাহিনীর মধ্যে কতকগুলি অবান্তর ও অপ্রধান চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য মূল কাহিনীটি সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই এবং কোন চরিত্রই ফুটিয়া উঠার অবকাশ পায় নাই। তাহার উপর বিরামের পরেও নূতন নূতন চরিত্রের আমদানী

করা হইয়াছে। ফলে গল্পটি একেবারেই জমিতে পারে নাই। নায়ক নায়িকার চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে হইলে কতকগুলি অপ্রধান চরিত্র গড়িয়া তুলা আবশ্যক—যেগুলি মূল চরিত্র সৃষ্টির সহায়তা করে। কিন্তু সেই অপ্রধান চরিত্রগুলি যদি চিত্রের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে, তাহা হইলে মূল চরিত্রের বিকাশ হওয়া ত দূরের কথা, গল্পের মাধুর্য্যটুকুও নষ্ট হইয়া যায়। আলোচ্য ছবিতে তাহাই হইয়াছে। সুতরাং পরিচালক শ্রীযুত প্রফুল্ল রায় যদি কতকগুলি অবান্তর ও অপ্রধান চরিত্রকে নির্ম্মমভাবে বাদ দিতেন তাহা হইলে হয়ত পরশমণি একটি প্রথম শ্রেণীর চিত্র হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারিত।

নায়কের ভূমিকায় শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়ের অভিনয় চমৎকার হইলেও তিনি স্থানে স্থানে মাত্রাধিক্য করিয়া ফেলিয়াছেন। নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী জ্যোৎস্না যথাসম্ভব সুন্দর অভিনয় করার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি আশানুরূপে অভিনয় নিপুণতা দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার মুখ দিয়া যে দুইখানি গান দেওয়া হইয়াছে সেই গান দুইখানি তাঁহার নিজের গান নহে। সেইজন্য দুইখানি গান খুব ভাল হইলেও আমরা তজ্জন্য শ্রীমতী জ্যোৎস্নার প্রশংসা করিতে পারি না। হারু ঘোষের ভূমিকায় তুলসী লাহিড়ী ও মিঃ সেনের ভূমিকায় সন্তোষ সিংহ সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। ভবতোষের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য্যকে অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইবার কোন সুযোগই দেওয়া হয় নাই। এলার ভূমিকায় রাণীবালা যে শ্রেণীর অভিনয় দেখাইয়াছেন তাহা একেবারেই রুচিসম্মত নহে। শ্রীমতী রাণীবালা এলা চরিত্রটিকে ভাল করিয়া বুঝিতেই পারেন নাই। সতীর ক্ষুদ্র ভূমিকায় নবাগতা অভিনেত্রী শ্রীমতী বীণা বাগচি সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। হাসির ভূমিকায় শ্রীমতী অরুণার অভিনয় আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে—তাঁহার অভিনয়ের মধ্যে একটি প্রাণশক্তির সাড়া পাওয়া যায়। শ্রীমতী অরুণা প্রথম যে নাচটি দেখাইয়াছেন, কোন শিক্ষিতা, ভদ্রবংশীয়া তরুণী ঐ শ্রেণীর নাচ দেখাইতে পারেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। শক্তিশালিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রভা মিসেস সেন চরিত্রটিকে চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

ছবির মধ্যে নাচের দৃশ্যগুলি অতি চমৎকারভাবে লওয় হইয়াছে। শ্রীযুত শৈলেন রায়ের সংগীত রচনা এবং হিমাংশু দত্তের সুর সংযোজনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবহ সংগীত ভাল হয় নাই। ছবির সংলাপ স্থানে স্থানে বিশেষ উপভোগ্য কিন্তু সর্ব্বত্র সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্পাদনা একেবারেই ভাল হয় নাই। ছবির মধ্যে উপভোগ্য অনেক কিছু আছে এবং সেই হিসাবে ছবিখানি বেশ ভাল চলিবে বলিয়াই মনে হয়।

* * * * *

গত শনিবার, ১২ই আগষ্ট হইতে চিত্রা ও নিউ সিনেমায় নিউ থিয়েটার্সের নূতন ছবি "রজত জয়ন্তী" দেখান হইতেছে। শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় প্রমথেশ বড়ুয়া পাহাড়ী সান্যাল, মেনকা, মলিনা, শৈলেন চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখার্জ্জি, দীনেশ দাস, শোর প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

ছবিখানি আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, এই ছবিখানি [illegible] বাঙলা দেশে নহে সমগ্র ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ [illegible] লাভ করার যোগ্য। শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া এই ছবি [illegible] অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া [illegible] মুগ্ধ হইয়াছি। বারান্তরে এই ছবি সম্বন্ধে আমরা [illegible]ভাবে আলোচনা করিব।

* * * * *

আগামী শনিবার হইতে রূপবাণী চিত্রগৃহে ফিল্ম-করপোরেশনের প্রথম বাঙলা ছবি 'রিক্তা' আরম্ভ হইবে। শ্রীযুত সুশীল মজুমদার ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। বিভিন্ন ভূমিকায়ঃ—অহীন্দ্র চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া, রমলা, সুশীল মজুমদার, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি দেখিয়া আসিয়া পরে আমরা এইছবি সম্বন্ধে আমাদের মতামত জানাইব।

* * * * *

কমলা টকিজের হইয়া পরিচালক শ্রীযুত সতু সেন শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অতি প্রশংসিত নাটক "স্বামী স্ত্রী"র চিত্র গ্রহণ করিতেছেন। ফিল্ম-প্রোডিউসার্সের ষ্টুডিওতে এই ছবি তোলা হইতেছে।

"স্বামী-স্ত্রী" নাটকখানি সম্বন্ধে নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছু নাই। বহু দিন ধরিয়া অতি প্রশংসিতভাবে এই নাটকখানি রঙমহল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। নূতনত্বের জন্য এই নাটকখানি যে শুধু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা নহে; চরিত্র সৃষ্টিতে, ঘটনার পর ঘটনার সমাবেশে, মার্জ্জিত ও ভদ্র রুচি সম্মতভাবে নাট্যকার এই নাটকখানিকে এইরূপ চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন যে তাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নাই। নর-নারীর মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনস্তত্ত্ব নাট্যকার অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীযুত সতু সেনের পরিচালনায় চিত্রখানি সে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া উঠিবে এ আশা আমরা করিতে পারি।

এই চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় ছায়া, চন্দ্রাবতী, ছবি বিশ্বাস, প্রভাত মুখার্জ্জি, সন্তোষ সিংহ প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন। চিত্র গ্রহণ করিতেছেন বিভূতি লাহা; যতীন দত্ত শব্দ গ্রহণ করিতেছেন; দৃশ্যপরিকল্পনা করিয়াছেন সুধাংশু চৌধুরী; সংগীত রচনা করিয়াছেন শৈলেন রায়; গানে সুর দিয়াছেন হিমাংশু দত্ত এবং আবহ সংগীত পরিচালনা করিতেছেন দক্ষিণা ঠাকুর।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৮ই আগষ্ট—

শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট সরস্বতীবালার মৃত্যুঘটিত মামলার সমস্ত আসামীকেই বে-কসুর খালাস দিয়াছেন।

আসাম ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন সদস্যকে লইয়া "আসাম কা[illegible] প্রগ্রেসিভ পার্টি" নামে একটি দল গঠিত হইয়াছে। [illegible] সাধারণত পরিষদের কংগ্রেস কোয়ালিশন দলের স[illegible]যোগে কাজ করিবে।

[illegible] আর্য্য লীগের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক [illegible]ধিবেশনে হায়দরাবাদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখার [illegible]ধান্ত হইয়াছে। নিজাম সরকারের অদ্যকার ইস্তাহারে যে আপোষের মনোভাব রহিয়াছে তাহার কথা বিবেচনা করিয়াই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে যে সকল সত্যাগ্রহী জাঠা আছে, তাঁহাদিগকে দলভঙ্গ করার জন্য সত্যাগ্রহ কমিটিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুক্ত রাজমোহন করঞ্জাই দমদম সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি কুড়িগ্রাম ট্রেন ডাকাতি মামলায় দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

গত কয়েকদিনের অবিরাম বর্ষণের ফলে কৃষ্ণনগরে গৃহ পতনে তিনজনের মৃত্যু হইয়াছে। নাটোরের নিকট এক নৌকাডুবিতে দুইজনের মৃত্যু হইয়াছে।

সিংহল গবর্ণমেণ্ট বেকার সিংহলীদের চাকুরীর সংস্থান করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ভারতীয় দিনমজুর বিতাড়নের যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসারে প্রায় আট শত ভারতীয়কে জবাব দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগকে ভারতে ফিরিয়া যাইবার ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে। ভারতে ফিরিয়া যাইবার মেয়াদ বার দিন।

কটকে নবপ্রগতি সাহিত্য সংসদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, 'খাঁটি প্রগতি সাহিত্য হইবে বাস্তব-বাদী, সাধারণ মানুষের মনের প্রতিচ্ছবি। মানব জীবনের ভাল-মন্দ উভয়দিক হইতে উপাদান লইয়া উহা গড়িয়া উঠিবে। সম্মুখে থাকিবে কেবল দুইটি আদর্শ—এক জাতির চেতনা উন্মেষ, আর মানুষের সম্মুখে উচ্চতম আদর্শ স্থাপন।"

এ পর্য্যন্ত প্রায় ৬২ হাজার সৈন্য ভারত হইতে সিঙ্গাপুর পৌঁছিয়াছে।

প্যালেষ্টাইনে সারাকেন্দ-এর বন্দিশালায় ৮০জন রাজনৈতিক বন্দী সরকারী অনাচারের বিরুদ্ধে 'আমৃত্যু অনশন' আরম্ভ করিয়াছে।

৯ই আগষ্ট—

ওয়ার্দ্ধায় শেঠ যমুনালাল বাজাজের ভবনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া, শ্রীযুত শঙ্কর রাও-দেও, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই এবং আচার্য্য কৃপালনী অধিবেশনে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনায় যোগদান করেন। আজ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় একটি মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীযুত উধোজীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। শ্রীযুত উধোজীকে পরিষদের সদস্যপদে ইস্তাফা দেওয়ার জন্য বলা হইয়াছে এবং তাঁকে তিন বৎসরের জন্য কংগ্রেস হইতে বহিস্কৃত করা হইয়াছে।

আসামে কংগ্রেস কোয়ালিশন পার্টিকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে আসাম মন্ত্রিসভায় আরও দুইজন মন্ত্রী লওয়া সমীচীন বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটি অভিমত প্রকাশ করেন।

ভয়পুর সরকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শেঠ যমুনালাল বাজাজকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়াছেন।

বিহারের অন্তর্গত আওরঙ্গাবাদের নিকট রয়েল এয়ার ফোর্সের একখানি বোমারু বিমান পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উইং কম্যাণ্ডার ও বিমানের দুইজন কর্ম্মচারী নিহত হইয়াছেন। বিমানখানি কলিকাতা আসিতেছিল, পথিমধ্যে প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া এই দুর্ঘটনা হয়।

১০ই আগষ্ট

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়। ওয়ার্কিং কমিটি দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ভাঙ্গিয়া দিয়া জিলা কংগ্রেস কমিটিকে নিয়মানুসারে পুনর্নির্ব্বাচন কার্য্য সমাধা করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে। এতৎসম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক লালা শঙ্করলাল দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী কল্পে কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে এক বিরাট জনসভা হয়। শ্রীযুত সুরেশ-চন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বন্দীদের মুক্তি না দেওয়া হইলে দুই মাস পর যে সংগ্রাম আরম্ভ হইবে, তজ্জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইতে জনসাধারণকে আহবান করিয়া সভায় বহু বক্তা বক্তৃতা করেন।

আসাম ব্যবস্থাপক সভায় ফাইন্যান্স বিল পাশ হইয়াছে।

১১ই আগষ্ট—

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, গুরুতর নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পদের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে তিন বৎসরের জন্য তিনি কোন নির্ব্বাচিত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না। ৯ই জুলাই তারিখের বিক্ষোভ প্রদর্শনে অপর যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটি তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই, তবে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কাহারও